

বঙ্গদর্শন

(নবপার্ব্যায়)

মাসিক পত্র

ব্রাহ্মণ বর্ষ

১৩১৯

প্রবন্ধ-লেখক লেখিকাগণ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীকোমটিচন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীচন্দ্রশেখর ব্রহ্মোপাধ্যায়, শ্রীঅক্ষয়-
কুমার মৈত্রেয়, শ্রীশশধর বায়, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল,
শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী, শ্রীসত্যীশচন্দ্র বাকুটি, শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, শ্রীশব্দচন্দ্র চৌধুরী,
শ্রীমুরেলীনাথ মজুমদার, শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেন্দ্রকুমার
রায়, শ্রীগিরিশানাথ ব্রহ্মোপাধ্যায়, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণেন্দ্রনাথ
মিত্র, শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, শ্রীমনোবরুণ গুপ্ত ঠাকুরতা, শ্রীজিহ্না-
লাল বসু, শ্রীগোভিন্দলাল আচার্য্য, শ্রীকালীনাথ ব্রহ্মোপাধ্যায়,
শ্রীবিদ্যুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীবেনোয়াত্রীলাল গোস্বামী, শ্রীপদ্মা-
নন মজুমদার, শ্রীরমণীমোহন বোষ, শ্রীতাবকচন্দ্র
রায়, শ্রীমুখোদচন্দ্র মজুমদার, শ্রীরামলাল সর-
কার, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশীতলচন্দ্র
চক্রবর্তী, শ্রীমুরেলীনাথ মৈত্র, শ্রীকালি-
দাসরায়, শ্রীগোপালচন্দ্র দেব,
শ্রীত্রিগুণেন্দ্র রায়, শ্রীমতী
প্রসন্নমণী দেবী, শ্রীমতী প্রিয়-
বদা দেবী প্রভৃতি।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে।

এস. সি. মজুমদার প্রকাশিত,

বার্ষিক মূল্য ৩৯/০।

1

পণ্ডিত.সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ব্রহ্মসংহিতা ও ভক্তিবাদ

অপূর্ব্ব মহাগ্রন্থ। শ্রীশ্রীগৌরান্ন মহাপ্রভু এই মহাগ্রন্থ স্বয়ং দাক্ষিণাত্য হইতে
জন্মভূমিতে আনয়ন করিয়া শ্রীল জীব গোপামী দ্বারা টীকা লেখান। সেই মূল ও টীকা
এবং মূলের ও টীকার পৃথক পৃথক্ অনুবাদ এবং ষড়দর্শন ও ভক্তি শাস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-
চন্দ্র যে এক অদ্বিতীয় ও পূর্ণতম পরমাত্মা তাহা মূলে শ্লোকাদির ব্যাখ্যা ও আভাস দ্বারা
দেখান হইয়াছে, তৎপরেই ভক্তিই যে মুক্তির একমাত্র কারণ এবং "স্বাধার প্রেম সাধা
শিরোমণি" তাহা ভক্তিবাদে বুঝান হইয়াছে। এমন গ্রন্থ, এমন সংগ্রহ, এমন
বালোচনা কোন গ্রন্থে নাই। বঙ্গভাষায় ইহা মহাপ্রত্ন। বহু পুস্তক, সুন্দর চাপা,
উৎকৃষ্ট বাঁধাই ও কাগজ। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

দ্বাদশ বর্ষ]

বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১৩১৯

[১২শ সংখ্যা

মুঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। সভাপতির অভিভাষণ	শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ... ৭০৭
২। নিমাই-চরিত্র	শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়, বি এ ... ৭৩৫
৩। রামাবতী	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বৈজ্যেয় ... ৭৪৬
৪। বিলাতের টিকটিকি	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ... ৭৫১
৫। জয়দেব ও বিদ্যাপতি	শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু ... ৭৫৮
৬। বেদের কথা	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রপাল ... ৭৬৮

এস্, মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত

১৩১৯

নব বর্ষের

বঙ্গদর্শনের

বৈশাখ সংখ্যা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যায় সাহিত্যাচার্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়গণের বিবিধ রচনা ও কোন সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসিকের ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস, ও শ্রেষ্ঠ গল্প ও নক্সা-লেখকগণের ছোট গল্প ও নক্সা প্রভৃতি থাকিবে। নববর্ষ হইতে নূতন বন্দোবস্তানুযায়ী, গ্রাহকগণ ১০ই তারিখের মধ্যে প্রতিমাসের কাগজ পাইবেন।

গ্রাহক মহোদয়গণ ৩০শে চৈত্রের মধ্যে আগামী বর্ষের মূল্য ৩৮/০ মণিঅর্ডার করিলে সুবিধা অনুভব করিব। যাহারা মণিঅর্ডারে টাকা পাঠান অসুবিধা মনে করেন, তাঁহাদের নিকট ৩৮/০ চার্জ করিয়া বৈশাখের সংখ্যা ভিপিতে প্রেরিত হইবে। গ্রাহক মহাশয়গণের কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে ৩০শে চৈত্র মধ্যেই অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

বঙ্গদর্শন

চরিত-চিত্র



শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার ইতিহাসে গুরুদাস বাবুর স্থান
বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে গুরুদাস
বাবুর নাম থাকিবে কি না, জানি না। না
থাকাই সম্ভব। ইতিহাস সচরাচর যে সকল
বস্তুর স্মৃতিকে সময়ে রক্ষা করে, গুরুদাস
বাবুতে সে বস্তু বেশি নাই। যাহা অলোক-
সামাগ্র, ইতিহাস কেবল তাহাকেই স্মরণীয়
করিয়া রাখে। গুরুদাস বাবুর একুপ
অলোকসামাগ্র কোনো কিছু নাই। তাঁর
অনেক বিদ্যা আছে, কিন্তু অনন্তসাধারণ
বিশেষজ্ঞতা নাই। শ্রেষ্ঠ মেধা আছে, কিন্তু
অলৌকিক প্রতিভা নাই। গুরুদাস বাবু কর্মী;
আর তাঁর কর্ম সর্বদাই ধর্ম ও নীতি, শাস্ত্র
ও লোকাচারের সম্মান করিয়া চলে। এই
জন্ত যাহারা সচরাচর এ সংসারে কলহ-
কৌলহল-মুখর কর্মজাল বিস্তার করিয়া,
সমুদ্র একটা ঐতিহ্য-কীর্তি অর্জন করে,
গুরুদাস বাবু সে জাতীয় কর্ম-নায়ক নহেন।
তথাপি দেশের লোকে তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা
করে; এতটা শ্রদ্ধা বাংলাদেশের সকল

শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রাণ
হইতে, আর কাহারো প্রতি অর্পিত হইতেছে
কি না, সন্দেহ। দেশের লোকে তাঁহার
বিদ্যার সম্বর্ধনা করে; তাঁহার বিনয়-সৌজন্তের
সমাদর করে; তাঁহার বাহ্যভূষণশূণ্য
ধর্মনিষ্ঠার ও আত্মনিষ্ঠার পূজা করিয়া থাকে।
সকল প্রকারের জনহিতকর কর্মে তাঁহার
নেতৃত্ব কামনা করে। সকল আদেশিক
সাধু-অমুষ্ঠানে তাঁহার সমানুভূতি ও সাহচর্য্য,
তাঁর পরামর্শ ও আশীর্বাদ ভিক্ষা কবে। কিন্তু
তিনি যে তাহাদের চিন্তা ও ভাব, আশা ও
আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়া, অতি ঘনিষ্ঠভাবে
তাহাদের অন্তর্জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া
আছেন, এমনটা কখনো অশুভব করে না।
আর এ জগতে যাহারা, মিত্রভাবেই হউক
আর শত্রুভাবেই হউক, আপনাদের সম-
সাময়িক জনমণ্ডলীর জ্ঞান, রস, আশা, আদর্শ,
প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত
হইয়া থাকেন, ইতিহাস কেবল তাহাদেরই
স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিতে চাহে।

ঐতিহাসিক কীর্তির বিশেষত্ব

কিন্তু ইতিহাসে বাহাদুরের নাম থাকিয়া যায়, কেবল তাঁহারই যে সমাজের শ্রেষ্ঠ জন, কেবল তাঁহাদেরই নিকটে যে সমাজ অশেষ ও অশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ থাকে, অপরের নিকটে থাকে না, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। ফলতঃ ইতিহাস যে কেবল ভালকেই মন্দে করিয়া রাখে, মন্দকে তুলিয়া ধায়, তাহাও নহে। রোমের ইতিহাস পুণ্যলোক মার্কাস্ অরিলিয়সের যেমন, তেমনি ক্রুরমতি নীরোরও নামকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের প্রাচীন পুরাণ-কথায় রামও আছেন, রাবণও আছেন; যুধিষ্ঠিরও আছেন, দ্রুপদও আছেন। ভারতের পুণ্যস্থতি জনকের নামও রাখিয়া রাখিয়াছে, বেণু রাজার নামও ভুলিয়া যায় নাই। ইতিহাস কেবল ভালকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে, মন্দকে রাখে না, তাহা নয় ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা কিছু অলোকসামান্য, ইতিহাস তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরে। মানবের প্রকৃতি হইতেই তো ইতিহাসের বিচার-পদ্ধতির উৎপত্তি। আর যাহা নিত্য, তাহা অপেক্ষা যাহা নৈমিত্তিক, যাহা স্থিতি-হেতু, তাহা অপেক্ষা যাহা গতি-সহায়; যাহার মন তাহারই দ্বারা সমধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে বাহারা জননমাজের স্থিতির সহায়, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, বাহারা জন-সমাজের গতির হেতু হইয়া উঠেন, ইতিহাস তাহাদিগের স্মৃতিকেই বিশেষভাবে জাগাইয়া রাখিতে চাহে। যে সকল শক্তির সমবায়ে বা সংঘর্ষণে সমাজ-জীবনবিবর্তিত হয়, ইতিহাস তাহাকেই ভাল করিয়া লক্ষ্য করে। আর সমাজ-বিবর্তনে ভাল ও মন্দ দুই মিশিয়া

থাকে। আলো ও ছায়ার সমাবেশ ব্যতিরেকে যেমন কোনো তৈলচিত্র ফুটিয়া উঠে না; যেইরূপ ভাল ও মন্দের সংঘর্ষণ ব্যতীত সমাজ-জীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভাল ও মন্দের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে, তাহারই দ্বারা, সেই বিরোধের ফলস্বরূপই, জনসমাজ বিবর্তিত হইতেছে। এই দেবাত্ম-সংগ্রাম মানব-সমাজের নিত্য ধর্ম। আর তারই জন্ত, এই মানব-সমাজের বিবর্তনের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা যে ইতিহাসের কর্তব্য, সেই ইতিহাস লোকে যাহাকে ভাল বলে কেবল তাহাকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে না; কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা কিছু শক্তিশালী, যাহা কিছু অনন্তসাধারণ, যাহা কিছু গতির কারণ, ইতিহাস সর্বদা তাহাকেই নিরপেক্ষভাবে ধরিয়া রাখিতে চাহে।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রণালী

আর অলোকসামান্য প্রতিভাই সচরাচর জনমণ্ডলীর প্রাণে নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব, নূতন আদর্শ, নূতন আশার সঞ্চার করিয়া, যুগে যুগে সমাজের এই গতিশক্তিকে প্রবুদ্ধ ও পরিচালিত করিয়া থাকে। এই সকল নূতন ভাব ও আদর্শের প্রেরণায়, যাহা পূর্বে পাওয়া যায় নাই, তাহা পাইবার জন্ত জনগণের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। এই লোভ হইতে নূতন কর্মের আয়োজন, এবং এই কর্মক্ষেত্র হইতেই সমাজের বিবর্তন ও বিকাশ সাধিত হয়। অলোকসামান্য প্রতিভা সমাজের গতি-বেগ বৃদ্ধি করে বলিয়াই ইতিহাসে তাহার এত গৌরব। কিন্তু জনসমাজের কল্যাণকল্পে যেমন তাঁর গতি-শক্তির তেমনি তাঁর স্থিতি-শক্তিরও আবশ্যক। যেখানে সমাজের

গতি-শক্তি তাঁর সনাতন স্থিতি-শক্তিকে একান্তভাবে অভিভূত করিয়া ফেলে, সেখানেই সমাজ-চৈতন্য একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া, উন্মাদিনী বিপ্লবশক্তির ক্রীড়াপুতলি হয় এবং অচিরে বিনাশের মুখে যাইয়া পড়ে। আবার যেখানে সমাজের স্থিতি-শক্তি একান্ত-ভাবে তাহার স্বাভাবিক গতিশীলতাকে চাপিয়া রাখিতে বা পিষিয়া মারিতে চেষ্টা করে, সেখানে কিছুদিনের জন্ত সমাজ নিভান্ত স্থবির হইয়া পড়ে এবং শুদ্ধ গতানুগতিক পথ ধরিয়া জড়গতিমাত্র প্রাপ্ত হয়, জীবন-চেষ্টা প্রকাশ করিতে পারে না। আর স্বভাবের গতিরোধ করিয়া কিছুকালের জন্ত স্থবিরতা লাভ করে বলিয়াই, তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ, পরিণামে প্রবল বিপ্লবের মুখে যাইয়াই পড়ে। এই জন্ত, সমাজের চিরন্তন কল্যাণকল্পে, তাহার স্বাভাবিক বিবর্তন-পথ অবাধ ও প্রশস্ত রাখিতে হইলে, তাহার গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তি উভয় শক্তিকেই, আপন আপন অধিকারে, সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যক হয়।

সমাজ-জীবনের ত্রিধারা

কারণ, জনসমাজের বিবর্তন-চেষ্টা গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তি উভয়কেই সমভাবে অবলম্বন করিয়া চলে। একদল লোক যখন কোনো অভিনব ভাব বা আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক অহুসারগণতঃ আত্যন্তিকভাবে সমাজের গতি-বেগকে বাড়াইয়া তুলিতে চান; অপর এক দল লোক তখন, সমাজের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিধিব্যবস্থার এবং অস্থান-প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্তন যে অপরিহার্য হইয়া উঠে এবং এই পরিবর্তনের একান্ত প্রতিরোধ করিলে সমাজের গুরুতর অকল্যাণ

সাধিত হয়, ইহা বিচার না করিয়া, সমাজস্থিতির দোহাই দিয়া, প্রাণপণে এই প্রবুদ্ধ গতিশক্তিকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। আর এই দুই দলই সমাজ-বিবর্তনের প্রত্যক্ষ হেতুরূপে, ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহেন। কিন্তু যাহারা এক দিকে দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া, এইরূপে সমাজের গতিবেগকে আত্যন্তিক ভাবে বাড়াইয়া তোলেন, তাহারা যেমন সমাজের স্বৈর্য্য ও শান্তি নষ্ট করিয়া, তাহা আভ্যন্তরীণ প্রাণ-বস্তুকে পীড়িত করেন; সেইরূপ যাহারা অতীতকে অভিনব যুগধর্মের ও কালধর্মের প্রতি অমনস্ক হইয়া, এই প্রবুদ্ধ গতিবেগকে জোর করিয়া প্রতিরোধ করিতে বন্ধপরিকর হন, তাহারাও সেইরূপই অথবা সংগ্রাম বাড়াইয়া, সমাজ-প্রাণকে রক্ষা করিতে যাইয়াই, তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হন। কিন্তু যাহারা এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া, ধীর-ভাবে তার পরিণাম লক্ষ্য করিতে থাকেন এবং যতক্ষণ না এই সংগ্রামের নিবৃত্তি হইয়া নূতনের ও পুরাতনের মধ্যে একটা উচ্চতর সন্ধি ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ততক্ষণ কোন এক পক্ষকে একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে, এই কলহ-কোলাহলের মধ্যে সমাজের মর্মস্থলে যে সনাতন প্রাণবল্য আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকেই কেবল ধরিয়া বসিয়া রহেন,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সমাজের মেরু-দণ্ডস্বরূপ! কোন সমাজে, কালপ্রভাবে, তাহার পূর্বকৃত ও অধুনা-চেষ্টিত কর্মবশে, এইরূপ, সমর-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, যাহারা নূতনের লোভেও আত্মবিস্মৃত হন না, আর তার ভয়-বিভীধিকাতেও বিক্লিষ্ট হইয়া উঠেন না,—

কামবশাৎ নূতনকেও আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হন না, আর কার্পণ্যবশাৎ পুরাতনের জীর্ণতারও আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহেন না; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের গুণাগুণ ও দাওদাদাবীর পরীক্ষা হইয়া পরিণামে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, ধীরভাবে তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন,—প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলে, সমাজের সনাতনী প্রাণশক্তি চাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিবার আশ্রয়কা করে। কলহকোলাহলপ্রিয় ইতিহাস এই সকল লোকের খোঁজ লয় না। কিন্তু ইতিহাসের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াও, আসন্ন-সমাজ-বিপ্লবের মুখে, এই সকল ধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্মনিষ্ঠ, আত্মনিষ্ঠ, শাস্ত ও সমাহিত-চিত্ত সুধীজনই অতি সন্তর্পণে, সেই সঙ্কটকালে, সমাজের সনাতন প্রকৃতিটিকে প্রাণে পুরিয়া বাঁচাইয়া রাখেন।

গুরুদাস বাবু ও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়

বাংলার স্বদেশী সমাজ একটা প্রবল বিপ্লব-স্রোতের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে। আর এই সঙ্কটকালে যে অত্যন্তসংখ্যক ধীর-প্রকৃতি সুধীজনকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজের সনাতন প্রাণবন্ত আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, গুরুদাস বাবু তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। যে বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনার প্রভাবে এই যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, গুরুদাস বাবু সেই শিক্ষা ও সাধনাকে সুন্দর-রূপেই অধিগত করিয়াছেন। এ দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের তিনি অগ্রণী। যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনার সেতু-স্বরূপ হইয়া আছে, গুরুদাস বাবু তাহার অন্ততম অধিনায়ক। কিন্তু গুরুদাস বাবুর সমসাময়িক ইংরেজি-শিক্ষাপ্রাপ্ত

সম্প্রদায়ের অনেকেই যেরূপভাবে এই শিক্ষা-দীক্ষারদ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, গুরুদাস বাবু কখনো সেরূপ হন নাই। অন্তর্দিকে যাহারা এই শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াও, ইহার প্রতি একটা গভীর ও অযৌক্তিক বিরাগ বশতঃ এই শিক্ষাদীক্ষাতে দেশ মধ্যে যে অবশ্যস্বার্থী পরি-বর্তনের স্রোত আনিয়াছে, সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতে বঙ্গপরিকর হন; গুরুদাস বাবু কখনো একান্তভাবে তাঁহাদেরও সঙ্গে মিশিয়া যান নাই। মানুষের বিজ্ঞা তাহার ভূত্য হইয়াই থাকিবে, তাহারই ঈশ্বিত-সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত হইবে; ইহাই বিজ্ঞাভ্যাসের সত্যলক্ষ্য। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে আমরা আজি-কালি সর্ব্বস্বাস্ত হইয়া যে বিদেশীয় বিজ্ঞা-অর্জনের চেষ্টা করিতেছি, তাহা অনেক স্থলেই আমাদের ভূত্য না হইয়া, আমাদের প্রভু হইয়াই বসিতেছে। আমরা অনেকেই এই অভিনব বিজ্ঞাকে নিজেদের কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারিতেছি না; প্রত্যুত এই বিজ্ঞাই আমা-দিগকে ভয়াবহ পর-ধর্ম্মে নিয়োগ করিতেছে। মানুষের শিক্ষা ও সাধনা তাহার আত্মজ্ঞানেরই স্ফূরণ করিবে; ইহাতেই শিক্ষাদীক্ষার স্বার্থকতা লাভ হয়। কিন্তু বর্তমান বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনা আমাদের আত্মজ্ঞানের স্ফূরণ না করিয়া, অনেক সময় কেবল আত্মবিস্মৃতিই জন্মাইয়া দেয়। এই বিদেশী বিজ্ঞার বলে আত্মলাভ করা দূরে থাক, অনেক সময় আমরা আত্মবিক্রয় করিয়াই বসি। এইরূপ আত্ম-বিস্মৃতি ও আত্মবিক্রয় আমাদের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। সংস্কারক ও সংস্কার-বিরোধী, উভয় দলেরই মধ্যে ইহা দেখা যায়। এক শ্রেণীর সমাজ ও ধর্ম্ম-

সংস্কারক সৰ্বজনসমক্ষে, স্পর্ধাসহকারে, নিঃস্বার্থভাবে, যেমন এই বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন ; ষাঁহারা এই প্রকাশ্য প্রয়াসের প্রতিরোধ করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারাও গোপনে গোপনে সেই বিজাতীয় ভাবকেই অজ্ঞাতসারে প্রাণ মধ্যে বরণ করিয়া তুলিতেছেন। ভগবানকে যেমন মিত্রভাবে ভজনা করিয়াও পাওয়া যায়, শত্রুভাবে সাধন করিয়াও পাওয়া যায়, আর শাস্ত্রে বলে, শত্রু-ভাবে সাধন করিলে যত সত্ত্বর সিদ্ধিলাভ হয়, মিত্রভাবে ভজনায় তত সত্ত্বর হয় না;—সেই-রূপ কৌনো বিদেশীয় সভ্যতা-সাধনাকেও মিত্র-ভাবে ও শত্রুভাবে, উভয় ভাবেই পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকেরা মিত্রভাবে যুরোপের ভজনা করিতেছেন। সংস্করণ-বিরোধী “পুনরুত্থানকারিগণ” শত্রুভাবে তার সাধনা করিতেছেন। আর কার্যতঃ উভয় পক্ষই সমভাবে তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সংস্কারকগণের উপরে যুরোপের প্রভাব প্রত্যক্ষ, সংস্করণ-বিরোধিগণের উপরে প্রচ্ছন্ন—হ’এর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ।

“সংস্কারক” ও সংস্করণ-বিরোধী

সংস্কারকগণ অসাধারণ অভ্যুদয়সম্পন্ন বিদেশীয় সমাজের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদিকে যথাসাধ্য নিজের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত লালায়িত হইয়াছেন। আর এইরূপে বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার বাহু উপকরণগুলিকে সম্বন্ধে সংগ্রহ করিতে বাইয়া, স্বল্পবিস্তর আশ্রয়হারা হইয়া পড়িতেছেন। স্বদেশী সভ্যতা ও সাধনার যে একটা অতি ভাল দিক আছে, এ কথা ইহারা অস্বীকার করেন না।

বরং এই ভালটুকুকে রক্ষা করিবার জন্তই যে সংস্কারের প্রয়োজন, ইহাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোনো সমাজের বহিরঙ্গণলিকে গ্রহণ করিয়া তার ভিতরকার প্রকৃতিগত আদর্শ ও স্বভাবকে বর্জন করা যে কখনো সম্ভব হয় না, এটা তাঁহারা বোঝেন না। বিদেশীয় সমাজের বাহিরের উপকরণ ও আয়োজনগুলিকে প্রাণ-পক্ষে সংগ্রহ করিব, আর স্বদেশের সমাজের ভিতরকার প্রাণটাকেও ধরিয়া রাখিব এবং তাহারই মধ্যে পূরিয়া দিয়া একটা উৎকৃষ্টতম সমাজ গড়িয়া তুলিব, ইহা যে একেবারে অসম্ভব ও অসাধ্য,—এই মোটা কথাটা অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। প্রত্যেক জীবের আত্ম-প্রয়োজনেই তার দেহটা গড়িয়া উঠে। জীবদেহের বহিরঙ্গণগুলি একটা আকস্মিক ঘটনাপাতের অচেষ্টিত ফল নহে। সমাজ-জীবন এবং সমাজ-দেহ সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। প্রত্যেক সমাজের রীতিনীতি, আচার-বিচার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদি সেই সমাজের আত্মপ্রয়োজনে, তার আভ্যন্তরীণ জীবন-চেষ্টার ফলেই গড়িয়া উঠে, কোন আকস্মিক ঘটনাপাতে, আপনা হইতে গজায় না, অথবা অন্য সমাজ হইতেও উড়িয়া অসিয়া জুড়িয়া বসে না। দেহের সঙ্গে দেহীর যেমন অঙ্গাদ্বী—ইংরেজিতে ইহাকে অর্গেনিক রিবেষণ (Organic relation) বলে—প্রত্যেক সমাজের রীতিনীতি, বিধি-ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে সেই সমাজ-জীবনের সম্বন্ধও সেইরূপ অঙ্গাদ্বী, আকস্মিক নহে। কাণ টানিলেই যেমন আপনা হইতেই মাথাও সরিয়া আইসে, সেইরূপ কোন সভ্যতা ও সাধনার বাহিরের ঠাটটাকে কোথাও খাড়া করিতে গেলেই, তার প্রাণটাও

যে তার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চিত। বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার বহিরঙ্গসাধনে নিযুক্ত হইলে, তার অন্তরঙ্গটুকুকেও লইতেই হইবে। আর এরূপ ভাবে, স্বচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তার দেহ ও প্রাণ উভয় বস্তুকেই যদি আত্মসাৎ করিতে হয়, তবে স্বদেশের সত্য প্রাণটাকে কিছুতেই রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সংস্কারকগণ যে ভাবিতেছেন, তাঁরা বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার ভাল ভাল অস্থান-প্রতিষ্ঠানগুলিকেই গুণিয়া বাছিয়া, নিজের সমাজে গ্রহণ করিবেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দেশের সনাতন আদর্শটিকেও বাঁচাইয়া রাখিবেন, ইহা নিতান্তই অলীক কল্পনা মাত্র। প্রত্যেক সভ্যতা ও সাধনাতেই ভাল ও মন্দ দুই আছে। আর এই ভাল ও মন্দ, ছায়াতপের গ্রাফ, পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে মিশিয়া আছে। সকল সমাজের রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার মধ্যেই ভাল ও মন্দের এই অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে। যে সমাজে যে সকল রীতিনীতি ও আচার-বিচার, সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে, সে সমাজে, তার সঙ্গে সঙ্গে লোকচরিত্রের মধ্যেই ভালকে রক্ষা করিবার ও মন্দকে রোধ করিবার একটা অপূর্ব কৌশলও আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। অপর সমাজ যদি এই সকল রীতিনীতি বাহির হইতে গ্রহণ করিতে যায়, তাহা হইলে, ভাল মন্দ দুই তাহাকে লইতে হয়। কিন্তু তার ভালটিকে বাড়াইয়া দিয়া মন্দটিকে রোধ করিবার এই সহজ কৌশলটি সে সমাজ কিছুতেই লাভ করিতে পারে না। কারণ এই সহজ

কৌশলটি ধার করিয়া পাকিয়া যায় না। আর এই জনাই অনুকরণ-প্রয়াসী সংস্কার-চেষ্ঠা, সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না বলিয়া, সর্বদাই ভয়াবহ পরধর্ম হইয়া উঠে। আমাদের আধুনিক ধর্ম-ও-সমাজ-সংস্কারকগণ যেমন এইরূপে বিদেশের সমাজের বহিরঙ্গসাধনে সচেতন হইয়া, সেই সমাজের ভিতরকার ভাব ও আদর্শের দ্বারা উত্তরোত্তর অভিভূত হইয়া, তাহারই ফলে স্বদেশের ভিতরকার সনাতন প্রাণশ্রোতের বাহিরে বাইয়া পড়িতেছেন; সংস্করণ-বিরোধিগণও সেইরূপই, অন্যভাবে ও অন্য কারণে, সেই সনাতন প্রাণ-শ্রোত হইতে একান্তভাবেই সরিয়া বাইতেছেন। সংস্কারকগণ বিদেশীয় সমাজের বাহিরের আচারানুষ্ঠানাদির মধ্যে নিজেদের সমাজের প্রাণরূপী সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শটিকে পুরিয়া, তাহাকে সমন্বয়যোগী ও কার্যক্ষম করিবার চেষ্ঠা করিতেছেন। এই পরদেহে যে সে প্রাণ থাকিবে না, থাকিতে পারে না; তৎপ্রতি ইহাদের দৃষ্টি নাই। সংস্করণ-বিরোধিগণ বিপরীত পথ ধরিয়া স্বদেশের সমাজের প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার মধ্যে বিদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রবল প্রাণটাকে পুরিয়া দিয়া, নিজেদের সমাজের বাহ্য ঠাটটাকে সতেজ ও সমন্বয়যোগী করিতে চাহিতেছেন। আমাদের পুরাতন সমাজ-দেহ বিদেশের এই নবীন প্রাণের টান যে কখনই সহিতে পারিবে না, তৎপ্রতি ইহাদের দৃষ্টি নাই। আর এই-রূপ উভয় পক্ষই বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সংস্কারকগণ নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার বহিরঙ্গটাকে

বলবিস্তার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, বিদেশীয় সমাজের হাতে, নিজেদের সমাজকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। এই ব্যগ্রতার পশ্চাতে একটা পাত্রিজনস্বলভ, কল্লিত, বিখ্যমানবী প্রেমের প্রেরণাই আছে; নিজেদের সমাজ-জীবন ও সমাজ-প্রকৃতির কোনো সত্য ধারণা নাই। অন্যদিকে যাহারা প্রাণপণে এই সংস্কার-প্রয়াসের প্রতিরোধ করিয়া, সমাজের “সনাতনী”টুকুকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন; তাঁহাদের এই ব্যাকুলতাতে তাঁহাদের সরল স্বদেশপ্রীতিই প্রকাশিত হয়, কিন্তু নিজেদের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে প্রাকৃতজনস্বলভ দেহাঅধাসটী যে বিন্দু-পরিমাণেও বিচলিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত হয় না। তাঁহারা সমাজের দেহটাকেই, তার বাহ্য বিধিব্যবস্থা ও আচার-অমুষ্ঠান প্রভৃতিকেই সমাজের সনাতন প্রাণ বলিয়া ধরিতেছেন আর তারই জন্ত, কালের প্রভাব এবং পূর্বকৃত কর্মের অপরিহার্য পরিণামের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃকপাত না করিয়া, সমাজের বাহিরের ঠাটটাকে রক্ষা করিলে তার ভিতরকার প্রাণটাও রক্ষা পাইবে ভাবিয়া, যাহারা এই ঠাটটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চান, তাঁহাদের সর্ববিধ সংস্কার-চেষ্টার প্রতিরোধ করিতেছেন। এইরূপে অম্মাদের সংস্কারকল যেমন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে, দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত সমাজগঠনকে ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার স্থলে বিলাতি আদর্শের একটা রজত-প্রধান জ্যেষ্ঠ-ভেদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন; সেইরূপ সংস্কার-বিরোধিগণও আশ্রমভ্রষ্ট

সুতরাং শস্যহীন যে বর্তমান বর্ণভেদ সমাজে প্রচলিত আছে, তারই ভিতরে বিলাতী জ্যেষ্ঠ-ভেদের প্রাণটাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্মের ক্ষয়োন্মুখ বহিরঙ্গটাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। একদল বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দেহটাকে, আর একদল তার প্রাণটাকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন। সুতরাং একপক্ষ সজ্ঞানে, আর একপক্ষ অজ্ঞাতসারে, কিন্তু উভয় পক্ষই সমভাবে, সত্যকার স্বাদেশিকতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। আর এই দুই দলই, দুই ভিন্ন দিক দিয়া, দেশের সত্যিকার সনাতন সভ্যতা ও সাধনার মূল ভিত্তিকে ভাঙ্গিয়া দিতেছেন।

গুরুদাস বাবুর “মধ্যপথ”

গুরুদাস বাবু এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিদলের কোনটারই অন্তর্ভূত নহেন। প্রচলিত অর্থে, তাঁহাকে কিছুতেই সমাজ-সংস্কারক বলা সম্ভব হইবে না। তিনি নিজেই কোন গতে সংস্কার-বিরোধী বলিয়া পরিচিত হইতে রাজি নহেন। মানব-সমাজ যে নিয়ত পরিবর্তনশীল, ইহা তিনি জানেন। মধ্যে মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম হইলেও, মোটের উপরে এই সকল সামাজিক পরিবর্তন যে উন্নতিমুখী, ইহাও তিনি মানেন। সমাজের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রাচীন রীতিনীতিও যে পরিবর্তন-যোগ্য হইয়া পড়ে, ইহা তিনি স্বীকার করেন। “হিন্দুসমাজে সংস্কারের অনেক স্থান আছে, সংস্কারকের অনেক কার্য আছে”—এ কথা যুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন।*

সুতরাং মোটের উপরে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, প্রচলিত সমাজসংস্কারক-দিগের সঙ্গেও গুরুদাস বাবুর মতের মিল আছে। তবে মতের মিল থাকিলেও কার্যের মিল নাই। তারই জন্যই গুরুদাস বাবুকে প্রচলিত অর্থে সমাজসংস্কারক বলা সম্ভবত নহে। সমাজসংস্কারকেরা সচরাচর সমাজের গতির বেষ্টাই বাড়াইয়া দিবার জন্যই ল্যস্ত; তার গতির দিকটা স্থির রহিল কি না, তৎপ্রতি তাঁহাদের তেমন সর্জাগ দৃষ্টি নাই। আর এই খানেই তাঁহাদের সঙ্গে গুরুদাস বাবুর যা' কিছু বিরোধ। সাধারণভাবে সমাজসংস্কারকদিগের, সহৃদেস্যের সঙ্গে গুরুদাস বাবুর আন্তরিক সহানুভূতিই আছে। এই জন্য আপনি নিষ্ঠাবান ও একান্ত শ্রুতি-অনুগত হিন্দু হইয়াও, গুরুদাস বাবু কখনো শ্রুতি-শ্রুতি-বিরোধী সংস্কারক-সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন নাই। বরং তাঁরা যে সাধু-ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সংস্কারকার্যে ব্রতী হইয়াছেন, সেই ইচ্ছার সফলতার জন্যই, তাঁহাদিগকে “অগ্রপশ্চাৎ ও চারিদিক্ দেখিয়া গুনিয়া সাবধানে” চলিতে বলেন। *

হিন্দুর সমাজানুগত্য

এই সংঘম ও সম্যকদৃষ্টিই গুরুদাস বাবুর কর্মজীবনের মূলমন্ত্র সমাজের কল্যাণের জন্ত, প্রয়োজন মত, তার প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যাইতে পারে। কোন চিন্তাশীল এবং বিশেষজ্ঞ হিন্দুই এ পরিবর্তনের একান্ত বিরোধী নহেন। প্রাচীনকে বর্জন করাই যে মহাপাপ, হিন্দুর বিবর্তন-

ইতিহাসে এমন অদ্বুত কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা প্রাচীন ও প্রচলিত তাহাকে ভাঙ্গাই যে অধর্ম, গুরুদাস বাবুও এমন মনে করেন না। আবশ্যক হইলে, হিন্দু তাঁর দেবতার মন্দিরও তো ভাঙ্গিয়া থাকেন। কিন্তু সে ভাঙ্গার ভাব ও ধরণ পৃথক। সে ভাঙ্গিতে তাঁর দেবতাও লুপ্ত হন না, তাঁর দেবভক্তিও নষ্ট হয় না। দেবতার পীঠস্থান বলিয়াই তো দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা। তারই জন্ত তো সামান্য ইটকাঠের ঘর ভক্তের ভক্তির বিষয় হইয়া উঠে। হিন্দুর সমাজ, সেইরূপ, হিন্দুর ধর্মের বহিরাবরণ ও কায়বাহুরূপ ধর্মাবহ ও পাপনুদ বলিয়া হিন্দুর শ্রুতি যাহার বন্দনা করিয়াছেন, তিনি নিতান্ত নিরাকার ভাবমানা নহেন। কেবল মানুষের হৃদয়-আকাশেই তাঁর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় না। যেমন প্রত্যেক মানুষের প্রাণে, তাঁর ধর্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, তিনি আত্মপ্রকাশ করেন; সেইরূপ যে সমাজে সে ব্যক্তি বাস করেন, সেই সমাজ-দেহে, তার রীতিনীতি এবং বিধিব্যবস্থার মধ্যেও তিনি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রত্যেক সমাজের বিধিব্যবস্থা, সেই সমাজের প্রাণগত ধর্মের বহিরঙ্গ ও বহিঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া রহে। অতএব হিন্দু আপনার দেহকে যেমন দেবতার মন্দির বলিয়া ভাবেন, তাঁর দেহ-পুরে যেমন তিনি সর্কাস্তর্য্যামী ও সর্কলোকসাক্ষী নারায়ণকেই একমাত্র পুরুষামীরূপে দেখিয়া সংযত চিন্তে, পবিত্রভাবে দেহের সেবা করেন; সেইরূপ আপনার সমাজকেও হিন্দু সেই ধর্মাবহ ও পাপনুদ পরমপুরুষের বহিরঙ্গ ও কায়বাহুরূপ বলিয়া ভক্তি করেন। এই কারণেই নিষ্ঠাবান

হিন্দুর চক্ষে তাঁর সমাজের আত্মগত্য ও ধর্মের আত্মগত্য একই কথা হয়।

• হিন্দুর সমাজ-তত্ত্ব

কারণ, হিন্দুর নিকটে তাঁর সমাজ, কতকগুলি মনুষ্যগোষ্ঠির স্বেচ্ছানির্বাচিত বা ঘটনাক্রমে সংগঠিত, একটা মিলনভূমি নহে। মানুষ কখনো ইচ্ছা করিয়া, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এ সকল স্বকৃত সমাজ তার মূল সমাজেরই অন্তর্গত হয়, কিন্তু সে সমাজের সম-ধর্ম লাভ করে না। ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, বৈষ্ণবসমাজ, ভারত-সভা, জমিদারী-পঞ্চায়ৎ, জাতীয়-মহাসভা বা কংগ্রেস এবং প্রাদেশিক সমিতি বা কন্ফারেনস—এগুলি স্বেচ্ছাবদ্ধ সমাজ। কিন্তু মানুষকে সামাজিক জীব বলিয়া আমরা যে সমাজের প্রতি নির্দেশ করিয়া থাকি, সে সমাজ এই জাতীয় সমাজ নহে। ফরাসীবিপ্লবের অধিনায়কগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, একটা কল্পিত সামাজিক সর্বের বা সোসিয়াল্ কন্ট্রাক্টের (social contract) উপরে মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া, সেই সর্বের উপরেই জনমণ্ডলীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বত্বাধীনতাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বহুদিন সে কল্পিত সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। যুরোপীয় পণ্ডিতেরাও এখন আর মানবসমাজকে এইরূপ একটা স্বেচ্ছাবদ্ধ ও স্বকৃত মিলনভূমি বলিয়া মনে করেন না। হিন্দু কখনোই এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। হিন্দু চিরদিনই এটী জানেন যে মানুষ যেমন আপনার খুসি বা খেয়ালমত এই ভৌতিক দেহ ধারণ করে না,

সেইরূপ সে আপনার ইচ্ছামত সমাজ-বিশেষেও জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্ম-সম্বন্ধীয় সর্ববিধ ব্যাপারই তার প্রাক্তনকর্ম-বশে সংঘটিত হইয়া থাকে। তার প্রাক্তন-কর্মই তাহাকে আপনার নির্দিষ্ট ফল-অনুযায়ী ভৌতিক দেহেতে আবদ্ধ করে। আর সেই প্রাক্তনকর্ম-বশেই মানুষ সমাজ-বিশেষে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, সেই সমাজের কর্মজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই দেহের সঙ্গে যেমন, তার নিজের সমাজের সঙ্গেও সেইরূপ, মানুষের যাবতীয় সম্বন্ধ আকস্মিক নহে কিন্তু অঙ্গাদী। যেখানে সে ঘটনাবশে, পরজীবনে, সমাজান্তর গ্রহণও করে, সেখানেও তার মূল ও জন্মগত সমাজ-প্রকৃতিটাকে সে সঙ্গে লইয়াই যায়। সেই স্বেচ্ছানির্বাচিত নূতন সমাজে, নূতন কর্ম সঞ্চিত হইয়া, কালক্রমে এই প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিলেও, যে সমাজে তার জন্ম হইয়াছিল, সেই সমাজের মূল ছাপটা তার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহি-রাচরণ হইতে কখনোই একেবারে মুছিয়া যায় না। প্রত্যুত বংশপরম্পরায় তার বৈজ্ঞিকগুণ সংক্রামিত হইয়া, এই স্বেচ্ছাগ্রহীত নূতন সমাজেও, চিরদিনের জন্ত না হউক, অন্ততঃ বহুদিন পর্য্যন্ত, তার বংশধরগণের চিন্তাতে ও চরিত্রে, সেই মূল সমাজের কতকগুলি বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। আর ইহাতেই সমাজের সঙ্গে সেই সমাজান্তর্গত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ যে আকস্মিক নহে, কিন্তু নিত্যই অঙ্গাদী, এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সঙ্গে সমাজ-ান্তর্গত জনগণের যে সম্বন্ধ তাহা একান্তই অপরিহার্য ও অঙ্গাদী বলিয়াই, হিন্দু কখনো আপনার সমাজকে নির্জীব মনে করেন নাই। তাঁহার দেহে যেমন একটা প্রাণবন্ত আছে,

যাহা চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, যে সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া, সর্ব-বিধ মৈহিক চেষ্টা প্রকাশিত হইতেছে, তাহারই মধ্যে এই প্রাণবস্ত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন; তেমনি তাঁহার সমাজেও একটা প্রাণবস্ত আছে, হিন্দু এ কথাই চিরদিনই বিশ্বাস করিয়া আলিয়াছেন। এই সমাজ-প্রাণকেও চক্ষে দেখা যাক না। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহারই বিবিধ চেষ্টার ভিতরে এই সমাজ-প্রাণও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। আর হিন্দুর এ সিদ্ধান্তকে যুরোপীয়দের পক্ষেও আজিকালি একটা অদ্ভুত কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। কারণ যুরোপীয় পণ্ডিতেরাও এখন এই কথাই বলিতেছেন। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদগণ মানবসমাজে জীবধর্ম আরোপ করিয়া, তাহাকে নিঃসঙ্কোচে জীব-উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সোসিয়াল্ অর্গেনিজম্ (social organism) বা সমাজ-জীব কথাটা যুরোপীয় চিন্তায় সর্বথা গৃহীত হইয়াছে। আর এটা যদি কেবল একটা কথার কথা না হয়, এর পশ্চাতে যদি কোনো প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তবে জনসমাজের ভিতরে একটা আত্মক্ষুরিত প্রাণ-চেষ্টারও প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য হইয়া উঠে। 'জীব' বলিলেই তার একটা ব্যক্তিত্ব বা নিজস্ব আছে, এটা বোঝায়। এই ব্যক্তিত্ব বা নিজস্ব সাধারণ জীবধর্ম। জীবমাত্রেরই একটা নিজস্ব লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্যলাভের জন্ত যথোপযুক্ত উপায়-নির্বাচন ও সেই উপায়-অবলম্বনে আপনার সফলতালাভের প্রয়াস করিবার একটা আভ্য-

ন্তরীণ শক্তিও আছে। জীবের সর্ববিধ জীবন-চেষ্টার ভিতর দিয়া 'তার জীবনের এই চরম-লক্ষ্যটা নিয়ত ফুটিয়া উঠে। জীবের ভিতরকার ও বাহিরের বিভিন্ন সম্বন্ধ ও সর্ববিধ বিধিব্যবস্থা এই লক্ষ্যটির সন্ধানেই চলে। জনসমাজেরও সমষ্টিভাবে একটা গতি, একটা ঐতিহাসিক বিবর্তন-চেষ্টা, একটা নিয়ম আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু গতি আছে, তথাপি নির্দিষ্ট গন্তব্য নাই; বিধান আছে, তথাপি কোনো স্থির লক্ষ্য নাই; নিয়ম আছে, তথাপি সে নিয়ম কোন কিছুই স্থিরভাবে আয়ত্ত, প্রকাশিত বা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে না,—ইহা কুত্ৰাপি জীবধর্ম বলিয়া গণ্য হয় না। 'একপ অসঙ্গতি বুদ্ধিতে আসে না, কল্পনা করাও' অসম্ভব। কিন্তু জনসমাজকে কেবল অর্গেনিজম্ বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না। জনসমাজে শুদ্ধ জীবত্ব আরোপ করিয়াই, তার প্রকৃতি ও গতির সম্যক্ অর্থ প্রকাশ করা যায় না। জনসমাজকে, এই জন্ত, কেবল অর্গেনিজম্ না বলিয়া বিইং (Being) বলিতে হয়। ইতালীয় মনীষী মহামতি ম্যাটসিনি মানব-সমাজকে এই বিইং উপাধি প্রদান করিয়াছেন। যুরোপীয়দের মধ্যে আধুনিক কালে, বোধ হয়, ম্যাটসিনিই মানব-সমাজের মূল প্রকৃতিটী অতি পরিষ্কার রূপে ধরিয়াছিলেন। Humanity is a Being—আধুনিক যুগে ম্যাটসিনিই প্রথমে অকুতোভয়ে এ কথাটা বলিয়াছেন। আর বিইং (Being) বস্তু অচেতন নহে, সচেতন। তাহা স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। তার আত্মজ্ঞানই তার গতির কারণ ও স্থিতির ভূমি হইয়া আছে। পাশ্চাত্যেরা 'যাহাকে বিইং (Being)' বলেন, হিন্দু তাহাকে আত্মা বলেন। আমরা

যাহাকে “আমি” বলি, যাহাকে অপর মানুষে ভূমি বা তিনি বলে, এই অহং-প্রত্যয়বাচক বস্তুই আত্মবস্তু। তাহাই স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। এ বস্তু আপনি আপনার গতি-হেতু ও স্থিতি-ভূমি। হিন্দুর শাস্ত্রে, জীবাস্তর্ধ্যামী এই আত্ম-বস্তুকেই নারায়ণ বলিয়াছেন। “জীবদ্দে জলে বসে সেই নারায়ণ।” এই নারায়ণই ব্যক্তিভাবে জীবাস্তর্ধ্যামী—পরমাত্মা। আর এই নারায়ণই, সমষ্টিভাবে, মহাবিশ্বরূপে, সমগ্র মানবসমাজেরও আত্মা। ম্যাটসিনী যে বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া “হিউম্যানিটি ইজ এ বিং” (Humanity is a Being) এই কথা বলিয়াছেন, সেই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়াই, হিন্দু-সাধক মহাবিশ্ব নাম দিয়াছেন। এই হিউম্যানিটির ভাব বা আদর্শকে যুরোপের নিকট হইতে ধার করিয়া, বিশ্বমানব উপাধি দিয়া নিজেদের জাতীয় সাধনায় বা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হিন্দুর পক্ষে একান্তই অনাবশ্যক। * আমাদের মহাবিশ্বতে এই ভাবটী যেমন স্বন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যুরোপের হিউম্যানিটিতে এখনো তেমন ফুটিয়া উঠে নাই কোথাও কোথাও খৃষ্টীয়-সাধনায় খুঁজেতে বরং এ ভাবটী ফুটিয়াছে। এই মহাবিশ্বই বিশ্ব-আত্মা। এই দেহ নারায়ণেরই কায়বাহ। তিনিই স্বীকেশ,—এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের অন্তরস্থ পর-আত্মা বা পর-

মাত্মা,—বিজ্ঞান-চৈতন্যের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। তিনিই কর্ম্মাধিপ,—দেহমনের সর্ববিধ চেষ্টার নিয়ামক ও ফলদাতা। আবার সমষ্টিভাবে, মহাবিশ্বরূপে, এই নারায়ণই সমাজ-দেহে বাস করিতেছেন। জনসমাজ এই মহাবিশ্বেরই কায়বাহ-স্বরূপ। তিনিই ধর্ম্মাবহ ও পাপমুদ সমাজ-নিয়মের তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা। সমাজ-বিবর্তনের তিনিই একমাত্র প্রবর্তক ও পরিচালক। ম্যাটসিনী যে হিউম্যানিটিকে বিং বলিয়াছেন, সেই তবুই বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্রোক্ত নারায়ণ বা মহাবিশ্ব। আর আপনার সমাজকে হিন্দু এই সর্বাস্তর্ধ্যামী, এই সমাজাস্তর্ধ্যামী, এই বিশ্ব-আত্মা মহাবিশ্বের বহিঃপ্রকাশ ও কায়বাহরূপে দেখেন বলিয়াই, তাঁহার নিকটে সমাজের আত্মগত্যা ও ধর্ম্মের আত্মগত্যা একই কথা হইয়াছে।

হিন্দুসমাজতত্ত্বে গতি-শক্তির স্থান

কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু যে কখনো আপনার সমাজের প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে উদ্যত হন না, এবং এই সকল পরিবর্তন প্রবর্তিত করিবার সময় প্রচলিত সমাজ-বিধির আত্মগত্যা অস্বীকার করেন না, এমনো নয়। হিন্দুর চক্ষে সমাজটা দেহমাত্র, নারায়ণই এ দেহের প্রাণ। আর প্রাণের প্রয়োজনেই দেহ ; দেহের প্রয়োজনে তো প্রাণ নয়। প্রাণ দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও, সর্বদাই দেহ অপেক্ষা বড় হইয়া বহে। নারায়ণ সর্বদাই সমাজ হইতে বড়। আর সমাজের রীতিনীতি যখন কালবশে নারায়ণের আত্ম-প্রকাশের অনুপযোগী হইয়া, তাঁর আত্ম-প্রয়োজনেই, পরিবর্তনযোগ্য হইয়া উঠে, তখন তিনি স্বয়ং সাধুসভাজনগণেতে আবিষ্ট বা

* বক্ষিমচন্দ্র আনন্দমঠে মাতৃ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিবার সময়ে মাকে মহাবিশ্বের অঙ্কে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই মার নিত্যমূর্ত্তি। মহাবিশ্বের অঙ্ক হইতেই মা ক্রমে ভগবাতী, কালী, দুর্গা রূপে সমাজ-বিবর্তনে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বক্ষিমচন্দ্রের মহাবিশ্বই যুরোপীয়-ধর্ম্মের হিউম্যানিটি।

অবতীর্ণ হইয়া, এই সকল পরিবর্তনযোগ্য বিধি-ব্যবস্থা রহিত করিয়া, নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন। তখন হিন্দু নিঃসঙ্কোচে এই মহাজনপন্থার আত্মগত্য গ্রহণ করিয়া, প্রচলিত ও পুরাপ্রতিষ্ঠিত পরিবর্তনযোগ্য সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পুরাতন আত্মগত্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই প্রণালীতে যেখানে সমাজের সংস্কার সাধিত হয়, যেখানে এই সংস্কারচেষ্টা শুদ্ধ সমাজের ব্যক্তিগণের স্বাভিমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজ-সংস্কারের নাগে, তখন সমাজের জনগণমধ্যে অসংযত ব্যক্তিভাষিমান জাগ্রত হইয়া, তাহাদিগকে স্ব-স্ব-প্রধান করিয়া, সমাজ শাসনকে শিথিল করিয়া দেয় না। সেখানে প্রাকৃতজনের অশোধিত বিচারবুদ্ধি ও অসংযত ভোগলালসার দ্বারাই প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তনযোগ্যতাও প্রমাণিত হয় না এবং প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার বশতা অস্বীকার করিতে বাইয়া, সমাজসংস্কারচেষ্টা সমাজমধ্যে অরাজকতা আনয়ন করিতে পারে না। যুগে যুগে, এই ভাবেই হিন্দুসমাজের সংস্কার ও বিবর্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। মহাজনপন্থার অনুসরণ করিয়াই হিন্দু সর্বদা আপনার সমাজের সংস্কার ও শোধন করিয়াছেন। আর এই কারণেই, প্রাচীন ও প্রচলিত সমাজবিধিকে অগ্রাহ্য করিয়াও, হিন্দু প্রকৃতপক্ষে কখনো সর্বধর্মমূল যে সমাজাত্মগত্য তাহাকে একান্ত-ভাবে বর্জন করেন নাই, করিবার প্রয়োজনও কদাপি হিন্দুসমাজে উপস্থিত হয় নাই।

মহাজন-পন্থার প্রণালী

কিন্তু কোনো সমাজের সকল লোকই সর্বদা সেই সমাজের মূল প্রকৃতিকে সজ্ঞানে

আয়ত্ত করিতে পারে না। সকলেই তার শ্রেষ্ঠতম বিধান বা উৎকৃষ্টতম আদর্শানুযায়ী আপনাদিগের জীবনকে গড়িয়া তোলে না। এই জন্ম কালবশে যুগে যুগে যখন সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে, তখন সকল হিন্দুই যে এই মহাজনপন্থা আশ্রয় করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। আর কোনো যুগেই যুগপ্রবর্তক মহাজনেরা সেই যুগের প্রারম্ভেই আবিভূতও হন না। প্রথমে নানা কারণে সমাজ-মধ্যে নূতন আদর্শ ও নূতন শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। তখন অল্পে অল্পে নূতনে ও পুরাতনে বন্দ উপস্থিত হইয়া, সমাজমধ্যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে থাকে। আর তখন হইতেই এই সকল যুগপ্রবর্তক মহাজনগণের আগমনের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়োজনও আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সকল সামাজিক বিশৃঙ্খলার একান্ত অতিশয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা আবিভূত হন না। কারণ ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুদয় একটা বিশেষ মাত্রা লাভ না করিলে, যুগপ্রবর্তক মহাজনগণ আত্মপ্রকাশ করেন না। সুতরাং প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলেই, এক দল লোকে মহাজনপন্থাশ্রয় লাভ না করিয়াও, শুদ্ধ আপনাদের বিচারবুদ্ধির প্রেরণাতেই সমাজের প্রবুদ্ধ গতিশক্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। সে সময়ে আর একদল লোক সমাজস্থিতিরক্ষার্থে প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতিকেই আশ্রয় করিয়া রহেন। কিন্তু যথাসময়ে মহাজনেরা আবিভূত হইলেই যে সকলে বা অনেকে একযোগে তাঁহাদিগকে আশ্রয় করেন, তাহাও নহে। তখনো একদল লোকে প্রাচীনকেই ধরিয়া রহেন। হিন্দুসমাজের

বিবর্তন-ইতিহাসেও এটা সর্বদাই দেখা • কর্মশ্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দেন না ।
 গিয়াছে । ভগবান বুদ্ধদেবের সামসাময়িক আকর্ষণ সকলোই বা অধিকাংশই তাঁহার শরণাপন্ন হন নাই । কেহ কেহ যেমন তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমন কেহ কেহ আত্যন্তিক আগ্রহ সহকারে তাঁহার শিক্ষা ও সাধনার প্রতিরোধও করিয়াছিলেন । আর বহুসংখ্যক লোকই তাঁহার আনুগত্যও গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার প্রতিপক্ষতাও করেন নাই, কেবল যাহা ছিল, তাহাকেই ধরিয়া রহিয়াছিলেন । মহাপ্রভুর সময়ে, আমাদের এই বাংলাদেশেও তাহাই দেখা গিয়াছে । আর আমাদের এ কালেও যে যুগ-ভাবপ্রবর্তক মহাজনের আবির্ভাব হয় নাই, এমনো তো নয় । কিন্তু সকলেই কি তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন, বা করিতে পারিয়াছেন ?

• ফলতঃ একরূপ সর্বদাই হইয়াছে ও সর্বদাই হইবে । কারণ, সকল মানুষ্যের প্রকৃতি সমান নয় । কারো প্রকৃতি বা তামসিক, কারো বা রাজসিক, আর কারো বা শুদ্ধ সাত্বিক । যারা নিতান্ত তামসিক, তাঁরা এ মহাজনপন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না । তাঁদের অবিবেক, তাঁদের জড়তা, তাঁদের ভয়প্রমাদাদি এ পথে চলিবার একান্ত অন্তরায় হইয়া রহে । সেইরূপ যারা নিতান্তই • সাত্বিক, যাহাদের তর্ক ও রজঃ উভয়ই অন্তরস্থ সঙ্কণ্ডের দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়াছে, সেই সকল সহজ-সিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ সাধু-সজ্জনেরা, যুগধর্ম-প্রবর্তক মহাজনগণের প্রতি ভক্তিমান হইয়াও, প্রয়োজনভাবে, প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাদের ঐকান্তিক আনুগত্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের

যাঁহাদের অন্তঃপ্রকৃতি রজোপ্রধান, তাঁহারাি প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলে, সমাজের প্রবুদ্ধগতি-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আপনাদের প্রকৃতির চরিতার্থতা অব্বেষণ করেন । আর ইহাঁদের মধ্যে যাহাদের অন্তরস্থ রজোগুণ বর্দ্ধীযুমান সত্ত্বের দ্বারা অভিভূত হইতে আরম্ভ করে, তাঁহারাি যুগপ্রবর্তক মহাজনগণকে একান্তভাবে অবলম্বন করিতে অগ্রসর হন । কারণ, যুগ-প্রবর্তক মহাজনগণ আপনারা ত্রিগুণাতীত হইলেও, চতুঃপার্শ্বস্থ রজোগুণপ্রধান লোক-দিগকে অবলম্বন করিয়াই স্ব স্ব আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকেন । যুগ-প্রবর্তক মহাজনগণের প্রথম শিষ্যেরা সকলে না ইউন, অনেকেই, রজোপ্রভাবে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া, প্রাচীন ও প্রচলিত সংস্কার ও পন্থাকে পরিহার করিয়া, নূতন সাধন ও শাসন গ্রহণ করেন । ক্রমে এই নূতন সাধন ও শাসনের ফলেই, তাঁহাদের অন্তরস্থ সঙ্কণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া প্রথমে তাঁহাদের রজোগুণকে অভিভূত করে, পরে, ইহাঁদের মধ্যে যাহারা বিশেষ • স্কৃতিসম্পন্ন, তাঁহারা ক্রমে ত্রিগুণাতীত হইয়া, ভাগবতী তত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন । কিন্তু পরিণামে সর্বাধিক্য হইলেও, আদিত, নূতন পন্থা অবলম্বন-সময়ে, রজোগুণের অতিশয্য থাকা একান্তই আবশ্যক হয় । নতুবা সকলে যুগপ্রবর্তকমহাজন-পন্থা অবলম্বন করিতে পারে না । আর এই কারণেই হিন্দুর যাবতীয় যুগাবতার ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব । কেবল এক পরশুরামই, অবতারগণমধ্যে, ব্রাহ্মণ ছিলেন । কিন্তু তিনিও ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া-ছিলেন মাত্র ; ব্রাহ্মণ্যধর্ম অবলম্বন করেন

নাই। পরন্তু ত্রিভুবনকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্তই তাঁহাকে রজঃপ্রধানা রাগাশ্রিতা ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া, ক্ষত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। হিন্দুর কিস্বদন্তিপ্রসিদ্ধ যুগাবতারগণের ক্ষত্রিয়ত্বের পশ্চাতে সমাজ-বিজ্ঞানের একটা অতি সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গুরুদাস বাবু ও মহাজনপন্থা

গুরুদাস বাবুর মধ্যে কখনো এই রজো-গুণের কোনো প্রকারের আতিশয্য দেখা যায় নাই। “কর্ম্মনাং অশমঃ স্পৃহা”—ইহাই রজের প্রধান লক্ষণ। এই গুণ “তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবঃ” ইহা “রাগাশ্রিতা।” গুরুদাস বাবুর কর্ম্ম-চেষ্টা আছে। এখন পর্য্যন্তও জন-হিতকর কর্ম্মে তাঁর বিন্দু পরিমাণ আলস্য বা উদাসীনতা দেখা যায় না। কিন্তু কর্ম্মচেষ্টা থাকিলেও কখনোই কর্ম্মে তাঁর অশম স্পৃহা দেখা যায় নাই। তাঁর কর্ম্মচেষ্টা তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভব নহে, ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত। সুতরাং আমাদের অপরাপর কর্ম্মনায়কগণের মধ্যে প্রায়শই যে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব ও ফলাফল-সন্ধিৎসু চাঞ্চল্য লুকাইয়া থাকে, গুরুদাস বাবুতে তাহা লক্ষিত হয় নাই। আর তাঁর প্রকৃতির ভিতরে এই রজোগুণের আতিশয্য নাই বলিয়াই, যে মহাজনপন্থা অবলম্বন করিয়া, অতি প্রাচীনকাল হইতে যুগে যুগে হিন্দুসমাজের বিবর্তন হইয়া আসিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুসমাজ প্রত্যেক যুগক্ষিপ্তসময়ে আপনার গতিশক্তি ও স্থিতি-শক্তির মধ্যে এমন সুন্দর ও সহজ সন্ধি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, গুরুদাস বাবু, আপনার কর্ম্মজীবনে বা ধর্ম্মজীবনে,

কোথাও একান্তভাবে সেই মহাজনপন্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। গুরুদাস বাবুর ভিতরকার প্রকৃতিই এমন যে তিনি যৌদ্ধ-যুগের আদিতে জন্মিলে, কখনই একান্তভাবে ভগবান বুদ্ধদেবের শরণাপন্নও হইতে পারিতেন না, তাঁর প্রতিবাদীও হইতেন না। কিন্তু বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও সাধনার প্রতি অন্তরে অন্তরে ভক্তিমান হইয়াও, সেকালের ক্রিয়া-বহুল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৈদিক পন্থাকেই ধরিয়া রহিতেন। মহাপ্রভুর সময়ে, এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও, গুরুদাস বাবু তাহাই করিতেন। সে কালের বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ও কায়স্থদিগের স্মরণ, গুরুদাস বাবুও হয় ত মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত ও সাধন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কখনই তাঁর একান্ত অন্তর্গত হইয়া, সমাজের প্রচলিত স্মৃতি-আমুগত্য বর্জন করিতে পারিতেন না। আর আমাদের এই কালে, বাংলার হিন্দু-সমাজের গতিশক্তি যে সকল মহাজনকে আশ্রয় করিয়া, সমাজের “পরিবর্তনযোগ্য” রীতিনীতির সংস্কার-সাধনের প্রয়াসী হইয়াছে; গুরুদাস বাবু ইহাদের সকলেরই প্রতি ভক্তিমান, কাহাকেই অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করেন না; কিন্তু আবার কাহাকেই একান্ত ভাবে আশ্রয় করিয়া, সমাজের পরিবর্তনযোগ্য রীতিনীতির আমুগত্যও পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হন নাই।

গুরুদাস বাবু ও লৌকিকাচার

মোট কথা এই যে — :

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলব্ধনক্ষমঃ

তথাপি লৌকিকাচারঃ মনসাহপি ন লভয়েৎ ।

“যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং সমুদ্র-লব্ধনক্ষম

হইলেও, কদাপি *আপনার মনেও লৌকিকা-
চারকে উল্লেখ করিবেন না”—ইহাই
গুরুদাস বাবুর *কর্মজীবনের মূল সূত্র হইয়া
আছে। গুরুদাস বাবু, মোটের উপরে,
বর্তমান হিন্দুসমাজের অনেক বিধিব্যবস্থা ও
রীতিনীতিরই পরিবর্তন যে আবশ্যক হইয়া
উঠিয়াছে, ইহা জানেন ও মানেন। আর এ
সকল মত প্রচার করিতেও তিনি কুষ্ঠিত হন
না। কিন্তু যতদিন না সমাজ সমষ্টিভাবে
এগুলিকে গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যতদিন না
এগুলি লৌকিকাচারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে,
ততদিন তিনি এ সকল সংস্কার কার্যে পরিণত
করিতে প্রস্তুত নহেন। কিছুকাল পূর্বে
পর্য্যন্ত এদেশের হিন্দুসমাজে যে অতি অল্প-
বয়সে বালক-বালিকাদের বিবাহ হইত, গুরু-
দাস বাবু তার প্রতিবাদী। চতুর্দশ কি পঞ্চ-
দশ বর্ষেই সচরাচর “স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর-
সঙ্গলিপ্সার” উদ্রেক হয়; আর যে বয়সে
এই প্রযত্তির উদ্রেক হয়, তখনই তাহাকে
“নির্দিষ্ট পায়ে গুপ্ত করিয়া নিবৃত্তিমুগী করিবার
জ্ঞ” নরনারীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করা
কর্তব্য—বিবাহের বয়সসম্বন্ধে গুরুদাস বাবু
এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। * কিন্তু কার্য্যতঃ
বিবাহের বয়স নির্ধারণ করিতে যাইয়া তিনি
দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ বর্ষ পর্য্যন্তই তাহাদের
বিবাহ দেওয়া কর্তব্য, এই অভিমত প্রকাশ
করিয়াছেন। তাঁর নিজের বুদ্ধি ও বিচার
মতে চতুর্দশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষই বালিকাদের
বিবাহের নিম্নতম কাল নির্ধারিত হওয়াই
বিধেয়। “অসামান্য পবিত্র ও স্নেহচর্চিত”
নরনারীর পক্ষে আরো অধিক বয়সে বিবাহ

করিলেও, ধর্মহানি হয় না, এ কথাও তিনি
অস্বীকার করেন না। কিন্তু তথাপি কেবল
লৌকিকাচারের মুখাপেক্ষী হইয়াই, গুরুদাস
বাবু, দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ বর্ষই বালিকার
বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া নির্ধারণ
করিয়াছেন। ত্রিশ ২৫সর পরে, বাংলার
হিন্দুসমাজের লৌকিকাচারে যদি অষ্টাদশ বা
উনবিংশ বর্ষের যুবতীগণের বিবাহ প্রচলিত ও
প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, গুরুদাস বাবু যে তখনো
এই দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ বর্ষের নিয়মকেই
ধরিয়া থাকিবেন, এমন বোধ হয় না।
যেমন বাল্যবিবাহের সংস্কারসম্বন্ধে, সেইরূপ
হিন্দুসমাজের প্রচলিত জাতি-বিচারসম্বন্ধেও,
লৌকিকাচারে যে পরিমাণে শিথিলতা বা
ঔদার্য্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, গুরুদাস বাবু
কেবল তাহাই গ্রহণ করিতে রাজি আছেন।
পরমার্থদৃষ্টিতে যে জাতি-বিচারের স্থান নাই,
গুরুদাস বাবু ইহা স্বীকার করেন।

“বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি

শুনিচৈব যপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।

গাভী হস্তী কুকরকে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে।

পণ্ডিতেরা সমভাবে দেখেন সকলে॥

এবং রামচন্দ্র স্বয়ং গৃহক চণ্ডালের সহিত
মিত্রতা করিয়াছিলেন। অতএব হীনজাতি
বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা হিন্দুর কর্তব্য
নহে। * গীতার এই উক্তি অনুসারে, আর
গুণকর্মবিভাগের দ্বারাই প্রথমে চতুর্দশের
উৎপত্তি হয়, এই কৃষ্ণোক্তি স্মরণ করিয়া,
হিন্দুসমাজে এখন যে আকারে জাতিবিচার
প্রতিষ্ঠিত আছে, সম্ভবতঃ বলিয়া তাহার সমর্থন
করা সম্ভব নহে; গুরুদাস বাবু ইহা জানেন।

কিন্তু সমাজের লোকমত এখনো এতটা অগ্রসর 'সমান মর্যাদা দেওয়া' হয়। বিবাহ, হয় নাই। তবে বাংলার হিন্দুসমাজে আজিকালি দায়ভাগ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে নির্ধারণে, জাতিবিচারটা কেবল পানাহার ও বিবাহেতেই এইরূপ লৌকিকাচার প্রক্তি-স্থিতি অপেক্ষাও আবদ্ধ হইয়া আছে। স্তত্রাং মধ্য যুগের হিন্দুয়ানীর "লৌকিকাচারং মনসাহপি ন লজ্যেৎ"—এই আদেশ মনে রাখিয়াই যেন, গুরুদাস বাবুও "আহার ও বিবাহ বাদ দিয়া" অজ্ঞাত বিষয়ে জাতির প্রাচীর যেন ভাঙ্গা যাইতে পারে, ভাঙ্গাই কে কর্তব্য, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। আর সে যুক্তি অবলম্বনে * বিবাহ ও আহার এই দুই বিষয়েই এখন জাতি-বিচার মানিয়া চলা কর্তব্য, অজ্ঞ বিষয়ে নহে, গুরুদাস বাবু এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও লৌকিকাচারই যে তাঁহার সামাজিক কর্তব্যাকর্তব্যানির্ধারণে প্রধান ও সম্ভবতঃ একমাত্র তৌলদণ্ড, এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া যায়।

গুরুদাস বাবুর সামাজিক সিদ্ধান্ত

আর গুরুদাস বাবুর মতন এমন সম্যক-দর্শী, এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সছিচারক মনোবীর সিদ্ধান্তেও সামান্য লৌকিকাচার যে এতটাই অদ্বুত প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইহার কারণ নির্দেশ করাও একান্ত কঠিন নহে। প্রথমতঃ গুরুদাস বাবু আযৌবনকাল আইনকাছন লইয়াই দিন কাটাইয়াছেন। আর সকল সভ্যদেশের ব্যবহার-শাস্ত্রেই লৌকাচার অদ্বুত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। যে সকল লোকাচারের আরম্ভকাল জনগণের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সকল সভ্যসমাজেই সে জাতীয় লৌকিকাচারকে প্রত্যক্ষ আইনের স্পষ্ট বিধানের

* জান ও ধর্ম—৩৫৫ পৃষ্ঠা।

বলবন্তর বলিয়া গণ্য হয়। আর ব্যবহার শাস্ত্রে লৌকিকাচারের এতটা অদ্বুত প্রভুত্ব দেখিয়াই, ব্যবহারজীবী গুরুদাস বাবুর প্রাণে তাহার প্রতি এমন অপরিমীম মর্যাদা জন্মিয়াছে। গুরুদাস বাবু ব্যবহারবিদ (jurist) ও নীতিবিদ (moralist) দুই। কেবল ব্যবহারবিদ বলিলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হইবে, জানি। কিন্তু তথাপি তাঁর সাধনায় ও শিক্ষান্তে ব্যবহারবিদের দিকটা যে পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঠিক নীতি-বিদের দিকটা সে পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না সন্দেহ। গুরুদাস বাবু জীবনের গুরুতর সমস্যাসকলকে কতটা পরিমাণে যে সমীচীন ব্যবহারবিদের চক্ষে দেখেন ও সর্বদা ব্যবহার তত্ত্বের যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে 'এ সকলের যথোপযোগী মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁর "জ্ঞান ও কল্প" গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একদিকে যেমন তাঁর ব্যবসায়ের দীর্ঘ অভ্যাস, অন্যদিকে সেইরূপ তাঁর তত্ত্ব-সিদ্ধান্তও গুরুদাস বাবুর এই লোকাচারানুগত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। তত্ত্বসম্বন্ধে গুরুদাস বাবু শঙ্কর-বেদান্তাবলম্বী। শঙ্কর বেদান্ত মতে, বিশেষতঃ যে মায়াবাদ শঙ্কর-সিদ্ধান্ত বলিয়া এদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে, জীব ও জগতের সত্য ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। বস্তুতে সর্পস্রমের মতায়, এই জীব ও জগতের পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান পরমার্থতঃ মিথ্যা। মায়াতেই এই সংসারের উৎপত্তি, মায়াতেই ইহার স্থিতি।

সংসারের বিবিধ সম্বন্ধসকলের কোনো নিত্য • রস-স্বরূপ যে পূর্ণব্রহ্ম তাঁহারই নিগিলরসামৃত-লক্ষ্য বা পারমার্থিক প্রতিষ্ঠা নাই। সুতরাং প্রচলিত শঙ্কর-দ্বিদ্ধান্তে সমাজ-ধর্ম ও সামাজিক উন্নতি-অবনতি, সকলই অতি নিচের কথা; সাধনার্থীর নিকটে ইহার মূল্য থাকিলেও, দ্বিদ্ধ পুরুষের নিকটে কোনো সত্য, কোনো মূল্যই নাই। ধর্মার্থ, পাপপুণ্য প্রভৃতির ব্যবহারিক সত্য ও সার্থকতা আছে মাত্র; পারমার্থিক সত্য ও সার্থকতা নাই। অতএব দেহভুক্তি বা ভূতভুক্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, মনঃসংযম, উপরতি, তিতিক্ষা, এ সকল সাধনসম্পৎলাভের জন্ত উপযোগী অভ্যাসের ক্ষেত্র বলিয়াই সংসার প্রয়োজনীয়। সাধনসম্পৎ লাভ হইয়া ক্রমে বিবেক-বৈরাগ্যাদি ও সর্বশেষে ব্রহ্মাত্মিকতা-হুত্বতি বা কৈবল্যসিদ্ধি হইলে, সর্বের গোলস যেমন আপনা হইতেই, অনাবশ্যক বলিয়া, তাহার গাত্র হইতে খসিয়া পড়ে, সেইরূপ জীবের সংসার ও তাহার যাবতীয় সামাজিক সম্বন্ধাদিও তাহার মন হইতে আপনি খসিয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু কেবল মায়াবাদীর নিকটেই যে সংসারের সম্বন্ধসকল অনিত্য, ও অনিত্য বলিয়াই পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলৌক, তাহা নহে। কোনো হিন্দুসিদ্ধান্তেই এ সকলের অনিত্যতা অস্বীকৃত হয় নাই। খাঁরা মায়াবাদী নহেন, তাঁরাও এগুলিকে নিত্য বা সত্য বলেন না। সুতরাং এ সকল ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধের অতীত হইবার চেষ্টা সকল সাধনেই আছে। তবে মায়াবাদী এ সকলের পশ্চাতে কোনো স্থায়ী রস প্রত্যক্ষ করেন না। আর খাঁরা মায়াবাদী নহেন, তাঁরা সংসারের সর্ববিধ অনিত্য সম্বন্ধের মধ্যেও কতকগুলি স্থায়ী রসের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই সকল রসকে

রস-স্বরূপ যে পূর্ণব্রহ্ম তাঁহারই নিগিলরসামৃত-সিদ্ধুর উপরিস্থ তরঙ্গভঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন। এ সংসারে পিতাপুত্রের যে কায়িক সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষতাই অনিত্য। প্রাকৃতজনে যে বাৎসল্যরস আশ্বাদন করে তাহাও স্থায়ী, সম্মানের জন্মের সঙ্গে তাহার উৎপত্তি হয়, আর সম্মান গত হইবার পরে সচরাচর তাহা ক্ষীণ হইয়া, দীর্ঘকাল পরে, লুপ্তপ্রায় হয় কিন্তু এই সম্বন্ধের পশ্চাতে একটা স্থায়ী বাৎসল্যরস আছে। এই স্থায়ী রসই, দেশকাল-ধীন এই সংসারে লৌকিক পিতামাতার সঙ্গে পুত্রকন্যার যে সম্বন্ধ, তাহারই মধ্য দিয় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এরস ভগবৎ প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং পারমার্থিক ও নিত্য। সংসারের বিভিন্ন সম্বন্ধ এই স্থায়ী ভাগবতীলীলা-রসকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল সম্বন্ধের অন্তরালে, শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ স্থায়ী রস বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই জন্ত, এই পঞ্চ স্থায়ী রসের প্রকাশ ও আলম্বন বলিয়া, সংসারেরও একটা পারমার্থিক সত্য ও মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও মূল্য আছে। জীব ও সংসার অত্যন্ত অনিত্য নহে, অত্যন্ত নিত্যও নহে; কিন্তু নিত্যানিত্য-মিশ্রিত। ইহাকে পরিণামী নিত্য বলা যায়। আর পরিণামী নিত্য বলিয়াই, এই সংসার ভাগবতী-লীলার আশ্রয় হইয়া আছে। এই লীলা-প্রয়োজনেই মনুষ্যসমাজ মহাবিশ্ব বা নারায়ণের কাব্যবূহ হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের আত্মচরিতার্থতার জন্তই, সেই অদ্বৈত-স্বরূপেরই মধ্যে, যে একটা দ্বৈত-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যে দ্বৈত-সম্বন্ধ বা ভেদাভেদকে অবলম্বন করিয়াই

ভগবান নিত্যলীলপর হইয়া আছেন, শঙ্কর-সিদ্ধান্তে এই তত্ত্বের কোনোই স্থান ও সঙ্গতি নাই। সুতরাং ভগবল্লীলারসপর বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে যে ভাবে ও যে অর্থে মহাজনপস্থা আশ্রয় করিয়া, সমাজের গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তির মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, শঙ্কর-সিদ্ধান্তে তাহা হয় নাই, হওয়া সম্ভব নহে। এখানে লৌকিকাচারের পস্থা অবলম্বন করিয়াই এই প্রতিদ্বন্দী শক্তিদ্বয়ের স্বাভাবিক বিরোধ ভঙ্গনের চেষ্টা করিতে হয়। তাহার আর অন্তপথ নাই।

সংসার মায়ামাত্র। সমাজসম্বন্ধ সকল মায়িক। মানুষের মেহমমতা, প্রেম-ও-শ্রেয়বোধ, ভালমন্দজ্ঞান, ধর্মাধর্মবিচার, সকলই অবিদ্যাবন্ধিয়ানী। সুতরাং নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে কার্যের যে একটা সঙ্গতি রাখিতেই হইবে, এখানে এমন কোনো কথা নাই। আমাদের এ সকল মতামত যখন মিথ্যা, কার্যাকার্য যখন মিথ্যা, মতের সঙ্গে কার্যের মিলন-বিরোধও যখন মিথ্যা; তখন বিশ্বাসের সঙ্গে কাজের মিল হইল কি না হইল, তাহাও মিথ্যা। এ সকলের ব্যবহারিক সত্য থাকিলেও পারমার্থিক মর্যাদা নাই। এ সকল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলীক। প্রচলিত শঙ্কর-সিদ্ধান্তে সংসারধর্মের কোনই পারমার্থিক সত্য ও মর্যাদা নাই। চিত্তশুদ্ধি করিয়া ক্রমে সর্ব-বিধ দ্বৈতবোধ নষ্ট করাই, শঙ্কর-বেদান্তমতে, সমাজধর্ম ও সমাজবন্ধনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। সমাজবন্ধন ও সামাজিক সম্বন্ধ সকল জীবের বহিমুখী ও বহুমুখী প্রবৃত্তি সকলকে সংযত ও নিবৃত্তিমুখী করিয়া দিয়াই,

এই পারমার্থিক উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে। আর একমাত্র সংযম ও নিবৃত্তি-সাধনই যখন সমাজধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তখন লৌকিকাচারের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া যে কোনো উদ্দেশ্যে ও যে কোনো আকারেই সমাজের বিরুদ্ধে দ্রোহীভাব অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহাতেই সমাজবন্ধনের এই মুখ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিষম ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলেই কোনো না কোনো আকারে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেই হয়। এরূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জন-গণের পক্ষে আপনার ইচ্ছা ও আবৃত্তিকে সংযত করিয়া রাখা একান্তই কঠিন হইয়া পড়ে। আর সর্ববিধ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্যেই বে-কলহবিরোধ জাগিয়া থাকে, তাহাতে অন্তরের দ্বৈতভাব ও ভেদবুদ্ধিকে জাগাইয়াই রাখে, নষ্ট করিবার সাহায্য করে না। সুতরাং লৌকিকাচারকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ-সংস্কার করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা মোক্ষপথের অন্তরায় হইয়া উঠে। এই জন্ত শঙ্করমতাবলম্বী সাধুসন্ন্যাসীসমাজে একদিকে প্রচণ্ড জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানপন্থার প্রতি ঐকান্তিক পক্ষপাতিত্ব, অত্রদিকে তামসপ্রকৃতি-স্থলভ নিশ্চেষ্টতা ও লৌকিকাচারের আত্যন্তিক আত্মগত্যা, এ দুই দেখা-গিয়া থাকে। একদিকে—বিচারে, চিন্তায়, সাধনায় ও সিদ্ধান্তে—এ সকলে সর্ববিধ দ্বৈতভাব ও ভেদবুদ্ধির নিন্দা করিয়াও, কার্যকালে ইহার; প্রায় সর্বদাই সমাজ-প্রচলিত সর্বপ্রকারের ভেদ ও বিষম্যের সম্পূর্ণ মর্যাদা রাখিয়া চলিবার জন্ত ব্যগ্র হন। শঙ্কর স্বয়ং ইহার অন্তর্থাচরণ করেন নাই।

মধ্যযুগের হিন্দুয়ানী লৌকিকাচারকে যে এমন করিয়া ধর্মের আসনে বসাইতে চাহিয়াছে, শঙ্কর-বেদান্তের সঙ্গে ইহার অতিশয় ঘনিষ্ঠ বোগ আছে বলিয়া মনে হয়। আর আজিও হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়মধ্যেই শঙ্কর-সিদ্ধান্তের প্রভাব, প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, নিরতিশয় প্রবল রহিয়াছে বলিয়াই, আমাদের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণও লৌকিকাচারের আত্মগত্যা পরিত্যাগ করিতে এত ভয় পাইয়া থাকেন। গুরুদাস বাবুর লৌকিকাচারের ঐকান্তিক আত্মগত্যের অন্তরালেও শঙ্কর-বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্টই লক্ষিত হইয়া থাকে।

লৌকিকাচারকে কেবল মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীই যে ধর্মের আসনে বসাইয়াছে, তাহা নহে। বর্তমান কালে কোনো কোনো যুরোপীয় সিদ্ধান্তেও তার প্রায় অনুরূপ মর্যাদাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অষ্টাদশ খৃষ্টশতাব্দীর যুরোপীয় চিন্তা, অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জন করিয়াও সমাজ-স্থিতিরক্ষার্থে একটা বিজ্ঞান-সম্মত, যুক্তিপ্রতিষ্ঠ মর্যাদার বা ধর্মনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইয়া, ফলতঃ লৌকিকাচারকেই ধর্মের আসনে বসাইয়াছে। প্রত্যক্ষবাদী কোমত-গিদ্ধান্তেও আমাদেরই শঙ্কর-বেদান্তের স্থায়, সমাজ-বিবর্তনে সমাজের গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্ত, এই লৌকিকাচারই প্রত্যক্ষ ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কোমত-সিদ্ধান্ত-বাদিগণ, ইংরেজিতে যাহাদিগকে পজিটিভিষ্ট (Positivist) সম্প্রদায় বলে,—একদিকে যেমন সামাজিক উন্নতির জন্ত লালারিত, সেইরূপ অন্যদিকে সমাজের

স্থিতিভঙ্গ-নিবারণের জন্তও একান্ত ব্যগ্র হইয়া থাকেন। তাঁরা কিছুতেই, কার্যতঃ, সমাজের প্রচলিত বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতির প্রভাব নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের নিকটেও সমাজই ধর্মের কায়ব্যাংসরূপ। ক্যাথলিক খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে চার্চ বা রোমক-খৃষ্টীয় সত্য যে মর্যাদা প্রাপ্ত হয়, ধর্মের বহিঃপ্রকাশ বলিয়া সকলে যে রূপ এই চার্চের বা সঙ্ঘের আত্মগত্যা স্বীকার করিয়া চলে, প্রত্যক্ষবাদী কোমত-মতাবলম্বিগণ মধ্যে সমাজ সেইরূপ মর্যাদাই প্রাপ্ত হয়, এবং সমাজের আত্মগত্যা মানিয়া চলা, কোমত-মতে নিতান্তই নীতিসম্মত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কোমত-মতের সঙ্গে মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর এই সমাজাত্মগত্যা বা লৌকিকাচারাত্মগত্যা একটা যে একা আছে, বাঙালী হিন্দুদিগের মধ্যে যারা কোমত-মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষায় ও চরিত্রে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। খিদিরপুরের জমিদার, স্বর্গীয় যোগীন্দ্র-চন্দ্র ঘোষ, গ্রামশন পত্রের সুরোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইহার দু'জনই কোমত-মতাবলম্বী ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় জীবনের শেষভাগে এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কি না, জানি না। যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে পরিত্যাগ করেন নাই, ইহা সকলেই জানেন। আর এ'রা দু'জনই একদিকে বোরতর প্রত্যক্ষবাদী ও যুক্তিবাদী হইয়াও হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও সংস্কারাদির ঐকান্তিক আত্মগত্যা গ্রহণ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই। ইংরেজ কোমত-বাদিগণ মধ্যে স্যার হেনরী কটন প্রভৃতি প্রায় সকলেই হিন্দু এই লৌকিকাচারের আত্মগত্যা

কখনই ভাঙ্গিয়া দিতে চান নাই; বরং সর্বদাই তাহাকে সঙ্গত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। ইহারা পারলৌকিক ধর্মের দিক্ দিয়া হিন্দু রীতিনীতির পোষকতা করেন নাই। সে ধর্মে তাঁদের আদৌ বিশ্বাস ছিল না। কেবল গুরু সমাজের, কল্যাণকামনার, সমাজস্থিতিরক্ষার্থে, সমাজনীতি বা মরালিটির দিক্ দিয়াই এ সকলের সমর্থন করিতেন। গুরুদাস বাবু কোমতমতাবলম্বী নহেন। কিন্তু সমাজনীতিসম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর লৌকিকাচারের ঐকান্তিক আনুগত্য যে কোমতমতের দ্বারা সমর্থিত হইয়া, আধুনিক যুরোপীয় নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ইহার একটা সঙ্গতি-সাধনে যে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তাঁরই জন্ত গুরুদাস বাবুর আধুনিক শিক্ষা এবং সাধনাও তাঁর চরিত্রগত মধ্যযুগের হিন্দুগানীর ঐকান্তিক লৌকিকাচারানুগত্যকে নষ্ট করিতে পারে নাই।

গুরুদাস বাবুর এই রক্ষণশীলতার আরো একটি বিশেষ কারণ আছে। গুরুদাস বাবু একদিকে যুরোপের আধুনিক সাধনা ও অন্বেষিক স্বদেশের সনাতন সাধনার উভয়েরই মূল প্রকৃতিটী ভাঙ করিয়াই ধরিয়াছেন। এই দুই সাধনা ও সভ্যতার মধ্যে যে বিশাল বৈষম্য আছে, ইহাও তিনি জানেন। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির, সেইরূপ প্রত্যেক সমাজের ধর্মও যে সর্বদাই তার ভিতরকার মূল প্রকৃতি হইতে, সেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং এই জন্ত কি ব্যক্তির পক্ষে কি সমাজের পক্ষে, সকলেরই পক্ষে যে পরধর্ম ভয়াবহ হয়, ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন। আনাদের সমাজসংস্কারপ্রয়াস যে

অনেক বিষয়েই ভারতের প্রাচীন সমাজ-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া, যুরোপের রীতিনীতির স্বল্পবিস্তর অনুকরণচেষ্টায় চলিয়াছে, ইহাও তিনি দেখিতেছেন। যুরোপ যে পথে যাইয়া, অসংযত বিষয়-ভোগলালসায় বিক্ষিপ্ত হইয়া, আপনার জীবনসমস্যাকে বিষম জটিল করিয়া তুলিতেছে, নূতন নূতন পন্থার অনুসরণ করিয়া, সমাজের বুকে সমস্যার উপরে সমস্যাই স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছে, একটারও সমীচীন মীমাংসা করিতে পারিতেছে না, কখনো পারিবে কি না, তাহারও স্থিরতা নাই; গুরুদাস বাবু এ সকলই জানেন। আর আমরা যে সমাজের হিতেচ্ছু হইয়া, এ সকল না বুঝিয়া, সংস্কারের নামে, অনেক সময়, নিজেদের সমাজের উপরে এই ভয়াবহ পর-ধর্মের বোঝা চাপাইয়া দিতেছি, ইহাও তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আর এই জন্তই অজ্ঞাত ও অপরিষ্কৃত পন্থার সমাজকে চালাইবার পূর্বে, সে পথ সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির অনুযায়ী হইবে কি না, ইহা দেখিবার জন্তই, তিনি সর্বদা এই লৌকিকাচারের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে চাহেন। কারণ, কি ব্যক্তি কি সমাজ উভয়ই সর্বদা আপনার প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই আধুনিক জীবতত্ত্বে বা বায়লজিতে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম কহে। এই নিয়মাদীন হইয়াই, সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থারও বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। কদাপি যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না, এমন নহে। কিন্তু যেখানেই ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানেই সমাজ পরধর্মবশে আত্মাহারা হইয়া, বিপ্লবমুখী ও বিনাশোন্মুখ হইয়া উঠে। গুরুদাস বাবুর

রক্ষণশীলতার অন্তরালে এই বিপ্লবের ভয়ই জাগিয়া আছে। বর্তমান সময়ে রক্ষণশীল হিন্দু বলিয়া অনেকেই পরিচিত। কিন্তু ইহারা অনেকেই প্রাচীন সমাজের জীর্ণদেহকে রক্ষা করিবার জন্য যত ব্যস্ত, তার ভিতরকার সনাতন প্রাণবস্তুর রাখিবার জন্য তত ব্যস্ত নহেন। হিন্দুয়ানীর বাহ্য ঠাট্টা বজায় থাকিলেই, হিন্দুর সব রহিল, সেই ঠাট্টার ভিতরকার প্রাণটা হিন্দু কি অহিন্দু, ভারতীয় কি বিলাতী হইয়া যাইতেছে এ চিন্তা তাঁহা-দিগকে স্পর্শ করে না। এক গুরুদাস বাবুই বোধ হয়, আধুনিকশিক্ষা প্রাপ্ত হিন্দুদের মধ্যে, হিন্দুর সনাতন প্রাণবস্তুর অক্ষত ও অক্ষয় রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। আর এই ব্যগ্রতার জন্যই হিন্দুসমাজের সনাতন প্রাণবস্তু

এবং ধর্মবস্তুও, আজ তাঁহাকে ও তাঁহারই মতন ধর্মনিষ্ঠ ও কর্মনিষ্ঠ, সংযত ও সম্যকদর্শী সুধীজনকে আশ্রয় করিয়া, আসন্ন বিপ্লবযুগে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক বস্তুরই স্থিতির ভূমি যাহা, তাহা অতি নিগূঢ় ভাবে, চক্ষুর অন্তরালে, বসিয়া থাকে। তাহার গতির কারণ যাহা তাহাই বাহিরে ফুটিয়া উঠে। গুরুদাস বাবুর মত লোকনায়কগণ সমাজের স্থিতির সহায় বলিয়া, তাঁহাদের প্রভাব সর্বদা প্রত্যক্ষ হয় না ; নতুবা তাঁহাদের শক্তি ও মাহাত্ম্য যে সামান্য, তাহা নহে। ইহারা আছেন বলিয়াই হিন্দুর সমাজের সমাজত্ব, ও হিন্দুর ধর্মের ধর্মত্বটুকু এখনো আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া রহিয়াছে।

ক্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সাময়িক-আলোচনা

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকায় আর একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এ কথা শুনিয়া দেশের লোক যে প্রথমে কতকটা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তখন অনেকেই ভাবিয়া-ছিলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন আর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ই ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল ও কলেজগুলি কলিকাতার অধীন ও পূর্ববঙ্গের স্কুল ও কলেজগুলি ঢাকার অধীন হইবে। এইরূপভাবে লোকশিক্ষা লইয়া বাংলাদেশকে আবার নূতন করিয়া দ্বিধা বিভক্ত করা হইবে। সম্রাট স্বয়ং আসিয়া বঙ্গভঙ্গের কার্জনী কুশপট্টা ভাঙ্গিয়া দিয়া গেলেন সত্য ; কিন্তু তার অবব্যাহিত পরেই, এই নূতন বঙ্গভঙ্গের আশঙ্কায় লোকমন সহজেই বিচলিত হইয়া উঠে। কিন্তু বড়লাট যখন সরলভাবে এই বিষয়ে আপনামনোভাব

প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আর একটা নূতন পরীক্ষার যন্ত্র ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হইবে না, কিন্তু একটা প্রকৃত বিহার বা টিচিং ইউনিভারসিটি সেখানে স্থাপিত হইবে, তখন আর এরূপ ভয়ভাবনার কোনো কারণ রহিল কৈ? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ভিন্ন ভিন্ন স্কুলকালেজের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা লইয়াই ক্ষান্ত রহেন ; এবং এই পরীক্ষা লইবার জন্য যতটা পরিমাণে ও যেরূপভাবে তাদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করা আবশ্যিক ততটা তত্ত্বাবধানও করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্কুলকালেজের মধ্যে কোনো প্রকারের ঘনিষ্ঠতা নাই, জ্ঞানোৎসাহ অসম্ভব। এই কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একটা সত্য ও সম্ভাব্য একতা বা কোনো প্রকারের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ

নাই। উচ্চ-আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই একতা ও অঙ্গাদ্বী সম্বন্ধই প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ। প্রাচীন বিহার সকল এই শ্রেণীরই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বিলাতে অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ, আমেরিকায় হারবার্ড, ইয়েল, এ সকল প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ও এই শ্রেণীরই। এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় এখন আমাদের দেশে একটাও নাই। ঢাকায় এই প্রথম এই উচ্চ-আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহাতে দেশের লোকের আনন্দ করাই কর্তব্য; ক্ষোভের ভেঁ কোন কারণ এখনো দেখা যায় না।

* * *

এইরূপ বিহার বা টিচিং ইউনিভারসিটি যদি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ফলে বরিশাল, মৈমনসিংহ, রাজশাহি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যে সকল স্কুলকলেজ এখন আছে, তার সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সম্বন্ধ কিছুতেই তো ছিন্ন হইতে পারে না। এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার অন্তর্ভুক্ত স্কুলকলেজ সকল সেই স্থানেতেই আবদ্ধ থাকে। অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজের বাহিরে, এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থষ্ট কোনো স্কুলকলেজ নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থষ্ট কোনো স্কুলকলেজও ঢাকা সহরের বাহিরে থাকিবে না, থাকিতে পারিবেই না। তাই যদি হয়, তবে বড়লাট হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এক বলিয়া অশু বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিবেন, এই কথাই বলিতে হয়। কিন্তু এরূপ সন্দেহের তো কোনো কারণ নাই। আজি পর্যন্ত তিনি কেবল আপনার দূরদর্শিনী নীতিরই পরিচয় দিয়াছেন, রাজনীতি-স্থলভ কুটিলতার কোনো পরিচয় দেন নাট। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের আলোচনায় কাহারো সত্যতা বা অসত্যতার কথা তোলাই অপ্রাসঙ্গিক। ডাক্তারী ব্যবসায়ে, ডাক্তার যখন রোগীর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি সাধু কি অসাধু, সরল কি অসরল, এ সকল প্রশ্ন উঠে না, তোলাই অসঙ্গত ও অযৌক্তিক; কেবল তাঁর নিদান-জ্ঞান

আছে কি না, রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থার কুশলতা আছে কি না, ইহাই বিচার্য। সেইরূপ রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক কোনো কক্ষাক্ষের বিচার-আলোচনায় কর্তার দূরদর্শিতা ও সম্যক দর্শন আছে কি না, তিনি মূল সমস্যাটা ধরিয়াছেন কি না, এবং তাঁরই উপযোগী করিয়া শাসন-ব্যবস্থা করিতেছেন কি না, এ সকলই কেবল বিবেচ্য, তাঁর সত্যতা বা অসত্যতা, সরলতা বা কুটিলতা, এ সকল সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত। ল্যাট হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের দূরদর্শিতা আছে কি না, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিচারালোচনার দ্বারা তাঁর শাসননীতি সত্যভাবে পরিচালিত হইতেছে কি না, এ ক্ষেত্রে ইহাই কেবল বিবেচ্য। আর এইরূপ ভাবে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবের আলোচনা করা যায়, তবে তার সমীচিনতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিবে, বা থাকিতে পারে এমন মনে হয় না।

* * *

প্রথমতঃ হার্ডিঞ্জ মহোদয় যে বলিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় নহে, ইহা অতি সত্য। আমরাও তো বহুদিন ধরিয়া, নানাভাবে, নানা দিক দিয়া, এই আক্ষেপই করিয়া আসিতেছি। নানাভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানেরও যে চেষ্টা হইতেছে, আর এ জন্য যে গবর্ণমেন্ট অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন, ইহাও জানা আছে। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিই এরূপ, ইহার গঠনই এমন, জন্মাবধি এই বিশ্ববিদ্যালয়টী এমন ভাবে, এমন সব অবস্থা ও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে এখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নতুন করিয়া একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়িয়া তোলা কেবল অসম্ভব নহে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই অসাধ্য। ফলতঃ কলিকাতার মত সহরে একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এখানকার সামাজিক অবস্থা, লোকের বসবাসের ব্যবস্থা, এ সকলই একটা সাক্ষাৎ

বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়গঠনের একান্তই বিরোধী। একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব বিষয়েই যথাসম্ভব আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীন হওয়া একান্তই আবশ্যক। অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ প্রভৃতির এ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা আছে। আর এটা থাকা সম্ভব হইয়াছে এই জ্ঞাত যে, এই দুইটা মহন কাৰ্য্যতঃ কেবল এই বিশ্ববিদ্যালয় দুইটিকে লইয়াই গঠিত হইয়াছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয় নাই, ও হইতেই পারে নাই, এই জ্ঞাত লণ্ডনের উপরে এট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রকারের কর্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব ছিল না, কখনো সম্ভব হইতেই পারে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আর এই জ্ঞাতই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপে, তারই ছাঁচে, প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজের আদর্শে গড়িয়া উঠে নাই।

* * *

ঢাকাতে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজের আদর্শেই গঠিত হইবে। বড়লাট বারবার মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং ও রেসিডেন্সিয়েল ইউনিভারসিটি (Teaching and Residential University) হইবে, লর্ড হাডিঞ্জ স্পষ্টভাবে এই কথা বলিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা কোনও আকারে যে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে একটা ভাগ বাটোয়ারা বসান হইবে না, এ কথাও তিনি বলিয়াছেন। ইহার পরেও তাঁর এই অস্তিত্বের প্রতিরোধ করা কেবল অযৌক্তিক নহে, কিন্তু নিতান্তই অসঙ্গত।

* * *

ফলতঃ যাঁরা এখন ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁরা এই প্রস্তাবের ভিতরকার তত্ত্বটী এখনও ধরিতে পারেন নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমানবিরোধীরা

ইহা ধরিলেও, হিন্দু বিরোধীদল একে-বারেই ধরিতে পারেন নাই। আর তারই জ্ঞাত এই প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তাটা ইহাঁরা একেবারেই স্বীকার করিতে রাজি নন। বড়লাট যে ভাবের বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাহা যে অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য ইহা সকলেই বোঝেন। আর বর্তমান অবস্থায় সরকার কোথা হইতে এত টাকার ব্যবস্থা করিবেন, অনেকে ইহাও ভাবিয়া পান না। আর 'এই জ্ঞাতই সত্যি সত্যি যে ঢাকায় একটা উচ্চ অঙ্গের বিহার স্থাপিত হইবে, তাঁরা কিছুতেই ইহাঁ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। আর এটা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই, গবর্ণমেন্টের এই প্রস্তাবের পশ্চাতে কোনো না কোনো একটা অসাপু অভিপ্রায় লুকাইয়া আছে, এরূপ কল্পনা করিতেছেন। এই চেষ্টার ভিতরকার তত্ত্বটা ধরিতে পারিলে, এ ভয় ভাবনা হইত না।

* * *

ঢাকা পূর্ববঙ্গের প্রধান সহর, বাংলার বিশাল মুসলমান-সমাজের কেন্দ্রস্থল। সমস্ত ভারতবর্ষে পঞ্জাব ও বাংলা এই দুইটাই মুসলমান-প্রধান প্রদেশ। আর বাংলার মধ্যে পূর্ববঙ্গই বিশেষভাবে মুসলমান-প্রধান হইয়া আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঢাকায় বা পূর্ব-বঙ্গের কোথাও আলিগড়ে যে মুসলমান কলেজ আছে, তার প্রভাব প্রত্যক্ষ হয় নাই। সমগ্র মুসলমান-সমাজকে এক করিয়া পুনরায় ইসলামের আধিপত্যকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায়, ভিন্ন ভিন্ন মুসলমানাধিকৃত দেশে যে একটা প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া উঠিতেছে, ভারতবর্ষে আলিগড়ই তার একটা কেন্দ্র-স্থল। ইসলাম মহামণ্ডলের বা প্যান-ইসলামিজমের (Pan-Islamism এর) ভাবটা আলিগড় কালেক্সের ছাত্রদের মধ্যেই অত্যন্ত প্রবল। তাঁরা এই ভাবটাকে ভারতময় ব্যাপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই ইসলাম-মহামণ্ডল বা প্যান-ইসলামিজমের সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশশাসননীতির একটা নিগূঢ় ও প্রবল

প্রতিযোগিতা রহিয়াছে। ভারতের মুসলমান-প্রকৃতিপুঞ্জ বহির্ভারতের মুসলমান শক্তিসম্ভেদর সঙ্গে কোনও প্রকারের সখা বা সহায়ত্বভূতি সূত্রে আবদ্ধ হয়, ভারতের ব্রিটিশ প্রভুশক্তি কখনই এটা ইচ্ছা করেন না। অথচ এইরূপ সখ্যবন্ধন প্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্ত আমাদের মুসলমান-সমাজের ইংরেজিশিক্ষিত নেতৃবর্গের অনেকেই বিশেষ লালায়িত। আলিগড়ই মুসলমানগণের একমাত্র নিজস্ব বিদ্যালয়। পূর্ববঙ্গের নবজাগ্রত মুসলমানসম্প্রদায়কে

এই বিদ্যালয়ের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্তই প্রধানতঃ ঢাকায় একটি নূতন ও উচ্চ অঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়াছে। এই জন্তই অনেক ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান এই প্রস্তাবের এত বিরোধী হইয়াছেন। আমাদের হিন্দুনেতৃবর্গ এই প্রতিবাদে মুসলমানগণের সঙ্গে যোগ দিয়া যে আত্মঘাতী নীতির অনুসরণ করিতেছেন, একথা যেবোবোন না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।

— — —

নব বর্ষ

এস এস, হে বর্ষ নূতন !

নূতন কিরণ ঢালি' আশার আলোক জালি'

এস এস, হে অতিথি করি আবাহন !

বুকভরা প্রেমরাশি, ল'য়ে এস মধু হাসি,

আজি নত শিরে তোমা' করি গো বন্দন !

এস এস, হে বর্ষ নূতন !

এস এস, হে বর্ষ নূতন !

উঠিছে তরুণ রবি, আকাশে সোনার ছবি,

কাননে কুসুমবালা গেলিছে নয়ন ;

আলোকে পুলকি' প্রাণ বিহগ গাতিছে গান—

তোমার বন্দনা ভরি' নিখিল ভুবন ;

এস এস, হে বর্ষ নূতন !

এস এস, হে বর্ষ নূতন !

ভুলাইয়া ভূত কথা, মুছাইয়া মলিনতা

আন' নব বল দেহে—নূতন জীবন ;

শুনাও নূতন গীতি প্রাণ ভরি' দেও প্রীতি,

পূর্ণ কর জীবনের আশা, আকিঞ্চন ;

এস এস, হে বর্ষ নূতন !

এস এস, বরষ নূতন !

দেখাও কর্তব্য-পথ, জীবনের ভবিষ্যৎ,

ভেঙে দেও সুখতন্ত্রা—অলস স্বপন ;

দণ্ডে-দণ্ডে পলে-পলে আয়ু ক্ষয়মুখে চলে,

কে বা জানে কত দূরে হবে সমাপন !

এস এস, বরষ নূতন !

এস এস, বরষ নূতন !

তীরে-তীরে দিয়া পাড়ি, কৈশোর, যৌবন ছাড়ি'

কোন্ খেয়া-ঘাটে তরি করিবে বন্ধন ;

ফেলে যাবে কত গ্রাম— নয়নের অভিরাগ,

তালী-নারিকেল-কুঞ্জ-ছায়ার মগন !

এস এস, বরষ নূতন !

এস এস, বরষ নূতন !

বল আর কত দূরে ' নিয়ে যাবে কোন্ পুরে

হয় ত, সন্ধ্যার ছায়া নাগিবে তখন ;

তখন দ্বিধাও তরি, যাত্রা সমাপন করি'

করিব নূতন দেশে, নব-পদার্পণ ;

এস এস, বরষ নূতন !

. শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ।

ভিক্টর হগোর কথা

ভিক্টর হগোর মহিমামণ্ডিত নাম ভুবনবিখ্যাত। তাঁহার সাহিত্য-যশঃসৌভাগ্যব্যাপ্ত। তিনি কবি, তিনি নাট্যকার, তিনি ঔপন্যাসিক; এবং এই বিবিধ ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভা অতুলনীয়। তাঁহার প্রাধান্য সর্ববাদিসম্মত। অনেক কাব্যরসজ্ঞ তাঁহাকে ফ্রান্সের সর্বপ্রধান কবি বলিয়াছেন। ইউরোপীয় বিদ্বৎসমাজেই তিনি অনেক বার 'উনিবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি' বলিয়াও অভিহিত ও সম্পূজিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজেও তাঁহার ভক্তের সীমা নাই। এমন মাহুষের জীবন-কথা শুনিবার আগ্রহ অনেকের হইবার সম্ভাবনা। তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কিন্তু বলিয়া রাখিতে হইতেছে যে, ইহা ভিক্টর হগোর জীবনী নহে। তাঁহার বালা-শিক্ষা ও সাহিত্য-জীবনের কথাঞ্চিৎ পরিচয়মাত্র। আমি প্রবন্ধ লিখিতেছি; জীবন-বৃত্ত লিখিতেছি না।

১৮০২ খৃঃ অব্দের ২'এ ফেব্রুয়ারি ভিক্টর হগো জন্মগ্ৰহণ করেন। জন্মকালে তিনি এমন ক্ষুদ্র, শীর্ণ, দুর্বল ও জীবনী-শক্তিহীন ছিলেন যে, প্রসবকারী-চিকিৎসক স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, এই শিশুর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন যে, "তাঁহাকে কাপড় পরাইয়া একখানি সাধারণ চেয়ারের উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল; সে এত অল্প স্থান অধিকার করিয়াছিল যে, তাঁহার মন

আরও বারটি ছেলের স্থান, সেই চেয়ারে হইতে পারিত।" তাঁহার অগ্রজ ইউজিন তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—“এ আবার কি একটা ছোট্ট জানোয়ার!” ইউজিন তখন দেড় বৎসরের শিশু, ভাল করিয়া কথা বলিতেও শিখে নাই।

নেপোলিয়ানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্ট নেপল্‌সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে ভিক্টরের পিতা লিয়োপোল্ড হগো কর্মকুশলতা, রণদক্ষতা ও বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ রাজকীয় কসিকান্ সেনাদলের কর্ণেল ও আভেলিনো প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। দুই বৎসরেরও অধিককাল তিনি স্ত্রীপুত্রের সঙ্গসুখে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি এই দীর্ঘকাল কর্ম্মানুরোধে ইতালির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভূমধ্যসাগরের একাধিক দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। স্ত্রীর পত্নী ও পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে রাখিতে পারেন নাই। তাহারা প্যারিসে বাস করিতেছিল। এক্ষণে এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া, এবং ইতালিতেও শান্তি স্থাপিত হওয়ায়, তিনি স্ত্রীকে আসিতে লিখিলেন।

১৮০৭ সালের অক্টোবর মাসে মাদাম হগো পুত্রদ্বয়কে লইয়া ইতালি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভিক্টরের বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র। এই দূরপথ যাত্রা সম্পর্কীয় বড় অধিক কথা পরিণত বয়সে ভিক্টরের মনে ছিল না, কিন্তু দুই চারিটা ঘটনা

তাঁহার মনে গভীর ভাবে শঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। একটা ঘটনা এই যে, তাহাদের প্যারিস হইতে যাত্রাকালে ভয়ানক ঝড় ঝুটি হইতেছিল; তাহাতে তাহাদের গাড়ীর জানালা ভাঙিয়া গিয়াছিল। আর মনে ছিল, আপলাইন্ পূর্বতে এক দিনকার ভোজনের কথা। পার্কটা বাঘুর কল্যাণে বালকদিগের অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল। সঙ্গে আহার্য কিছুই ছিল না; নিকটে সাধারণ ভোজনাগার পাইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। অকস্মাৎ একজন ছাগ-পালকের সহিত দেখা হইল; সে লোকটা তাহার কুটীরে বালকদিগকে আশ্রয় দিবে চাহিল। কিন্তু তথায় খাদ্যদ্রব্য কিছুই ছিল না—কেবল একটু সন্তোনিহত ঈগল পক্ষী পড়িয়া ছিল। ক্ষুধার জ্বালায় বালকেরা কোলাহল করিয়া উঠিল, “আমরা এই ঈগল পাখীই খাব।” ছাগপালক সত্য সত্যই তাহা রাঁধিয়া দিল; বালকগণ মহা আনন্দে ও আগ্রহে তাহা উদরসাৎ করিল।

আরও একটা কথা মনে ছিল। সেই সময়ে জলপ্লাবনে পারিস নগরীর চতুর্দিক ভুবিয়া গিয়াছিল। জুতা, মোজা ভিজাইতে অনিচ্ছক কৃষকেরা সেগুলি বাঁধিয়া গমায় বুলাইয়া খালি পায়ে পথ চলিতেছিল, এই অসদৃশ দৃশ্য দেখিয়া বালক ভিট্টর বড়ই আনন্দ পাইল; তাহার অগ্রজ ইউজিনকে টিপিয়া বলিল—“দেখ, দেখ, কি সব মজার লোক! ইহারা বরং নিজের পা ক্ষয় করিবে, তবু জুতা ক্ষয় করিতে রাজি নয়।”

অবশেষে যাত্রীর এই ক্ষুদ্র দল আভেলিনোতে গিয়া পৌঁছিলেন। আনন্দে অধীনা

লিওপোল্ড হুগো তাঁহার জন্মকাল সাময়িক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া স্ত্রী ও পুত্রদিগের সম্বর্জন্য করিলেন।

আভেলিনোতে অবস্থানকালে বালকদিগের দিন বড় সুখেই কাটিতে লাগিল। পাঠশালায় যাইতে হয় না, পাঠাভ্যাস করিতে হয় না, শিক্ষকের তাড়না নাই, গৃহেও কোন প্রকার বাধাবাধি নিয়মের গিড়খনা নাই—কোন বালাই-ই ছিল না; কেবল খেলা-ধুলা করিয়া, হাস্য-কলরব করিয়া, গাছে চড়িয়া, ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিয়া, প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া, দিন বড় আনন্দেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু এত সুখ বড় অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কয়েক মাসের মধ্যেই নেপ্লুসের রাজা যোসেফ বোনাপার্টী স্পেনের সিংহাসন লাভ করিয়া ইতালি হইতে চলিয়া গেলেন। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিডে পৌঁছিয়া তিনি লিওপোল্ড হুগোকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার ইতালিতে থাকায় কোন আপত্তি নাই বটে, কিন্তু তিনি স্পেনে আসিলে অধিকতর প্রীতি ও সম্ভাষের বিষয় হয়। মান-সম্ময়, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, ধনসম্পদ, উচ্চপদ, গৌরব, লিওপোল্ড হুগোর যাহা কিছু, সবই যোসেফ বোনাপার্টীর প্রসাদে; ইতালি পরিত্যাগের অন্তিম দিন পূর্ণে তিনি লিওপোল্ডকে নাইট্ কমান্ডার ও মার্শালের উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহৃদয় প্রীতিপূর্ণ আহ্বান কি অস্বীকার কুরা যায়? স্পেনে যাওয়াই স্থির; কিন্তু নবাধিকৃত স্পেন তখন অশান্তিপূর্ণ। ইতালি তাহার নূতন রাজ্যকে সহজে স্বীকার করে নাই;

স্পেনও করিল না। তেমন অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া তথায় যাওয়া নিরাপদ ও সম্ভব নহে। লিওপোল্ড হুগো স্থির করিলেন যে স্ত্রী ও পুত্রদ্বিগকে প্যারিসে পাঠাইয়া দিয়া তিনি স্বয়ং স্পেনে যাইবেন।

তাহাই হইল। পুত্রসহ প্যারিসে পাঠাইয়া দিয়া লিওপোল্ড হুগোর পক্ষে নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বড়ই হ্রস্ব বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। এই সময়ে তাহার মাতা বরগুণি প্রদেপে অবস্থান করিতে ছিলেন। লিওপোল্ড এই সময়ে তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একাংশ এই রূপ—

“সর্বকনিষ্ঠ ভিক্টরের লেখাপড়া শিখিবার বড় আগ্রহ। সে তাহার সর্ব প্রোক্ত ভ্রাতার ছায় দীর, গম্ভীর ও চিন্তাশীল। কথা সে বড় কহে না; কিন্তু যাহা বলে তাহা সকল সময়েই প্রসঙ্গাধীন—প্রসঙ্গাতীত কখনই হয় না। সময়ে সময়ে সে যে সব মন্তব্য প্রকাশ করে, তাহাতে আমি বিস্মিত হই। আমার কাছে তাহারা যে এখন নাই, তাহাতে আমার বুক ভাদিয়া গিয়াছে! কিন্তু উপায় কি? এখানেও তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার কোন সুবিধা নাই; সুতরাং প্যারিসে পাঠান ব্যতীত আর উপায় ছিল না।”

ভিক্টর হুগো শৈশবে কেমন ছিলেন, তাহা তাহার পিতার এই পত্র হইতে কতকটা বুঝা গেল।

প্যারিসে আসিয়া বালকদিগকে একটি শিশুবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ইতিপূর্বেই ভিক্টরের বর্ণপরিচয় হইয়াছিল,

এবং অক্ষর দেখিয়া ও মিলাইয়া সে নিজের চেষ্টাতেই পড়িতে শিখিয়াছিল। বিন্যাস লেখে আসিয়া লিখন ও বর্ণবিজ্ঞান শিখিতে হইল। তাহার শিক্ষকের পরী অনেক সময় গৌরব করিয়া বলিতেন যে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার এক সপ্তাহের মধ্যেই ভিক্টরকে ক্রান্তনিপির জ্ঞান বাইজলের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় স্মরণ করিয়া বলা হইয়াছিল, এবং সমস্ত অধ্যায়টি লিখিতে ভিক্টরের কটির অঙ্গিক ভুল হয় নাই—সে কেবল *beni* কথাটা লিখিতে একটা *e* অধিক দিয়া লিখিয়াছিল।

শিশু ভিক্টরের লেখাপড়া শিখিবার যেমন আগ্রহ ও আন্তরিকতা ছিল, খেলা-ধুলাও তদ্রূপ বা ততোধিক ছিল। সে যাহাই করিত, সর্বাস্তঃকরণে করিত। ক্রীড়ার সময় তাহাদের কোন ভ্রাতারই পরিচ্ছদের প্রতি বড় অক্ষিপ থাকিত না, ভিক্টরের একেবারেই না। যখন তাহার খেলা সারিয়া মাতার নিকট আসিত, তখন প্রায়ই দেখা যাইত, তাহাদের গায়ের জামা ধুলা-মাটিতে ভরা, পায়েজামা নানা স্থানে ছেঁড়া। ইহার জ্ঞান তাহাদিগকে প্রায়ই মাতার কাছে তিরস্কৃত হইতে হইত। একদিন তাহারা এ বিষয়ে এতই বাড়াবাড়ি করিয়াছিল যে, মাদাম হুগো অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে শাসাইয়া বসিলেন—“পুনরায় তোমরা যদি এরূপ আচরণ কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে ড্রেগুনদের মতন মোটা কাপড়ের পোষাক পরিতে হইবে।”

পরদিন তাহারা বিদ্যালয় হইতে গৃহে

ফিরিবার সময় একদল ড্রেগুন সৈনিক অশ্ব-
রোহণে যাইতেছিল। সূর্য্যাকিরণে তাহাদের
পরিচ্ছদ ঝকঝক করিতেছিল। তাহা
দেখিয়া ভিক্টর বড়ই মুগ্ধ হইল। জিজ্ঞাসা
করিল, “ইহারা কাহার?” সঙ্গিনী ধাত্রী
বলিল—“ইহারা ড্রেগুন।”

বিদ্যালয় হইতে বাড়ী আসিয়া ভিক্টর
বড়ই চোঁচোটে ও ছুটাছুটি করিত। সে
দিন বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার
পর এক ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, অথচ
ভিক্টরের কোন সাড়াশব্দ নাই। কিঞ্চিৎ
উদ্বিগ্ন হইয়া মাতা খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে
পাইলেন, একটি প্রাচীরের অন্তরালে
দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্তভাবে ভিক্টর নিজের
পায়জামা ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিতেছে।
মাতা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—ওখানে ও কি
হইতেছে? কিছুমাত্র ভীত বা অপ্রতিভ না
হইয়া, অগ্নানবদনে মাতার মুখপানে চাহিয়া
ভিক্টর বলিল—“আমি ড্রেগুনদের মতন
পায়জামা পরিতে চাই।”

১৮০৯ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে মাদাম
হগোর গৃহে এক জন নূতন অতিথির
আগমন হইল। এই অতিথি, জেনারাল
লাহোরী। নেপালিয়নের কোপে পড়িয়া
ইনি কিছু দিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন বন্ধুর গৃহে
লুকায়িত থাকিয়া জীবন কাটাইতে
ছিলেন। পুলিশ তাঁহার পশ্চাতে লাগিয়াই
ছিল বলিয়া একই স্থানে থাকা তাঁহার
পক্ষে নিরাপদ ছিল না। তাই গুপ্তভাবে
থাকিলেও তাঁকে পুনঃপুনঃ আবাসস্থান
পরিবর্তন করিতে হইতেছিল। এক্ষণে
তিনি আসিয়া মাদাম হগোর গৃহে গুপ্তভাবে

অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরিণতবয়স্ক
হইলেও তিনি শিশুদিগের সহিত সরল,
উদার ও অমায়িক ভাবে মিশিতে
পারিতেন। ইহাদের খেলাধুলায় ইনি
অকপট ভাবে যোগ দিতেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ
ভিক্টরকে ইনি সময়ে সময়ে ধরিয়,
উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেন এবং পতন সময়ে
ধরিয়া লইতেন। এইরূপ খেলায় শিশুর
মাতা বড়ই ভীত হইতেন, কিন্তু ভিক্টরের
আনন্দের সীমা থাকিত না।

এই গৃহে ইহার অবস্থানে শিশুদিগের
বিদ্যাশিক্ষার অনেক সাহায্য হইয়াছিল।
ইনি তাহাদের পঠিত বিষয় তত্ত্বাবধান
করিতেন, অনুশীলনের খাতা দেখিয়া দিতেন,
তাহাদের রচনা ভাল হইলে প্রশংসা
করিতেন, ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন
করিয়া দিতেন, এবং অবসরকালে বালক-
দিগের পক্ষে সুখবোধ্য ঐতিহাসিক ও
পৌরাণিক গল্পসকল শুনাইয়া তাহাদের
চিত্ত বিনোদন করিতেন। তিন ভ্রাতার
মধ্যে ভিক্টরের প্রতি তিনি যেন কিছু
অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আট বৎসর
বয়সেই ভিক্টরের ল্যাটিন শিক্ষা আরম্ভ
হইয়াছিল। গৃহে জেনারাল লাহোরী
তাহাকে তাসিতসের ইতিহাসগ্রন্থ ব্যাখ্যা
করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। ইহাতে ভিক্টরের
ল্যাটিন-শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

মাদাম হগো পুত্রদিগকে লইয়া প্যারিসে
আগার পর তিন বৎসর অতীত হইয়া
গিয়াছে। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে লিওপোল্ড
হগোর স্ত্রী ও পুত্রদিগকে দেখিবার সুযোগ
একবারও হয় নাই। নববিজিত ও অশান্তি-

পূর্ণ স্পেনে তিনি যুদ্ধ ও শাসনকার্য লইয়া অতিমাত্র ব্যস্ত ছিলেন। তিন বৎসরের বিচ্ছেদের পর জ্যৈষ্ঠদিগকে দেখিবার জন্ত তিনি নিতান্ত উৎসুক ও ব্যগ্র হইলেন। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা কর্ণেল লুই হুগো কোম রাজকীয় কার্যোপলক্ষে পারিগে যাইতেছিলেন। লিওপোল্ড হুগো তাহাকে দিয়া জ্যৈষ্ঠদিগকে স্পেনে আসিবার জন্ত অরোধ করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার কার্য সমাধান করিয়া লুই হুগো ভ্রাতৃজ্ঞার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধর্মোপাখ্যচিত সামরিক পরিচ্ছদ, সমুজ্জ্বল তরবারি, বীরোচিত সততপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল ও পিতৃসদৃশ আকৃতি দেখিয়া বালকেরা যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া পড়িল। বহুকাল পরে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ভিক্টর হুগো বলিয়াছিলেন—“যখন আমাদের পিতৃব্য আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন আমার মনে হইয়াছিল, যেন প্রধান স্বর্গীয় দূত মাইকেল আলোকরশ্মিতে চড়িয়া আমাদের গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন।”

কর্ণেল লুই হুগোর আগমনের পর দিনই ইউজিন ও ভিক্টর দেখিল যে, তাহাদের শয়নকক্ষের টেবিলের উপর কয়েকখানি নূতন পুস্তক রহিয়াছে। মাতা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, “এগুলি স্পেনদেশীয় ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ। তোমরা আজই পড়িতে আরম্ভ কর, কেননা তিন মাসের মধ্যেই তোমাদিগকে স্পেনের ভাষা শিখিতে হইবে।”

ছয় সপ্তাহ অতীত হইলেই দেখা গেল যে, তাহারা স্পেনদেশের ভাষা উত্তমরূপে ও অনর্গল বলিতে পারিতেছে; কেবল উচ্চারণ ব্যতিক্রম হইতেছে মাত্র।

ইহার কিছুদিন পরেই মাদাম হুগো ও তাঁহার পুত্রত্রয় স্বামী ও পিতৃদর্শনে স্পেন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন স্পেনে যাওয়া অতিশয় বিপদসঙ্কুল ছিল। নবাধিকৃত স্পেন তখন সর্পাস্তঃকরণে ফরাসীদিগের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। ঋণযুক্ত ও পুনঃপ্রতিনিয়তই চলিতেছিল; এমন দিন যাইত না যে দিন না একটা সংঘর্ষ ঘটিত না। স্পেনে যাইতে হইলে তখন ফরাসীদিগকে প্রাণ হাতে করিয়া যািতে হইত। বহু সংখ্যক রক্ষক সঙ্গে না লইয়া স্পেনে ভ্রমণ করা তখন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বেয়ন নগরে উপস্থিত হইয়া মাদাম হুগো অবগত হইলেন যে, যে রক্ষিবর্গ তাহাদের সঙ্গে যাইবে কথা ছিল, তাহারা এমাসের মধ্যে আসিয়া জুটিতে পারিবে না। অগত্যা তাহাদিগকে একমাস কাল বেয়ন নগরে বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইল।

এই সময়কার একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। যে গৃহে মাদাম হুগো তাঁহার পুত্রদিগকে লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সে গৃহের অধিকারিণী একটি বিধবা জীলোক। সেই জীলোকটিও এই গৃহেরই একাংশে অবস্থান করিত। তাহার একটি কণ্ঠা ছিল।

কণ্ঠাটির বয়স দশ বৎসর; ভিক্টরের

বয়স তখন নয় বৎসর। বালিকার পক্ষে দশ বৎসর যাহা, বালকের পক্ষে বোধ হয় পনের বৎসরও তাহা নহে। এই ক্ষুদ্র বালিকাটি ভিক্টরকে দেখিত শুনিত, তাহাকে গল্প পড়িয়া শুনাইত—তাহার একপ্রকার অভিভাবিকা হইয়া উঠিয়াছিল। ভিক্টরের দুই অগ্রজ ভ্রাতা, আবেল ও ইউজিন, ইহাদের সঙ্গে বড় মিশিত না। তাহারা তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠের সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া চলিত। যে দিন বন্দুক-ব্যবহারের শিক্ষা ও পরীক্ষা হইত, সে দিন আবেল ও ইউজিন তাহা দেখিতে চলিয়া যাইত; কিন্তু ভিক্টর যাইত না। সে এই বালিকার কাছে বসিয়া থাকিত। বন্দুকের খেলা দেখায় আনন্দ আছে বৈ কি। কিন্তু এই বালিকার মুখ দেখাতে ভিক্টরের বোধ হয় অধিক আনন্দ ছিল।

ইহাকে অবগুই কেহ প্রেম বলিবে না। নয় বৎসরের বালক, দশ বৎসরের বালিকা—ইহাদের মধ্যে প্রেম, আমাদের নাটক-নভেলপড়া পাঠকবর্গ অবগুই স্বীকার করিবেন না। কেহ স্বীকার করুন বা না করুন, ঘটনাটা এই—

তাহার অগ্রজ দুই ভ্রাতা বাহির হইয়া গেলে, ভিক্টরকে বালিকা বলিত—“এস ভিক্টর, তোমাকে আমি কিছু পড়িয়া শুনাই; তাহাতে সময়টা বেশ কাটিয়া যাইবে।” তখন বালিকা ভিক্টরকে লইয়া গিয়া সিঁড়ির একটা ধাপে বসিত এবং কোন একখানি গল্পের পুস্তক খুলিয়া কোন চিত্তরঞ্জক গল্প পড়িয়া যাইত। কিন্তু ইহার এক বর্ণও ভিক্টরের কর্ণগোচর

হইত না; সে কেবল একদৃষ্টে বালিকার মুখপানে চাহিয়া থাকিত। বালিকার চক্ষু যতক্ষণ পুস্তকে নিবদ্ধ থাকিত, ততক্ষণ ভিক্টর একমনে-একপ্রাণে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বালিকা যখন মাথা তুলিয়া ভিক্টরের পানে চাহিত, তখন ভিক্টর নিতান্ত অপ্রতিভ হইত ও লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিত।

এক এক সময় বালিকা যখন বুঝিত যে, ভিক্টর মন দিয়া শুনিছে না, তখন সে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া বলিত—“দেখ ভিক্টর তুমি ভাল করিয়া শুনিতেছ না। তুমি যদি মন দিয়া না শুন, তবে আর আমি পড়িব না।” তখন ভিক্টর ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিত, “আমি খুব মনোযোগ করিয়া শুনিতেছি, তুমি পড়া।” অর্থাৎ বালিকার চক্ষু পুনরায় পুস্তকে নিবদ্ধ হইলেই ভিক্টর আবার প্রাণ ভরিয়া তাহার মুখ দেখিবার হরিষা পাইবে। কোন কোন সময়ে বালিকা জিজ্ঞাসা করিত, “কোন খানটা তোমার খুব লাগিয়াছে, ভিক্টর?” ভিক্টর এ প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিত না; কেননা, কিছুই তাহার কর্ণগোচর হয় নাই।

এই ব্যাপারের অনেক দিন পরে, পরিণত বয়সে, ভিক্টর হগো নিজেই বলিয়াছিলেন—“এইরূপ বাল্যোচিত প্রণয়-ব্যাপার বোধ করি সকল মানুষেরই জীবনে ঘটে। ইহার সহিত পরিণত বয়সের প্রেমের সম্বন্ধ, যেমন উবার আলোকের সহিত মাধ্যন্দ্য প্রথর দীপ্তির সম্বন্ধ। ইহা জাগরণোন্মুখ হৃদয়ের প্রথম নয়নোন্মীলন।”

তেরিশ নব্ব্বসর পরে, ১৮৪৪ সালে, ভিক্টর হুগোকে আর একবার বেয়ন নগরে বাইতে হইয়াছিল। তিনি সর্বাগ্রে সেই গৃহটি দেখিতে গেলেন। সেই বালিকা পাঠ্যিকাকে মনে করিয়া কি? সেই বাড়ীর দ্বার তখন রুদ্ধ ছিল; কেহ সেখানে বাস করিতেছিল না। নিকটবর্তী অনেক গৃহে অনেক লোককে সেই বালিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাও নাম শুনিয়া কেহই তাহার কথা শ্রবণ করিয়া বলিতে পারিল না। কেহই কোন সন্ধান দিতে পারিল না। তিনি সেদিন বেয়ন নগরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলেন—অস্পষ্ট আশা, যদি সেইরূপ আকৃতির কেহ চক্ষে পড়ে। হুয়াশা! জীবনে আর কখনও ভিক্টর তাহার কথা শুনিতে পান নাই। ভিক্টরের পক্ষে তখন তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

অবশেষে মাদাম হুগো পুত্রদিগকে লইয়া স্পেন গতিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহারা স্পেনের রাজধানী মাদ্রিড নগরে পৌঁছবার কয়েক সপ্তাহ পরেই ইউজিন ও ভিক্টরকে তথাকার অভিজাতদিগের কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পর দিন প্রাতে কলেজের অধ্যক্ষ এই ছুটি বালক শিক্ষাবিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং বিদ্যাগয়ের কোন শ্রেণীতে ইহাদিগকে ভর্তি করা বাইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত নিজের কক্ষে ইহাদিগকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন। সেখানে আরও এক জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। টেবিলের উপর কতকগুলি ল্যাটিন পুস্তক সাজান ছিল। পারিসের

বিদ্যালয়ে যে সকল পুস্তক পড়ান হইত, এগুলিও তাই। দুই ভ্রাতা নিভাস্ত বালক বলিয়া প্রথমেই ইহাদিগকে “L’ Epitome” নামক একখানি পুস্তক অনুবাদ করিতে দেওয়া হইল, ইহারা কিছুমাত্র চিন্তা বা ইতস্ততঃ না করিয়া তাহা অনর্গল অনুবাদ করিয়া দিল। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক উভয়েই কিছু বিস্মিত হইলেন। তারপর ইহাদিগকে “De Viris” নামক ল্যাটিন পুস্তক দেওয়া হইল। কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ইহাও তাহারা অবলীলাক্রমে অনুবাদ করিল। অধ্যাপকের অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তাহার পর “Justin” দেওয়া হইল, “Quintus Curtius” দেওয়া হইল। ইহাও তাহারা অভিধানের বিনা সাহায্যে অনুবাদ করিয়া গেল। অধ্যাপকদ্বয় বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর পুস্তক দিয়া শিক্ষকদ্বয় দেখিলেন যে, “Virgil” ও “Lucretius” বুঝিতে বালকদ্বয়কে কিছু আয়াস পাইতে হইতেছে।

কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় যেন বড় অসম্মত হইলেন। তাহার বিদ্যালয়ের ইহাদের মতন বয়সের বা কিঞ্চিৎ অধিক বয়সের কোন বালকই ল্যাটিন ভাষায় এতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিরক্তিপূর্ণ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আট বৎসর বয়সে তোমরা কোন ল্যাটিন পুস্তকের পাঠ লইতে?” ভিক্টর উত্তর করিল—“Tacitus.” প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টিতে অগ্নিশুলঙ্গ বাহির হইল; তিনি ভিক্টরকে যেন কতকটা শত্রুর মতন দেখিলেন।

এখন বিবেচনার বিষয় হইল, ইহা-
দিগকে কোন্ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা যায়।
দ্বিতীয় শিক্ষক অভিমত প্রকাশ করিলেন যে,
শিক্ষাবিষয়ে ইহারা যতটা অধিকদূর অগ্রগত
হইয়াছে, তাহাতে ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত
অধিকবয়স্ক বালকদিগের সহিত উচ্চশ্রেণীতে
দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অধ্যক্ষ মহাশয় অভি-
মত প্রকাশ করিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বয়সের
বালকদিগকে এক শ্রেণীতে লওয়া কিছুতেই
যুক্তিযুক্ত নহে। দ্বিতীয় অধ্যাপক আর কি
করিবেন, ইউজিন ও ভিক্টরকে তাহাদের
সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে অতি নিম্নশ্রেণী-
তেই ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইল। ইহাতে এক
বিভ্রাট উপস্থিত হইল। অল্পবয়স্কের জন্ম
যাগ কিছু দেওয়া হয়, অল্পবয়স্ক বালকেরা
তাহাতে নিবিষ্ট হইবার পূর্বেই ইহারা দুই
ভ্রাতা তাহা সমাপন করিয়া চুপ করিয়া
বসিয়া থাকে। ইহাতে সেই শ্রেণীর
অপর বালকেরা নিতান্ত নিরুৎসাহিত হইয়া
পড়ে। তাহারা বেশ বুঝিতে পারে যে,
এই দুই ভ্রাতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া
কোন পুরস্কার (prize) পাওয়া সম্পূর্ণ
অসম্ভব। অধ্যক্ষ মহাশয় আর কি করিবেন
অগত্যা ইহাদিগকে অব্যবহিত উচ্চতর
শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। সে শ্রেণীতেও
ঠিক এইরূপই হইতে লাগিল। আর এক
শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হইল; সেখানেও
ঠিক ঐ রূপই ঘটিল। বালকদিগের যে
কোন শ্রেণীতেই এই ভ্রাতৃত্বকে দেওয়া হয়,
সেই শ্রেণীর অপরাপর বালকেরা একেবারে
হতাশ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়ে। তখন
অন্যোপায় হইয়া কলেজের অধ্যক্ষ

‘মহাশয় অধিকবয়স্ক বালকদিগের শ্রেণীতে
ইহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে বাধ্য
হইলেন। ফল এই হইল যে, এক
সপ্তাহের মধ্যে ইহারা দুই ভ্রাতা সমস্ত
শ্রেণী হইতে অলঙ্কারের শ্রেণীতে টঠিয়া
গেল।

এই শ্রেণীতেও একটু কৌতুকবহু
ব্যাপার ঘটিল। পঞ্চদশ বৎসরের বালকেরা
নয় বৎসরের বালকদিগকে যেরূপ তাচ্ছিল্য
ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, সেই শ্রেণীর
অপরাপর ছাত্রেরা ইহাদের দুই ভ্রাতাকে
প্রথমে সেইরূপ অবজ্ঞার ভাবে দেখিতে
লাগিল। কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই
তাহারা দেখিল যে, পাঠ্যপুস্তকের অনেক
স্থল, যাহা তাহারা অভিধানের সাহায্য লইয়া
বহু প্রয়াসেও অর্থ করিতে বা বুঝিতে
সক্ষম হয় না, এই বালক দুইটি তাহা
অনায়াসেই করে ও বুঝে। তখন তাহারা
ইহাদের সহিত সমবয়স্কের তায় সমান ভাবে
মিশিতে লাগিল।

১৮১২ সালের প্রারম্ভে স্পেন দেশে
ফরাসীদিগের অবস্থান ক্রমেই এরূপ আশঙ্কা-
জনক ও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছিল যে,
জেনারেল লুগো পত্নী ও পুত্রদিগকে আর সে
দেশে রাখা অসম্ভব ও বিপদজনক মনে
করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আবেলকে বাধ্য
হইয়া নিজের কাছে রাখিলেন, কিন্তু ইউজিন
ও ভিক্টরকে তাহাদের মাতার সহিত ফ্রান্সে
পাঠাইয়া দিলেন।

প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া মাদাম লুগো
তাহার পুত্রদ্বয়কে শীঘ্র আর কোন বিদ্যা-
লয়ে পাঠাইলেন না। তাহাদের শিক্ষাকার্য্য

গৃহেই চলিতে লাগিল। লারিভিয়ার নামক একজন শিক্ষক ইহাদের দুই ভ্রাতার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ইহাদিগকে ল্যাটিন পড়াইতে লাগিলেন। আরও এক প্রকারে ইহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ সাধিত হইতে লাগিল। মাদাম হুগো নিজে পুস্তকপাঠের একান্ত অনুরাগিণী ছিলেন। একটি সাধারণ পুস্তকালয়ে তিনি বার্ষিক চাঁদা ত দিতেনই, তদ্ব্যতীত রয়ল নামক একজন পুস্তকবিক্রেতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, ইউজিন ও ভিক্টর তাহার দোকানে গিয়া যে কোনও পুস্তক যত ইচ্ছা লইয়া আসিবে। এই কার্যের ভার পাইয়া ভ্রাতৃত্বেরও নানাবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করিবার সুবিধা হইয়াছিল। দোকানে গিয়া মাতার জন্ত পুস্তক নির্বাচন উপলক্ষে কোন পুস্তক তাহাদের ভাল লাগিলে তাহারা দোকানে বসিয়াই সেই সব পুস্তক তিন চারি ঘণ্টা করিয়া মনোযোগসহকারে পাঠ করিত। গদ্য, পদ্য, ইতিহাস, জীবন-রত্ন, ভ্রমণ-রত্নাস্ত, বিজ্ঞান সকলই তাহারা একাগ্রচিত্তে পাঠ করিত। এইরূপে তাহারা ক্লশো, ভলটেয়ার ও দিদেরোর গ্রন্থাবলী পড়িয়া শেষ করিয়াছিল। এমন কি, “Tables” ও সেই শ্রেণীর অপরাপর উপগ্রাস পর্যাস্ত তাহারা পাঠ করিত। সর্বাপেক্ষা তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, কাপ্তেন কুকের ভ্রমণরত্নাস্ত। এই পুস্তক সেই সময়ে সর্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যত্যাগের পর অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই জেনেরাল হুগোকে তাহার সামরিক

পদ হইতে অপসারিত করিলেন। কেননা বহিঃশত্রু কর্তৃক ফ্রান্স-আক্রমণে যে কেহ দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়াছিল, তাহারা সকলেই বুদ্ধিগতির বিষময়নে পড়িয়াছিল। জেনেরাল হুগো প্যারিসে আসিয়াই পুত্রদ্বয়ের ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যাপ্ত হইলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, ইহাদিগকে “Ecole Polytechnique” এ দিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে সেখানে প্রবিষ্ট হইবার উপযোগী শিক্ষালাভের জন্ত প্রথমতঃ তাহাদিগকে অপর একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নাম, করডিয়র; তাহার সহকারী-শিক্ষকের নাম, ডেকোটা। এই বিদ্যালয়ে ওবেশকালে ইউজিনের বয়স প্রায় পনের ও ভিক্টরের তের।

বাণিজ্য-ব্যবসায় যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সময়ে সময়ে কোন একটা বিশেষ দ্রব্যের মরসুম পড়িয়া যায়, সাহিত্যক্ষেত্রেও সময়ে সময়ে তাহা ঘটে। এই সময়ে ১৮১৫ সালে, প্যারিসে কবিতা-রচনার একটা মরসুম পড়িয়া গিয়াছিল। কবি অর্কাব, সুবোধ নিকোঁধ, বালক যুবক প্রৌঢ়, সকলেই কি এক অজ্ঞাত কারণে কবিতা রচনা করিতে সিরতিশয় সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। তের বৎসরের ভিক্টর যে এই স্রোতে ভাসিয়া চলিবে, ইহাতে বিশ্বাসের বিষয় কিছুই নাই; বরং তাহার পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক, কেননা স্পেনে ঘাইবার পূর্ব হইতেই, অর্থাৎ যখন তাহার বয়স সবে আট বৎসর, কবিতা-রচনার চেষ্টা সে করিত। বলা বাহুল্য যে, সে সকল দোষ-

বহুল পদ্যমাত্র হইত, কবিতা হইত না। সে যাহা হউক, এই নূতন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালেই, অর্থাৎ ১৮১৫ হইতে ১৮১৮ পর্য্যন্ত, তাহার কবিতা লিখিবার আগ্রহ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কবিতাক্ষেত্রে যত প্রকারের পথ আছে, ভিক্টর সে সকলেরই পথিক হইয়া উঠিয়াছিল। আখ্যানকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, শোকোচ্ছ্বাস, নাটক, প্রহসন, প্রহেলিকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকথা, ওসিয়ানের অনুসরণ, ভার্জিল ও হোরেসের অনুবাদ, কবিতাসম্বন্ধে এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহাতে ভিক্টর হস্তক্ষেপ করিত না। এমন কি, এই বয়সেই ভিক্টর এক-খানি হাস্যরসাত্মক গীতিনাট্য পর্য্যন্ত লিখিয়াছিল।

এই সময় তিনি যাহা কিছু লিখিতেন তাহা কেবলমাত্র তিন জন পরম আত্মীয় ও বন্ধুকে পড়িয়া গুনাইতেন। সে তিন জন, তাঁহার মাতা, তাঁহার ভ্রাতা ইউজিন ও বিশিষ্ট সূহৃদ বিস্কারা। এই তিন জন নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে এই সকল রচনার দোষগুণ নির্দেশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার রচনার সর্বাপেক্ষা কঠোর বিচারক ছিলেন তিনি নিজে। তাঁহার নিয়ম এই ছিল যে, একখানি খাড়া বাঁধিয়া লইয়া তাহাতে তিনি কবিতা লিখিয়া যাইতেন। একখানি খাড়া নিঃশেষ হইলে আর একখানি খাড়া বাঁধিয়া লইয়া লিখিতেন। রচনা-অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাব্যরস-গ্রাহিতারও উৎকর্ষ সাধিত হইত। তখন আর তাঁহার নিঃশেষিত খাতার লিখিত কবিতাসকল ভাল লাগিত না; তিনি সে

খাতাখানি পোড়াইয়া ফেলিতেন। এইরূপে সেই সময়কার অনেক খাতাই তিনি নিজেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমাদের বঙ্গীয় নবীন কবিগণ এমন মহাদৃষ্টান্তের ও আদর্শের অনুসরণ করেন না কেন? করিলে যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে অনেক জঞ্জাল দূরীভূত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ।

এই কবিতা-রচনাব্যাপার লইয়া এক বার একটা বিলাট ঘটয়াছিল; তাহা কৌতুকবহুও বটে, নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া হাস্যজনকও বটে। পূর্বেই বলিয়াছি, সে সময়ে কবিতা-রচনার একটা আকস্মিক মরসুম পড়িয়া গিয়াছিল। ভিক্টর নিজে ত লিখিতেনই; তাহার অগ্রজ ইউজিন লিখিতেন, তাঁহার একান্ত সূহৃদ বিস্কারা লিখিতেন এবং বিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ডেকোটিও লিখিতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে যে কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, ইহা ডেকোটি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। ভিক্টর হুগোর কবিতালেখার উপর তিনি বড়ই বিরূপ ছিলেন। কিন্তু নানা প্রকারে প্রয়াস সহেও তিনি ভিক্টরের কবিতা লেখা বন্ধ করিতে পারেন নাই। রাত্রে ভিক্টর নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অর্ধরাত্রি জাগিয়া কবিতা লিখিতেন এবং তাহা অতি সাবধানে নিজের টেবিলের দেয়ালে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। এক দিন তিনি নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার দেয়াল খোলা পড়িয়া আছে ও কাগজপত্র সমস্ত অপহৃত হইয়াছে। অপহরণকারী যে কে, তাহা বুঝিতে ভিক্টরের অণুমাত্র বিলম্ব

হইল না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ডেকোটির নিকটে ঘাইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, এমন সময়ে ডেকোটিই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।” তিনি গিয়া দেখিলেন যে, অধ্যাপক ডেকোটি ও অধ্যক্ষ করুড়িয়ার উভয়েই অতি গন্তীর ও অপ্রসন্নভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। এবং সম্মুখে টেবিলের উপর তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া অতি গন্তীরভাবে ও কঠোরস্বরে ডেকোটি বলিলেন—“আমি ত তোমাকে কবিতা লিখিতে নিষেধ করিয়াছি।”

কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভিক্টর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিলেন—“আমি ত আপনাকে আমার দেবরাজ ভাস্কিবার অধিকার দিই নাই।”

ডেকোটি বড় প্রতীত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ভিক্টরকে অভিযুক্ত অপরাধীর ন্যায় বিনোত ও ক্ষমাপ্রার্থীরূপে দেখিতে পাইবেন। তাহা দূরে থাকুক,

এখন ভিক্টরই ক্রুদ্ধ অভিযোগকারী ও ডেকোটি অভিযুক্ত অপরাধী হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যখন দেখিলেন ও বুঝিলেন যে, বিচারকের ও শাসকের গর্ভিত উদ্ধত ভাবে ও বাক্যে কোন ফল হইল না, তখন বলিলেন—“যখন তুমি অবাধ্য হইয়াও এত খানি স্পর্ধা করিতেছ, তখন এই মুহূর্ত্ত হইতেই এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক রহিত হইল।”

নির্তীক ভিক্টর অন্তরীকণে বলিলেন—“আমিও সেই কথাই আপনাকে বলিতে যাইতেছিলাম।”

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মণ্ডল্য বেগতিক দেখিয়া নিজে মধ্যস্থ হইয়া ছাত্র ও অধ্যাপকের বিরোধ কোন প্রকারে এক প্রকার মিটমাট করিয়া দিলেন। তবে উভয়ের মধ্যে অন্তরের অপ্রসন্নতা ও মলিনতা দূর হইতে যে আরও অনেক সময় লাগিয়াছিল, এ কথা না বলিলেও চলে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম ।

১

বর্ণাশ্রমধর্ম ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার এক অপূর্ণ সম্পত্তি। জগতের আর কোথাও ইহা পাওয়া যায় না। বর্ণভেদ বা শ্রেণীভেদ অনেক দেশেই ছিল, কোনও না কোন আকারে এখনো রহিয়াছে। আমেরিকায় জাতিভেদ নাই, কিন্তু এমন বিধম বর্ণভেদ আজিও বিদ্যমান

যে, জাতিভেদ-পীড়িত ভারতেও তাহা নাই, কখনও ছিল কি না সন্দেহ।

খ্রীষ্টীয়ান ইউরোপে জাতিভেদ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে ইউরোপে মনুষ্যের সমান ও সম্বর্দনা বেশী, — মানুষের প্রতি কেবল মানুষ বলিয়া যে একটা সত্য শ্রদ্ধা আছে, দূর হইতে কল্পনার চক্ষে যাই দেখ

যাক না কেন, কাছে গিয়া প্রতিদিনের কার্য-কলাপ পরখ করিয়া দেখিলে সে প্রতীতি জন্মে না। এবং ভারতে জাতিভেদ সত্ত্বেও যে মানুষের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা, মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়া নহে কিন্তু নারায়ণরূপে যে ভক্তি করিবার একটা ভাব, অন্তঃসলিলার মত, প্রাণের ভিতরে ভিতরে এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এরূপ ভাব ক্রটি কোন খৃষ্টীয়ান ভক্তের মধ্যে থাকিলেও, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজাধারী ইউরোপীয় সমাজে একান্তই বিরল। এ ভাব থাকিলে ইউরোপে ধনী-সম্প্রদায় চিরদিন দরিদ্রকে যে চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, আর সমগ্র খেতান্সমাজ অপর বর্ণের লোকের প্রতি যে অস্বিমজ্জাগত ঘৃণার ভাব পোষণ করে, তাহা কখনই সম্ভব হইত না।

ইউরোপে জাতিভেদ নাই, শ্রেণীভেদ আছে ; এ কথা সকলেই জানেন ও মানেন। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা কর যে এ দুইয়ের কোনটাকে বেশী পছন্দ করি, আমার প্রথম উত্তর এই যে, ইহার কোনোটাকেই আমি সত্য ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি না। ভারতে আজ যে আকারে জাতিভেদ আছে ও ইউরোপে যে শ্রেণীভেদ প্রবল, এ দুইই মানুষ-বিকাশের অন্তরায়। মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছেন, এ দুইয়ের কোন ব্যবস্থাতেই তাঁহাকে ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে দেয় না। কিন্তু যদি বল যে, এই দুইয়ের একটাকে আমরা লইতেই হইবে, তৃতীয় পন্থা আর নাই; তবে আমি ঐকান্তিক অকুণ্ঠার সহিত বলিব—“আমার নিজের

জাতিভেদকেই আমার রাখিতে দাও, বিলাতের শ্রেণীভেদের দ্বারা আমার এই পুরুষপরম্পরাগত জাতিভেদকে আমি তাড়াইয়া দিতে রাজি নহি।”

আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক বন্ধুই এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিবেন, জানি। আর যে সকল বন্ধুগণীল বন্ধু আমাকে এই জ্ঞান সাধুবাদ করিবেন, তাঁরাও যে আমার এ কথার মর্ম্ম বুঝবেন না ইহাও দেখিতেছি। তবুও বলি, আমাদের জাতিভেদ যতই মন্দ হউক না, বিলাতের শ্রেণীভেদ হইতে অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ।

আপনার বস্তুর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক যে মমতা আছে তারই প্রেরণায় এ কথা বলিতেছি, এমনও কেহ মনে করিবেন না। আমি ইংরেজ বা আমেরিকান হইলেও এই কথাই বলিতাম। এমন ইংরেজ ও আমেরিকানও দেখিয়াছি, যাদের স্বদেশ-ভক্তি কম নহে, আর যারা নিজদের সমাজের শ্রেণীভেদের সমুদায় দোষগুণের সম্পূর্ণ ওয়াকিব হইয়াও স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার এ কথার সায দিয়া থাকেন।

আমাদের জাতিভেদের প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে কিছুতেই মানুষকে আপনার জন্মের বাঁধন কাটাইয়া উঠিতে দেয় না। যে নীচ জাতে জন্মিল কিছুতেই তার উঁচু জাতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিবার অধিকার বা অবসর হয় না। শ্রেণীভেদের বিশেষ গুণ এই যে, গুণী হইলে যে কেহই এই জন্মের বাঁধন কাটাইয়া উঠিতে পারে। অতি নীচ ঘরে যে জন্মাইল সে-ও আপনার গুণের প্রমাণ দিতে পারিলে অন্যায়সে বা

সন্ন্যাসে শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীতে যাইয়া বসিতে পারে।

এই যুক্তি অবলম্বনে যাঁরা ভারতের জাতিভেদের উপরে ইউরোপের শ্রেণীভেদের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে যান, মনে হয় তাঁরা যেন একটা মোটা কথার পতি লক্ষ্য করিয়া দেখেন না। প্রথমতঃ তাঁহারা এইটী ভুলিয়া যান যে, ভারতের জাতিভেদ যতই কেন দূরতীক্রমণীয় হউক না, কখনই একান্ত অনতিক্রমণীয় ছিল না, আজিও নহে। পুরাণ ইতিহাসে নিম্নতম জাতির সাধু ও সিদ্ধপুরুষদিগের ব্রাহ্মণ্যলাভের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আজিও যাঁহাদিগকে সচরাচর অন্ত্যজ জাতি বলা যায়, সে সকল জাতির সাধু-মহাজনেরা ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির উপদেষ্টাও গুরুর আসন পাইতেছেন ইহাও জানি। এই বাংলা দেশের নানা স্থানে সর্বদাই এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। সুতরাং একান্তভাবেই যে জাতির প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা অসাধ্য, কিছুতেই এমন কথা বলা যায় না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সকলেই জাতির অতীত হইয়া যায়। বৈষ্ণবতন্ত্রে ভেক ধারণ করিলেই জাতির বাঁধন কাটিয়া যায় কিন্তু সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা ভেকধারী বৈষ্ণবের কথা এখানে বলিতেছি না; গৃহস্থ সাধুদিগের কথাই বলিতেছি। এরূপ অনেক সাধু নিম্ন জাতে জন্মিয়া গার্হস্থ্যশ্রম না ছাড়িয়াও উচ্চ জাতির লোকের উপদেষ্টা ও গুরু হইয়াছেন ও হইতেছেন।

তবে, এ সকল দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ইহা মানিতেই হইবে। আর কেন যে বিরল

তাঁহার কারণও চোখের উপরেই পড়িয়া আছে।

ইউরোপেও নিম্নশ্রেণীর লোকে উচ্চ শ্রেণীতে যাইতে পারেন। ভারতেও নিম্ন-জাতিতে জন্মিয়া উচ্চজাতির সমকক্ষ হইতে পারা যায়। শ্রেণীর বন্ধন বা জাতির বন্ধন দুইয়ের কোনটাই একান্ত অনতিক্রমণীয় নহে। তবে, পন্থার পার্থক্য আছে। যে পথে শ্রেণীর প্রাচীর ডিঙ্গাইতে পারা যায়, সে পথে জাতির প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা সম্ভব নহে।

বিলাতে অতি নীচ জালিয়ার ঘরে জন্মিয়াও কোন ব্যক্তি অর্থ ও বিদ্যাবলে বলীয়ান হইলে ক্রমে লার্ডসতার সভ্য হইয়া দেশের আভিজাত শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারেন। কেবল অর্থের জোরে যে পারা যায় তাহা মনে করিবেন না। কেবল বিদ্যার বলেই যে পারা যায় তাহাও কল্পনা করিবেন না। অর্থের চাবি দিয়া আভিজাত্যের দরজা খুলিতে হয়। বিদ্যার পালিস দিয়া, সহজ না হইলেও কৃত্রিম উপায়ে কিয়ৎপরিমাণে আপনার কথাবার্ত্তায় ও চাল-চলনে আভিজাত্যের রংটা ফুটান আবশ্যক হয়। এটী না করিলে কেবল অর্থের জোরে অভিজাতসমাজের মধ্যে গিয়া বসিবার চেষ্টা করিলে, একেবারেই যে সফলতা লাভ করা যায় না তাহা নহে। কিন্তু সে সাফল্য 'হংস মধ্যে বকো যথা'র তায় একান্তই বিপত্তির কারণ হইয়া উঠে। তথাপি অর্থই বিলাতী সমাজে নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে যাইবার মুখ্য পথ।

বিলাতে অর্থের বলে নীচ হইতে উঠি
হওয়া যায়। জাতিভেদ-পীড়িত ভারতে
অর্থের এ মর্যাদা নাই। এখানে জন্মের
বন্ধন ছাড়াইতে হইলে অর্থ নহে কিন্তু
পরমার্থের প্রয়োজন হয়। ধন-লাভ জ্ঞান-
ভক্তি-লাভ অপেক্ষা সহজ। অর্থ-উপার্জন
পারমার্থিক-সম্পদ-আহরণ অপেক্ষা অশেষ
স্বল্পায়াসসাধ্য। প্রত্যেক সমাজেই অতি
স্বল্পসংখ্যক লোক পরমার্থ-লাভে প্রয়াসী
হন, ইহাদের মধ্যে কচিৎ কোন ব্যক্তি সিদ্ধি
লাভ করিয়া থাকেন।

“মনুষ্যাণাং সহশ্রেয়ু কশ্চিৎ যততিসিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাম্ কশ্চিৎ যততি বেতি

তত্ত্বতঃ ॥

সহস্র মনুষ্য মধ্যে কচিৎ কোনো ব্যক্তি
সিদ্ধির জন্ত যত্ন করেন। আর সাধনশীল
সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে কচিৎ কোনো ব্যক্তি
আমাকে তত্ত্বভাবে জানেন।

পরমার্থলাভ যে সমাজে নিম্নজাতি হইতে
উচ্চতর জাতিতে বাইবার একমাত্র পন্থা, সে
সমাজে যে বহুলোকে জন্মের বন্ধন কাটাঁয়া
উঠিতে পারে না, ইহা বিচিত্র নহে।
ইংরেজসমাজ যে দাম লইয়া নিম্নশ্রেণীর
লোককে উচ্চশ্রেণীতে বাইতে দেয়, হিন্দু-
ভারতে কেহ সেই দাম দিয়া সামাজিক
আভিজাত্য কিনিতে পারে না। ইহাই
কেবল সত্য। নতুবা ভারতের জাতিভেদ
একান্ত অনতিক্রমণীয় আর ইউরোপের
শ্রেণীভেদ একান্তই অতিক্রমণীয়; দুইয়ের
মধ্যে এ পার্থক্য প্রতিষ্ঠা হয় না। একটা
দুরতিক্রমণীয় ও অপরিচাল্য সহজে অতিক্রম
করা যায় এ কথাই সত্য।

জাতিভেদ যতই কেন মন্দ হউক না,
তাতে মানুষের মনুষ্যত্বকে চাপিয়া রাখে;
আর ইউরোপীয় শ্রেণীভেদে রাখে না, এমন
কথাও নিঃসন্দোহে বলিতে পারি না।

বরং ইউরোপ যে প্রণালীতে নিম্ন-
শ্রেণীকে উপরে তুলিয়া লয়, বোণ হয়
তাহাতেই মনুষ্যত্ব-বিকাশের শী হানি হয়।
ভারতবর্ষের চিরাগত প্রণালীতে তাহার
ততটা আশঙ্কা নাই বলিয়াই মনে হয়।

ইউরোপে টাকা দিয়া আভিজাত্য কেনা
যায়। মানুষ সমাজের পদমর্যাদার কাঙাল
সর্বত্রই। যেখানে টাকায় এ পদমর্যাদা
কেনা বাইতে পারে, সেখানে টাকার আদর
অবশ্যই বেশী হইবে। এই জন্ত ইউরোপে
টাকার দাম আমাঙ্কের দেশ অপেক্ষা অনেক
বেশী। আর যেখানেই টাকার দাম চড়িয়া
যায় সেখানেই মনুষ্যত্ব বলিতে যা কিছু
বোঝায়, তাহার মূল্য অনেকটা কমিয়া
আসিবে, ইহা অনিবার্য। ইউরোপে কি
তাহাই হইতেছে না? সে দেশে দারিদ্র্য
আমাদের পঞ্চমগাপাতকের সমান।
টাকার মর্যাদা বাড়িলেই ভোগবিলাসের
মাত্রা চড়িয়া বাইবে, ইহাও অবশ্যসত্তাবী।
যে সমাজে টাকার উপরে সমাজের পদ
ও সম্মান-প্রাপ্তি এতটাই নির্ভর করে,
সেখানে লোকে সর্বদাই আপনার অর্থ
জাহির করিতে ব্যগ্র হইবে। ইহা হইতে
সমাজে বাহ্য আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইবেই
হইবে। টাকাকড়ি, বোড়াগাড়ী, বাগান-
বাড়ী এ সকল যখন লোকে জাহির করিবার
জন্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে, তখন সে
সমাজে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে

ক্ষীণতর হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এ পথ দৈবী সম্পদের পথ নহে—আসুরী সম্পদেরই প্রশস্ত পথ। শ্রেণী-ভেদে এই আত্মঘাতী পন্থাকে কি প্রশস্ত করিয়া তুলে না ?

‘এই জগতই মনে হয় আমাদের জাতি-ভেদ যতই কেন নিন্দনীয় হউক না, বিলাত ও আমেরিকার শ্রেণীভেদ অপেক্ষা কিছুতেই হীনতর এ কথা বলা যায় না।

তবে জাতিভেদ যে আকারে এখন আমাদের সমাজে আছে তাহাও কোনো মতেই মঙ্গলজনক নহে। বিলাতি শ্রেণী-ভেদও তথৈবচ কিম্বা ততোধিক। দুইয়ের কোনটাই সামাজিক কল্যাণের সহায় নহে।

ফলতঃ আমার মনে হয় জাতিভেদ কথাটা আমাদের সভ্যতা ও সাধনার কথা নহে। শাস্ত্রেও এ কথা আছে কি না জানি না। ঐকান্তিক অভেদজ্ঞান-লাভ যে সাধনার চিরন্তন লক্ষ্য, তাহাতে এরূপ ভেদের কথা থাকা সম্ভব নহে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম শাস্ত্রীয় কথা, এই ধর্মের উপরে হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনা প্রতিষ্ঠিত, ইহাও সত্য। এই বর্ণাশ্রম-ধর্মের সাহায্যেই ভারতের অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক আর্য্যেরা আপনাদিগের সাধনা ও সভ্যতাকে এই বিশাল ভূখণ্ডে বিবিধ জাতির অসংখ্য জনগণমধ্যে আশ্চর্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম-অবলম্বনেই প্রাচীন ভারতে অনেক জাতি এক বহুমুখী সাধনার অন্তর্গত হইয়া এই বিশাল ও বহু-শাখ হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। খৃষ্টীয়ান বা মুসলমানধর্মের জায়, ভারতের

আর্য্যধর্ম একটা মতবদ্ধ ধর্ম নহে। মত-বদ্ধ ধর্ম সকলকে প্রচারক ধর্ম বলা যায়। ভাব ও ভাষা এখানে দুই বিদেশী। মতবদ্ধ ধর্মকে ইংরেজীতে Credal Religion বলে। কতকগুলি বিশেষ মতেই এ সকল ধর্মের পুঙ্খ-প্রতিষ্ঠা। এ সকল ধর্মের স্থিতি যে মতের উপরে এমন কথা বলা ঠিক নহে। অপর ধর্মের যেমন, সেইরূপ এ সকল ধর্মেরও স্থিতি আচারে ও চরিত্রে, শুদ্ধ বটে নহে। কিন্তু ইহাদের গতির মূল মত, আচার নহে। মত-প্রচারের দ্বারাই এ সকল ধর্ম প্রথমে আপনাকে প্রসারিত করে। এই জগতই ইহাদিগকে প্রচারক ধর্ম, বা ইংরেজীতে Missionary Religion বলে। এ সকল ধর্মে মতের প্রচার আগে, আচারের প্রতিষ্ঠা পরে। ভারতের আর্য্যধর্ম এই শ্রেণীর ধর্ম নহে। খৃষ্টীয় বা মহাকদীয় তন্ত্র যেক্রমে আপনাদিগের বিশেষ বিশেষ মত প্রচার করিয়া, আপনাদিগকে জগতে ছড়াইয়াছে, আর্য্যধর্ম সেরূপভাবে জগতে আপনাকে ছড়ায় নাই। তথাপি খৃষ্টীয় ধর্ম যেমন অখৃষ্টীয়ানকে খৃষ্টীয়ান করিয়াছে, কিম্বা ইলসাম ধর্ম যেমন কাকেরকে কলুমা পড়াইয়া মুসলমান করিয়াছে, ভারতের প্রাচীন আর্য্যেরাও সেইরূপ অসংখ্য অনার্য্যকে আর্য্য করিয়াছিলেন। অহিন্দু যে কখনও হিন্দু হইতে পারে না, কথাটা নিতান্তই আধুনিক। হুন, শক প্রভৃতি অনেক প্রাচীন জাতি আদিতে হিন্দু ছিলেন না, এখন শ্রেষ্ঠ হিন্দু বলিয়া পরিগণিত। বিরাট দ্রাবিড়সমাজ আধ্যাত্মের বহির্ভূত ছিল। কিন্তু আজ সেই সমাজে হিন্দুয়ানীর প্রভাব

যেমন প্রবল, আৰ্য্য-সাধনার প্রাচীনতম লীলাভূমি উত্তর-ভারতে তেমন তর প্রবল নহে। দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র মণিপুরী জাতি হিন্দু হ'ল কারিয়াছে। আজিও দেশের নানা স্থানে আমাদিগের অলঙ্কিতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনার্য্য-গোষ্ঠী আৰ্য্যসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া বাইতেছে। আৰ্য্যধর্ম মত প্রচার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উপরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে নাই। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সনাতন আৰ্য্য-সাধনা বিবিধ অনার্য্য সমাজে, আপনার বিশেষ সমাজ-তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সকল অনার্য্য-সমাজকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে। এই বিশেষ আৰ্য্যসমাজ-তন্ত্রকেই বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে।

হুদিনে পড়িয়া এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম আশ্রম-বিহীন, সুতরাং ধর্মচ্যুত হইয়া বর্ণভেদে পরিণত হইয়াছে। বর্ণাশ্রম বলিয়া যাহারা একটা প্রবল কোলাহল তুলিয়াছেন, তাহারা বর্ণাশ্রম বলিতে প্রকৃত পক্ষে বিলাতী ছাঁচের ও বিদেশী কাঁজের একটা বিকৃত শ্রেণীভেদই বুঝিয়া থাকেন। একদল লোক যেমন ভারতের তথাকথিত জাতিভেদকে তাড়াইয়া, তাহার স্থানে বিলাতের আমদানী অর্থ-প্রাণ, ভোগপ্রধান, পারুষপূর্ণ, উগ্র-কর্ম্মা, বিপ্লবাত্মক শ্রেণীভেদকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, সেইরূপ আর একদল লোকে আশ্রমের অর্থ তুলিয়া ধর্মের মর্ম্মকে নিস্পীড়িত করিয়া বর্ণাশ্রম রক্ষা করিবার চুল করিয়া সেই আত্মঘাতী শ্রেণীভেদের আদর্শকে আপনাদিগের সমাজে

আনিয়া কেহ বা ব্রাহ্মণ-সভা কেহ বা বৈষ্ণব-সভা কেহ বা মহিষ্য-সভা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্ম্ম বুঝিলে এ উৎকট চেষ্টায় কেহ প্ররত্ত হইতেন না।

বর্ণাশ্রমধর্ম সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ। এ সমাস দ্বন্দ্ব সমাস নহে। কিন্তু দ্বন্দ্ব ও যষ্টিভূৎ-পুরুষ এই দুই সমাস এক হইয়া এই সমষ্টিকে গড়িয়াছে। বর্ণ ও আশ্রম—বর্ণাশ্রম দ্বন্দ্ব সমাস, এই বর্ণাশ্রমের যে ধর্ম তাহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম। বর্ণ হইতে আশ্রমকে পৃথক করিলে যে বর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহার উপরে বর্ণভেদ বা জাতিভেদকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম তিষ্ঠিতে পারে না। বর্ণ ও আশ্রমের পরস্পরের সঙ্গে যে প্রাচীন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল তাহা বর্তমান সময়ে আছে কি? এখন আশ্রম নাই বর্ণ আছে। সুতরাং ভারতে বর্ণাশ্রম আর নাই; বর্ণাশ্রমধর্মও নাই। আছে কেবল জাতিভেদ আর এ জাতিভেদ বস্তুটা কখনো প্রকৃত আৰ্য্য-সাধনায় স্থান পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

আৰ্য্য-সাধনায় বর্ণ ও জাতি একই কথা কি না তাহাও বলিতে পারি না। গো জাতি, মনুষ্য জাতি এ সকল কথা আছে। বিজাতি এ কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে জাতি বলা যাইত, না বর্ণ বলা যাইত?

চাতুর্কণ্যম্ ময়া সৃষ্টম্।

গীতায় ভগবান এই কথাই বলিতেছেন। চারি জাতির সৃষ্টি করিয়াছি এমন কথা তো বলেন নাই। আর বর্ণাশ্রমধর্মও বর্ণ শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে, জাতি শব্দ হয় নাই। এখানে বর্ণ শব্দের অর্থ কি? এ কি বর্ণ না অঙ্গুর?

আর্য্যো-অনার্য্যো বর্ণভেদ ছিল, পণ্ডিতেরা এ কথা বলেন। কিন্তু চতুর্ধর্মে তিন বর্ণই তো আর্য্য-গোষ্ঠী-ভুক্ত ছিল। সুতরাং বর্ণ-শ্রমের যে বর্ণ, তাহা রংয়ের দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছিল এমন মনে করা যায় না। বিশেষতঃ চতুর্ধর্মের প্রথম তিন বর্ণই কেবল, আশ্রম-ধর্মের অধিকারী ছিলেন। শূদ্রের সে অধিকার ছিল না। সুতরাং আর্য্য ও অনার্য্য বর্ণের যে বিভিন্নতা ছিল, তাহার উপরে বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলতঃ বর্ণভেদ কথাটাই যেন আর্য্য-সাধনার বিরোধী বলিয়া মনে হয়। আর্য্যেরা বর্ণ-বিভাগ করিয়াছিলেন, বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠা

করিবার জন্ত ব্যগ্র হন নাই। কিন্তু এই বর্ণাশ্রমধর্মের দ্বারাই তাহারা বর্ণ-বিভাগ করিয়াও, সত্য সত্যই বর্ণভেদকে আপনাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেন নাই। বর্ণাশ্রম-ধর্ম এই জন্তই ভারতের সাধনার বিশেষ সম্পত্তি। এই বর্ণাশ্রমধর্ম যখন কালক্রমে ম্লান হইয়া গেল, বর্ণ যখন আশ্রম হইতে, ও বর্ণ ও আশ্রম যখন ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তখনই পারমার্থিক সাম্য সাধনার জন্ত যে সমাজের জন্ম, সেই উদার সমাজে আত্মবাহী বর্ণভেদের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বর্ণাশ্রমধর্ম নহে।

শ্রীহরিদাস ভারতী।

নবযুগের নববর্ষ

এবারকার নববর্ষকে নব্যভারতের একটি নবযুগের নববর্ষ বলিয়াই অভিযুক্ত করিতে হইবে। ভারতবর্ষ এখন প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সে সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে কিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, তাহার ইতিহাস বহু ভাগে বিভক্ত। তাহার যথাযোগ্য সমালোচনার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই বলিয়া, অনেক রাজকর্মচারী ভারতবর্ষের বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখিত হইলে, তাহাতে হয় ত অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য বলিয়াও বিবেচিত হইবে না।

ভারতবর্ষে বৃটিশসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেকাহিনী নিম্নলিখিত বাণিজ্য-

কাহিনী। ইংরাজ বণিক-সমিতির অপরাধিত অধাবসায়ের কথাই তাহার প্রধান কথা। তাহার মূলে কেবল অংশীদারগণের লাভের লোভের কথা। তখনও তাহার অধিক কোনরূপ উচ্চ আশা কাহারও কল্পনা-ক্ষেত্রেও প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু তাহাই এখন ঘটনা-চক্রে সমগ্র ইংরাজজাতির অসামান্য অভ্যুদয়-কাহিনীর প্রধান কথা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

যে যুগে প্রাচ্য-বাণিজ্যের প্রবল প্রলোভন ইংরাজগণকে নিরতিশয় প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, সে যুগে ইংরাজ-শক্তি প্রবল শক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল না। আকস্মিক ঝড়বাতো “আরমাদা” নামক নৌবাহিনী সমুদ্রপথে বিপর্য্যস্ত না হইলে, ইংলণ্ডের ইতিহাস কিরূপ আকার ধারণ করিত,

তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু সেই যুগেও অকুতোভয়তাই ইংরাজজাতির প্রধান অবলম্বন বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার উপর নির্ভর করিয়াই, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিযোগিতা পরাভূত করিয়া, ভারত-বাণিজ্যে লাভবান হইবার আশায়, ইংরাজ-বণিক্-সমিতি মূলধন-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহা বড় সহজ বা নিরুপেক্ষে সুসম্পন্ন হয় নাই। প্রথমবারের বাণিজ্য-যাত্রা সফল না হইলে, বণিক্-সমিতি অধ্যবসায়-প্রকাশের অবসর লাভ করিতেন কি না, তদ্বিষয়েও সংশয়ের অভাব ছিল না।

তাহারা যে বাণিজ্য-যাত্রায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত-বাণিজ্য বলিয়া অভিহিত করা যায় না;—তাহা প্রাচ্য মুহাসাগরের অনির্দিষ্ট অভিনব বাণিজ্য। কারণ, তৎপূর্বে ইউরোপের অন্যান্য প্রবল জাতি ভারত-বাণিজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত থাকিলে, তাহারা ই সে সুযোগের ফললাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষ তখনও একটি পরাক্রান্ত প্রাচ্য সাম্রাজ্য বলিয়াই সুপরিচিত ছিল। উত্তরকালে, সে সাম্রাজ্য, তাহার অন্তর্নিহিত বিদ্রোহ-বহিতেই ভষ্মীভূত হইয়া গিয়াছিল! সেই শ্মশানভূমির উপর ইংরাজ-বণিক্-সমিতির বিজয়-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাহা অচিস্তিত-পূর্ব আকস্মিক ঘটনা; নিরতিশয় বিশ্বাসের ব্যাপার বলিয়াই অভিহিত হইবার যোগ্য।

তখনকার ইংরাজ-বণিক্-সমিতির লাভের

লোভ প্রবল থাকিতেও, ক্ষতির আশঙ্কা তুল্যরূপেই প্রবল বলিয়া পরিচিত ছিল। সেকালের পুরাতন দণ্ডের, কাগজ-পত্রে তাহার কথাই প্রধান কথা। রাজ-কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তের নিকটবর্তী হইলে, বাণিজ্য-ব্যাপার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে বলিয়া, একদিকে যেমন প্রবল আশঙ্কা ইংরাজ-বণিক্-সমিতিতে সর্বদা সতর্ক করিয়া রাখিত; অন্যদিকে, সেইরূপ সতর্কতাই, বাণিজ্য-রক্ষার খাতিরে তাহাদিগকে রাজকার্য্যে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন স্বীকার করিতেও বাধ্য করিত। সুতরাং সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের সঙ্কল কথাই বাণিজ্যের কথা। তাহার জন্মই “পলাশির যুদ্ধ;”—তাহার জন্মই “দেওয়ানী সনন্দ” গ্রহণ।

তৎকালে শাসন—শোষণকার্য্য এবং শোষণের জন্ত শাসনকার্য্য প্রধান রাজকার্য্য বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই জন্ত, অল্পকালের মধ্যেই, ইংরাজ বণিক্-সমিতি শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। যথাকালে রাজস্ব সংগ্রহ করাই সেকালের লক্ষ্য ছিল; তাহার জন্ত “মহন্তের” সময়, কৃষককুল প্রায় নিশ্চূল হইয়া গিয়াছিল! রাজস্ব-সংগ্রহের লালসা প্রবল ছিল বলিয়াই, কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, ভূস্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই, রাজস্ব-বিধি গঠিত হইয়াছিল।

প্রজাপালনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম, সে কথা কখন কখন সাধারণভাবে উল্লিখিত হইলেও, বণিক্-সমিতি তাহাকে মূলধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

হয়। কিন্তু সে কথা এখন বলিতেছি না। বৈষ্ণবকবিতার শিলাংশই এখন আমার লক্ষ্য। বৈষ্ণবকবিতায় যে একটা স্বাক্ষর শুনিতে পাওয়া যায়, সেই স্বাক্ষরে যে একটু রহস্যের ভাব আছে, তাহা বড় উপাদেয়। গানের প্রধান অঙ্গ যেমন সুর, গৌণতঃ ভাব, তেমনি বৈষ্ণব কবিতায় এই স্বাক্ষরই তাহার প্রথম কোশল। আমরা যখন বৈষ্ণবকবিতা পড়ি তখন প্রথমে আকৃষ্ট হই তাহার রহস্যময়ী ভাষা দ্বারা, তার পর তাহার ভাবের দিকে নজর পড়ে। এই ভাষার একটা বৈচিত্র্য এই যে ইহা দ্বারা যেন ভাবটা ছন্দে ও সুরে বাঁধা পড়িয়া যায়।

সখিরে ভাল করি পেখন না ভেল।

মেঘ লতা সঙ্গে তড়িত লতা জন্ম

হৃদয় গেল দেরি গেল।

একটা অনির্কচনীয় ভরা সুরের সহিত কাণের ভিতর বাজিয়া উঠে। ইহা গানের আলাপের মত কথার অপেক্ষা রাখে না, ভাবের লালিতাকে প্রকাশ হইবার অবসর দিতে চাহে না। এমনি করিয়া বৈষ্ণব-কবির পদাবলী আমাদের হৃদয়ে একটা সুরের মোহ সৃজন করে। কোকিল বা পাখিয়ার কুজনের অর্পণ বাহির করিয়া আমরা তাহার মিষ্টতা উপভোগ করি না, তাহা শুনিতেই মিষ্ট লাগে। কোমল ভাবে ভরপুর বৈষ্ণবকবির হৃদয় এই সুরে বিভোর হইয়াছিল, তাই অধিকাংশ বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবিই এই ভাষার সাহায্যে তাঁহাদের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং চণ্ডী-দাসও ইহার আশ্রয় লইয়াছেন, তবে

অনেক কম মাত্রায়, এবং বোধ হয় বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর। জ্ঞানদাসের পদাবলীর মধ্যে অবিশিষ্ট বাঙ্গলাপদ কতকগুলি আছে, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ পদই “ব্রজবুলি”তে লিখিত, অথবা ব্রজবুলিমিশ্রিত ভাষায় রচিত।

“শ্রামরি সোঙরি তৌহারি নাম।”

হইতে জ্ঞানদানের পদাবলীর আরম্ভ হইয়াছে। জ্ঞানদাস ও অগাঠ বৈষ্ণবকবি-গণের পদযোজনা বিষয়ে বিশেষতঃ এই যে, ইহার জগৎ তাঁহারা অত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, অথবা ইহারই প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল, তাহা কোথাও মনে হয় না। যেখানে যাহা আসিয়া পড়িয়াছে তাহাই তাঁহারা বসাইয়া গিয়াছেন, কাটছাঁট করিবার প্রয়াস করেন নাই, কথা বাড়িয়া গিয়াছে কি কথা পড়িয়া গিয়াছে, অত ভাবিবার তাঁহাদের প্রবৃত্তি বা সময় ছিল না। অথচ মনের উল্লাসে তাঁহারা যে গান গাহিয়া ছেন তাহা অনায়াসে সম্পাদিত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই সুন্দর ভঙ্গীতে মনোহর ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই আত্ম-প্রকাশ বহু বৈচিত্র্যময়, এবং প্রায় সর্বত্রই ভাবের উপযুক্ত। কবি জ্ঞানদাস রাস-লীলার আনন্দ কেমন সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিবার যোগ্য।

দেখরি সখি শ্রামচন্দ

ইন্দু বদনী রাধিকা।

বিবিধযন্ত্র যুবতীরন্দ

গাওয়ে রাগ মালিকা॥

মন্দ পবন কুঞ্জভবন

কুসুম গন্ধ মাধুরী।

মদন রাজ নব সমাজ

ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী ॥

তরল তাল গতি দ্বলাল

নাচে নটিনী নটন সুর।

প্রাণ নাথ করত হাত

রাই তাহে অধিক পূর ॥

অঙ্গ অঙ্গ পরশ ভোর

কেহ রং ত কাহ্নু কণ্ঠকার ।

জ্ঞানদাস কহত রাস

যেছন জলদে বিজুরী জোর ॥

মনের আনন্দে হৃদয়ের নৃত্যশীল গতি যেন
এই কবিতার ছন্দের সহিত জড়িত হইয়া
রহিয়াছে। এই একটা মাত্র ছন্দে জ্ঞানদাসের
রাসানন্দ পর্য্যবসিত হয় নাই, বহুবিধ নূতন
ছন্দোবন্ধে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।
আরও কতকগুলি ছন্দের পরিচয় আমরা
এইখানে দিতেছি—

চন্দন চান্দ কুসুম নব কিসলয়

মন্দ পবন পিক রাব।

বরিহা কপোত জোড়ে জোড়ে নাচত

চিতক নিজ পর মাঝ ॥

ভালিরে ভালি অভিসার মদন সমাজে।

রাধা রসবতী অতি রসে আরতি

কাহ্নু রসিকবধু রাজে ॥

কুসুমিত কুঞ্জহি রঞ্জন মনসিজ

নব নব রঙ্গিনী মেলি।

রসময় ভৃঙ্গ কতছ রস মধুকরী

ভ্রমি ভ্রমি করু রস কেলি ॥

ধনিরে ধনিরে ধনি দুহরূপ লাগি

ধনি বেদ গবি কত ভাঁতি।

আর কে কহ কত দুহরসে উনমত

জ্ঞান কহে নাহি দিন রাতি ॥

এই ছন্দে জয়দেবের প্রভাব বিলক্ষণ
অনুভূত হয়।

নুপুর ঘুঘুর মধুর বোল

ঝনন ঝনন নটন রোল

হাসি হাসি কেহ করত কোল

ভালি ভালি বোলনী।

জ্ঞানদাস পড়ত তাল

গায়ত মধুর অতি রসাল

গুণত ভুগত ভগত উমত

হৃদয় পুতলী দোলনী ॥

এই ছন্দগুলির একটা মূর্তি আছে, বচন-
বিজ্ঞাসের প্রতি দৃষ্টি পড়িবার পূর্বেই শুধু
স্পন্দনে সুরের সলিল-হিলোলে আমরা
কবির ‘হৃদয় পুতলী দোলনী’ স্পষ্ট অনুভব
করিতে পারি; কেবল ছন্দের গুণেই
আনন্দরস মূর্তিমান হইয়া আমাদের প্রাণে
ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি করে। ভাবব্যঞ্জক
বাক্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য ধাবিত ও নিবদ্ধ
হইবার প্রয়োজন হয় না, কবির অতিশ্রুত
ভাব আপনি যেন ডহলিয়া উঠিয়া আমাদের
সম্মুখেই উপস্থিত হয়। কাব্যশিল্পে এ
কৌশল বোধ হয় বঙ্গসাহিত্যে প্রথমে
বৈষ্ণবকবি আমদানী করিয়াছেন। সঙ্গীত-
কলায় যেমন তালের ও সুরের পার্থক্যে
অনেক ভাবের পার্থক্য আসে তেমনি কাব্য-
কলায়ও যে হইতে পারে তাহা বঙ্গ-
সাহিত্যে প্রথম দেখাইয়াছেন বৈষ্ণব
কবিকুল; এই জগৎ বঙ্গসাহিত্য চিরদিন
তাহাদের কাছে ঋণী থাকিবে।

তাই বলিয়া বৈষ্ণবকবি যে ছন্দ লইয়া
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা নহে;
হৃদয়ের বিভিন্ন ভাবের অনুগামিনী ভাষা

যেমন মানুষমাত্রেই পক্ষে স্বাভাবিক, . যায়, তাহা হইলে তাঁহার স্থান দুই এক বৈষ্ণবকবির ছন্দের তারতম্যও তেমন স্বাভাবিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। লোকে আনন্দিত হইলে এক রকম কথা কয়, ব্যথিত হইলে অল্প রকম কথা কয়, রাগিলে তাহার ভাষা অন্তরূপ ধারণ করে; যে নিতান্ত কৃত্রিমতার জালে আবদ্ধ নহে, সে কোনও সময়েই বাছিয়া বাছিয়া কথা সাজাইয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে না, যখন যেটা আসিয়া পড়ে সেই কথাতেই ভাব ব্যক্ত করে। বৈষ্ণবকবির ছন্দেও এইরূপ স্বভাব-সরগতা বিद्यমান। ইহাদের কাব্যে আনন্দের ভাষার মতনই বিষাদের ভাষা আছে.

বন্ধুর লাগিয়া, সব তেয়াগিত্ত

লোকে অপযশ কয় ।

এ ধন আমার কয় অত্যাধনা

ইহা কি পরাণে সয়”

সই কত না রাখিব হিয়া ॥

আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়

আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥

যে দিন দেখিব আপন নয়নে

আন জন সঙ্গে কথা ।

কেশ ছিঁড়ি ফেলি বেশ দূর করি

ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥

বলা বাহুল্য যে, এ উদাহরণটি কবি জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে যে কোনও বিষয়ের উদাহরণ দিব তাহা ইহারই পদসমষ্টি হইতে গৃহীত হইবে। এইখানে বলিয়া রাখি যে বৈষ্ণবসাহিত্যে জ্ঞানদাসের স্থান বিশেষ উন্নত; এমন কি বিশ্বের বহুস্থকে যদি স্থান-নির্ণয়ের অধিকারী বলিয়া ধরা

যায়, তাহা হইলে তাঁহার স্থান দুই এক জনের নীচে হইতে পারে, এতদধিক নিম্নে যাইবে না। এ কথা অবশ্য বলাই নিম্প্রয়োজন যে জ্ঞানদাসের কবিতায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, এমন কি অনেক স্থলে অত্যাগত বৈষ্ণবকবির স্থায় তিনিও বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের কথাগুলি লইয়া নিজের পদাবলীর শৌষ্ঠব সাধন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে “গৌবিন্দদাস” প্রবন্ধে আমি বুঝাইয়াছি যে, ইহাতে জ্ঞানদাসের লঙ্ঘিত হইবার কোনও কারণ নাই, কারণ শিষ্য গুরুর অনুকরণ করিবে তাহাতে বিচিহ্নতা কি? জ্ঞানদাসে চণ্ডীদাসের প্রভাব বেশী, কি বিদ্যাপতির প্রভাব বেশী; ইহার মীমাংসা হওয়া দুর্ঘট; কারণ যাহারা জ্ঞানদাসের সমগ্র রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি, উভয় মহাকবির কাছ হইতেই প্রচুর পরিমাণে ধারণ গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহা হোক এ কথা বলিলে অত্যাধিক হইবে না যে, এতৎ সত্ত্বেও জ্ঞানদাস বৈষ্ণবসাহিত্যের, তথা সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের, একটা উজ্জ্বল রত্ন। আমরা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, জ্ঞানদাসে অনেক পরিমাণে চণ্ডীদাসের ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধ হইয়াছে। জ্ঞানদাসের সম্বন্ধে সাধারণভাবে আপাততঃ এইটুকু বলিয়া রাখিলেই চলিবে; অতঃপর আমরা যে কথা বুঝাইতেছিলাম তাহাই আর একটু বিশদভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

আমরা বাক্য ও ছন্দসম্বন্ধে এত বিস্তৃত

ভাবে অলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেন, তাহার কারণ নির্দেশার্থ ফরাসী পণ্ডিত ভিক্টর কুজ্যার ফরাসীতে লিখিত গ্রন্থের ত্রিভোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃত অনুবাদ হইতে নিম্নোক্ত অংশটির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি ভিক্ষা করিতেছি। কুজ্যার বলেন; “বাক্যই কবিতার সাধনযন্ত্র; কবিতা বাক্যকে আপনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া লয়, এবং আদর্শ-সৌন্দর্য প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে মনোবস্তুর পরিণত করে। কবিতা বাক্যকে ছন্দের দ্বারা সুন্দর করিয়া তোলে; বাক্যকে সামান্য কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত এই উভয়ের মধ্যবর্তী করিয়া দাঁড় করায়; উহাকে এমন কিছু করিয়া তোলে যাহা মূর্ত ও অমূর্ত উভয়ই, যাহা আকৃতি ও দেহ-গঠনের ত্রায় সৌম্যবর, পরিস্ফুট, সুনির্দিষ্ট; যাহা বর্ণচ্ছটার ত্রায় জীবন্ত ভাবাপন্ন, যাহা ধ্বনির ত্রায় মর্ম্মস্পর্শী ও অনন্ত। শব্দ স্বয়ং, বিশেষতঃ কবিতার নির্মাণচিত ও রূপান্তরিত শব্দ, একটা প্রবল বিশ্বজনীন সঙ্কেত।”

তাই বলিয়াছিলাম যে কবি জ্ঞানদাসের ছন্দে একটা এমন কিছু আছে যাহা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বচ্ছন্দে আপন মর্ম্ম বিজ্ঞাপন করে। যেমন আনন্দের ছন্দ, বিষাদের ছন্দ আমরা দেখাইয়াছি, তেমনি মনের অপরাপর ভাবাবলীর ছন্দও একা জ্ঞানদাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবকবি মনুজ-হৃদয়ের ছবি তুলিয়াছেন, এবং সেই ছবি ভাবের বর্ণে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই চিত্রের প্রকাশ হইয়াছে তাঁহাদের বাক্য ও ছন্দে। বাক্যের উপরই

ছন্দ প্রতিষ্ঠিত, যদিও ছন্দের এমন শক্তি আছে যদ্বারা সে বাক্যের উপর নির্ভরতা ত্যাগ করিয়া, আপনার গুণে আপনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। কালিদাসের কুমার-সম্ভবের রতিবিলাপের ছন্দের প্রতি মনোনিবেশ করিলেই এ কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে সংস্কৃত কিছুই জানেন না তাহার কাছে যদি এই রতিবিলাপ যথাযথ রীতি অনুসারে আবৃত্তি করা যায় তাহা হইলে সেও বুঝিতে পারিবে যে কবি বিষাদের গান গাহিতেছেন। জ্ঞানদাসের আর একটা পদ উঠাইয়া এই কথা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিব। বসন্তকালে বিরহ-বিবুরা শ্রীরাধা শূন্য কুঞ্জবনে বিলাপ করিতেছেন, এই বিলাপ ব্রজবুলিতে গ্রথিত অতএব ইহাতে বাক্যের রহস্যাত্মক ভাবও যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু ইহা শুনিলেই বুঝা যাইবে যে, এই পদে কবি কোনও বিষাদের তান তুলিয়াছেন :—

ফুটল কুমুম নবকুঞ্জ কুটার বন
কোকিল পঞ্চম গাবই রে।
মলয়ানীল হিম শিখরে সিংহারল
পিয়া নিজ দেশ না আইব রে ॥
অনিমিথ নিকট নহে মুখ নিরখিতে
তিরপিত নহি এ নয়ান।
এ সব সময় সহয়ে এত শাকই
অবলা কঠিন পক্ষীগ।
চন্দন চাঁদ অধিক উত্তপাতই
উপবন অলি উত্তরোল।
সময় বসন্ত কান্ত দূর দেশ
জানহু বিহি প্রতিকূল ॥

দিনে দিনে খীন তহু হিমে কমলিনী জমু
না জানি কি হয় পরজন্ত।

জ্ঞানদাস কহ কো সমুখায়ত
শ্রামর নিকরুণ অন্ত।

• ইহার অর্থ সর্বত্র উপলব্ধি না হইলেও,
ছন্দের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যায়
যে এই পদে ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিয়াছে।
বসন্তের উল্লাস এবং বসন্তের বিষাদ কবি
ছন্দের তারতম্যে প্রকটিত করিতে
পারিয়াছেন।

কিস্ত ছন্দ তো কেবল ভাবের বাহন
মাত্র; দেউলের বাহ্যাবরণ যতই চাক্চিক্য-
ময় হউক তাহার অভ্যন্তরে যদি দেবতা
না থাকেন, তবে তাহার প্রয়োজনীয়তা
বড়ই অল্প। তাই কবিতায় কেহ ছন্দ মাত্র
দেখিতে চাহে না, দেখিতে চাহে তাহার
হৃদয়। কবিতার হৃদয় ছন্দ নহে—ভাব।
তত্রাচ কবিতার ছন্দ নিতান্ত অবহেলার বস্তু
নহে, যে হেতু ছন্দদ্বারা ভাব প্রকাশ করিবার
বিশেষ সুবিধা হয়। পদ্ম যে গজ নহে তাহা
অনেকেই বিস্মৃত হন। তাই ছন্দের বিষয়ে
এত কথা বলিলাম। তবে শুধু ছন্দ ভাল
হইলেই যে কবিতা হয় তাহাও নহে, তাই
কবিতার বাক্য পরীক্ষার প্রয়োজন হয়।
কান্যের ভাবক্ষুণ্ণিত বাক্যেরই উপর নির্ভর
করে—শুধু ছন্দের উপর নহে।

বৈষ্ণব কবির শব্দ-চয়ন-শক্তি প্রশংসনীয়।
শব্দের শক্তি অনেক প্রকার, তাহার
মধ্যে ব্যঙ্গন-বোধ হয় প্রধান। এক একটা
কথায় যে ভাবাভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া
যায় তাহা এই ব্যঙ্গনাশক্তির সাহায্যে।
জ্ঞানদাসের পদাবলীর মধ্যে ইহার উদাহরণ

অনেক মিলিবে। তাঁহার এক একটী
কথার মধ্যে ভাবরাশি যেন লুকাইয়া
আছে।

সহজে নবীর পুতলি গোরী।

জারল বিরহ আনলে তোরি।

এই “জারল” কথাটী মনের কত ভাব
প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে, যেহেতু
কেমন বিষাদমাখা চিত্র আঁকিয়াছে।

চলিতে না পারের রসের ভরে।

আলস নয়নে অলস করে।

* * *

না জানিয়ে কিবা অন্তর সুখে।

আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে।

* * *

কালের বদন চমকি চাও।

ভাবে কেয়া কুল ওর না পাও।

* * *

কপোলে পুলক বেকড় দেখি।

প্রেম কলেবর ততহি সখি।

এই পদের ভিতর অনেকগুলি কথা লক্ষ্য
করিবার উপযুক্ত; যথা রসের ভরে, অলস
ঝরে, ঝলকে চমকি চাও, ওর না পাও।
প্রত্যেক কথায় এক একটা বিভিন্ন ভাব
প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র পদাবলীর দ্বারা
রসাবিষ্টা একটা কমনীয় মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে
ঠিক সেই মূর্তি, যাহা কালিদাসের অমর
তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়া চিরকালের জন্য
আমাদের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিয়াছে—

তাং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাসযষ্টিঃ

নিষ্কপণায় পদমুদ্রিত মুদ্রবহন্তী।

মার্গাচলব্যতিকরা কুলিতেব সিন্ধুঃ

• শৈলাধিরাজতনয়া ন যথৌ ন তস্থৌ ॥

শ্রুতিকৃতক কথার সাহায্যে কবি এক ধানি
সুন্দর চিত্রপট আয়াদের কাছে উপস্থিত
ক'রয়াছেন। গেমের প্রথম পরিচয়ে
লজ্জানব নব বধূর নয়নের অবসন্নতা এমন
সুন্দরভাবে বড় অল্পই চিত্রিত হইয়াছে।
কবির জ্ঞানদাগ এইরূপ অনেক স্থলেই
শব্দশক্তির দ্বারা ভাব প্রকটন করিতে
পারিয়াছেন উদাহরণ—

শ্রাম চিকনিয়া দে রাসে নিরমিল কে
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি।

* * * *

লোচন নোর লুকাইলি গোরী।

পু কঃ প্রচুর করলি ধনী চোরী ॥

প্রেম পরস রস লীলা রস লহরী

দুহঁতু ভাবে উজোর।

কাব্যের বাক্য যে একটা সংক্ষেপ তাহা যে
মূর্ত ও অমূর্ত এই গুলিতে তাহা বেশ দেখা
যায়। শব্দ-বাক্য এই সকল পদে বিশেষ
রূপে উদাহৃত হইয়াছে। বোধ হয় শেষের
উদাহরণটীতে শুধু ব্যঞ্জনা-শক্তির প্রয়োগ
হইয়াছে বলিলে ঠিক হইবে না, অলঙ্কার-
শাস্ত্রমতে ইহাতে লক্ষণারও পরিচয় পাওয়
যায়। ভাবে “উজোর” ইহার মুখ্যার্থ ত্যাগ
করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে,
অতএব ইহাতে শব্দের লক্ষণাশক্তির সুকল
কার্য্যই ব্যঞ্জনাদ্বারা ই প্রকাশিত হয়, ইহাই
আলঙ্কারিকগণের মত।

যন্ত্র প্রতীতিমাধাতুং লক্ষণং সমুপাস্ততে।

ফলে শব্দৈক গম্যে চ ব্যঞ্জনান্নাপরা ক্রিয়া ॥

কাব্যপ্রকাশ—২য় উল্লাস।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

স্নেহের প্রতিদান

পল্লী-কাহিনী

মুকুন্দ পাল ও মুরারী পাল দুই ভাই।
মুকুন্দ মুরারী অপেক্ষা আট বৎসরের বড়।
মুকুন্দের বয়স যখন নয় বৎসর, সেই
সময় তাহাদের পিতা গোপীনাথ পাল
তিন দিনের জরে ভবপারে প্রস্থান
করিল। এক বৎসরের শিশু মুরারীকে
লইয়া তাহার জননী সৌদামিনী বিধবা
হইল; নাবালক পুত্র দুটিকে সে কিরূপে
লালন পালন করিবে, কিরূপেই বা সে দুটি
উদরান্নের সংস্থান করিবে তাহা স্থির
করিতে না পারিয়া, বিধবা চতুর্দিক
অন্ধকার দেখিল; গুরুতর পতি-বিয়োগ-
শোকের উপর দুঃসহ অন্নচিন্তা তাহাকে
ব্যাঙ্কুল করিয়া তুলিল। স্বামীর সংকার

শেষ হইলে বিধবা সিমন্তের সিন্দুর ঘুছিয়া,
হাতের নোয়া খুলিয়া, সাদা ধান পরিয়া
তাহার পিতার জ্ঞাতি ভ্রাতা ত্রিলোচন
সরকারের পা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিয়া
বলিল, “কাকা, সংসারে আপনার বলিতে
আপনি ভিন্ন আমার আর কেহই নাই,
ষাহাতে আমার জাতি রক্ষা হয়, আপনি
তার উপায় করুন। আপনি থাকিতে
কার হুয়োরে দাসীগিরি করিতে যাইব?”

ত্রিলোচন সরকার সরলপ্রকৃতি, ধার্মিক
বৃদ্ধ। পাকা আমের মত টুকটুকে গৌরবর্ণ,
দাড়ি গৌর কামানো, মাথার প্রকাণ্ড
টাক, ষাড়ের দিকে মরুভূমিতে ওয়েশিসের
মত অল্প কয়েকগাছি কেশ ছিল, তাহা

শণের জায় শুভ্র ; কষ্টে তিনকণ্ঠি তুলসী কাঠের মালা। সরকারী মহাশয় ভূসি মালের কারবার কন্ঠি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া- ছিলেন, তাঁহার আড়তে অনেক লোকজন খাটতি, এবং পরোপকারী সদাশয় সাধুব্যক্তি বলিয়া গ্রামে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সৌদামিনীর পিতা রামনারায়ণ সরকারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল না। রামনারায়ণ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ত্রিলোচনের অনিষ্ট-সাধনের জন্ত কোনদিন চেষ্টার ক্রটি করেন নাই ; রামনারায়ণের খলতায় অনেক সময় ত্রিলোচনকে যথেষ্ট ক্ষতি-গ্রস্ত হইতেও হইয়াছিল ; একটি মিথ্যা মামলা বাধাইয়া রামনারায়ণ ত্রিলোচনের অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে রামনারায়ণের পরিবারবর্গের উপর ত্রিলোচন জাতক্রোধ হইয়াছিলেন, এমন কি, তিনি রামনারায়ণের পরিবারস্থ কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিতেন না ; কিন্তু সদ্য-বিধবা সৌদামিনীকে অত্র-পূর্ণ নেত্রে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ত্রিলোচন পূর্ব ক্রোধ বিস্মৃত হইলেন, তিনি সৌদামিনীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, “আমার রাজু যদি ছ’বেলা হুন্ঠো পেতে পায় তাহলে তুমিও পাবে। তোমাকে পরের দুয়ারে দানীগিরি করতে হবে কেন ? আমার সংসারে কত লোক ‘প্রতিপালন’ হচ্ছে, আর তোমাকে হু’ন্ঠো পেতে দিলে কি আমার সংসার অচল হবে ?”

সৌদামিনী বলিল, “আমি নিজের

পেটের ভাবনা ভাবিনে কাকা, হুটো ‘অপুষ্টি’ নিয়েই হয়েছে আমার বিপদ।”

ত্রিলোচন বলিলেন “অপুষ্টি আর কি, ভগবান ত কাকেও অপুষ্টি মনে করেন না ; যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার দেবেন। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না মা, আমার সংসারে থেকেই ওরা ‘মানুষ যুনিষ’ হোক। রাজুকে বলে দেব সে মুকুন্দকে আড়তের কাজ কর্ম শিখাবে।”

রাজু অর্থাৎ রাজীবলোচন ত্রিলোচনের একমাত্র পুত্র। রাজুই এখন ত্রিলোচনের সংসারের কর্তা, সেই কাজকর্ম দেখে। মহা প্রভুর চরণচিন্তা, ভাগবতগ্রন্থপাঠ, সঙ্কনপ্রসঙ্গ ও হরিকথার আলোচনা লইয়াই রন্ধের জীবনসন্ধ্যা নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইতেছে।

সৌদামিনী বলিল “কাকা আপনার জামাই আমাদের কাকি দিয়ে চলে গেলেন, বাড়ীটা শ্রমশানের মত খাঁ খাঁ করচে, ও বাড়ীতে আমার আর এক দণ্ড মন টক্চে না। কি করে আমি থাকবো ?”

ত্রিলোচন ‘রাধাকৃষ্ণ’ নামাঙ্কিত সুলোহিত হরিনামের বুলিটি ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “তুমি আমার বাড়ীতেই থাকবে, আমার নিজের মেয়ে নেই, তুমিই মেয়ের মত সংসারের ‘গিন্নিমে’ করবে। বোমা আমার বাতে ভুগচেন। সংসারের কাজকর্ম দেখাশুনা করে এমন ‘গিন্নি ধনি’ জ্বালোক সংসারে কেউ নেই, তোমার উপর সেই ভার দিলাম।”

ইতিমধ্যে রাজু খড়ম পায়ে দিয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে সেই গৃহের বাঁরাণ্ডায়

উপস্থিত হইল, ত্রিলোচন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “রাজু, গোপীনাথ ত হঠাৎ মারা গেল, সৌদামিনীর কোন উপায়ই ত দেখে চিনে, গলায় দুটো নাবালক বুল্লে, আমাদের সংসারেও ‘গিন্নি ধন্নি’ মেয়েলোকের অভাব। আমি মনে করচি, তোর দিদি আমাদের সংসারে থেকেই ‘প্রতিপালন’ হোক, তুই কি বলিস্?”

“রাজু বলিল, “আমি আবার কি বলবো, আপনাদের যেমন ইচ্ছা। আর আমরা থাকতে দিদি অল্প কোথাও গতর খাটিয়ে থাকেন, এও ত উচিত নয়। আপনি সঙ্গত কথাই বলেছেন।”

ত্রিলোচন পুত্রের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “সংসারে কে কাকে খেতে পরতে দেয় বল! সকলই লীলাময়ের লীলা, তিনিই আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছেন, আবার জল দিয়ে জগৎ ঠাণ্ডা করেন। নিরাশ্রয় অনাথের প্রতিপালন-ভার তিনিই নিচ্ছেন, আমরা কেবল উপলব্ধি মাত্র। তা দেখিস্ সুদাংয়ের বড় ছেলে মুকুন্দকে গোলাবাড়ীতে রেখে কাজকর্ম কিছু শিখুতে পারিস্ কি না।”

রাজু বলিল, “মুকুন্দ নিতান্ত ছেলেমানুষ, এখন ও কাজকর্ম কি শিখবে? সে এখন কিছুদিন পাঠশালায় লিখুক, একটু জ্ঞান বুদ্ধি হলে কাজকর্ম শিখানো যাবে।”

ত্রিলোচন বলিল, “হ্যাঁ সেই কথাই ভাল। ছেলেটাকে একটু লেখাপড়া শিখানো দরকার বটে।”

পরদিন সৌদামিনী ত্রিলোচনের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মুকুন্দ গ্রাম্য পাঠ-

শালায় ভর্তি হইল। যে হততভাগিনী বিধবা সংসার-সমুদ্রের কূল-কিনারা দেখিতে না পাইয়া উদ্বেগে ও ভয়ে অবসন্ন হইতেছিল, ভগবানের অনুগ্রহে তাহার অশন-বসনের ক্রোশ দূর হইল।

২

কয়েক বৎসর পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিয়া মুকুন্দের হাতের লেখাটা বেশ পাকিয়া আসিলে, রাজু তাহাকে গোলাবাড়ীর কাজে নিযুক্ত করিল; মুকুন্দ বুদ্ধিমান, বিনয়ী ও আজ্ঞাবহ ছিল, কিছুদিনের মধ্যেই সে চালানী কারবারের কাজ বেশ বুঝিয়া লইল। সৌদামিনী রাজুকে ধরিয়া ‘একটি গরীবের মেয়ের সঙ্গে মুকুন্দের বিবাহ দিল।’ কর্তা ত্রিলোচন সরকার বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের হস্তে সংসারের ভার দিয়া স্বয়ং শ্রীরন্দ্রাবনে যাত্রা করিলেন, তাহার ইচ্ছা ছিল জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সেই খানেই বাস করিবেন।

মুকুন্দ দু’টাকা উপার্জন করিতেছে দেখিয়া সৌদামিনী রাজুকে বলিল “এতকাল ভূমি প্রাণকে ও আমার ছেলে দুটাকে প্রতিপালন করলে, সাধ করে ছেলের বিয়ে দিলেম, সেও দু’পয়সা আনচে, এখন আমি মনে করচি বাড়িতে গিয়েই থাকবো। ছেলে দুটো থাকতে, কর্তার ভিঁটেয় প্রদীপ জ্বলবে না, কি করে তা দেখি? ঈশ্বর ইচ্ছায় বো এখন ‘গিন্নি ধন্নি’ হয়েছে, আমি তোমার সংসারে না থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না। আর আমি তো বাড়ীর ছয়োরেই থাকবো, যখন ডাকবে তখনই আসবো।”

রাজু বলিল, “এতদিন সংসারের সকল ভার তোমার হাতে ছিল, আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম ; তবে তোমার থাকতে পালজির ভিটেয় একটা আলো জ্বলবে না এটাও ভাল দেখায় না। তা যা ভাল বোক, কর ; বাবা আবার মনে না করেন, এখানে তোমার থাকবার অসুবিধা হলো বলে তুমি বাড়ী চলে যাচ্ছ।”

সৌদামিনী বলিল, “না, কাকা তা কখনও মনে করবেন না। তোমার কত গুণ তা কি তিনি জানেন না ? এতদিন তোমরা আমাকে যে ভাবে প্রতিপালন করলে, নিজের মায়ের পেটের ভাই ও বোনকে তেমন আদর যত্নে রাখে না ; কি আর বলবো ভাই, নারায়ণ মধুসূদন তোমাকে চিরজীবী করে রাখুন। তোমার সোনার সংসার চির দিন উথলে উঠুক।”

এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া সৌদামিনী পল্লীপ্রান্তবর্তী স্বামী গৃহে ফিরিয়া গেল। অন্ধকার কুটার দশবৎসর পরে আবার দীপালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যথাসময়ে সৌদামিনী পুত্রবধূকে গৃহে আনিয়া আবার সংসার পাতিয়া বসিল। বৈচিত্র্যময় কৰ্ম-রঙ্গভূমিতে তাহার জীবন-নাটকের নূতন দৃশ্যপট উন্মুক্ত হইল।

মুকুন্দ দেখিল সে শৈশবে ভাল রকম লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই, ইংরাজী কিছু না শিখিলে একালে তদ্রম্যাজ্ঞে সমাদর হয় না, অর্থসম্পদ, মানসম্মত এ সকলই ইংরাজীশিক্ষার উপর নির্ভর করে। মুকুন্দ মুরারীকে গ্রামের মাইনর স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল।

লেখাপড়ায় মুরারীর অমুরাগ ছিল, শৈশবেই তাহার হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ প্রবল হইয়াছিল, সে অল্পদিনেই মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিও পাইল। ভ্রাতার কৃতকার্য্যতায় উৎসাহিত হইয়া মুকুন্দ স্থির করিল সে বত দিন পারিবে মুরারীকে পড়াইবে। মুরারী যদি কোন রকমে বি এল্টা পাশ করিয়া উকীল হইয়া বসিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পিতার নাম উজ্জ্বল হইকে। নিত্যানন্দপুরের স্কুলেই যত্ন যত্ন করিবে, সে পর্য্যন্ত নিত্যানন্দপুরের একটি ছেলেও প্রবেশিকা পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ব্যবসায়প্রধান স্থান, স্কুলেই ছেলেদের সামান্য লেখাপড়া শিখাইয়া বাণিজ্য-ব্যবসয়ে নিযুক্ত করিত।

নিত্যানন্দপুরের সাতকোশ দূরে সুলতানপুর গ্রাম। সুলতানপুরের বিদ্যোৎসাহী জমিদারেরা অনেক চেষ্টায় সেখানে একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপিত করিয়াছিলেন, সুলতানপুরে মুকুন্দের এক বিধবা পিশির বাড়ী। বিধবার হাতে অনেক টাকা ছিল, তিনি মহাজনী করিতেন। মুরারী পিশির বাড়ী থাকিয়া সুলতানপুরের স্কুলে পাড়িতে লাগিল। মুরারী তিন বৎসর পরে, এণ্ট্রেন্স পাশ করিলে মুকুন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। মুকুন্দ তাহাকে এল এ পড়াইবার জন্ত কৃষ্ণনগরে পাঠাইল। মুরারী এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া বৃত্তি পায় নাই, কৃষ্ণনগরে রাখিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা গ্রাম্য আড়তদারের গোমস্তা মুকুন্দের পক্ষে সহজ হইল না। মুরারীর খণ্ডর নীলরতন

সাহার যথেষ্ট পয়সা ছিল, কিন্তু সে জামাইকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল না, সে বলিল, “আমার ত আর ঐ একটি মাত্র মেয়ে নয়, আমাকে আরও চারিটি মেয়ে পার করিতে হইবে, জামাইকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য সাহায্য করি, আমার এমন পাণ্য নাই।” — অগত্যা মুকুন্দ পিশিমাকে ধরিয়া পসিল। পিশিমা দশটাকার তিন কেতা নোট বাহির করিয়া বলিল, “এই টাকা দিয়ে মুরারীর কেতাব কিনে দিও, শুনেছি এখন তার অনেক টাকার কেতাব লাগবে। আমি বিধবা মেয়ে মানুষ, তোমার ভাইকে পড়ানোর খরচ কোথায় পাব? আমি আর কিছু দিতে পারবো না।”

পিশিমা এতদিন মুরারীকে বাড়ী রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছে, টাকা কয়টি না লইলে তাহার অপমান করা হয়, বিশেষতঃ মুকুন্দের ছাত্র পক্ষে ত্রিশ টাকা উপেক্ষার বস্তু নহে। সে টাকা কয়টি লইল, কিন্তু ভাতার শিক্ষার গুরুভার সে কিরূপে বহন করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। রাজুর নিকটেও সে সাহায্য চাহিতে পারিল না, ইদানীং রাজুর কাজকর্মও ‘মন্দা’ যাইতেছিল, তথাপি রাজু স্বতঃপ্রস্তুত হইয়া মুরারীর কলেজের বেতন বাহা লাগে তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইল। মুকুন্দ সপরিবারে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া ভাতার শিক্ষার ব্যয় চালাইতে লাগিল। সংসারে বৃদ্ধা মাতা ও দুই ভাইয়ের স্ত্রী। তখন পর্য্যন্ত মুকুন্দ পুত্রমুখ দর্শন করে নাই, তাহার স্ত্রীর সন্তানবতী হইবার বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছিল, স্তত্রাং পরীবাসিনীগণের

ধারণা হইয়াছিল, মুকুন্দের স্ত্রী পদ্মাবতী বক্ষ্যা। নাতির মুখ দেখিবার মুখ অদৃষ্টে নাই বলিয়া পৌদামিনী সর্বদাই আক্ষেপ করিত।

কৃষ্ণনগর সহরে আসিয়া মুরারী হঠাৎ ভয়ঙ্কর স্বদেশপ্রেমিক হইয়া উঠিল। কোথাও সভাসমিতি হইবে—মুরারী তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিত, কোন স্বদেশ-হিতকর কার্যে টাকা তুলিতে হইবে—মুরারী টাদার খাতা হাতে লইয়া সম্ভ্রান্ত নগরবাসিগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিত; অক্টোবর-যোগের সময় নবদ্বীপে বহু যাত্রীর সমাগম হইলে, মুরারী ভলন্টিয়ার দলের কাপ্তেন হইয়া, তীর্থযাত্রিগণের ‘বিবিধ অসুবিধা দূর করার জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কাজ খুব ভাল ও প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে তাহার পড়াশুনার বড় বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। দেশহিত ও জনহিতের উৎসাহে সে ভুলিয়া গেল—তাহার দরিদ্র দাদা সপরিবারে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেছে।

দশে মুরারীর খুব প্রশংসা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কেবল দেশের প্রশংসা সঞ্চয় করিয়া পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না; একজামিন পাশ করিতে হইলে যথারীতি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হয়, এবং নির্ভুল উত্তর লিখিতে হইলে পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করা আবশ্যক। মুরারী সময়ভাবে অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তক খুলিবার ‘ফুরসৎ’ পাইত না। নির্দিষ্ট সময়ে গেজেটে এল এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল, কোনও

বিভাগে মুরারির নাম দেখিতে পাওয়া গেল না। মুরারি বলিল—পরীক্ষকেরা তাহার ‘মেরিট এপ্রিসিয়েট’ করিতে পারে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুচ্ছ ‘এক্সামিন পাশ’ করিবার জন্ত সে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহার জীবনের মহত্তর সার্থকতা আছে।

ভাই এল এ পরীক্ষায় ফেল হইল দেখিয়া গোবিন্দ বড় মর্গাহত হইল, নিজের অদৃষ্টকে দিকার দিতে লাগিল; কিন্তু সে মুহূর্তের জন্ত ভ্রাতাকে অপরাধী করিল না।—রাজু বিরক্ত হইয়া মুরারির কলেজের বেতন দেওয়া বন্ধ করিল; মুকুন্দও আর তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে পারিল না। মুরারি দাদার উপর বড় চটিয়া গেল, এবং মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া ডাকঘরে এপ্রেন্টিস আরম্ভ করিল। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে কুড়ি টাকা বেতনে তাহার চাকরী হইল। মুরারী জগন্নাথপুর ডাকঘরে কেরানীগিরি করিতে গেল; স্বদেশপ্রেম ও জনহিতৈষণার খোলস দূরে পড়িয়া রহিল।—কলেজ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সে নেশা কাটিয়া গিয়াছিল।

ইতিমধ্যে মুকুন্দের পিশি রক্তামাশয় রোগে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। পিশির পীড়ার সংবাদ পাইয়া মুকুন্দ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া কয়েকদিন প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল। সংসারে পিশির জন্ত কোন নিকট আত্মীয় ছিল না, পিশির টাকাকড়ি সমস্তই মুকুন্দের হস্তগত হইল।

দরিদ্রের সম্মান মুকুন্দ এক সঙ্গে আট দশ হাজার টাকা পাইয়া হঠাৎ ‘বে-সামাল’ হইয়া উঠিল। টাকাগুলি ছল বাহির করিয়া

কণ্টকের ছায় তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে অধিকাংশ টাকা খরচ করিয়া পিতৃভিত্তায় এক অট্টালিকা নির্মাণ করিল, কিছু জমিজমা করিল। এবং অবশিষ্ট টাকা দিয়া মুদিখানার দোকান খুলিল।

রাজু মুকুন্দকে তাড়াতাড়ি চাকরী ছাড়িয়া দোকান করিতে প্রথমে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু মুকুন্দের একান্ত আগ্রহ বুঝিয়া শেষে আর আপত্তি করে নাই—তবে গোটাকত উপদেশ দিয়াছিল, ‘হাত চেয়ে যেন আম বড় না হয়, কখন পুঞ্জি ভেঙ্গে খরচ করো না, ইত্যাদি।’ সে সব অতি প্রাচীন উপদেশে মুকুন্দ বড় কাণই দিল না, তবে রাজুর নিকট কোন অবিনয়ও দেখাইল না।

মহা সমারোহে মুকুন্দের ব্যবসায় চলিতে লাগিল। উভয় ভ্রাতার জীর অনেকগুলি সোনার গহনা হইল; এবং যে সকল পল্লীরমণী মুকুন্দ ও মুরারির জীর সহিত পূর্বে গাক্যালাপও করিত না, তাহারা এখন ঘন ঘন তাহাদের বাড়ী আসিয়া আত্মীয়তা করিতে লাগিল। কেহ হইল সেই, কেহ হইল বেগুন ফুল; তা ছাড়া দেখনহাসি, অডিকলোন, গঙ্গাজল প্রভৃতি কুটুম্বিনী সমাজের কোলাহলে মুকুন্দের প্রশস্ত অট্টালিকা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

পুত্রদ্বয়ের দোভাগ্য-স্বর্ঘ্য যখন মধ্যাকাশে দেদীপ্যমান, সেই সময় সাধ্বী সৌদামিনী সজ্জানে গঙ্গালাভ করিলেন। মায়ের শ্রাদ্ধ লইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে কিঞ্চিৎ মনান্তর উপস্থিত হইল, মুকুন্দ বলিল, “মায়ের

শ্রাদ্ধে সাতখানি গ্রামের কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিব ও রাত্ৰ হইতে তিন দল কীর্ত্তন আনাইব ; ব্রহ্মোৎসর্গ ও অন্ততঃপক্ষে দুইটা বোড়শ না করিলে লোকে কি বলিবে, শার আমাদের তৃপ্তিই বা কিসে হইবে, মা-ই আমাদের সর্বস্ব ছিলেন।” মুরারি বলিল, “পরের টাকা কিছু হাতে আসিয়াছে বলিয়া কি এই ভাবে অপব্যয় করা ভাল ? সংক্ষেপে কাজ শেষ কর।’

কিন্তু মুরারির পরামর্শে কাজ হইল না। মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ শেষ হইল।

ইদানীং মুদীখানার দোকান ভাল চলিতেছিল না; অথচ সংসারে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়; মুকুন্দকে বাধ্য হইয়া জমিদার ও শিকদারদের কাছে বাড়ী ও জমি বাঁধা দিয়া হাজার টাকা কর্জ লইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। মুরারি বলিল, “তোমার বিবেচনার ক্রটিতেই দেনা হইল ! তখন অত করে বারণ করেছিলাম, কিছুতেই শুনলে না। এখন আপনিও মজলে, আবার সবাইকে মজাবার জোগাড় করে তুলেছ।

তাহার স্ত্রী পদ্মাবতীকে জানাইল, “দিদি, তোমাদের ত ছেলে পুলে নাই, তোমাদের আর কিসের ভয় বল, ভাণ্ডরের বিবেচনার দোষে আমাদেরই আঙা বাচ্ছা লয়ে পথের ভিখারী হ’তে হচ্ছে !” এ কথাও মুকুন্দের কাণে গেল। সে ভাবিল ঠিক কথাই ত ! তখন মহাজনকে বুঝাইয়া সে বাড়ীর ও জমার (নিজ অংশ) অর্ধেক বাঁধা দিয়া টাকা লইল। অর্ধেক অংশই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া মহাজনও তাহাতে আপত্তি করিল না।

তারপর মুদীখানা সঙ্ক্ষে কি কর্তব্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভায়ের ইচ্ছামত মুকুন্দ একটা ব্যবস্থা করিয়া লইল। দুই নামে দোকান চলিতে লাগিল।

তখন দ্বিগুণ উৎসাহে মুকুন্দ ব্যবসারে মনঃসংযোগ করিল। কিন্তু যখন সাংসারিক অবস্থার অবনতি আরম্ভ হয়, তখন সহস্র চেষ্টাতেও তাহার গতিরোধ হয় না। মুকুন্দের স্ত্রীর যে কয়েকখানি অলঙ্কার ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহাও উত্তমণের দিক্কে উঠিল। তবে মুরারির অংশের টাকা মুকুন্দ কোন রকমে সংগ্রহ করিয়া মুরারিকে দিয়াছিল। তবু কলঙ্ক ও লাঞ্ছনার হাত হইতে এড়াইতে পারে নাই।

৪

মা ষষ্ঠীর খেয়াল কিছু বিচিত্র। অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি মাথা খুঁড়িয়াও তাহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না, পোষ্ট পুত্র লইয়া তাঁহাদিগকে বংশ রক্ষা করিতে হয়; আবার যে দরিদ্র উদরারের সংস্থানে অসমর্থ, তাঁহার কুপাসিদ্ধির প্রাবনে তাহাকে ‘নাকানি চুবানি’ খাইতে হয় ! ছেলে মেয়ের নিবারণ, ক্ষান্ত, আশ্রয় প্রভৃতি নিষেধার্থসূচক নামকরণ করিয়াও হতভাগ্যের নিষ্কৃতি নাই, তাই কবি হুঃখ করিয়া গাহিয়াছেন—

“বিয়ে কল্লৈ পুত্র কন্ডা,

আসে যেন প্রবল বন্ডা,

পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্বশাস্ত !

প্রাণের রাখিতে ‘হোল প্রাণান্ত’ ॥

মুকুন্দ বংশরক্ষায় হতাশ হইয়া যখন হাল ছাড়িয়াছিল, সেই সময় মা ষষ্ঠী

হঠাৎ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বহুতে হাল ধরিলেন; মুকুন্দের দ্বী পঁচিশ বৎসর বয়সে এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল। তাহার পর বৎসর ঘুরিতে না মুরিতেই মা বধী হয় একটি পুত্র না হয় একটি কণ্ঠারত্ন তাহার উপহার দিতে লাগিলেন। মুরারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র তখন বেশ বড় সড় হইয়া জনার্দনপুরের স্কুলে লেখা-পড়া আরম্ভ করিয়াছিল।

সাংসারিক অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতে লাগিল, মুকুন্দ বাধ্য হইয়া দোকান উঠাইয়া দিল, নিজে একবেলা না খাইলেও চলে, কিন্তু দুধ ভিন্ন ছেলে মেয়েদের একবেলা চলিবার উপায় নাই। গয়লার নিকট দুধ কিনিতে অনেক পয়সা লাগে, সুতরাং মুকুন্দ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দুইটি হুগুবতী গাভী কিনিল। অর্থকষ্টে বাধ্য হইয়া মুকুন্দ দাসদাসীদের বিদায় দিয়াছিল, অগত্যা সে স্বহস্তে গরুর বিচালী কাটয়া জাব মাখিয়া দিত, এবং তৈজসপত্রগুলি বিক্রয় করিয়া কষ্টে সংসার চালাইত। নানা দুশ্চিন্তায় অকালে তাহার চুল পাকিয়া গেল, এবং প্রোট হইবার পূর্বেই জরা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।

এদিকে মুরারি কয়েক বৎসরের মধ্যেই বেশ গুছাইয়া লইল। সে বিশ টাকা বেতনে ডাকঘরের চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার বেতন পঞ্চাশ টাকা হইল; একটি সব পোষ্ট অফিসে সে পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত হইল।

মুরারি রূপণ ছিল, রূপণেরা প্রায়ই সঞ্চয়ী হয়। ডাকঘরের চাকরী করায়

তাহাকে দাস দাসী রাখিতে হয় নাই, ডাকঘরের হরকরা ও পিয়নেরাই তাহার গৃহস্থালীর সকল কাজ করিয়া দিত, বাসা ভাড়া লাগি না; নিকট বিক্রয় করিয়া সে যে কমিশন পাইত, তাহাতেই কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলিত, বেতনের টাকাগুলি হুদে খাটিত। এই ভাবে কিছুদিনের মধ্যেই মুরারি অনেক টাকা জমাইয়া ফেলিল।

ডাকঘরের চাকরীতে প্রায়ই ছুটি পাওয়া যায় না। সুতরাং মুরারি সপরিবারেই কর্মস্থলে থাকিত। তথাপি সে মধ্যে মধ্যে দাদার তত্ত্বতল্লাস লইত, এবং পূজার সময় বৎসরান্তে সপরিবারে একবার বাড়ী যাইত। যতদিন তাহার দাদার সন্তানাদি হয় নাই, ততদিন সে দাদার অন্তঃগত হইয়া চলিয়াছিল, দাদাকে মৌখিক সম্মানও করিত। সে বুঝিয়াছিল দাদার যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই তাহার বা তাহার পুত্রের। সুতরাং দাদার অবাধ্য হইয়া তাহার মনে কষ্ট দেওয়া সে সঙ্গত মনে করিত না।

কিন্তু মা বধী যেদিন হইতে মুকুন্দের স্নেহে ভর করিলেন, সেই দিন হইতেই মুরারির মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। সে বুঝিল, এতদিনে সরিকের সংসার হইল। তাই মুকুন্দ যখন অর্থকষ্টে পড়িয়া তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন মুরারি দাদাকে অর্থের পরিবর্তে অঘাচিত হিতোপদেশ প্রদানে কুণ্ঠিত হইল না, সে মুকুন্দকে লিখিল, “আপনি কোনও দিন বুঝিয়া চলিতে শেখেন নাই, আপনার হাতে যথেষ্ট পয়সা ছিল, কিন্তু আপনি তাহা দুই হাতে উড়াইয়া দিয়াছেন, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়

করিয়া সর্বস্ব লুটাইয়াছেন, তখন আমি আপনাকে সাবধান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার কথা আপনি গ্রাহ করেন নাই, পিশিয়ার এতগুলি টাকা আপনি কি করিয়া নষ্ট করিলেন, সে কথা আমি কোনদিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, আমি কোনও দিন আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি নাই, সামান্য বেতনের চাকরী করিয়া কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিতেছি। স্বীকার করি আপনি যে বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার অর্দ্ধাংশ আমার, এবং আপনি আমার স্ত্রীকে দুই একখানি অলঙ্কারও দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা আপনার স্বোপার্জিত অর্থ নহে, পিশিয়ার টাকাতেই তাহা হইয়াছে; সেই অর্থে আপনার ও আমার সমান অধিকার ছিল; আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবশতঃই আমি কোনদিন সে টাকার অংশ চাহি নাই। বুদ্ধির দ্বায়ে সর্বস্ব উড়াইয়া এখন আপনি অর্ধকষ্টে আমার নিকট সাহায্য চাহিয়াছেন, সাধ্য হইলে আমি আপনাকে কিছু পাঠাইতাম, কিন্তু তাহা আমার সাধ্যাতীত। মানুষ মাত্রেই স্ব স্ব কর্মের ফলভোগ করে, আপনি স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করিতেছেন, আমি কিরূপে তাহার প্রতিবিধান করি?”

হায়, মুকুন্দ যে এই ভাইকেই বাল্যকাল হইতে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালিত করিয়াছে, সপরিবারে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে! ইহাকেই বলে—

“যখন তোমার কেউ ছিল না,

তখন ছিলাম আমি,

এখন তোমার সব হয়েছে,

পরু হয়েছি আমি।”

কিন্তু মুকুন্দের মনে এত কথা আসে নাই, ভাইয়ের সাধ্য নাই, তা সে কি করিবে! কিন্তু মুরারি চিঠি খানি এ ভাবে লিখিল কেন? আর একটু শ্রম করিয়াও লিখিতে পারিত! সহসা তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, দুই চারি ফোঁটা স্থানচ্যুত হইয়াও পড়িল!

পিতার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মুকুন্দের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র গোপাল তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অর্ধক্ষুণ্ট কোমলস্বরে বলিল, “বাবা তুই কাঁদতিত কেন? তোল কি হয়েছে?”—কাঁদ কাঁদ হইয়া তাড়াতাড়ি সে কচি কচি হাতে বাপের চোখের জল মুছাইয়া দিল। মুকুন্দ বেদনাবদ্ধ ব্যথিত বক্ষে পুত্রকে চাপিয়া ধরিল, জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাস অশ্রুরূপে বিগলিত হইয়া আবার তাহার উভয় গণ্ড প্রাবিত করিল, সে পুত্রের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না।

৫

কয়েক মাস পরে মুকুন্দের উত্তমর্গ পঞ্চানন শিকদার প্রাপ্য টাকার জন্ম পীড়া-পীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু অর্থাভাবে তাহার সংসার প্রতিপালন করা কঠিন, সে সুদসহ সহস্রাধিক টাকার ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিবে?—শেষে পঞ্চানন শিকদার বাধা হইয়া জেলার সবজজ আদালতে গোবিন্দের নামে নানিশ রুজু করিল। বন্ধকী সম্পত্তি লইয়া মথিলা, মুকুন্দ বুঝিল, মামলা চালাইয়া কোনও লাভ নাই; নিমজ্জনোন্মুখ ব্যক্তি যেমন সম্মুখস্থিত

তৃণ ধরিয়া উদ্ধার লাভের আশা করে মুকুন্দ সেইরূপ কিস্তীবন্দী করিয়া এই মহাদায় হইতে উদ্ধার-লাভের চেষ্টা করিল। কিন্তু কিস্তীতে কিস্তীতে টাকা দিতে না পারলে কিস্তীবন্দী করিয়া ফল কি? প্রথম কিস্তীতেই সে কিস্তী খেলাপ করিল। আদালত হুকুম দিলেন, মুকুন্দের সম্পত্তি নিলাম করিয়া উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ হইবে।

বাসগৃহের অর্দ্ধাংশ ভিন্ন মুকুন্দের অণ্ড কোন সম্পত্তি ছিল না, সূতরাং তাহাই নিলাম হইয়া গেল! মুরারির ঋণ্ডের নামে সে অংশ খরিদ হইল।

কয়েক দিন পরে নিলাম খরিদারের উকীল মুকুন্দকে বাড়ী হইতে উঠিয়া যাইবার জন্ত এক 'হুটিশ' দিলেন। মুকুন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সঙ্গে লইয়া পৈত্রিক বাসভিটা পরিত্যাগ করিল।—হুই ক্রোশ দূরে সনাতনপুরে মুকুন্দের

ঋণ্ডবাড়ী; মুকুন্দের স্ত্রী ভিন্ন তাহার ঋণ্ডের অণ্ড পুত্র কন্যা ছিল না। মুকুন্দ সপরিবারে তাহার একমাত্র অবলম্বন গরু দুটি লইয়া ঋণ্ডালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মুকুন্দ এখন ঋণ্ডালয়েই সপরিবারে বাস করিতেছে। সে সনাতনপুরে কয়েক জন দোকানদারের দোকানে ঠিকিা মুহুরীর কাজ করে, এবং অবসর কালে গোরুর বিচালি কাটে ও জাব মাখে। আর, বৎসরের ভিতর অন্ততঃ একবারও মুরারীকে দেখিয়া আসে, ঘরের একটু ঘি, চাষের কিছু আলু, গোটা কত নারিকেলের নাড়ু ভাইয়ের জন্ত বহিয়া লইয়া যায়, তবে পরিমাণ বড় অল্প, তা হ'লে কি হয় মুরারি যে এ সব বড় ভাল বাসে! মুরারির স্ত্রী জিনিষের 'ছিরি' দেখিয়া ঠোট ফুলাইয়া তাম্বিলের হাসি হাসে, আর স্বামীর প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখে। পাছে তার মন নরম হয়, সর্বনাশ, তা হইলে কি আর রক্ষা আছে?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

নমোহস্ত তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে!

দুষ্কারবিন্দায়ত পত্নেন্দ্র।

যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ

প্রজালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥

হে বেদব্যাস! আপনাকে প্রণাম করি। আপনার বুদ্ধি বিশাল। আপনার নেত্র পদ্মপত্রের ঠায় বিস্তৃত। আপনিই মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ। জ্ঞানময় প্রদীপ জালিয়াছেন।

মুখবন্ধ

সত্যসত্যই মহাভারত ভারতের জ্ঞানময় অপূর্ণ প্রদীপ। ভারতের গৌরবরবি অন্তর্মিত। গাঢ় মোহনিশা সমাগতা। এই ঘন অজ্ঞানতিমিরে মহাভারত এখনও উজ্জল জ্ঞানপ্রদীপরূপে ভারতের অতীত গৌরব প্রকাশ করিতেছে। কি কবিত্বে, কি দার্শনিকতায়, কি ভূগোলরূপে, কি ধর্ম-সংহিতাভাবে, কি ইতিহাসাংশে মহাভারত

অতুলনীয়। মহাভারত কবিদের অমৃত-প্রস্রবণ, দর্শনের গভীর খনি, প্রাচীন পৃথিবীর অদ্ভুত ভূগোল, আর্য্যসমাজের অত্যাশ্চর্য চিত্র, পৌরাণিকী গাথার অক্ষয় ভাণ্ডার, ধর্মের অগাধ রত্নাকর, ও ভারতের বিচিত্র ইতিহাস। এই জগুই মহাভারত পঞ্চমবেদ বলিয়া বিখ্যাত। এই জগুই প্রবাদ যে, পিতামহ ব্রহ্মা যখন একদিকে বেদবেদাঙ্গাদি ও অপরদিকে মহাভারত রাখিয়া তৌল করেন, তখন মহাভারতের ভার অধিক হইয়াছিল। মহাভারত যে একাধারে আর্য্যজাতির মহান্ কাব্য, গভীর দর্শন, ও অদ্ভুত পুরাণ ইহা সর্ববাদিসম্মত।

মহাভারতে ঐতিহাসিকতায় সংশয়

আস্থাবান্ নিরক্ষর বা সাক্ষর হিন্দুগণ সকলেই মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও কতক পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত এদেশবাসী মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এতদূর পর্য্যন্ত বলেন যে, প্রাচীন ভারত ইতিহাস বুঝিত না, তাই প্রাচীন ভারতে ইতিহাস নাই, কেবল লৌকিকা-লৌকিক অসম্ভব ঘটনাবলির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অগ্রে আমাদের পূর্বপিতামহগণ ইতিহাস শব্দের বার্থ-মর্ম অবগত ছিলেন কি না দেখা আবশ্যক

প্রাচীন ভারতে ইতিহাস-জ্ঞান

প্রাচীনভারতে যে ইতিহাসের মর্ম পরিচিত ছিল তাহা পুরাণ, আখ্যান, কথা,

আখ্যায়িকা, ইতিহাস প্রভৃতি শব্দ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান। পুরাণ পঞ্চলক্ষণাবিত—
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মনন্তরাগিচ।

বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

সর্গ অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও তত্ত্বময় হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি, বিসর্গ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হইতে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের সৃষ্টি; বংশ অর্থাৎ প্রজাপতিগণ কর্তৃক দেববক্ষরক্ষোমনুষ্যতিথ্যগাদির সৃষ্টি, মনন্তর অর্থাৎ বৈবস্বতমনু প্রভৃতি চতুর্দশ মনুর অধিকার, এবং বংশানুচরিত অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ, এই পঞ্চবিধ বিষয় যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই পুরাণ। এ মতে পুরাণ গবেষণা এবং অলৌকিক ও লৌকিকা-লৌকিক ও নৌকিক ব্যাপারের সন্নিবেশ থাকে। পুরাণের অলৌকিক বিবরণকে mythology ও লৌকিকালৌকিক বিবরণকে legend বলা যাইতে পারে। আখ্যান শব্দে কাল্পনিক বা সত্য বা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। সেই আখ্যানকে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ পঞ্চবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অগ্নিপু্রাণে আছে—

‘আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।

কথালিঙ্গেন্দি মন্ত্তে গদ্যকাব্যঞ্চ পঞ্চধা ॥

আখ্যায়িকা, কথা, খণ্ডকথা, পরিকথা ও কথালিকা এই পঞ্চভাগে গদ্যকাব্য বিভক্ত। আখ্যায়িকা শব্দে সত্যমূলক ইতিবৃত্ত, কথা শব্দে কাল্পনিক রচনা বুঝায়। অমরকোষে “আখ্যায়িকোপলক্ষার্থা,” “প্রবন্ধকল্পনা কথা” এইরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। আলঙ্কারিকগণের হস্তে আখ্যায়িকা ও কথা শব্দের অর্থ ক্রমে সঙ্গীর্ণ হইয়া পড়ে।

গদ্যে লিখিত নায়কমুখে বিরূত উপাখ্যানের নাম আখ্যায়িকা এবং গদ্যে লিখিত নায়ক-মুখে বা অপরের মুখে বিরূত উপাখ্যানের নাম কণা হয়। আচার্য্য দণ্ডী ঐরূপ লক্ষণে আপত্তি করিয়া আখ্যায়িকা ও কথ্য ও খণ্ডকথ্য ভূতি সমস্ত আখ্যানকেই এক জাতীয় গদ্যময় গল্প বলিয়াছিলেন। তৎপরবর্তী আলঙ্কারিকগণ আখ্যায়িকা ও কথার প্ৰভেদ দেখাইয়া বলেন সত্যমূলক বিনয়নী আখ্যায়িকা ও কাল্পনিক বিবরণী কথ্য। সেই জন্ত তাঁহারা বাণভট্টের হর্ষচরিতকে আখ্যায়িকা ও কাদম্বরীকে কণা বলিয়া বর্ণনা করেন।

ইতিহাসের লক্ষণ

ইতিহাস শব্দটী ইতিহ শব্দের উত্তর আস্‌বাহু অধিকরণ বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিপন্ন। ইতিহ শব্দে পূর্ববৃত্তান্ত বুঝায়। ইতিহ হইতেই ঐতিহ্য শব্দ আসিয়াছে। ঐতিহ্যের অর্থ প্রবাদ। ইতিহাস শব্দের যৌগিক অর্থ—যাহাতে ইতিহ বা পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সূত্রাং অমরকোষের বচন “ইতিহাসঃ পূর্ববৃত্তম্”। ঐ যৌগিক অর্থ ক্রমে প্রসারিত হয়। প্রসারণও গুক্তিযুক্ত। নীরস প্রাচীন ঘটনার ইতিবৃত্ত ইতিহাস হইলে ইতিহাসের গৌরব থাকে না। ঐরূপ ইতিবৃত্তকে ইংরাজিতে history অর্থাৎ ইতিহাস না বলিয়া annals (বার্ষিক ঘটনার বিবরণী) বা chronicles অর্থাৎ প্রাচীন ঘটনাবিভাস বলা হয়। ইতিহাস বিদ্যার প্রস্থান-ভেদ। ইতিহাস-রচনা শিল্পবিশেষ। কেবল প্রাচীন বৃত্তান্ত সরসভাবে লিখিয়া রচনা চাতুরী

দেখাইলেই ইতিহাস-লেখকের ইতিকর্তব্যতা সম্পন্ন হইল না। যখন মানবসমাজকে উন্নতিপথে লইয়া যাওয়া সমস্ত বিদ্যারই উদ্দেশ্য, তখন ইতিহাসেরও সেই উদ্দেশ্য থাক্য উচিত। সেই জন্ত ইতিহাসের এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে যে—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসম্বিতম্।

• পুরাবৃত্তং কথায়ুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ সাধিত হয় এমন উপদেশকথা সহ প্রাচীনকালে ঘটিত বৃত্তান্তের বিবরণ ইতিহাস।

ইংরাজী History শব্দের অর্থ

ইংরাজী History শব্দের অর্থও ঐরূপ।

উহার ধাতুজ্ঞ অর্থ জ্ঞান, সংবাদ, অনুসন্ধান। ইহার ষড়বিধ যোগরূঢ় অর্থ যাহা কোষকার Webster দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

১য়। কোন সত্য বা কাল্পনিক ব্যক্তি বা বিষয়সংক্রান্ত সম্বন্ধঘটনাবলির বিবরণ।

২য়। কোন জাতির বা সম্ভের বা বিদ্যার বা শিল্পের উত্থান বিকাশ পতন ইত্যাদির কারণানুসন্ধানমূলক ঘটনাবলির বিবরণ।

৩য়। ঘটনাবলির বিবরণদ্বারা মনুষ্য-চরিত্রের আলোচনা।

৪র্থ। ইতিহাসের বিষয়ীভূত ঘটনা।

৫য়। ঐতিহাসিক নাটকাদি।

৬ষ্ঠ। ঐতিহাসিক বিষয়ের চিত্র।

ইংরাজী ইতিহাস শব্দের অর্থ কত বিস্তৃত দেখুন যে, ঐতিহাসিক নাটকাদি যাহাকে সংস্কৃতে ইতিহাসবাদ ও ঐতিহাসিক বিষয়ের

চিত্র-বাহাকে ইতিহাসনিবন্ধন বলে তাহাও ইংরাজী ইতিহাস শব্দের বাচ্য। কালনিক চরিত্রের ঘটনাবলীর বিবরণও ইতিহাস। তাই Thacker এর উপন্যাস Pendenisকে History of Pendenis অর্থাৎ পেণ্ডেনিসের ইতিহাস বলা যায়। সত্য ঘটনার বিবরণ ইতিহাসের অভিধেয় বটে। কিন্তু ঘটনাবর্ণনাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। সেই ঘটনাবলী দ্বারা মনুষ্যজীবনের ক্রম-বিকাশ-প্রদর্শনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং অম্মদেশে এবং পাশ্চাত্যদেশে ইতিহাসের একই উদ্দেশ্য, ইতিহাস-রচনায় কল্পনার লীলা। উভয় দেশের ইতিহাস যে সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্ত কল্পনাদেবীর সাহায্য লন তাহা ঐ উদ্দেশ্য হইতেই বুঝা যাইতেছে। সংস্কৃত ইতিহাস-কারক পূর্ব রূপান্তর অবলম্বন করিয়া জন-সমাজকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। পাশ্চাত্য ইতিহাসলেখক পূর্ব রূপান্তর অবলম্বনে কিরূপে কোন জাতির অভ্যুদয় হইল কেনই বা তাহার পতন হইল এবং সেই সেই অভ্যুদয় ও পতন হইতে কি নীতি পাওয়া যায় ইহা শিক্ষা দেন। ঐ নীতি নিক্ষেপে এবং অভ্যুদয়াদির কারণ অনুসন্ধান কল্পনার লীলা অনিবার্জ। লেখকের যেরূপ প্ররক্তি তদনুযায়ী তিনি কারণ দেন। ইংলণ্ডের প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লব অর্থাৎ প্রথম চার্লসের সহিত প্রজাপুঞ্জের সমর-সংক্রান্ত ইতিহাস পাঠ করিলেই উহা বুঝিতে পারা যায়। কেহ কেহ প্রথম চার্লসকে নৃশংস ভীষণ অত্যাচারী রাক্ষস প্রকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। কেহ বা তাহার দোষকালনে

যত্নবান হইয়াছেন। এইরূপ দ্বিতীয় জেমস-এর সহিত বিগ্রহ লইয়াও মতভেদ। যেখানে মত দিবার অধিকার সেইখানেই মতভেদ অবশ্যজ্ঞাবী। “ভিন্নরূচির্হিলোকঃ” কালিদাসের কথা প্রবণতা। ঘটনাবর্ণনেও ইতিহাসকার কল্পনাদেবীর আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন না। একটি যুদ্ধবর্ণনা করিতে হইবে। ইতিহাসের উপজীব্য প্রাচীন প্রাদে কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিল, কোন্ পক্ষের কত সৈন্য ছিল, কোন্ পক্ষের কোন্ বীর কিরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু ইতিহাসলেখক বর্ণনা সরস করিবার জন্ত তাহাতে রঙ দিতে বাধ্য হন। সেই জন্তই একই যুদ্ধের বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে মোটের উপর সদৃশ হইলেও একরূপ নহে। যে লেখকের যত কবিত্ব সেই লেখকের বর্ণনা তত উজ্জ্বল। Macaulay-র ইতিহাসে এতই কল্পনার ছটা যে সেনাপতি Wolsey বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ধর্মপুস্তকের মধ্যে Bible, কাবীর মধ্যে Shakespeare ও Homer-এর গ্রন্থ, এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে Macaulay's History of England লইয়া যান।

মূলে সত্য থাকিলে ঐতিহাসিকতা নষ্ট হয় না।

ইতিহাসের লক্ষণ ও ইতিহাসলেখার প্রণালী পর্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, যদি মূলে সত্য থাকে তাহা হইলে ঐতিহাসিকতা নষ্ট হয় না। প্রাচীনকালে একই ব্যক্তি কবি, দার্শনিক ও ইতিহাসকার হইতেন। সুতরাং ইতিহাসে কবিত্বের ছটা ও দর্শনের ঘট দেখিতে পাওয়া যায়। একালে কবি, দার্শনিকও

ইতিহাসকার ভিন্ন ভিন্ন, অতএব কাব্য, ইতিহাস ও দর্শন পৃথক পৃথক। তথাপি ইতিহাস দার্শনিকতা বা কবিত্বের ছায়া একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যতদিন ইতিহাসকার স্বীয় গবেষণার পরিচয় দিবেন, ততদিন ইতিহাসে দার্শনিকতা থাকিবে। কল্লনার লীলা ইতিহাসে কখনই যাইবে না। Hallamএর Constitutional History সমালোচনা করিতে গিয়া Macaulay বলিয়াছেন যে, কবিত্ব ও দার্শনিকতা এই উভয় বিরুদ্ধ ভাব যখন অবিরুদ্ধভাবে মিলিত হইয়া সত্যকে উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবে, তখনই আদর্শ ইতিহাস দেখিতে পাইব। তিনি চুঃখ করিয়াছেন যে, ঐ দুই বিরুদ্ধভাবের অবিরুদ্ধ সম্মিলন জগতে নাই। আমাদের ধারণা ঐ মিলন অনেকটা মহাভারতে আছে। এ জন্ত মহাভারত ইতিহাসমূলক দার্শনিক কাব্য এবং দার্শনিক-কাব্যমূলক ইতিহাস।

ঐতিহাসিক সত্যতার নির্ণয়োগায়

সংস্কৃতশাস্ত্রমতে প্রমাণ অষ্টপকার।
নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন বাদীর ভিন্ন ভিন্ন মত সুন্দররূপে সংগৃহীত।
প্রত্যক্ষমেক চাক্ষাকাঃ কণাদমুগতো পুনঃ।
অমুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্খ্যাঃ শব্দকং তে অপি।
অষ্টৈকদেশিনোহপ্যেবমুমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্য। সতৈঃ গনি চার্য্যাহঃ প্রভাকরাঃ ॥
অভাবব্যাচ্যোভ্যনি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যমুক্তান তানি পৌরাণিকা জ্ঞাণ্ডঃ ॥
চাক্ষাকমতাবলদ্বারা একমাত্র প্রত্যক্ষকে, বৈশেষিক ও বৌদ্ধবাদীরা প্রত্যক্ষ ও অমু-

মানকে, সাঙ্খ্যবাদিগণ সেই দুইটি ও শব্দকে, একদল নৈয়ায়িক ঐরূপ ঐ তিনটিকে, আর একদল উপরাস্ত উপমানকে; পূর্বমীমাংসকগণ অর্থাপত্তির সহিত সেই চারিটিকে, ভট্টমতামুসারীরা ও বেদান্তীরা ঐ পাঁচটি ও অভাবকে এবং পৌরাণিকগণ সম্ভব ও ঐতিহ্য লইয়া সেই সকলগুলিকে প্রমাণ বলেন।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবন্ধ-বশতঃ যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। ইহা গর্ভজনবিদিত। এক প্রত্যক্ষকেই চাক্ষাকগণ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। কোন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সন্নিবন্ধ না হইলেও আমরা অপর প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বারা সেই অপ্রত্যক্ষবিষয়ের জ্ঞানে উপনীত হই বলিয়া মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে অমুমানকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এ বিষয়ে তাহার মতামুসরণ করিয়া প্রত্যক্ষ ও অমুমান এই দুইটি প্রমাণ বলেন। সাঙ্খ্যকার ইহার উপর আপ্তবাক্য অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিসাশূন্য বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের বচনকেও প্রমাণ বলেন। বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে ইহা অমুমানের অন্তর্ভুক্ত। একদল নৈয়ায়িক বলেন যে সদৃশবস্তুদর্শনে সদৃশবস্তুর জ্ঞান আপনা-আপনি আসে সুতরাং উপমানও প্রমাণ। আর একদল বলেন যে তাহাও অবোধ-পূর্ব অমুমান। দুইটি বিরুদ্ধ বিষয় দেখিয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জনের জন্ত যে তৃতীয় অদৃষ্টবিষয়ের জ্ঞান, তাহাকে অর্থাপত্তি বলে। পূর্বমীমাংসকগণ ইহার এই প্রচলিত দৃষ্টান্ত দেন—“পীনো দেবদত্তো

দিবা ন ভুঙ্ক্তে অতঃ রাত্রৌ ভুঙ্ক্তে”
(দেবদত্ত দিবসে খায় না অথচ স্তল, স্নতরাং
রাত্রে খায়)। পীনহ ও দিবসে অনাহার
বিরুদ্ধ, তাহাদের বিরোধ-ভঙ্গনের জন্য রাত্রি-
ভোজন স্বাকার্য্য। নৈয়ায়িকাদির মতে এরূপ
দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টজ্ঞান অসম্ভব। পূর্ব-
মীমাংসকগণের মধ্যে যাঁহারা কুমারিলভট্টের
মতাবলম্বী তাঁহারা আবার ঘটাতাব হইতে
ঘট্টের জ্ঞানকে অভাবনামক পৃথক্ প্রমাণ
দ্বারা সিদ্ধ বলেনঃ পৌরাণিকগণের এই
ছয়টি প্রমাণেও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। তাঁহারা
অগত্যা ঐতিহ্য বা প্রবাদ এবং সম্ভব অর্থাৎ
ইহা হইতে পারে ইহাকেও প্রমাণ বলিয়া
মানেন। ঐতিহ্য ও সম্ভব না মানিলে
ঐতিহাসিক সত্যের অস্তিত্বলোপ হয়।
প্রাচীনব্যাপার আমরা দেখি নাই।
তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে
হইলে সেই সমসাময়িক ব্যক্তির
কথা বিশ্বাস না করিলে চলে না।
আবার বহুপ্রাচীন বিষয়ে সমসাময়িক
ব্যক্তিরও অভাব। তথায় যাহা করেন
ধারাবাহিক জনশ্রুতি। এই জন্য আমাদের
শাস্ত্রে বলে “ন হ্যমূল্য জনশ্রুতিঃ” (শ্রুতি
বা প্রবাদ অমূল্য নহে)। দুঃখের
বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচ্য ইতিহাসের
সত্যতা নিরাকরণে প্রবাদকে একেবারে
ফেলিয়া দেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান
যে যদি তাঁহাদের পুরাতত্ত্বের সত্যতা
স্থির করিতে তাঁহাদের প্রবাদ যাহা
chronicles ও annalsএ রক্ষিত তাহা
ত্যাগ করা যায়, তাহা হইল সেই পুরাতত্ত্বের
সত্যতা ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

মহাভারতে ইতিহাসের গোণ লক্ষণ

মহাভারতে সংস্কৃতমতে ইতিহাসের গোণ-
লক্ষণ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষসংক্রান্ত উপদেশাবলী
সাবিত্রী-সত্যবান্ প্রভৃতি উপাখ্যানের,
বৃত্তবাসবাদি পৌরাণিকসংবাদে, গৃহগোমায়ু-
সংবাদাদি কথায়, সনৎসুজাতীয়ভগবদ্গীতা
অনুগীতা মোক্ষধর্ম্মাদি দার্শনিকভাগে এমন
কি প্রতি ছত্রে ছত্রে আছে। তর্কচ্ছলে
মহাভারতের চরিত্রগুলি কাল্পনিক ধরিলেও
মহাভারতে বর্ণিত সমাজ কাল্পনিক না
হইলে ইংরাজিতেও ইতিহাসের গোণ
লক্ষণ মহাভারতে আছে বলিতে হইবে।
সুতরাং জিজ্ঞাস্য—

মহাভারতের সমাজ কাল্পনিক কি সত্য?

ঐ সমাজ পর্যালোচনা করিলে উহা
কবির স্বকপোল কল্পিত বলিয়া বোধ
হয় না। কল্পিত হইলে উহা সত্য কালের বা
ত্রেতার সমাজের জায় ধর্ম্মময় ও সর্বানন্দময়
হইত। ব্যাসদেব যে নিজকালের বিপর্য্যস্ত
সমাজ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা গ্রন্থে
সুপ্রকাশ। ইতিহাসের মুখবন্ধেই আদি
বংশাবতারণপর্বাধ্যায়ে তিনি অগ্রে সত্য-
যুগের চিত্র দিয়া পরে তাহা কেন ঘাপরের
শেষভাগে পরিবর্তিত হয় উল্লেখ করিয়াছেন।
সত্যযুগের শেষভাগে ক্ষত্রিয়গণ দুর্ব্বৃত্ত
হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপর অত্যাচার
আরম্ভ করিলে, এমন কি নিরীহ তপোব্রত
মহর্ষি জমদগ্নিকে হৈহয়গণ বিনাশ্রমে
হত্যা করিলে, জামদগ্ন্য রাম ক্ষত্রিয়দমনে
বদ্ধপরিকর হন। তিনি একবিংশতিবার
পৃথিবীকে নিক্ষেপ্ত করিয়া ক্ষত্রিয়শোণিতে
সমস্তপঞ্চ হ্রদ সৃষ্টি করতঃ পিতৃ-

গণের তর্পণ করেন। পিতৃগণ তখন তাঁহাকে দর্শন দিয়া ক্ষত্রিয়কুলের ঐতি কোপ সম্বরণ করিতে বলিলে তিনি শাস্ত হন। এই উপাখ্যানের সত্যতায় সন্দেহ করিলেও ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ক্ষত্রিয়রাজত্বগণ পুরাকালে ঘোর অত্যাচারী হন এবং জামদগ্ন্যসদৃশ শত্রুকুল ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধন করেন। পরে ক্ষত্রিয়গণ উচ্ছিন্ন হইলে ক্ষত্রিয়নারীরা সন্তানার্থিনী হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট আসেন। শংসিতব্রত বিপ্রগণ তখন ক্ষত্রিয়গণনাতে পুনরায় ধার্মিক ক্ষত্রিয়কুল সৃষ্টি করেন। সেই নূতন ক্ষত্রিয়গণ প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশের তায় স্বধর্মনিরত হইয়া ধর্মতঃ পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। আবার ধর্মশ্রোতঃ প্রবর্তিত হইল। তপোবনে বেদধ্বনি উঠিল। ক্ষত্রিয়দিগের ভূরিদাক্ষণ্য যোগের যুগটি হইল গঙ্গা। যমুনা সরস্বতী নন্দী কাবেয়ী গোদাবরার উপকূল পুনরায় চিহ্নিত হইল। বৈশ্বগণ কৃষিবাণিজ্যাদির ত্রীভুজ করিলেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যা বিক্রয় করেন না। ক্ষত্রিয়গণ অত্যাচারী নহেন। বৈশ্ব দুঃখল বৃষ হলে যোতেন না, বৎসতরীকে মারিয়া দুঃখ দোহন করেন না। বাণকুণ্ড কূটমানে গ্রাহকগণকে প্রবঞ্চনা করেন না। গর্জজ্ঞ কালবর্ষা। ধরা শস্যশ্রামলা। ঋতু-গণ যথাকালে প্রবর্তিত। তরুরাজি ফলভরে অবনত। নিখিল সমাজ সমৃদ্ধিত। এইরূপে সত্য ত্রেতা কাটিয়া গেল। স্বাপরও শেষ হয় হয় হইল। ধরার অদৃষ্টে এ সুখ সহিল না। অম্বরগণের দৃষ্টি মর্ত্যধামে পড়িল। দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া

অম্বরগণ পৃথিবীতে মৃত্যু এমন কি গোমাহাদি পশু মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে দৈত্যদানবগণে বশুন্ধরা পারিপূর্ণা হইলেন। ধরাধামে অবতারণ অম্বরকুল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব শূদ্রদিগকে ঐপীড়িত করিতে লাগিল। মহাধগণও তাহাদের দ্বারা ধর্মিত হইলেন। ধরা অম্বরভার সহিতে পারেন না। গোরুপ-ধারিণী হইয়া তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ পিতামহের নিকট দুঃখ জানাইলেন। পিতামহ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া ভূভার-হরণের জ্ঞাত দেবগণকে নিয়োজিত করিলেন। ইন্দ্রাদিদেবগণ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ মর্ত্যধামে আসিতে স্বীকার করিলেন। তাঁহার অনন্ত করুণা। সত্যসত্যই যখন ধর্মের রানি ও অধর্মের অভ্যাস হয় তখনই তিনি সাধুগণের পরিত্রাণ ও ধর্মসংস্থাপনের জ্ঞাত অবতারণ হন। ভগবান্ সদলবলে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই বংশাবতরনিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে স্বাপরের শেষভাগে আর্য্যসমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষত্রিয় নৃপতিই দুর্বৃত্ত ও অধার্মিক হইয়া পড়ে। ধার্মিক অতএব দেবান্শসম্ভূত জন কতক ঐ সমাজের রক্ষার জ্ঞাত ব্রতী হন এবং সেই সর্বনিয়ন্তার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ধার্মিকগণই অধার্মিকের জয়ে সমর্থ হন। দুর্ঘোষন দুঃশাসন প্রভৃতি যেরূপ কুর, দ্রাব্যপদ, অধার্মিক তাহাতে তাহার। যথার্থই বলির অংশ এবং যুধিষ্ঠিরাদি যেরূপ ধর্মপরায়ণ, সহিষ্ণু ও স্বার্থত্যাগী তাহাতে তাঁহার। ধর্মীদি

দেবগণের অংশজাত বটে। শ্রীকৃষ্ণ যেক্ষণ অলৌকিক শক্তির আধার, তাহাতে তিনিই সেই ধর্মসংস্থাপক ভগবান—নারায়ণের অবতার। ইহার কবির কল্পনা-প্রসূত হইলেও কবি যে ঐ সমস্ত চরিত্রযুগ্মে নিজসময়ের পাপময় অথচ পুণ্যবীজযুক্ত সমাজের উল্লেখ করিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই সময় জ্ঞুরতে যে ক্ষত্রিয় রাজার সংখ্যা অনেক ও তাঁহাদের যে প্রত্যেকরই সৈন্য বহুল ছিল তাহাতেও সংশয় নাই। সত্যসত্যই নিখিল ভারতের সৈন্যপদভরে ধরা প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। বর্তমান ইউরোপ রাজ্যের অবস্থা যদি কোন কবি ইতিহাসমূলক কাব্যে লেখেন তাহা হইলে তিনিও ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, জার্মান, ইটালি, রুশিয়ার সেনা, রণতরী ও অস্ত্রশস্ত্র বর্ণনা করিতে নিশ্চয়ই বলবেন যে উহাদের পদভরে মেদিনা কম্পাশিত। যদি আবার ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ সার্থাক হইয়া ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত হন এবং পৃথিবীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন তাহা হইলে ধর্মের ইতিহাসকার না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না যে, অগ্রগণ্য উহাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অচিরে উহাদিগকে দমন করিবার জন্য সর্বনিয়ন্তা আবিভূত হইবেন। সুতরাং বেদব্যাসকে ব্রহ্মপ্রমাদ-শূন্য সর্ববেত্তা ঋষি বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও তাঁহাকে কবিত্বপ্রতিভাবান ধর্মপ্রিয় দার্শনিক লেখক বলিলেও তাঁহার বংশাবতরণিকাকে অমূলক বলা যায় না। অসুরাংশসূত মহুগণের প্রভাবে, যে

ধর্ম হীনপ্রভ হয়, সমাজ বিপর্যাস্ত হয়, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। মহাভারতের সমাজ তাই বিপরিসংস্থিত ও বিপর্যাস্ত। ব্রাহ্মণ-মাত্রেই মহুর কথিত 'যজ্ঞনযাজ্ঞাদি ষট্‌কর্ম লইয়া ছিলেন না। ধোম্যাদি স্বধর্মনিরত থাকিলেও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিভোগী। আবার দ্রোণ কৃপ ও অশ্বখামা প্রভৃতি ঋষিবংশধর হইয়াও ব্রাহ্মণের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া উদরের জন্য শত্রুজীবী হন। ক্ষত্রিয়গণও সকলে সত্যযুগের ত্রায় শাস্ত্র দাস্ত সত্যনিষ্ঠ ও ইজ্যাদ্যয়নাদিপঞ্চ কর্মনিরত ছিলেন না। ইজ্যাদির সহিত দুর্ঘোষনাদির কোন সম্পর্কই ছিল না। কণ তাঁহাকে যে যোগ করান তাহা সাম্বিক বা রাজসিক যজ্ঞ নহে, কেবল তমোগ্রণের পূর্ণবিকার। ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের মধ্যে অধিকাংশই অধ্যয়নাদিপরায়ণ ছিলেন না, তাঁহাদের দানও তাদৃশ ছিল না এবং বিষয়ে অনাসক্তি আদৌ ছিল না—ইহাও মহাভারত হইতে বেশ বৃদ্ধিতে পাওয়া যায়। শূদ্র এবং আর্য-সমাজের বহিভূত জাতিসমূহের মর্যাদা-বৃদ্ধিও দৃষ্টিগোচর হয়। পৌরবংশাবতংস শাস্ত্রমুদাসরাজার কণা সত্যবতীর পাণি-গ্রহণ করিলেন। শূদ্রাগর্ভজাত বিদুরকুরু-গণের প্রধান মন্ত্রী। তিনি ধর্মপ্রাণ ও সরল আবার কণিকের ত্রায় ব্রাহ্মণ কোটিল্য চাণক্যের ত্রায় কুটিল। শক-দরদ-পারদ-পল্লবচীন-হন-রোমক-খুশতকিরা প্রভৃতি আর্যসমাজের বহিভূত জাতি আর্যসমাজের নৃপতিগণের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ। এমন কি ক্ষত্রিয়গণের মুখে

তাহারাও সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেন এবং হস্তিনাপুরের সিংহাসন জ্ঞাত তাহারাও প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বর্ণধর্মের জ্ঞান অশ্রম-ধর্মেরও পরিবর্তন মহাত্মার তে হয়। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি অর্থভাববশতঃ প্রাচীন প্রথা অমূল্যধনে গুরুগৃহে যাইয়া গুরুশ্রদ্ধা করিয়া শস্ত্রাদি লাভ করেন। কিন্তু ধনাঢ্য রাজবংশীয় কুরুবালকগণ গৃহে গুরু পাইলেন। কৃপ ও দ্রোণ উপযাচক হইয়া তাহাদের বৃত্তিভোগে তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন। দারিদ্র্য-পীড়িত দ্রোণ যখন বাল্যসখা দ্রুপদের দ্বারস্থ, দ্রুপদ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার সম্মান রাখিলেন না। দ্রোণও ব্রাহ্মণবলে তাহাকে শাসন করিতে না পারিয়া কৌরবগণের ক্ষত্রিয়বলে তাহাকে বিধ্বস্ত করিলেন। ব্রাহ্মণের রক্ত তাহার ধমনীতে প্রবাহিত বলিয়া তিনি দ্রুপদকে স্ববশে পাইয়াও ক্ষমা করিলেন। কিন্তু দ্রুপদ বৈরনিষ্ঠ্যাতনে আত্মহার্য হইয়া দ্রোণঘাতী যজ্ঞের জ্ঞাত যাজ্ঞক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বেদবিৎ কর্ম্মী যাজ্ঞ অর্থের লোভে ব্রাহ্মণ-ঘাতী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। দ্রোণ ব্রাহ্মণোচিত ঔদার্য্যপ্রযুক্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে হস্তা জানিয়াও শিক্ষারূপে গ্রহণ করিয়া অস্ত্রবিদ্যা দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরু ও ব্রহ্ম হত্যা করিলেন। দ্রুপদরাজনন্দিনী, পাণ্ডবগণের গৃহিণী, রাজস্বয় যজ্ঞে দীক্ষিতা মহিষী দ্রোপদীকে একবস্ত্রা রক্তশলা অবস্থায় প্রকাশ্য সভায় বলপূর্বক আনিয়া বিবস্ত্রা করিতেও দুঃশাসন সক্ষম হইল না। রোক্তদ্যমানা বীরগণ, সভাসদগণকে বারবার অত্যাচার নিবারণ করিতে বলিলেও

ভীষ্মদ্রোণাদি কেহ দুর্ব্যোধনের ভয়ে কথা কহিলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্য-গর্ভজাত পুত্র যুয়ুশ্ম থাকিতে না পারিয়া দুর্ব্যোধনাদিরও ভৎসনা করিলেন। যে কাণ্ড্য ক্ষত্রিয়গণের অগ্রগণ্য করিতে সাহস পান নাই, সেই কাণ্ড্য বৈশ্যানন্দন করিলেন। সাক্ষাৎ ধর্মের নন্দন যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়া নিন্দনীয় জানিয়াও, কৌরবগণের পাপ-চক্র বিদিত হইয়াও সৌবলের আহ্বানে দ্যুতে বসিলেন এবং ক্রীড়ায় এতদূর আত্মহার্য হইলেন যে অর্থ, বসন, ভূষণ, হস্তী, অশ্ব, রথ, চতুরঙ্গবল হারাইয়াও তাহার চৈতন্য হইল না। মহাদেব, নকুল, অর্জুন, ভীষ্ম ও আপনাকে পণ রাখিয়া তিনি খেলিলেন। তাহাতেও হারিয়া তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইল না। তিনি যয়ং জিত ও দারু হইয়া তখন দ্রোপদীর উপর তাহার কোন অধিকার না থাকিলেও পঞ্চজন্যর পত্নীকে পণ রাখিয়া খেলিলেন। এই সমস্ত উপকথা হইলে ইহা হইতে তাৎকালিক আর্ধ্যসমাজের আভাস পাওয়া যায়। এবং কতদূর পর্য্যন্ত সেই সমাজ পরিবর্তিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। এই পরিবর্তনের মধ্যে আবার সনাতন ধর্মের সনাতনত্ব সমাজে রক্ষিত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ভীষ্মের দেবোপম চরিত্র আর্ধ্যসমাজের সনাতন চিত্র। ভীষ্মের জ্ঞান আত্মবলিদান ভারতে সে দিনও মেবারের ইতিহাসে ঘটয়াছে। স্বর্ঘ্যবংশবতঃস বাপ্পারাওএর প্রথিত বংশধর চণ্ড ও পিতার জ্ঞান মিবারের পৃথিবী রাজযুট

সহস্রমুখে বংশপরম্পরাক্রমে স্বচ্ছায় ভ্যাগ করিয়া ভীষ্মের ভাব যে ভারতেরই তাহা দেখাইয়াছেন। বিদুরের ধর্মপক্ষসমর্থনকারিতা, যুধিষ্ঠিরের সত্য-নিষ্ঠতা আর্ধ্যসমাজের সনাতন শক্তি। দ্রৌপদীর পতিভক্তি আর্ধ্যনারীর সনাতন রীতি। অর্জুনের সহিষ্ণুতা আর্ধ্যসমাজের সনাতন প্রথা। শ্রীকৃষ্ণে ভগবদ্ভাব আর্ধ্যসমাজের উন্নত আদর্শ। তাই

নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তর্কচ্ছলে ব্যাসের ক্ষুদ্রিত চরিত্রগুলি প্রাণহীন ধরিয়া লইলেও সেই চরিত্রাঙ্কনমুখে মূনিবর নিজকালের 'পাপিপুণ্যময় সমাজ বর্ণন করিয়াছেন, একই পটে আলোক-ছায়ার ন্যায় যুধিষ্ঠির-দ্রুপদ্যাদির সন্নিবেশ করিয়া সমসাময়িক সমাজের আলোক-ছায়া দেখাইয়াছেন। (ক্রমশঃ) শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী।

অবলা কি দুর্বল ?

অনেকের বিশ্বাস অত্যন্ত বিষয়ে, বিশেষতঃ বুদ্ধি ও হৃদয়ে, পুরুষের সমকক্ষ হইবার মত গুণ স্ত্রীর থাকিলেও, শারীরিক বলে স্ত্রী পুরুষের বামে বসিবার যোগ্য। এই কারণেই অনাদিকাল হইতে পুরুষ স্ত্রীর রক্ষাকর্তা, স্বামী বা নিয়ন্তা, এবং স্ত্রী পুরুষের অনুবর্তিনী দাসী।

ইংরেজদের মধ্যে কিস্তি এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। ডারউইন বলেন স্ত্রী পুরুষের অনেক পূর্বে উন্নতির শেষ সোপানে উঠিয়াছে; পুরুষ এখনও উন্নতির পথে চলিয়াছে। হারবার্ট স্পেন্সার বলেন—“স্ত্রীজাতির উন্নতি অবহেলা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত। জন ষ্টুয়ার্ট মিল মনে করিতেন কেবল মাত্র অভ্যাসজাত সংস্কারদ্বারা স্ত্রী পুরুষের নিকট হীনতা স্বীকার করে, নতুবা স্ত্রী কোন বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। মহাত্মা মিল যেরূপ সাহস ও দক্ষতার সহিত তাঁহার মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সভ্য জগৎ স্তম্ভিত

হইয়াছিল। সমগ্র রমণীসমাজ তাঁহার নিকট এ জন্ত চিরঋণী।

আজ কাল পুনরায় একদল মাথা তুলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্ত্রী পুরুষ-অপেক্ষা দুর্বল নহে, পক্ষান্তরে পুরুষই দুর্বল।

ইহাদের প্রমাণ-সংগ্রহের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে ইংরেজ কুলাজনাগণ সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিকার বিস্তারের জন্য হিন্দুমন্তারূপে রণরঙ্গ মাতিয়াছেন। তর্ক যুক্তির ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম না করিলে পাছে স্বার্থপরায়ণ পুরুষ সহজে স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে, বোধ হয় এই আশঙ্কায় বীর রমণীকুল সমাজ-বন্ধন পদদলিত করিতে উত্তত হইয়াছেন। প্রবণপ্রতাপাবিত ইংরেজ রাজপুরুষগণ ইহাদের ভৈরব নিনাদে ত্রস্ত ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। রমণীর অধিকার-পথ অচিরে কণ্টকমুক্ত না করিলে, ইংরেজ সমাজে কি বিপ্লব উপস্থিত হইবে কে বলিতে পারে?

ডারউইনের শিষ্যগণ বলেন মানুষ ও বনমানুষের শারীরিক গঠনগত প্রভেদের মধ্যে পঁজরের হাড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানুষের পঁজরে সাত খানি হাড় থাকে ; বনমানুষের আটখানি। বনমানুষ যে মানুষের পূর্বপুরুষ এ সম্বন্ধে একটা প্রমাণ যে, অনেক মানুষের চখান পঁজর থাকে। এবং এই অষ্টমপঞ্জর স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে বেশী দেখা যায়। সূত্ররং ইহা স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের একটা নিদর্শন। আবার শরীরাবয়বের অস্বাভাবিক গঠন ও পুরুষের গৌরবের অনেক পরিমাণে হানি করে। পুরুষের মাথার চুল ঝড়ার ঠায় মধ্যভাগে দ্বিধাভিন্ন ও উর্দ্ধমুখী। অনেক সময় হস্তপদের অঙ্গুলি পুরুষের বিকৃত। আঙ্গুলের উপর আঙ্গুল, দাঁতের উপর দাঁত, একরূপ বিকৃতি স্ত্রীগণের মধ্যে খুব কম। ইহা স্ত্রীজাতির শারীরিক উৎকর্ষের প্রমাণ।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় পুরুষ ক্রমবিকাশে যত উন্নীত হইতেছে, ততই সে স্ত্রীকে লাভ করিতেছে।* অবয়ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন আধুনিক সভ্য সমাজে পুরুষের গঠন ও আকার ক্রমেই স্ত্রীর মত হইয়া আসিতেছে। হয় ত এমন দিন বহুদূর নয় যখন আকার দেখিয়া পুরুষ কি স্ত্রী চেনা শক্ত হইবে। অপরিচিতের সহিত আলাপে নামধামের পরিচয়ের সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইবে। অসভ্য

কথাটি, বৃষি বা সভ্য। হিন্দু জাতির আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দেহের গঠন, লালিত্য, রম্যজানোচিত নয় কি? দিত্ত, গৌরাক্ষ সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। নজীরের অভাব নাই। মল্লিনাথ।

সমাজে বৃহদাকার স্ত্রীদীর্ঘ বপু পুরুষোচিত বলিয়া গণ্য। কিন্তু সে ধারণা এখন সভ্য সমাজ হইতে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। এখন স্ত্রীর ঠায় পুরুষও কৃশাঙ্গ ও ঝর্ঝাকার হইলে সভ্য মানবের সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করে। বস্তুতঃ সভ্যদেশে পুরুষ ও স্ত্রী-অস্থিবিশিষ্ট ও স্ত্রীমূলভ জীবন্যাসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে।

এ প্রমাণ অনুসারে বাঙ্গালী পুরুষ অল্প দেশীয় পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হায়, বাঙ্গালী! তুমি জান না বিশ্ববিদ্যাতা তোমার অজ্ঞাত-সারে তোমাকে মনুষ্যজাতির আদর্শ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের আরও প্রমাণ আছে। বর্ণানুভূতি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর তীক্ষ্ণ। অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় তাহারা ৪৫ টীর বেশী বর্ণ অনুভব করিতে পারে না। সাদা, কাল, নীল, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের ভেদ কেবলমাত্র স্ত্রীগণই সুস্পষ্ট অনুভব করে। সভ্যসমাজে পুরুষগণও বর্ণের সূক্ষ্ম তারতম্য অনুভব করিতে পারে না। এ বিষয়ে স্ত্রীর শক্তি পুরুষ অপেক্ষা বেশী।

একটা কিছু রহস্যজনক প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন অভিনব পণ্ডিতসম্প্রদায় মনে করেন যেখানে ঋদাসামগী মহার্ষ্য ও অপ্রচুর, সেখানে পুত্র বেশী জন্ম গ্রহণ করে এবং যেখানে প্রচুর ও সুলভ সেখানে কন্যা বেশী জন্মে। ধর্মীর গৃহে এই কারণে কন্যা বেশী ও দরিদ্রের গৃহে পুত্র বেশী। হুর্ভিক্ষ ও মহামারী কিম্বা যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় পুত্র বেশী জন্ম গ্রহণ করে।

এবং এই একই কারণে দুর্গম পার্শ্বত্যাগপ্রদেশে ও মরুভূমে কন্যা অপেক্ষা পুত্র বেশী। এই পণ্ডিত-মণ্ডলী ভারতবর্ষের খবর রাখিলে বলিতে পারিতেন এই কারণে ভারতে পুত্র অপেক্ষা কন্যা বেশী এবং অস্বাস্থ্যশালা আর্থারমণী ইংরেজের পুরস্কৃত হইলে সভ্যতার আদান প্রদানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলও অধিক লাভবতী হইতেন।

অনেকের হয় ত খটকা থাকিবে অপ্রচুর খাদ্যের সঙ্গে মানুষের জন্মের কি সম্বন্ধ? এবং স্বল্প খাকিলেও, তাহাতে স্ত্রীলোকের গৌরব কিসে বাড়ে। আমার মনে হয়—বিজ্ঞান ইহার সমর্থন করিবে কি না জানি না—সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সমুদয় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির সম্যক উৎকর্ষ খাদ্য হইতে পুষ্টি ও রসাকর্ষণের উপর নির্ভর করে। অপ্রচুর খাদ্যের সহিত পুরুষের অপরিণত শরীর ও মনের জন্ম হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রীর পারে না। এই জন্য অপ্রচুর খাদ্যের অভাব ঘটিলে সেখানে স্ত্রী জন্মে না, পুরুষ জন্মে। ধনীর গৃহে এই জন্য সুন্দরী কন্যা এবং মরুভূমে ও দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে পুত্র বেশী জন্মে। ইহা স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের অত্যন্ত প্রমাণ।

কেহ হয় ত বলিবেন—ঠিক ইহাতে স্ত্রীর শারীরিক শক্তির কোন পরিচয় পাইলাম না। অধ্যবসায়শীল ইংরেজ পণ্ডিত ইহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত। ইহারা নানা ভিন্নদেশীয় হাসপাতাল অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে স্বভাবতঃ স্ত্রীর শরীর পুরুষ অপেক্ষা সুদৃঢ় ও স্থায়ী। রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে ও রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেশী। স্ত্রী হাসিমুখে যে রোগ বহন করে, পুরুষ তাহাতে শয্যাগত হয়। অনেক রোগ স্ত্রীলোকের আদৌ হয় না। অনেক রোগ খুব

কম হয়। পীড়িত-অন্ধচ্ছন্দ বা উহাতে অস্বা-
স্বাত স্ত্রী যত সহজে সহ্য করে, পুরুষ তাহা
পারে না। অস্বচিকিৎসা বিচারদ পণ্ডিত এ
কথার সাক্ষী। সেবা-ব্রতে স্ত্রী অতুলনীয়।
হিন্দুর নিকট ইহার নূতন পরিচয় দিতে
হইবে না। হিন্দু স্ত্রীকে সন্ন্যাসীস্বরূপা জানে।
অন্য দেশে ইহার সম্যক পরিচয় নাই
বলিয়া হাসপাতাল ও যুদ্ধক্ষেত্র অনুসন্ধান
করিতে হয়। সেখানে দেখা যায় সেবার
দ্বা পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নার্স (Nurse)
বা ধাত্রীগণ হাসপাতালে ও যুদ্ধক্ষেত্রে
করণহস্ত প্রসারণ না করিলে কত বিরাট
সভ্য রাজ্যে মরণের ছায়া দ্বিগুণ বিকট
হইয়া মানুষকে মরণের ভয়ে ক্ষিপ্ত করিয়া
তুলিত। রমণী স্বল্পলহস্তদ্বারা শিশুকেও
সুখ-শস্যায় পরিণত করিয়াছে। ইহা রমণীর
কম গৌরবের কথা নয়।

আর এমটীমাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিব।
ইনসিওরেন্স কোম্পানির ইতিহাস হইতে
দেখা যায় স্ত্রীর দৃষ্টিশক্তি পুরুষ অপেক্ষা
তাক্ষ ও স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী।
দৃষ্টি যে তীক্ষ্ণতর তাহার প্রমাণের জন্য
ইনসিওরেন্স কোম্পানীর দপ্তর ঘাঁটিয়া
মরি কেন? ইহা ত জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের
ন্যায় নিত্যপ্রামাণ্য-নতুবা সে কটাক্ষে
মহাযোগী মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইবে
কেন? আর গেচারি বাঙ্গালী-পুরুষই বা
বিশ্বসংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া অঞ্চলক্ষীর
অঞ্চললয় হইবে কেন?

ইহার পর যদি কোন পুরুষ স্ত্রীর
শ্রেষ্ঠত্বে সন্দেহ করেন তবে মনে করিব
নিচেরই তাহার স্মৃতিতত্ত্বের বর্ণনাপরিচয় হয়
নাই।*

শ্রীপ—

* এটা একটা কথার কথা মাত্র। ডারউইনের
মতবাদের সহিত এ কথা কোন সম্বন্ধেই আছে—এ কথা
যেন কেহ মনে না করে।



বঙ্গদর্শন



রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা

সত্য এবং সনাতন ধর্মের শান্তি, প্রীতি, ও মঙ্গলময় মন্ত্রের প্রচারক ঋষিগণ। যে সকল ঋষি তাহা কাব্যে প্রচার করিয়াছেন তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অভিনব এবং অপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর রক্তিম সন্ধ্যায়, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য জীবন-সংঘর্ষের মহাকোলাহলের মধ্যে, ধীরে ধীরে, বহু পুরাকালের কতকগুলি লুপ্ত গান এবং শান্তিবাদী, ঋষি রবীন্দ্রনাথের নিকট বঙ্গের শস্যশ্রামলক্ষেত্রপ্রান্তে, ভগ্নকুটারে, এবং পুরাতন মন্দিরে বসিয়া আমরা শুনিয়াছি। বিংশতি বৎসর পূর্বে সেগুলি আমরা কিছুই বুঝিতাম না। তখন কল্লনা-মন্দিরে সেগুলি ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে অনেক অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাহিত্যজগতে তাহার প্রতিভা বাঁহরণ, সেলী, এবেক্সার ইলিয়ট, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবিগণের সহিত তুলনা করিয়াছি। ক্রমে বঙ্গের অতীতপূর্ব ধর্ম-জীবনের উন্মেষ হইল। যে জীবন দেবতাকে বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ বিস্মৃত হইয়াছিল তাহাকে মন্থপুত করিয়া

নবপ্রতিষ্ঠিত যজ্ঞের মধ্যে বঙ্গের সন্তানগণ পুনর্ব্যার আবাহন করিল। সেই সন্তানগণের অগ্রগণ্য হোতা এবং কবি—রবীন্দ্রনাথ। যে মন্ত্রদ্বারা তিনি এই সাধনা শিখাইতে চাহিয়াছেন তাহার মূলে প্রকৃতি এবং পুরুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। তাহার কথা কাব্য। তাহার উৎস উপনিষদ। তাহার ভিত্তি জ্ঞান, এবং উপকরণ প্রেম। সেই প্রেম সিঞ্চন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বহু শতাব্দীর মরুভূমিকে পুষ্পিত এবং লতাবেষ্টিত আশ্রমে পরিণত করিয়াছেন। সধ্যভাবে, পবিত্র মনে, প্রীতির সহিত যখন সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছি, তখনই কিছু নূতন দেখিয়াছি এবং শিক্ষা করিয়াছি। তখনই কোনও কালের বিস্মৃত কথা মনে পড়িয়াছে। কোনও গভীর অন্তর্নিহিত এবং অমৃত-স্রাবিণী ভাবলহরী ফুটিয়া উঠিয়াছে। বুঝি নাই কিন্তু অমৃতব করিয়াছি। কারণ জানি না, তবুও নিজের বিগলিত অশ্রুধার দেখিয়া লজ্জিত হইয়াছি।

কেবল কাব্য নহে, তাহারই মধ্যে কলভাবে কবি রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি ধর্মজগতের আদিম ইতিহাস ক্ষুদ্র এবং

মনোহর প্রণালী দ্বারা ইচ্ছিতে প্রকটিত করিয়াছেন। নিরুপ্প এবং বিশাল উদধির বক্ষে প্রকৃতি এবং পুরুষের প্রথম উদ্বাহ, সপ্তপর্ণভূষিত কুমারগণের বাল্যলীলা, অনন্ত আকাশতলে তাহা দগের আত্মবিস্মৃতি এবং স্বপ্ন, ভূগৃহে তাহাদিগের পুনরাবর্তন, মাতৃ-স্নেহ, পিতৃবিস্মৃতি এবং মায়াবধু লইয়া গৃহরচনা, কত কথায়, কত ছন্দে এবং কত রঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখিতে পাইয়াছি।

অবসর মত যাহা মনে পড়িত, তাহারই কতিপয় কথা এই প্রবন্ধে আমরা লিখিতেছি। সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কাব্যের সহিত ধর্মের, এবং প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ, যাহা আমরা রবীন্দ্রনাথের গানে পাইয়াছি, তাহারই কিয়দংশ বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সমালোচনার বিপুল ব্যাপার আমাদের সাধার বহির্ভূত। রবীন্দ্রনাথের গভীর মর্মস্পর্শী কাব্য সম্পূর্ণরূপে মানসপটে চিত্রিত করি, সে স্পর্শ আমাদের নাহি। ক্ষুদ্র অন্তঃকরণে যতদূর তাহার প্রতিধাত অমুভব করিয়াছি, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার মর্ম যতদূর বুঝিয়াছি, সে সব কথা বলিলে, যদি অল্প কাহারও সম্বাদী ভাবের সহিত মিশিয়া যায়, তাহা হইলে আনন্দ লাভ করিয়া সার্থক হইব।

ধর্মই কাব্যের মূল

ধৃতি হইতে ধর্ম। ধর্ম প্রকৃতি এবং পুরুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ। অজ্ঞান ও মায়া হইতে আত্মবিস্মৃতি এবং দুঃখ। কিন্তু এই বিশাল মায়ারূপী আবরণের মধ্যে ধর্মই

পথপ্রদর্শক। ধর্ম প্রথমাবস্থায় পরিচ্ছিন্নভাবে উদিত হয়, ক্রমে কর্মক্ষেত্রে স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, প্রীতি এবং আত্মত্যাগে প্রসারতা লাভ করে। তাহারই প্রতিকৃতি সমাজ এবং সংসার। বহুযুগ দুঃখ সহিয়া জীব অবশেষে জাতিস্মরণতা এবং আত্মজ্ঞান লাভ করে।

জীবাত্মার এই বিশাল ইতিহাস, কেবল মানবের সামাজিক ক্রিংবা জাতীয় ইতিহাসে প্রকটিত করা দুঃসাধ্য। একই লীলা, একই ধর্ম, অহরহ চক্রবৎ পরিবর্তন করিতেছে। ধর্মশাস্ত্র গুরুমুখী বিদ্যা, দর্শন বিবেক ও বিচার-সাপেক্ষ। বাহ্যদৃষ্টিতে ইতর মানব কেবল দুইটি চিত্র দেখিতে পায়—বন্ধ এবং প্রেম। একদিকে জীবন-সংগ্রাম, অন্তদিকে স্নেহবন্ধন। সেই বন্ধন ধর্মোদ্ভূত, এবং বন্ধন হইলেও মুক্তির পথ। প্রেম একটি নিগূঢ় বন্ধন, ভক্তিও বন্ধন। কিন্তু এই বন্ধন হইতেই, এই দ্বৈতভাব হইতেই, প্রাণের গতি অন্তর্মুখী হইয়া থাকে। পরিচ্ছিন্ন জীবনের সহিত অনন্ত জীবনের সম্বন্ধ ঘনীভূত হয়। প্রেম হইতেই জীব যুক্তাবস্থা অমুভব করে, আদর্শ করনা করে। সেই প্রেমের প্রসারতা স্থাবর জঙ্গম এবং প্রত্যেক বিশ্বকণায় যে অমুভব করে সেই ভক্ত। তাহারই সৌন্দর্য্য, তাহার সঙ্গীত লইয়া কাব্য। তাহারই কথা, ধর্মের কথা, প্রকৃতি এবং পুরুষের সম্বন্ধের কথা। অতএব মনীষিগণ কহিয়াছেন, ঈশ্বর, প্রকৃতি, ধর্মের প্রতিভা, সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত এবং প্রেমময় মানবের জীবন, এইগুলি কাব্যের সাধারণ এবং মৌলিক বিষয়।

যাহারা গুরুপদটি পথ জানে না, যাহা-
দিগের দেহের প্রাকৃতিক সংগঠনে প্রেম
এবং ভক্তির উপকরণ বর্তমান, তাহাদিগের
পক্ষে কাব্যই ধর্মপথপ্রদর্শক। ভারতবর্ষের
আদিম সামাজিক কিংবা জাতীয় ইতিহাস
বিশদরূপে কোথাও বর্ণিত হয় নাই,
কিন্তু তাহা হইতেও অধিকতর মূল্যবান
ইতিহাস আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা
ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্র। কাব্য, তন্ত্র এবং
দর্শন সেই শাস্ত্রের অন্তর্গত। আদিম প্রকৃতির
অঙ্কশয়ান স্বপ্নপ্রভৃতি মানবশিশুর সহিত
বিশ্বপরমাত্মার সম্বন্ধ আমরা প্রাচীন
মহাকাব্যে দেখিতে পাই। সেই বিশ্বব্যাপ্ত
মায়াদেহের রচনা তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল।
দর্শনশাস্ত্র তাহা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।
কেবল কাব্যের দিকেই দৃষ্টিপাত করিলে
অন্যাসনে উপলব্ধি হইবে যে, পৌরাণিক
ইতিহাস ইহার প্রথম যুগের উপকরণ।
কিন্তু সে ইতিহাস ধর্মের অদ্বিতীয় ইতিহাস।
সেই যুগের প্রকৃতি ও পুরুষের গুঢ়
পারিবারিক সম্বন্ধের ইতিহাস। তাহাতে
এ যুগের সৌন্দর্য্য-উপাসনার তত্ত্ব বিরল।
তাহাতে পরবর্তী যুগের পরিশ্রুত যৌবন-
লক্ষণ নাই। তাহারও পরবর্তী যুগের
দর্শনশাস্ত্রের বার্তাক্য-লক্ষণ নাই। শৈশবের
স্বপ্ন কোন যুগেই কেহ বৃত্তিতে পারে না।
ঐচ্ছিক তাহাই প্রকৃত তন্ত্র ও ইতিহাস,
এবং প্রকৃত দর্শনের প্রমাণ। একটি নিষ্কলঙ্ক,
নিপাপ, ঘৃণ্য সত্ত্বোজাত শিশুর দিকে
লক্ষ্য করিয়া দেখুন। নীরব গৃহে শিশুর
প্রতি একাগ্রচিন্তা জননী, এবং জননীর
অঙ্কে জীবন্ত স্রষ্টা সন্তান। উভয়ের

অন্তরালে অদৃশ্য পিতা। তিন জনেই বৃত্ত
এবং সেই গোপনীয় যোগপথেই ধর্মের
প্রথম অঙ্কুর নিহিত। যে স্বপ্নে শিশু মগ্ন
তাহা কখনই আধুনিক হইতে পারে না,
কারণ তাহার প্রত্যেক হস্তে নির্দিষ্ট ভাব,
প্রত্যেক ক্রন্দনে পূর্ববৈরাগ্য এবং প্রত্যেক
চাহনিতে অন্তর্দৃষ্টি। দর্শন যাহা বুঝাইতে
চাহে, তন্ত্র যাহা বর্ণনা করে, জগৎ-সীমার
যাহা শেষ, যাহার মধ্যে মুণিময় স্রষ্টার স্রষ্টার
বিশাল বিশ্বধর্মের আদি এবং অনাদি বন্ধন,
অজ্ঞেয় এবং অদৃশ্য বিরাট সত্য পুরুষের
মহিমা প্রচার করিতেছে, ইহা তাহাই।
তাহা বর্ণনা করা শিশুর ক্ষমতার বহির্ভূত।
কারণ তাহার বিবেক এবং বিশ্লেষণের শক্তি
প্রস্তুত হয় নাই। শিশু তখনও কবির
পদে প্রতিষ্ঠিত নহে। সে কথা জানে না।
তখনও ছন্দের উৎপত্তি হয় নাই। আনন্দ
অন্তর্নিহিত।

কাব্যের প্রথম তিনটি যুগ

সমগ্র পৌরাণিক কাব্য এবং মহাকাব্য
সেই আদিম স্বপ্নের কথা। সেই মহান
এবং বিরাট স্বপ্ন কি তাহা আমাদের
বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু এককালে আমরাও
তাহার দ্রষ্টা ছিলাম। বাহ্য প্রকৃতিতে
মন আকৃষ্ট হইলে সেই স্বপ্ন আমরা বিশ্বত
হই। সত্য স্বপ্ন অসত্য হইয়া দাঁড়ায়।
পুরাতন হাসি নূতন, পুরাতন অশ্রু বাহ
নয়নের, পুরাতন জীবন তখন পরিচ্ছিন্ন।
কিন্তু বাস্তবতা এবং যৌবন পর্য্যন্তও সেই
স্বপ্নের প্রভাব আমরা দেখিতে পাই।
জন্মান্তরে বদ্ধসংসারী জীব সেই স্বপ্ন বিশ্বত
হইয়া পথভ্রান্ত অরণ্যগত পথিকের স্থায়
পরিভ্রমণ করে।

কিন্তু ঋষি-কবি যুক্ত শিশু। প্রথম যুগে সে স্বপ্নদৃষ্ট ইতিহাস বর্ণনা করে। দ্বিতীয় যুগ তাহার বাস্তবস্থা। তখন জীবন-সংগ্রাম তাহার লক্ষ্য। সেই স্বপ্নের অভ্যন্তরে সে অন্তর্নিহিত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া দ্বন্দ্ব মিটাইতে চাহে। মহাসংগ্রামের মধ্যে তাহার চিরসখা সত্য স্বপ্নময় পুরুষ অবতাররূপে রথোপস্থে কিংবা ভূগর্ভ ভেদ করিয়া ধর্মের মানি দূর করেন। সে যাহা দেখিতেছে তাহা সত্য। সে যাহা কহিতেছে তাহা কেহ শিখায় নাই। তাহার কল্পনা স্মৃতি ব্যতিরেকে অল্প কিছুই নহে। প্রকৃতির মায়াময়ী লীলা সে স্বভাবতঃ ধ্যানস্থ হইয়া দেখিতে থাকে। তাহার প্রকৃত অর্থ আমাদের নিকট দুজ্জের, কিন্তু তাহার নিকট সরল সত্য। আমাদের নিকট তাহা অদ্ভুত, অতএব আমরা চিরকালই কহিয়া থাকি যে, বাস্তবিক ও ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এবং পাশ্চাত্য Transcendental কবিগণ সকলেই কল্পনার দাস। যেন একটা অভূতপূর্ব অবিখ্যাত মোহজালে জড়িত। পৌরাণিক ইতিহাসের কথা এবং এ যুগের কবির কথা সকলই কল্পিত গাঁজাখুর বিষয়।

প্রথম যুগের সনাতন মহাকাব্য বেদ-গানে প্রচারিত হইয়াছিল। পুরাণ হইতে দ্বিতীয় যুগের মহাকাব্যের সৃষ্টি। কিন্তু সেই মহাজ্ঞানী ঋষিগণের বর্ণনাসমূহ সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক। পাশ্চাত্য মনীষিগণ ইহার সম্বন্ধে দুইটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

গেটে, লেসিং, হার্ডার প্রভৃতি জার্মান দর্শনবিদগণের মতে পৌরাণিক দৃশ্যসমূহের মধ্যে গুঢ় সঙ্কেত বর্তমান। সে সঙ্কেতের অর্থ ঋষিগণ ভিন্ন অপরের নিকট দুজ্জের। রেগান প্রভৃতি বলেন যে, আদিম মানব যুগসংস্কারবশতঃ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিল (They conversed with Nature, spoke to her, heard her voice, and held to her through her arteries. They comprehended in a sort of magnetic way. They did not create symbols to cover dogmas. The latter were born as thought and the intention was not distinct from the thing itself)। কিন্তু আমাদের আধুনিক সংস্কার দর্শনের ও জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। আমরা মনে করি ধর্ম মানব-কল্পনা মাত্র, পৌরাণিক কাব্য একটা বিরাট হেঁয়ালি। বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত পূরণ করিতে পারিলেই তাহার মায়াদুর্গ ছিন্নবিছিন্ন করা হইল। যোগ দীক্ষা প্রভৃতি সেই হেঁয়ালির অন্তর্গত।

যেমন যৌবনের প্রারম্ভেই যুবাব সহিত পিতামাতার যুক্ত সম্বন্ধ শিথিল হইতে থাকে এবং ‘আমিত্যে’র ভাব তীব্র হয়, সেই রূপ তৃতীয় যুগে মানবের অবস্থা দাঁড়ায় (The relation between Nature and God becomes veiled)। প্রকৃতি ও পুরুষের আদিম রহস্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পিতামাতার সহিত শিশুর পুরাতন সম্বন্ধ থাকে না। তখন এই মায়িক আবরণের

মধ্যে আমরা . দুইটা ভাবের উৎপত্তি দেখিতে পাই।

• অমুসন্ধান

প্রকৃতির বাহ্য মায়িক সৌন্দর্যের উপভোগ-কামনা তাহার প্রথম দৃশ্য, এবং দ্বিতীয় দৃশ্য তজ্জনিত বিশৃঙ্খলা এবং ব্যতিচারের মধ্যে ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উভয়ের সংঘর্ষে অগম্যে দৈবের ভাব মানব-হৃদয়ে উদ্ভূত হয়। মহাকদীয় ও খৃষ্টীয়ধর্ম তাহার প্রমাণ। উভয় ধর্মেই দৈব এক। কিন্তু মায়ী কিংবা প্রকৃতির কথাই লেশমাত্র নাই। ব্যবহারিক ভাবে মায়ী কিংবা স্ত্রী-প্রকৃতিকে নিকৃষ্ট স্থান নির্দিষ্ট করাই মুসলমানধর্মের লক্ষণ। সাংখ্যদর্শনের ‘নৃত্যকীৰ্ত্তন’। কিন্তু কামনা-শূন্য জ্ঞান তাহাতে নাই। সুফিধর্মের অভ্যুত্থানের পূর্বে কেবল সৌন্দর্যের উপভোগই মুসলমান কবিগণের বর্ণনার বিষয় ছিল। খৃষ্টীয় ধর্মে স্ত্রী-প্রকৃতির স্থান সামাজিক ভাবে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সনাতন ধর্মের মাতৃভাব তাহাতে নাই। পরাপ্রকৃতির জগদ্ধাত্রীভাব, প্রকৃতি-পুরুষের অনাদি পবিত্র সম্বন্ধ, এবং তাহাতে জীবের অপূর্ণ রহস্যময় স্থান পরবর্তী যুগের কবিগণের জগৎ রহিয়া গিয়াছিল। সনাতন ধর্মের অভ্যুদয়ই ইহার কারণ। ইহাকে Max Muller প্রভৃতি ‘পুনবন্ধন’ [Re=again, Ligo=bind or Religion] স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যে ডোর এই বন্ধনকে দৃঢ় করে তাহাই ধর্ম। ঋষিগণের মতে এই যুক্তাবস্থা কোনকালেই লয় প্রাপ্ত হয় না, কেবল কালে শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। যুক্ত শিশু যৌবনকালে সংস্কারবশতঃ সেই

বন্ধন লইয়া উন্মাদের জ্বালায় আত্মহারা হইয়া পরিভ্রমণ করে। “The first poems related the earliest bonds, but never expressed them in analytical thought. Poetry begins with the youth of the world’s history. It is called the mediaeval movement and its first aspect is transcendentalism. Nature begins to lay down the relation of God with itself as Bride.” বিশ্ব্তিবশতঃ আমরা ইহাকে মায়িক সৃষ্টি এবং কল্পনা বলিয়া থাকি, কিন্তু অমুধাবনা করিয়া দেখিলে পূর্ব-কল্পের স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। পূর্ব-স্বপ্নের চিদাভাস। তাহাই কবির এত ব্যাকুলতা এবং অমুসন্ধান। প্রেম এবং তীব্র সঙ্গলিপ্সা ইহার প্রমাণ। ধ্যান এবং অমুসন্ধান ইহার আনুসঙ্গিক লক্ষণ। হগো, বাইরন, সেলী, কীটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এবের্ডার ইলিয়ট প্রভৃতি এই পথের পথিক। তবে ইহার সাধক কবি নহেন। বৈষ্ণব এবং সুফিবিগণ প্রকৃতি ও পুরুষের প্রেমবন্ধন ভক্তিমাৰ্গে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু Transcendental, কবিগণ দৃশ্যজগতে তাহার অমুসন্ধান-তৎপর হইলেন। সেলীর দীর্ঘনিশ্বাস, ওয়ার্ডসওয়ার্থের গভীর নিদি-ধ্যাসন, এবের্ডার ইলিয়টের করুণা এবং স্নেহ, ও টেনিসনের কর্তব্যপরায়ণতা এবং কালাইলার বীর-পূজা, সকলেরই রঙ্গমূল দৃশ্যজগৎ। অন্তরে যে পুরুষ বর্তমান তাহার সহিত দৃশ্য জগতের সম্বন্ধ কি? স্প্রপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেল দ্বিতীয়মুখে কহিলেন

যে সেই পুরুষ আপনাকে আপনিই বাধিয়া থাকেন, নিজেই নিজের প্রেমে মত্ত। ইহা বেদান্তের মায়িক স্বপ্ন, এবং জ্ঞান-জগতের কথা। কিন্তু Transcendental কবিগণ তাহাতে তৃপ্ত হয়েন নাই। এই যে বিরাট স্বপ্ন বাহার অভ্যন্তরস্থ ভক্তির কথা পূর্বে শুনিয়াছি, জ্ঞানের কথা দার্শনিকগণ কহিয়াছেন, তাহার আদি ও অন্তের আভাস মধ্যাবস্থা হইতে কিরূপে প্রাপ্ত হইব? জড়-প্রকৃতি, জড়সমাজ, জড়সংসারের মধ্যে সেই অন্তরাখ্যা কিরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন? কোন্ ভাবের মধ্য দিয়া, কোন্ সোপানীয় পথ দিয়া জীব-ভাবে সেই আখ্যা আপনাকে অন্তর্ভব করিয়া থাকেন? আমার

ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই, সাধনা নাই, পথ কেহ কহে নাই। তবে কি দৃশ্যজগতের অপূর্ণ ভাবের মধ্যে, উন্মাদ জীবন-তরঙ্গায়িত সমাজ ও সংসারের মধ্যে, প্রত্যেক তৃণকণা এবং ঝিল্লীরবের মধ্যে প্রকৃতির সহিত পুরুষের এবং জীবের সহিত জীবের এবং মায়াদিগ্ধিত চৈতন্যময় পরমাত্মার পবিত্র, সনাতন, এবং শাস্তিময় সম্বন্ধ আশ্রয় দেখিতে পাইব না? এই যুগে যে অভিনব পথ দিয়া Transcendental কবিগণ এই মহান্ অমূল্যস্থানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার একজন শ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন পথিক।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শিক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা *

মানবশিশু-প্রথম যখন এই সুন্দর আলোকোজ্জ্বল বিশ্বের দিকে তাহার কচিকঁচ অক্ষিপন্নব উন্মীলিত করিয়া চাহিয়া দেখে, তখন প্রাক্তনজন্মবিঘ্ন তাহার অনন্তমুখ ইন্দ্রিয়কে সেই আলোকাচ্ছন্ন বিশ্বের রহস্ত উদ্ঘাটন করিতে কিক্রিয়াত্র সহায়তা করে কি না, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার মানসপটে যে রেখাগুলি ধীরে ধীরে অঙ্কিত হইতে থাকে, তাহাই তাহার শিক্ষার প্রথম সোপান। সে মানসপটে এই পরিস্ফুট রেখাগুলির পশ্চাতে যে প্রচ্ছন্ন ভূমি রহিয়াছে, তাহার বিচিত্র উপাদানের

মধ্যে বংশপরম্পরাগত জ্ঞান ও বৃত্তি লুক্কায়িত আছে। এই জ্ঞান ও বৃত্তি সকল শিশুর বুদ্ধিবিকাশে প্রভূত সহায়তা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রচ্ছন্নভূমি বা Back ground যেমন পরোক্ষভাবে চিত্তোৎকর্ষের জন্ত দায়ী, অগণিত জীব-প্রবাহ হইতে উদ্ভূত জ্ঞান ও বৃত্তি সকল সেইরূপ চিত্তোৎকর্ষের পক্ষে পরোক্ষভাবে অত্যাवশ্যক।

এইরূপ মৌলিক, মানসিক ও শারীরিক বিভব লইয়া মানবশিশু জ্ঞানার্জনের পথে অগ্রসর হয়, এবং ক্রমে নিজের চেষ্টায় অমূল্য এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অনবরত আপনাকে নিয়োজিত করিয়া

* চুঁড়ার সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

জ্ঞানার্জনের শক্তি লাভ করে। ইঙ্গিত-
সন্নিবর্তনিত জ্ঞান হইতে সে যেরূপ
বহিঃগতের সন্ধান পায়, স্বরণ, মনন ও
সুখাদির উপলব্ধি হইতে সে তেমনই
আপনার মনকে জানিতে পায়; এবং বাহ্য
ও আন্তর বিষয়ের মধ্য দিয়া মানবাত্মার
স্বরূপ ক্রমশঃ বুঝিতে পারে। এইরূপে
আত্মজ্ঞান লাভ করাই মানবের জ্ঞানের
চরম লক্ষ্য। সূত্রাত্মক মানবের শিক্ষা-দীক্ষা
সমস্তই আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত
হইতেছে। সেই জন্যই মানব ইতিহাস
ও পুরাণে, কাব্য ও দর্শনে, ধর্ম ও বিজ্ঞানে
—প্রকৃতপক্ষে আপনাকেই খুঁজিয়া বেড়ায়।
সে যেমন তাহার নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের
জন্য বিশ্বের সমস্ত পদার্থকে নিয়োজিত
করিতে প্রয়াসী হয়, তেমনি লৌকিক ও
অলৌকিক চরিত্রের মধ্য দিয়া, জ্ঞানের
নিগূঢ়তম সমস্তার দ্বার দিয়া, ছন্দের সঙ্গীতে,
আত্মার সহিত পরমাত্মার নিবিড়তম সম্বন্ধে,
পদার্থ ও পরমাখুর সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পরিচয়ে
মানবের আত্মা আপনার পরিস্ফুটতর
প্রতিবিম্ব দেখিয়া সার্থক হয়। এ সার্থকতা
প্রয়োজন-বিশেষের অপেক্ষা করে না,
ইহাতে সকল সময়ে প্রতিদ্বন্দিতার জ্বালা
থাকে না—এ সার্থকতা মানুষের মৌলিক-
প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষা ও কামনার সার্থকতা।
তুমি যখন অর্থের জন্য জগৎকে কুবেলভাণ্ডার
বলিয়া গণনা করিয়া তাহা ভয় করিতে
চলিয়াছ, অথবা যশের জন্য নানাধিক
পণ্যে তোমার তরলীখানি সাঙাইয়া লইয়া
পৃথিবীর হাটে বাণিজ্য করিতে চলিয়াছ,
অথবা বিলাসের লালসায় প্রকৃতির

প্রমোদোচ্চানের প্রতি পুষ্পের সৌরভ
লুটিয়া বেড়াইবার কল্পনা করিতেছ,—তখন
তুমি তোমার বৃহত্তর, পূর্ণতর, সুন্দরতর
আত্মার সন্ধানে ফিরিতেছ! তোমার
সমস্ত চেটা, সমস্ত সাধনা, সমস্ত ক্রিয়া-
কলাপের পশ্চাতে তোমার আত্মা আপনাকে
প্রকাশ করিতেছে। তুমি শতাব্দ্যমধ্যে যজ্ঞ
করিয়া ইজ্ঞাই কামনা কর, আর তত্ত্বজ্ঞান
লাভ করিয়া নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের
অধিকারী হইতে চাহ, এ সমস্তই তুমি
তোমার নিজের তৃষ্টি, তৃপ্তি বা পরিণামের
জন্য করিতেছ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।
আত্মাই সমস্ত মননশক্তি ও ক্রিয়াক্রান্তির
উৎস। নিজের ছায়াকে উল্লঙ্ঘন করিয়া
যেমন যাওয়া যায় না, আত্মার রক্ত ছাড়িয়া
তেমনই অন্যদিকে যাওয়াও অসম্ভব।
আমরা যে শুধু অনাত্মের মধ্য দিয়া
আত্মার সন্ধান পাই তাহা নহে, আমাদের
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে
আত্মাভিমুখী। জ্ঞানের দিক দিয়া—ধর্মের
দিক দিয়া—অধর্মের দিক দিয়া—যে দিক
দিয়াই—দেখি, আত্মা সকলের মধ্যস্থলে
বর্তমান রহিয়াছে। আত্মাপেক্ষা জগতে
প্রিয়বস্ত আর কিছুই নাই, উপনিষৎকার
সত্যই বলিয়াছেন—

ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি

কিঙ্করানন্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।

—বৃহদারণ্যক।

অতি হেয় স্বার্থ হইতে পরমোপাদেয়
পরার্থ পর্যন্ত সকল বিষয়েই আত্মার প্রতিষ্ঠা
দেখিতে পাওয়া যায়। আমি অবশ্য
এরূপ বলিতেছি না যে, লোকে আত্মার

সুখ বা সুবিধার জন্য পরার্থের অহুসান করে, নিজের প্রয়োজন উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিবেশীদিগের উপকার করে, এমন কি, মাতৃসন্তানের উপকারিতা ও মূল্য অরণ করিয়া মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ বা স্নেহ-পরবশ হয়! কোনও কোনও নীতিতত্ত্ববিৎ এরূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছেন! কিন্তু আমি বলিতেছিলাম যে, মামবের বাবতীয় ক্রিয়াকলাপ তাহার আত্মার মুদ্রাক্রিত! যে স্বার্থসম্পর্কশূন্য পরহিত-রতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বলি প্রদান করিয়া সময়ে সময়ে মানবজগতের ইতিহাসের শুষ্ক কঠিন উষরে স্নিগ্ধপূত মন্দাকিনীধারা বহাইয়া দেয়, সে পরহিতের মধ্যেও আত্ম আপনার শান্ত পবিত্র নিফল সম্পূর্ণ মুক্তি দেখিয়া ধন্য হয়। ইহাই আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই যে সর্বব্যাপী আত্মধর্ম জীবজগতের প্রাথমিক স্তর হইতে ধীরে ধীরে উচ্চাদপি উচ্চ স্তরে আত্ম বিকাশ করিতেছে, ইহাকে সাহায্য করাই মানবীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। মানব ইহার যে স্তর যে সময়ে অধিকার করিয়া থাকে, সে সময়ে তাহার শিক্ষাপ্রণালী ও সাধনা তাহার অঙ্গগামী হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য হইলেও স্তরের পার্থক্য অনুসারে শিক্ষার আদর্শসম্বন্ধে অনেক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। টাইবরের তীরে অবিনশ্বর নগরী যখন জগজ্জয়ের স্বপ্ন দেখিতেছিল, জগতের শিক্ষয়িত্রীস্বরূপিণী গ্রীস যখন পরকীয় শাসনজ্বায়ে নিভুতে জ্ঞান ও শিল্পের আদর্শ গড়িতেছিল, ইলাহ বাগিজ্যের জাল বিস্তার করিয়া যখন

জগৎকে আত্মর ন্যায় বেঁটন করিবার কল্পনা করিতেছিল, ভারত যখন স্তিমিত-নয়নে অরণ্যে বসিয়া পুনর্জন্ম ও কুর্সফলের অনন্ত শৃঙ্খল রচনা করিতেছিল, তখন এই সকল দেশের লোকেরা বিভিন্ন উপায়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল। এবং সেই জন্য ইহাদের শিক্ষাপ্রণালীও স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্তমান যুগে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্ত নির্জনতার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিল। সুযোগ পাইয়া সে সেই আদর্শের মধ্য দিয়াই আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। তাহার শিক্ষা, সঙ্কল্প, আকাঙ্ক্ষা সমস্তই সেই তীব্র আত্ম-প্রকাশের সঙ্গনস্বরূপ হইয়াছে। যে সুবৃষ্টি অহিফেনযুদ্ধ বেণীবন্ধ চীন এতদিন আপনাকে ভুলিয়াছিল, সে-ও হঠাৎ তাহার অহিলাঙ্গিণী বেণীর সহিত অহিফেন চীন সমুদ্রে বিসর্জন দিয়া জাগ্রত হইয়াছে; তাহারও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চঞ্চলতা দেখা দিয়াছে। বর্তমান চীনের শিক্ষা-প্রণালী এই নূতন আদর্শের ছায়ায় গঠিত হইবে। চীনের আদর্শ ভারতের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতে পারে। যতদিন আদর্শের পার্থক্য থাকিবে, ততদিন শিক্ষাও বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য। এইরূপে আমরা দেশভেদে ও জাতিভেদে শিক্ষার ভারতম্য বুঝিতে পারি। একই কেন্দ্রস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াও প্রকৃতি ও আদর্শানুসারে রেখাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

হার্বার্ট স্পেন্সার তাহার “শিক্ষা” নামক

নারবাদ গ্রন্থে “কোন জ্ঞান সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ?” এই প্রশ্নের মীমাংসায় অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে “আত্মরক্ষাই জীবধর্মবিশিষ্ট মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এবং যে জ্ঞানের দ্বারা এই আত্মরক্ষা সহজসাধ্য হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা আদরণীয়। এই জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে উপযোগিনী যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাই গরীয়সী। বলা বাহুল্য যে আত্মরক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠার সুস্পষ্টতম উদাহরণ। জীবরাজ্যের প্রথম স্তর হইতে শেষ স্তর পর্য্যন্ত সর্বত্রই এই আত্মরক্ষা-নীতির সার্বভৌম প্রভাব। এই আত্মরক্ষারূপ আত্মপ্রতিষ্ঠা তোমাকে স্বার্থাক্ত জীবমাত্রের পরিণত করিতে পারে, আবার এই আত্মপ্রতিষ্ঠা দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া তোমাকে অমরত্বের তীরে লইয়া বাইতে পারে। জীবজগতের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া স্পেন্সার জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি জীবনের পরিপূর্ণতা (complete living) কেই জানের চরম আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইলেন। সামাজিক আত্মরক্ষা, রাষ্ট্রনৈতিক আত্মরক্ষা, অর্থনৈতিক আত্মরক্ষা—নানা ভাবে পারিপার্শ্বিক সর্ববিধ অবস্থার মধ্য দিয়া আমরা আত্মাকে পূর্ণতর অবস্থায় লইয়া যাইতে চাহি। এই জ্ঞানই আত্মরক্ষা বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নীতি। এবং এই জ্ঞানই তৎসাধনরূপ জ্ঞানের অমূল্যলব্ধি মানবের লক্ষ্য হইয়াছে। দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য যাহা পারে, নাই, বিজ্ঞান তাহা করিতেছে। ‘বিজ্ঞানের প্রভাবে জীবনৌপলব্ধি বাড়িতেছে, বিজ্ঞানের প্রভাবে

স্বথের সীমা প্রসারিত হইতেছে, বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারে শত্রুকে পরাভূত করা সহজ হইয়া উঠিতেছে। কাজেই, আত্মরক্ষা যেখানে মূলমন্ত্র, বিজ্ঞানই সেখানে প্রধান পুরোহিত। বিজ্ঞান আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়, সুতরাং বিজ্ঞান আদরণীয়।

আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাণ-পোষণের গোরব এদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছিল, বলিয়া বোধ হয়। ক্রটি বলিয়াছেন—

কস্মিন্নহমুংক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্থ্যমীতি স প্রাণ-মসৃজত।

ছান্দোগ্যে প্রাণের প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা আছে।

প্রাণো পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বশা প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্বিল্ল “শাস্ত্রানং সততং রক্ষণং” “শরীরমাশ্রয়ং ধর্মসাধনং” ইত্যাদি বহু পদের দ্বারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমর্থিত হইয়াছে। তবে বর্তমান কালে জীবন-সংগ্রাম যেমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, পূর্বে সেরূপ ছিল না বলিয়া মনে হয়। সেই জন্য আত্মরক্ষা এ দেশের কল্লনার উপর ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

আত্মরক্ষাতত্ত্বের মধ্যে শিক্ষাপ্রণালীর যে আত্মপ্রতিষ্ঠা-সাধনতা দেখিতে পাইতেছি, পাশ্চাত্য জগতে শতদিকে শতভাবে তাহা ক্ষুণ্ণ লাভ করিয়াছে। অবশ্য তাহার ফল

যে সর্বত্র শুভদায়ক হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইহার গতি আলোচনা করিলে বস্তুতঃ আমরা শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে একটি অব্যভিচারিত সত্যের সন্ধান পাই— তাহা এই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত এবং জাতিগত আত্মবিকাশ। এই আত্মবিকাশের ইতিহাসই মানবজীবনের গূঢ়তম ইতিহাস। আত্মার ধারণা অবশ্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। কারণ এই ধারণা আবার অতীত শিক্ষা, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়াছে। বর্তমান যুগে ইউরোপে এই আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহার স্বাভাবিক কর্ম-প্রিয় জীবনে এক তুমুল বজ্রা তুলিয়াছে। তাহার জ্বালাময় কর্মলালসায় ঘৃতাভিত্তি প্রদান করিয়াছে। মধ্যযুগে লোকে যখন প্রাচীন আদর্শ লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, গত-যুগতিকের ঋণ ভজন-সাধনকে অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তখন সে এক শান্তি ছিল! কিন্তু তার পরেই যে জাগরণ সৃষ্টির শাস্ত্র অলসতা ভাঙ্গিয়া দিল, সে জাগরণ এখনও পাশ্চাত্য জগতে তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করিতেছে। লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া ধর্মজীবনে যে চঞ্চল আত্মপ্রকাশ দেখা দিল, তাহা আবার রাষ্ট্রীয়নীতি, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে অদ্বুত শক্তির সহিত ক্রিয়া করিতে লাগিল। চিন্তা ও বাক্যে স্বাধীনতার জন্ম পাশ্চাত্য জগতে দুর্দমনীয় আশঙ্কা লোকের মনে জাগিয়া উঠিল, এবং সেই স্বাধীনতা-প্রয়াসের ফলে কত রাজ্য ধ্বংসযুগে প্রস্থিত হইল, কত নূতন রাজ্য গড়িয়া উঠিল, কত পুরাতন

ধর্মমত সে বন্ডায় ভাসিয়া গেল, নূতন ধর্ম-মতের সৃষ্টি হইল, তর্কশাস্ত্রের জীর্ণ শুষ্ক কঙ্কাল পরিত্যক্ত হইল, তাহার স্থলে সরস সজীব বিজ্ঞানের বীজ রোপিত হইল। লোকশিক্ষার ফলে আত্মপ্রতিষ্ঠা জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজতন্ত্রের স্থলে প্রজাতন্ত্র আনয়ন করিতেছে। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার স্থলে সাকার প্রত্যক্ষীভূত জনবৃহৎ উপাসনার অন্তিমোদন করিতেছে; এবং দর্শনশাস্ত্রের জটিল কঠিন নিফল তর্ককে নির্বাসিত করিয়া তাহার স্থলে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ যন্ত্র ও নল প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলে গৃহপিণ্ডরকোকিলা-গণ শত শত শতাব্দীর জড়তা পরিহার পূর্বক রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহাদের অধমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়াছেন এবং জিউজিউংসুর সাহায্যে কোমলাঙ্গীগণ বর্ষ-চর্মপরিহিত বেচারীপাহারাওয়ালাকে পর্যাস্ত ধরাশায়ী করিতেছেন, এরূপ শুনিয়াছি। বস্তুতঃ তাঁহাদের ঘোড়ার সহস্র পর্যাস্ত যে অধিকার লাভ করিয়াছে, তাঁহারাই বা সে অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত থাকিবেন? আত্মপ্রতিষ্ঠা ধীরে ধীরে জাগ্রত হইয়া তাঁহাদিগকে গৃহের অভ্যন্তর হইতে টানিয়া আনিয়া সমাজের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছে। ইহাতে ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু এই যে সচেতন, প্রবুদ্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠা রমণীগণের মধ্যে একটা উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতে অংশে কল্যাণের জন্ম হইতেছে।

বর্তমান যুগের যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর
বিপ্লব তাহাও লোকশিক্ষার ফল। পূর্বে
ধনীর দ্বারে নিধন রূপার জন্ত দণ্ডায়মান
হইয়া কৃতার্থ হইত। ধনী তাঁহার প্রাসাদের
উচ্চতম শিখর হইতে আদেশ প্রচার
করিতেন, নিধন অবনত মস্তকে সে আদেশ
পালন করিয়া ধন্ত হইত। কিন্তু সে দিন
চলিয়া গিয়াছে; অকস্মাৎ রক্তমঞ্চে পট-
পরিবর্তনের আয় ধনী ও শ্রমজীবীদিগের
সম্মুখে একেবারে উল্টাইয়া যাইতে
বসিয়াছে। ধনী ইচ্ছা করেন যে তাঁহার
অর্থে যে সকল পণ্যজাত উৎপন্ন হইবে,
তাঁহার লভ্যের অধিকাংশ তাঁহারই
কোষাগারে যাউক। বেচারী শ্রমজীবীরা
খাটিয়া খাটিয়া সারা হউক এবং সম্ভ্রান্তে
প্রাসাদাদনের জন্ত স্বল্প কিছু অর্থ লউক।
তাহা হইলেই ধনীর পক্ষে লাভের মাত্রা
বাড়িয়া যাইবে। পৃথিবীর হাটে প্রতি-
যোগিতা যতই বাড়িয়া যাইতেছে, অর্থশালী-
দিগের ততই চেষ্টা হইতেছে যাহাতে
শ্রমজীবীদিগের পারিশ্রমিক কমিয়া যায়।
অর্থের বশ সকলেই; শ্রমজীবীগণের ত
অর্থ নাই। কাজেই তাহারা ধনীর
রূপাপ্রার্থী হইয়া কোনও রূপে জীবন
অতিবাহিত করিয়া যাইত। কিন্তু শিক্ষার
প্রভাবে তাহাদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা
দেখা দিয়াছে এবং আরও সুশিক্ষার সূচনা
করিতেছে। তাহাদের অর্থবল নাই;
কিন্তু তাহাদের লোকবল আছে—সমবেত
হইয়া প্রণালী অনুসারে কাজ করিবার
মত তাহারা শিক্ষা পাইতেছে, স্তত্রাং আজ
নিধনের দ্বারে ধনীকে দাঁড়াইতে হইয়াছে।

এই যে তীব্র পারিশ্রমিক প্রতিযোগিতা
অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জগতের সর্বত্র প্রধুমিত
হইয়া উঠিতেছে, ইহা হইতে যে কি এক
বিশাল দাবদাহের উৎপত্তি হইতে পারে
তাহা ভাবিতেও শোণিত শুষ্ক হয়। এই
অবশ্যস্তাবী বিপ্লবের মধ্যেও আমরা
আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি গৌরবময় চিত্র
দেখিতে পাই। লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর ক্রেশ
প্রশমিত করিয়া, জগতের অধিকাংশ
লোকের শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া
এই আত্মপ্রতিষ্ঠা মানবের অপরিমিত
কল্যাণ সাধন করিতেছে, যদি এই আত্ম-
প্রতিষ্ঠা জগতে সাম্যতন্ত্র বা সম্পত্তির
সম-বিভাগ (The Socialistic ideal)
আনয়ন করে, তাহা হইলে ফল যে কি
হইবে বুঝিতে পারা যায় না।

চিন্তায় ও কর্মে আত্মপ্রকাশের যে উচ্চ
আদর্শ হিন্দুদিগের মধ্যে ছিল, তাহা কোনও
আদর্শের তুলনায় পরিমিত বলিয়া বোধ
হয় না। সে একদিন ছিল যখন অরণ্যের
শান্ত বিজনতার মধ্যে সরস্বতীর কলগুঞ্জন,
কাব্য ও সঙ্গীতের ছন্দে আর্ধ্যাঙ্গণ বিশ্বস্ততার
স্তুতি রচনা করিতেন। সে একদিন ছিল,
যখন অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে জগতের
প্রিয়বস্তুসম্ভার উপহার দিয়া তাঁহার
আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন। সে এক দিন
ছিল, যখন আত্মতত্ত্বচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া
তাঁহার অদ্ভুত তথ্যসকল আবিষ্কার করিয়া
ভবিষ্যৎবংশীয়দের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি অর্জন
করিয়াছিলেন। আত্মাকে জানিতে পারা
যাঁহার জ্ঞানের আদর্শ বলিয়া মানিয়াছিলেন,
আত্মহিতের চেষ্টাকে যাঁহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা ও সাধনা কি গভীর ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ত নিয়োজিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মোক্ষের জন্তই হউক, নিঃশ্রেয়স-লাভের জন্তই হউক, অথবা অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির জন্তই হউক, যে কোনও লক্ষ্যের দিকেই তাঁহাদের চিন্তাসূত্র প্রলম্বিত হইয়াছিল, সেই দিকেই আধ্যাত্মিক আত্মপ্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কালের চক্র ইহার পরে কত শত বার আবর্তিত হইয়াছে, কত নূতন নূতন লক্ষ্য, নূতন নূতন আদর্শ আমাদের কর্ম ও গতিকে পরিচালিত করিয়াছে, এখন আর সে পুরাতন সমাজ নাই,—পুরাণের কর্মক্ষেত্র নাই, পুরাতন শিক্ষা নাই—কাজেই সে পুরাতন আত্মপ্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল আদর্শও আর নাই। বর্তমান অবস্থাবিপর্ক্যের মধ্যে কেবলমাত্র সেই পুরাতন আদর্শের অনুসন্ধান করিলে চলিবে না। আধ্যাত্মিকতার সে দ্যুতিমান মধ্যাহ্নের রক্তকাস্তি অপরাহ্নের ভূমিতালোকে ফিরিয়া পাইবার আশা করা বৃথা। আমাদের এ নূতন জাগরণ বর্তমান যুগের আশা ও কল্পনাকে সার্থক করিবে, পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে এবং অজ্ঞাত জাতির সহিত আমাদের সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। যে আত্মপ্রতিষ্ঠা কার্যকারণ-পরম্পরার অপেক্ষা করিবে না, অন্যান্য জাতির ইতিহাসের প্রতি অবলোকন করিবে না, অবস্থার প্রতি, দেশ কালের প্রতি, জনসাধারণের প্রকৃতি ও রুচির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, সে আত্মপ্রতিষ্ঠা সার্থক

হইতে পারিবে না বলিয়া মনে হয়। স্বাভাবিক নির্দোষনে সে আদর্শ কখনও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

দেশ, কাল ও অবস্থার বৈচিত্র্য, অজ্ঞাত জাতির সহিত সম্বন্ধ প্রভৃতি আমাদের ক্রিয়া ও চিন্তাপ্রণালীকে স্বাভাবিকই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যে শক্তি ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ হইয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়া আপনা-আপনি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাকে রুদ্ধ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমাদের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই নূতন জাগরণকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করাই বর্তমান যুগে ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ।

কল পাকিয়া যখন বস্তুচ্যুত হইতে চলিয়াছে, তখন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে কেহ চাহে না। পুরাতনের প্রতি মমত্ব-পরবশ হইয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করা বিফল। কিন্তু সেই যে পুরাতন আধ্যাত্মিক আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে একটা মহিমময় আশ্বাস, আত্মনির্ভর ও সনাতনত্ব ছিল, তাহাকে বিদায় দিলে চলিবে না। নূতন ও পুরাতনের যে অপূর্ণ সমাবেশে দেশে এক চির মঙ্গলময় আদর্শের আবির্ভাব হইবে, তাহা জগৎ বিশ্বের সহিত নিরীক্ষণ করিবে।

আমাদের জাতীয় জীবনের তরুণারূপ-রাগের উদয়ে যে মঙ্গলধ্বনি অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে স্বাগত জানাইবার জন্ত ভারতের বিভিন্ন জাতি প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ আমাদের

জীবনকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার নিম্নে শিক্ষার জন্য একটি অধীর ব্যগ্রতার মতো বহিয়া যাইতেছে। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের স্বজাতির শিক্ষার জন্য বিধিমতে আয়োজন করিতেছেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রয়াস-গুলি গ্রথিত হইয়া এক বিপুল ইসলাম-বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। হিন্দুরাও পশ্চাৎপদ হইবার নহেন; হিন্দুদিগের মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে স্পৃহা আছে, মাননীয় মালবা মহাশয় অজস্র রোপায়ুদ্রায় তাহার পরিমাপ করিয়া দেখাইয়াছেন। হিন্দুদিগের মধ্যে আবার বিভিন্ন জাতি অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর ভূমিতে নিজ নিজ শক্তি নিয়োজিত করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন—ব্রাহ্মণ-সভা, কায়স্থ-সভা, মাহিষ্য-সভা, বৈশ্য-বারজিবি-সভা, নমঃশূদ্র-সভা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান জন্ম গ্রহণ করিয়া এক প্রবল জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ দেশের রমণীরাও তাঁহাদের স্বভাবস্বলভ অলসতা পরিহার পূর্বক অন্তঃপুরের শিক্ষা-বিধানের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। রাজকীয় শক্তিও এ বিষয়ে উদাসীন নহে। গতবর্ষে শিমলা ও এলাহাবাদে রাজপুরুষদিগের যে শিক্ষা-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেরূপ সচেতন ভাবে শিক্ষাবিস্তাররূপ দায়িত্ব মনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদিগের দ্বারা ছাত্রগণের জ্ঞানার্জন-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিক আশা হয় যে, আমাদের শিক্ষার পথ অনেক প্রশস্ত হইয়াছে। এ

অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা কল্পে সম্রাটের দান বড়ই সমযোগ্যগামী হইয়াছে। মাননীয় গোখলে মহোদয়ের প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যবস্থা সমগ্র দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাজক্ষার প্রতিধ্বনিমাত্র। আমাদের শিক্ষার জন্য রাজকীয় চেষ্ঠার আর একটি উদাহরণ—ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের লোকের সহায়তায় রাজপুরুষগণের চেষ্ঠা আশাতীত রূপে সফল হইয়া উঠুক, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই কামনা হওয়া উচিত। আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ যে প্রজা-শিক্ষার জন্য অধুনা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন—ইহাও আমাদের পক্ষে আশার কথা। আজ এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া আমাদের দেশের প্রজা-বৎসল ভূপতিকুলের আদর্শস্বরূপ সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের সমক্ষে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া আমি গর্ব অনুভব করিতেছি।

এইরূপে অসংখ্য চেষ্ঠা আমাদের নানা আবর্ত ও বাধার মধ্য দিয়া লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া দিতেছে। শিক্ষার আয়োজন হইতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা জন্ম লাভ করিয়া উন্নততর, পূর্ণতর, সুন্দরতর শিক্ষা-প্রণালীর প্রসূতি হইবে। পুরাতন আদর্শকে সন্মুখে রাখিয়া, মাতৃভাষাকে অবলম্বন করিয়া নূতন শিক্ষা-প্রণালী আমাদের সর্ববিধ মঙ্গলের নিলয় হইবে। এই যে আরাধ্যতম লক্ষ্য, ইহা জ্ঞানের দ্বারা শিক্ষার দ্বারা লাভ করিতে হয়। গন্তব্য পথ দীর্ঘ, কিন্তু পথেয়ও অপ্রচুর নহে। উপযুক্ত সাধনার অভাব না ঘটিলে

সিদ্ধি নিশ্চয়ই অদূরবর্তিনী। এই যে বিশ্বের সভায় আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা লইয়া দণ্ডায়মান হইব, ইহা আমাদের স্পর্ধা মাত্র নহে। আমাদের অতীত ইতিহাস এই জ্ঞাত্য অধিকারে আমাদের উপযোগিতা শতযুগে প্রমাণ করিয়া দিতেছে। দেশের প্রতিকূল জলবায়ু এ গৌরব খর্ব করিতে পারে না, পরাধীনতা এ গৌরব কাড়িয়া লইতে পারে না * যাহা 'সর্বমাত্মবশং সূখং' বলিয়া এক সময়ে অপূর্ব আত্মনির্ভরের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা কি সে পুরাতন গৌরব তুলিয়া গিয়া জগতের প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া অপরের ঐর্ষ্যা মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া

দেখিবে? ব্যাধি যখন কর্ণের পর বর্ষ সহস্র সহস্র ভারতবাসীকে অকালে গ্রাস করিতেছে, বর্ষের পর বর্ষ হৃর্ডিক্ষ যখন অনন্ত বিভীষিকা লইয়া ভারতের দ্বারদেশে দেখা দিতেছে, তখন কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে? তাই বলিতে-ছিলাম যে, আত্মপ্রতিষ্ঠা আমাদের বহু শতাব্দীর সুসুপ্তিকে দূর করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে এ দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে শ্রেয়ঙ্কর পথে পরিচালিত করাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্য হইবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

কমলমণি

(বিষয়বস্তু)

বিষয়বস্তু তিনটি ফুল, তিনটিই অতুলনীয়—কমল স্বভাবজাত, কুন্দ অপার্থিব, সূর্য্যমুখী প্রকৃতি-প্রসূত হইলেও, তাহাতে কারুকার্য আছে, সে চরিত্রে শিক্ষার ফল পরিলক্ষিত; যদিও সে শিক্ষা হিন্দুর শিক্ষা, স্বাভাবিক কারণান্তর্ভূত, স্বভাব হইতে কদাচিৎ প্রভেদযোগ্য। আমরা সূর্য্যমুখী ও কুন্দকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, কমলকে বুঝান কঠিন। অথবা কমলকে বুঝিতে ব্যাখ্যার প্রয়োজনের অভাব। শুভ্র, অরঞ্জিত, প্রস্ফুটিত, নিত্যবিরাজিত;

অকণ্ট, খোলা, শাদা, পরিকার; সপ্রকাশ, ক্রৌড়াময়; তাহার আবার ব্যাখ্যা কি? দেখিলেই নয়নের প্রীতি জন্মে, চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। এমন অপূর্ব সৃষ্টি কাব্যজগতে বিরল, ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একই ভাবের, কৃত্রাপি ব্যতিক্রম নাই। কমল সর্বত্র পরিস্ফুট ও অনায়াস-বোধ্য। তবে এ চরিত্র পরিস্ফুরণ জন্ম যত কৌশলের আবশ্যক ছিল, কবি তাহার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। স্নেহের পুত্তলি সতীশুকে কমলের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছেন, শ্রীশচন্দ্রের আপিস জোটাওয়া দিয়াছেন, নিরাশ্রয় বালিকা কুন্দকে

* Editor's Footnote to Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire.

আনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আর ভক্তি ও মহাপ্রীতির পাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অতুলনীয় গৃহিণীর সহিত হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ করায় কমলের প্রীতি-প্রকৃতির গাভীরোর ভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। সূর্য্যমুখীর আত্মবিসর্জনের সংবাদে কমল সতীশকেও একদিন ভুলিয়াছিলেন, তাঁহার গৃহত্যাগে কুন্দের প্রতি তাঁহার স্বভাব-প্রকৃত হৃদয়ও একদিন প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল।

কমলমণি অষ্টাদশবর্ষীয়া কুলরমণী, এ বয়সে হিন্দুপরিবারে তাঁহার স্বামীকূলে গুরুজন কেহ না থাকা তত সম্ভবপর নহে। তাই, বোধ হয়, কবি কমলের স্বপ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কমলের প্রকৃতি-প্রস্ফুরণ জন্ত তাঁহার স্বাধীনতার প্রয়োজন, স্বামীসন্তাষণে তাঁহার কোনরূপ বাধা থাকা সম্ভব নহে, কবি তাই কৌশলে কমলের স্বপ্নকে কমলের স্বামী শ্রীশচন্দ্রের গৈতুক বাসস্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার বাড়ীতে কমলই গৃহিণী, সুতরাং উপস্থিত যে কোন কাজ গৃহের জীলোকের উপর লগ্নভার হইবার প্রয়োজন হইত, তাহা কমলের উপরেই পড়িত; তাহা দ্বারা কবি কমলের প্রকৃতি লোকের দৃষ্টিগোচর হইবার কারণ বা উপায়ের স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ বালিকা, দরিদ্রা, মলিনা, অযত্নালিনী কুন্দকে আনিয়া কমলের হাতে ফেলিয়া দিলেন, কমল তাহাকে সহস্র ধৌত, স্নাত, সুবাসিত, বস্ত্রালঙ্কারভূষিত করিয়া, তাঁহার পরিশ্রম লাভবের আশায়, ঐ সকল

কার্য্য করিতে উত্তম দাসীর গায়ে তপ্তজল ছিটাইয়া দিয়া, আশনার চিরপ্রেমময় স্বভাবের প্রথম পরিচয় প্রদান করিলেন।

অতাকে স্বামীর হৃদয়ভাগিনী জানিয়া মর্শ্বপীড়ায় সূর্য্যমুখী কমলকে একবার আসিতে আহ্বান করিলেন, কমল সে আহ্বানে গোবিন্দপুরে আসিলে দত্তদিগের বাগীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল, সূর্য্যমুখীর চোখের জল শুকাইল। আবার সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ এবং তজ্জনিত নগেন্দ্রের দেশত্যাগের পর, বিজন দত্তগৃহে, কুন্দ-নন্দিনী দুঃখকাতর হৃদয়ে সময়তিপাত করিতেছেন। নগেন্দ্রনাথের প্রত্যাগমনের সঙ্গে কমল তথায় পুনরাগমন করিলে, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল আবার আকাশে একটি তারা উঠিয়াছে। প্রকৃতই কমল যেখানে যাইতেন সেইখানেই আলোক বিস্তার করিতেন, আলোকময়ীর উপস্থিতিতে লোকের দুঃখ প্রশমিত হইত, বিবাদের স্থানে প্রফুল্লতা আসিয়া দুঃখান্ধকার বিদূরিত করিত। চুলের গোছা লইয়া বসা কমলের একটি রোগ ছিল। সূর্য্যমুখীর দুঃখে সমবেদনাও এই রোগের পথে প্রকাশ লাভ করিত, কুন্দনন্দিনীর সহিত সহানুভূতির ইহা উপায়স্বরূপ হইত। হিন্দুরমণীগণমধ্যে প্রীতিপ্রবণতার এ লক্ষণ সর্ব্বদাই লক্ষিত হইয়া থাকে। একই সময়ে সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর সহিত সমভাবে সহানুভূতি দ্বারা কবি কৌশলে কমলের চিরপ্রেমিকতার, তাঁহার প্রীতিরূপের সাক্ষরজনীনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার

কমল তাহা জানিতেন, তাই তিনি স্বর্ধ্য-
মুখীর মর্মপীড়ায় ব্যথিত হইয়াও, কুন্দ-
নন্দিনীর হৃৎথে হৃৎখী, সুখে সুখী না হইয়া
থাকিতে পারেন নাই।

কমল কাহাকেও তিরস্কার করিলেও,
তাহার ভিতর দিয়া তাহার মধুর প্রকৃতি
প্রকাশ পাইত। “বৈষ্ণবো দিদি—তোমার
মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর
কি গান জান না?” এ তিরস্কারে রক্ষতা
কোথায়? আবার “রসো। আমি একটা
বাবলার ডাল আনি। মিসেকে কাঁটা ফোটার
সুখটো দেখাই।” এবং এই প্রসঙ্গে হীরাকে
সম্বোধন করিয়া, “আর পারিস্ ত মাগীকে
ছুট বাবলার কাঁটা ছুটিয়ে দিয়া আনিস্।”,
অমৃতময়ীর রাগেও যেন অমৃতক্ষরণ হয়।
এই স্থলে, অল্প দিকে, কবির কোশল দেখুন।
রক্ষতার ভাবেও “মধুর প্রকৃতির বিকাশের
জন্ম হরিদাসী বৈষ্ণবীকে কাঁটা ফোটাইবার
চেষ্টায় যেমন কমলকে প্ররত্ত করিয়াছেন,
তেমনই আবার ভদ্রমহিলার শীলতা রক্ষার
জন্ম কবি পথের মাঝে আনিয়া সতীশচন্দ্রকে
বসাইয়াছেন। তাহাতে শীলতাও রক্ষা
হইয়াছে, স্নেহময়ীর স্নেহপ্রকৃতিও বিকাশ
লাভ করিয়াছে।

স্বর্ধ্যমুখীর প্রতি কমলের ভালবাসার
গাঢ়তা কবি কয়েকটি ঘটনা দ্বারা অতি
সুন্দর রূপে প্রকটিত করিয়াছেন। কুন্দের
প্রতি স্বামীর আসক্তি জানিয়া স্বর্ধ্যমুখী
যখন অতি হৃৎথে লিখিলেন “একবার এসো।
কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার
সুহৃদ কেহ নাই। একবার এসো!” পড়িয়া
কমলমণির আসন টলিল, আর তিনি স্থির

থাকিতে পারিলেন না। কমলমণি রমণীরঙ্গ,
অমনি স্বামীর সঙ্গে গোবিন্দপুর যাওয়ার
পরামর্শ করিতে গেলেন। আবার কমলের
স্বামীপুত্র লইয়া আমোদের মধ্যে কুন্দের
সহিত নগেন্দ্রনাথের বিবাহের সংবাদ
পৌছিল, কমল গোবিন্দপুর যাইবার জন্ম
অতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দপুর
উপস্থিত হইয়া, স্বর্ধ্যমুখীর সম্বন্ধে অতি
আশঙ্কান্বিত অন্তরে পুর প্রবেশ করিলেন,
প্রাণাধিক সতীশচন্দ্রও সে ব্যস্ততার মধ্যে
পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল। এইরূপ, যে দিন
নগেন্দ্রনাথ স্বর্ধ্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ লইয়া
কলিকাতায় কমলের বাড়ী উপস্থিত
হইয়াছিলেন, কমল সতীশচন্দ্রকে একা
ফেলিয়া সে রক্তির মত অদৃশ্য হইয়াছিলেন।
অল্প ভাবে, স্বর্ধ্যমুখীর গৃহত্যাগে, কুন্দের
প্রতি কমলের রাগ, সহানুভূতির আশয়ে
নিকটগততা কুন্দকে দেখিয়া তাঁহার অপ্রসন্নতা,
স্বর্ধ্যমুখীর প্রতি তাঁহার সেই প্রণয়গাভীর-
মূলক। তাহার পর, স্বর্ধ্যমুখী গৃহে প্রত্যাগত
হইয়া, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ অপ্রমাণিত করিলে
কমল যখন কান্না ও হাসির মধ্যে শাখ
বাজাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন
কেবল যে তাঁহার ভাতৃপত্নীর প্রতি
প্রণয়ানিশ্য চরম বিকাশ লাভ করিল, তাহা
নহে, তাঁহার সরল আনন্দময় প্রকৃতিরও
অতি প্রদীপ্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এই
প্রসঙ্গেই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, কুন্দের
মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে কমলমণি ও স্বর্ধ্যমুখীর
উচ্চৈশ্বরে রোদন এই রমণীষয়ের হৃদয়রহস্য
কম উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে নাই।
কমলমণি কাহাকে না ভালবাসিতেন।

স্বর্য়ামুখী কাহাকে না ভাল বাসিতে পারিতেন! কুন্দ স্বামীর হৃদয়াধিকারিণী, কুন্দের জ্ঞাত তাঁহার জীবনসর্বস্ব, তাঁহার একমাত্র চিন্তার বস্তু, সুখের উপকরণ, স্বামীবু ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া, স্বর্য়ামুখী দেশত্যাগিনী পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছিলেন, সেই কুন্দের জ্ঞাত তাঁহার উচ্চৈঃস্বরে রোদন,

সেই কুন্দের মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া তিনি বলিতেছেন, “সর্বনাশ হইয়াছে। আমি এত দিনে জানিলাম আমার কপালে এক দিনেরও সুখ নাই—নতুবা আমি আবার সুখী হইবামাত্রই এমন সর্বনাশ হইবে কেন?” হৃদয়ের মহত্ব ও সৌন্দর্য্যে এরূপ কমই দোঁধিতে পাওয়া যায়।

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী ।

শ্রীচরণ

পৃথিবীর অত্যাচর দেশ নারীদেহের নানা অপ্সের সুসমা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু সকল অপ্সের ভিত্তিভূমি শান্তিপ্রদ চরণকমলের সৌন্দর্য্য ও মহিমা-কীর্তন এক মাত্র ভারতবর্ষেরই একান্ত বিশেষত্ব। স্নাত্য দেশের সুকুমার সাহিত্যে মরাল-গ্রীবা, নীলাশ্বনেত্র, অরুণগণ্ড এবং মধুর বিদ্যাবরের প্রশংসার অভাব নাই, কিন্তু সেখানে শ্রীচরণের “থল কমল শোভা” উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতবর্ষীয় শ্রীচরণের “হৃদয়-পাবক” অলঙ্কারাগ অথবা ভারতবাসীর প্রকৃতিগত ভক্তিরস এই চরণমহিমাবু মূলকারণ কি না জানি না, কিন্তু শ্রীচরণের মহিমা ভারতবর্ষে যেমন উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত এমন আর কোথাও নহে। সর্কাপেক্ষা প্রাচীন কবি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্কাপেক্ষা আধুনিক কবি পর্যন্ত সকলেই এই মন্ত্রের উপাসক। বাঙ্গালার বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ

পর্যন্ত কেহই এ বিষয়ে ক্রটি প্রদর্শন করেন নাই।

সুবিমল নখরসংযুক্ত শ্রীচরণ দেখিয়া কেহ বা বিস্ময়ে গাহিয়াছেন—

“কমল যুগল পর চাঁদক মাল।”

কেহ গাহিয়াছেন—

“যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই

তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই ॥”

কেহ বলিয়াছেন—

“উরুযুগ কদলী করিবর কর জিনি

স্থল পঙ্কজ পদ পাণি

নখ দাড়িম বীজ ইন্দু বরণ জিনি

পিক জিনি অমিয়া বাণী।”

কেহ গাহিয়াছেন—

“যে চাঁপার ফুল তব অঙ্গুলি দেখিয়া

কটুগন্ধ সার করে নীরস হইয়া।”

কেহ গাহিয়াছেন—

“অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা ল'য়ে

পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হ'য়ে।”

কেহ বা নির্ঝক বিস্ময়ে ভাবিতেছেন—

“কোমল চরণ তলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হ’য়ে ছিল ?”
এবং তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আকুল কণ্ঠে
গাহিয়া উঠিয়াছেন—

“যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি
শৌর্য্যবীৰ্য্য যাহা কিছু ধূলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে !”

এবং কেহ বা তাহাতেও তৃপ্তি না
পাইয়া ভক্তির আকুল উচ্ছ্বাসে বলিয়া
ফেলিয়াছেন—

“কাজ কি আমার কাশী ?
শ্রামাপদ কোকনদে গয়া গঙ্গা বারাণসী !”
শ্রীচরণের এমন অপূর্ণ মহিমা-সম্বীত
জগতের অল্প কোনি সাহিত্যে দুর্লভ ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার
অস্বাস্থ্যকর প্রভাবে ভারতের এই সনাতন
মহিমা বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল ।

পাশ্চাত্যশিক্ষাবিকৃত সমাজ পূর্বে
হইতেই এ বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটাইবার চেষ্টা
করিতেছিলেন, তাহার উপর কিছুদিন পূর্বে
ভক্তিতাজন পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন
মহাশয়ের বিদূষী পত্নী জীলোকের পাঠকা
ব্যবহারসম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া
আমাদের অধিকতর সন্তুষ্ট করিয়া
তুলিয়াছিলেন ।

পণ্ডিতমহাশয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন
যে পুরুষগণের “স্থল কমল” শোভাদর্শনের
মুঢ় আকাঙ্ক্ষা এবং রমণীমণ্ডলীর অলঙ্ক-
রঞ্জিত চরণকমলের শোভাপ্রদর্শনের শূন্য-
গর্ভ গর্ভী রমণীজাতির পাঠকা পরিত্যাগের
কারণ ।

আমরা চরণকমলের চিরভক্ত হিন্দুজাতি
—যাহাদের আদর্শ দেবতা “উদার শতপন্নব”
মন্তকে ধারণ করিয়া চরণের মহিমা প্রচার
করিয়া গিয়াছেন—আমরা পাশ্চাত্য-আদর্শ-
অনুপ্রাণিত শিক্ষিত সমাজের অনুরোধ গ্রাহ্য
করি নাই, কিন্তু হিন্দুধর্মনিষ্ঠা প্রবীণা পণ্ডিত-
মহাশয়ার প্রবল অনুযোগ আমাদের
কথঞ্চিৎ নিরুত্তর করিয়াছিল । তাই আজ
সহসা সুশিক্ষিত পশ্চিমের দূরপ্রাস্ত হইতে
অপ্রত্যাশিত অভয়বাণী শুনিয়া আবার
বহুকাল পরে আমাদের “নির্বাকভূমিষ্ঠা”
আশা “সঙ্কুচিত” হইয়া উঠিতেছে

যে পশ্চিম আপনার বিষময় প্রভাবে
আমাদের সর্বনাশে উত্তত হইয়াছিল,
সে-ই আজ আবার আমাদের রক্ষার জহ্ন
বাহ রচনা করিয়া দীনবন্ধুর অমর বাণীকে
পূর্ণ সার্থকতা দান করিয়াছে !

আমেরিকার “ইলিনয়” প্রদেশের
জীলোকদের শ্রীচরণসম্বন্ধে বহুদিন হইতে
কিছু খ্যাতি আছে । পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে
তাহাদের মত দৈর্ঘ্যপ্রস্থবিশিষ্ট শ্রীচরণ
না কি দুর্লভ ! শ্রীচরণ-মর্যাদাভিজ্ঞ পাশ্চাত্য
সমাজে এ জগৎ এতদিন তাহাদিগকে কিছু
সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল ।

এতদিন পরে সেখানকার একজন
সুপণ্ডিত অধ্যাপক প্রগাঢ় গবেষণা সহকারে
শ্রীচরণের মহিমা আবিষ্কার করিয়া তাহাদের
বহুকালের কলঙ্ক বিদূরিত করিয়াছেন ।
অধ্যাপক মহাশয়ের মতে শ্রীচরণ কেবল
শরীর বহনের উপযোগী যন্ত্রমাত্র নহে;
ইহা প্রকৃতি-বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক শক্তির
বাচক । শ্রীচরণের দৈর্ঘ্য প্রস্থের উপরেই

প্রকৃতির কোমলতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, এবং চিত্তবৃত্তির সম্ভাবিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাঁহার মতে, চরণদ্বয়কে উপযুক্তরূপে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে পারিলেই সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং চরিত্রের কমনীয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য অধ্যাপক মহাশয়ের মতে যতক্ষণ সম্ভব অনাবৃত পদে থাকা কর্তব্য, এবং অভাবে ঢিলা ঝড়মের আয় চটিজুতা ব্যবহার করা উচিত। ছেলেদের জুতা দিতেই নাই এবং এক জুতা উপর্যুপরি দুইদিন পায়ে দিতে নাই।

অধ্যাপক মহাশয়ের মতে শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যও শ্রীচরণের পরিণতি একান্ত প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ চল্লিশ বৎসর বয়সের পরে অধিকাংশ লোকেরই ‘বপু’র সহসা কিঞ্চিৎ ‘প্রকর্ষ’ ঘটয়া থাকে। সুতরাং পূর্ন হইতে চরণদ্বয়কে পরিপুষ্ট করিয়া না রাখিলে এ বয়সে শরীর বহন কিঞ্চিৎ ক্লেশকর হইয়া উঠে। সুতরাং শ্রীচরণ নিত্য উপেক্ষার বস্তু নহে।

পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে এই অভয়বাণী শুনিয়া তাই আবার আশা হইতেছে যে, এখনো আরও কিছুকাল ধরিয়া “চরণ-যাচক” “হৃদয়পাবক” রূপে প্রেমিকের হৃদয় দক্ষ করিবে, কবি স্থানিত চরণে স্থলকমলের শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবেন, ভক্ত ‘কোমল’ বগিয়া “কমল পায়” শরণ লইয়া কৃতার্থ হইবে এবং ভগবানের বক্ষস্থল হইতে “ভৃগুপদচিহ্ন” আরও কিছুকাল বিলুপ্ত হইবে না।

অধ্যাপক মহাশয়ের অভয়বাণী সার্থক হউক। ভারতের কলকণ্ঠ হইতে “উদার পদপল্লবের” সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া জগতের অগাধ জাতি চরণের মর্যাদা উপলব্ধি করুক, চীনের পীতচরণ হইতে কাষ্ঠপাছুকার কঠোর নিগড় খসিয়া যাক, এবং ইউরোপের সংকীর্ণ পাছুকা আপনার ক্ষুদ্র বক্ষ হইতে খেত শতদল বিমুক্ত করিয়া দিক, আমরা চরণভক্ত হিন্দুজাতি খেত, পীত নানা বর্ণের শ্রীচরণে অলঙ্কার অরুণরাগ দেখিয়া কৃতার্থ হই।

শ্রীশ্রীচরণ দাসগুপ্ত ।

বিলাতে সার্বজনীন সাধারণশিক্ষা

আমাদের দেশে যঁারা জোর করিয়া সকুল লোককে স্কুলে পাঠাইয়া বর্ণজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁরা যদি বিলাতে কি কারণে ও কিরূপ অবস্থাধীনে এই সার্বজনীন শিক্ষার বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে, এটা একবার তলাইয়া দেখেন, বড়ই ভাল হয়। কারণ বিলাতে যেরূপ বিধান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তার অনুরূপ

বিধান এ দেশে প্রবর্তিত করা যে এখন অসম্ভব ও অসম্ভব, উভয় দেশের সমাজ-প্রকৃতির ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলে, ইহা অতি সহজেই বোঝা যাইবে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ আমাদের সমাজে এরূপ জবরদস্তির বর্ণজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার কোনো অপরিহার্য প্রয়োজন এখনো উপস্থিত হয় নাই। আর যে সামান্য

পরিমাণ লোকের বর্ণজ্ঞান জন্মিবার প্রয়োজন আপনারা অনুভব করিতেছেন, সেই পরিমাণে এ শিক্ষাও আপনাদের হইতেই দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তার জন্ত কোনো প্রকারের জোরজবরদস্তি করা একান্তই অনাবশ্যক। আজ আমাদের এই বাংলা দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে যে পরিমাণ লোক লেখাপড়া জানেন, বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে তত লোক জানিতেন না। আবার দশ বৎসর পরে এই বর্ণজ্ঞান আরও যে অনেকটা ছড়াইয়া পড়িবে, তারও কোনো সন্দেহ নাই। আর এই অতি সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে আপনাদের হইতেই যখন দেশের অধিকাংশ লোক বর্ণজ্ঞান হইয়া উঠিবেই উঠিবে, এবং এই বর্ণজ্ঞানের যা কিছু ফলাফল তাহা লাভ করিতে পারিবে, তখন অমন রাতারাতি তাদের গলায় দড়ি দিয়া স্থলে টানিয়া আনিবার জন্ত কোনো ব্যাকুলতার কারণ দেখা যায় না। দেশের সাধারণ লোকের একরূপ লেখাপড়া শিক্ষার পক্ষে যদি কোথাও কিছু অন্তরায় থাকে, তাহা সর্বপ্রথমে দূর করিয়া দাও। যে গ্রামে স্থল-পাঠশালা নাই, সেখানে এগুলি স্থাপিত কর। যারা স্থল-পাঠশালায় আপনাদের হইতে পড়িতে আসিতে চায়, প্রয়োজন হইলে, তাহাদিগকে পাঠ্য পুস্তকাদি কিনিয়া দিবার ব্যবস্থা কর। দিনের বেলায় যারা আপনাদের পৈত্রিক ব্যবসায় নিযুক্ত থাকে বলিয়া, পাঠশালায় আসিতে পারে না, তাদের জন্ত নৈশ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা কর। যারা পাঠশালার অতি সামান্য বেতন পর্যন্ত জুগাইতে পারে

না, তাদের বিনা বেতনে পড়িতে দাও। সাধারণ বয়স্ক লোকদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্ত কথকতা, ছায়াবাজি, বায়স্কোপ, এ সকলের ব্যবস্থা করিয়া, বিনা বর্ণজ্ঞান-শিক্ষায় যাহাতে তাহাদের চিন্তা ও ভাব বাড়িয়া উঠিতে পারে, তার আয়োজন কর। কিন্তু যার যে বিষয়ে রুচি জন্মায় নাই, যার এই বর্ণজ্ঞান লাভ করিবার জন্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে আইনের ভয় দেখাইয়া, রাজবিধানের ও রাজদণ্ডের শাসনে জোর করিয়া পাঠশালায় আনিবার জন্ত ব্যস্ত হইও না। ইহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই ফলিবার সম্ভাবনা বেশি। আর এই কুফলের আশঙ্কাতেই এই উদ্ভট ও অতুষ্করণের সংস্কার-প্রয়াসের প্রতিবাদ করা হয়; নতুবা দেশের জনসাধারণে চিরদিন অজ্ঞ হইয়া থাক, ইহা যেমন সংস্কারকেরা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না, যারা তাঁদের এই চেষ্টার প্রতিরোধ করা কর্তব্য জ্ঞান করেন, তারাও ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় ভাবেন না ও বলেন না।

বিলাতে কিছুকাল হইতে যে জবরদস্তির সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহারও যে কোনো কুফল ফলিতেছে না, এমন নয়। চৈত্রের সংখ্যার বঙ্গদর্শনে এ সকল কুফলের কতকটা আলোচনা করিয়াছি। সেখানেও এই জোরজবরদস্তি না করিলেই, বোধ হয়, ভাল হইত। তবে বিলাতী সমাজের প্রকৃতি যেরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে যে ভাবে, নানা কারণে, পরিবারের স্নেহের সঞ্চয়ক কতকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, আর সর্বোপরি

সে দেশের জনগণমধ্যে অমিতাচার যে আকারে কিছুদিন পূর্বে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সকল সময়ে কেবল পিতামাতার সহজ স্নেহমমতার উপরেই সন্তানসন্ততিদের শিক্ষাদীক্ষার ভার ফেলিয়া রাখা হয় ত সম্ভব হইত না। সে অবস্থায় গরিব গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় হয় ত অল্পবয়সে রাজপথকে আশ্রয় করিয়াই দিন কাটাইত, এবং তাহার ফলে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে শ্রুণ্ডিকা-লয়কেই আশ্রয় করিয়া জীবনক্ষয় করিত। বিশেষতঃ সে দেশে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা ক্রমে এতটাই বাড়িয়া পড়িতেছিল যে, অনেক সময় মিতাচারী পিতামাতার পক্ষেও আপন আপন জীবিকা-উপার্জনের চেষ্টায় বিব্রত থাকিয়া, তার উপরে আবার ছোট ছোট শিশুদিগের যথাযোগ্য তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। বিলাতের গরিব লোকেরাই খাটিয়া খায়, আর আমাদের গরিব লোকেরা বিনা খাটুনিতেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে, তাহা নয়। আমাদের গরিবদিগকেও খুবই খাটিতে হয়। তবে আমাদের খাটুনির ক্ষেত্র ও ধরণ, বিলাতের গরিব লোকদিগের খাটুনির ক্ষেত্র ও ধরণধারণ হইতে স্বতন্ত্র। বিলাতে গরিব লোকদিগকে কলের বা খনির মজুরী করিতে হয়। প্রত্যয়ে ৬।০টা কি ৭টা হইতে ১২টা কি ১২।০টা পর্য্যন্ত, ও আবার ১টা কি ১।০টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা কি ৫।০টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই সকল কারখানায় যাইয়া পাটিতে হয়। সুতরাং কার্যতঃ সমস্ত দিনের মধ্যে তারা আপনাদের সন্তানসন্ততির, মুখ একবারও

দেখিবার সুযোগ পর্য্যন্ত অনেক সময় পায় না, তাদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করা তো দূরের কথা। দুগ্ধপোষা শিশুদিগকে সারাদিনের জন্ত একটা নির্দিষ্ট পয়সা দিয়া কোনো ধাত্রীর হাসপাতালে,—ইংরেজিতে এ গুলিকে বেবি-ফার্ম (Baby-Farm) বলে,—রাখিয়া যায়, সন্ধ্যাবেলা কলকারখানা হইতে ফিরিবার সময় আবার বাড়ী লইয়া আসে। আর যারা একটু বয়স্ক, পূর্বে অনেক সময়ই তাহাদিগের হাতে দুপ্রহরের আহারের জন্ত একটা ছুটা পয়সা দিয়া, একরূপ রাত্ৰায়ই ছাড়িয়া যাইত। সুতরাং এই অবস্থায় তাদের জোর করিয়া স্কুলে লইয়া গিয়া, সেখানে আটকাইয়া রাখার ব্যবস্থাতে অনেক লোকেরই কতকটা সুবিধা হইয়াছিল। এই সুবিধাটুকু না হইলে, বিলাতের লোক-মত, কেবল কতিপয় সংস্কারকের সাদু ইচ্ছার ও উন্নত আদর্শের চরিতার্থতার জন্ত, এই জবরদস্তির লেখা-পড়ার ব্যবস্থার সমর্পণ করিত না। কিন্তু আমাদের দেশের একরূপ অবস্থা এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমাদের দেশের গরিব লোকদের জীবিকা-উপার্জনের চেষ্টায় পারিবারিক জীবনটা এখনো এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় নাই। আমাদের সমাজের গরিব জীলোকেরাও খাটিয়াই খায়; কিন্তু এখনো কি পুরুষ কি স্ত্রী, কাহাকেই কলকারখানার জেলখানায় যাইয়া দিনের ১০।১২ ঘণ্টা আবদ্ধ থাকিয়া, প্রতিদিনের অন্নমুষ্টি সংগ্রহ করিতে হয় না। পুরুষেরা বাহিরে যাইয়া খাটে, স্ত্রীলোকেরা হয় নিজের ঘরে বসিয়া না

হয় অতি নিকট প্রতিবেশীদের বাড়ীতে যাইয়া সামান্য শ্রম করিয়া, পরিবারের তহবিলে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্ৰহ করিতে চেষ্টা করে। এক্ষণ প্রকারের খাটুনির ব্যবস্থায় দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে বেবী-কারমে (Baby-Farm) কিম্বা অল্পবয়স্ক বালকবালিকা-দিগকে পথে ঘাটে রাখিয়া যািতে হয় না। সুতরাং লেখাপড়া শিক্ষা করা ছাড়াও যে আর একটা প্রয়োজনে বিলাতে এই জ্বরদস্তির বর্ণজ্ঞানদানের ব্যবস্থা লোক-মতের দ্বারা সমর্থিত হইয়া, দেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে প্রয়োজন আমাদের সমাজে এখনো উপস্থিত হয় নাই। আর যে অল্পকরণলিপ্সা এই সংস্কারচেষ্টার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ইহাতে একটা কৃত্রিম শক্তি সঞ্চার করিতেছে, তাহা যদি যথা-সময়ে প্রতিহত ও উন্মূলিত হইয়া যায়, এবং বিলাতের দেখাদেখি, রাতারাতি ধনী হইয়া উঠিবার লালসায় আমরা যদি এদেশেও কলকারখানা বসাইবার জ্ঞাত সর্বশ্রম পণ করিয়া না বসি, তবে, ঈশ্বর-কুপায়, হয়ত কখনোই আমাদের সমাজে এই “সর্ব্বেনশে” প্রয়োজন উপস্থিত হইবে না।

অতএব ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব যে বিলাতে যে জ্বরদস্তির সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে কেবল একদল ইংরেজ সমাজসংস্কারকের দেশহিতৈষ্য ও লোকহিতৈষ্যতার আতিশয্যই বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু সমাজের ভিতরকার কতকগুলি অপরিহার্য প্রয়োজনও বিদ্যমান ছিল। বহুকাল ধরিয়া বিলাতের সমাজের প্রকৃতি এমনি ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল, সে

দেশের পারিবারিক ও স্নেহমমতার স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও বন্ধন সকল এমনি ভাবে শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা ও পণ্য-উৎপাদন-প্রণালী এমনি ভাবে পরিবর্তিত হইতেছিল, ব্রিটিশ জাতির রাষ্ট্রব্যবহার ও ঐতিহাসিক বিবর্তন এমনি একটা পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, সে পথের অপরি-হার্য প্রয়োজনের অনুরোধে, সে দেশে এই জ্বরদস্তির লেখাপড়ার বিধান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। কলতঃ বিলাতের এই সার্বজনীন সাধারণশিক্ষার ব্যবস্থাটী, নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে, একাকী দাঁড়াইয়া আছে, এমনি নয়। তার সমজাতীয় আরো দশটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার মাঝখানে, সে সকল বিধিব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াই, সেখানে এই বিশেষ বিধানটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর এই সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থার দরুণ, প্রতিদিনও আরো কতকগুলি নূতন নূতন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। এ সকল অভিনব বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে, সার্বজনীন সাধারণশিক্ষাবিধিও আপনার সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না। আর বিলাতী সমাজের ভিতরকার ও চারিপাশের যে সকল অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে বিলাতের সার্বজনীন সাধারণশিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে, তাহার বিচার না করিয়া, কেবল একটা নিগূণ সংস্কারলিপ্সার চরিতার্থতার জ্ঞাত, বিলাতের অনুকরণে, আমাদের এখানে এই জ্বরদস্তির বর্ণশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিলে, সমাজে অকারণ

একটা বিপ্লবী উপস্থিত এবং দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অনর্থক কতকগুলি গুটিল সমস্যার সৃষ্টি হইবে। আর এই জন্তই এই উদ্দেশ্য সংস্কারচেষ্টাকে সর্বপ্রথমে সংঘত করা আবশ্যিক।

আমাদের সমাজের প্রকৃতির ভিতরে ও বর্তমান সামাজিক অবস্থা হইতে, বিলাতের মতন জোর করিয়া দেশের সকল বালকবালিকাকে স্কুলে পাঠাইবার যে কোনো অপরিহার্য প্রয়োজন এখনো উপস্থিত হয় নাই, এ কথা এই সংস্কারের প্রবর্তক ও পরিপোষকগণও বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ফলতঃ যাহারা এই বিলাতী আইন আমাদের দেশের গরিব লোকদের স্বক্ষে চাপাইবার জন্ত এতটা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহারাও এ পর্যন্ত এরূপ কোনো বিশেষ সামাজিক প্রয়োজন দেখাইতে পারেন নাই। লেখাপড়া শিখিলে সাধারণভাবে মানুষের কি কি উপকার হইয়া থাকে, এ সকল কথাই সর্বদা গুনিয়া থাকি। এ সকল কথা তো কেহ অস্বীকারও করে না। কিন্তু শুদ্ধ এই সকল সাধারণী যুক্তির বলেই বিলাতে বা অথ কোনো দেশে জোর করিয়া দেশের সকল লোককে লেখাপড়া শিখাইবার বিধান প্রচলিত হয় নাই। পাণ্ডা-পাত্রীদের এ সকল অভ্যস্ত বুলী বক্তৃতার বকুনীরূপেই বিশেষ কাজে আসে; এ সকলের জোরে কোনো বিরাট-সমাজ আপনার 'স্বাভাবিক গতিবেগকে বাড়াইয়াও দেয়' না, চাপিয়াও রাখে না। ফলতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনো জীব আপনার আভ্যন্তরীণ

প্রয়োজনের প্রেরণা ব্যতীত, কেবল একটা বড় উপদেশ গুনিয়া বা অতি উচ্চ আদর্শ দেখিয়া, কোনো বিষয়ে আপনার শক্তি প্রয়োগ করে না। যতক্ষণ না জীবন-সংগ্রামে ঐয় লাভ করিয়া আয়ত্ত্বকার জন্ত কোনো কিছু গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া উঠে, কোনো জীব ততক্ষণ সে বিষয়ে চেষ্টিত হয় না। এইরূপ সমাজ-জীবও অপরিহার্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বিষয়ে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে চাহে না। কোনো বিশেষ সাধনা আয়ত্ত্ব করা, কোনো বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা, কোনো প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে পরিহার করিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা, এ সকল যতক্ষণ কোনো সমাজের পক্ষে জীবন-মরণের কথা না হইয়া দাঁড়ায়, ততক্ষণ সে সমাজ কখনো সে সকল বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া, আপনার দেহের বোঝা ও কর্মের দায় খামাকা বাড়াইয়া তোলে না।

নরবলি, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন, রাজপুত্রদিগের কণ্ঠাহত্যা প্রভৃতি মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর কণ্ঠকগুলি প্রথা ইংরেজ সরকার জোর করিয়াই তুলিয়া দিয়াছেন; দেশের লোকের মত গ্রহণ করিয়া এ সকল নিষেধ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, হইতেই পারিত না। অতএব জোর করিয়া এখন যদি সকলকে স্কুলে পাঠানোই হয়, কিছু দিন পরে, লোকমতে ও সমাজের অভ্যাসে এই ব্যবস্থাটা যখন স্থায়িত্ব লাভ করিবে, তখন জবরদস্তির দরুণ যে অসুবিধা ও অযঙ্গলটুকু আপাতত হইতেও বা পারে, তাহার আর কোনো

আশঙ্কা থাকিবে না, কেহ কেহ এইভাবে এই সংস্কার-চেষ্টার সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু নরবলি, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন, এ সকল প্রথা কখনো সমাজের সর্জনকে বা অধিকাংশ লোককে স্পর্শ করে নাই। অতীতকালে অনেকের সহজ-মাছুষী বুদ্ধি ও সহৃদয়তাই এ সকল প্রথার স্বল্পমাত্রার বিরুদ্ধাচরণ করিত। এ সকল প্রথা রহিত হইয়া, সমাজের ভিতরে সাক্ষাৎভাবে এমন কোনো প্রকারের পরিবর্তন আনয়ন করে নাই, যে পরিবর্তনের ফলে সমাজ-প্রকৃতির বা সাধারণ সামাজিক রীতিনীতির কোনো বিশেষ ও স্থায়ী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। জোর করিয়া সকল বালকবালিকাকে স্কুলে আনিবার ব্যবস্থা এ জাতীয় নহে। স্মৃতরাং নরবলি, সতীদাহ, প্রভৃতির নজীর এখানে একেবারেই খাটে না।

কিন্তু এই সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে বিলাতের সমাজ-প্রকৃতির ও সামাজিক অবস্থার যেমন ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী সন্ধ আছে, তাহার আধুনিক রাষ্ট্রনীতির সঙ্গেও ইহার সেইরূপ সন্ধাই রহিয়াছে। আর বিলাতে এই সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা যে উদার রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এদেশের বর্তমান অবস্থায় সে নীতির প্রতিষ্ঠা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ লোকাহিতার্থে কিছুতেই বাঞ্ছনীয়ও নহে। প্রত্যেক রাষ্ট্রশক্তির বা রাজশক্তির কতকগুলি মুখ্য আর কতকগুলি গৌণ কর্তব্য আছে। প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করা এবং স্বরাষ্ট্রকে পররাষ্ট্রশক্তির

বা পররাষ্ট্রশক্তির আক্রমণ ও উৎপাত হইতে রক্ষা করিয়া, প্রজাসাধারণের স্বাভাবিক স্বত্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাই প্রত্যেক রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রথম কর্তব্য। জাতির রাষ্ট্রশক্তি, যে আকারেই সংঘটিত হউক না কেন, তাহা কোনো সেনাপতি বা লোকপতিকেই আশ্রয় করিয়া আশ্রয়প্রকাশ ও আশ্রয়প্রতিষ্ঠা করুক, কিংবা কোনো বিশেষ অভিজাত শ্রেণীকে আশ্রয় করিয়াই আশ্রয়প্রকাশ ও আশ্রয়প্রতিষ্ঠা করুক, অথবা দেশের আপামর সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহা রাজতন্ত্রই হউক আর প্রজাতন্ত্রই হউক, স্বৈচ্ছাতন্ত্র বা অটক্র্যাটিকই (autocratic) হউক, কিংবা প্রজাতন্ত্র বা ডিমক্র্যাটিকই (democratic) হউক, সকল অবস্থাতে ও সকল আকারেই প্রত্যেক রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তিকে সর্বদা এই মুখ্য উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর হইতেই হয়। যেখানেই কোনো রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি এই মুখ্য কর্তব্য পালনে অপারগ বা পরাজুহ হয় সেখানেই সমাজস্থিতি রক্ষা পায় না, সমাজ বিপ্লবের মুখে যাইয়া পড়ে, রাষ্ট্রশক্তি বা রাজশক্তি বিপর্যস্ত হইয়া যায়, ও সমাজরক্ষার জন্ত নূতন ব্যবস্থার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের জানোয়ার্তি-বিধান, রাষ্ট্রের পক্ষে যৎসম্বলকর হইলেও রাষ্ট্রশক্তির একটা মুখ্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হয় না। যেখানে রাষ্ট্রীয় সেনাগণের গতিবিধির জন্ত ও পররাষ্ট্রশক্তির আক্রমণ ও উৎপাত হইতে রাজ্যরক্ষার জন্ত রাজপথ

নিৰ্মাণ করা, অনাবশ্যক, সে সকল স্থলে কেবল প্রজাগণের গতিবিধির বা ব্যবসাবাগিচ্যের জন্ত এ সকল পথ বা পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করা, দেশের উন্নতি কল্পে প্রয়োজনীয় হইলেও, রাষ্ট্রশক্তির মুখ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্য-রক্ষার বা আর্থিক উন্নতির বা জ্ঞানলাভের জন্ত নানাবিধ সময়োপযোগী বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন এবং অধিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা, এ সকলই রাষ্ট্রের গৌণ কর্তব্যের অন্তর্গত। আর যতদিন না রাষ্ট্রশক্তি স্বল্পবিস্তর পরিমাণে প্রজাসাধারণের হস্তগত হইয়াছে, অর্থাৎ যতদিন না দেশের শাসন-ব্যবস্থা একান্তই নিয়মতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র হইয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত কোনো সমীচিন রাষ্ট্রনীতিবিদই পরকরায়ত্ত রাষ্ট্রশক্তির হস্তে এ সকল গৌণ কর্তব্য পালনের গুরুভার অর্পণ করিতে অগ্রসর হন না। যতদিন পর্য্যন্ত বিলাতের রাষ্ট্রশক্তি সম্যকরূপে প্রজাসাধারণের হাতে আসিয়া পড়ে নাই, যতদিন পর্য্যন্ত একদিকে রাজার অধিকার ও অন্যদিকে প্রজার স্বত্ব-স্বাধীনতা, এ দু'এর মধ্যে একটা নিত্য বিরোধ ও প্রতিযোগিতা জাগিয়া ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত কোনো সমীচিন ইংরাজ রাষ্ট্রনীতিক রাষ্ট্রশক্তির বা রাজশক্তির হস্তে লোকশিক্ষার ভার এমনভাবে অর্পণ করিয়া, দেশে আইনের জোরে সার্বজনীন সাধারণশিক্ষা প্রবর্তিত করিতে চাহেন নাই। লোকশিক্ষা যার হাতে থাকে সে-ই কালক্রমে দেশের ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিতে পারে। রাজা-প্রজার স্বত্বস্বার্থের

সম্পূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্য যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ততদিন রাজশক্তির হস্তে একান্তভাবে লোকশিক্ষার ভার অর্পিত হইলে, সে রাজ্যে প্রজার স্বত্বস্বাধীনতার সম্প্রসারণ অসাধ্য না হইলেও নিতান্তই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। আমাদের ইংরেজি-নবিশ রাষ্ট্রনীতিকেরা বিলাতের লিবারেল সম্প্রদায়ের দিবিয়া দিয়া সকল কাজই করিতে চান, কিন্তু তাঁদের নকলনবিশী রাষ্ট্রবুদ্ধিতে এই সামান্য তথ্যটা ধরা পড়ে না। যতদিন ইংলণ্ডে রাজার অধিকার ও প্রজার স্বত্বস্বাধীনতার মধ্যে একটা বিরোধ ও প্রতিযোগিতা জাগিয়া ছিল, ততদিন যে বিলাতের লিবারেল সম্প্রদায় রাজশক্তির আধিপত্যকে প্রতিহত করিবার জন্ত, দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে তাহার মুখ্য কর্তব্যের গণ্ডি অতিক্রম করিতে দেন নাই, প্রজার ধনপ্রাণ ও পররাষ্ট্রের আক্রমণ ও উপদ্রব হইতে স্বরাষ্ট্রকে রক্ষা করা ব্যতীত, আর প্রায় কোনো কার্য বাহাতে তাহার হস্তগত না হয়, প্রাণপণে তার চেষ্টা করিয়াছেন; এই অতি সামান্য কথাটা ইহার সর্বদাই ভুলিয়া যান। আর এই জন্তই যে বুরোক্রাসির (Bureaucracy) বা রাজকর্মচারী-তন্ত্রের হস্ত হইতে দেশের প্রজাসাধারণের স্বত্বস্বাধীনতাকে উদ্ধার করিবার জন্ত তাঁরা কালে অকালে এমন আন্দোলন আন্দার করিয়া থাকেন, সেই বুরোক্রাসির হাতেই একান্ত ভাবে আবার লোকশিক্ষার অধিকারটা ভুলিয়া দিবার ঐ এত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন।

ফলতঃ রাষ্ট্রশক্তিপ্রয়োগে, বিধিব্যবস্থার

জোরে, সর্বসাধারণের মধ্যে বর্ণজ্ঞান প্রচার করিবার বিধান যে সাধারণ রাষ্ট্রনীতির অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইংরাজিতে তাহাকে ষ্টেট সোসিয়ালিজম (state socialism) বলে। যে বিশেষ সমাজ-নীতি যুরোপে সোসিয়ালিজম (socialism) নামে প্রচারিত হইতেছে, এই ষ্টেট সোসিয়ালিজম (state socialism) তাহারই অন্তর্গত। মোটামোটি সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায় এই বলেন যে, যে সকল বিষয়ের উপরে সমাজের জনগণের জীবন ও জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যসাধন একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে, সে সকল বিষয়কে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের অপরিহার্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করিয়া, সমাজের সর্বসাধারণের প্রতিভূস্বরূপ যে রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি তারই হস্তে অর্পণ করা কর্তব্য। এ সকল বিষয়ে কোনো বিশেষ ব্যক্তির বা কোনো বিশেষ পরিবারের বা সম্প্রদায়ের কোনো প্রকারের বিশেষ দাওয়াদাবী থাকিবে না। মানুষের বাঁচিবার জন্ত তিনটি বস্তুর ঐকান্তিক প্রয়োজন হয়। এক বায়ু, দ্বিতীয় জল ও তৃতীয় মাটি বা জমি। এই তিন বস্তুর দুইটি সর্বসাধারণের সম্পত্তি, এ দুটির উপর কারো কোনো বিশেষ অধিকার নাই। জল ও হাওয়ার জন্ত, মোটের উপরে, কেহ কোনো খাজানা দাবি করিতে পারে না। কিন্তু জমির অবস্থা স্বতন্ত্র। যুরোপের প্রায় সর্বত্রই জমিটা বিশেষ বিশেষ জমিদারের সম্পত্তি। এ জমির উপরে সর্বসাধারণের কোনো অধিকার নাই। যার যেমন প্রয়োজন সে সেরূপভাবে এই জমি

ব্যবহার করিতে পারে না। জমিদারের খুসিমত, তাহাকে খাজনা দিয়া তবে লোকে সে জমিতে বসবাস ও সে জমির চাষ করিয়া তাহা হইতে আপনার খাজাদি সংগ্রহ করিতে পারে। সোসিয়ালিষ্টগণ বলেন, এ জমিতে জমিদারের কোনো অধিকার থাকিবে না। জমি সাধারণের সম্পত্তি হইবে, আর রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি যখন জনসমাজে জনসাধারণের একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হইয়া আছে, তখন জমির সর্ববিধ স্বত্ব এই রাষ্ট্রশক্তিরই থাকিবে। জমির খাজানা কোনো ব্যক্তি বিশেষে দাবী করিতে পারিবেন না; জমিতে যদি কোনো গাছপালা বা খনি থাকে, সে ধনও রাষ্ট্রেরই হইবে, জমিদার আত্মসাৎ করিতে পারিবেন না। আর শুধু জল ও বায়ুর উপরে সাধারণের অধিকার থাকিলেই তো হয় না। এ জল বিপুল, পানের উপযুক্ত, ও গছন্দে পাওয়া যায়, এমন করা চাই। আর হাওয়াটাও যাতে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। সুতরাং এ সকল কাজও রাষ্ট্রের হস্তেই গুস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার পর, কেবল জমি, জল, ও হাওয়াতেও মানুষ মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। জমি হইতে পণ্য উৎপন্ন হয়। এ সকল পণ্য উৎপাদনের প্রকৃষ্টতর উপায় উত্তরোত্তর উদ্ভাবিত হইয়া, সমাজের ধনীদেব হাতে একটা বিপুলশক্তি ও সাংঘাতিক অধিকার অর্পণ করিতেছে। সাধারণ জনগণ ইহাদের কলকারখানায় যাইয়া খাটিয়া প্রাণান্ত হয়, কিন্তু তাহাদের পরিশ্রমের সমুদয় ফল তাহারা নিজেরা

উপভোগ করিতে পায় না। ধনীর মুনাফার আকারে সে কলের অনেকটাই তাঁহাদেরই করকবলিত হইয়া পড়ে; জনেরা শুদ্ধ পারিশ্রমিক মাত্র পাইয়া, কায়ক্ৰেশে জীবন-ধারণ করে। এ ব্যবস্থাও রদ হওয়া আবশ্যক। যেমন সকল কার্যের মূল্যধার যে জমি, তাহা কাহারো বিশেষ স্বত্বাধীন থাকিবে না, সেইরূপ এই সকল পণ্য উৎপাদন করিবার যন্ত্রতন্ত্রেও কাহারো বিশেষ স্বত্ব বা অধিকার থাকিবে না। এ সকলও রাষ্ট্রেরই অধীন হইয়া, সর্ব-সাধারণের কাজে আনা চাই। সমাজের এক দল লোক খাটিয়া মরিবে, আর একদল অতি মুষ্টিমেয় লোক খাটিবেন না, অথচ সাধারণ লোকের শ্রমের অধিকাংশটাই আয়সাৎ করিবেন, এ ব্যবস্থা ঠায়াহুমোদিত নহে, ইহারও পরিবর্তন অত্যাৱশ্যক। পণ্য উৎপাদনের উপায় সকলও (ইংরেজীতে ইহাকে instruments of production বলে) জনসাধারণের যে রাষ্ট্রশক্তি তারই কর্তৃত্বাধীনে ও অধিকারে থাকিবে। উৎপন্ন পণ্যের মুনাফা কোনো ব্যক্তি বিশেষে বা সমবায় বিশেষে দাবী করিতে পারিবে না। যে পণ্য হইতে যে রূপ মুনাফা হইবে, তাহার কিয়দংশ রাষ্ট্রের সাধারণ কার্যে ব্যয়িত হইবে, আর বাকী স্ফটাই শ্রমজীবীগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু কেবল জমি বা কলকজাতেই তো আর পণ্য উৎপন্ন হয় না। তার জন্ত মানুষের শক্তি-সাধ্য ও বিদ্যাবুদ্ধিরও তা একান্তই আবশ্যক। সুতরাং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির শক্তি-সাধ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি বাড়াইবার

জন্ত যাহা কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক, রাষ্ট্রশক্তিকে তাহাও করিতে হইবে। যেমন জমির খাজানা বলিয়া একটা কিছু কাহাকেও দিতে হইবে না, কলকারখানার মুনাফা বলিয়া কেহ এই সকল কল-কারখানায় উৎপন্ন পণ্যের মূল্যের কোন একটা ভাগ নিজেরা লইতে পারিবে না, সেইরূপ জনগণের শক্তিসাধ্য ও বিদ্যাবুদ্ধির বিকাশের জন্ত যাহা কিছু ব্যবস্থা আবশ্যক হয়, তাহার জন্তও কেহ কোন টাকা দাবী করিতে পারিবে না। সকলেই কিছু না দিয়া এই সকল বিধিব্যবস্থার সাহায্যে যথাসম্ভব শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিতে পারিবে। সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায়ের এই মত। বিলাতে বা অপর কোথাও সম্পূর্ণভাবে এ মত এখনো গৃহীত হয় নাই। কিন্তু ক্রমেই যে এ সকল সিদ্ধান্ত যুরোপের রাষ্ট্রীয় বিবর্তনে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। যে সার্বজনীন সাধারণশিক্ষা বিলাত প্রভৃতি দেশে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা এই সোসিয়ালিষ্ট নীতিরই উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিরই ইংরাজি নাম স্টেট সোসিয়ালিজম (state socialism) এই স্টেট সোসিয়ালিজম যুরোপে প্রজা-সত্ত্বের সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিলাতে গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রজাসাধারণের সুখ-সুবিধা-বৃদ্ধির কথা শিক্ষা-দীক্ষা বিধানের জন্ত যত কিছু বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তার প্রায় সকলগুলিই এই রাষ্ট্রনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে প্রজাসাধারণে

কেবল আপনাদের সন্তানসন্ততিগণের লেখাপড়ার ভারই রাষ্ট্রশক্তির হাতে দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বার্লিকোর অক্ষম অবস্থায় যখন তাহাদের আর খাটিয়া খাইবার শক্তি থাকিবে না, তখন যাহাতে রাষ্ট্রের কোষাগার হইতে সকলেই একটা নির্দিষ্ট বৃত্তি পাইতে পারে, তারও ব্যবস্থা করিয়াছে। এই নূতন বার্লিকোর পেন্সনের ব্যবস্থা অনুসারে, ৬৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক ইংরেজই, তার জীবিকার অল্প উপায় না থাকিলে, সপ্তাহে পাঁচশিলিং বা ৩৫০ আনা হিসাবে আমরণ কাল পর্য্যন্ত পেন্সন পাইতেছে। এই সম্প্রতি যে ইনশুর্যান্স আইন পাশ হইয়াছে, তাহাতে কর্মক্ষম লোকও যখন ব্যায়ারামে পড়িয়া, কিম্বা কর্মের অভাবে উপার্জন করিতে অপারগ হইবে, তখন তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছে। যেমন সার্কজনীন সাধারণশিক্ষার ব্যবস্থা, তেমনি বার্লিকোর পেন্সনের বিধান এবং এই নূতন ইনশুর্যান্স আইন (Insurance Act) এ সকলই একই সাধারণ রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত। আর বিলাতে এই নীতি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। দেশের সকা বালকবালিকাকে স্কুলে লইয়া গিয়াই ব্রিটিশরাজ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। এরূপ জোর-জবরদস্তির ফলে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাইতেছে বটে, কিন্তু পিতামাতা তাদের উপযুক্ত অন্তরঙ্গের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না, বা করিতেছে না। সুতরাং এখন অনেক বালকবালিকাদিগকে সরকারের খরচে খাওয়াইবারও ব্যবস্থা

করিতে হইতেছে। অনেক স্থানেই অন্ততঃ স্কুলের ছেলেমেয়েদের দুপ্রহরের আহারের ব্যবস্থাটা স্কুলের কর্তৃপক্ষগণকেই করিতে হইতেছে। কখনো কখনো তাদের দুইয়া মুছিয়া ছেঁড়া ও নোংড়া কাপড় চোপড় ছাড়াইয়া দিয়া, পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরাইয়া তবে স্কুলে রাখিতে হয়। সুতরাং কেবল বেতন না লইয়া লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাতেই এই সংস্কারের সার্থকতালাভ হইবে না। ক্রমে অপর অনেক বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারত সরকার এ জ্ঞাত কবে যে এত টাকা টাকা খরচ করিতে পারিবেন, বলা যায় না। আর পারিলেও তাহা করাই কর্তব্য হইবে কি না তাহাও ভাবিবার কথা। এরূপ ভাবে সন্তানগণের সকল ভারই যদি রাজা আপনার হাতে গ্রহণ করেন, তাহার ফলে দেশের লোকের সহজ সন্তান-বাৎসল্য যে ক্রমে নষ্ট হইবার কতটাই আশঙ্কা আছে ইহা ভাবিলেও ভয় হয়। মানুষের ভাল মন্দ কোন প্রবৃত্তিতেই যে নিরাকার সাধন সম্ভব নহে, আজিকালিকার দিনেও আমাদের আধুনিকশিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের এ সহজ কথাটা বুঝিতেও কিছু সময় লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

বিলাত প্রভৃতি দেশে সার্কজনীন সাধারণশিক্ষা যে বিশেষ রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত, এদেশে সে নীতি প্রবর্তিত হইবার সময় এখনো আইসে নাই। এই রাষ্ট্রনীতি (state socialism) প্রজাস্বত্বের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই যুরোপে ক্রমে তর্জালাভ করিতেছে। স্বৈচ্ছাচ্ছন্দ শাসনে

এ নীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলেও কদাপি কল্যাণকর হয় না, হইতেই পারে না। আমাদের নকলনবিশী রাষ্ট্রনীতির পক্ষে এ সহজ কথাটা বোঝাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ষতদিন না শাসনযন্ত্রের উপরে শাসিতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ষতদিন না শাসনকর্তাগণ শাসিতের মুখাপেক্ষী হইয়া সর্বদা তাদের স্বত্বস্বার্থের ন্যায্য রক্ষা করিয়া চলিতে শিখিয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রশক্তির হস্তে প্রজার পারিবারিক বা বৈষয়িক বা সামাজিক কোনো কর্তব্য ও অধিকার অর্পণ করিতে যাওয়া যে একান্তই মূর্থতা, ইংরেজ রাষ্ট্রনীতি ইহা চিরদিনই জানিয়াছে। আমাদের দেশে এখন জোরজবরদস্তির লেখাপড়া প্রবর্তিত করিলে পুলিশের অধিকার ও অত্যাচার কতটা যে বাড়িয়া যাইবে এ কথা কি সংস্কারকেরা একটীবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন। কারণ এ আইন জারি করিবার ভার হয় পুলিশের উপরে না

হয় নূতন গ্রাম্য পঞ্চায়তের সভাপতির উপরেই অর্পিত হইবে। আর উভয় ক্ষেত্রেই জেলার রাজকর্মচারী যিনি, তাঁরই প্রভুত্ব আমাদের শিশুগণের শিক্ষাদীক্ষার উপরেও যাইয়া পড়িবে। একদিকে যাঁরা ঢাকায় একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে আর পূর্বপ্রদেশের লোকশিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন এই কথা শুনিয়া বুয়োরোক্রাসীর প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, অত্য়দিকে তাঁরাই আবার জোরজবরদস্তির লেখাপড়ার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন! আমাদের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনার পশ্চাতে যে নীতি বলিয়া কোন একটা কিছু নাই, এ সকলে তাহাই প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু নীতি-জ্ঞান না থাকিলেও যে বড় বড় রাষ্ট্রনীতিবিদ হইতে পারা যায়, ইহা কেবল বর্তমান ভারতবর্ষেই সম্ভব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

থিয়সফি

(G. De Lafontর ফরাসী হইতে)

এক্ষণে কেবল নব-বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এবং যে থিয়সফি শাক্যমুনির প্রচারিত মতবাদের একটা শাখা বলিয়া দাবী করেন, সেই থিয়সফি সম্বন্ধে আলোচনা করা বাকী আছে।

আমি এ স্থলে, আধুনিক থিয়সফির মত ও বিশ্বাস কি, অথবা সেই সকল মত ও

বিশ্বাসের সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য হয় কি না, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না; আমি শুধু আলোচনা করিব, বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া থিয়সফির যে দাবী সেই দাবীর প্রকৃত কোন ভিত্তি আছে কি না।

যে দার্শনিক সম্প্রদায় হইতে এই নূতন

সম্প্রদায়টি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহা মহাবান-পদ্ধতি হইতে নিঃসৃত এবং উহা যোগবাদের এক শাখা। উহা “যোগার্চ্যা” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্যিক ভারতে, দীর্ঘকাল হইতে যোগবাদসংক্রান্ত যে সকল সম্প্রদায়ের প্রাণ-ভাব হইয়াছে, উহা তাহাদেরই এক শাখা। কিন্তু Csoma, Barnouf, Wassiljew, Schlaginweit, Wilson,—ইহাদের মতে, যোগার্চ্যা-পদ্ধতি, অশ্ব-যুগের দশম শতাব্দীতে ভারত ও তিব্বতে প্রবর্তিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, এই সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থের নান সংস্কৃত ভাষায়—“কালচক্র” ও তিব্বতীয় ভাষায়,—“Dons Kyi Khorlo”।

এই গ্রন্থে, সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, কাল-গণনা-বিজ্ঞা, আলোচিত হইয়াছে। উহাতে কতকগুলি দেবতার বর্ণনা পাওয়া যায়। এমন কি, উহার মধ্যে নহগদীয় ধর্মেরও কথা আছে। উহা পরোপরি আদিবুদ্ধ হইতে আবির্ভূত বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। Schlaginweit বলেন, যোগবাদ-সংক্রান্ত মুখ্য ক্রিয়াকর্ম ও মূলমন্ত্রগুলির সহিত, সাইবিরীয়দিগের Shamanism এর আশ্চর্য মিল আছে। তা ছাড়া উহা অনেকটা হিন্দুদিগের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের অনুরূপ। যে ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই ত্রিলোকের অস্তিত্ব কেবল আমাদের কল্পনায় বিद्यমান এবং এই বিশ্বাস-অনুসারে যে কাজ করে, সে এমন কতকগুলি অলৌকিক শক্তি লাভ করে যাহা পুণ্য ও

সংযম-জনিত শক্তি হইতে, উৎকৃষ্ট এবং যাহার প্রভাবে সে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হয়।”

এই সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—দেব-পর্যায়ের চূড়াদেশে সেই পরমদেব আদিবুদ্ধের সিংহাসন অধিষ্ঠিত—বিনি অনাদি ও অনন্ত ; তাহার পর, পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ :—ইহার দ্বারা দেব-শ্রেণীভুক্ত। এই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের অনুরূপ পঞ্চ মানুষীবুদ্ধ। প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধ স্বকীয় ধ্যান-বলে, এক একটি ধ্যানীবোধিসত্ত্ব সৃষ্টি করেন,—ইহাদেরও দেব-প্রকৃতি। আবার প্রত্যেক মানুষীবুদ্ধ তিন লোকে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যাহা সর্গাপেক্ষা উন্নত সেই ধ্যান-লোকে তিনি নাম-রূপ-বিবর্জিত ; রূপ-লোকে তিনি ধ্যানীবুদ্ধ-রূপে প্রকাশ পান ; এবং কাম-লোকে তিনি মানব-আকারে আবির্ভূত হন। এইরূপ, প্রত্যেক মানুষীবুদ্ধের অনুরূপ এক-একজন ধ্যানীবুদ্ধ ও এক-একজন বোধিসত্ত্ব আছে। বর্তমান যুগে, শাক্য-নিহি মানুষীবুদ্ধ (ইনি চতুর্থ মানুষীবুদ্ধ) ; তাহার ধ্যানীবুদ্ধ—অমিতাভ এবং তাহার ধ্যানীবোধিসত্ত্ব—অবলোকিতেশ্বর বা পদ্মপাণি। এই সম্প্রদায়ের মতে, ধর্মসদ্বক্ষীয় কোন এক বিষয়ের উপর (জাগতিক ঘটনা বা তত্ত্বের উপর নহে) একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে, মানুষ কতকগুলি অলৌকিক মানসিক শক্তি অর্জন করিতে পারে, এবং তাহা হইতে সাধন আরম্ভ করিয়া ধ্যান সমাধির চারি ধাপে উপনীত হয় ; তাহার ফলে, প্রথমেই তাহার ব্যক্তিত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু এই সূক্ষ্ম সমাধির অবস্থায় উপনীত

হইতে হইলে, গোড়ায় কতকগুলি সাধন একান্তই আবশ্যিক ; এবং যে প্রণালীতে একাগ্রচিত্ত হওয়া যাইতে পারে “যোগাচর্যা” তাহার উপদেশ দেয়।

পরিণেবে, “ধারণী” নামক কতকগুলি অভ্যাস-মন্ত্র ও যোগসাধনমন্ত্রের আৱন্তি দ্বারা সাধক, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের সাহায্য পাইবার অধিকারী হয়। এই অভ্যাস-মন্ত্র ও যোগসাধন-মন্ত্রের সহিত যে ব্যক্তি শীলধৰ্ম্ম ও স্বল্প ধ্যানসমাধি সংযুক্ত করিতে পারে, সে অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে। তখন সে, —কি ধন, কি দীর্ঘ পরমায়ু, কি পর-চিন্তের উপর প্রভুত্ব এ সমস্ত ইচ্ছা করিলেই লাভ করিতে পারে। পরিণেবে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না—সে পরমদেবের সহিত যুক্ত হয়।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই সম্প্রদায়টি আধুনিক ; কেননা, উহাদের মতে, মুক্তি তত্ত্বশাস্ত্রের জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই তত্ত্বশাস্ত্র, সমস্ত প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তাদিগেরই মতে, অষ্ট-গুণের প্রথম শতাব্দীগুলির মধ্যেই ভারতে আবির্ভূত হয় এবং দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। Schlegel বলেন, তত্ত্বশাস্ত্রের আধুনিকতা সন্দেহে আর একটি প্রমাণ এই যে, চীন ভাষায় তাত্ত্বিকগ্রন্থ অতি অল্পই পাওয়া যায়। তাহার কারণ, যে সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ ভারতে আগিয়াছিলেন, তখনও তত্ত্বশাস্ত্র আবির্ভূত হয় নাই। তবে, “ধারণী” নামক অভ্যাস-মন্ত্রগুলি সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন কালের।

পূর্ণোক্ত দার্শনিক দৃষ্টি হইতে

আধুনিক কালে আরও যে সকল মতবাদ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে, থিয়সফি তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইবার থিয়সফিষ্টদিগের গ্রন্থাবলী হইতেই বিচার করিয়া দেখা যাক, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত থিয়সফিষ্টদিগের কল্প সঙ্গত।

আমি কর্ণেল অল্‌কটের বৌদ্ধধর্ম্ম-সংগ্রহে নিতান্ত অস্বাভাবিক ধরণের একটি প্রস্তোত্তরমালার উল্লেখ করিব মাত্র ; প্রধান-পুরোহিত স্মৃৎসলের অনুমোদিত হইলেও, এই প্রস্তোত্তরমালা নিতান্ত সরল নির্বোধ ব্যক্তিদিগের জন্যই রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আদিম বৌদ্ধ গ্রন্থগ্রন্থে উহার প্রমাণ অনুসন্ধান করা যথেষ্ট। থিয়সফিষ্টরা যে গ্রন্থকে তাঁহাদের ইমারতের স্মৃৎস ভিত্তি-প্রস্তর মনে করেন, আমি কেবল সেই গ্রন্থের উপর সমধিক নির্ভর করিয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ঐ গ্রন্থের নামমাত্রই সমস্ত দ্বিধা বিদূরিত হয়—সেই নামটি—Sinnet প্রণী “গুহ্য বৌদ্ধধর্ম্ম বা হিন্দু Positivism” গ্রন্থকার প্রথমেই এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, যে মতবাদটি তিনি আমাদের নিকট অর্পণ করিতেছেন, তাহা একরূপ গুপ্তভাবে রক্ষিত হইয়াছিল যে ভারতের কোন গ্রন্থে বা পাণ্ডুলিপিতে তাহার চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যদিও আমি এ স্থলে থিয়সফির সত্যতা সন্দেহে বিচার করিতে আদৌ ইচ্ছা করি না, তবে এইটুকুমাত্র আমি বলিতে চাই যে, মিষ্টার সিনেট যাহা বলিয়াছেন তাহা সমস্ত প্রাচীনকালের গুহ্য-মতবাদের

বিপরীত কথা। এ কথা সত্য, প্রাচীনকালের সমস্ত জাতিই দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐতি-পরম্পরায় গুহ-মতবাদকে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুকাল পরে উহা লিপিবদ্ধও হইয়াছিল; এইরূপ পাণ্ডুলিপি ও উৎকীর্ণ লিপি ইজিপ্তস্থান, আসীরীয়-ব্যাবিলোনীয়, চীনীয়, হিন্দু, পারসিক, ইহুদি—এই সকল জাতির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি এ কথা স্বীকার করি, উহাদের মধ্যে দৃষ্টি-ঘাটনের চাবিটি না পাইলে, ঐ সকল পাণ্ডুলিপির অর্থ বোধগম্য হওয়া কঠিন বা অসম্ভব; কিন্তু ঐ সকল পুঁথি যে আছে এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি গুহ ধরণের মতবাদও যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

“গুহ-বৌদ্ধধর্মের” গ্রন্থকার আমাদিগকে এই কথা জানাইয়াছেন যে,—তিনি তাহার গ্রন্থের নাম “গুহ-বৌদ্ধধর্ম” যে দিয়াছেন তাহার কারণ,—যদিও এই গুহতত্ত্বের উপদেশ বহুপ্রাচীন যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, এবং গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল,—কিন্তু গৌতম বুদ্ধ এই গুহতত্ত্বের এতটা উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে এই গুহতত্ত্ব তাহারই নিজস্ব হইয়া পড়িয়াছে।” বস্তুতঃ গুহতত্ত্ব অতীব প্রাচীন কালের এবং ইহাও কাগরও অবিদিত নাই যে, সেই প্রাচীন কালে, কেবল দীক্ষিত ব্যক্তিরাই প্রকৃত ধর্মমত জানিতে পারিত। অতএব মিষ্টার সিনেট আমাদেয় নিক; কিছুই নূতন বলেন নাই এবং এই কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আর তিনি যে শাক্যমুনিকে এই গুহমতবাদের নবজীবনদাতা বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তাহার সম্ভব কোন হেতু প্রদর্শন করা তাহার পক্ষে কঠিন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন প্রকৃত যুক্তি নাই। তিনি বলেনঃ—

“তাঁহার গ্রন্থ-প্রক্ষিপ্ত আলোকের সাহায্যে ভিন্ন, প্রকৃত সত্যায়ুসদ্ধায়ী সুধীগণ (মিষ্টার সিনেট সেই সকল সুধীগণকে সাহসী ও সাহসী বান্ নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং কতকগুলি প্রসিদ্ধ ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন) ভারতীয় ধর্মগুলিরও সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। এই ঘোষণার পর,—সিনেট তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় যে আশঙ্কা করিয়াছেন পাছে লোকে তাঁহার কথা লঘুভাবে গ্রহণ করে, সে আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে হয় না।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যদি মিঃ সিনেট বড় বড় যুরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তা ও প্রাচ্য দেশীয় বড় বড় দার্শনিকদিগের কথা অগ্রাহ করেন এবং এই কথা বলেন যে, তাঁহার মতবাদগুলি কেঁদে গ্রন্থে বা কোন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় না, তাহা হইলে তর্কের মুখ এইখানেই শু আপনা হইতে বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু আমি ভাবিয়া পাই না, তিনি কিরূপে থিয়সফির লক্ষণ নির্দেশ করিবেন। এই থিয়সফি কোন অলৌকিক ব্যাপারের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপদ্ধতিই উহার পত্তনভূমি। তথাপি, মিঃ সিনেট আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, “এই বৈজ্ঞানিক দর্শন যাহা শিক্ষা দেয় তাহাই প্রকৃত মতবাদ, তাহাই বৌদ্ধধর্মের ভিতরকার জিনিস”। আরও তিনি এই কথা বলেন যে, “গুহ ধর্মসংক্রান্ত যত সম্বলনী আছে, তন্মধ্যে তিব্বতের ভ্রাতৃমণ্ডলী সর্বপ্রধান, তাহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না।” এবং সিংহলদ্বীপ “গুহ-বৌদ্ধ-ধর্মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিষিক্ত”।

আমি এক্ষণে স্পষ্টরূপে সমগ্রাণ করিব যে সিনেটের প্রদত্ত মতবাদগুলি পূর্বোক্ত তিব্বতীয় “যোগাচার্য্য” সম্প্রদায়ের মতবাদ হইতে নিঃসৃত। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নাময়িক-আলোচনা।

ইসলাম-মহামণ্ডল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তুলিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে এ সব বিষয়ের কোনও সম্ভূতি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ফলতঃ এই আন্দোলনটাই অনেক পরিমাণে কেবল কলিকাতার গুটিকয়েক নেতৃগণের বিশেষ চেষ্টাতেই এখানে জাগিয়া রহিয়াছে। মফঃস্বলে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে, বড়লাট বাহাদুরের অভিপ্রায়ের সঙ্গে লোক-নায়কগণের মোটামুটি সহায়তাই রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের নেতৃবর্গ, ঢাকায় একটা নূতন টিচিং ও রেসিডেনশিয়াল ইউনিভারসিটি (Teaching and Residential University) যদি হয়, তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, এ কথাই বলিয়াছেন। এই জ্ঞান কলিকাতায় সে দিন টাউনহলে যে সভা হয়, প্রথমতঃ তাহার মন্তব্যের পাণ্ডুলিপিতেও এই কথাই বলা হইয়াছিল। পরে ইহার পরিবর্তন হইয়া, ঢাকায় কোনো প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক ইহা আদর্শেই বাঞ্ছনীয় নহে, এই কথা বলা হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে কতিপয় মুসলমান সভ্যের অনুরোধেই বিশেষ ভাবে এই পরিবর্তন করা হইয়াছিল। মুসলমানগণ কেন যে এ বিষয়ে এমন আপত্তি করিতেছেন, তার ভিতরকার কথাটা ধরিতে পারিলে, বোধ হয় হিন্দু-নেতৃবর্গ একপক্ষে তাঁহাদের মতের সমর্থন করিতেন না। আর যারা এটা বুঝিয়া গিয়াও এইরূপ আন্দোলনে আমাদের মুসলমান বন্ধুগণের পৃষ্ঠপোষক হইতেছেন, তারা

যে প্যান্-ইসলামিজম বা ইসলামমহামণ্ডল প্রকৃতপক্ষে কি বস্তু, ইহা একটুকুও বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। একদিকে জাপান, অত্রদিকে এই ইসলামমহামণ্ডল, (চীনের প্রকৃতির পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নাই বলিয়া, তার কথা কিছু ঠিক করিয়া বলা যায় না)—এঁরা হু-ই ভারতের জাতীয় জীবনের, রাষ্ট্রীয় একতার ও সাধারণ লৌকিক স্বাধীনতার সর্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু। ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাষ্ট্রীয় একতা প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হউক ইহা কে না চায়? এই একতা ব্যতীত ভারতে রাষ্ট্রীয় জীবনের শক্তিসঞ্চার অসাধ্য হউক বা না হউক, নিতান্তই যে দুঃসাধ্য হইবে, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। এই একতার পথে কোনো ক্রমেই কোনো বাধাবিঘ্ন স্থাপিত করা কর্তব্য নহে। হিন্দু ও মুসলমান একযোগে মিলিত হইয়া সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় ও দেশহিতকর কার্য করুন, ইহা সর্বদাই প্রার্থনীয়। কিন্তু প্যান্-ইসলামিজম বলিয়া যে অভিনব বস্তু মুসলমান-জগতের চিদাকাশে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্বতোভাবেই ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় একতার বিষম শত্রু। জগতের সকল দেশের মুসলমানকে একচ্ছত্রাধীন করিয়া বিশ্বব্যাপী একটা অভিনব ইসলাম-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্নস্বপ্নে প্যান্-ইসলাম বিভোর হইয়া আছে। প্যান্-ইসলামিজম কেবল একটা ধর্মের ব্যাপার নহে। ধর্ম বাস্তবিক ইহার একটা বাহ্য আবরণ মাত্র।

ইহার মূল লক্ষ্য সংসার, পরমার্থ নহে। চারিদিকে জগতের জাতিসকল এক অভিনব শক্তিসন্ধারে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। যুরোপীয় জাতি সকল আশিয়ার ও আফ্রিকার উপরে আপন আপন রাষ্ট্রীয় অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছেন, এবং আপন আপন অধিকৃত রাষ্ট্ররক্ষা ও অনধিকৃত রাষ্ট্রলাভের জন্য তাঁহারা আপনাদিগের শক্তি-পুঞ্জকে সংহত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছেন। যুরোপীয় জাতি সকলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা বৈরভাব আছে বলিয়াই আশিয়ার ও আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি এখনো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া আছে। আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সকলই ইসলামের অন্তর্ভূত। ইয়ুরোপে সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর পূর্ব সীমান্ত হইতে, আশিয়ায় চীনের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত, বৃহৎ ভূভাগ এবং সমগ্র উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা মুসলমানেরই দেশ। এই বিস্তৃত মুসলমানভূমিকে যদি এক করিয়া তুলিতে পারা যায়, তবে আধুনিক জগতে মুসলমানসমাজ খৃষ্টীয় সমাজেরই মত শক্তিশালী ও অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। এখনো যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান-রাষ্ট্র আছে, তাহাদের স্বত্বস্বাধীনতা রক্ষা করাও বহুলপরিমাণে এই একতা-সাধনের উপরেই নির্ভর করিবে। আর এইরূপে একটা বিশ্বব্যাপী মহম্মদীয় রাষ্ট্র-সত্ত্ব গঠন করিয়া জগতের ইতিহাসে আর একবার ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করাই প্যান-ইসলামিজমের মূল উদ্দেশ্য। ভিন্ন ভিন্ন দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানগণ এই সুখসৌভাগ্যের স্বপ্নবোরে মাতোয়ারা

হইয়া উঠিতেছেন। ভারতের মুসলমান-নেতৃগণের সকলে না হউন অনেকেই, এই আশামদিরাপানে আত্মহারা হইয়াছেন। এঁরা যে আপনাদিগের রাষ্ট্রীয় জীবনকে ভারতবর্ষের সাধারণ রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছেন, যাহাতে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অধিকার বিস্তারিত ও রাষ্ট্রীয় শক্তি সঞ্চাতিত না হয়, তার জন্য ইহারা যে একদল অদূরদর্শী ইংরেজরাজ-কর্মচারীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, ইহার পশ্চাতে এই অদ্ভুত ও সাংঘাতিক মাদকতা রহিয়াছে। ভারতীয় মসলেম-লীগের প্রতিষ্ঠা যে এই অভিনব প্যান-ইসলামিজমেরই একটা তরঙ্গভঙ্গমাত্র, ইহা লাট হার্ডিঞ্জ সুস্পষ্টই বুঝিয়াছেন। আর তিনি এটাও জানেন যে ভারতে এখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা ভেদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রবল হিন্দুদিগকে দুর্বল ও দুর্বল মুসলমানদিগকে সবল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে, যে প্যান-ইসলামিজম, ব্রিটেন ও ভারত কারোই মিত্র নহে, যাহা ভারতে হিন্দুজাতির অভ্যুদয় ও ব্রিটিশের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য, উভয়েরই সমান প্রতিবাদী, সেই প্যান-ইসলামিজমের গর্ভেই অশেষ শক্তিসঞ্চার করা হইবে। ইহা বুঝিয়াই লাট হার্ডিঞ্জ ভারতে ব্রিটিশের স্বার্থ ও হিন্দুর স্বত্ব উভয়ই যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তাহার বিধান করিবার জন্যই বঙ্গভঙ্গ রহিত করিয়াছেন। সেই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক স্বাভাব্য বা প্রান্তনিশীল অটনমি (Provincial Autonomy) প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সমগ্র ভারতকে বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র

শাসনে বিভক্ত করিয়া, তাহাদের সমবায়ে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠা শাসন-সম্বন্ধ বা যুদ্ধরাজ্য গড়িয়া উঠিবে এই আশার কথা প্রচার করিয়া স্বদেশপ্রেমিকদিগের আশাকে সঞ্জীবিত করিয়াই তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই সুদূর লক্ষ্যকে ধরিয়াই এই নূতন ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও উপস্থিত করিয়াছেন। দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতি ও নিয়তি যাহা লক্ষ্য করিতেছেন, স্বজাতির অভ্যুদয় ও সমগ্র মানবসমাজের শান্তি ও উন্নতি যাহা কামনা করেন, তাহাদের পক্ষে সর্বতোভাবে লাট হার্ডিজের এই দূরদর্শিনী নীতির সমর্থন করা কর্তব্য।

প্যান্-ইসলামিজম্ যে ভাবে জগতের মুসলমান-সমাজের শক্তি-বৃদ্ধির ও একতা-সাধনের জন্ত চেষ্টা করিতেছে, সে ভাবে ইসলামের অভ্যুত্থান হউক, ইহা ইচ্ছা করি না বলিয়া, কেহ আমাদেরকে ইসলামধর্মের বা মুসলমান-সমাজের শত্রু মনে করিবেন না। আমরা সর্বান্তঃকরণে ইসলামের হিত কামনা করি। ইসলামের অধোগতিতে মানবসমাজের একটা অতি বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বিকল হইতেছে, ইহা আমরা সর্বতোভাবে স্বীকার করি। সমগ্র মানবমণ্ডলীর হিতার্থেই আমরা ইসলামের হিত কামনা করি। আর ভারতের সঙ্গে ইসলামের যে একটা বিশেষ ও অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাও আমরা বিস্মৃত হই নাই। ভারতীয় মুসলমানগণ ভারত-সমাজের অঙ্গ। অঙ্গের উৎকর্ষে অঙ্গীর উন্নতি অবশ্যস্বাভাবী। অঙ্গের অপকর্ষে অঙ্গীর অবনতি অপরিহার্য।

সুতরাং ভারত-সমাজের কল্যাণকল্পেই ভারতের মুসলমানসম্প্রদায়ের যথাযোগ্য অভ্যুদয় কামনা করিয়া থাকি। কিন্তু অঙ্গ যদি অঙ্গীর বিদ্রোহী হইয়া, তাহার সঙ্গে সর্বপ্রকারের সম্বন্ধ ছেদন করিয়া, স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহে, তাহাতে অঙ্গ ও অঙ্গী উভয়েরই শক্তিক্ষয় হয়, এবং উভয়েরই আপন, আপন সফলতালাভের অশেষ সম্ভাব্য জন্মিয়া থাকে। ভারতের মুসলমানসম্প্রদায় যদি প্যান্-ইসলামের মোহিনীমূর্তি দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে থাকেন, তাহাতে যেমন তাহাদের নিজের, তেমন ভারতবর্ষের, তেমন সমগ্র মানবমণ্ডলীর অশেষ অকল্যাণের সূত্রপাত হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াই, আমরা এই আত্মঘাতী ও স্বদেশদ্রোহী প্রয়াসের প্রতিরোধ করা কর্তব্য মনে করি। ভারতের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানগণ যে সকল ক্ষেত্রে হিন্দুনেতৃত্বগর্বের সহিত মিলিত হইয়া, প্রকাশ্যে ও একযোগে ব্রিটিশ রাজকর্মচারিগণের নীতির বা কার্যের প্রতিবাদ করিতে যাওয়া, প্রকৃতপক্ষে, ভিতরে ভিতরে এই প্যান্-ইসলামিজমেরই শক্তিসঞ্চার করিতে চেষ্টা করিবেন, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে সচকিতস্বাভিত্ত্য অবলম্বন করিতেই হইবে। এই কয় বৎসর, মিটো মহোদয়ের শাসনকালে, ভারতে প্যান্-ইসলামের প্রচারকগণ ইংরেজরাজপুরুষগণকে ধরিয়া আপনাদের কার্যোদ্ধার করিতেছিলেন। লাট হার্ডিজের বিচক্ষণ বুদ্ধি সে পথ বোধ করিয়াছে। এখন তাহারা দেশের হিন্দুনেতৃগণকে ধরিয়া সেই কাজই বাজাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এটা আমাদের বোঝা উচিত।

লাট হার্ডিঞ্জের শাসন-নীতি

লাট হার্ডিঞ্জের এই নূতন শাসন-নীতির নিগূঢ় মর্ম দেশের লোকে এখনো ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। এটা বুঝিলে তাঁরা অথবা আন্দোলন করিয়া, এ সময়ে বড়লাট বাহাদুরকে অকারণ বিব্রত করিতে যাইতেন না। অপর বিষয়ে যেমন লোকের একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেলে, তাহার প্রয়োজন না থাকিলেও, তাহাকে পরিত্যাগ করা কঠিন হয়, এ ক্ষেত্রে আমাদের নেতৃবর্গের তাহা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মাহুষের সকল অভ্যাসই আদিতে কোনো প্রয়োজনসাধনের জন্ত জন্মিয়া থাকে। কিন্তু পরে, সে প্রয়োজন অতীত হইলেও, অভ্যাসটা চলিয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এইরূপ প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়াই প্রথমে জন্মিয়াছিল। গবর্ণমেন্টের কাৰ্য্যকাণ্ডের সমালোচনা করিবার জন্তই এই আন্দোলনের জন্ম হয়। সে কালে গবর্ণমেন্ট সর্ববিষয়ে লোকমতকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেন বলিয়া, এই সমালোচনা প্রায়শই প্রতিবাদে ও নিন্দাবাদে পরিণত হইয়াছিল। একদল লোক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বলিতেই গবর্ণমেন্টের প্রতিবাদ বুঝিতেন। এখনো অনেকের এ ধারণা নষ্ট হয় নাই। আর একরূপ আন্দোলন করিতে করিতে একদল লোকের এমনি একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তাঁরা এখন কোনো না কোনো অজুহাতে গবর্ণমেন্টের কাৰ্য্যকাণ্ডের একটা না একটা প্রতিবাদের স্বরগোল না তুলিলে দিনটা বৃথাই গেল এমনি বেন

মনে করেন। কিছুদিন পূর্বে, নানা কারণে দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গোল প্রায় থামিয়াই গিয়াছিল। আন্দোলনই য়াঁদের কর্মশীলতার প্রাণ, তাঁরা এ জন্ত কতকটা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ল্যাট মিণ্টোর প্রচণ্ড শাসনাধীনে উচ্চবাচ্য করা বড় নিরাপদ ছিল না; স্তবরাং সে সময়ে প্রতিবাদের বেগটা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ল্যাট হার্ডিঞ্জ ল্যাট মিণ্টোর সে অদূরদর্শিনী নীতি একরূপ বর্জনই করিয়াছেন। শাসনের কঠোরতা তেমন আর নাই। এই কারণে আবার সেই পুরাতন অভ্যাসটা জাগিয়া উঠিয়াছে।

* * *

দেশের কল্যাণের জন্ত, নূতন ল্যাটের এই নূতন নীতির মর্ম বুঝিয়া, যথাযোগ্যভাবে তাঁর সমর্থন করাই যে এখনকার প্রধান কর্তব্য, এ দিকে এখনো অনেকেরই দৃষ্টি পড়ে নাই। আর তারই জন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে, দিল্লিতে রাজধানী তুলিয়া নেওয়া উপলক্ষে, বেহারে নূতন শাসনপ্রতিষ্ঠার জন্ত, উড়িষ্যা বাংলা হইতে পৃথক হইতেছে বন্ধিয়া, এইরূপে নানা দিক্ দিয়া ল্যাট হার্ডিঞ্জের কাৰ্য্য ও অভিপ্রায়ের এত প্রতিবাদ হইতেছে।

লাট হার্ডিঞ্জ যে সকল কাজই ঠিক আমাদের মনোমত করিবেন বা করিতে পারিবেন, এমন কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কোনো ঠেকই এমন ভাবে অপর কাহারো মন জোগাইয়া আপনার কর্তব্য সাধন করিতে পারেন না। একজন শাসনকর্তার পক্ষে ইহা

একান্তই অসাধ্য। লর্ড হার্ডিজ একটা বিরাট ও জটিল শাসনযন্ত্রের শীর্ষ স্থানে, তাহার পরিচালকরূপে, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সর্বত্রই যন্ত্রী যন্ত্র অপেক্ষা বড়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যট্ট বড় হউন না কেন, কোনো যন্ত্রচালনার তাঁহাকে বহুলপরিমাণে সেই যন্ত্রের অধীন হইয়াও চলিতেই হয়। যন্ত্রী কখনো একান্তভাবে আপনার যন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া কার্যোদ্ধার করিতে পারেন না। লর্ডসাহেব যে নীতিই প্রবর্তিত করুন না কেন, কার্যতঃ সে নীতি অস্থায়ী শাসনকার্য পরিচালনার ভার তাঁর নিজের হাতে নাই। অধীনস্থ কর্মচারীগণের হাতে এ ভার সর্বদা ন্যস্ত থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং এ সকল প্রাচীন ও পদস্থ রাজকর্মচারীর ভাবস্বভাব, মতামত, কটু ও অভ্যাসকে একেবারে অগ্রাহ করিয়া শাসন পরিচালন সম্ভব হয় না। অন্ত্যদিকে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা যেমন তার পূর্বকৃত কর্মাদীন হইয়া আছে, এক কর্মফলকে অগ্রাহ করিয়া সে ইচ্ছা কিছুতেই আপনার সফলতা লাভ করিতে পারে না,—রাষ্ট্রের নীতিও সেইরূপ রাষ্ট্রের পূর্বকৃত কর্মবন্ধনকে উল্লঙ্ঘন করিয়া একেবারে আপনার সফলতা অন্বেষণ বা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইতরজনের দ্বারা রাষ্ট্রপতিকেও আপনার কর্মাদীন হইয়া বাস করিতে হয়। ইতরজনের কর্ম তার স্বকৃত বা তার পরিবার বা সমাজকৃত। রাষ্ট্রপতি যে বিশাল ও জটিল কর্মজালে আবদ্ধ হন তাহা কেবল তাঁহার স্বকৃত বা পরিবারকৃত নহে। সমগ্ররাষ্ট্রের সমুদায় পুরাতন ও অধুনাকৃত কর্মজালে তাঁহাকে চারিদিক হইতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই জন্ত রাষ্ট্রপতির

সদিচ্ছাচ্ছেই সর্বদা রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হয় না। এই সকল বিচার-আলোচনা করিয়া দেখিলে, লর্ড হার্ডিজ আমাদের হাতে চাঁদ ধরিয়া দিলেন না বলিয়া, অধীর বা অসম্ভব হইবার যে কোনই কারণ নাই, ইহা সহজেই বোঝা যাইবে।

* * *

অনেকে প্রশ্ন করিতেছেন—“লর্ডসাহেব কি আমাদের ভালের জন্য ব্যস্ত হইয়া এ সকল করিতেছেন? ভিতরে ভিতরে তাঁর কি অন্য অভিপ্রায় নাই?” আমার নিকট এ প্রশ্নটাই একান্ত অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। পাদ্রিজনস্বলভ বিশ্বমানবী-প্রেম লর্ড হার্ডিজের আছে কি না, জানি না। আর থাক বা না থাক সে বিষয়ে এ ক্ষেত্রে আমাদের মাথা ঘামানো নিতান্তই নিরর্থক। ভাল পাদ্রিই যে ভাল শাসনকর্তা হইবেন এমনো তো কোনো কথা নাই। ফলতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিমানবিহারী বিশ্বমানবী-প্রেমের আতিশয্য রুতিহ-লাভের সহায় না হইয়া প্রায়শঃই অতি গুরুতর অন্তরায় হইয়া উঠে। রাষ্ট্র-নীতিকে প্রাণে যদি কোনো বিশ্বকল্যাণকর আদর্শের প্রেরণা থাকে, ভালই। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির অনাগতকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি ও সেই অনাগতের ভবিষ্যৎ মন্দটুককে প্রতিহত করিয়া তার ভালটুককে প্রবুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ করিবার কর্মকুশলতাথাকা একান্তই আবশ্যক। বিশ্বমানবী-প্রেম না থাকিলেও কেহ শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনীতিবিশারদ হইতে পারেন। এই দূরদর্শনের ক্ষমতা ও অনাগত বিপন্নিসারণের কুশলতা না থাকিলে, রাষ্ট্রনীতির আলোচনা বা রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনভার গ্রহণ করা

তার পক্ষে বিড়ম্বনার ও রাষ্ট্রের পক্ষে অশেষ অকল্যাণের কারণ হইবেই হইবে। “লাট-সাহেব কি কেবল আমাদের ভালোর জন্ত ব্যস্ত হইয়া, এ সকল কাজ করিতেছেন?”—এ কথা যারা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁদের যে রাষ্ট্রনীতির ক, খ, জ্ঞানও হইয়াছে, এমন বোধ হয় না।

* * *

আর এই “আমাদের ভালোর” অর্থই বা কি? “তার অর্থ অভিপ্রায় আছে কি না?”—এই প্রশ্নে এই “অর্থ অভিপ্রায়” বলিতেই বা কি বোঝায়? কেবল “আমাদের ভালো” করিবার জন্ত ব্যস্ত হইলে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এখন যাহাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও অনেকটা প্রতিযোগিতা আছে, লাট হার্ডিজ যে তাঁহাদের ভালোর প্রতি উদাসীন বা তাঁদের ভালোর প্রতিবাদী, ইহাই বোঝাইত। সে অবস্থায়, আমাদের হিতার্থী হইতে যাওয়া, লাট হার্ডিজকে দেশদ্রোহী, রাজদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী হইতে হইত। তিনি “আমাদের ভালো” করিবার জন্ত এই উচ্চপদে নিযুক্ত হন নাই। ব্রিটিশসাম্রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া, সেই সাম্রাজ্যের স্বত্বার্থ-রক্ষার জন্তই তিনি ভারতের শাসনকর্তৃপদে পৃত হইয়াছেন। এ মোটা কথাটা ভুলিলে চলিবে কেন? লাট হার্ডিজ ‘আমাদের ভালোর’ জন্ত এ দেশে আসেন নাই। আজি পর্যন্ত কোনো লাট-বেলাট এ ভাবে ভারতশাসনভার গ্রহণ করেন নাই। কোনো জমিদারীর নায়েব যদি জমিদারের স্বার্থ নাশ করিয়া প্রজার স্বার্থ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হয়, সে লোক যতই কেন মহদয় ও সদাশয় হউক

না, কক্ষচারীরূপে যে নিমক্‌হারাম ও অবিশ্বাসী, তার কি আর সন্দেহ আছে? সেইরূপ কোনো ব্রিটিশ-শাসন-কর্তার পক্ষে কেবল “আমাদের ভালোর” জন্ত ব্যস্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার চেষ্টা করা যে একান্তই নিমক্‌হারামি হইবে, এ কথা অস্বীকার করা যায় কি? লাট হার্ডিজ এইরূপ নিমক্‌হারাম হইবেন ইহা কল্পনাও করা যায় না। ফলতঃ তিনি কেবল “আমাদের ভালোর” জন্ত আত্মস্তিক আগ্রহবশতঃ এই নূতন শাসননীতি প্রবর্তিত করিয়াছেন, এমন কথা বলি না বলিলে সে কথা তাঁর প্রশংসার কথা না হইয়া বরং নিন্দারই কথা হইত।

* * *

ফলতঃ ব্রিটিশ-ভারতের শাসননীতি কদাপি ব্রিটিশজাতির ও ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ভাল-মন্দের দিকে না চাহিয়া, কেবল আমাদের ভালোর জন্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিতেই পারে না। যে সকল ইংরেজরাষ্ট্রনীতিক আজি পর্যন্ত আমাদের কল্যাণ অহুসরণ করিয়া চলিতে চাহিয়াছেন, তাঁরাও ব্রিটিশজাতির বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের প্রতি কদাপি উদাসীন হন নাই। তাঁরা কেবল এইটা বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের কোনো প্রকারের সত্যিকার অমঙ্গল-চেষ্টা করিয়া, ব্রিটিশজাতির ও ব্রিটিশসাম্রাজ্যের চিরন্তন কল্যাণসাধন সম্ভব নহে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকে এ জগতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের আপাত-বিরোধটাই দেখে, আর এই বিরোধকেই বিশ্ববিস্তারের নিত্য ধর্ম্ম মনে করিয়া, একের স্বার্থকে অত্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিণামে এ চেষ্টা সর্ব্বথাই বিফল হইয়া

দায়। বিশ্বের মর্মস্থলে সকল বিরোধের নিষ্পত্তি, সকল প্রতিদ্বন্দিতার সমাঙ্গসা, সকল সংগ্রামের শেষ-সন্ধি-স্থাপনের একটা বিধান ও ব্যবস্থা রহিয়াছে। যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তি বা কোনো জাতি মিলনের সেই নিত্য ভূমিকে প্রাপ্ত হইয়াছে, ততক্ষণ তাদের বিরোধ ও সংগ্রামের ক্ষণিক বিরাম হইতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে না। এই মিলনের ভূমিটী অন্বেষণ ও আবিষ্কার করাই সকল নীতির লক্ষ্য। ধর্মনীতি ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ-নিষ্পত্তির জ্ঞান সম্ভানে অজ্ঞানে এই মিলন-ভূমিটীকেই খুঁজিতেছে। বিশ্বধর্ম্মের বিবর্তন-ইতিহাস এই অন্বেষণেরই বিবরণ মাত্র। সমাজনীতি, সমাজের ভিতরকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের, ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের স্বত্বস্বার্থের বিরোধ মিটাইবার চেষ্টায়, সতত এই ভূমিটীরই অন্বেষণ করিতেছে। রাষ্ট্রনীতিও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে বিষম বিরোধ জাগিয়া আছে, তাহার মীমাংসার নিমিত্ত সতত এই মিলনভূমিকেই আশ্রয় করিবার জ্ঞান লালসিত। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি এ সকলেরই উৎকর্ষ ও সফলতা ভ, এই মিলনভূমি প্রাপ্তির উপরে নির্ভর করে। তিনিই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম-নীতিবিদ যিনি ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে আপাত-বিরোধ-জগতকে বিছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রকৃষ্টতম নিষ্পত্তি করিতে পারেন। তিনিই শ্রেষ্ঠতম সমাজনীতিবিদ যার শিক্ষাদীক্ষাতে সমাজের আপাতবিরোধ উত্তরোত্তর নষ্ট হইতে থাকে। আর রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তারই অসাধারণ পারদর্শিতা প্রমাণিত হয়, যিনি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে আপাত-বিরোধ বাধিয়া উঠে, তার সম্যক

মীমাংসা করিবার পথ প্রদর্শন কবিত্তে পারেন। ভাবতের স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটেনের স্বার্থের আপাত-বিরোধ বহিয়াছে সত্য। ক্ষুদ্রবুদ্ধি ইংরেজ ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভাবতবাসী উভয়ে কেবল এই বিরোধটাকেই লক্ষ্য করিয়া চলেন। তাই তাহারা একে অথবা মঙ্গলকে প্রতিহত করিয়া, আপনাদের কল্যাণ সাধন করিবার কল্পনা করেন। লাট হার্ডিঞ্জের দূর্বদর্শিনী বাধুনাতি এ ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাবণ ভাবত ও ব্রিটেনের স্বত্বস্বার্থের মধ্যে একটা আপাতবিরোধ রহিয়াছে, একথা যেমন সত্য, তেমনি এটি বিরোধ নিষ্পত্তির একটা উচ্চতর ও প্রশস্ত-তর ভূমি আছে, তাহাও তেমনি সত্য। লাট হার্ডিঞ্জ এ কথা বুঝিয়াছেন। লাট কর্জন ব লাট মিল্টো এটা বুঝেন নাই, তাই তাঁরা এক পথ বন্দিয়া চলিয়াছিলেন। লাট হার্ডিঞ্জ এটা বুঝিয়াছেন বলিয়া, অল্পপথ বন্দিয়াছেন।

* * *

লাট হার্ডিঞ্জ ভুল করিয়াই বুঝিয়াছেন যে ব্রিটেনকে বড় করিয়া রাখিতে হইলে, ভারতকে ছোট কবিলে চলিবে না। এক দিন ছিল যখন ভাবতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাব-বাহী ভূত্ব করিয়া রাখা সম্ভব বলিয়া মনে হইত। সেদিন আর নাই। ভারতের আত্ম-জ্ঞান ফুটিয়াছে। ব্রিটিশ-শাসনফলেই ভাবত ক্রমে আপনাকে চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে। কিছুকাল হইতে দেশে যে অশান্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার পশ্চাতে এই নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় চৈতন্য স্পন্দিত হইতেছে। এখন আর ভাবতকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভারবাহী ভূত্ব করিয়া রাখা সম্ভব নয়। দু চাবি দশ

বৎসর সম্ভব হইলেও চিবিদিন কদাপি সম্ভব হইবে না। সুতরাং এখন হইতেই অল্পে অল্পে ভারতের এই নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে ব্রিটিশ-প্রভুশক্তির সন্ধি ও সখ্য সাধন করিয়া, আত্মরক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। ব্রিটেন যুরোপের শক্তিপুষ্পের মধ্যে আজ যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে, ভারতের সঙ্গে তার রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ যদি কোনো কারণে ছিন্ন হইয়া যায়, কিছুতেই আব সে পদ ও সে মর্যাদা, সে প্রতাপ ও প্রভুত্ব থাকিবে না। ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যত্ব এক-বারেই লোপ পাইবে। যে কোনো প্রকারে হউক এই সম্বন্ধটী রক্ষা করা, ব্রিটেনের স্বার্থে দৃষ্টি দিয়া দেখিলেও, ব্রিটিশরাষ্ট্রনীতির মূললক্ষ্য হওয়া বিধেয়। আর এই মূললক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভারতের ব্রিটিশ প্রভুশক্তির পক্ষে দেশের নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে যথাসাধ্য সখ্য স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন-নীতির ইহাই মূল-সূত্র।

আর যে কারণে আমাদের এই নবপ্রবুদ্ধ জাতীয়-চৈতন্যের সঙ্গে যথাসাধ্য সখ্য রক্ষা করিয়া চলা ব্রিটিশ-প্রভুশক্তির আত্মপ্রয়োজনেই আজ কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই কারণেই ভারতের কল্যাণ-কামনা যাহারা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও আত্মপ্রয়োজনেই ব্রিটেনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হইয়া, আপনাদের জাতীয় জীবনের যথাসম্ভব সফলতা অন্বেষণ করাই বিধেয়। সভ্যজগতের বর্তমান অবস্থায় ভারতের সঙ্গে সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া গেলে, ব্রিটেনের যেমন আপনাব পদ ও মর্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, সেইরূপ এই সম্বন্ধ একেবারে ভাঙ্গিয়া দিলে ভারতের পক্ষে আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা করা সাধ্যায়ত্ত হইবে না। আর কেন যে আমরা আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা

করিতে পারিব না, তাঁর কারণ প্রধানতঃ দুইটী,—এক চীনের পুনরুত্থান, অপর প্যান্-ইসলামিজমের অভ্যুদয়। এ জগতে কেবল এক চীনই ভারতের অপরিমিত প্রকৃতিপুঞ্জকে শুদ্ধ কায়িকশক্তির দ্বারা অভিভূত করিয়া রাখিতে পারিবে। আর ভারতের পাঁচকোটি মুসলমান প্যান্-ইসলামের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যদি আশিয়ার ও আফ্রিকার সৈকতবালুকাদম বিরাট মুসলমান-সমাজের সঙ্গে একাদ হইয়া উঠিতে পারে, তবে ভারতের স্বরাজ-প্রতিষ্ঠারই আশা চিরদিনের জন্য আকাশকুসুমবৎ শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। চীনের নবজাগরণ ও প্যান্-ইসলামের অভ্যুদয়, এই দুইটী যেমন ব্রিটেনের তেমন ভারতের ভবিষ্যৎকে ভীতিগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের ও ব্রিটেনের পরস্পরের রাষ্ট্রীয় স্বত্বস্বার্থের মধ্যে একটা উচ্চতর মিলন ও সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে, এই দুই শক্তির হস্তে উভয়েরই ভবিষ্যৎ আশাভরসা একবারে নির্মূল হইয়া যাইতে পারে। লর্ড হার্ডিঞ্জ এটা দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন। আর এই দূরদৃষ্টির উপরেই তাঁর ভারত-শাসন-নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি স্বদেশের ও স্বজাতির অকল্যাণ করিয়া আমাদের ভাল করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা সত্য নহে। তিনি আমাদের অকল্যাণ করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির স্বার্থান্বেষণ করিতেছেন, ইহাও সত্য নহে। সত্য কথাটা এই যে তিনি এমন এক ভূমিতে বাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, যেখানে ব্রিটেনের কল্যাণ-কামনাতেই তাঁহাকে ভারতের আত্মচৈতন্যের সফলতালাভের পথ প্রমুক্ত করিয়া দিতে হইতেছে, আর ভারতের কল্যাণকল্পেই এদেশে ব্রিটিশের স্বত্বস্বার্থকেও যথাসম্ভবভাবে রক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। আর এই সম্যকদৃষ্টির উপরে তাঁর ভারতশাসন-নীতি প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই, ইহাকে আমাদেরও সর্বতোভাবেই আলিঙ্গন করা কর্তব্য।

ভারতশিল্পের মূলসূত্র

ভারত-শিল্পের মূলসূত্র কোথায় ;—ভারত-বর্ষের বাহিরে না অভ্যন্তরে ? অনেকে ইহার আবিষ্কার-সাধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। ইহাকে মূলক্ষণ বলিয়াই অর্থ্যর্থনা করিতে হইবে। কারণ, মানব-হৃদয়ের অনির্দিষ্টনীয় ভাব-সম্পৎ যে ভাবে শিল্পের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করে, তাহার পরিচয়-লাভের জন্ত আয়োজন না করিলে, মানব-সমাজের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। শাস্ত্রপট্ট-লিপি, শিলাপট্ট-লিপি এবং লুপ্তাবশিষ্ট পুরাতন গ্রন্থ পুরাকালের নানা বিবরণের সন্ধান প্রদান করিতে পারে। তজ্জন্ত তাহার আলোচনা ইতিহাস-লেখকগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। পুরাকালের শিল্পনিদর্শনগুলিও সেইরূপ সমাদর লাভের যোগ্য ; তাহার মধ্যেও পুরাকালের নানা বিবরণের সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা আছে।

ভারত-শিল্প আদৌ শিল্পকলার নিদর্শন বলিয়া কথিত হইতে পারে কি না, এক সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে তদ্বিষয়েই বিলক্ষণ সংশয় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। একখানি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—“ভারত-ভাস্কর্যের বিস্তৃত সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিবার প্রলোভন নাই। কারণ, শিল্পের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার সময়ে, তাহা হইতে সাহায্যলাভের আশা করা যাইতে পারে না। তাহা নিতান্ত

নিয়ন্ত্রণীয় কারুকার্যমাত্র ;—তাহাকে শিল্পকলা বলিয়া সমাদর করা যায় না।”*

বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য সভ্য-সমাজে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। যাহারা গুপ্তী, এবং গুপ্তজ, তাঁহাদিগের বিচারে, ভারত-শিল্প বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের “শিল্পকলার” মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন, ভারতশিল্পের উল্লেখ না করিলে শিল্পের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উপায় নাই। কারণ, সমগ্র প্রাচ্য শিল্পেই ভারতশিল্পের প্রভাব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে ; প্রাচ্য-শিল্পের উপরও গৌণভাবে সে প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে। তথাপি, ভারত-শিল্পের প্রকৃত প্রকৃতি-বিচারে এখনও তর্কবিতর্ক নিরন্তর হয় নাই, এখনও নানা মুনির নানা মতের প্রবল ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইয়া, ভারত-শিল্প নানাক্রমে বিপর্যস্ত হইতেছে।

অনেকের বিশ্বাস ;—ভারতশিল্প পরাস্ত-করণ-লব্ধ। যাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্তকরণ-লব্ধ বলিতে অসম্মত, তাঁহাদিগের বিশ্বাস,

* There is no temptation to dwell at length on the Sculpture of Hindustan. It affords no assistance in tracing the history of art, and its debased quality deprives it of all interest as a phase of Fine Art.—Westmacott's Handbook of Sculpture, p. 51.

—ভারতশিল্পে পরালুকরণ-সম্পর্কের অভাব ছিল না। যাহারা তাহার অসম্বন্ধ প্রমাণ উপস্থিত করিতে অসমর্থ, তাহাদিগের বিশ্বাস,—ভারতবর্ষীয়গণ প্রতিভাবে পরালুকরণকে ভারতবর্ষীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। * এই সকল কারণে, ভারত শিল্পের মূলস্থত্রের সন্ধান লাভের জ্ঞাত ভারতবর্ষের বাহিরে পর্যটন করিবার প্রবৃত্তি এখনও সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইতে পারে নাই; এবং ইহাতেই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যথাযোগ্য ভাবে অল্পসন্ধান কার্য্য ব্যাপ্ত হইবার অধাবসায় ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না। এখনও ভারতশিল্পের উপর গ্রীক শিল্প-প্রভাবের কথা আলোচিত হইতেছে।

ব্রসেলজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর মহোদয় তাহার আলোচনায় ব্যাপ্ত হইয়া, কয়েকটি সারণ্ত বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে সুপরিচিত হইলেও, বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত। তাহার সারমর্ম এই যে,—“ভারত-সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক-সভ্যতার কিছুমাত্র সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না, এরূপ কল্প স্বীকার করিতে না পারিলেও, তাহাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য

প্রদান করা যায় না। কারণ, উভয়দেশের মানবসমাজে ধর্মতত্ত্বের এবং দার্শনিক তত্ত্বের যুগপৎ উন্মেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। জ্যোতিষে এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গ্রীসের নিকট ভারতবর্ষের যৎকিঞ্চিৎ ঋণ থাকিতে পারে; কিন্তু এই দুইটি বিজ্ঞান উভয়দেশে স্বতন্ত্রভাবেই বিকশিত হইবার হ্রস্বপাত করিয়াছিল। কাব্যে, নাটকে, ব্যাকরণে, লিপিকোশলে, গণিতে বা কলাশিল্পে ভারতবর্ষের উপর গ্রীসের প্রভাব কল্পিত হইতে পারে না। কারণ, গ্রীসের সহিত পরিচয় লাভ না করা পর্য্যন্ত, এ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষ নিশ্চেষ্টভাবে কালযাপন করিতে পারে নাই। পরিচয় সংস্থাপিত হইবার পর, গ্রীক-শিল্পের প্রভাবে ভারত-ভাস্কর্য্যে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে ভারত-শিল্পের স্বাভাব্য এবং রচনা নৈপুণ্য বিনষ্ট হইতে পারে নাই।” *

* Greece has played a part, but by no means a predominant part, in Indian civilization. The evolution of philosophy and religion has gone along parallel, but independent paths. India owes to Greece an improvement in astronomy and medicine, but it had begun both, and in lyric and epic poetry, in grammar, the art of writing, the drama, mathematics and the fine arts, it had no need to wait for the introduction or the initiative of Hellenism. Notably, however, in the plastic arts, and perhaps also in the details of dramatic representations, the classical culture has acted as a ferment to revivify the native qualities of the Indian artists

* India, of course, has borrowed many things from abroad during the long course of ages, but it is a trite observation, easily proved by many instances, that she always so transmutes her borrowings as to make them her own.—Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, p. 7.

শিল্পকলার শূলচেটা বিকাশ-চেটা। যে প্রাকৃতিক বিকাশ চেটায়, বৃক্ষলতা ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করিতে গিয়া, যথাকালে পুষ্পফলে সুশোভিত হয়, সেই প্রাকৃতিক বিকৃষ্ট-চেটাই মানবসমাজকেও শিল্পকলায় আত্মবিকাশ লাভ করিবার জন্ত উত্তেজনা করিয়া থাকে। শিল্পকলার মূলসূত্র মানব-প্রকৃতিতে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। মানব-সমাজ বহুদেশে, বহুজাতিতে বিভক্ত হইয়া, নানাভাবে বিকাশ-লাভের চেটা করিয়া আসিতেছে। যে দেশের, যে যুগের, যে মানবসমাজ যে ভাবে অনুপ্রাণিত, তাহার শিল্পকলার মূলসূত্র তাহার মধ্যেই অনুসন্ধান করা কর্তব্য। তাহা বাহিরে নহে,—
অভ্যন্তরে। অল্পদিন হইল, ইহার উপলব্ধি করিয়া, মানবতত্ত্বশাস্ত্র নূতন পদ্ধতিতে তথ্য-লোচনা করিবার জন্ত মূনিঋষিগণকে বিবিধ অনুসন্ধান-চেটায় ব্যাপ্ত করিয়াছেন। এক দেশের সহিত অল্প দেশের কোন কোন বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান প্রচলিত হইলেও, তাহাতে বিকাশ-চেটার মূলপ্রকৃতি পরিবর্তিত হইতে পারে না। বিকাশ চেটার সাদৃশ্যমাত্র লক্ষ্য করিয়াই, এক দেশের নিকট আর এক দেশের ঋণ থাকা সিদ্ধান্ত করা যায় না। সে সাদৃশ্য হয় ত জাতিগত বা প্রকৃতিগত কোনরূপ বিলুপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয়-বিজ্ঞাপক অপরিহার্য্য সাদৃশ্য।

ভারতবর্ষের সহিত পুরাকালেও অনেক

without robbing them of their originality and subtlety." Journal of the Royal Asiatic Society (1898), pp. 188—189.

দূরদেশের পরিচয় ছিল। বাণিজ্য-ব্যপদেশে সে পরিচয় কখন ক্ষণস্থায়ী কখন বা দীর্ঘস্থায়ী পরিচয়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহার পসাদে ভারতবাসিগণ নানা দূরদেশ হইতে ধনরত্ন আহরণ করিবার সময়ে, কখন যে কোনরূপ জ্ঞানরত্ন আহরণ করেন নাই, তাহা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভারতবাসিগণ শিল্পকলার বিকাশসাধনে দূরদেশ হইতে কখন কিরূপ রচনা-কৌশল আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারতশিল্পের মূল-প্রকৃতিতে তাহার পরিচয়-লাভের উপায় নাই। ভারতবর্ষ কখন কখন ভিন্নদেশ হইতে শব্দসম্পৎ আহরণ করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রভাবে ভারতবর্ষের ভাষার মূলপ্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায় নাই। সেইরূপ প্রয়োজনে ভারতবর্ষ কখনও ভিন্নদেশের শিল্পরীতি হইতে কোনরূপ নূতন রচনা-কৌশল আহরণ করিয়া থাকিলেও, তাহাতে ভারতশিল্পের মূলপ্রকৃতি পরিবর্তিত হইতে পারে নাই। ভারতশিল্পে একটি অনন্তসাধারণ বিকাশ-চেটা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সহিত ভারতবর্ষের আর্থ্য অনার্থ্য সকল শ্রেণীর অধিবাসীর পরস্পরাগত শিক্ষাদীক্ষার সময়-সাধনের চেটা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাকে বাহির হইতে আনৃত শিক্ষাদীক্ষার নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষই তাহার প্রকৃত মিলনভূমি।

ভারতশিল্পের ইতিহাস বিষয়ক সদাঃ প্রকাশিত গ্রন্থে ভিক্টোরিয়া স্মিথ স্রীকার

করিয়াছেন,—“ভারতবর্ষের পুরাপ্রচলিত শিল্প-সংস্কার অতিক্রম করিয়া, গ্রীকশিল্পের রচনারীতি এবং রচনা-মান ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। হিন্দু-শিল্পের প্রকৃত গুণাবলী সম্বন্ধে যতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুশিল্প আদ্যন্ত হিন্দুসংস্কারের বশবর্তী হইয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে, গ্রীক-সংস্কারের বশবর্তী হয় নাই। কেবল সাজসজ্জার মধ্যেই বিদেশাগত শিল্প-প্রভাবের পরিচয় খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে, তাহা বাহ্য প্রভাব মাত্র।

এই বাহ্য প্রভাব ভারতবর্ষের সকল যুগের সকল প্রদেশের শিল্পকলার মধ্যে আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই। যে যুগের যে প্রদেশের শিল্পকলায় ইহার পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার আলোচনায় ব্যাপ্ত হইয়া, মনীষিগণ “গাঙ্কার-শিল্প” বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন। “গাঙ্কার-শিল্পের” লক্ষ্য কি ছিল, এখনও তদ্বিবয়ক সকল তর্ক নিরস্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহা কি ভারতশিল্পকে

গ্রীক ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল? যে সকল নিদর্শন বর্তমান আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—“গাঙ্কার শিল্প” গ্রীক শিল্পকেই ভারত-ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টা যখন সফল হইয়াছিল, তখন “গাঙ্কার-শিল্পের” স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যত দিন সে চেষ্টা সফল হয় নাই, ততদিন সফলতা লাভের আয়োজন চলিতেছিল। যে সকল শিল্পনিদর্শনে সেই আয়োজনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই “গাঙ্কার-শিল্প” নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। তাহাকে গ্রীক-শিল্প বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ভারতবর্ষই তাহার প্রকৃত উদ্ভব-ক্ষেত্র।

ভারত-শিল্পকে বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করিবার উপায় থাকিলে, তাহাকে সহজেই আয়ত্ত করিবার সম্ভাবনা থাকিত। ভারত-শিল্প ভারত-সমাজের সকল প্রকার আত্মবিকাশচেষ্টার সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই, সহসা সকল কথার মীমাংসা-সাধনের উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সংস্থান, তাহার সভ্য অসভ্য সমগ্র মানবসমাজ, ভারতবর্ষের আত্মবিকাশ-চেষ্টার গতি নির্দেশ করিয়াছে;— ভারতবর্ষের “প্রচণ্ড সূর্য্যঃ স্পৃহনীয় চন্দ্রমা” তাহার গতি নির্দেশ করিয়াছে; ভারতবর্ষের জল-স্থল-অন্তরীক্ষ, বৃক্ষবনস্পতি-পর্ব্বতমালা, নদনদী-মহাসাগরও তাহার গতি নির্দেশ করিয়াছে। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না; ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়াও, শিল্প-সৌন্দর্য্য আলোচিত হইতে পারে না।

* Greek artistic canons and rules of proportion never succeeded in making headway against the strong current of Indian tradition. Hindu Sculpture, whatever may be thought of its intrinsic quality continued to be Indian on the whole, guided by Indian not Greek principles. The foreign influences, Assyrian, Persian, or Greek, had merely superficial effect, chiefly traceable in decorative details.— Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, p. 8.

এই সরল সত্যটি এখনও ভাল করিয়া প্রতিভাত হয় নাই।

ভারত-শিল্পের মূল-সূত্র কোথায়, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—ভারতবর্ষীয় মানব-সমাজের মূলপ্রকৃতি কোথায়? তাহা বাহিরে, না অভ্যন্তরে? সে প্রকৃতি যে চিরকালই আয়নিষ্ঠ ছিল, তাহার প্রমাণাবলীর অভাব নাই। বাহারা যখন ভারতভূমিতে আপতিত হইয়াছে, তাহারাই (কিয়ৎকালের মধ্যে) ভারতবর্ষীয় হইয়া গিয়াছে। প্রবল সমাজের পক্ষে এইরূপে ক্ষুদ্র সমাজকে আয়সাৎ করিবার ক্ষমতা বর্তমান ছিল বলিয়াই, ভারতবর্ষ বহু বিপ্লবে বিপর্যস্ত হইয়া, এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায় নাই। এখনও সেকাল-একালের মধ্যে কালগত পার্থক্যই উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য;—প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। এখনও ভারত-বর্ষের প্রধান আকাঙ্ক্ষা বাহিরে নহে, অভ্যন্তরে,—সাঙ্গে নহে, অনন্তে;—পরিদৃশ্যমান বস্তুতে নহে, অতীন্দ্রিয় মহাশব্দায়।

আমরা কিছুই জানিতে পারি না;—ইহা সত্য হইতে পারে না। আমরা সমস্তই জানিতে পারি;—ইহাও, সত্য হইতে পারে না। মানব-জ্ঞানের এই সীমানির্দেশের মধ্যে, তাহার অসীম ক্ষমতার পরিচয় লাভ করিয়া, ভারতবর্ষ অচিন্ত্যকে চিন্তা করিবার এবং অনির্দেচনীয়কে বাক্যে, প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিতে সাহসী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সাহসেই, প্রাচীন কালের

ভারতবর্ষ, গভীর মধ্যে অবস্থান করিতে সম্মত হয় নাই। তাহাকে গভীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া, তাহার ইতিহাস সঞ্চলনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা ভারত-শিল্পের ইতিহাসেও সুবাক্ত হইয়া রহিয়াছে।

যে সকল দেশে শিল্পকলা, কেবল পরিদৃশ্যমান আকারকে অবলম্বন করিয়া, আয়প্রকাশের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, সে সকল দেশের শিল্পকলার সহিত ভারতশিল্পকলার জাতিত্ব কল্লিত হইতে পারে না। ভারতশিল্পকলা আকারের ভিত্তর দিয়া ভাব ফুটাইবার চেষ্টা না করিয়া, ভাবকেই আকার-দানের চেষ্টা করিয়াছিল। তজ্জন্ম ভারতবর্ষের সকল যুগের মূর্তিশিল্পেরই মূলপ্রকৃতি এক রূপ;—তাহা আভাসাত্মক। অনির্দেচনীয়ের আভাস প্রকাশ করিয়াই তাহা কৃতকৃতার্থ। তাহার মূলসূত্র ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

কেবল শিল্প-সৌন্দর্য্যের বিচারেই এই মূলসূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব নাই। ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে বুঝিবার পথই প্রকৃত পথ;—সেই পথে, ভারতশিল্পের মূলসূত্র আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা শ্রমসাধ্য বলিয়া, তাহাতে সহসা পদার্পণ না করিয়া, অনেকে প্রতিভাবলেই ভারত-শিল্পের ব্যাখ্যা-কার্য্যে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ইতিহাস এইরূপে উপেক্ষিত হইলে, সত্যনির্ণয় করা সহজ হইবে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। ভারতশিল্পের মূলসূত্রের সন্ধান লাভ করিতে হইলে,

ভারতবর্ষের জনসমাজের সর্ববিধ আয়-বিকাশচেষ্টার ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে হইবে।

ফাণ্ডার্সন্ তাঁহার অমরগ্রন্থে একটি কাল্পনিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—“ভারতশিল্পে হিন্দু বৌদ্ধ এবং জৈন নামক তিনটি রচনারীতি দেখিতে পাওয়া যায়।” তাহাকে মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করিয়া, অনেকেই ভারতশিল্পকে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন নামক তিনটি বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভারতশিল্পের মূলপ্রকৃতি সর্বত্র সকল যুগে একরূপ হইলেও, যুগে যুগে নানা স্থানে নানা রচনারীতি মূলমন্ত্রের ভাষ্যরূপে আয়প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে কেবল স্থান-কালের প্রভাবেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; ধর্মসম্প্রদায়-সমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাবই শিল্পের পক্ষে একরূপ। অনির্বচনীয়কে আকার-দানের চেষ্টাতেই তাহার পরিসমাপ্তি। ভারতবর্ষের সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মূল প্রস্রবণ একস্থানে বলিয়াই ভারতবর্ষ সমন্বয়-ক্ষেত্র। তাহার প্রভাব শিল্পের ইতিহাসেও দেদীপ্যমান।

যাহা অনির্বচনীয়, তাহা ভাষণে মধুরে মিশিয়া রহিয়াছে। তাহা অণু হইতে অণু এবং মহানু হইতেও মহীয়ান। যে যুগে যে প্রদেশে তাহা যে ভাবে মানব-মনকে বিকাশ-চেষ্টায় প্রণোদিত করিয়াছে, সেই যুগের সেই প্রদেশের রচনারীতিতে [সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মূর্তিশিল্পে] তাহার প্রভাব

দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহা কোন কোন যুগে কোন কোন প্রদেশে ভীষণেব ভিতর দিয়া, মধুরের ভিতর দিয়া, কিম্বা ভীষণ-মধুরের ভিতর দিয়া, অনির্বচনীয়কে আকার-দানের চেষ্টা করিয়াছে। তৎকালের তৎপ্রদেশের জনসমাজ তাহা জানিত। সুতরাং আমরা যাহাকে ভীষণ বলিয়া জ্ঞাপী বিকাশ করি, তাহারা তাহার অন্তর্নিহিত মৌন্দর্য্য-সম্ভোগে বঞ্চিত হইত না। মৃত্যু অমৃতের সোপান বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হইত, তাহাদের দৃষ্টি নিকটে নহে,—দূরে। তাহারা সকল যুগের সকল প্রদেশের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মূর্তিশিল্পের মধ্যে অমূর্তকেই দর্শন করিত। আমরা মূর্তিমাত্র দর্শন করিয়া, বিজ্ঞতার পরিচয় দান করিবার জন্ত বলিতেছি,—কোনও মূর্তি ভীষণ, কোনও মূর্তি মধুর, সকল মূর্তি অল্লাধিক অস্বাভাবিক।

ভারতবর্ষে স্বাভাবিক মূর্তিরচনারও অভাব ছিল না; এখনও নানা স্থানে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি ভারতশিল্প দেবমূর্তি-রচনার সময়ে স্বভাবানুকরণ করিতে সক্ষম হয় নাই কেন, তাহার নিগূঢ় কারণ বিদ্যমান ছিল। মানবমূর্তিকে দেবমূর্তির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভারতশিল্পাচার্য্যগণকেও সর্বাঙ্গ-সুন্দর নরনারী রচনা করিয়াই নিরস্ত হইতে হইত। কিন্তু তাহাতে ভারতশিল্পের মূলমন্ত্রটি ছিন্ন হইয়া পড়িত। প্রয়োজনের অনুরোধেই ভারতশিল্প সে পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে নাই। বাহিরের পট হইতে সাদৃশ্য

আহার্য না কুরিয়া, চিত্তপট হইতে সাদৃশ্য আহার্য করিতে গিয়াই, ভারতশিল্প এক অননুসাধারণ শিল্পস্বত্বের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহা কদাপি পরানুকরণরূপ বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

ভারতশিল্প সুন্দর কি না, তাহা ইতিহাসের বিচারযোগ্য বিষয় বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কিরূপ কার্যকারণশৃঙ্খলা

ভারতশিল্পকে অননুসাধারণ স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে, তাহার প্রভাবে কোন্ প্রদেশের কোন্ যুগের ভারতশিল্প কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই কেবল ইতিহাসের বিচারযোগ্য কথা। তাহার প্রথম এবং প্রধান কথা,—ভারতশিল্পের মূলস্বত্বের কথা। তাহা বাহিরে না অভ্যন্তরে,—সর্বপ্রায়ে তাহারই আলোচনা শেষ করা কর্তব্য।

শ্রী গঙ্গয়কীমার মৈত্রেয়।

মানবের জন্মকথা

অসভ্য মানব এবং কুকুর অনেক সময় নিম্নভূমিতে জল দেখিয়াছে, সুতরাং তাহা-দিগের মনে নিম্নভূমির সহিত জলের ভাব জড়িত হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তি বোধ হয় ঐরূপক্ষেত্রে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন; কিন্তু আমরা অসভ্যদিগের কথা যতদূর জানি তাহাতে তাহারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিবে কি না, বিশেষ সন্দেহস্থল; কুকুরেরা ঐরূপ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করিবে না; কিন্তু কুকুর এবং অসভ্য মানব উভয়েই যদিও পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল হউক, তথাপি আবারও একই ভাবে (জল) অন্বেষণ করিবে। তাহাদিগের মনোমধ্যে, কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত বিद्यমান থাকুক আর নাই থাকুক, তাহারা উভয়েই ঐ কার্য্য বুদ্ধিপূর্বক করিবে। হস্তী এবং ভল্লুক জলে বায়ুমণ্ডলে যে তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এই কথাই বলা যাইতে পারে। অসভ্য মানব যেরূপ গতি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা

করে, তাহা কিরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন হয়, সে বিষয় কিছু জানেও না, জানিতে ইচ্ছাও করে না। কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মোটামুটি একটা বুদ্ধিপরিচালনার ফল; দার্শনিক পণ্ডিতের সুদীর্ঘ বিচার-মূলক সিদ্ধান্ত সকল যে ভাবে নিষ্পন্ন হয়, অসভ্যেরও নিশ্চয়ই তদনুরূপ। কিন্তু অসভ্যের এবং উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণের মধ্যে নিশ্চয়ই এ প্রভেদ থাকিবে যে অসভ্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের এবং অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিবে, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প পরিদর্শনান্তে ঐ বিষয় এবং অবস্থার মধ্যে একটা সমবায় সম্বন্ধ বুঝিয়া বসিবে। ইহা তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা। আমার একটা শিশু সন্তানের কর্ম্মগুলি আমি প্রত্যহ লিখিয়া রাখিতাম; সে যখন ১১ মাস বয়সের হইল এবং একটা কথাও বলিতে পারে না, তখন তাহার মনে সর্বপ্রকার বস্তু এবং শব্দের অর্থ যেরূপ দ্রুতগতি সংযুক্ত হইতে

লাগিল, তাহার সহিত অতিশয় বুদ্ধিমান কুকুরের ব্যবহার যতদূর দেখিয়াছি তাহা তুলনা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীস্থ এবং পাইক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ জন্তুগণের মধ্যেও বস্তুর সহিত শব্দ সংযোগ-বিষয়ে এবং পর্য্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত করা সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকার প্রভেদই দেখা যায়।

অল্প পরিদর্শনের পরেও বুদ্ধিবৃত্তির উত্তেজনা কিরূপ হয় তাহা আমেরিকান বানরগণের নিম্নশ্রেণীস্থদিগের ব্যবহার দৃষ্টে বেশ বুঝা যায়। রেজার যত্নপূর্বক উহা পরিদর্শন করিতেন। তিনি যখন প্যারা গোয়া দেশে তাহার বানরদিগকে ডিখ দিয়াছিলেন তখন তাহার উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিত, স্তবরাং তন্মধ্যস্থ পদার্থ অনেক নষ্ট হইত; কিন্তু পরে তাহার ডিম্বের একদিক কোন কঠিন বস্তুর উপর আস্তে আস্তে দিত, এবং খোসার ভগ্নস্থানগুলি অঙ্গুলি দ্বারা খুঁটিয়া তুলিত। একবার তীক্ষ্ণ অগ্নি হাত কাটিলে তাহার ঐ অঙ্গুলি আর স্পর্শও করিত না, অথবা স্পর্শ করিলেও অতি সাবধানে করিত। অনেক সময় তাহাদিগকে কাগজে জড়াইয়া চিনি দেওয়া হইত; রেজার কখন কখন ঐ কাগজের মোড়কের মধ্যে জীবিত বোলতা দিতেন; বানরেরা াড়াতাড়ি কাগজ খুলিতে গেলে বোলতায় কামড়াইয়া দিত। এইরূপ একবার দংশন করিলে পর উহারা প্রত্যেকবার কাগজের মোড়ক প্রথমে কাণের কাছে আনিয়া উহার মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ শুনা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করিত।

নীচে কুকুরের কতিপয় ব্যবহারের উল্লেখ করিতেছি। মিঃ কোহন (Colquhoun) দুইটী বক্স হংস উড়ীয়মান অবস্থায় শীকার করিয়াছিলেন, উহার একটী নদীর অপর পারে পড়িয়াছিল। তাহার কুকুর একসঙ্গে দুইটাকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারিল না; তৎপর ঐ কুকুর যে কখন কোন পাখীর একটী পালখ উলট-পালট করে নাই সে একটী হংসকে মারিয়া ফেলিল, এবং অপরটাকে লইয়া এপারে আসিল, পরে ঐ মৃতপাখীটী আনিতে গিয়াছিল। কর্ণেল হাচিন্সন্ বক্স করিয়াছেন যে একসঙ্গেই দুইটী পাটিজকে গুলি করা হয়, একটী হত অপরটী আহত হইয়াছিল। আহতটী দৌড়াইয়া পলাইতেছিল, তখন শিকারী কুকুর তাহাকে ধরিল, এবং ফিরিয়া আসিবার সময় মৃত পাটিজটিকে দেখিতে পাইল। “সে ক্ষণকাল ধামিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না; তা’রপর যখন বুঝিল যে ঐ মৃতটী আনিতে হইলে জীবিতটী পলাইয়া যায় তখন সে ক্ষণকালমাত্র বিবেচনা করিবার পর তখনই ইচ্ছা করিয়াই জীবিতটিকে বলপূর্বক হত্যা করিল, তৎপর দুইটাকেই একসঙ্গে লইয়া আসিল সে এই একবার মাত্র ইচ্ছা পূর্বক শিকার নষ্ট করিয়াছিল জানা যায়।” এখানে আমরা বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাইতোঁছি কিন্তু উৎকৃষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাই না; কারণ কুকুর প্রথমে আহতটীকে আনিয়া পরে মৃতটীকে আনিতেই পারিত, যেমন বক্সহংস আনিবার সময় করা হইয়াছিল। এই দুইটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার হেতু এই যে

দুইজন পরিদর্শক পৃথক ভাবে অমূৰূপ ঘটনার প্রমাণ দিতেছেন, তাহাতে দেখা যায় যে শিকারী কুকুর (Retreiver) যাহারা বংশানুক্রমিক অভ্যাসবশতঃ কখনও শিকারকে বধ করে না, তাহারাও বংশানুগত অভ্যাসের বিপরীত কার্য্য করিয়াছিল ; সুতরাং বুঝা গেল যে, বদ্ধমূল অভ্যাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে তাহাদিগের বিচার-বুদ্ধি কতদূর প্রবল হইয়াছিল !

বিখ্যাত হান্সবোর্ট মহোদয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমি এ বিষয় শেষ করিব। দক্ষিণ আমেরিকার খচ্চর-চালকগণ বলে “যে খচ্চরটীর চলন যুহ, তাহা আপনাকে দিব না, যেটীর বুদ্ধি ভাল সেইটী দিব।” ইহা হইতে হান্সবোর্ট বিবেচনা করেন যে “ভূয়োদর্শন হইতে এই যে কথাটী প্রচলিত হইয়াছে, তদ্বারা জীব অণুমাত্র, কলমাত্র—এই মত এত উত্তমরূপে খণ্ডিত হইতেছে যে দর্শনশাস্ত্রের বিবিধ যুক্তি-তর্কেও তেমন হইতে পারে না।” তথাপি কোন কোন লেখক অদ্যাপিও বলেন যে উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণের বুদ্ধিবৃত্তির চিহ্নমাত্রও নাই। উপরে যে সকল বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলাম তদনুরূপ বৃত্তান্ত তাঁহারা কেবল বাক্যাভ্রমরপূর্ণ ব্যাখ্যায় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন।

আমি বিবেচনা করি, ইহা এক্ষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে মানবের এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ জন্তুর, বিশেষতঃ বানরগণের মধ্যে কতিপয় সহজাত বৃত্তি সাধারণ। উহাদিগের সকলের ইন্দ্রিয়গণ একই প্রকার, অহুভূতি এবং স্বাভাবিক সংস্কারও একই; কাম-ক্রোধাদি রিপু, স্নেহমমতা, ভাবপ্রবাহও

তুল্যরূপ; এমন কি, অপেক্ষাকৃত জটিলবৃত্তি-গুলিও একই প্রকার, যেমন হিংসা, সন্দেহ, প্রতিযোগিতা, কৃতজ্ঞতা, মহত্ব। উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণ প্রতারণা করে ও প্রতিহিংসা লয়; উহার। সময় সময় বাঙ্গ বুঝিতে পারে, এবং উহাদিগের রসিকতার ভাবও আছে। উহাদিগের আশ্চর্য্য বোধ ও কৌতুহল আছে। অমূৰূপবৃত্তি, মনঃসংযোগ, চিন্তা-শীলতা, উৎকর্গাপকর্ষবোধ, স্মৃতি, কল্পনা, ভাবসংযোগ, বুদ্ধিবৃত্তি—এ সকলই উহাদিগের আছে, কিন্তু সকলের সমান পরিমাণে নাই। একজাতীয় বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমিক প্রভেদ অনুসারে প্রায় জড়বৎ নির্কোষ হইতে অশেষ বুদ্ধিমান পর্য্যন্ত সকলই দেখা যায়। উহার। উদ্ভাদও হইতে পারে, কিন্তু অমূৰূপে তাহা অপেক্ষা অনেক কম সময় হইয়া থাকে। তথাপি অনেক গ্রন্থকার দৃঢ়তার সহিত বলেন যে মনোবৃত্তিতে মানুষে এবং ইতর জন্তুতে অলজ্ঞা প্রভেদ বিদ্যমান আছে। আমি ইতিপূর্বে এইরূপ উক্তি বিংশতির অধিক সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে সকলগুলিই প্রায় মূলাহীন। কারণ এই সকল উক্তির সংখ্যা ও পরস্পরের গুরুতর পার্থক্য বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে ঐরূপ সংগ্রহের চেষ্টা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে কেবল মানুষই উত্তরোত্তর ক্রমিক উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম; এবং সকল মানুষই যন্ত্র ও অগ্নি ব্যবহার করে, অথবা জন্তুকে গৃহপালিত করে, অথবা সম্পত্তি অধিকার করে, অথবা কোন জন্তুর সামান্য-বিধি

নিশ্চয় করিবার অথবা সাধারণ-সংস্কার ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই; উহাদিগের কাহারও আত্মজ্ঞান অথবা আত্মবোধ নাই; উহারা কেহই ভাষা ব্যবহার করে না; কেবল মানুষেরই সৌন্দর্য্য-বোধ আছে; খামখেয়ালি, কৃতজ্ঞতা, অজ্ঞেয়ের ভাব, ঈশ্বরে বিশ্বাস, অথবা হিতাহিত জ্ঞান আছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরুতর এবং প্রয়োজনীয় কয়েকটা বিষয় সম্বন্ধে আমি সাহস করিয়া গোটাকতক কথা বলিব।

আর্কবিসপ্ সায়ার পূর্বে বিবেচনা করিতেন যে কেবল মানুষই ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে পারে। মানুষ অল্প প্রাণী অপেক্ষা অতুলনীয় অধিক উন্নতি অত্যন্ত দ্রুতবেগে লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রধান কারণ বাক্শক্তি এবং এক পুরুষের জ্ঞান পুরুষপরম্পরায় সংক্রমিত হওয়া। ইতর জন্তু সম্বন্ধে প্রথমে ব্যক্তিগত হিসাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে বুদ্ধদিগের অপেক্ষা অল্পবয়স্কগণকে অতি সহজে ফাঁদে ধরা যায়। যাহার ফাঁদ পাতায় কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই এ কথা জানেন। বুদ্ধদিগের অপেক্ষা অল্পবয়স্কদিগের নিকট শত্রুও সহজে আসিতে পারে। বুদ্ধদিগকেও একস্থানে এক ফাঁদে বহুসংখ্যক ধরা অসম্ভব; এক প্রকার বিষ দিয়া বহুসংখ্যক বুদ্ধকে বধ করা যায় না। সকলেই যে ঐ বিষ খাইয়াছিল তাহা হইতে পারে না; অথবা এক ফাঁদে ধরা পড়িয়াছিল তাহাও নহে। উহারা নিশ্চয়ই অল্প

জন্তু ফাঁদে বদ্ধ হওয়া অথবা বিষ খাইয়া মরা দেখিয়া সাবধান হইতে শিক্ষা করিয়াছে। উত্তর আমেরিকাতে সকল পরিদর্শকই দেখিয়াছেন, যে সকল লোমশ জন্তুদিগকে দীর্ঘকাল অবধি তাড়াইয়া (ধরা) হইতেছে তাহারা অসম্ভব ধূর্ততা, সাবধানতা ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়; কিন্তু তথায় এত দীর্ঘকাল ফাঁদ পাতিয়া শিকার করা হইতেছে যে সম্ভবতঃ বংশানুক্রমের নিয়মানুসারে উহারা ঐ সকল বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। * অনেকে আমাকে জানাইয়াছেন যে, যখন কোন জেলায় প্রথম টেলিগ্রাফের তার বসান হয় তখন উড়িবার সময় তারে ঠেকিয়া অনেক পক্ষী মারা পড়ে; কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহারা অত্যাগ পক্ষীকে ঐরূপে মরিতে দেখিয়া ঐ বিপদ হইতে দূরে থাকিতে শিক্ষা করে।

জন্তুগণের বংশপরম্পরা অথবা জাতির কথা বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, পক্ষী ও অত্যাগ জন্তুগণ মানুষ এবং অপর শত্রু হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা ক্রমে শিক্ষা করে, এবং ক্রমেই ঐ শিক্ষা ভুলিয়াও যায়। এই সতর্কতা প্রধানতঃ বংশানুক্রমিক অভ্যাস অথবা সহজ-বৃত্তি, সন্দেহ নাই, কিন্তু অংশতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারও ফল। লিয়র বলেন, যে সকল স্থানে বেশি শৃগাল শিকার করা হয় তথায় বাচ্চাগুলি গর্ভ হইতে প্রথম বাহির হইয়াই যেরূপ সতর্কতা প্রদর্শন করে, তরূপ অল্প স্থানে করে না।

* এ সকল বংশানুক্রমে হওয়া এক্ষণে স্বীকৃত হয় না; বুদ্ধের দৃষ্টি দেখিয়া অল্পবয়স্কেরা ধূর্ততা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া থাকিবে।

আমাদের গৃহপালিত কুকুরগুলি শৃগাল ও নেকড়ে বাঘ হইতে জাত হইয়াছে; যদিও তাহাদিগের ধূর্ততা বাড়ে নাই, এবং সাবধানতা ও আশঙ্কা কমিয়াছে, তথাপি তাহাদিগের স্নেহ, বিশ্বাসিতা, মেজাজ এবং সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি নৈতিক গুণ উন্নত হইয়াছে। ইউরোপে, উত্তর আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে, নিউজিল্যান্ডে, এবং সম্প্রতি ফরোসা দ্বীপে ও চীনদেশে সাধারণ ইন্দুর অত্যন্ত জাতীয় ইন্দুরকে জীবন-সংগ্রামে পরাজয় করিয়া বিজয়ী হইয়াছে। মিঃ সুইনহো বলেন যে ফরোসা ও চীনের ঐ সকল ইন্দুর অধিকতর চতুর, এই নিমিত্তই রহস্যকায় মুস্ কনিঙ্গা জাতীয় ইন্দুরকেও পরাজয় করিয়াছে। মানব কর্তৃক নির্মূল হইবার উপক্রম হওয়ায় উহার বুদ্ধি পরিচালন করিয়া আশ্রয়কার চেষ্টা করিতে করিতেই চতুরতা শিক্ষা করিয়াছে। এবং অল্পবুদ্ধি অথবা নির্দোষগুলি ক্রমশঃ বিনষ্ট হওয়াতেও ঐরূপ হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু মানুষের সংস্রবে আসিবার পূর্বেও ঐ সাধারণ ইন্দুর অজ্ঞাতীয় ইন্দুর অপেক্ষা অধিকতর চতুর ছিল, এবং তদ্ব্যতীতই বিজয়ী হইয়াছে, ইহাও সম্ভব নহে। কোন মুখ্য প্রমাণ না পাইয়াও, যদি কেহ বলেন যে কোন ইতর জন্তুই চিরাতীত কাল হইতে ঐ পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে এবং অজ্ঞাত মনোবৃত্তিতে উন্নতি লাভ করে নাই, তবে তিনি জীব-বিবর্তনতত্ত্বে যাহা প্রমাণ-অপ্রমাণের বিষয় তাহার সম্বন্ধে আগে হইতেই একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন। আমরা জানি যে ল্যাট্টার মতামতসারে

জন্তু-যুগ * অপেক্ষা এক্ষণে সকল জন্তুপায়ী জীবের মস্তিষ্কই বড় হইয়াছে।

অনেক সময় কথিত হয় যে কোন ইতর জন্তুই যন্ত্র ব্যবহার করে না। কিন্তু বহু সিম্পাজি পাথরের আঘাত দিয়া ফল ভাঙ্গে; যেমন কাট বাদাম ভাঙ্গা যায় সেইরূপ। রেঞ্জার একটা আমেরিকান বানরকে এই ভাবে কঠিন সুপারী ভাঙিতে শিখাইয়াছিলেন। ঐ বানর শেষে ইচ্ছাপূর্বক অল্প প্রকার সুপারী অথবা বাস্ত পাথর দ্বারা ভাঙিয়া খুলিত। সে এই ভাবে দুর্গন্ধযুক্ত ফলের খোসা খুলিত। আর একটা বানরকে লাঠি দিয়া একটা বড় বাস্ত খুলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল; পরে সে ঐ লাঠি দ্বারা ঠেলা দিয়া তার বস্ত নড়াইত। আমি নিজে দেখিয়াছি, একটা অল্পবয়স্ক ওরাংওটাং এক ফাটা স্থানের মধ্যে লাঠির এক দিক প্রবেশ করাইয়া দিয়া অপর দিক হাত দিয়া ধরিয়া লিবারের তায় ব্যবহার করিয়াছিল। অনেকেই জানেন ভারতবর্ষে পোষা হাতী গাছের শাখা ভাঙিয়া তদ্বারা গায়ের মাছি তাড়াইয়া থাকে; একটা বহু হস্তীকেও ঐরূপ করিতে দেখা গিয়াছে। আমি দেখিয়াছি, একটা ছোট ওরাংওটাং যখন ভাবিল যে তাহাকে চাবুক মারা হইবে তখন সে একটা কঞ্চল অথবা খড় দিয়া গা ঢাকিয়া আশ্রয়ক্ষা করিয়াছিল। এই সকল স্থলে পাথর এবং লাঠি যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু উহাদিগকে যন্ত্রস্বরূপও ব্যবহার করে। সিম্পারের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া ব্রেস বলেন যে এবিসিনিয়া দেশে যখন একজাতীয় বানরের দল পাহাড়

হইতে নামিয়া ক্ষেত্র লুণ্ঠন করিতে আসে, তখন তাহারা সময় সময় অপরজাতীয় বানরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। গেলাডা জাতীয়গণ বড় বড় পাথর গড়াইয়া দেয়, হেমাড্রিয়া জাতীয়গণ তাহা এড়াইবার চেষ্টা করে; তৎপর উভয় জাতীয় বানরই অত্যন্ত চিংকার করতঃ পরস্পরকে বেগে আক্রমণ করে।

ব্রেস যখন কোবার্গ গোথা দেশের ডিউকের সহিত শ্রমণ করিতেছিলেন, তখন এবিসিনিয়ায় মেনসা-পথের মধ্যে একদল বেবুন বানরকে উভয়েই বন্দুক লইয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। বানরগণ তখন পর্বত হইতে এত পাথর গড়াইয়া দিয়াছিল, (তাহার মধ্যে মানুষের মাথার মত বড় পাথরও ছিল) যে আক্রমণ করায়দিগকে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে

হইয়াছিল, এবং কিছু দিন পথিকগণ ঐ পথে যাইতে পারিল না। ঐ সকল বানর সকলে মিলিত হইয়া এইরূপ করিয়া-ছিগ, ইহা উল্লেখযোগ্য। মিঃ ওয়ালেস তিনবার দেখিয়াছিলেন, “যখন তাহারা কতকগুলি সপুত্রক বানরীর গাছের নিকট যাইতেছিলেন, তখন বানরীরা ক্রোধান্বিত হইয়া ডুরিয়ান গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ও কাঁটায়ুক্ত ফল ছিড়িয়া তাহাদিগের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাতে তাহারা আর উহার নিকটে যাইতে পারিলেন না। আমি অনেক বার দেখিয়াছি, সিম্পাঞ্জিকে কেহ বিরক্ত করিলে হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই তাহার দিকে ফেলিয়া মারে। পূর্বে যে বেবুন বানরের কথা উল্লেখ করিয়াছি সে ঐ জন্তু কাদা প্রস্তুত করিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশধর রায়।

চরিত-চিত্র

স্বর্গীয় উইলিয়াম:টি, স্টেড্

বাল্যকাল হইতে ইংরেজি গ্রন্থে অনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজের চরিতাখ্যান পড়িয়াছি। ইংরেজসমাজের মাঝখানে বসিয়াও ছোট-বড় অনেক ইংরেজের সঙ্গে নানা কথো, নানা ভাবে, মেশামিশি করিয়াছি। কিন্তু উইলিয়াম, টি, স্টেডের মত এমন খাঁটি ইংরেজ অতি অল্পই দেখিয়াছি।

“খাঁটি” ও “ভাল”।

যে বস্তু ঠিক আপনার স্বরূপেতে থাকে তাহাকেই আমরা খাঁটি বস্তু বলি। কিন্তু

খাঁটি হইলেই যে সে বস্তু সকলের চক্ষে ভাল হইবে এমন বলা যায় না। দ্রব্যগুণসম্বন্ধে, বোধ হয়, যা খাঁটি তাই ভাল, আর যা ভুল তাই খাঁটি হয়। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা যায় কি? আমরা কোনো দ্রব্যের নিজের-প্রকৃতির দ্বারাই তার সত্যিকার ভালমন্দ বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু মানুষের বেলা আমরা তার ভিতরকার প্রকৃতির সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সন্ধান করি না; আমাদের

নিজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি কৃতি ও অভ্যাসের দ্বারাই তার ভালমন্দের বিচার করিয়া থাকি। সকল মানুষ যদি সমান হইত, তবে একরূপ বিচার অসম্ভব হইত না। কিন্তু মানুষ যে সকল সমান নয়। সকল জলই যেমন সমান, জলে জলে যে বেশ কম দেখি, তাহা জলের ভিতরকার প্রকৃতিগত নহে, জল ছাড়া অথ কোনো ধাতুকণা বা লবণাদি তার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া জলের গুণের তারতম্য উৎপাদন করে; সকল সোণাই যেমন সমান; সকল পারদ গন্ধকই যেমন সমান; সকল মানুষ তো আর সেরূপ সমান নয়। মানুষে মানুষে যে বিভিন্নতা তা' তার প্রকৃতিগত। সে প্রকৃতির বাহিরের কোন বস্তু তার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া এ সকল ভেদাভেদের সৃষ্টি করে নাই। আর মানুষে মানুষে এই প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে বলিয়াই প্রকৃতপক্ষে একের যা' ধর্ম্ব অপরের তাই ধর্ম্ব হয় না, একের ভাল মন্দের দ্বারা অপরের ভালমন্দের বিচার সম্ভব হইতেই পারে না; সুতরাং কোনো মানুষ খাঁটি হইলেই যে সকলের বিচারে সে ভালও হইবে, আর সকলে কাহাকেও ভাল বলিলেই যে সে খাঁটি হইবে, এমন কোনো কথা নাই। বরং এ সংসারে দশজনে যাকে ভাল বলে অনেক সময় সে খাঁটি হয় না; নিজের স্বরূপেতে থাকা তার পক্ষে একান্তই কঠিন হইয়া পড়ে।

ভাল ইংরেজ ও খাঁটি ইংরেজ,

এমন ইংরেজ তো দেখিয়াছি যাঁহা-
দিগকে আমাদের চক্ষে বড়ই ভাল লাগি-

য়াছে। এমন বিস্তর ইংরেজ সর্বদাই তো দেখিতে পাই, যাঁহাদিগকে আমাদের চক্ষে নিতান্তই মন্দ ঠেকে। কিন্তু আমরা যাঁহাকে ভাল বলি তিনিই যে খাঁটি ইংরেজ আর আমরা যাঁহাকে মন্দ দেখি তিনিই যে খাঁটি ইংরেজ নহেন, এমন কথা বলা যায় কি? বরং আমরা যে ইংরেজকে বড় ভাল বলি তার পক্ষে খাঁটি ইংরেজ না হওয়ারই সম্ভাবনা কি বেশী নাই? লাট রিপণ্ আমাদের চক্ষে বড় ভাল ইংরেজ ছিলেন। তাঁর মত এমন ভাল লাট বহুদিন ভারত শাসন করিতে আসেন নাই। কিন্তু রিপণচরিত্রে যে বস্তু দেখিয়া আমরা এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম সে বস্তু ইংরেজচরিত্রের বিশেষত্ব নহে। রিপণের শাস্ত্যুদ্ভি, সদাপ্রসন্ন ভাব, সমাহিত চেষ্টা-চরিত্র, ধর্ম্মভয় ও ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া আমরা ইংরেজ আভিপ্রায়ের পরিচয় পাই নাই, বরং আমাদের সনাতন ব্রাহ্মণ্য আদর্শেরই কথঞ্চিৎ আভাস পাইতাম। আর তারই প্রত্য রিপণকে আমাদের এতটা ভাল লাগিয়াছিল। রিপণ লোক অতি মহৎ ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু খাঁটি ইংরেজ ছিলেন, এমন কথা, বলিতে পারি না। রিপণের মত, ভারত-বন্ধু স্মার হেনরি কটনও লোক অতি ভাল। রিপণকে দেখিয়া যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ভাব মনে আসিত, কটনকে দেখিয়া, তাঁর কথাবার্ত্তায় ভাবস্বভাবে, কতকটা সেইরূপ আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশ্বমানবভক্ত, বাঙ্গালী আন্দোলনকারী বা এজিটেশনের স্বাভি-জ্ঞাপিয়া উঠে। কলতঃ কটন যখন আসামের

চিফ্‌মিশনার ছিলেন, তখন শিল্পের সিভিলিয়ান সমাজ, পরিহাসচ্ছলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় তাঁহাকে “বাবু চিফ্‌” বলিয়াই ডাকিতেন। আর তারই জগুই বস্তুতঃ কটনকেও আমাদের এত ভাল লাগে। কিন্তু রিপণ, কটন, এঁরা কেউ যে খাঁটি ইংরেজ, একথা বলিতে পারি না।

ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্ব।

ইংরেজের ইংরেজত্ব বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, সে বস্তু যাঁর ভিতরে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেবল তাঁহাকেই খাঁটি ইংরেজ বলা যাইতে পারে, অত্বে নহে। দুধ যখন সম্পূর্ণরূপে আপনার স্বরূপে থাকে, তখনই কেবল তাহাকে খাঁটি দুধ বলা যায়। খাঁটি দুধের চাইতে কারো কারো নিকটে রাবড়ী ঢের বেশি মিষ্টি লাগে। ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থায় ঘোল কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢের বেশি উপকারী হয়। কিন্তু তাই বলিয়া রাবড়ী বা ঘোল খাঁটি দুধ হয় না। যেমন দুধের দুগ্ধ বলিয়া একটা বস্তু আছে, যে বস্তুরূপে দুধ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তাহাকে খাঁটি দুধ বলা যায়; সেইরূপ ইংরেজেরও ইংরেজত্ব বলিয়া একটা বিশেষ বস্তু আছে, এ বস্তুরূপে থাকিলেই ইংরেজ খাঁটি ইংরেজ হয়। দুধের দুগ্ধ যেমন দুধকে দুনিয়ার আর সকল বস্তু হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি ইংরেজের এই ইংরেজত্ব বস্তুও তাহাকে দুনিয়ার আর সকল জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সকল মানুষই এক হিসাবে সমান বটে; কিন্তু আর এক হিসাবে কোনো মানুষই আর কোনো মানুষের মত নহে। সকল মানুষেরই

দেহ-গঠন মোটের উপরে এক; সকলেরই মোটের উপরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আছে; সকলেরই মধ্যে একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে মন বিরাজ করিতেছেন, মনের উপরে বুদ্ধি; বুদ্ধির উপরে আত্মা;—সত্য ও অসত্য, আৰ্য্য অনার্য্য, মানুষমাত্রেই এ সকল সাধারণ মানবধর্ম রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি সকল মানুষ তো সমান নয়। কারণ এই সাধারণ ও সার্বজনীন মানবধর্মের মধ্যেই আবার ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে তার নিজস্ব বা ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা কিছু আছে, যাহাতে প্রত্যেক মানুষকে অপর সকল মানুষ হইতে আলাহিদা করিয়া রাখিতেছে। এই ব্যক্তিত্ব-বস্তুটা তার চেহারা, তার চাহনিতে, তার গলার স্বরে, তার পায়ের শব্দে, তার চালচলনে, তার ভাবস্বভাবে, যে ভাবে সে চিন্তা করে, যে রূপে সে ভাবে-চিন্তে,—এ সকলের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই যে বিশেষত্বটুকু যাহাতে এক মানুষকে আর এক মানুষ হইতে পৃথক করিয়া রাখে, ইহাকে সাধারণ মানবধর্মের অন্তর্গত ব্যক্তিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্য। সমাজের বা মনুষ্যগোষ্ঠির কতকগুলি নিজস্ব ধর্ম আছে। আর এই যে নিজস্ব সমাজ-ধর্ম বা গোষ্ঠি-ধর্ম বা জাতি ধর্ম, ইহারই ‘জগু’ এক জাতি অপর জাতি হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। বিশাল মনুষ্যত্বের সাধারণ ভূমিতেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া, হিন্দুর হিন্দুত্বকে, ইহুদীর ইহুদীত্বকে, জর্মানের জর্মানত্বকে,

ইংরেজের ইংরেজকে,—এ সকল ভিন্ন ভিন্ন জা'তের জাতি বা জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানুষের হিসাবে ইহুদী ও হিন্দু, জাপ ও জর্মান, রুশ ও চীন, ইতালীয় ও ইংরেজ, এঁরা সকলেই সমান। সকলেরই মানুষের দেহ, মানুষের মন, মানুষের ভাব-স্বভাব রহিয়াছে। অথচ জাতির হিসাবে, ইহাদের সকলেই অপর সকল হইতে ভিন্ন। হিন্দুর চেহারা, কথাবার্তায়, চালচলনে, ভাবস্বভাবে, এমন একটা বিশেষত্ব আছে বাহা জগতের আর কোনো জা'তের ভিতরে নাই। এই বিশেষত্বটুকুই হিন্দুর হিন্দুত্ব। যে সকল চিহ্ন দ্বারা হুনিয়ার অসংখ্য জা'তের মাঝখানে আমরা হিন্দুকে বাছাই করিয়া আলাহিদা করিতে পারি, তাই তার হিন্দুত্ব। সেইরূপ যে সকল চিহ্নের দ্বারা জর্মানকে জগতের আর দশটা জা'তের ভিতরে চিনিয়া লইতে পারা যায়, তাহাই তার জর্মানত্ব। আর যে সকল লক্ষণের দ্বারা ইংরেজকে এইভাবে বিশ্বের মানবসমাজের মাঝখানে চিহ্নিত করিয়া গণিত করিতে পারা যায়, তাহাই তার ইংরেজত্ব। এই ইংরেজত্ব-বস্তু ইংরেজের চেহারা, তার গঠনে, তার বর্ণে, তার সর্ববিধ সূক্ষ্ম শারীর ধর্ম্মে, তার চালচলনে, তার ভাবস্বভাবে, জীবনের সকল বিভাগে ফুটিয়া রহিয়াছে। যার ভিতরে এই ইংরেজত্ব-বস্তু বেশি লক্ষ্য করিতে পারি, যে ইংরেজ আপনার জা'তের এই সকল স্বরূপলক্ষণেতে অবস্থান করিতেছে, কেবল তাঁহাকেই খাঁটি ইংরেজ বলা যায়। আর এই অর্থেই ষ্টেডকে আমি অত্যন্ত খাঁটি ইংরেজ বলিতেছি।

ইংরেজদের শারীর লক্ষণ

আমাদের দেশের নানা জাতের নানা লোকের ভিতরে কে যে হিন্দু আর কে যে অহিন্দু ইহা যেমন তাহার চেহারাতেই অনেক সময় ধরা পড়ে, সেইরূপ বিলাতের নানা জা'তের লোকের মধ্যে কে যে ইংরেজ ইহা তার চেহারা দেখিয়াই চিনিতে পারা যায়। বিলাতে ইংরেজ আছে, স্কট বা স্কট আছে, আইরিশ আছে, ওয়েলশ আছে; তাহা ছাড়া জর্মান, রুশ, ইতালীয়, ফরাসীস, এ সকল খেতাপও বিস্তার আছে। আর কিছু দিন সে দেশে বাস করিলেই কে কোন্ জা'তের লোক ইহা তাহাদের চেহারা দেখিয়াই ঠিক করিতে পারা যায়। যেখানে পুরুষানুক্রমে অসজাতীয় বিবাহ নিবন্ধন নানা জাতের রক্তের বেশি মেশামিশি হইয়া গিয়াছে, সেখানে কে ইংরেজ, কে জর্মান, কে আইরিশ, ইহা একেবারে ঠিক করা যায় না বটে, কিন্তু যেখানে এরূপ শোণিত-মিশ্রণ হয় নাই, সেখানে খাঁটি ইংরেজ যে কে ইহা তার চেহারাতেই ধরা পড়ে। খাঁটি ইংরেজের চেহারা ভারি ভারি ঠেকে। আইরিশের বা ইতালীয়ের চেহারা যেমন কাটা ছাঁটা, ইংরেজের চেহারা সেরূপ নয়। আইরিশ বা ইতালীয়ের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেরূপভাবে আপন আপন উৎকর্ষলাভের চেষ্টা করে, ইংরেজের যেন সেরূপ করে না। নাক, চোখ, জ্র, কপোল, ললাট, কর্ণ, গ্রীবা,—আইরিশ বা ইতালীয়ের চেহারা এরা সকলে আপন আপন অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, সকলে মিলিয়া,

তারই ভিতর দিয়া যেন একটা সুন্দর সঙ্গত মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে, এরূপই মনে হয়, ইংরেজের চেহারাতে এ ভাবটী লক্ষ্য করা যায় না। আইরিশের বা ইতালীয়ের, প্রাচীন গ্রীষ্মীয়ের বা রোমকের চেহারা দেখিলে মনে হয় যে বিধাতাপুরুষ বুঝি আপনার কারখানায় নিবিষ্টমনে বসিয়া ভাস্কর্যের চর্চা করিতে করিতে, অপূর্ণ খাটুলি দিয়া, এ চেহারাগুলি খুঁদিয়া বাহির করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজকে গড়িতে যাইয়া কোনো স্মৃষ্ণ যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজের চেহারার উপকরণ-গুলি বেশ বাছিয়া গুছিয়াই যে সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেষটা যেন, কোনো দৈব কারণ-বশতঃ বিধাতাপুরুষ আঙ্গুল দিয়াই সেগুলিকেই ঠাসিয়া, টিপিয়া, ইংরেজের মূর্তি গড়িয়াছেন, এমনই মনে হয়। তারই জগৎ ইংরেজের গঠনটা কেমন মোটা, ভারি, স্থূল। চীন-জাপানের মতন ইংরেজের নাক খাঁদা নয়, আবার আইরিশ বা ইতালীয়ের মত টাছাছোলাও নয়। কিন্তু মোটা। ইংরেজের চক্ষু আকর্ষণীয় হও নহে, অথচ খুব ছোটও নহে; কিন্তু রংএ ও আকারে কতকটা মার্জার চক্ষুরই মত; তার মোহিনীশক্তি অত্যন্ত কম। ইংরেজের কেশ কটা; চিবুক চওড়া; গ্রীবা বন্ধিমও নয়, খাটও নয়, কিন্তু কতকটা মোটা। তার সমুদয় দেহগঠনই অনেকটা স্থূল। কিন্তু এই স্থূলত্বে কোনো বিশেষ কমনীয়তা ফুটিয়া উঠে না, কেবল সতেজ রক্তমাংসের একটা জীবন্ত প্রভাবই যেন অনুভূত হইয়া

থাকে। এই রক্তমাংসের প্রভাবের একটা বিশেষ শব্দ ইংরেজিতে আছে, আমাদের ভাষায় আছে বলিয়া জানি না। ইংরেজিতে এ বস্তুকে এনিম্যালিজম্ (Animalism) বলে। আর খাটি ইংরেজ যত কেন উন্নতচরিত্রের হউন না, এই এনিম্যালিজম্ বস্তুটী তাঁর চেহারাতে সর্বদাই স্বল্প বিস্তর ফুটিয়া রহে। বুলডগ (Bulldog) নামে যে এক জাতীয় বিলাতী কুকুর আছে, সারমেয়-সমাজে তার চেহারা যে ছাঁচের, কুকুরজাতির ভিতরে সে চেহারার যে বিশেষত্ব আছে, মনুষ্যসমাজে ইংরেজের চেহারাও কতকটা সেই ছাঁচের

ইংরেজের মানস-লক্ষণ

ইংরেজের চেহারা স্থূল কিন্তু শক্ত, মোটা কিন্তু অনমনীয়, কোন অঙ্গই তার অপরিষ্কৃত নাই, অথচ কোন অঙ্গই যেন জড়ত্বের ও ইতরজীবত্বের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। যেমন ইংরেজের চেহারায় বুল ডগ্কে মনে করাইয়া দেয়, তেমনি তার প্রকৃতিও অনেকটা এই বুলডগেরই মত। বুলডগ একবার কোনো শীকারের পশ্চাতে ছুটিলে সে শীকারকে কখনো ছাড়িয়া আসে না। একবার কোনো শীকারকে ধরিলে, প্রাণ যায় যাক তবুও তার দাঁতের কবাট আর খোলে না। ইংরেজও সেইরূপ যে লক্ষ্যকে একবার সন্ধান করে, তাহাকে কখনো লাভ না করিয়া ছাড়ে না। যাহা একবার ধরে, প্রাণান্ত হইলেও তাহাকে আর পরিত্যাগ করে না। সহজে সে কোনো বিষয়ে কাণ দেয় না। ছজুকে পড়িয়া সে আশ্চর্য্য

হয় না। কোনো বস্তুকে বুঝিতে তার সময় লাগে। কোনো লক্ষ্যকে সন্ধান করিবার পূর্বে সে অনেক ভাবে-চিন্তে। তার বৈশ্বপ্রকৃতি ক্ষতি-লাভের খতিয়ান না করিয়া কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু একবার যদি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে, একবার যদি কোন লক্ষ্যকে সন্ধান করে, একবার যদি কোনো ব্যাপারে হাত দেয়, তবে তার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার চেষ্টায় ইংরেজ আর অগ্রপশ্চাৎ বা ভালমন্দ, বা ক্ষতিলাভ, কোন কিছুই গণনা করে না। ইংরেজকে দেখিলেই, তার চেহারার ভিতরেই, একটা পশুভাবের প্রভাব লক্ষ্য হয়। তার শারীর প্রকৃতিকে অনেকটা তামসিক বলিয়াই মনে হয়, সত্য; কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে নিদ্রালস্য প্রভৃতি তমোধর্ম্মের লেশ মাত্র আছে বলিয়াও বোধ হয় না। ইংরেজ ব্যবসাদার, দোকান-পশারীর জাত, অথচ দোকানীপশারীর স্বভাবসুলভ রূপগত তাহাতে নাই। ইংরেজের বুদ্ধি অনেকটা স্থূল সন্দেহ নাই। সূক্ষ্মত্ব ধরিবার শক্তি তার কম, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অথচ স্থূলবুদ্ধি লোকের মধ্যে যে এক প্রকারের মানসিক জড়তা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরেজের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। কথাটা আপাতত স্ববিরোধী হইলেও নিরতিশয় সত্য যে জগতের অপর জাতির মধ্যে সচরাচর যাহা নিতান্ত দোষের বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই ইংরেজের মধ্যে, ইংরেজপ্রকৃতির বিশেষত্বনিবন্ধন, তার অশেষ গুণগরিমার মূল কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

ষ্টেডের শারীর লক্ষণ ও মনের প্রকৃতি
ইংরেজপ্রকৃতির এই সহজ ও বিশেষ ধর্ম্মগুলি ষ্টেডের মধ্যে অতি আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমরা যে সকল প্রসিদ্ধ ইংরেজের চেহারা দেখিয়াছি, তার কোথাও ইংরেজের ইংরেজটী এমনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। গ্যাড্‌স্টোন কি মল্‌, টেনিসন্ কি মরিস্, হ্যারিসন্ কি স্পেন্সার, এঁদের সকলের চেহারাতেই এমন কিছু না কিছু টাঁছা-ছোলার, কাটাকুঁদার ভাব ছিল, যে ভাব খাঁটি ইংরেজের চেহারায় নাই। খাঁটি ইংরেজের চেহারা ঢালাই জিনিষ, খোদাই জিনিষ নহে। এ চেহারা অনেকটা সাদাসিধে, অনেকটা মোটাশোটা, অনেকটা স্থূল। ষ্টেডের চেহারাও ঢালাই ছিল, খোদাই ছিল না। তাহাও অনেকটা সাদাসিধে, অনেকটা মোটাশোটা, অনেকটা স্থূল ছিল। ষ্টেডকে দেখিয়া মনে হইত, বিধাতাপুরুষ যে বিশেষ ছাঁচে প্রথমে ইংরেজকে গড়িয়াছিলেন, বহুদিন পরে বুঝি সেই ছাঁচটাকে ধুইয়া মুছিয়া, ঘষিয়া মাজিয়া, আবার যেন তাহাতেই আমাদের এ কালে ষ্টেডকে ঢালাই করিয়া পাঠাইয়াছেন। ষ্টেডের মাথাটা বড় ছিল। আর সেই বড় ও সুগোল মস্তকের ঘননিবিড় কেশরাশি তাঁর ভিতরকার ভাবপ্রবণতার পরিচয় প্রদান করিত। অতিশয় ভাবপ্রবণ লোকে একটু লঘুচিত্ত, একটু চঞ্চল, একটু নিষ্ঠাহীন হইয়াই থাকে। কি আইরিশ্, কি স্পেনীয়, কি ফরাসীস্, কি ইতালীয়,—যুরোপের

ভাবপ্রবণ লোকেরা সকলেই স্বল্পবিস্তর লঘুচিত্ত ও চঞ্চল ও নিষ্ঠাহীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইংরেজের চরিত্রে এ লঘুচিত্ততা এ চঞ্চল্য, এ নিষ্ঠাহীনতা নাই বলিলেই হয়। ষ্টেডের আন্তরিক ভাবপ্রবণতার মধ্যেও একরূপ লঘুচিত্ততা বা চঞ্চল্য বা নিষ্ঠাহীনতা ছিল না। তাঁর সুগঠিত মস্তকের নিবিড় কেশরাশি যেমন তাঁর ভাবপ্রবণতার পরিচয় দান করিত, তেমনি আবার তাঁর প্রশস্ত ললাট, উন্নত কপোল, অপেক্ষাকৃত স্থূল অধরোষ্ঠ ও আয়ত চিবুকের ভিতর দিয়া তাঁর চরিত্রের স্বৈর্য্য ও গাভীর্ঘ্য, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার আতাই ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁর চোখ দু'টা ছোট ছিল। কিন্তু সেই ছোট গোলকের তীব্র দৃষ্টির ভিতর দিয়া লোকচরিত্র বুঝিবার একটা অসাধারণ শক্তি এবং আপনার স্বত্বস্বার্থ রক্ষা করিবার উপযোগী একটা বণিকস্বভাবস্থূলভ চতুরতাও প্রকাশিত হইয়া পড়িত। ষ্টেডের মুখের দিকে চাহিলেই মনে হইত, এ লোককে ক্ষেপান যায়, কিন্তু ঠকান যায় না। এ ব্যক্তি ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়া, কোন অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ত সর্বনাশকে অকুতোভয়ে আলিঙ্গন করিতে পারে; কিন্তু ভাল করিয়া না বুঝিয়া, আপনি কোন বিষয়ের সত্যাসত্য প্রত্যক্ষ ও প্রমাণিত না করিয়া, অন্ধ বিশ্বাসের প্রেরণায় বা কোন হুজুরের টানে, গোলে হরিবোল দিয়া, অন্ধকারে এক পা-ও চলিতে পারে না। ষ্টেডের চেহারার ভিতর দিয়াই এ সকল যেন ফুটিয়া বাহির হইত।

ষ্টেডের বাল্যশিক্ষা:

ষ্টেড অতি সামান্য গৃহস্থের ঘরে জন্মিয়া অতি সামান্য ভাবেই জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আমরা আজিকালি উচ্চশিক্ষা বলিয়া জানি, সে শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। ষ্টেড কোন বড় স্কুলে যান নাই। বিলাতে আমাদের দেশের মত বর্ণভেদ নাই, কিন্তু শ্রেণীভেদ আছে। বর্ণভেদে সামাজিক পদ-মর্যাদাকে একান্ত ভাবে ব্যক্তিবিশেষের জন্ম ও কুলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রেণীভেদে সামাজিক পদ-মর্যাদাকে অনেক পরিমাণে ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। বর্ণভেদের উপরে যে সমাজ গঠিত, সেখানে ধনের মূল্য কখনই অতিমাত্রায় বাড়িয়া যাইতে পারে না। সেখানে ধনী ও নিধনের মধ্যে কোনো প্রকারের আত্যস্তিক ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অতীতকালে শ্রেণীভেদের উপরে যে সমাজ গড়িয়া উঠে, সেখানে ধনের মূল্যটা আপনা হইতেই চড়িয়া যায়। সেখানে ধনী ও নিধনের মধ্যে জীবনের সকল পথেই একটা দ্রুত-ক্রমণীয় ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ণভেদ-প্রতিষ্ঠিত সমাজে, যে বড় কুলে জন্মাইল, তার ধন থাক বা না থাক, আপনার কুলোচিত বিদ্যা ও জ্ঞান তাহাকে উপার্জন করিতেই হয়। সমাজও সেখানে আত্মরক্ষার জন্ত আপনা হইতেই এই বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রেণীভেদপ্রতিষ্ঠিত সমাজে টাকা দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। এইজন্য শ্রেণীভেদের উপরে যে সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে বিদ্যালভ

ধনীদেবই সাধ্যাঙ্ক, দরিদ্রের পক্ষে সহজ নহে। বিলাতে ইটন্ (Eton), হ্যারো (Harrow), উইন্চেস্টার (Winchester), রাগ্‌বী (Rugby) প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্কুল আছে। দেশের বড়লোকের বালকেরাই এই সকল স্কুলে যাইতে পারে। আভিজাত্যের দাবী গ্রাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে এ সকল স্কুলে যাওয়া অসম্ভব। এ সকল স্কুলের বালকেরাই অক্সফোর্ড (Oxford) ও ক্যাম্ব্রিজ্ (Cambridge) এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া থাকে। অক্সফোর্ড (Oxford) ও ক্যাম্ব্রিজ্ (Cambridge) এই দুই পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকলেরই প্রতি উন্মুক্ত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এখানে বিদ্যালভ করা এতই ব্যয়সাধ্য যে দেশের সাধারণ গরিব লোকে সে ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না। তার উপরে এই দুইটী বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনের মধ্যে এমন একটা আভিজাত্যের অভিমান জাগিয়া আছে যে, সমাজের নিম্নশ্রেণীর বালকেরা সেখানে যাইয়া অনেক সময় “হংস মধ্যে বকো যথা”র জায় বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। ষ্টেড্ গরিব গৃহস্থের সন্তান। বিলাতী সমাজের আভিজাত্যশ্রেণীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের কোন প্রকারের সম্বন্ধের গন্ধ যাত্রাও ছিল না। সুতরাং কোন প্রসিদ্ধ স্কুলে বা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া কোন প্রকারের উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ তাহার ঘটে নাই। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া অতি অল্প বয়সেই এক আফিসের ছোকরার বা এরেষু বয়ের (Errand-

Boy) কর্মগ্রহণ করিয়া ষ্টেড্‌কে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিতে হয়।

কালজের শিক্ষা ও কাজকর্মের শিক্ষা

বিধাতার বিশ্বের যেখানেই কোন বিশেষ মন্দ জাগিয়া উঠে, সেখানে সেই মন্দেরই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবিধায়ক ভালটাও আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মানুষের প্রকৃতি কখনই চিরকাল বা দীর্ঘকাল কোন মন্দকে আশ্রয় করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব, সমাজের পক্ষে ইহা অসাধ্য। যাহা অপূর্ণ তাহাই মন্দ। আর মানবপ্রকৃতি পূর্ণতার বীজ বুকে ধরিয়া ঋজুকুটিলভাবে সেই পূর্ণতার দিকেই ক্রমে দ্রুতগতি উঠে। ব্যক্তি ও ইহাই করিতেছে, সমাজ এই পথেই চলিতেছে। আর তারই জন্ত কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, মানুষের সকল প্রকারের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠার ভিতরেই ভালোর মধ্যেই মন্দ ও মন্দের মধ্যেই ভালো মিশিয়া রহে। এই জন্ত রক্তপ্রধান বিলাতীসমাজে গরিব লোকের পক্ষে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে কিম্বা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যালভ করা যেমন কঠিন, অতদিকে সেইরূপ এ সকল সুযোগ না পাইয়াও যত লোক সেখানে কেবল আপনার অল্পশীলন ও অধ্যবসায়বলে অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষালাভ করিয়া সমাজে অসাধারণ সন্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন, অত কোন সমাজে তাহা সম্ভব হয় না। কি ব্যবসা-বাণিজ্যে কি রাষ্ট্রীয় কার্যে কিম্বা নূতন-তত্ত্বের আবিষ্কারে বিলাতে যাহারা সমাজে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন, তাহাদের সকলে বা অনেকেই

যে অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজের লোক, এমন নহে। ইংরেজের বিশাল বাণিজ্য যাহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহাদের একজনেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজজাতির ক্ষাত্রবীর্য যে সকল মহাবীরকে আশ্রয় করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ক'জনের সঙ্গেই বা অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজের কোন সম্পর্ক ছিল? বারুণীর অঙ্কে বান্ধিত ইংরেজের নৌ-বিলাস হইতেই ইংলণ্ডের বিশ্ববিজয়িনী নৌশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে, অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজের শিক্ষা হইতে হয় নাই। ফলতঃ সকলে অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজে যাইতে পারে না বলিয়াই ইংরেজসমাজের এত লোক বালো কোন শিক্ষা না পাইয়াও শুদ্ধ আপনাদের অদম্য অধ্যবসায়বলে পর-জীবনে সমাজের শ্রেষ্ঠজনের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে। এই অদম্য অধ্যবসায় ইংরেজ-চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ।

ষ্টেডের অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব

এই অধ্যবসায় গুণেই ষ্টেড ও অতি সামান্ত গৃহস্থের ঘরে জন্মিয়া, শৈশবে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষালভের কোনো সুযোগ না পাইয়াও, পরজীবনে কেবল আপনার দেশে নহে, কিন্তু সমগ্র সভ্যসমাজে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। একদিন যে সামান্ত হরকরার কাজে নিযুক্ত হইয়া লণ্ডনের রাজপথে চিঠি হাতে করিয়া ছুটোছুটি করিত, পরে এমন এক দিন আসিল, যখন রুসিয়ার জার (Czar) ও জার্মানীর কায়সার (Kaiser), তুরস্কের

সুলতান ও ইংলণ্ডের সম্রাট, নিয়ম-তত্ত্বাধীন রাজমন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রাধীন প্রেসিডেন্ট, সমাজসংস্কারক ও ধর্মপচারক, তাঁহারই পরামর্শপ্রার্থী হইয়াছিলেন। অথচ ষ্টেড কখনো সাক্ষাৎভাবে কোন রাষ্ট্রীয় কর্মভার গ্রহণ করেন নাই। ব্রিটিশ প্যালেমেন্টে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল না। তাঁহার অপেক্ষা অনেক নীচুদেরই ইংরেজও প্যালেমেন্টে যাইয়া ক্রমে মন্ত্রীদলে পর্যন্ত চুকিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে ষ্টেডও তাহা পারিতেন কিন্তু এ চেষ্টা তিনি কখনো করেন নাই। একবার কেবল তিনদিনের জন্য প্যালেমেন্টে যাইবার তাঁর সাধ হইয়াছিল,—আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। তখন আইরিশ লোক-নায়ক পার্ণেল জীবিত ছিলেন। সে সময়ে কি একটা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অহিতাচারের তীব্র প্রতিবাদ করা আবশ্যক হয়। ষ্টেড পার্ণেলকে তখন একটা আইরিশ কনস্টি-টুয়েনসী (Constituency) জোগাড় করিয়া তিন-চার দিনের জন্য তাঁহাকে প্যালেমেন্টের সভ্য করিয়া দিতে বলেন। প্যালেমেন্টে দাড়াইয়া এই অহিতাচারের প্রতিবাদ করিয়া একটী মাত্র বক্তৃতা দিয়াই তিনি তাঁর পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া যাঁর স্থান তাহাকে দিতে রাজি হন। যাহা হউক ষ্টেডের এই ক্ষণিক সাধও পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু প্যালেমেন্টের সভ্য না হইয়াও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির বিকাশসাধনে ষ্টেড যতটা সাহায্য করিয়াছেন, গ্লাডস্টোন প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যতীত আর কেহ ততটা সাহায্য করিয়াছেন কি না, সম্মেহের কথা।

আর ষ্টেডের এই অসাধারণ কৃতিত্বের পশ্চাতে তাঁর সাচ্চা ইংরেজ-প্রকৃতিটাই দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেডের বুদ্ধি যে নিরতিশয় সূক্ষ্ম ছিল, তাহা নহে। ইংরেজের স্বাভাবিকী বুদ্ধি একটু মোটা। তাহা ভারে কাটে কিন্তু ধারে কাটে না। কোনো সূক্ষ্ম তত্ত্বে বা জটিল বিষয়ে ইংরেজের বুদ্ধি সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। কোনো জটিল সমস্যার জটিলতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, একটা সম্যকদর্শন কুটিয়া উঠে। ইংরেজবুদ্ধির এ সম্যক দৃষ্টি নাই। যে অগপশাৎ বিবেচনা ব্যবসায়ীর লাভালাভ জানিবার জ্ঞান অত্যাবশ্যক, ততটুকু দূরদর্শিতা ইংরেজের বুদ্ধিরও আছে। কিন্তু যে সম্যকদৃষ্টি তত্ত্বদর্শীর লক্ষণ, ইংরেজের সে সম্যকদৃষ্টি নাই। আর সেরূপ সম্যকদৃষ্টি নাই বলিয়াই ইংরেজের একটা অসাধারণ 'গোঁ' আছে। এই গোঁয়ের জোরেই ইংরেজ ছুনিয়া জয় করিয়াছে। আর এই গোঁয়ের জোরেই ষ্টেডও অসাধারণ বিচার বল, অথবা বিপুল ধনের বল, কিম্বা উচ্চ আভিজাত্যের বল ব্যতীতও আজীবন ইংরেজসমাজে রাজা ও প্রজা, ইতর ও তদ্র, সকলের উপরে এতটা আধিপত্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

“Maiden Tribute.

ষ্টেডের প্রথম প্রতিষ্ঠা “পেল্ মেল্ গেজেট” (Ball Mall Gazette) নামক পত্রিকায়। সে আজ প্রায় আটশ বৎসরের কথা। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের পাঠকদিগের নিকটে ষ্টেড তার পূর্ব হইতেই সুপরিচিত

ছিলেন। কিন্তু যে দিন “Maiden Tribute of Modern Babylon” নামক প্রবন্ধা-বলী পেল্ মেল্ গেজেটে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল, সে দিন সমগ্র সভ্যজগতের চক্ষু ষ্টেডের উপরে যাইয়া পড়িল। সেদিন ইংরেজ বুঝিল যে বহুদিন পরে একজন মানুষের মত মানুষ দেশে জন্মিয়াছে। সে দিন ছুনিয়া দেখিল যে ইংরেজের বিপুল ধনরাশি, তাহার প্রচণ্ড ভোগবিলাস, তাহার সখ ও সৌখিনতা এ সকলের পশ্চাতেও একটা সাচ্চা মনুষ্যত্ব-বহু জাগিয়া আছে। সে দিন ইংরেজ-সমাজের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র যুরোপীয় সমাজেও একটা সাড়া পড়িয়া গেল। লণ্ডন সহরে সে সময়ে একদল বড় লোক গরিব পিতা মাতাকে টাকা দিয়া বশু করিয়া তাহাদের উদ্ভিন্নযৌবনা, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাগণের সর্বনাশ করিগেছিল। এই পাপে ইংরেজ আভিজাত সমাজ নীরয়গামী হইতেছিল। প্রাচীন বেবিলনে, আমাদের দেশের কোনো কোনো তান্ত্রিক সাধনের গায় ধর্মের নামে, অক্ষতযোনী কুমারীগণের সতীত্ব নাশ করা হইত, এরূপ কিম্বদন্তী আছে। এই কিম্বদন্তী স্মরণ করিয়াই ষ্টেড লণ্ডন সহরকে মডার্ন বেবিলন (Modern Babylon) নামে অভিহিত করেন। আর বেবিলনের পুরাতন গর্হিতাচার মনে করিয়াই কুমারী-বলি বা Maiden Tribute বলিয়া লণ্ডনের ধনীলোকদিগের এই আধুনিক পণ্ডরুত্তির ব্যাখ্যান করেন বিলাতের অতিবড় সম্ভ্রান্ত লোকেরাও এই পাপে লিপ্ত ছিলেন। মাতৃরূপী রমণীর

শ্রেষ্ঠতম বস্তু যে এরূপভাবে বেচা কেনা হয়, ষ্টেড্‌ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। এ দুয়াচারের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করিবার জন্য আপনার সর্দার পণ করিয়া দাড়াইলেন। কেবল লোকের মুখের কথার উপরে নির্ভর করিয়া সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকের বিরুদ্ধে অত বড় অভিযোগ আনা সম্ভব নহে ভাবিয়া, তিনি স্বয়ং ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। আপনি একজন ‘লম্পট’ সাজিয়া, যাহারা এই গর্হিত ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, তেমন লোকের দ্বারা একটা উদ্ভিন্নযৌবনা বালিকার মাতাকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া, তার কন্যাকে সংগ্রহ করিলেন। বিলাতী আইনে সে সময়ে ষোড়শ বর্ষই বালিকাগণের নিম্নতম ‘সম্মতির’ বয়স বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। এই বালিকার বয়স যে ষোড়শ বর্ষের ন্যূন ইহা সত্য সত্য ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইলেন। যখন এতটা প্রমাণ স্বয়ং সংগ্রহ করিলেন, ব্যাপারটা যে সত্য সে বিষয়ে যখন আর তিলপরিমাণ সন্দেহের অবসর রহিল না, তখন ইহার কথা সাধারণে প্রচার করিয়া Maiden Tribute-শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পত্রস্থ করিলেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবা মাত্র, চারিদিকে তুমুল আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। ধনীদল আপনাদের কলঙ্ক রটনায়, ক্রোধে, ভয়ে, লোকলজ্জায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। ইংরেজ জনসাধারণে দারিদ্র্যের অবমাননার কথা পড়িয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। সভ্যজগতের লোকে ইংরেজের নামে দিকার দিতে লাগিল। Maiden Tribute লেখার জন্য

ষ্টেড্‌কে রাজদ্বারে দণ্ডিত করা অসম্ভব দেখিয়া, তাঁর শত্রুগণ ষ্টেড্‌ আপনি যে একটা অপাপ্রবয়স্কা কুমারীকে ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করাইয়া, আপনার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই স্মৃতিতেই, ষ্টেড্‌ অপাপ্রবয়স্কা কুমারীর সম্মত নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে নালিশ রুজু করাইলেন। অপাপ্রবয়স্কা বালিকার সহবাসের চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া ষ্টেড্‌ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া তাঁর কারাদণ্ড হইল। কিন্তু একজন্ম ষ্টেডের দুঃখ হইল না। এ দণ্ড তাঁর নিন্দার হেতু না হইয়া শাস্তির কারণই হইল। কারাবাস তাঁর অপমানের বিষয় না হইয়া অশেষ গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিল। আমরণ পর্যন্ত ষ্টেড্‌ যে তারিখে তাঁর কারাদণ্ড হইয়াছিল, প্রতি বৎসর সেই দিন সেই পুরাতন কয়েদীর পোষাক পরিধান করিয়া, সেই ত্যাগযজ্ঞের সাধ্বৎসরিক উৎসব করিতেন। ষ্টেডের জেল হইল বটে, কিন্তু যে গোপনীয় অত্যাচারের কথা লোকমণ্ডলী মধ্যে প্রচার করিয়া তিনি এ দণ্ডভোগ করেন, সে অহিতাচার ররও প্রতিবিধান হইল। Maiden Tribute শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর প্রত্যক্ষ ফল-স্বরূপ বিলাতের প্রাচীন দণ্ডবিধিতে অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা যুবতীগণের সহবাসকে দণ্ডনীয় করিয়া, নূতন বিধান সন্নিবিষ্ট হইল। এই বিধান অনুসারে অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের ‘সম্মতির’ বয়স অষ্টাদশবর্ষ নির্দ্ধারিত হইল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ক্রিমিনাল এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (Criminal Amendment Act.) ইংরেজের সমাজ-জীবনের

ইতিহাসে, ষ্টেডের অক্ষয় কীর্তি বলিয়া চিরদিন ঘোষিত হইবে।

বিলাতী সংবাদপত্র-সম্পাদনে ষ্টেডের বিশেষত্ব

সাময়িক পত্রের লেখক ও সম্পাদক বলিয়াই ষ্টেড আধুনিক সভ্যজগতে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক সময়ে সাময়িক সংবাদপত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী সন্দেহ নাই। কিন্তু সাময়িক পত্রের প্রভাব যত, এই সকল পত্রের লেখকদিগের প্রতিষ্ঠা তার শতাংশের এক অংশও হয় না। ফলতঃ এ সকল পত্রে কে লেখে বা না লেখে, সাধারণ লোকে তার খবরাখবর রাখে না। বিলাতী সাময়িক পত্র সকল দল বিশেষের মুখপত্র হইয়াই থাকে। যে পত্রিকা যে দলের মুখপত্র, তাহাতে সেই দলের মতামত ও রীতিনীতিরই পোষকতা করা হয়। এই সকল রচনার ভিতর দিয়া লেখকগণের ব্যক্তিত্ব কুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না। লেখকেরা পরস্পর খাইয়া লেখেন। যাহাদের বেতনভোগী হইয়া ইহারা প্রবন্ধাদি রচনা করেন, তাহাদের মতামতই ইং-দিগকে ব্যক্ত করিতে হয়। নিজেদের বিচারবুদ্ধির অনুযায়ী কোনো কিছু লিখিবার অধিকার ইহাদের প্রায়ই থাকে না। কখনো কখনো নিজেদের যাহা মত নয়, এমন বিষয়ও ইহাদিগকে লিখিতে হয়। ঐক্য ব্যবসাদারী সাহিত্যচর্চায় ক্ষুণ্ণবৃত্তির ব্যবস্থা হইলেও মনোবৃত্তির ক্ষুরণ কিম্বা মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। বিলাতের ধনীলোকেরা এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ বহুকাল ধরিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখকগণের মনুষ্যত্বকে এইরূপ-

ভাবে চাপিয়া রাখিয়া ও পিষিয়া মারিতে ছিলেন। ষ্টেডই সর্বপ্রথমে এই নিষ্ঠুর দাসত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকের ও সাময়িক পত্রের লেখকগণের আত্মসম্মানবোধকে জাগাইয়া তোলেন। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে বেনামী লেখাই বিলাতী সংবাদপত্রের সাধারণ রীতি ছিল। ষ্টেডই সর্বপ্রথমে নিজের নাম দিয়া সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। আজকালি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিলাতের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রের লেখকগণ নিজের নাম দিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্বকার বেনামী লেখাতে সংবাদপত্র বিশেষেরই প্রতিষ্ঠা হইত, দল বিশেষেরই প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বাড়িয়া যাইত; জনগণের চিন্তা ও চরিত্রের কিম্বা রাষ্ট্রের কর্ত্ত ও নীতি সম্বন্ধে লোকমত সংগ্রহকারী সাময়িকপত্রের লেখকগণের ব্যক্তিত্বের ও বিজ্ঞাবুদ্ধির কোনো প্রকারের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইত না। ষ্টেড এ সকলকে বদলাইয়া গিয়াছেন। সাময়িক পত্রের লেখকগণ যে রাষ্ট্রীয় জীবনগঠনে কতটা সহায়তা করেন, প্রতিভাশালী সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদগৌরব ও শক্তিসাধ্য যে কোনো রাজমন্ত্রী বা রাষ্ট্রমন্ত্রী অপেক্ষা কম নহে, কিন্তু কোনো কোনো স্থলে অনেক বেশী; লোকে পূর্বে ইহা কখনো অনুভব করে নাই। ষ্টেডকে দেখিয়া তারা এখন ইহা বুঝিয়াছে। ষ্টেড সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাময়িক পত্রের লেখক ছিলেন। কিন্তু কি স্বরাষ্ট্রের কিম্বা পররাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ নীতি নির্ধারণে তিনি যে পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন,

অনেক রাষ্ট্রমন্ত্রী তাহা করিতে পারেন নাই। ইংরেজের নৌ-নীতি আজ যে রীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে ষ্টেডেরই উদ্ভাবিত। জর্জী প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দী রাষ্ট্রশক্তির নৌবলের তুলনায় ইংরেজের নৌশক্তিকে কি পরিমাণে বাড়াইতে হইবে, তাহার সূচনাক্রমে ষ্টেডের দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়। ষ্টেডই প্রথমে এ কথা বলিয়াছিলেন যে, অপরে যখন এক খানা যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করিবে, ইংলণ্ডকে তখন দু'খানা নির্মাণ করিতে হইবে। আজ উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল উভয় দলের রাষ্ট্রনৈতিকেরা একবাক্যে এই আদর্শ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। আজ কালি যুরোপের সর্বত্র শালিশীর দ্বারা যে রাষ্ট্রীয় বিরোধের নিষ্পত্তির চেষ্টা হইতেছে, ষ্টেড তাহারও সূত্রপাত করেন। কতিপয় বৎসর পূর্বে হেগ্ (Hague) নগরীতে সভ্যজগতের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মিলিয়া, প্রতিদ্বন্দী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের শান্তি হইয়া পরস্পরের বিবাদ যাহাতে আপোষে মিটিতে পারে, তাহার বিচার আলোচনা করিয়াছিলেন। ষ্টেড সেই শান্তিসমিতি বা 'Peace Conference' এরও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও অধ্যবসায় ব্যতীত এই অনুষ্ঠান যে কখনই সম্ভব হইত না, ইহা সকলেই এখন একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। ষ্টেডের ধনবল ছিল না। ষ্টেড কোনো রাষ্ট্রনৈতিকদলের নেতা ছিলেন না। তাঁর লোকবলও ছিল না। তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি কিম্বা অলোকসামান্য প্রতিভাও ছিল না। তাঁর ছিল কেবল অদমনীয়

অধ্যবসায়, অকপট সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগ, অসাধারণ আত্মনির্ভর এবং নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেম ও লোকহিতৈষ্য। ষ্টেড বালকের আয় সরল ছিলেন, স্ত্রীলোকের আয় কোমলহৃদয় ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন, সিংহের আয় সাহসী ছিলেন ও পর্ব্বতের আয় অটল ছিলেন। আর তাঁহার মধ্যে এ সকল গুণের সমাবেশ ছিল বলিয়াই, সামান্য সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক হইয়াও তিনি সাময়িক ইতিহাসে এক্ষণ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্র-পরিচালকগণ দুই পথ ধরিয়া প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। এক পথে যাইয়া, সর্বদা লোকমতের অনুসরণ করিয়া, জনসাধারণে যখন যে ভাবে ক্ষেপিয়া উঠে সেই ভাবেতে ইন্ধন জোগাইয়া তাঁহার সহজেই লোকে অনুগতভাজন হইতে পারেন। আর এক পথে যাইয়া, জনসাধারণের কি ভাল লাগিবে সে দিকে দৃকপাত না করিয়া, কিসে তাহাদের ভাল হইবে, তারই অনুধ্যান করিয়া, তাহাদিগকে প্রেয়ের পথে নয়, কিন্তু শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। প্রথম পথের পথিক লোকমতের অনুসরণ করিয়া অনুগত ভূক্তের আয় জনসাধারণের সেবা করেন। এ পথ সহজ। এই পথে অনায়াসে বা অতি স্বল্পায়াসেই সংবাদপত্র-পরিচালক আপনার পশার বৃদ্ধি করিতে পারেন। এ পথ ব্যবসাদারের পথ। বিলাতের প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্রের ও সাময়িক পত্রের প্রায় সকল গুলিই এই পথের পথিক। লোকমতের হাওয়া যখন যে বিষয়ে যে দিকে প্রবলবেগে

ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন ইহারা সেই দিকেই আপনাদের লেখনী চালনা করিয়া থাকেন। দেশের প্রবল রাষ্ট্রীয়-দলের প্রত্যেকেরই ছ' এক খানা মুখপত্র আছে। এই সকল সংবাদপত্র নিজ নিজ দলের নেতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া চলে। এক সময়ে বিলাতে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক, লিবারেল ও কনসারভেটিভ (Liberal ও Conservative) এই দুই প্রতিদ্বন্দী দলের কোনোটারই একান্ত অল্পগত নয়। এমন সংবাদপত্র ছিল না। তখন যারা সংবাদপত্র কিনিতেন ও পড়িতেন, তাঁরা সকলেই হয় কনসারভেটিভ না হয় লিবারেল এই দুই দলের একদল ভুক্ত হইতেন। আর এই দুই দলের মধ্যে এতটা রেশারেশি ছিল যে একদলের লোকে অপর দলের পৃষ্ঠপোষক সংবাদপত্র স্পর্শ পর্যন্ত করিতেন না। সাময়িক পত্রের পাঠক সংখ্যাও তখন অল্প ছিল। ক্রমেই এ সকল অবস্থার দোরতর পরিবর্তন ঘটিতেছে। সাময়িক পত্রের পাঠকসংখ্যা পূর্ণাপেক্ষা এখন অনেক গুণে বেশী হইয়াছে। আগেকার দলাদলির ভাবটাও ক্রমে কমিয়াছে। কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয়দলভুক্ত নহে, সাময়িক পত্রের এক্রপ অনেক পাঠক এখন জুটিয়াছে। এ সকল লোকই পালেমেণ্টে সভ্যনির্বাচন সময়ে এই দুই প্রতিদ্বন্দীদলের ভাগ্যবিধাতা হইয়া থাকে। যখন যে দলের দিকে ইহারা ঝুকিয়া পড়ে, তখন সেই দলেরই ক্ষিত হয়। আর আজিকালি বিলাতে এই সকল লোকই ব্যবসাদারী সাময়িক পত্র সকলের প্রভু হইয়া বসিয়াছে। সূচত্বর ব্যবসায়ী যেমন খাজাবের

মতিগতি লক্ষ্য করিয়া আপনার পণ্য সংগ্রহ করে ও দোকানপাট সাজায়, গ্রাহকের মন জোগাইয়া পয়সা উপার্জন করা ছাড়া আর কোনো উচ্চতর লক্ষ্য যেমন তার থাকে না, সেইরূপ এই সকল সংবাদপত্র-পরিচালকও লোকমত কোন্ দিকে চলিতেছে তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখেন এবং সেই মতের পোষকতা করিয়াই আপনাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কোনো বিষয়ের সত্যাসত্য, ভালমন্দ বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার তাহাদের কর্তব্যসীমার বাহিরে পড়িয়া রহে। এই সকল সংবাদপত্র-পরিচালক জনমণ্ডলীর আসন্ন পরিচারক রূপে তাহাদের মজ্জি জোগাইয়াই ছ' পয়সা উপার্জন করেন; লোকের ইষ্টানিষ্ট ও দেশের ভালমন্দের প্রতি ইহাদের দৃষ্টি নাই। বিলাতের অধিকাংশ সাময়িক পত্রই এখন এই পথ ধরিয়া চলিতেছে। ডে'লি মে'ল (Daily Mail) জাতীয় সংবাদ পত্র এই পথ ধরিয়া চলিয়াই দেশটা লুটিয়া খাইতেছে। কিন্তু ইহাই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র-পরিচালনার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ নহে। ভালমন্দ বিচার না করিয়া লোকমতের অনুসরণ করাই সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ব্যবসায় বা কণ্ঠব্য নহে। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক জনমণ্ডলীর পরিচারক হইবেন না, কিন্তু পরিচালকই হইবেন; অনুগত ভূতা হইবেন না, কিন্তু তাহাদের শক্তিশালী গুরু হইয়া, তাহাদিগকে প্রেয়ের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইবেন। ইহাই সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সত্য লক্ষ্য। আর আধুনিক

বিলাতী সমাজে যে অত্যন্ত সংখ্যক সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক এই লঙ্কায় অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ষ্টেড্ তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন। যে কালে ষ্টেড্ এই আদর্শ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করেন, সে কালে বিলাতী সংবাদপত্র সম্পাদক ও লেখকবর্গের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা বলিয়া কোনো বস্তু ছিল না। যে পেল্ মেল্ গেজেটকে আশ্রয় করিয়া ষ্টেড্ বিলাতের সাময়িক সাহিত্যে অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই পেল্ মেল্ গেজেটের সঙ্গেও বেশী দিন একসঙ্গে কাজ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ষ্টেড্ “পেল্ মেল্” পরিত্যাগ করিলেন। যে আদর্শের অনুসরণ করিতে বাইয়া তাঁহাকে পেল্ মেল্ ছাড়িয়া দিতে হয়, অথচ কোনো সংবাদপত্রের বেতন-ভোগী সম্পাদক বা লেখকরূপে সেই আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। আপনার জীবনের লক্ষ্য সাধনের জ্ঞাত ষ্টেড্কে তখন আপনার স্বাধীনে একখানি সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হয়। এইরূপেই তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত রিভিউ অব্ রিভিউজের (Review of Reviews) উৎপত্তি হয়। আপনি এই পত্রের সঙ্গীকারী ও আপনি ইহার সম্পাদক ও পরিচালক হইয়া ষ্টেড্ বিগত বাইশ বৎসর কাল আধুনিক সভ্যসমাজে আপনার পবিত্র লোকশিক্ষাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

“রিভিউ-অব্-রিভিউজ্”

যে অকপটে যে আদর্শের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, বিধাতাপুরুষ স্বয়ং

তাহাকে সেই আদর্শ লুপ্তের উপযোগী বিচার-বুদ্ধি ও শক্তি সাধ্য দান করিয়া থাকেন। ষ্টেডের যে অসাধারণ বুদ্ধি কিম্বা অলোকসামান্য দূরদৃষ্টি ছিল, এমন বলা যায় না। কতটা পরিমাণে যে রিভিউ অব্ রিভিউজ্ (Review of Reviews) তাঁহার লোকশিক্ষাব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্য করিবে, প্রথম হইতেই যে তিনি এটা বুঝিয়াছিলেন এমনও বোধ হয় না। আজি কালিকার দিনে লোকে নিজ নিজ বিষয়-কর্ম লইয়া এতই ব্যাপৃত হইয়া পড়ে যে বড় বড় মাসিক পত্রে যে সকল গভীর বিষয়ের আলোচনা হয়, সে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পড়িবার সময় ও শক্তি তাহাদের থাকে না বলিলেই হয়। অথচ দুনিয়ার চিন্তাস্রোত কোন্ ভাবে কোন্‌দিকে চলিতেছে এই সকল মাসিকপত্র না পড়িলে তাহার সন্ধান রাখাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ করিয়া কর্মব্যস্ত জনগণের হস্তে অর্পণ করিবার জ্ঞানই রিভিউ অব্ রিভিউজের জন্ম হয়। ইহা অপেক্ষা কোনো উচ্চতর লক্ষ্য যে ষ্টেড তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এমন মনে হয় না। আর প্রত্যক্ষ করেন নাই বলিয়াই তাঁহার এই অনুষ্ঠানের অন্তরালে আমরা এখন বিধাতাপুরুষেরই হস্ত দেখিতেছি। ষ্টেড নিজের একখানা দৈনিক সংবাদপত্র না হউক, অন্ততঃ উচ্চ অঙ্গের সাপ্তাহিক বা মাসিক ইংরেজী পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন। কেন যে তিনি সে পথে যান নাই জানি না। কিন্তু ইহা জানি যে তিনি রিভিউ অব্ রিভিউজের সাহায্যে সমগ্র

সভ্যজগতের চিন্তা ও কর্মের উপরে যতটা প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, কোনো সাপ্তাহিক বা মাসিক ইংরেজী পত্রিকার সাহায্যে তাহা কদাপি লাভ করিতে পারিতেন না। রিভিউ অব রিভিউজ ইংরেজীতেই লেখা হয় সত্য, আর লগুনেতেই ছাপা হইত। কিন্তু এ সম্বন্ধে ইহাকে কখনই কেবল ইংরেজের কাগজ বলা যাইতে পারিত না। যুরোপের সর্বত্র যে সকল কর্মী ও মনীষিগণের হস্তে আধুনিক জগতের ভাগ্য-সূত্র রহিয়াছে, রিভিউ অব রিভিউজ তাঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধার ও আদরের বস্তু ছিল। রাজপ্রাসাদে রাজা, মন্ত্রভবনে রাজ-মন্ত্রিগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, সেনা-শিবিরে সেনানায়ক, সংবাদপত্রের আপিসে সম্পাদক, ধর্মমন্দিরে ধর্মযাজক, নাট্যশালায় নটনায়ক, আধুনিক সভ্যজগতের সর্বত্র গাঁহার। জনগণের চিন্তাশ্রোত ও কর্ণ-শ্রোতকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই রিভিউ অব রিভিউজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইহারা সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে, শ্রদ্ধাসহকারে রিভিউ অব রিভিউজ পাঠ করিতেন। বিলাতের অত্যন্ত প্রধান রাষ্ট্রনায়ক ব্যালফোর (Balfour) একবার বলিয়াছিলেন যে তিনি কখনও সংবাদপত্র পাঠ করেন না, কিন্তু তিনিও রিভিউ অব রিভিউজের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। রিভিউ অব রিভিউজ কেবল যে অপর পত্র হইতে প্রবন্ধ সার সংগ্রহ করিয়াই আপনার কলেবর পূর্ণ করিত তাহাও নহে। প্রতি মাসে সভ্যজগতের যেখানেই যে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটুক

না কেন, ষ্টেড্ তাহারই উপরে আগনার মস্তব্য প্রকাশ করিয়া একদিকে জগতের দৈনন্দিন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন, অতীতকে হুনিয়ার লোকমত গঠনের সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। রিভিউ অব রিভিউজের চরিত্র-চিত্রগুলি আধুনিক সভ্য জগতের গত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসের প্রাণ রসকে ভবিষ্যতের জন্ত মুর্ছিমস্ত করিয়া রাখিয়াছে।

ষ্টেডের বিচার প্রণালী।

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আধুনিক সভ্য জগতের কোনো দেশে এমন কোনো শক্তিশালী লোকনায়কের অভ্যুদয় হয় নাই, যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে ষ্টেডের স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ আলাপপরিচয় ছিল না। তিনি কেবল যে জগতের দৈনন্দিন ঘটনাগুলিই জানিতেন তাহা নহে, কিন্তু এই সকল ঘটনার অন্তরালে যে ব্যক্তিগত চরিত্র লুকাইয়া থাকে, নথ-দর্পণের তায় সর্বদা তাহাও প্রত্যক্ষ করিতেন। সূত্রাৎ ষ্টেড্ কখনই কেবল বাহিরের কাণ্ডাকার্যের দ্বারা কোনো বিষয়ের ভালমন্দের বিচার করিতেন না। কিন্তু এই সকল কার্য্যাকার্যের ভিতরে যে মানুষের প্রাণ, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, মানুষের শক্তি ও সংযম, মানুষের লক্ষ্য ও অভীষ্ট জড়াইয়া থাকে, তাহারই দ্বারা এ সকলের বিচার করিতেন। আর এই জন্ত প্রত্যেক দেশের কর্মিগণ একদিকে যেমন তাঁহার মন্তব্যের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া শ্রদ্ধাভরে তাঁহার কথা শুনিতেন, অতীতকে সেইরূপ কেবল বাহির হইতে যাহারা সকল বিষয়ের বিচার

আলোচনা করেন, তাহারা অনেক সময়ে ষ্টেডের বুদ্ধির স্থিরতা ও তাহার মতামতের মধ্যে কোনো প্রকারের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নাই বলিয়া প্রায়ই তাঁহার মন্তব্যকে উপেক্ষা করিতেও চেষ্টা করিতেন। যে মানুষ নিজের নিকটে সর্বদা ঝাঁপি হইতে চাহে, লোকচক্ষে তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা প্রমাণিত করা অসম্ভব। মানুষ সর্বজ্ঞ নহে। সত্যের সকল দিকটা সর্বদা একই সঙ্গে তাহার চক্ষু-গোচর হয় না। আমাদের সকল সিদ্ধান্তেই অন্ধের-হস্তিদর্শন-ভ্রাতৃটা প্রায় সর্বদাই প্রযুক্ত হইতে পারে। এবং তারই জ্ঞান জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সর্বপ্রকারের সিদ্ধান্তই উত্তরোত্তর পূর্ণতর হইতে যাইয়াই পরিবর্তিত হয়। লোকে যাহাকে সচরাচর স্থিরমতি বলে তাহা অনেক সময়েই কেবল রুদ্ধগতির লক্ষণ। ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই রুদ্ধগতিকেই arrested development বলে। কিন্তু ষ্টেডের মনের গতি আশ্চর্য কথনও রুদ্ধ হয় নাই। বয়স তাহার বাড়িয়াছিল, কিন্তু শৈশবের সারল্য, যৌবনের উদ্যম, জ্ঞানের পিপাসা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, কণ্ঠের চেষ্টা, এ সকলের কিছুই বিন্দু পরিমাণ কমে নাই। জগতের অনেক লোক প্রকৃত পক্ষে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইতে না হইতেই মরিয়া যায়। নূতন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করিয়া নূতন শক্তি সংগ্রহ ও নূতন চেষ্টার প্রকাশ, নিত্য নূতন জ্ঞান বা নিত্য নূতন রস আবাদন, নিত্য নূতন কণ্ঠের আয়োজন—এ সকলই তো প্রকৃত জীবনের লক্ষণ।

কিন্তু জগতের অধিকাংশ লোক জীবিত থাকিয়াও জীবনের এ সকল লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারে না। আর এই সকল লোকের বিষয়েই সচরাচর আমরা জীবন্ত-মৃত্যুর স্থিরতার মধ্যে, তাহাদের রুদ্ধবুদ্ধির স্থিরতাও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পর্যন্ত ষ্টেড প্রকৃত অর্থে জীবিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বুদ্ধি যে প্রাকৃতজন-সুলভ স্থিরত্ব লাভ করে নাই ইহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাঁহার মতামতের মধ্যে যে সঙ্গতির অভাব দৃষ্ট হইত তাহা কেবল বাহিরেরই কথা, ভিতরের কথা নহে।

ষ্টেড ও রশ সম্রাট

ষ্টেড আজীবন প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। যখন যেখানে প্রজামণ্ডলী আপনাদের স্বত্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করিয়াছে, ষ্টেড তখনই তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই জন্তই তিনি বুয়র যুদ্ধের সময় নিজেদের গভর্ণমেণ্টের সমর্থন না করিয়া বুয়র-নেতৃবর্গের পক্ষই সমর্থন করিয়াছিলেন। আর এই কারণে সেই সময়ে তিনি অতিমাত্রায় সাধারণ ইংরেজমণ্ডলীর বিরাগভাজনও হইয়াছিলেন। অথচ যে সিসিল রোড্‌স্ (Cecil Rhodes) প্রকৃত পক্ষে চক্রান্ত করিয়া ব্রিটিশগভর্ণমেণ্টকে এই সংগ্রামে প্ররত্ত করেন, ষ্টেড সর্বদাই সেই সিসিল রোড্‌সের স্ব্তিবাদে নিষ্ঠুর হইয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেন। সাধারণ লোকে ষ্টেডের এই দুই কার্যের মধ্যে কোনো প্রকারের সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ষ্টেড একদিকে যেমন জগতের সর্বত্র প্রজামণ্ডলীর স্বত্ব-

স্বাধীনতা সম্প্রসারণের ও প্রজাতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন, অতীতকালে সেইরূপ যুরোপের স্বৈচ্ছাতন্ত্রের একমাত্র অধিনায়ক, রুশিয়ার জারেরও (Czar) পক্ষ সমর্থন করিতেন। লোকে এ অসঙ্গতির অর্থও বুঝিতে পারে নাই। এই জন্ত তাহার অনেক সময়ে ষ্টেডের সাধুতা সম্বন্ধেও সন্দেহান হইয়াছে। কেবল বাহির হইতে ষ্টেডের কার্যাকাণ্ডের বিচার করিলে এ অসঙ্গতির রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয় না। মিসিস রোডসকে এবং “জারকে” সাধারণ লোকে দূর হইতে এবং বাহির হইতেই সন্দেহ দেখিয়াছে। তাহাদের নিকটে যাইয়া তাহাদের প্রাণের অন্তঃপুরে কখনো প্রবেশাধিকার পায় নাই। ষ্টেড এই দুই জনকেই অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বন্ধুর নিকট বন্ধু যেমন প্রাণের সকল পক্ষা খুলিয়া দিয়া নিঃসঙ্কোচে দাঁড়ায়, রোডস এবং “জার” দু’জনেই সেইরূপ একদিন ষ্টেডের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ষ্টেডের প্রকৃতিগত অকপটতার সংস্পর্শে জারের জারত্বের বহিরাবরণ আপনা হইতেই সরিয়া গিয়াছিল। ষ্টেডের অনাবৃত মনুষ্যত্বের সম্মুখে “জার” জাররূপে নহে, কিন্তু শুদ্ধ মানুস্বরূপে একদিন দাঁড়াইয়া ছিলেন। “জারের” ভিতরে যে মনুষ্যত্ববস্ত আছে, তাহারই দ্বারা ষ্টেড সন্দেহ জারের বাহিরের কার্যাকাণ্ডের বিচার করিতেন। এই জন্ত রুশীয় গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার অবিচারে জারের প্রতি ষ্টেডের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির কোনো ব্যাঘাত উপাদন

করিতে পারে নাই। রুশীয় গভর্ণমেণ্ট কেবল জারকে লইয়া নহে। সে গভর্ণমেণ্টের কার্যাকাণ্ডের জন্ত জার কতটা দায়ী এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো দায়িত্ব আছে কি না এ কথা বলা কঠিন। রুশের বিশাল ও জটিল শাসনযন্ত্রে জার একটা সামান্য অঙ্গ মাত্র। রুশিয়ার রাজশক্তি ও প্রজা-প্রকৃতির অনাদিকৃত কর্মবশে রুশের স্বৈচ্ছাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, কেবল রাজার ইচ্ছায় বা আভিজাত্যবর্ণের চেষ্টায় ইহা গড়িয়া উঠে নাই। এখন সে স্বৈচ্ছাতন্ত্র কেবল রুশরাজের উদার অভিপ্রায়ের বলে ভাঙিয়া চুরিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। রাজা ও প্রজা উভয়ের কর্মক্ষম না হইলে, কখনই রাজ্যের এ সংস্কার সাধিত হইবার নহে। গুপ্তহত্যায় কর্মবোঝা বাড়িয়াই যায়, ক্ষয় হয় না। এ পথ স্বাধীনতার পথ নহে। সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ যে দিন আপনার কর্মক্ষম করিতে পারিবে, তাহাদের পুরুষ পরম্পরাগত তমঃ নষ্ট হইয়া যে দিন তাহাদের আত্ম-চৈতন্যের উদয় হইবে, সে দিন গুপ্তহত্যারও প্রয়োজন থাকিবে না, বিদ্রোহেরও প্রয়োজন অনাবশ্যক হইবে; কিন্তু আপনা হইতেই রাজাপ্রজার পরস্পরের অধিকারের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। এই মীমাংসার পথে রুশের বর্তমান জার প্রকৃত-পক্ষে কোনই অন্তরায় নহেন। ইহার প্রধান অন্তরায় বিপ্লবপন্থিগণ। বিপ্লবপন্থিগণ যতদিন গুপ্তহত্যা প্রভৃতি অহিঁসাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত

জারের পক্ষে রাজপুরুষদিগের অত্যাচার নিবারণ করাও অসম্ভব। সাধারণ লোকে ইহা বোঝে না। সাধারণ লোকে জারের মনুষ্য যে কতটা ইহা জানে না। আর তারই জন্ত তাহার। সরাসরিভাবে বিচার করিয়া রুশগণের কার্য্যার্থ্যের জন্ত অত্যাচারে জারকে দায়ী করিয়া থাকে। ষ্টেড্ জারকে চিনিতেন। জারের রাজৈর্ধ্য নয় কিন্তু নিরাভরণ মাহুষী মূর্তি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রুশ শাসনযন্ত্রের জটিলতাও তাঁর চক্ষুগোচর হইয়াছিল। এই যন্ত্রচালনায় জারের শক্তিসাধ্য যে কি এবং অধিকার ও অবসরই বা কতটুকু ইহাও তিনি জানিতেন। আর এ সকল জানিতেন বলিয়াই রুশের রাষ্ট্রীয়শক্তির ও বিপ্লবশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যে সকল অমানুষী কাণ্ড ঘটত, সে সকলের জন্ত জারকে তিনি কখনো দায়ী মনে করিতেন না। রুশের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে জার যেমন অবস্থার দাস এবং ঘটনাচক্রে ক্রীড়াপুতলী হইয়া আছেন, সিসিল রোডন্সও দক্ষিণ আফ্রিকায় সেইরূপই অবস্থার দাস ও ঘটনাচক্রে ক্রীড়নক হইয়াছিলেন। আর এই জন্তই ষ্টেড্ বুয়রব্রিটিশসংগ্রামঘটিত কার্য্যার্থ্যের জন্ত সিসিল রোডন্সকেও কখনো সাক্ষাৎভাবে দায়ী করেন নাই।

ষ্টেডের চরিত্রের জটিলতা সকলে বুঝিতে পারুক বা না পারুক, তাঁর চরিত্রের স্বচ্ছতা ও তাঁর অকৃত্রিম সত্যানুরাগে, তাহার সরল স্বদেশ-বাৎসল্য ও গভীর মানব-প্রেমে সকলেই মুগ্ধ ছিল। এক প্রকারের সত্যানুরাগ ইংরেজের জাতীয়

চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ। যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে, সেখানে দোকানদারীর ভিতর দিয়াই একপ্রকারের সত্যবাদিতা ফুটিয়া উঠে। এইরূপ সত্যবাদিতা ব্যতীত যে ক্ষেত্রে কেহ আপনার ব্যবসায় রক্ষা করিতে পারে না। এই জাতীয় সত্যতাকে লক্ষ্য করিয়াই ইংরেজ প্রবাদ-বচনে সত্যতাকে শ্রেষ্ঠতম নীতি—হনেষ্টকে বেষ্টে পলিসি (Honesty is the best policy)—বলিয়াছে। ষ্টেডের সত্যপরায়ণতা এই শ্রেণীর ছিল না। তাহা অকপট সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইজন্ত তিনি যখন যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, সেইভাবে কাজ করিতে যাইয়া, অনেক সময় আপনার বিস্তর ক্ষতিও করিয়াছেন। ব্রিটিশ—বুয়রের যুদ্ধের সময়, তার উজ্জল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ এই অকপট সত্যানুরাগের জন্তই, ইদানীং তার নিজের সমাজে এবং কিয়ৎ পরিমাণে, অত্যাচার দেশেও ষ্টেডের প্রতিপত্তি কিছু কমিয়া গিয়াছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরলোকের পর হইতে ষ্টেড পরলোকতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া, ইংরেজিতে যাহাকে স্পিরিটুয়ালিজম (Spiritualism) বলে, তার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মৃতলোকের আত্মা যে জীবিতদিগের সঙ্গে উপযুক্ত “মিডিয়াম” পাইলে, কথাবার্তা কহেন ও এমন কি কখনো কখনো ভৌতিকরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের চক্ষুগোচরও হন, ষ্টেড কিছুদিন হইতে ইহাতে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। এই স্পিরিটুয়ালিজমের অনুশীলন করিবার

জ্ঞান তিনি লণ্ডনের নিকটবর্তী উইম্বেলডেন নামক স্থানে একটা বাড়ী করিয়া, মাহিনা দিয়া লোক রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে, দৈনন্দিন বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে প্রায়ই তিনি কিছুকাল এই বিষয়ের অলুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। এই সময়ে কখনো কখনো তিনি জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সমস্যার সম্বন্ধেও পরলোকগত মনোবিগণের মতামত জানিবার চেষ্টা করিতেন। এইভাবে পরলোকতত্ত্বের অলুশীলনের সত্যাসত্য বা ভালমন্দ বিচারের এ সময় নহে, এ স্থানও নহে। সকলে বা অনেকে যে এ যুগে এ সকল ভৌতিক কাণ্ডে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, এমনটাও আশা করা যায় না। বরং অধিকাংশ লোকেই এসকল প্রয়াসকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। সুতরাং বিশ্লেষকের বা যুরোপের তর্কবাদিদিগের সমক্ষে এ সকল তত্ত্বের আলোচনা বড় কম সাহসের পরিচয় দেয় না। ষ্টেড্‌ অকুতোভয়ে তাঁর সিয়ান্সে (Seance'এ) যে সকল কথাবার্তা হইত, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে তাহা বাহির করিতেন। ইহাতে অনেক লোকেই তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, ইহাও তিনি জানিতেন। এজ্ঞ তাঁর ব্যবসায়েরও বিস্তর ক্ষতি হইতেছিল, ইহাও তিনি দেখিতেছিলেন। কিন্তু যাহা নিজে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, লোকের যথ চাহিয়া তিনি কখনো তাহা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতেই তাঁর চরিত্রের জোর কতটা ছিল, ইহা সহজেই বোঝা যায়। এ বিষয়েও ষ্টেড্‌ ইংরেজের সেরা ছিলেন।

যেমন তাঁর সত্যানুরাগ, তেমনি তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও মানবহিতৈষণাতেও ষ্টেড্‌ ইংরেজ-চরিত্রের উচ্চতম উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজ তাঁর দেশকে যেমন ভালবাসেন, জগতের আর কোনো জাতির লোক বোধ হয় তাদের নিজেদের দেশকে তেমন ভালবাসে না। ইংরেজের প্রেম কাজে ফোটে, কেবল ভাবে বা কথায় উচ্ছৃঙ্খলিত হয় না। ষ্টেড্‌ স্বজাতিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, ছুনিয়ায় যে ইংরেজের মত আর কোনো জাতি যে ছিল বা আছে ভিতরে ভিতরে তিনি যে তাহা বড় বিশ্বাস করিতেন, এমনো মনে হয় না। তাঁর চক্ষে ইংরেজ আদর্শ মানুষ। কিন্তু সে ইংরেজ খাঁটি ইংরেজ, ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের উন্নত আদর্শব্রষ্ট যে সকল লোক জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া ইংরেজ নামে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে, ষ্টেডের চক্ষে সে ইংরেজ আদর্শ-মানুষ ছিল না। এইজ্ঞ ইংরেজের মধ্যে যা কিছু ভাল, তাহাই তিনি রক্ষা করিবার ও বাড়াইবার জ্ঞান ব্যস্ত ছিলেন, মন্দকে কখনো আদর করিয়া পুষিয়া রাখিতে চান নাই। ব্রিটিশ উপনিবেশে এবং ভারতবর্ষে আসিয়া যে সকল ইংরেজ ইংরেজ-ব্রষ্ট হইয়া যান, যারা ইংরেজের সত্যবাদিতা, ইংরেজের জায়পরতা, ইংরেজের উদারতা ইংরেজের মানবহিতৈষণা ভুলিয়া যাইয়া, একটা অযথা ও আত্মঘাতী অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া, অপর জাতির লোকের উপরে অত্যাচার প্রভূত ও অমানুষী অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাদের ইংরেজত্বের অভিমানের সঙ্গে ষ্টেডের বিন্দু পরিমাণেও

সহানুভূতি ছিল না। অন্যদিকে ষ্টেডের মানবহিতৈষ্যতাও, বলিতে গেলে, তাঁর গভীর স্বজাতি বাৎসল্যেরই রূপান্তর মাত্র ছিল। তিনি আপনার জাতিকে ও আপনার সভ্যতা ও সাধনাকে এতটা ভাল বাসিতেন যে একদিকে যেমন সেইজন্য, নিজের জাতির আদর্শ ও চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখিবার ও উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে, এই আদর্শ ও এই সভ্যতা ও সাধনা যাহাতে জগতের সকল লোকে আয়ত্ত ও অধিকার করিতে পারে, তাঁর জন্যও সর্বদাই লালায়িত ছিলেন। ছুনিয়ার লোক ইংরেজের মত সাধন ও লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠা হউক, ইংরেজ রাষ্ট্র যেমন নিয়ম-তন্ত্র, ইংরেজ রাজ্য যেমন প্রজামতের অধীন, সকল দেশের রাষ্ট্র ও রাজ্য সেইরূপ হউক, ষ্টেড সর্বদাই ইহা চাহিতেন। তাঁরই জন্য জগতের যেখানে প্রজাবহ সম্প্রসারণের সম্ভব প্রয়াস হইতেছে দেখিতেন, যেখানেই স্বেচ্ছাতন্ত্রের • স্থানে নিয়মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আয়োজন বা চেষ্টা হইতেছে শুনিতেন, সেখানেই সেই সকল প্রয়াসের সঙ্গে সর্বদা সহানুভূতি করিতে অগ্রসর হইতেন। কি পোল্যান্ডের, কি ফিনল্যান্ডের, কি মিশরের, কি ভারতবর্ষের, কি চীনের, কি পারস্যের, সকল দেশের স্বাধীনতার উপায়কগণ বিলাতে বাইয়া, তাঁর স্থানে যেমন দেশদেশান্তরের যাত্রী মিলিত হয়, সেইরূপ ষ্টেডের বাড়িতে সম্মিলিত হইতেন। * এখানে আফ্রিকার কান্নি লোক-নায়েককে দেখিয়াছি। পারস্যের প্রজাতন্ত্রের অধিনায়কগণকেও দেখিয়াছি। যারা তুরস্কের রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্তিত করিয়াছেন, সেখানেও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, সেই সকল ইয়ংটার্ককে (Young Turksকে) এখানে দেখিয়াছি। ফিনল্যান্ডে, পোলাণ্ডে, সকল দেশে যারা স্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন,

বিলাতে গেলে, ষ্টেডের বাড়িতে সকলেরই নিমন্ত্রণ হইত, সেখানে সকলেই মিলিত হইতেন। ষ্টেডের বৈঠকখানা আধুনিক সভ্যজগতের শ্রেষ্ঠজনের একটা পবিত্র সম্মিলন ক্ষেত্র ছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর এই অদ্ভুত সম্মিলন, গৃহস্থামীর উদার মানবপ্রেমেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দান করিত।

জীবদ্দশায় ষ্টেড যে সকল উন্নত আদর্শের কথা প্রচার করিতেন, মরণ সময়েও তাহারই চরণে আশ্রয়বলিদান দিয়া গিয়াছেন। মরণকালেই মানুষকে সভ্যভাবে চেনা যায়। অকূল পাথারে পড়িয়া মানুষের সংসারের সকল আশ্রয় যখন নিঃশেষ লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই তাঁর জীবনের সত্যিকার সাধনটা যে কি ছিল, তাহা আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ষ্টেডেরও তাহাই হইয়াছে। সবলাকুলের হিতব্রত ষ্টেড যৌবনের প্রারম্ভেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই ব্রতের সাধনাই Maiden Tribute রচিত ও প্রকাশিত হয়। তাঁরই জগৎ কারাগারে তাঁর লাঞ্ছনা অসহায়ের সহায়তা করিতে ষ্টেড কখনও পরাশ্রয় হইয়াছেন, তাঁর শত্রুরাও এমন কথা বলে না। আর অকূল সমুদ্রে, ভগ্ন অর্ধবস্ত্রী বক্ষে, অশ্রু ও শিশুদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া শেষে ধীর ভাবে, আপনি সেই জাহাজের সঙ্গে অতলে ডুবিয়া গিয়া ষ্টেড সেই পবিত্র জীবনব্রতই উদঘাপন করিয়াছেন। ইংরেজ চরিত্রের মহৎ কোথায়, যুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার দেবক-টুকু কোন্স্থানে, — টাইট্যানিক জাহাজের এই অন্তিমদৃশ্যে তাহাই কুটিয়া উঠিয়াছে। এই পবিত্র দৃশ্য যখন মানসপটে ভাসিয়া উঠে, তখন আর ইংরেজ জাতিকে অশ্রদ্ধা, যুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।



বঙ্গদর্শন ।

টাইট্যানিকের তিরোধান

জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের ব্যবধানটা যে কত স্বপ্ন ও সামান্য, সংসারমোহবিভ্রান্ত মানুষ সকল সময়ে ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই বৃষ্টি বিধাতাপুরুষ মাঝে মাঝে টাইট্যানিকের তিরোধানের মত লোমহর্ষণ বিধানের ব্যবস্থা করিয়া, আত্মবিস্মৃত জনগণের আত্মচৈতন্যকে জাগাইয়া দেন। সভ্যতা বলিতে আমরা আজি কালি যে বহুকে বুঝিয়া থাকি, তাহা একান্তই ইহ-সর্বস্ব। এই সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের চিন্তা ও বলনার উপরে প্রত্যক্ষ পুরুষকারের প্রভাব অগ্রস্ত বাড়িয়া গিয়া, অপেক্ষাকৃত “অসভ্য” প্রাচীন সমাজে দৈবের উপরে যে একটা ঐকান্তিক নির্ভর ছিল, তাহা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া, একেবারেই নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তার অদ্ভুত উদ্ভাবনীশক্তি, তার আশ্চর্য্য কর্মশৃঙ্খলতা, যতই তাহাকে বাহিরের শক্তিপুঞ্জের প্রভু ও নিয়ন্তা করিয়া তুলিতেছে; যতই মানুষ আপনার বুদ্ধি-বলে দেশ-কালের নৈসর্গিক ব্যবধান, জল-স্থলের “অল্পজ্ঞানীয় অন্তরায়, প্রতিপ্রকৃতির অল্পকূলতা-প্রতিকূলতা,” এ সকলকে তুচ্ছ করিয়া, আপনার অভিষ্টসাধনে

সমর্থ হইতেছে, ততই তার আপনার উপরে নির্ভরতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিতেছে। এই নির্ভরতাটি অদ্ভুত সভ্যতার একটা অতি প্রধান লক্ষণ। স্বতরাং এরূপ সভ্যতা যে “আত্মসন্তোষবিতান্ধতা” পনমানমদান্বিতা” হইবে, ইহা আর বিচিন্তা কি? এ সভ্যতাকে মাঝে মাঝে এরূপ ভাবে নাড়া না দিলে, তাব চৈতন্যোদয় হইবে কেন?

* * * * *

যেরূপ ভাবিতেছিল যে সে আপনার অলৌকিক অধ্যবসায় ও অসাধারণ বুদ্ধির জোরে নিঃসর্গের প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জকে করায়ত্ত করিয়া ক্রমে মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া তুলিবে। টাইট্যানিকের তিরোধানে, ক্ষণিকের জগৎ তার সে স্বপ্নস্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। আমরা এ পথে মৃত্যুকে জয় করিতে বাই নাই। আমরা যাহাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া জানি, তিনি যোগেশ্বর, তিনি মহাবৈরাগী, তিনি দ্বন্দ্বাতীত, মৃত্যু ও অমৃতের তার সমান-জ্ঞান, তপঃপ্রভাবে জীব-শিব তাঁর ভিতরে এক হইয়া গিয়াছে। আমাদের মৃত্যুকে জয় করিবার পথ ছিল—যোগের পথ, ভোগের পথ নহে; ত্যাগের পথ, লোভের পথ নহে।

বদা সর্পে প্রমত্তেস্ত কামা যে হস্য জদি শিতাঃ ।

অথ মর্জোহ্মতো ভবতাত্র ব্রহ্ম সমগ্ধুতে ॥

“যে সকল কামনা এই মর্জা জীবের জন্মকে আশয় করিয়া আছে, সেই সমুদায় যখন একান্তভাবে পরিত্যক্ত হয়, তখনই মর্জা অমর হয়, এবং এইখানেই ব্রহ্মকে ভোগ করিয়া থাকে।”

আমরা অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাকেই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র পথ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি। “ত্যাগেনৈবমৃতত্বমশ্নোঃ” কেবল ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব পাওয়া যায়, তার আর অন্যপথ নাই, ভারতের আধ্যাত্মতা ও সাধনার ইহাই সার কথা ও শেষ কথা। জগতের সকল সাধু ও “সিদ্ধ-পুরুষেরাই এ কথাই সত্যতার ও সারবত্তার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছেন। খ্রীষ্টীয় সাধনায়ও এ কথাটা নূতন নহে। যিশুও এই ত্যাগের পথই দেখাইয়া গিয়াছেন, ভোগের পথ দেখান নাই। “তোমার বা” কিছু তৎসমুদায় বিকাইয়া দিয়া, আমার অনুগামী হও,”—“যদি মে’ জীবন পাইতে চাও, তবে এ’ জীবন বিসর্জন দাও”;—“কল্যাকার জ্ঞাত চিন্তা করিও না, আজিকার দুর্ভাবনাই আজিকার জ্ঞাত যথেষ্ট”;—খৃষ্টের এ সকল প্রসিদ্ধ উপদেশ,—এবং পরিণামে যে ভাবে তিনি এই মহাত্যাগ-যজ্ঞে আপনার পবিত্র দেহ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন; আর এইরূপ ভাবে দেহ রাখিয়া আপনার “পুনরুত্থান” বা রিসারেক্সনের (Resurrection) ভিতর দিয়া, খৃষ্টীয়ান্ মণ্ডলীকে তিনি স্বয়ং অমৃতত্বের যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও আমাদেরই এই প্রাচীন ও সার্বজনীন ঋষিপন্থা। ইহাই যুক্তির একমাত্র পথ—“নাভ্যঃ পৃথ্বীঃ বিতুতে হ্যনায়” ।

* * * * *

টাইট্যানিকেব তিরোধান সংসার-মোক্ষ-বিভ্রান্ত যুরোপীয় সমাজকে, অপূর্ণ কলাকুশলতা সহকারে, এই সনাতন ঋষি-পথ ও পুরাতন যিশুপথই দেখাইয়া দিয়া গেল। যারা আজন্মকাল নিরাশ্রিতভাবে কেবল ভোগের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল, যাহাদিগকে ছুনিয়ার লোকে ইহ-সংসার বলিয়াই ভাবিয়া আসিয়াছিল, আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে আত্মরী-সম্পদ বলিয়াছেন, গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে আত্মরীভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার আহরণ করিতে যাহারা আপনাদের সংস্পর্শ পণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হইত; সেই সকল লোককে বৃকে লইয়াই টাইট্যানিক তার এই মহাপ্রাণে যাত্রা করিয়াছিল। আধুনিক সমাজের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা ও বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও কর্মকুশলতা মিলিয়া এই বিপুল অর্পণমান্থান নির্মাণ করিয়াছিল। একদিন যুরোপ ইহাতে আটল্যান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় যাইতে এক পক্ষ কাল লাগিত। ক্রমে তাহা এক সপ্তাহে আসিয়া দাঁড়ায়; বৎসব দুই কাল হইল, এ ব্যবধান আরও কমিয়া গিয়াছিল। দুইটি প্রসিদ্ধ ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজ ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করে; একের নাম “কিউনার্ড” (Cunard), অণরের নাম “হোয়াইট ষ্টার” (White Star)। কিউনার্ড কোম্পানীর মরিত্যানিয়া (Mauritania) নামক নূতন জাহাজ প্রথমে, পাঁচ দিন কয়েক ঘণ্টায়, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে। সপ্তমী কোম্পানীর এই অদ্বুত কৃতিত্ব দেখিয়া, হোয়াইট ষ্টার (White Star)

কোম্পানীর পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই প্রতিযোগিতার প্রেরণাতেই “টাইট্যানিকের” জন্ম হয়। পাশ্চাত্য জগতে প্রতিদিনই নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত ও নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে। “মরিট্যানিয়া” যখন নিশ্চিত হয় তার পরে, এই দুই বৎসর কি তিন বৎসর কালের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন বা যন্ত্রের যাহা কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হইয়াছে, “টাইট্যানিক” সে সকলই গ্রহণার্থে নিশ্চিত হইয়াছিল। আরতনে ও প্রতি শক্তিতে, মাজসজ্জার বিচিত্রতায় ও ভোগবিলাসের আয়োজনে, সকল বিষয়েই “হোয়াইট ষ্টার” কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ “টাইট্যানিক”কে অর্ণবপোতের সেরা করিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। আরোহীগণের সুখের ও সখের ব্যবস্থা করিয়াই ইহারা ক্ষান্ত হন নাই। জাহাজখানিকে এমন ভাবে গড়িয়া-ছিলেন, তার ভিতরে এমন সকল কলকৌশল রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে ইহার ডুবিবার কোনও আশঙ্কাই ছিল না। আপনাদের অসাধারণ কৃতিত্বের উপরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, নিরতিশয় স্পর্ধা সহকারে যাত্রীগণকে সর্বপ্রকারের সুখ সৌখিনতার ও ভোগবিলাসের লোভ দেখাইয়া, এবং সমুদ্র-যাত্রার সর্ববিধ বিপদাশঙ্কা সম্বন্ধে একান্ত অভয়-দান করিয়া, আপনাদের নিয়ন্তৃসমিতির বা Board of Directors'এর সভাপতি মহাশয়কে সঙ্গে দিয়া, যাত্রী, কক্ষচারী ও নাবিক সকলে মিলিয়া প্রায় তিন হাজার ঙ্রাপুরুষ লইয়া, হোয়াইট ষ্টার কোম্পানী টাইট্যানিককে অটল্যাটিকের বৃকে ভাসাইয়া দিলেন। প্রহরে প্রহরে অদৃশ্য ঈশ্বর-স্পন্দনকে

আশ্রয় করিয়া, তারহীন তড়িৎ-বার্তা সাগর-বক্ষস্থ টাইট্যানিকের গতিবিধির সংবাদ চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল। বিপুলকায় জাহাজখানি নির্ভয়ে ও সদর্পে সমুদ্র-তরঙ্গ ভেদ করিয়া যেমন হেলিয়া জুলিয়া নাচিয়া খেলিয়া চলিতেছিল, তার বৃকের উপরে সহস্রাধিক নরনারীও সেইরূপ ভয়ভাবনা-বিরহিত হইয়া, হাস্যপরিহাসে, নাচেগানে, দিন কাটাইতেছিলেন। এইরূপেই এই বিশাল প্রাণের পসরা সাজাইয়া “টাইট্যানিক” আনন্দে আপনার গন্তব্যের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল।

* * * * *

কিন্তু তার কর্মকর্তাগণ তাহার যে গন্তব্য নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সে গন্তব্য লাভ তাহার ভাগ্যে ছিল না। সভ্যতার দর্পচূর্ণ করিবার জন্ত, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির গর্ভ হরণ করিবার জন্ত, বিষয়বিশৃঙ্খল জনগণের চিত্তে সাড়া আনিবার জন্ত, পুরুষকারের উপরে যে দৈব আছেন এই জ্ঞান জন্মাইবার জন্ত, সংসারমোহবিন্যস্ত স্বরূপবৃত্ত সভ্য জীবের স্বরূপচৈতন্যের সঞ্চার করিবার জন্ত, কামোপ-ভোগপরমা সভ্যতা ও সাধনার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্ত, “নান্যদস্তীতিবাদী” ইহ-সর্বস্ব জনগণের প্রাণে অমৃতত্বের সুসমাচার প্রচার বরিবার জন্য, ভোগসর্বস্ব সমাজকে ত্যাগের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য—বিধাতাপুরুষ টাইট্যানিকের আর এক গন্তব্য নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। টাইট্যানিক সে সাংঘাতিক নিয়তি প্রাপ্ত হইয়াই আপনার চরম সার্থকতালাভ করিয়াছে।

* * * * *

সমুদ্রে তরঙ্গ নাই। আকাশে মেঘ নাই।

অগণ্য নক্ষত্ররাজি দশদিক্ পূর্ব করিয়া, হীরার হাট খুলিয়া বসিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণপক্ষের নিশির অন্ধকারও নাই। শাস্ত্র হুপ্রসন্ন প্রকৃতিমুখে নিশ্চয়তার আভাস মাত্র নাই। অপূর্ব রচনাকৌশলগুণে বিপুলকার্য অর্ণব-পোতের জলমগ্নের আশঙ্কার লেশমাত্র নাই। তড়িতালোকসমুজ্জ্বল, বিবিধ কলাকুশলপূর্ণ প্রমোদপ্রদামুগ্ধরিত ইন্দ্রপুরীর-ভাষ্য অর্ণবপোত আশ্রয় কারিণী বিনয়প্রাদিক আরোহী নির্ভয়ে ও নিশ্চিত মনে অকুল জলরাশি ভাসিয়া চলিয়াছে। কেহ বা শুইয়াছে, কেহ বা শয়নের আয়োজন করিতেছে। কেহ বা ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে, কেহ বা সঙ্গীতলাপ করিতেছে। কেহ বা আরামচৌকিতে বসিয়া নিব্বিষ্টমনে অধ্যয়ন করিতেছে, আর কেহ বা ডেকের উপরে পাদচারণ করিতে হরিতে প্রণয়ীজনের সঙ্গে বিশ্রুতলাপ করিতেছে। কেহ বা পনের কেহ বা দারিদ্র্যের, কেহ বা প্রেমের কেহ বা প্রতিযোগিতার, কেহ বা জ্ঞানের কেহ বা ললিতকলাপ, কেহ বা সখ্যের কেহ বা সখের ভাবনা ভাবিতেছে। দুনিয়ার সকল ভাবনার বোঝা এই টাইটানিক শাস্ত্র সমুদ্রায়ুরাশি ভাসিয়া চলিয়াছে—নাই কেবল সে বিচিত্র পসারী এক মুড়ার ভাবনা। সহসা যখন মরণের ডাক পড়িল, কাঁহাজের কল যখন বন্ধ হইয়া গেল, আরোহীগণের প্রাণ-রক্ষার জন্ত লাইফ-বোট (Life boat) বা জীবনতরণীগুলিকে জলে নামাইবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইল, সকলকে ডেকে যাইয়া দাঁড়াইবার জন্ত যখন কান্ডানের ভুরুমজারী হইল, তখনও সকলের প্রাণে সাড়া পড়িল না। কালের ভেরী বাজিল, তথাপি অনেকে ক্রীড়া-

কৌতুক ছাড়িল না, অনেকের গীতবাদ্য থামিল না। বিজ্ঞানের প্রাণাণ্যকে নষ্ট করিয়া, সভ্যতার অসাধারণ কৃতিত্বাভিমানকে চূর্ণ করিয়া, স্থির সমুদ্রে, নিম্নল আকাশ তলে, টাইটানিক যে সহসা অতলে ডুবিলে বা ডুবিতে পারে, অনেকের মনে এক কল্পনারও উদয় হয় নাই। প্রথমকার এ ভাব সহজেই বৃথিতে পারা যায়। কিন্তু পরে যখন বিপদ ঘেঁ সত্য, মৃত্যু যে সন্নিকট এ বিষয়ে তিল পরিমাণ সন্দেহের আর অবসর রহিল না, তখনও যে কেন-এই দ্বিগহস্রাধিক আরোহী এবং নাবিকেরা ভয়-বিক্ষিপ্ত হইয়া, শৃঙ্খলমুক্ত পশুর ন্যায় কে কাহাকে মারিয়া আপনকে বাঁচাইবে সে চেষ্টায় জাহাজপালিকে কলহকোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিল না, এ রহস্য ভেদ করা সহজ নহে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, যে আধুনিক সভ্যতা হয় মাত্রকে সর্বপ্রকারের সাধারণ মানব দম্ব-বিবহিত করিয়া জিস্রোপাত্তসমম্বিত কাষ্ঠলোষ্ট্রে পরিণত করে, না হয় দেবের উন্নীত করিয়া তোলে। এ সকল কিম্বদন্তির না মোক্ষের লক্ষণ? টাইটানিকে যাহা দেখিলাম তাহা কি ভ্রুত না বীরত্ব?

* * * *

আর একরূপ সন্দেহের কারণ এই যে আমরা যদ্যপেক সূচরাচর ইহ-সম্পদ বলিয়াই মনে করি। যুরোপ ভোগের সম্মানই পাইয়াছে, ভোগের নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও লাভ করিতে পারে নাই, অনেক সময়ে আমরা একরূপই ভাবিয়াই থাকি। সুতরাং টাইটানিকের তিরোহানে যুরোপ যাহা দেখাইল, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আমরা সহজে ধরিয়া উঠিতে পারি না। কখনো মনে হয়, আমরা যুরোপকে

মাহা বুঝিয়া আসিয়াছিলাম তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আর কখনো মনে হয়, বুঝি বা টাইট্যানিকের তিরোধানের যে কাহিনী জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে কল্পিত। ফলতঃ আমাদের পূর্ব্বধারণাও একান্তই মিথ্যা নহে; আর আজ যে ছবি দেখিলাম, তাহাও নিশ্চাই কল্পিত নহে। ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনা যে ত্যাগের পথ ধরিয়া যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া চলিয়া আসিয়াছে, যুরোপ যে সে পথেই সন্ধান পাইয়াছে, টাইট্যানিকের তিরোধানে ইহা প্রমাণ হয় না। ভারতের পথ চিরদিনই ত্যাগের পথ। যুরোপের পথ চিরদিনই ভোগের পথ। ভারতের যতই কেন আয়বিস্তৃতি জন্মাক্ না, সে কখনো একান্তভাবে যুরোপের ভোগের পথ পরিত্যাগ করিবে না। আর যুরোপের যতই কেন ক্ষণিক শ্ৰদ্ধানবৈরাগ্যের উদয় হউক না, সেও কখনো ভারতের এই প্রাচীন ত্যাগের পথ পরিত্যাগ করিবে না। ভারত যদি যুরোপের অদ্বিতীয় অভ্যুদয় দেখিয়া তাহার ভোগের পথ পরিত্যাগ দায়, তাহাতে আত্মচরিতার্থতা লাভ করা দূরে থাকুক, সে নিষ্ফল প্রয়াসে তাহার ভাগ্য কেবল আত্মঘাতী পরধর্ম্ম লাভই ঘটিবে। আর যুরোপও যদি ভারতের প্রাচীন পারমাণবিক সম্পদের অতিলৌকিক শক্তি দর্শনে আপনার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভারতের পরধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হয়, সে প্রয়াসও তাহার পক্ষে সাংঘাতিক ঘটনাই উঠিবে।

ফলতঃ কি ভারতের কি যুরোপের পক্ষে এইরূপ পরধর্ম্মাভ্যুদয়নের কোনই প্রয়োজনও নাই। কারণ মানব প্রকৃতির মৌলিক একত্বনিবন্ধন, মানুষ আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া, নিষ্ঠাসহকারে যে পথেই চলুক না কেন, পরিণামে সেই মূল প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হইবে; ইহার অগ্রথা হওয়া অসম্ভব। সকল নদীই যেমন একই সাগরগর্ভে যাইয়া আপনার চরিতার্থতা লাভ করে, সেইরূপ সকল মানবীয় সাধনাই ঋজুকূটীনভাবে, নামী পথ অতিক্রম করিয়া, পরিণামে যে মনুষ্যত্ব মানবপ্রকৃতিমানুষেরই সার্থকতা লাভ হয় সেই মনুষ্যত্বকেই প্রাপ্ত হয়। যুরোপের প্রবাদে একটি কথা আছে—সকল পথই চরমে রোম নগরে যাইয়া পৌঁছায়। সেইরূপ সার্বজনীন মানব ইতিহাসেরও সিদ্ধান্ত এই যে, সর্ব্বপ্রকারের মানবীয় সাধনাই চরমে একটি পরম মনুষ্যত্ব বস্তুকেই ফুটিয়া উঠে। ত্যাগে যেমন ত্যাগের পরিসমাপ্তি হয় না, নিষ্কাম ভোগে বাইরাই ত্যাগ আপনার সার্থকতা লাভ করে; সেইরূপ ভোগও আপনার চরিতার্থতার জগুই ক্রমে ত্যাগের পথ আশ্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং আদিত যে ভোগ কামান্বিতের অনুসরণ করিয়া চলে, ক্রমে ত্যাগের পথ ধরিয়া তাহাকেই নিষ্কাম কাম্যযোগের মতো আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে হয়।

* * *

আধুনিক যুরোপীয় সভ্যতার আত্মনৃত্যিক ভোগ লালসা আপনার চরিতার্থতার জগুই যে সকল যমনিয়মাদির প্রতিষ্ঠা করিতে

বাদ্য হইয়াছে, টাইট্যানিকের তিরোধান-
কালে তাহারই শ্রেষ্ঠতম ফল আমরা
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আধুনিক ভোগের
আয়োজন করিতে হইলে, বহুলোকের
সমবেত শ্রম ও সাহচর্য প্রয়োজন হয়।
টাইট্যানিক আপনি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।
এতবড় বিপুলকার্য অর্থব্যয় পরিচালনার
জন্ত বহুলোকের আবশ্যক হয়। এই বহু-
সংখ্যক নৌ-কর্মচারী ও নাবিকদিগের
পরিচালনার জন্য প্রত্যেকের কর্মাকর্ষের
একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করাও অপরিহার্য
হইয়া উঠে। এই সকল ব্যবস্থার উপরেই
যখন এত আরোহীর স্বপ্নাচ্ছন্দ্য ও জীবন-
মরণ নির্ভর করে, তখন এসকলের
বিন্দুমাত্র বিপর্যয় ঘটাতো না ঘটে, তাহার
জন্ত কঠোর শাসনেরও প্রয়োজন হয়।
এক এক খানি সমুদ্রগামী জাহাজ এক
একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের ন্যায়। কাপ্তান সেই
রাজ্যের রাজা। জাহাজের কর্মচারী এবং
আরোহী সকলকেই কাপ্তানের আজ্ঞাবাহী
হইয়া চলি- হয়; না চলিলে জাহাজ-
পরিচালনা অসম্ভব এবং এত লোকের
প্রাণরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেনা-
শিবিরে প্রত্যেক সেনাপতির যে প্রভুত্ব
ও অধিকার, সমুদ্রগামী জাহাজের
কাপ্তানের সেইরূপ অধিকার ও প্রভুত্ব রহিয়াছে।
এখানে নাবিক এবং আরোহী সকলেরই
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা,—জাহাজের কাপ্তান।
তাহারা এই সকল জাহাজে সর্বদা
যাতায়াত করিয়া থাকে ও এই সকল
জাহাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে,
তাহারা সকলেই জাহাজের বিধিব্যবস্থা

মানিয়া চলিতে ও ফাঁপনের আদেশ
পালন করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। আর
এই অভ্যাসের ভিতর দিয়া তাহারা এক
প্রকারের সংযম শিক্ষাও করিয়া থাকে। এই
সংযমের গুণেই আসন্ন মৃত্যুর মুখেও
টাইট্যানিকের দ্বিসহস্রাধিক আরোহী ও
নাবিক বিন্দুমাত্র ভয়বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে নাই।

* * * *

এ তো গেল বিশেষ ব্যবস্থার ও
বিশেষ বিধানের কথা। ইহার অন্তরালে
আধুনিক যুরোপীয় সভ্যতার কতকগুলি
সাধারণ ধর্মও বিদ্যমান ছিল। এই
সভ্যতা ও সাধনা, যতই কেন ভোগপ্রদান
হউক না, ইহার পারমাণবিক দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত
ক্ষীণ হইলো, পরার্থপরতা বস্তুতঃ সামান্য
নহে। বিধাতার রাজ্যে অত্যন্ত ভোগী
যে সেও কখনও নিতান্ত একাকীত্বের
মনো কিছুই ভোগ করিতে পারে না।
জনসমাজই একদিকে যেমন ত্যাগের,
অত্যাগের সেইরূপ ভোগেরও একমাত্র
উপযুক্ত ক্ষেত্র। একান্ত একাকী হইয়া যে
থাকে, সে যেমন ত্যাগের অবসর পায় না,
সেইরূপ ভোগের আয়োজনও করিতে পারে
না। ভোগের মাত্রা যতই বাড়িয়া যায়,
ততই দশজনকে মিলাইয়া, দশজনের শক্তি
সাধারণ সমবায়ের সেই ভোগের আয়োজনও
করিতে হয়। আর এইরূপে দশজনে মিলিয়া
কোনো কিছু করিতে গেলেই প্রত্যেকের
স্বার্থপরতাকে, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্তই,
কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া চলিতে হয়।
এই সমবায়ের স্বত্র দরিয়াই যুরোপ এতটা
অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আর দশজনে

মিলিয়া কাজ করিতে যাইয়াই য়ুরোপীয় সমাজে এক প্রকারের পরার্থপরতা ও বিকাশ হইয়াছে। এইরূপে দেশের জ্ঞান ও দেশের জ্ঞান ত্যাগস্বীকার করা য়ুরোপীয় সভ্যতার ও সাধনার একটা সাধারণ ধর্ম হইয়া গিয়াছে। এই ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই য়ুরোপের জাতীয় চরিত্রে একটা অতি উদার বিশ্বপ্রেমের আদর্শ ও কুটিয়া উঠিয়াছে। টাইট্যানিকের তিরোধান কালে আমরা এই সকলেরই একটা অতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। ত্যাগের পথে যাইয়া ভারত মৃত্যুকে জয় করিয়াছিল। ভোগের পথে যাইয়া য়ুরোপ মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে শিপিয়াছে। ভারত বিশ্বের সঙ্গে একায়া সাধন করিয়া আপনি সুখদুঃখের অতীত হইয়াও জগতের সুখকেই আপনার সুখ ও জগতের দুঃখকেই আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ ও ভোগ করিবার নিগৃঢ় সঙ্কল্প গাভ করিয়াছিল। এই মহাপরিনির্বাণের সুখ-দুঃখের তত্ত্ব য়ুরোপ জানে না। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থার সংবাদ আধুনিক সভ্যতা রাখে না। কিন্তু আপনি সুখ চাহে বলিয়াই, য়ুরোপ অপরকেও সুখী করিতে চাহে এবং আপনি দুঃখের তীব্র হলাহল পান করিতেছে বলিয়াই, সে বিষের যাতনা জানে এবং তাহারই জ্ঞান জগতের দুঃখীতাপীর সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারে এবং সেই দুঃখ ও সেই বেদনা উপশম করিবার জ্ঞান কখনও কোনও শ্রম বা ত্যাগ স্বীকার

করিতেও বিমুগ্ধ হয় না। টাইট্যানিকের তিরোধানে কি করিয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে হয়, তাহাই দেখিলাম। কেমন করিয়া অপরের স্বপ্নে স্থানভব ও অপরের দুঃখে দুঃখানুভব করিতে হয়, তাহাও দেখিলাম। কাম্য বস্তুর অন্বেষণ করিতে যাইয়াও যে অসাধারণ সংঘর্ষের প্রয়োজন হয় এবং এই অপরিহার্য সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই যে অতি উচ্চ অঙ্গের মনুষ্য ও কুটিয়া উঠিতে পারে এবং এই পথে যাইয়াও যে স্বকৃতিসম্পন্ন লোকে ক্রমে নিষ্কাম কর্মযোগ লাভ করিতে পারেন, টাইট্যানিকের তিরোধানে ইহাও দেখিলাম। এ সকল দিকেই আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনা অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। টাইট্যানিক আধুনিক য়ুরোপের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির অগুরুত্ব নিদর্শনরূপে গঠিত হইয়াছিল এবং য়ুরোপীয় কর্মিগণের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিবার জ্ঞান সগর্বে সাগর বক্ষে ভাসিয়াছিল। আর য়ুরোপের ইহসম্বন্ধ ভোগপ্রধান সাধনার মূলেও সে ভাগবতীলীলাশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, তাহারই ভিতর দিয়া শ্রেষ্ঠতম যোগশক্তি ও মোক্ষসম্পদ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, ইহা প্রমাণ করিয়াই টাইট্যানিক অতল সাগরতলে অকর্ষিত হইয়াছে। টাইট্যানিকের তিরোধানে য়ুরোপ মহীয়ান ও জগৎ লাভবান হইয়াছে।

নাহি সে

(১)

নাহি সে উৎসাহ, আশা, কামনা, কল্পনা ;
 আজ আমি মরণের ত্যক্ত আবর্জনা ।
 শীতে যথা শুষ্ক সরঃ পড়িয়া নীরবে,
 কুয়াসা দুর্গন্ধ-ভরা গলিত-পল্লবে ।
 উবে গেছে সুখ শোভা স্রুতি স্রসার ;
 রয়েছে শৈবাল পঙ্ক,—যা নহে যাবার !

(২)

রয়েছে পড়িয়া পিছে কি দীন জীবন !
 প্রভাত আনে না আর নব জাগরণ !
 মধ্যাহ্নে পড়ে না আর সে শ্রম-নিশ্বাস ;
 সন্ধ্যাহ্নে আসে না আর আপনে বিশ্বাস ।
 আসে যায় দিনরাত, সেই অবসাদ—
 মানে, জানে, কৈশর্মে, ধর্ম্মে, নাহিক আবাদ ।

(৩)

ধরা জুড়ে পড়ে আছে শুধু সেই দিন,—
 সে ফুল উজ্জ্বল চক্ষু হ'তেছে মলিন !
 চায়—চায়—তবু চায়, কি বলিতে চায়,
 হৃদয়ের ভাষা তার অধরে মিলায় !
 হাতে ধরি, বুকে পড়ি, মুখে রাখি কাণ ;
 শীতল নিষ্পন্দ দেহ, মুদ্রিত নয়ান ।

(৪)

মরণ-কালিমা দেহে, তবু কি সুষমা !
 রাহুর কবলে যেন পূর্ণিমা-চন্দ্রমা ।
 কি মহিমা—কি ভঙ্গিমা—নির্ভয় হৃদয়,
 এখনি জাগিবে যেন করি মৃত্যু জয় ।
 কোথা তুমি—কোথা আজ মৃত্যু-বিজয়িনী—
 সর্কার্থমাধিকে গোরা শিবে নারায়ণী !

(৫)

দিয়া তব রূপগুণ না হয় মরণে—
 বাঁচিলে না কেন আর ছ' দিন জীবনে !
 শুধুই বন্ধায়ে গেলে,—কি ছিল আমার—
 জগতের সার তুমি—জীবনের সার !
 না লইলে প্রেমপূজা—প্রেম প্রতিদান,
 না করিতে আবাহন, দেবী অন্তর্দান !

(৬)

মনে হয়,—ছুটে যাই পিছে পিছে তব,
 হউক না যত দূর, সব দুখ স'ব ।
 এক দিন—কোন দিন—যদি কোন কালে,
 চোখে চোখে দেখা হয় মেঘ অন্তরালে ।
 বলিব না কোন কথা ; ছুটি করে ধরি',
 চেয়ে—চেয়ে মুখপানে র'ব বুকে ধরি' ।

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল ।

হিন্দুর ধর্মের বিচিত্রতা

হিন্দু যাহাকে ধর্ম বলেন সে বস্তু সনাতন। কালবিশেষে তাহার উৎপত্তি হয় নাই। দেশ বিশেষে সে ধর্ম আবদ্ধ হয় না। তাহা কেবল হিন্দুরই ধর্ম নহে, মানব মাত্রেরই তাহা ধর্ম। এই জ্ঞান সে ধর্ম সর্বতোভাবেই সার্বভৌমিক ও সার্বজনীন। এ ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বেদে বা হইবে, আভেত্তায় বা তালমুদে, ত্রিপিটকে বা কোরাণে নাই। কারণ—“বেদাঃ বিভিন্নঃ”। তাহা স্মৃতিতে নাই; কারণ “স্মৃতয়ো বিভিন্নঃ”। তাহা মুনিজনের মীমাংসায় নাই, কারণ “নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং”। সে ধর্মের তত্ত্ব “গূহ্যাঃ নিহিতং”—মানব প্রকৃতির মূলে নিহিত আছে। আর গূহ্য-প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এ ধর্ম সনাতন ও সার্বজনীন। এই ধর্মবস্তু প্রত্যেক মানুষের মূল প্রকৃতি হইতেই ফুটিয়া উঠে; বাহির হইতে কাহারো উপরে আসিয়া চড়িয়া বসে না। আর সকল মানুষের প্রকৃতি যখন সমান নহে, তখন সকলের ধর্মও কখনই এক হইতে পারে না। হিন্দু এই সত্যটা অতি দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়া, কখনই খৃষ্টীয়ান বা মুসলমানের মত, আপনার ধর্মকে অপরের উপরে চালাইবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে হিন্দুর মানব-হিতৈষ্যতার অভাব বুঝায় না; কিন্তু তাঁর গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টিরই প্রমাণপরিচয় প্রদান করে।

কলতঃ হিন্দু যে মানুষকে কেবল ভাল বাসেন, তাহা নহে; মানুষকে জ্ঞাতিবর্ণ-নির্কিশেষে ভক্তি করাই তাঁর সাধনের একটা

মুখ্য অঙ্গ। হিন্দুর চক্ষে মানুষ কেবল মানুষ নহেন, কিন্তু নারায়ণ। হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীকে কেহ প্রণাম করিলে, “নমো নারায়ণায়” বলিয়া, তাঁহারা সে ব্যক্তির প্রত্যভিবাদন করেন। এই রীতিটী জগতের আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না। খৃষ্টীয় জগতে মানুষের মর্যাদা অশেষ প্রকারে বাড়িয়াছে, স্বীকার করি। “কোনো মানুষ, তার সামসারিক অবস্থা ও সামাজিক পদমর্যাদা যাই থাক বা না থাক ‘না কেন, আমি অপেক্ষা হীন নহে’— ইহা সাধন করাই খৃষ্টীয় সভ্যতার মানব-প্রেমের আদর্শ। খৃষ্টীয় ধর্মে, শিশুখৃষ্টের উপদেশে, এতদপেক্ষা একটা উচ্চতর আদর্শেরো আভাস পাওয়া যায়, স্বীকার করি। মানুষের সেবাতৈই যে খৃষ্টের সেবা হয়, খৃষ্টীয় সাধনার এ ভাবটা ফুটিয়াছে, মানি। কিন্তু তথাপি মানুষ যেমনটী আছে, ঠিক সেই ভাবে থাকিয়াই যে আমার অপেক্ষা বড়, আমার ভক্তির পাত্র, আমার ভজনার আধার ও অবলম্বন, হিন্দুর ভক্তি-সাধনেতেই কেবল এই ভাবটা যেনন ফুটিয়া উঠিয়াছে, জগতের আর কোথাও তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। এই জ্ঞান মানুষের প্রতি যে হিন্দুর কখনো ভাল-বাসার অভাব ছিল বা আছে, তাহা নহে। তবে ভালবাসার অত্যাচারটুকু নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। খৃষ্টীয়ান যখন আমাকে ভালবাসেন, তখন তিনি আমাকে তাঁরই মত করিয়া তুলিবার জ্ঞান বাগ্ন হন। তাঁর ধর্মটা যাঁতে আমি গ্রহণ করি, তাঁর

সত্যতা ও সাধনা যা'তে আমি অবলম্বন করি, তাঁর সিদ্ধান্ত সকলকে যা'তে আমি সত্য বলিয়া আশ্রয় করি, তার জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন। আমি যেমনটী আছি, তেমনটী থাকিয়া যাইব, ইহাতে তাঁর প্রীতির ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। যেখানে প্রীতির একান্ত ব্যাঘাত নাও জন্মে, সেখানেও প্রীতি আর প্রীতি থাকে না, কিন্তু নিরতিশয় স্নিগ্ধ অনুকম্পার আকার ধারণ করে। মর্যাদা, সম্মান, ভক্তি, ইহাই সত্য প্রীতির প্রাণ। প্রীতি যেখানে এই মর্যাদা-জ্ঞান রক্ষা করিতে পারে না, সেখানে তাহার প্রীতি নষ্ট হইয়া, তাহা অনুকম্পাতে পরিণত হয়। পাদ্রিজন-স্বলভ প্রীতি তাই প্রকৃত পক্ষে প্রীতি নহে, কিন্তু অনুকম্পামাত্র। হিন্দুর সাধনার মানুষকে প্রীতি করিবার পন্থা আছে, তাঁহাকে ভক্তি, দিবার বিধান আছে, কিন্তু এই পাদ্রিজন-স্বলভ অনুকম্পা করিবার স্থান নাই। যে যা'কে অনুকম্পা করে, সে নিজকে তার অনুকম্পার পাত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিবেই ভাবিবে। মুখে স্বীকার না করিলেও, এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অন্তঃসলিলার মত, তাহার প্রাণের ভিতরে লুকাইয়া থাকিবেই থাকিবে। এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান যে স্থলে ও যে আকারেই মানুষের প্রাণে প্রবেশ করুক না কেন, ইহা যে ধর্মসাধনের আধ্যাত্মিক শত্রু, হিন্দু ইহা জানেন। সুতরাং তিনি লোককে ভক্তি দিতেই চাহেন, তাহাকে অনুকম্পা করিবার জন্য কদাপি ইচ্ছা করেন না। আর যে যা'কে ভক্তি করে, সে তার গুণভাগেরই প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলে, দোষভাগকে তন্ন তন্ন করিয়া অবৈষম্য করে না। তা'কে ভক্তি দিতেই সে চাহে, তা'কে উদ্ধার করিবার জন্য

ব্যাকুল হইয়া উঠে না। জগতের প্রচারক-ধর্ম সকলে ছনিয়ার লোককে উদ্ধার করিবার বাসনাটাই অত্যন্ত প্রবল। হিন্দুর এ বাসনা নাই বলিয়া, হিন্দুর ধর্ম প্রচারক-ধর্ম নহে। আর ধর্মবস্তুর মূল প্রকৃতির অন্তঃস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, হিন্দুর ধর্ম প্রচারক-ধর্ম হইতে পারে নাই।

কারণ, মানুষের ভিতরকার প্রকৃতি হইতেই যখন তার ধর্ম ফুটিয়া উঠে, তখন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা নিবন্ধন, তাহাদের ধর্মও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিবে। আর এই তত্ত্বটী অতি দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দুর ধর্ম যেমন একদিকে খৃষ্টীয়ান, মুসলমান প্রভৃতি মতবদ্ধ ধর্মের আর ছনিয়ার লোককে আপনার ভিতরে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করেন নাই; সেইরূপ নিজের ভিতরেও অশেষপ্রকারের বিচিত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন। যেভাবে ও যে অর্থে খৃষ্টীয়ান ধর্ম বা মুসলমান ধর্মকে একটা ধর্ম বলা যাইতে পারে, হিন্দুর ধর্মকে সেই ভাবে ও সেই অর্থে একটা ধর্ম বলা যায় না। বিশাল হিন্দুর ধর্মের আশ্রয়ে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদিগকে মোটামুটি জড়োপাসক বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। ইহারা যে কাঠলোষ্ট্রের পূজা করেন, তাহা নহে। জগতের অতিশয় নিম্নস্তরের সাধনাতেও জড় বলিয়া জড়ের উপাসনা নাই। কিন্তু এই সকল জড়োপাসক জড় আধারে অজড়ের অধ্যাস করিয়াই, তাঁহার পূজা করেন। এই অধ্যাস-জনিত উপাসনাকে বেদান্তে প্রতীকোপাসনা বলেন। হিন্দুর ধর্মে যেমন এই নিম্নতম

অধিকারের প্রতীকোপাসনা আছে ; তেমনি অসংখ্য দেবদেবীর-পূজাও প্রচলিত রহিয়াছে। আর এই সকল দেবদেবী যে সকলেই এক জাতীয় তাহা, নহে। শিতলা বা ওলাবিবির পূজা যে শ্রেণীর, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা সে শ্রেণীর নহে। আবার এই সকল পৌরাণিক দেবদেবীর ভজনা যে শ্রেণীর, ভক্তিপ্ৰাণ বৈষ্ণব বা শৈব সিদ্ধান্তের রাধাকৃষ্ণের বা শিব-শক্তির ভজনা সে শ্রেণীর নহে। হিন্দুর ধর্মে যেমন অতি নিম্ন অধিকারের প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা আছে, তেমনি মধ্যম অধিকারের সম্পদুপাসনার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। দুই বস্তুর মধ্যে কোনো সামান্য ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ইহাদের ক্ষুদ্রতর যে বস্তু, —এবং ক্ষুদ্রতর বলিয়াই যাহা বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত,—তাহার সাহায্যে বৃহত্তর বস্তুর যাহা জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকে সম্পদজ্ঞান বলে। ভূগোল শিক্ষার্থী দৃষ্ট ও কবায়ত্ত কমলালেবুর সাহায্যে অদৃষ্ট ও অনায়ত্ত পৃথিবীর আকারের যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা এই সম্পদজ্ঞান। কমলালেবু ও পৃথিবীর মধ্যে আকারগত যে সামান্য ধর্ম আছে, কমলালেবুকে সম্মুখে রাখিয়া, সেই সামান্য ধর্ম অবলম্বনে কেহ যদি অদৃষ্ট পৃথিবীর ধ্যান ও আরাধনা করিতে যান, তাঁর সে উপাসনাকে সম্পদুপাসনা বলা যাইবে। সূর্য্যের সঙ্গে ব্রহ্মস্বরও কতকটা সামান্য ধর্ম আছে। সূর্য্য স্বপ্রকাশ ; আর কিছুতে সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারেনা ; সূর্য্য নিজেই নিজকে প্রকাশিত করেন। আর নিজকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া যুগপৎ তিনি এই জগতকেও লোকচক্ষে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সূতরাং সূর্য্য যেমন

স্বপ্রকাশ, তেমনি জগৎপ্রকাশক। চিংস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুও স্বপ্রকাশ ও জগৎ প্রকাশক। সেই চিদালোকেই আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় জগতের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়কে জানিতেছে। আর এই বিধকে এইভাবে প্রকাশিত করিতে যাইয়াই, চিংজ্যোতি যে ব্রহ্মবস্তু তাহা আপনাকেও প্রকাশিত করিতেছেন। এই জন্মই প্রতি কহেন “তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্ পদং সদা পশুন্তি শূরয়ঃ দিব্য চক্ষুরাততং।” ব্রহ্মবস্তুর সঙ্গে সূর্য্যের এই সামান্য ধর্ম লক্ষ্য করিয়া, গায়ত্রিসম্বন্ধ-সাহায্যে এই প্রত্যক্ষ সত্যতার ধ্যান ও আরাধনা করা সম্পদুপাসনার অন্তর্গত। যেমন সূর্য্যোপাসনা, তেমনি মনোপাসনা, তেমনি প্রাণোপাসনা, এ সকলই সম্পদুপাসনা। কিন্তু হিন্দুর ধর্মে আরো উচ্চ অঙ্গের স্বরূপ-উপাসনারও ব্যবস্থা আছে। এখানে সর্ব্বপ্রকারের ইন্দ্রিয়চেষ্টার বৈষয়িক ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রেই আত্যন্তিক নিবৃত্তিলাভ করা আবশ্যক করে। এই নিবৃত্তিলাভ হইলে, উপাসক আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া, সমাধিযোগে ব্রহ্মস্বরূপের সাংস্কার পাইয়া, স্বরূপোপাসনার অধিকারী হইবেন। কিন্তু এই স্বরূপোপাসনাতেই হিন্দুর সাধনা আপনাদের চরম চরিতার্থতা লাভ করেনা। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারেই স্বরূপোপাসনার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেও উন্নততর অবস্থা আছে। সে লীলার অবস্থা। এখানে উপনিষদের ব্রহ্ম ভাগবতের লীলার-সময় ভগবানরূপে ক্ষুটিয়া উঠেন। আর সাধক উপনিষদ যাহাকে “রসো বৈ সঃ” তিনি রসস্বরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাকেই নিখিল-রসামৃতমূর্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই এই

নিখিললীলারসে আত্যস্তিকভাবে আপনাকে বিসর্জন করিয়া, জীবমুক্তিলাভ করেন। কঠলোষ্ট্রের উপাসক হইতে এই জীবমুক্ত মহাপুরুষগণ পর্যাস্ত, সকল শ্রেণীর সাধকই হিন্দুগোষ্ঠীভূক্ত। ইহারা সকলেই আপন আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধ্বজ কুটীল, উচ্চ নিম্ন, বিবিধ পস্থা অবলম্বনে একই চরম সাধ্যের সাধনা করিতেছেন। আর ধর্মবস্তুকে মানুষের প্রকৃতির মূলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, হিন্দুর ধর্ম আপনার মধ্যে এমন অশেষ বিচিত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছে।

ফলতঃ মানবপ্রকৃতি হইতেই যদি ধর্মের উৎপত্তি হয়, তবে এই প্রকৃতিতে যেমন অশেষ বিচিত্রতা থাকিবেই থাকিবে তেমনি এই প্রকৃতি সকলের সমান নয় বলিয়া, মানুষের মতামতও কখনো এক হয় না, তার শক্তি সাধ্যও কখনো সমান হয় না। আমাদের মতামত তো আর আকাশ হইতে উড়িয়া পড়ে না; আমাদের মনের, বুদ্ধির, প্রজ্ঞার যতটা বিকাশ হইয়াছে ও যে সকল বাহিরের বিষয়ের সঙ্গে বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া এই মন ও বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সকলের ফলেই আমাদের মতামত গড়িয়া উঠে। অতএব যেখানে লোকের মনবুদ্ধি ঠিক এক রকম বিকশিত হয় নাই, আর যেখানে তাহাদের বাহিরের অভিজ্ঞতাও সমান নয়, সেখানে তাদের মতামত কদাপি সমান হইতেই পারে না। মানুষের সত্যিকার মতামত যদি ভ্রান্ত হয়, সে ভ্রান্তির নিরসন করিতে হইলে, তাহার মনের প্রকৃতিটাকে বদলাইতে হইবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পরিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবহার ভিতর দিয়া সেই মানস প্রকৃতিটী

এতাবৎকাল আপনার সার্থকতা লাভের চেষ্টা করিয়াছে, সে সকল অবস্থা এবং ব্যবস্থারও যথাসম্ভব পরিবর্তন ঘটান আবশ্যক হইবে। নতুবা কখনই তার সত্যিকার মতামতগুলির সংশোধন বা পরিবর্তন সম্ভব হইবে না। খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি জগতের প্রচারকধর্ম এই সত্যটী ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। এ সকল ধর্ম নানা অবস্থার, নানা অধিকারের, নানা জাতির মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। তার ফল এই দাঁড়ায় যে খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি ধর্মের কথাগুলিই এই সকল লোকে শিখিয়া রাখে, সে সকল কথার অন্তরালে যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব লুকাইয়া আছে, তাহা কিছুতেই ধরিতে পারে না। এবং এইজন্ম কাল ক্রমে হীন অধিকারের লোকের মধ্যে এই সকল তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া, হীন অর্থ পাইয়া, খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি প্রচারকধর্ম সকলের মৌলিক শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই রক্ষা করা আর সম্ভব হয় না।

যিশুখৃষ্ট জুদিয়ার লোক। ইহুদীয় সাধনার পরিণত ফলরূপেই সে দেশে যিশুখৃষ্টের জন্ম হয়। যিশুখৃষ্টের উপদেশ ও সাধনপন্থার সঙ্গে ইহুদীয় সাধনার ও ইহুদীয় সমাজ-জীবনের একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এই সকল উপদেশ ও সাধন যখন প্রাচীন গ্রীশীয় চিন্তার সঙ্গে মিলিয়া গেল, গ্রীশীয় সমাজের স্নর্ধীগণ যখন যিশুখৃষ্টের ধর্মকে গ্রহণ ও সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন এই ধর্মই এক নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল। ইহুদীয় সাধনার ঝাঁক চিরদিনই কক্ষের দিকে ছিল। জিহোভার সঙ্গে ইহুদীয় জাতির আদি-পুরুষ এভাহেমের একটা বিশেষ সর্ভের উপরেই

প্রাচীন ইহুদীর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য ইহুদীয় ধর্মকে আজিকালিকার পণ্ডিতেরা সর্ব্বের ধর্ম বা কভেন্যান্ট্যান্ রিলিজিয়ন্—Covenantal Religion—বলিয়া থাকেন। “তোমরা আবার হুকুম মানিয়া চল, আবার নিদিষ্ট পথের অনুসরণ কর, আবার তোমাদের এক মাত্র দেবতা বলিয়া গ্রহণ কর; আমিও তোমাদিগকে আবার নিজের লোক বলিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিব ও জগতের অপরাপর জাতি সকলের মধ্যে তোমাদিগকে বাড়াইয়া দিব”—ইহুদী-দেবতা জিহোভার এই সর্ব্বের উপরেই ইহুদীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহুদীয় ধর্ম কৰ্ম্ম-প্রধান। আর কৰ্ম্ম-প্রধান বলিয়াই ইহুদীয় পন্থায় আত্যন্তিক বৈধভাব বা লিগ্যালিজম (legalism) দেখা গিয়া থাকে। যিশুখৃষ্টের উপদেশে এই বিধিআনুগত্যই দাস্যরসের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া একটা অসাঁধারণ উৎকর্ষ লাভ করে। কেহ কেহ যিশুর রসকে বাৎসল্য বলিয়াছেন, জানি। যিশু আপনায় উপাস্যকে সর্ব্বদাই পিতা সম্বোধন করিয়া, আপনাকে তাঁহার পুত্ররূপেই দেখিতেন, ইহাও সত্য। পিতৃআদেশের ঐকান্তিক ও সপ্রেম আনুগত্যই যিশুর সাধনার মূল বস্তু। পিতৃ-ইচ্ছার সঙ্গে আপনায় ইচ্ছার আত্যন্তিক যোগ সাধনেই এই আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইয়া থাকে। কিন্তু এই যোগ দাস্য সাধনেও সম্ভব। এই যোগ দাস্যরসেরও সাধ্য। ইহাই দাস্য ভাবের বিশেষত্ব। দাস্যের রস উচ্চতর বাৎসল্যভেদে আছে। “পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের ভাব পরে পরে বৈসে।” কিন্তু ইহা বাৎসল্যের বিশেষত্ব নহে। দাস সর্ব্বদাই প্রভুর আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে চাহে। প্রভুর আজ্ঞা-পালনেই

তার মূল, তার আনন্দ, তার সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ হইল মনে করে। পুত্র পিতার অনুগত হয় বটে, কিন্তু সে আনুগত্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তার মধ্যে এমন একটা মুক্তভাব থাকে, এমন একটা সহজ স্বাধীনতা থাকে, যাহা দাস্য সম্বন্ধে পাওয়া যায় না। পুত্র পিতার কথা যদি কখনও নাও শোনে, তাহাতে তার বাৎসল্য রসের নিতান্ত ব্যাঘাত হয় না। পুত্র কখনও বা আপনাকে পিতার সমান, কখনও বা পিতা অপেক্ষা বড়ও মনে করিয়া থাকে, আর কখনও বা আপনাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অসহায় বলিয়াও ভাবে। একরূপ রসবৈচিত্র্য দাস্যভাবে পাওয়া যায় না। এ সকল বৈচিত্র্য যিশুর মধ্যেও দেখা যায় নাই, এইজন্যই যিশুর ভাবকে ঠিক বাৎসল্য বলা যায় না। একরূপ ভাবের সঙ্গে ইহুদীয় সাধনার ঐকান্তিক সম্ভব ছিল। কিন্তু এই কৰ্ম্ম-প্রধান যিশুধর্ম্মই যখন গ্রীশে যাইয়া পড়িল, গ্রীশীর সাধনা যখন যিশুকে আয়তন করিতে আরম্ভ করিল, তখনই তাহার মৌলিক বৈধীভাবটা ক্ষীণ হইতে লাগিল, এবং আদিতে যে ধর্ম্ম কৰ্ম্ম-প্রধান ছিল, তাহাই ক্রমে নূতন মাটির নূতন রসের জোরে একান্তই জ্ঞানপ্রধান হইয়া উঠিল। আমরা আজি কালি যাহাকে খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম বলিয়া জানি, তাহার ইহুদীয় ভাব একেবারে লোপ না পাইলেও নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। আর গ্রীশের দার্শনিক চিন্তার প্রভাবেই তাহার মধ্যে অতি গভীর তত্ত্বজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ প্রভৃতি গভীর তত্ত্বকথা গ্রীশেরই কথা, ইহুদীর কথা নহে। যিশুর ইহুদী শিষ্যগণের হাতে এ সকল ফোটে নাই। আলেকজেন্ড্রিয়ার তত্ত্বজ্ঞানী-

দের নিকট হইতেই বর্তমান খৃষ্টীয়ান ধর্মের সকল প্রকারের গভীর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আবার যখন, কালক্রমে এই খৃষ্টীয় ধর্মই রোমক সাধনার সঙ্গে মিলিয়া গেল, তখন এই নূতন সাধনার প্রভাবে, তাহার মধ্যে পুনরায় একটা প্রবল বৈদীভাবেরও প্রতিষ্ঠা হইল। খৃষ্টীয়ান ধর্ম প্রচারকধর্ম। নানা সনয়ে নানা লোকের মধ্যে এই ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে! কিন্তু সর্বদা ও সর্বত্রই এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে মিলিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে, এই একই ধর্ম নানা আকারও ধারণ করিয়াছে। খৃষ্টধর্মের মূল কথাগুলি সকল স্থানেই রহিয়াছে। কিন্তু সর্বত্র একই অর্থে এই সকল কথা লোকে বোঝে নাই, বুঝিতে পারে না।

ফলতঃ কেবল বিশেষ বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধেই এ কথা সত্য, সাধারণ ভাবে সকল ধর্ম সম্বন্ধে সত্য নয়, এমন কথাও বলা যায় না। জগতের অসংখ্য খৃষ্টোপাসকদিগের সকলের অন্তরে খৃষ্ট যেমন এক নহেন, ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অন্তরে ও সাধনাতে একই খৃষ্ট অসংখ্য রূপ ধারণ করিয়া আছেন; সেইরূপ প্রত্যেকের ঈশ্বরও অপরের ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। জগতের নানা লোকে, নানা নামে যেমন একই ঈশ্বরের ভজনা করে, ইহা সত্য; তেমনি প্রত্যেক লোকের অন্তরের ঈশ্বরামূর্তি ও ঈশ্বরোপলব্ধি যে অপন লোকের ঈশ্বরামূর্তি হইতে পৃথক, ইহাও সত্য। ব্রহ্ম বল, জিহোভা বল, ঈশ্বর বল, খোদা বল, বিষ্ণু বল, শিব বল, রাধা বল, শক্তি বল, যে নামেই পরমতত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা কর না কেন, এ সকল নামের অন্তরালে

যে সত্য বস্তুর অমূর্ত্তি থাকে, তাহা তোমার নিজে, তোমার ভিতরকার প্রকৃতির দ্বারা, সেই প্রকৃতির রসে রঞ্জিত হইয়া আছে। তোমার প্রকৃতি যদি তামসিক হয়, সাত্বিক বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিলেই তোমার প্রাণের মধ্যে যে দেবতার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা কখনো সাত্বিক হইবে না; হইতেই পারে না। এই জ্ঞান সাধকের প্রকৃতির বিশেষত্ব নিবন্ধন অনেক শৈব এবং শাক্ত সাধকও প্রকৃত বৈষ্ণব হইয়া থাকেন, অনেক বৈষ্ণব সাধকও ঘোরতর শাক্ত হইয়া রহেন। অনেক নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম ও ভিতরে ভিতরে ঘোরতর পৌত্তলিক হইয়া রহেন। আর অনেক দেবোপাসকও বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক খ্রীসম্পদ লাভ করিয়া, দেবতার নামে ও দেববিগ্রহে সেই “অলখ নিরঞ্জনবই” ভজনা করিয়া থাকেন। “জয় জ্যোতির্শ্বর” বলিয়া অনেক ব্রহ্মোপাসকও চক্ষু বুজিয়া কেবল একটা জগৎজোড়া আগুনের হুকাই হযত দেখেন; আর কখনো উচ্চ প্রকৃতির কোনো সাকারোপাসকও হযত, “জয় জ্যোতির্শ্বর” বলিতে বলিতেই ধ্যান মগ্ন হইয়া আপনার অন্তরে স্বপ্রকাশ ও জগৎপ্রকাশক চিজ্যোতির্শ্বর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কোনো আকার সম্মুখে না রাখিলেই যে অমূর্ত্তের মানস-পূজা হয়, আর বাহ্যমূর্ত্তির সম্মুখে বসিলেই সর্বদা যে মূর্ত্তেরই পূজা করিতে হয় সেখানে অমূর্ত্তের প্রকাশ অসম্ভব ও অসাধ্য, তাহা নহে। দেবতার মূর্ত্ত-প্রকাশ ও অমূর্ত্ত-প্রকাশ উভয়ই বাহিরের মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার বা তাহার অভাবের উপরে নির্ভর করে না। কিন্তু উপাসকের ভিতরকার প্রকৃতির উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। যাহার ভিতরকার

প্রকৃতির মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তাহাকে অমূর্তের উপাসনায় প্রবৃত্ত করা বিড়ম্বনা মাত্র। সে কেবল শব্দ মাত্রই শুনিবে, সে শব্দের মর্ম্ম গ্রহণে কখনই সমর্থ হইবে না। সে নিরাকারের ভজন করিতে যাইয়া, দেবতাপক্ষে যত ইন্দ্রিয়ের উপরে যাইবার চেষ্টা করিবে, নিজের সাংসারিক ও বৈষয়িক জীবনে ততই ইন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের দ্বারা আরও অধিক অভিভূত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায় তার সাক্ষ্য। আর ষার প্রকৃতি অতীন্দ্রিয়ের অধিকারে যাইয়া পৌছিয়াছে, সে রাম নামই করুক, আর খৃষ্ট নামই করুক,

সে সেই নামের ভিতরেই যিনি নামরূপেব অতীত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। অনেক হিন্দু ও ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ান সাধক ইহার প্রমাণ। আর হিন্দু এ সকল তত্ত্ব অতি পরিস্কাররূপে ধরিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার ধর্মে মূর্ত ও অমূর্ত, সাকার ও নিরাকার, অতি যৌতর তামসিক, অতি প্রবল রাজসিক, ও নিরতিশয় সাত্বিক, এই সকল বিচিত্র ও পরস্পর বিরোধী মহা নতের ও স্বধন-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর ধর্ম্মের তত্ত্বকে শুধাতে—মানব প্রকৃতির মূলে—প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, হিন্দু আপনীর ধর্ম্মকে এত উদার ও তাহাতে এত বিচিত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন।

শ্রীহরিদাস ভারতী।

ভারত, আয়ল্যান্ড ও ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য নীতি

কেবল চীনের অভ্যুত্থান বা প্যান্‌ই-লানিঙ্গের আশঙ্কা হইতেই যে লাট হার্ডিংয়ের বর্তমান ভারত-শাসন-নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা নহে। সমস্ত সভ্য-জগতের, এবং বিশেষতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ইহার অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। সভ্যজগতে তিনটি বিপুল শক্তি ক্রমে পরস্পরের বিরুদ্ধে আয়-প্রতিষ্ঠার* আয়োজন করিতেছে। সমগ্র খেতাব জাতি সকল, আশিয়া ও আফ্রিকা অভিনব অভ্যুদয় আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার শব্দভারতের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতে খেতাবের একটা তুমুল বিরোধ বাধিবার

আশঙ্কা জাগিয়াছে। খেতাবসমাজ এখন আশিয়া ও আফ্রিকায় যে অসংখ্য প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়াছেন, ইহা আর বেশি দিন যে অপ্রতিহত থাকিবে, এমন মনে হয় না। জাপানের অভ্যুদয়-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ও পূর্ব আশিয়ায় যুরোপের রাজ্য-বিস্তার চেষ্টা চিরদিনের জন্য প্রতিহত হইয়াছে। চীনের অভ্যুত্থানের ফলে আশিয়ার যুরোপের প্রভাব আরও কমিতে আরম্ভ করিবে। ক্রমে হৃদয় যুরোপীয় জাতি সকলকে কেবল যে আশিয়া ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহা নহে; কিন্তু একবার যদি চীন-জাপান একত্রিত হইয়া, একটা মঙ্গোলীয় শক্তিসম্মিলিত গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার হৃদয়

আত্মপ্রসারণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে যুরোপের পক্ষে আত্মরক্ষা করাও কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। রুশ-জাপান সমরের অবসান হইতেই যুরোপের প্রাণে এ আতঙ্কের উৎপত্তি হইয়াছে। রুশ, আমেরিকা ও ইংলণ্ড, এরা সকলেই স্বল্পবিস্তর এই আতঙ্কের দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন। এইজন্যই যে রুশিয়া শতাব্দিক কাল হইতে ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দী হইয়া ছিল, যার ভয়ে ভারতে ব্রিটিশপ্রভুশক্তি সততই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত, যাহাকে সন্দেহের ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখা ভারতীয় ইংরেজ-শাসনকর্তাদের একরূপ প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সেই রুশিয়ার সঙ্গেই ব্রিটিশ-রাজ আগ্রহাতিশয় সহকারে বিশেষভাবে সৌখ্যবন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। জাপান-চীনের অভ্যুদয় যেমন রুশিয়ার তেমনি আমেরিকারও আশঙ্কার হেতু হইয়াছে। আর এইজন্যই ইংলণ্ডের সঙ্গে সর্বপ্রকারের সম্ভাবিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্ত একটা সালিশীর ব্যবস্থা করিতে আমেরিকা এতটা ব্যগ্র হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ সমাজ এইরূপে যথাসাধ্য আপনাদের ঘরাও বিবাদ মিটাইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। এই ব্যাকুলতার অন্তরালে দীর্ঘকালনিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গ-সমাজের আকস্মিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা জাগিয়া আছে। এই আশঙ্কার তাড়নায় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিতরকার বিবাদগুলোও অতি সত্ত্বর মিটানো আবশ্যক হইয়াছে। ইংরেজ মন্ত্রিসমাজ আজ যে এত ব্যস্ত ও ব্যগ্র হইয়া আয়ল্যান্ডে “হোমরুল” বা স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহার পশ্চাতেও প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও, অপরোক্ষে এই

আশঙ্কাই জাগিয়া আছে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের শান্তি-স্থাপন ও ঘননিবৃত্ততা সাধনের জন্ত সর্বপ্রাণে এই পুরাতন বিবাদটা মিটানো আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু আয়ল্যান্ডে এই হোমরুল বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের অপরাপর প্রদেশেও অনুরূপ “হোমরুল” বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে। ফলতঃ আয়ল্যান্ডে হোমরুল প্রতিষ্ঠার সংকল্প প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ রাজমন্ত্রীগণ, স্কটল্যান্ডে এবং ওয়েলসেও ক্রমে অনুরূপ শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেন। আয়ল্যান্ডের হোমরুল-বিল পাশ হইলে, সেখানে একটা প্যারলিমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং আয়ল্যান্ডের শাসন-কর্তাগণকে এই প্যারলিমেণ্টের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে।

A National Parliament in Ireland and an Executive subject to that Parliament—

আইরিশ স্বরাজ-পন্থীগণ বহুদিন হইতে ইহাই চাহিতেছিলেন। এতাবৎকাল ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিকগণ কিছুতেই আয়ল্যান্ডের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে রাজি হন নাই। এরূপভাবে রাবণের চিতার ছায় একটা প্রধূমিত বিদ্যেবহি আয়ল্যান্ডে জাগাইয়া রাখিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্বপ্রকার সম্ভাবিত আশঙ্কার প্রতিরোধ করিয়া সন্ধ্যকল্পে আত্মরক্ষা করা যে একান্ত অসাধ্য না হইলেও, নিতান্তই দুঃসাধ্য হইবে, ইহা দেখিয়া গুনিয়াই, বর্তমান মন্ত্রিসমাজ আয়ল্যান্ডে হোমরুল-প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই স্বরাজ পাইয়া আইরিশগণ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের

সঙ্গে সর্বপ্রকারের সম্বন্ধচ্ছেদন করিতে চেষ্টা করিবেন, এ আশঙ্কা কখনই বেশী ছিল না, এখন একেবারেই নাই। বরং ইংরাজসমাজের রাষ্ট্রনীতিবিশারদগণ এখন এইটাই বুঝিয়াছেন যে, আয়ল্যান্ডকে জোর করিয়া ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত রাগিবার চেষ্টাতে সেই সাম্রাজ্যের শক্তি ও ঘনিষ্ঠতা যে পরিমাণে নষ্ট হইবে, আয়ল্যান্ডে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, সে পরিমাণে নষ্ট হইবার কোনোই আশঙ্কা নাই। বরং তাহাতে, সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত থাকিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-সকলতা লাভের সম্পূর্ণ অবসর পাইয়া, যেভাবে আয়ল্যান্ড সেই সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবে, জোর করিয়া তাহাকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া তাহার এই স্বাভাবিক ও জ্ঞানানুগত আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্ম-সকলতা লাভের পক্ষে অথবা বাধা বিয় স্থাপন করিলে, কিছুতেই তাহার সে অনুরাগ জন্মাইবে না। প্রত্যুত কেবল বিরাগ ও বিদ্বেষই বাড়িয়া উঠিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের দৃষ্টি, সাম্রাজ্যের শক্তিপুঞ্জকে সংহত করিয়া আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে হইলে, তাহার অঙ্গীভূত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও জাতি সমূহের স্বাভাবিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে যথা-যোগ্যভাবে পূর্ণ করাই আবশ্যিক। আধুনিক যুগে যে সকল বিশাল ও বিভীষিকাজনক শক্তিসম্মুদ্র ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার মধ্যে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সূর্য্যদৌ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিতরকার সকল প্রকারের বিবাদ মিটাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই, প্রকৃতপক্ষে, আয়ল্যান্ডে হোমরুল বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যিক

হইয়াছে। তাহারই জন্ত ক্রমে স্টল্যাণ্ডে এবং ওয়েল্‌সেও এইরূপ হোমরুল বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সর্বশেষে শুদ্ধ আপনাদিগের প্রাদেশিক স্ববাস্বাদীনতা অক্ষুণ্ণ রাগিবার জন্তই ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত এই প্রকারের হোমরুল বা স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হইবে। আর যখন এইরূপে বর্তমান ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের বা ইউনাইটেড কিংডমের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই সকল প্রাদেশিক হোমরুল বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন সেখানে আপনা হইতেই, মার্কিনের যুক্তরাষ্ট্রের বা 'ইউনাইটেড স্টেটস'এর জায় একটা ফেডারেল কনষ্টিটিউশন Federal Constitution বা সমবায়-শাসন-তন্ত্র গড়িয়া উঠিবে। মার্কিনের যুক্তরাষ্ট্রে রাজার স্থান নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে সমবায়-শাসন-তন্ত্র গড়িয়া উঠিলেও, তাহা মার্কিনের মত প্রজাতন্ত্র হইবে না। ব্রিটিশ-রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে আজ যেমন, তখনও, এই নূতন সমবায়-শাসন-তন্ত্র বা ফিডারেল কনষ্টিটিউশন গড়িয়া উঠিলে, ইংলণ্ডেরই অধিষ্ঠিত থাকিবেন। আয়ল্যান্ডে, স্টল্যাণ্ডে, ওয়েল্‌সে ও ইংলণ্ডে এই সকল প্রাদেশিক স্বরাজ বা হোমরুল প্রতিষ্ঠিত হইলে আপনা হইতেই ব্রিটিশ-প্রজাসভার বা পার্লামেন্টের প্রকৃতি ও শক্তি, ধর্ম ও কর্ম, উভয়ই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রাদেশিক আইন কাহ্ননও বিধিবদ্ধ করেন, আবার সাম্রাজ্যের কল্যাণার্থেই সকল সাধারণ বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহাও প্রবর্তিত করেন। কিন্তু প্রাদেশিক প্রজাসভা গঠিত হইয়া, প্রাদেশিক স্বরাজ ও স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্ত যাহা যাহা বিশেষভাবে আবশ্যিক হইবে, সে সকল

কাজ প্রাদেশিক প্রজাসভা ও সেই প্রজাসভার অধীনস্থ প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টই আপনারা করিবেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তখন ফেডারেল পার্লামেন্ট হইবে। তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণকে লইয়া এই সাধারণ প্রজাসভা গঠিত হইবে। যে সকল বিষয়ে সকল প্রদেশের বা একাধিক প্রদেশের স্বত্বস্বার্থ আছে, কেবল সেই সকল বিষয়ই এই ফেডারেল পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ রক্ষা করা, তাহাদের পরস্পরের বিবাদ বিরোধের মীমাংসা করা, সমগ্র সাম্রাজ্যের সন্ধিবিগ্রহাদির অনুষ্ঠান ও তত্ত্বাবধান করা, পররাষ্ট্রের সঙ্গে আপনাদের যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববিধ সম্বন্ধ নির্ণয় ও সম্বন্ধ স্থাপন করা, ও এই সকল সম্বন্ধকে যথাসম্যগভাবে রক্ষণ করা,—এই সকলই তখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'কর্ম' হইবে। ব্রিটিশ প্রজাসভা ক্রমে এইভাবেই পুনর্গঠিত হইয়া উঠিবে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রজীবন এই দিকেই বিবর্তিত হইয়া উঠিতেছে।

কলতঃ ইংরেজ রাষ্ট্রনীতি-বিদগণদেরা সম্পূর্ণই দেখিতেছেন যে কেবল এই পথেই অব্যবহিত ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও উন্নতি বিধান সম্ভব। ইহার আর দ্বিতীয় পথ নাই। এখন আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলিতে যাহা বুঝি, তাহা তিন অঙ্গে পূর্ণ হইয়া আছে। এই সাম্রাজ্যের এক অঙ্গ, গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য, ইংরেজিতে ইহাকে United Kingdom of Great Britain and Ireland বলে। তার দ্বিতীয় অঙ্গ,—অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ক্যানোডা ও দক্ষিণ-আফ্রিকা, এই চারিটা উপনিবেশ। আর তার তৃতীয়

অঙ্গ,—ভারতবর্ষ ও মিশর। এই তিনটি অঙ্গের মধ্যে, বলিতে গেলে, কোনো প্রকৃতি গত, স্বাভাবিক, অচ্ছেদ্য যোগ, কিম্বা কোনো প্রকারের স্বত্বস্বাধীনতার বা শাসনতন্ত্রের সমতা নাই। এই তিনটি অঙ্গের শাসন-তন্ত্র তিনটা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়া আছে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির কথা। এই উপনিবেশ গুলিকে কোনো মতেই ইংলণ্ডের অধীন বলা যায় না। ফলতঃ এগুলিকে এক একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিলেও চলে। তারা নিজেদের আইনকানুন নিজেরাই বিধিবদ্ধ করে, নিজেদের করভার নিজেরাই নির্ধারণ করে, নিজেদের রাজস্ব নিজেদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতই ব্যয় করে। নিজেদের রাষ্ট্রীয় কর্মচারীগণ নিজেরাই নিযুক্ত করে। তারা ব্রিটেনের আমদানী পণ্যের উপরে ইচ্ছামত শুল্ক নির্ধারণ করিতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপরাপর দেশের লোককে তাহাদের দেশে ইচ্ছামত যাতায়াত ও ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দিতে বা তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। তাহারা ইংরেজকে কোনো কর দেয় না। ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগ বা সেনা-বিভাগের ব্যয় নির্বাহার্থে এক কপর্দক অর্থও দান করে না। ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদের একরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। ইংলণ্ডের যুদ্ধ বিগ্রহাদির সঙ্গেও তাহারা যোগদান করিবে কি না তাহাও সম্পূর্ণরূপেই তাহাদের ইচ্ছাধীন। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভাজ তাহাদের গবর্ণর-নিয়োগ করিবেন, আর তাহারা নিজেরা কোনও পররাষ্ট্রের সঙ্গে সাংক্ষাৎভাবে সন্ধিবিগ্রহাদি করিতে পারিবে না ইহাই তাহাদের উপরে ব্রিটিশ-আধিপত্যের চরম সীমা। কিন্তু সন্ধি

বিগ্রহ না করিতে পারিলেও, এই সকল উপনিবেশ স্বৈচ্ছামত ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই, অল্প রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যগত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারে। অতএব উপনিবেশ সকলের উপরে ব্রিটেনের প্রভুত্ব একটা মৌখিক বস্তু। স্বজাতীয় লোক বলিয়া ভাষা, ইতিহাস, ধর্ম জাতীয় প্রকৃতি ও প্রেরণা এ সকল বিষয়ে কোনও কোনও উপনিবেশের সঙ্গে ব্রিটেনের একটা আন্তরিক ঐক্য ও ভাবগত যোগাযোগ রহিয়াছে। ক্যানডা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার সঙ্গে এ যোগ ততটা নাই। কিন্তু ক্যানডা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিকাংশ অধিবাসী ব্রিটিশ শোণিতপ্রসূত না হইলেও, তারাও ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া যে সকল স্বাধীনতা ও সুশাস্ত্রবিধা ভোগ করিতে পারে, তারই জন্য তাহাদের প্রাণেও এ মৌখিক যোগটা ভাঙ্গিবার কোনো প্রকারের প্রয়োজন বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এ সকল উপনিবেশের নিজেদের কোনও নৌ-শক্তি নাই। ইহাদের কোনো নির্ধারিত সেনাবলও নাই বলিলেই হয়। আত্মরক্ষার জন্য ইহাদের আছে কেবল “মিলিশিয়া” বা প্রজা-সেনা। পুলিশ প্রহরী ছাড়া এ সকল উপনিবেশে আর কেহই অনন্যাকস্ম হইয়া সমর কোশল শিক্ষা করিয়া, জীবিকা উপার্জনের জন্য সৈনিকের কস্ম গ্রহণ করে না। এ অবস্থায় এ সকল উপনিবেশের পররাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার উপযুক্ত শক্তি ও ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। ব্রিটেনকেই ইহার ব্যবস্থা করিতে হয়। আর ইহাই গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলের সর্বপ্রকারের বর্তমান বাধ্য বাধকতার মূল। কিন্তু গত কয়েক বৎসর

হইতে ব্রিটিশ উপনিবেশ সকল অল্পে অল্পে নিজেদের নৌ-শক্তি ও সৈন্যবল গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছে। যে পরিমাণে তাহাদের এই আত্মরক্ষার শক্তি ও ব্যবস্থা করিয়া ও গড়িয়া উঠিবে, সেই পরিমাণে গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলের বর্তমান যোগ-বন্ধনও শিথিল হইবার খুবই আশঙ্কা আছে।

* * * * *

উপনিবেশগুলির সঙ্গে যদি বর্তমান বন্ধনটা রক্ষা ও দৃঢ় করিতে হয়, তবে একটা সাম্রাজ্য-ব্যাপী সমবায়-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে একটা বিরাট যুক্ত-রাষ্ট্রে পরিণত না করিতে পারিলে, এ সাম্রাজ্যের শক্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষা করা অল্পকাল মধ্যেই একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিবে। আর এটা করিতে গেলেই, এই সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গুণ্ডলকে কোনও না কোনও আকারে হোমরুল দিয়া, তাহাদের প্রত্যেকটাকেই স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। বর্তমান ইংরেজ মন্ত্রিসভা এবং আমাদের বড়লাট ইহারা সকলেই এটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়াছেন। তাই একদিকে মন্ত্রী সভা আয়ারল্যান্ডে হোমরুল প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, অতীতকে লাট হার্ডিঞ্জ ক্রমে ভারতবর্ষেও একটা বিরাট যুক্ত রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়া, তাহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত রাখিয়া, সেই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব, ভারতের জাতীয় জীবনের স্বপ্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা, এবং সমগ্র মানব সমাজের শান্তি ও কল্যাণ বিধানের জন্য, তাহারা এই নূতন শাসন-নীতি প্রবর্তিত করিয়াছেন। ইহা কেবল

আমাদেরই ভালর জন্ত করেন নাই; কেবল ইংরাজের বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভালর জন্তও করেন নাই। কিন্তু ইহাতে সকলেরই কল্যাণ হইয়া, জগতেরও অশেষ কল্যাণ

হইবে, এই ভাবিয়াই, এই নীতির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত লাট হার্ডিঞ্জ সচেষ্ট হইয়াছেন। এই জন্তই আমরা সর্বাস্তঃকরণে তাঁর এই শাসন নীতির সমর্থন করি।

তরুণ রব ।

(পূর্বকাহিনী)

যে কবির কথা আমরা বলিতেছি, সেই রবীন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই ছরস্তুর কল্পনা প্রিয়। নিখিলের রহস্য প্রকাশে কৃত-সঙ্কল্প। কবির বয়ঃক্রম অপ্রকাশ্য।

‘পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেনো,
কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে এত নজর কেন?’

কবিবরের ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামের পাক দেখিয়া আমরা বহুকালাবধি মুগ্ধ। কিন্তু কেশের পাক হইতে মনের পাক আরও জটিল। কবিকুলের মানস ক্ষেত্রে বীজ কোথা হইতে বপন হয় তাহার তথ্য দার্শনিকগণ এখনও সবিশেষ বুঝাইতে পারেন নাই। সর্বাপেক্ষা transcendental দার্শনিক ফিল্ডের মত গ্রহণ করিলে :—

‘O, wonderful spirit, now for the first time do I wholly understand the doctrine. Man is not a product of the world of sense. His vocation transcends time and space, and every

thing that pertains to sense where his being finds its home, there too his thoughts seek their dwelling place. Those are best known to the childlike devoted simple mind. How thou art and seemest to thy own Being. I shall never know any more than can assume thy nature. After thousands of spirit lives I shall comprehend thee as little as I do now in this earthly house.’

ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যই কবি কল্পনার স্বদেশ ভূমি। সেই অজ্ঞাতদেশে চেষ্টা করিয়া কোন কবি উপনীত হইয়াছেন এমন কথা আমরা কখনও শুনি নাই। কিন্তু সে দেশের কোন ‘গোপন নূতন ফর, গুঞ্জে কুজনে,’ কিংবা ছন্দোবন্ধে যদি কোন কবি লইয়া আসেন তবে আমরা নিদাঘ সমুদ্র মাঝা পাতিয়া বরষার বারিধারার স্থায় সেগুলি গ্রহণ করিয়া খুসি হইব।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ‘childlike, devoted

and simple mind' পূৰ্ণ সাধনার ফল। তরুণ কবির নিখিল মন স্বর্ণশিশুর প্রতিকৃতি। “বিশ্বপ্রকৃতি” তার কাছে তাই ছিলনাক’ সাবধানে।” কবির বিশ্বাসঘাতকতাও শিশুর মত। ‘আসাবধান বিশ্বপ্রকৃতি’র গুপ্ত রহস্য উদ্বেদ করিয়া তিনি লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। প্রথম অঙ্কে

‘হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল
নরনারী শুন সবে,
কতকাল ধরে’ কি যে রহস্য
ঘটিছে নিখিল ভবে।
একথা কে কবে স্বপনে জানিত,
আকাশের চাঁদ চাহি
পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে
সারাবাত নিদ্ নাহি’।

কুমুদীর সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ, ভ্রমরের সহিত নবমালতীর সম্বন্ধ, কিংবা প্রকৃতির সহিত পুরুষের চিরন্তন সম্বন্ধ আজিকার নতুন কথা নহে। পূর্বের অনেক কবি গাহিয়া গিয়াছেন। ভগো হইতে টেনিসন পর্যন্ত অনেক কবি তাহার মধ্য উদঘাটনে যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট বিশ্বপ্রকৃতি সাবধান ছিল। অনেকে অনেক ভাবে প্রকৃতির উপাসনা করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু মস্তান গৰ্ভ করিয়া বলিতে পারে যে ভারতবর্ষ ছাড়া অল্প কোন দেশেই প্রকৃতিকে মাতৃভাবে লক্ষ্য করে নাই। সেই পুরাতন শৈশব বাণী রবীন্দ্রনাথের গোষ্ঠাকতক কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। ‘প্রকৃতি-গাথায়’ রবীন্দ্রনাথের এইটুকু অভিনব। ইহা এদেশে-ই গৌরব। কবির প্রশংসা না করিতে

চাহেন, ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহার মানস শিশু বড় সুন্দর সৃষ্টি।

মানবাত্মার আদি-শৈশব পুরুষ সত্ত্বের এবং উপনিষদের কথা। কবি তাকে কত সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন তাহা তাঁহার কাব্য হইতেই গোটা কতক অংশ লইয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। ইতিহাসটাকে সত্য না ভাবেন, ‘কল্পনা’ বলিয়াই ভাবুন। কিন্তু কবি তাহাতে ছুঃখিত হইবেন।

‘—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূণ্য, বড় ক্ষুদ্র বন্ধ অন্ধকার!—
এ দৈন্ত্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি!
এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাম্ সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি!’

সংসারের তীরে স্বর্গের কুখা শুনিতে সকলে প্রস্তুত নহে। তবে কাদালী কবির দৈহ্যদশা দেখিয়া যদি আপনার পাশাণ হৃদয় টলিয়া উঠে তাহা হইলেই তিনি সার্থক হইবেন।

জীবাত্মা মনাতনপুরুষের অংশ। তাঁহারই জ্যোতিকণা। এই জগৎ মানব মস্তিষ্কের জগৎের মধ্যেও স্বর্গের আনন্দ, জ্ঞান এবং চেতনা অল্পভব করে। ইন্দ্রিয়াতীত ‘ভাবের রাজ্য হইতে তাঁহার রূপের রাজ্য আসে’ এবং পুনরায় সেই দেশে ফিরিয়া যায়। ইহাই মোটামুটি মানবজন্মকথা। কিন্তু বিশ্বতীর কিংবা মায়া এবং অজ্ঞানের অন্ধকার দিয়া নতুন সংসারে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার আভ্যন্তরিক বন্ধন হইতে বিচ্যুত হয় না। স্বপ্ন, কল্পনা, এবং ভাবের উন্মেষই তাঁহার প্রমাণ।

কিন্তু স্বর্গের সহিত মর্ত্যের সম্বন্ধ কি তাহা আমরা বোধ হয় ভাবিয়া দেখি নাই। পুণ্যবলে, ধর্মবলে, হয় ত স্বর্গের আনন্দ অনুভব করিবার দাবী দাওয়া আমাদের থাকিতে পারে। হয় ত পুণ্যবল ক্ষয় হইলে আমরা পুনর্বার মর্ত্যে স্থল ভাবে বিচরণ করিতে বাধ্য কিন্তু কবি তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার মতে মানবসন্তানের ধর্মজগতে একটা দায়ীত্ব আছে। স্বর্গ হইতে বিদায়ের সময় কবি বলিতেছেন :—

থাক স্বর্গ হাশ্রমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি ছুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় ছদ্মগুর তরে।
যত পাপী তাপী, মেলি বাত্র আলিঙ্গন
সবারে কোমলবক্ষে বাদিবারে চায়,
ধলিমাখা তত্ত্বস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক্ সুখে তুংগে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা। অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গগুণ গুলি!

অথচ,

‘দেবগণ!

মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূর স্বপ্ন সম—যবে কোনো অন্ধ্ররাতে
সহসা হেরিব জাগি’ নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দের আলো, নিদ্রিতা প্রেমসী,
লুপ্তিত শিখিলবাহ’ (লোকালয় ১২৩।১২৪)
তার পর নিদ্রিতা প্রেমসীর কথা। পূর্ণিমা
নিশিতে নিদ্রিতা প্রেমসীর সোহাগ চুশন

আমাদের কপালে কোন্ কালে ঘটিয়াছিল
এমন মনে পড়ে না, এবং যদিও ঘটিয়া থাকে
তবে তাহাতে সহস্রজন্মের পূর্বের স্বর্গস্থখ-
কথা স্মরণ পথে আসিয়া ছিল, এহেন
জাতি-স্মরণতার দর্প আমরা করিতে অক্ষম।
কিন্তু জননীমর্ত্যভূমির অশ্রুধারা বিমোচন করায়
দায়ীত্ব যে আমাদের আছে, সে কথা কবি
সহিত আমরা প্রাণপণে স্বীকার করি। সে
অশ্রুধারা যে কেবল মূর্তমানবের নয়ন
বিগলিত তাহাই নহে। পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা,
কীটপতঙ্গ এবং সমগ্র বিশ্ব তাহার অংশীদার।
এই যে একটা অনাদি চিরন্তন মাতৃবন্ধন তাহা
কেবল ‘করণা’ এবং ‘জ্ঞান’ দ্বারা বুঝান
যায় না। এবং, সে বন্ধন আত্মমুক্তি কল্পনা
করিয়াও ছিন্ন করা যায় না, কারণ সমগ্র
বিশ্বকে তাহা বেঁধেন করিয়া আছে।

‘বন্ধন? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন

স্নেহপ্রেম আশীতৃষ্ণা; সে যে মাউপাণি
স্তন হ’তে স্তনান্তরে লইতেছে টানি’,

স্তনাতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ

ছিন্ন করিবারে চাস্ কোন মূর্ত্তিঅমে?

আমরা হিন্দু। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, যাগ যজ্ঞ,
পূজা এবং অর্চনার মাধ্যমে সেই বন্ধন চির-
কালই রাখিয়া দিয়াছি। পাশ্চাত্যজগতে
বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পূর্বে, সেই বিশ্বজনীন
বন্ধনের সম্পূর্ণ তথা কোন কাব্যগ্রন্থে পাওয়া
যায় না। মাতৃস্বরূপা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়া
মানবাত্মার সহিত পরমাাত্মার যে গূঢ় সম্বন্ধ
বর্তমান, তাহা হিন্দুসন্তানের স্মৃতিপথে
ক্রিয়াকলাপে, চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়া
গিয়াছে। সে ভাব ভোগাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবার
নহে। মৃত্তিকিংবা নির্দোষদ্বারা মিটিবার নহে।

এই জগতই পুনর্জন্ম আমরা মানিয়া থাকি
‘অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবীভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক ।

এই অদ্ভুত শৈশব-গাথা ‘শিশু’ নামক
কাব্যখণ্ডে কবি বর্ণনা করিয়াছেন । তাহারই
মধ্যে অব্বেষণ করিলে the child is the
father of the man, কবির ওয়ার্ডসওয়ার্থের
এই গভীর বাণীর মর্ম বুঝিতে পারিব । এই
বিশ্বজগত ‘শিশুর মহামেলা’ । সেই শিশুর
জন্মকথায় কবি সমগ্র সনাতন দর্শনশাস্ত্রের
মর্ম উদ্ঘাটিত করিয়াছেন ।

স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া পূর্বকল্পের
শিশুগণ কি করিয়া মর্ত্যে জননীর অঙ্গ
পূর্ন প্রাপ্ত হইল ? ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক
প্রভৃতি উপনিষদে জীবের পুনরাবর্তন সম্বন্ধে
অনেক কথা আছে । তাহার মর্ম এই যে
ছান্দোগ্য হইতে ভুলোক পর্যন্ত চিরন্তন একটা
পথ রহিয়া গিয়াছে বাহা দিয়া মানবসন্তানগণের
অহরহ পুনরাবর্তন হইতেছে । সে পথ
প্রকৃতিরই ক্রোড়স্থ । যে তন্ত্রাত্মকমে সেই পথ
সৃষ্টি হইতেছে, কবির অগ্ন্যাগ্ন কাব্যংশ হইতে
তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিব । আপাততঃ
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রকরণের ‘দ্বৈতরহস্য’টা
মনে রাখা উচিত । ঈশ্বর আপনিই নিজের
মাথাকে স্ত্রীপ্রকৃতিরূপে বিস্তার করিয়া ভাব-
রাজ্যের সৃষ্টি করেন । শাস্ত্রের মতও তাই,
দার্শনিক হেগেলের মতও তাই । ইহা তাঁহার
আনন্দ লীলা ।

‘যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
যেভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি ক’রে দান
তটিনী ধারারে স্তম্ভ করাইছে পান,
যেভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক

আপনারে ছুঁই করি লভিছেন স্পৃহ,
ছুঁইএর মিলনবাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধগীত করিছে রচনা,
হে রমণি ! ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিও ভরি’ দিলে সেই রহস্য আভাসে’ !

তাই ‘জন্মকথায়’ থাকা ‘মাকে শুদায় ডেকে’
‘এলেম আমি কোথা থেকে ?’ জননী
প্রকৃতি কহিল ‘ইচ্ছা হয়ে ছিল মনের
মাঝারে’ । যদি শিশুর মনে কোন পটকা
উপস্থিত হয় তাই কবি পুনরায় বুঝাইতেছেন,
‘তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তারি পূজায় তোমার পূজা করেছি ।’

এটা সনাতন ধর্মের কথা । অথ কোন
দেশের কবিতায়, কোন মহাকাব্যে, একথা
আমরা পাই নাই । বঙ্গের মা যশীর কুটীরে
থোকার দর্শনশাস্ত্র, থোকার জন্মতন্ত্র ও
বিজ্ঞান, সামান্য কয়টি কথায় কবি কি স্নন্দর
ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন ! তাহাতে তাঁহার
আর্য্য প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে । কবি হয়ত
নিজে কখন সে দর্শন ও বিজ্ঞান স্বীয় কাব্যের
মধ্যে প্রযুক্ত করিতে চাহেন নাই, কিন্তু
তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সহিত কথায়
কথায়, ছন্দে ছন্দে তাহা প্রকাশ হইয়াছে ।
থোকা ইচ্ছা শক্তির স্বরূপ হইয়া, মনের
মাঝারে দিয়া, কিরূপে আসিল ? উত্তর
সে ‘চিরকালের আশায়’ ছিল, ‘মায়ের, দিদি
মায়ের পরাণে ছিল’ ; শুধু তাই নয়, গৃহদেবীর
কোলের মধ্যে অনেক কাল লুকাইয়া ছিল ।
যৌবনের সঙ্গে মাতার তরুণ অঙ্গে ‘সৌরভের
মত’ মিশাইয়া ছিল ।

সব দেবতার আদরের দন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী
তুই জগতের স্বপ্ন হতে

এসেছিল্ আনন্দ শ্রোতে

নতন হরে আমার বুকে বিকশি' !

সদানন্দ, চিরকুমার আশ্বার প্রকৃতির ক্রোড়ে
আনন্দদর্শনের সুন্দর কথা !

সদানন্দ থোকার বিশেষ গোটাকতক লক্ষণ
আছে তাহাতে তাহার জন্মরহস্য বুঝা যায়।

আমরা, বন্ধ সংসারী,

না পাই যারে, চাহিয়া তারে

আমার কাটে বেলা'

কিন্তু থোকা,

'মা পাও চারিদিকে

তাহাই ধীর তুলিছ গড়ি

মনের সুখটিকে'

এইত গেল নিলিপ্তভাবে। কিন্তু থোকা নিলিপ্ত

হইয়া অন্তঃপুরে থাকে কি করিয়া ?

'থোকা থাকে জগৎ সংসারের

অন্তঃপুরে

চরাচরের সকলকর্ম

করে হেলা

মা যে আসেন থোকার সঙ্গে

করুতে থোকা !

থোকার তরে গল্প হবে

বর্ষা শরৎ,

খেলার গৃহ হয়ে উঠে

বিশ্বজগৎ !

কিন্তু আমরা থাকি 'জগৎ পিতার বিদ্যালয়ে'।

আমাদিগের নিকট স্বযাচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রে

মত চলিতেছে। বিশ্ব নীরব। নাগ কণ্ঠার

কথা গল্প মাত্র ! আমাদিগের নিকট বিশ্বগুরু

মহাশয় কঠিন হইয়া থাকেন।

বন্ধজীবের জ্ঞান হইতে বহুদিন লাগে।

কিন্তু এই যে মায়ার আগার জগৎ, মুক্ত

থোকা তাহা জন্মিয়াই প্রতিপন্ন করিতে

চাহে। এই যে নগ্ন পরিবর্তনশালী ক্ষণিক

সুখ দুঃখের বিষয়-পুত্তলিকা, থোকার নিকট

তাহারা ভুচ্ছ। সে যাহা দেখে তাহা ভাসিয়া

ফেলে।

থোকার সাথ যে বড় হইলে সে খেয়াঘাটের

মাঝি হইবে।

'আমি কেবল যাব একটিবার

সাত সমুদ্র তেরোনদী পার'

কবির খেয়াঘাটের দিকে খুব টান। ভবনদী,

'ও সোনার তরী লইয়া কবি-মাঝি অনেক

ছবি আঁকিয়াছেন। সে কথা পরে বলিব।

আপাততঃ তাঁহার কাব্যপটের ছুরন্ত থোকার

ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমাদিগকে বিস্মিত হইতে

হয়। দর্শনিক Fitcher কথায়, he transce-

nds all time and space. সরলভাবে ঘর ওয়া

কথায় কবি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন:—

দাদা হেসে কেন

বলেন আমায় "থোকা।

তোর মতন দেখি নেইক বোকা !

চাঁদ যে থাকে অনেক দূরে

কেমন করে ছুঁই ?"

আমি বলি দাদা তুমি

জাননা কিচ্ছুই !

মা আমাদের হাসে যখন

ঐ জানানার ফাঁকে

তখন তুমি বলবে কি, মা

অনেক দূরে থাকে ?"

থোকা ইহা অপেক্ষাও একটি গুরুতর প্রমাণ

দিতেছে। চাঁদ যে নিকটে আসিলে মস্ত বড়

দেগাইবে, সেটা কোন কাজের কথা নহে

'মা আমাদের চুমো খেতে

মাথা করে নীচু

তখন কি মার মুখটি দেখায়

মস্ত বড় কিছু' ?

এই যে তায়রত্ব থোকা, তার হৃদয় স্নেহে

ভরা। বৃক্ষ, পুষ্প, সকলেই তাহার নিকট

পাঠশালার ছাত্র। তাদের পাঠশালা মাটির

নীচে। খেলিতে চাহিলে গুরুমহাশয় তাহা-

দিগকে দাঁড় করিয়া রাখে। তাদেরও মা

আছে। যারা মেঘের মধ্যে থাকে তাহারাও

থোকাকে ডাকে কিন্তু মৃত্যুবৎসল থোকা

তাহাদিগের সহিত যাইতে রাজি নয়।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বিলাতী কথা

প্রথম যখন লণ্ডনে পৌঁছি, তখন সন্ধ্যা সাতটা। সেদিন রবিবার ছিল। ফরাসী দেশের ভিতর দিয়া গিয়া, কে'লে হইতে ডোবারের পথে সমুদ্র পার হইয়া, বিলাতের মাটিতে পা দি। ডোবার হইতেই পরিচিত বন্ধুদিগকে তারে খবর পাঠাই। ভাবিয়া-ছিলাম তাঁরা কেউ না কেউ ষ্টেশনে আসিবেন। তখন জানিতাম না যে বিলাতে, বিশেষ লণ্ডন সহরে, রবিবারে চিঠি বা টেলিগ্রাম কিছুই বিলি হয় না। অন্ততঃ সকালে এ ব্যবস্থা ছিল না; আজি কালি হইয়াছে। কাজেই ষ্টেশনে কেউ নিতে আসেনি। তবে তাতে বড় আদিয়া যায় না। লণ্ডনে হোটেলের অভাব নাই। যে সে হোটেলেই ওঠা যায়। একটা হোটেলের নাম আমার জানা ছিল। খুব জাঁকালো না হইলেও, হোটেলটা ভদ্র-গোছের। সংবাদপত্রের লীলাভূমি স্ক্রীটে ইহার অবস্থিতি। নাম বলা মাত্রই গাড়োয়ান এ হোটেলের পরিচয় পাইয়া আমাকে সেখানে লইয়া গেল।

হোটেলে ঢুকিয়াই তার আফিস। এই আফিসেই অভ্যাগতদিগকে নাম সহি করিয়া পছন্দমত ঘর ভাড়া করিতে হয়। সকল ঘরের ভাড়া সমান নহে। ছোট বড় ও আসবাবের তারতম্য হিসাবে ভাড়াও বেশ কম হয়। ছ'তালার ঘরগুলোর ভাড়া সকলের চাইতে বেশী। ষত উপরে 'ওঠা' যায়, ততই ভাড়া কম হয়। আমি তেতলায় একটা ঘর লইলাম। এ সকল হোটেলে

ঘরের ভাড়া আলাহিদা ও খাবার খরচ আলাহিদা দিতে হয়। ঘর ভাড়ার ভিতরে আলো বাতি ও চাকর-চাকরাণীর কাজটা ধরা হয়, এর জন্ত স্বতন্ত্র কিছু দিতে হয় না। কিন্তু চাকরচাকরাণীও বাড়ীর ভিতরকার কাজই করিবে। বাহিরের কাজে পাঠানো যায় না। সে কাজের প্রয়োজন হইলে অল্প লোক আছে। স্বতন্ত্র পয়সা দিয়া তাদের পাঠাইতে হয়। তাহাদের জন্ত যেমন স্বতন্ত্র পয়সা দিতে হয়, স্নানের জন্তও সেইরূপ। স্নানটা সে শীতের দেশে একটা সখেরই মধ্যে গণ্য। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে প্রতিবারে ছয় পেনি ও গরম জলে স্নান করিলে তার দ্বিগুণ—এক শিলিং বা বারো আনা দিতে হয়। তবে স্নানের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। প্রতিদিন নূতন সাবান ও ধোওয়া তোয়ালে মেলে; আর স্নানের টব্‌টা প্রত্যেক বারই নূতন করিয়া ণদিয়া মাজিয়া দেয়। আহাৰটা হোটেলে দিনে একবার করা চাই, নইলে দরভাড়া বেশী লাগে। সকালের খাওয়াটা,—ইংরেজেরা ইহাকে ব্রেকফাস্ট বলেন,—যাহা কিছু হউক হোটেলের খাবার ঘরেই খাইতে হয়। খাবারের দু'টা ব্যবস্থা আছে। একটা বীধা ব্যবস্থা—সে দেশের কথায় ইহাকে ('Table d'Hotel') বলে। এ কথাটা ইংরেজী নয়, ফরাসী। ইহার অর্থ হোটেলের টেবিলে যে দিন যেক্রপ আহাৰ্য্য রাখার ব্যবস্থা হয়, সে হিসাবে খাইতে পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থায় অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পদ থাকে।

ইংরেজীতে এই ভিন্ন ভিন্ন পদকে কোস বলে। কোথাও বা হোটেলের টেবিলের খাওয়ায় তিন কোসের কোথাও বা পাঁচ, কোথাও বা সাত কোসের ব্যবস্থা থাকে। এটা পুরা খাওয়া। 'Table d' Hôte' মতে খাইলে একটা বাঁধা দাম দিতে হয়। প্রাতঃকালেও খাওয়ার জন্ত মাঝারি রকমের হোটলে দেড় কি দুই শিলিং—আমাদের টাকা আর আঠারো আনা কি দেড় টাকা দিতে হয়; ব - বড় হোটলে আড়াই শিলিং হইতে সাড়ে তিন শিলিংও লাগে। কিন্তু হোটলে থাকিলেই যে 'Table d' Hôte' এর হিসাবে খাইতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। প্রত্যেক পদেরও স্বতন্ত্র দাম ধরা থাকে। খাবার টেবিলে, একখানা কার্ডে জিনিসের নাম ও দাম লেখা থাকে। যার যেমন পয়সা ও যেরূপ রুচি সেই হিসাবে, এই কার্ড দেখিয়া যে পদ ইচ্ছা লইতে পারেন। এ ব্যবস্থাকে 'A la Carte' বলে। কথাটা ফরাসী, অর্থ কার্ডের মাসিক। অনেক লোকেই প্রাতঃকালের খাওয়াটা কার্ড দেখিয়া, সংক্ষেপে চুকাইয়া থাকেন।

আমি হোটেলের আফিসে নাম ধাম লিখিয়া একটা ঘর লইলাম। অপরিচিত লোকে ঘর ভাড়া করিলে, ভাড়ার টাকাটা আগামই দিতে হয়। কিন্তু আমার সঙ্গে আমার বড় ট্রাক ও অন্যান্য বাক্স ছিল বলিয়া, আমাকে আর আগাম টাকা দিতে হয় নাই। সে রাতে কেবল এক পেয়াল চা খাইয়াই শুইয়া পড়িলাম।

আমার প্রত্যুষে জাগা চিরদিনের অভ্যাস। সেই অভ্যাস মত ভোরের

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোক মেলিয়া দেখিলাম জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে দিব্যি আলো ঢুকিয়াছে। বাহিরে, রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার চলাচলের গোলও উঠিয়াছে। ভাবিলাম এখন ঠাণ্ডা ভাল। কিন্তু ঠাণ্ডা জলে মুখ হাত ধোওয়া তো চলে না, আর বিনা আওনে ঘরে বসিও যায় না, তাই চাকরাণীর জন্ত ঘণ্টা বাজাইলাম। একবার, দু'বার, তিন বার বারবার দড়ি টানিয়া ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলাম। কিন্তু কা কস্ত পরিবেদনা? কেউ যে সাড়া দেয় না। শেষে হতাশ হইয়া আবার শয্যায় আশ্রয় লইলাম। এদিকে ঘর আলোতে ভরিয়া উঠিল। বাহিরেও গাড়ীঘোড়ার গোলমাল বাড়িতে লাগিল। তথাপি চাকর-বাকর কারো উচ্চ-বাচ্য নাই। মনে মনে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। একবার ভাবিলাম কালো বলিয়া কি এরা তুচ্ছ করিতেছে? এত ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি তবুও কেউ একজন এলো না। তখন মনে বড় রাগ হইল। তাই খুব জোরে ঘণ্টার দড়ি নাড়িতে আরম্ভ করিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া আবার ঘণ্টা বাজাইলাম। তখন একজন আসিয়া দরজায় বা দিল। আমি ক্রোধভরে বলিলাম—“এতক্ষণ ধরিয়া আমি ঘণ্টা বাজাইতেছি, এক জনও তার উত্তর দিল না, এর মানে কি?” সে ব্যক্তি বলিল—“হোটেলের চাকরচাকরাণীরা আটটার আগে উঠে না; কাজেই কেউ সাড়া দেয় নাই। ‘এখন সব সাতটা বাজিয়াছে।’ কাজেই আমাকে তৃতীয় বাব

কমলের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, চাকর-চাকরাণীদের শয্যাভ্যাগের প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিতে হইল। সে দিন হইতে বুঝিলাম—প্রভুঘোষে শয্যাভ্যাগ করিবে—শৈশবের এই শিক্ষা আধুনিক সভ্যতায় আর পালন করা চলে না। সভ্যতার জুলুমে গরিবের শৈশবের এ অভ্যাসটা কাজেই পরিত্যাগ করিতে হইল।

সেই প্রথম ক’দিন যা হোটেলের কাটাইয়াছিলাম, তার পর লণ্ডন সহরে আর কখনো বেশিদিন হোটেলের কাটাই নাই। হোটেলের সুবিধা অনেক আছে বটে, কিন্তু খরচ বড় বেশী। ভালো হোটেলের সপ্তাহে ৩০।৩৫ টাকার কমে একটা শোবার ঘর মেলে না। বোর্ডিং-হাউসে এই ৩০।৩৫ টাকায় সপ্তাহের যাবতীয় খরচ কুলাইয়া যায়। ছোট ছোট বোর্ডিং-হাউসে ২০।২২ টাকায়ও খাওয়া থাকা বেশ চলে। কিন্তু আমি কখনো বোর্ডিং হাউসে থাকি নাই। বোর্ডিং-হাউসে কোনো কোনো দিক দিয়া হোটেলের চাইতে বেশী বাঁধাবাঁধি আছে। আহারের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, সে সময়ে উপস্থিত না হইলে, আর খাবার পাওয়া যায় না। কিন্তু না খাওয়ার দরুণ সাপ্তাহিক বিলের টাকা কমে না। তার পর বোর্ডিং-হাউসে নানা লোক বাস করে, তাদের সকলের সঙ্গে একত্রে খাইতে বসিতে হয়। এ সকল লোকের পূর্ব-পরিচয় কিছুই জানা থাকে না। তার জ্ঞানও বোর্ডিং-হাউসে থাকিতে কখনো প্রযুক্তি হয় না। তৃতীয় কথা এই যে বোর্ডিং-হাউসে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা প্রায়ই অতি জঘন্য। খুব বড় বড়

বোর্ডিং-হাউসে অবশ্য ভাল বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু সে সকলের দাম প্রায় হোটেলেরই মত। অত টাকা দিয়া সে সকল উচ্চদের বোর্ডিং-হাউসে সকলের থাকা পোষায় না, আর খাওয়া সে টাকা খরচ করিতে পারেন, তাঁদের পক্ষে হোটেলের থাকাই প্রেমকর। বোর্ডিং-হাউসের খাওয়ার পরিচয়েই আমার পিত্ত উড়িয়া যাইত। বিলাতে সর্বত্রই প্রধান খাদ্য মাংস। আমাদের যেমন ভাত, পাঞ্জাবী-পুরবীষাদের ‘যেমন রুটি, ইংরেজের তেমনি গোস্ব। আলু, কপি, শাকসবজী এ সকল উপকরণ মাত্র। আর সেখানে গোমাংসই বেশী চলে। বোর্ডিং-হাউসে মাত্রেই গরু-রোষ্টের নিত্য ব্যবস্থা আর সকল রান্নাতেই লার্ড বা শূকরবসা ব্যবহৃত হয়। ঘি-জিনিসটা বিলাতে পাওয়া যায় না। মাখম ‘মেলে, কিন্তু মাখমের রান্না অতি বিরল। কোনো কোনো মাছ-রান্নায় মাখম ব্যবহৃত হয়, নতুবা লার্ড প্রশস্ত। আর গরু ও শূকর দু’এর কোনোটাতেই কখন রুচি হয় নাই। যথাসাধ্য সর্বদাই বিলাতপ্রবাসকালে এ দুই বস্তু বর্জন করিয়া চলিতাম। কাজেই এই কারণেও কখনো বোর্ডিং-হাউসে থাকি নাই।

হোটেল এবং বোর্ডিং-হাউস ছাড়া, বিলাতে থাকবার আর একটা ব্যবস্থা আছে তাকে অ্যাপার্টমেন্ট (Appartment) বলে। অনেক জায়গায় সাজশয্যাসমেত ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতে পারা যায়। এই সাজানো ঘরগুলোকে অ্যাপার্টমেন্ট বলে। এক জন বাড়ীওয়ালী বড় একটা বাড়ী লইয়া, তাহাকে নানা প্রয়োজনীয় আসবাব দিয়া

সাজাইয়া রাখে, এবং একটি ছুটি ঘর ভাড়া দিয়া তাহা হইতেই আপনার জীবিকা তুলিয়া লয়। ঘরভাড়ার ভিতরে এ সকল স্থলে আলো, বাতি ও চাকরচাকরাণীর খরচও ধরিয়া লওয়া হয়। আহাের ব্যবস্থা ইচ্ছা করিলে বাড়ীতে বাড়ীওয়ালীর নিকটেও করা যায়, আর বাহিরে যে সকল খাবার স্থান বা Restaurant আছে, সেখানেও করিতে পারা যায়। বাড়ীতে খাবার ব্যবস্থা করিলে, রাঙ্গা-বাঙ্গা সবই বাড়ীওয়ালী করিয়া দেয়। কেবল জিনিষপত্রের দাম তাহাকে ধরিয়া দিতে হয়। কখনো কখনো হুকুমমত খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেয়, ও তার অন্ত স্বতন্ত্র দাম লইয়া থাকে।

আমার একটি বন্ধু লওনে প্রথমে আমাকে অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করিয়া দেন। আমি নূতন লোক, সবে বিলাতে পৌঁছিয়াছি, তিনি তিন বৎসরকাল সে দেশে কাটাইয়াছেন, সুতরাং আমি সম্পূর্ণরূপেই এ বিষয়ে তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলাম। বন্ধুটি স্বভাবতঃই অতি ধীর, শান্ত ও নির্মল প্রকৃতির লোক! এ রকম সংযমী পুরুষ বিলাতে অতি কমই যান। কেবল সংযমী নন, কেহ কেহ তাঁহাকে একটু 'অতিমাত্রায় স্মৃতিচিহ্নস্ত বা পিউরিট্যান বলিয়াও মনে করিতে পারেন। প্রথমে আমরা একটা বাড়ীর জানালায় অ্যাপার্টমেন্ট খালি আছে এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া, তথায় ঢুকিলাম। যে চাকরাণী দরজা খুলিয়া দিল, তার রূপবোবনের ছটা ও চালচলনের ষটা দেখিয়া আমরা উভয়েই একটু সঙ্কচিত হইলাম।

বন্ধুটি বাংলাতে আমায় বলিলেন—“বাড়ীটা সুবিধামত মনে হয় না।” যা হউক যখন দরজা খুলাইয়া ঢুকিয়াছি, তখন একবার ঘরটা না দেখিয়া ফিরিয়া আসা ভাল নয় বলিয়া, দেখিয়া আসিলাম। কিন্তু আমাদের নিবার ইচ্ছা থাকিলেও, ভাড়া শুনিয়া চক্ষুস্থির হইয়া গেল। এক থানা মাঝারি রকমের শোবার ঘর, তারই ভাড়া সপ্তাহে এক পাউণ্ড বা পোনর টাকা। বন্ধুটি বাহিরে আসিয়া বলিলেন এ সকল বাড়ীতে এরূপ ভাড়াই চায় বটে। আমি বুঝিলাম বিলাতে কেবল ঘরের গুণে ভাড়া হয় না, বাড়ীর চাকরচাকরাণীর শোভাসৌষ্ঠবেও ঘরের ভাড়া চড়িয়া যায়। এ কথাটা যে কত সত্য, পরে তার অনেক প্রমাণ পরিচয় পাইয়াছি। এই হ'তে বাড়ী খুঁজিতে যাইয়া, ঘরদোর দেখিবার আগেই চাকরাণীদের একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইতাম। যে স্থলে চাকরাণীদের রূপের চটক বা প্রশাধনের কলাকৌশল একেবারে চখের উপরে আসিয়া পড়িত, সেখানে আর ঢুকিতাম না।

অনেকগুলি ঘরই দেখিলাম; কিন্তু পছন্দমত একটিও পাইলাম না। কোথাও বা চাকরাণীর চাউনী দেখিয়া সরিয়া পড়িলাম, কোথাও বা ঘরের ব্যবস্থা দেখিয়া বিমূখ হইলাম। আর যে যে স্থলে ঘর ও বাড়ীওয়ালী দুই আপত্তিশূল্য মনে হইল, সেখানেও স্নানের ব্যবস্থা নাই শুনিয়া, বাড়ী ঠিক করা সম্ভব হইল না। আগেই বলিয়াছি, 'স্নানটা ইংরেজসমাজে একটা সখের মধ্যে গণ্য। সুতরাং সকালে

সকল বাড়ীতে স্নানের কোনোই বন্দোবস্ত ছিল না। স্বাদের স্নান করার একান্ত ইচ্ছা হয়, তাঁরা নিজেদের ঘরে একটা ছোট্ট টবে, খানিকটা গরম জল ও ঠাণ্ডা জল লইয়া, একরূপ “কাকস্নান” করিয়া সে সাধ মিটাইতে পারেন। বাঙ্গালীর ছেলে, আজন্মকাল নিত্যস্নান করা অভ্যাস। আমার এরূপ কাকস্নানে চলিবে কেন? কাজেই স্নানের বন্দোবস্ত যেখানে নাই, এমন বাড়ীতে ঘরভাড়া করা অসম্ভব হইল। অনেক কষ্টে, শোষণ, একটা বাড়ী পাওয়া গেল। এখানে বাড়ীওয়ালী বর্ষীয়সী। চাকরাণীটা যুবতী হইলেও একান্তই কুৎসিৎ এবং সর্বপ্রকারের প্রসাধন-পটুতাশূন্য। ঘরগুলোর আসবাব খুব দামী ও সৌখিনতাসাধক না হইলেও, চলনসহি রকমের। আর সর্বোপরি এই পুরাতন বাড়ীতেও, কি ভাগ্যগুণে জানি না, একটা সুন্দর, পরিষ্কার স্নানাগার ছিল। আর কথা নাই। এত গুণের সমাবেশ অতি বিরল ভাবিয়া, একেবারেই এই বাড়ীতে একটা ঘর ভাড়া করিয়া ফেলিলাম।

থাকবার স্থান তো হইল, স্নানেরও ব্যবস্থা হইল। এখন আহারের বন্দোবস্ত কি করা যায়। বাড়ীওয়ালী নিজে প্রায়ই দেখা দিতেন না। চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে একখানা বড় কার্ড আনিয়া দিল। তাতে এরূপ ভাবে খাবার দর লেখা ছিল :—

১। প্রাতরাশ বা ব্রেকফাস্ট ১ শিলিং।

২। মধ্যাহ্নাহার বা লঞ্চ ১।০ শিলিং।

৩। বিকালের চা ৬ পেনি।

৪। রাত্রেয় আহার বা ডিনার ২ শিলিং।

তখন লগুনে আমি একেবারে নূতন। কোনে কিছুই জানি না। আর কোন ইংরেজ যে কাউকে কখনো ঠকায় বা ঠকাইতে পারে, এ জ্ঞানও জন্মায় নাই। কাজেই বিনা ওজরে, এই দর মানিয়া লইয়া, বাড়ীতেই আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। প্রথম সপ্তাহটা মন্দ চলে নাই। জিনিষগুলো যেন টাটকাই পাইতাম, আর রান্নাবান্নাও মন্দ হইত না। কিন্তু লগুনের বাড়ীওয়ালী একরূপ সেবিকা হইলেও, এদেশের প্রাচীন কথা—সেবকান্নে পুরাতনে—পুরাণ হইলে চাকর আর চাউল দুই ভাল হয়, এটা লগুনে খাটে না। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই খাওয়া খারাপ ও তার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের শয়তা নষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। প্রাতরাশে—আধসিদ্ধ ডিম, খান দুই রুটী-টোষ্ট, এবং এক পেয়ালা ককো বা চা’এর ব্যবস্থা আমার ছিল। এরই জন্ত আমাকে বারো আনা করিয়া দিতে হইত। ক্রমে দেখিলাম—ডিম কেবলই পচিয়া যায়, টোষ্ট পুড়িয়া উঠে, মাখন মার্জেরীন্ হইয়া বসে, এবং চা ও ককো দুই চিনির সঙ্গে মিলিয়াও কিছুতেই কবিরাজী পাঁচন হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে না। দু’এক দিন তো চ’খ বুজিয়া এ অখাদ্যই গলাধঃকরণ করা গেল। ভাবিলাম হাতের পাঁচ আঙ্গুল যখন কোথাও সমান হয় না, তখন প্রতিদিনই যে টাটকা ডিম, সুপক্ক টোষ্ট, স্বচ্ছ চা পাইব, এ তো বড় সম্ভব নয়। সর্বত্রই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। এখানেও তাই হচ্ছে। কিন্তু এখন

দেখিলাম—কনিষ্ঠাই পাচ আঙ্গুলের সকল-
গুলিকে আপনার সমান করিয়া অঙ্গুলীসমাজে
অলৌকিক সাম্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে ;
আর যাহাকে নৈমিত্তিক ব্যতিক্রম ভাবিয়া-
ছিলাম, তাহাই নিত্য নিয়মের আসন
একান্তভাবেই অধিকার করিয়া বসিয়াছে,
তখন ধৈর্য রাখা মুশিল হইয়া উঠিল। কিন্তু
ধৈর্য ভাঙলে কি হবে ? সভ্যতার বাঁধ
তো আর ভাঙা যায় না ! এদেশে চাকর-
চাকরাণী অপরাধ করিলে, দুটো গালিগালাজ
দিয়া ভিতরকার বিরক্তির ষ্টিমটা ছাড়িয়া
দিয়া, কতকটা ঠাণ্ডা হওয়া যায়। সাহেব-
মেমেনের তো গালগালাজ করা চলে না।
চাকরাণী গুরুতর অত্যাচার করেছে। চাই
গরম চা, একেবারে ঠাণ্ডা চা আনিয়া হাজির
করিয়াছে—তবুও খজ্জবাদ দিয়া লইতে
হইবে। পরে “Please get a fresh pot.”
অঙ্গগ্রহ করিয়া নতুন ক’রে তৈয়ার করিয়া
আর এক পট চা আনিবে কি ? এই
বলিয়া প্রথমকার ভুল সংশোধনের চেষ্টা
করিতে পার। কিন্তু গালাগালি দেওয়া,
এমন কি চেচাইয়া হুকুম করাও সে দেশে
চলে না। একদিন বড় বিরক্ত হইয়া,
একজন চাকরাণীকে একটু গরম স্বরে
বলেছিলাম “You must do it, you
forget that you are paid for it—”
“তোমাকে এ কাজটা কর্তেই হবে ;
তুমি ভুলে যাচ্ছ যে এ কাজের জন্তই তুমি
মাহিয়ানা পাইতেছ।”—আর সে এমন
কাহা জড়িয়া দিল যে আমি চো’কে কাণে
পথ দেখিতে পাই নাই। সে দুর্জয় মান
কি করিয়া ভাঙে বহুক্ষণ আমায় অনশ্রুকণ্ঠ

হইয়া তার উপায় ধ্যান করিতে হইয়াছিল।
এই যখন দেশের রীতি, সভ্যতার ইহাই
যখন দস্তুর, তখন কিল খাইয়া কিল চুরি
করা ভিন্ন তো আর উপায়ান্তর নাই।
অবশ্য এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিতাম।
কিন্তু যাই বা কোথায় ? বাড়ীর ভাব তো
দেখা গিয়াছে। আর অজ্ঞাত যে এই দশাই
ক্রমে ঘটবে না, তারই বা কথা কি ?
এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষটা বাড়ীতে
আহার পরিত্যাগ করিলাম।

ক্রমে দেখিলাম বিলাত যাইয়া যারা
শুদ্ধ ঘর ভাড়া করিয়া Apartmentএ
থাকেন, তাঁদের পক্ষে বাহিরে আহারের
ব্যবস্থা কন্ডাই সব চাইতে ভাল। আর
এর জন্ত ব্যবস্থাও কিছুই করিতে হয় না।
বিলাতে সকল স্থানেই বিশ্বের Restaurant
বা খাবার-স্থান আছে। উত্তম, মধ্যম,
অধম, সকল রকমের খাদ্যই পাওয়া যায়।
যার যেমন পয়সা ও যেমন অভিরুচি সেইরূপ
আহার্য্যই এ সকল Restaurantতে পাইতে
পারেন। আর সামান্য জলযোগের স্বন্দর
পরিপাটী ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্রই রহিয়াছে।
এরেটেড্, ব্রেড্ কোম্পানী বলে একটা
কোম্পানী আছে, সাটে ইহার নাম এ, বি,
সি (A. B. C.)। এই A. B. C. দোকান
অলিতে গলিতে সর্বত্র আছে। আজি কালি
এদের দেখাদেখি আরো অনেক কোম্পানী
হইয়াছে, ঝারা সমস্ত খাবার বিক্রী করেন।
এ, বি, সি দোকানে দুই পেনিতে
একটা আধসিদ্ধ বড় টাটকা ডিম, দুই
পেনিতে এক খানা খুব বড় সমাখন-টোষ্ট
(Buttered toast) এবং আর দুই পেনিতে

টাট্কা এক পেয়াল। চা বা ককো পাওয়া যায়।
স্বতরাং এই সকল দোকানে ছয় পেনিতে বা
ছয় আনায় অতি সুন্দর, তৃপ্তিকর, পরিষ্কার
পরিচ্ছন্ন প্রাতরাহার মিলে। এ অবস্থায়
গচা ডিম, পোড়া টোষ্ট, তিতো চা'য়ের
জুজু বাড়ীওয়ালীকে এক শিলিং বা বারো
আনা দেওয়া একান্তই বোকামী নয় কি ?
আর কেবল তাই নয়, তার উপরে আপনার
স্বভাবটী প্রতিদিন গুমরিয়া গুমরিয়া ক্রোধ-
পোষণে বিকৃত হইয়া যায়। আমি ক্রমে
প্রাতরাহারের জুজু এ, বি, সির শরণাগত
হইলাম। ইহাতে ভাল খাওয়া, মুক্ত হাওয়ায়
একটু বেড়ানো ও মনের সন্তোষ সকলই
মিলিতে লাগিল। মধ্যাহ্নের আহারও
এইরূপ বাহিরেই করিতে লাগিলাম। লগুনে
নিরামিষেরও বেশ ব্যবস্থা আছে। সে কালে
তিন চারিটা খুব ভাল নিরামিষ-আহারের
স্থান বা Vegetarian Restaurant ছিল।
এখানে মুসুর বা মটর ডালের স্থপ, কপি
সিদ্ধ, বড়বটীর কোপ্তা, আলু ভাজা,

মাগুনানার পায়স,—এরূপ তিন চারিটা
পদের লক্ষ বা মধ্যাহ্নাহার ছয় আনায়
পাওয়া যায়, এটা table d' Hote lunch.
তা ছাড়া A la Carlo lunchও আছে।
ইচ্ছামত বাছিয়া গুছিয়া খাইলে এক শিলিংএ
অতি সুন্দর ও পরিতৃপ্ত আহার হয়। বাড়ী-
ওয়ালীকে তার অখাদ্য লক্ষের জুজু দেড়
শিলিং দিতে হয়। ধারা একান্ত নিরামিষাশী
নন, তাঁরা দশ আনা বার আনায় মাছ বা
মাংসও খাইতে পারেন। আগে কারি-ভাত
বেশি পাওয়া যাইত না। এখন দশ আনায়
অতি সুন্দর কারি-ভাত পাওয়া যায়। রাত্রে
আহারেরও ব্যবস্থা বাহিরে করিলে,
খাওয়াও ভাল হয়, পয়সাও কম লাগে।
ধারা সস্তায় বিলাতে থাকিতে চান, অথচ
ভাল খাওয়ার দাওয়া হয় ইচ্ছা রাখেন, তাঁদের
পক্ষে Apartmentএ থাকিয়া বাহিরে
আহারের ব্যবস্থা করাই শ্রেয়। অন্ততঃ
আমি তাই করিয়াছিলাম।

বিলাত-ফেরত।

জেগে কাঁদা

তারি নব অম্বরাগ প্রভাতে মিশিয়া,
উষায় তুলিয়াছিল, মধুর করিয়া,
দিয়াছিল পক্ষীকণ্ঠে, সঙ্গীত নবীন
হৃদয়ে ফুটায়েছিল কণক নলিন,
স্বপ্ন এনেছিল বহি সোণার কল্পনা,
কেবল সংসারে ছিল, প্রেম-আলোচনা
যৌবন উঠিয়াছিল, উল্লাসে ফুলিয়া
নব ছন্দে, নব গীত, আলাপ করিয়া।

স্বপ্ন-রাজ্য হ'তে রত্ন, আনিতে আহাশ
ভাসাইয়া দিয়াছিহু প্রণয়ের তরী ;
চলেছিহু গান গেয়ে বাজাইয়া বাঁশী,
বহুবিধ রতনের হইয়া প্রয়াসী ;
তুলেছিহু পদ্মকলি, পদ্মের যুগল
গিয়েছিহু পদ্মমধু, সকাল, বিকাল ;
বাঁশরী ধৈবতরাগ, উগারি উগারি
তুলিত হৃদয়মাঝে, কুহক লহরী,

নিদ্রা, জাগরণে যেন করি পশ্টন
নয়নে সজ্জিত তার মধুর স্বপন ;
জাগরণে ছিল নিদ্রা নিদ্রায় মদ্রি,
স্বথের প্রাচুর্য্যে দৌহে হ'তাম অধীর,
তর তর, থর থর, বেতসী কম্পনে,
কাঁপিয়া উঠিত হিয়া, সতত সঘনে,
স্পর্শে স্পর্শে বিনিময়, ঈক্ষণে ঈক্ষণ
হর্ষে হর্ষে, বিকিকিনি, মধুর কেমন !
দিবসে আনন্দভরা, নিশায় মাধুরী
বসন্তের পিকের বান, বর্ষায় দাহুরী *
অধর আনিত বহি অধরের হাসি
স্বথের বিলাসে স্থখ হইত উদাসী ।
নয়নে আছিল ভরা শীতল বিজরী,

মধুর মাধুরী ছিল সর্ব-অঙ্গ ভুরি,
দধিন পবন ভরে, নাচিয়া নাচিয়া
যেতেছিল তরীখানি স্রুধীরে ভাসিয়া
পুলকের আলোকের, মাঝারে সহসা
ঘনাইয়া মান-মেঘ ঢাকিল ভরসা,
বাত্যা এলো অন্ধকারে ছাইল আকাশ
দৌহাচিহ্নে 'আমিষের' হইল বিকাশ
কোথা হ'তে ব্যবধান বিতস্তি প্রমাণ,
আনিল মালিন্যরাশি আমার সমান,
প্রেমেরে দলিত ক'রে দাঁড়াল গৌরব,
স্বজিল সম্মুখে এক ভীষণ রোরব,
উঠিল গর্জের ঝড় ডুবাইল তরী,
স্বপন গিয়াছে ঘুচি, জেগে কেঁদে মরি ।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী

আকাজক্ষা

১
মরম-বেদনা মরমে লুকায়ে
রাখিয়াছি সাবধানে,
কি যে ব্যাকুলতা, কেহ তাহা নাহি জানে !
ঐগা খানি লয়ে বসিয়া বিরলে
চাহি—নব নব তানে
আমার গোপন মরম কথাটি
বিকাশি' তুলিতে গানে ;
সে গান কখন পশিবে না তার কাণে !

২
যে গান নীরবে * ধনিয়া উঠিছে
আমার মরমতলে
পারিতাম যদি শিখাতে বিহগ দলে !
প্রতি নিশাশেষে উষা আসি হাসি'
যখন দাঁড়ায় ভবে,
স্বপনের ঘোর ত্যজিয়া নয়ন
মেলিয়া সে চাহে যবে,—
ভনিত সে গান শত বিহঙ্গরবে ।

৩
কল্লোল তুলি' ক্ষুদ্র তটিনী
স্রুদ্রে বহিয়া যায়,
গানটি আমার যদি সে শিখিত, হায় !
উপবনে আসি' বসি' নদীকূলে
যবে দিবা-অবসানে
স্বপনে মগন থাকে সে চাহিয়া
সন্ধ্যাগগন পানে,
বুঝিত সে—নদী কি যে গায় কলতানে ।

৪
আমার এ গান পারিতাম যদি
শিখাইতে সযতনে
মন্দ মধুর বঙ্গন্ত সমীরণে !
সে যখন গৃহে থাকে আনমনে
খুলি দিয়া বাতায়ন,
গন্ধ বহিয়া আনি' সে পবন
জাগাইয়া ফুলবন,—
বেদনা আঘার করিত সে নিবেদন ।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ ।

সুরমোপত্যকা সাহিত্য-সম্মিলন

প্রথম অধিবেশন

করিমগঞ্জ

১৩১৯ বঙ্গাব্দ

সভাপতির অভিভাষণ

ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। যাঁহার প্রেরণায় বাণীর সুরমোপত্যকাসী ভক্ত এবং অনুরক্ত সেবকগণ ভগবতী ভারতীর পূজার জন্ত আজ এখানে সমবেত হইয়াছেন, আহ্নন, সকলে ভক্তিপূর্ণ একাগ্রচিত্তে এবং আশা ও উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয়ে সর্বাগ্রে সেই বিশ্বজননীর চরণে প্রণাম করি।

অভ্যর্থনা-সমিতির মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সভ্য মহোদয়গণ, সমবেত ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ এবং স্নেহাস্পদ ছাত্রগণ, আজ আপনারা যে উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ এবং তাহার ফল অতি দূরব্যাপী। আপনারা আজ যে মাতৃযজ্ঞের মহানুষ্ঠান করিতেছেন, তাহার আরম্ভ এবং ক্রমোন্নতি আছে, কিন্তু শেষ নাই। জাতীয় সাহিত্যের স্থিতি, পুষ্টি এবং উন্নতি-সাধনই আপনাদিগের উদ্দেশ্য, এবং এই সমস্তই জাতীয় স্থিতির সমকালব্যাপী। কিন্তু পুষ্টি এবং উন্নতি যতই দূরব্যাপী হউক, আরম্ভকে ছাড়িয়া দিলে কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। যে বিচার আরম্ভ ককারাদি বর্ণজ্ঞানে এবং পরিণতি বৈদ ও বেদাদ্বাদি শাস্ত্রসংক্ষেপ, ককারাদি বর্ণ ছাড়িয়া দিলে তাহার অস্তিত্বই থাকে

না। যে যত বড় এবং যত উন্নত হই হউক, আরম্ভ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। আবার আরম্ভে যে প্রণালী, যে আদর্শ, যে প্রকৃতি অবলম্বিত হইবে, পরিণতিতেও সেই প্রণালী, সেই আদর্শ, সেই প্রকৃতি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পরিণতি লাভ করিবে। উন্নতির অর্ধপথে অগ্রসর হইয়া যদি প্রণালী বা আদর্শ কিছা প্রকৃতির পরিবর্তন করিতে যাওয়া যায়, তবে সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার হইবে, আরম্ভের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব থাকিবে না, পরিণতি ত দূরের কথা। একখানি নৌকা বা একখানি গৃহ এক প্রণালীতে এবং এক আকারে নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধ সমাপ্ত না হইতেই যদি তাহার প্রণালী বা আকারের পরিবর্তন করিতে যাওয়া যায়, তবে তাহার বিরূপ ছরবছা হইতে পারে, একবার কল্পনা করিয়া দেখুন। বালকের বর্ণজ্ঞান-লাভের সময়ে যদি তাহার উচ্চারণের বিশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখা না যায়, তাহা হইলে তাহার সে দোষের আর এ জন্মে সংশোধন হয় না, ইহা আপনারা সকলেই জানেন। এই জন্ত আরম্ভটি বাহাতে বিচক্ষণ কারিকরের হাতে নির্দোষ এবং সর্বদা-সুন্দর হয়, সে বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

আপনাদিগের অদ্যকার এই জাতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, জাতীয় সাহিত্য-গঠনের আরম্ভে একজন স্থিরবুদ্ধি, ধীরস্বভাব, গম্ভীর চিন্তাশীল এবং লব্ধিসিদ্ধি সাহিত্য-সাধককে সভাপতির আসনে বসাইতে পারিলে ভাল হইত। কেবল বুদ্ধ হইলেই কেহ এ আসনের যোগ্য হয় না। আমি জানি, জানে, গান্ধীধো, উৎসাহে এবং বাগ্মতায় আমি অপেক্ষা যোগ্যতর অনেক মহাত্মাই শ্রীহৃষ্টে বর্তমান আছেন। এই আসনে তাঁহাদের কাহাকেও অদ্য বসিবার সুযোগ দিলে তাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এবং বিজ্ঞতাপূর্ণ পরামর্শ শুনিয়া এই আরম্ভের শুভ হুচনা এমন ভাবে করিতে পারিতেন, যাহাতে আপনাদের মহৎ উদ্দেশ্য কালক্রমে সুসম্পন্ন হইতে পারিত, প্রণালী বা আদর্শের বিস্তৃতি সঙ্ক্ষে ভবিষ্যতে কখনও সন্দেহ মাত্র উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। বাহা হউক যখন এই অযোগ্যকেই আপনারা যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, তখন ইহাকেই পুরোবর্তী করিয়া আপনাদের আরক মাতৃযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে।

সম্রাট এবং সম্রাট-প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ

আমাদের মহামাত্ত সম্রাট রাজ্যলাভ করিয়াই এবার ভারতে পদার্পণ করিয়া প্রজা-বাৎসল্যের নূতন নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং দিল্লীর সংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অত্যাচ্ছ বর-শাকোপ সঙ্গে বঙ্গভাষাভাষী প্রজাদিগকে এক শাসকের অধীন করিয়া রাখিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। তাঁহার ভাবতে আগমন এবং আমাদিগকে এই স্বভাবদত্ত অত্যাচ্ছ অধিকার প্রদানের উক্ত আমরা সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার দয়াবতী মহ-

ধর্ম্মণীকে সর্কাস্তঃকরণে, ধন্যবাদ প্রদান করি, এবং তাঁহাদের স্বাস্থ্যযুক্ত শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবনের জ্ঞাত এবং ভারতের প্রতি তাঁহাদের সদ্ভাবের স্থায়িত্বের জ্ঞাত জগজ্জননীর নিকট একান্তচিত্তে প্রার্থনা করি। তাঁহার যে মহামুভব ভারত-রাজপ্রতিনিধি এবং ভারত-সচিবের সুমন্ত্রণায় এই অভাবনীয় ক্ষুণ্ণগ্রহে সম্রাট ভারতকে কৃতার্থ ও পরিতপিত করিয়াছেন, সেই মহামুভব ভারতবন্ধুদিগকেও আমাদিগের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করি।

প্রান্তবাসী বাঙ্গালী

আমাদের সম্মিলনের উদ্দেশ্য সাহিত্যের চর্চা; রাজনীতির আলোচনার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সভার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রজাধর্ম্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সম্মিলন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শান্তি এবং উন্নতি, এ সমস্তই রাজার আশ্রিত। রাজদৃষ্টি এবং রাজাহুগ্রহ ব্যতীত এ সকলের কিছুই নিরাপদে তিষ্ঠিতে পার্থক্য লাভ করিতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজন হইলে ভাষা এবং সাহিত্য-চর্চার সম্মিলনকেও রাজাহুগ্রহের জ্ঞাত ভিক্ষার্থী হইতে হয়।

বিগত ১২শে চৈত্র (১লা এপ্রিল) হইতে প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর বড়ই দুঃখের দিন উপস্থিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্য যখন উপস্থিত হয় তখন সৌভাগ্যও দুর্ভাগ্যেই পরিণত হয়—“মাতৃ-জন্মাহি বৎসস্ত স্তম্ভীভবতি বন্ধনে”। যে ব্যবস্থা ভারতের জনসাধারণকে আনন্দিত করিয়াছে, যে ব্যবস্থা ১২শে চৈত্রে সম্মিলিত বঙ্গের ঘরে ঘরে হস্তময়ী দীপমালা প্রজ্জ্বলিত করিয়া কণ্ঠে কণ্ঠে সম্রাটের জয়ধ্বনি বিধোষিত করিয়াছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ব্যবস্থাই সেই

আনন্দের দিনে প্রান্তবাসী সপ্ততিলক্ষ রাজভক্ত
বঙ্গালী প্রজার গৃহকে অন্ধকারে আবৃত
রাখিয়া তাহাদেয় নয়ন হইতে শোকাশ্র-ধারা
প্রবাহিত করাইয়াছে। আজিও সেই অন্ধকার
এবং সেই অশ্রুপাত চলিতেছে, জান না কবে
তাহার নিবৃত্তি হইবে, মহামুভব বড়লাট কবে
৭০ লক্ষ বঙ্গালীর গৃহের এবং হৃদয়ের সেই
গাঢ় অন্ধকার ঘুচাইবেন, সেই বক্ষঃপ্লাবী অশ্রু
মুছাইবেন! অন্তান্ত প্রান্তবাসী বঙ্গালীর
এ সম্বন্ধে কাহার কি বলিবার আছে, কাহার
প্রাণে কিরূপ তীক্ষ্ণ শূল বিদ্ধ হইয়াছে ঠিক
জানি না; কিন্তু ত্রায়-শাস্ত্রে যুগান্তর-প্রবর্তক
রঘুনাত শিরোমণির জন্ম-স্থান, পতিত-পাবন
মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি, ভগবৎকৃপায়
জলন্ত বিশ্বাস-প্রদীপ্ত মহাপুরুষ অবৈতাচার্য্যের
বাণ্য-লীলা-নিকেতন শ্রীহট্ট, আজ বঙ্গদেশ
হইতে বিচ্ছিন্ন, ঐ সকল ভারত-বিশ্বতকীর্তি
বঙ্গালী মহাপুরুষদিগের স্বজাতীয় এবং
স্বদেশীয়েরা আজ বঙ্গালী বলিয়া পরিচয়
দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত! ব্রিটিশ
অধিকারের পূর্বে যে রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থা
প্রজাসাধারণের অবগতির জন্ত বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ
হইত, যে হেড্‌স-রাজ্যের বঙ্গভাষায় লিখিত
দণ্ডবিধি বর্তমান থাকিয়া আজও বঙ্গভাষায়
প্রাচীনতা এবং প্রভাব প্রচার করিতেছে, আজ
কি না সেই হেড্‌স-রাজ্যের বঙ্গভাষাভাবী
প্রজাবর্গ মহিমাম্বিত ব্রিটিশ জাতির অধিকারে
আসিয়া বঙ্গালী জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে
বসিয়াছে! দক্ষ-জ্ঞান ব্যতীত এ দুঃখ রাখিবার
আর স্থান কোথায়? এ দুঃখের কথা মহামান্য
মন্ত্রী এবং তাহার উদারচেতা প্রতিনিধি
ব্যতীত আর কাহার নিকট নিবেদন করিব?

কেহ কেহ বলিতেছেন, আর কাঁদিয়া
ফল কি? প্রান্তবাসী বঙ্গালীর অদৃষ্টে
যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার ওস্ত
আর বুখা আক্ষেপ এবং বুখা আন্দোলনে
কেবল মানসিক কষ্টেরই বৃদ্ধি। “যেখানে
অস্ত্রের লেখা, ব্যথা সেই খানে” এই মশ্বরুদ
ব্যবস্থা যাহাদের ভাগ্যে ঘটয়াছে, তাহারা
এই ক্রন্দন এবং এই আক্ষেপের অর্থ বুঝে,
অন্তে দূরে দাঁড়াইয়া তাহার কি বুঝিবে?
কিন্তু আমাদের ক্ষীণকণ্ঠের ক্ষীণস্বর উথিত
হইয়া আবার বাতাসেই লীন হইয়া যাইতেছে;
যাহাদের কর্ণে পৌছিতে এ দুঃখের প্রতীকার
হইতে পারিত, তাঁগদের কর্ণে আমাদের
এ ক্রন্দন এমন ভাবে পৌছিতে পারিতেছে
না। প্রান্তবাসী বঙ্গালীর এই ক্রন্দন
রাজকর্ণে পৌছিবার অন্তরায় অনেক। এই
৭০ লক্ষ অধিবাসীর বসতি একস্থানে নহে,
তাহাদের বাসস্থান একটি সক্ষীর্ণ রেখার ত্রায়
দূর-বিস্তীর্ণ বঙ্গের প্রায় তিন দিক্ ব্যাপ্ত
রহিয়াছে, স্তরাতঃ তাহার এক প্রান্তের
ক্রন্দনরোল অন্তপ্রান্তে পৌছিতে না—আপনারা
অদ্য এখানে যাহা বলিতেছেন এবং যাহা
করিতেছেন, সাঁওতাল পরগণা বা মানভূম
সিংহভূম প্রভৃতি স্থানের বঙ্গালীরা কখনও
তাহার সংবাদ পাইবেন কি না সন্দেহ।
তাহার পরে এই সকল প্রান্তবর্তী প্রদেশে
একমাত্র শ্রীহট্ট ছাড়া আর এমন একটি স্থান
নাই যাহা শিক্ষা প্রভৃতি সভ্যতার উপকরণে
বঙ্গালীর কোন জেলার সমকক্ষ হইতে
পারে। সর্বোপরি সভা-সমিতি বা সংবাদ-
পত্রাদির এমন কোন ব্যবস্থা নাই, যদ্বারা
তাহারা পরস্পরের অবস্থা এবং মনোভাব

জানিতে পারে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া একযোগে কার্য্য করিতে পারে। কর-পনের অঙ্গুলীগুলি যতদিন মূলদেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, ততদিন তাহাদের দ্বারা মূলদেহের শোভা এবং কার্য্য উভয়ই সম্পাদিত হয়; কিন্তু তাহারা যদি কখনও দৈব-দুর্বিপাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন দেহের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহার শোভা এবং কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে, পরন্তু অঙ্গুলীগুলির অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর বর্ত্তমান বিচ্ছেদে সঞ্জিলিত বঙ্গের অস্তিত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না বটে, কিন্তু এক দশমাংশ শক্তি যে কমিয়া গেল তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর এই বিচ্ছিন্ন অংশের অস্তিত্বই বা কতদিন থাকিবে—কতদিন এই বিচ্ছিন্ন অংশের অধিবাসিগণ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার অবকাশ পাইবে? এখন ইহারা শাসন-সংরক্ষণ প্রভৃতি গবর্ণমেন্ট সম্পর্কীয় সর্ববিষয়ে বাঙ্গালী জাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইল, কেবল বাঙ্গালীর মাতৃভাষাটাই ইহাদিগের বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার অবলম্বন হইয়া রহিল। ইহাও দীর্ঘকাল থাকিবে না। বৃহৎ শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্র শক্তির সংস্পর্শ হইলে বৃহৎ শক্তি ক্ষুদ্র শক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে, অধিকমাত্র জলের সঙ্গে বিন্দুমাত্র জলের যোগ করিয়া দিলে সেই বিন্দু আর ক্ষণমাত্রও আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। এই ৭০ লক্ষ বাঙ্গালী যে অল্পকাল মধ্যে আপনাদের অস্তিত্ব আসামবাসী এবং বিহারবাসীর অস্তিত্বে ডুবাইয়া দিতে বাধ্য না হইবে, এ কথা দৃঢ়তার সহিত কে বলিতে পারে? ব্যক্তিগত ভাবেই

হউক আর জাতিগত ভাবেই হউক, আপনার অস্তিত্বের বিলোপ কেহ আকাঙ্ক্ষা করে না।

আমরা আজ নৈরাশ্রের অপার সমুদ্রে পড়িয়া সস্তরণ করিতেছি। সস্তরণদ্বারা যে কূল পাইব না, তাহা আমরা জানি; কিন্তু সস্তরণ ছাড়িলে যে জীবনের আশা একেবারেই যায়, তাহা বুঝিয়াই সস্তরণ করিতে আমরা বাধ্য। মানুষ জলে পড়িয়া যতক্ষণ হাবুডুবু খায়, যতক্ষণ হস্তপদ সঞ্চালন করে, ততক্ষণই তাহার বাঁচিবার আশা, কারণ ততক্ষণই অন্নের দৃষ্টি-আকর্ষণ এবং সাহায্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সে যখন মরিয়া ফুলিয়া ঢেপ হইয়া ভাসিতে থাকে, তখন লোকে তাহাকে দেখিলেই ঘৃণায় চক্ষু ফিরায়ে, তাহাকে তুলিয়া লইবার জন্ত কেহ হস্ত প্রসারণ করে না। মানুষ বন্দুকের গুলি খাইয়া যতক্ষণ নড়ে চড়ে, যতক্ষণ হস্তপদের আক্ষেপ প্রদর্শন করে, ততক্ষণই তাহাকে বাঁচাইবার জন্ত চিকিৎসক প্রাণপণ চেষ্টা করেন, গুলি উদ্ধার করিবার জন্ত নানারূপ কৌশল অবলম্বন করেন; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার নড়া চড়া এবং খেঁচুনি থামিয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই চিকিৎসকের যত্নও থামিয়া যায়, ডোমে তাহাকে লোক-নয়নের অন্তরালে লইয়া ফেলিয়া দেয়। যাহারা আত্মরক্ষার প্রকৃতির এইরূপ বিধানের কথা অবগত আছেন, তাহারা আমাদের এই হাহতামে, এই অশ্রুপাতে, এই আক্ষেপ-উৎক্ষেপে বিরক্ত না হইয়া ভরসা করি আমাদেরকে সহানুভূতির চক্ষেই দেখিবেন, এবং যাহার যতটুকু শক্তি থাকে, আমাদের সহায়তায় তাহার প্রয়োগ করিবেন।

জাতি এবং ধর্ম, এক হইলেও কেবল ভাষার পার্থক্যই বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতিকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। যে দিন বাঙ্গালার ভাষা হইতে আমাদের ভাষা পৃথক্ হইবে, সে দিন সহস্র চেষ্টাতেও আমরা আর বাঙ্গালীর সঙ্গে এক জাতি হইয়া থাকিতে পারিব না; যাহারা স্থলভাবে দেখেন, তাঁহারা বলিবেন, যে দিন খ্রীষ্ট আসামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেইদিনই খ্রীষ্টবাসী আসামবাসী—আসামী হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। কয়েক বৎসর হইল হবিগঞ্জে কি একটা ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল, কলিকাতার কোন সংবাদপত্রের সংবাদ-স্বস্ত্রে সেই সংবাদ এইরূপে প্রকাশিত হয় যে, পূর্ববঙ্গের হবিগঞ্জে অমুক ঘটনা ঘটিয়াছে। ঘটনাটি এতই ক্ষুদ্র ও উপেক্ষণীয় যে, তাহার কিছুমাত্র আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই পূর্ববঙ্গের কোন পত্রিকায় তাহার যে প্রতিবাদ হয়, তাহার গভীর স্মৃতি আজও আমার মনে রহিয়াছে। প্রতিবাদের মর্ম এই যে, কলিকাতার সম্পাদক নিজের অজ্ঞতাবশতঃ পূর্ববঙ্গের নামে একটা সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, হবিগঞ্জ আসামে, পূর্ববঙ্গে নহে। একই কথা উপরে উপরে দেখিলে অনেক ক্ষম্যে হাসি পায়, কিন্তু আবার তলাইয়া দেখিলে তাহাতেই চক্ষের জলও আসিতে পারে।

প্রাস্তবাসী বাঙ্গালীর প্রতি হুবিধা এবং অল্পগ্রহের জন্য রাজদ্বারে কাদিবার যেরূপ অধিকার আমাদের আছে, আমরা

সেইরূপে কাদিতে থাকিবই, মহামাত্র সম্রাট পঞ্চম জর্জের মহাবর এবং মহাবাক্য আংশিক ভাবেও ব্যর্থ হইতে দিব না। যতদিন রাজার সান্নিধ্য দৃষ্টি অভিশপ্ত প্রাস্তবাসী বাঙ্গালীর উপরে নিপতিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত কম্পন, প্লাম্পন প্রভৃতি জীবনলক্ষণ আমরা কখনও ছাড়িতে পারি না। কিন্তু রাজদ্বারে প্রতীকারের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাতৃভাষার অনুরাগ এবং অনুশীলন যাহাতে শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, এখন তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, গবর্ণমেন্টের বর্তমান কার্যাবশতঃ মাতৃভাষার অনুশীলন আমাদের জাতীয় জীবন-কাটি মরণ-কাটি হইয়া উঠিয়াছে।

যুক্তবঙ্গের সঙ্গে যোগ-দক্ষ:

শিশু যতক্ষণ মাতার অঞ্চল ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ সে নিজেও নিভীক, তাহার মাতাও নিশ্চিন্ত। কিন্তু যদি কেহ কখনও সেই শিশুকে মাতার অঞ্চল হইতে কাড়িয়া লইতে যায়, তখনই প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারা যায় মাতার প্রতি শিশুর কিরূপ টান, শিশুর প্রতি মাতার কিরূপ মর্শ্চন্দ্রী আকর্ষণ। যুক্তবঙ্গ আমাদের সেই মা এবং বঙ্গভাষা আমাদের সেই মাতৃ-অঞ্চল, আমরা প্রাণপণে সেই অঞ্চলটুকু আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিয়া তারস্বরে, করুণকণ্ঠে চীৎকার করিতে থাকিব, আমরা প্রাণ থাকিতে মা এবং ভাইকে ছাড়িয়া পৃথক্ হইয়া থাকিব না, প্রতিবাসীর জাতিতে আপনার জাতিত্বকে নিমজ্জিত করিতে পারিব না। বাঙ্গালার মধ্যে বাঙ্গালীর সঙ্গে আমরা সকলের ছোট হইয়া থাকি, সেও আমাদের গৌরব; বাঙ্গালী জাতি হইতে

ভ্রষ্ট হইয়া অতের মধ্যে গোরবের উচ্চাসন লাভ করিলেও আমরা তাহাতে স্থগী হইতে পারি না, শাস্তি পাইতে পারি না।

বলিয়াছি, বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে যোগ-রক্ষার এখন আমাদের প্রধান অবলম্বন বাঙ্গালাভাষা এবং বাঙ্গালাসাহিত্য। বাস্তবিক ইহাই বর্তমানে উভয়ের মধ্যে একমাত্র বন্ধন-সূত্র। প্রাস্ত-প্রদেশে এই বন্ধন দৃঢ় করিবার পন্থা কোথায় কি অবলম্বিত হইতেছে, আমরা কিছুই জানি না, এবং জানিবার উপায়ও নাই; কিন্তু এই সুরমোপত্যকার মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা কিরূপে বর্ধিত হইতে পারে, মাতৃভাষার উন্নতি কিরূপে সাধিত হইতে পারে, যুক্তবঙ্গ এবং প্রাস্ত-বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ কি উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, আমাদের বর্তমান অবস্থায় তাহার নির্ধারণ এবং অবলম্বন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গ-ভারতীর মনীষী সেবকগণ বঙ্গীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে জাতীয় সাহিত্যিক তপস্যায় বিশেষভাবে অগ্রসর হইয়া এ পর্য্যন্ত নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাহিত্য-সভা রাজধানীর উচ্চমঞ্চে দণ্ডায়মান থাকিয়া চারিদিকে সম্বল এবং সত্ত্বক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, বঙ্গভারতীর সাহিত্য-মাত্রাজ্যের সীমারেখা কোন দিকে সঙ্কীর্ণ না হয়, তাহার প্রভাবে কোন দিকে ক্ষুণ্ণতা না ঘটে, বৃষি বা ইহাই দেখিবার জ্ঞাত দৃষ্টিকে মজাগ রাখিয়াছেন। আবার উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য পরিষৎ তারুণ্যের স্বভাব-মূলভ উৎসাহ এবং অনুরাগবশতঃ বঙ্গের

প্রাস্ত-প্রদেশকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন; পরন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া প্রতিবাসী আসামকেও নিতান্ত আপনায় করিয়া লইবার জ্ঞাত যেন ব্যগ্র হইয়াছেন। আমাদিগের প্রতি বঙ্গীয় ভ্রাতাদিগের যখন এত স্নেহ এবং এত অনুরাগ দেখা যাইতেছে, তখন আমাদের নিরাশ হইবার কোন কথা নাই, আমাদের এই মাতৃভাষা এবং জাতীয় সাহিত্যরূপ বন্ধনরজ্জুকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদিগের সঙ্গে জাতীয় উন্নতি-পথে একযোগে চলিতে পারিব।

সাহিত্যের আদর্শ

সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই যখন পতনের অবস্থা হইতে উত্থান করিতে হইবে তখন ইহার একটা পূর্ণাঙ্গ আদর্শ আমাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে স্থির রাখা উচিত। বঙ্গ-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, অনেক সাহিত্যিকই যেন বৈচিত্র্যের জুহু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য সাহিত্য যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন বৈচিত্র্য-সংযোগে তাহার সৌন্দর্য্য, মাহাত্ম্য এবং সমৃদ্ধি বর্ধিত হয়। কিন্তু আমার যেন বোধ হয়, বঙ্গ-সাহিত্যের সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কেহ কেহ বঙ্গভাষাকে ব্যাকরণের নিগড় এবং বর্ণ-বিজ্ঞানের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জ্ঞাত অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কেহ কেহ বা নিজ নিজ প্রদেশলব্ধ প্রাদেশিকতার আবর্জনা তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ভাসাকে অচল এবং অপরিচিত করিয়া তুলিতেছেন। আবার কেহ বা স্বাধীনতার ততদূর পক্ষপাতী না হইলেও ভাষার প্রসাদ-গুণকে নিতান্তই অবজ্ঞা করিতেছেন।

এই সকল লেখকের, ভাষায় এবং ভাবে কি জানি কি একটা তরলতা, একটা চঞ্চলতা, একটা অগভীরতা রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না, কাজেই বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। এই সকল লেখকের লেখা তরতর করিয়া কাণের মধ্যে কি একটা মধুরতা, একটা নালিত্য, একটা ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণ ঢালিয়া দিয়া যায় তাহা বুঝিতে পারি না, কিন্তু হৃদয় পর্য্যন্ত যে তাহা প্রবেশ করে না, হৃদয়ে যে তাহার একটা দাগ অঙ্কিত হয় না, দুই দিন পরে চেষ্টা করিলেও যে তাহা আবার স্মৃতি-পথে আনিতে পারি না, এ কথা বুঝি। বঙ্গভাষায় লিখিত অনেক স্মৃতিস্তিত স্মরণ প্রবন্ধ প্রাদেশিকতার বিবে এমনই মূর্ছিত যে, প্রাস্তবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে তাহার থাকা না থাকা তুল্য। আমার স্মরণ আছে, এক সময়ে বাঙ্গালার কোন প্রদেশে প্রায় দেড়শত বালককে মিশ্র প্রাথমিক পরীক্ষায় সরল শরীর পালনের মৌখিক পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। লেখক ছাত্রদিগকে অবস্থা বিশেষে পলতার ডাল্‌না খাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। মিশ্র প্রাথমিক পাঠশালার শিক্ষকেরা এই সকল প্রাদেশিক শব্দ বুঝেন কি না জানিবার জন্ত আমার বোঝুহল হইল, এবং বালকদিগকে ঐ দুইটি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, তথা ছুংখেরও বিষয়, দেড়শত বালকের মধ্যে একজনও ঐ দুইটি শব্দের অর্থ বলিতে পারিল না। এই সকল পরীক্ষায় বালকেরা পুস্তকের অর্থ বড় একটা বুঝে না, শিক্ষকের কথাগুলি মুখস্থ করিয়াই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। শিক্ষকেরা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই ঐ দুইটি ক্ষুদ্র শব্দকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন,

নতুবা তাঁহাদের প্রতিধ্বনিত ছাত্রদিগের নিকন্তর থাকিবার কোন কথা ছিল না। অভিধানের সংগ্রহকর্তারা সাধারণতঃ সাধু ভাষায় প্রচলিত শব্দগুলিরই সঙ্কলন করিয়া থাকেন, এবং ইহাই সুসঙ্গত। প্রতি জেলার প্রাদেশিক শব্দ যদি বাঙ্গালার অভিধানে স্থান লাভ করে, তাহা হইলে তাহা যে শব্দকল্পদ্রুমের কত গুণ বড় হইবে তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ শিক্ষকেরা অভিধান খুলিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে পলতাও পান নাই, ডাল্‌নাও পান নাই। গ্রন্থকার যদি “পলতার ডাল্‌না” না লিখিয়া “পটোল পত্রের ব্যঞ্জন” লিখিতেন, তাহা হইলে নিতান্তই যে সরলতার ব্যাঘাত ঘটিত, এমন নহে; পরন্তু তাঁহার লেখার উদ্দেশ্য সূক্ষ্ম হইত, বাঙ্গালার সর্বত্র সকলেই তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিত। আজকাল সরল লেখার একটা অর্থ হইয়াছে, সরল বর্ণের লেখা, যুক্তবর্ণের অভাব। যুক্তবর্ণ দেখিলেই অনেকে শিহরিয়া উঠেন, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিলে বালকেরা যে যুক্তবর্ণকে বড় একটা ভয় করে না, তাহা ভাবিয়া দেখেন না।

যাহা হউক, এই সকল লেখক যে পথ প্রশস্ত মনে করিলেন সেই পথেই চলিবেন, আমাদের ক্ষুদ্র চিৎকারে তাঁহারা নিরস্ত হইবেন না। কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি একটা গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে; এবং বর্তমান অবস্থায় সেই গুরুত্ব শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা বঙ্গের এক নিভৃত প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছি; বঙ্গের সকল প্রদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের সমস্ত প্রাদেশিক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারি, আমাদের সে সুযোগ বা ক্ষমতা নাই। এ

অবস্থায় যে সকল গ্রন্থ প্রাদেশিকতা-বর্জিত এবং বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় লিখিত, যে সকল গ্রন্থের ভাব কর্ণে তরল মাধুর্য্য উৎপাদন অপেক্ষা হৃদয়ে বিমল আনন্দ এবং তৃপ্তি সম্পাদনে অধিক সমর্থ, যে সকল গ্রন্থের ভাব কেবল ক্রান্তি নাহে পর্য্যবসিত না হইয়া হৃদয়ে পাষণ্ডাঙ্কবৎ স্থায়ী স্মৃতি মুদ্রিত করে, সেই রূপ গ্রন্থকেই আমাদের আদর্শ করিয়া লইতে হইবে। বৈচিত্র্যের চটকে মুগ্ধ হইয়া নানা-গ্রন্থকারের 'পশ্চাতে' দৌড়িলে আমরা কাহাকেও ধরিতে পারিব না, কাহারও গুণ আয়ত্ত করিতে পারিব না, স্মৃতরাং তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরাও ভাষায় বৃহস্পতি হইয়া পড়িব, এক এক জনে এক একটা পেচরাম প্রস্তুত করিয়া বসিব। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গ-ভাষা এবং বঙ্গ-সাহিত্য এখন আমাদের জীবন-কাঠি মরণ-কাঠি, এ সময়ে এই জীবনের সম্বলকে আমরা আমাদের, তামাসা বা খেলালের বিষয় করিতে পারি না। জীবিত কাহারও নাম লইয়া বিপন্ন হইতে চাই না; কিন্তু মৃতের নাম গ্রহণ নিরাপদ, কেননা তাঁহারা এখন ঈংসা-দেবের বাহিরে, তাহারা এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা জীবন-গঠনের জন্ত, জাতীয় অস্তিত্ব-রক্ষার জন্ত বঙ্গ-ভাষা এবং বঙ্গ-সাহিত্যকে অবলম্বন করিতে যাইতেছি, স্মৃতরাং ভাষা এবং সাহিত্যের আদর্শ অবলম্বন করিতে আমাদের বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। বিদ্যাগার, অক্ষয়কুমার এবং তারানাথ যদিও সংস্কৃতকে ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের অনুকরণ অসঙ্গত এবং হাস্য-কর হইবে, তথাপি তাঁহাদের গ্রন্থ অতি আদর

করিয়া আমাদের কাছে অধ্যয়ন করিতে হইবে। গ্রন্থপাঠ কেবল অনুকরণের জন্ত নহে, জ্ঞানের পুষ্টিসাধনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। আমি আশা করি, এই উপত্যকার শিক্ষিতদিগের মধ্যে এমন কেহই থাকিবেন না, যিনি জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, কালীপ্রসন্নের মহাভারত, হেমচন্দ্রের রামায়ণ, মধুসূদনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বৃহৎসংহার, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, তারকনাথের স্বর্ণলতা, শ্রীশচন্দ্রের শক্তি-কানন বা বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর পড়েন নাই। প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থপাঠ করিব, তাঁহাদের নিকট জ্ঞানলাভ করিবার জন্ত; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ পড়িব, তাঁহার জ্ঞান তাঁহার ভাব, এবং তাঁহার ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্ত। এই সঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তকেও বিস্মৃত হইতে পারি না। তাঁহার শতবর্ষ চিরদিনই বঙ্গীয় যুবকের চিত্তে স্বদেশ-প্রীতির উৎস উৎসারিত করিবে। কিন্তু আজিও বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গ-সাহিত্যে সম্রাটের আসনে আসীন রহিয়াছেন, কবে কোথায় এ আসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী জন্মিবেন, তাহা অনুমান করা আমাদের সাধ্যাতীত। বঙ্কিমের ভাব, ভাব, জ্ঞান এবং সর্বোপরি স্বদেশ-প্রীতি কেবল আমাদের কাণের ভিতর দিয়া তরতর করিয়া চলিয়া যায় না, কিন্তু আমাদের প্রাণের মধ্যে কিছু না, কিছু অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যায়। সহজ, সরল, অথচ বিশুদ্ধ সাধুভাষা বঙ্কিমের লেখনী-মুখে প্রসূত হইয়া আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে; এতক্ষণ কি পড়িলাম এবং কেন পড়িলাম? ইত্যাকার প্রশ্ন উদিত হইয়া আমাদের মনকে

ব্যখিত করে না। বঙ্কিমের সম্বন্ধে কেবল একটা আপত্তি এই, তাঁহার উপন্যাসের ভাষা পাঠ করিয়া তরলমতি যুবকেরা সহসা তাহার গভীর অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারে না, সুতরাং যতটা উপকৃত হইবার কথা ততটা উপকৃতও হয় না। কিন্তু বঙ্কিমের লেখা বুঝাইবার জন্ত সময়ে সময়ে অনেক শক্তিশালী লেখক লেখনী ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল সমালোচনা পাঠ করিলে যুবকদিগের পক্ষে সে আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে।

ব্যাকরণের বন্ধন হইতে ভাষাকে মুক্ত করিবার প্রয়াস আলমশ-প্রসূত একটা রোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি ভরসা করি এই উপত্যাকাবাসী কেহ এ প্রয়াসে যোগ দিবেন না। পরন্তু এ প্রদেশের বালকেরা বাল্যকাল হইতে যাহাতে ব্যাকরণে অভ্যস্ত হইয়া ভাষাকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে, আপনারা তাহার চেষ্টা করিবেন। বাঙ্গালাভাষায় শুদ্ধরূপে লিখিতে বা আলাপ করিতে যে পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, তাহা নহে; যে সে একখানা বাঙ্গালা ব্যাকরণ পড়িলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মানবীয় সকল কার্যের এবং সকল বিষয়েরই একটা কিছু বিজ্ঞান আছে। ব্যাকরণ ভাষার বিজ্ঞান। “তুমি যাও” বলি কেন, “আমি যাও” বলি না কেন, ইহার হেতুবাদ ব্যাকরণে পাওয়া যাইবে। যাহারা লেখা পড়া শিখে না, তাহারা গতানুগতির অল্পসরণ করে, কিন্তু যাহারা লেখাপড়া শিখিবার গর্ব রাখে, তাহাদের নিকট হইতে এরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা অসঙ্গত নহে।

উচ্চারণ শিক্ষা

বাঙ্গালার এক একটা জেলাকে উচ্চারণ সম্বন্ধে এক একটা প্রদেশ মনে করা যাইতে পারে। এক জেলা ছাড়িয়া অন্য জেলায় প্রবেশ করিলেই প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার এবং বর্ণগত উচ্চারণের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় যে, একটা জেলা ছাড়িয়া এখন অন্য জেলায় আসিয়াছি। নিকটবর্তী জেলায় এই পার্থক্য অতি অস্পষ্ট, বিশেষ প্রাধান্য না করিলে এ পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু একটা জেলা মধ্যে ব্যবধান রাখিলে তাহার দুই প্রান্তের দুই জেলার ভাষাগত পার্থক্য বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। বাঙ্গালার মধ্যবর্তী কোন একটা জেলাকে যদি কেন্দ্র বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কেন্দ্র হইতে যে দিকে যতদূরে যাওয়া যাইবে, সে দিকে ততই কেন্দ্রের সঙ্গে এই পার্থক্য বাড়িতে থাকিবে এবং প্রান্তপ্রদেশে যাইয়া এই পার্থক্যটা মূর্তিমান হইয়া দেখা দিবে। বঙ্গের উত্তর-পূর্ব কোণে কাছাড় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেদিনীপুর অবস্থিত। এই দুই জেলার ইতর লোকের মধ্যে যে পারিবারিক ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা কতকটা উচ্চারণের দোষে এবং কতকটা প্রাদেশিকতা-বাহুল্যে এরূপ জড়িত যে, কাছাড় এবং মেদিনীপুরের অশিক্ষিত লোকে তাহাদের পরস্পরের কথা সহজে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যদি বিশুদ্ধ সাধু বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা যায়, তাহা উভয়েই অক্লেশে বুঝিবে। সুতরাং প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে সাধু বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিবার অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ অভ্যাস এক দিনে দুই দিনে হয় না। বালকদিগকে যখন

বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন হইতেই এদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। শিক্ষকদিগের অত্যন্ত গুণ-পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কণ্ঠে উচ্চারণগত জড়তা বর্তমান আছে কি না তাহাও দেখা কর্তব্য। দেখা গিয়াছে, অনেক ইচ্ছা করিলেই বিস্কন্ধ বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে পারেন, কিন্তু অনেক স্থলে সে ভাবে আলাপ করিতে তাহারা লজ্জাবোধ করেন। এ লজ্জার অর্থ বুঝিতে পারি না। প্রাদেশিক পারিবারিক ভাষা হইতে বিস্কন্ধ সাধু ভাষা যদি উৎকৃষ্ট স্তরায় প্রার্থনীয় হয়, তবে তাহার ব্যবহারে লজ্জার কারণ কি? সাহিত্যিক ভাষার পরিচয় কাগজে কলমে এবং কথিত ভাষার পরিচয় কথাবার্তায়। কিন্তু কথাবার্তায় বিস্কন্ধ ভাষার ব্যবহার করিতে যদি লজ্জা বা আলস্য হয়, তাহা হইলে সমাজের চলিত ভাষা উন্নত হইবে কিরূপে? অবশ্য সাহিত্যে ভাষাটিক কথিত ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কথাবার্তায় সাহিত্যের গ্রাম্য গম্ভীর ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে হাস্যাম্পদ হইবারই কথা; কিন্তু তাই বলিয়া বাক্যালাপের সংস্কার কেবল যে সাধুজন-বর্জিত এবং সর্বসাধারণের অপরিচিত প্রাদেশিক ভাষারই ব্যবহার করিতে হইবে এমন কোন কথাই নাই। ব্যক্তি-বিশেষ শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, তাহার ব্যবহৃত ভাষাই তাহার পরিচায়ক। দেশ-বিদেশের ভাষা উন্নত কি অবনত, তদ্দেশবাসী জনসাধারণের কথাবার্তাই তাহার পরিচায়ক। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যেমন দিন দিন বদ্ধিত হইতেছে, তাহাদের ব্যবহৃত ভাষাও যদি সেই সঙ্গে দিন দিন উন্নত হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রাদেশিকতা যে অনেক

পরিমাণেই বিদূরিত হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ-নির্বাচন

কোন গ্রন্থের ভাষা আমাদের অনুকরণীয় কোন গ্রন্থের ভাব এবং উপদেশ আমাদের পক্ষে উপযোগী এবং মঙ্গলজনক, স্তরায় প্রার্থনীয়, তাহা অবধারণ করিবার জন্ত দেশের মধ্যে অন্ততঃ সুরমোপত্যকাতে একটা ব্যস্ততা থাকা উচিত মনে করি। গ্রন্থ বাহির হইলেই তাহার বিজ্ঞাপনের মধ্যেই সচরাচর একটা সমালোচনা বাহির হইয়া থাকে। ইহাকে বৈজ্ঞাপনিক সমালোচনা বলা যাইতে পারে। ইহাতে গ্রন্থের প্রকৃত দোষ-গুণ, প্রকৃত মূল্য, বুঝিতে পারা যায় না; স্তরায় এটি বিজ্ঞাপনের জাঁকজমকে মোহিত হইয়া অনেকে আগ্রহ সহকারে পুস্তক ক্রয় করেন। কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া অর্থব্যয় সফল হইল বলিয়া মনে করিতে পারেন না। দেশের লোকের অবস্থা এমন নহে যে সুপাঠ্য হউক আর নাই হউক বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহারা সমস্ত পুস্তকই কিনিতে পারে। এ অবস্থায় যদি এমন একটা সভাসমিতি কিছু থাকে যে, তদ্বারা নূতন পুস্তকের ভাষা ও ভাব প্রভৃতির দোষ-গুণ সর্বোপায়ে আলোচিত হয় এবং সেই সভার মত লইয়া তবে সাধারণ লোকে গ্রন্থ ক্রয় করে, তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হয়। দেশের ভাষা এবং সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলে সর্বোপায়ে সাধারণের সম্মুখে ভাষা এবং সাহিত্যের নির্দোষ আদর্শই ধরিতে হইবে। আমি ভরসা করি, আপনারা এই বিষয়টি বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এবং যদি আপনাদিগের অভিমত হয়, তাহা হইলে ভাষা

এবং ভাবের আদর্শ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের উপকারের জন্ত যাহাতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নির্মাণিত হইতে পারে, আপনারা তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

সাহিত্য-প্রচার

প্রচারের একটা আকাঙ্ক্ষা মানবহৃদয়ে বোধ হয় চিরদিনই বর্তমান আছে। অবশ্য স্থানকাল বিবেচনায় প্রচারের প্রণালীতে পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়ে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রচার্য বিষয়ের মধ্যে ধর্মই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহার পরেই রাজনীতি। ধর্ম এবং রাজনীতি প্রচারের জন্ত কত লোক খাটিতেছেন, কত অর্থ ব্যয় হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এই প্রচারকার্য্য দুই প্রণালীতে সিদ্ধ হইয়া থাকে; প্রথম বক্তৃতার দ্বারা, এবং দ্বিতীয় সাহিত্য দ্বারা। জগতে যত গ্রন্থাগার আছে, তাহা হইতে যদি ধর্ম এবং রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থগুলি গৃহক করিয়া ফেলি, তাহা হইলে মূল্যবান গ্রন্থ অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। যিনি যে বিষয় উপলব্ধি করেন, যাহার যাহা সমাজের মঙ্গলকর বলিয়া ধারণা হয়, তিনি তাহাই প্রচার করিতে ব্যগ্র হন, তবে কৃতকার্য্যতা স্বতন্ত্র কথা। জ্ঞান-প্রচারের আকাঙ্ক্ষা মানবহৃদয়ে নিত্যন্তই স্বাভাবিক; তাহার উপরে এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ, থাকাতে মণি-কাঞ্চনের যোগ হইয়াছে। ধর্মশাস্ত্র বলিয়াছেন, সংসারে যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান লাভ করিয়া পরকে তাহা দান না করে, জ্ঞানরূপী ভগবান তাহাকে দয়া করেন না। যাহা হৃদয়ের স্বাভাবিক স্পৃহা, তাহা ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদিত হইলে

তৎসম্পাদন বড়ই মধুর হইয়া উঠে। জ্ঞান-প্রচারের এই মধুর্য্য পূজাপাদ মহর্ষিগণ পূর্বাভাস উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহাদের উচ্ছিষ্টভোজী ক্ষুদ্র আমরাও সেই স্বাভাবিক পিপাসার তাড়নায় তাহাদেরই উপদেশরূপ উপাদেয় প্রসাদ মানবজাতির মধ্যে যথা-শক্তি বিতরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। কিন্তু এ বিষয়েও এতটা ব্যবস্থা, একটা উদ্যোগ, একটা প্রণালী থাকা নিত্যন্ত প্রয়োজন। একা এক ব্যক্তিও কার্য্য করে, আবার বহুলোক সমবেত হইয়াও কার্য্য করে; কিন্তু এই কাব্যের সঙ্গ এবং পরিমাণে তারতম্য কত, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাঝেই তাহা বুঝিতে পারেন। বর্তমান যুগে সাধারণের জন্ত একাকী খাটিবার প্রথা একরূপ রহিত হইয়া যাইতেছে, অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি মহৎ পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই এক পরামর্শে, এক উদ্দেশ্যে এবং এক যোগে বহুলোকের সমবেতভাবে খাটিবার প্রথা সভ্য জগতের সর্বত্র অবলম্বিত হইতেছে। সাধারণভাবে সর্বত্র, এবং বিশেষভাবে বর্তমান সময়ে এই উপত্যকায়, বাঙ্গালা-সাহিত্যালোচনার কতদূর প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি আপনারা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই উপত্যকায় উৎকৃষ্ট আদর্শ সাহিত্যের প্রচারের যে কতদূর আবশ্যিকতা, তাহা আপনারা সহজেই উপলব্ধি করিবেন। কোন্ কোন্ গ্রন্থ উৎকৃষ্ট, কোন্ গ্রন্থ কোন্ শ্রেণীর লোকের বিশেষ উপকারী, তাহা সাধারণকে কেবল বলিয়া দিলেই আপনারা কর্তব্যের পরিসমাপ্তি হইবে না, কিন্তু যাহার যে গ্রন্থের প্রয়োজন, সেই গ্রন্থ লইয়া তাহার দ্বারে উপযাচকের

তায় আপনাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে। বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লইয়া প্রচারকার্য আরম্ভ করিলে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, পরিশ্রমও সার্থক হইবে না। উদরারের জন্ত বর্তমান যুগের লোক এতই ব্যতিব্যস্ত যে, বৃহৎ গ্রন্থ পাঠের অবকাশ তাহাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে, এবং বৃহৎ গ্রন্থ ক্রয় করিবার অর্থও তাহাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে। সুতরাং বৃহৎ গ্রন্থ লইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াও তাহার অধিক ক্রেতা মিলিবে না। যে গ্রন্থ যত অধিক লোকে আদর করে, তাহার প্রচার তত অধিক পরিমাণে হইল বৃদ্ধিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার দ্বারা এই কার্য সহজে সম্পাদিত হইতে পারে। দুই চারি পয়সা, কি অন্ততঃ দুই চারি আনা মূল্যের পুস্তিকা কিনিয়া লইতে লোকের তেমন কষ্ট হয় না, উহা পড়িতেও কাহারও অবকাশের অভাব হয় না। ক্ষুদ্র পুস্তিকার মহিমা যে কত, খ্রীষ্ট-ধর্ম-প্রচারকেরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। ঐ সকল প্রচারকমণ্ডলীর কার্যবিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, তাহারা প্রতি বৎসর এক এক খণ্ড পুস্তিকার লক্ষ লক্ষ সংখ্যা মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন, এবং তাহার জন্ত লক্ষ লক্ষ রোপ্যমুদ্রা ব্যয় হইতেছে। এই কার্যের ফল কিরূপ হইতেছে, প্রত্যেক দশবারিকী লোকগণনার বিবরণ পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাদের দেশে শক্তি নাই, সে অর্থ বলও নাই; কিন্তু মানবের প্রতি আমাদের যে ভালবাসা এবং নানা দুর্দৈবের কালে আমাদের যে কষ্ট-সহিষ্ণুতা আছে, তাহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ উৎসাহ এবং সমবেত চেষ্টা যোগ করিলে আমাদের অজ্ঞাত সমস্ত

অভাবের পরিপূরণ হইতে পারে। এই সকল পুস্তিকার যথোচিত প্রচার পুস্তক-বিক্রেতার দ্বারা হইতে পারে না। পুস্তক-বিক্রেতা দোকান খুলিয়া একস্থানে বসিয়া থাকে, বিদ্যালয়ের বালকের তায় নিতান্ত দায়ে নাঠেকিলে কেহ ভাল পুস্তকের অমুসন্ধান লইতে তাহার দোকানে সচরাচর যায় না। পুস্তক লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘাইতে পারিলে বিমুখ হইয়া রিক্ত হস্তে ফিরিবার কথা নাই। বেদেনীদের দৃষ্টান্ত দেখুন। গৃহস্থের ঘরে কিছুই অভাব নাই, স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইতেছে। গৃহস্থ যে সময়ে গৃহে উপস্থিত নাই, বেদেনীরা ঠিক সেই সময়ে ছাইভস্মের পশরা মাথায় লইয়া ডাক হাঁক ছাড়িতে ছাড়িতে গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হয়, এবং গৃহিনীদিগকে সেই ছাইভস্মে সম্বলিত করিয়া অনায়াসে প্রতি গৃহস্থের গৃহ হইতে দুই চারি আনা লইয়া চলিয়া যায়। যদি বেদেনীর ছাইভস্মে এত আদর হইতে পারে, তাহা হইলে আপনারা যে অমূল্য ভালবাসার সঙ্গে অমূল্য জ্ঞানের খনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা লইয়া গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইবেন, তাহার কি অনাদর হইবে? কখনই না।

ধর্মপ্রচারই হউক, আর সাহিত্যপ্রচারই হউক, পেট বাঁধিয়া—উপবাস থাকিয়া কেহ কিছু করিতে পারে না, সুতরাং আমাদের যুবকেরা যে বিনা অঙ্গে পেটকে বুঝাইয়া সাহিত্য-প্রচারের জন্ত খাটিতে পারিবেন, এমন আশাই করা যায় না। কিন্তু এই কার্য ব্যবসায়ের ত্রিসাবে অনায়াসে করা যাইতে পারে। গ্রন্থকারেরা এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিবেন, এবং প্রাপ্ত

সভা-সমিতি ঐ সকল পুস্তিকার ভাষা, বিষয় ও উপযোগিতা বিচার করিয়া দেখিবেন। পুস্তিকা তাঁহাদের অভিমত হইলে প্রত্যেক উপবিভাগে কয়েক জন নির্দিষ্ট যুবক তাহার প্রচারের ভার লইবেন। গ্রন্থকারেরা গ্রন্থবিক্রেতাদিগকে যে কমিশন বা দস্তুরী দিয়া থাকেন, সেই দস্তুরী এই সকল যুবককে তাঁহারা অনায়াসেই দিতে পারেন। ইহাতে গ্রন্থকার এবং বিক্রেতা উভয়েরই উৎসাহিত হইবার কথা; বরং এমনও আশা করা যায় যে, লেখকেরা ধনাগমের দিকে তেমন দৃষ্টি না রাখিয়া প্রচার-সৌকর্য্যার্থ এই সকল পুস্তিকার মূল্য যতদূর সম্ভব অল্প করিয়াই নির্ধারণ করিবেন।

পুস্তকালয়

ক্ষুদ্র পুস্তিকা কিনিতে কষ্ট হয় না। পড়িবার অবসর পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে অত্যন্ত দিতে পারা যায়। এক সময় হারাইয়া গেলেও কষ্ট হয় না; কিন্তু বড় গ্রন্থ সম্বন্ধে সে কথা পাটে না। একখানা বড় গ্রন্থ পড়িতে অনেক সময় লাগে, তাহা কিনিতে অধিক অর্থ লাগে, স্মরণার্থ সচরাচর তাহা দান করা পোষায় না। আবার হারাইয়া গেলেও কষ্ট হয়। অথচ সাহিত্যে বড় বড় গ্রন্থেরও বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে, চুটকি পুস্তিকায় সে প্রয়োজন কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্য গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহাতে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের বড় বড় গ্রন্থ সংগ্রহ করা কর্তব্য। পুস্তকালয়ের নাম শুনিলে অনেকে ভীত হইতে পারেন। বড় বড় নগরে সহস্র সহস্র টাকা খরচ করিয়া সে পুস্তকালয় স্থাপন করা যায়, তাহাতেই যখন পুস্তকের অভাব দূর হয় না, পাঠকের পাঠস্পৃহা

পরিতৃপ্ত হয় না, তখন ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসীদিগকে পুস্তকালয় স্থাপনের উপদেশ দেওয়া উপহাস করা মাত্র। কিন্তু আমি বলিতেছি, গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় স্থাপন উপহাসের বিষয় নহে, অসম্ভব কথা নহে। যে ক্ষুদ্র গ্রামে দুই চারি জন মাত্র শিক্ষিত ভদ্রলোক থাকেন, সেই গ্রামের জন্ত তাঁহাদের গ্রন্থগুলি আগে চিহ্নিত করিয়া যদি একটা নিরাপদ কুঠারীতে রাখা যায়, তাহা হইলে সেই গ্রামে পুস্তকালয় হইয়া গেল মনে করা যাইতে পারে। কালী সিংহের মহাভারত, হেমচন্দ্রের রামায়ণ প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থ ঘরে ঘরে না থাকুক, অনুসন্ধান করিলে হয় ত প্রায় গ্রামেই এক খানা দুই খানা পাওয়া যাইতে পারে। ইহার পরে প্রাপ্তকৃত্ত সমিতির অনুমোদিত বড় বড় গ্রন্থ অর্থ সংগ্রহ দ্বারাও ক্রয় করা যাইতে পারে। গৃহস্থবিশেষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এক পয়সা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিবার জন্ত যদি গ্রামে গ্রামে একজন দুইজন করিয়া ভদ্রলোক প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সভার অনুমোদিত নতুন নতুন বড় বড় গ্রন্থ পুস্তকালয়ে সংগ্রহ করাও কঠিন হইবে না। বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডার এখনও এমন সমৃদ্ধ হয় নাই যে, একটুকু বহু করিলেই তাহার সমস্ত উৎকৃষ্ট পুস্তক পাওয়া না যাইতে পারে। কয়েক বৎসর অতীত হইল একটি বন্ধু আমার নিকটে ৫০০ শত টাকা মূল্যের বাঙ্গালা উৎকৃষ্ট গ্রন্থের একটা তালিকা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দেওয়া আমার শক্তিতে কুলায় নাই। আমার বোধ হয়, খুব বিবেচনার সহিত গ্রন্থগুলি দেখিয়া শুনিয়া কিনিলে ২০০ শত টাকার মধ্যেই

বাস্তালা পুস্তকের একটা উল্লেখযোগ্য পুস্তকালয় হইতে পারে। উদ্যোগী লোক থাকিলে এক বৎসরে না হউক, অন্ততঃ ৫ বৎসরে যে কোন গ্রামে এই ২০০ টাকা সংগ্রহ হইতে পারে। প্রয়োজন বুঝিতে না পারিলে ২ টাকা ব্যয় করাও অপব্যয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দেশের সুখ, সুবিধা এবং উন্নতি সম্বন্ধে সাহিত্যের উপযোগিতা লোকে যদি বুঝিতে পারে, তাহা হইলে পুস্তকালয়ের জন্ম ২০০ শত টাকা ব্যয় অতি দরিদ্র গ্রামও সার্থক মনে করিবে। কিরূপে পুস্তকালয়টি নিরাপদ থাকিবে, কি করিলে গ্রন্থগুলি বিনষ্ট বা অপহৃত হইবে না, কি নিয়মে সকলে ঐ সকল গ্রন্থ লইয়া পড়িয়া ফিরাইয়া দিলে পুস্তকালয়ের অপচয় হইবে না, অথচ লোকের জ্ঞান-ভাণ্ডার বিস্তৃতি লাভ করিবে, পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতাগণই তাহা অবধারণ করিবেন, সে বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় করিয়া সময় হরণ করা নিম্প্রয়োজন।

সাহিত্য-চর্চার ফল

কোন গণিতবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“হোমরের নামে সকলেই পাগল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, হোমর কি প্রমাণ করিয়াছেন?” ইহার উত্তরে হীরন্ নামক একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন “হোমর যদি সমগ্র গ্রীকজাতির বন্ধন-রজ্জুস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে সুখ, সমৃদ্ধি ও সভ্যতার দিকে অগ্রসর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যথেষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন”। আমাদের দেশের কোন পণ্ডিত কাব্যশাস্ত্রকে ভবরোগের সুখসেবা ঔষধের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ধর্মসাধন সাধারণ লোকের পক্ষে তিস্ত, কিন্তু কাব্যচর্চা করিলে স্নিগ্ধ রস-উপভোগের

সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসাধন হইয়া যায়। পণ্ডিতেরা কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সাধারণ সাহিত্য সম্বন্ধে সেই কথাই অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। এক গুরু শিষ্য, এক দেবতার উপাসক, এক গ্রন্থের পাঠক প্রায় একই স্বভাব সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের চিন্তা, বাক্য এবং কার্য প্রায় একই প্রকৃতির হইয়া থাকে, একই খাতে চলিয়া থাকে। ইংলণ্ডে যে সময়ে মধ্যযুগের অবসান হইয়া নব্যযুগের আরম্ভ হইল, বাইবেলের অনুবাদ পাঠ করিয়া ইংলণ্ডবাসী আবালবৃদ্ধ জীপুরুষের ভাব, চিন্তা, আবেগ এবং আদর্শ একই প্রকৃতির হইয়া দাঁড়াইল, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া ইতিহাস-লেখক বলিয়াছেন, “England became the land of a book and that book was the Bible.” অর্থাৎ সমগ্র ইংলণ্ড তখন একখানি মাত্র গ্রন্থের প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিল, সেই গ্রন্থখানি বাইবেল। বাস্তবিক মনুষ্যসমাজে সঙ্গ্রহের প্রভাব যে কতদূর গভীর এবং কতদূর বিস্তৃত, বর্ণনায় কেহ তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। যে জানে জীব-জগতের মধ্যে মানবের অব্যাহত প্রভুত্ব, সাহিত্য তাহার সেই জ্ঞান-ভাণ্ডার। যে দেশের সাহিত্য যত উন্নত এবং বিস্তৃত, আর যে দেশের লোক সেই সাহিত্যের প্রতি যত অনুরক্ত, জগতে সেই দেশ এবং সেই জাতি তত সুখী, তত উন্নত এবং তত প্রভাবশালী—এ, কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য দূরে যাইবার প্রয়োজন হইবে না, এই ভারতবর্ষেই, আমাদের অতি নিকটেই, যাহাদের একটা সাহিত্য আছে, আর যাহাদের কোন প্রকার সাহিত্য নাই, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, চারিদিকে

একবার দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। জ্ঞান, ধর্ম, ঐশ্বর্য, শক্তি প্রভৃতি মানবের স্বত্বের, মহত্বের এবং গৌরবের যে কিছু উপাদান আছে, তাহার জন্ম মানব-সমাজ এই সাহিত্যের নিকটেই ধ্বনিত।

এই সকল সাহিত্যচর্চার প্রত্যক্ষ মুখ্যফল। কিন্তু ইহা ছাড়া গৌণফল যে কত আছে তাহার অবধি নাই। হুই একটার উল্লেখ করা অগ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের পল্লীগ্রামগুলি এক সময়ে সৌহার্দ্য, শান্তি এবং আনন্দের রঙ্গভূমি ছিল। পাশ্চাত্যদিগের ভাষায় যাহাকে জীবন-যুদ্ধ বলে, তাহার বাতাস তখন আমাদিগের পল্লীগ্রামকে স্পর্শ করে নাই। তখন অল্প আয়াসে জীবিকার সংস্থান হইত, স্নখ-ভোগের অল্প উপকরণে লোকের সন্তোষ জন্মিত এবং স্বান, পূজা, আহার, নিদ্রা সম্পাদন করিয়া যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকিত, লোকে তাহা গান-বাঁজের বিশুদ্ধ আমোদে, অথবা রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদির শ্রবণ-কীর্তনে অতিবাহিত করিত। এখন পূজাতে আর সময় নষ্ট হয় না, স্বচ্ছন্দে স্বান আহার এবং নিদ্রা করিয়াও প্রচুর সময় অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু এই অবশিষ্ট সময়ের ব্যবহার পূর্বে যে রূপে হইত, এখন সে রূপে হইতে পারে না; এখন বিবাদ-বিসংবাদ, মামলা-মোকদ্দমা, পরনিন্দা-পরচর্চা এবং গ্রাম্যদলাদলি সেই বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ এবং সাহিত্য-চর্চার স্থান অধিকার করিয়াছে। সাহিত্য-চর্চার ফলে, অর্থাৎ সর্বদা রামায়ণীয় এবং মহাভারতীয় কথার আলোচনায় মনে যে সকল সদ্ভাবের উদ্বেক হইত, তদ্বারা মানবের চরিত্র উন্নত হইত এবং পরস্পরের স্নখ-দুঃখে ও সম্পদ-

বিপদে, পরস্পরের অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সহায়তায় সেই উন্নতি, সেই সামাজিক সৌভাগ্য প্রকাশ পাইত। নিন্দাচর্চা, মামলা-মোকদ্দমা, ঈর্ষা-নিন্দা এবং দলাদলির বৈরনির্যাতনে যাহাদের চিত্ত সর্বদা আন্দোলিত, তাহাদের হৃদয়ে সেই সকল দেবভাব কেমন করিয়া স্থান পাইবে, নারকীয় দুর্গন্ধের মধ্যে মানবীয় সদ্ভাবরূপ স্বর্গীয় কুসুম কিরূপে বিকশিত হইবে? এই সকল কারণে বঙ্গের পল্লীগুলি এখন আর সেই নন্দন-কাননের শোভা ধারণ করে না, এখন সেগুলি শ্মশানের চিত্র, পিশাচের বিলাস-ভূমি, নরকের অভিনয় ক্ষেত্র। কিন্তু এখনও যদি আপনারা পল্লীগ্রামের মঙ্গল-সাধনে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত অগ্রসর হন, এখনও যদি সাহিত্যের দিকে পল্লীবাসীর অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের পল্লীগুলি আবার সেই নন্দনকাননের শোভা ধারণ করিবে, আবার ইহা আমাদের চতুর্দর্শ-সাধনের নিরুপদ্রব পবিত্র ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে।

যে সকল বালক-বালিকা যেরূপ সমাজে প্রতিপালিত হয়, তাহারা সেইরূপ সমাজের উপাদানে আপনাদিগের চরিত্র গঠন করে। যে সকল শিশু সন্তান হিংসা-নিন্দা, ঝগড়া-বিবাদ, জন্মাবধি প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহারা যৌবনে বা বার্কক্যে সাধু সদাচারী পবিত্র এবং সদ্ভাবসম্পন্ন হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা বাতুলতা। দেশের মানুষ-গুলিকে যদি পবিত্র-চরিত্র, পরার্থ পর, সদ্ভাব-সম্পন্ন এবং প্রীতি-পরায়ণ দেগিতে চাহেন, তাহা হইলে শিশুগণ যে গ্রামের যে সমাজে প্রতিপালিত হইবে, সেই গ্রাম এবং সেই সমাজকে সেইরূপ মানুষ গঠিত করিবার উপ-

যুক্ত যন্ত্র করুন। মানুষকে মারিয়া পিটিয়া বা উপদেশ দিয়া ভাল করা যায় না, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে এবং শিক্ষিতসমাজে প্রত্যক্ষ হইতেছে। মানুষের চরিত্রগঠন যন্ত্রের সাহায্যে বা বলের সাহায্যে হয় না ; অল্পকূল ক্ষেত্রে অল্পকূল ঋতুতে উপযুক্ত রূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে যেমন রস-বাত-তাপাদির মহায়তায় আশানুরূপ শস্য জন্মে, সেইরূপ পল্লীগ্রাম এবং পল্লী-সমাজকে আদর্শের অনুকূলভাবে প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে বালকবালিকাদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা সেই আদর্শের অনুরূপ হইবেই হইবে। আমার এ কথার কেহ উপহাস করিতেছেন কি না জানি না, কিন্তু আমার ঐক্য বিশ্বাস, দেশে সাহিত্যের চর্চা বর্দ্ধিত করিলে, গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় স্থাপন, সদগ্রন্থের সংগ্রহ এবং তৎপাঠে সাধারণের আগ্রহ জন্মাইতে পারিলে আমাদের পল্লীর অবস্থা বাস্তবিকই নন্দনকাননের অনুরূপ হইবে, এবং তাহাতে যে সকল নরশিশু জাত ও প্রতিপালিত হইবে, তাহারা ভবিষ্যতে আপন আপন চরিত্রে নিশ্চয়ই দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে।

মহিলাদিগের সহায়তা

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা পুরুষদিগকে উপলক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল পুরুষদিগের দ্বারা এই স্তম্ভহং কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না। পুরুষেরা সভা-সমিতি স্থাপন করিতে পারেন, গ্রন্থ নির্বাচন করিতে পারেন, গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন, টান দিয়া গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন ; কিন্তু শিশুকে শিক্ষা দিবার ভার, শিশুকে

আদর্শের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার রমণীদিগের হাতে। প্রাথমিক অবস্থায় জননীই শিশুর দাত্ত্রী, শিক্ষয়িত্রী এবং উপদেশদাত্ত্রী। সেই সময়ে জননী যদি শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দিকে তুল্যরূপে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে শিক্ষিত এবং গঠিত করিতে পারেন, তবেই একদিন শিশুর আদর্শচরিত্র লাভের সম্ভাবনা থাকে ; নতুবা প্রথম অবস্থায় ধরিয়াই যদি তিনি শিশুটির চরিত্রকে অঁকাবাঁকা করিয়া কুৎসিতভাবে গড়িয়া ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে সে শিশুর পক্ষে সহস্র চেষ্টাতেও আর সেই আদর্শের অনুরূপ সহজ, সরল, নির্মল, উন্নত চরিত্র লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। কোন্ দেশের মানুষগুলি কিরূপ, সেই দেশের শিশুদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থা দেখিলেই তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা বিস্তুত করিতে হইলে সর্বত্রই রমণীদিগের সহানুভূতি এবং সাহচর্য্যের প্রয়োজন। এই সাহচর্য্য কেবল ইচ্ছা, যত্ন বা অনুরাগ থাকিলেই হয় না। শিশুর সর্ববিধ শিক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিতে হইলে শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব এবং অধ্যাত্মতত্ত্বে জ্ঞান থাকা চাই। কিন্তু সে নিতান্ত সহজ কথা নহে। আমাদের সমাজের কথার কাজ কি, যে সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার বহুল বিস্তার হইয়াছে, সে সমাজেও অধিকাংশ গৃহে একরূপ জননীর নিতান্ত অভাব। স্নেহের বিষয়, আমাদের রামায়ণ এবং মহাভারত যেভাবে লিখিত, তাহাতে নীতিতত্ত্ব এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে অধ্যয়ন না করিলেও ঐ সকল গ্রন্থ কেবল কাব্যের মত পড়িয়া গেলেই নীতিতত্ত্ব

ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব অনায়ত্ত থাকে না। অবশিষ্ট রহিল শারীরতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব। এই দুই বিষয়ের যথাযথ অধ্যয়ন আমাদের মহিলা-দিগের বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে; ভবিষ্যতে কখনও সম্ভব হইবে কি না তাহা ভবিষ্যৎ জানে। কিন্তু যঁাহারা গ্রন্থ নির্কীচনের ভার লইবেন, তাঁহারা যদি বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া এই সকল বিষয়ে, পুরনারীদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থ বাছিয়া বাহির করিতে পারেন ভালই; যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে ঐ সকল বিষয়ে মহিলা-দিগের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করা তাঁহাদিগের কর্তব্য হইবে। এইরূপ স্বব্যবস্থার ফলে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় লিপিত ভাব-শুদ্ধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থলাভ করিয়া আমাদের মহিলাগণ যদি একদিকে নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়া অত্মদিকে সতর্ক ভাবে শিশুর শিক্ষা চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে অচিরেই আমাদের এই উপত্যকা ভাষার বিশুদ্ধি, ভাবের উৎকর্ষ এবং জ্ঞানের বিস্তার ও উন্নতি লাভ করিয়া অচিরেই ধ্বংস হইতে পারে। সমাজের এই সুন্দর আনন্দ-জনক চিত্র আজ কল্পনার বিষয় রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের উৎসাহী যুবকেরা যদি সূদৃঢ় সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায় সহকারে এই কার্য্যকে একটা মহাব্রত মনে করিয়া ইহার সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আজ যাহা কল্পনা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহাদের জীবিত কালের মধ্যেই তাহা বাস্তবে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। সাহিত্য-সেবার উপরে জীবিকার জ্ঞান নির্ভর করিতে কাহাকেও উপদেশ দেই না। গ্রন্থ-বিক্রেতার ব্যবসায় লাভজনক হইলেও গ্রন্থকারের দারিদ্র্য জগতে

চিত্র-প্রসিদ্ধ। যিনি প্রকৃতির তাড়নায় এই দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহার কথা স্মরণ; কিন্তু দেশের সম্বলের জ্ঞান সাহিত্যের সেবা, পরিচর্যা এবং প্রচারে যঁাহারা আত্মশক্তির প্রয়োগ করিবেন, তাঁহারা জীবিকার জ্ঞান অল্প একটা না একটা কিছু অবলম্বন করেন, এই আমার অনুরোধ। এই উপত্যকাবাসী শিক্ষিত যুবকেরা জীবিকার জ্ঞান যিনি যে পন্থাই অবলম্বন করুন, সাহিত্যের অমুরাগ তিনি ছাড়িবেন না, সাহিত্যের উপর হইতে তাঁহার সান্নিধ্য দৃষ্টি সরাইয়া লইবেন না, ইহাই আমার আশা।

কয়েক মাস পূর্বে করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত “প্রভাত” নামক পাক্ষিক পত্রিকায় শ্রীহট্টবাসী জনৈক যুবকের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই পত্রখানি পড়িয়া আমি এই বার্তিকোণে যেন যৌবনের উৎসাহ অনুভব করিয়াছিলাম। ঐ পত্রের লেখক কে, এবং তিনি এই সভায় উপস্থিত আছেন কি না, জানি না। কিন্তু সেই পত্রখানিতে তিনি যে উচ্চম-উৎসাহ, যে আশা-ভরসা, যে স্বদেশ-প্রীতি ও গৌরব-লিপ্সার আভাষ দিয়াছেন, তাহা আজও আমার অন্তঃকরণকে যেন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার সহকারী কয়েকটি বন্ধু নানা ভাষায় নানা বিধা শিক্ষা করিয়া ঐ সকল ভাষার সম্পদরাশি আহরণপূর্বক মাতৃভূমিকে গৌরব গণ্ডিত করিবেন। ভরসা করি, আজিও তাঁহারা সে সঙ্কল্প বিশ্বস্ত হন নাই, সে অধ্যবসায় পরিত্যাগ করেন নাই।

এই সকল যুবক যখন দেশের হিতে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া সঙ্কল্পিত ব্রত পালনের জন্ত কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, তখন তাঁহাদিগের অল্পসাহসী ভ্রাতারাও আর ঘরে বসিয়া থাকা সম্ভব মনে করিবেন না, অন্ততঃ লজ্জার পাতিরেও তাঁহাদিগের অধিক অগ্রসর ভ্রাতাদিগের সঙ্গে যোগ দিবেন। আপনারা সমগ্র বঙ্গের জন্ত পাটিতে না যাইয়া যে এই ক্ষুদ্র উপত্যকাতেই আমাদের কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন, ইহা বড়ই মঙ্গলের কথা। ইহাতে কার্য্য করিবার বিশেষ স্তবিধা হইবে এবং কার্য্যের পরিমাণও বেশী দেখাইতে পারিবেন। 'সমস্ত বঙ্গের তুলনায় আপনারদের সংখ্যা এবং কার্য্যকরী শক্তি নিতান্তই ক্ষুদ্র ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র উপত্যকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যদি আপনারা কার্য্য করেন, তাহা হইলে কার্য্যটি ঠিক শক্তির অনুরূপই হইবে, স্তবরাং কার্য্য করিয়া যেমন স্বপ্ন পাইবেন, সেইরূপ ফলও পাইবেন।

বঙ্গভূমির সঙ্গে যোগরক্ষা

আপনাদের উপত্যকাতে স্থায়ী বা সাময়িক ভাবে যে কোন সাহিত্যিক অনুষ্ঠান হউক, মূল বঙ্গদেশের সঙ্গে তাহার যোগ রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য! আমি জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি খ্রীহটে একটি স্থায়ী সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি এই সংবাদে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া আর একজন বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিয়াছি, এবং উপত্যকাবাসী মাত্রেই এই সভার সভ্য হউন আর নাই হউন, ইহার কার্য্যকলাপে যোগ দিয়া পাটিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ

করিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য বিষয়ক সভা-সমিতির শীর্ষস্থানীয় মনে করা যাইতে পারে, স্তবরাং ইহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই বঙ্গদেশীয় অত্যাঁজ সমস্ত সাহিত্য-বিষয়ক সভা-সমিতির সঙ্গে যোগ রহিল বলিয়া মনে করা অত্যাঁজ নহে। বঙ্গদেশে জেলায় জেলায় এইরূপ সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বাধীনভাবে স্ব স্ব জেলার জন্ত কার্য্য করিবে, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সর্বোপরি অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত সাহিত্যিক সভা-সমিতির যোগসূত্র এবং নিয়ামকরূপে বর্তমান থাকিবেন। এইরূপ ব্যবস্থাই আমার নিকট নিতান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালী আজিও বিষয়-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সকলে একযোগে কার্য্য করিবার তেমন পরিচয় দিতে পারেন নাই ; আমাদের আশা, অন্ততঃ সাহিত্য-বিভাগে এক উদ্দেশ্যে এবং এক যোগে কার্য্য করিয়া বাঙ্গালী আপন জাতীয় একতার প্রমাণ দেখাইবেন। আপনাদিগের মধ্যে যখন কোন সাহিত্যিক উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে, তখন আপনারা বঙ্গের সাহিত্যিকদিগকে সাদরে ও সাহসাদে নিমন্ত্রণ করিবেন, এবং বঙ্গদেশে যখন এই শ্রেণীর কোন অনুষ্ঠান হইবে, তখন, আমি ভরসা করি, আপনারাও সেইরূপ নিমন্ত্রণ পাইবেন। এইরূপ পরস্পরের যাতায়াত, আলাপ-আপ্যায়ন, এবং পরস্পরের সঙ্গে হৃদয়ের ভাব-বিনিময় রক্ষা করা সর্বকালেই বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়; বিশেষতঃ এই বিচ্ছেদের দিনে, সুরমা-উপত্যকার এই ছদ্মদিনে সেই প্রয়োজন শতগুণে বদ্ধিত হইয়াছে। আপনারা মনে করিবেন না যে, এই বিচ্ছেদ-ব্যাপারে কেবল আপনারাই

ব্যথিত হইয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে পরকর্তৃক বিচ্ছেদ ঘটিলে স্নেহশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতা বরূপ ব্যথিত হন, আজ প্রান্তবাসী বাঙ্গালীকে বিচ্ছিন্ন দেখিয়া সমগ্র বাঙ্গালীজাতি সেইরূপ ব্যথিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের বহুস্থানে আমার সর্বদা যাতায়াত আছে, বহু বাঙ্গালীর সঙ্গে আমার প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং আমাদের সঙ্গে এই শাসন-বিষয়ক বিচ্ছেদে তাঁহারা কিরূপ ব্যথিত হইয়াছেন, আমার তাহা অবগত হইবার বিলক্ষণ সুযোগ রহিয়াছে। বাঙ্গালার সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আপনারাও ইহার পরিচয় পাইতেছেন; তবে যে আন্দোলনের তেমন তীব্রতা প্রত্যক্ষ করিতেছেন না, তাহার কারণ, আমাদের ঞ্চায় তাঁহাদেরও বিশ্বাস আছে, মহামনা পঞ্চম জর্জের রাজত্বে, মহানুভব লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন কালে, ৭০ লক্ষ নিরপরাধ রাজভক্ত বাঙ্গালী প্রজার এই নিরর্থক নিগ্রহ, এই নিকার জনদয়-ক্ষত কখনও স্থায়ী হইবে না। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, বঙ্গবাসী বাঙ্গালীর সঙ্গে প্রান্তবাসী বাঙ্গালীর আত্মীয়তা এবং ঘনিষ্ঠতা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্ত আপনারা যে কোন সঙ্গত এবং বৈধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, আপনারা তাহাতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পূর্ণমাত্রা সহানুভূতি এবং সহযোগিতা পাইবেন।

• সাহিত্যের ইতিহাস

আপনারা যখন সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন সাহিত্যের ইতিহাসকে আপনারা উপেক্ষা করিতে পারেন না। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য এবং তাহার

ইতিহাস আলোচনা করা যে আপনারদের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজীয়, এ কথা বলিবার আবশ্যকতা দেখি না। কিন্তু কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইল না। আপনারদের অনেকেই ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত; যাহারা বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, ইংরাজীতে তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা প্রায়ই দেখা যায় না। যাহারা মাতৃভাষায় সাহিত্য-সেবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন ইংরাজ, ফরাসী, জার্মান, জাপানী প্রভৃতি জগতের উন্নত জাতিদিগের সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিতে বিমুগ্ধ না হন। ঐ সকল জাতি কিরূপে বর্তমান সভ্যতার উচ্চতমকে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাসের ঞ্চায় তাঁহাদের সাহিত্যের ইতিহাসেও তাহার আভাস, তাহার মূলস্থত্র দেখিতে পাইবেন। এ জন্ত ঐ সকল জাতির ভাষা এবং সাহিত্য-সমৃদ্ধে অবগাহন না করিলেও কার্য্যসাম্প্রদিক হইতে পারিবে, অনুসন্ধান করিলে ইংরাজী ভাষাতেই ঐ সকল উন্নত জাতির সাহিত্যের ইতিহাস দেখিতে পাইবেন।

অনুবাদ

দেশের ভাষা এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে গেলে অনুবাদ অনিবার্য্য। জগতের যে দেশে যে জাতির মধ্যে যে বিষয়ে যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র মানবজাতির অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে, সমস্ত মানব-মণ্ডলী তাহার ফল উপভোগ করিতেছে। বাঙ্গালী যান এবং তাড়িতবার্তা আমাদের দেশের, আমাদের জাতির কেহ আবিষ্কার করে নাই;

কিন্তু বিদেশীর আবিষ্কৃত সেই সম্পদ হুদূর ভারতের হুদূর বঙ্গের এক নিভৃত কোণে থাকিয়া আমরাও তুল্যরূপে উপভোগ করিতেছি। জড়জগতের উন্নতি সম্বন্ধে যে কথা অন্তর্জগতের উন্নতি সম্বন্ধেও সেই কথা। কিন্তু সেই উন্নতি আয়ত্ত করিবার প্রণালী স্বতন্ত্র। বাস্পীয়মান এবং তাড়িতবাহিত্য পাইবার জন্ত আমাদিগকে ভাবিতে হয় নাই, পয়সার লোভে বা কার্যের সুবিধায় যে গরজ মনে করিয়াছে, সে ঐগুলি বিনা প্রার্থনায় আনিয়া আমাদিগের দ্বারে উপস্থিত করিয়াছে। ঐগুলি এখন আমাদের দেশের সম্পদ, জাতীয় সম্পদ, কেননা আমরা সকলেই তুল্যরূপে ঐ সকলের সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেছি। যাহা ভোগ করিবার অধিকার বা সুবিধা তুল্যরূপ নহে, তাহাকে জাতীয় সম্পদ বলিতে পারি না। সাহিত্যকে তখনই প্রকৃত জাতীয় সম্পদ বলিতে পারিব, যখন তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ এবং অধিকার জাতীয় আপামর সাধারণ সকলের তুল্যরূপ হইবে। বাস্পীয়মান এবং তাড়িতবাহিত্য এদেশে যে ভাবে আসিয়াছে, ইংরাজের সাহিত্য-সম্পদ, সাহিত্যের ইতিহাস সে ভাবে আসিতে পারে না। দেশে সে সম্পদ আনিতে হইলে অনুবাদ দ্বারা মাতৃভাষার ভিতর দিয়া তাহাকে আনিতে হইবে, তবে তাহাতে সকলের অধিকার জন্মিবে, সকলে তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ পাইবে। সত্য বটে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার গুণে এখন আপনারা অনেকেই সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইতেছেন; কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঐ সকল উপায়ে গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া স্বজাতীয় সর্বসাধারণের দ্বারে উপস্থিত করিতে না

পারিতেছেন, সে পর্য্যন্ত সে সম্পদ আপনারদের জাতীয় সম্পদ নহে, আপনারদের দেহ-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রভাব এবং অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। যে ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্ত, সে সাহিত্যের চিত্র, সৌন্দর্য্য এবং প্রভাব উপলব্ধি করিবার জন্ত আপনারা বাল্যকাল হইতে এত যত্ন পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, এত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, তদ্বারা যদি স্বজাতির উন্নতি করিতে না পারিলেন, সেই কষ্টোপার্জিত সম্পদ যদি স্বজাতিকে উপহার দিতে না পারিলেন, তাহা হইলে আপনারদের সেই কষ্ট, সেই জ্ঞান, সেই আহৃত সম্পদ সার্থক হইল, কেমন করিয়া বলিব?

হিন্দু-মুসলমান

মাতৃভাষার এবং মাতৃভাষার সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এবং অধিকার এক। বাস্তবিক এ ক্ষেত্রে কাহারও স্বার্থ বা অধিকারের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। এখানে উচ্চ-নীচ, জ্ঞী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সমান স্বার্থ, সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ। পণ্ডিত এবং মূর্খেরও অধিকার এবং স্বার্থ এক, তবে ভাষার বিশুদ্ধি-সাধনে এবং সাহিত্যের উন্নতিবিধানে পণ্ডিতের অর্থাৎ শিক্ষিতের যে পরিমাণ সুযোগ আছে, মূর্খের সে পরিমাণ সুযোগ নাই, এইমাত্র প্রভেদ।

হিন্দুর আয় অনেক মুসলমানও, বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ অনেক মুসলমান গ্রন্থকারের গ্রন্থ-বিবরণ ও জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমাদের

ধর্মবাদ-ভাজন হইয়াছেন। কতিপয় মুসলমান যুবকের মধুর কবিতা পাঠ করিলে কাহার হৃদয়ে স্বদেশাভিরাগ উদ্দীপিত না হয়? গীর মুশারফ হোসেনের অগাধ বিবাদদ্রব “বিবাদ-সিদ্ধি” পাঠ করিলে কাহার চক্ষে জল না আইসে, কোন্ পাষণ্ডবীভূত না হয়? মুসলমান সম্পাদকের সুপরিচালিত, মুসলমান পুরুষ ও রমণীর সুচিন্তিত প্রবন্ধ-মালায় সমলঙ্কৃত “কোহিনূর” ব্লকপ উন্নতমস্তকে পদবিক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালার সাময়িক-সাহিত্য-সমাজে চলিতেছে, তাহাতে কাহার হৃদয় আশার আনন্দে উৎফুল্ল না হয়? আবার সহৃদয়, সুলেখক, শান্তস্বভাব, মিষ্টভাষী ও সুন্দর-চরিত্র, দরিদ্র মুন্সী তালিমুদ্দীন সরকারের জায় কত উৎসাহী মুসলমান বন-জাত কুসুমের মত লোক-নয়নের অন্তরালে থাকিয়া কেবল জীবন-যুদ্ধেই জীবনান্ত হইতেছেন, আপনার অস্তিত্বের নিদর্শন স্বরূপ একটুকু হাস্য, এক বিন্দু অশ্রু, কিম্বা একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও স্বদেশের সাহিত্য-ভাণ্ডারে রাখিয়া যাইতে পারিতেছেন না, তাহার গণনা কে করিবে?

কোন কোন মুসলমানের সাধ, বঙ্গ-ভাষার আসনে উর্দু-ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার বঙ্গ-ভাষাকে মাতৃভাষা বলিতে চাহেন না, তাঁহাদের অভিধানে বাঙ্গালী-শব্দটি হিন্দুশব্দের প্রতিশব্দমাত্র। কিছুদিন পূর্বে কোন কোন হিন্দুও মনে করিতেন, সংস্কৃতই আমাদের মাতৃভাষা, কেবল সংস্কৃত সাহিত্যই পাঠের যোগ্য; বঙ্গ-ভাষা কেবল অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী এবং স্ত্রীলোকের ভাষা, কেবল নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুরোচিত ভাষা। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই; এখন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাছ

শ্রীযুক্ত বাদবেশ্বর তর্করত্নের জায় দেশ-পূজা পণ্ডিতও বঙ্গ-ভাষাকে অবলম্বন করিয়া আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ বাগ্মিত্বের পরিচয় দিতে কষ্ট, লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই অস্বাভাবিক সংস্কৃত-প্রীতি বা উর্দু-প্রীতি এই প্রান্ত-প্রদেশে প্রবেশ করে নাই;—এই সুদূর নিভৃত উপত্যকাটি অনেক কুবাঁতাস হইতেই রক্ষা পাইয়া আসিতেছে; ভরসা করি, ভবিষ্যতেও অনেক কুবাঁতাসই ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

সংস্কৃত এবং উর্দু, আমাদের পরম আদরের জিনিস বটে; সংস্কৃত না শিখিয়া হিন্দু, বা উর্দু না শিখিয়া মুসলমান শিক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারেন না, সত্য; কিন্তু সুপুত্র যেমন যেখানে যাহা উপার্জন করেন, জননীকে হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হন, সেইরূপ দেশের যিনি সুসন্তান, তিনি যে ভাষাই অধ্যয়ন করুন, আর হিন্দু বা মুসলমান যে জাতিই হউন, তিনি যেখানে যে সম্পদটুকু পাইবেন, তাহাই যত্ন করিয়া জননী জন্মভূমির সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিবেন, তাহাই দ্বিরা মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য এবং গৌরব বর্দ্ধিত করিবেন, আমাদের জননী জন্মভূমি এই প্রত্যাশাই করেন।

ধনবানের সাহিত্য-সেবা

লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর বিরোধ চির-প্রসিদ্ধ। এ বিরোধ কেবল এ দেশে নহে, সর্বত্র। লক্ষ্মী এবং সরস্বতী যদি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গী না হইতেন, তাহা হইলেও এ বিরোধ

থাকিয়া যাইত, কারণ এ বিরোধ লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর—ধন এবং জ্ঞানের প্রকৃতিগত।

গল্প আছে, সম্রাট তৈমুর যখন সমর-খণ্ডের অধিপতি, তখন সেট রাজ্যে একজন প্রসিদ্ধ কবি বর্তমান ছিলেন। কোন রূপবতী রমণীর গণ্ডদেশে একটি তিল-চিহ্ন ছিল, তাহাতে সেই রমণীর সৌন্দর্য্য যেন আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কবি ঐ রমণীর রূপ বর্ণনা করিতে করিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন, এবং বর্ণনার একস্থলে বলিয়া ফেলেন, “আমি ঐ তিলের সৌন্দর্য্যটুকু পাইলে সমরখণ্ডের রাজ্যটুকু দিয়া ফেলিতে পারি।” কালক্রমে তৈমুর একদিন ঐ কবিতা শুনিতে পাইয়া কবিকে ডাকিয়া পাঠান। কবি উপস্থিত হইলে তিনি ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এত আশ্পর্ক যে একটা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের বিনিময়ে আমার রাজ্যটুকু দিয়া ফেলিতে চাও?” তখন কবি শাস্ত ও বিনীতভাবে যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, ‘রাজন! কবিরা চিরকাল এইরূপ অমিতব্যয়ী, তাই তাহাদের দরিদ্রতা ঘুচে না।’

এই গল্পটার মধ্যে—লক্ষ্মী-সরস্বতীর চির-প্রসিদ্ধ বিরোধের মধ্যে—একটা বিজ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে। যাহারা জ্ঞানের সেবা করে, তাহারা স্বভাবতই ধনকে অসার ক্ষণস্থায়ী তৃণবৎ মনে করে, স্তব্ধতা ধন উপার্জন করিলেও সঞ্চয় করিতে পারে না। আর যাহারা ধনের সেবা করে, তাহারা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিলেও তাহার আদর করিতে পারে না—পাছে দরিদ্র হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তাহার কাছে ঘেঁসিতে চায় না। এই হইল সাধারণ

নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রম অল্প স্থলেই দেখা যায়।

জ্ঞান-সেবকের হৃদয়ে পার্থিব সম্পদের উচ্চাভিলাষ কুত্ৰাপি দেখা যায় না। কেবল অল্প-বস্ত্রের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই তিনি হৃদয়ের অবিভক্ত অমুরাগ জ্ঞান-সেবায়—সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসর্গ-করিতে পারেন। কিম্ব দুঃখের বিষয়, অনেকের ভাগ্যে এই সামান্য অল্প-বস্ত্রের চিন্তাই সাহিত্য-সেবার ঘোর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। অল্প-চিন্তায় কালিদাসের কবিতাও কুণ্ঠিত হইয়াছিল, অল্পভাবে সেক-পীয়রকেও হরিণ চুরি করিতে হইয়াছিল। আর আত্মে পরে কাঁ কথা।

এইখানে ধনবানের একটি কর্তব্য দেখা যাইতেছে। ধনবান বলিতেছেন, জাতীয়-জীবনীশক্তি সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত, স্তব্ধতা জাতীয়মঙ্গলের জন্তই জাতীয়সাহিত্যের পরিপোষণ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত উচিত। প্রত্যক্ষ ভাবে, স্বয়ং লেখনী ধারণ করিয়া যদি সরস্বতীর অর্চনা করিতে পারেন, ভালই; কিন্তু যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে প্রতিনিধি বা পুরোহিতের দ্বারা—যাহারা সাহিত্য সেবার জীবন উৎসর্গ করেন, তাহাদের সহায়তাদ্বারা—এ অর্চনা সম্পাদন করিতে পারেন। কত রাজা, কত মহারাজা, বিলাসের কোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া, মণি-মাণিক্যে দেহ খচিত রাখিয়া, গর্গ-রোহণে গড়াগড়ি দিতে দিতে, স্বাবকবর্ণের শান্তি মধুর স্তবলহরী শুনিতে শুনিতে ভবনাট্যশালা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহারা সকলেই বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারে বিনীত হইয়া গিয়াছেন, নিজের নামটি পর্য্যন্ত জন-সমা

রাপিয়া বাইতে পারেন নাই। কিন্তু যে সকল সোভাগ্যশালী ধনী বাগ্‌দেবীর সেবকদিগকে মুষ্টিমাত্র অন্ন দিয়া সাহিত্য-সেবায় সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা মানব-স্মৃতিতে অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন, মানবজাতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ আজিও তাঁহাদের নামকীর্তন করিতেছে। সাহিত্য-সেবায় সহায়তা করিলে যুগপৎ দেশের মঙ্গল-সাধন এবং নিজের নামকীর্তন ও মশোলাভ হয় ; ক্ষণস্থায়ী সংসারে নশ্বর দেহধারী মানবের পক্ষে ইহা কি সামান্য লাভ ?

শ্রীহট্ট-সম্মিলনী

আপনাদের সাহিত্য-সেবার মহামুষ্ঠানে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র কথা যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিলাম। উপসংহারে শ্রীহট্ট-সম্মিলনী সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলিয়া বক্তব্যের শেষ করিব। শ্রীহট্ট-সম্মিলনী বহুদিন হইল স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে অনেক জেলায় এইরূপ সম্মিলনী স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের এই সম্মিলনী বোধ হয় তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহা শ্রীহট্টের পক্ষে গৌরবের কথা বলিয়া মনে করিতে পারি। আজ আপনারা যে উদ্দেশ্যে এখানে সম্মিলিত হইয়াছেন, বিবেচনা করিতে গেলে 'শ্রীহট্ট-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য তাহা হইতে অভিন্ন। ভাষাকে এবং সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলে কেবল আমাদের যত্নে তাহা সিদ্ধ হইবে না, তাহার জন্ত শিশুর ধাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী-স্বরূপিণী জননীকে প্রস্তুত করিতে হইবে। বিপুল-অর্থব্যয়সম্বুল স্কুল-কলেজ স্থাপন দ্বারা আর্য্যসমাজে যাহার সম্পাদন অসম্ভব, শ্রীহট্ট-সম্মিলনী অতি অল্পমাত্র ব্যয়ে, কেবল নিজের উৎসাহ এবং অনুরাগের বলে,

সেই ছত্রহ অন্তঃপুরশিক্ষার ব্রতগ্রহণ করিয়াছেন। উৎসাহ এবং অনুরাগে যতদূর সম্ভব, যুবকেরা তাহাই করিতে পারেন ; কিন্তু এই গুরুতর কার্য্যে যেরূপ চিন্তা, যেরূপ পরামর্শ, যেরূপ ব্যবস্থা এবং যে সামান্য অর্থব্যয় অনিবার্য্য, যুবকেরা তাহা কোথায় পাইবেন ? দেশের এবং সমাজের জ্ঞান-বুদ্ধ নেতৃগণ দূরে দাঁড়াইয়া কেবল তাগাসা দেখিলে এই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না। যুবকেরা এই শুভকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, এই বিনা-বেতনর চাকরি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া আপনাদিগেরই কার্য্য করিতেছেন। আপনারা ইহাদিগের সঙ্গে যোগ " দিলে ইহাদিগের উৎসাহ, অনুরাগ এবং কার্য্যকরী শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। আমার বিনীত প্রার্থনা, আপনারা এই সুযোগ ছাড়িবেন না। ইহারা যে অন্তঃপুর-শিক্ষার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, আপনাদের অভিজ্ঞতা এবং পরিণত চিন্তা-শক্তির সহায়তা পাইলে ইহারা আজ বহু চেষ্টাতেও যতটুকু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাহার শতগুণ কার্য্য করিতে পারিবেন, আমাদের পারিবারিক, জীবনে তাহার শতগুণ-সফলতা দেখাইয়া, শতগুণ মঙ্গল সাধন করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। কর্ণধার-বিহীন তরবার ত্যায় আজ শ্রীহট্ট-সম্মিলনী বিরঙ। তাহার ভুল-ভ্রান্তি থাকে, ব্যবস্থায় দোষ থাকে, প্রণালীতে ত্রুটি থাকে, আপনারা অগ্রসর হইয়া উপদেশ দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া দিন ; কিন্তু তাহার কার্য্যকলাপে উদাসীন থাকিয়া অথবা ভ্রম-ত্রুটির জন্ত তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া এই মঙ্গলকার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন না। আজ আপনাদের উদাসীনতার ভগ্নহৃদয়

লইয়া যুবকেরা কার্য্য করিতেছে, তাই পদে পদে তাহাদের কন্ঠে বিগ্ন ঘটিতেছে, তাহারা আশানুরূপ ফল পাইতেছে না। আপনাদের সহানুভূতি পাইলে, আপনাদের সহাস্য মুখ দেখিয়া, আপনাদের আশীর্বাদ এবং পদধূলি মাথায় লইয়া যুবকেরা যখন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তাহার সফল সমাজে এবং পরিবারে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনারা আনন্দিত হইবেন। যাহা অনিবার্য্য, তাহার প্রতিকূলতায় কোন ফল নাই, তাহার সুপরিচালনই বিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার কার্য্য। আমাদের সমাজে জীশিক্ষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে; তাহাকে আর জোর

করিয়া দূরে তাড়াইয়া দিবার সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় যাহাতে সেই শিক্ষা সুশ্রুণালীতে এবং সুব্যবস্থায় পরিচালিত হয়, যাহাতে তাহা কুফলের পরিবর্তে সফল উৎপাদন করিতে পারে, যাহাতে জীশিক্ষার গুণে আমাদের ভাষা পরিপুষ্ট এবং সাহিত্য উন্নত হয়, যাহাতে আমাদের বালক-বালিকাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে উন্নত পবিত্র চরিত্র গঠিত হইতে পারে, আপনারা তাহারই ব্যবস্থা করুন, সেইদিকেই মনোযোগ প্রদান করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

মহাভারতী

পুথি পত্র বন্ধ নাহি আজ সাথে
ভাবিয়াছি একবার
পড়িব লিখন, নীলাশ্বর পাতে
পুরাবৃত্ত সমাচার।
গুনিব পবনে ভুবন বাহিনী
পুণ্য ভাগবত গান
পড়িব পৃথ্বীর পুরাণ-কাহিনী
শ্রাম শপ্পে দিনমান।
গুনিব বর্ষার বাদল বর্ষণে
মেঘের গাদল রবে,
বজ্র বিদ্রোহ অস্ত্র ঘর্ষণে
করকাতাড়িত ভবে
মহাভারতের, সমর উল্লাস,
শ্রীহরির শঙ্খনাদ,
শরশয্যা পরে ভীষ্মের নিধাস
অভিমত পুরমাদ।
ঋতু পর্য্যায় জানাবে শোভায়
অবতার জন্মকথা,
শ্রামের শ্রামল তনুর ছায়ায়
রাধিকা মাধবী লতা!

রুদ্ধ নিদাঘে রৌদ্র যবে জলে
তীব্র পরশুর মত,
পরশুরামের ব্রহ্মতেজ বলে
হবে পৃথ্বী পরাহত।
করুণা ধারায় প্লাবিতা ধরা
বারি ঝরে বরষার
করুণা আধার মনে পড়ে তাঁর
যিনি বুদ্ধ অবতার।
নির্ম্মল উদার প্রশান্ত সংযত
শরতের নীলাশ্বর,
দেখাবে রামের তপস্বীর মত
ত্যাগরিক্ত কলেবর!
কুয়াসা কাঁপিয়া আসিবে হিমালী
অশ্রু প্লাবিত বৃকে,
কোরব জননী ধৃতরাষ্ট্র রাণী
গান্ধারী আবৃত মুখে!
স্কন্ধ সংগ্রাম, সাস্ত্র অভিনয়
জীর্ণ পত্র মরমরে,
মহাপ্রয়াণের জানাবে সময়
রাজ্য ধন তুচ্ছ করে'!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

ফলিত জ্যোতিষ ।

(গল্প)

উপযুক্ত পরিশ্রম সবেও বার বার তিনবার এক্‌এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে অদৃষ্টের রহস্তোদ্ভেদে স্বতঃই আগ্রহ জন্মিয়া থাকে । সুতরাং বিফল মনোরথ অনুকূল যে পড়াশুনা ছাড়িয়া বন্ধুর সাহায্যে “জ্যোতিষরত্নাকরের” রহস্যদ্বারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে ইহাতে বিশ্বয়ের বিষয় কিছুই নাই ।

অনুকূলের পিতৃবোর ইচ্ছা ছিল যে যখন অনুকূলের পক্ষে জননী সরস্বতীর মন্দির-প্রবেশের পথে এমন একটা দুর্ভিত্তিক্রম বাধাই উপস্থিত হইল তখন দ্বারে বসিয়া সময় নষ্ট না করিয়া অনুকূলের পক্ষে তাঁহার সপত্নীর প্রসাদ লাভের চেষ্টা করাই সুব্যবস্থা । কিন্তু “প্রত্যক্ষফলপ্রদ” জ্যোতিষ শাস্ত্রের আশ্বাদ লাভ করিয়া অনুকূল পিতৃবোর কথায় কর্ণপাত করিল না ।

অধ্যবসায়শীল অনুকূল অল্প দিনের মধ্যেই ‘লগ্নমান’ ‘পতাকৌচক্র’, ‘গ্রহবলাবল’, ‘সপ্তবর্গসাধন’ ‘গ্রহগণের শক্রমিত্র কখন প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বন্ধু সাহায্যে আয়ত্ত করিতে লাগিল । “ভাবস্ফূট” “ভাবসন্ধি” প্রভৃতি সূক্ষ্ম গণনাও তাহার অপরিচিত রহিল না । কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া ফল নির্ণয় করিতে গিয়া অনুকূলের দ্রুত উন্নতি কিছু বাধা পাইল ; তাহার জীবনে প্রত্যক্ষ লব্ধ ফলের সঙ্গে কোষ্ঠী নির্দিষ্ট ফলের কেমন যেন একটা “নৈসর্গিক শত্রুতার” ভাব দেখা যাইতে

লাগিল । যে মাসে সে ধন লাভের “যোগ” দেখিল, সেই মাসেই রজক তাহার মূল্যবান কোটটাকে ছিঁড়িয়া লইয়া আসিল এবং যে মাসেই সে “স্বীলাভের” সম্ভাবনা দেখিয়া ঋণ্ডারলয় গমনের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া রহিল সেই মাসেই তাহার ঋণ্ডার মহাশয় তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হইলেন । “যান বাহনের শুভযোগে”র ফলে ত বেচারাকে এক সপ্তাহ শয্যাতেই থাকিতে হইল । মানলাভের পরিবর্তে রায় মহাশয়ের দ্রুত চালিত “টমটম” তাহার পায়ের অঙ্গুলির উপর দিয়াই চলিয়া গেল । এরূপ অবস্থায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের “প্রত্যক্ষ ফলের” প্রতি কিছু সংশয়সংকার অবশ্যজ্ঞাবী । সুতরাং অনুকূল জ্যোতিষ শিক্ষা ব্যাপারে কেবলমাত্র বন্ধুর উপর নির্ভর করিতে পারিলনা । সে উপযুক্ত গুরুলাভের জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিল । এমন সময়ে একদিন বসন্ত গায়াছে তাহার অন্ধকার জীবনে জ্যোতির্শ্রয় দ্রবতারার মত এক তেজঃ পুঞ্জ সন্ন্যাসী যেন তাহারই প্রতি রূপা করিয়া কল্যাণপুরের বটরক্ষতলে দর্শন দিলেন । সন্ন্যাসীর কাছে সে শুনিল—তত্ত্ব, ও জ্যোতিষ শাস্ত্র যাহা কিছু আছে তাহা তির্কিত এবং নেপালেই আছে ; গুরু রূপাব্যতীত সে বিদ্যা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই ।

গুরু-রূপালাভ সময়সাপেক্ষ জানিয়া অনুকূল আপাততঃ নিজের জীবনের

ফলাফলটা জানিয়া লইবার জন্ত উৎসুক হইয়া একদিন সন্ন্যাসীকে জোর করিয়া ধরিয়া বসিল। সন্ন্যাসী অম্লরুদ্ধ হইয়া একান্তভাবে তাহার জন্মকুণ্ডলী, কররেণা এবং ললাটফলক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ; ক্ষণমধ্যেই সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন “অতিপ্রবল রাজযোগে তোমার জন্ম। ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট এইযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ‘তোমার জীবনে অতুল সম্পদ এবং অসীম উন্নতি অপরিহার্য।’”

ভূমিষ্ঠ হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া অম্লকূল বলিল “ভাগ্যোদয়ের সূত্রপাত কবে হইতে?” সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিলেন “চৌত্রিশ বর্ষ সাত মাস একুশ দিনে তোমার ভাগ্যারম্ভ। এই প্রবল উন্নতি আমরণ স্থায়ী হইবে।”

সপ্তাহান্তে সন্ন্যাসী গ্রামত্যাগ করিয়া গেলেন। নবোত্তমে অম্লকূল “শঙ্কুনির্মাণ” “সর্বদেশীয় লগ্নমান আনয়ন” “রবিভুক্তি” “সপ্তশলাকা বিচার” গভৃতি গভীর গবেষণায় চিত্ত সমর্পণ করিল।

অম্লকূলের সৌভাগ্যখ্যাতি দেখিতে দেখিতে গ্রাম মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল। যুবতীগণ দলে দলে আসিয়া অন্তরাল হইতে অম্লকূলকে দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়া গেলেন। বালিকারা আসিয়া তাহাকে মালা পরাইয়া গেল। প্রবীণারা মুক্ত কণ্ঠে তাহার রূপগুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যুবকেরা তাহাকে বহুভাবে পাইবার জন্ত প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতে

লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে জানাইয়া গেলেন যে তাহার জন্ত নিত্যন্ত নিকামভাবে তিনি আজ এক বৎসর কাল নারায়ণকে তুলসী দিয়া আসিতেছেন এবং কবিরাজ মহাশয় উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গেছেন যে তিনি যে এতদিন ধরিয়া বহু পরিশ্রমে ১০০ টাকা ভরির “ষড়গুণবলি জ্ঞারিত মকরধ্বজ” কাহার জন্ত প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন তাহা এইবার গ্রামের অদূরদর্শী লোকেরা অচিরেই জানিতে পারিবে।

এইরূপে চারিদিক হইতেই যখন অম্লকূলের আশ্রয় সৌভাগ্য স্মৃতি হইতেছিল, সেই সেই সময়ে অম্লকূল তাহার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে এক পত্র পাইয়া ধৈর্য্য হারাইল।

অম্লকূলের শ্বশুর মাখন লাল চক্রবর্তী পুলিশ বিভাগে দারগার কাজ করিতেন। স্মরণ্য মহাশয় চরিত্র সৰ্ব্বদে তঁাহার একটা স্বভাবগত অনাস্থা জন্মিয়াছিল। জামাতার ভাবী সৌভাগ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রধান দারগা সহসা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সেই জন্ত তিনি তঁাহার অধীনস্থ একটি জমাদারের পদ শূন্য হওয়ায় জামাতাকে লিখিয়াছিলেন যে তঁাহার বিবেচনার আপাততঃ অম্লকূলের সেই পদটি গ্রহণ করা কর্তব্য। পুলিশ বিভাগে তঁাহার যেরূপ প্রতিপত্তি আছে তাহাতে অম্লকূল একবার এ কার্য্যে প্রবেশ করিলে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাহাকে দারোগার পদে উন্নীত করিয়া দিতে পারিবে। ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া এ বয়সে অলস ভাবে বসিয়া থাকা উচিত

নয়। রাজত্ব হাতে আসিলে চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া কঠিন স্বাধ্যাপার নহে, কিন্তু একবার বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেলে চাকরি পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ভবিষ্যতে অতুল সমৃদ্ধির অধীশ্বর কোন ব্যক্তি একপ-পত্র পাইয়া ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে? অনুকূল—অতুল সম্পদের অধিকারী, অসীম উন্নতির সাধক—অনুকূল ১০ টাকা বেতনের জমাদারের পদ গ্রহণ করিবে? একপে তাহার মানহানি করিবার অধিকার কাহারো আছে? অনুকূল পত্র হাতে করিয়া গর্জিতে গর্জিতে স্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—“দেখ দেখি একবার তোমার বাবার আক্কেল! আমাকে কি না জমাদারের কাজ করতে লিখছেন। আমাকে এর কাম করে অপমান করার কি প্রয়োজন ছিল?”

পত্নী তিলোত্তমা ইতিমধ্যেই লক্ষীর অগ্র-দূত রূপে স্বামীকে উপযুগপরি দুই কথা উপহার দিয়া আপনার মাতৃত্বের অধিকার পাকা করিয়া লইয়াছিলেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বোধ হয় পিতার অবিখ্যাসও তাঁহার চিন্তে কিয়ৎপরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল; সুতরাং পত্নী স্বামির তর্জনে ভীত না হইয়া বধুজনোচিত সঙ্কেচ ত্যাগ করিয়া হাসিয়া বলিলেন “রাজ্য লাভের ত এখনো ৭ বৎসর দেরি; তৎদিন “তরুতলে” রাজত্ব না করে কোন একটা কাজ কর্ম করলে এমনিই বা কি ক্ষতি?”

অনুকূল আর সহ করিতে পারিল না। সেইদিনই সে খুড়িমাকে বলিয়া পত্নী ও কন্যাদ্বয়কে তাহার খণ্ডরালয়ে পাঠাইয়া দিল।

কত্থার মুখে সকল কথা শুনিয়া মনুষ্য চরিত্রজ্ঞ মাখন বাবু বলিলেন “তা হলে বাবাজির অদৃষ্টে অনেক হুংখ আছে দেখচি।”

মুখে হুংখে আশায় নিরাশায় পাঁচবৎসর কাটিয়া গেল। গ্রামের বারোয়ারি পুজার অবসানে অনুকূলের কতকগুলি নিকর্যা বন্ধু তাহাকে বলিল—“ভাই তোমার শুভ-দিন ত নিকট হয়ে এলো। এই সময়টা দিনকতক আমোদ করলে হয় না?”

বন্ধুবৎসল অনুকূল কহিল “বেশত, বল কি করতে চাও।” বন্ধুরা বলিল—“যাত্রার দল করলে হয় না? যাত্রার দলে যেমন পয়সা তেমনি আমোদ। মতিরায় ত যাত্রার দল করে, রীতিমত জমিদারি করে গেল! দিবি এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়ান যাবে। খাওয়া দাওয়ারও জুত আছে। কি বল ভাই? রাজার পাট তোমার বাঁধা রহিল।” কথাটা তাহারও নিতান্ত মন্দ লাগিলনা। যতদিন আসল যাত্রা না হওয়া যায় ততদিন রাজার পাট করিয়া চালচলনটা পাকা করিয়া লইলে ক্ষতি কি? মাসখানেকের মধ্যে সে উদ্যোগী বন্ধুবর্গের সাহায্যে পৈতৃক জমি জমা বাঁধা দিয়া এবং মহাজনের কাছে হাঙনোট কাটিয়া হাজার টাকা সংগ্রহ করিল।

উদ্যোগ পর্তুটা পরম উল্লাসেই কাটিয়া গেল। ‘ছোকরা’ সংগ্রহ, গায়ক বাদক পরীক্ষা, পোষাক খরিদ প্রভৃতি ব্যাপারে দিনগুলো নদীর খরস্রোতের মত দ্রুতবেগে বহিয়া চলিল।

কিন্তু অবশেষে যখন সমস্ত আরোজন সম্পূর্ণ হইল তখন দেখা গেল যে সংগৃহীত

মূলধন প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে, শুনিয়া বিস্মিত অম্বুকুল বলিল—সে কি ? তাহলে দল চলিবে কি করে ? উদ্যোগী মন্থ বলিল আর সে জ্ঞাত ভাবনা নেই। সুমুখেই আশ্বিন মাস। দুটো একটা বায়না জুটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।” অম্বুকুল বলিল “সে কি মন্থ ? এখনো গান বাজনা কিছুই ঠিক হয়নি। এ অবস্থায় বায়না পেলেই বা নেবো কি করে ?” চতুর মন্থ হস্ত করিয়া বলিল—সে জ্ঞাত তোমার কোন ভাবনা নেই। সে তার আমার উপর রইল, তুমি কেবল হরিশ্চন্দ্রের পাঠটা ঠিক করে নাও।”

বন্ধুর উৎসাহে আনন্দিত অম্বুকুল সকল কর্ম ছাড়িয়া নির্জন প্রান্তরে অপরাহ্নের সূর্য্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ‘হা বিবস্থান হায় সূর্য্যবংশের কুলপতি—আজ এখনি উদ্ভিত হ’লে ! নিজের অকৃতী সন্তানের সর্বনাশ দর্শন করতে তোমার এত আগ্রহ কেন দেব ?’—বলিয়া প্রাণপণে আপনার ‘পাট’ মুখস্থ করিতে লাগিল।

৪

মন্থনাথের আন্তরিক চেষ্টা ও উৎসাহে—অম্বুকুলের “দলের” এক বায়না জুটিল। গন্তব্যস্থান পদ্মাপারের এক জমিদার গৃহ। পরম উৎসাহে নূতন হ্যাণ্ডোনেট কাটিয়া পাথের সংগ্রহ করিয়া অম্বুকুলের যাত্রার দল বিস্মিত গ্রামবাসীর নিমিষহীন নেত্রের উপর দিয়া কল্যাণপুরের ঘাটে নৌকারোহণ করিল। বেচারী অম্বুকুল সমস্ত পথ ‘পাট’ মুখস্থ করিতে করিতে চলিল এবং অবসর মত “হরিশ্চন্দ্রের” দাঁড়াইবার, রোদন

করিবার ভাবভঙ্গী কিরূপ হইলে ঠিক স্বাভাবিক হয় মনে মনে তাহাই ভাবিয়া লইতে লাগিল।

তিন দিনের পর অবসন্নদেহে প্রজ্জ্বলিত জঠরে মুমূর্ষু মানবসন্তানগুলি “মৌন, মুক ধীরা মাতৃভূমির” তটলাভ করিয়া আশ্রয় হইল। গ্রামের লোকে পরম সমাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া জমিদারের সুরহং গোশালায় তাহাদের জ্ঞাত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিল।

নিশীথরাত্রে মোটা চাউলের অন্ন, জলবৎ তরল দাইল এবং মশক সঙ্কুল, গোমূত্র সুরভিত গোশালার তৃণ শয্যা শয্যাগ্রহণ করিয়া অম্বুকুলের সৌভাগ্য গর্গর অনেকটা লঘু হইয়া আসিল।

তাহার পর রাত্রি দুইটা বাজিতে না বাজিতেই মথন গ্রামের অবশিষ্ট দলপতিগণ, নাসিকা গর্জন সহকারে নিদ্রা দিবার জ্ঞাত তাহাদের ডাকিয়া আনা হয় নাই বলিয়া ছলু-সুল বাধাইয়া দিল এবং অম্বুকুল তাহাদের অভদ্রতায় প্রতিবাদ করিবা মাত্র যাত্রার দলের লোকদের পৃষ্ঠের দৃঢ়তা পরীক্ষার জ্ঞাত তীব্র আকাজ্জা প্রকাশ করিল, তখন হতভাগ্য অম্বুকুলের পক্ষে শুভাদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। চক্ষু মর্দন করিতে করিতে এবং অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে সে শয্যা ত্যাগ করিল।

রাত্রি তিনটা হইতে যাত্রা আরম্ভ হইল।

একেই পাট, ভাল করিয়া তৈয়ারি হয় নাই, তাহার উপর পথশ্রমে এবং অনিদ্রায় সমস্তই আরও গোলমাল হইয়া

গিয়াছিল; সুতরাং যাত্রা করিতে গিয়া অভিনেতার। স্বাপনাপন ভূমিকা ভুলিয়া গেল, বালকদের ঐক্যতান সঙ্গীত তাল ও রাগিনীর মর্যাদা রক্ষা করিল না, ঢোল “চপতপ” করিতে লাগিল এবং “ছড়ি” লাগাইবা মাত্র বেহালা করুণ আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

যাত্রা ভাঙ্গিবামাত্র গৃহস্বামী “অধিকারী”কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কম্পিত বক্ষে অমুকুল গৃহস্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনিই এ দলের অধিকারী?” অমুকুল নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বাবু বলিলেন “আজ ৩০ বৎসর আমাদের বাটীতে যাত্রা হইতেছে কিন্তু এমন স্তম্ভর যাত্রা কখন শুনি নাই। আমার ইচ্ছা আপনাকে একজু উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করি।

অধিকারীর পুরস্কারের ব্যবস্থা দেখি। দলের লোক “যঃ পলায়তি স জীবতি” ভাবিয়া যে যেখানে পাইল সরিয়া পড়িল।

তৃতীয়-দিন নিশীথরাত্রে বিদীর্ঘমান হৃদয়ে অবসন্ন সর্বস্বাস্ত্র অমুকুল চোরের মত আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যসুখ তাহার ভাগ্যে ঘটবার পূর্বেই ভাগবিপর্যায়ের অঙ্কটা অভিনীত হইয়া গেল। এখন অমুকুলের আশা—হরিশ্চন্দ্রের প্রথম অঙ্কের নিরবচ্ছিন্ন সৌভাগ্যসুখ বুঝিবা তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে।

সেই অমুকুল অবস্থার জন্ত অমুকুল আশাপথ চাহিয়া রহিল।

কিন্তু —

‘আশাপথ চেয়ে চেয়ে দিন ত কুরায়ে গেল!’

ভাগ্যোদয়ের শুভদিন অতীত হইয়া গিয়াছিল। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্ত অমুকুল আর একবার তাল করিয়া জন্মনক্ষত্রের “ভাগ্যদণ্ডের পরিমাণ” এবং গ্রহগণের চক্র ও মন্দগতি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও কোন ক্রটি বুঝিতে পারিল না।

মহাজনেরা ইতি পূর্বেই তাহার বিরুদ্ধে একতরফা ডিগ্রি কবিয়া লইয়াছিল।

• খণ্ডর জনার্দন চক্রবর্তী লিখিয়াছিলেন—

“স্মরণ করিও যে তোমার দ্বী কতাকে গ্রহণ করা না করা একমাত্র তোমর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অবীন নহে। তোমার পরিবার-বর্গের ভরণ পোষণ করিতে তুগি আইনতঃ বাধ্য। অতএব যদি তুমি সত্তরে তোমার হীন চরিত্র বন্ধ বান্ধবের কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দ্বী কতাসম্বন্ধে স্বেচ্ছা না কর, তাহা হইলে আমি অধিক দিন তোমাকে জামাতা বলিয়া ক্ষমা করিতে পারিব না।”

পিতৃব্য জানাইয়াছিলেন যে তিনি প্রাচীন হইয়াছেন, চিক্কাকাল সংসারে জড়িত থাকিয়া পরকালের পথে কটক রোপন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাঁহার ইচ্ছা আগামী বৈশাখের প্রথমেই তিনি বন্দাবন বাস করেন।

চারিদিক হইতে এইরূপে বিপন্ন হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে অমুকুল চিন্তামগ্নচিত্তে নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিল।

তবে কি অম্বুকুলের অদৃষ্ট বলিয়াই জ্যোতিষও প্রতিকূল? ফলিত জ্যোতিষও ফলে না?

সহসা জ্যোৎস্নালোকিত বৃক্ষতলে পূর্বদৃষ্ট সন্ন্যাসী-মূর্ত্তি দেখিয়া সে বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন “তোমারি নাম অম্বুকূল না? আমাকে তোমার কোষ্ঠি দেখাইয়াছিলে?” অম্বুকূল সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বলিল “আজ্ঞা হাঁ।”

সন্ন্যাসী বলিলেন “এইখানে বস। আমি তোমার জন্ম আবার এখানে আসিয়াছি। আমি তোমার ‘রাজযোগের’ কথা বলিয়াছিলাম না? আমার গণনায় কিছু ভ্রম হইয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া জ্যোতিষ-চর্চা করি নাই। গতবৎসর একদিন হিমালয়ে বসিয়া বুলির মধ্যে কি খুঁজিতে খুঁজিতে তোমার লগ্নকুণ্ডলীটা বাহির হইয়া পড়িল। আর একবার ভাল করিয়া গণনা করিয়া দেখিলাম ‘ভাবস্মৃতি’ সম্বন্ধে সামান্য একটু ভ্রম হইয়াছে।” রুদ্ধ নিশ্বাসে কম্পিত বক্ষে অম্বুকূল বলিল “কি ভ্রম, ঠাকুর?” সন্ন্যাসী বলিলেন “আর কিছু নয়। তোমার ভ্রূদ্বী বৃহস্পতি ‘ভাগ্যাদিপ’ না হইয়া ‘অষ্টমাদিপ’ হইয়াছেন। ইহার ফলে তোমার ‘রাজযোগ’ ভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু রাজযোগ ভগ্ন হইলেও তোমায় কোষ্ঠিতে অতি প্রবল ‘তীর্থযাত্রা’ যোগ ঘটয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ তীর্থে তোমার যাত্রা অবশ্যজ্ঞাবী। এই পথ দিয়া

ত্রিবেণী যাইতেছিলান, মনে করিলাম তোমার সংবাদটা দিয়া যাওয়া ভাল।”

শুনিবামাত্র সমস্ত বিশ্বত্বকাণ্ড অম্বুকূলের চক্ষে বিদ্যুৎবেগে ঘুরিয়া উঠিল। অম্বুকূল ব্যথিত মস্তিষ্ক স্থির করিবার জন্য মাথায় হাত দিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তবুও জ্যোতিষশাস্ত্র যে মিথ্যা নয় ইহা বুঝিয়া কতকটা সে সোয়াস্তি অম্বুভব করিল।

প্রহরাভীত রাত্রে অম্বুকূল গৃহে পৌছিয়া শুল্লি আদালতের পেয়াদা সন্ধ্যা হইতে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই পেয়াদা তাহার হাতে এক ‘নোটস’ দিল। ‘নোটসে’ কেন তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে না তাহারই কারণ দেখাইবার জন্ম নির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ ছিল।

সমস্তরাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া সকল দিক ভাবিয়া দৈববিড়ম্বিত অম্বুকূল সন্ন্যাসী বেশে কাশী যাত্রাই এ অবস্থায় একান্ত কর্তব্য বলিয়া স্থির করিল।

পরদিন হইতে আর অম্বুকূলকে কল্যাণপুরে দেখা যায় নাই। তাহার অদৃষ্টে “তীর্থযাত্রা” ঘটয়াছিল কি না সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে তাহার বৃদ্ধা পিশি আক্ষেপ করিতেন—যাত্রায় রাজা সঙ্গেই তাঁর অম্বুকূলের রাজযোগ খণ্ডে গেল। আর, যারা তাঁর ছেলেকে সখের রাজা সাজাইয়াছিল, তারাই যত নষ্টের মূল ভাবিয়া বৃদ্ধা কেবলি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিতেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

জ্ঞানদাস ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আমরা জ্ঞানদাসের নৌকা-বিহার ও
রাসগৌণ-সম্বন্ধীয় পদগুলিতে গৃঢ় অগৃঢ়, এই
দুই প্রকার ব্যঙ্গের অনেক পরচয় পাইতে
পার। কেবল শব্দ-ব্যঙ্গ নয়, অর্থব্যঙ্গও
সে গুলিতে অনেক আছে।

কর্ণধারবর চড়িয়া তরণীপর

আওল রাইক পাশ ।

চড় সমেত পারে উতারব এ ধান

কছু নাহি ভাব তরাস ॥

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল

দুকুল বহিয়া যায় ঢেউ ।

গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ

তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥

দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শামরায়

কখন না জানে কাল, বাহবার সন্ধান

জানিয়া চড়িছু কেনে নায় ॥

নায়াব নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটী কয়

কুটিল নয়নে চাহে মোরে ।

ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জালা সহিবে কে

কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥

অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল

পরান হৈল পরমাদ ।

জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি

এখনি না ভাবহ বিবাদ ॥

“নৌকা বিহারের ও রাস-লীলার” মধ্যে

যে গৃঢ় অর্থ আছে তাহা সকলেই বুঝিতে

পারেন। এখানে তাহার বাখ্যার প্রয়োজন

নাই, কেবল নৌকা-বিহারবিষয়ক আর

একটী পদ এইখানে উদ্ধৃত করিব। এই

পদে শুধু শব্দের ও অর্থের বাঞ্ছনাশক্তিই
প্রকাশিত হয় নাই, ছন্দের আত্মপ্রকাশিকা
শক্তিও বিশেষরূপে উদাহৃত হইয়াছে।

এক দায় দেখে দেখে ওগো বাড়ি মা ।

জীরণ নীরণ

আয়স ভিন্ন

অতি পুরাতন না ॥

অধির নীর

গভীর ধীর

অগাধ নাহিক যা ।

বিধির ঘটন

আসিয়া পবন

উপজিল বহু বা ॥

পাইয়া আশ্রয়

দিয়া জয় জয়

যমুনা কাড়িছে রা ।

কল কল কল

হিল্লোল কল্লোল

দেখিয়া হালিছে গা ॥

হেলিছে হুলিছে

তুলিয়া ফেলিছে

চল কল স্রোত সা ।

জ্ঞানদাসের

কেবল ভরসা

ও রাসা দুখানি পা ॥

এ সকল শ্রীরাধার উক্তি; পবন চঞ্চল,

কাল যমুনার জলে শ্রীরাধার জীর্ণ তরী

হেলিতেছে হুলিতেছে, যমুনা গভীর—অস্থির

অগাধ জল অবসর পাইয়া কল্লোল তুলিয়া

হিল্লোল সৃজন করিয়া খর স্রোতে বহিয়া

যাইতেছে; একটা বিপদ-সম্মুল অথচ সুন্দর

দৃশ্য আমাদের নয়নের কাছে উদ্ভিন্ন

হইতেছে। দৃশ্যটী করুণ, কিন্তু ইহা সৌন্দর্য্য-

রসস্বারা অর্দ্রাকৃত। তাহার উপর ভক্তির

একটা সুন্দর আবরণে কবি ইহার

ভয়ানকত্ব চাকিয়া ফেলিয়াছেন। আমি

বলিয়াছি যে এ সপ্নল চিত্রে একটা গুঢ় ভাব
নিহিত আছে—শ্রীকৃষ্ণের উত্তরে সেই ভাবটা
পরিষ্কৃত হয় ; কবি তাহার মধ্যেও শব্দ-
বাক্য ও অর্থব্যঙ্গের অবতারণা করিয়া রহস্ত-
জালে আবৃত করিয়া তাহাকে আরও
মনোরম করিয়াছেন ।

করে তুলি কেলি করি ডুবিল ডুবিল তরী
ফের হাল খসি পইল জলে ।

পবনে পাতিল ঝড় তরঙ্গ হইল বড়
বুঝি আজ কি আছে কপালে ॥

একুল ওকুল হুকুল নিরাকুল
তরঙ্গে তরঙ্গী স্থির নয় ।

আমি কি করিব বল উথলে যমুনা জল
কাণ্ডার করেছে নহি রয় ॥

এত দিন নাহি জানি লোক মুখে নাহি শুনি
যুবতীর যৌবন এত ভারি ।

নিজ অঙ্গ বাগ ছাড় যৌ ন পাতল কর—
তবে জে বাহিয়া যাইতে পারি ॥

নৌকা-বিহারের শেষ পাদ এতঃসঙ্কল্পীয়
পদাবলীর তাৎপর্যার্থ কবি নিজে পরিষ্কার
করিয়া দিয়াছেন :—

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা ।
নাম নৌকায় নিরবধি পার কর ভবনদী
তব আগে কি ছার যমুনা ।

চরণ তরঙ্গী যার যে করে তোমারে সার
কিবা তার পারের ভাবনা ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির মর্ম গ্রহণ করা
সহজ হইয়া পড়ে । বাসনার বোঝা না
নামাইতে পারিলে জলশ্রোতে যে তরঙ্গী
ডুবিলে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? তাই শ্রীকৃষ্ণ
রাধিকাকে “যৌবন পাতল ” করিতে
বলিয়াছেন । যৌবনেই বিষয়-বাসনা, ভোগ-

বাসনা প্রবল হইয়া দাঁড়ায় ; তাই বিষয়-
বাসনা বোঝাইবার জন্য “যৌবন” শব্দের
ব্যবহার করা হইয়াছে । শব্দের লক্ষণাশ্রিত
ব্যঞ্জনা-শক্তির পরিচয় এই স্থানে ভালরূপে
আমরা পাইতেছি । দানলীলায় উপস্থিত
হইয়া আমরা ইহার আরও প্রকৃষ্ট পরিচয়
পাইব । একটা মাত্র উদাহরণ দিলেই
চলিবে ।

অমূল্য রতন করিয়া গোপন
রেখেছ হিয়ার মাঝে ।

নিজ ভাল চাহ খসাই দেখাহ
ইথে কি আবার লাঞ্জে ॥

ঐ চারিষ্ট ছত্রের মধ্যে অনেক সুন্দর ভাব
লুকাইত আছে, ‘খসাইয়া’ দেখিতে পারিলে
তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে । প্রথম
সাদাসিঙ্গে অর্থটাই দেখা যাউক । অবশ্য
সে অর্থ আজকালকার রুচির সম্পূর্ণ অনু-
মোদিত হইবে না, না হইলেও কবির বাক্য-
রচনা-শক্তির পরিচায়ক বলিয়া আমরা
তাহা বিবৃত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না ।
কেবল বাক্যার্থ ধরিলে এই বুঝিতে হইবে
যে দাসী সন্দেহ করিতেছে যে যাত্রীর হৃদয়
মধ্যে কোনও ধন গুপ্ত আছে, তাই সে তাহা
খুলিয়া দেখিতে চাহে । আজকালকার
Octroi officerরা যেমন যাত্রীর সমস্ত
বাস্ক পেটরা খুলিয়া দেখিয়া লয়, ইহাও
এক রকম সেইরূপ দেখিবার দাবী । কিন্তু
আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে কবির
অভিপ্রেত অর্থ অত্র রকম ; তিনি শব্দের
ব্যঞ্জনা-শক্তিদ্বারা বুঝাইতে চাহেন যে কৃষ্ণ
রাধিকার বসনারূত স্তনবৃগল দেখিতে
চাহিতেছেন । এই তা গেল সহজ ব্যঞ্জনা ;

যদি কবি জ্ঞানদাস বৈষ্ণবকবি না হইয়া সাধারণ কবি হইতেন, তাহা হইলে ইহার অধিক আমরা আর কিছু দেখিতে বা বুঝিতে চাহিতাম না। কিন্তু আমরা জানি যে জ্ঞানদাসের গীতি ইতর ইন্দ্রিয়পরায়ণের গীতি নহে, তুচ্ছ কামগাঁথা নহে। যদি তাহা ভাবিতাম তাহা হইলে জ্ঞানদাসের পদাবলী লইয়া এতটা বকাবকি করিতাম কি না সন্দেহ। অতএব এই চরণ কয়টির যথার্থ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। আমরা এখন যে অর্থ করিব তাহাও শব্দপ্রয়োগচাতুর্য্য-বাক্যক এং সেই জন্তই এই স্থলে সে ব্যাখ্যার অবতারণা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদিগকে এই স্থলে বৈষ্ণবকবির যথার্থ স্বরূপের প্রতি ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, নচেৎ এ চরণের অর্থ পরিষ্কৃত হইবে না। বৈষ্ণবকবির কাছে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রণয়ীপ্রণয়িনী মাত্র নহেন, তাঁহাদের কাছে ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ বরং’ এবং রাধা ভক্তিময়ী—ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি ; শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা—শ্রীরাধা জীবাত্মা। এইটুকু মনে রাখিয়া উদ্ধৃত কবিতাংশের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেই ইহার তাৎপর্য্য আর ঢাকা থাকিবে না। কবি “দানলীলা” বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ পরমাত্মা জীবাত্মার কাছে তাঁহার প্রাপ্য দান বুঝিয়া লইতেছেন, ভগবান্ ভক্তের কাছে আত্মসমর্পণরূপ দান গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি দেখিয়া লইতে চাহেন যে ভক্ত তাঁহাকে কতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে, কত ধানি আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে। ভগবান্ বুঝিতেছেন যে এই জীবাত্মা এই ভক্ত তাঁহারই অধেষণে

ঘরে বাহির হইয়াছে। ইহার হৃদয়ে ভগবৎ-প্রাপ্তির, ভগবানে আত্মসমর্পণের আত্যন্তিক আগ্রহ বিরাজমান রহিয়াছে ; ভক্তিরূপ যুক্তা তাহার হৃদয়ে বলকিতেছে, তাই তিনি বলিতেছেন—

অমূল্য রতন করিয়া গোপন

রেখেছ হিয়ার মাঝে।

যখন ভক্ত প্রথম ভক্তির পথে অগ্রসর হয়, তখন তাহার অনেক বাধাবিপত্তি উপস্থিত হয় ; তখন তাহার মন একদিকে সংসারের টান আর দিকে ভগবানের টান, এই দুই বিপরীতমুখী বলের মধ্যে পড়িয়া সংশয়ে দোলায়মান হয়। সংসার বলে আমাকে ঠেলিয়া কোথায় যাও, আমিই তোমার সব, আবার ভক্তি বলে তুমি এ কি করিতেছ, তুচ্ছ সংসারমোহে পড়িয়া আসল জিনিষ অবহেলা করিতেছে। এইরূপ দ্বিধা-ভাবাপন্ন হইয়া জীবাত্মার হৃদয় সংশয়াকুল হয়। সে সংসারও ছাড়িতে পারে না, অথচ ভগবান্কে ছাড়িবার প্রবৃত্তি তাহার হয় না। যতক্ষণ এইরূপ অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাহার অনেক লুকোচুরি থাকে, অনেক বিমিশ্র ভাব থাকে, লজ্জা ঘৃণা ভয় তাহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে! এমন অবস্থায় সংসারাসক্তি আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরে, “নহি কুলটা হম বর কুলকামিনী নিকটে ইত্যাদি।” তখন মনে হয় যে ভক্তির প্ররোচনা সকল বুঝি খাঁটি নয়, এমন সংসারকে কি চেনা যায় ? ভগবানের বাক্য তখন “ইহ সব কুবচন” বলিয়া উড়াইয়া দিবার ইচ্ছাও না জাগে তাহা নহে। নব অনুরাগ জাগিয়াছে, আমার তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা

হইতেছে না, সংসারানুরাগরূপ বসনে তাহা যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে তাই হৃদয়ের যে অমূল্য রত্ন ভক্তি তাহা হৃদয়ে গুপ্ত ভাবে রহিয়াছে, ভক্ত অমূল্য রতন গোপন করিয়া হিয়ার মাঝে রাখিয়াছে।

কিন্তু দাসী আজ আর তাহা গোপন করিয়া রাখিতে দিবেন না।

যং করোষি যদশাসি

যজ্ঞহোষি দদাসি যং।

যতপশ্যসি কেউন্তেয়'

তং কুরুষ মদর্পণম্ ॥

যদি আমাকে পাইতে চাও, তবে আমায় সব অর্পণ কর, ইহাই তাঁহার চিরদিনের প্রতিজ্ঞা। কথায় বলে 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।' শ্রীরাধার হৃদয়ে এখনও এই তিনই বিরাজিত রহিয়াছে। তিনি কৃষ্ণ প্রেম চাহেন, কিন্তু সেই প্রেমে এখনও আত্মহারা হইতে পারেন নাই, এখনও সংসারের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি রহিয়াছে;—ভগবানের গতি তীব্র আকর্ষণ আবার সংসারের প্রতিও অনেক প্রকার আসক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবদাসক্ত জীবকে লোকে পাগল বলে, সাংসারিক লোকে "কুল" বলিয়া গ্রহণ করিয়া সেই কুলরক্ষার জন্ত ব্যস্ত হয়। জীবাত্মার এই মোহ ভাঙ্গে কিসে? ভগবান্ নিজে বলিয়াছেন:—

দৈবী হ্যেবা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের মায়াবরণ খুচাইয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতে প্রস্তুত। তবে তাঁহার সেই রূপালাভের

জন্ত ভক্তকেও সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিতে হইবে, কিছু ঢাকিলে চলিবে না, পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। ভক্ত যদি নিজের ভাল চায়, তবে তাহার হৃদয় কোনও প্রকার আবরণে ঢাকিয়া রাখিলে চলিবে না; যদি সে, হৃদয়ের সমস্ত ভাব, সমস্ত রুচি ভগবচ্চরণে ঢালিয়া দিয়া লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে, যদি সেই মহাদানীকে সমস্ত দান করিতে পারে তবেই তাহায় শ্রেয়ঃ; তাই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরূপিনী নিজের রসান্বাদগ্রাহিনী শক্তির প্রতিমূর্তি আনন্দময়ী শ্রীরাধাকে সেই লজ্জা ভয় ত্যাগ করিতে বলিতেছেন, সংসারানুরাগরূপ বসন খসাইয়া তাঁহার হৃদয়ে কি কি মহাভাব আছে তাহাই দেখাইতে বলিয়াছেন—

নিজ ভাল চাহ খসাইয়া দেখাহ
কিন্তু এই যে খসাইয়া দেখান, এ কি সহজ গা? মানুষ সব করিতে পারে, কিন্তু সংসারের নিন্দাস্তৃতিকে অবহেলা করিতে পারে না। তাই মানুষ সর্বদা আত্ম-গোপনে তৎপর, যতক্ষণ না ভগবৎরূপায় ভগবানে সম্পূর্ণরূপ আত্ম নিবেদিত হয় ততক্ষণ সে কিছুতেই সাংসারিক লজ্জা ছাড়িতে পারে না। কিন্তু এ লজ্জা না ছাড়িলেও তো ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ, চরম প্রয়োচনা—

ইথে কি আবার লাঞ্চে?

হয় তো ইহাতেও ফল ফলিতে না পারে; তাই 'হই বাহু পসারি' ভগবান্ তাঁহার পথ আগলাইলেন। যদি এ পথে আসিয়াছ

তবে আমাকে ছাড়াইয়া আর যাইও না,—
যাইতে পারিবৈ না, আমার দান আমাকে
দিয়া যাও। কয়টা ছত্রে কবি জ্ঞানদাস
একটা মহান্ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন;
কিন্তু সেই ভাবরূপ অমূল্য রত্ন তাঁহার
বাক্যের হৃদয়ের মাঝে গোপন ভাবে বিরাজ
করিতেছে, তাহাকে আমাদের খসাইয়া
দেখিতে হইবে—“ইথে কি আবার লাজে”।
হয় তো অনেকে ইহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা
মনে করিয়া গায়ে জরের প্রকোপ অনুভব
করিবেন, কেহ বা এই চরণের ভিতর হইতে
এ ব্যাখ্যা আসিতে পারে তাহা ভাবিতেও
পারিবেন না। কেহ চরণটিকে অঙ্গীণ
ভাবিয়া মুখ ফিরাইবেন। যে যে ভাবেই

ইহাকে গ্রহণ করুন কেহই কিন্তু অস্বীকার
করিতে পারিবেন না যে, এই চরণে কবি
বাক্যের ব্যঞ্জনা-শক্তির নিপুণ ব্যবহার
করিয়াছেন।

আমরা জ্ঞানদাসের শব্দপ্রয়োগ পরিচয়
দিতে গিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর মূলস্থত্রে
আসিয়া পড়িয়াছি—সময়ে এই স্থত্রের
অনুসরণ করিব; আপাততঃ তাঁহার পদা-
বলীর সম্বন্ধে অপরাপর কথা বলিয়া লই।
এখনও আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলীর ভাব
সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার অবসর পাই
নাই, অতঃপর তাঁহার ভাবের পরিচয় গ্রহণ
করিতে প্ররুস্ত হইব। (ক্রমশঃ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

ফোয়ারা *

(সমালোচনা)

বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসর শ্রীশ্রী-
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। গ্রন্থ-
কর্তার এই পরিচয়, পুস্তকের কভারেই
পাওয়া যায়! পুস্তকের ভিতরে একস্থানে
কোকিল প্রসঙ্গে গ্রন্থকর্তা নিজের অন্তরূপ
পরিচয় ইঙ্গিতে দিয়া সংসাহসের পরিচয়
দিয়াছেন।† গ্রন্থকারের বাকী পরিচয় গ্রন্থ-
খানিই দিবে; আর দিবে তাঁহার পরবর্তী
রচনাসমূহ! আমরা এখন পুস্তকখানির কিছু
পরিচয় দিব।

গ্রন্থকারের মতে দুইটি কারণে সচরাচর

* শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ৬৫ নং কলেজ
প্লট ভট্টাচার্য্য এও মল হইতে প্রকাশিত।

† ফোয়ারা ১৫২ পৃঃ ১০ম লাইন।

গ্রন্থকারগণ পুস্তক প্রকাশ করেন,—একটি
সুকুমার মতি বালকবালিকাগণের শিক্ষা-
সৌকর্য্যার্থে দ্বিতীয়টি বঙ্গুবর্ণের সনির্ভর
অনুরোধে।” কথাটা সত্য বটে, এ যেন
কতকটা রক্ত জননীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতে,
তৃতীয় পক্ষে দার পরিগ্রহ,—অথবা প্রথম ও
দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে মেয়েদের মায়াবী করার
লোকাভাবে বাধ্য হইয়া বিবাহরূপ গলগড়
করা!

নিবেদনে গ্রন্থকার বলেন এই দুইটির
কোন কারণেই তিনি গ্রন্থ * প্রকাশ করেন
নাই। শুধু তাঁর মনের তৃপ্তির জন্ত! আরও
একটা কারণ এখানে বলেন নাই, কিন্তু

* অন্ততঃ এ পুস্তক।

ইহার কিছু পূর্বেই সঙ্কোচের সহিত নিবেদনের প্রথমেই বলিয়াছেন—‘বালুকা কঙ্করময় মরুভূমিতে স্থানে স্থানে ফোয়ারা আছে, শিক্ষকের শুষ্ক জীবনেও মাঝে মাঝে ভাবের ফোয়ারা খেলে; এই ফোয়ারায় আধি ব্যাধি শোক তাপ ক্লিষ্ট সংসার-পথিকের একদণ্ডের তরেও কি শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হইবে না?’

গ্রন্থ সমালোচনায় প্ররক্ত হইবার পূর্বেই বলিয়া রাখি ‘গ্রন্থকারের এই আশায় আশঙ্কার কোন কারণ নাই! তাঁর গ্রন্থ-প্রকাশ সার্থক হইয়াছে।

কথা উঠিতেছে, শিক্ষকের জীবন কি শুষ্ক! যে জীবন শত শত জীবনকে সরস করিয়া দেয়, তাহা কি শুষ্ক! হিন্দুর আদর্শ বাল-বিধবা, যিনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি সংসারে বহু জীবনকে সুখ শান্তিময় করিয়া রাখেন সেই বিধবার পবিত্র জীবন কি শুষ্ক? অন্নের পক্ষে যাহা সরস, নিজের পক্ষে তাহা সেরূপ না হওয়া কি অসম্ভব? কিন্তু সে অনেক কথার কথা! ইহা তর্কের বিষয় নহে, অনুভবের। শিক্ষকের জীবন অনেকটা হিন্দুর ঘরের বাল-বিধবারই মত, কিন্তু এ প্রসঙ্গ তুলিয়া, গ্রন্থের সমালোচনারূপ ‘টেকনিকালিটি’তে যৌক্তিকতা নষ্ট করিলে তা চলিবে না। ‘মেরিটে’ বিচার করিতে হইবে। স্মরণ্য এ সকল প্রসঙ্গে আর কাজ নাই।

মরুভূমে ওয়েসিস্ ছুটে, পাষাণে ফোয়ারা ফুটে, এ কথা খুব সত্য। উপস্থিত প্রমাণ ললিত বাবুর এই ফোয়ারা। ফোয়ারায় অধিকাংশই রসের উৎস, তাহার

যোলটি ধারা। ঠিকই হইয়াছে, অল্পে ষোড়শ ব্যঞ্জন বড় তৃপ্তিকর। ‘রমণীর ষোড়শ বৎসর বড় মধুর, আবার ষোলকলা ভিন্ন সুধাকরের পূর্ণতা ঘটে না। কিন্তু, হাতের পাঁচ অঙ্গুল সমান হয় না। ফোয়ারার যোলটি রচনাই যে, সমান রসের ফোয়ারা তা বলিতে পারি না। বারাণসী-দর্শনে কবিতাটি এ গ্রন্থে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, বরং না দিলেই ছিল ভাল, ইহাতে রস নাই, বরং একটু কস আছে; তবে গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন প্রাণীজগতের ত্রায় সাহিত্যজগতে অপত্যম্বেহ অন্ধ। ইহার উপরে আর কথা চলে না। তারপর তীর্থ-দর্শন। লেখাটি বেশ, কিন্তু এ গ্রন্থে উহা তেমন খাপ খায় নাই। আর ‘বিরহ’? বিরহে লেখার নূতনত্ব আছে, মুসিয়ানা আছে, ভাবুকতা আছে, কিন্তু এ গ্রন্থের পক্ষে বড় গুরুপাক। বাসরের মজলিসে “মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,” এ সঙ্গীত—হইলেনই বা বর বড় সুকণ্ঠ—বরের পক্ষে শোভন হয় না; এ ক্ষেত্রেও বিরহে সেই দোষ ঘটিয়াছে। আর বাকি তেরটি রচনা, সত্যি রসের ফোয়ারা। এই রসের সঙ্গে আবার নানা মূল্যবান উপলব্ধি আছে। এই সকল রচনায় লেখকের পাণ্ডিত্য, গবেষণা, বহু-দর্শিতা প্রভৃতি বহুগুণের সমাবেশ বেশ স্বচ্ছন্দভাবে মিশিয়া গেছে, অথচ বিগা জাহির করিবার লেশমাত্র চেষ্টা আছে বলিয়া কুতূহল মনে হয় না। ললিত বাবু বিগা দেখাইয়াছেন, রক্তও দিয়াছেন, তাহার বিদ্যারত্ন উপাধি সার্থক।

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে খুঁত নাই

এমন বলি না, স্থানে স্থানে এক আধটা অসাবধানতা আছে, ‘প্রবাসের স্মৃতি’ অত্যাচারের অত্যাচার আছে, দুই একটা ফুট নোটও রসিকতা একটু ‘মেঠো’ হইয়াছে। তা এ সকল ক্রটি ধর্তব্যের মধ্যেই নহে।

ফোয়ারার রচনায় পাণ্ডিত্য আছে, এ কথা বলিয়াছি, কিন্তু পাণ্ডিত্যের চেয়ে সরগতার জ্ঞানই ফোয়ারার আদর বেশী হইবে।

ভূগোলে পড়িয়াছিলাম, পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল; সে বোধ হয় যাকাতার আমলের নির্দেশ; সকল দেশের কথা ঠিক বলিতে পারি না কিন্তু এখন বাঙ্গালার নদ নদী খাল বিলের অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, স্রবের পরিমাণ বাড়িতেছে। পৃথিবীতে রসের ভাগও এইরূপে ক্রমেই কমিতেছে। কি প্রকৃতিতে কি মানবহৃদয়ে সর্বত্রই সরসতা কমিয়া কাঠিন্য বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং সাহিত্য-জগতে যে ইহার বৈলক্ষণ্য ঘটিবে ইহা বিচিত্র নহে। অল্প দেশের সাহিত্যের কথা, জোর করিয়া বলিবার সাধ্য আগার নাই, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে আজকাল হাস্যরসের, পরিহাসরসিকতার বড়ই অভাব। বাঙ্গালার দীনবন্ধু, মাইকেল বঙ্কিমবাবুর “কমলাকান্ত” যে ভাবে হাসাইয়া গিয়াছেন, সে হাসি আর কেহ হাসাইতে পারে না। কয়েক বৎসর পূর্বে কোন আধুনিক কমলাকান্ত প্রয়াগে দেখা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রয়াগে হিন্দু পূর্ণপুরুষের জ্ঞান বাহা “দান” করিতে যান নবীন কমলাকান্তও স্বর্গীয় কমলাকান্তের বা বঙ্গ রস-সাহিত্যের তাহাই “প্রদান”

করিয়াছিলেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথ এখন আর রহস্ত আলোচনা করেন না, তিনি এখন ঋষিবে অগ্রসর; অমৃতলালের অমৃতধারাও ক্ষীণ হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এখন রস পরিপাক করিয়া “নাটক” জমাইতেছেন— আর দুই একজন যারা রসের পাক চাপাইয়াছিলেন তাঁরাও রসিয়া গিয়াছেন, তাই আজ বঙ্গসাহিত্যের এই রসহীনতার দিনে ললিত বাবুর ফোয়ারায় আমরা তৃপ্ত এবং আশান্বিত হইয়াছি।

ফোয়ারায় ষোলটি মূল প্রবন্ধের মধ্যে ১৮টি চুটকি, আর খানিকটা চুটকি সাহিত্য— সেটাকে আধখানা রচনা বলিলেই চলে— সুতরাং মোটের উপর সাড়ে আঠারটি চুটকি আছে। অক্ষয় বাবুর “সাধারণী” সাড়ে আঠার ভাজার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ইহাতে সব আছে, এমন কি আধখানা লঙ্কাও আছে, নাই কেবল একটু জল অর্থাৎ রস। কিন্তু আমাদের ললিত বাবুর এই সাড়ে আঠার ভাজার লঙ্কাও আছে আবার জল বা রস তাও ঢালাও। যদি সে রস কেহ খুঁজিয়া না পান তবে বুঝিব তাহার রসাস্বাদনের দিন কাল গিয়াছে।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব, কিন্তু “কূপে পশু পয়োনিধাবিব জলং গৃহাতি তুলাং ঘটং” এ রসের সাগরের পরিচয় ঘটের সাহায্যে কি বুঝাইব?

যিনি এ রসের পরিচয় ষোল আনা পাইতে চান, তিনি বারো আনা খরচ করিয়া পাঠ করুন, হাতে হাতে চারি আনা লাভ

পাইবেন। আমরা ফোয়ারার আর বেশী সূখ্যাতি করিতে কিছু সঙ্কুচিত হইতেছি, কারণ ফোয়ারার ঘোলটি মূল প্রবন্ধের মধ্যে ‘বঙ্গদর্শনে’ চারিটি বাহির হইয়াছিল, সুতরাং ফোয়ারার সূখ্যাতিতে আমাদের কিছু আত্মপ্রশংসা আসিয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ নাকি বলিয়াছিলেন আত্মহত্যা ও আত্মপ্রশংসা দুইই সমান। ললিত বাবুর জ্ঞান আমাদিগকে শেষ আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতে হইল! এমন স্বার্থভ্যাগ সাহিত্যজগতে কি দুলভ নহে?

ফোয়ারার কয়েকটি রচনা বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল, আমরা ভাগলপুরের সম্মিলনে উপস্থিত ছিলাম, ললিত বাবুর “বর্ণমালায় অভিযোগ” প্রবন্ধ শ্রবণে সভায় কি হাস্যলহরী উঠিয়াছিল, কি আনন্দের উচ্ছ্বাস খেলিয়াছিল, কি প্রশংসার হাওয়া বহিয়াছিল, তাহা যিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন না,

তাহাকে বুঝান শক্ত। ললিত বাবু এক স্থানে বলিয়াছেন যে রহস্য রচনারূপ রঙের সাতা ক্রফ করিয়া বঙ্গদেশের টেকা জ্বিতিয়া নিলে হয় না? “উড়ুপেনাস্থি সাগরং” আর কি! —সত্য সত্যই ললিতবাবুর অনেক রচনা অনেক টেকাকেও টেকা দিয়া থাকে ফোয়ারার যথাযথ সমালোচনা আমরা করিতে পারিলাম না, কারণ আমরা রসিক নহি। ললিতবাবু আমাদিগকে এ গ্রন্থ উপহার দিয়া ভুগ করিয়াছেন, কারণ তিনি ত জানেন—

“অরসিকেনু রহস্তনিবেদনম্

শিরসি যা লিখ মা লিখ মা লিখ মা লিখ।”

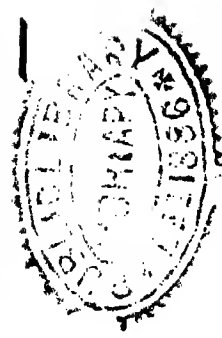
সমালোচক সম্বন্ধে সে আক্ষেপ করিতে হইলেও, আমরা আশা করি,—বাক্সালার পাঠক সমাজ সম্বন্ধে এ প্রকার অভিযোগ করার কোন কারণ গ্রন্থকারের ঘটিবে না? —ফোয়ারার নূতন সংস্করণে আমরা শীঘ্রই তাহার যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিব।



বঙ্গদর্শন ।

চরিত-চিত্র

স্বরেন্দ্রনাথ



আধুনিক রাষ্ট্রীয় কর্মজীবনে স্বরেন্দ্রনাথের স্থান
স্বরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী। কিন্তু তাঁর
প্রতিভার প্রেরণা ও সুদীর্ঘ কর্মজীবনের
প্রভাব বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া, সমগ্র
ভারতবর্ষকে অধিকার করিয়া আছে।
আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে আরও
অনেক শক্তিশালী লোকনারক আছেন।
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোনও কোনও
বিষয়ে স্বরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাও
অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁদের
সকলের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাই আপন আপন
প্রদেশেতে আবদ্ধ। লালা লাজপত্ রায়ের
নাম ভারতবিশ্রুত হইলেও, কর্মক্ষেত্র, প্রকৃত
পক্ষে, পকনদের সীমা অতিক্রম করে নাই।
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও সেইরূপ কেবল
এলাহাবাদ ও আগ্রার যুক্ত-প্রদেশের রাষ্ট্রীয়
জীবনেই কতকটা নেতৃত্ব-মর্যাদা পাইয়াছেন,
ভারতের অত্যাশ্র প্রদেশের লোকে অনেকেই
তাঁর নাম জানে, কিন্তু কেহই এ পর্যন্ত তাঁর
প্রতিভার বা কর্মজীবনের প্রেরণা অনুভব
করে নাই। স্যার ফিরোজশাহ মেহেতাব
আসম্ভবজুবর্ণ যাহাই বলুন না কেন, তাঁর

রাষ্ট্রীয়-নেতৃত্বও বোম্বাই'এর পার্শী ও গুজ-
রাটের বেনিয়া সম্প্রদায়েই সাক্ষাৎভাবে স্বীকৃত
হয়; বোম্বাই প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয় সমাজ,
কিন্তু বাংলার কি পঞ্জাবের শিক্ষিত সম্প্রদায়
এ পর্যন্ত তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করেন নাই।
তবে কংগ্রেসে বা জাতীয় মহাসমিতিতে
কিছুদিন পর্যন্ত যে তাঁর একটা অনন্তপ্রতিদ্বন্দী
প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাও অস্বীকার
করা যায় না। আর ইহার হেতুও একরূপ
চক্ষের উপরেই পড়িয়া আছে। জম্মাবাদি
কংগ্রেস স্যার ফিরোজশাহ মেহেতা, স্বর্গীয়
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এল্যান, ও
হিউম্‌এবং স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, ইহাদের
অর্থেই বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে।
অনেক সময় কংগ্রেসের অপরাপর নেতৃবর্গ
কংগ্রেসের ব্যয় সংকুলনের জন্ত আপনাদের
প্রতিশ্রুত চাঁদা যথাসময়ে আদায় করেন
নাই বা করিতে পারেন নাই বলিয়া এই
চারিজনকেই বহুদিন পর্যন্ত এই অনাদায়
টাকার দায়ভারও বহন করিতে হয়। এ
অবস্থায় যাহাদের কার্পণ্য বা ঔদাসীন্যে স্যার
ফিরোজশাহ মেহেতাকে বৎসর বৎসর এত

টাকার ঝুঁকি বহন করিতে হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে কংগ্রেসের কার্যকলাপে মেহেতা সাহেবের অভিপ্রায়ের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। মেহেতা সাহেবের নিকটে কংগ্রেসের এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্ন-ঋণ স্বরণ করিয়াই, অপরাপর নেতৃবর্গ কংগ্রেসের কার্য পরিচালনায় তাঁর অভিমত ও আবদার মানিয়া চলিয়াছেন। কংগ্রেসের অত্যন্তম উত্তমর্গ বলিয়াই কংগ্রেস-মণ্ডপে স্যার ফিরোজশাহ বেহেতার একটা প্রতাপ ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুবা কংগ্রেসের বাহিরে, দেশের সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মাকর্ষের উপরে, কিম্বা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের চিত্তে, মেহেতার চরিত্রের বা প্রতিভার কোনোই প্রভাব কখনই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায়, কোনো কোনো বিষয়ের আলোচনায়, অপরাপর সভাগণের তুলনায়, কখনো কখনো, অসাধারণ সাহসিকতার ও বিশেষ কৃতিত্বের প্রমাণ প্রদান করিয়া, শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতবাসী একটা খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছেন, সত্য। আর এ খ্যাতি ও মর্যাদা তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের উপরেই যে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত, ইহাও অতিশয় সত্য। গোখলে সন্ধিধান, ও কোনো কোনো বিদ্যায় স্বল্পবিস্তর বিশেষজ্ঞতাও তাঁর আছে। যুরোপীয় অর্থনীতি-শাস্ত্রে গোখলের যে পরিমাণ অধিকার জন্মিয়াছে, ভারতের আর কোনো লোকপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মনায়কের তাহা আছে কি না সন্দেহ। যে প্রণালী অবলম্বনে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিকেরা

বিবিধ রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বিচার-আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই প্রণালী অবলম্বনে পরমত-খণ্ডন ও স্বমত-প্রতিষ্ঠায় গোখলে একরূপ সিদ্ধহস্ত। ইংরেজের চিরাত্যন্ত বাদ-বিদ্যায় ইংরাজিতে ইহাকে ডিবেট (Debate) বলে—লাট কার্জ্জনের মত 'পারদর্শী' লোক ইংল্যান্ডে এখন কম। অথচ কখনো কখনো এই ল্যাট কার্জ্জনকেই এ বিষয়ে গোখলের নিকটে হার মানিতে হইয়াছে। আর আপনার বিচারবুদ্ধি অলুয়ায়ী স্বদেশের সেবাস্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া, গোখলে এ পর্যন্ত যে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সহকারে এই সেবারত উদ্যাপন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, ভারতের অল্প কোনো লোকনায়কের মধ্যে সেরূপ ঐকান্তিকী নিষ্ঠাও দেখা যায় নাই। গোখলের মধ্যে যে সকল গুণের সমাবেশ হইয়াছে, সে সকল গুণ এদেশের অল্প কোনো প্রসিদ্ধ লোকনায়কের মধ্যে সে মাত্রায় দেখা যায় নাই; ইহা সত্য বটে, কিন্তু তবুও গোখলের বর্তমান ভারতবাসী খ্যাতি যেকোনো তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্র বলেই অর্জিত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে যদি গোখলেকে হাতে ধরিয়ান্না তুলিতেন; পুনরার সার্কজনীন সভা যদি, রাণাড়ের অনুরোধে, গোখলেকে ওয়েল্‌বী কমিশনের সম্মুখে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ না করিতেন; প্রথম বারে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, বিলাতী সংবাদপত্রে, প্লেগ-বিধানের প্রবর্তন সম্বন্ধে পুনরার ইংরেজ সৈন্তগণের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছিলেন, গোখলে যদি জাহাজ-ঘাটেই সর্বোত্তোভাবে

তার প্রত্যাখ্যান করিয়া বোম্বাইএর রাজ-পুরুষদিগের অন্তঃপ্রভাজন না হইতেন; ফিরোজশাহ মেহেতার শিষ্যত্ব ও আত্মগত্যা স্বীকার করিয়া, তাহারই প্রসাদে, যদি তিনি বোম্বাই-ব্যবস্থাপকসভার বে-সরকারী সভাগণের প্রতিনিধি হইয়া বড় লাটের ব্যবস্থাপকসভায় না আসিতেন; সেখানে লাট কর্জন আপনার স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্যগুণে যদি গোথেলের বিচারযুক্তির যথাসাধ্য খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াই, যদি তার মেধার ও পাণ্ডিত্যের সম্বন্ধনা না করিতেন; ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে তথাকথিত চরমপন্থীদিগের অভ্যুদয় হইলে, মিটো ও মলে প্রভৃতি ভারতশাসনবস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষেরা যদি এই নূতন রাষ্ট্রীয়-নৃত্তিকে সংযত ও প্রতিহত করিবার জন্য গোথলে ও তাঁর দলের লোকনায়কগণকে লোক-চক্ষে বাড়াইয়া তুলিতে চেষ্টা না করিতেন;—এই সকল বাহিরের ঘটনাপাত না হইলে, গোথলে যে শুদ্ধ আপনার প্রতিভার বা চরিত্রের বলে, ভারতব্যাপী এই খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন, ধীরভাবে সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু এ সকল যোগাযোগ সত্ত্বেও গোথলে যে সমগ্র ভারতের আধুনিক-শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব-মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই, ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে। কেবল এক সুরেন্দ্রনাথই এই দেশে, এই কালে, এই অনন্তপ্রতিযোগী নেতৃত্বের দাবী করিতে পারেন।

যে সকল বাহিরের ঘটনা ও অবস্থার যোগাযোগে এ দেশের অপরূপ রাষ্ট্রীয় কর্ম-

নায়কগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের প্রথমাবস্থায় এবং তাহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত, তাঁহার ভাগ্যে সে সকল যোগাযোগ ঘটে নাই। রাজপুরুষদিগের আসন্নসংসর্গলাভ এ দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র প্রশস্ত পথ। আর এ দেশে ধনবলে ও পদবলেই রাজপুরুষদিগের প্রসাদলাভ করিতে পারা যায়। আজ লোকে বলে, সুরেন্দ্রনাথ লক্ষপতি হইয়াছেন। কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভসময়ে সুরেন্দ্রনাথের এ ধনপরিবাদ ছিল না। গোথলেকে রাণাড়ে নিজের হাতে ধরিয়া বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বাংলার তদানিন্তন লোকনায়কগণের মধ্যে একজনও একপভাবে সুরেন্দ্রনাথকে রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। বাংলার ধনী ও পদস্থ লোকেরা আজ সুরেন্দ্রনাথের সাহায্য ছাড়া কোনো স্বাদেশিক অন্তঃস্থানে ব্রতী হইতে সাহস পান না। কিন্তু ইহাঁদের জোষ্ঠেরা একদিন রাজদ্বারে-লাঞ্ছিত সুরেন্দ্রনাথকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া, তাঁরা হইতে দূরে থাকিতেন। বহুদিন পর্য্যন্ত রাজপ্রসাদলোলুপ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাগণ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনায় সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এক মঞ্চে উপবেশন করিতেও শঙ্কিত হইতেন। আজ সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজরাজপুরুষদিগের দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে সম্বাদিত হইতেছেন। কিন্তু একদিন তিনি এই রাজকর্মচারী সম্প্রদায় নিকট লাঞ্ছিত হইয়া রাজকর্ম হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। আর বহুদিন পর্য্যন্ত সে লাঞ্ছনার কথা এ দেশের ইংরেজ-

রাজপুরুষেরা বিশ্বৃত হন নাই। প্রত্যুত খতই সুরেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনায় দেশের জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া, আপনি সেই শক্তি সাহায্যে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন, ততই তাঁহারা সেই প্রাচীন লাঞ্ছনার স্মৃতিকে প্রাণপণে জাগাইয়া রাখিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাও সকলেই জানেন। সেই রাজপুরুষেরাই, আজিকার অবস্থাধীনে, আপদ-বিপদে, প্রতিপদেই দেশের প্রজামতের পোষকতা-লাভের লোভে, সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন। যে কনগ্রেসের কাজকর্ম আজ সুরেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া কিছুতেই চলে না ও চলিতে পারে না; একদিন, কনগ্রেসের জন্মকালে, তাহার জন্ম-দাতা ও ধাত্রীবর্গ সকলে প্রাণপণে সেই সুরেন্দ্রনাথকে তাহার বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, এ কথাও মিথ্যা নয়। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার ফিরোজশাহ মেহেতা উভয়েই সুরেন্দ্রনাথকে কনগ্রেসের কর্মে আমন্ত্রণ করিতে চান নাই। হিউম সাহেবও প্রথমে তাঁহাদের মতেই মত দিয়াছিলেন। হিউম ভারত গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ছিলেন। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি যে অশ্রদ্ধা বহুদিন হইতেই জাগিয়াছিল, হিউমের মনেও যে তাহা ছিল না, এমন নহে। তার উপরে যখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহেতা প্রভৃতি কনগ্রেসী নেতৃবর্গ সুরেন্দ্রনাথের সাহায্যগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন হিউম যে সেই মতে সায় দিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু কনগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার জন্ত হিউম যখন কলিকাতায় আসিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথকে

ছাড়িয়া বাংলা দেশের লৌকমত্যকে কনগ্রেসে টানিয়া আনা যে একান্তই অসম্ভব, ইহা দেখিলেন ও বুঝিলেন, তখন তাঁর মত ফিরিয়া গেল এবং বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহেতা প্রভৃতির আপত্তি অগ্রাহ করিয়া, গুণগ্রাহী হিউম স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথকে কনগ্রেসের কর্ম-নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইলেন। আজ সুরেন্দ্রনাথের অনেক সহায়-সম্পদ লাভ হইয়াছে। আজ তিনি দেশের রাজপুরুষ ও রাজারাজড়ার দ্বারা সম্বন্ধিত ও সম্মানিত হইতেছেন। কিন্তু একদিন তাঁহাকে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায়, “শোথের শেয়ারার” মত, দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মশ্রোতের ঘাটে ঘাটে ফিরিতে হইয়াছিল। আর আজ তিনি আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে যে অনন্তপ্রতিযোগী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা কোনো প্রকারের অনুকূল ঘটনাপাতের ফল নহে। এ কীর্তি অর্জনে কেহ তাঁহাকে কোনো প্রকারে সাহায্য করে নাই। ইহা সর্ব্বতোভাবেই তাঁর স্বোপার্জিত। কেবল আপনার প্রতিভা ও পুরুষকারের বলেই সুরেন্দ্রনাথ এ দেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ম-জীবনে এই অনন্তপ্রতিযোগী নেতৃত্ব-মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব ও মহত্ব।

সুরেন্দ্রনাথের চরিত্র

অশেষ প্রকারের প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই সকল প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া তাঁর এই কর্মজীবন যে এমন অদ্ভুত সফলতা লাভ করিয়াছে, ইহাতে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ মানসিক বলেরই প্রমাণ প্রদান

করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বীর পুরুষ নহেন। আমরা সচরাচর যাহাকে বীরত্ব বলি, তার অন্তরালে অনেক সময় একটা ফলাফল-বিচার-বিরহিত এক-গুণানো লুকাইয়া থাকে। এই প্রকারের একগুণানো সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে নাই; থাকিলে, সুরেন্দ্রনাথ যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা কখনই পাইতেন না। সুরেন্দ্রনাথ যে খুব সাহসী পুরুষ, এমনো বলা যায় না। যে অসমসাহসিকতা অসাধ্য সাধনের প্রয়াস করিয়া, সর্বস্বান্ত হইয়া, পরিণামে নিঃশেষ নিষ্ফলতা মাত্র লাভ করে, সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে কখনো সেরূপ অসমসাহসিকতা দেখা যায় নাই। কিন্তু অবিচলিত ধৈর্য্য যে বীরত্বের লক্ষণ, আর নিন্দা-স্তুতি উভয়কে সমভাবে উপেক্ষা করিয়া আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে চলিবার শক্তির ভিতরে যে সাহসিকতা লুক্কায়িত থাকে, সে বীরত্ব ও সে সাহস সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বদাই দেখা গিয়াছে। যে মনের বল থাকিলে লোকে বিরোধী শক্তির আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু কখনোই তাহার নিকটে নত হয় না;— এই আত্মঘাতী মানসিক বল সুরেন্দ্রনাথের কখনো ছিল না। কিন্তু যে মনের বল আপনার রুচি ও প্রবৃত্তি, মান ও অপমান, আয়াস ও শ্রম-ক্লেশ, এ সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া, সকল অবস্থাতেই, সেই অবস্থার সঙ্গে যথাসম্ভব সন্ধি ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, আপনার লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে পারে, সুরেন্দ্রনাথের সে মানসিক শক্তি যে পরিমাণে আছে, আমাদের আর কোনো লোকপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয়-নায়কের মধ্যে তাহা নাই। যে নিগূঢ় কৌশল-সহায়ে

জীব বিবিধ বিরোধী অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়াও, প্রাকৃতিক নির্দোষতার নিয়মানুযায়ী, আত্মরক্ষা ও আত্মচরিতার্থতালাভে সমর্থ হয়, সুরেন্দ্রনাথ অতি আশ্চর্য্যরূপে সে কৌশলটি লাভ করিয়াছেন। এই কৌশলটি যে জীব লাভ করিতে পারে, সেই কেবল বিশ্বব্যাপী নিশ্চয় জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা করিতে পারে। এই কৌশলতা-গুণেই সুরেন্দ্রনাথ জীবন-সংগ্রামের জয়টাকা লগাটে ধারণ করিয়া, ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের রত্ন-প্রাধান্য

সুরেন্দ্রনাথের অন্তঃপ্রকৃতি যে খুব সাত্ত্বিক তাহা নয়। নির্মলত্ব, ভাস্কর্য ও অনাময়ত্ব, এ সকলই সত্ত্বের লক্ষণ। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের বুদ্ধি অতীন্দ্রিয় বস্তু-ধারণায় তৎপর হয়; চিত্ত বিকারশূন্য ও কর্ম নিষ্কাম হয়। এ সকলের কোনো লক্ষণই এ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের চিন্তায় ও চরিত্রে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁর স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনা, যুগযুগান্তব্যাপী তপস্যার ফলে, বহুদিন হইতেই সম্বন্ধপ্রধান হইয়া আছে, সত্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে কালে কর্মবশে এই সমাজের পুরাতন সাত্ত্বিকতাও ঘোর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বত্রই যুগসন্ধিকালে এইরূপ হইয়া থাকে। এইজন্য যে শিক্ষা ও সাধনায় এই সাত্ত্বিকীভাব ফুটিয়া উঠে, সুরেন্দ্রনাথ সে শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাল্যকালে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানের

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে, নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে, স্বদেশের সনাতন ভাব ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি একেবারেই লোপ পাইতেছিল। সমগ্র দেশই তখন ঘোরতর সামাজিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া, নিজেদের প্রাচীন সভ্যতার ও সাধনার প্রাণহীন ও অর্থশূন্য বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের অল্পসরণেই নিযুক্ত ছিল। তার ভিতরকার সত্যের ও মহত্বের অনুভূতি, সাধু-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে কচিৎ থাকিলেও, সাধারণ গৃহস্থদিগের মধ্যে একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। তার উপরে, সুরেন্দ্রনাথের পিতা, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুরোপীয় সভ্যতার ও সাধনার প্রবল রাজসিক আদর্শের দ্বারা একান্তই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই স্বল্পবিস্তর এই দশা ঘটিয়াছিল। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথকে কেবল ইংরেজী শিখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইংরেজের চালচলন অভ্যাস ও ইংরেজের চরিত্র লাভ করিবার জন্ত, তিনি অতি অল্প বয়সেই সুরেন্দ্রনাথকে ডব্লিউ স্কুলে প্রেরণ করেন। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথ একরূপ বাল্যাবধিই কলিকাতার ইংরেজ ও ইউরেশীয় বালকগণের সংসর্গে থাকিয়া স্কুল কালেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তার পরে, বিলাতে যাইয়া এই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য উদযাপন করিয়া সিভিলিয়ানী-পদ লইয়া, দেশে ফিরিয়া আসেন। আজিকালি বিলাত ও ভারত যেন ঐ'ঘর ও'ঘর হইয়া পড়িয়াছে, সত্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যখন শিক্ষার্থী হইয়া বিলাত গমন করেন, তখন এইরূপ ছিল না। সেকালে বিলাত যাওয়া এত সহজ ছিল না

বলিয়া, বিলাতপ্রত্যাগত হিন্দুদিগের নিজেদের প্রাণে একটা প্রবল অহঙ্কার এবং কোনো কোনো দিক্ দিয়া সমাজেও তাঁহাদের একটা অননুসাধারণ মর্যাদা ছিল। সে কালের বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী হিন্দুদের সঙ্গে, তাঁহাদের প্রাচীন পৈতৃক সমাজের কোনো প্রকারের যোগাযোগ প্রায়ই থাকিত না। সমাজও তাঁহাদিগকে পতিত বলিয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখিত। আর তাঁহারা নিজেরাও সাহেব সাজিয়া, সহধর্ম্মিণীকে গাউন পরাইয়া যেম সাজাইয়া, “নেটিভদের” সঙ্গে প্রযুক্তভাবে মেশামেশি করিলে কি জানি এই সদ্যলব্ধ সভ্যতার মর্যাদালঙ্ঘন হইয়া পড়েন, সেই ভয়ে আপনাদের সমাজ হইতে বর্জ্যসম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। সুরেন্দ্রনাথও প্রথম বয়সে তাঁহাই করিয়াছিলেন। আর বিধাতার চক্রান্তে ও তাঁর স্বদেশের স্বকৃতি বলে, সুরেন্দ্রনাথের সিভিলিয়ানী-পদ যদি খসিয়া না পড়িত, তাহা হইলে আজি পর্য্যন্তও তিনি এই ভয়াবহ পরধর্ম্মের বোঝাই বহন করিয়া চলিতেন। অতএব এই সকল ঘটনাবশে সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্যে যে স্বদেশের ও স্বজাতির সভ্যতা ও সাধনার নিগূঢ় প্রকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে নাই, ইহা কিছু বিচিত্র নহে।

সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের টানটা পুরাদমেই স্বদেশাভিযুগী হইলেও তাঁর মত, প্রকৃতি এবং ভিতরকার ভাব ও আদর্শ যে সত্যই স্বদেশী, এমন বলা যায় না। শুদ্ধ সাম্বিকী প্রকৃতিই আমাদের স্বদেশী চরিত্রের চিরন্তন আদর্শ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন লোকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের কোনও না কোনও একটা গুণ অপর দুই গুণকে অভিভূত করিয়া, তাহাদের

প্রকৃতিকে বিশেষভাবে সাহিত্যিক, বা রাজসিক, বা তামসিক করিয়া তোলে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতিতেও গুণ বিশেষের প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে। কোনও জাতি বা এই জন্য তামসিক, আর কেহ বারাজসিক, আর কেহ বা সাহিত্যিক প্রকৃতির হয়। কোনও জাতির সভ্যতা ও সাধনা রজঃ-প্রধান, আর কাহারও বা তমোপ্রধান, আর কোনও জাতির সভ্যতা ও সাধনা বা সত্ত্ব-প্রধান হইয়া থাকে। যুরোপের সভ্যতা ও সাধনা রজঃ-প্রধান। ভারতের সভ্যতা ও সাধনা সত্ত্ব-প্রধান। যুরোপের সাধনাতেও সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণেরই প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আছে। রজঃ-প্রধান বলিয়া যুরোপীয় সাধনায় তামসিকতা নাই, বা সাহিত্যিকতা ফুটে নাই, এমন নহে। জীব সাধন-বলে কখনও কখনও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ মুক্তলোক সর্বত্রই অতি বিরল। সাধারণ মানুষের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ সর্বদাই এই গুণত্রয় বিদ্যমান থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাধনায় এবং সভ্যতায়ও সর্বদাই এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে। ভারত-বর্ষেও অনেক তামসিক এবং রাজসিক লোক আছেন। ভারতের বহুমুখী সাধনায় রাজসিক এবং তামসিক উভয় প্রকৃতিরই যথাযোগ্য অনুশীলনেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বও ভারতের সভ্যতার ও সাধনার বৌদ্ধ সাহিত্যিকতারই দিকে। শুদ্ধ সাহিত্যিক চরিত্রই আমাদের দেশের আদর্শ চরিত্র। যুরোপীয় সাধনার বৌদ্ধ রাজসিকতারই দিকে। এই জ্ঞাত রাজসিক চরিত্রই সে দেশের আদর্শ চরিত্র। সুরেন্দ্রনাথ বাগ্যাবধি যুরোপীয় সভ্যতা ও

সাধনার ঐকান্তিক প্রভাবের ভিতরে বাড়িয়া উঠিয়াছেন বলিয়া, এই যুরোপীয় আদর্শের রাজসিক চরিত্রই লাভ করিয়াছেন।

আর সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও চরিত্র শুদ্ধ সাহিত্যিক নয়, কিন্তু একান্তই রাজসিক, ইহা কোনোই নিন্দার কথাও নহে। ফলতঃ প্রকৃত সাহিত্যিক প্রকৃতির লোক এ সংসারে অত্যন্ত বিরল। অত্র দেশের তো কথাই নাই, আমাদের এই সত্ত্ব-প্রধান সভ্যতা এবং সাধনাতেও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক চরিত্র যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। সচরাচর লোকে যাহাকে সাহিত্যিকতা বলিয়া মনে করে, অনেক সময় তাহা কেবল ঘোরতর তামসিকতারই রূপান্তর মাত্র। সত্ত্ব এবং তমঃ উভয়েরই কতকগুলি বাহিরের লক্ষণ এক প্রকারের বলিয়া অতি সহজেই এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। সাহিত্যিকতার বৃদ্ধিতে অনেক লোকের মধ্যে কখনও কখনও এমন একটা অবস্থা আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকারের বাহিরের কর্মক্ষেত্র হইতে বিরত করে। এই কর্মক্ষেত্রহীনতা তমোগুণেরও লক্ষণ। তবে এই সাহিত্যিকী নিশ্চেষ্টতার অন্তরালে ভগবত্তিরের আর তামসিকী নিশ্চেষ্টতার অন্তরালে নিদ্রালগ্ন প্রভৃতি জড়গুণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এ দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া, লোকে অনেক সময় এই নিদ্রালগ্ন প্রভৃতি জড়দুর্গ-সম্মত নিশ্চেষ্টতাকেই সাহিত্যিকতার লক্ষণ বলিয়া ভ্রম করে। প্রত্যেক যুগসম্মিকালে পূর্বতন যুগের বিধিব্যবস্থা ও রীতি নীতি যখন লোকের একান্ত অভ্যস্ত হইয়া তমোদুঃখ-ক্রান্ত হয়, তখন, সত্ত্ব-প্রধান সমাজেও, এই জ্ঞাত সাহিত্যিকতার প্রভাব অত্যন্তই বাড়িয়া

উঠে। এই জাল সাংস্কৃতিকভাবেই আমাদের দেশটা এখন ছাইয়া ফেলিয়াছে। এ অবস্থায় লোক-সমাজে পুনরায় সত্য সাংস্কৃতিকতার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জনগণের অন্তরস্থিত রজোগুণকেই আগে বাড়াইয়া তোলা আবশ্যক হয়। স্বরেন্দ্রনাথ আচরণ ও উপদেশের দ্বারা আপনার দীর্ঘ কর্মজীবনে এই যুগপ্রয়োজন সাধন করিয়াই আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে একরূপ অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিতে পারিয়াছেন।

স্বরেন্দ্রনাথ যখন রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন যদি তিনি লোক-চক্ষে কোনো উচ্চ সাংস্কৃতিক আদর্শ ধরিতে যাইতেন, তাহা হইলে তাহাতে দেশব্যাপী তামসিকতারই প্রভাব বাড়িয়া যাইত, প্রকৃত সাংস্কৃতিকতা লোকচরিত্রে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত না। দেশের কল্যাণের জন্ত সে সময় রজোগুণের প্রেরণারই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আর সমাজপ্রকৃতির এই অন্তঃপ্রয়োজনের অহুরোধে সে সময়ে সর্ব প্রকারের লোকহিতত্বই বিশেষ ভাবে রজোধর্মাক্রান্ত হইয়াছিল। স্বরেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারক নহেন। স্বদেশের ধর্মজীবনে শক্তিসংকার করিবার জন্ত বিদ্যাতা তাঁহাকে ডাকেন নাই। সামাজিক, এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার সংস্কার সাধনব্রতেই ভগবান তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ধর্মসংস্কারকগণও তখন দেশের ধর্মজীবনের মধ্যে একটা প্রবল রাজনৈতিক ভাবই জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। সে সময়ে এইরূপ চেষ্টারই প্রয়োজন এবং তাহাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। অতএব কালধর্মবশেই স্বরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি

ও চরিত্র রাজনৈতিক হইয়াছে। একরূপ না হইলে তিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহা কখনই করিতে পারিতেন না। লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, অশম ও স্পৃহা এই সকলই রাজনৈতিকতার প্রধান লক্ষণ। ধনমানাদি লাভ হইতে আরম্ভ করিলে, তাহা উত্তরোত্তর আরও অধিক পরিমাণে লাভ হউক, এই যে অভিলাষ তাহারই নাম লোভ। পরজব্যাদিতে যে লালসা তাহাকেও লোভ বলে বটে, কিন্তু সে লোভ নিরতিশয় নিকৃষ্ট বস্তু, অতি নিম্ন অধিকারের ধর্মও এই লোভকে প্রশ্রয় দেয় না। এই লোভ রাজনৈতিক বস্তু নহে। কিন্তু ধর্মাত্মমোদিত উপায়ে উত্তরোত্তর ধনমানাদি বৃদ্ধি করিবার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই রজোগুণের লক্ষণ। নিয়ত কর্ম করিবার যে ইচ্ছা, তাহারই নাম প্রবৃত্তি। কোনো বিষয় বা প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিবার যে উদ্যম, তাহাই আরম্ভ। ইহা করিয়া, পরে উঁহা করিব, এইরূপ সংকল্প-বিকল্পাত্মক। যে বৃদ্ধি, তাহাই অশম। সর্ব প্রকারের সামান্য বস্তুতে যে তৃষ্ণা তাহাই স্পৃহা। এই লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, অশম ও স্পৃহা, শাস্ত্রে এই সকলকেই রজোলক্ষণ বলিয়াছেন। স্বরেন্দ্রনাথের মধ্যে এই সকল লক্ষণগুলিই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এই সকলের দ্বারাই তাঁর প্রকৃতির রজোপ্রাধান্য প্রমাণিত হয়। এই রাজনৈতিকতাই স্বরেন্দ্রনাথের জীবনের ও চরিত্রের একাদিকে বলের ও অহুদিকে দুর্বলতার হেতু হইয়া আছে। তাঁর ভাল ও মন্দ, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, উর্ভয়ই এই রাজনৈতিক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আপনার কর্মজীবনের প্রারম্ভেই স্বরেন্দ্র-

নাথ যে ঘোড় বিপাকে পতিত হন, পেরুপ
 ঝপাকে পড়িয়া অতি অল্প লোকেই আবার
 মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত। ধন-মানের
 আশা করিয়াই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন,
 সহসা ধন-মান-পদ সকল হারাইয়া, নিরতিশয়
 দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। যাহা কিছু
 পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাঁহার পদচ্যুতির আদেশের
 বিরুদ্ধে বিলাত আপীল করিতে যাইয়া, তাহাও
 একরূপ নিঃশেষ হইয়া গেল। পৈতৃক
 ভদ্রাসনের নিজের অংশটুকু মাত্র অবলম্বন
 করিয়া, দারিদ্র্যের বিভীষিকা মাথায় লইয়া,
 সুরেন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় আসিয়া
 দাঁড়াইলেন। সুরেন্দ্রনাথ রাজকর্মেই জীবন
 অতিবাহিত করিবেন ভাবিয়া, তাহারই উপ-
 যুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; কোনো
 প্রকারের ব্যবসায়িকবিদ্যালয় কবেন নাই।
 রাজদ্বারে লাক্ষিত হইয়া অগ্রত্ব তাঁহার বিদ্যার
 ও যোগ্যতার উপযুক্ত কর্ম লাভ করাও তখন
 সম্ভব ছিল না। কিন্তু পদচ্যুত এবং একরূপ
 হতসর্ধ্ব হইয়াও সুরেন্দ্রনাথ কিছুতেই
 দমিয়া গেলেন না। আপনার পুরুষকারের
 প্রভাবে সমুদায় প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা
 করিয়া নূতন ক্ষেত্রে নূতন কর্মজীবন গড়িতে
 আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পূর্বে যে ব্যক্তি
 আসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে ইংরেজ রাজপুরুষ-
 দিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন, তিনিই এখন
 সীমান্ত বেতনে মেট্রোপলিটন কালেজে
 অধ্যাপকের কর্ম গ্রহণ করিয়া আপনার জীবিকা
 অর্জন করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায়
 পড়িলে অনেক লোকই একেবারে ভাঙ্গিয়া
 চুরিয়া যাইত। পুনরায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত
 করিবার যে শক্তি ও উদ্যম আবশ্যক,

অনেক লোকেই তাহা আর সংগ্রহ করিতে
 পারিত না। কিন্তু দমিয়া যাওয়া কাহাকে
 বলে, সুরেন্দ্রনাথ ইহা একেবারেই জানেন
 না। জীবন-সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথ সময় সময়
 হটিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কখনই পরাভূত হ'ন
 নাই। ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত উচ্চ অঙ্গের
 রাজসিকতারই ফল। জীবের জীবনী-শক্তি
 একদিকে বাধাত পাইলে যেমন আর এক-
 দিকে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা
 করে, সুরেন্দ্রনাথের বলবতী কর্মস্পৃহাও এই
 রূপে যখনই একদিকে প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা
 প্রত্যাহত হইয়াছে তখনই অপূর্ণ কুশলতা
 সহকারে, আপনার অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণাতেই
 যেন, অজ্ঞাতসারে নূতন পথে যাইয়া আশ্চ-
 র্যিতার্থতা লাভের চেষ্টা করিয়াছে। রাজ-
 কর্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আশায় সুরেন্দ্র-
 নাথ প্রথম সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন।
 সে আশা যখন অকালে সমূলে উৎপাটিত
 হইয়া গেল, তখন তিনি স্বদেশের রাষ্ট্রীয়
 জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আপনাকে
 প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, সেই দিকে
 আপনার শরীর মনের সমুদায় শক্তি নিয়োগ
 করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের যোগসিদ্ধি

সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে কখনো ধর্মজীবনের
 কোনো প্রকারের বাহ্য আড়ম্বর দেখা যায়
 নাই। তিনি ঈশ্বর মানেন; কিন্তু সার্থক বা
 নিরর্থক ঈশ্বর-প্রসঙ্গে কখনো কালাতিপাত
 করেন বলিয়া শুনা যায় নাই। স্বদেশের বা
 বিদেশের ধর্মশাস্ত্রের বা তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে
 তাঁহার যে কোনো প্রকারের সাক্ষাৎ ও
 ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বা আছে, এমনও কোনো

প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পূর্বজন্মের স্মৃতিবলেই হউক, আর অহেতুকী ভাগবতী-রূপাশ্রমেই হউক, স্বরেন্দ্রনাথ আপনার কর্ম-জীবনের ভিতর দিয়াই যে এক প্রকারের যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইহাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। স্বরেন্দ্রনাথ রাগদ্বৈত-বিমুক্ত বৈরাগী পুরুষ নহেন। পুত্রদার-গৃহাদিতে তাঁর আসক্তি নাই এবং এ সকলের ইষ্টানিষ্টলাভে তাঁর চিত্ত বিচলিত হয় না, এমনও নহে। প্রত্যুত তাঁর মত প্রীতিশীল পতি ও সন্তানবৎসল পিতা আমাদের দেশেও সর্বদা সর্বত্র দেখা যায় না। কিন্তু তাঁহার কর্মজীবনের আত্মানে, নলিনীদলগত জল-বিন্দুর গায়, এই সকল স্নেহমমতার আসক্তি তাঁহার চিত্ত হইতে সর্বদাই অনায়াসে ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। প্রথম জীবনে নবীন পুত্রশোক এবং শেষ জীবনে নিদারুণ পত্নী-বিয়োগ, এ সকলের কিছুতেই ক্ষণকালের জ্ঞাপ্ত ও তাঁহার স্বাদেশিক কর্মক্ষেত্রের কোনোই ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা-দিনে স্বরেন্দ্রনাথের পুত্র-বিয়োগ হয়। বন্ধুগণ যখন তাঁহাকে সভাস্থলে আসিবার জ্ঞাপ্ত ডাকিতে যান, তখন স্বরেন্দ্রনাথ নিদারুণ পুত্র-শোকে অধীর হইয়া, ছিন্নমূল কদলীর গায়, ধূলায় লুপ্তিত হইতেছিলেন। কিন্তু ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার জ্ঞাপ্ত সভাস্থলে তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে শুনিয়া, সেই শোকাহত স্বরেন্দ্রনাথ তখনই শোকবেগ সংবরণ করিয়া, চক্ষের জল ও অঙ্গের ধূলি মুছিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপ ধৈর্য ও সংযম পূর্বজন্মলব্ধ যোগশক্তির প্রভাবেই প্রাকৃতিকভাবে সম্ভব হয়। আবার বিগত কংগ্রেসের

প্রাকালে, এই বৃদ্ধ বয়সে, পত্নীবিয়োগবিধুর স্বরেন্দ্রনাথ এক দিনের জ্ঞাপ্ত যে আপনার দৈনন্দিন কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই ইহা দেখিয়াও তাঁহাকে মুক্তপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। এই মুক্তভাব সাধনালব্ধ নহে, কিন্তু সহজসিদ্ধ। ইহাই তাঁহার কর্ম-জীবনের মূলমন্ত্র। আর সেই কর্মজীবনে তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এই সহজসিদ্ধ মুক্তভাবই তাহার নিগূঢ় হেতু। এই মুক্তভাব আছে বলিয়াই, স্বরেন্দ্রনাথ কখনও অতীতের নিষ্ফলতার স্মৃতিকে ধরিয়া ভুতলে পড়িয়া থাকেন নাই। ইহার জ্ঞাপ্ত তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কখনো আত্মহার হ'ন নাই। আর এই জ্ঞাপ্ত সময়ে সময়ে অশেষ প্রকারের নিন্দা ও অপবাদের ভাগী হইয়াও, স্বরেন্দ্রনাথ কখনই আপনার অভীষ্ট কর্মপথ পরিত্যাগ করেন নাই।

স্বরেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় লোকনায়ক হইয়াও কোনো দিনই লোক-নিন্দার হাত এড়াইতে পারেন নাই। বরং সময়ে সময়ে তিনি এতটাই লোক-নিন্দার ভাগী হইয়াছেন যে, অল্প লোকে সেই অপবাদ মাথায় লইয়া আবার কখনও লোক-নেতৃত্বের দাবী করিতে সাহস পাইত কি না সন্দেহ। রাজকর্ম হইতে অপস্থত হইয়া, নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলে যে বিদ্যাসাগর তাঁহাকে অযাচিত আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, স্বরেন্দ্রনাথ যখন সেই বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন কালেক্টর প্রতিনিধী সিটি কালেক্টে কর্ম গ্রহণ করেন এবং অল্পদিন মধ্যে আপনি সেই মেট্রোপলিটন কালেক্টর আর একটা প্রবল প্রতিনিধী, রিপণ কালেক্টর, প্রতিষ্ঠা করেন

তখন তাঁহার কুশলে বাংলার শিক্ষিত সমাজ মুগ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু স্বরেন্দ্রনাথ নীরবে সেই নিন্দাবাদকে উপেক্ষা করিয়া অল্প-দিন মধ্যেই জনসাধারণের চিত্তে আপনার পূর্বতন প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার রিপণ কালেজের আইন বিভাগের অবৈধ আচার আচরণ লইয়া, একটা বিষম গোল বাধিয়া উঠে এবং এই কালেজ একেবারে উঠিয়া যাইবার আশঙ্কা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। আর যে ভাবে তখন স্বরেন্দ্রনাথ এই আসন্ন বিপদ হইতে আপনার কালেজটী রক্ষা করেন, তাহা লইয়াও শিক্ষিত বঙ্গসমাজের সর্বত্র তাঁহার যে কুশল রটনা হয়, সেরূপ কুশলকে ঠেলিয়া অল্প কোন লোকনায়ক স্বাদেশিক কর্মক্ষেত্রে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আর শোকে সংযম, বিপদে ধৈর্য্য, নিন্দা-অপবাদে উপেক্ষা, প্রত্যক্ষ নিষ্ফলতার মধ্যেও অসাধারণ কর্মোচ্ছাস, এ সকলই স্বরেন্দ্রনাথের পূর্বজন্মসিদ্ধ যোগশক্তির প্রমাণ প্রদান করে। স্বরেন্দ্রনাথের জীবনের কৃতিত্বের পশ্চাতে এই যোগশক্তিকে প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম ও মূল্য বোঝা অসম্ভব হইবে। স্বরেন্দ্রনাথের এই সংযম, এই উপেক্ষা ও এই কর্মোচ্ছাস, এ সকল উচ্চতম রাজসিকতারই লক্ষণ। এ সকলে স্বরেন্দ্রনাথের অসাধারণ পুরুষকারেরই প্রমাণ পরিচয় প্রদান করে।

স্বরেন্দ্রনাথের কর্মজীবনে পুরুষকার ও দৈব

কিন্তু এ সংসারে পুরুষকার যতই কেন প্রবল হউক না, দৈবের সঙ্গে যুক্ত না হইলে, তাহা কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। সর্ব

বিষয়েরই সিদ্ধি দৈব ও পুরুষকারের শুভ যোগাযোগের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করে। স্বরেন্দ্রনাথ আপনার কর্মজীবনে যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাহা কেবলই তাঁহার অনন্যসাধারণ পুরুষকারের ফল নহে। পুরুষকার আত্মদীপ্তির ভিতরকারই কথা। আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুরুষকারের দ্বারা আমাদের জীবনের বাহিরের অবস্থা-ও ব্যবস্থার সৃষ্টি বা যোগাযোগ সাধিত হয় না। এ সকল যোগাযোগ দৈবই সংঘটন করিয়া থাকেন। নেপোলিয়ানের অসাধারণ পুরুষকার লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের তরঙ্গমুখে না পড়িলে, আর যে সকল আদর্শের প্রেরণায় এবং যে সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তি-সংঘর্ষে সেই মহাবিপ্লবের সূচনা হয়, তাহার অল্পকূলতা না পাইলে, সে অলোকসামান্য পুরুষকার কখনই স্মৃতিত হইত না এবং স্মৃতিত হইলেও কখনই আপনার সম্যক চরিতার্থতা লাভে সমর্থ হইত না। আর যে সকল ঘটনা-সম্পাতে ও যে সকল ব্যবস্থা ও অবস্থার যোগাযোগে নেপোলিয়ানের পুরুষকার স্মৃতিত ও কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা তাঁহার স্বকৃত নহে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই দৈবকৃত। স্বরেন্দ্রনাথের পুরুষকারের আত্মপ্রতিষ্ঠাতেও এই দৈবের কার্য্যই প্রত্যক্ষ রহিয়াছে।

যে সকল বিশেষ অবস্থা ও ব্যবস্থাদির যোগাযোগে স্বরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকার আত্মপ্রকাশের অল্পকূল এবং সময়োচিত অবসর প্রাপ্ত হয়, তাহা দৈবেরই কার্য্য। এরূপ ক্ষেত্র ও অবসর না পাইলে স্বরেন্দ্রনাথের কর্মজীবন যে অসাধারণ সফলতালাভ

করিয়াছে, তাহা কখনই লাভ করিতে পারিত না। ফলতঃ সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা অতিশয় অলোকসামান্য, কিম্বা তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতা বা প্রসার যে খুবই বেশী, তাহা নহে। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনীষী তাঁর পূর্বেও অনেকে এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছেন; তাঁর জীবনকালেও অনেকে ছিলেন এবং আছেন। কৃষ্ণদাসের মত রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি কিম্বা রাজেন্দ্রলালের মত, পাণ্ডিত্য সুরেন্দ্রনাথের কখনই ছিল না। এমন কি কোনো কোনো দিক দিয়া শিশিরকুমারের প্রতিভাও সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়াই মনে হয়। অথচ সুরেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন, ইহাদের কেহই সে কীর্তি অর্জন করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষ-কারের সঙ্গে দৈবের যে অল্পকূল যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে, এ দেশের তাঁর সমসাময়িক কিম্বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী অল্প কোনো লোক-নায়কগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। কৃষ্ণদাস, রাজেন্দ্রলাল, শিশিরকুমার আপন আপন শক্তি অল্পসারে সকলেই স্বদেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সাধনবলে বাংলার আধুনিক রাষ্ট্রীয়জীবন অনেক পরিপুষ্টলাভ করিয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহাদের কাহারো নাম থাকিবে কি না সন্দেহ। পণ্ডিতসমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী প্রত্নতত্ত্ববিদ বলিয়া অনেক দিন রাজেন্দ্রলালের খ্যাতি থাকিবে। বাংলার আধুনিক রাষ্ট্রীয়জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কৃষ্ণদাসের এবং শিশিরকুমারের নামও

কতকটা থাকিবারই কথা। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের দেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এই দুই বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদকের নাম কতকটা থাকিয়া যাইবে। কারণ “হিন্দু-প্যাটিয়ট” ও “অমৃত-বাজার”কে উপেক্ষা করিয়া এদেশের আধুনিক সংবাদপত্রের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু আধুনিক ভারতের ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের জীবনে ও চরিত্রে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকার যেন শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, কৃষ্ণদাস কিম্বা রাজেন্দ্রলাল কিম্বা শিশিরকুমার হইতে তাহা হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মিতা-শক্তি ইহার একটা প্রধান কারণ বটে; কিন্তু কেবল এই বাগ্মিতা-প্রভাবেই সুরেন্দ্রনাথ এই কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিতেন না।

সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা-শক্তি

সত্য বলিতে কি, সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা-শক্তিও যে অত্যন্ত উচ্চ-অঙ্গের এমন কথাও বলা যায় কি না সন্দেহ। সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজী-বক্তৃতার শব্দ-সম্পদ অতি অদ্ভুত, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষের বক্তাদের ত কথাই নাই, ইংরেজ বাগ্মিগণের বক্তৃতাতেও এরূপ অসাধারণ শব্দসম্পত্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্থূললিত শব্দ-যোজনায় সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা যে অনন্ত-সাধারণ দক্ষতালাভ করিয়াছে, চিন্তার গভীরতায় কিম্বা ভাবের মৌলিকতায় অথবা যুক্তিপূর্ণম্পর্ক-প্রয়োগে কোনো সিদ্ধান্ত বিশেষের প্রতিষ্ঠার নিপুণতায় সেরূপ শ্রেষ্ঠ লাভ করে নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা বহুল পরিমাণেই ধ্বন্যাত্মক। সঙ্গীতের শক্তিও

এইরূপই ধ্বংসাত্মক। আর সঙ্গীত যেমন ধ্বংসাত্মক স্বরগ্রামের দ্বারাই মানবের চিত্তকে বিবিধভাবে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতাও সেইরূপ শক্তিশালী শব্দপ্রবাহের বলেই শ্রোতৃবর্গের চিত্তে তড়িৎ-সঞ্চারণ করিয়া থাকে। সঙ্গীতের স্বরগ্রাম যতক্ষণ কর্ণপটাহে আহত করিতে থাকে, ততক্ষণই যেমন তার প্রভাব চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখে, কিন্তু সে সুরলয় প্রবাহ যখন বন্ধ হইয়া যায় তখন তার অশরীরী স্মৃতিমাত্র পড়িয়া থাকে, কিন্তু তার মধ্যে ধরিবার ছুঁইবার বড় বেশী কিছুই থাকে না; সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার শব্দপ্রবাহও সেইরূপ ফলই উৎপাদন করে। যতক্ষণ তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে বাজিতে থাকে, ততক্ষণই তার উন্মাদিনী উদ্দীপনা চিত্তকে চঞ্চল করিয়া রাখে, কিন্তু কর্ণের সঙ্গে সেই শব্দ-শ্রোতের যোগ বিচ্ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে উদ্দীপনার নেশাও ধীরে ধীরে ছুটিতে আরম্ভ করে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তার স্মৃতিমাত্রই জাগিয়া রহে, কিন্তু সে বক্তৃতার চিন্তাযুক্তির প্রভাব শ্রোতৃবর্গের জ্ঞান ও চরিত্রকে অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সুরেন্দ্রনাথ কেবল আপনার অসাধারণ বাগ্মিতাবলেই যে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অনগ্র-প্রতিদ্বন্দী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

আর সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার এই অদ্ভুত শব্দসম্পদও প্রকৃতপক্ষে সহজসিদ্ধ নয়। যে সকল সাহিত্যিকের শব্দসম্পদ সহজসিদ্ধ, তাঁহাদের শব্দবিভাসের অন্তরালে সর্বদাই হয়

ভাবরাজ্যের কিম্বা জ্ঞানরাজ্যের কিম্বা বাহিরের বিষয়জগতের কিম্বা সামাজিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার একটা অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা বিদ্যমান থাকে। এই বস্তুতন্ত্রতা হইতেই সহজসিদ্ধ সাহিত্যিকের শব্দশক্তি উৎপন্ন হয়। যে সকল লেখক ও বক্তার শব্দসম্পদ সহজসিদ্ধ, তাঁহাদের রচনা বা বক্তৃতার প্রভাব সাময়িক উদ্দীপনাতেই পর্যাবসিত হয় না; কিন্তু পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের জ্ঞানে ও জীবনে সর্বদাই স্বল্পবিস্তর স্থায়ী লাভ করিয়া থাকে। যাহাদের শব্দসম্পদ সহজসিদ্ধ নয় কিন্তু কঠোর সাধনালব্ধ, তাঁহাদের সাহিত্যচেষ্টা অনেকসময় বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়া এই স্থায়ী ফললাভে অসমর্থ হয়। সুরেন্দ্রনাথের শব্দসম্পদও সাধন-লব্ধ। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। এই স্মৃতিবলে অনেক শব্দসম্পদশালী ইংরেজ-লেখকের গ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। এই সকল ইংরেজ-লেখকের শব্দসম্পদ আয়ত্ত করিয়াই সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা এমন সম্পত্তিশালী হইয়াছে। আর পরদনপুষ্ট বলিয়াই সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার শব্দশক্তির পশ্চাতে সর্বদা কোনও সঙ্গীত বস্তুতন্ত্রতা বিদ্যমান থাকে না এবং এই কারণেই তাঁহার উদ্দীপনাও স্থায়ী হয় না। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও প্রধানতঃ আপনার বাগ্মিতাবলেই সুরেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় ও কর্মজীবনে যে স্থায়ী প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার পুরুষকারই ইহার একমাত্র হেতু নহে, ইহার অন্তরালে দৈবপ্রভাবও প্রত্যক্ষ হয়।

দেশকালের যথাযোগ্য যোগাযোগ ব্যতীত এ জগতে কি সাংসারিক কি পারমার্থিক কোনো প্রকারের সাধনাতেই লোকে সিদ্ধি

লাভ করিতে পারে না। আর দৈবকুপায় সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবনে এই যোগাযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি এতটা সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ আজি পর্যন্তও তাঁর স্বদেশের প্রাণবস্তুর সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁর কর্মজীবনের প্রথমে যে তিনি এই প্রাণ-শ্রোতের একান্ত বাহিরে পড়িয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক ইংরেজিশিক্ষিত স্বদেশবাসিগণের সকলেরই এই অবস্থা ছিল। সেকালে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙ্গালীগণ ইংরেজিতেই কথাবার্তা ও পত্র-ব্যবহার করিতেন, ইংরেজি ধরণেই চিন্তা করিতেন, ইংরেজি সাহিত্যের অলঙ্কারাদি অবলম্বনেই নিজেদের ভাবসমাধানের চেষ্টা করিতেন। ইংরেজসমাজের আদর্শে নিজেদের সমাজকে এবং ইংলণ্ডের রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুযায়ী আপনাদের রাষ্ট্রীয় জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ইহারা সকলেই স্বল্পবিস্তর লালায়িত ছিলেন। এই অবস্থায় যে সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজি-শব্দ-সম্পদ-পুষ্টি, ইংরেজি-অলঙ্কার-ভূষিত, ইংরেজি ভাবে অনুপ্রাণিত, যুরোপীয় ইতিহাসের দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত বাগ্মিতা তাঁহার স্বদেশের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

ইংরাজি-শিক্ষা, স্বাধীনচিন্তা ও ব্যক্তিত্বাভিমান

ইংরেজিশিক্ষা এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে একটা প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমান জাগাইতেছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর যুরোপীয় সাধনা এই ব্যক্তিত্বাভিমানকেই সত্য স্বাধীনতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ

করিয়াছিল, প্রাচীন যুগের যুরোপীয় সাধনায় এই ব্যক্তিত্ববোধ—ইংরেজিতে যাহাকে sense of personality বলে—ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। গ্রীসীয় সাধনা জনসমাজকে অঙ্গরূপে এবং সেই সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে অঙ্গরূপেই দেখিয়াছিল। অঙ্গীকে ছাড়িয়া যেমন অঙ্গের কোনই সার্থকতা নাই ও থাকা সম্ভবে না, সেইরূপ সমাজকে ছাড়িয়াও সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কোনো স্বতন্ত্র সার্থকতা যে আছে বা থাকিতে পারে, গ্রীসীয় সাধনায় এই জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং গ্রীসে যে সকল ব্যক্তি সমাজ জীবনের পক্ষিপুষ্টিসাধনে একান্ত অসমর্থ হইত, তাহা-দিগের বাচিয়া থাকারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। সমাজের ঐকান্তিক আব্রুগতাই সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। যেমন গ্রীসে সেইরূপ প্রাচীন ইহুদায়ও কোনো প্রকারের ব্যক্তিত্ব-বোধ জাগিতে পার্য নাই। ইহুদীয় সাধনা জনসমাজের সমষ্টিগত সার্থকতাই উপলব্ধি করিয়াছিল। ব্যষ্টিভাবে সমাজের অঙ্গগত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরও যে একটা নিজস্ব লক্ষ্য ও সার্থকতা আছে, এই জ্ঞান ইহুদীয় চিন্তাতে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। প্রথম যুগের খৃষ্টীয় সাধনা এক দিকে ইহুদীয় এবং অতীতদিকে গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং রোমক ব্যবহার-তন্ত্রের প্রভাবে এই নূতন খৃষ্টীয় সাধনায় কিয়ৎ-পরিমাণে পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কারসম্বন্ধে একটা ব্যক্তিত্ব-বোধ জন্মিলেও বহুদিন পর্যন্ত প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহুদীয় সমাজতন্ত্র এবং গ্রীসীয় ও রোমক রাষ্ট্রতন্ত্রের

স্থানে নূতন খৃষ্টীয় সজ্জ্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া খৃষ্টীয়ান জনমণ্ডলীর ব্যক্তিত্বাভিমানকে এখানেও চাপিয়া রাখিতে লাগিল। ইহুদায় ও গ্রীসে যেমন সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে একান্ত ভাবেই সমাজশক্তির ও রাষ্ট্রশক্তির অধীন করিয়া রাখিয়াছিল, প্রথম যুগের খৃষ্টীয় সাধনাও সেইরূপই খৃষ্টীয়ান জনসাধারণকে একান্তভাবেই Churchএর বা খৃষ্টীয় সজ্জ্বের অধীন করিয়া রাখে। প্রভুশক্তির রূপান্তর ও নামান্তর হইল মাত্র, কিন্তু জনমণ্ডলীর ঐকান্তিক পরাদীনতার কোনই পরিবর্তন হইল না। এইরূপে যেমন প্রাচীন গ্রীক ও রোমক তন্ত্রে, সেইরূপ নূতন খৃষ্টীয় তন্ত্রেও জনগণের ব্যক্তিত্ব-মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বহু শতাব্দে ব্যাপিয়া এক দিকে পৌরহিত্য-প্রধান রোমক খৃষ্টীয় সজ্জ্ব ও অন্যদিকে স্বেচ্ছাচারী প্রজারঞ্জনবিমুখ খৃষ্টীয়ান ভূপতিবর্গ, উভয়ে মিলিয়া যুরোপীয় জনমণ্ডলীর অন্তর্বাহ্য সর্বপ্রকারের স্বাধীন চেষ্টাকে একান্ত ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া, তাহাদের প্রাণ-গত ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকে নিতান্ত নির্জীব করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্মের প্রামাণ্য-বিচারে স্বাভিমতের এবং রাষ্ট্রীয়-শাসন-ব্যাপারে লোকমতের কোনই অধিকার ও মর্যাদা ছিল না। রোমক সজ্জ্বের প্রধান পুরোহিত বা পোপ একদিক দিয়া লোকের ধর্মজীবনে আপনাকে ঈশ্বরের সাফাৎ প্রতিনিধি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অন্যদিকে খৃষ্টীয়ান রাজ্যবর্গও জনগণের সাংসারিক কর্মজীবনে ঐশ্বরিক মর্যাদার দাবী করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ষোড়শ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক পৌরহিত্যের অতিপ্রাকৃত প্রভুত্বের প্রতিবাদ

করিয়া মার্টিন লুথার খৃষ্টীয় জগতে ধর্মের প্রামাণ্যবিচারে জনগণের স্বাভিমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হইতেই খৃষ্টীয় সমাজে স্বাধীন চিন্তার বা Free Thoughtএর উন্মেষ হইতে আরম্ভ করে। মার্টিন লুথার রোমক সজ্জ্বের অধিপতি পোপের অতিপ্রাকৃত প্রভুত্বের দাবীই অগ্রাহ করেন; কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র বাইবেলের অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য অস্বীকার করেন নাই। বাইবেলের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া তিনি প্রত্যেক খৃষ্টীয়ান সাধক ও যজমানকে, ভগবৎ প্রেরণাধীন হইয়া, আপনাদের ধর্মগ্রন্থের যথাযথ মর্ম-নির্ধারণের অধিকার প্রদান করেন। রোমক খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের মর্মনির্ধারণের জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তি-সম্পন্ন গুরুরই কেবল প্রতিষ্ঠা ছিল, কিন্তু সাধারণ খৃষ্টীয় সাধক ও সাধনার্থী জনমণ্ডলীর স্বাভিমতের কোনোই স্থান ছিল না। মার্টিন লুথার যে সংস্কৃত খৃষ্টধর্মের প্রচার করেন, তাহাতে শাস্ত্র ও স্বাভিমতেরই প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু সদ্গুরুর কোনো স্থান হয় নাই। ধর্ম-শাস্ত্র মাত্রই প্রাচীন কালের ধর্মজীবন ও অধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। সুতরাং এই সকল শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন করিতে হইলে দীর্ঘকাল-ব্যাপী তপস্যার বলে তাহার অনুরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা আবশ্যক হয়। সর্বপ্রকারের গভীর আধ্যাত্মিক-অভিজ্ঞতা-বিহীন প্রাকৃত জ্ঞানের পক্ষে কেবল ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তির কিম্বা লৌকিক জ্ঞানের যুক্তির বলে অলৌকিক আধ্যাত্মিক সম্পদসম্পন্ন ধর্ম-প্রবর্তকগণের উপদেশের প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন

করা একান্তই অসম্ভব। সে অদ্বুত চেষ্টা সর্বদাই বন্ধ্যার পুত্রশোকের ব্যথার ছায় কল্পিত ও অলীক হইবেই হইবে। কেবল সন্তানবতী রমণীই যেমন আপনার অন্তরের আঁসল্য রসের অভিজ্ঞতার দ্বারা অপরের মাতৃ-স্নেহের বিবিধ প্রকাশের প্রকৃত মর্ম নির্ধারণ করিতে পারেন; সেইরূপ অনন্তসাধারণ সাধনসম্পদ-সম্পন্ন সদ-গুরুগণই নিজেদের গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দ্বারা পুরাতন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন। প্রত্যেক বিদ্যার শাস্ত্রই, বহুকালব্যাপী সাধনা দ্বারা যাঁহারা সেই বিদ্যাকে প্রকৃতভাবে অধিগত করিয়াছেন, সেইরূপ অধ্যাপক ও আচার্য্যগণের শিক্ষার সত্যাসত্যের সাক্ষ্য দেয়; আর এই সকল অধ্যাপক এবং আচার্য্যগণও নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলে আপনাদের বিদ্যাসম্বন্ধীয় শাস্ত্রের সত্যাসত্য নির্ধারণে সমর্থ হন। অতএব ধর্ম-শাস্ত্রের মর্ম উদ্ঘাটনে সদগুরু প্রামাণ্য ও প্রয়োজন নাই, এ কথা বলিলে চলিবে কেন? অথচ মার্টিন লুথার-প্রবর্তিত Protestant খৃষ্টীয় সাধনা ধর্মসাধনে যেমন শাস্ত্রের ও স্বাভিমতের সেইরূপ সদগুরুও যে একটা সঙ্গত স্থান ও অধিকার আছে, ইহা অস্বীকার করে। ইহার ফলে প্রথমে ধর্মশাস্ত্রের মর্মনির্ধারণে প্রাকৃত জনের অসংযত বিচারবুদ্ধি এবং লৌকিক জ্ঞানের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমান এই প্রমাণদ্বয়ই একমাত্র কষ্টিপাথর হইয়া দাঁড়ায় এবং ক্রমে প্রাকৃত বুদ্ধি বিচারের প্রাবল্য হেতু শাস্ত্রের প্রামাণ্যমর্যাদাটুকুও একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই রূপেই যুরোপে অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর স্বাধীনচিন্তার বা Free nany Thoএর এবং

যুক্তিবাদের বা Rationalismএর প্রতিষ্ঠা হয়। এই স্বাধীনচিন্তা ও যুক্তিবাদ প্রবল হইয়াই যুরোপীয় লোকচরিত্রে একটা অসংযত ও অসঙ্গত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগাইয়া তুলে। এই ব্যক্তিত্বাভিমানই ফরাসীবিপ্লবের উৎস-মুখে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ও আত্মচরিতার্থতাভ্যন্তরে চেষ্টা করে। আমার বুদ্ধি যাহা সত্য বলে তাহাই কেবল সত্য, সত্যের আর কোনো বাহিরের প্রামাণ্য নাই; আমার সংজ্ঞান বা Conscience যাহাকে ভাল বলে তাহাই ভাল,—ইহার উপরে ভালমন্দের আর কোনো উচ্চতর বিচারক নাই—এই বস্তুকেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর যুরোপীয় সাধনা স্বাধীন চিন্তার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। এই স্বাধীন চিন্তার প্রভাবেই যুরোপে স্বাধীনতার নামে একটা অসঙ্গত ও অসংযত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া উঠে, এবং ইহার ফলে ক্রমে সমাজের গ্রন্থি শিথিল, ধর্মের প্রভাব হ্রাস এবং আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি ও সত্য ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে।

আধুনিক ভারতে ধর্ম ও সমাজসংস্কার

ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নব্যবিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরেও এই যুরোপীয় স্বাধীনচিন্তার ও যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং তাঁহাদের প্রাণে স্বাধীনতার নামে একটা অসংযত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া আমাদের বর্তমান ধর্ম ও সমাজসংস্কারের সূত্রপাত করে। এই ধর্ম ও সমাজসংস্কার-চেষ্টার বহুবিধ ভ্রম-ক্রটি এবং অসম্পূর্ণতাসত্ত্বেও আধুনিক ভারতের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনগঠনের জন্য তাহা

যে একান্তই প্রয়োজন ছিল, কিছুতেই এ কথা অস্বীকার করা যায় না। পূর্বসংস্কারবর্জিত না হইলে কেহ এ জগতে সত্যের সাধনা করিতে পারে না। এই সংস্কারবর্জনের নামই চিত্তশুদ্ধি। কি ব্যক্তি কি সমাজ উভয়েরই আত্মচরিতার্থতালাভের জন্ত এই চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক হয়। 'নেতি'র ভিতর দিয়াই 'ইতি'তে যাইতে হয়। ব্যতিরেকী পন্থার পরেই অন্যরী পন্থার প্রতিষ্ঠা। ইহাই আমাদের প্রাচীন বৈদ্যাস্ত্রের শিক্ষা। ইংরেজ মনীষী কার্লাইল, Through Eternal Nay to Eternal Yea, এই সূত্রে আমাদের এই প্রাচীন উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সমাজের সকল অর্থোক্তিক বন্ধন ছেদন করিতে উদ্যত হইয়া, ধর্মের শাস্ত্রবদ্ধ সকল অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল আপনার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও সংজ্ঞানের উপরে দাঁড়াইতে যাইয়া, আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায় এই নেতি বা "না"-এর পথ ধরিয়াই, নিজেদের ও সমাজের চিত্তশুদ্ধিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙালী শিক্ষিত সমাজ যেক্রপ আগ্রহ সহকারে যতটা স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া এই নূতন ধর্ম ও সমাজসংস্কারের পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন, ভারতের আর কোনো প্রদেশের লোকে সেরূপ করেন নাই। আর এই সাধনবলেই আধুনিক স্বাধীনতার আদর্শ বাংলা দেশে যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে ভারতের আর কোথাও সেরূপ ফুটিয়া উঠে নাই।

বাংলার স্বাধীনতার ও স্বদেশ-চর্য্যার আদর্শ

ফলতঃ যে যাহাই বলুন না কেন বাংলার নিকট হইতেই যে ভারতের অপরাপর প্রদেশ-বাদিগণ বহুল পরিমাণে এই আধুনিক

স্বাধীনতার ও স্বদেশচর্য্যার উদ্বীপনা লাভ করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র ভারত যখন নিদ্রিত, কেবল বাংলাই তখন জাগিয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতের অল্প কোন প্রদেশে যখন ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয় নাই, বাঙালী তখনও এই মুক্তিযুদ্ধসাধনে নিযুক্ত ছিল। আর এই জন্তই বাংলার স্বাধীনতার আদর্শের পূর্ণতা ও সজীবতা বাঙালীর স্বাদেশিকতার ধর্মপ্রাণতা ও একনিষ্ঠা এবং বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের শক্তি ও শুদ্ধতা, এ সকল এ পর্য্যন্ত ভারতের অল্প কোন প্রদেশে দেখা যায় নাই। অত্যাগ প্রদেশের ধর্ম-সংস্কার-চেষ্টা একদিকে নূতনকেও নিঃসঙ্কোচে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং অল্পদিকে পুরাতনের সনাতন প্রাণ-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেও সজীব ও সমযোগ-যোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই। কিন্তু নূতনের কুযুক্তি এবং পুরাতনের কুসংস্কারের মধ্যে একটা খিচুড়ী পাকাইবারই চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ-সংস্কারচেষ্টাতেও অত্যাগ প্রদেশে এইরূপ অসঙ্গতিদোষ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সমাজ-সংস্কার করিতে যাইয়া বাংলা আপনার বিচার-বুদ্ধির অস্থায়ী শুদ্ধ শ্রেয়ের পথই ধরিতে চাহিয়াছে, শ্রেয়ের পথে চলিবার জন্ত ব্যস্ত হয় নাই, কিন্তু অত্যাগ প্রদেশের সমাজ সংস্কারের চেষ্টাতে ঝায়ে প্রেরণা অপেক্ষা স্নেহের প্রলোভনই বলবত্তর হইয়া আছে। সত্যের আত্মগত্যা অপেক্ষা সুবিধার অন্বেষণই তাহাতে বেশী। অত্যাগ প্রদেশের রাষ্ট্রীয় চেষ্টার মধ্যেও এখনও পর্য্যন্ত একটা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বিদ্যমান

রহিয়াছে। কিন্তু বাংলার রাষ্ট্রীয় আদর্শ চির দিনই সমগ্র ভারতের মৌলিক একত্বের উপরে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। সেইরূপ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রকৃত স্বাধীনতার আদর্শও ফুটিয়া উঠে নাই, কেবল বাংলা দেশেই তাহা ফুটিয়াছে। আর অন্যান্য প্রদেশের স্বাদেশিকতাও একদিকে ভারতের সনাতন সভ্যতা এবং সাধনার উপরেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আর অতীতকালে আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠতম মানব-হিতৈষী ও বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার সঙ্গেও যুক্ত হয় নাই। এই স্বাদেশিকতা কোথাও বা একটা অন্ধ, অযৌক্তিক স্থবির ও গতানুগতিক রক্ষণশীলতার, আর কোথাও বা একটা শ্রেয়-জ্ঞানশূন্য প্রেয়-সন্ধিংযু বিজাতীয় পরজাতিবিদ্বেষেরই নামাস্তর ও রূপান্তর মাত্র হইয়া আছে। অনেক স্থলেই এই স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার যথো-পযোগ্য সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেবল বাংলা দেশেই আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalism-এর সত্য ও পূর্ণ আদর্শ অনেকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর ইহার কারণ এই যে ইদানীন্তন কালে বাঙালী শিক্ষিত সমাজ স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার যে উন্নত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ভারতের অল্প কোন প্রদেশ-বাসিগণ এ পর্য্যন্ত সে শিক্ষা লাভ করিবার অবসর পান নাই। বাংলার এই আধুনিক স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার আদর্শকে বুটাইয়া তুলিবার জন্ত নানা দিকে নানা লোক নানা চেষ্টা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই নূতন সাধনার প্রথম যুগের প্রধান দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু তিনজন,—রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও স্বরেন্দ্রনাথ।

পরযুগের যুগ-আদর্শ ও রাজা রামমোহন

বাংলার এবং বস্তুতঃ সমগ্র ভারতবর্ষেরই, আধুনিক ধর্মজীবন ও কর্মজীবনের প্রথম গুরু রাজা রামমোহন। ইংরেজি শিক্ষায় ইংরেজের শাসনে, যুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে এদেশে যে অভিনব আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভাই সম্যক্রূপে তাহার সাফাৎকার লাভ করিয়া, সেই আদর্শকে স্বদেশের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে গিলাইয়া, কিরূপে তাহার পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে, ইহা দেখাইয়া গিয়াছে। রাজা রামমোহন কিরূপে সমাজজীবনের সকল বিভাগে এই নূতন যুগধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার জীবনে ও উপদেশাদিতে যে সর্বদ্বন্দ্বসুন্দর স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে, নানা দিক দিয়া, ঋজু কুটিলভাবে, বিগত শত বৎসর ধরিয়া, দেশের শ্রেষ্ঠজনেরা নিজ নিজ শক্তিসাধ্য অনুসারে সেই আদর্শেরই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। এই শতাব্দ্যব্যাপী সাধনার বলে সেই আদর্শ ক্রমে ক্রমে ক্ষুণ্ণতর হইয়া উঠিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও সম্যক্রূপে আয়ত্ত হয় নাই।

কিন্তু রামমোহন সম্পূর্ণ যোগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশিত করিয়াও আপনার কর্মজীবনে বিশেষভাবে তাঁর তত্ত্বাত্মক বা theoretic side-ই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। পূর্বতন যুগের সঞ্চিত কর্মক্ষয় ও তাহার প্রাণ-হীন সংস্কার ও অর্থহীন কর্মজঞ্জাল পরিকার করিবার চেষ্টাতেই তাঁহার সমুদায় সময় ও শক্তি নিয়োজিত হয়। রামমোহনের শিক্ষা

সমাজজীবনের সকল অঙ্গকেই অধিকার করিয়াছিল সত্য। একদিকে যেমন ধর্মের তত্ত্বাঙ্গ ও সাধনঙ্গ, উভয় অঙ্গকেই তিনি স্মরণোত্তম ও সুদৃষ্টি করিয়া, প্রাচীন ঋষিগণ অবলম্বনেই তাহাকে সত্যোপেত ও সমন্বিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে সমাজজীবনেও যে সকল অহিতাচার পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারও সংস্কারসাধনে সমন্বিত যত্ন করিতে ক্রটি করেন নাই। আর দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনেও যাহাতে প্রজা-সাধারণের স্বত্ব-স্বাধীনতার সম্প্রসারণ হয়, রাজা রামমোহন সে দিকেও যথামোযোগ্য যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কর্মজীবনের এই ব্যাপকতা ও বহুমুখীনতা সত্ত্বেও রাম-মোহন বিশেষভাবে ধর্মসংস্কারক বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কোনও একান্ত ধর্মপ্রাণ সমাজে কোনও নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সর্ব্বদা তাহাকে ধর্মের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হয়, নতুবা সে আদর্শ সে সমাজের মর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য রাজা রামমোহন নবযুগের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও তাঁহার ধর্ম্মের কোঁক যে ধর্ম্মের সংস্কারকার্যের উপরেই বেশি পড়িয়াছিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

রাজার স্বাধীনতার আদর্শ

স্বাধীনতাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূল মন্ত্র ছিল। ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গ ও সাধনঙ্গে এই দুই দিকেই রাজা বিশেষভাবে এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিক দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর যুরোপীয় সাধনার স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে

রাজার আদর্শের যোগ ও মিল থাকিলেও, ইহা সর্ব্বতোভাবেই সেই আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর ছিল। আর স্বদেশের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে রাজার যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাহাই তাঁহার স্বাধীনতার আদর্শের এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। রাজা বৈদান্তিক সাধনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য বৈদান্তিক মন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে রাজা রামমোহনের স্বাধীনতার আদর্শের অতি নিগূঢ় যোগ ছিল। বৈদান্তিক মার্গ অবলম্বন করিয়া, ইদং প্রত্যয়বাচক সর্ব্ববিধ অনায়াস-বস্তুর ঐকান্তিক অধীনতা হইতে, অহং প্রত্যয় বাচক আত্ম-বস্তুকে মুক্ত করাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার ধর্ম্মের শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা সকলই এই আদর্শের অনুযায়ী ছিল। রাজার বহুমুখী সাধনার প্রত্যেক ও সকল বিভাগের সঙ্গেই একটা অতি গভীর ও ঘনিষ্ঠ যোগ-সম্পর্ক ছিল। আর এই যোগ-সম্বন্ধই রাজার আদর্শকে আধুনিক যুরোপীয় সাধনার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। রাজার দেশ-প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার এই বৈদান্তিক আদর্শের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও রাজা সম্পূর্ণরূপে শব্দর বৈদান্তের মার্যবাদ গ্রহণ করেন নাই। অতএব বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের সগুণ ব্রহ্মবাদকেও একান্তভাবে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শব্দর সিদ্ধান্ত ও রাসামুজ সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের সঙ্গে আধুনিক যুরোপের

উচ্চতম সামাজিক আদর্শের একটা অপূর্ণ সঙ্গতিসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের পরবর্তী আচার্য্যগণের হ্রায়, রাম-মোহন কি তত্ত্ববিচারে কি ধর্মসাধনে একান্ত-ভাবে শাস্ত্রগুরুর অধিকার ও প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করেন নাই। কিয়ৎ-পরিমাণে মাটির লুথারের মত রাজা রামমোহনও শাস্ত্রনির্ধারণে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের হ্রায় শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অধিকার একেবারে অস্বীকার করেন নাই। আবার অল্পদিকে লুথারের হ্রায় রাজা শাস্ত্রার্থ-নির্ধারণে সদ্গুরুর প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়া, কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরেই শাস্ত্রোপদেশের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভারও অর্পণ করেন নাই। এইজন্যই প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তে শাস্ত্র ও স্বানুভূতির—Scripture এবং Private Judgment-এর মধ্যে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই, রাজা আপনার সিদ্ধান্তে, শাস্ত্রার্থ বিচারে, সদ্গুরুর যথাযোগ্য স্থান ও অধিকার প্রদান করিয়া, অতি সহজেই সেই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। আর এই-রূপেই রাজা রামমোহন তত্ত্ববিচারে ও ধর্মসাধনে ভারতের প্রাচীন এবং যুরোপের আধুনিক সাধনার উচ্চতম আদর্শের মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজার সামাজিক সিদ্ধ

যেমন তত্ত্ববিচারে ও ধর্মসংস্কারে, সেইরূপ আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তেও রাজা রামমোহন প্রাচীন ভারতেরও আধুনিক যুরোপের সাধনার মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন

করিয়াই আগাদিগের বর্ত্তমান যুগ-আদর্শকে সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও একই সঙ্গে স্বাদেশিক ও সার্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সমাজ-জীবনের শৈশবে জগতের সর্বত্রই সমাজের কর্ম বিভাগ বংশ-মর্যাদার অনুসরণ করিয়া চলে। যে যে বংশে জন্ম গ্রহণ করে, সেই বংশের পুরুষানুক্রমিক কর্ম ও অধিকারই সমাজ-জীবনে তার নিজেরও কর্ম ও অধিকার হয়। যখন পিতা বা পিতৃব্য বা তাঁহাদের অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই প্রত্যেক শিশুর একমাত্র দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, পরিবারের বাহিরে যখন বাণ্যশিক্ষার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন কোনো ব্যক্তির পক্ষে পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, ব্যবসায়ান্তর গ্রহণে জীবিকা উপার্জন করা একান্ত অসাধ্য না হইলেও, নিতান্তই দুঃসাধ্য ছিল, সন্দেহ নাই। সে অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের কুলধর্মই সমাজ-দেহে তাহার বিশেষ স্থান ও কর্ম নির্ধারণ করিত। আর সে সময়ে জনগণের কর্ম ও অধিকারভেদ জন্মগত হইলেও প্রকৃত পক্ষে গুণ-কর্ম-বিভাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিতও ছিল। সমাজ-বিজ্ঞানের এই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

চাতুর্য্যং যস্য সৃষ্টম্ গুণকর্মবিভাগশঃ ।

এই সাধারণ সমাজতত্ত্বের উপরেই হিন্দু বর্ণ-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হিন্দু এই স্বাভাবিক কর্মবিভাগের সঙ্গে আশ্রম চতুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া এই বর্ণভেদের ভিতর দিয়াই যে অভেদ শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, জগতের আর কোনো জাতি সমাজ-জীবনের শৈশবে ও কৈশোরে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন

নাই। স্মৃতিরূপে এই আশ্রমধর্মই প্রাচীন হিন্দু সমাজের সমাজতত্ত্বের বিশেষত্ব। কিন্তু কালক্রমে এই বর্ণাশ্রম ধর্মও যখন সামাজিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহায় না হইয়া তাহার অন্তরায়ই হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-স্বভাবস্বলভ সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রপ্রকৃতিস্বলভ রজোগুণ হারাইয়াও কেবল জন্মের দোহাই দিয়াই ব্রাহ্মণত্বের বা ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকার ও মর্যাদা দাবী করিতে লাগিলেন, তখন সমাজের ও ব্যক্তির উভয়ের কল্যাণার্থে প্রাচীন কুলধর্মকে অতিক্রম করাই আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই জন্তই গীতায় ভগবান প্রথমে বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াও শেষে, গৃহ্যাদিপি গৃহ্যতম যে ধর্মতত্ত্ব তাহার অভিব্যক্তি করিয়া বলিলেন :—

সর্বধর্মশান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

অতএব বর্ণাশ্রমপ্রধান হিন্দুর সমাজ-তত্ত্বেও সর্বকর্মত্যাগসম্পূর্ণক, মহাজন-পন্থা অবলম্বন করিয়া, এই বর্ণাশ্রমের অধিকার অতিক্রম করিবারও প্রশস্ত পথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ইহাই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুর সমাজতত্ত্বের ও সমাজনীতির শেষ শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত। রাজা এই সিদ্ধান্তের উপরেই আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার সঙ্গে আধুনিক যুরোপীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম সামাজিক সিদ্ধান্তের সঙ্গতি সাধন করিয়াছিলেন। কর্ম-সাধনই সামাজিক জীবনের উপজীব্য। কর্মের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে লাভ করাই, সমাজ-জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লাভের জন্ত প্রথমে ঐকান্তিক সমাজানুগতা, তৎপরে সমাজের

এই আনুগত্য স্বীকার করিয়াও ভগবানে সমাজবিধি-নির্দিষ্ট সর্বপ্রকারের কর্মসম্পাদন, তার পরে মহাজনপদ আশ্রয় করিয়া এই সমাজানুগত্য বর্জন ও নিষ্কাম কর্মযোগ সাধন,—এই ত্রিধামেতে হিন্দুর কর্মসিদ্ধান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মধ্য-যুগের হিন্দুয়ানী নিষ্কাম কর্ম বলিতে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ ফলভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, লোক সংগ্রহার্থে বর্ণাশ্রম-বৃহিত কর্মসংস্থানই বুঝিয়া আসিয়াছে। এখনও অনেকে নিষ্কাম কর্ম বলিতে ইহাই বুঝেন। রামমোহন মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর আশ্রম-বিরহিত স্মৃতিরূপে ধর্মহীন বর্ণভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্মজীবনের সংস্কার সাধনার্থে, প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়াই, লোক-শ্রেণ্যকে একমাত্র প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে তিনি প্রাচীন হিন্দু কর্মতত্ত্বকে একদিকে সত্যোপেত ও বস্তু-তত্ত্ব এবং অন্যদিকে সত্যভাবে স্বদেশী ও সার্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। কি তত্ত্ববিচারে ও ধর্মসাধনে কিম্বা সামাজিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সংস্কারে, রামমোহন কোনো বিষয়েই আপনাকে স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনা, সংস্কার ও সিদ্ধান্ত হইতে একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন করেন নাই।

কিন্তু এই উন্নত, উদার, একই সঙ্গে স্বদেশী ও সার্বজনীন যুগ-আদর্শ সাধনের যোগ্যতা এবং অধিকার তখনো দেশের লোকের জন্মায় নাই। রাজা আদর্শটাই দেখাইয়া দেন, কিন্তু সেই আদর্শ যেকোন ক্ষেত্রে সাধন করিয়া আয়ত্ত করা সম্ভব, তখনও সে অন্তর্কূল ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর একদিক দিয়া কেশবচন্দ্র এবং অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ এই অন্তর্কূল ক্ষেত্র গঠনের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

তরুণ-রবি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দার্শনিক শিশুর দুইটা গান ঘুমপাড়ানো।

(১) 'সাতভাই চম্পার' গান জগদ্বিখ্যাত।

সকল দেশের কাব্য কিংবা পুরাণেই (mythology) ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে,

(২) 'বিষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বাণ,'

এবং 'শিবঠাকুরের বিয়ে' ও 'তিন কণ্ঠের' কথার তত্ত্ব এখনও অন্তর্দেশের জীমহলে প্রচারিত হয় নাই।

“তিনাভিচক্রমজরমনবং

যত্রেসা বিশ্বভুবনাদিতস্তুঃ’

(ঋগ্বেদ—১ম মণ্ডল ১৬৪ সূক্ত)

কোন কালের মহাপ্রলয়ের পর এই বিশ্ব-ভুবনের ত্রিলোকস্বরূপ নাভিচক্রের সহিত শিবঠাকুর সংযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু সেই মৌলিক জন্ম-বৃত্তান্তের সহিত শিশুর নিগূঢ় স্মৃতির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সে তাহা শুনিয়া মস্তমূগ্ধবৎ ঘুমাইয়া পড়ে।

“কবে বিষ্টি পড়েছিল

বাণ এল সে কোথা ?

শিবঠাকুরের বিয়ে হল

কবেকার সে কথা ;

তিন কণ্ঠে বিয়ে করে

কি হ’ল তার শেষে ?

না জানি কোন নদীর ধারে

না জানি কোন দেশে !

কোন ছেলেরে ঘুমপাড়াতে

কে গাহিল গান

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,

নদী এল বাণ !”

এই অতুল গৌরবময় আধ্যাত্মিক জন্ম-কাহিনী কবি পরে প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্বে বুঝাইবেন। এখন কেবল শিশু তাহার কবিতা শুনিয়া বিস্মিত হউক।

বহুপূর্বের বৈদিক ঋষিগণ আদিত্যের সপ্তপুত্রকে দেখিয়াছিলেন,

স্বতপুষ্ঠো অশ্রুতাপশ্চাৎ বিশপতিং

সপ্ত পুত্রঃ (১ম মণ্ডল—১৬৪ সূক্ত)

কবি পূর্বেরই বলিয়া গিয়াছেন যে তাহার। মাতার (প্রকৃতির) মনের মধ্যেই ছিল।

‘মাতা পিতর মৃত বভাজ ধীত্যাগ্রে

মনসা সং হি জন্মে’

(১ মণ্ডল—১৬৪ সূক্ত, ঋগ্বেদ)

এই যে আদিত্যের রশ্মিকণাস্বরূপ কুমারগণ তাহাদের সম্বন্ধ কি ?

‘জেনো না এ স্থখে দুঃখে আকুল সংসারে,

মেটে না সকল তুচ্ছ আশ,

তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে

কোরো না কো’রো না অবিশ্বাস।

আবার,

‘ভূষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল

উদ্ধাধারা করিছে বর্ষণ,

শ্রামল আশার ক্ষেত্রে করিয়া নিফল

স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ।

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
 মেলি ছুটি সক্রুণ চোপ,
 পড়ুক হু ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে,
 যেন ছুটি বালিকীর শ্লোক ।
 ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে
 করুণার অমৃত নিব্বারে,
 তোমারে কাতর হেরি, মানবের মনে
 দয়া হবে মানবের পরে ।’

সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে করবলার ক্ষেত্রে
 স্বীয় পুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজনবেষ্টিত মহম্মদীয়
 ধর্মের দ্বিতীয় ইমাম হুসেনের তৃষ্ণা, শোণিত
 দিয়াও মিটে নাই। ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরের
 সন্তান যীশুর তৃষ্ণা এখন ধর্মজগতের রহস্যময়
 কথা, চিতোরের জলন্ত চিতায়ও যে তৃষ্ণার
 সামঞ্জস্য হয় নাই, এই স্বার্থপূর্ণ জগতে সে
 তৃষ্ণা কে মিটাইবে ?

মাতার করুণা ।

তবে মাতা পাষণী কেন ? চারিদিকে
 নৃশংসতার হানাহানি কেন ?

‘এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
 পরিপূর্ণ একটি জীবন ।’

এই পরিপূর্ণ জীবন, পরিপূর্ণ সংসার এবং
 সমাজ অলক্ষ্যে আসিতেছে। শিশু তাহা
 পরে দেখিবে ।

‘This fine old world of ours is but a child
 Yet in the go-cart. Patience ! Give it time
 To learn it limbs : there is a hand that
 ’ guides

* * * * *

When the war-drum throbs no longer,
 and the battle flags are furled
 In the Parliament of men, the Federation
 of the world,

টেনিসনের ইহাই ভবিষ্যদ্বাণী । কিন্তু এ পথে
 “The little boys will shoot and stab”

এই খুনাখুনি ছাড়া কি সম্পূর্ণ জীবনের
 অন্য পথ নাই। এ শাস্ত্র মন্ত্র ছাড়া কি কোন
 বৈষ্ণবী মন্ত্র নাই ?

ভারতবর্ষ তাহা জানিত এবং সমগ্র
 জগতের ভারতবর্ষের নিকট তাহা লিখিতে
 বাকি আছে ।

‘যেদিকে ফিরাবে তুমি জুখানি নয়ন

সে দিক হেরিবে সবে পথ !

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,

মানে না বাহর আক্রমণ !

একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে

নীরবে করে সে পলায়ন ।

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি

চেয়ে দেখ আকাশের পানে

পড়ুক বিগল বিভা, পূর্ণ রূপরশি

স্বর্গমুখী কমলনয়ানে !’

শিশুর বাসনা করুণা-বিজড়িত,

‘যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে

শিরে ধরি সত্যের আদেশ !

যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে

প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক ।’

এই প্রেমের পথেই কবি আদর্শ শিশুকে
 অন্ধে লইয়া অফুরাণ পথে যাইতে চাহেন ।

সে পথ বসন্তময়, জরাশোক বর্জিত ।

“The Lark

Soars up and up shivering for very joy ;
 Afar the ocean sleeps ; white fishing gulls
 Flit where the strand is purple with its tribe
 Of nested limpets ; savage creatures seek
 Their loves in wood and plain—and God
 renews
 His ancient rapture.”

—Browning.

করুণাময়ী মা শিশুকে ক্রোড়ে লউন। এবং জড়ের অমরত্ব দেখিতে চাহি না। মহা-
যখন মায়াতরবারি লইয়া বিশ্বগৃহ-প্রাদ্ধনে ভারতের আমল হইতে আমরা কৃষ্ণের জীব।
ভাই ভাই খুনাখুনি করিবে তখন মাতার কৃষ্ণ যতুবংশ প্রভৃতি ধ্বংস করুন। আমরা
অশ্রু দেগিয়া তাহারা ভুলিয়া যাইবে। খুনা- যেন অচল আয়তনের মধ্যে থাকি। কবি যেন
খুনির মধ্যে আমরা জ্ঞান এবং বিজ্ঞান, আত্মার সেটা ভুলিয়া না যান।

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার :

দ্বিপ্রহর—বর্ষানিশা

১
দ্বিপ্রহর ; বর্ষানিশা ;
অন্ধকার দশ দিশা,
দুর্গদ্বারে একা সাজী মত,
জীবনে জাগিয়া অবিরত !
২
প্রতি পলে, প্রতি খাসে
জীবন গুটায় আসে—
বুঝিতেছি অতি পরিস্কার !
উঠি, বসি, চলি বার বার ।
৩
নিশা না পোহাতে চায়,
জীবন না ছুটি পাশ !
দূরে বাজে রাজার তোরণে
তৃতীয় প্রহর—কতক্ষণে !
৪
একে একে, গণি গণি—
মিলাল ঘটিকা-ধ্বনি
দুলে দুলে সমীরে, তিমিরে,
নদীপারে অরণ্যের শিরে ।
৫
দ্বিগুণ নিস্তব্ধ সব ;
করিতেছি অমুভব—

নিশ্বাস হ'তেছে ক্ষীণতর,
বাড়িছে মৃত্যুর পরিসর ।
৬
কিছুতে কাটে না কাল,
রচিতেছি চিন্তাজাল
কত কি যে জড়ায়ে—জড়ায়ে,
'গুটী' সম, আপনা হারায়ে ।
৭
মাঝে কোথা ভুলে যাই—
আকাশের পানে চাই
অভ্যাসে জুড়িয়া দুই কর ।
শূণ্য দৃষ্টি—কি শূণ্য অন্তর !
৮
পেচক ডাকিল দূরে,
বাহুড় পলাল উড়ে,
ফেরুপাল করিল চীৎকার ।
অচল অটল অন্ধকার ।
৯
নাহি আশ, নাহি ভ্রাস,
খুলে দেছি বন্ধোবাস,
এস মৃত্যু, নির্দম বিজয়ী !
প্রতীক্ষায় শত মৃত্যু সহি ।
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

মিলন *

প্রিয়তম,

আজ ছেলেবেলার একটা খেলা মনে পড়িয়াছে। তোমার সঙ্গে কতদিন সে খেলা করিয়াছি। আজ এসেই খেলা খেলি, আজ তুমি আর ইহলোকে নাই—কিন্তু আমি মনে করিব যেন তুমি বাঁচিয়া আছ, আর আমি তোমাকে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পত্র লিখিব—যেন তুমি পড়িবে। কেন জান?—এ সংসারে আমার দুঃখের কথা বলি—এমন কেহ নাই : তুমি বাঁচিয়া থাকিতে বা আমাদের আপনাব বলিবার কে ছিল?

প্রিয়তম, যখন বরের ধারে দাঁড়াইয়া, কক্ষিনের উপর তোমার নাম পড়িলাম, তখনও আমি মে ভীষণ সত্য সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারি নাই! আমার সমস্ত হৃদয় যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল—আমি যেন সমস্ত অমৃতব-শক্তি হারাইয়াছিলাম—শোক, দুঃখ কিছুই মনে আসিতেছিল ন। পাদরী যখন গম্ভীর স্বরে মন্ত্র পড়িতেছিলেন তখন আমি তাঁর হাতের দিকে চাহিয়া ছিলাম এবং অত গরমেও যে কেন তিনি গরম দস্তানা পড়িয়াছেন—তাই ভাবিতে ছিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম—তুমি বলিতে যে পাদরী সাহেবের মুখ থানা যেন ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত। তুলনাটা মনে করিয়া হাসি আসিতেছিল। পাশে দেখি তোমার পিসি চোখ রগড়াইয়া রগড়াইয়া অনেক চেষ্টার পর এক ফোঁটা জল বাহির

করিয়া চারিদিকে দেখিতেছিলেন—কেহ তাঁর চোখের জল দেখিল কি না। তখন আমার বেশ একটু আমোদ বোধ হইতেছিল। আমার মনে হইতেছিল যেন আমি একটা মজার স্বপ্ন দেখিতেছি। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিব জ্ঞানুলা দিয়া রোদ আসিতেছে তুমি পাশেই শুইয়া আছ—তোমাকে জাগাইয়া স্বপ্নের কথা বলিয়া দু'জনে খুব হাসিব।

ইহাং মাটি পড়ার শব্দে আমার চমক ভাঙ্গিল—সব কথা মনে পড়িয়া গেল—হা জগদীশ্বর! তবে ইহা স্বপ্ন নয়—সব সত্য! আমি আর থাকিতে পারিলাম না—তোমার পার্শ্বে বাইবার জন্ত ছুটিয়া যাইতেছিলাম—কে আমার হাত ধরিল। চাহিয়া দেখিলাম তোমার ভগিনী ইদা—সে পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। সকলেই কাঁদিতেছে! আর আমি, আমি হতভাগিনী—যে তোমাকে জীবনে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছে,—আমার পোড়া চোখে এক ফোঁটা জল নাই! আর যারা কাঁদিতেছে তারা কি তোমাকে আমার মত ভাল বাসিত!

কাতরকণ্ঠে ইদাকে বলিলাম, “আমাকে ছাড়,—আমি আর ঘরে ফিরিব না—আমি আমার প্রিয়তমকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না! আজ তিন বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে—এক দিনও সে আমাকে ছাড়িয়া থাকে নাই—আজ সে একলা কেমন করিয়া থাকিবে! তাহারই পাশে আমার স্থান।”

* ইংরাজী হইতে অনূদিত।

ইদা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল, বলিল,—“এত অধীর হইয়া না, একটু শাস্ত হও, তুমি সহমরণে যাবে না কি?”

ঠিক কথা, সহমরণে যাওয়ার প্রথা ত আমাদের নাই! হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হউক, কিন্তু সমাজের বিধি ত টলিবার নয়—সে ত নিশ্চয়—অটল! তারপর কি হইল ঠিক মনে নাই। সকলে বাড়ী ফিরিয়া খানায় বসিল—আমাকেও বসিতে হইল; সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথাও কহিতে হইল—আহারের ভানও করিতে হইল। জগতের কাছে ইহারই নাম ‘ঐধ্য’—নিমন্ত্রিতদের খাতির আমার প্রথম কাজ—নববৈধব্যের দুঃখ—সে ত পরের কথা! ইহাই সামাজিকতা! কিন্তু কে যে কি বলিল আর আমি যে তার কি উত্তর দিলাম—তাহা জগদীশ্বরই জানেন, আমার একটুও মনে নাই!

তারপর আমি পাশ কাটাইয়া তোমার ঘরে গেলাম। সে ঘর তেমনিই অপরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে! তুমি যেখানে যে জিনিষটা রাখিয়া গিয়াছ, তেমনিটিই রহিয়াছে! দাসী জানিত সে ঘরের কোন জিনিষে হাত দেওয়া আমি পছন্দ করি না—তোমার ঘরটি আমি নিজে গোছাইতাম তুমি হাসিতে। আজো তেমনি সব অগোছানো হইয়া রহিয়াছে। একটা আরাম-কুর্চির উপর তোমার গল্ফ খেলার ছড়িটা, একটা চেয়ারের উপর ফোটোগ্রাফ তোলার যন্ত্রটা, একটার উপর কতকগুলো ছবির কাগজ! আর টেবিলের উপর তোমার গল্ফ খেলার

জামাটা গড়িয়া আছে। আমি জামাটাতে মুখ লুকাইয়া, সেটাকে বার বার চুম্বন করিলাম। আমার চোখে কিন্তু জল ছিল না। কেবল বিধাতাকে মনে মনে অভিসম্পাত দিলাম—এটা কি পাপ!

এ ত গেল কালকের কথা। আজ সকালে আমি তোমার কবরের কাছে গিয়াছিলাম। চারিদিক নির্জন নিগূঢ়—এভাতালোকে হাসিতেছে। ক্ষণেকের জন্য আমি আমার দুঃখ ভুলিয়া গেলাম, বিধাতার উপর রাগ করিতে ভুলিয়া গেলাম, অনেকক্ষণ তোমার কবরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম—ভাবিতেছিলাম তুমি আমার আসা জানিতে পারিয়াছ কি না? হয়ত রাতে একলা একলা তোমার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই ভাবিতেছিলাম। এমন নির্বোধ আমি! আমি জানি তোমার নিষ্পাপ আত্মা চিরস্থরের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি ত কেবল তোমার আত্মাটিকেই ভাল বাসিতাম না—আমি যে তোমার হাসিচুষ্ঠি মিমিমা গুণখানি—তোমার সর্ল-শরীরকে ভাল বাসিতাম। তোমার সেই সুন্দর সহস্র গুণখানি মনে করিয়া বিধাতার উপর আক্রোশ ফিরিয়া আসিল। জগতে এত কদাকার, এত পাপী থাকিতে আমার প্রিয়তমের সে দেবহুর্ভ সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবার তাঁর কিসের অধিকার!

আত্মীয়-স্বজনদেরা মনে করিলেন এ সময়ে একা থাকা আমার পক্ষে ভাল নহে—তাই পিসিয়া আমার কাছে রহিয়া গেলেন। আমাকে অত্যন্ত রাখিবার জন্য তিনি নানান বই পড়িয়া শুনাইতে

লাগিলেন ! তিনি চপিয়া গেলে যে আমি কত সুখী হইতাম—তাও তিনি বুঝিলেন না।

প্রিয়তম, আজ এখন বিদায় ! আমি শুইতে যাইতেছি। কিন্তু বারান্দাটা বড় অন্ধকার, আমার ভয় করিতেছে তোমার ত মনে আছে অন্ধকারে আমার বড় ভয়—রাত্রে তোমার আগে শোবার ঘরে যাইতে হইলে আমি নানা ওষুধ করিয়া তোমার জন্ত বসিয়া থাকিতাম। রাত্রিতে আমার বড় ভয় ! কাল রাত্রে আমি একবারও ঘুমাই নাই, সমস্ত রাত ঘড়ি বাজা শুনিয়াছি। এত দুঃখেও আমি জগদীশ্বরকে ডাকিতে পারি নাই—যে এত নিষ্ঠুর, তাকে ডাকিয়া কি হবে।

তোমার আদরের
হেলেন।

(২)

বুধবার

আমার প্রিয়তম,

আজ বৈকালে পাদরো সাহেব আসিয়া-
ছিলেন—প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া তোমার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন—বলিলেন তুমি বড় ভাল লোক ছিলে। আমার একবার মনে হইল জিজ্ঞাসা করি—“আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?” কিন্তু কিছু বলিলাম না—বলিলে অভদ্রতা হইত। তারপর তিনি আমাকে সাব্বানা দিয়া বলিলেন,—“জগদীশ্বর যাঁহা করেন ভালর জন্তই।”

“ভালর জন্ত!” এই যে তিনি তোমার মত বলিষ্ঠদেহ, কর্মক্ষম ব্যক্তিকে যৌবনের পূর্ণ উত্তমের মধ্যে সংসার হইতে কাড়িয়া

লইলেন, ইহাও কি ভালর জন্ত—আমাকে কি ইহাই বিশ্বাস করিতে হইবে! আমি আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলাম না, বলিলাম,—“আমাকে ও সব কথা বলিয়া কোনো ফল নাই। তোমরা যে বল পরমেশ্বর দয়াময়, তাহা মিথ্যা; কেবল মানুষকে ভুলাইবার উপায় মাত্র। তিনি দয়াময় হইলে আজ আমার প্রিয়তম আমাকে ছাড়িয়া যাইতেন না—আমার এমন ঈশ্বরে আর বিশ্বাস নাই।”

দেখিলাম বৃদ্ধ আমার কথায় অত্যন্ত আঘাত পাইলেন—কি করিব, তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন আমিও থাকিতে বলিলাম না। আমার চায়ের টেবিলে স্থান না পাওয়ার জন্ত কিম্বা অবিখ্যাসের জন্ত তাঁর বেশী দুঃখ হইল—বুঝিলাম না। না, একথা আমার বলা ভাল হইল না, আমি বড় দুঃখ, আর এমন কথা বলিলাম না; প্রিয়তম, আমার দোষ লইও না।

পিসিমা আজ সন্ধ্যার সময় চলিয়া যাইবেন। আজ তিনি আমার উপর বড় চটিয়া গিয়াছেন। আহা! তারপর আমি চুপ করিয়া বসিয়া তোমার কথা ভাবিতে-
ছিলাম, তাঁর ইচ্ছা আমি তাঁর সঙ্গে একটু তাস খেলি, আমার কিছু ভাল লাগিতেছিল না। তিনি একটু কর্কশ স্বরে বলিলেন—“দেখ, দিন রাত কি দুঃখ পুষে রাখবে? মনকে স্থির কর—বাহা আমার স্বর্গে গিয়াছে—সে এখন সুখেই আছে।” “এখন কেন, সে ত আমার কাছে, জীবনেও সুখী ছিল! তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে সে

স্বর্গেই স্থখে আছে! তার কথা, তোমার মুখে আমার ভাল লাগে না। তুমি স্বর্গের কি খবর রাখ?”

পিসিমা ত চটিয়া আকুল—একেবারে ঘরে গিয়া বাক্স গোছাইতে বসিলেন। আমি জানি এতটা রুঢ় কথা আমার ভাল হয় নাই। কিন্তু পিসিমা যখন চোখদুটো আকাশের দিকে করিয়া মুখটা অন্ধকার করিয়া স্বর্গ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন আমি কোন মতেই ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলাম না। যেন স্বর্গটা তাঁর ইজারা মহল—যেন তিনি সেখানে কটা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছেন এবং এই শীতে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া টিকিটও খরিদ করিয়াছেন।

আজ বাড়ীটা একেবারে নিস্তর। তুমি যে নাই আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তোমার আগার আশায় বসিয়া আছি, যেন এখন তোমার পায়ের শব্দ শুনিব। তুমি যখন আসিতে হৃদয় করিয়া দরজা-গুলো খুলিয়া, একসঙ্গে দু’তিন সিঁড়ি লাফাইয়া একেবারে বড়ের মত আমার ঘরে ঢুকিতে। আমি বড় রাগ করিতাম—তুমি হাসিয়া বলিতে—“রাগ করো না, লক্ষ্মীটি! আমি সামলাইতে পারি না—আমি চিরকালই বড়ের মত ছরস্তু।”

আর আজ! আজ তুমি পাথরের মত স্থির!

হা ঈশ্বর! এমন করিয়া আর কত দিন বাঁচিব! প্রিয়তম, আজ আর লিখিতে পারিতেছি না, আমার সর্ব

কাঁপিতেছে। তোমারই হেলেন।

(৩)

প্রিয়তম,

আজ তোমার সেই ছোট ডায়েরীখানি পড়িতেছিলাম। এই ক্ষুদ্র লাল বইখানি লইয়া তোমার সঙ্গে কত কাড়াকাড়ি করিয়াছি, মনে আছে? তোমার মৃত্যুর—না না, তুমি চলে যাওয়ার পর এ পর্যন্ত এক দিনও আমি চোখের জল ফেলি নাই, আজ তোমার ডায়েরী পড়িতে পড়িতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছি।

তোমার অশ্রুতের আগের দিন পর্যন্ত তোমার লেখা আছে।

“আজ বৈকালে টেনিস্ খেলিলাম।

* * সন্ধ্যায় হেলেনকে লইয়া থিয়েটারে গিয়াছিলাম, খুব ভাল লাগিল।”

এ কথায় কাঁদিবার কি আছে?

“মঙ্গলবার ২৬শে—আজ হেলেনের শরীর ভাল নাই, আমিও কোথাও যাই নাই, খেলা বন্ধ। দিনটা বড় খারাপ।”

“বুধবার ২৭শে—আজ হেলেন ভাল আছে। আজ দিনটা খুব আনন্দে কাটিয়াছে। সমস্ত দিন রুটি আমি ছেলে-গুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলিলাম।”

* * * * *

ত্রিশবৎসর বয়সেও তোমার ছেলে-মানুষী যায় নাই—তুমি বালকের মতই সরল ছিলে। আমার একটু মাথা ধরিয়াছিল তাই খেলাধুলা বন্ধ করিয়াছিলে, আমি ভাল আছি সেই আনন্দে তুমি সহিসের ছেলেদের সঙ্গে লুকোচুরী খেলিতে গেলে।

আজ সমস্ত জগৎ আমার কাছে অন্ধকার,

কোন আশা, কোন আলো দেখিতেছি না। জানি না তোমাকে হারাইয়া এমনি দুঃখের ভিতর কতদিন বাঁচিতে হইবে। হা ভগবান—আমার কি কোন উপায় নাই!—না, না ভগবানকে ডাকিব না—তিনি ত নিষ্ঠুর!

হেলেন।

(৪)

শুক্রবার

প্রিয়তম,

কাল সমস্ত রাত ভেবে ভেবে আমি একটা উপায় স্থির করেছি! আচ্ছা, আমার কাঁদার কি দরকার। তুমি চলিয়া গিয়াছ—এখন এ জীবন ত আমার—ইহা রাখি না রাখি আমার হাত! বেশ কথা! কথাটা লোকে ভাল বলিবে না, জানি। কিন্তু মনে কর, ডাক্তার আমার ঘূমের জন্ত যে ওষুধটা দিয়েছে—সেইটি যদি একটু বেশী করে খাই—খেয়ে একবারে ঘুমিয়ে পড়ি—তারপর, যখন জাগিব—দেখিব তোমার কাছে পৌঁছিয়াছি; বেশ মজা হয়! আমি কি বোকা, এ সোজা কথাটা আগে কেন মাথায় আসেনি?

আজ মিসেস্ ওয়েলস্ আসিয়াছিল, সমস্ত রূপ কেবল তোমার গুণগান করিল—তোমার মত ভদ্রলোক না কি সে কখনও দেখে নাই! কি মিথ্যুক! তোমার ত মনে আছে যে একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, তুমি চাকরকে বলিলে—“বল গে আমরা দু’জনেই মরিয়া গিয়াছি।” দরজাটা খোলা ছিল, মিসেস্ ওয়েলস্ সব কথা শুনিতে পাইয়াছিল।

আর আজ সে আসিয়াছে তোমার স্মৃতি করিতে? সে কথা যাক।

তোমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে, এই আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। ক’দিন তোমাকে দেখি নাই, তাই বসিয়া বসিয়া তোমাকে মনে আনিতেছিলাম। মনে পড়িতেছিল তুমি যেন টেনিস খেলিয়া ফিরিতেছ—সাদা ফ্লানেলের পোষাকে তোমার বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ আরো সুন্দর দেখাইতেছে! তুমি যেন নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছ—সর্পাক্ত হোয়ালে জড়ান—মাথার চুলগুলো এলো মেলো—আজ তোমার সেই ‘ভীমকান্ত’রূপ মনে পড়িতেছে।

আচ্ছা, তুমি কি জানিতে আমি তোমাকে কতটা ভাল বাসি? না! আমি ত তোমাকে সব বলিতে পারি নাই। পুরুষ মানুষ যতটুকু বুঝিতে পারে, তুমি ততটুকু বুঝিতে—তার বেশী নয়!

তোমার ঘরে, তোমারই টেবিলে বসিয়া আমি লিখিতেছি। তুমি চিরকালই অগোছালো—টেবিলের চারিদিকে কাগজ পত্র ঘর ছড়ান, তুমি যে বইখানা পড়িতেছিলে, সেখানা তেমনি খোলাই পড়িয়া রহিয়াছে।

কাল তোমার জন্মদিন! আজ ত আমার মরা হবে না। কাল সকালে যে তোমার গোরটি তুল দিয়ে সাজাইতে হইবে। আমাদের মিলন আর এক দিন পিছাইয়া গেল। এ একদিন—কি করিয়া কাটাইব?

তোমার আদরের

হেলেন।

(৫)

শনিবার

প্রিয়তম,

আজ সকালে তোমার কাছে গিয়াছিলাম। নানা রংয়ের চন্দ্র মল্লিকায় তোমার গোর সাজাইয়া আসিয়াছি—“আমাদের সুখের দিনের জন্মোৎসব স্বরণ করিয়া—আবার প্রিয়তমকে এই ফুলগুলি উপহার দিলাম।”

* * * * *

আর কয়েক ঘণ্টা দেবী, তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।

তোমার পাড়বার ঘরে বসিয়া আছি। গত বৎসর এমনি দিনে তুমি—এই চেয়ার খানায় বসিয়াছিলে। সে কি আনন্দের দিন—সে দিনের কথা মনে পড়িতেছে। তুমি নিজে চা তৈয়ার করিয়া আমাকে দিলে এং চা খাইয়া চুরোট ধরাইয়া গল্প করিতে বসিলে। আজো যেন সে চুরোটের গন্ধ ঘরটার মধ্যে রহিয়াছে। সুখের দিনের ছোটখাট সামান্য ঘটনার স্মৃতি হৃৎকের দিনে কেন কষ্টকর—বলিতে পার ?

যাক সে কথা—আর ত ঘণ্টা কতক আছে !

* * *

এখন রাত্রি ১০টা। হঠাৎ আমার একটা ভয়ঙ্কর চিন্তা আসিয়া জুটিয়াছে। আচ্ছা, আমি যে আত্মহত্যা করিব—তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হইবে ত। আত্মহত্যা যদি পাপ হয়, তবে ত মুক্তার পর তোমার কাছে আমি যাইতে পারিব না। তবে। কাল যখন লোকে জানিবে আমি বিষ

খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছি, ডাক্তার আসিয়া বলিবে—আমার মাথা ধরাপ হইয়াছিল। কিন্তু এ কথায় ত পরমেশ্বরকে ভুলান যাইবে না। তবে কি করিব ! না, আমাকে মরিবেই হইবে—তোমাকে ছাড়িয়া এ জীবন প্রাণ মুহূর্তে বড় কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। প্রিয়তম, তুমি এ সময় যদি একবার এক মুহূর্তের জগৎ আসিতে ! জগদীশ্বর, আমি তোমার অনন্ত দয়া, অপার করুণা সকলই বিশ্বাস করিব। পাদবী সাহেব যে বলিয়াছিলেন—যে তুমি যাহা কর সবই ভালর জগৎ—আমি তা'ও গ্রহণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইব—কেবল একবার মাত্র—এক মিনিটের জগৎ আমার প্রিয়তমকে আমার কাছে আসিতে দাও, আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব—কেবল এই সমস্তার নামাংসা করিয়া লইব ! আমি আর এ প্রার্থনা করিব না, আর কিছু চাহিব না !

* * *

প্রিয়তম এক বার এস ! একবার মাত্র ! এ নিরানন্দ গৃহে এ নির্জনতা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, আর ত পারি না। একবার এস, প্রিয়তম। হেলেন।

(৬)

রবিবার

প্রিয়তম,

কাল তুমি ঘপে আমার কাছে আসিয়াছিলে। তুমি আমার হাত দুটি ধরিয়া, কাণের কাছে মুখ থানিয়া আমাকে বলিলে, —“হেলি, এমন ছেলেমানুষি করনে ত চলবে না। তোমাকে একটু শক্ত হ'তে

হ'বে। মনে রেখো—আমরা আবার সুখী হ'ব, আমাদের আবার মিলন হ'বে—হয় ত খুব শীঘ্রই হ'বে।”

আমি যেন তোমার গলা জড়াইয়া তোমাকে আদর করিতে গেলাম—এমন সময় আমার সে স্নেহের স্পন্দ মিলাইয়া গেল—ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! তুমি আমাকে শক্ত হইতে বলিয়াছ—আমি শক্তই হইব। ভাগ্যে কাল রাত্রে সে ওষুধটা পাই নাই—তা' হ'লে ত তোমার কথার অবাধ্য হইতাম। আমি তোমার কথাই শুনিব—আমি মনকে দৃঢ় করিব। আমি হাসি মুখে তোমার সঙ্গে মিলনের প্রতীক্ষা করিব। পরমেশ্বর আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন—আর আমি তাঁর নিন্দা করিব না। আমি শক্ত হইব—যেন তোমার সঙ্গে দেখা হইলে তুমি আমার উপর রাগ করিবে না।

আজ কি সুন্দর দিন,—সমস্ত পৃথিবী আজ আলোকে ভরিয়া উঠিয়াছে—আকাশে মেঘে কি রংয়ের বাহার! এমন দিন আসিলে তুমি বলিতে—আজ গল্ফ খেলার দিন—তুমি চিরদিনই এমনি অকবি!

কাল মালী কুলের গাছগুলো দেখিবার জন্ম বলিতেছিল—আমার উৎসাহ ছিল না। তুমি ডাফোডিল ফুল বড় ভাল বাসিতে—এবার ডাফোডিলে বাগান খালো হইয়া উঠিবে! দেখো,—আমি বাগানটিকে কেমন সুন্দর করিয়া তুলিব।

* * * *

রবিবার সন্ধ্যা।

প্রিয়তম,

আমি ঠিক কবেছি কাল লগুনে যাব।

দিন কতক গিয়া ইদার কাছে কাটাইয়া আসি। তুমি ত জান নভেম্বর মাসে কুয়াসায় আর রুটিতে এ জায়গাটা কেমন হয়—প্রাণ যেন হাঁপিয়ে আসে, সারাদিন কান্না পায়। আর কি আমার কান্দা উচিত—আমি যে হাসিমুখে থাকিব তোমার কাছে স্বীকার করছি। ইদার সেই বড় ছেলেটিকে মনে আছে। কেমন কৌকড়া কৌকড়া চুল, বড় বড় হাসিমাথা চোখ দুটি। তোমার নামে তার নাম। তার সঙ্গে খেলা করে আমার দিন বেশ কাটবে—হয় ত আমি অনুরোধ করলে ইদা তাকে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে এখানে আসতেও দেবে।

আজ সন্ধ্যার সময় আমি গির্জায় গিয়াছিলাম—তখন গির্জার ভিতরে গান হইতেছিল। আমি স্তব্ধ হইয়া তোমার গোরের পাশে দাঁড়াইয়াছিলাম—পাহাড়ের উপর নীল আকাশে চাঁদ উঠিতেছিল, স্নিগ্ধ শুভ্র চন্দ্রকিরণে সব যেন স্বপ্নরাজ্যের মত দেখাইতেছিল। দূরে হথরনের ঝোপে একটা নাইটিংগেল সঙ্গীত-স্রোতে আকাশ ভাসাইয়া দিতেছিল। আর আমি তোমার গোরের পাশে দাঁড়াইয়া কান্দিতেছিলাম—কিন্তু কান্দিয়া এমন শান্তি একদিনও পাই নাই।

আজ তবে আসি, প্রিয়তম, আবার কাল লগুনে গিয়া তোমাকে পত্র লিখিব।

তোমার আদরের

হেলেন।

* * * *

বৃদ্ধ ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন—

“জীবনের কোনো আশা নাই।” বলিয়া তিনি রেল-সংঘর্ষে অজ্ঞাত আহতদিগকে দেখিবার জন্ত চলিয়া গেলেন। চার পাঁচ ঘণ্টা পরে হেলেনের একবার জ্ঞান হইল—ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “আগি কোথায়?” সুরক্ষাকারিণী বলিল “ভয় নাই, আপনি হাঁসপাতালে—”

“ভয়! আমার মৃত্যুতে কোনো ভয় নাই।”

মৃত্যুর পূর্বে হেলেনের আর একবার জ্ঞান হইয়াছিল—তার মুখে দিব্য আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। “শ্রিয়তম, কে জানিত এত শীঘ্র আমি তোমার কাছে যাইতে পাইব। ভগবান্, তোমার বড় দয়া।” বলিয়া হেলেন চক্ষু মুদিল। সব ফুরাইয়া গেল।

শ্রীস্ববোধচন্দ্র মজুমদার।

ভাদ্র-শ্রী

টোপর পানায় ভরল ডোবা নধর লতায় নয়ান-জুলী,
পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাকল যেন কুণ্ডলি।
তাজা আতার ক্ষীরের মত পূবে বাতাস লাগছে শীতল,
অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁত্রে বেড়ায় কাংলা-চিতল।

ছাতিম গাছে দোলন! বেঁধে ছলছে কাদের মেয়েগুলি,
কেয়া ফুলের রেণুর সাথে ইলুশে-গুঁড়ির কোলাকুলি;
আকাশ-পাড়ার জ্বাম-সায়রে যায় বলাকা জল সহিতে,
কিল্লি বাজায় ঝাঝর, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে।

কল্কে ফুলের কুঞ্জবনে জলছে আলো ধাস্‌গেলাসে,
অন্ন-চিকণ টিক্লি জলের ঝল্‌মলিয়ে যায় বাতাসে;
টোকার টোপর মাথায় দিয়ে নিড়ে ন হাতে কে ওই মাঠে?
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কারা ছিটায় গায়ে জলের ছাটে?

নকলী রাতে চাষার সাথে চষা-ভূঁয়ের হচ্ছে বিয়ে,
হ'ল্লে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চাদর আড়াল দিয়ে;
ক'নের মুখে মনের মুখে উঠছে ফুটে শ্রামল হাসি,
চাষার প্রাণে মধুর তানে উঠছে বেজে আশার বাঁশী।

বাঁশের বাঁশী বাজায় কে আজ? কোন্‌ সে রাখাল মাঠের বাটে?
অগাধ ঘাসে দাঁড়িয়ে গাভী ঘাসের নধর অঙ্গ চাটে।
আজ দোপাটির বাহার দেখে বিজলী হ'ল বেঙা-পিতল,
কেয়া ফুলের উড়িয়ে ধ্বজা পূবে বাতাস বইছে শীতল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জগন্নাথের “নবকলেবর”

এবার জগন্নাথের নবকলেবর হইবে, পাণ্ডারা “নবযৌবন” কথাটাও ব্যবহার করেন। জগন্নাথের আবার নবকলেবর ও নবযৌবন - কথাটা আমাদের বিদেশীয়-ভাবে অভ্যস্ত কাণে অত্যন্তই বাজে। যিনি ত্রিকালাতীত, নিত্যও নিরাময়, তাঁর আবার নবকলেবর ও নবযৌবন কি? একদিন ভাবিতাম হিন্দু বুঝি তার কর্ণ-কাণ্ডের এ সকল বাগবাক্য কিছুটা বোঝে না।

কিন্তু জগন্নাথের যে কোনো ভৌতিক দেহ নাই, সুতরাং সে দেহের উৎপত্তি-লয়াদি যে অসম্ভব, এ সকল কথা কোন হিন্দু না জানে? আর এ সকল কথা এমন ভাল করিয়া জানে ও বোঝে বলিয়াই হিন্দু নানা মূর্তির এবং নানা বিগ্রহের পূজা অর্চনা করিয়াও, প্রকৃত পক্ষে কখনই সাকারবাদী বা জড়োপাসক হয় না।

হিন্দুর দেবতা আর সে দেবতার মূর্তি এক নহে। নিজের আত্মবস্তুকে হিন্দু অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিয়াছিল। আর তার নিজের দেহ যেমন তার আত্মা নয়, কিন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন, দেহের রোগশোক উৎপত্তি বিনাশ প্রভৃতিতে সেই আত্মাকে স্পর্শ করে না; সেইরূপ তার দেবতার যে মূর্তি নিজের হাতে হিন্দু গড়িয়া তোলে, সে মূর্তি বা বিগ্রহও যে প্রকৃত দেবতা নয়, এ কথাও হিন্দু দেখাই জানে। আর এ কথা জানে বলিয়াই, হিন্দুর ধর্মে মূর্তি-পূজা, কোনও কোনও সিদ্ধান্তে, নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত

হইলেও, কখনও পাপ বলিয়া নিষিদ্ধ হয় নাই। ইহদীয়, মোহমদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্মে মূর্তিপূজা মহাপাপ। ইহার কারণ এই যে অতি প্রাচীনকালে, ইহদীয় ও আরব প্রভৃতি জাতির সাধনাতে, মানুষ্যের আত্মা যে তার দেহ হইতে স্বতন্ত্র এ জ্ঞান ছুটিয়া উঠে নাই।

হিন্দু চিরদিনই তার আত্মাকে নিত্য ও দেহকে অনিত্য, অহংবস্তুকে অবিনাশী ও দেহাদি বাবতীয় ইদংবস্তুকে নধর বলিয়া জানে। সুতরাং দেহের পরিণামে আত্মার যে কোন প্রকারের পরিবর্তন হয় না, এ বিশ্বাস তার ধর্মে মর্মে গাঁথিয়া আছে। তাঁর দেবতা জড় নহেন, অজড়; অনাত্মা নহেন আত্মা। তাঁর নিজের আত্মা যেমন কর্ণবশে বিদেহী হইয়াও দেহ ধারণ করে, হিন্দুর দেবতাও সেইরূপ অমূর্ত হইয়াও সাধকের হিতার্থে, সাধনার সাহায্য করিবার জন্ত, মূর্তিতে অধ্যাসিত হইয়া থাকেন। কিন্তু দেবতা নিজে সেই মূর্তি নহেন। সুতরাং মূর্তি জলে ভাসাইয়া, আশানে ফেলিয়া, আগুনে পোড়াইয়াও, হিন্দু আপনার দেবতাকে নষ্ট করিল, এমন কল্পনা করে না। বরং মোহবশে কখনো কখনো তাঁর নিজদেহে আত্মবোধ জন্মে বটে, কিন্তু কদাপি তাঁর দেবতার মূর্তিতে নিষ্ঠাবান হিন্দুর কখনও দেবতা-জ্ঞান জন্মে না।

এই জ্ঞান বা অজ্ঞান কখনো জন্মে না বলিয়াই, জগন্নাথের নবকলেবর বা নব-

যৌবনের কাহিনী শুনিয়া, হিন্দু তাহাকে একটা একান্ত উপহাস্যাপদ ব্যাপার বলিয়াও ভাবে না।

জগন্নাথকে দারুব্রজও বলে। পুরীতে যে জগন্নাথ-বিগ্রহ আছেন, তাহার উপাদান মৃত্তিকাও নয়, ধাতুও নয়, কিন্তু কাঠ। আর এই মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গড়াও নয়, খোদাও নয়; কেবল রং করা মাত্র। এই রং বতই কেন পাকা হউক না, প্রতিদিন তৈল-চন্দনাদির দ্বারা অভিষিক্ত হইলে ক্রমে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইবেই যাইবে। এই জন্য অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়া ইহার নূতন রং করা আবশ্যক হয়। জগন্নাথের স্নানযাত্রার পরে, রথযাত্রার পূর্বে এই নূতন রং দেওয়া হয়। এই কারণে এই একমাস কাল জগন্নাথের মূর্তিকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখা হয়। মাসান্তে, রথের দিনে, আবার নবরঞ্জিত দেবমূর্তিকে রথারূঢ় করাইয়া, তাঁর রথযাত্রা হইয়া থাকে।

কিন্তু কাঠ তো আর চিরদিন থাকে না। সুতরাং জগন্নাথের মূর্তির কেবল রং বদলাইলেই চলে না, মাঝে মাঝে দারুখানাও বদলাইয়া নূতন করা আবশ্যক হয়। এই দারুবদলান-ব্যাপারকেই জগন্নাথের নবকলেবর বা নবযৌবন বলে। পূর্ণিমা দিন জগন্নাথের স্নানযাত্রা হয়। পরবর্তী অমাবস্ত্য-রাত্রে, জগন্নাথের পুরাতন দেহ “শ্মশানে” লইয়া গিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণের ভিতরেই একটা স্থান আছে, যাহাকে জগন্নাথের শ্মশান বলে। স্নানযাত্রার পরবর্তী অমাবস্ত্য-রাত্রে “দ্বৈতপতি” নামে এক বিশেষ গোত্রের পাণ্ডা, সপরিবারে

জগন্নাথের পুরাতন দারুকে নারায়ণ-বিগ্রহ বা শালগ্রামশীলার সঙ্গে এক ছোট রথে চড়াইয়া প্রথমে মন্দির প্রদক্ষিণ করায়, পরে সেই শ্মশানে লইয়া গিয়া দারুখণ্ডকে ফেলিয়া দেয়। সে দিন সন্ধ্যা হইতে মন্দির একেবারে বন্ধ থাকে। দ্বৈতপতি পাণ্ডা ও তাঁর পরিবারের লোক ব্যতীত আর কেহ সে রাত্রে মন্দিরে প্রবেশ করিতে বা মন্দিরের ভিতরে থাকিতে পারে না। এইরূপে জগন্নাথের পুরাতন কলেবর শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া, নারায়ণকে সেখান হইতে শ্রীমন্দিরে ফিরাইয়া আনিয়া যথাস্থানে রক্ষা করা হয়। এই নারায়ণই নিত্য বস্ত। ইনিই দারুব্রজের আত্মাস্বরূপ। দারু কালবশে জীর্ণ হইয়া যখন পরিত্যাগযোগ্য হয়, তখন তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া আসা হয়; কিন্তু তার আত্মাস্বরূপ নারায়ণের তো আর বিনাশ নাই। সুতরাং নারায়ণকে শ্মশান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া রাখা হয়। নূতন মূর্তি যখন আবার গঠিত হয়। তখন এই নারায়ণই তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহাকে আপনার বিগ্রহ করেন। তখন আবার এই সামান্য কাঠের বস্তাই দেবতার দেহরূপে অর্চিত চর্চিত পূজিত সেবিত হইয়া থাকে। এই রূপেই জগন্নাথের “নবকলেবর” বা “নব-যৌবন” হয়। ভক্তেরা এ ব্যাপারকে লীলা বলেন। তুমি আমি ইহাকে রূপক বলিতে পারি। কিন্তু হিন্দু যে আপনার দেবতার রোগে, মৃত্যুতে ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে, তার দেবতার যে সত্য সত্যই নবযৌবন বা নবকলেবর হয় বলিয়া মনে করে, এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ফলতঃ যত হিন্দুদেবতা-বিগ্রহ আছেন, তার মধ্যে মনে হয় জগন্নাথের এই বিগ্রহের রূপকতা যেন সর্বাপেক্ষা অধিক। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, জগন্নাথের এই বিগ্রহের কোনও বিশিষ্ট রূপ নাই, এমনও বলা যাইতে পারে। শিশুরা যেমন ছুইটা তিনটা রেখা যেমন তেমন ভাবে এদিক ওদিক টানিয়া বলে, এটা কেমন মানুষ বা কেমন ঘোড়া, বা কেমন হাতী দেখ; জগন্নাথের এই দারুমূর্তি যেন অনেকটা সেই ভাবেই রচিত হইয়াছে। শিশু-হস্তাক্তি মানুষ বা ঘোটক বা হস্তীর চিত্রের মানুষ বা ঘোটক বা হস্তি যেন সে সকল চিত্রেতে নাই, আছে কেবল চিত্রকরের নিজের মনে, এ সকল চিত্রের মানুষ প্রভৃতি যেমন একান্তই মানস-বস্তু, কিন্তু সত্য সত্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নয়; জগন্নাথ-মূর্তিরও অনেকটা সেইরূপ। পুরীর এই জগন্নাথবিগ্রহ কত দিনের, কবে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা বা প্রচার হয়, পণ্ডিতেরা সে কথা বলিতে পারেন। সে প্রত্নতত্ত্বের বিচার এ প্রসঙ্গে নিম্প্রয়োজন। তবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে যখন পুরী-তীর্থ প্রথমে স্থাপিত হয়, পুরীর মন্দির সর্ব প্রথমে যখন নিৰ্ম্মিত ও এই জগন্নাথ-বিগ্রহ রচিত হয়, তখন হিন্দুজাতির নিতান্ত, শৈশবাবস্থা নহে। স্মৃতরাং শৈশবের অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতা হইতে এই জগন্নাথ-মূর্তির সৃষ্টি হয় নাই। যে মন্দিরে এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়, সেই মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রাবলীই সেকালের হিন্দু চিত্রকলার অসাধারণ উৎ

কর্ষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ; আর যারা অল্পদিক দিয়া এমন কলাকুশলতাপূর্ণ চিত্রাদি রচনা করিতে পারিত, তারা যে নিতান্তই অজ্ঞতা বা অক্ষমতা-হেতু এ অদ্ভুত জগন্নাথ-মূর্তিটা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল, ইহা কল্পনা করাও যায় না। বরং এই মূর্তিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই মনে হয় যেন কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই ইহার কারিকরেরা এমন ভাবে বোকা সাজিয়া এ অপরূপ দেবমূর্তিটা গড়িয়াছিলেন।

বস্তুতঃ জগন্নাথকে মূর্ত না অমূর্ত বলিব, অনেক সময় তার এই বিগ্রহ দেখিয়া এই প্রশ্নই মনে জাগে। আমাদের ইংরেজি শিক্ষার অঞ্জনরঞ্জিত চক্ষে যাহা জগন্নাথ-মূর্তির দোষ বলিয়া মনে হয়, তাহাই কি তার সর্বাপেক্ষা বেশী গুণের কথাও নয়? আমরা ইহাকে কিন্তু-কিমাকার ভাবি। গ্রীসের দেবমূর্তি সকল কেমন সুন্দর, কেমন চিত্তাপহারক, কেমন ভাবে আমাদের রঞ্জিনীর্তিকে তৃপ্ত করিয়া সে মূর্তি সকল অপূৰ্ব রসে প্রাণমনকে পূর্ণ করিয়া দেয়! মিনাস বা এপলো, জুনো বা এক্রডাইটিস আমাদের চক্ষে আর দেবতা নন। কিন্তু তথাপি এ সকল প্রাচীন মূর্তির যতটুকু নির্গমকালতরঙ্গাভিঘাত বহন করিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতেই কত না দেবভাব আমাদের মধ্যে জাগাইয়া দেয়। মূর্তিপূজা যদি করিতেই হয়, তবে এমনি সব মূর্তিরই পূজা করা যায়, আমরা যুরোপীয়দের সঙ্গে যোগ দিয়া অনেক সময় এরূপই মনে করি। আর এ সকল গ্রীশীয় দেবমূর্তির তুলনায় আমাদের

দেবতা সকল অনেক সময়ই কত অদ্ভুত, কত উদ্ভট, কত ভয়ানক ও বৌৎস বলিয়া বোধ হয়। আমাদের এই মূর্তিপূজা কতই না গ্রোটেস্ক (grotesque) বলিয়া মনে হয়। সুতরাং জগন্নাথের এই ঝাড়া ও নুলো মূর্তিকে যে আমরা উদ্ভট ও grotesque বলিয়া ভাবিব ইহা আর বিচিত্র কি ?

কিন্তু গ্রীষ্ম তার দেববাদ ও মূর্তিপূজার ভিতর দিয়া যে বস্তুর সন্ধান গিয়াছিল, হিন্দু যে সে 'বস্তুর' সন্ধান পায় নাই। সুতরাং তাদের উভয়ের চেষ্টা কখনও এক রকমের হওয়া সম্ভব নহে। গ্রীক রূপের সন্ধানে যাইয়া তার দেবমূর্তি সকল গড়িয়াছিল। হিন্দু অরূপের সন্ধানে যাইয়া তার দেবতার মূর্তি কল্পনা করিয়াছিল। দু'এর মধ্যে এই আকাশপাতাল প্রভেদ ছিল। গ্রীক রূপের উপাসক ছিল। হিন্দু আজন্মকাল অরূপেরই সাধনা করিয়া আসিয়াছে। গ্রীক ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই যে অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান ও সন্ধান আছে, তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। হিন্দু অতীন্দ্রিয়ের মধ্যেও যে ইন্দ্রিয়গুণাভাস আছে, তাহাই, সাধনসৌকার্য্যার্থে, ইন্দ্রিয়জ রূপরসাদির সঙ্গে কায়ক্লেশে মিশাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং তার অতীন্দ্রিয় দেবতাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধ্যান করিতে যাইয়াও, হিন্দু সর্বদাই সে দেবতার অতীন্দ্রিয় পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। গ্রীষ্মীয় দেবমূর্তি সকলের ধ্যানে সাধু ও স্মধীজনের চিতে যতই উন্নত ও পবিত্র ভাবের উদয় হউক না কেন, প্রাকৃতজনের প্রাণে তাহাতে ইন্দ্রিয়-

ভোগলালসার উদ্রেক না হওয়া একরূপ অসম্ভব। মাইলোর ভিনাসের ভাস্ক্য মূর্তিটা দেখিয়া অসাধারণ আধ্যাত্মিক সম্পদসম্পন্ন পণ্ডিতদের চিত্তবিকার উপস্থিত হউক বা না হউক, সাধারণ লোকের যে তাহা হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। আর গ্রীষ্মের উত্তরাধিকারীস্বত্রে যারা এই কলানুশীলনতৎপরতা লাভ করিয়া, আধুনিক যুরোপীয় কলাশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁদের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির মধ্যে যেগুলিতে এই ইন্দ্রিয়ভোগ-লালসার উদ্রেক করে, জনসাধারণে সেগুলিকেই সকলের চাইতে বেশি পছন্দ করে, ইহাও কে না জানে ? অতীন্দ্রিয় হিন্দুর দেবমূর্তিতে এরূপ কোনও কিছুই আভাস পাওয়া যায় না। আর এই ইন্দ্রিয়রসকে গুরু করিবার জন্তই যেন, মনে হয়, হিন্দুদেবমূর্তির মধ্যে অশেষবিধ অপ্রাকৃতত্বের সমাবেশ হইয়াছে। আমাদের দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, প্রভৃতি দেবীমূর্তির দর্শনে ও ধ্যানে কাম-ক্ৰোধাদি উদ্ভিত না হইয়া, আপনা হইতেই প্রশমিত হইয়া যায়। আর এ সকলের অপ্রাকৃতত্ব বা অতিপ্রাকৃতত্বই ইহাব প্রধান কারণ।

জগন্নাথমূর্তিতে কালী দুর্গা প্রভৃতি মূর্তির ঝায় কোনও প্রকারের অপ্রাকৃতত্ব বা অতিপ্রাকৃতত্ব নাই। কিন্তু অতীন্দ্রিয় হিন্দুর ইহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়-সংস্কৃতিটা যে রূপে ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে, আর কোনও হিন্দুদেবমূর্তিতে সে রূপ হয় নাই। জগন্নাথমূর্তিকে কতকটা নিরাকার মূর্তি বলিলেও চলে। আমরা মচরাচর

নিরাকারের যে অর্থ করি, তাহাতে থাকিতে পারে বলিয়াই তাহাকে নিরাকার নিরাকারবাদ আর শূন্যবাদ মূলে এক হইয়াই যায়। যার আকার নাই, মোটা মুটি আমরা তাগকেই নিরাকার বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিরাকার তাহাই যার কোন বিশেষ আকার নাই। যে বস্তু কোন বিশেষ আকারেতে আবদ্ধ হয় না, হইতেই পারে না, তাহাই সত্যসত্য নিরাকার। আর একই কালে যাহা বহুবিধ আকারে থাকিতে পারে, তাহারই কোনও বিশেষ আকার নাই। আর তাহাই সত্য সত্য নিরাকার। আকাশ-বস্তু এত জন্ত নিরাকার। অথচ এই আকাশই একই সময়ে ঘটপটাদিতে সাকাররূপ ধরিয়াও থাকে। প্রাণ-বস্তু নিরাকার; কারণ সর্বদাই দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেও, কোন বিশেষ দৈহিক আকারেতে গাণ্ড আবদ্ধ হয় না। যে প্রাণ বহুদিন পূর্বে একরূপে অগোপন শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ছিল, আজ তাহা পরিণত বয়সের পরিপক্ক অস্থিপঞ্জর ও লোল পেশিচন্দ্রাদির মধ্যেও সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাজনেরা বলেন দেহান্তেও এই প্রাণ থাকিবে ও ক্রমে কৰ্ম্মবশে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া আবার শারীর চেষ্টা প্রকাশ করিবে। এই প্রাণ-বস্তুর যদি কোনো একটা বিশেষ আকার থাকিত, কোনো এক সাকার দেহের সঙ্গে যদি তার এমন ঐকান্তিক যোগ থাকিত যে, সে যোগ নষ্ট হইলে সে প্রাণও নষ্ট হইয়া যাইত, তবেই কেবল সে প্রাণকে সাকার বলা বাইতে পারিত। কিন্তু বিবিধ আকারেই প্রাণ-বস্তু থাকে ও

থাকিতে পারে বলিয়াই তাহাকে নিরাকার বলি। আর এই অর্থে জগন্নাথ সাকার নহেন, কিন্তু তাঁর যতই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, তিনি সর্বদা, সর্বোতোভাবেই নিরাকার। কারণ যার কোনো আকার-বিশেষ নাই, যুগপৎ যে বস্তু বহু আকারেতে প্রকাশিত হইতে ও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে, সেই প্রকৃত নিরাকার। নতুবা কোনো আকারের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে গেলেই যার নিজস্ব ও বস্তু নষ্ট হইয়া যায়, সে বস্তু শূন্য হইতে পারে, কিন্তু সত্যিকার নিরাকার হইতে পারে না। কারণ নিরাকারের প্রকৃত অর্থ সর্বাাকার।

আর জগন্নাথ-মূর্তির মধ্যে এই সর্বাাকার যতটা পরিমাণে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, আর কোনও হিন্দু দেবমূর্তিতে তাহা হয় নাই। ইহাই জগন্নাথের আড়া-মূলো ছবির ভিতরকার কথা। একদিক দিয়া জগন্নাথের কোনো রূপ নাই। শিশুরা যেমন বালুকামৃষ্টি ধরিয়া বলে, এই নেও গোলাও বা পায়স; যে শাধক জগন্নাথের মূর্তি গড়িয়াছেন, তিনিও সেইরূপই যেন বলিতেছেন,—এই নেও তোমার ঠাকুর। আজ জগন্নাথকে বৈষ্ণবেরা বিশেষভাবেই দখল করিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু জগন্নাথের মূর্তির সঙ্গে বিষ্ণু-মূর্তির কোনই সাদৃশ্য নাই। বিষ্ণু চতুর্ভুজ। জগন্নাথের চার হাত নাই। ত্রীকৃষ্ণের এক শ্রেষ্ঠতম, গৃহতম, দ্বিভুজ মূর্তি আছে বটে; কিন্তু সে দ্বিভুজ মূর্তিও ত্রিভুজ ও মুরলীধর। জগন্নাথের সঙ্গে তারও কোন মিল নাই। অগচ এই জগন্নাথকে দেখিয়াই আগে আগে বৈষ্ণবগাধক ও

কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণদর্শন-সুখসৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়াছেন। রথের দিনে এই জগন্নাথের মূর্তির অগ্রেই মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নাচিতে নাচিতে গাহিয়াছিলেন—

সেই তো পরাণ নাথ পাইছু

যার লাগি মদন দহনে ঝুরি গেছ।

আর রথারূঢ় জগন্নাথ-মূর্তি দেখিয়া কুরুক্ষেত্রে অর্জুন-সারথির রূপ মনে করিয়া, এই মূর্তিতেই সেই রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া, আর এক রসের উচ্ছ্বাসে পুরাতন শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—

যঃ কোমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্র
স্বাপা

শ্বেচোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়
কদম্বানিলাঃ।

স। চৈবাশ্বি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার-
লীলাবিধৌ

রেবারোধ সিবৈতরী তরুতলে চেতঃ
সমুৎকণ্ঠতে ॥

আর বৈষ্ণবেরা জগন্নাথকে বিষ্ণুমূর্তি বলিয়া যতই ধরুন ও প্রচার করুন না কেন, শৈবেরাও তাঁহাকে নিজেদের ইষ্টদেবতা, লোকনাথ বলিয়াই দেখেন। এই জগৎ শ্রীক্ষেত্র বৈষ্ণব, শৈব, সকল সম্প্রদায়েরই পীঠস্থান হইয়া আছে। আধুনিক কালে যেমন শ্রীগোরাপ মহাপ্রভুর মধ্য ও অন্ত্য,

এই দুই লীলার সাক্ষী নীলাচল, পুরীধামের ধূলিকণা হইতে মন্দিরচূড়া পর্য্যন্ত সকল যেমন চৈতন্যলীলা-মুখরিত হইয়া আছে; পুণাতন কালে সেইরূপ এই নীলাচল শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবনের সঙ্গেও জড়িত হইয়া ছিল। সাকারবাদী বৈষ্ণব ও শাক্ত, নিরাকারবাদী নানকপন্থী ও কবীর-পন্থী, জ্ঞানপথাবলম্বী বৈদান্তিক ও ভক্তি-মার্গচারী বৈষ্ণব, সকলেই এই পুরীধামকে তীর্থস্থান বলিয়া পূজা করেন। এখানে শঙ্কর, নানক, কবীর সকলেরই মর্যাদাও বিদ্যমান রহিয়াছে। আর ইহার একটা প্রধান কারণ বোধ হয় জগন্নাথ-মূর্তির বিশেষত্ব।

এই মূর্তি ঠিক সাকারও নয়, ঠিক নিরাকারও নয়। ইহাতে ইন্দ্রিয় নাই, অথচ ইন্দ্রিয়ের আভাস মাত্র আছে। জগন্নাথ-মূর্তি দেখিয়া মনে হয় যেন শ্রুতি যাহাকে “অপালিপাদৌ যবনোগ্রহিতা”—“সর্কোন্দ্রিয়-গুণাভাসং সর্কোন্দ্রিয়বিবর্জিতম্” বলিয়া ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, সেই শ্রুতিনির্দেশ অনুযায়ীই কোনও ভক্তসাধক এই অদ্ভুত, উদ্ভট, অশুট মূর্তির ভিতর দিয়া সেই পরমতত্ত্বকেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জ্ঞানদাস

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রায়ই বলিতেন যে শকুনি আকাশে উঠিলেও তাহার দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ের উপর, তেমনি অনেক সমালোচক বৈষ্ণব-কবির ভাবের কথা বলিতে গিয়াও

তাঁহাদের কবিতার কেবল অলীলাংশ— তাঁহাদের মতে যাহা অলীল—সেই সব অংশ বাছিয়া বাহির করিয়া খুব গস্তীর স্বরে মত প্রকাশ করেন যে, এই সকল

আদিরসের ছড়াছড়ি আছে বলিয়াই বৈষ্ণব-কবির প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে বড় প্রবল ভাবে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মতের সমর্থনার্থ বৈষ্ণব-কবির শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা কামাতুর যুবক, রাধিকাকে কামাতুরা নায়িকা ও সখীগণকে দূতীতে পরিণত করিয়াছেন। এই মত কি সত্য? বৈষ্ণব-কবির প্রভাবের কি ইহাই একমাত্র হেতু?

আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলীর যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে এই অভিমতের ভিতর সারাংশ নিতান্ত অল্প। অবশ্য আমরা এ কথা বলিব না যে যাহা সাধারণ লোকচক্ষে অশ্লীল বা আদিরসঘটিত বলিয়া বোধ হয়, এমন অংশ বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে অথবা আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে নাই, আছে সত্য; কিন্তু বৈষ্ণব-কবির গানের প্রতিষ্ঠা ভাবে, ইন্দ্রিয়পরতায় নহে। এই মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে বিশেষ কোনও পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন কেবল রসসংগ্রহণেচ্ছ হৃদয়ের সহিত বৈষ্ণব-কবির চর্চা। যিনি কেবল তাঁহাদের বিষয় লিখিবার জ্ঞ বা বলিবার জ্ঞ তাঁহাদের কবিতা পাঠ করেন, তাঁহার দ্বারা বৈষ্ণব-কবির—বৈষ্ণব-কবির বলি কেন, কোনও কবির যথার্থ ভাব গ্রহণ করা অসম্ভব। কবির হৃদয় কবির হৃদয় দ্বারা ধরা পড়ে, আর কিছুতেই নহে।

বৈষ্ণব-কবির পদাবলী মুখ্যতঃ ভক্তির গান, প্রেমের গান; গৌণভাবে তাহারা ভালবাসার গান। অতএব বৈষ্ণব-পদাবলী

ভালবাসার সকল লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে তাহাতে বৈচিত্র্যও নাই। এই যে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রিয়সন্তোগব্যাপার তাহাকে ভালবাসার রাজ্য হইতে একেবারে তাড়াইয়া দেওয়া যায় কি? তাহা যদি না যায়, তাহা হইলে সত্যতত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব-কবি যদি তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন তো তাহাতে এমন অত্যাধিক কিছু হয় নাই যে জ্ঞাত বৈষ্ণব-কবির, মাথা তুলিতে লজ্জা হইবে। জ্ঞানদাস ভালবাসার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তাই তিনি সূত্ররূপে কহিয়াছেন—

রূপ লাগি আঁখি বুঝে, গুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে,

পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঞ্চে ॥

এবং ইহারই রূপান্তর রবি বাবুর

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।

প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন ॥

তবে প্রভেদ এই যে রবি বাবু শুধু হস্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, দৈহিক মিলনের বর্ণনা করিতে পারেন নাই, বৈষ্ণব-কবি তাহা করিয়াছেন। রবি বাবুর সময়ের শিক্ষা ও দীক্ষা অন্তরকমের, বৈষ্ণব-কবির শিক্ষা ও দীক্ষা অন্তরকমের। রবিবাবুর সময় ও বৈষ্ণব-কবির সময়—এই দুই সময়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য হইয়াছে। সেক্ষণীয়র, কালিদাস, বায়রণ, গেটে যাহা লিখিতে পারিয়াছেন, এখনকার কোনও যুরোপীয় বা ভারতবর্ষীয় কবি তাহা লিখিতে সাহস করিবেন না, লিখিলেও তাঁহাকে আজকাল বৈষ্ণব-কবির মত সমালোচকের হস্তে লাক্ষিত হইতে হইত। সময়ের গুণে

মনুষ্যের আত্মদ-শক্তির পরিবর্তন হয়, তাই বৈষ্ণব-কবির সময়ে যাহা দোষ বলিয়া গণ্য হইত না এখন তাহা দোষ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। এই জন্ত বৈষ্ণব-কবি দৈহিক সন্তোগ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; এখন যদি কেহ তাহা করে তাহা হইলে তাহাকে সে লেখা পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু দৈহিক মিলনবর্ণনারও একটা আছে। বৈষ্ণব-কবির দৈহিক মিলন কাম্বুকের দেহ-সন্তোগ নহে, ভালবাসার যে স্বাভাবিক পরিণতি, এ দেহ-সন্তোগ তাহাই, তুচ্ছ ইন্দ্রিয়-পরিভূষ্টি মাত্র নহে। সেক্ষপীয়রের ভীনস এবং এডোনিলে ভীনসের অথবা বায়রণের ডন জুয়ানের নায়ক-নায়িকাগণের কিম্বা বিদ্যাসুন্দরের নায়ক-নায়িকার মত বৈষ্ণব-কবির নায়ক ও নায়িকা কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্তই দৈহিক সন্তোগ খোঁজেন নাই। এই সন্তোগব্যাপার আজকাল অশ্লীল মনে হইলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহার সহিত অনেক পরিমাণে হৃদয় মিশ্রিত আছে। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে এই সন্তোগস্বত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রেম পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে, নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই মিলন হইতেই রাধাকৃষ্ণের পূর্ণ মিলন সাধিত হইয়াছে—এ মিলনে অসাদ নাই বরং উল্লাস আছে। যাহা কেবলই ইন্দ্রিয়পরতা, তাহা ক্ষণিক উত্তেজনা মাত্র, সেই উত্তেজনাস্তে উপভোক্ত-বয়েস হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করে, ক্রুটজার সোনাটায় (Kreutzer Sonata) কাউন্ট টলষ্টয় তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব-

কবির নায়কনায়িকার হৃদয়ে উপভোগ দ্বারা রসের সঞ্চার, ভাবের বিকাশ হইয়াছে—

পাসরিতে নারি কাল কান্থর পিরীতি ।

সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি ॥

হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না শোয়ায় ।

বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোড়ায় ॥

তনু তনু গরশ লাগি আভরণ তেজে ।

চরণে বাবক রবে দেখি পাই লাঞ্জে ॥

নিশি অবসান জাগি কাতর হইয়া ।

দৃঢ় করি বান্ধে মোহের ভুজলতা দিয়া ॥

অরুণ উদয় দেখি পাড়ি শেম ফাঁদে ।

মুখে মুখে দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে ।

ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম ফাঁস ।

তেঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস ॥

গাঁহার হৃদয় আছে, ভাবাহুসন্ধানপ্রবৃত্তি ও রসগাহিতা আছে, তিনি বুঝিয়া দেখুন এই যে সন্তোগ-রসোদ্গার তাহা কত উপাদেয়, একবার ভাবিয়া দেখুন যে বৈষ্ণব-কবির সন্তোগ কোন্ জাতীয়।

তার পর আমরা দিগকে দেখিতে হইবে যে জ্ঞানদাসের নায়ক-নায়িকার চিত্তের কোন্ ভাব এই মিলন ঘটাইয়াছে। তাহা কি কেবলই ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা অথবা যথার্থ ভালবাসা? বৈষ্ণব-কবির অতএব জ্ঞানদাসের নায়ক-নায়িকা রূপ গুণ দুই দেখিয়া ভালবাসার জালে জড়িত। রূপজ প্রণয় যে কেবল ইন্দ্রিয়ের মোহ তা নয়, ইহা হইলেই অস্বাধ প্রেমের উৎপত্তি হইতে পারে। সেক্ষপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েট, কালিদাসের শকুন্তলা, গেটের মার্গারিট, ভিক্টর হিউগোর লা এসমেরাও, ইহার সকলেই রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছিল, রূপে ভুলিয়া ভাল বাসিয়াছিল,

ভালবাসিয়া কেহ প্রাণ পর্যন্ত বলি দিয়াছিল,
 কেহ বা অনন্ত বিপৎসাগরে পতিত হইয়া-
 ছিল। প্রথম দর্শনে যে প্রেমের উৎপত্তি
 সে প্রেম অনেক সময়ে দৈবানুশাসন স্বরূপ,
 ইংরাজীতে যাহাকে revelation বলে
 তাহাই। সেই দর্শনেই যেন জন্মজন্মান্তরের
 বিস্মৃত ভাবাবগী, চির পুরাতন প্রেম নূতন
 হইয়া উঠিয়া জীবনের স্রোত ফিরাইয়া দেয়।
 এক কোন শুভক্ষণে, এক মুহূর্ত্তে একটি
 চাহনির ভিতর দিয়া,—আকাঙ্ক্ষার পথে
 দুইটী প্রাণ এক হইয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের
 ভালবাসা বৈষ্ণব-কবি এই ভাবে বর্ণনা
 করিয়াছেন। প্রথমদর্শনেই শ্রীরাধার অন্তর
 যে অপূর্ণ অনুরাগ জাগিয়াছে, যে আকাঙ্ক্ষার
 রাশি পুঞ্জীভূত হইয়াছে, যে সব-ভুলানো
 ভাব জাগিয়াছে, যে ভালবাসা—প্রিয়ের তিল
 মাত্র বিচ্ছেদ সহনাক্ষম ভালবাসা—আপন
 অধিকার বিস্তার করিয়াছে, দেহের মিলন,
 প্রাণের মিলন এই উভয় বিধ মিলনের জন্ম
 যে তীত্র বাসনা উৎপন্ন হইয়াছে, শিল্পকুশল
 কবি জ্ঞানদাস যেন সে সকল ভাব অনুভব
 করিয়া, শ্রীরাধার সেই বাসনাকর্ষিত দিব্য-
 মৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার ছবি তুলিয়াছেন—

সহজে ননীক পুতলি গোরী ।
 জারল বিরহ আনলে তোরি ॥
 বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ ।
 শ্রামরি সোঙরি তৌহারি নাম ॥
 শুনহ মাধব কহনু তোয় ।
 শমতি না দেই দিন রজনী রোয় ॥
 অরুণ অধর বাজুলি ফুল ।
 পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর ফুল ॥
 ফুরল কবরী উরহি লোল ।

স্বমেরু উপরে চামর ভোল !
 গলায় এ গজ মোতিম হার ।
 বগন বহিতে গুরুয়া ভার ॥
 অঙ্গুর অঙ্গুলি বলয় ভেল ।
 জ্ঞান কহে দুঃখ মদন দেল ॥

এমন প্রণয়ে অঙ্গসঙ্গাসক্তি থাকিলেও
 মনের কার্যই বেশী, ভাবের প্রাবল্যই বিশেষ
 ব্যক্ত। তাই জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—

কাগর বদন চমকি চাও ।
 ভাবে বেয়াতুল ওর না পাও ॥
 কপোলে পুলক বেকড় দেখি ।
 প্রেম কলেবর ততহি সখি ॥

শ্রীরাধার প্রণয় কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা
 উপভোগের জন্ম লাভায়িত নহে, সর্বস্ব
 সমর্পণ করিতে উদ্বৃত্ত, ইহা কামপরতন্ত্রার
 ইন্দ্রিয়লালসা নহে, বিচার চক্ষু উজ্জ্বলতা
 ইহার মধ্যে নাই; সংসারে যাহা কিছু
 লোকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, বিশেষতঃ স্ত্রী-
 জাতির পক্ষে যাহা কিছু সংসারের সার
 শ্রীরাধার প্রণয় এ সকলকেই তুচ্ছ করিয়া
 সেই প্রিয়তমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে,—
 এ প্রেম গভীর, স্বার্থহীন আত্মনিবেদন—

শ্রামরূপ দেখিয়া আকুল হইয়া
 দুকুল ঠেকিলাম হাতে ।
 ভুবন ভরিয়া অপযশ ঘোষণা
 নিছিয়া কইনু মাথে ॥
 সজনি কি আর লোকের ভয় ।
 ও চাঁদ বদনে নয়ান ভুলাল
 আর মনে নাহি লয় ॥
 অপযশ ঘোষণা যাক দেশে দেশে
 সে মোর চন্দন চুয়া ।

শ্রামের রাক্ষা পায় এ তনু সঁপেছি
তিল তুলসী দিয়া ।

কি মোর সরম ঘর ব্যবহার
তিলেক না সহে গায় ।

জ্ঞানদাস কহে এ তনু নিছিনু
শ্রামের ও রাক্ষাপায় ।

যে প্রণয়ে হৃদয়ে এমন ভাবের
উৎপন্ন হয়, এমন নিরবচ্ছিন্ন আত্মোৎসর্গের
প্রবৃত্তি জন্মায়, যে ভালবাসায় আপনার বলিয়া
কিছু রাখিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়, সেই
প্রণয়ের ভাব কি একজন সামান্ত দূতর
উপলব্ধি করা সম্ভব? যদি তাহা না
হয়, তবে যাহারা সেই ভাব বুঝিয়া দৌত্য
কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, তাগদের সামান্ত
দূতী বলা চলে না। বৈষ্ণব কবির-সখী
ইতর দূতী নহে, তাহারা রাধাপ্রেমে
আত্মত্যাগিনী, রাধার স্নেহে সখী, হঃখে হঃখী,
রাধার স্নেহের জন্ত তাহারা সব করিতে পারে,
সব ছাড়িতে পারে, সব ভুলিতে পারে
তাই শ্রীরাধার হৃদয়ে যখন এমন সর্বগ্রাসী
প্রেমের উদয় সখী বৃত্তিতে পারিল, যখন সে
বুঝিল যে ভালবাসা ভিন্ন রাধার আর কোনও
সুখ নাই, তখন সে কৃষ্ণের কাছে দূতীগিরি
করিতে চলিল—সাঁহার হৃদয়ে মাধুর্য্যানুভূতি
আছে তিনি কবি জ্ঞানদাসের সখীর এই
দৌত্যের মর্ম্ম বুঝিয়া আনন্দিত হইবেন—

মন্দির মাঝে বৈঠল বর স্নানরী
দিনকর ছুপর ঠানে ।

যব হাম পুছল পিরীতি সন্তাবণ
প্রেমজলে ভরল নয়ানে ॥

মাধব! তুয়া অনুরাগিণী রাধা ।

তুয়া পরসাদ অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন বাধা ॥

ভাবে ভরল তনু পুনঃ পুনঃ কম্পিত
পুনঃ পুনঃ শ্রামরি গোরা ।

পুন পুছত পুন দিগ নৈহারত
ভুঁয়ে শুভয়ে পুন রেরি ॥

ফুরল কবরী উরহি লোটায়েত
কোরে করত তুয়া ভানে ।

জ্ঞানদাস কহে তুহু ভালে সমবত
কোন করব চিতে আনে ॥

শ্রীরাধার ভাবের কি সুন্দর পরিচয় এই
দূতীর মুখে ব্যক্ত হইয়াছে! জ্ঞানদাসের
কাব্যে সখী কখনও দূতী, কখনও সেবিকা,
কখনও বন্ধু, কখনও মন্ত্রী;—সর্বদাই ইহারা
রাধার মর্ম্মগ্রাহিণী, রাধার ভাবে বিভোর,
ভাবের আধীন্যে। রাধার হৃদয়ে বত ভাবের
উদয় হয় তাহারা সব ধরিতে পারে, সব
কহিতে পারে।

কত কত ভাব পেখনু হাম তাই ।

ধনি ধনি তুহু ধনি রসবতী রাই ॥

মিলনের পূর্বে রাধিকার হৃদয়ে কত
অপূর্ণ ভাবেরই উদয় হইয়াছে তাহা এই
সখীগাই জানে ও বুকে।

হাসি রহল করে বসন ঝাঁপাই ।

মধুর সন্তাষণ মধুরিম চাই ॥

আন দিনে শ্রবণে না দেই পরধাব ।

আজু আপনে ধনি কহিলি সুধাব ॥

শুন শুন মাধব উলসিত অঙ্গ ।

কমলিনী কয়ল তুয়া পর সঙ্গ ॥

শ্রীরাধার মনে এত উল্লাস, এত
আকাঙ্ক্ষা এত ভাব, কিন্তু তিনি সবই
লুকাইয়া রাখিতে চাহেন, এত যে অন্তরঙ্গ
সখী তাহাদের অনেক সময় সেই সকল
ভাব অনুভবে বুঝিয়া লইতে হয়, ইচ্ছিতে

অবৃত্ত করিতে হয় । প্রেমতত্ত্বজ্ঞ কবি
জ্ঞানদাস কহিয়াছেন--

রসের বেতার লুকা না যায় ।

তাই সখীদের জানিতে বিলম্ব হয় না
যে রাধার হৃদয়ে কোনও এক অভিনব
ভাবের উদয় হইয়াছে; তাহাদের সহ-হৃদয়
সম্পন্ন হৃদয় রাধার অন্তরের নূতন ভাব
লুকান থাকিলেও ধরিয়া ফেলে—

ক্লেণে ধনী চমকায় ক্লেণে উঠে কাঁপ ।

কর পরশিলে নহে এত অঙ্গ তাপ ॥

মনের যুকতি কেহ লখিতে না পারে ।

মৃগমদ লেপই কাঙ্ক্ষন কলেবরে ॥

সবে এক দেখিয়া করএ পরতীত ।

কালী নাম শুনিয়া চকিত হয় চিত ॥

কালী কালী বরণ দেখিয়া ভালবাসে ।

জ্ঞানদাসে বসে কালী কান্থর ভাবে আছে ।

যাহারা এমন মর্ষজ্ঞা, এমন অন্তরঙ্গ তাহা-
দের কাছে মনের ভাব গোপন করিবার
প্রয়াস বুঝা, তাই রাধার মুখ কুটে, প্রাণের
আবদ্ধ যাতনা আকাজ্ঞা নৈরাশ্র সন
উন্মুক্ত পথে ছুটিয়া বাহির হয় ।

আগে মুঞি জানিলে যাইতাম না

কদম্বের তলে ।

চিত হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে ॥

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল ।

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ।

ঘরে-বাইতে পথ মোর হইল অজুরাণ ।

অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ।

চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদে ধান্দা ।

তার মাঝে হিয়ার পুতলি রইল ঝাঙ্কা ।

কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া ।

বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোড়া ॥

জাতি কুলশীল মোর হেন বুঝি গেল ।

ভুবন ভরিয়া মোর বোষণা রহিল ॥

কুলবতী সতী হইয়া দুকূলে দিখু দুখ ।

জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥

যে আপনার জন তাহার কাছে একবার মুখ
খুলিলে সব প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই রাধার
মনের সকল কথা একে একে সখীর কাছে
ব্যক্ত হইয়াছে—

মনের মরম কথা তোমাংরে কহিয়ে এথা

শুন মন পরাণের সই ।

স্বপনে দেখিখু যে গ্রামল বরণ দে

তাহা বিম্ব আর কার নই ॥

সমবেদনাময়ী সখী আর স্থির থাকিতে পারে
না, তাই তাহাকে আমরা দ্বিতীয় কার্য্যে রত
হইতে দেখি।

যেমন নায়িকার ভাব তেমনি নায়কেরও
ভাব,—ইহাতেও দৈহিক মিলনের আনন্দ
বর্জিত হয় নাই, কিন্তু প্রাণও মিশিয়া
আছে ।

চিত পুতলি সম দেহ ।

গরম না বুঝয়ে কেহ ॥

পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি ।

নিব্বরে ঝরয়ে হুন আঁখি ॥

নায়ক-নায়িকার এমন অবস্থায় মিলন
অবশ্যশ্যাব্দী তাই কবি জ্ঞানদাস কহিয়াছেন—

জ্ঞান কহয়ে তোহে সার ।

করহ গমন উপচার ॥

এই মিলনে যে রস উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা
করিতে করিতে কবি বিহ্বল হইয়াছেন—
যে কয়টি পদ এই উল্লসিত অবস্থায় তিনি
সৃষ্টি করিয়াছেন সেগুলি কবিত্বের পরাকাষ্ঠা
বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না । যদি স্থান থাকিত

তাহা হইলে সবগুলি তুলিয়া দেখাইতাম ;
স্থানাভাব সত্ত্বেও কতকগুলি এখানে উদ্ধৃত
করিয়া দিল'ম, রসজ্ঞ পাঠক সেগুলির
ভাবপ্রবণতা ও প্রণয়ৈকরসতায় মুগ্ধ হইবেন
সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ ও
একাগ্রতা এই পদগুলিতে উজ্জল মূর্তি
ধারণ করিয়াছে—ইহাদের প্রত্যেক চরণ,
প্রত্যেক শব্দ, ভাবের এক একটা প্রস্রবণ
ছুটাইয়াছে।

শিশুকাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে
পর্যাণে পর্যাণে লেহ ।

না জানি কি লাগি কো বিহি গড়ল
ভিন ভিন করি দেহা ॥

সই কিবা সে পিরীতি তার ।

আলস করিয়া পাসরিতে নারে
কি দিয়া সুধিব ধার ॥

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম ।

প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম ॥

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখনে যে দিকে পায় ।

বাহ পাসরিয়া বাউল হইয়া
তখনে সে দিকে ধায় ॥

লাখ কামিনী ভাবে রাতিদিনি
যে পদ সেবিতৈ চায় ।

জ্ঞানদাস কহে আহীরা নাগরী
পিরীতে কিনিল তায় ॥

প্রিয়ের প্রণয়ে রাধার হৃদয়ে কি মধুর গর্ভ !
প্রিয়ের প্রণয়-কীৰ্ত্তনে তাঁহার কি আনন্দ,
কত উল্লাস !

যব দেখা দেখি হয়ে হেন তার মনে লয়ে

নয়নে নয়নে যোরে প্রিয়ে ।

পিরীতি আরতি দেখি "হেন মনে লয় সখি
আমি তারে চাহিলে সে জীয়ে ॥

আহা মরি মরি মুগ্ধি কি করিব আরতি ।

কি দিয়া সুধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি ॥

রসিক নাগর যে নিতুই ছুয়াবে সে
বিনা কাজে কত আসে যায় ।

জ্ঞানদাস তবে কয় তোমার চরিতে যেবা লয়
তাহা বা ক'হবা তুমি কায় ॥

কিন্তু ইহা কেবল গর্বোত্তর ভাবই নহে, ইহার
সহিত প্রিয়তমের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য-স্মৃতিও
জড়িত আছে, তাই এ সৌভাগ্যমদে তীব্রতা
না আসিয়া ভাববিহীনতা আসিয়াছে—

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটা কয় ।

ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয় ॥

আলো সই সে জন মাছুষ নয় ।

তাঁহার সঙ্গিতে পিরীতি করয়ে
কি জানি কি তার হয় ॥

সহজে রসের আকার সে যে
ভাবের অঙ্গুর তায় ।

বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায় ॥

চমক চলনি গগিম দোলনৌ
রমণী মানস চোর ।

জ্ঞানদাস কহে সো পিয়া পিরীতি
মরমে পশিল তোর ॥

ভাবের নেশা--ভালবাসার তন্ময়তা প্রেমাত্মী-
কৃত "আমিদের" তরল ও সরল প্রসার
এমন মধুরভাবে আর কোথাও বর্ণিত হইতে
দেখিয়াছি কি না জানি না ।

যাহা শ্রীরাধার মুখে ব্যক্ত তাহাই কবি
শ্রীকৃষ্ণের মুখেও ব্যক্ত করাইয়াছেন—

সুন্দরি আঁরে কহিছ কি ।

তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
ভিতোর হইয়াছি ॥

ধির নহে মন সদা উচাটন
সোঁয়াথ নাহিক পাই ।

গগনে ভুবনে দশ দিশ গণে
তোমারে দেখিতে পাই ॥

তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে ।

খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে ॥

শুন বিনোদিন প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা ।

একই পরাণ

দেহ ভিন ভিন

জ্ঞান কহে গেল ধান্দা ॥

এমন “পিরীতিতে” যিনি ভিতোর না হইতে
পারেন তাঁহার পক্ষে বৈষ্ণব-কবির পদাবলী
লইয়া নাড়াচাড়া করা বিড়ম্বনা মাত্র । কোন
ইন্দিয়পরতন্ত্রার মুখে কোন ইন্দিয়পরাভূত
কামুকের মুখে এমন ভাব প্রকাশিত হইতে
পারে কি ? বৈষ্ণব-কবির গান ইন্দিয়
স্বথের গান কহে, তাহা আত্মবিলোপকারী
ভাবোন্মাদের হৃদয়োথ ধ্বনি—কোথাও
চঞ্চল, কোথাও বিহ্বল, কোথাও বেদনাময়,
কোথাও আবার আনন্দ-মুখিতে । কৃত্রিমতা
কোথাও নাই, তাগ নহে, তবে তাহা এত
বিরল যে তাহাকে অগ্রাহ করিতে পারা
যায় । (ক্রমশঃ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু ।

অনুপ্রাসের অধিকার-বিচার *

অনেকের বিধান, অনুপ্রাস জিনিসটা
নিতান্ত কৃত্রিম, সর্বসাধারণের পাতাবিক
ভাষার সহিত অনুপ্রাসের সম্পর্ক অত্যন্ত
অল্প । কিন্তু আজ আমি দেখাইব, শুধু
সাধুভাষায় নহে, † সাধারণ কথাবার্তার
ভাষায়ও অনুপ্রাসের অনুপাত কম নহে ।
এক কথায়, অনুপ্রাস ভাষা-শরীরের অচ্ছেদ্য

অঙ্গ । ভাষাগঠনে অনুপ্রাসের প্রভাব
অত্যন্ত অধিক ।

অনুপ্রাসাত্মক শব্দসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-
নাথ ঠাকুর মহাশয় ‘ধ্বনাত্মক’ শব্দ,
‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ ও ‘ভাষার ইচ্ছিত’ এই
প্রবন্ধত্রয়ে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিয়াছেন
(তৎপ্রণীত শব্দতত্ত্বনামক পুস্তক দেখুন ।)
ইহার ভিতরকার কথাটাও তাঁহার মুক্ত দৃষ্টি
এড়ায় নাই । তিনি বুঝাইয়াছেন—“মিলের
দরকার আছে । মিলটা মনের উপর বা
দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে—একটা

* উত্তর-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত ।

† ভাষাতত্ত্ব হিসাবে, সাধুভাষায় অপেক্ষা সাধারণ
কথাবার্তার ভাষায় ব্যবহৃত অনুপ্রাসের দৃষ্টান্তগুলিই
অধিকতর মূল্যবান । কেননা সেগুলি আদিম ও অকৃত্রিম ।

শব্দের পরে ঠিক তাহার অল্পরূপ আর একটা শব্দ পড়িলে সচকিত মনোযোগ বন্ধ হইয়া উঠে, জোড়ামিলের পরস্পর ষাতপ্রতিঘাতে মনকে সচেত্ন করিয়া তোলে—সে সুরের সাহায্যে অনেকখানি আন্দাজ করিয়া লয়।” (ভাষার ইঙ্গিত)। আমার বক্তব্য বিষয়ের অনেক মশলা তাঁহার সূচিস্থিত প্রবন্ধ তিনটি হইতে সংগৃহীত।

২। খাঁটি সংস্কৃত কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, কল্লোল, কাক, কুঙ্কট, কুঙ্কর, কেকা, কোকিল, গদাগ, গর্গর, ঘর্ঘর, চর্চরী (হাততালি!), ছুছন্দরী, ঝঞ্জা, মর্মর, মৃমুর, বর্ষর, বৃদ্বৃদ, প্রভৃতি শব্দে অল্পপ্রাসের বন্ধার সুস্পষ্ট। সম্ভবতঃ এগুলি মূলে ধ্বনাত্মক শব্দ (onomatopoeic); তবে বৈয়াকরণেরা অন্য উপায়ে পদগুলি সাধিয়া দিবেন কি না জানি না। বাঙ্গালায় প্রাণীর সংজ্ঞা, কুকুর, কুকড়ো, ঘুঘু, ছুঁচো, টাটু, তোতা ঘুরঘুরে (পোকা), টুনটুনি, ব্লবব্লি, টিকটিকি, গিরগিটি ও বাদ্যযন্ত্র ডুগডুগি, চড়কড়ে, প্রভৃতিও সম্ভবতঃ এই গোত্রের।

ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি শব্দ ধ্বনাত্মক না হইলেও অল্পপ্রাসাত্মক। সুবিধার জ্ঞাত সেগুলিও এই অল্পচ্ছেদে দিলাম। যথা—

(১০) খাঁটি সংস্কৃত—অরহর, অবয়ব, অহহ, আশীষ, কঙ্কর, কঙ্কাল, কণ্টক, কনীনিকা, করকা, করক, কলক, কর্কট, কর্কশ, কক্কী; কাকু, কাক্তিক, কুঙ্কম, কুহক, কেতকী, গুগ্‌গুল, তাত, তারতম্য, তিস্তিডী, দজ্জ, ননান্দ, পর্পটী, পল্লল, পিপীতিকা, পিপীলিকা, পিপ্লল, মর্ম, মাম,

যোজন, রবাব, রোরব, ললিত, লাঙ্গল, লাঙ্গুল, লালা, লীলা, লোল, বর্কুল, বকল, বড়বা, শশ, শস্ত, শাশালী, শিরীষ, শিশু, শিশংগা, শীর্ষ, শেষ, শোষ, শ্লেষ, শ্লেয়া, শ্বশুর, শ্বশ্রী, শ্বশান, সদস্ত, সর্ষপ, সহসা, সাহস, সামঞ্জস্য, সীসক, স্বসা।

এবং (১০) চলিত বাঙ্গালা, বাবা, মামা, কাকা, দাদা, দিদি, ননদ, (চাচা, নানা, নুফু,) প্রভৃতি সম্পর্কসূচক শব্দে; কাকাতুয়া, কাকড়া, চামচিকে, ঝিঝি, পাপিয়া, বাবুই, শুগুক, প্রভৃতি জীবজন্তুর সংজ্ঞায়; আমআদা, কটিকারি কাকরোল, কাকুড, কিসমিস, ঘলঘলে, চিচিধে, কেঁতুল, পেঁপে, মর্তমান, বরবটি, শশা, শুগুনি, সর্ষে, প্রভৃতি উদ্ভিদের সংজ্ঞায়; আনান, ককান, কড়কান, কোঁকড়ান, কোঁচকান, কোঁতকান, কোঁকান, কোঁচকান, গগান, গেগান, গোঁগান, গোণান, ঘনান, চাঁচা, চোঁচান, ছোঁচান, ছোঁচড়ান, বাঁজান, টাটান, টুটা, তাতান, তোতলান, থতান, থিতোন, থোঁতলান, দাঁড়ান, ধাঁড়ান, নলান, নিকোন, নিবোন, নিড়োন, নিড়োন, নেটান, নেয়ান, পানান, ফোনান, ফোঁফান, ম্যামান, বানান, বিনোন, বুনোন, রগড়ান, শাণান, শাশান, শিষোন, শোষা, প্রভৃতি ক্রিয়াপদে, এবং আরও বহুতর শব্দে অল্পপ্রাস আছে।

যথা, আড়গোড়া, আলখাল্লা, উনান, একরার, কতক, কয়েক, ককে, কাঁকাল, কাবাব, কাঁহাতক, কুক, কুকি, কুলকুচো, কেলেঙ্কারি, কোঁতকা, খয়েরখা, খামখা, খামখেয়ালি, খিরকিচ, খিটকেল, গুণোগার,

ঘোষা, চামচে, চাঁচ, চাঁচ, চৌচ, চৌচা, চৌচালি, জঞ্জাল, জবরজঙ্গ, জবাব, জরুরী, জাজিম, জাঁহাবাজ, জুজু, জেরবার, বন্ধাট, টাটকা, টোটকা, টুঁটি, টোটো, টাট, টাটী, ট্যাঁটা, ঠাট্টা, হুঁটো, ঠোট, ডাঙা, ডেটেরা, তফাত, তরিরত, তাঁত, তুতে, দফারফা, দরদ, দাদ, দামামা, দালাল, দিগদারি, দেদার, দৌদ, নানা, নাস্তানাবুদ, নেয়ান, পাপস, পাপর, পাপড়ী, মথমল, মলমল, মলম, মরমুম, মহাম, মামদো, মামলা, মামলি, মালামো, মালুম, মুসলমান, রড়, রগড়, রোকড়, রোবকারী, রোজগার, বন্দোবস্ত, বরাবর, বিলকুল, বোষেটে, সরফরাজী, সরগরম, সরকার, সরবরাহ, সরেস, সালসা, সামসারা, সাঁড়াশী, হরকরা, হামেহাল, হিমসিম। ইহার মধ্যে অনেকগুলি আরব পারসী হইতে গৃহীত।

(১০) ইংরাজী হইতে গৃহীত—কেক, কোক, কোকেন, কোকো, কুইনাইন, টিকিট, ডিসমিস, লঠন, রবার।

২। খাঁটি সংস্কৃত বীজ্যাক্ষর শব্দদ্বয়ে অনুপ্রাস সপ্রকাশ। যথা অঃরহঃ, পুনঃ-পুনঃ, মুহমুহঃ, শনৈঃ শনৈঃ, ভূরিভূরি, তন্ন-তন্ন, মুহ মুহ, ইত্যাদি। এগুলি বাঙ্গালায় চলিত আছে। আবার সংস্কৃত বারংবারং, মন্দঃ মন্দঃ, প্রভৃতির অপভ্রংশ বারবার, মন্দমন্দ, ঘনঘন, লাখে লাখে, বাকৈ বাকৈ, কালোকালো, শাদা শাদা, দুষ্ট দুষ্ট, প্রভৃতিও অনুপ্রাসের উদাহরণ। পড়পড়, ঘরঘর, হাজাহাজা, গলাগলা, ধরাধরা (গন্ধ), বাধবাধ, ছাড়ছাড়, ইত্যাদিও আর এক শ্রেণীর শব্দ। বাঙ্গালা—থাকিয়া

থাকিয়া, রহিয়া রহিয়া, পড়িয়া পড়িয়া, প্রভৃতি বোধ হয় সংস্কৃত পৌত্তা পৌত্তা, সারং সারং, প্রভৃতির অনুরূপ। ঘরে ঘরে, পথে পথে, জলে জলে, জন্ম জন্ম (সপ্তমী বিভক্তির লোপ), ঝোপে ঝোপে, হাতে হাতে, গায়ে গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, কোলে কোলে, বকে বকে, মানুষে মানুষে, প্রভৃতি রকম রকমের বহুতর উদাহরণ শ্রীযুক্ত রণীন্দ্রনাথ বাবুর 'বাংলা শব্দদ্বয়' প্রবন্ধে আছে। 'এ সকল স্থলেই অনুপ্রাস অধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সারংসার, পরাংপর, গয়ংগছ, সর্কেসর্কা, সচরাচর, ইত্যাদিতে অনুপ্রাসের রেশ।

৩। এক্ষণে অনুপ্রাসাত্মক কয়েক-শ্রেণীর শব্দের কথা বলিব। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ধ্বন্যাত্মক; কতকগুলির এক অংশ অর্থযুক্ত হইলেও অপর অংশ অর্থশূন্য, কথার মাত্রা হিসাবে ব্যবহৃত।

(১০) একটি শব্দেরই অবিকল দ্বিক্রি। সংস্কৃত মকমক, কলকল ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। চাকচাকাও বোধ হয় এই শ্রেণীর। বাঙ্গালায় কন্ কন্, কড়্ কড়্, বন্ বন্, চক্ চক্, চিক্ চিক্, তাই তাই, ধেই ধেই টো টো, প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। রবীন্দ্র বাবুর শব্দতত্ত্বে বহুতর দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। এগুলি সবই ধ্বন্যাত্মক।

(১০) এই সকল শব্দের দ্বিতীয়ভাগের শেষে একারযোগে বিশেষণ গঠিত হয়, যথা চট্চটে, তুলতুলে, গুড়গুড়ে ইত্যাদি। এবং আনি যোগ করিয়া বিশেষ্য গঠিত হয় যথা টনটনানি, ফরফরানি।

(৮০) ঋকৃক্তিকালে ঋকৃক্ত অংশের পূর্বে আকার আগম। এই শ্রেণীতে ধ্বজাত্মক ছাড়া অন্তরূপ শব্দও আছে। সংস্কৃত ভাষায় ফলাফল, যোগাযোগ, মতামত, এই শ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। বৈয়াকরণেরা অবশ্য এগুলি নঞযোগে সিদ্ধ বলিবেন। ‘হলাহল’ ‘যথায়থ’ দেখিতে এইরূপ, তবে অবশ্য অন্য প্রকারে ব্যুৎপন্ন। বাঙ্গালায় খবরাখবর, শরীর অশরীর (৭) এই শ্রেণীর। ধ্বজাত্মক শব্দে বহু বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা কপাকপ, গবাগব, সপাসপ, (বরাবর অবশ্য এ দণের নহে)। রবীন্দ্র বাবুর শব্দতত্ত্বে অনেক উদাহরণ আছে : থমথমা, রবরবা, গড়গড়া, চটচটা, কনকনাতে আকার সর্বশেষে বসিয়াছে। সংস্কৃত হলহলা এই শ্রেণীর নহে কি ?

(১০) দ্বিতীয়ার্ধের শেষে ইকার আগম। যথা, খড়খড়ি, গড়গড়ি (উপধি), চড়চড়ি, সড়সড়ি, টিকটিকি, ধুকধুকি। অরজারি একটু নিয়মভঙ্গ করিয়াছে।

(১০) প্রথমার্ধের শেষে আকার ও দ্বিতীয়ার্ধের শেষে ইকার আগম। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ নিয়ম আছে, যথা, দন্তাদন্তি, নখানখি। এইরূপ বাঙ্গালায় কাণাকাণি। অনেক স্থলে প্রথমার্ধের আকার পূর্ব হইতেই আছে, যথা ধাকাধাকি, রশারশি, জানা, হানা প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে নিস্পন্ন জানাজানি, হানাহানি, মারামারি। অনেক স্থলে আকার উচ্চারণে ওকার হইয়া যায় যথা, ছুটোছুটি, উঠোউঠি, হলোহলি। খুনোখুনি, মুখোমুখি প্রভৃতি একটু স্বতন্ত্র রকমের। ছনোছনি, ঘুঁষোঘুঁষি প্রভৃতির

ওকার পূর্ব হইতেই আছে। এই অমুচ্ছেদে বর্ণিত শব্দগুলি ধ্বজাত্মক নহে। রবীন্দ্র বাবুর বহুতর দৃষ্টান্ত আছে, অতএব মিছামিছি বকাবদি করিব না। পূর্বার্ধের একার দ্বিতীয়ার্ধে ইকারের মত উচ্চারিত হয় যথা টেপাটিপি, মেশামিশি (কখন কখন এরূপ উচ্চারণ ঘটে না, যথা ঘেঁসাঘেঁসি); এইরূপ পূর্বার্ধের ওকার দ্বিতীয়ার্ধে উকারের মত উচ্চারিত হয়, যথা মোটামুটি, রোখাকুখি, খোলাখুলি পৌটলাপুটলি, বোঁচকাবুঁচকি, রোয়াকুয়ি।

(১০) দ্বিতীয়ার্ধে স্বরের অন্তরূপে পরিবর্তন। এ শ্রেণীতে ধ্বজাত্মক শব্দ আছে। অন্য শ্রেণীর শব্দও আছে। প্রথমার্ধে যে স্বরই থাকুক না কেন, দ্বিতীয়ার্ধে তাহা আকারে পরিবর্তিত হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। যথা,—টিপিয়া টাপিয়া, ঠিকঠাক, কোঁপ কোঁপ, মিটমাট, যুৎযাৎ, যো যা, যোগে যোগে, গোছগোছ, গোলগাল, হুকুমহাকাম, (ধ্বজাত্মক গুপগাপ), চুপচাপ, ধুমধাম, শুকনাশাকনা, খোলাখালা, চুণাচাণা, (চুণো উচ্চারণ), তল্লীতল্লা, ইত্যাদি বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। স্বরের অন্তরূপ পরিবর্তনও ঘটে। যথা কালোকালো, খাটোখোটো, গ্যাঁগোঁ, গ্যাঁটমগোঁটম, গ্যাঁটাগোঁটা, গ্যামাগোমা, বাঁটঘোঁট, বাঁতঘোঁত, ঘেরাঘোরা, বা ঘো, ছাঁকছাঁক, টায়টোয়, টানটোন, ঠারেঠারে, ঢাঝাঢোঝা, দাগদোগ ফারফোর, ফাঁকেফাঁকে, ভাতেভাতে, ভাবেভালে, সাফসোফ, (এ গুলিতে ওকার; কাতুকুত, কারিকুরি (৭), গাঁইগুঁই, জারীজুরী, ফারিফুরি, ঝেঁড়েঝেঁড়ে, ডালডুল, তাড়াতুড়ি,

নাহুসহুস, (এগুলিতে উকার)। ডামডিমে ইকার। ভাজাভুজোয় শেষ আকারের উকার উচ্চারণ। মাহুস মুনিষে দুইটি স্বরের পরিবর্তন ঘটিয়াছে

(১৮০) দ্বিতীয়ার্ধে ব্যঞ্জনের বা অসংযুক্ত স্বরের অত্র ব্যঞ্জনে পরিবর্তন। এইটা বাঙ্গালা ভাষার একটা বিষম মুদ্রাদোষ। সাধারণতঃ ট বা ফ বসাইয়া শব্দের দ্বিকৃতি ঘটান হয়; যথা—শালটাল, সাগটাপ, বইটই, শশাফণা, নিষ্ঠাফিষ্ঠা, (ধ্বজাশ্লক ছটফট, ধড়ফড়, হাঁসফাঁস, উত্তম-কৃত্তম, হেলাফেলা)। ইহার উদাহরণ দিয়া শেষ করিবার যো নাই। কতকগুলি স্থলে ম বা ব বসাইয়া শব্দের দ্বিকৃতি করা হয়; যথা—কটমট, কচমচ, ডগমগ, ধতমত, চিনিমিনি, তোধামোধা, গ্যাডম্যাড, হাঁউ-মাউ (খাঁউ) ইত্যাদি ধ্বজাশ্লক শব্দ ও বোলামোলা, শেষমেষ ইত্যাদি; চাকরবাকর, অদলবদল, এংবেং, আন্তেব্যান্তে (?) * কাঁছাকাঁছা * কাণ্ডবাণ্ড, খড়েবড়ে, টাটী-বাটী, * তাগবাগ, তাঁতবাঁত, আঁকাবাঁকা, শোধবোধ, সুদিবুদি, (?) ইত্যাদি ও আগড়ম-বাগড়ম, তড়বড়, দড়বড়, নড়বড়, কলবল, কিলবিল, খিচিবিচি, ঢুলবল, চুরবুর, চড়বড়, চিড়বিড়, হিজিবিজি, হিলিবিহি ইত্যাদি ধ্বজাশ্লক শব্দ। ইহারও উদাহরণ দিয়া শেষ করিবার যো নাই। অত্যাঘ ব্যঞ্জনে পরিবর্তনের উদাহরণ দিতেছি।

অ—অজলঙ্গ (পূর্ববঙ্গ), অক্লিসঙ্কি, * অলিগলি, * অবরেসবরে।

আ—আইটাই, আঁকুপাঁকু, আঁটাশাঁটা, আগেভাগে (?), আটেকাটে (?), আতালি-পাতালি, আলাভোলা, (বা ভুলো), আলু-খালু, আনচান, আশপাশ, * আবোলতাবোল আলেডালে, *।

উ—উলচল, উলকেফলকো, উসখুস, উসখুসু।

এ—এবড়োখেবড়ো।

ও—ওরঘোর।

খ—খাওয়া দাওয়া (দাবী দাওয়ার দাওয়া নহে—খাবার দাবার তাহার প্রমাণ)

চ—চটপট, চ্যাভ্যা।

ছ—ছটেপটে, ছাতুনাতু, ছারখার।

জ—জড়গড়, জবুথবু।

ঝ—ঝালাপালা।

ত—তচনচ, তধিগধি, তড়িষড়ি।

ধ—ধানপান (ধানুল নহে), ধানাই-পানাই, ধাইপাঁই, ধুকপুক, ধেড়ছেড়।

ন—নড়চড়, নড়াচড়া, (আরোহণ চড়া নহে), নাড়াচাড়া, নটবট, নিড়িকচিড়িক, নিটপিট, নিশপিশ, ন্যাতাক্যাত।

প—পড়েধড়ে (ধরিয়া ?), পোড়াপোড়া, পাকশাক (শাকান্ন নহে)।

ফ—ফণিনপণি, ফাটকিনাটাক।

ভ—ভাবসাব।

ম—মোটাগোটা, মোটাসোটা।

য—যবেহবে (জলে স্থলের দেখাদেখি ?), যো সো।

র—রকমশকম, রুগুগুগু।

* এ সকল স্থলে দ্বিতীয় শব্দটি আসল, প্রথমটি তাহার বিকার। অতএব ঠিক এই নৃত্র খাটে না।

* এ সকল স্থলে দ্বিতীয় শব্দটি আসল, প্রথমটি তাহার বিকার। অতএব ঠিক এই নৃত্র খাটে না।

ল—লগুভণ্ড, লুটেপুটে ।

ব—বকাঝকা, বদলসদল, বাদসাদ বা ছাদ, বুদ্ধিসুদ্ধি (শুদ্ধি বোধ হয় নহে, 'বুদ্ধে স্বখে' দেখুন), বেয়েছেয়ে, বেঁটেখেটে ।

শ স—শিকুটিবিকুটি, শসিকাসিয়া, স্থিতভিত ।

হ—হাষিগাষি, হরেদরে, হাউচাউ, হাড়গোড়, হাবীজাবী (পূর্ববঙ্গে), হাবা-তাবা, হানপান, হাতেনাতে, হাঁসফাস, হিল্লীদিল্লী, হলস্থল, হেরফের, হেস্তনেস্ত, হেজিপেজি, হৈটৈ, হৈটৈর, হোমরাচোমরা ।

এই শব্দের একটা বিশেষ বিধি আছে । কতকগুলি স্থলে দ্বিতীয়ার্কের স্বরও বাজনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় । যথা, অম্বুধ বিবুধ (বম্বু হইল না), আঁটিম্‌টি, অষ্টাকষ্টি, আঁকজাঁক, আছাড়িপিছাড়ি, উবদোখাবদা, উবদোপাবদা, আমলাফয়লা, কাটচিট, কাপড়চোপড়, কামালে-জোমাণে, নিকুলে-চুকুলে, কষ্টেস্‌কষ্টে, খুটিনাটী, গিল্লীধন্নী বা গিল্লীবান্নী, গিরগিটি, গোলমাল, চাষাভূষো, চুরমার, চোটপাট, চাঁচামেচি, ছেলেপিলে, ছুতোনাতা, ঝটাগটি, টোটাঘুটি, ডাকাবুকো,

ভুতিয়েপাতিয়ে, খরহরি, নিন্দাবান্দা, নেকড়াচোকড়া, পিঠানাটা, পাখীচুখী, ফাঁকিছুঁকি, মাপযোপ, মিলেগুলে বা মিলেজুলে, মিশেগুশে, মেখেচুখে, যোটপাট, যোড়াতাড়ি, রান্সসখোন্সস, লুঠপাট, লেখাযোখা, বাসনকোসন, বিয়া (বিয়ে) খাওয়া সাজগোজ, সাপকোপ, সেজেগুজে সোণাদানা, হাবাগোবা, হাবজাগোবজা, হাবুডুবু, হাড়ুডুডু, হাড়গোড়, হড়পাড় ।

(১০) নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বীজ্য ঘটিয়াছে । কিন্তু বড় অনিয়ম । কান্নাকাটি কারাকিং, কারকারবার, ক্যা কটকট, খেখেলা, গরিবগুরবো, গালিগালাজ, গো-গুস্তি, ঘুরঘুটি, বগড়াঝাঁটি, টাইটম্বর, টাল-মাটাল, ঠিকঠিকানা, তরীতরকারী, তাকতধি, তানতোবড়া, তুচ্ছতাচ্ছল্য, ধনধোকড়া, ধুমধারাকা, পাখীপাখালী, ফণিকাসিয়া, (ফণিভাষ্য ?), ফাইফরমাশ, ভরাভর্ষি, ভুজোভাং, ভুলোভাটকা, মোটমাটারি, যোগসাযোগ, রাজারাজড়া, বনিবনাও, বরাবডে, বড়োহাবড়া, সময়শিরে, সাহেবসুবো, হাবরহাটী । (ক্রমশঃ)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

খিণ্ডসফি ও বৌদ্ধধর্ম

মিঃ সিনেট বলেন—“আদি বুদ্ধের অর্থ :— সেই সর্বাদিম জ্ঞান, অতিপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে”; স্বর্গীয় ধ্যানী-বুদ্ধদিগের অনুরূপ মর্ত্যালোকের মানব-

বুদ্ধগণ; এই মানব-বুদ্ধগণ ধ্যানী-বুদ্ধগণ হইতেই উদ্ভূত; তাহার পর, স্বর্গীয় বোধিসত্ত্বগণ; জ্ঞানের অভিব্যক্তিস্বরূপ— অবলোকিতেশ্বর; পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধের অনুরূপ

পঞ্চ মানব-বুদ্ধ; এই পঞ্চ মানব-বুদ্ধের মধ্যে চতুর্থ বুদ্ধ শাক্যমুনি; প্রত্যেক মহাপ্রলয়ের পর এক এক বুদ্ধ পৃথিবীতে আগমন করেন। ঈশ্বরের সহিত অর্হং-আত্মার যোগ হয়। এই সমস্ত কথা imঃ সেনেট বিবৃত করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, এই সমস্ত মতবাদ, “যোগাচার্য্য” শাস্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সিনেট যে বলিয়াছেন, অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও আদিবুদ্ধের উল্লেখ আছে, আমরা শুধু তাঁহার সেই উক্তির প্রতিবাদ করিব। Schmedt, Csomado Coros, Burnouf, Wilson, Hodgson ও Schlaginweit সকলেই একবাক্যে এই কথা অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে এই আদিবুদ্ধবাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহা আদিম বুদ্ধধর্মের অন্তর্গত নহে। আর, যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম বুদ্ধধর্মের আরও পূর্ববর্তী, এই মতবাদ সেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্গত তা হইতেই পারে না।

প্রথমে আমরা দেখাইব, বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত এই মতবাদগুলি, যে দর্শন-শাস্ত্র হইতে নিঃসৃত হইয়াছে সেই দর্শনশাস্ত্র অশ্বমুগের দশম শতাব্দীতে তিব্বৎদেশে আবির্ভূত হয়। তাহার পর আমরা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে, এই মতবাদ-গুলি প্রাচীনকালের যেকোন ধর্মপদ্ধতি হইতে গৃহীত হইতে পারে। প্রথমতঃ সিনেট যে গুপ্ত মতবাদের কথা একটা গ্রন্থের আবরণ দিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, উহা অতীব প্রাচীন-কালেও সমস্ত প্রাচ্যখণ্ডে বিদ্যমান ছিল।

সভ্যতার পথে যাহারা সর্বগ্রাম্যমৌ, সেই মিশরবাসীদিগের মধ্যে, দীক্ষিতদিগের মন্দিরাদি ছিল। চ্যান্ডীয়, হিন্দু, পারসীক, চীনীয়, ইহুদি—ইহাদের মধ্যেও ছিল। এই সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত গুপ্ত মতবাদগুলি মূলতঃ অভিন্ন। Lao-Tsen-র Tao মতবাদ এবং ভারত ও মিশরের বিখ্যাত ব্রহ্ম মতবাদ যে সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহুদীদিগের “কাবাল”-গ্রন্থদ্বয় ঐ একই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। ‘আর, সৃষ্টি-প্রকরণসম্বন্ধে, কি মিশরীয়, কি চাল্ডীয়, কি হিন্দু, কি ইহুদি, কি গ্রীস এই সকল জাতির মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাতে উহাদের সাধারণ উৎপত্তিই সপ্রমাণ হয়। সিনেট নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

“এই গ্রন্থে, অর্হং বৌদ্ধদিগের যে সৃষ্টি-তত্ত্বের কথা আমরা বিবৃত করিয়াছি, উহা দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগেরই পদ্ধতি। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবার বহুপূর্বে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উহা প্রচলিত ছিল।”

জীবপর্যায়ের পদ্ধতি, বৌদ্ধদিগের বিভিন্ন স্বর্গ, যাগার অমুরূপ—চিত্তগুচ্ছ ও ধ্যানসাধির বিভিন্ন অবস্থা,—এই সমস্ত বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম হইতে গ্রহণ করিয়াছে; অবশ্য উহার কিছু কিছু পরিবর্তন ও করিয়াছে।

অতএব, কিসে যে থিওসফি বিশেষ-রূপে বৌদ্ধধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

“বৌদ্ধ গৌতম এই মতবাদের পূর্ণতা-বিধান কল্পে এতটা করিয়াছেন যে ইহা তাঁহারই নিজস্ব হইয়া পড়িয়াছে”—এই

বিশ্বাসের উপর ভর করিয়াই তিনি উক্ত প্রকার দাবী করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি, থিয়োসফির মতবাদগুলি আদিম বৌদ্ধধর্মের মতবাদ নহে। তা ছাড়া আমরা ইহাও দেখাইব যে, শাক্যমুনির দর্শন-পদ্ধতি থিয়োসফির দর্শন পদ্ধতি নহে। ল্যাসেন, বুণ্‌ফ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তারা সম্মত করিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্মের দর্শনপদ্ধতি কপিলের সাংখ্য সিদ্ধান্ত হইতে বিকাশলাভ করিয়াছে। এ কথা সকল প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তারাই স্বীকার করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বুণ্‌ফ এইরূপ বলেন—“শাক্যমুনি ধর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া, নাস্তিক সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সিদ্ধান্তগুলি এইঃ—ঈশ্বরের অসম্ভাব, মানব-আত্মা-সমূহের বহুত্ব ও নিত্যত্ব, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির নিত্যত্ব। সেই প্রকৃতিও রূপান্তরিত হইয়া থাকে; এবং তাহার কতকগুলি উপাদান আছে; সেই উপাদানগুলি দিয়া, প্রকৃতি, সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ মানব-আত্মাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। এই মতবাদ হইতে শাক্যমুনি,—ঈশ্বরের নাস্তিত্ব, মানব-আত্মার বহুত্ব, ধোনিভ্রমণবাদ, নির্বাণ-মুক্তি—এই সমস্ত গ্রহণ করেন। এই নির্বাণ-মুক্তির কথা সাধারণতঃ সমস্ত ব্রাহ্মণিক দর্শনেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।”

সিনেটের গৃহবৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই সকল মতবাদই আমরা দেখিতে পাই।

যে কর্মবাদ থিয়োসফির একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়, উহা কি বৌদ্ধধর্ম, কি ব্রাহ্মণ ধর্ম—উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত।

থিয়োসফির মতামুসারে, যে সকল উপাদানে মানুষ গঠিত, তন্মধ্যে আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই “রূপ”। এই রূপ-শব্দের অর্থ আকার; সমস্ত হিন্দুদর্শনেই ইহার উল্লেখ আছে।

থিয়োসফির তৃতীয় তত্ত্ব—“অ্যাট্রাল বডি” অর্থাৎ “লিঙ্গশরীর”। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি সাংখ্যদর্শনের সংজ্ঞা। কতকগুলি বিস্কৃত উপাধি লইয়া এই শরীর গঠিত,—ইহাই সাংখ্যদর্শনের “সূক্ষ্মশরীর”।

পঞ্চম উপাদান—“মনঃ”। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মনঃ কি? না, অন্তঃকরণ। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয়েরই মতে, ইহা চক্ষু কণাদির দ্বারা আর একটি ইন্দ্রিয়।

ষষ্ঠ উপাদান “বুদ্ধি”। এক বৌদ্ধ, কি ব্রাহ্মণ উভয়ের ভাষাতেই ইহার অর্থ—যে মনোবৃত্তির দ্বারা মনুষ্য জ্ঞান লাভ করে।

সপ্তম উপাদান—আত্মা। বৌদ্ধদিগের এই আত্মা, এই আমি,—জ্ঞান, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতাদি সংযুক্ত ব্যক্তিগত দেহ নহে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, কত প্রকার বিভিন্ন উপাদান লইয়া থিয়োসফি গঠিত। ইহার আরও অজ্ঞাত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। থিয়োসফি বৌদ্ধধর্মের উপর দাবী কিয়ৎপরিমাণে সপ্রমাণ করিতে পারিলেও বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক শাক্যমুনির সহিত কোন প্রকার যোগ নিবন্ধ করিতে পারিবে না।

পরিশেষে, মিঃ সেনেটের গ্রন্থের কতকগুলি ভ্রম প্রদর্শন করিব। এই ভ্রমগুলি উপেক্ষা করা যায় না; কারণ, তিনি “মহা-ধীশক্তি সম্পন্ন সর্বোপেক্ষা প্রখ্যাত সংস্কৃত

ব্রাহ্মণ” শঙ্করাচার্যকে প্রমাণ মানিয়া এই সকল ভ্রমের অবতারণা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, শঙ্করাচার্য্য বুকেরই এক অবতারণা; এবং তাঁহার মতে বুকের মৃত্যুর ৬০বৎসর পরে, শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। আরও তিনি এই কথা বলেন—“শঙ্করাচার্য্য—বেদান্ত দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা, যদিও তিনি ব্যাসের গ্রন্থাদি হইতে ইহার পোষকতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেদান্তের প্রকৃত অর্থ—জ্ঞানের চূড়ান্ত অংশ। শঙ্করাচার্য্যকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যিক দর্শন বেদান্তের সংস্থাপক বলায়—এমন কি সাংখ্যেরও পূর্ববর্তী বলায় মিঃ সিনেট একটা কুজ্ঞাটিকার সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বয়ং ব্যাস যিনি দ্বিতীয় বেদান্ত-দর্শনের সংস্থাপক, প্রাচীন বেদান্ত-দর্শনকে সমর্থন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সেই ব্যাস বৌদ্ধধর্মের বহুপূর্ববর্তী। সেনেট, যে শঙ্করাচার্য্যকে বুকের অবতার বলিয়াছেন, তাঁহাকেই আবার এমন এক দর্শন-তত্ত্বের প্রধান প্রবর্তক বলিয়াছেন যাহা বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত, কোলুক্বের মতে, ব্যাস বা বেদব্যাসের অর্থ “বেদের সঙ্কলনকর্তা।” বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই দর্শনের নাম “বেদান্ত” হইয়াছে। পক্ষান্তরে শাক্যমুনি, শুধু যে বেদের প্রামাণ্য অগ্রাহ করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি বেদান্ত দর্শনের সেই বিষয় শব্দে কপিলের দর্শন হইতে তাঁহার দর্শনতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অকৃত কথা—শঙ্করাচার্য্য, বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক, ব্রহ্মসূত্রের একজন প্রখ্যাত ভাষ্যকার। সেই

ভাষ্যগ্রন্থে, তিনি বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র—যাহা বৌদ্ধদিগের আদিম দর্শনগুলির পরবর্তী—সেই ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন দর্শনগুলি ভ্রান্ত, ইহাই সপ্রমাণ করা। কেননা, তাঁহার মতে, ঈশ্বর পূর্ণরূপে এক ও অখণ্ড এবং জগৎ বাস্তবসত্য নহে। সুতরাং, ইহা শাক্যসিংহের প্রচারিত মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। এই বেদান্তদর্শন যে বৌদ্ধদিগের প্রতিপক্ষ, তাহার প্রমাণ—বর্তমান কালেও বৈদান্তিক ব্রাহ্মণেরা, জৈননামক হিন্দুসম্প্রদায়ের বিরোধী তাঁহারা বলেন, যে প্রকারেই ভৌতিক পদার্থের যোগাযোগ কর না কেন, তাহা হইতে জ্ঞানবস্তু কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না; এবং ভৌতিক পদার্থের দ্বারা মনোবৃত্তি ও মানসিক ব্যাপারেরও ব্যাধা হইতে পারে না।

অতএব শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগের প্রতিপক্ষ; সুতরাং তিনি বুকের অবতার হইতে পারেন না।

মিঃ সিনেট ব্রহ্মের যে উৎপত্তি দিয়াছেন তাহাতেও বড় একটা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, “ব্রহ্ম শব্দ ‘বৃ’ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—যাহার অর্থ, প্রসারিত হওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া, ফলপ্রসূ হওয়া।”

পক্ষান্তরে Eichhoff এর ব্যাকরণ অনুসারে ব্রহ্মশব্দ “ব-র-হ” ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—যাহার অর্থ ধারণ করা। বস্তুত, ব্রহ্ম বিংশবিধরণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ, নিজস্বরূপে পূর্ণভাবে অবস্থিত। তিনি সেই

আধ্যাত্মিক রসস্বরূপ, যিনি পবিত্র বাক্যকে বাক্য হইতে উদ্ধৃত্ত উত্তোলন করেন, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে সত্যরূপে বিরাজ করেন সেই জগুই, Oldenburg বলেন, “যিনি পবিত্র বাক্য অবগত হইয়াছেন, তিনিই একটি আশ্রয় লাভ করেন, কেননা ব্রহ্মই সকলের আশ্রয় ও অবলম্বন।”

পরিশেষে মিঃ সেনেটের “একটি স্পর্ধা-বাক্য এইখানে উদ্ধৃত্ত করিব—“কোন প্রামাণিক বৌদ্ধগণি প্রামাণিককে কেহ দেখান দেখি যাহাতে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে— এই মতবাদটি এইরূপ শিক্ষা দেয় যে, কোন জীববিবর্তনক্রমে একবার মানব-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর আবার কোন সময়ে পশুরাজ্যে নামিয়া আসিতে পারে। আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতেছি, এরূপ বাক্য কখনই কেহ দেখাইতে পারিবে না।”

আমি মিঃ সেনেটকে এই সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক বৌদ্ধ বাক্য প্রদর্শন করিব। ইহা সংস্কৃত “দিব্য-অবদানের” অন্তর্গত “সংঘ-রক্ষিতার” কাহিনী। তিব্বতীয়দিগের “Dul-va” গ্রন্থের মধ্যেও এই কাহিনীটি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা অতি প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণন এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—“মাননীয়া সংঘরক্ষিতা ভগবান্ বুদ্ধকে সোধোধন করিয়া এই রূপ বলিলেন—“প্রভো, আমি এই জগতে এমন সকল জীব দেখিয়াছি যাহাদের আকৃতি প্রাচীরের তায়, স্তম্ভের তায়, বৃক্ষের তায়, পুষ্পের তায়, ফলের তায়, বজ্রের তায়, সমাজজীবীর তায়, ঘটের তায়, উদ্ভূতের তায়, কটাহের তায়; আমি এমন জীবন্ত

দেখিয়াছি যাহার দেহ মধ্যস্থলে বিভক্ত হওয়ায়, যাহারা কেবল মাংসপেশীর ভরে, বিচরণ করে। প্রভো, কিরূপ কর্মফলে জীব এইরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়?” ভগবান উত্তর করিলেন—“সংঘ-রক্ষিতা, তুমি প্রাচীরাকৃতি যে সকল জীবকে দেখিয়াছ, তাহারা সমৃদ্ধ কাণ্ডের শ্রোতৃবর্গ। উহারা নিষ্ঠীবনের দ্বারা সংঘারামের প্রাচীরকে কলুষিত করিয়াছিল। এই কর্মফলে উহারা প্রাচীরের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ কারণেই, অল্প শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ বা বৃক্ষকারে, কেহ বা উদ্ভূতের আকারে, কেহ বা কটাহ আকারে পরিণত হইয়াছে।” ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট উক্তি আর কি হইতে পারে?

এইখানে আমি উপসংহার করিব। বড় বড় প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণের গ্রন্থ হইতে অনেক বাক্য উদ্ধৃত্ত করিয়া, আমি যে বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছি, উহা প্রধানত ব্যবহারিক ধর্মনীতির সংহিতামাত্র। সকল জনসমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ নিম্ন-শ্রেণীদিগের মধ্যে, সাধুতা চিত্তশুদ্ধি, মাদুর্য্য মৈত্রী প্রভৃতির জ্ঞান উন্মেষ করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই জগুই বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধ শাক্যমুনি, “ধর্ম্মমিত্র” ও “মানব-মিত্র” বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। মুক্তির জগু তিনি সকলকেই আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলেন, “আমার এই ধর্ম্ম সর্বজনের মুক্তির জগু।” অনেক পণ্ডিত এই বলিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রতি দোষারোপ করেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানানুশীলনের উচ্ছেদ করে, সত্যতার উন্নতি ও বিকাশের পথ রুদ্ধ করে,

এক কথায়, মানুষকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জড়তার দিকে লইয়া যায়। কিন্তু আমার বোধ হয়, শাক্যবুনির প্রকৃত উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এইরূপ দোষারোপের কোন ভিত্তি থাকে না। অলস উৎসাহ-পূর্ণ করণ সদয় বুদ্ধ, যতটা সম্ভব, মানুষের হুঃখ নিবৃত্তি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সর্বপ্রথমে তিনি পার্শ্বব স্নেহসন্তোগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি দেখাইলেন, এই সকল স্নেহ অতীব অসার। তাহার পর, যে অহংবুদ্ধি আমাদের জীবনের প্রতি আসক্ত করে ও আমাদের অন্তরে ভবতৃষ্ণার উদ্বেক করে, সেই অহংবুদ্ধিকে মানব-অন্তর হইতে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ত, তিনি যোনি-দ্রবণবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং সকলকে এই আশ্বাস দিলেন যে, যে ব্যক্তি নির্বাসনের অনুসরণ করিবে সেই চরম মুক্তি বা মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে। এক কথায়, তিনি মানুষের হৃদয় হইতে স্নেহের অভাব-বোধ বিরোধিতা করিয়া, মানুষকে পার্শ্বব স্নেহ হইতে বিযুক্ত করিয়াছেন। মানসিক ও সামাজিক উন্নতির উদ্বেদ হউক বা যাহাই হউক, তিনি মানুষের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কি দীনহীন হুঃখপীড়িত মানবমণ্ডলীর পরম কল্যাণ সাধিত হয় নাই? তিনি যখন কারিগর-দিগকে, শূদ্রদিগকে, দীনদরিদ্রদিগকে, অস্পৃশ্যদিগকে আপনার নিকট আহ্বান করিয়াছিলেন, ধর্মপ্রচারকালে তখন এই সকল নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কথাই

তাহার মনে হইয়াছিল, উচ্চশ্রেণীর কথা তাহার মনে হয় নাই। পক্ষান্তরে, আমরা যাহাকে উন্নতি বলি, সভ্যতা বলি, তাহাতে অবশ্য মানুষের জ্ঞানসম্পদ বর্ধিত হইতে পারে, কিন্তু সে একপ্রকার ভৌতিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান নহে। উদ্ভ্রম প্রবৃত্তি-সমূহ দমন করা দূরে থাকুক, তথাকথিত উন্নতি এমন-সব নতন অভাবের সৃষ্টি করে, যাহা কখনই পূরণ হইতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, মানুষের হৃদয়-ভাব, মানুষের অভাবসমূহ পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত করিয়া, মানুষকে অতি সূক্ষ্মচেতা করিয়া দিয়া, সেই সঙ্গে তাহার হুঃখবোধও তীব্র করিয়া তুলে। আমাদের যেরূপ ভৌতিক বা বৈষয়িক সভ্যতা, তাহাতে দারুণ জীবন-সংগ্রামের উদ্ভব হয়। দীনহীন দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি দারুণ নির্দয় এই যে সভ্যতা, ইহা সামাজিক সংগ্রাম-উৎপাদন-কারীর সহিত মূলধনীয় বিরোধ, পররাজ্যের সহিত যুদ্ধ, পরদেশাক্রমণ প্রবৃত্তি এই সমস্ত উত্তেজন করে। এই সমস্ত আয়াসের বিনিময়ে মানুষ পায় কি?—ততটুকু শিক্ষা পায় যাহাতে করিয়া মানুষ তাহার অবস্থার হীনতামাত্র অনুভব করিতে পারে এবং সেই বিলাসস্নেহের আশ্বাদ পায় যাহা তাহাকে কখনই পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি দিতে পারে না।

প্রকৃত কথা, বাসনাহীন প্রশান্ত ধ্যানাত্মক বৌদ্ধজীবন—সেই আলাময়, অভ্যুত্তম পাশ্চাত্য মানব-জীবন অপেক্ষা কি বাঞ্ছনীয় নহে, যে জীবন ভৌতিক সভ্যতার ভীষণ আবর্তে পড়িয়া মত্ত ও বিক্ষুব্ধ

হইতেছে? সুখ দিতে না পারুক, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারিলেও, বৌদ্ধধর্মকে মানবমণ্ডলীর পরম হিতকারী মুহূর্ত্ত বলিতে হইবে। এই মর্ত্তাজীবনের—বিশেষত আমাদের সভ্যতার চিরসহচর দারুণ দুঃখ-কষ্টের সহিত সংগ্রামে হতাশ হইয়া সমাজের হতভা। অসগায়

যে সকল ব্যক্তি আত্মহত্যার দ্বারা মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; তাহার। কি পরিশেষে সেই পরম কল্যাণময় বিরামের আকাঙ্ক্ষা করিবে না, যে বিরামকে কপিল-বস্ত্রের মধুর-প্রকৃতি শাক্যমুনি “নিক্কাণ”-আখ্যা প্রদান করিয়াছেন?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আধুনিক শিক্ষার আদর্শ ও জবরদস্তুর লোকশিক্ষা।

বর্ত্ত প্রকারের সামাজিক সমস্যা আছে, তার মধ্যে লোকশিক্ষার সমস্যাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা জটিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এই জটিল সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এই লোকশিক্ষার সমস্যার অসাধারণ গুরুত্ব ও জটিলতা প্রত্যক্ষ করিয়া, একান্ত সরাসরি ভাবে, শুদ্ধ একটা সদিচ্ছার উৎসাহে, ইহার মীমাংসা করিতে সাহস হয় না।

বথায়োগ্য অনুশীলনের দ্বারা মানুষের যাবতীয় স্বাভাবিক শক্তি ও বৃত্তিকে ভাগ রূপে ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহাদের সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে, নিজ নিজ সমাজের বিচিত্র কর্মজীবনের ভিতর দিয়া, আপনার জীবনের বথাসমুদ্র সার্থকতা লাভে সমর্থ করাই—আধুনিক শিক্ষার আদর্শ। এই শিক্ষার দুইটি মুখ্য অঙ্গ। এক অঙ্গ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে, ও অপর অঙ্গ তাহার সামাজিক জীবনকে অধিকার করিয়া আছে। এই শিক্ষার ব্যক্তিগত অঙ্গ মনো বিজ্ঞানের উপরেই বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত

হইতেছে, আর ইহার সামাজিক অঙ্গ সমাজতত্ত্বের উপরেই গড়িয়া উঠিতেছে।

জগতের প্রাচীন সাধনা সকলে সকল স্থানে লোকশিক্ষার এই ব্যক্তিগত অঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। আজিকালি আমরা ব্যক্তির বলিতে যে বস্তু বুঝি, ইংরেজীতে বাহাকে Human Personality বলে, প্রাচী সাধনায়, ভারতবর্ষের বাহিরে, তাহার জ্ঞান কোথাও ভাল করিয়া ফুটয়া উঠে নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের বাহিরে, মানবের অন্তঃপ্রকৃতিকে ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাও কুদ্রাপি হয় নাই। জগতের প্রাচীন সাধনায় মানবপ্রকৃতির অশেষ জটিলতার জ্ঞানও ভাল করিয়া ফোটে নাই। মানুষের প্রকৃতিতে ভাল ও মন্দে মধ্যে যে একটা নিত্যবিরোধ জাগিয়া আছে, তাহার জ্ঞানই প্রাচীন কালের লোকচিত্তকে অনেক স্থলে একান্ত অভিব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আর এই বিরোধের জ্ঞান এমন একটা প্রবল দৈততাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল যে, তাহাতে মানবপ্রকৃতির

মৌলিক ও অনতিক্রমণীয় এককের জ্ঞানকে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর দেয় নাই। সুতরাং সে কালের লোকশিক্ষার আদর্শ অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রবিশেষের আদেশের কিস্বা ব্যক্তিবিশেষের অনুশাসনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইত। সে আদর্শ সর্বতোভাবে মানুষের নিজের প্রকৃতির উপরে এবং সেই প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিবার অবসর পায় নাই। সে কালের লোকশিক্ষা বাহির হইতে কি ভাল এবং কি মন্দ তাহার প্রামাণ্যলক্ষণ সংগ্রহ করিয়া, উপর হইতে সেই বাহিরের আদর্শকে জনগণের উপরে চাপাইবার চেষ্টা করিত এবং মানুষের আপাত ভালকে বাড়াইয়া তাহার আপাত মন্দকে নিরস্ত করিবার প্রয়াসেই আপনার সফলতা অন্বেষণ করিত।

এ শিক্ষার প্রকৃত মূল্য ও সত্য সার্থকতা যাগাই হউক না কেন, উহা যে অনেকটা সহজ ছিল, এ কথা মানিতেই হইবে। কিন্তু এ কালের মনোবিজ্ঞান মানবপ্রকৃতির অশেষ বৈচিত্র্য ও আপাত-বিরোধের মধ্যে যে অনতিক্রমণীয় একক আছে, তাহাকে যতই আয়ত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই পুরাতন দ্বৈতবোধ নষ্ট হইয়া, আধুনিক শিক্ষার সমস্তাধিকার ক্রমশঃই অত্যন্ত গুটিল করিয়া তুলিতেছে। মানবপ্রকৃতি স্বরূপতঃ এক, যদিও অশেষ প্রকারের রূপের ভিতর দিয়া সেই প্রকৃতি আপনাকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। ছায়াতপের স্রায় ভাল ও মন্দ মানুষের মধ্যে মিলিয়া আছে। মানুষের ভালোর মধ্যেই তার মন্দ এবং মন্দের মধ্যে তার ভাল লুকাইয়া আছে।

আত্মশক্তিক ভাল বা আত্মশক্তিক মন্দ, দুয়ের কিছুই তাহার মধ্যে নাই। সুতরাং মানব-প্রকৃতির কিছুই একান্ত ভাবে উপেক্ষণীয় বা পরিত্যজ্য নহে। প্রাচীন কালের শিক্ষা মানুষের প্রকৃতির ভাল ও মন্দের প্রত্যক্ষ বিরোধকে জাগাইয়া রাখিয়া ও ফুটাইয়া তুলিয়াই আপনার আদর্শলাভে চেষ্টা করিত। আধুনিক শিক্ষা এই বিরোধকে বিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া মাত্র মনে করে, এবং এই বিরোধের ভিতর দিয়াই মানব-প্রকৃতি যে সামঞ্জস্যের দিকে যাইতেছে, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া চলে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা মন্দের ভিতর দিয়াই ভালকে বাড়াইয়া তুলিয়া এবং ভালোর ভিতর দিয়া মন্দকে শোধিত করিয়া মানুষের প্রকৃতিকে পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের সুর মিলাইয়া কণাবিশারদ বাজকদেরা যেমন একটা অপূর্ণ সঙ্গত করিয়া তোলেন, সেইরূপ মানুষের ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি আপাত-বিরোধী বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সকলের যথাযোগ্য অনুশীলন করিয়া, তাহাদের মিলনে একটা অপূর্ণ সঙ্গত করাই আধুনিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। মানবপ্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু ভাল মন্দ সেই প্রকৃতিরই অঙ্গভূত হইয়া আছে, তাহার সকল গুলিকে মিলাইয়াই এ সঙ্গত করিতে হইবে। এ সকলের মধ্যে কোনো বৃত্তিকে ছাড়াইয়া এ সঙ্গত পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিবে না। একটিকে খাটো করিয়া অপর কোনোটিকে বাড়াইয়া দিলে এ সঙ্গত নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রত্যেক বৃত্তির এক একটা নিজস্ব লক্ষ্য

আছে। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির এই নিজস্ব লক্ষ্যটিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। প্রত্যেক বৃত্তি আপনার নিজস্ব লক্ষ্যেরই অনুসরণ করিবে, অথচ তারই ভিতর দিয়া সকলে মিলিয়া সমগ্র প্রকৃতির যে লক্ষ্য, তাহাকেই বাড়াইয়া দিবে। ইহাই আধুনিক শিক্ষার ব্যক্তিগত ঋণের উৎকৃষ্ট আদর্শ। আর এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াই এ কালের মনোবিজ্ঞান বর্তমান যুগে লোকশিক্ষার সমগ্রাণকে এমন বিষম জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

প্রাচীন সাধনা সকলে অনেকস্থলেই মানব-প্রকৃতির এই জটিলতার জ্ঞান ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। সে সকল সাধনা মানুষের ভিতরে একটা আত্যন্তিক দন্দ কল্পনা করিয়া, কতকগুলি বৃত্তিকে ভাল আর কতকগুলিকে মন্দ ভাবিয়া, ভাল বৃত্তিগুলিকে সতেজ ও মন্দগুলিকে নিষেধ করিবার জন্ত, লোক-শিক্ষার নামে মানুষের উপরে অশেষবিধ অস্বাভাবিক শাসনসংযমের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতিকে নিষেধিত করিত। সুতরাং সে কালের লোকশিক্ষাতে মানবপ্রকৃতিকে সাহায্য করার চেষ্টা অপেক্ষা শাসন করার চেষ্টাই বেশী ছিল। ভিতর হইতে, যথাযোগ্য অনুশীলনের দ্বারা, মানবের প্রকৃতিকে ফুটাইয়া তুলিয়া, সেই প্রকৃতির সম্পূর্ণ চরিতার্থতা সম্পাদনের চেষ্টা অপেক্ষা, সে কালের লোকশিক্ষাতে মানুষের উপরে কতকগুলি বাহিরের বিধিনিষেধ চাপাইয়া দিয়া সেই প্রকৃতিকে সর্বদা সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার চেষ্টাই অধিক ছিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান লোকশিক্ষার যে নূতন আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতেছে, তাহা এই প্রাচীন

আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ আদর্শ প্রাচীন শাসনের স্থলে নূতন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ আদর্শের প্রেরক ও পরিচালক অপরের আদেশ নহে, কিন্তু নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি। এই আদর্শ শিক্ষাকে কঠিন ও ক্লেশকর না করিয়া সর্বতোভাবে সহজ ও সুখকরই করিতে চাহে। এই আদর্শের অনুসরণের জন্ত জনগণকে প্ররোচিত করিবার মূল মন্ত্র ভয় নহে কিন্তু লোভ।

অতএব আধুনিক আদর্শের লোকশিক্ষা কোথাও প্রবর্তিত করিতে হইলে, সকলের আগে সে শিক্ষা সম্বন্ধে জনগণের রুচি জন্মান আবশ্যক। আর তাহা করিতে গেলেই বর্ণ-জানপ্রচারের জন্ত ব্যস্ত না হইয়া, আগে জনমণ্ডলীর প্রাণে বস্তুজ্ঞানলাভের জন্ত যাতে একটা বলবতী আকাক্ষার উদয় হয়, তারই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি অপরাপর দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় কোন অংশেই হীন নহে। সুতরাং জ্ঞান-উপার্জন মূল যন্ত্রটি আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে সম্পূর্ণরূপেই সক্ষম হইয়া আছে। যে ক্ষেত্রে এই যন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, আমাদের দেশে তাহা কিছু অভাব, কেবল তারই। সুতরাং বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে এই ক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠাই লোকশিক্ষার প্রথম কক্ষ। কতকগুলি পাঠশালা খুলিয়া দেশের সর্বসাধারণ শিশুদিগকে সেখানে পাঠাইলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। বরং সাক্ষাৎভাবে শিক্ষার্থীদের অভি-ভাবকদিগের প্রাণে এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদেরও মধ্যে এই জ্বরদস্তির

ব্যাপারে শিক্ষালাভে অনুরাগ না জন্মাইয়া
বিরাগই উৎপাদন করিবে। অতএব দেশের
জনসাধারণের মধ্যে সংশিক্ষাবিস্তারের পথ
অবাধ ও প্রশস্ত রাখিবার জন্তই এই জবর-
দস্তির লোকশিক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে
প্রতিষ্ঠিত না হয়, সর্বতোভাবে তাহার চেষ্টা
করা কর্তব্য।

আর জনমণ্ডলীর প্রাণে জ্ঞানপিপাসার
উদ্রেক করিতে হইলেই তাহাদের প্রকৃতির
অনুসরণ করিয়া তাহার যথাযোগ্য উপায়
অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ সকল
মানুষের প্রকৃতি সমান নয় বলিয়া সঙ্গ
বিষয়ে সকলের সমান কুতূহলও জন্মে না।
এই জন্ত সকলে সকল বিষয়ের অনুশীলন
এবং অধ্যয়ন করিতেও পারে না। এই
কারণেই কেহ বা গণিতের, কেহ বা জড়-
বিজ্ঞানের, কেহ বা জীবতত্ত্বের, কেহ বা
ইতিহাসের, কেহ বা কাব্যের, কেহ বা
সঙ্গীতের, কেহ বা স্থাপত্যের, আর কেহ বা
ভাস্কর্যের অনুশীলনেই সর্বাপেক্ষা অধিক
রস পাইয়া থাকে এবং যে যে বিষয়ে
সর্বাপেক্ষা অধিক রস পায়, সে সেই বিষয়ের
অধ্যয়ন ও আলোচনাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক
কৃতিত্বও লাভ করিয়া থাকে। যার যে বিষয়ে
স্বাভাবিক অনুরাগ নাই, জোর করিয়া
তাহাকে সেই বিষয়ের অধ্যয়নে
নিয়োগ করিলে, তাহাতে অযথা শক্তিক্লয়
হয় মাত্র। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান এই অযথা
শক্তিক্লয় নিবারণের জন্ত সকল শিক্ষার্থীকে
সর্ববিধ শিক্ষিতব্য বিষয়ের অধ্যয়নে নিযুক্ত
করে না। কিন্তু জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করিয়া
বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীকে তাহাদের নিজ

নিজ কৃতি, প্রবৃত্তি ও পূর্বশিক্ষা অনুসারে
বিশেষ বিশেষ জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত করিয়া
থাকে।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ব্যক্তিগত শিক্ষা
সম্বন্ধে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর কৃতি ও
অভ্যাস ও শক্তি অনুযায়ী তাহার শিক্ষার
ব্যবস্থা করিয়া থাকে; সেইরূপ জাতীয়
শিক্ষা সম্বন্ধেও জাতির প্রকৃতি ও কৃতি,
ভিতরকার ও বাহিরের প্রয়োজন ও
আয়োজন তাহাদের পূর্বশিক্ষারই অনুসরণ
করে। সকল লোকের কৃতি ও প্রবৃত্তি,
সংস্কার ও অভ্যাস যেমন সমান নহে,
সেইরূপ জগতের সকল জাতির কৃতি ও
প্রবৃত্তি, সংস্কার এবং অভ্যাস সমান নয়।
ইংরেজের কৃতি ও প্রবৃত্তি আমাদের কৃতি ও
প্রবৃত্তি হইতে ভিন্ন। যে সকল বিষয়ে
সচরাচর ইংরেজ জনসাধারণের অসাধারণ
কুতূহলের উদ্রেক হইয়া থাকে, সে সকল
বিষয়ে অনেক সময়েই আমাদের দেশের
লোকের বিন্দু পরিমাণ কুতূহলও জন্মে না।
যে রস ইংরেজকে মাতাইয়া তোলে, সে রস
অনেক সময় হয় ত আমাদের দেশের
চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। আবার
আমরা যে রসে সহজেই মগ্ন হইয়া বাই,
ইংরেজ হয় ত সে রসের স্বাদ কিছুই জানে
না। সুতরাং যে উপায়ে ইংরেজসমাজে
লোকশিক্ষা বিধান করা সম্ভব ও সহজ, সেই
উপায়ে, সেই সকল বিষয় অবলম্বনে ও সেই
রূপ প্রণালীর অনুসরণে, আমাদের দেশে
লোকশিক্ষা বিধানের চেষ্টা কখনই ফলবতী
হইতে পারে না।

ইংরেজের আইন আদালতের উদাত্ত-

শাসনদণ্ডের ভয় দেখাইয়া, দেশের জন-সাধারণকে বর্ণজ্ঞ করিয়া যে লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্ত অনেকে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা যে দেশের লোক-প্রকৃতির এবং জনমণ্ডলীর পুরাতন সভ্যতা ও সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার কোনোই সম্ভাবনা নাই। সরকারী আইনের সাহায্যে যে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা যে ইংরেজ-রাজের আপনার স্বজাতির শিক্ষা ও সাধনা, অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস এবং তাঁহাদেরই কৃতি ও প্রকৃতির স্বল্পবিস্তর অনুসরণ করিবে, ইগা অবশ্যসম্ভাবী ও অনিবার্য।

আর লোকশিক্ষার সঙ্গে সর্বত্রই দেশের রাষ্ট্রশক্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। এই জন্ত অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেশের রাষ্ট্রশক্তি যাহাদের হাতে থাকে, তাঁরা সর্বদাই জনমণ্ডলীর শিক্ষার ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে আপনাদিগের করতলগত করিয়া রাখিতে চাহেন। সুতরাং ইংরেজ-রাজ আপনার রাজবিধানের তাড়নায় দেশের সর্বসাধারণ শিশুমণ্ডলকে পাঠশালায় পাঠাইয়া, তাহাদের শিক্ষার ভার আমাদের

হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, এমন কল্পনাও করা যায় না। ইংরেজ আইন করিয়া যদি এ দেশে কখনো সার্বজনীন লোকশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন, তাহা হইলে শিক্ষিতব্য বিষয় নির্ধারণ এবং শিক্ষার প্রণালী নির্বাচন,—এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল কর্মই—একান্ত ভাবে আপনার হাতেই রাখিবেন। ইহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও নীতিসঙ্গত। আর তাহাই যদি হয়, তবে আমাদের বর্তমান উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার যেমন আমাদের জাতীয় শাস্ত্রের ও সাহিত্যের, সভ্যতার ও সাধনার, অভ্যাসের ও অহিজ্ঞতার সঙ্গে কোনোই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই; সেইরূপ এই সার্বজনীন লোকশিক্ষার সঙ্গেও দেশের সত্যিকার প্রাণবস্তুর কোনোই সম্পর্ক থাকিবে না। উচ্চশিক্ষা পাইয়া আমরা যেমন বহুল পরিমাণে স্বদেশের প্রাণ হইতে সরিয়া পড়িয়াছি, দেশের সর্বসাধারণের ভাগ্যেও এই জ্বরদস্তির লেখাপড়ার ফলে ক্রমে তাহাই ঘটিবে। এই বিপদ নিবারণের জন্ত এই উৎকট সংস্কারচেষ্টার প্রতিরোধ করা আবশ্যক।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

মহাভারতীয় ইতিবৃত্তের বিভাগ

মহাভারতের সমাজ কাল্পনিক না হইলেও তাহাতে যখন মহাভারত ইতিহাস না হইয়া ইতিহাসবাদ-পদবাচ্য হয়, তখন মহাভারতের ইতিবৃত্ত সত্য কি না অসুসঙ্কেয়। পাণ্ডবগণের কার্যকলাপ-বর্ণনা মহাভারতের

প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও ব্যাসদেব চন্দ্রবংশের আমূল পরিচয় দিয়াছেন। অজ্ঞযোনি হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই ইতিবৃত্তকে প্রধার্নতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দার্শনিক, দ্বিতীয় লৌকিক। পদ্মযোনি হইতে বুধ পর্য্যন্ত দার্শনিক।

পুরুষবা হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত পৌকিক।
লৌকিককে আবার দুইভাগ করা যাইতে
পারে প্রাচীন ও সমসাময়িক। পুরুষবা
হইতে প্রতাপ পর্য্যন্ত প্রাচীন। শান্তনু
হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত সমসাময়িক।
প্রাচীনান্ধকে আবার লৌকিকালৌকিক ও
শুদ্ধলৌকিক এই দুই শাখায় বিভাগ করা
যাইতে পারে।

দার্শনিক অংশ

দার্শনিক অংশ এই বংশের প্রাসঙ্গিক
নহে বলিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যক
নাই। কিন্তু ইহা না বলিয়া থাকিতে পারি
না যে, উহা উপকথা নহে, উহাতে গভীর
স্মৃতিতত্ত্ব নিহিত। ব্রহ্মাই দার্শনিকের
অহঙ্কারতত্ত্ব; সনক, সনাতন, সনন্দ,
সনৎকুমার প্রভৃতি সেই তত্ত্বের পুত্রীভূত
মনস্তত্ত্বের ইচ্ছোপসর্জনজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন
বুর্জি, মরীচ্যাদৌ মনের জ্ঞানোপসর্জন-
ইচ্ছাশক্তির বিকাশ। কণ্ডপ মনোবর্গ-
সংকল্পের পরিচালক। দক্ষ সৃষ্টিকৌশল,
ব্রহ্মার জ্ঞানোপসর্জন কর্ত্ত্বের ফল।
তাহার পত্নী প্রসূতি ক্রিয়াশক্তি। তাহার
পঞ্চাশটা কণ্ঠা সেই ক্রিয়াশক্তির ভিন্ন ভিন্ন
প্রস্থানভেদ। চতুর্দশ ক্রিয়াশক্তির সহিত
মিলিত হইয়া কণ্ডপ স্বয়ং সাত্ত্বিক দেব-
সর্গ, স্বক্ষরাজসিক গন্ধর্বাদি-দেবযোনিসর্গ,
স্বক্ষতামসিক অশ্বরসর্গ, হুলতামসিক পশু-
পক্ষিসর্গ করেন। ব্রহ্মার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ
অত্রি হইতে ইচ্ছাশক্তির বাসনারূপ অংশই
চন্দ্র। কামনামণ্ডলই চন্দ্রের অধিকার।
জীব যত দিন ন্যায়ী, ততদিনই কামনা-
মণ্ডলে ঘূর্ণায়মান। তাই গীতায় বলা

হইয়াছে “তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য
নিবর্ত্ততে।” সেই চন্দ্রের পুত্র বুধ কামকামীর
বুদ্ধি। এদিকে মনু স্রষ্টার মনাষা। তাহার
কণ্ঠা ইণাই পৃথিবী বা পার্থিবভাব। তিনি
বংশ বুধের সহিত মিলিত তখনই কামকামী
মানববংশ পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত।

লৌকিকালৌকিক অংশ

পুরুষবা মর্ত্ত্যধামে চন্দ্রবংশের আদি-
পুরুষ। অবশ্য মানববংশের পূর্ণপরিচয়
দিতে গেলে একরূপ একস্থলে না একস্থলে
দাড়াইতেই হইবে বাহার পূর্বে আর যাওয়া
চলে না। দর্শপ্রাণ পাচ্যলেখক দেবতা
হইতে সেই আদিপুরুষের জন্ম বলেন।
প্রতীচ্যগণ তাঁহাকে ব্যাঘ্রাদির ছুঁকে পাষিত
বলেন। চন্দ্রবংশীয় নৃপগণের বংশ
পুরুষবার পূর্বে আর লইয়া যাওয়া যায় না,
এইভাবে গ্রহণ করিতে চান গ্রহণ
করুন, আর পুরুষবাকে দেবতার পুত্রই
বলুন উভয়ের কোনটীতেই পুরুষবার অস্তিত্ব
লোপ হয় না। তিনি একরূপ আদিমন্মুখ্য,
অতএব তাঁহাতে অনেক অমানুষ্যভাব
আরোপিত হইয়াছে। অমরা উর্কশী তাঁহার
রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বরণ করেন এবং
সেই অমরার গর্ভে তাঁহার আয়ু, ধীমান,
অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু, ও শতায়ু নামে
ষট্‌পুত্র জন্মে। এই ব্যাপারের যদি
একরূপ ব্যাখ্যা করেন যে উর্কশীসদৃশ
উর্কশী নায়ী কোন রূপবতী তাঁহার কণ্ঠে
বরমালা দেন, তাহা হইলে ইতিবৃত্তের অলৌ-
কিকতা যায়। পিতার চরিত্রে অলৌকিকতা
থাকিলেও পুত্র আয়ু যাত্নুধ ভিন্ন আর কিছুই
নহে। স্বর্গানবীর গর্ভে তাঁহার নহস, বুদ্ধশশী,

রজি এবং অনেনাঃ নামক চারি পুত্র হয়। নহষ প্রবল পরাক্রমশালী রাজচক্রবর্তী। ইন্দ্রাদি অমাবলম্বিক ব্যাপার মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিবার পর ঘটায় নহষের মর-লীলা অসম্ভবপর নহে। অবশ্য নহষের ভ্রাতা রজির চরিত্র পুরাণে যেরূপ অঙ্কিত তাহা অসম্ভব। কিন্তু মহাভারতে সেই অলৌকিকতা না থাকায় মহাভারতের ইতিবৃত্ত সে দোষে দূষিত নহে। নহষের ষটপুত্র—যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, অযতি ও ধ্রুব। যতি ক্ষণিক ভোগ ছাড়িয়া চিরানন্দকর যোগে নিমগ্ন হন। সুতরাং যযাতি সিংহাসন পান। তিনি শাসনগুণে প্রজাপুঞ্জকে, যাগযজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণকে, অধ্যয়নাদি দ্বারা ঋষিগণকে সন্তুষ্ট করেন। সমাগরা ধরণি তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার দুই পত্নী—গুরুকণ্ঠা দেবযানি ও অম্বররাজ বৃষপর্ষাও কণ্ঠা শর্মিষ্ঠা। দেবযানির গর্ভে যত্ন ও তুর্কস্ম নামে দুই ও শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অণু এবং পুরু নামে তাঁহার তিন পুত্র হয়। শুক্রাচার্যের সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করায় কবি তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন যে অচিরে জরাগ্রস্ত হও। ঋষির চরণে পতিত হইলে তিনি রাজাকে ঐ জরা যে কোন পুত্রে সংক্রান্তি করিবার শক্তি দেন। তদনুসারে যযাতি ক্রমে ক্রমে যত্ন, তুর্কস্ম দ্রুহ্য ও অম্বকে স্বীয় জরা বিনিময়ে তাহাদের যৌবন দিবার জন্য অম্বরোধ করেন। কিন্তু অবাধ্য পুত্রগণ কেহই পিতৃবাক্য রক্ষা করিতে চাহিলেন না। কনিষ্ঠ পুরু নিজের যৌবন বিনিময়ে পিতার জরা লইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। পিতা সহস্র বর্ষ পুত্রের যৌবন লইয়া ভোগ করতঃ যখন দেখিলেন যে ভোগবাসনা কমিল না তখন হঠাৎ তাঁহার নির্বেদ হইল। নির্বেদের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান জন্মিল। তখন অবাধ্য পুত্রচতুষ্টয়কে নির্কাসিত করিয়া কনিষ্ঠ পুরুকে সিংহাসনে বসাইলেন ও স্বয়ং বাণপ্রস্থাস্রম অবলম্বন

করিলেন। যযাতির সহস্রবর্ষভোগ ও জরা সংক্রমণ ইত্যাদি সম্ভবপর না হইলেও উহার মূলে সত্য থাকি সম্ভব।

লৌকিকালৌকিকংশের সত্যতা বিচার।

উক্ত অংশের সত্যতা নিরাকরণ করা অত্যন্ত দুর্বল। পুরুরবা প্রভৃতি এত প্রাচীন যে সেই সময়ের কোন লেখা নাই। নিখিল পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও পুরুরবার উপাখ্যান আছে। ঐ উপাখ্যান গাথাতে চিররক্ষিত হইয়া পরে মহাভারত ও পুরাণে গ্রাথিত হয়। ক্রমে উহা সংস্কৃত নাটকে ও কাব্যে প্রচলিত হইল। শর্মিষ্ঠার উপাখ্যান লইয়া বঙ্গকবিও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ঋগ্বেদ অন্তান্ত বলিয়া যদিও বিশ্বাস না করেন, উহার উপাখ্যানগুলি যে সত্যমূলক নহে তাহার কোন প্রমাণ নাই। আবার যদি দেখি সেই প্রবাদ কেবল মুখে না থাকিয়া বহুকাল যাবৎ লিখিত গ্রন্থে পুরুষপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে, তখন উহা বিশ্বাস করিবার সম্ভব কারণ আছে বলিতে হইবে। এই অংশ যে গাথামূলক তাহা মহাভারত ও পুরাণাদিতে স্পষ্ট বুঝা যায়। যযাতির পুত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অনুবংশশ্লোক সকলেই ধরিয়াছেন যত্ন তুর্কস্ম দ্রুহ্য দেবযানী ব্যজায়ত।

দ্রুহ্যত্বানুগ পুরুষ শর্মিষ্ঠা বার্ষপার্ষণী ॥

যযাতির নির্বেদ সম্বন্ধে

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
ইত্যাদি গাথাও উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঐ গাথাগুলি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং তৎপ্রতিপাত বিষয়ও ভিত্তিহীন নহে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

শুদ্ধলৌকিক অংশ

পুরু হইতে প্রতীপ পর্য্যন্ত নৃপতিগণকে শুদ্ধলৌকিক অংশভুক্ত করা যাইতে পারে। যত্ন, তুর্কস্ম, দ্রুহ্য ও অম্বর বংশ পুরাণে বিশদরূপে দেওয়া আছে। মহাভারতে তাহা প্রাসঙ্গিক নহে বলিয়া দেওয়া হয় নাই।

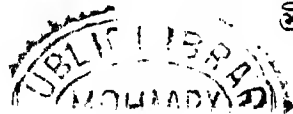
পুরুষ পূর্ববংশও মহাভারতে নাই। কেবল যে শাখা হইতে জনমেজয়ের উৎপত্তি সেই শাখা বঙ্গীয়সংস্করণের আদিপর্বেব ২২ অধ্যায়ে আত্মপূর্বে দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণ অধ্যায়ে পুরুষ প্রাচীনবংশের প্রবীর, যনসু, রৌদ্রাশ্ব প্রভৃতির পরিচয় আছে। জনমেজয় তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া স্বীয় বংশের অমূল পরিচয় চাহিলেন। তত্বত্রে বৈশম্পায়ন দক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পরীক্ষিৎ পর্যন্ত বংশাবলী দিলেন। ঐ অধ্যায় মতেই ঔদ্ধলৌকিক অংশ দেওয়া গেল। পুরুষ কোশল্যা নাম্নী পত্নীতে জনমেজয় নামে পুত্র জন্মে। জনমেজয় তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও একবার বিখক্তি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মধুবংশীয়া অনন্তা নাম্নী ভাগ্যীতে তাহার প্রাচীষান্ নামক পুত্র হয়। প্রাচীষান্ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। নিখিল প্রাচীদিগ্ জয় করায় তাহার প্রাচীষান্ আখ্যা হয়। তিনি যদুবংশীয়া অশ্বকীকে বিবাহ করিয়া সংযতি নামে পুত্র লাভ করেন। সংযতি দৃযদ্য রাজার পুত্রী বরাঙ্গীর পাণিগ্রহীতা। তাহার পুত্র অহংঘাতি কৃতবীর্যের হুহিতা ভানুমতীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া সার্কভৌম নামে পুত্র পান। সার্কভৌম কেকয়বংশীয়া সুনন্দাকে ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে স্বয়ম্বর সভা হইতে বলপ্রকাশ পূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ঐ বিবাহের ফল জয়ৎসেন। তিনি বিদর্ভবংশীয়া সুশ্রবার গর্ভে অবাচীন নামে পুত্র পান। অবাচীনের পত্নীও বিদর্ভবংশীয়া। তাহার নাম মর্যাদা। তাহার গর্ভে অবাচীনের অরিহনামক পুত্র হয়। তিনি অঙ্গরাজকন্যা আঙ্গীকে বিবাহ করিয়া মহাভৌমের জন্ম দেয়। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই যে অমুবংশীয় বলির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুঙ্গ ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র হয়। ঐ পঞ্চ ভ্রাতার অধিকারই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুঙ্গ ও পাণ্ড্র নামে প্রতিষ্ঠিত। রামায়ণে প্রসিদ্ধ

দেশরথের সখা অঙ্গরাজ রোমপাদ অঙ্গের পৌত্র, দিবিরথের প্রপৌত্র। মহাভৌম প্রসেনজিতের কন্যা সুযজ্ঞার পাণিপীড়ন করিয়া তাহার গর্ভে অযুতনায়ী নামক পুত্র উৎপাদন করেন। অযুত পুরুষমেধযজ্ঞ করায় উহার নাম অযুতনায়ী হয়। তিনি পৃথুশ্রবার কন্যা কামাকে বিবাহ করেন। কামার গর্ভে জাত অযুতনায়ীর পুত্র অক্রোধন কলিঙ্গবংশীয়া করন্তার স্বামী। তাহাদের পুত্র দেবাতিথি বৈদেহী মর্যাদার গর্ভে অরিহ নামক পুত্র পান। অরিহই পুরাণের রৌদ্রাশ্ব। এবং মহাভারতেও রৌদ্রাশ্ব নাম আছে। অঙ্গরাজবংশীয়া সুদেবার গর্ভে অরিহের ঋক্ষনামে পুত্র হয়। ঋক্ষই বোধ হয় ৯৪ অধ্যায়ের অনাধুষ্ট। তিনি তক্ষকহুহিতা জ্বালার গর্ভে মতিনার নামক পুত্র পান। পুরাণে মতিনারের পরিবর্তে রস্তিনার নাম দেখা যায়। মতিনার স্বরস্বতী-ভীরে দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ করিলে সরস্বতী প্রীতা হইয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন, ইহা প্রবাদ। সেই পত্নীতে মতিনারের তংসু নামে পুত্র জন্মে। মতিনার অশ্বমেধ রাজস্ব প্রভৃতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তংসু ব্যতীত মহান, অতিরথ ও দ্রহ্ম নামক তাহার আরও তিনটি পুত্র হয়। তংসুর পত্নী কলিঙ্গবংশীয়া। কিন্তু তাহার নাম নাই। তংসু নিখিল বসুন্ধরা জয় করিয়া সম্রাট হন। তাহার পুত্র ঈগিনের পঞ্চ পুত্র—দ্বয়ন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু ও বসু। কালিদাসের রূপায় দ্বয়ন্ত আমাদের সকলের সুবিদিত। তিনি অপ্রতিরথ সম্রাট হন। বিশ্বামিত্র-হুহিতা কণ্ঠের পালিতা কন্যা শকুন্তলার গর্ভে তাহার পুত্র ভরত জন্মে। ভরত হইতে ভরতবংশ। ভরত যেমনি যুদ্ধবীর তেমনি দানবীর। সর্কস্বদক্ষিণযজ্ঞে তিনি তাহার সাম্রাজ্য কণ্ঠমুনিকে দান করেন। ভরতের চারিটি স্ত্রী। তিনটিতে তাহার নয়টি পুত্র হয়। ঐ পুত্রগণ অপদার্ব ছিল। তিনি সংপুত্রের জন্ত ভরত্বাজের সাহায্যে যজ্ঞ করিলেন।

সেই যজ্ঞস্থলে সুনন্দার গর্ভে ভূমত্ম জন্মে। সেই পুত্রই বংশের গৌরব। তিনি দাশার্হবংশীয়া বিজয়ার পাণিগ্রহণ করেন। বিজয়ার গর্ভে ভূমত্মার সুহোত্র, সুহোতা, সুহবিঃ, সুযজ্ঞঃ ও দিবিরথ নামক পঞ্চ এবং পুরুষা নামী পত্নীর গর্ভে ঋচিকনামে এক পুত্র হয়। সুহোত্র সাম্রাজ্য পান। তিনি ইক্ষাকুবংশের সুবর্ণাকে বিবাহ করেন। সুবর্ণার গর্ভে তাঁহার হস্তিনামক পুত্র জন্মে। সেই হস্তীই হস্তিনাপুরের স্থাপয়িতা। হস্তী ত্রিগর্ত্তদেশীয়া পত্নী যশোধরার গর্ভে বিকুষ্ঠনের জন্ম দেন। দাশার্হী সুদেবার গর্ভে বিকুষ্ঠনের অজমীঢ় নামে যে পুত্র হয়, তাঁহার যশোরামি সকল পুরাণে গীত। অজমীঢ় হইতে চতুর্দশের প্রবৃতি। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে অজমীঢ় বলিয়া মহাভারতে প্রায়ই সম্বোধন করা হইয়াছে। অজমীঢ়ের কৈকেয়ী, গাকারী, বিশালা, ঋক্ষিণী প্রভৃতি অনেক ভাৰ্য্যার অনেক পুত্র হয়। পুরাণে উল্লিখিত আছে যে তাঁহার বেশিনী নামী পত্নীতে যে কখনামে এক পুত্র হয় তাঁহার বংশধরগণ কাশ্যায়ন দ্বিজ হন। অজমীঢ়ের আর এক পত্নীর সন্ততি কতক নীপ ও কতক পৌরব নামে অভিহিত। তাঁহার নৌলিনী-নামী পত্নীর বংশই পাকাল আখ্যা পান। ঐ বংশেই সোমকের পোত্র, পৃষতের পুত্র দ্রুপদ জন্মে। ধূমিনী-নামক পত্নীতে অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে এক পুত্র হয়। যদিও মহাভারতের ৯৫ অধ্যায়ে ঋক্ষের নাম নাই, পূর্ব অধ্যায়ে তাঁহার নাম আছে এবং সংবরণ যে তাঁহার পৌত্র তাহাও ৯৫ অধ্যায়ে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে। অজমীঢ়ের বংশধর সংবরণ এইরূপ বলায় সংবরণ যে পুত্র নহে তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত উভয় অধ্যায়ের মধ্যে বিরোধ নাই। সংবরণ সূর্য্যের তপস্তা করিয়া সূর্য্যাহুতা তপতীকে পত্নীত্ব লাভ করেন। আদিপর্বে চৈত্ররথো-পাখ্যানে গন্ধর্ব্ব চৈত্ররথ অর্জুনকে কেন

তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যামুখে তপতী এবং সংবরণের সহিত তাঁহার বিবাহের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। আদিপর্ব্বের ৯৪ অধ্যায়ে বর্ণনা আছে যে সংবরণের রাজ্যকালে অনাগৃষ্ট তুর্ভিক্ষ ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা প্রজাক্ষয় হইলে পাকালরাজ দশ অক্ষৌহিনী সেনা সহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তাঁহাতে সংবরণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন ও সিদ্ধতটস্থপর্ব্বতনিকুলে আশ্রয় লন। পরে তিনি বশিষ্ঠের রূপায় পৈতৃক সিংহাসন লাভ করিণ্ড সমর্থ হন। তপতীর উপাখ্যানেও বর্ণিত যে সংবরণ কর্ত্তক গৌরহিত্যে নিযুক্ত হন তাহা প্রকাশ। সংবরণের পুত্র কুরু ধর্ম্মায়া তপতী। তাঁহারই নামে রাজ্যের নাম কুরুজাঙ্গল হয়। তাঁহার তপস্কার ক্ষেত্রই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্ররূপে অভিহিত। কি দৈব বিড়ম্বনা! ভবিষ্যতে সেই ধর্ম্মক্ষেত্রই, সেই শাস্তিনিকেতনই, ভারতের যুদ্ধক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়। হস্তিনাপুরের সিংহাসন জ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের বীর ঐ ক্ষেত্র-শোণিতে প্লাবিত করেন। ঐ ক্ষেত্রেই ভারতের ক্ষত্রিয়বীৰ্য্য নির্দীপিত হয়। পরে আবার ঐ ক্ষেত্রেই পৃথিবীজের সময়ে কাল-চক্রে হিন্দুর গৌরবরবি ডুবিয়াছে। ঐ ক্ষেত্রেই পাঠান, মোগল ও মহারাষ্ট্রের গৌরবও অন্তমিত। যাহাই হউক কুরু দাশার্হনন্দিনী শুভাঙ্গীকে বিবাহ করেন ও বিদূরথ নামে পুত্র পান। পুরাণের মতে তাঁহার সধব্ব বা সুধবা, জহু ও পরীক্ষিৎ নামে তিনটি পুত্র হয় এবং বিদূরথ জহুর পৌত্র। বিদূরথ যহুবংশীয়া সুপ্রিয়া নামী পত্নীতে অনথের জন্ম দেন। অনথের ঔরসে মগধবংশীয়া অমৃতের গর্ভে-জাত পরীক্ষিৎ বাহদারংশের সূর্য্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সূত ভীমসেন কেকয়বংশীয়া কুমারীর গর্ভে প্রতিশ্রবানামক পুত্র উৎপাদন করেন। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ গিরিনন্দিনী সুনন্দার গর্ভে দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী।





বঙ্গদর্শন

ভিক্টর হুগোর কথা

ফরাসী পরিষদের সহিত ভিক্টর হুগোর প্রথম পরিচয়, অর্থাৎ ষশস্রী হইবার স্মৃতি, বড়ই কৌতুকাবহ ও চিত্তাকর্ষক। ১৮১৭ সালের পরিষদের পুরস্কার-কাব্যের বিষয় ছিল—“জীবনের সর্বাবস্থায় অধ্যয়নলভ্য সুখ।” ভিক্টরের বয়স তখন সবে পনের বৎসর ও তখন তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু প্রতিভা চিরকালই আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন ও আত্ম-নির্ভরশীল। ভিক্টর মনে করিলেন, এই প্রতিযোগিতায় একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না? যেমন সঙ্কল্প, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কার্য্যে পরিণতি। তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ে তিন শত বিংশতি ছত্র সমন্বিত খণ্ড-কাব্য লিখিয়া প্রস্তুত করিলেন।

প্রতিযোগিতার জ্ঞাত কাব্য ত লেখা হইল, কিন্তু এক মহা সঙ্কট উপস্থিত। রচনাটি পরিষদের সম্পাদকের হস্তে দিবার উপায় কি? ভিক্টর তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা কাহাকেও বলেন নাই—তাঁহার মাতাকেও না, তাঁহার অগ্রজ ইউজিনকেও না। লর্ড বাইয়ন লিখিয়াছেন—“একদিন প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া অকস্মাৎ দেখিলাম, আমি ষশস্রী হইয়া উঠিয়াছি।” ভিক্টর হুগো বোধ হয় কতকটা এইরূপ অতর্কিত ভাবে সহসা ষশস্রী হইবার

মানস করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এইরূপ ছিল যে, যদি সফলোত্তম হই, তাহা হইলে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ষশস্রী হইয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিব; আর, যাহা অধিকতর সম্ভব, যদি বিফলমনোরথ হই, তাহা হইলেও এই প্রতিযোগিতার কথা কেহই জানিবে না বলিয়া কাহারও কাছে মাথা হেঁট হইবে না।

যাহা হউক, ভিক্টর ভাবিয়া চিন্তিয়া কুল-কিনারা দেখিতে পাইলেন না। ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্রেরা রবিবারে বাহিরে যাইতে পারিত বটে, কিন্তু পরিষদের সম্পাদকের অফিস সে দিন বন্ধ। তদ্ব্যতীত, কবিতা-রচনা সমাপ্ত হইল এক সোমবারে; তাহার পরবর্তী বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার রচনা গ্রহণের শেষ দিন। অগত্যা তিনি তাঁহার বন্ধু বিস্কারাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। বিস্কারা প্রথমতঃ যেন আকাশ হইতে পড়িল—পনের বৎসরের বালক ফরাসী-পরিষদের পুরস্কার-রচনায় প্রতিযোগিতা করিতে সাহস করে! কি অভাবনীয় কথা! এমন অসম্ভবও কি সম্ভব! তার পর তাহার অতিপ্রিয় নবীন বন্ধুর অভাবনীয় ও দ্রঃসাহসিক উত্তমে সে মুগ্ধ ও আনন্দে অধীর

হইল; বলিল—“ইহারই জন্ত তোমার এত ভাবনা? তুমি নিশ্চিত থাক, সব আমি করিয়া দিব।” ভিক্টর আশ্বস্ত হইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে সেই বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ রচনা-গ্রহণের শেষ দিন, ছাত্রদিগের বহির্ভ্রমণের দিন। অধিনায়করূপে বিস্কারা ছাত্রদিগকে লইয়া বহির্গত হইলেন ও পরিষৎ-মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরিষৎ-ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিস্কারা সহসা খমকিয়া দাঁড়াইলেন—যেন দ্বারস্থ সিংহের মূর্তি দেখিয়া তিনি বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছেন। ফোয়ারা হইতে জল-ধারা অতি সুন্দর ভাবে উৎসারিত হইতেছিল; ছাত্রগণ মুগ্ধ হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। এই অবসরে বিস্কারা ভিক্টরকে লইয়া অরিত পদে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দ্বাররক্ষকের ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের কক্ষ কোন্‌ খানে? তার পর ছুটিয়া উপরে উঠিলেন। ভিক্টর তখন ভাবিলেন, বিস্কারাকে বিশ্বাস করিয়া সকল কথা বলিয়া বড়ই ভাল কার্য্য হইয়াছে; তিনি নিজে ত এমন ছঃসাহসের কার্য্য কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

বিস্কারা সম্পাদকের ঘরের দরজা ঠেলিয়া প্রথমে প্রবেশ করিলেন; স্পন্দিত হৃদয়ে ভিক্টর তাঁহার অনুসরণ করিলেন। একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর রাশীকৃত কাগজ; তাহার সম্মুখে বসিয়া পলিতকেশ, অতি-গম্ভীর ও ভীষণ-মূর্ত্তি এক বৃদ্ধ। কম্পিত হস্তে ভিক্টর তাঁহার কাব্য ও শীলমোহর-আঁটা চিঠিখানি তাঁহার হাতে কোন প্রকারে দিলেন, কিন্তু বাক্যক্ষুৰ্ত্তি হইল না। বিস্কারা কতকটা

আত্মস্থ ছিলেন; তিনি অক্ষিতকণ্ঠে আবশ্যকীয় দুই একটা কথা কেবল রকমে বলিয়া উভয়ে তথা হইতে নিষ্কান্ত হইলেন। বাহিরে আসিয়া উভয়েই যেন একটা অসাধ্য সাধন করিয়াছেন মনে করিয়া সানন্দগর্বে প্রফুল্লতা অনুভব করিলেন। উভয়েই মনে করিলেন, যদি দৃঢ়চিত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে বৃক্ষপূর্ব্বের সূর্য্যকে পশ্চিমে উদিত করাও যাইতে পারে।

শুধু শিষ্য উভয়ে তাঁহাদের সার্থক ছঃসাহসিকতার জন্ত পরস্পরকে অভিনন্দিত করিতে করিতে যেমন সিঁড়ি হইতে নামিয়াছেন, অমনি দেখিলেন, সম্মুখে ভিক্টরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবেল। আবেল বলিলেন—“দাঁড়াও! তোমরা এখানে কি জন্ত?”

ভিক্টরের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বিস্কারাও হাতে নাতে ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ হইয়া কিছুই গোপন করিতে পারিলেন না। ব্যাপারটা সমস্তই ভাগিয়া বলিলেন। ভিক্টর আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, এই ঔদ্ধত্য ও ছঃসাহসিক অপকর্ম্মের জন্ত নিশ্চয়ই ভৎসিত হইতে হইবে। কিন্তু সেরূপ কিছুই হইল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ আবেল, পনের বৎসরের বালক নহেন, ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী বিজ্ঞানায়ের ছাত্রও নহেন; পরিষদের নামে তাঁহার স্বাক্ষর হইবার নহে। পরিষদের পুরস্কার-রচনায় ভিক্টর যে প্রতিযোগিতা করিয়াছে, ইহাতে তিনি দোষাবহ বা অজ্ঞান কিছুই দেখিতে পাইলেন না—ইহা তাঁহার কাছে খুবই স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তথাপি ভিক্টর তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অমরোধ করিলেন, ব্যাপারটা যেন প্রকাশ করা না হয়। আবেল

বলিলেন—“তুমি নিশ্চিত থাক। এ কথা আমি ছাদের উপর হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিব।”

কিরূপ সশব্দ উদ্বেগে বিস্ময়া ও ভিক্টর পরিষদের অভিমত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনা করা নিশ্চয়োজন। তখনকার করাসী-পরিষদ্ কবি-যশঃ-প্রার্থীদিগের ভাগ্য-বিধাতা। তাঁহাদের প্রদত্ত প্রশংসা বা নিন্দা বেদবাক্যের ত্রায় অনাস্ত্র ও সর্বজন গ্রাহ্য হইয়া থাকে। ভিক্টরের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ এই প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতার ফলাফলের জ্ঞাত্য যতই কেন উদ্বেগ থাকুক না, ভিক্টর তাঁহার খেলায়-ধূলা ভুলেন নাই। এক দিন তিনি খেলায় উন্নত, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবেল দুই জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে তাঁহারই দিকে আসিতেছেন। তাঁহাদের গুরুগম্ভীর মূর্তি দেখিয়া ভিক্টরের মনে কেমন একটা অস্পষ্ট সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। আবেল ডাকিয়া বলিলেন—“এদিকে এস ত, নির্দোষ!” ভিক্টর ভয়ে ভয়ে, যেন কতকটা অভিভূত ভাবে অগ্রসর হইলেন। আবেল বলিলেন—“তুমি একটি অদ্ভুত জীব! তোমার পুরস্কার-রচনায় ওরূপ পাগলামি লিখিতে গিয়াছিলে কেন? তোমার বয়স কত, তাহা কে জানিতে চাহিয়াছিল? তাহার জ্ঞান কাহার মাথা ব্যথা পড়িয়া গিয়াছিল? পরিষদ্ মনে করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়াছ। তুমি যদি তোমার বয়সের উল্লেখ না করিতে, তাহা হইলে পুরস্কার ত তোমারই প্রাপ্য হইয়াছিল। তুমি একটি আশ্চর্য্য গদ্য! বাহা হউক, তোমার কাব্যের সম্মান উল্লেখ হইয়াছে।”

এইরূপে ভিক্টর হুগো তাঁহার কাব্যোত্তমের সফলতার সংবাদ প্রথম অবগত হইলেন। আবেলের কথা শুনি তীব্র হইলেও তাঁহার চোখ মুখ হর্ষোৎফুল্ল দেখিয়া ভিক্টর আশ্বস্ত হইলেন। তবে তাঁহার নিজের অববেচনাতেই যে পরিষদের পুরস্কারলাভে বঞ্চিত হইলেন, এজ্ঞা কিছু ক্ষুদ্র অবশ্যই হইয়াছিল।

বাপারটা এই—ভিক্টর হুগো তাঁহার পুরস্কার-কাব্যে লিখিয়াছিলেন—“আমার বয়স সবে পনের বৎসর মাত্র।” * তাঁহার কাব্য যখন সর্ব সমক্ষে পরিষদের সম্পাদক কর্তৃক পঠিত হয়, তখন ‘ডিঃডোর’ প্রণয়-ব্যাপারের বর্ণনা শুনিয়া সকলেই, বিশেষতঃ মহিলামণ্ডলী, ধস্তা ধস্ত করিয়াছিল। পরিষদের মন্তব্যে লিখিত হইয়াছিল—“রচয়িতা তাঁহার কাব্যে নিজের বয়ঃক্রম পনের বৎসর মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যদি সত্যই তাঁহার বয়স এত অল্পই হয়” ইত্যাদি। পরিষদ্ তাঁহার বয়সে সন্দেহান হইয়া প্রকারান্তরে তাঁহার অসাধারণ কবিশ্রুতিভার গোরব কীৰ্ত্তনই করিলেন বটে, কিন্তু পুরস্কার তিনি পাইলেন না।

না পান, কিন্তু প্যারিসের সংবাদপত্র-মহলে তাঁহার জয়জয়কার পড়িয়া গেল। সে সময়ে করাসীপরিষদ্ কর্তৃক কোন রচনার সম্মান উল্লেখ একটা অসামান্য ও অরণীয় ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত—পনের বৎসরের বালকের রচনার পক্ষে তাহা অচিস্তনীয় ঘটনা।

* “De trois lustres a peine ai vu finir le cours.”

নিজের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে যে পরিষদের সদস্ত-গণ বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই, তজ্জন্ত ভিক্টর স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পরিষদ কর্তৃক তাঁহার রচনার সম্মান উল্লেখ জ্ঞাত কৃতজ্ঞতাঞ্জাপক এক পত্র ও তৎসহ তাঁহার জন্মের সন তারিখের নিদর্শনপত্র পরিষদের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্রোত্তরে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিবার জ্ঞাত অনুরোধ করিলেন। পত্র খানি ভিক্টর তাঁহাদের বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কর্ণডিয়র সাহেবকে দেখাইলেন। তিনি ভিক্টরকে নিজেই ইচ্ছামুসারে যে কোন দিন যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে ভিক্টর সম্পাদকের সহিত দেখা করিবার জ্ঞাত একদিন পরিষদমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ সম্পাদক মহাশয় ইতিপূর্বে ভিক্টরকে পঞ্চদশ বর্ষের বালক বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই ;

তিনি তাহার বালকত্বে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাস করিলেন, অর্থাৎ ভিক্টরকে একবার বসিতেও বলিলেন না। তারপর অতি হিতৈষী মুকব্বির মতন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, পরিষদ তাঁহার বয়সের বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহার অনুকূল মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন যে, এত অল্প বয়সে পরিষদের পুরস্কার না পাওয়াই তাঁহার পক্ষে ভাল হইয়াছে এবং এত অল্প বয়সে পরিষদের পুরস্কার পাইলে তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও শ্রম-বিমুগ্ধতার সম্ভাবনা ছিল—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ব্যাপারে ভিক্টরের পক্ষে দুইটি সফল কলিল। প্রথম, তাঁহার অধ্যাপক ডেকোটি,

যিনি কবিতারচনা বিষয়ে ভিক্টরের প্রতিদ্বন্দী হইবার দুরাশা এতদিন করিয়া আসিতে-ছিলেন, তিনি নিরস্ত হইলেন। ফরাসী-পরিষদের সদস্তেরা বাহার কবিতার সম্মান উল্লেখ করেন, তাহার সহিত প্রতियোগিতা করিতে যাওয়া যে বাতুলতা মাত্র, তাহা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন। ঈর্ষ্যানল নির্বাপিত হউক বা না হউক, তাহার বিস্তার রুদ্ধ হইয়া গেল। আর একটা সুবিধা এই হইল যে, ভিক্টরের পক্ষে ছাত্রাবাস হইতে বাহিরে গমনাগমন বিষয়ে আর কোন প্রকার বিধিনিষেধ রহিল না—সেটা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হইল। যে বিদ্যালয়ের ছাত্র পঞ্চম কর্তৃক সম্মানিত, সে বিদ্যালয়ের যে কত গৌরব তাহা অধ্যক্ষ কর্ণডিয়র সাহেব সর্গর্বে স্বয়ং প্রমাণ করিলেন। আর যে ছাত্রের ফরাসীপরিষদের সম্পাদকের সহিত পত্র ব্যবহার চলে, তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা ত হঃসাহসিকতা। অতএব ছাত্রাবাসে থাকিয়াও ভিক্টর এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেন।

পরিষৎসম্পর্কিত এই ব্যাপারের আরও একটু কোতূহলজনক অনুরূতি আছে। ফরাসীপরিষদের একজন প্রাচীন ও সম্মানিত সদস্ত ও ধর্মোপদেষ্টা নৃসিংহোত্তর নিজেও তের বৎসর বয়সে কোন প্রাদেশিক পরিষদ হইতে পুরস্কারলাভ করিয়াছিলেন, ও তখনকার ইউরোপীয় সাহিত্যের সম্রাট ভল্টেয়ার স্বয়ং তাঁহাকে পত্র লিখিয়া সংবদ্ধিত করিয়াছিলেন। সেই পত্রে ভল্টেয়ার লিখিয়াছিলেন—“আমার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে এমন একজনের প্রয়োজন আছে ; তুমি আমার স্থান অধিকার

করিতে পারিবে মনে করিয়া আমি প্রীতিলাভ করিতেছি।”* আজি আবার সেই গৌরব-মণ্ডিত অতীতের স্মৃতি আগিয়া উঠিল। সেই তের বৎসরের বালকের কথা ও এই পনের বৎসরের বালকের কথা তুলনা করিয়া বিধ্বংসমাজে জন্মনা হইতে লাগিল যে, কালে ভিক্টর আর একজন নুফ্-সতো হইয়া উঠিবে।

শুধু ইহাই নহে। ভল্‌টেয়ার তাঁহাকে তাঁহার বাল্যরচনার অল্প বৈরাগ্য অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, আজ নুফ্-সতোও একজন উদীয়মান নবীন কবিকে সেইরূপে অভিনন্দিত করিবার অবসর পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ইহা অবগত হইয়া ভিক্টর এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ইহার পর উভয়ের মধ্যে অভিনন্দন-কবিতার বিনিময় হইল। ভিক্টর তাঁহার অভিনন্দন-কবিতায় অনেক মহিমাকোঁর্তনের পর শেষে লিখিয়াছেন—“হে নুফ্-সতো, তুমি একদিন ভল্‌টেয়ারের আশা স্থগ হইয়াছিলে; এখন তুমি তাঁহারই অসীম গৌরবের উত্তরাধিকারী। আজ তুমি দয়া করিয়া আমার নবীন বয়সের আশ্রয় ও অবলম্বন হও।” প্রত্যুত্তরে অনেক প্রশংসাবাদের পর নুফ্-সতো লিখিয়াছিলেন—“আমি বৃদ্ধ; প্রশংসাবাদের দ্বারা প্রশংসাবাদের ঋণ পরিশোধ করিব না। প্রতিদানে আমার সাধ্যানুসারে সহুপদেশ দ্বারা তোমাকে সম্বর্দ্ধিত করিব।”

ইহার অনতিবিলম্বে নুফ্-সতো এক দিন

ভিক্টরকে ভোজননের নিমন্ত্রণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে ডেকোটির বিদ্যালয়ের গৌরবের সীমা রহিল না। পরিষদের এই বৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত সদস্য তৎকালে Lesage এর “Gil Blas” নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের একটি সংস্করণের সম্পাদনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। একটা কথা লইয়া এই সময়ে তিনি কিছু ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। একজন জেজুইট তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, লেসেজের ঐ উপন্যাসখানি আদৌ মৌলিক রচনা নহে; উহা একখানি স্প্যানিশ্ ভাষায় লিখিত উপন্যাসের অনূকরণ মাত্র। কথাটার সত্য-সত্য নির্ণয় না করিলেই নয়; অথচ তিনি নিজে স্প্যানিশ্ ভাষাও জানিতেন না, সেই পুস্তকের ফরাসী অনুবাদও ছিল না। স্মরণঃ নুফ্-সতো কিছু বিপন্ন, একটু দিশাহারা, হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ভিক্টর বলিলেন—“আমি স্প্যানিশ্ ভাষা জানি।” নুফ্-সতো হঠাৎ চিত্তে বলিলেন—“বটে! তুমি যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুস্তক খানি পড়িয়া, জেজুইটের কথাটা সত্য কি না আমাকে বলিতে পার, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার করা হয়।”

যে ব্যক্তি ভল্‌টেয়ারের স্থলাভিষিক্ত, তাঁহার সনির্বন্ধ অনুবোধ যথাযথরূপে রক্ষা করিতে তিনি ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত নিযুক্ত হইলেন। পরদিনই তিনি স্প্যানিশ্ উপন্যাসখানি সংগ্রহ করিলেন। অতি মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিয়া উভয় গ্রন্থের একটি বিস্তৃত তুলনা ও সমালোচনা লিখিলেন। তাহাতে প্রমাণিত হইল যে, এই দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ কোনই

* “Il faut bien que l'on me succède,
Et j'aime en vous mon heritier.”

সাদৃশ্য নাই—লেসেজের উপভাস সম্পূর্ণ মৌলিক। বৃদ্ধ অতিরিক্ত বালক ভিত্তির এই সমালোচনার উৎকর্ষে এতটাই বিমুগ্ধ হইলেন যে, ইহার একটি শব্দও পরিবর্তিত না করিয়া সমগ্র নিবন্ধটি তাঁহার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিলেন ও তাহাতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিলেন। পনের বৎসরের বালকের পক্ষে কি অচিন্তনীয় গৌরব! প্রতিভা কোন কালেই অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে না।

ভিত্তির ছাত্রাবস্থার আর একটি অপূর্ণ কীর্তির কথা এই স্থলে উল্লেখ করিতে হইতেছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ আবেলের কয়েকটি বন্ধু সাহিত্যচর্চা করিতেন ইউজিন ও ভিত্তিরের সহিত ইহাদের পরিচয় হইলে সকলেই অল্পাধিক সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য-সেবী বলিয়া পরস্পরের বনিষ্ঠতা সত্তরই বিলক্ষণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল। অনতিবিলম্বে তাঁহারা সকলে মিলিয়া ক্ষুদ্র একটি সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতি মাসের প্রথম দিনে এই সভার একটি করিয়া অধিবেশন হইত; যৎকিঞ্চিৎ আহারের ব্যবস্থাও থাকিত। আহারান্তে প্রত্যেকেই এক মাসের সাহিত্যচেষ্টার কিছু কিছু নমুনা সর্বসমক্ষে পাঠ করিতেন। একদিন তাঁহাদের মধ্যে এক জন সহসা বলিয়া উঠিলেন—“আমার মনে একটা মৎলবের উদয় হইয়াছে।”

“কি?”

“আমরা সকলে মিলিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিলে কেমন হয়?”

“তোমার মৎলবটা খুলিয়া বল।”

“মনে কর যেন কতকগুলি সেনানী কোন যুদ্ধের প্রাকালে একত্র মিলিত হইয়া

নিজ নিজ জীবনকাহিনী নিবৃত্ত করিতেছে। সকলেই মরিবার ও মারিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত; ইহাতেই উপভাসগুলির মধ্যে একটা একতা থাকিবে। আর প্রত্যেকের রুচির পার্থক্য ও শক্তির তারতম্য হেতু উপভাস-গুলির বৈচিত্র্য সম্পন্ন হইবে। মুদ্রিত পুস্তকে গ্রন্থকার বলিয়া কাহারও নাম থাকিবে না। নানাবিধ রুচি ও শক্তির একত্র সমাবেশ দেখিয়া পাঠক সাধারণ অবশ্যই মুগ্ধ হইবে।”

সকলেই বলিয়া উঠিল—“বাহবা! অতি উত্তম কল্পনা।” প্রস্তাবটা সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। প্রত্যেক গল্পের আয়তনও স্থিরীকৃত হইল; কেননা গ্রন্থ বৃহদায়তন হইলে মূল্যও অধিক করিতে হইবে; কিন্তু তাহা বাঞ্ছনীয় ও বুদ্ধিসিদ্ধ নহে। সভা ভঙ্গ কালে সকলকে সম্বোধন করিয়া আবেল বলিলেন— ত হির হইল; এখন ষাটাত্তে আমরা অনলস হইয়া কার্যো নিবিষ্ট হই, তজ্জন্ত উপভাস লিখিয়া সম্পূর্ণ করিবার একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যিক। আশুন, উপভাস লিখিতে কতটা সময় দেওয়া যাইবে তাহা স্থির করা যাউক।”

ভিত্তির বলিলেন—“এক পক্ষ।”

আর সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ী করিতে লাগিল। এক পক্ষের ভিতর একখানি উপভাস লিখিয়া শেষ করা—ভিত্তির কি রঙ্গ করিতেছে, না, পাগল হইয়াছে? ভিত্তির তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—“আমি এক পক্ষের মধ্যেই আমার উপভাস লিখিয়া শেষ করিব।”

কেহ কেহ বলিল—“অসম্ভব!”

ভিক্টর বলিলেন—“যে বাজি রাখিতে ইচ্ছা কর তাহাই স্বীকার করিতেছি।”

“বাজি, সকলকে একদিন খাওয়ান।”

ভিক্টর বলিলেন—“তাই স্বীকার ”

পনর দিনের দিন প্রাতে ভিক্টর সকলকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার উপভাস সমাপ্ত হইয়াছে। উপভাসের আয়তন লইয়া পাছে কেহ ছল ধরে, সেই জ্ঞাত তিনি তাঁহার উপভাসকে একখানি গ্রন্থেরই আয়তন প্রদান করিয়াছেন। সেইদিনই রাত্রি আটটার সময় যদি তাঁহার একটি নির্দিষ্ট গৃহে সমবেত হইতে পারেন, তাহা হইলে ভিক্টর তাঁহার উপভাস সর্বসমক্ষে পাঠ করিবেন।

সকলেই অতিমাত্র কোতূহলপরবশ হইয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নির্দিষ্ট গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্টর তাঁহাদিগকে পড়িয়া

শুনাইলেন তাঁহার সুবিখ্যাত ও সর্বজন সমাদৃত উপভাস “Bug Jargal”।

সকলকেই স্বীকার করিতে হইল যে, বাজি তাঁহারা হারিয়াছেন ও ভোজের উদ্বোধন করিতে তাঁহারা প্রত্যেকেই বাধ্য প্রথম দিন ভোজ দিলেন ভিক্টরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবেল। বাজির ইহাই শেষ ভোজ হইল, কেননা আর সকলের অর্থান্ধার। ভিক্টরের এই উপভাস খানি ছাড়া আর কোন উপভাস লিখিতেও হইল না, “কেননা” আর সকলের সময়ান্ধার। সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার সঙ্কলিত উপভাসসংগ্রহ গ্রন্থ আর লোক-লোচনের গোচরীভূত হইল না বটে, কিন্তু ফরাসী সাহিত্য একখানি উপাদেয় উপভাসে সমলঙ্কৃত হইল।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

অনুপ্রাসের অধিকারবিচার

(২)

এ পর্য্যন্ত ধ্বজাঙ্ক ও বীণাঙ্ক শব্দের বিচার করা গেল। এ গুলির হয় দুই অংশেরই অর্থ নাই অথবা এক অংশ অপর অংশের (পরিবর্তিত) পুনরাবৃত্তি। এক্ষণে এমন কতকগুলি যোড়া-শব্দের দৃষ্টান্ত দিব, যে গুলির প্রত্যেক অংশেরই স্বতন্ত্র সত্তা ও অর্থ আছে। অথচ অনুপ্রাসের অনুরোধেই সে গুলির উদ্ভব, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এ গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। (১) সমার্থ (২) সমপর্যায় (৩) বিপরীতার্থক বা কার্য-কারণ-সম্বন্ধবিশিষ্ট। কতকগুলি উদাহরণ

রবীন্দ্রবাবুর ‘ভাষার ইঙ্গিত’ প্রবন্ধে প্রসঙ্গ-ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তমভাগ, তৃতীয় সংখ্যায় (১৩০৭) আমিও বহুসংখ্যক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি। এবার-কার ফর্দ তদপেক্ষাও পূর্ণাঙ্গ।

শ্রেণীবিভাগে হয় তো অনেক ক্রটি আছে। অনেকগুলি শব্দযুগ্ম সমার্থ শ্রেণীতে ধরিব বা সমপর্যায় শ্রেণীতে ধরিব, সে একটা সমস্তা—কেননা শব্দষয়ের মধ্যে অর্থের প্রভেদ অতি সামান্য। সমপর্যায় শ্রেণী ও বিপরীতার্থক বা কার্যকারণ-সম্বন্ধবাচক শ্রেণী লইয়াও

গোল আছে। এক হিসাবে ধরিলে ‘সাধনা ও সিদ্ধি’ সমপর্যায়, আবার আর এক হিসাবে ইহাদের মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ। এক হিসাবে ধরিলে ‘ইতস্ততঃ’ বা ‘কুলীন ও কাপ’ সমপর্যায়, আবার অন্য হিসাবে বিপরীতার্থবোধক। এ সব ক্রেটি সর্বত্র সংশোধন করিয়া উঠিতে পারি নাই।

শব্দযুগ্মগুলির প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে অনেক রহস্য ধরা পড়ে। উপসর্গ-পরিবর্তন বা প্রত্যয়পরিবর্তন বা নঞযোগে অনেক অমুপ্রাসায়ক শব্দযুগ্মক নির্মিত হয়—যথা আবর্তন-বিবর্তন, অমুচর-সহচর, আপদ-বিপদ, ক্রিয়াকর্ম, ওতপ্রোত। এই প্রকারের উদাহরণ নিঃশেষ করিয়া দেওয়া অসম্ভব। কতকগুলি শব্দযুগ্মে দুইটিই সাধুভাষার শব্দ, যথা—আমোদ-আহ্লাদ, জন-মানব, ক্রিয়াকাণ্ড; কতকগুলিতে একটি সাধুভাষার শব্দ ও অপরটি সংস্কৃত শব্দের (হয় তো সেই শব্দটিরই) অপভ্রংশ, যথা ছর-ছাড়া, বাল-বাচ্ছা, অতিথ-অভ্যাগত, কিছু কিছু; কতকগুলিতে দুইটিই সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, যথা ঝড়ঝাপটা, মাথামুণ্ড, আকুলি বিকুলি, গা গতর; কতকগুলিতে একটি সংস্কৃত শব্দ অপরটি মুসলমানী শব্দ, যথা কাজিয়া কলহ, তত্ত্ব তল্লাস; কতকগুলিতে একটি সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ অপরটি মুসলমানী শব্দ, যথা ধর পাকড়; আবার কতকগুলিতে দুইটিই মুসলমানী (বা দেশজ ?) শব্দ, যথা জমিজামগা, জোতজমা, মামলামোকদমা।

(১) সমার্থ শব্দযুগ্ম

অমুপ্রাসের অমুরোধ এত অধিক যে

সমার্থ শব্দযুগ্ম ব্যবহার করিয়া পুনরুক্তি-দোষ (tautology) অগ্রাহ করা হয়।

অ—অতিথ-অভ্যাগত, অমুচর-সহচর, অমুনয়-বিনয়, অমুরোধ-উপরোধ, অমুখ-বিস্মুখ, অলঙ্কার-প্রতিকার (?)।

আ—আকুলি বিকুলি, আদর আপ্যায়িত, আদর আবদার, আদর আহ্বান, আপদ বিপদ, আমোদ আহ্লাদ, আমোদ প্রমোদ, আবেদন নিবেদন, আলাপ পরিচয় (মধ্যে প), আশা ভরসা।

ই—ইশারা ইঙ্গিত।

উ—উদ্যম উৎসাহ।

এ—এশোমেলো (এলান মেলান)।

ক—কটুকটব্য (?), কথাবার্তা, কথোপকথন, করা কর্ম্ম, কাকুতি মিনতি, কাজিয়া কলহ, কাণ্ডকারখানা, কাষকর্ম্ম, কালো কিলি (কৃষ্ণ), কায়দাকামুন, কিছু কিছু, কুড়ী কুটী (কুঠ), কুট কচালে, কুল কিনারা, কৃষ্ণবিষ্ণু, কেউকেটা, কেঁদে ককিয়ে, ক্রিয়াকর্ম্ম, ক্রিয়াকাণ্ড।

খ—খবর বার্তা, খাতির নাদারত, থানা-থন্দ, খালবিল, খেলাধুলা, (রবীন্দ্র বাবুর মতে ধুলা ধুলি নহে, দেয়ালা) খোজখবর, খোলা খাবরা।

গ—গয়না গাঁটি (?), গল্প গুজব (?), গা গতর (দুইই ‘গাজ’ শব্দের অপভ্রংশ), গুণ জ্ঞান (?), গোড়িগুগলি, গোঁড়ে গর্ত্ত।

ঘ—ঘরনী গৃহিণী, ঘর গৃহস্থালী (?), ঘরবাড়ী।

চ—চড়চাপড়, চাঁচাছোলা, চালচলন, চালাকচতুর, চিঠিচপাটি, চোরছেঁচর।

ছ—ছরছাড়া (দ্বিতীয়টি প্রথমটির অপ-

ত্রাশ) ছলছুতা, . ছালচামড়া, ছেলে
ছোকরা।

জ—জন্তু জানোয়ার, জমি জায়গা, জমি
জিরেৎ, জাঁকজমক, জীবজন্তু, জোতজমা,
জাতগুণ্ঠি (জাতিগোষ্ঠী), জাতগোস্তর
(জাতিগোত্র), জ্ঞান গোচর (?), জালা
যন্ত্রণা।

ঝ—ঝড়ঝাপটা (হুইই ঝঞ্ঝার অপভ্রংশ ?)

ড—ডলামলা, ডেঙ্গাডহর

ত—তত্ত্বতলাস, তর্কবিতর্ক, তর্জন গর্জন,
তাড়া হড়া।

দ—দরদাম, দাবীদাওয়া, দীনদরিদ্র,
দীনহুঁখী, দীনহীন, দেখাসাক্ষাৎ (থ ক্ষ)।

ধ—ধরপাকড়, ধনদৌলত (লাট)।

ন—নাড়ীভুঁড়ি, আকাবোকা, নষ্টনষ্ট,
নাড়াসুড়ো।

প—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পাকাগোক্ত,
পাকেপ্রকারে, পাখীপাখালী।

ফ--ফেরফাঁফর, ফোতফেরার।

ভ—ভরপুর, ভয়ভীত, ভাইভায়াদ, ভুল
ভান্তি, ভূতপ্রেত, ভ্রমপ্রমাদ।

ম—মাঝে মিশেলে, মাথামুণ্ড, মান অভি-
মান, মানমর্যাদা, মানসম্মত, মাযলা মোকদ্দমা,
মায়ামমতা, মিলে মিশে, মৃহমন্দ।

য—যাগ যজ্ঞ।

র—রঙ্গ ভঙ্গ (ভঙ্গ 'বাক্স'র অপভ্রংশ ?)

ল—লক্ষ ঝপ্পা, লাঠি . চেষ্টা, লালন
পালন, লীলা খেলা।

ব—বন বাদাড়, বন্ধু বান্ধব, বর্ষা বাদলা,
বল বিক্রম, বল বীর্ঘ্য, বসবাস, বাকী বকেয়া,
বাজনা বাস্তি, বাদ বিচার, বাদ বিসংবাদ, বাধা
বিষ, বাধা ছাঁদা, বাল বাচ্ছা, বিচার বিতর্ক,

বিজ্ঞ বিচক্ষণ, বিদেশ বিতুম, বিপদ আপদ,
বিবাদ বিসংবাদ, বিষয় সম্পত্তি, বুঝ সমজ,
বৃষ্টি বাদলা, বেঁচে বর্তে, বেঁটে বম্বুর, বাক
বিজ্ঞপ, ব্রাহ্মণবটু।

শ—শত্রু সমর্থ, শক্তিশেল, শক্তি সামর্থ্য,
শাক সবজী, শালা সহস্বী, শিকা সহবৎ, শূর
বীর, শৌর্য বীর্ঘ্য, শ্রান্ত ক্লান্ত।

ষ—ষণ্ডা গুণ্ডা, ষাঁড়া গাঁড়া।

স—সচরাচর (?), সতী সান্দ্রী, সদাসর্বদা,
সন্ধান সুলুক, সভা সমিতি, সভ্য ভব্য, সন্মান
সম্মত, সর্বসাকল্য (?), সলা পরামর্শ, সাড়াশব্দ,
সাধ আস্থাদ, সাজ সজ্জা, সাজ সরঞ্জাম,
সাক্ষী সাবুদ, সুখ শান্তি, সুখ সম্পদ, সুখ-
সৌভাগ্য, সুখ স্বস্তি, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সুখে
স্বচ্ছন্দে, সেবা শুক্রবা, সেবাসুহৃ, (সুহৃতা বা
শুক্রবার অপভ্রংশ) . সৈ শ্রান্তি, স্তব স্ততি,
স্তব স্তোত্র, স্বস্ত্ব স্বামিস্ত্ব।

হ--হাঁক ডাক, হাঙ্গামা হুজুৎ, হাব
ভাব।

(২) সমপর্যায় শব্দযুগ্ম

সম-পর্যায় বুঝাইতে অনুপ্রাসের শরণ
গ্রহণ না করিলে রস জমাট বাধে না।

অ—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, অজর
অমর, অধারন অধ্যাপন, অন্নব্যঞ্জন, অন্নকরণ
ও অন্নসরণ, অন্ত (অন্ত্র ?) দন্ত, অভাব
অভিযোগ, অবৃত্ত নিষৃত, অবহেলা অপমান,
অশন বসন, অঙ্গ শত্রু, অষ্টপৃষ্ঠে
(ওষ্টপৃষ্ঠে ?)।

আ—আইন আদালত, আইন কারুন,
আকার প্রকার, আকাশে বাতাসে, আকৃতি
প্রকৃতি, আগে ভাগে, আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা,
আচার বিচার, আচার ব্যবহার, আঁচড়

কামড়, আঁচান ছোঁচান, আত্রেয়ী মৈত্রেয়ী,
আদর আহ্বান, আধি বাধি, আনা নেওয়া,
আপিস আদালত, আম জাম, আমীর ওমরা,
আয় পয়, আবর্তন বিবর্তন, আলা ভোলা,
আসন বাসন, আসানোটা, আহাৰ বিহার,
আহার ব্যবহার ।

ই—ইট পাটকেল, ইল্ল চল্প, ইয়াং তুরাং ।

উ—উকিরুকি (কুকিয়া পড়া), উচ্চ-
বাচ্য (?), উড়ে পুড়ে, উৎসাহ উত্তেজনা,
উনিশ বিশ, উপত্যকা অধিত্যকা, উল্লা মুল্লা,
উল্লু ভল্লু, উদ্বল মুবল, (রঙ্গপুরে উড়ুন-
গান), উড়ু উড়ু, ছাড় ছাড় ।

ঋ—ঋদ্ধি ও বুদ্ধি (কন্দম্বর), ঋদ্ধি
সিদ্ধি ।

এ—একতালা দোতালা, একলা
দোকলা, একমনে একধানে, এখন তখন
অবস্থা, এলাচ লঙ্গ ।

ও—ওতপ্রোত ।

ঔ—ঔদার্য্য গাভীৰ্য্য ।

ক—কচু ঘেঁচু, কহ কুমড়ো, কণাদ
কপিল, কফ কাসী, কড়া ক্রান্তি, কর্তা কর্ম
ক্রিয়া, কল কবজা, কল কাঠী, কল কারখানা,
কল কৌশল, কলাকৌশল, কলা মূলা, কপূর
পুংগ, কাকুতি মিনতি, কাকে কোকিলে,
কাকে বকে, কাগজে কলমে, কাছা কোঁচা,
কাঠ কয়লা, কাঠখড় (লাট), কাণা কুঁজো,
কাণা খোঁড়া (লাট), কানাই বলাই, কাপড়
চাদর, কামক্ৰোধ, কামরূপ কামাখ্যা, কামার
কুমার, কালিয়া কাবাব, কোণ্ডা কোন্ডা,
কালিয়া পোলোয়া, কালী কলম কাগজ,
কালী কলমমন, কালীঝুলি (ঝুল), কাঠলোষ্ট্র,
কাশ কুশ, কালী কালী, কুসুম কস্তুরী, কুচ

কাওয়াজ, কুঁচকি কণ্ঠা, কুল বেল, কুল শীল,
কুড়িয়ে বাড়িয়ে, কেন কঠ, কেনা কাটা,
কেয়ূর কুণ্ডল, কোদালে কুড়ুলে (মেঘ),
কোশাকুশী (কোশী), ক্ষীর চিড়ে, ক্ষীর সর ।

খ—খড় দড়ি, খতা কোদাল (লাট),
খাই আর শুই, খাজা গজা জেলাপি, খাতা
পত্র, খাতির নাদারত, খাড়া বড়ি খোড়, খানা
পিনা, খাল বিল, খুন খারাপি, খুন জখম,
খেতাব খেলাত, খেলাধুলা (দেয়ালা ?), খৈ
দৈ, খোরাক পোষাক, খোল করতাল (লাট) ।

গ—গড়ন পিঠন, গণ পণ, গণা গাঁথা, গণ্য
মাত্র, গণ্ডে পিণ্ডে, গরু গাধা, গয়া গঙ্গা
গদাধর, গাঁইগোত্র, গাওনা বাজনা,
গাছ ঝাছড়া, গাঁজা গুলি, গাড়ু গামছা,
গাল গলা, গুড় চিড়ে, গুড় মুড়ি, গুল্মে গোবরে,
গুরু গস্তীর, গুরু পুরুত, গুলি গোলা,
গো গর্দভ, গো গবয়, গৌসাই গোবিন্দ, গ্রহ
উপগ্রহ, গ্রাহক অগ্রগ্রাহক, গ্রীষ্ম বর্ষা ।

ঘ—ঘট পট, ঘটা বাটা, ঘর দোর, ঘর
বর, ঘাট মাঠ হাট বাট, ঘাড়ে গর্দানে (লাট),
ঘোর ফের, ঘোরা ফেরা ।

চ—চৰ্ম্মা চুয়া, চাঁচা ছোলা (লাট), চাকুরী.
ও কুকুরী, চাঁচী পুঁচী, চাঁপা চন্দন, চাঁল
চিড়ে, চাঁল কলা, চাঁল ডাল, চাঁল চুলো,
চাঁল জল, চাষ বাস, চিঠি চপাটি, চিড়ে
মুড়কি, চুরি চামারি, চুয়া চন্দন, চেবে চিন্তে,
চৈঁচৈ পুঁচৈ, চেষ্টা চরিত্তির (চরিত্র ?), চৈতন
চুটকি, চোখ মুখ, চোখোখো মুখোখো, চোর
ছেঁচড় ।

ছ—ছকড়া নকড়া, ছয় নয়, ছলে বলে
কৌশলে, ছাঁট কাট, ছাতা ছড়ি, ছাঁদনদড়ী
গোদানডী, ছিটা ফোঁটা, ছিকি ভিকি, ছির

ভিন্ন, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ছিরি (ছী) ছাঁদ, ছেঁড়া
খোঁড়া (খণ্ডিত), ছেঁড়া ছুটো (?), ছোট
খাট, ছোলা কলা ।

জ—জগাই মাধাই, জটা জুট, জটিল
জুটিল, জপ তপ, জমি ও মা, জল কয়লা, জল্লনা
কল্লনা, জলে জললে, জাগৎ জীবন্ত, জাত-
জন্ম (জাতি), জাতী যুথী, জ্ঞান ও মান,
জ্ঞানান্তরা, জামু ভামু কুশামু, জামাই বেহাই,
জামা জোঝা, জামাঘোড়া, জীর্ণ শীর্ণ, জীবন
যৌবন, জুতা ও গুতা, জুতা হাতা, জুতা জামা,
জুতা মোজা, জেলে মালা (মালা), জৈত্রী
জায়ফল, জর জালা, জরবিকার ।

ঝ—ঝড়তি পড়তি, ঝাড়ে গোড়ে
(গোড়ায়), ঝালে ঝোলে অঘলে, ঝোড়
জঙ্গল (লাট), ঝোড় ঝাড়, ঝোঁপ ঝাড় ।

ট—টাকা টিপনৌ, টেনে বনে, টাকা
কড়ি ।

ড—ডাকাকো (?), ডাকিনী যোগিনী,
ডাল ঝোল, ডাল ডালনা, ডিখ ডবিখ, ডেরা
ডাঙা, ডোম ডোকলা ।

ঢ—ঢাকঢোল, ঢিল পাটকেল, ঢোলক
তবলা ।

ত—তাউই মাউই, তামাক টিকে, তামা
তুলসী, তাল বেতাল, তাল বেল, তালুক মুলুক,
তিত (ত্যক্ত ? তিক্ত ?) বিরক্ত, তিল
তণুল, তাশ পাশা শতরঞ্চ, তুরী ভেরী, তুল-
রাম ধোয়ারাম, তেড়ে ফুঁড়ে, তেল তামাক,
তেলি তামুলি, তেলি মালী, 'তোড় বোড়,
তৈল তরুনী, ত্রিশ ত্রিশ (বিশ) ?

দ—দণ্ড মুণ্ড, দধি হুধ, দর দস্তর, দল
বল, দলিল দস্তাবেজ, দয়া মায়ী, দয়া দাক্ষিণ্য,
দশ পঁচিশ (খেলা), দশ বিশ, দড়াদড়ি,

দাঙ্গা কাসাদ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, দান ধ্যান,
দানা পানি, দাঁতে ভাতে, দায় দৈব, দাক্ষিণি
কাবাবচিনি, দাবী দাওয়া, দিগ্ দেশ, দিল্লী
লাহোর, হুধ দই, হুলী মালী, দেব দ্বিজ, দেশ
ও দশ, দৈত্য দানা (দানব), দোল দুর্গোৎ-
সব, দোড় ধাপ (লাট), দ্বন্দ্ব দ্বেষ, দ্বীপ
উপদ্বীপ ।

ধ—ধড়া চূড়া, ধন ধাত্র, ধন জন যৌবন,
ধন মান, ধরা বাঁধা, ধরম করম, ধর্ম কর্ম,
ধর মার, ধবলী শ্রামলী, ধুতী ফোতা, ধূপ
দীপ, ধূপ ধুনা, ধূলা বালি, ধোপা নাপিত,
ধ্যান জ্ঞান, ধ্যান ধারণা ।

ন—নদ নদী, নদী উপনদী, নয় ছয়,
নয় বানর, নদী নালা, নাক কাণ, নাকানি
চুবানি, নাকে মুখে চোখে (কথা), নাড়ী
ভুঁড়ি, নাড়ী নক্ষত্র, নাতি পুতি, নাল ঝোল,
নাম ও কাম, নাম ধাম, নিতাই নিমাই,
নিত্য সত্য, নিদ্রা তন্দ্রা, নিপট কপট, নিম
নিসিন্দে, নুনে ফেনে, নুন নেব, নেত্র শ্রোত্র ।

প—পত্র পল্লব, পত্র পুষ্প, পদ পসার,
পরশু তরশু, পর্যায় পটী, পরিবর্তিত পরি-
বর্দ্ধিত পরিবর্জিত, পশু পক্ষী, পসার প্রতি-
পত্তি, পাঁজি পুঁথি, পাইক পেয়াদা, পাণ
সুপারি (প), পায়ের পিঠে, পাল পার্শ্ব,
পাষণ্ড ভণ্ড জিপণ্ড, পাহাড় পর্তত, পিঠে
পুলি, পিতা মাতা (বাঙ্গালার), পীর পরগম্বর,
পুঁজি পাটা, পুড়ে বুড়ে (বুড়িভাজা হইয়া),
পুলিশ পাহারা, পূজা পাঠ, পোকা মাকড়,
পূজা পার্শ্ব, প্রায়শ্চিত্ত প্রস্কারণ ।

ফ—ফল ফুল, ফাটা চটা, ফাঁসী শুলী,
ফুটকড়াই মড়কি, ফুটো ফাটা, ফুল ফল ।

ভ—ভক্তি মুক্তি, ভক্ষ্য ভোজ্য, ভজন

পূজন, ভয় ভাবনা, ভাই ভগিনী ভাই ভায়াদ, ভাত ভরকারী, ভাতে হাতে, ভাব ভঙ্গী, ভাব ভক্তি, ভিটে মাটি, ভূত ভবিষ্যৎ ।

ম—মক্কা মদিনা, মঠ মন্দির, মজুর মিস্ত্রী, মণি মাণিকা, মণি মুক্তা, মণ্ডা মিঠাই, মতি গতি, মন্ত্র মাংস, মদ মাংসর্ষা, মদ মাংস, মন্ত্র মাংস, মনঃ প্রাণ, মন্ত্র তন্ত্র, ময়লা মাটি, মল মূত্র, মশা মাছি, মাছ মাংস, মাঠ গোষ্ঠ, মাঠ ঘাট, মাল্লী মাল্লা, মাজ্জাজা মুখতাব মুশাক্কিরখানা, মান মাথুর, মাস্ত গণা, মা মাসি, মারা ধরা, মাল মশলা, মাসি পিসি, মুগ মুহুরী, মুচি মুসলমান, মুটে মজুর, মুড়ি মুড়কি, মুণ্ডক মাণ্ডুকা, মৃদঙ্গ মন্দিরা, মেথর মুদফরাস, মেঘ বৃষ (রাশি), গোলা মুয়াজ্জিন ।

য—যক্ষ রক্ষঃ, যজন যাজন, যম জামাই, যথা তথা, যন্ত্র তন্ত্র, যা তা, যাছ মাধু, যান বাহন, যীশা মূশা, যুড়ে হেড়ে, যুৎবরাত, যেথা সেথা, যেন তেন প্রকারেণ, যে সে, যোড়া তাড়া, যোগাড় যন্ত্র ।

র—রঙ্গ বেরঙ্গ, রদ বদল, রণে বনে, রয় বয়, রয় সয়, রস কষ, রাধা ঢাকা, রাজা রুজী (উজীর ?), রাজা মহারাজা, রান্না বান্না (বাটনা ?), রামা শ্রামা, রীতি নীতি, রূপ রস, রেখে ঢেকে, রেশম পশম ।

ল—লতা পাতা, লাগান ভাঙ্গান, লাঠি সোটা, লুচি কচুরি, লুচি চিনি, লোক লঙ্কর, লোহা লকড়, লাঞ্ছনা গঞ্জনা, লাউ ও লেট ।

ব—বউড়ী খিউড়ী, বন্দুক বাকদ, বনে বাদাড়ে, বর্ষ চর্ষ, বল বুদ্ধি, বসন ভূষণ, বাগ্ বিতণ্ডা, বাঘ ভালুক (লাট), বাঙ্গালা বিহার, বাছ গোছ (গোছান), বাছ বিচার,

বাত পিত্ত, বাপ বিচার, বাদ বিতণ্ডা, বাধা বিয়, বাঁধা ধরা, বাঁড়ুগো মুখুজো চাটুজো, বালক বালিকা, বায়ু বরুণ, বার ব্রত, বিকি কিনি, বিড়ে বারগ, বিত্তে বুদ্ধি, বিদ্যা সাধা, বিদায় আদায়, বিধি বিষ্ণু শিব, বিন্দু বিন্দর্গ, বিল ও ঝিল, বিশ ত্রিশ, বিষয় আশয়, বুদ্ধি বিবেচনা, বেইমান বেতমিল, বেয়ে ছেয়ে, বোল চাল, ব্যয় ভূষণ (ব্যসন ?), ব্যবসায় বাণিজ্য, ব্যাকরণ অভিধান, ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বৈদ্যা ।

শ—শকুনি গৃধিনী, শত সহস্র, শয়নে স্বপনে, শরৎ শীত, শরম ভরম, শাক স্কৃত, শাঁখা শাড়ী, শাদা সিঁথে, শান্ত দান্ত, শান্ত সংযত, শাস্তি স্বস্তায়ন, শালী শালাজ, শিকা দীক্ষা, শিষ্য সেবক, শুক সনক, শুক শারী, শুচি শুদ্ধ, শুদ্ধ বুদ্ধ, শেল শূল শরাসন, শোয়া বসা, শৌচ আচমন, শশানে মশানে, শ্রদ্ধ শাস্তি, শ্রদ্ধ সপিণ্ডীকরণ, শ্রীদাম সুদাম, শ্বাস কাস, শ্বশুর ভাসুর ।

স—সই অপারিশ, সৎ চিৎ, সত্য ত্রেতা, সত্যং শিবং স্তন্দরং, সময় সুযোগ, সময় ও সুবিধা, সরিং সাগর ভূধর, সর্দি কাসি, সহায় সম্পদ, সহায় সম্পত্তি, সহায় সামর্থ্য, সহি মোহর, সাক্ষোপাঙ্গ, সাড়া শব্দ, সাত সতের, সাধ সেমস্তন, সাধু সজ্জন, সাধু সন্ন্যাসী, সাবান সোডা, সিপাই শাস্ত্রী, স্বধ সৌভাগ্য, সুযোগ সুবিধা, সুশীল ও সুবোধ, সূচ হতা, সোণা দানা, সৃষ্টি স্থিতি সংহার, সৈন্ত সামন্ত, স্থির ধীর গভীর, সৃষ্টি গুষ্টি, স্তুতি হুতি, স্নান দান, স্বাহা স্বধা, স্থল কলেজ (ল) ।

হ—হরিৎ পীত লোহিত, হ'য়ে ব'য়ে, হর্তা কর্তা বিধাতা, হব্য কব্য, হরে দরে (?)

হড় গুড়, হাওলাত বরুত, হাঙ্গামা হুজুং, হাট
ঘাট বাট মাঠ, হাড় চামড়া, হাড়ি ডোম,
হাড়ি কুড়ী (কুড়ী), হাড়ি বেড়ী, হাড়ি সরা,
হাড়ি হেঁশেল, হাড়ে নাড়ে, হাতে হেতেরে,
হায়রাণ পেরশান, হারানে পরাণে, হাসি খুসি,
হাসি ভামাসা, হা হতাশ (হতোহস্মি), হিসেব
কিতেব, হীরা জহরৎ, হকা কলিকা, হুষ্ট পুষ্ট,
হেন তেন, হেনা তেনা, হেমন্ত বসন্ত, হেলা
ফেলা, হেলে ছলে, হোড়া পোড়া, হোসেন
হাসান, হেজে যা'ক ম'জে যা'ক ।

(৩) বিপরীতার্থক শব্দযুগ্ম

বৈপরীত্য, (antithesis) ও কার্য-
কারণ-সম্বন্ধ বুঝাইতে অনুপ্রাসের আশ্রয়
না লইলে ভাব ও ভাষা ঘোরালো হয় না ।

অ—অজলে অস্থলে, অনলে অনিলে
সলিলে, অলুল প্রতিকুল, অলুকের না
হনুকের, অলুরাগ বিরাগ, অলুলাম প্রস্তিলোম,
অলুলাম বিলোম, অলুবাদ না হনুবাদ, অর্থী
প্রত্যর্থী, অবস্থা ও বাবস্থা ।

আ—আগাগোড়া, আদান প্রদান, আনা
গোনা (আসা যাওয়া অর্থ নহে কি ?),
আপন পর, আমা ও ঝামা, আশ্রয়, আলোকে
আঁধারে, আশালব্ধবিনিতা, আবির্ভাব
তিরোভাব, আশা আশঙ্কা, আসমান জমীন
(স্বর্গ মর্ত্য ?), আসল ও নকল, আঁও হয়
অও হয় ।

ই—ইতস্ততঃ, ইতোলষ্টস্ততোনষ্টঃ ।

উ—উচ্চ নীচ, উচ্চাবচ, উৎকর্ষ অপকর্ষ,
উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট, উত্তম মধ্যম অধম, উত্তরাপথ
দক্ষিণাপথ, উত্থান পতন, উন্নতি অবনতি,
উপায় অপায়, উটো পান্টা ।

ঊ—ঊর্দ্ধ্ব অধঃ ।

এ—(হয়) এস্পার (না হয়) ওস্পার ।

ও—ওস্তাদ ও সাক্ষেরদ, ওলে ঝোলে
(খেও না) ।

ক—কড়ি ও কোমল, কথা বনাম কাণ,
কাচ ও কাঞ্চন, কার্যা কারণ, কালা ধলা,
কুলীন ও কাপ, কোরাণ প্রাণ, ক্রয় বিক্রয়,
কোমল ও কঠোর ।

খ—খাখ খাদক ।

গ—গতান্নাত, গদ্য পদ্য, গমনাগমন, গরু
ও জরু, গুণনীয়ক ও গুণিতক ।

ঘ—ঘর বা'র, (না) ঘরকা (না)
ঘাটকা, ঘরে বাইরে, ঘোড়া ডিঙ্গে ঘাস,
ঘোড়া ভেড়ার একদর, ঘুঁষ বা ঘুঁষি ।

চ—চকোর ও চাতক, চড়াই উতরাই,
চাঁদ ও চকোর, চোরে কামারে ।

ছ—ছায়া ও কায়া (কায়) ।

জ—জল স্থল, জয় পরাজয়, জীব ও জড়,
জীব ও শিব, জীবে শিবে, জীবাত্মা পরমাশ্মা,
জীবন মরণ, জীবিত মৃত, জেলে ও হেলে,
জোষ্ঠ কনিষ্ঠ ।

ট—টানা পড়েন ।

ঠ। ঠাকুর কুকুর, ঠেকে শেখা আর
দেখে শেখা ।

ত—তাত (তাপ ?) ও বাত, তিলে তাল,
তুট্ট ও কুট্ট, তেলে জলে, ত্যাগী ও ভোগী,
তীর তুচ্ছ, তালে আর বোলে ।

দ—দানব মানব, দেওয়া থোওয়া, দেনা
পাওনা, দেব দৈত্য, দিলে নিলে, দেশ বিদেশ ।

ধ—ধলা ও কালা ।

ন—নরম গরম, নরনারী, নিগ্রহ অনুগ্রহ,
নিষ্ঠা ও বন্দনা, নিখাস ও প্রখাস, নেড়া নেড়ী,
নূতন পুরাতন ।

প—পতঙ্গ ও মাতঙ্গ, পত্নী ও পেত্নী, পাণ তাপ (কার্য্যাকারণ), পাণ পুণ্য, পাণ ও প্রায়শ্চিত্ত, পিতাপুত্র, পৈয়াজ পয়জার, পীযুষ ও বিধ, পূর্ব পশ্চিম, পুরুষ ও প্রকৃতি, পুলক ও আতঙ্ক, পূর্বাপর, পেটে পিঠে, প্রকৃতি ও বিকৃতি, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, প্রজা ও জমীদার, প্রবীণ ও নবীন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, প্রাচীন ও নবীন, প্রাচী ও প্রতীচী, পাতাচাপা কপাল আর পাথরচাপা কপাল।

ভ—ভক্ত 'ও ভাক্তি, ভক্ত ও ভণ্ড, ভয় ও ভক্তি, ভয় ও ভরসা, ভাব ও ভাষা, ভিতর বাহির, ভূত ভবিষ্যৎ, ভুলোক ঢালোক।

ম—মরণকাঠী জীবনকাঠী, মর্দা ও মাদী, মাগী মিসে, মান অপমান, মায়ে ছায়ে, মায়ে পোয়ে, মিছা সাঁচা, মুড়ি মিছরি, মেয়ে মর্দ, মেঘ ও মহিষ।

য—যাতায়াত, যুক্ত ও মুক্ত, যোগ বিরোগ, যোগী ও ভোগী।

র—রক্ষক ভক্ষক, রসা কথা (কষায়),

রাং রূপা, রাজা প্রজা, রাম রহিম, রাম রাবণ।

ল—লাভ লোকসান (নোহান), লাল কালা, লেনা দেনা।

ব—বর বধু, বাঘে গরুতে, বাঘে ছাগে, বাঘে বকরীতে, বাদী প্রতিবাদী, বাপে বেটায়, বাঘে বলদে, বাহাল বরতরফ, বিধি নিষেধ, বিপদ সম্পদ, বাস্তব সমস্ত।

শ—শত্রু ও শাস্ত্র, শিকা ও পরীক্ষা, শিলা ও স্থলি, শিব-সতী, শিশির ও সমুদ্র, শূত্র ও পূর্ণ, শূদ্র ভদ্র, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, শ্রেয়ঃ ও হেয়।

স—সংসার ও সম্মাস, সকাল বিকাল, সদর অন্তর, সত্য মিথ্যা, সরেশ নিরেশ, সাঁক সকাল, সাবিত্রী সত্যবান্, সান্ত্ব অনন্ত, সাম্নে পিছনে, সাধনা ও সিদ্ধি, স্তম্ভঃস্তম্ভ, স্ত্রোয়াঃস্ত্রোয়া, স্তর নর, সুরু হইতে শেষ, স্থল ও স্থল্ম।

হ—হনু ভানু, হরণ পূরণ, হর্ষ বিষাদ, হ'ল আর গেল, হরিদ্বার আর গঙ্গাসাগর। (ক্রমশ)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বয়কট ও হিন্দু-জাতিভেদ

(সামাজিক প্রবন্ধ)

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাঝেই এ কথা স্বীকার করেন যে, কোনো না কোনো আকারে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত আছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রথা বৃদ্ধি হয় এবং বিভিন্ন দেশের সভ্যতার প্রকারভেদে ইহা বিভিন্ন প্রকারের

আকার ধারণ করে। শুধু পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর স্ব-শ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদ দেখা যায় না, অথবা আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে না। নিম্নশ্রেণীর অসভ্য লোকদিগের মধ্যেও জাতিভেদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তবে হিন্দুজাতির

মধ্যে জাতিভেদ যে আকার ধারণ করিয়াছে, পৃথিবীর আর কোনো জাতির মধ্যেই সেরূপ আকার প্রাপ্ত হয় নাই; ইহার নাম স্পর্শ-দোষজনিত জাতিভেদ। ভিন্ন জাতির কিম্বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের স্পৃষ্ট অন্ন খাইলে জাতি যাইবে, এমন কি, জল খাইলেও জাতি যাইবে, জাতিভেদের একরূপ বন্ধন পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। আমাদের বিদেশীয় বন্ধুগণ এবং পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন স্বদেশীয় সমাজ-হিতৈষিগণ মনে করেন, ইহা একান্তই সাম্য-মৈত্রীর বিরোধী এবং অসম্ভাব্যতার পরিচায়ক। এটা হিন্দুর উপরে একটা ভীষণ অভিযোগ,— যাহা কোথাও নাই, তাহা তোমার মধ্যে কেন থাকিবে?

উত্তর এই যে, ইহা অসম্ভাব্যতার লক্ষণ নহে; কেননা, পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো অসম্ভ্য জাতির মধ্যেই একরূপ স্পর্শদোষজনিত জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত নাই। যদি ইহা অসম্ভাব্যতার লক্ষণ হইত, তবে কোনো না কোনো অসম্ভ্যজাতির মধ্যে ইহার নিদর্শন পাওয়া যাইত। আর একরূপ প্রথা অস্তিত্ব প্রচলিত নাই বলিয়াই যে এই প্রথাটা জঘন্য, ইহাও যুক্তিসূক্ত কথা নহে। তবে সাম্য-মৈত্রীর নাম যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উত্তর দিতেছি।

অত্যেক সমাজেই সমাজশাসনের জন্য একটা “বয়কট-প্রথা” প্রচলিত থাকা আবশ্যিক। প্রথাটার এ দেশী নাম এক-ন্ন’রে করা। কিন্তু আজকাল বয়কট শব্দটা আমাদের দেশের লোকের এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে উহাকে পরিত্যাগ করা যায় না। এই স্বদেশী আন্দোলনে সকলের

মুখেই “বয়কট কর, বয়কট কর” এই শব্দ ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর উচ্চারিত হইয়াছে। যাহারা জাতিভেদের নিন্দা করেন, একঘ’রে করাকে ঘৃণিত আচরণ মনে করেন, তাঁহারাও বিদেশী দ্রব্যের ক্রেতা-বিক্রেতাকে বয়কট করিতে বাধ্যবদ্ধ যুবক এবং মহিলা ও বালিকা সকলকে মাতৃভূমির নামে, জৈখরের নামে, আরাধ্য দেবতার নামে শপথ করাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, গভর্ণমেন্ট আইন করিয়া বাধা না দিলে এখনও সেই প্রতিজ্ঞার শ্রোত খরবেগে প্রবাহিত থাকিত। এ কথা সকলেই বুঝিয়াছেন যে, সমাজ-দ্রোহীকে শাসন করিতে হইলে বয়কটের একান্ত প্রয়োজন।

এ দেশের বয়কট কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। অমুক ব্যবসায়ী বিলাতী কাপড়ের চালান আনিয়াছিল, তাই তাহাকে বয়কট করা হইল অর্থাৎ তাহার গুরু পুরোহিত, ধোপা নাপিত বন্ধ করা হইল, তাহার স্পৃষ্ট অন্নজল পরিত্যক্ত হইল, সমাজে সে একঘ’রে হইল। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, যে শক্তি মুহূর্তের মধ্যে একজন ধনী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অনাথ ও অপমানিত করিতে পারে, এই শক্তির মূল কোথায়? মূল ঐ অন্নজলে, মূল ঐ স্পর্শ-দোষের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। অপরাধী ব্যক্তির অন্নজল পরিত্যক্ত হইল, যে তাহার অন্নজল গ্রহণ করিবে, তাহারও অন্নজল অব্যবহার্য হইবে; স্তত্রাং গুরু গেল, পুরোহিত গেল, চাকর গেল, চাকরানী গেল, সে একটা হোটেল ঘরে ঢুকিয়া ভাত পাইতে পারে না; কেননা, সে ঘরে ঢুকিলে ঘরের

অন্নজল নষ্ট হইবে। কি বিষম বন্ধন! কি ভীষণ শাস্তি!

আজকাল সমাজ-শৃঙ্খলা না থাকায় এবং দেশে হিন্দু ভিন্ন অপরাপর জাতির বসতি ও আধিপত্য হওয়ায়, লোকের সমাজ-ভিন্ন কমিয়া গিয়াছে। এখন কোন ধনী লোককে বয়কট করা বড়ই কঠিন কার্য; কেননা, সে গুরু-পুরোহিতের কাঙ্গাল নহে, সামাজিক অস্থ-ষ্ঠানের দ্বার দ্বারে না, পূজা-পার্বণ-শ্রাদ্ধাদিকে আপদ জ্ঞান করে, তাহার মিলিবার মিশিবার জন্ত তাহারই জায় উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব বহুজনের অভাব নাই এবং আহারের জন্ত গ্রাণ্ড-হোটেল কি গ্রেট ইষ্টরনের দ্বার খোলা আছে। আর যদি ঘরে রান্না বাস্না করিতে হয় তাহার জন্ত হিন্দু পাচক কি হিন্দু চাকরের দরকার নাই; তাই আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের বয়কট-ব্যাপারে রাজধানী অপেক্ষা ক্ষুদ্র সহর, সহর অপেক্ষা মফঃস্বল এবং পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গ সমধিক জয়যুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে যেখানে সমাজের বন্ধন যেমন দৃঢ়, সেইখানে সেইখানে বয়কট ততটা কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছে।

একণে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পৃথিবীর যে সকল দেশে হিন্দু-জাতিভেদের জায় জাতি-ভেদ-প্রথা নাই, অর্থাৎ যে সকল দেশে স্পৃষ্ট অন্নজল পরিত্যাগ করা সামাজিক শাসনের অঙ্গ নহে, সে সকল দেশে কি “বয়কট” হয় না? “বয়কট” শব্দের উৎপত্তি ইউরোপেই হইয়াছে। এ কথাই উত্তর এই যে, সে সকল দেশের বয়কটের প্রণালী স্বতন্ত্র, আমাদের দেশে যেখানে “কদমে পুণ্ডরীকাক্ষঃ,” সেদেশে সেখানে “প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।” আসল কথা এই

যে, সে দেশে যদি কাহাকেও বয়কট করা হয় এবং যদি কোন ব্যক্তি সেই বয়কট-ব্যক্তির সাহায্য করে, অথবা কোনরূপে তাহার প্রতি কিক্রিয়াত্র সহানুভূতি দেখায়, তবে বয়কটকারী জনমণ্ডলী সেই ব্যক্তির বাড়ী ঘর ঘেরাও করিবে, তাহার ঘরে আগুন দিবে এবং তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলে হয় প্রাণে মারিবে, নতুবা তাহাকে বিকৃতাক্ষ করিবে। আমেরিকার খেতাজগণ যখন ইংলণ্ডের “চা” বয়কট করিয়াছিল, তখন বয়কটকারিগণ তুলার আলকাতরা মাথাইয়া সঙ্গে রাখিত এবং বয়কটের বিরুদ্ধবাদী কোনো ব্যক্তিকে রাস্তায় দেখিতে পাইলে, তাহার চোকে মুখে আচর্ষিতে সেই আলকাতরা-মাথা তুলা চাপিয়া লাগাইয়া দিত; সে সব দেশে বয়কটের সময় অস্ত্রান্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সকলের তুলনায় এই প্রথাটিকে বিশেষ শিষ্টতা ও সভ্যতাব্যঞ্জকই বলিতে হইবে।

আমি পাশ্চাত্য বয়কট প্রথার সমালোচনা করিতে চাহি না। আমি শুধু বলিতে চাই যে, আমাদের দেশে ও পাশ্চাত্যমণ্ডলে বয়কটের যে বিভিন্ন মূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে আমাদের জন্ত কোনটী বাঞ্ছনীয়? পাশ্চাত্য বয়কট-প্রণালীতে বয়কট-ব্যক্তি বিপক্ষের নিকট হইতে কোনো সাহায্য পায় না; কিন্তু আমাদের দেশে যাহাকে একঘ’রে করা হয়, কেহ তাহার বাড়ীতে আহাৰ করে না বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি বিপন্ন কি বুড়ু হইয়া আসিলে, সকলেই তাহাকে যত্নের সহিত অন্নজল প্রদান করে। এদেশের একান্ত কঠোর শাসনও দয়াকে কখনই অতিক্রম করে নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ-

সংস্থানে সুপ্রণালীক্রমে একঘ'রে করার উপায় না থাকায় সে দেশের বয়কট-প্রথা একান্ত বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং উহা ভীষণ সংহারক মূর্তি ধারণ করিয়া ধর্ম ও রাজ-বিধি উভয়কেই লঙ্ঘন করে। ইহা পাশ্চাত্য মণ্ডলে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রামা পঞ্চায়ৎ-প্রথাকে আজকাল অনেক চিন্তাশীল ইংরাজও প্রশংসা করিয়া থাকেন। যখন এদেশের গ্রাম্য পঞ্চায়ৎপ্রথা বর্তমান ছিল, তখন সামাজিক শাসনই সেই প্রথার মূল শক্তি ছিল এবং সেই শক্তির মূল-মন্ত্র ছিল সামাজিক বয়কট অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তির পৃষ্ঠে অন্নজল পরিত্যাগ করা। যদি বল যে জরিমানা করার প্রথাও প্রচলিত ছিল, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে সামাজিক শাসনের ভয়েই লোকেরা জরিমানা দিত, নতুবা দিবে কেন?

আমি এই প্রবন্ধে এই মাত্র দেখাইতেছি যে, সমাজ-শাসনের গন্তব্য যদি বয়কট প্রথার

আবশ্যক থাকে (বাহারা উহা অস্বীকার করেন তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার নাই) তবে হিন্দুবয়কট-প্রথা অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তির পৃষ্ঠে অন্নজল পরিত্যাগ করাই সর্বোৎকৃষ্ট প্রথা। পৃথিবীর অত্রান্ত দেশের প্রচলিত প্রথা অপেক্ষা উহা শিষ্ট ও নিরীহ অথচ সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-সম্পন্ন। যদি কেহ এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রথার আবিষ্কার করিতে পারেন, আমরা অবশ্যই মাথা পাতিয়া তাঁহার কথা গ্রহণ করিব। *

শ্রীমদানন্দোত্তর গুহ ঠাকুরতা।

* নূনাবিধি ২০ বৎসর পূর্বে বরিশালের ষ্টান মিশনের অন্তর্গত বাগধা ও আকর গ্রামের আলোক ও কালীচরণ নামক ব্যক্তিদ্বয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলে ষ্টানগণ তাহাদিগকে একঘ'রে করিল, কেবল যে তাহাদের অন্নজল পরিত্যাগ করিল এরূপ নহে, তাহাদের ক্ষেতের ধান কাটিল না, তাহাদের জীর্ণঘর মেঝেঘর করিল না, এই প্রবন্ধ লেখক কোন একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজপত্নীকে একথা জানাইলে তিনি উত্তর করিলেন যে এরূপ শাসন-প্রণালী অবলম্বন না করিলে তাঁহারা তাহাদের মণ্ডলীর শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিষেন না।
লেখক।

জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব-কবির মিলন-গীতিও কেবল ইঞ্জিরের চর্চ্চামাত্র নহে, এ সকল গাঠনও ভাব-বাহুল্য বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়াছে।

না পুছ না পুছ সখি পিয়ার পিরীতি।

পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচতি ॥

হিয়ার উপর হইতে শেজে না শোয়ায়।

বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোড়ায় ॥

নিদ্রার আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।

কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে ॥

হিয়ার হিয়ার এক বয়ানে বয়ান।

নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান ॥

ইথে যদি মুঞি তেজিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাসে।

আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাসে ॥

এমতি বন্ধিয়ে নিশি হুঁহে এক মেলি।

জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি ॥

জ্ঞানদাসের রাধা-চরিত্র আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, জ্ঞানদাসে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমন্বয় হইয়াছে। বিদ্যাপতির রাধিকা রসিকা, চঞ্চলা, সরলা, ক্ষুটিত-মাত্র-যৌবনা, প্রণয়রস-মুগ্ধা, দৈহিক-সুখ-প্রিয়। নারিকী—চণ্ডীদাসের রাধিকা যৌবনে যোগিনী, মনোময়ী, দেহবুদ্ধিহীন। বিদ্যাপতির রাধিকার মন লুকাইয়া কাজ করে, দেহবৃত্তি স্বপ্রকাশ; চণ্ডীদাসের রাধিকার দেহ আছে, তাহা বৃষ্টিবার ঘো নাই, মন ও ভাব স্বতঃ-বিকশিত। বিদ্যাপতির শ্রীরাধা লালসাময়ী, চণ্ডীদাসের রাধিকা পাগলিনী। বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের রাধিকা-চরিত্রের বিচ্ছিন্নতা এই ক্ষুদ্র লেখক অপর এক প্রবন্ধে সবিস্তারে বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছে।* এই কারণে বিদ্যাপতির রাধিকার মিলনে আনন্দ, বিচ্ছেদে মিলন—আর চণ্ডীদাসের রাধিকার সম্বন্ধে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদে দৈন্ত। জ্ঞানদাসের রাধিকা ভাবময়ী, পূর্বরাগে অনেক পরিমাণে চণ্ডীদাসের রাধিকার মত বেদনাময়ী, কিন্তু দেহ-বুদ্ধিহীন নহে; এইজন্য সম্বন্ধে আনন্দময়ী ও ভাবময়ী, বৈচিত্র্যাম্বুসন্ধানময়ী। মিলনেই কবি রাসলীলা দোললীলা, ঝুগুন প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের শ্রীরাধা কিন্তু বিদ্যাপতির রাধার মত তীব্রলালসাময়ী নহেন, তাই বিরহে তাঁহার বিদ্যাপতির রাধিকার তুল্য একাগ্রতা নাই। বিদ্যাপতির রাধিকা বিরহে অশুষ্কণ মাধব মাধব চিন্তা করিতে করিতে “ভেল মাধাই”; চিন্তার এমন প্রথরতা আমরা জ্ঞানদাসে বা চণ্ডীদাসে দেখিতে পাই না।

কিন্তু জ্ঞানদাসের শ্রীরাধার আসঙ্গলিপ্সা ছিল বলিয়া বিরহে তাঁহার হৃদয়ে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা অপেক্ষা বেদনার প্রাধিক্য আছে। এইরূপে জ্ঞানদাসে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথঞ্চিং সামঞ্জস্য হইয়াছে।

কিন্তু এমন মধুর মিলনে বিরহ কেন? ইহার গোজাত্মজ উত্তর—পুরুষের অনেক কাজ, শুধু প্রেম লইয়া বাসিয়া থাকিলে, তাহার চলে না, কাজেই বিচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী। এমন উত্তরে কিন্তু বৈষ্ণব-কবির বিরহ বুঝা যাইবে না; এইখানে আবার তাঁহাদের পূর্বকথিত মূল সূত্রের অনুসরণ করিতে হইবে। আমরা বলিয়াছি যে, বৈষ্ণব-কবির গানে একটা গূঢ়ভাব নিহিত আছে এবং অল্প পরিমাণে তাহা বুঝাইবারও চেষ্টা করিয়াছি। জ্ঞানদাস নৌকাবিহারের পদে তাহা কতক পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। আমরা যখন বুঝিব যে, বৈষ্ণব-কবির গান পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলন-সঙ্গীত, ভগবান ও ভক্তের প্রেমলীলা বর্ণন, তখন এই-বিরহ বোঝা সহজ হইবে। শ্রীমদভাগবত কহিয়াছেন যে, ভগবৎপ্রেম-লাভে গোপীদিগের হৃদয়ে, বিশেষতঃ যে গোপী-প্রধানার কথা ভাগবতে আছে, এবং যিনি শ্রীরাধা ভিন্ন আর কেহই নহেন, তাঁহার হৃদয়ে গর্ভের উদয় হইয়াছিল। আমরাও দেখিয়াছি যে, জ্ঞানদাসের শ্রীরাধাও প্রিয়তমের প্রেমলাভে একটু গর্ভশালিনী, একটু আমিষ-ময়ী হইয়াছেন—

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া

পীতবাস পরে শ্রাম।

প্রাণের অধিক করের মুরলী

লইতে আমারি নাম ॥

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখনে যে দিকে যায়।

বাহু পাসরিয়া বাউল হইয়া
তখনে সেদিকে ধায় ॥

ইহাতে বেশ একটু “আমার আমার” ভাব
আছে। “আমি যে কৃষ্ণকে একেবারে বাঁধিয়া
ফেলিয়াছি” এই রকম ভাব ইহাতে দেখিতে
পাওয়া যায়। আবার—

পিরীতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি
আসি তারে চাহিলে সে জীয়ে।

বেশ প্রেম-দর্পের পরিচয় দিতেছে। এ দর্প
মিষ্টতা-বর্জিত নহে; কিন্তু দর্প যেমনই হউক,
তাহা ভাল নয়। লৌকিক কবিও
গাহিয়াছেন—

প্রেম শুরু হুতে বাঁধাবাঁধি

বাতাসের তো ভর সবে না।

তাই শ্রীরাধার এই ভালবাসার দর্পে—এই
সৌভাগ্যমদে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে।
শ্রীরাধার হৃদয়ে প্রেম পরিপূর্ণমাত্রায় ছিল
বলিয়া তিনি আবার প্রিয়তমকে ফিরাইয়া
পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে বড় কষ্টের, অনেক
সাধনার পরে। এমন সাধনা ভিন্ন, সম্পূর্ণ-
রূপে আশ্রিত-বর্জিত না হইতে পারিলে,
দেহ, মন, প্রাণ, সংসার-স্বখ, লোকনিন্দা,
লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—এ সকল একেবারে ত্যাগ
করিয়া পূর্ণমাত্রায় তদেকচিত্ত না হইতে
পারিলে, ভগবান্কে পাওয়া যায় না—
ভগবান্কে বাঁধা যায় না; তাই শ্রীরাধার এই
বিরহ-পরীক্ষা। ভাগবত বলিয়াছেন যে,
যখন ভগবান্ গোপীদিগের চিত্তে এই দর্প
দেখিলেন, তখন তিনি সেই গর্ষ শাস্ত করিবার
অন্ত এবং তাহাদিগকে কৃপা করিবার অন্ত—

“প্রশমায় প্রসাদায়” অন্তর্হিত হইলেন। এ
বিরহ ভক্তের প্রতি ভগবানের অমুগ্রহ-সজ্জাত।
এই বিরহ হইতেই শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-চরণে
সর্বস্বার্থপণ। এই সর্বস্বার্থপণ-প্রবৃত্তি তাঁহার
হৃদয়ে প্রেমোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছিল,
কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় নাই, অনেক
বাধা-বিপত্তি, অনেক আততায়ী ভাব তাহা
হইতে দেয় নাই; এই বিরহেল, পরে তাহা
কার্য্যে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। মিলনে
চপলতা আছে, মান আছে, অভিমান আছে;
এতদ্ভিন্ন মিলনে ঐহিকতার প্রতি দৃষ্টিও
আছে; এমন একটা ভাব আছে যে, কৃষ্ণ
ব্যতিরেকেও আমার এমন আরও অনেক
জিনিষ আছে, যাহা রাখা প্রয়োজন; এ
কথাও তখন মনে আসে যে, কৃষ্ণ ও
সংসার দুই রাখিতে হইবে। কিন্তু বিরহান্তে
আর শ্রীরাধার কিছুই নাই—কেবল শ্রীকৃষ্ণ
ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাই ভাগবত
বলিয়াছেন—

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবাস্তরবীর্যত।

ভক্ত বৈষ্ণব-কবি এইজন্ত বিরহচিত্র
আঁকিতে বড় উৎসাহী ও বড় নিপুণ।
লৌকিক কবির কাছে যাহা কলামাত্র, বৈষ্ণব-
কবির কাছে তাহা সাধনায় উন্নীত হইয়াছে—
অশ্রু-জল-সিক্ত হইয়া চিত্রগুলিও পবিত্র
হইয়াছে।

মুড়াব মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ
যদি সেই পিরা নাহি আইল।

এ হেন যৌবন পরশ রতন
কাচের সমান ভেল ॥

গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শব্দেয় কুণ্ডল পরি।

যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেখানে নিষ্ঠুর হরি ॥

মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হঞা ।

যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি
বাক্সি বসন দিয়' ॥

আপন বন্ধুরা আনিব বাক্সিয়া
কেবা রাশিবারে পারে ।

যদি রাখে কেউ তাক্সিব এ জীউ
নারী বধ দিব তারে ॥

পুন ভাবি মনে বাক্সিব কেমনে
সে শ্রাম বন্ধুরা হাতে ।

বাক্সিয়া কেমনে ধরিব পরাণে
তাই ভাবিতেছি চিত্তে ॥

জ্ঞানদাসে কহে বিনয় বচনে
শুন বিনোদিনি রাধা ।

মথুরা নগরে যেতে মানা করি
দারুণ কুলের বাধা ॥

শুধু ভগবান্ নয়, আজ কবিও একটু
পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা রাখেন । কিন্তু শ্রীরাধার
এখন আর কোনও বিষয়েই অসুযোগ নাই,
মুখে হাসি নাই, দেহে বেশবিক্রাস নাই,
কোনও স্থখে আকাজকা নাই—

পিয়া পরদেশে বেশ গেল দূর ।

হাস রতস সবহ' ভেল চুর ॥

মৃগমদ চন্দন লেপন বিধ ।

মন পূবন জমু আনল শিখ ॥

শ্রীরাধার এখনকার অবস্থা বৈষ্ণব-কবি
জ্ঞানদাসের প্রত্যক্ষীকৃত স্বরূপ ; এমন সাংখ্যিক
অবস্থা মহা প্রভুর জীবনে অহরহঃ দেখা দিত-

কাহু কাহু করি ক্ষিতিতলে মুকুহলি

সখীগণ দ্বিগুণ বিষাদ ॥

এক সখী তুরিতহিঁ কোরে আগোরল
কহতহিঁ আগোরত কাল ।

শুনইতে ঐছন বচন রসায়ন
পাওল জীবন দান ॥

চেতন পাই হেরই পুন দশদিশ,
অতি উৎকণ্ঠিত হোই ।

কাঁহা মঝু প্রাণনাথ কহি ফুকারায়
অবহ' না আওল সোই ॥

রোয়ত হসত খসত মণি যোজত
পহুহিঁ নয়ন পদারি ।

সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈথনে
মথুরা নগর সিধারি ॥

কবি জ্ঞানদাস বিরহের বড় মনোহর
চিত্র আঁকিয়াছেন ; কারণ, তিনি বিভাপতির
শিষ্য । বিভাপতির বিরহচিত্রের মধ্যে যে
উপাদান আছে, জ্ঞানদাসের চিত্রেও সেই
সকল বর্তমান । চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার
বিরহের সম্ভাবনা নাই ; কারণ, তিনি দেহের
দ্বারা প্রিয়োপভোগের ধার ধারেন না,
ভাবরসে বিভোর হইয়া আছেন । জ্ঞান-
দাসের রাধা যেমন ভাবে বিভোর, তেমনি
অঙ্গ-সঙ্গ-রসাস্বাদিনী, তাই তাঁহার বিরহে
মর্মান্তিক ক্রন্দন ফুটিয়াছে ; আবার ইহা
হইতেই তাঁহার দেহবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া চিত্ত
পরিগুহ্ব হইয়াছে, হৃদয়ে প্রিয়তমের প্রতি
নির্বিকল্পচিত্তে সর্বস্বার্থণের প্রবৃত্তি প্রবল
হইয়া উঠিয়াছে । তাই বিরহের পর
মিলনে অমৃত উঠিয়াছে । আর তাঁহার
ঘর নাই, সংসার নাই—

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া ।

চির দিন পরে পাইয়াছি লাগ

আর না দিব ছাড়িয়া ॥

তোমার আমার একই পরাণ

ভালে সে জানিয়ে আমি ।

দ্বিয়ার হৈতে বাহির হইয়া

কি রূপে আছিল তুমি ॥

যে ছিল আমার মরমের দুখ

সকল করিষু ভোগ ।

আর না করিব আঁখির আড়

রহিব একই যোগ ॥

পাইতে শুইতে তিলেক পলকে

আর না যাইব ঘর ।

কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে

আর কি কাহাকে ডর ॥

এতছ' কহিতে বিভোর হইয়া

পড়িল শ্যামের কোরে ।

জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর

ভাসিল নয়ান লোরে ॥

শ্রীনাথ এখন বুঝিয়াছেন যে তাঁহার নিজস্ব কিছুই নাই; তাঁহার গর্ক্স এখন নিজেকে লইয়া নয়, সে গর্ক্সের আর অহমিকা নাই। তাই যিনি বলিয়াছিলেন—

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া

সীতবাস পরে শ্যাম ।

প্রাণের অধিক করের মুরলী

লইতে আমার নাম ।

তিনি এখন বলিতেছেন—

বঁধু তোহারি গরবে গরবিণী আমি

রূপসী তোহারি রূপে ।

হেন মনে'লয় চরণ যুগল

সদা ধ'রে রাখি বৃকে ॥

এই যে বঁধুর গর্ক্সের গর্ক্স, বঁধুর রূপে রূপ, এই যে চরণযুগল সদা বৃকে ধরিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি—ইহাই আত্মসমর্পণ;

আধখানা নহে, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এই গর্ক্সের, এই রূপাত্মভূতিতে, এই আকাঙ্ক্ষার আধ্যাত্মিক উন্নতির চূড়ান্ত দেখা যাইতেছে; কারণ, ইহা কোনও ইন্দ্রিয়ময় জীবের ক্লেদময় গর্ক্স নহে, জ্ঞানময়ী আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা নহে; ইহা যেমন প্রেমিকার সর্ক্সস্বর্পণ, তেমনি আর এক দিকে ভক্তের আত্মনিবেদন। ভক্তের ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই নাই; তাহার কাছে প্রাণ ভগবানের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর--

অন্তের আছয়ে অনেক জনা

আমার কেবল তুমি ।

পরাণ হইতে শত শত গুণে

প্রিয়তম বলি মানি ॥

নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ

তুমি হে কালিয়া চাঁদা ।

জ্ঞানদাসে কহে তোমারি পিরীতি

অন্তরে অন্তরে বাস্কা ॥

এই আত্ম-বিলোপন কত সুন্দর! ধরিয়া লইলাম, জ্ঞানদাসের কোনও আধ্যাত্মিক ভিত্তি নাই; তাহা হইলেও কি এই অত্যন্ত আত্মত্যাগ, এই নির্বিড় আত্মসমর্পণ, এই একান্ত নির্ভরশীলতা, গভীর প্রেমের পরিচায়ক নহে?—ভাবের বিকাশ করিতে সক্ষম নহে? এ আত্ম-ত্যাগে চুক্তি নাই, দেনা-পাওনার হিসাব নাই, লাভালাভের খতেন নাই, এ ত্যাগ যথার্থই মর্ক্স-ত্যাগ; জাতিত্যাগ, কুলত্যাগ, এমন কি, ধর্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ। তোমার জুলিয়টই ভালবাসার খাতিরে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু চুক্তি ছাড়িতে পারে নাই; প্রথমতই সে

চুক্তি করিয়া লইয়াছিল—তাহার লৌকিক ধর্ম বজায় রাখিয়াছিল। সংসারের যাহা কিছু ভাল—নামধাম, কুলশীল, ধর্ম্যধর্ম—সব বিসর্জন দিয়া যে প্রেমে আত্মহারা হয়, তাহাকে সমাজে পতিত হইতে হউক, লোকে কুলটা বলিয়া গালি দিক্, কিন্তু সেই যথার্থ ভাল বাসিয়াছে, সেই যথার্থ প্রেমিক। এমনি সর্বনাশী প্রেম ছদ্মবেশে না জাগিলে ভগবানকে বাধা যায় না। তাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরকীয়া নাস্তিক্যের এত কদর; তাই মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, পরবাসিনী নারী যেমন সকল সময়েই সংসারের কার্য্য করিতে করিতেও, প্রেমিকের নবসম্প্রদায় উপভোগ করে, ভক্তের ভগবান সশব্দে ঠিক সেই রকম ভাব হওয়া চাই। ভাবে ঢল ঢল, অনুরাগে বিহ্বল হইয়া ভগবানকে ভালবাস; সংসার কি বলে, তাহার দিকে কান দিও না; সংসারে কত কি হারাইলে, তাহা দেখিতে বাইও না; শুধু ভালবাস, কেবল ভাবরসে সেই ভাবের ভাবুককে ধরিয়া রাখ, যে তাঁহাকে এমন করিয়া ভালবাসে, যে জ্ঞানদাসের রাধিকার মত তাঁহাকে সর্বময়, সর্বাধিষ্ঠিত ভাবিয়া বলিতে পারে—প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারে—আমার কিছুই নাই, সবই তোমার, আমি শুধু তোমায় ভালবাসিতে জানি, যে বলিতে পারে—

বঁধুহে আর কি ছাড়িয়া দিব।

এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ

সেখানে তোমারে খোব ॥

ও চাঁদ বদন সদা নিরখিব

সুখ না চাহিব আর।

তোমা হেন নিধি মিলাওল বিধি
পূরিল মনের সাধ ॥

প্রেম ডোর দিয়া রাখিব বান্ধিয়া
ছুখনি চরণারবিন্দ।

কেবা নিতে পারে কাহার শক্তি
পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ ॥

যে বলিতে পারে—

ওহে নাথ কি দিব তোমারে।

কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।

যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥

তুমি যে আমার নাথ আমি যে তোমার।

তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার ॥

যতক্ষণ বাসনা মোর তুমি তার নিধি।

তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি ॥

ধন জন দেহ গেহ দকলি তোমার।

যে ভালবাসা দিতে জানে,—নিরাবিল,
নিরবচ্ছিন্ন ঐখর্য্য জ্ঞান-রহিত ভালবাসা দিতে
জানে, তাহার প্রতি ভগবানের উত্তর জ্ঞান-
দাসের কথায় এই—

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।

তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম ॥

তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।

তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥

* * * * *

তুয়া অনুরাগে হাম তুমায় দেখি।

তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি ॥

নাথক ও নাস্তিক্যের এই প্রকার আত্ম-
সমর্পণে জ্ঞানদাসের কাব্যের পরিসমাপ্তি
হইয়াছে—এই স্বার্থহীন প্রেম কি ইন্দ্রিয়-
চপলতার পরিচয় দেয়? না, আমরা ইহার
ভিতরে ভক্তের ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের এবং
অমানী ও মানদ এবং ভূণের চেয়েও নীচ

হৃদয়ের মধুর স্বার্থহীনতার স্ম-বাতাস অনুভব করিয়া আমাদের সংসার-ক্লিষ্ট, আত্মস্বখায়েষী রিপুবলীভূত অন্ধ হৃদয়কে একটু উন্নত, একটু আনন্দময়, একটু নিঃস্বার্থ ও আশ্রিত-বর্জিত করিতে পারি। “এই গীতি-কবিতাগুলি আমরা ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সাহিত্য-প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি—আত্ম-গরিমার রাজ্যের অধিবাসিত্বকে আত্ম-বিসর্জনের কথা শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে পারি।”*

“বৈষ্ণবের গান স্বাধীনতার গান। তাহা জাতি মানে না, কুল মানে না। অথচ এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ সৌন্দর্য্য-বর্ধনে নিয়মিত। তাহা অন্ধ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভাস্ত উন্নততা মাত্র নহে।”†

অতএব যদি বৈষ্ণব-কবির চিত্রিত প্রেমকে সাধাসিদ্ধ প্রেম বলিয়াও ধরা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রেমের এমন মধুর, এমন গভীর মূর্তি, এমন হৃদমনীয় বেগ আমরা আর কোথাও চিত্রিত দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। “বৈষ্ণব-কবির সেই স্বাধীন প্রেমের গভীর জুগিবার আবেগকে সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্রে, অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসার-পথ হইতে মানস-পথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন।”‡

বৈষ্ণব-কবির প্রভাবের ইহাই মূল কারণ এবং এইজন্মই বলিয়াছি যে, সংসার-বিক্ষিপ্ত হৃদয়ে বৈষ্ণব-কবির সরল সত্যজ্ঞ-আত্মতাগ-ময়ী পেমগীতি এক-অনির্বচনীয় ভাবে সজ্জন করিয়া যেন জীবনীশক্তি ফিরাইয়া দেয়,

তাপদগ্ধ শ্রান্ত ও ক্লান্ত চিত্তে শান্তি-স্বখার প্রস্রবণ খুলিয়া দেয়।

জ্ঞানদাসের প্রেমসঙ্গীতের সমালোচনা এইখানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু জ্ঞানদাসে এতদরিক্তও কিছু আছে, যাহা দ্বারা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সমসাময়িক কবি গোবিন্দ-দাসের পদাবলীতে যাহা নাই তাহা আমরা জ্ঞানদাসে দেখিতে পাই। প্রেম-পদাবলীর ভিতর তাঁহার নূতন বংশীশিক্ষা; কিন্তু ইহার আভাস তিনি চণ্ডীদাসে পাইয়াছিলেন। সখ্যারসের চিত্রাবলী তাঁহার নিজস্ব। চৈতন্ত-পূর্ব্ববর্তী বৈষ্ণব-কবিগণ মধুর রস ভিন্ন অন্তরঙ্গের সাধনা করেন নাই। মহাপ্রভু প্রথমে সকল রসের সাধনার আদর্শ বৈষ্ণব-গণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। সেই সুশিক্ষার ফলে বৈষ্ণব-কবিগণ সখ্য-বাৎসল্যাঙ্গী রসের মাধুর্য্যও অনুভব করিয়া তত্ত্ব রস বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মধুর রস সকল রসের শ্রেষ্ঠ; কারণ, ইহাতে অন্তান্ত সকল রসের অস্তিত্ব আছে এবং ইহাতে যেমন আত্মসমর্পণের ভাব আছে, তেমন আর কোনও রসে থাকিতে পারে না, বাৎসল্যও নয়। তাই বৈষ্ণব-কবি মধুর রসের সাধনায় উৎসাহী ও কৃতী। কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানদাসের সখ্যারসের চিত্রাবলী নিতান্ত অবহেলার বস্তু নহে। ইহাদের রসবত্তা স্বতঃস্ফূর্ত, নির্মল ও হৃদয়গ্রাহী। সখ্যার কাছে সখ্যার আবদার, সখ্যার উপর সখ্যার জোর বড় উপাদেয় ভাবে এই পদ-গুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের গোপালগণের সখ্য নিরাবিল সখ্য; ইহাতে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান-জনিত সঙ্কোচ নাই, খোসামুদি নাই, কেবল আছে প্রাণঢালা ভালবাসা।

* দীনেশ বাবু—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

† রবিবাবু—গ্রাম্য সাহিত্য।

‡ রবিবাবু—গ্রাম্য সাহিত্য।

এইজন্ত বৃন্দাবনবাসীদের কৃষ্ণ রতিকে বৈষ্ণব-
শাস্ত্রে “কেবলা রতি” বলে। এই গোপ-
বালকদের হৃদয়ে এমন ভাব পাই যে, আমরা
একজন মহামহিমামিতি ব্যক্তির সহিত সখ্যাত্রে
আবদ্ধ, অতএব আমরা খুব মস্ত লোক ;
তাহারা জানে, গোপাল তাহাদের সাথী,
তাহাদের সখা ; এতদ্ব্যতিরিক্ত আর তাহারা
কিছু জানে না, জানিতে চাহে না। তাই
ইহাদের কত জোর—

গোপাল যাবে কি না যাবে আজি গোষ্ঠে।

এক বোল বলিলে আমরা চলিয়া যাই
গোধন চলিয়া গেল মাঠে ॥

কিন্তু ইহাদের প্রাণে স্নেহ অগাধ ; ইহারা
রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার ভয় দেখায়, কিন্তু
পারে না। কানাই না হইলে, তাহারা খেলিয়া
সুখ পায় না, প্রাণে আনন্দ পায় না—

একেলা মন্দির মাঝে, আহ তুমি কোন কাজে
এ তোমার কোন্ ঠাকুরাণ ।

যদি বা এড়িয়া যাই অন্তরেতে ব্যথা পাই
যাইতে কেমনে প্রাণ ধরি ।

না জানি কি গুণ জান সদাই অন্তরে টান
তিল আধ না দেখিলে মরি ।

এমন সখা পাইয়া গোপালেরও আনন্দের সীমা
থাকে না ; তাহাদের সহিত মিশিয়া, তাহাদের
মত হইয়া, তাহাদের সখ্যাসাম্বাদ পরিতৃপ্ত
করিয়া, গোপালের হৃদয় স্থখে উছলিয়া উঠে।

গিরিধর লাল গিরিপথ খেলল
তরু হেলয়া পদ পঙ্কজ দোলনৌয়া ।

অতি বল সুবল মহাবল বালক
কাঞ্চে ছান্দ করে ভাঙ দোহনিয়া ॥

গিরিবর নিকট খেলত শ্রামসুন্দর
ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল ।

নৌতুন তৃণ হেরিয়া যমুনা তট
চঞ্চল ধায় গোপাল ॥

সখাগণ সঙ্গে সঙ্গে নন্দনন্দন
উপনীত যমুনাতীর ।

পাঁচনি বেত্র বাম কক্ষে দাঁবই
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর ॥

গোপালের এই বালক সখাগণ একান্ত তদগত-
প্রাণ; ইহারা তাহার কোনও কষ্ট সহিতে পারে
না, অল্প মাত্র অদর্শনে আকুল হইয়া উঠে ;
গোপাল তাহাদের কোমল হৃদয়ের একমাত্র
সম্বল, একমাত্র ভালবাসার অবলম্বন ।

হিয়ায় কটক দাগ, বয়ানে বন্ধন লাগ
মলিন হইয়াছে মুখশশী ।

আমা সভা তেয়াগিয়া কোন্ বনে ছিলা গিয়া
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি ॥

নবঘনশ্রাম তহু বামব হইয়াছে জহু
পাষণ বেজেছে রাজা পায় ।

বনে আসিবার কালে হাতে হাতে সঁপে দিলে
বরকে গেলে কি বলিব মায় ॥

খেলাব বলিয়া বনে আইলাম তোমার মনে
বসিয়া তরুর ছায় ।

বনে বনে উচাটিয়া তোর লাগি না পাইয়া
আমা সভা প্রাণ কাটি যায় ॥

জানদাস কছে বাণী শুন ভাই নীলমণি
এ কোন চরিত তোর বল ।

আমাদের ফেলে বনে যাও তুমি অস্ত্র স্থানে
তুমি আমাদের এক যে সম্বল ॥

বিমল উজ্জল সৌন্দর্য্যে গোপবালকগণের
হৃদয় পরিপূর্ণ ; ইহাদের সখ্যে খাদ নাই, ইহা
খাঁটি সোনা। “এই কি করিলাম, বুঝি
বাড়াবাড়ি হইল” এমন ভাব ইহাদের মনে
আসে না ; ইহারা খালি ভালবাসিতে জানে,

ভালবাসা দিতে জানে, আর কিছুই জানে না। মহাপুরুষ অর্জুনও কৃষ্ণকে সখা বলিয়া অপরোধইয়াছে বলিয়া নিজ অপরাধ ফালনের প্রয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু এই গোপশিশুরা অবিমিশ্র সখ্যারসে অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষ্ণের ঐর্ষ্যের প্রতি ক্রোধান্বিত করে নাই। ইহাকেই বলে “কেবলা রতি” এবং তাহা বৃন্দাবনেষ্ট সম্ভব হইয়াছিল। যশোদার বাৎসল্যেও এইরূপ নির্মল ও পবিত্র স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়; তাহার ভিতরও কোনও প্রকার সঙ্কোচের বাধা-বিঘ্ন নাই। যশোমতী গোপালকে কেবল স্নেহ দিতে চান—সেই স্নেহরসে তাঁহার গোপালকে আশ্রিত করিয়াই তিনি তৃপ্ত। ইহাতে কেবল বাৎসল্য-রতি। এইরূপ অবিমিশ্র ভালবাসা ভগবানকে উল্লসিত করিতে পারে, বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাস তাহাই বুঝাইয়াছেন। তিনি আনন্দময় ভক্তিময় হৃদয়ের মধুর আবেগে এই সকল বিভিন্ন রসের চিত্র আঁকিয়া ভক্তের হৃদয়ে

আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিয়াছেন—বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে ভাবোৎসর্গ করিয়া—বহুফল-শালী করিয়া, আমাদেরকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের পদাবলী ভাব-সর্বস্ব ভাবের সার মাত্র নহে; ইহারা প্রেম-পুলকিতচিত্ত ভক্তের ভগবৎপদে সচন্দন-তুলসীস্বরূপ, অশ্রুসিক্ত-নির্ম্মালা-স্বরূপ, স্নিগ্ধ ও কোমল, সরল ও পবিত্র। “যিনি” যে ভাবেই ইহাদের গ্রহণ করুন, ইহারা কাহাকেও বঞ্চিত করিবে না; ভক্ত ইহাদিগের কাছ হইতে ভক্তি শিক্ষা লটবেন, রসিক ইহাদিগকে রসের আকর বলিয়া গ্রহণ করিবেন, ভাবুক ইহাদিগকে ভাবপরিপোষক বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ জ্ঞানদাসের পদাবলী নির্দোষ না হইলেও, বহুগুণসম্পন্ন; সে বিষয়ে নিতান্ত পরীবাণপ্রিয় সমালোচক ভিন্ন আর সকলেই স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

লৌকিক অংশ গাথামূলক

এক্ষেণে বিচার্য্য যে, উক্ত বংশাবলী প্রামাণিক কি না। ইহাতে কোন অলৌকিকতা নাই। ইহাও যে গাথামূলক এবং কবির স্বকপোল-কল্পিত নহে, তাহা ২৫ অধ্যায় পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তংহু ও দুহুস্তের ও শান্তহু উপাখ্যানে প্রাচীন গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে। তংহু উপাখ্যানে যে অলৌকিক ব্যাপার অর্থাৎ সরস্বতীর তংহুকে পতিত্ব বরণ, তাহা বিশ্বাস না করিলেও, এইরূপ ভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় যে, সরস্বতী-তীরে ষাণ্মাষিক-বজ্রফলে তংহু সরস্বতীর বরে

সরস্বতীর অংশভূতা সরস্বতী নারী কোন পত্নী লাভ করেন। মহাভারতে দুহুস্তোপাখ্যানে দুর্কাসা নাই। তাঁহার অভিসম্পাতবশতঃ দুহুস্তের স্মৃতিলোপ ও অদুরীক দর্শনে পুনঃ-স্মৃতির কথাও নাই। ইন্দের সাহায্য জ্ঞাত দুহুস্তের স্বর্গে গমনও মহাভারতে বর্ণিত হয় নাই। কালিদাস ঐ সমস্ত অলৌকিকতা কতক পদ্মপুরাণ ও কতক স্বীয় কল্পনা হইতে পাইয়াছেন। মহাভারতে অলৌকিকতার মধ্যে এই মাত্র আছে যে, যখন দুহুস্ত শকুন্তলাকে পরিণীতা জানিয়াও, লোকসজ্জার ভয়ে স্বীকার করেন নাই, তখন দৈববাণী হয়—

‘মাতা ভগ্না পিতৃঃ পুত্রো যেন জাত স এব সঃ ।
ভরস পুত্রং ছয়ন্ত ! মাংসংস্থ শকুন্তলাম ॥
রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ ।
বক্ষান্ত ধাতা গর্ভস্ত সত্যমাহঃ শকুন্তলা ॥
মাতা ভগ্না বা চর্মপুটক স্বরূপ । পুত্র
পিতারই সম্পত্তি । বাহার ঔরসে যার জন্ম,
সেই তাহার । হে ছয়ন্ত ! পুত্রকে ভরণ
কর, শকুন্তলাকে অবমাননা করিও না । হে
নরদেব ! রেতসোৎপন্ন পুত্র যমগৃহ হইতে
(পিতৃগণকে) উদ্ধার করে, তুমিই এই
গর্ভের ধাতা । শকুন্তলা সত্যই বলিয়াছেন ।

ঐ দৈববাণীর পর ছয়ন্ত সভাসদগণকে
বলিলেন যে, দেবগণ যাহা বলিলেন, আপনারা
তুলিলেন ত ? শকুন্তলা যথার্থই আমার পত্নী,
ভরত আমার বীজোৎপন্ন । এক্ষণে আপনারা
অনুমোদন করিলে, আমি শকুন্তলাকে লইতে
পারি । তাঁহারা একবাক্যে অনুমোদন করায়
ছয়ন্ত পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করিলেন । এই
অধ্যানে ছয়ন্ত রামচন্দ্রের স্থায় যে প্রজারঞ্জন,
তাহা বুঝায় । যদি আকাশবাণীতে বিশ্বাস না
ধাকে, তাহা হইলে রাজা যে প্রজাগণের অনু-
মোদন লইয়া গোপনে বিবাহিতা পত্নীকে গ্রহণ
করেন, ইহাই দৈববাণীর ব্যাখ্যা করিতে
পারেন । স্মতরাং অলৌকিকতা প্রযুক্ত ঐ
বংশাবলী অবিখ্যাস-যোগ্য হইতে পারে না ।

ঐ বংশাবলী প্রকিঞ্চ কি না ?

কিন্তু ঐ বংশাবলী গ্রহণে দুইটি আপত্তি
হইতে পারে । একটি এই যে, ঐ বংশাবলী
মহাভারতের বঙ্গীয় সংস্করণগুলিতেই দেখা
যায়, কিন্তু দাক্ষিণাত্য পুস্তিকাবলধনে কৃত
নির্ণয়-সাগর প্রেসের সংস্করণে নাই । বঙ্গীয়
সংস্করণগুলির ৯৫ অধ্যায়ই বোম্বাইএর সংস্করণে

নাই । স্মতরাং উহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি কোন বঙ্গীয়
মহারথের স্বেচ্ছায় রচনা ও পরে প্রকৃষ্ট, ইহা
বোধ হয় কোন মহাত্মা বলিবেন । তহুত্তরে
বক্তব্য এই যে, বোম্বাই সংস্করণের পাঠ
সমীচিন নহে । জনমেজয় স্বীয় বংশের আমূল
পরিচয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা
ঐ সংস্করণেই প্রকাশ । যযাতির উপাখ্যান
সমাপ্ত হইলে উক্ত পুস্তকে জনমেজয়ের মুখে
এই দুই শ্লোক দেওয়া আছে—

পুত্রং যযাতেঃ প্রজ্ঞাহি পুরুঃ ধর্মভূতাং বরম্ ।
আনুপূর্ব্বোণ যে চাত্তে পুরোর্ব্বংশবিন্দনাঃ ॥
বিস্তরেণ পুনর্জাহি দৌমন্তেজ্ঞনমেজয়াং ।
সংবভূব যথা রাজা ভরতো দ্বিজসন্তম ॥

যযাতির পুত্র ধার্মিকগণের অগ্রগণ্য পুরুষ
বিষয় ও অপর যে সকল পুরুষ বংশধর জন্মেন,
তাঁহাদের বিষয় বিশদরূপে বলুন । আরও
হে দ্বিজবর ! ছয়ন্ত হইতে রাজা ভরত যেরূপে
জন্মলাভ করেন, তাহাও সবিস্তর বলুন ।

এই প্রশ্নের উত্তরে পুরু হইতে জনমেজয়
পর্যন্ত অথও বংশধারাই দেওয়া উচিত ।
কিন্তু বোম্বাই সংস্করণে যে বংশাবলী আছে,
তাহা খণ্ডিত । উহাতে কেবল প্রসিদ্ধ পুরুষ-
গণেরই উল্লেখ হইয়াছে । স্মতরাং বঙ্গীয়
সংস্করণে যে অগ্রে ৯৪ অধ্যায়ে প্রথিত বংশধর-
গণের উল্লেখ করিয়া, ৯৫ অধ্যায়ে অথও
বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত ।

মহাভারতের সহিত পুরাণের বিসম্বাদ ও সামঞ্জস্য

মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ের
বংশাবলী স্বীকারে দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে
পারে যে, ঐ সম্বন্ধে মহাভারতের সহিত
পুরাণের বিসম্বাদ দৃষ্ট হয় । সেই বিসম্বাদ
দেখাইবার জন্য উক্ত বংশাবলীই দেওয়া গেল ।

মহাভারতের বংশাবলী । বিষ্ণুপুরাণের বংশাবলী ।

- | | |
|----------------|----------------|
| ১। পুরু | ১। পুরু |
| ২। জনমেজয় | ২। জনমেজয় |
| ৩। প্রাচিৎসান্ | ৩। প্রাচিৎসান্ |
| ৪। সংঘাতি | ৪। অরী |
| ৫। অহংঘাতি | ৫। মনহা |
| ৬। সার্কভৌম | ৬। অভয় |
| ৭। জয়দেন | ৭। সুহ্ম |
| ৮। অবাচীন | ৮। বহগধ |
| ৯। অরিহ | ৯। সংঘাতি |
| ১০। মহাভৌম | ১০। অহংঘাতি |
| ১১। অযুতনারী | ১১। রৌদ্রাধ |
| ১২। অক্রোধন | ১২। ঋক্ষ |
| ১৩। দেবতিথি | ১৩। রত্ননার |
| ১৪। অরিহ | ১৪। তংহ |
| ১৫। ঋক্ষ | ১৫। ইন্দ্র |
| ১৬। মতিনার | ১৬। দুহ্য |
| ১৭। তংহ | ১৭। ভরত |
| ১৮। ইন্দ্র | ১৮। বিতথ |
| ১৯। দুহ্য | ১৯। ভবন |
| ২০। ভরত | ২০। প্রহংক |
| ২১। ভূমহু | ২১। সুহোত্র |
| ২২। সুহোত্র | ২২। হস্তী |
| ২৩। হস্তী | ২৩। অজমীঢ |
| ২৪। বিকুঠন | ২৪। ঋক্ষ |
| ২৫। অজমীঢ | ২৫। সংবরণ |
| ২৬। ঋক্ষ | ২৬। কুরু |
| ২৭। সংবরণ | ২৭। অকু |
| ২৮। কুরু | ২৮। সুবথ |
| ২৯। বিদুরথ | ২৯। বিদুরথ |
| ৩০। অনধা | ৩০। সার্কভৌম |
| ৩১। পরীক্ষিৎ | ৩১। জয়দেন |
| ৩২। ভীমসেন | ৩২। আরাধী |
| ৩৩। অতিশ্রবাঃ | ৩৩। অযুতায়ু |
| ৩৪। প্রতীপ | ৩৪। অক্রোধন |
| ৩৫। শান্তনু | ৩৫। দেবতিথি |
| | ৩৬। ঋক্ষ |
| | ৩৭। ভীমসেন |
| | ৩৮। দ্রুপ |
| | ৩৯। প্রতীপ |
| | ৪০। শান্তনু |

বিষ্ণুপুরাণের উপরোক্ত বংশাবলী সকল
পুরাণেরই সম্মত। প্রভেদ এই পর্য্যন্ত দেখা

যায় যে, কচিং কোন কোন পুরুষ দৃষ্টে
এক নামের পরিবর্তে অন্য নাম আছে।
যথা আরাবীর পরিবর্তে আরাধি—

পুরাণের বংশাবলী-মতে পুরু হইতে
কুরু পর্য্যন্ত ২৬ পুরুষ, কিন্তু মহাভারতের
বংশাবলী মতে ২৮ পুরুষ। পুরাণ-মতে
কুরু হইতে শান্তনু পর্য্যন্ত ১৫ পুরুষ, মহা-
ভারত মতে ৮ পুরুষ। সুতরাং কুরুর অধস্তন
পুরুষে যতদূর উভয়ের মধ্যে অনৈক্য, ততদূর
উদ্ধতন পুরুষে নাই। এই অংশেই উভয়ের
মধ্যে নিশ্চয় একটাতে ভ্রম আছে, বলিতে
হইবে। মহাভারতে কে কোন বংশীয়কে বিবাহ
করিয়া কি পুত্র উৎপাদন করেন, ইহা বিশদ-
ভাবে লিখিত আছে। পুরাণে তাহা নাই।
সুতরাং পুরাণেই লিপিকর-প্রমাদ থাকা
সম্ভব। পুরাণের অংশে যে লিপিকর-প্রমাদ
আছে, তাহা পুরাণ হইতে দেখা যায়। পুরাণ-
মতে জরাসন্ধ কুরুর পুত্র সুহ্ম বা সুধবর
বংশে এবং যুধিষ্ঠির কুরুর পুত্র জহ্মুর বংশে
জাত। জরাসন্ধ ও যুধিষ্ঠির যে সমসাময়িক,
তাহা পুরাণ এবং মহাভারত উভয়েই স্বীকার
করেন। উভয়ের মতেই জরাসন্ধ ভীম
কর্তৃক হত হন এবং জরাসন্ধপুত্র সহদেব
ভারতবর্ষে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করেন ও নিহত
হন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুযায়ী পাদে স্পষ্ট
লিখিত হইয়াছে।

“সংগ্রামে ভারতে তস্মিন্ সহদেবো

নিপাতিতঃ ॥”

সেই ভারত-সংগ্রামে (জরাসন্ধি) সহদেব
নিহত হন। পুরাণে জরাসন্ধকে কুরু হইতে
অষ্টম পুরুষ বলা হইয়াছে। যথা—কুরুর
পুত্র সুহ্ম বা সুধবা, তৎপুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র

চাবন, তৎপুত্র কৃতক, তৎপুত্র উপরিচর বহু, তৎপুত্র বৃহস্পতি ও তৎপুত্র জরাসন্ধ। এক্ষণে বিচার করুন যে, কুরু হইতে জরাসন্ধ যদি অষ্টম পুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার সম-সাময়িক বৃদ্ধিষ্টির কুরু হইতে অষ্টাদশ পুরুষ হইতে পাবেন কি না। সাত পুরুষের মধ্যে জ্যোষ্ঠের ধারা হইতে কনিষ্ঠের ধারা কখনই এত বৃদ্ধি পাইতে পারে না যে ১০ পুরুষের পার্থক্য হইয়া পড়ে। মহাভারতের বংশাবলী-মতে কুরু হইতে বৃদ্ধিষ্টির একাদশ পুরুষ। জ্যোষ্ঠ ভ্রাতার অধস্তন অষ্টম পুরুষ কনিষ্ঠ ভ্রাতার একাদশ পুরুষের সমসাময়িক হইতে পারে। সুতরাং কুরুর অধস্তন বংশ সম্বন্ধে পুরাণের পরিচয়ে যে ভ্রান্তি আছে, ইহা পুরাণমতেই স্থির। অত্র দিক্ হইতেও দেখিতে গেলে, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য। উপরিচরবহুর রত ভক্ষণে মৎস্তগর্ভে সত্যবতীর জন্ম। সেই সত্যবতীর কানীন পুত্র বেদব্যাস। ঐ সত্যবতী পরে শান্তনুর বৃদ্ধাবস্থার ভাৰ্য্যা হন। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য তাঁহার পুত্র। সুতরাং উপরিচর শান্তনুর পিতা প্রতীপের সমসাময়িক হন। মহাভারতের বংশাবলী স্বীকার করিলে তাহাই ঘটে; কারণ, কুরু হইতে প্রতীপ সপ্তম পুরুষ এবং পুরাণ-মতে কুরু হইতে উপরিচরবহু ষষ্ঠ পুরুষ। সুতরাং পুরাণে যে কুরু হইতে শান্তনু পর্য্যন্ত পঞ্চদশ পুরুষ ধরা হইয়াছে, তন্মধ্যে সপ্ত পুরুষ নিশ্চয়ই অধিক ধরা হইয়াছে। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সার্ক-ভৌম হইতে ঋক্ষ পর্য্যন্ত সপ্ত পুরুষ লিপিকরের দোষে কুরুর অধস্তন হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ সপ্ত পুরুষই কুরুর উর্দ্ধতন হইবেন। কিন্তু

কুরু হইতে মতিনার, পর্য্যন্ত উহাদের স্থান নাট, কারণ, ঐ অংশে মহাভারতে ও পুরাণে কেবল বৃহৎক্ষেত্র ও বিতথ এই দুই পুরুষ ভিন্ন কোনও বিসম্বাদ নাই। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মতিনারের পূর্বে ঐ সপ্ত পুরুষ যাইবেন। মহাভারতে তাই দেখা যায় যে, অহংঘাতির পুত্র সার্কভৌম ও পৌত্র জয়সেন। অতএব পুরাণের সার্কভৌম ও জয়সেনকে পুরাণের অহংঘাতির পরবর্ত্তী বলা যুক্তিযুক্ত। পুরাণের অযুতায়ু, অক্রোধন ও দেবাত্তিথি যে মহাভারতের অযুতনারী, অক্রোধন ও দেবাত্তিথি, এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। পুরাণের বংশাবলীতে উহাদের স্থান জয়সেনের পরই হওয়া উচিত। পুরাণের আরাবী বা আরাদি মহাভারতে অক্রোধসেনের পৌত্র অরিহ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পুরাণের ৩৬ নং ঋক্ষ যদি অবাতীন বা মহাভৌমের মধ্যে কেহ হন, তাহা হইলে সংঘাত হইতে দেবাত্তিথি পর্য্যন্ত মহাভারতের ও পুরাণের বংশাবলী মিল হয়। পুরাণের রস্তিনারই মহাভারতের মতিনার, এ বিষয় সন্দেহ নাই। রস্তিনারের পিতা ঋক্ষেয়ুই যে মতিনারের পিতা ঋক্ষ, ইহাও ঠিক। ঋক্ষেয়ুর পিতা রৌদ্রাখই মহাভারতের মতিনারের পিতামহ অরিহ। ২৪ অধ্যায়ে রৌদ্রাখের নাম আছে, এই অধ্যায়েই ঐ ব্যক্তিরই, অপর নাম অরিহ দেওয়া হইয়াছে। পূর্বকালে এক নৃপতির দুই তিনটি ক্রিয় নাম পুরাণ ও ভাষ্যশাসনাদি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে দেখুন যে, সংঘাত হইতে শান্তনু পর্য্যন্ত মহাভারতে বাকি রহিল অবাতীন, মহাভৌম, বিকূর্ণন,

অনখা ও পরীক্ষিত পাঁচজন ; পুরাণেও বাকি
 রছিল পাঁচজন বিতথ, বৃহৎক্ষেত্র, অক্ষু. সুরথ
 ও ঋক্ষ। মোট সংঘাতি হইতে শাস্ত্র পৰ্য্যন্ত
 মহাভারতে ৩১ পুরুষ, পুরাণেও ৩১ পুরুষ।
 স্মতরাং পুরাণের অবশিষ্ট ৫ জনকে মহা-
 ভারতের অবশিষ্ট ৫ জন স্বীকার করিতেই
 হইবে। তাহা হইলে সংঘাতি হইতে শাস্ত্র
 পৰ্য্যন্ত কোন বিসম্বাদই রছিল না। সংঘাতির
 উদ্ধতন পুরুষে যে পুরাণের সহিত বিরোধ,
 তাহাও লিপিকর প্রমাদ-ঘটিত বটে। পুরু,
 জনমেজয় ও প্রাচীবান্ মহাভারতে এবং
 পুরাণে আছে। পুরাণে প্রবীর, মনস্মা,
 অত্মদ, সূতায় ও বহুগব এই ৫ পুরুষ অধিক
 আছে, মহাভারতের আদিপর্কের ১৫ অধ্যায়ের
 বংশাবলীতে তাঁহাদের নাম নাই। কিন্তু পূর্ব-
 অধ্যায়ে মহাভারতে প্রবীর, মনস্মা, ও তৎপুত্র
 অম্বগ্ভানু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। সূতায়ের
 উল্লেখ শাস্ত্রপর্কে পাওয়া যায়। স্মতরাং ১৫
 অধ্যায়ে লিপিকরের প্রমাদবশতই উহাদের
 সম্বন্ধে যে পাঁচটা বাক্য ছিল, তাহা পড়িয়া
 গিয়াছে বলিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত যে
 সম্ভব, তাহার নিদর্শন মহাভারতের ১৫
 অধ্যায়েই আছে। ঐ অধ্যায়ে লিখিত আছে
 যে, অহংঘাতি কৃতবীৰ্য্যের কন্যা ভানুমতীকে
 বিবাহ করেন। পুরাণে দেখিতে পাই,
 কৃতবীৰ্য্য যুধিষ্ঠিরের দ্বাদশ পুরুষ ; যথা—
 ১। যুধি, ২। সহস্রজিৎ, ৩। শতজিৎ, ৪।
 হৈহয়, ৫। ধর্ম্মনজ, ৬। কুন্তি, ৭। সাহজি,
 ৮। মহিষ্মান, ৯। ভদ্রশ্রেণ্য, ১০। হৃদম,
 ১১। ধনক ও ১২। কৃতবীৰ্য্য। পুরাণের এই
 বংশাবলী মহাভারতে ধারাবাহিক না থাকিলেও,
 হৈহয়গণের উল্লেখ আছে। কৃতবীৰ্য্য যে

হৈহয়ের বংশধর, তাহা বহু স্থলে বলা হইয়াছে।
 মাহিষ্মতী যে কৃতবীৰ্য্যার্জুনের রাজধানী,
 তাহাও দেখা যায়। ঐ মাহিষ্মতী যে মহিষ্মান
 নৃপের নামে ইহাও বুঝা যায়। স্মতরাং
 পুরাণে কৃতবীৰ্য্যের বংশাবলী মহাভারতের
 স্বীকৃত বলিতে পারা যায়। মহাভারতের ১৫
 অধ্যায়ের বংশাবলী-মতে অহংঘাতি যুধিষ্ঠিরের
 পুরু হইতে পঞ্চম পুরুষ হন। তিনি কখন যুধি
 ষ্টিরের দ্বাদশ অধস্তন পুরুষের কন্যাকে বিবাহ করিতে
 পারেন না। প্রবীর, মনস্মা প্রভৃতি পঞ্চম
 পুরুষ অহংঘাতির উদ্ধতন হইলে, অহংঘাতি
 পুরুষ দশম পুরুষ হন এবং যুধিষ্ঠিরের দ্বাদশ অধস্তন
 পুরুষের কন্যার স্বামী হইতে পারেন। স্মতরাং
 মহাভারতে ও পুরাণে বিরোধ—বিরোধভাস
 মাত্র, যথার্থ বিরোধ নহে।

মহাভারতের বংশাবলীর প্রামাণিকতা

মহাভারতের বংশাবলী যে প্রামাণিক, তাহা
 চালুক্যবংশোদ্ভূত রাজরাজা পরনামা শ্রীবিষ্ণু-
 বধন মহীপতির দানপত্র ও উক্ত রাজরাজের
 অন্তঃস্থ চালুক্যবীর চোড় মহীপতির দানপত্র
 প্রভৃতি তাম্রশাসন হইতে প্রকাশ পায়।
 প্রথম দানপত্র Indian Antiquaryর
 ১৪ ভাগে ৫০—৫৫ পৃষ্ঠায় আছে, রাজরাজ
 ৯৪৪ শকে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন ও ভরদ্বাজ
 গোত্রসম্বৃত চোড়মার্ককে চন্দ্রগ্রহণে ঐ দানপত্র
 দ্বারা কোরুমেল্লি নামক গ্রাম দান করেন।
 দ্বিতীয় দানপত্র খানি South Indian
 Inscriptionএর ১ম ভাগে ৫৩—৫৭ পৃষ্ঠায়
 মুদ্রিত। ঐখানির কাল ১০০১ শক। ঐ
 দুইখানিতে চালুক্যবংশ চন্দ্র হইতে উৎপন্ন
 বলা আছে এবং ব্রহ্মা হইতে শাস্ত্র পৰ্য্যন্ত
 নিম্নলিখিত বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে—

ব্রহ্মা	দেবকি
অত্রি	ঋতুক
সোম	ঋক্ষক
বৃধ	মতিবর
পুরুষবা	কাত্যায়ন
আয়ু	নীল
নহষ	হয়ন্ত
যযাতি	ভরত
পুরু	ভুমত্যা
জনমেজয়	হস্তী
প্রাচীন	বিরোচন
সৈন্তযাতি	অজমীঢ়
হয়পতি	সংবরণ
সার্কভোম	সুধরা
জনমেজয়	পরীক্ষিৎ
মহাভোম	ভীমসেন
ঐশানক	প্রদীপন
ক্রোধানন	শান্তনু

এই বংশাবলী যে মহাভারতের বংশাবলী
অবলম্বনে লিখিত, তাহাষে কোন সংশ
হইতে পারে না। প্রাচীনই প্রাচীন,

সৈন্তযাতিই সংযাতি, হয়পতিই অহংযাতি,
সার্কভোমসুত জনমেজয়ই জয়সেন। তাত্ৰ-
শাসনে জয়সেনের পর অবাচীন ও অরিহ
এই দুই পুরুষ ছাড়িয়া মহাভোমের নাম
দেওয়া হইয়াছে। ঐশানকই যে অযুতনায়ী,
দেবকিই দেবাতিথি, ঋতুকই অরিহ, মতি-
বরই মতিনার, কাত্যায়নই ঈলিন, ইহা
স্পষ্ট বুঝা যায়। ভুমত্যা পর সুহোত্রকে
ছাড়িয়া তাত্ৰশাসনে হস্তীর নাম উল্লেখ করিয়া
বিকৃষ্টনের নামান্তর বিরোচন দেওয়া
হইয়াছে। পরে তাত্ৰশাসন-লেখক কুক ও
বিদুরথকে ছাড়িয়া সুধরার নাম দিয়াছেন।
এইরূপ মধ্যে মধ্যে যে দুই এক পুরুষ ছাড়িয়া
দেওয়া হইয়াছে, তাহা জানাইবার জন্যই
লেখক দানপত্রদ্বয়ে অমকের পুত্র অমুক না
বলিয়া অমকের পর অমুক বলিয়াছেন। দান-
পত্রের বংশাবলী হইতে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা
যায় যে, মহাভারতের বংশাবলী আধুনিক
কোন বঙ্গীয় পণ্ডিত আমাদিগের চক্ষে ধূলি
দিবার জন্য প্রস্তুত করেন নাই; উহা সহস্র
বৎসর পূর্বেও দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রবংশ বলিয়া
খ্যাত চালুক্যবংশীয়গণের মধ্যে প্রচলিত
ছিল। এ কারণ এই পূর্ণাঙ্গ বলা যাইতে
পারে যে, গাথা ও লেখা রক্ষিত প্রাচীন
লৌকিক্যগণের ইতিবৃত্ত অবিখ্যাস করা
তঃসাহসমাত্র। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী।

সালিশ-নিষ্পত্তি

পবন মুখুয্যের খিড়কীরাস্তার ধার এবং মধু মোড়লের পুকুরের পাড়, এই দো-সৌমানার উপর একটা আমগাছ লইয়া আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া বিবাদ চলিতেছে। লোকে বলে, গাছটার মূল্যের বিশ গুণেরও অধিক টাকা এ বিবাদে ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

যে বারে প্রথম এ গাছে আম পাকিল— পবন মুখুয্যে তার কৃষাণ লইয়া আম পাড়িতে গেল। গোটাকতক আম পাড়ার পর মধু মোড়ল খবর পাইয়া লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিল এবং অভিধানবহিভূত ভাষায় ব্রাহ্মণের কৃষাণকে নামাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ তখন অনন্তোপায় হইয়া তাহাকে ভীষণ অভি-সম্পাত দিতে আরম্ভ করিল এবং উপবীত ছিঁড়িবার ভয় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু অভিলাপের মাত্রা যখন ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল, মধু মোড়ল তখন ব্রহ্মশাপের জ্ঞাত কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া তাহার সুদীর্ঘ বংশদণ্ড আন্দোলিত করিয়া যাহা বলিল, তাহাতে ব্রাহ্মণতনয় সেখানে আর অধিকক্ষণ থাকা সদযুক্তি মনে করিল না। মুক্তকণ্ঠে পবন মুখুয্যে পবনবেগে একেবারে জমী-দারের কাছারীতে গোমস্তার নিকট উপস্থিত হইল।

গোমস্তা হলধর রায় ওরফে হল্য নাপিত তখন ভামাক টানিতে টানিতে জমা-ওরানীল-বাকীর কাগজ লিখিতেছিল; এবং মধ্যে মধ্যে অন্তমনস্ক হইয়া উপরি-পাণ্ডার উপায় ভাবিতেছিল। এমন সময় পবন মুখুয্যেকে

এ ভাবে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া ভবিষ্যৎ আয়ের গন্ধ পাইয়া সে পুনরিত হইয়া উঠিল, এবং সমস্তম্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া—“দাদাঠাকুর, পেন্নাম হই” বলিয়া আভূমিগ্রণত হইল।

হল্য নাপিত অনেক মোকদ্দমা মারিয়া তবে চিকিৎসক হইয়াছে। যেদিন পাঠশালা ছাড়িয়া জমীদারের নক্শে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া পুরস্কারস্বরূপ সে জমাসেরেস্তার মোহরের পদ পাইল, সেইদিন হইতে তাহার কপাল ফিরিয়াছে। ক্রমে জাতিহীনত চতুরতার গুণে সে আজ তিনখানা গাঁয়ের গোমস্তা—কেহ কেহ তাহাকে ‘নায়েব ম’শার’ বলিয়া থাকে। হল্য নাপিত আজ হলধর রায় এবং সে দেশের সমস্ত মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শ-দাতা এবং তদ্বিরকারক।

পবন মুখুয্যে বহুকণ্ঠে খাসকষ্ট শাস্ত করিয়া যখন সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিল, তখন হলধর বলিল—“তার আর ভয় কি, দাদাঠাকুর? আমি এখনি এর ব্যবস্থা করছি। দশ টাকা খরচ হবে, তা বলে ত’ কেউ আর নিজের হুকু ছেড়ে দেয় না! দেখে নেবো কেমন বেটা চাষা!” তার পর নানাবিধ শলা-পরামর্শ করিয়া কতকটা শাস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিল।

সন্ধ্যার পর মধু মোড়লও গোমস্তা মহা-শয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যথোপযুক্ত উপ-দেশ পাইল। পরদিন পবন মুখুয্যে মহ-কুমার গিয়া, জোর করিয়া ফল কাড়িয়া লওয়া ও মারপিটের ভয় দেখান ইত্যাদি অজুহাতে

কৌজদারি কোর্টে দরখাস্ত পেশ করিল। মধু মোড়লের পক্ষ হইতেও একজন মোক্তার ফল চুরির জন্ত পবন মুখুয্যের নামে নালিশ দায়ের করিল। গোমস্তা হলধর রায়ও সেদিন 'দৈবক্রমে' মহকুমায় উপস্থিত—তার না কি মুন্সেফকোর্টে কি একটা কাজ ছিল।

এমনি করিয়া মোকদ্দমা বাধিল। পবন মুখুয্যে একে বৃদ্ধি, তাঁর কালা ; কাজেই একটু জেদী। তার উপর একটা চাষা তাকে এমনতর অপমান করিয়াছে ; এর প্রতীকার না করিতে পারিলে সে আর গ্রামে বাস করিবে কোন্ মুখে ? মধু মোড়ল চাষার গোঁয়ার, তার উপর ছ'পয়সার সংস্থান আছে ; — সে কি একটা মোকদ্দমা লাড়িতে ভয় পায় ? শরোঁপরি ক্ষোরকার-নন্দন উভয়েরই হিতা-কাজী পরামর্শদাতা। এহেন মণিকাঞ্চন-সংযোগে উভয় পক্ষের ফৌজদারী মোকদ্দমা বেশ জেদের সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

ডেপুটিবাবু উভয়পক্ষের মোক্তারের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না ; এবং কেহই বাহাতে শাস্তিভঙ্গ করিতে না পারে, সেজন্য উভয়পক্ষকে মূচ-লেকায় আবদ্ধ করিয়া দেওয়ানী আদালতে আপন আপন স্বস্ত্র সাব্যস্ত করিবার আদেশ দিলেন। এদিকে দারোগার উপর হুকুম হইল—যে পর্য্যন্ত না দেওয়ানী আদালতে স্বস্ত্রের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, ততদিন দারোগা গাছের ফল পাড়াইয়া নিজের হেফাজতে রাখে।

সে আজ পাঁচ বছরের কথা। কিন্তু কোন পক্ষই এ পর্য্যন্ত দেওয়ানীতে স্বস্ত্রের মোকদ্দমা রুজু করে নাই ; কেননা, যে নালিশ করিবে,

প্রমাণের ভার তার উপর। এদিকে দারোগা বাবু আদালতের হুকুম মত চৌকিদার দিয়া আম পাড়াইয়া বিশেষ হেফাজতে রাখিলেন—সেবারকার মত বিবাদ মিটিল। পর বৎসর আবার আম পাকিবার পূর্বে উভয় পক্ষের দরখাস্ত পড়িল। আবার পূর্বের মতই হুকুম হইল। এমনি করিয়া প্রতি বৎসরই মোকদ্দমা দায়ের হইবামাত্র শাস্তি-ভঙ্গভয়ে দারোগা বাবু গাছের আমগুলি পাড়াইয়া লইতেন—কেননা, স্বস্ত্র সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ত কাহাকেও তাহা দেওয়া যায় না। আর তিনি গভর্ণমেন্টের নিমক-হালাল কর্মচারী হইয়া কেমন করিয়া শাস্তি-ভঙ্গের প্রশ্রয় দিবেন ? ফলগুলি কাজেই তাঁহাকেই বাধ্য হইয়া সামলাইতে হইত। আম-পাড়া হইয়া গেলে উভয় পক্ষ শাস্ত্যভাব ধারণ করিত ; এবং বৎসরান্তে আবার যথা-সময়ে যথারীতি বিবাদ সুরু হইত। এমনি করিয়া পাঁচ বৎসর কাটিল। বিবাদীদের স্বস্ত্র স্থির হউক বা না হউক ক্রমে এ গাছের আমের উপর দারোগা বাবুর 'দখলীস্বস্ত্র' পাকা হইবার উপক্রম হইল।

শেষে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধৈর্য্য হারাইয়া দেওয়ানীতে নালিশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। গোমস্তার পরামর্শে দারোগা বাবুর নিঃস্বার্থ উপদেশ সব ভাসিয়া গেল। মুখুয্যে এবার কাহারও কথা না শুনিয়া মুন্সেফী আদালতের আশ্রয় লইল। এবার পাকা রকমের মোকদ্দমা চলিবার সূত্রপাত হইল।

বিবাদের হেতু ও বিবরণ শুনিয়া মুন্সেফ বাবু সালিশ-নিষ্পত্তির উপদেশ দিলেন। কিন্তু প্রথমে উভয় পক্ষকে রাজী করা শস্ত

হইল। অবশেষে মুন্সেফ বাবুর তাড়নায় এবং প্রতিবেশিগণের পরামর্শে উভয়ে তাহাতে স্বীকৃত হইল এবং আদালতের নির্বাচনে এক জন কমিশন নিযুক্ত হইলেন। হুকুম হইল—তিনি সরেজমিনে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবে, উভয় পক্ষ তাঁহার ফিস্ ও পাথেয়াদি বহন করিবে।

এই হুকুমের সপ্তাহ পরে একদিন পল্লী-বাসী বালক-বালিকা এবং বধুবুন্দের সবিশেষ কোতূহল উৎপাদন করিয়া উকীল বাবুর পাকী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। নিরপেক্ষ উকীল বাবুর বিবাদীদের কাহারও গৃহে থাকা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ, এবং গ্রামে এক পবন মুখ্যে ভিন্ন আর ব্রাহ্মণ নাই,—অগত্যা তিনি সকলের বিশেষ অনুরোধেই মুখ্যে মহাশয়ের গৃহে থাকাই স্থির করিলেন। দেখিতে দেখিতে পবন মুখ্যের চণ্ডীমণ্ডপ লোকে ভরিয়া গেল এবং গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে উকীল বাবুর চোগা চাপকান ও স্বর্ণচেনশোভিত বরবপু এবং শশিমাবিমণ্ডিত গম্ভীর মুখমণ্ডল নিঃসন্দেহ-নয়নে দেখিতে লাগিল।

এদিকে মধু মণ্ডল ছুটিয়া গোমস্তা মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত। উকীল বাবু পবন মুখ্যের গৃহে অধিষ্ঠান করায়, তাহার সব আশী ভরসা উড়িয়া গিয়াছে; তাই সে হলধরের নিকট কিংকর্তব্য স্থির করিতে আসিয়াছে। হলধর গম্ভীরভাবে বলিল—“এখন কিছু বলা যায় না। আমি বৈকালে দেখা করব; তার পর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা।” মধু মণ্ডল চিন্তিত হইয়া গৃহে ফিরিল।

পরদিন প্রাতে উকীল বাবু মহাধুমধামে গ্রামের মাতব্বরদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের সমক্ষে সরেজমিনে তদন্ত আরম্ভ করিলেন। রশি ধরিয়া নানাদিক্ হইতে মাপ হইতে লাগিল; উকীল বাবুর বিভাবুদ্ধি এবং সর্বোপরি তাঁর নিরপেক্ষতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া গেল। কিন্তু সেদিন কিছুই স্থির হইল না। কেননা, একবার মাপিয়া লাইন ফেলিতে গিয়া আম গাছটা এবং মুখ্যের বাড়ীর আধখানা মধু মণ্ডলের পুকুরের সামিল হইল; দ্বিতীয় বারে সেটা এবং তৎসঙ্গে আরও ছ পঁচটা গাছ, বাঁহা মধু চিরকাল নির্বিবাদে ভোগ করিতেছে, সে গুলিও পবন মুখ্যের জমীর মধ্যে পড়িল। কাজেই সেদিনকার মত কাজ বন্ধ রহিল।

মধ্যস্থের অটল নিরপেক্ষ ভাব দেখিয়া গ্রামবাসীরা যেমন মুগ্ধ ও বিস্মিত হইল, বিবাদীরা তেমনি শঙ্কিত হইয়া উঠিল। গোমস্তা হলধরের পরামর্শে সেই রাত্রে আহারাদির পর পবন মুখ্যে মরিয়া হইয়া উকীল বাবুর নিকট একটা নীতিবিগর্হিত প্রস্তাব করিয়া বসিল। ফলে বাবুর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল; তিনি ভদ্রভাবে ব্রাহ্মণকে বিশেষ ভৎসনা করিলেন। বিপরীত ফলের ভয়ে ব্রাহ্মণ স্ত্রিমুগ্ধ হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় দিন আবার মাপ আরম্ভ হইল। সেদিনও কি একটা গোল বাধিয়া গেল—কিছুই স্থির হইল না। সন্ধ্যার সময় উকীল বাবুর প্রিয় ভৃত্য ফকির চাঁদ আসিয়া খবর দিল—উকীল বাবুর বিবাহের দক্ষণ ১০০ টাকা মূল্যের অঙ্গুরীয়টি আমতলায় হারাইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ২০। ২৫ জন

লোক খিড়কীর রাস্তা হইতে পুকুরের পাড় সর্বত্র খুঁজিতে লাগিয়া গেল। কিন্তু কোনোখানে সে হারানিধির দর্শন পাওয়া গেল না। সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং নানাপ্রকারে আন্তরিক দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল।

মধু মণ্ডলও এই আকস্মিক ঘটনায় চিন্তিত হইল। কিন্তু সে চিন্তা অল্প প্রকারের। কই, কাল বা আজ প্রাতে সে ত উকীল বাবুর হাতে এই বহুমূল্য আংটিটি দেখে নাই। সে তখন তাহার সচিবপ্রবর হলধরকে এই সন্দেহের কথা জানাইল। হলধর, ভাবিল,—কথাটা ত ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে তার উর্ধ্বর মস্তিষ্কে একটা অভিনব প্লানের উদয় হইল। প্রাতেই হলধর নিজের “বুদ্ধি” ও মধু মণ্ডলের “কড়ি” লইয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গেল। সেখানে না কি হাইকোর্টে জমীদার বাবুদের একটা মোকদ্দমার তদ্বির আবশ্যক। রওনা হইবার পূর্বে হলধর কমিশন বাবুর শ্রীচরণকমল হইতে বিদায় লওয়ার উপলক্ষে তাঁর শ্রীকরণলব পর্যবেক্ষণ করিতে ভুলিল না।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মধু মণ্ডলের রাখাল পুকুরের “গাবায়” উকীল বাবুর আংটিটি কুড়াইয়া পাইল এবং মধু মণ্ডল আসিয়া উকীল বাবুকে তাহা সমর্পণ করিল। উকীল বাবু তাহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া হারাগো আংটি হাতে পরিলেন।

তারপর সালিশের রিপোর্টে এবং মুন্সেফ বাবুর বিচারে আম গাছটি মধু মণ্ডলের সম্পত্তি বলিয়া সাব্যস্ত হইল। এতদিনের বিবাদের এইবার নিষ্পত্তি হইল দেখিয়া গ্রামের লোক সকলেই সুখী হইল। মোড়লদের দাওয়ায় এবং বারোয়ারীতলায় “কমিশন” বাবুর কথা লইয়া প্রায়ই আন্দোলন হইত, এবং গ্রামবৃদ্ধগণ তাঁহার নিরপেক্ষতার তারিফ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিত—“এমন না হ’লে আর জজের সালিশি ক’র্ত্তে পাঠায়!” মধু মোড়ল কিন্তু এ আলোচনায় যোগ দিত না; সে গস্তীরভাবে তামাক টানিতে টানিতে ভাবিত—“একটা আম গাছের জন্তে পাঁচ কুড়ি টাকা!”

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

বন্ধিমচন্দ্র

বন্ধিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধে (সাহিত্য, কাস্টিক, ১০১৮) বলিয়াছিলাম, “বন্ধিম বাবুর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া এখন এক-রূপ ঝকমারি হইয়া উঠিয়াছে”, সে ঝকমারি ত আছেই, তাহার উপর আমি এইবার ঝক-মারির মাসুল দিতে বসিলাম।

পূর্ব প্রবন্ধে এইটুকু দেখাইবার চেষ্টা

করিয়াছি, “কিন্তু এক সময়ে বাঙ্গালাগণের সায়ের সা সম্রাট হন, তিনি আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত সেই ঐশ্বর্যময় গণ্ডের আলোচনা করেন নাই, প্রত্যুত একান্ত অবহেলা করিয়া ছিলেন। * * * বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে তখন সাধারণে বাঙ্গালা কবিতাই বুঝিত। সে সাহিত্যে তাঁহার অবহেলা ত ছিলই না,

ওপের শিষ্য স্বীকারেই সে কথার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি তখন কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। আর ইংরাজি কবিতা, সেক্সপিয়র হইতে বায়রণ, তিনি বিশেষ করিয়া অনুশীলন করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া তিনি কবিতার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার শক্তি লাভ করেন। যাত্রা গান কীর্ত্তনের কথা এখন বলিব না।”

সেবার বলি নাই, এবার বলিব—বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন মহাপুরুষ ছিলেন। এমন ‘রাশভারি’ লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। অনেক দিন, তাঁহাকে একটি প্রণাম করা পর্য্যন্ত আমার তাঁহার সহিত আলাপের সীমা, তবে আলাপের দিন একাদশী হইলেই বড় গোলে পড়িতাম। সেইদিন, অতি বন্ধে, অতি আদরে, আমার উপর পুত্রাধিক স্নেহে, তিনি কাছে বসিয়া আমাকে ‘জগ’ খাওয়াইতেন। ‘এটি খাও,’ ‘ওটি খাও’ করিতেন, ফল-সন্দেশের স্বাহতা বর্ণন করিতেন। নিজে রস-গ্রাহী লোক ছিলেন, অতুল্য রসগ্রহণের পদ্ধতি-প্রকরণ দেখাইয়া দিতে আনন্দ বোধ করিতেন। একদিন ঐরূপ একাদশীতে আমি রসগোলা লইতে ইতস্তত করিতেছিলাম, তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, “এ কি তোমার ওপারের ফিরিজি-মলুকের রসগোলা পেয়েছ, যে, সূজীর বাগান দিবে?—এ পারে সে সকল হবার যো নাই, তুমি স্বহৃদে খাইতে পার।” এই যে ‘রাশভারি’ গোকের রহস্তে রসাস্বাদ—সেটি বড় অপূৰ্ণ পদার্থ। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রস-পরিগ্রহ না কি সকল বিষয়েই সমান

ছিল। কেবল খাইতে খাওয়াইতে নয়। তিনি সঙ্গীত-সাহিত্যের রস বিশেষ উপভোগ করিতে পারিতেন, এবং স্বয়ং বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া নিজ ভবনে সঙ্গীতাদির আয়োজন করিয়া আপামর সাধারণকে রস উপভোগের সুচারু সুবিধা দান করিতেন। অতি বালক-কাল হইতেই বঙ্কিম বাবু উৎকৃষ্ট যাত্রা গান, কবি, কীর্ত্তন, কথকতার রস উপভোগ করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। অনেকের অনুরূপে সেক্ষণ সুবিধা প্রায়ই ঘটয়া উঠে না।

আমাদের ওপারের রাস বাহাদুরদের বাড়ী ছিল যাত্রা-গান-মহোৎসবের মিলন-মন্দির। এতদঞ্চলের একরূপ টাউন হল। পালিপার্কিং ত ফাঁক্ যাবেই না, অল্প সময়েও উৎসব আছে। দুর্গোৎসবে, কৃষ্ণনগর শূণ্ণির উৎকৃষ্ট কুস্তকার শশী পাল ঠাকুর গড়িবে, উৎকৃষ্ট চিত্রকর চুঁচুড়ার মহেশ ও বীরচাঁদ সূত্রধর চিত্র করিবে। প্রতিমা সর্দার-স্বন্দর হইবে। জগমোহন স্বর্ণকারের চণ্ডীর গানে উচ্চ কণ্ঠে মা মা রবের মোহিনী শক্তি। অথবা নীলকমলের প্রসিদ্ধ রামায়ণ গান। যাত্রা অঙ্গে বদন অধিকারীর তুল্কো বা গোবিন্দ অধিকারীর ‘কালীদমন’ গান। দাশরথী রায়ের কথার ছটা-বটা * সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়ির সুরে তালে মাধামাধি গান; ফরাসডাঙ্গার জগৎমনমোহিনীর ঢপ্; বর্দ্ধমানের সহচরী ও বাহুগিরি কীর্ত্তন; মধুকানের গান; এইরূপ ছোট বড় মাঝারি

* দাশরথি সবকে বঙ্কিম বাবু আমার একদিন কথার কথার বলিয়াছিলেন;—“The fellow was master of the colloquial Bengalee.”

কতরূপ গান প্রায়ই হইত। এই ধরণীর কথকতা ক্রমাগত তিন মাস চলিয়াছে। এ সকলের আর কত পরিচয় দিব ? বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থসমূহ-মধ্যে কীর্তনের ও সহজ গানের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার সংগ্রহ ছিল বিস্তর, তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষার আর একরূপ উপ-করণ, তাঁহাদের ভবনে প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভজী ও তাঁহার নিত্য সেবা। এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। ‘বঙ্কিম জীবনী’ * হইতে সেই গল্পটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। “১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে একদা অপরাহ্নে জনৈক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সশিষ্য কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অতিথিশালা নাই, সন্ন্যাসী বাধা হইয়া ‘অর্জুন’র তটে বটচ্ছায়াতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। তাঁহার কাঁধে একটি দীর্ঘ বিলম্বিত ঝুলি। ঝুলির ভিতর “রাধাবল্লভজীউ” ছিলেন। সন্ন্যাসী ঝুলিটি নামাইয়া তরুচ্ছায়ার উপবেশন করিলেন।

বিশ্রামান্তে যখন সন্ন্যাসী ঝুলিটি তুলিতে গেলেন, তখন তাহা আর তুলিতে পারিলেন না। ক্ষুদ্র বিগ্রহ তুলিতে সন্ন্যাসীর সামর্থ্য কুলাইল না। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, ঠাকুরের সে স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি তখন (সেই গ্রামের সজ্জন ব্যক্তি) রঘুদেব ঘোষালকে ঠাকুর-সেবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুদেব তন্মুহূর্ত্তে স্বীকার পাইলেন। সন্ন্যাসী অর্জুনার

সন্নিহিতে একস্থানে একখানি ক্ষুদ্র চালা তুলিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

কয়েক মাস পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া এক দানপত্র রঘুদেবকে প্রদান করিলেন। দানপত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক রাধাবল্লভজীউ বরাবর লিখিত। দানের সম্পত্তি সামান্য কয়েক বিঘা ভূমি মাত্র। বর্তমান চট্টোপাধ্যায়-বাটী, রাধাবল্লভ-মন্দির প্রভৃতি এই দানপ্রাপ্ত ভূমির উপর দণ্ডায়মান।” * * * তাহার কয়েক বৎসর পরে ১৬৭৫ শকে রঘুদেব কর্তৃক মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরগায়ে লিখিত ছিল :—

বাণ সপ্ত কলা নাকে রঘুদেবেন মন্দিরম্।
রঘুদেবের দৌহিত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়
মাতামহের বিষয় পাইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করেন। রামহরি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রপিতামহ।
বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যাবস্থায় এই বিগ্রহের এবং অতিথি-অভ্যাগত-সেবার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল, এখনও অনেকটা আছে। সেই সুন্দর বিগ্রহ ও তাঁহার ঐকান্তিক সেবা সন্দর্শনে অভ্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্র বয়সকালে কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

কেবল কৃষ্ণভক্তি নহে। শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস তিনি আপনার গ্রন্থমধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, সে ত সকলেই জানেন ;—আমি বলিতেছি—এই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অলৌকিকত্বে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। এই সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে ধীরে ধীরে একটু জেরার ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তিনি প্রথমে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সহাস্তবদনে,

* বঙ্গীর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত—
ঐশীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংকলিত।

বলিতে থাকেন “তোমাদের চুঁচুড়ার একটি সুবর্ণ-বণিক-মহিলা, বিশ ত্রিশ জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে এ পারে আমাদের এই ঠাকুর দেখিতে আসেন।” বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে জল আসিল, বলিতে লাগিলেন “কিন্তু সকলেই ঠাকুর দেখিল, তিনি দেখিতে পাইলেন না; আমরা বাড়ীতে ছিলাম, সকলেই তাঁহার কাছে গেলাম, সমস্ত লোক জন সরাইয়া দিয়া, তাঁহার ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা করাইয়া দিলাম, অভাগিনী কিছুতেই ঠাকুরকে দেখিতে পাইল না, উচ্চঃস্বরে কাদিতে লাগিল”—বঙ্কিম বাবুও কাদিতে লাগিলেন, আর বলা হইল না। তাঁহার বিগ্রহ-ভক্তি দেখিয়া আমিও অভিভূত হইলাম।

বালক-কাল হইতেই বঙ্কিমবাবু ভক্তি-চর্চায় অভ্যস্ত হন। কৃষ্ণচরিত্রে সেই ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের হিন্দু মতে মানুষে মানুষে তারতম্য হয়—ত্রিবিধ কারণে;—(১) সংস্কারে, (২) শিক্ষায়, (৩) সাধনায়।

এই সংস্কার অর্থাৎ পূর্বজন্মার্জিত কৰ্ম্মের প্রভাব যুরোপ আমেরিকা বুঝেন না, কাজেই মানেন না। এটি তাঁহাদের আংশিক বর্স্বরতার পূর্ণ পরিচয়। আমাদের দেশেও যে কোন কোন নব্য স্পন্দন এই সংস্কার স্বীকার করেন না, সেটা কেবল অমুকরণের বিষময় ফল মাত্র। এই যে ছই সহোদরের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার বিষম বৈষম্য দেখা যায়, ইহার কি কোন কারণ নাই? যদি শিক্ষাবৈষম্যে ওরূপ বৈষম্য ঘটে,— তাই বা কেমন করিয়া বলি? সৰ্ব্ব শিক্ষার

অগ্রে বালক বঙ্কিম, একদিনেই পঞ্চাশৎ বর্গ লিখিতে বা পড়িতে পারেন, এটা কি কেবল genius কথা দ্বারাই বুঝা যাইবে? না জিনিয়স্ শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধ করিয়া বুঝিতে হইবে? Genius সেই ‘জন’ ধাতু, আর পূর্বজন্মজাত সংস্কারও সেই ‘জন’ ধাতু। পূর্বজন্মের কথা যুরোপের শিক্ষাদাত্রী গ্রীস-ভূমিতে স্বীকৃত ছিল, খৃষ্ট-সময়ে দোহাই দিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমাদের দেশের ঐটি সনাতন বিশ্বাস, আমরা বিলাতের অন্ধ অনুকরণ করিতে গিয়া সেই বিশ্বাস চাপিয়া রাখিব কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের genius বা প্রতিভা ত ছিলই, শিক্ষাও বিশেষভাবে হইয়াছিল। এক শিক্ষা প্রকৃতির নিকট, উহার কথা পূর্বে প্রবন্ধে বলিয়াছি—“তিনি স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সখ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।” আর একরূপ সমাজের বা মানবের নিকট হইতে; তাঁহার সংস্কৃত ইংরাজি ও বাঙ্গালা কবিতা শিক্ষার কথা পূর্বে বলিয়াছি, এখন যাত্রা-গান-কীর্ত্তনাদি শুনিবার তাঁহার যে অত্যধিক সুবিধা হইয়াছিল, সেই কথাই বলিলাম। বঙ্কিম বাবুর পিতার এই সকল বিষয়ে রসজ্ঞতা প্রচুর পরিমাণে ছিল, আর রস উপভোগের জ্ঞান প্রভূত ব্যয় করিতেন, আপনার বাসভবনে প্রায়ই সঙ্গীতোৎসব হইত, তাঁহার পরিবারের সকলেই সেই অপূর্ণ রস উপভোগ করিতে পারিতেন। এটি বড় অল্পভাগ্যের কথা নহে।

“রসভোগ, অসংযোগ হয় কি সকল কপালে? দরিদ্রের কি স্বর্ণ মিলে, রোদন করিলে

সিন্ধুকূলে?”

আর কি বিপরীত ব্যবস্থা দেখুন, আমাদের রবীন্দ্রনাথের কপালে। তিনি নিজেই তাঁহার দুর্দশা বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার “ভূত্য রাজক তত্ত্ব”, আর অন্ধকূপের মাসতুত ভাই—সেই শ্রীমন্দির “বাহির বাড়ীতে চাকরদের মহলে, দোতলার দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘর।” এখনও পড়িতে গেলে,—যতই বাঁচাইয়া লেখা হোক না কেন—পড়িতে গেলে চোখে জল আসে। রবিবাবু নিজেই নিজ বালাশিক্ষার পরিচয় অতি সুন্দর কাহিনী করিয়া লিখিতেছেন এবং তিনি স্পষ্ট করিয়া না লিখিলেও, আমি তাঁহার মুখে, শুনিয়া জানি,—যাত্রা, কবি, কীর্ত্তন, পাঁচালি, কোনরূপ দেশীয় সঙ্গীত শুনিবার সুবিধা বাল্যে কৈশোরে তিনি কিছুই পান নাই। তিনি যেদিন আমাকে এই কথা বলেন, সেই দিন আমি তাঁহাকে অভাগাবান্ বলিয়া মনে করি; আর সেইজন্য বঙ্কিম বাবুকে মহাভাগ্যবান্ বলিতেছি। নিজ ভবনে ভক্তির উপকরণের কথা এই মাত্র বলিলাম।

তাঁহার পর সাধনার কথা—সেই কার্লাইলের Indefatigable exertion in pursuit of an object. কোন বিষয়ে সিক্তি লাভের জন্ত অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রম।

যে দেশের অতি নিরক্ষর বর্ষের পর্য্যন্ত, পল্লীবাসের অতি দীন রমণী পর্য্যন্ত, ঐক্য-ভগীরথের সাধনার কথা জানে ও বিশ্বাস করে, সে দেশে সাধনার কথা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা বটে; কিন্তু সে সাধনা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি, আমরা মনে করিতেছি, একটি সভা করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, গোটা

কয়েক প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করাইয়া লইতে পারিলেই, সাধনার পিণ্ডাস্ত পিণ্ড শেষ হইল! হায় ভগবান্! ঐক্য-ভগীরথের দেশে এ কি বিড়ম্বনা!

কিন্তু বঙ্কিমবাবুর সাধনা—মনপ্রাণের সাধনা।—‘মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পাতন’। সাহিত্য-সাধনায়—তাঁহার একটু বিরতি বা ক্লান্তি ছিল না; আহার-নিদ্রার সময়-জ্ঞান নাই, পারিপাট্য বোধ নাই, ছুটি লইয়াছেন, আর দিবারাত্রি সাহিত্য-সাধনায় নিমগ্ন আছেন। নিজের লেখা নিজে নষ্ট করিতে প্রাণ ধরিয়া মাহুযে যে সেরূপ পারে, বঙ্কিম-বাবুর সাধনা দেখিবার পূর্বে আমার জ্ঞানটাই ছিল না। বিষবৃক্ষের এবং আনন্দ-মঠের স্তম্ভিকা-সমাচার আমি কিছু কিছু জানি। বিষ-বৃক্ষ বহরমপুরে হয়। প্রথম নাম হইয়াছিল, ‘উভয়েরই দোষ’, নগেন্দ্রে ও দেবেন্দ্রে বিপুল একটা মোকদ্দামা হাইকোর্টে পর্য্যন্ত হইয়াছিল। আমার সাক্ষাতে সেই খণ্ড খণ্ডীকৃত হইয়া অতলে গিয়াছে। সমগ্র উভয়ের দোষ পাণ্টাইয়া লেখা হইয়াছে ‘বিষবৃক্ষ’। সমীচীন পাঠক বুদ্ধিতে পারিবেন, উভয়েরই দোষ সাব্যস্ত হইলে—সূর্য্যমুখীর নিতান্তই দুর্দশা হইত। এখন যে ভাল হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার সাধনার কথা ভাবিলে এখনও সন্তুষ্ট হইতে হয়। সেই সাধনাই একরূপ প্রতিভা—“এই প্রতিভাতেই বঙ্কিম বাবু আমাদের ‘মধ্যে মহিমাবিত হইয়াছেন।’ আর ‘আনন্দ-মঠ’ নিষ্ঠাণে সাধনাট বা কত! এই সময় আমার নিজের নির্কুঞ্জিতার পরিচয় দিয়া, একটু গল্প বলি—যখন আনন্দমঠ স্তম্ভিকাগারে, তখন ক্ষেত্রনাথ

মুখোপাধ্যায় এখানকার আর একজন ডেপুটি ছিলেন, বঙ্কিমবাবু ত একজন ছিলেন; উভয়ের পাশাপাশি বাসা। সন্ধ্যার পর তিনি আসেন, আমিও যাই। তিনি স্তরস্তর, বড় টেবল হারমোনিয়ম্ লইয়া তিনি ‘বন্দে মাতরম্’ গানে মল্লারের সুর বসান। বঙ্কিম বাবুকে সুরের খাতিরে যৎসামান্য অদল বদল করিতে হয়। একদিন ক্ষেত্রবাবু আসেন নাই, বঙ্কিম বাবু আনন্দ-মঠের শেষে যুদ্ধের ভাগ তাঁহার হাতের লেখা খাতায় আমাকে পড়িতে দিলেন। আমি দেখিলাম, অজয় নদের উভয় পার্শ্বে স্থান, আমি ‘সন্তান’ শব্দ বুলিতে না পারিয়া ‘সন্তাল’ পড়িতেছিলাম—মনে মনে।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এবার কি Santal Insurrection theme হইল না কি?” তিনি বলিলেন, “না Sanyasi Insurrection.” আমি বলিলাম এই যে, আপনি লিখিয়াছেন অজয়ের ধারে আর বার বার বলিতেছেন, সন্তাল, সন্তালগণ”। তিনি তখন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন “একটা তোমার অনিচ্ছাকৃত ভুল—সন্তাল নয়, ‘সন্তান’, আর একটা আমার নিজের ইচ্ছাকৃত ভুল—অজয় নদ ও বীরভূমি।” তখন হো হো করিয়া ছইজনে হাসিতে লাগিলাম। পাঠক, পৃথী বেড়ে যায়, আঁজি হাসিতেই থাকুক না কেন?

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

হিন্দুধর্মের বহুমুখীনতা

মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির উপরে ধর্ম-বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, হিন্দু আপনাদি ধর্মকে দুগুণও সর্বজনীন, বিচিত্রতাপূর্ণ ও বহুমুখ করিয়াছে। মানবপ্রকৃতির সর্বজনীনতা, বিচিত্রতা এবং বহুমুখীনতা হইতেই হিন্দুধর্মের এ সকল লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মানুষ যেমন, তার ধর্মও যে সেইরূপই হইবে,—এই সামান্য কথাটা, জগতের অত্যাশ্চর্য্য ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। তাহারই জন্ত সে সকল ধর্মে, হিন্দু বাহ্যকে অধিকারিভেদ বলে, সে বস্তুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। হিন্দু জানে, ধর্মবস্তুটিকে মানুষের ভিতর হইতেই ফুটাইয়া তুলিতে হয়, বাহির হইতে ও উপর হইতে তাহার উপর এ বস্তুটিকে

চাপাইতে গেল ইহার সত্য ও শক্তি উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। তখন সে ধর্ম পোষাকী বস্তু হইয়া উঠে; আটপোরে হইতে পারে না। আর হিন্দু তাহার ধর্মকে বাহির হইতে কাহারও উপরে না চাপাইয়া, ভিতর হইতে ফুটাইতে গিয়াছে বলিয়া, তাহাকে এমন সর্বতোমুখ করা আবশ্যক হইয়াছে।

কারণ মানুষের প্রকৃতিও অত্যন্ত জটিল এবং সর্বতোমুখ। ভাল মন্দ কত কি যে এই প্রকৃতির মধ্যে, তাহার অঙ্গীভূত হইয়া আছে, বলা যায় না। এই প্রকৃতি একদিকে জড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত, জড়ের সঙ্গে অশেষবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ, জড়জগতের নিরামাধীন হইয়া আছে। জড়ের উপরে জীব। অগ্নময়

কোষের ভিতরে প্রাণময় কোষের প্রতিষ্ঠা। মানুষের প্রকৃতি এই প্রাণময় কোষের ভিতরেও আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং প্রাণ-ধর্মও তাহাতে আছে। প্রাণিঙ্গগতের নিয়মগুলি এই প্রকৃতিকে দখল করিয়া রহিয়াছে। আহাৰ, নিদ্রা, মৈথুনাদি প্রাণি মাত্রেয়ই ধর্ম; সুতরাং মানব প্রকৃতিরও সাধারণ ধর্ম। প্রাণময় কোষের ভিতরে মনোময় কোষ। এই মনের দ্বারাই মানুষ বাহিরের জড়জগতের ও অপর প্রাণিমণ্ডলীর সঙ্গে তাহার প্রতিদিন যে সকল সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে, সে সকল সম্বন্ধের জ্ঞানলাভ করিয়া, ইহা চাই, ইহা চাই না—ইহা করিব, ইহা করিব না;—এই সকল সংকল্পবিকল্পের দ্বারা তাড়িত হইয়া সংসারচক্রে নিয়ত ঘুরিতেছে। যেমন তার জড়দেহ, যেমন তার প্রাণ, তেমনি এই সংকল্পবিকল্পাত্মক যে মন, তাহাও মানুষের প্রকৃতিরই অন্তর্গত। এ সকলকে লইয়াই মানুষ মানুষ হইয়াছে। প্রাণবস্ত্র যে জড়ের উপরে, তাহা সত্য; মন আবার প্রাণেরও উপরে, ইহাও সত্য। কিন্তু জড়ে প্রাণের অধীনতা ও প্রাণের অপেক্ষা, এবং প্রাণেও মনের অধীনতা ও মনের অপেক্ষা সন্দেহ,—মানুষ প্রাকৃত অবস্থায় জড়েরও অধীন, প্রাণেরও অধীন, মনেরও অধীন হইয়া বাস করে। এ সকলের কোনোটিকেই সে একান্তভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। এই মনের উপরে তার বিজ্ঞান বা বুদ্ধি। মন ভেদের প্রতিষ্ঠা করে, বিজ্ঞান বা বুদ্ধি ভেদের মধ্যেই অভেদকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। মন সন্দেহাত্মক, বিজ্ঞান নিশ্চয়াত্মক। মন নিয়ন্তাই ভেদের স্রষ্টি করিতেছে। বিজ্ঞান তার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ কিরিয়া এই ভেদকে নষ্ট করিয়া একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। কেবলই যদি ভেদের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে মানব বুদ্ধি স্থিতিলাভ করিতে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন অভেদই যদি কেবল ব্রহ্মাণ্ডকে জুড়িয়া বসিয়া থাকে, তাহাভে মানুষের বিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান হইয়ের কিছুই জন্মিতে পারে না। ভেদাভেদের উপরেই মানুষের প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত। এই অশেষ ও অচিন্ত্য ভেদাভেদকে আশ্রয় করিয়াই এই মানবপ্রকৃতি আশ্চর্য্যতার্থতা লাভ করিতেছে। কিন্তু এখানেই মানবপ্রকৃতির জটিলতার ও বিচিত্রতার শেষ নাই। যেমন অন্তরময় কোষের ভিতরে প্রাণময় কোষ, যেমন এই প্রাণময় কোষের ভিতরে মনোময় কোষ, যেমন এই মনোময়কোষের ভিতরে বজ্ঞানময়কোষ, সেইরূপ এই বিজ্ঞানময় কোষের ভিতরে আনন্দময় কোষ আছে। এই কোষপঞ্চক লইয়াই মানব প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে। জড় ও প্রাণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্মাবলম্বী। জড় বলিতেই আমরা অপ্রাণী বুঝি। প্রাণী বলিতেই অজড় বুঝি। অথচ জীবিতে এই দুই পরস্পর বিরোধী ধর্মই সম্মিলিত হইয়া, তার জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানব-প্রকৃতির মধ্যে তাহার জড়ভাগ, অর্থাৎ এই দেহপ্রপঞ্চ, প্রাণাপেক্ষী হইয়া থাকে। সেইরূপ মানবের প্রাণবস্ত্র তাহার মনের অপেক্ষা করিয়া থাকে। মন বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান আনন্দের, অপেক্ষা রাখে। এই সকলের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। মানুষ যতক্ষণ মানুষ আছে, এই দেহের সঙ্গে যতক্ষণ তাহার সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে এই

কোষপঞ্চকের জটিল ও অপরিহার্য সম্বন্ধের মধ্যে বাস করিতেই হয়। বহুতপস্শাবলি, সিদ্ধ অবস্থায়, যোগিজনেরা এ সম্বন্ধসকলকে অতিক্রম করিতে পারেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহারা, আমরা যাহাকে ধর্ম বলি ও যাহাকে অধর্ম বলি, তত্ত্বভয়েরই অতীত হইয়া যান। দেখে আবদ্ধ থাকিয়াও তখন তাঁহারা বিদেহী। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও তখন তাঁহারা নিঃস্রগুণ্য হইয়া বাস করেন। এই সকল সিদ্ধ মহাজনকে লক্ষ্য করিয়াই, গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন—

“ত্রৈগুণ্য বিষয়াঃ বেদা নিঃস্রগুণ্যা ভবার্জুন।”

“গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়াই বেদসকলের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; হে অর্জুন! তুমি এই ত্রিগুণের অতীত হইতে চেষ্টা কর।” হিন্দুর ধর্ম্যধর্ম্য-বিচার এই ত্রিগুণাতীত রাজ্যের কথা নহে; তাহার অনেক নিচের কথা। হিন্দু বলেন যে সে অবস্থায় ধর্ম্যও থাকে না, অধর্ম্যও থাকে না; কর্ম্যও থাকে না, অকর্ম্যও থাকে না; পুণ্যও থাকে না, পাপও থাকে না।

যে মানব-প্রকৃতির উপরে হিন্দু ধর্ম্যবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা এই সাধারণ, এই প্রাকৃত, এই অসিদ্ধ, এই জড়-অজড়ধর্ম্য-সম্বিত, এই কোষপঞ্চকে আবদ্ধ মানব-প্রকৃতি। এই প্রকৃতির মধ্যে পশুও আছে, মানুষও আছে, দেবতাও আছেন। সূতরাং হিন্দুর ধর্ম্য মানুষের অন্তর্নিহিত জড়ত্ব ও পশুত্ব, শূন্যত্ব ও দেবত্ব, সকল অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া, সকল চেষ্টাকে সফল করিয়া, সকল প্রবৃত্তির

তৃপ্তিদান করিয়া, আপনার সার্থকতালাভের প্রয়াস পাইয়াছে। ইহাই হিন্দুর ধর্ম্যের অদ্ভুত বিচিত্রতার ও অপূর্ব বহুমুখীনতার মূল কারণ।

জগতের আর যত ধর্ম্য আছে, সকলেই মানবপ্রকৃতির মধ্যে ভাল ও মন্দে একটা আত্মাস্থিক ভেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কেবল হিন্দুর ধর্ম্যেই তাহা করে নাই। অপর সকল ধর্ম্যে মানুষের কতকগুলি বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে মন্দ ও কতকগুলিকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আর মন্দ বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলিকে নিশ্চয়মভাবে নিপীড়িত করিয়া, তদ্বিপরীত ভাল প্রবৃত্তি ও বৃত্তিগুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্যে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এরূপ একটা আত্মাস্থিক ভাগ-বাটোয়ারা করিবার নিফল প্রয়াস হয় নাই। ছায়াতপের মধ্যে যেমন কোনও ঐকান্তিক বিচ্ছেদ ঘটান অসাধ্য, সেইরূপ মানবপ্রকৃতির ভিতরে যাকে আমরা মন্দ বলি ও যাকে ভাল বলি, তা’র মধ্যেও কোনও প্রকারের আত্মাস্থিক ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা করা যায় না;—হিন্দু চিরদিনই এই কথা বলিয়াছেন। মানবের মধ্যে একটা মানবীয় দিক্ ও একটা ঐশ্বরিক দিক্ আছে। একদিকে মানুষ জীব—সর্ববিধ জীবধর্ম্যের অধীন; অত্ৰিদিকে সে শিব—নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবসম্পন্ন;—হিন্দু অতি প্রাচীন কালেই ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাই হিন্দুর প্রতি মানবপ্রকৃতির মধ্যে এই জীব-শিবের মিলনকে ছায়াতপের তায় বর্ণনা করিয়াছেন।

“ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।”

সূতরাং হিন্দু মানব-প্রকৃতির সকল দিক্কে ধরিয়াই, ধর্ম্যবস্তুকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা

করিয়াছেন, ধর্মকর্মে বা ধর্মসাধনে এই প্রকৃতির কোনও অঙ্কে উপেক্ষা করিতে বা চাপিয়া রাখিতে চান নাই।

মানুষের জড়দেহ আছে। মরণ পর্য্যন্ত এই জড়দেহের সঙ্গে তার অতিশয় ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। এই দেহকে আশ্রয় করিয়া তার মন, মনকে আশ্রয় করিয়া তার বুদ্ধি, বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, দেহী অবস্থায়, মানুষ যাহাকে আত্মা বলে, সে বস্তু বাস করে। এই আত্মবস্তুকে ফুটাইয়া তোলা ধর্মের চরম লক্ষ্য হইলেও, এই শরীর বা জড়দেহ হইতে আরম্ভ করিয়াই সেই ধর্মকে গড়িয়া তুলিতে হয়। ইহা বুঝিয়া শুনিয়াই হিন্দু বলেন,—“শরীর-মাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।” তাহারই জন্ম হিন্দুর ধর্ম সামান্য শারীর চেষ্টার প্রতি একটাই দৃষ্টি রাখিয়া চলে।

মানুষের শরীরের সঙ্গে তার মনের সম্বন্ধ কতটা যে গভীর ও ঘনিষ্ঠ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু ইহা বুঝিয়াছিলেন। মানুষের প্রবৃত্তি সকল যে কতটা পরিমাণে তাহার শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর অধীন, আধুনিক যুরোপীয় ও আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরাও ইহা একটু একটু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু বহুকাল পূর্বেই এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এইজন্ম এই স্নায়ুমণ্ডলীকে অবলম্বন করিয়াই হিন্দু মানবচরিত্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু জানেন যে, ‘ভাল হও’ বলিলেই লোকে ভাল হয় না। পরের উপদেশ শুনিয়া বা দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাল হইতে ইচ্ছা করিলেই কেহ ভাল হইতে পারে না। মনে মনে সাময়িক ভাবের প্রেরণায় যতই সাধু সংকল্প সে করুক না কেন,—

তার শরীর অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলী যদি সে সংকল্প-রক্ষার অমুকুল অবস্থা লাভ না করে,—কেবল মনের জোরে সে সংকল্প রক্ষা করা কখনও সম্ভব বা সাধ্যপন হয় না। ফলতঃ আমরা যাহাকে মনের জোর বলি—ইংরেজিতে যাহাতে inhibitive power of the will বলে,—তাহাও সর্ব্বথাই স্নায়ুমণ্ডলীর স্বস্থ ও সবল অবস্থার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। উন্মাদরোগগ্রস্ত লোকের এই মনের জোর একেবারেই নাই। যখন যে ভাব মনে জাগে, তাহাতেই তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলে। সে উত্তেজনাকে রোধ করিবার শক্তি তাহাদের থাকে না। ইহার কারণ, তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলীর অপ্রকৃতিস্থ, অস্বস্থ, আত্যন্তিক উত্তেজিত অবস্থা। সেটরূপ যাহাদের কুপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, আজন্মকাল যাহারা চৌর্য্য, পাক্ষা, নরহত্যা প্রভৃতি সমাজদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, আধুনিক যুরোপীয় মনস্তত্ত্ববিদগণ যাহাদিগকে instinctive criminals বলেন, তাহাদের এই অদম্য কুকর্ম্মাশক্তিও বিকৃত স্নায়ুমণ্ডলীরই ফল। কামক্রোধাদি সকল রিপূরই মূল আমাদের শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজিত ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা। এ সকল কথা অল্পে অল্পে, আধুনিক যুরোপীয় মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের গবেষণায় ও সিদ্ধান্তে ফুটিয়া উঠিতেছে। হিন্দু সাধকেরা বহুকাল হইতেই এ সকল কথা জানেন। সুতরাং তাহার প্রথমাবধিই মানুষকে ধার্মিক করিতে যাইয়া, “সর্ব্বান্দো তাহার” শরীরকে শোধন করিতে চাহিয়াছেন।

হিন্দুর ধর্মের অন্যান্য নিত্যকর্ম্মের ও ব্রতোপবাসাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মের ব্যবস্থা

এই দেহশুদ্ধির জ্ঞানই বিহিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই পানাহার সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম অশেষ প্রকারের আচার-বিচারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর এইজ্ঞানই, উচ্চাঙ্গের ধর্মসাধনায়, আসন-প্রাণায়ামাদিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সকলের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় সিদ্ধির কথা নানা-ভাবে, লোকসংগ্রহার্থে, যুক্ত হইলেও, এ সমস্তই প্রকৃতপক্ষে ভূতশুদ্ধির উপায় মাত্র। শরীরের স্বাস্থ্যসকলকে স্বিচ্ছ ও সুস্থ রাখিবার জ্ঞান, স্বাস্থ্যবীজ উত্তেজনা-নিবন্ধন বাহাতে অথবা চিত্তচাক্ষুণ্য উপস্থিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জ্ঞান, এ সকল জ্ঞান, ব্রত, উপবাস, আসন, প্রাণায়ামাদির বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এ সকলের মধ্যে অতি প্রাকৃত বা সুপারন্যাচারেল্ (supernatural) কিছুই নাই।

কিন্তু এ সকল যমনিয়মাদির প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া হিন্দু ধর্ম মানুষের শারীর প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধনেরই চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাকে পাঁড়ন করিতে কখনও চাহেন নাই। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে কুচ্ছসাধন প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু এ সকল সাধন প্রকৃত পক্ষে উচ্চাঙ্গের হিন্দু সাধন বলিয়া কখনই পরিগণিত হয় নাই। অধিকাংশ স্থলেই ঐশ্বর্যলাভের জ্ঞান এ সকল সাধন অবলম্বিত হইয়া থাকে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কঠোর ভাষায় এই প্রকারের সাধনের নিন্দা করিয়াছেন। এই সকল কুচ্ছসাধনকে আত্মরী সাধন বলে।

অশাস্ত্রবিহিতঃ ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥

কর্শয়ন্তুঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।

মাকৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্তরনিশ্চয়ান্ ॥

“যাহার দম্ভাহঙ্কারযুক্ত ও কামরাগবলান্বিত হইয়া অশাস্ত্রবিহিত পীড়াজনক তপস্তা করে এবং তাহাতে দেহস্থিত ভূতসকলকে বৃথা ব্রতোপবাসাদির দ্বারা ক্লিষ্ট করে, এবং শরীরভাষ্যবস্থ আত্মাক্রুপী আমাকেও পীড়ন করে, তাহাদিগকে অস্তুর বলিয়া নিশ্চয় জানিবে।” প্রকৃত ধর্মোপপথ এ নহে। হিন্দুর ব্রতোপবাসাদি শরীরকে দুর্বল ও দুস্থ করিবার জ্ঞান বিহিত হয় নাই, শক্ত ও সুস্থ করিবার ও রাখিবার জ্ঞানই বিহিত হইয়াছে। স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও শক্তিতেই জীবের শরীরের সার্থকতালাভ হয়। আর হিন্দু ধর্মের শারীরিক সাধনের উদ্দেশ্যও আয়ুঃসম্ভবলারোগ্য বিধান করা।

আর এ বিষয়েও হিন্দু ধর্ম কাহারও উপরে কোনও প্রকারের অথবা জোরজবরদস্তি করিতে চায় না। সকল মানুষের শারীর প্রকৃতি একরূপ নহে। সুতরাং শারীর ধর্মও সকলের সমান হইতে পারে না। এ বিষয়েও হিন্দু ধর্ম মানুষের স্বভাবে অনুসৃতক্রম করিয়া চলিতে চাহে না। গতানুগতিক পথ ধরিয়া কোনও কোনও হিন্দু সকল লোকের উপরেই একই প্রকারের ব্রতোপবাসাদি চাপাইতে চেষ্টা করিলেও, হিন্দু ধর্মের সনাতন আদর্শ বা উপদেশে একরূপ জোরজবরদস্তি কদাপি সমর্থিত হয় না। ফলতঃ জগতের আর কোনও ধর্ম সমর্থ ও অসমর্থের মধ্যে যমনিয়মাদির এমন পার্থক্য করেন কি না, জানি না। সমর্থ-জনের পক্ষে একরূপ বিধান, আর অসমর্থের

পক্ষে অন্তরূপ বিধান,—খৃষ্টীয় বা মোহনদীয় নিয়ম,—সেখানে এমন ব্যবস্থা নাই। হিন্দুর ধর্ম্মে আছে বলিয়া শুনি নাই। যাহা এক ধর্ম্মে এ ব্যবস্থা আছে। আর তারই জন্ত জন খৃষ্টীয়ানের পক্ষে ধর্ম্ম ও বিহিত, অপর হিন্দুর ধর্ম্ম এমন বিচিত্র ও বহুমুখী খৃষ্টীয়ানের পক্ষে ও তাহাই ধর্ম্ম ও বিহিত। হইয়াছে।

সবলের জন্ত এক নিয়ম, দুর্ব্বলের জন্ত অপর

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিলাতের কথা

(২)

খাওয়া দাওয়া

দেশে থাকিতে সাহেবী খানার প্রতি বেশ একটা লোভ ছিল। তখন জানিতাম না যে, আমরা এদেশে বাকে সাহেবী খানা বলি, তা বাস্তবিক সাহেবী খানা নয়। কারী ভাতের তো কথাই নাই, চপ্ কাট্-লেটের খবরও বিলাতের ইংরেজেরা কিছুই রাখেন না। নাম দুটা ইংরেজি বটে এবং ইংরেজও এক রকমের চপ্ কাট্লেট খাইয়া থাকেন; কিন্তু আমরা এদেশে চপ্ বা কাট্লেট বলিতে যে উপাদেয় বস্তু বুঝি, ইংরেজের চপ্ কাট্লেটের সঙ্গে তার নামগত সাদৃশ্য থাকিলেও, বস্তুগত বা স্বাদগত কোনও সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ইংরেজের প্রধান খাদ্য মাংস, আর তার মধ্যে আবার গোমাংসই প্রশস্ত। ইংরেজের প্রিয়তম খাদ্য “রোস্ট বীফ্” (Roast Beef)। একটা বড় মাংসের টুকরাকে তন্মূলের ভিতরে রাখিয়া সেই উত্তাপে কতকটা বলসাইলে বীফ্ রোস্ট হয়। যে মাংসখণ্ডের উপরের ভাগটা কতকটা পুড়িয়া যায়, কিন্তু ভিতর হইতে কাটিলেই পাতলা

রক্ত বাহির হয়, ইংরেজের রুচিতে তাহাই অতি সুখাদ্য বস্তু। এই মাংসের slice প্লেটে করিয়া যখন খাইতে দেয়, তখন তাহা রক্তের ঝোলের মধ্যে ভাসিতে থাকে; আর তাহাই একটুকু রাই বা mustard এবং লবণ সংযোগে ইংরেজেরা অতি তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন। ইংরেজের পাক-প্রণালী দেখিলে সর্ব্বদাই মানবের আদি অবস্থার কথা মনে পড়িয়াছে। এক সময় মানুষ আম-মাংসই ভোজন করিত। যখন ক্রমে আগুন জালিবার সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইল, তখন মানুষ বনে পশু শিকার করিয়া সেইখানেই তাহাকে পোড়াইয়া খাইত। ইংরেজ বনে যাইয়া পশু শিকার করে না, কসাইখানাতে বধ করে, আর ঘরে আনিয়া তন্মূলের ভিতরে সেই মাংসকে পোড়াইয়া ভক্ষণ করে। রন্ধনব্যাপারে ইংরেজের সভ্যতা এতটুকুই অগ্রসর হইয়াছে।

বিলাতে সুপক খাদ্যও পাওয়া যায়; কিন্তু সে সকল খাদ্যের রন্ধন-প্রণালীর আবিষ্কার ইংরেজ করেন নাই। বিলাতের

ভাল ভাল খাদ্য—মাংসই হউক, আর মাছই হউক বা মিষ্টিই হউক, হয় ফরাসীসের না হয় ইতালীর আবিষ্কৃত প্রণালী অনুসারে রান্না হয়। ইংরেজের ভাল ভাল খাদ্যের নামই তার প্রমাণ। ফলতঃ ইংরেজী খানায় ভোক্তা-দিগের সম্মুখে খাদ্যের যে তালিকা দেওয়া হয়, তাহা প্রায়ই ফরাসী ভাষায় লিখিত হয়। এ সকল তালিকাকে মেনু (menu) বলে। এ সকল তালিকায় প্রায়ই সূপের (soup) পরিবর্তে পটাজ (potage), রোট ফাউলের পরিবর্তে পোলে রোটি (poulet Roti), ফল বা fruit-এর পরিবর্তে ফ্রোমাজ (fromage)—এই সকল ফরাসী শব্দ ব্যবহৃত হয়। লণ্ডনের বড় বড় হোটেলে খাইতে গিয়া এই ভ্রাতৃ আমার মত লোকে অনেক সময় অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়েন। কোনটা যে গরুর, আর কোনটা যে ভেড়ার মাংস, ইহা বুঝিবার জ্ঞান হোটেলের খান-সামার মুখাপেক্ষী হইতে হয়। আর ইংরেজের রন্ধন-বিজ্ঞানের এই সকল বৈদেশিক পরিভাষাই, ইংরেজের রন্ধন-বিজ্ঞান যে একান্তই পরের নিকট ধার করা বস্তু, ইহা প্রমাণ করে। ইংরেজ অনেক বিজ্ঞা শিক্ষিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও যে মানুষের মত রাখিতে শিখেন নাই, বিলাতে যাইয়া দিন দুই তিন বাস করিলেই, এই জ্ঞানটা লাভ করা যায়।

ফরাসীস ও ইতালীয়েদের রন্ধন-প্রণালী, ইংরেজের রন্ধন-প্রণালী অপেক্ষা অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাঁহাদের খাদ্যও আমাদের নিকট তত সুখরোচক হয় না। আমরা যে পরিমাণে নানাপ্রকারের ঝালমসলা

ব্যবহার করিয়া থাকি, যুরোপের কোন জাতি তাহা করেন না। ঝালের মধ্যে তাঁহারা কেবল গোলমরিচের গুঁড়াই ব্যবহার করে, আর তাহাও রান্নায় অতি অল্পই ব্যবহার, হয়, খাইবার সময় প্রত্যেকে আপনার রুচিমত নিজ নিজ খাদ্যের সঙ্গে তাহা মিশাইয়া লন। দশ পনেরো বৎসর পূর্বে বিলাতে লাল লঙ্কার ব্যবহার একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। শাল কাল গোল মরিচের গুঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কার গুঁড়াও অনেক সময় টেবিলে সাজানো থাকে। পূর্বে ইংরেজ এক সিরকা (vinegar) এবং ওয়ারশায়ার সস্ (worcestershire sauce) ভিন্ন অল্প কোন সুখরোচক অল্প ব্যবহার করিতেন না। আজ কাল অনেক নূতন নূতন অল্প ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ সকল সবেও এখনও ইংরেজ জনমণ্ডলী সিদ্ধ-পোড়ারই বেশী ভক্ত। আর ফরাসীর বা ইতালীয়েদের রান্নাতেও আমাদের রান্নার স্বাদ বা গন্ধ পাওয়া যায় না।

প্রথম প্রথম বিলাতে যাইয়া ইংরেজের খানা খাইতে বড়ই অসুবিধা হয়। একে তো রান্নার শ্রী এইরূপ, তাহার উপরে খাদ্যের পরিমাণও কোথাও প্রচুর পাওয়া যায় না। বহু দিন হইল, একজন হিন্দু-মহিলা স্বামীর সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে একদিন বলিয়া-ছিলেন যে, ইংরেজের বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁর কান্না পাইত। আমরা নিরামিষাশী জাত, ভাতই খাই আর রুটাই খাই, পরিমাণে বেশী না খাইলে আমাদের শক্তিও থাকে না, উদর-

পুষ্টিও হয় না। ইংরেজ মাংসাপী জাত, আর ডাক্তারেরা বলেন যে, যে পরিমাণ নিরামিষ আহার করিলে শরীরের শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প-পরিমাণ মাংস খাইলেও চলে। সুতরাং আমরা যে পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ করি, ইংরেজের সে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। এইজন্যই ইংরেজের কাছে আহার করিতে যাইনা প্রথম প্রথম কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় না। কিন্তু ইংরেজ আমাদের তুলনায় পরিমাণে কম খাইলেও বারে বেশী খায়। গরীর লোকেরা সচরাচর দিনে তিনবার খায়; মধ্যবিত্ত লোকেরা চারবার, আর বড় লোকেরা ছয়বার খাইয়া থাকে। আর কে কোন্ সময়ে আহার করে, ইহা দ্বারা তাহার সামাজিক পদমর্যাদারও পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রম-জীবীদিগকে ছয়টা কি সাতটার সময় খাইয়া আপন আপন কর্মস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়; সুতরাং অতি প্রত্যুষেই তাহা-দিগকে breakfast বা প্রাতরাশ সমাপন করিতে হয়। মধ্যবিত্ত লোকেরা সচরাচর বেলা নয়টার সময় আপন আপন কর্মস্থলে গমন করেন; ইগাদিগকে সাড়ে সাতটা হইতে সাড়ে আটটার মধ্যে প্রাতঃকালের আহার শেষ করিতে হয়। বড় লোকেরা সঞ্চিত ধনের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন প্রতিদিন খাটিয়া তাঁহাদিগকে উদরারের সংস্থান করিতে হয় না। সুতরাং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ন'টা কি দশটায় এমন কি এগারোটা পর্য্যন্তও প্রাতঃকালের আহারের সময় নির্ধারণ করিতে পারেন। ইহারা

অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া থাকেন। শয্যাত্যাগ করিবার পূর্বেই ইহাদিগকে একটু আধটু কিছু খাইতে হয়। অতি প্রত্যুষে শয্যাপাশ্বেই ভৃত্য আনিয়া ইহা-দিগের জন্য এক পেয়ালা কফি বা চা এবং কিছু বিস্কুট রাখিয়া যায়।

প্রাতরাশ বা Breakfast

সচরাচর বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজেরা প্রাতঃকালে প্রায়ই লঘুভোজন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দুটা আধ সিদ্ধ ডিম, খান দুই toast, পেয়ালা দুই চা কিম্বা কোকো দিয়াই প্রাতঃকালের ভোজন শেষ করেন। কেহ বা ডিমের সঙ্গে অতি পাতলা শূকরমাংস ভাজা খাইয়া থাকেন, কেহ বা মাছ ভাজা খান। গরীব লোকেরাই কেবল প্রাতঃকালে মাংস খায়। কেহ কেহ প্রাতঃকালে কোন প্রকারের আমিষ ব্যবহার করেন না। পারিজ (porridge), টোষ্ট (toast) এবং কলা কমলালেবু কিম্বা অন্ত কোন সুপক্ক ফল বা ফলের মোরব্বা খাইয়া থাকেন।

লাঞ্চ বা টিফিন

এখানকার ইংরেজেরা যাহাকে টিফিন বলেন, বিলাতে তাহাকেই লাঞ্চ বলে। ইহাই ইংরেজের মধ্যাহ্নাহার। গরীব লোকেরদের মধ্যাহ্নাহারকে ডিনারও বলে। শ্রমজীবীগণ সচরাচর ১২টা হইতে ১২½ টার মধ্যে মধ্যাহ্নাহার করিতে বসেন। মাংস আর মিষ্টি এই দুই পদেই তাঁহাদের মধ্যাহ্ন-আহার শেষ হয়। গরুর রোষ্ট এবং তার সঙ্গে কিছু আলু ও সব্জী সিদ্ধ, ইহাই গরীব লোকের প্রধান খাদ্য। তার সঙ্গে একপদ

মিষ্টি বা পুডিং (pudding) হইলে তাহাদের মধ্যাহ্নাহার শেষ হয়। মধ্যাহ্ন ইংরেজ সূপ (soup), রোস্ট (roast) বা কাট্-লেট্ এবং পুডিং বা ‘মিষ্টান্ন’ এই দিয়াই মধ্যাহ্নাহার করিয়া থাকেন। ইহার। এই মধ্যাহ্নাহারকে ডিনার (dinner) না বলিয়া লাঞ্চ (lunch) বলেন। লাঞ্চের পরে কেহ কেহ এক খেলালা কাকি পান করেন। আর কি ছোট কি বড়, সকলেই মিষ্টি খাবার পরে, মুখ বদলাইবার জন্তই বোধ হয়, রুটী ও পনির খাইয়া থাকেন। বড়লোকদের লাঞ্চ একটু সমারোহের ব্যাপার। তাহাতে প্রথমে মুখরোচক ঝাল ও অন্ন খাইয়া ভোজন আরম্ভ করিতে হয়। কাঁচা মূলো জারক জলপাই, টিনের সার্ডিন (sardines) মাছ, সিরকায় ভিজান বীটপালং সিদ্ধ আর কোনো কোনো কাঁচামাছের আচার,—এ গুলিই যুরোপীয়দিগের অতিশয় মুখরোচক বস্তু। ইংরেজের আহাৰ্যের তালিকায় বা menuতে এগুলিকে Hors D’vour বলে। বড় লোকের লাঞ্চে ইহাই প্রথম পদ। তার পর সূপ। এই সূপ অশেষবিধ হইয়া থাকে। কতকগুলি সূপ, পাত্‌লা ও পরিষ্কার জলের মত হয়। ইংরেজিতে এগুলিকে clear soup বলে। আর কতক-

ধন হয়, তাহাকে thick soup কহে। প্রায় সকল সূপেই মাংসের কাথ ব্যবহৃত হয়। তবে নিত্যান্ত নিরামিষাশীদের জন্ত একেবারে নিরামিষ সূপেরও ব্যবস্থা হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। শুদ্ধ মাংসের সূপের মধ্যে ox-tail বা বাঁড়ের লেজের সূপই প্রশস্ত। Turtle soup অথবা

কাঠুয়ার সূপই সৰ্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ। বিলাতে কচ্ছপ বা কাঠুয়া জন্মায় না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে জীবন্ত কাঠুয়ার আমদানি হয়; তাহাও খুব বেশী পরিমাণে আসে না। তারই জন্ত সেদেশে কাঠুয়ার দাম এত বেশী। শীতকালে পূর্ববঙ্গে বিস্তর কাঠুয়া পাওয়া যায়। এগুলিকে বিলাত পাঠান যায় কি না চেষ্টা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। মধ্যাহ্ন লোকেরা এই turtle soup খাইতে পান না। ঘন সূপে হয় বিলাতী বেগুন বা tomato কিম্বা মটর গুঁটা কিম্বা অল্প কোন ফল বা সব্‌জী ব্যবহৃত হয়। এ সকলের মধ্যে মটরগুঁটা এবং বিলাতী বেগুনের সূপই সৰ্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু বড়লোকদের লাঞ্চে সূপের পরে মাছ, মাছের পরে এক পদ কি দুই পদ মাংস, মাংসের পরে মিষ্টি, তার পর বিস্কুট, মাখন ও পনির এবং সর্বশেষে সূপক ফল দেওয়া হয়। এইরূপে লাঞ্চ বা মধ্যাহ্নাহার কতকটা গুরুতর হইয়া উঠে।

Afternoon tea বা বৈকালিক চা।

বিকাল বেলা চা খাওয়ার পদ্ধতি পূর্বে ছিল না। কিছুদিন হইতে ইহা অভ্যস্ত চলিত হইয়াছে। মধ্যাহ্ন ও বড় লোকেরাই বিকাল বেলা চা, কেব্‌, বিস্কুট্, কেহ কেহ বা টোট্ট খাইয়া থাকেন। গরীব লোকেরা ছপুর বেলা ডিনার করে, আর দিনান্তে কাজ কর্ম হইতে ফিরিয়া গিয়া, সাঁজের বেলা চা খায়। সাড়ে চারটা কি পাঁচটার সময় চা খাইবার অবসর এবং পরশাও তাহাদের জোটে না। মধ্যাহ্ন লোকদিগের মধ্যেও ধন ও সামাজিক পদমর্যাদার হিসাবে ছোট বড় ভেদ আছে। মধ্যাহ্ন

শ্রেণীর মধ্যে যারা একটু ছোট, তাঁরা মধ্যাহ্নকালেই লাঞ্চ না করিয়া একেবারে ডিনার করেন, আর কাজকর্ম হইতে ফিরিয়া গিয়া ৫।০টা কি ৬টার সময় একটু ভারী গোছের চা খাইয়া থাকেন। ইহাকে ইংরেজেরা high tea, আর কেহ কেহ বা meat teaও বলিয়া থাকেন। ইহার চায়ের সঙ্গে মাছ বা মাংস নানা প্রকারের মিষ্টি এবং ফুল খাইয়া থাকেন। গরীব লোকেরা চায়ের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাংস বা cold meat খাইয়া থাকে।

ডিনার—Dinner

ইংরেজ-সমাজে কে কোন্ সময়ে ডিনার খায়, তাহার দ্বারা তাহার সামাজিক পদ-মর্যাদা নির্ধারণ করা যাইতে পারে। গরীব শ্রমজীবীরা দুপুর বেলা ডিনার খায়। নীচুদের মধ্যবিত্ত ইংরেজ একটা হইতে দেড়টার মধ্যে ডিনার খাইয়া থাকেন। তাঁর চাইতে বড় যারা, তাঁরা সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে ডিনার করেন। আর রাজি ৮টাই সমাজে শীর্ষস্থানীয় অভিজাতশ্রেণীর ডিনারের সময়। বড় লোকদের এই ডিনার অতি সমারোহের ব্যাপার। ডিনারের সময় সাহেব ও মেম সকলকে বিশেষ পোষাক পরিতে হয়। ইংরেজিতে ইহাকে evening dress বলে। সাহেবদের

evening dress সর্বদাই কাল হওয়া চাই এবং কামিজের বুক ভাল রকমে ইঞ্জী করা ও খোলা থাকা আবশ্যিক। Evening dress-এর সঙ্গে বুট চলে না, কাল রঙের বাগিস করা court shoe পরিতে হয়। মেমদের evening dressএ বাছ, গ্রীবা ও কণ্ঠের নিম্নদেশ অনাবৃত থাকে। যন্নিং দেশে যদাচারঃ। ইহাই সে দেশের নিয়ম। যেমন সাজসজ্জার পারিপাট্য সেইরূপ ডিনারে আহারেরও পারিপাট্য বেশী। ডিনারে Hors D'vour ছাড়া, স্প, মাছ, গোমেস-দির দুই ভিন পদ, হাঁস, মুরগী, পায়া-বত বা অন্ত কোন পাখীর মাংসের দুই এক পদ, মিষ্টি, বিস্কুট, মাখন ও পনির এবং সর্বশেষে সুপক ফলের ব্যবস্থা থাকে। সকলেই যে সকল পদ আহার করেন, তাহা নহে, কিন্তু নানা লোকের রুচি অনুযায়ী নানাপ্রকারের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক হয়। আহারান্তে সকলে drawing roomএ গিয়া বসিলে সেখানে গরম কাফি ও বিস্কুটের ব্যবস্থা হয়। ইংরেজের বিশেষতঃ বড়লোকদিগের মধ্যে ডিনার একটা অতি বৃহৎ সামাজিক ব্যাপার। তার আদব-কান্দা বিস্তর। বড় ঘরের গৃহিণীদিগকে এর জন্ত অনেক মাথা ঘামাইতে হয়।

বিলাত-ফেরত।

চরিত-চিত্র

হরেন্দ্রনাথ

(২)

কেশবচন্দ্র

রাজা যে উন্নত ও উদার ভূমিতে গাইয়া দাঁড়াইয়া এই অভিনব যুগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমাজের সাধারণ চিন্তা ও ভাবকে সেই ভূমিতে লইয়া যাইতে হইলে, সর্বদোঁ তাহার সর্ববিধ পূর্ব-সংস্কার নষ্ট করা আবশ্যক ছিল। প্রত্যেক গঠন কার্যের পূর্বেই কতকটা ভাঙ্গা আবশ্যক হয়। রাজাও যে কিছু ভাঙ্গেন নাই এমন নহে। কিন্তু তিনি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গড়িয়া তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক যুগ-সঙ্ঘি কালে নূতনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচলিত ও পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষেরা কেবল এই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না। কোথায়, কিরূপে এই সংগ্রামের শাস্তি হইবে, কোন্ হস্ত ধরিয়া পুরাতনের ও নূতনের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সাধন করিতে হইবে, তাঁহাদের সম্যক দৃষ্টি হইও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। স্বতরাং তাঁহারা পুরাতনের অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করিয়াই, নূতনকেও আপনার সফলতার দিকে প্রেরণ করেন। এবং নূতনের অভিষেক দিয়াই পুরাতনকেও সার্থক করিয়া তুলেন। কিন্তু যাহারা এই সকল মহাপুরুষের অন্তরতী হইয়া সমাজ-ক্ষেত্রকে তাঁহাদের প্রকাশিত যুগ-আদর্শের প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হ'ন, কোথাও তাঁহাদের এই মহাজন-প্রতিভামূলভ

সম্যক দর্শন থাকে না। থাকিলে তাঁহারা যে বিশেষ কার্যে ব্রতী হ'ন, সেই কার্যের সফলতারই ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। ফলতঃ প্রাকৃতজনের মধ্যে সম্যক দর্শন সচরাচর সংস্কার-কার্যের গতি-বেগকে একান্তভাবে কমাইয়া দিয়া তাহাদিগের কুসমোদ্যমকে বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্তই সংস্কারকের পক্ষে কস্মোৎসাহের যতটা প্রয়োজন সম্যক দৃষ্টির ততটা প্রয়োজন নাই। একদেশদর্শিতা বেগবতী সংস্কার-চেষ্টার জন্ত একান্তই আবশ্যক। অতএব রাজা যে সমুন্নত যুগ-আদর্শ প্রকাশিত করেন, সেই আদর্শের যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া সমাজক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত কেশবচন্দ্রের প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত একদেশদর্শিনী সংস্কার-চেষ্টারই একান্ত প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে, রাজার শিক্ষার অন্বেষণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বদেশী-সমাজে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক যুরোপের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের মধ্যে যে উদার ও উন্নত সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, তাহারই প্রয়োজনে, কেশব-চন্দ্রের দৈবীপ্রতিভা, তাঁর প্রথম বয়সে, স্বল্পবিস্তর একদেশদর্শী ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার-কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। কি ব্যক্তি, কি সমাজ, সকলেরই সত্যলাভের জন্ত প্রথমে সর্ববিধ পূর্বসংস্কার-বর্জিত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রের প্রমাণ্য, সদগুরু মর্যাদা, সমাজ-বিধানের ধর্মপ্রাণতা, এ সকলকে স্বল্পবিস্তর

অস্বীকার না করিলে, মানসক্ষেত্র কদাপি সম্পূর্ণ সংস্কার-বর্জিত ও নির্মল হইতে পারে না। এই সর্বগ্রাসী সন্দেহ ও অসত্যবোধ হইতেই ক্রমে খাঁটি ও সরল বিশ্বাস এবং সত্য আন্তরিকবুদ্ধির সঞ্চার হয়। “নেতি” “নেতি” বলিয়াই “ইতিতে” পৌঁছিতে হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে “নেতি” “নেতি” বলিয়া একেবারে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বশূন্য করিয়াই, পরে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, সর্বস্বত্বদেহ ব্রহ্ম,—এই মহাসত্যে উপনীত হইতে হয় কেশবচন্দ্রের সমাজ ও ধর্মসংস্কার-চেষ্টা। রাজার আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া, প্রথমে এই “নেতি”র পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল। এ পথ সংগ্রামের পথ, সন্ধির পথ নহে। এ পথ শক্তির পথ, সংযমের পথ নহে। ইহা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ, আত্মবিলোপের পথ নহে। এ পথ ইংরেজিতে যাহাকে Independence বা অনদীনতা বলে তারই পথ; সত্য-স্বাধীনতার পথ নহে। এ পথে যাইয়া একপ্রকারের ফ্রিডমে (Freedom) পৌঁছান যায়, কিন্তু উপনিষদ যাহাকে স্বরাজ্য বলিয়াছেন, সে বস্তু লাভ হয় না। এ পথ Rights-এর পথ, স্বত্বের পথ; Reconciliation-এর পথ বা সামঞ্জস্য ও শান্তির পথ নহে। কেশবচন্দ্র প্রথম বয়সে, ধর্ম ও সমাজসংস্কার-ব্রতে ব্রতী হইয়া, এই স্বত্বের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা; গুরুর প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে অসংস্কৃত ও অসিদ্ধ স্বাভিমানের স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা; সমাজের বিধি-

নিষেধাদির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তির স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা;—ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের কর্ম্যচেষ্টার মূল সূত্র ছিল। ধর্মের ও নীতির আবরণের দ্বারা সুসজ্জিত হইলেও কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের সমাজ ও ধর্ম-সংস্কার-প্রয়াস সর্ব বিঘ্নে ব্যক্তিগত Rights বা স্বত্বকেই জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর কেশবচন্দ্র ধর্মসাধনে ও সমাজশাসনে যে ব্যক্তিগত অনদীনতার আদর্শকে জাগাইয়া তুলিয়া দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার করেন, সুরেন্দ্রনাথ সেই আদর্শকেই রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া আপনার অনন্ত-প্রতিযোগী ঐতিহাসিক কীতি অর্জন করিয়াছেন।

আধুনিক যুগে কেশবচন্দ্রের পূর্বেই আমাদের দেশে এই ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছিল। একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারে, অত্মদিকে ডেভিড্ হ্যার এবং ডি, রোজেরিওর শিষ্যগণ সমাজ-সংস্কারে অষ্টাদশ-ঊঠ-শতাব্দীর ব্যক্তিত্বাভিমानी অনদীনতার বা Independence-এর আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি একদিকে আপনার কর্ম্যজীবনে এই দুই সংস্কার-স্রোতকে একীভূত করিয়া, জীবনের সকল বিভাগে এই অনদীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন এবং অতীতকালে এতাবৎকাল পর্যন্ত কার্য্যতঃ, যে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মোদ্যমের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হইতে-

ছিল, কেশবচন্দ্র সেই সকল বিচ্ছিন্ন শক্তি-কেন্দ্রকে একত্রিত করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া, এই সংস্কারকার্যে প্রবৃত্ত হ'ন। মহর্ষি প্রাচীন শাস্ত্র ও গুরুর প্রভুত্বই কেবল অস্বীকার করেন, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীকে আপনার স্বাভিমত কিস্বা সংজ্ঞানের (Conscience) উপরে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জ্ঞাত কোনও চেষ্টা করেন নাই। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়া, উপাসকগণের ধর্ম্ম-জীবন ও কর্ম্ম-জীবন পরিচালনায় শাস্ত্র-গুরুর প্রাচীন অধিকার মহর্ষির উপরেই অর্পণ করেন। প্রত্যেক সাধনাথীকে আপন আপন স্বাভিমত ও সংজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজে এক প্রকারের সাধারণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হ'ন। ধর্ম্ম সাধনে ব্যক্তিবিশেষের অসদ্ব্যবহার প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়াই কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে কেশবচন্দ্র যে কাজ করেন, আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বরেন্দ্রনাথও ঠিক সেই কাজটাই করিয়াছেন।

“ স্বরেন্দ্রনাথের পুণ্য আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবন

স্বরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের সূচনার বহুদিন পূর্বে হইতেই এ দেশের ইংরেজশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে সৃষ্টিমুখ করিয়াই স্বরেন্দ্রনাথ আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাবধিই বাংলার এবং বিশেষতঃ কলিকাতার সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বেসরকারী ইংরেজ প্রবাসীদের সঙ্গে

মিলিত হইয়া, সময়ে সময়ে, বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনাপন মতামত ব্যক্ত করিয়া তাহার পরিবর্তন বা সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। সময় সময় রাজপুরুষগণ নিজেরাই উপযাচক হইয়া বিশেষ বিশেষ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে চাহিতেন। বোধ হয় স্বরেন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, সেকালের বাংলার মনিষীবর্গ সকলেই, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন-ভুক্ত ছিলেন। সেকালে ইহারাই আপনাদের বিচার-বুদ্ধির অন্ত্যায়ী রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থাদির আলোচনা করিতেন এবং সময়ে সময়ে দেশের অভাব-অভিযোগের কথা রাজপুরুষদিগের গোচরে প্রেরণ করিতেন। রাজপুরুষেরাও ইহা-দিগকেই জনমণ্ডলীর স্বাভাবিক অপিনায়ক বা Natural Leaders বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহাদিগের মতামতের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করিতেন। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সভা সর্বদা জমীদারদেরই সভা ছিল। বাংলার, বিশেষতঃ কলিকাতারও তন্মিকটবর্তী স্থানের জমীদারগণের স্বত্বস্বার্থরক্ষার জ্ঞানই এই সভার জন্ম হয়। ইহার সভ্য এবং অপিনায়ক সকলেই জমীদার-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল জমীদার ছিলেন না বটে, কিন্তু জমীদারি স্বত্বস্বার্থের পরিপোষক এবং জমীদার-সমাজের মুখপাত্ররূপেই তিনি দেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ

করেন। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সভা জমীদারদিগের সভা হইলেও 'প্রয়োজনমত আপনাদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের রাষ্ট্রীয় স্বত্ব-স্বার্থসংরক্ষণে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের বিচার-আলোচনায় জনসাধারণের তো কথাই নাই, শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষেও শাফাৎভাবে যোগ দান করিবার অধিকার ও অবসর ছিল না। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সভার নেতৃবর্গ জমীদারী স্বত্ব-স্বার্থের সঙ্গে মিলাইয়া যতটা সম্ভব দেশের সাধারণ লোকের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে এক যোগে কোনো রাষ্ট্রীয় কৰ্ম সাধনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াস তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে জাগাইয়া, সংহত লোকমতের দুর্জয় শক্তি প্রয়োগে, রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত এ পর্যন্ত কোনো চেষ্টাই হয় নাই। অথচ দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের প্রাণে একটা বলবতী আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল।

আধুনিক স্বদেশাভিমান ও স্বাদেশিকতা

ফলতঃ যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরে একটা অসংযত ও অসঙ্গত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া প্রাচীন সমাজের শাসন ও পুরাণত ধর্মের বিশ্বাসকে ভাঙিয়া তাহাদিগকে ধর্মদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী করিয়া তুলে, তাহাতেই আবার তাঁহাদিগের প্রাণে এক নূতন স্বদেশাভিমানেরও সঞ্চার হয়। আমাদের সেইকালের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা বহুপরিমাণে যুরোপীয় আদর্শের

অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিল সত্য। ইহা সত্ত্বেও যে এই সকল সংস্কার-চেষ্টার অন্তরালে একটা প্রবল স্বদেশাভিমান জাগিয়া উঠিতেছিল ইহাও অস্বীকার করা যায় না। যুরোপীয় সমাজের তুলনায় আমাদের নিজেদের সমাজ-জীবন অতিশয় হীন, এবং যুরোপের যুক্তিবাদের তৌলদণ্ডে আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসাধনা অত্যন্ত ভ্রান্ত ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়াই বোধ হইত। আর এই হীনতাবোধ সর্বদাই আমাদের স্বদেশাভিমানে অত্যন্ত আঘাত করিত। এই বেদনার উত্তেজনাতেই, আমরা তখন এতটা দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাদের ধর্মের ও সমাজের সংস্কারসাধনে নিমুক্ত হইয়াছিলাম। আমাদের এই সংস্কার-চেষ্টা যদি সর্বতোভাবে খুঁটীয়ানী পড়া অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে সেই চেষ্টার ফলে আমাদের দেশে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতা ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু যে ব্যক্তিত্বাভিমান বা Individualism এবং যুক্তিবাদ বা Rationalism, আমাদের নিজেদের সমাজের ও ধর্মের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করিতে প্রণোদিত করে, তাহারই প্রভাবে আমাদের পক্ষে খৃষ্ট-ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন এবং যুরোপীয় সমাজবিধানের বশতগ্রহণও একান্তই অসাধ্য করিয়া তুলে। স্বদেশের বেদপুরাণাদিকে মনুষ্যপ্রতিভা-রচিত এবং সাধারণ মানব-বুদ্ধি-সহজ লম-কল্পনা-প্রসূত বলিয়া, প্রামাণ্য-মর্যাদা নষ্ট করিয়া, খুঁটীয়ানের বাইবেলকে ঈশ্বরপ্রণীত ও অত্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার আর কোনো পথ রহিল না।

শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব উড়াইয়া দিয়া, যীশু খৃষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করা অসাধ্য হইল। অথচ এইরূপ অবস্থাতেও যখন খৃষ্টীয়ান ধর্ম-প্রচারকেরা হিন্দু-ধর্মের উপরে নিজেদের ধর্মের আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সপ্রমাণ করিতে যাইয়া প্রতিবাদী ধর্মের মত-বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত ও সাধনার হীনতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহাদের এই অযথা নিন্দাবাদের ফলেই,—যে স্বদেশের ধর্মকে এককালে আমরা হীন বলিয়া বর্জন করিয়াছিলাম, তাহারই সম্বন্ধে ক্রমে আমাদের প্রাণে একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগিয়া উঠিল। মানুষ এ জগতে নিজের প্রাণের মধ্যে যে ভাব লইয়া অপর মানুষের নিকটে যায়, তাহার প্রাণেও অনক্ষিতে সেই ভাবেরই সঞ্চার করে। প্রেম এই জন্ত প্রেমকে ফোঁটায়। ঘৃণা ঘৃণাকেই বাড়াইয়া দেয়। একের অহঙ্কার-অভিমান, অপরের অহঙ্কার-অভিমানে আঘাত করিয়াই তাহাকে জাগাইয়া তুলে। মানব-প্রকৃতির এই নিয়ম-বশে খৃষ্টীয়ান ধর্ম-প্রচারকদিগের অসঙ্গত পক্ষাভিমান আমাদের অন্তরে স্বদেশের ধর্মসম্বন্ধেও একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগাইয়া দিল। যাহারা একদা স্বদেশের প্রচলিত ধর্মের সংস্কারকাণ্ডে ব্রতী হইয়া স্বদেশবাসিগণের নিকটে নিয়তই সেই ধর্মের ভ্রমপ্রমাদের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এখন তাঁহারা ই আবার জগতের অপরাপর ধর্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া আপনাদের প্রাচীন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান হইলেন। এইরূপে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাহাত্মা রাজনারায়ণ বসু, ইহারা সকলেই একদিকে যেমন প্রচলিত ক্রিয়াবহুল হিন্দুধর্মের সংস্কারের চেষ্টা করেন সেইরূপ অন্যদিকে, বিদেশীয় প্রতিবাদিগণের সমক্ষে এই ধর্মেরই সনাতন-তত্ত্ব ও চিরন্তন আদর্শের অনন্তসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপন্ন করেন। আপনাদিগের পুরাতন ধর্মের যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদের মধ্যে ক্রমে জাগিয়া উঠে তাহারই উপরে সর্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalism-এর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বহুবিধ মানসিক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে নবোদিত স্বাদেশিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে ইংরেজি শিক্ষার অনুপ্রাণনে এই নূতন স্বাদেশিকতার উৎপত্তি হয়, সেই শিক্ষারই বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, একদিকে দেশের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং অন্যদিকে ইংরেজ রাজপুরুষ ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে নানাবিধে একটা প্রবল প্রতিযোগিতা জন্মিতে আরম্ভ করে। এই প্রতিযোগিতা নিবন্ধন একদিকে এক অভিনব স্বদেশ-প্রীতি এবং অন্যদিকে একটা বিজাতীয় পরজাতি-বিদ্বেষও জাগিয়া উঠে। তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই নূতন স্বজাতি-বাংসল্য ও পরজাতি-বিদ্বেষ দুই-ই মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শনের” প্রতিষ্ঠা করেন। নব্যশিক্ষিত বাঙালী সমাজে বঙ্গদর্শন স্বদেশের প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি জাগাইয়া, এই নবজাত স্বদেশ-প্রীতিকে বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, রঙ্গলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র, মনোমোহন,

প্রভৃতির কবিপ্রতিভা, নানা দিকে ও নানা ভাবে এই স্বদেশাভিমানকে ফুটাইয়া তুলে। হেমচন্দ্রের “ভারতসঙ্গীত”; সত্যেন্দ্রনাথের “গাও ভারতের জয়, হোক ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়”; গোবিন্দচন্দ্রের “কতকাল পরে, বল ভারতেরে” এবং প্রাচীন স্মৃতিবাহিনী “যমুনা লহরী”; মনোমোহনের “দিনের দিন সবে দীন”;—এই সমুয়েই এই সকল জাতীয় সঙ্গীত প্রচারিত হয়। দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ” ইহার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের “শরৎ-সরোজিনী” ও “সুরেন্দ্র-বিনোদিনী” নীলদর্পণের মর্ম্মঘাতিনী উদ্দীপনাতে নূতন ইন্দ্রন সংযোগ করিয়া দেয়। নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ পুনঃ পুনঃ এই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া ইহাদিগের শিক্ষা ও উদ্দীপনাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। এই সময়েই নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ” প্রকাশিত হইয়া দেশের নবজাত স্বদেশ-প্রীতিকে আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। “ভারত মাতা” প্রভৃতি নূতন গীতি-নাট্য এই অভিনব স্বদেশ-প্রীতিকে এক নূতন দেবভক্তির আকারে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-ভক্তির স্রবধুনী-স্রোত যখন শিক্ষিত বঙ্গসমাজের প্রাণকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক নূতন চেতনার সঞ্চাব করিতে আরম্ভ করে, তখন এই স্বাদেশিকতার তরঙ্গ-মুখে, এই নূতন দেশচর্য্যার পুরোহিতরূপে, সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ’ন। আর দৈবরূপায় দেশ-কাল-পাত্রের একরূপ শুভ-যোগাযোগ ঘটয়াছিল

বলিয়াই, তাহার কর্ম্মজীবন এমন অনন্ত-সাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার শিক্ষা

কোনো দেশে যখন কোনো নূতন ভাব ও আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন সর্ব্বাদৌ তাহা উদারমতি, বিষয়বুদ্ধিবিশীন, উদ্যমশীল যুবকমণ্ডলীর চিত্তকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশের এই নবজাত স্বদেশ-প্রেমও সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষার্থী যুবক-গণের চিত্তকে অধিকার করে এবং তাহাদের যৌবনস্বভাবস্বলভ কল্পনা ও ভাবুকতাকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠে। আর এই জন্ত এই অভিনব স্বাদেশিকতা প্রথমেই কোনো প্রকারের বস্তুতন্ত্রতা ও লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার সহযোগী সাহিত্যিকগণ বঙ্গদর্শনের সাহায্যে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বজাতির প্রাচীন গৌরবস্মৃতি জাগাইয়া কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের নূতন স্বাদেশিকতাকে একটা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, সত্য। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের এবং সাধারণ সভ্যতার ও সাধারণ লুপ্ত-গৌরবের উদ্ধারে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বতন রাষ্ট্রীয় জীবনের আলোচনায় সে পরিমাণে মনোনিবেশ করে নাই। বিশেষতঃ দেশের আধুনিক রাষ্ট্রীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিচার-আলোচনা কখনই প্রকাশ্যভাবে বঙ্গদর্শনে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। “কমলাকান্তের দপ্তরে” লেখকের অসাধারণ স্নেহালঙ্কারে আচ্ছাদিত হইয়া, আধুনিক ভারতের অনেক রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও আদর্শেরই

গভীর আলোচনা রহিয়াছে, সত্য; কিন্তু অতি অল্প লোকেই সে সময়ে “কমলাকান্তের” স্বমধুর বিক্রপাত্মক স্বরসিকতার নিগূঢ় মর্ম্ম-উন্মেষটিনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নব্য-শিক্ষাভিমानी লোকেও কেবল তাঁহার অপূৰ্ণ সাহিত্যরসটুকুই আশ্বাদন করিতেন, লেপকের অদ্ভুত কৌতুককুশলতা এবং অসাধারণ শব্দসম্পদ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু এ সকল ছলাকলার অন্তরালে যে গভীর সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্ব লুকাইয়াছিল, তাহার সন্ধানলাভ করেন নাই। এই সকল কারণে, বঙ্গদর্শন নানাদিক্ দিয়া আমাদের নবজাত স্বাদেশিকতাকে পূরিপুষ্ট করিয়াও, বিশেষভাবে ইহাকে বশ্বতন্ত্র করিয়া তুলিতে পারে নাই। স্বরেন্দ্রনাথই প্রথমে এই স্বাদেশিকতার মধ্যে এক অভিনব এবং উন্মাদিনী ঐতিহাসিকী উদ্দীপনার সঞ্চার করেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের মধ্যে স্বদেশের ইতিহাসের জ্ঞান ছিল না বলিলেও, অতুলিত হয় না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে কিয়ৎ পরিমাণে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া হইত বটে, কিন্তু সে সকল ইতিহাস ইংরেজেরই রচিত ছিল। সেকালে যুরোপেও ইতিহাস বলিতে লোকে কেবল কতকগুলি রাজার নাম এবং তাঁহাদের যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণই বুঝিত। ইতিহাস যে সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গ, ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে যে মানব-প্রকৃতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার আত্মচরিতার্থতা-লাভের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান থাকে, এক যুগের ইতিহাস যে পরবর্তী যুগের জনমণ্ডলীর কর্ম্মজীবনের

উদ্দীপনার ও শিক্ষার মূল সূত্রগুলি আপনার পশ্চাতে তাহাদিগের জন্য রাখিয়া যায়, এ সকল কথা সে কালের যুরোপীয় ঐতিহাসিকেরাও ভাল করিয়া ধরেন নাই। ঐতিহাসিক আলোচনার এই পদ্ধতি তখনো ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং আমরা চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্থলকালেজে যে সকল ইতিহাস পাঠ করিতাম, তাহার ভিতরে কোনো উন্নত আদর্শ কিম্বা কর্ম্মের উদ্দীপনা আছে, ইহা অনুভব করিতে পারি নাই। আর এই কারণেই যদিও ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের—আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন গ্রীস, রোম ও মধ্যযুগের যুরোপজুগের—ইতিহাসও পাঠ করিতাম, কিন্তু এ সকল আমাদের প্রাণে কোনো প্রকারের সজীব স্বদেশ-প্রেমের কিম্বা উদার মানব-প্রেমের সঞ্চার করিতে পারিত না। স্বরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই সর্বপ্রথমে আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমক্ষে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই যে সেই জাতির স্বদেশভক্তির আলম্বন ও প্রতিষ্ঠা এই সত্য প্রচার করিলেন।

স্বরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ৩ আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের একযোগে সর্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দকে লইয়া এক ছাত্র-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাত্র-সভাই তাঁহার স্বাদেশিক কর্ম্মের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। যে অলোকসামাগ্র বাগিতা-শক্তির প্রভাব ক্রমে সমগ্র ভারতের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তকে অধিকার করিয়া তাঁহার অনন্তপ্রতিযোগী ঐতিহাসিক প্রতিপত্তির

প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কলিকাতার এই ছাত্র-সভাতেই তাহা সর্বপ্রথমে ক্ষুরিত হয়। এই ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথ “শিখ-শক্তির অভ্যুদয়”—*The rise of Shikh Power*,—সম্বন্ধে যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার স্মৃতি,—সেই বক্তৃতা যাহারা শুনিয়াছিলেন—তাহাদিগের চিত্ত হইতে কখনই লুপ্ত হইবে না। শিখধর্মের উৎপত্তি, শিখ খালসার প্রতিষ্ঠা, প্রথমে মোগল এবং পরে ব্রিটিশ প্রভুশক্তির সঙ্গে, শিখ খালসার যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, সেকালের স্থলপাঠ্য ভারত ইতিহাসের মধ্যেও ছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমন নহে। কিন্তু সেই সকল পূর্বপরিচিত ঘটনার অন্তরালে স্বরাষ্ট্র-প্রীতির যে শক্তিশালিনী উদ্দীপনা বিद्यমান ছিল, সুরেন্দ্রনাথের তড়িতসঞ্চারিণী বাগ্মী-প্রতিভাই সর্বপ্রথমে আমাদের নিকট তাহা ফুটাইয়া তুলে। সেই হইতেই এদেশের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম ও উন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ছাত্রপতি মহারাজা শিবাজি আধুনিক ভারতক্ষেত্রে যে এক বিশাল হিন্দুরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার মর্যাদাজ্ঞান তখনো আমাদের জন্মায় নাই। সুতরাং সে সময়ে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উদ্দীপনা আমাদের নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাকে স্পর্শ করে নাই। আমাদের এই নূতন স্বাদেশিকতা তখন একটা কল্পিত বিশ্বজনীনতার ভাব অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটা স্বদেশাভিমান মাত্র আমাদের চিত্তকে তখন

অধিকার করিয়াছিল। হিন্দু বলিয়া কোনো গৌরবাভিমান তখনো আমাদের মধ্যে জন্মায় নাই। হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রাণহীন কর্মকাণ্ডে আমাদের পুরুষাভুগত বিশ্বাস একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। জাতিভেদ-প্রদীপিত হিন্দুসমাজের প্রতিও গভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই সকল কারণে ছাত্রপতি মহারাজা শিবাজি ভারতে যে মহা হিন্দুরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার প্রকৃত মর্ম ও উন্নত মর্যাদা উপলব্ধি করিবার অধিকার আমাদের ছিল না। অল্প পক্ষে বাবা নানক প্রবর্তিত ধর্মে একদিকে যেমন কোনো প্রকারের কর্মবাহুল্য ছিল না, অল্প দিকে সেইরূপ গুরুগোবিন্দ-প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে জাতিবর্ণগত কোনো বৈষম্যও ছিল না। শিখ খালসা বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডের পিউরিট্যান (Puritan) সাধারণ-তন্ত্রের বা Commonwealth অনুরূপ ছিল। আর এই জগুই আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও যুরোপীয় সাধনায় অভিভূত চিত্তকে শিখ ইতিহাসের উদ্দীপনাতে এমন প্রবলভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিল। টেডের রাজস্থান ইহার অনেক পূর্বেই রচিত হইয়াছিল বটে এবং রঙ্গলালের পদ্মিনীর উপাখ্যানের ভিতর দিয়া রাজপুত-সমাজের অলৌকিক স্বদেশচর্য্যার উদ্দীপনা বাংলা সাহিত্যেও প্রবেশ করিয়াছিল, সত্য; কিন্তু পদ্মিনীর উপাখ্যান যে একান্তই “পৌরাণিকী” কাহিনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, এই জ্ঞান তখনো খুব পরিপুষ্ট হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের মুখে শিখ ইতিহাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষু রাজপুতনার কীর্তিকাহিনীর উপরেও

গিয়া পড়িল। এইরূপে 'স্বরেজনাথই সর্ব প্রথমে আমাদের নিকটে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে এক নূতন প্রাণতার প্রতিষ্ঠা করেন।

যেমন ভারতের ইতিহাস পড়িয়াও আমরা এতাবৎ কাল পর্যন্ত তাহা হইতে প্রকৃত পক্ষে কোনো প্রকারের সত্য স্বদেশিকতার উদ্দীপনা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সেইরূপ যুরোপীয় ইতিহাস পড়িয়াও তাহার ভিতরে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, তাহাও ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। স্বরেজনাথের বাগ্মী-প্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক যুরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্‌সিনির দৈবী প্রতিভা, গ্যারীবল্লীর স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে অদ্ভুত কর্মক্ষেপ, য়ুন-ইতালী (Young Italy) সম্প্রদায়ের এবং নব্য আয়র্লণ্ডের (New Ireland) আত্মোৎসর্গপূর্ণ দেশচর্যা, এ সকলের কথা স্বরেজনাথই সর্ব প্রথমে এদেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহল পরিমাণে কবি-কল্পনা ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের এবং বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অল্প প্রাণিত হইয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিল।

স্বরেজনাথের রাষ্ট্রীয় কর্ম-জীবনের ব্যাপকতা .

এইরূপে স্বরেজনাথ যে স্বদেশ-প্রীতিক্রমে আশ্রয় করিয়া আপনার রাষ্ট্রীয় কর্ম-জীবনের প্রতিষ্ঠা করেন, প্রথমাবধি সমগ্র ভারতবর্ষই তাহার উপজীব্য ছিল। বাঙালীর

প্রকৃতির এবং বাংলার ইতিহাসের বিশেষত্ব হইতেই আমাদের স্বদেশ-প্রীতির এই অপূর্ণ উদারতার উৎপত্তি হইয়াছে। এই আধুনিক স্বাদেশিকতা এ পর্যন্ত বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব, এই তিন প্রদেশেই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাংলার স্বাদেশিকতার আদর্শ যতটা উদার ও উন্নত, মহারাষ্ট্রের কিম্বা পাঞ্জাবের স্বাদেশিকতার আদর্শ ততটা উদার ও উন্নত নহে। ইংরেজ এদেশে না আসিলে ভারতবর্ষে মারাঠা ও শিখ, ইহারা ই সম্ভবতঃ মোগলের উত্তরাধিকারী হইয়া দেশের শাসন-শক্তিকে অধিকার করিয়া বসিতেন। ব্রিটিশ-প্রভুশক্তির প্রতিষ্ঠায় তাঁহাদের সে আশা নির্মল হইলেও তাহার স্থিতি শিখ বা মারাঠার চিত্ত হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। আর এই কারণে পাঞ্জাবের কিম্বা মহারাষ্ট্রের স্বাদেশিকতার মধ্যে একটা প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্ব লুকাইয়া আছে। বাংলায় সেরূপ কোনো ঐতিহাসিক স্থিতি নাই বলিয়াই, বাঙালীর স্বাদেশিকতার কোনো প্রাদেশিক আশ্রয়ও নাই। অত্যাধিক বাঙালীর প্রকৃতিও শিখ বা মারাঠার প্রকৃতির মত নহে। শিখ খালসা ভারতমাতার বাহুতেই বল সঞ্চার করিয়াছে, কিন্তু বিশেষ ভাবে তাঁহার বাগী-শক্তি অধিকার করিতে পারে নাই। অত্যাধিক মারাঠা ও বাঙালী ইহাদের বুদ্ধি-বল ভারতের অপরাপর জাতির বুদ্ধি-বল হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও বাঙালীর বুদ্ধিতে ও মারাঠার বুদ্ধিতে প্রভেদও বিস্তর। মারাঠার বুদ্ধি কার্য্যকরী, ইংরাজিতে ইহাকে practical বলে। বাঙালীর বুদ্ধি ভাবময়ী, ইংরাজিতে ইহাকে idealistic বলা যায়। কার্য্যকরী বুদ্ধি ফলসম্বন্ধে ;

কর্মাকর্মের আসন্ন ফল লক্ষ্য করিয়া চলে। ভাবময়ী বুদ্ধি সত্যসন্ধিস্থ; কর্মাকর্মের প্রত্যক্ষ ফলাফলকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাবযাজ্যে ও তত্ত্বাস্তে তাঁহার কি পরিণাম ঘটিবে, তাহাই কেবল দেখে। কার্য্যকরী বুদ্ধি আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া বাস্তবকে ধরিতে চাহে; ভাবময়ী বুদ্ধি বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া আদর্শেতেই আত্মসমর্পণ করে। দেশচর্য্যায় কার্য্যকরী বুদ্ধির প্রেরণা প্রাদেশিকতাকে বাড়াইয়া তোলে এবং স্বদেশ-ভক্তিকে সন্ধীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক করিয়া ফেলে। ভাবময়ী বুদ্ধি দেশচর্য্য ও দেশভক্তিকে সর্ব প্রকারের প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা হইতে যথা-সম্ভব মুক্ত করিয়া উদার ও সার্বজনীন করিতে চাহে। রাষ্ট্রীয় জীবনে কার্য্যকরী বুদ্ধি আসন্ন-ফলসন্ধিস্থ politicianএর বা রাজনীতিকের সৃষ্টি করে। আর ভাবময়ী বুদ্ধি দূরদর্শী ও সম্যকদর্শী নীতিজ্ঞ বা Statesmanএরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রের ও বাংলার কর্ম-জীবনের তুলনায় এই দুই জাতীয় মানববুদ্ধির ভেদাভেদের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

আর বাঙালীর প্রকৃতির গুণে এবং আধুনিক বাংলার ইতিহাসের কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয় গৌরবশ্রুতির অভাবে, আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতা যেমন সমগ্র ভারতবর্ষকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ বাঙালী কর্মনায়ক স্বরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্মজীবনও সমগ্র ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়াই গড়িতে আরম্ভ করে। স্বরেন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্র প্রাদেশিক শাসনের ভালমন্দ লইয়াই বিব্রত এবং

প্রাদেশিক জীবনের সন্ধীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কবি-কল্পনাতে এবং সংবাদ-পত্রেই কেবল ভারতের রাষ্ট্রীয় একত্ব বোধের কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইত, নতুবা এক প্রদেশের স্থখ-দুঃখ অথবা প্রদেশের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিত কি না সম্ভেদ। কলিকাতার ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-সভা, পুনার সার্বজনিক সভা ও মাদ্রাজের মহাজন-সভা, এ সকলই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান ছিল। স্বরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও উত্তোষে যে ভারতসভার বা Indian Associationএর জন্ম হয়, তাহাট সর্ব প্রথমে এই প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম ও চিন্তাকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক বিশাল কর্মজালে আবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই ভারত-সভার জন্ম হয় এবং অল্প দিন মধ্যেই উত্তর ভারতের বড় বড় সহরে শাখা সভা সকল গঠিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে প্রয়াগে, কাণপুরে, মীরাতে ও লাহোরে শাখা-ভারতসভার প্রতিষ্ঠা হয়। আজ কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সংহত করিবার জন্ত যে চেষ্টা করিতেছে, চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে স্বরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভাই প্রকৃত পক্ষে সর্ব প্রথমে সেই চেষ্টার সূত্রপাত করে। যে স্বদেশভিমানকে আশ্রয় করিয়া ভারত-সভা দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে বাড়াইয়া ও গড়িয়া তুলিতেছিল, কংগ্রেসের জন্ম নিবন্ধন যদি তাহা একান্ত বহির্ভূত হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে আর প্রজাশক্তি কতটা পরিমাণে যে সংহত

সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত ইহা এখন
কল্পনা করাও স্বকঠিন।

কলতঃ কংগ্রেসের জন্মের পূর্ণ হইতেই
সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারতসভার কর্মনাৎকরণ
একটা বিরাট জাতীয়-সমিতি গঠন করিবার
চেষ্টা করেন। এই আদর্শের অনুসরণেই
নানা স্থানে শাখা ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা
হয়। আর কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে চতুর
রাষ্ট্রনৈতিক লাট ডক্ট্রিনেরও যে কতটটা
সম্বন্ধ ছিল, ইহা এখন সকলেই জানেন।
সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ দেশে যে বিপুল
প্রজাশক্তি জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, তাহার
প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যে কংগ্রেসের
জন্ম হয় নাই, এ কথা বলাও কঠিন।
বোম্বাইয়ে গোপনে গোপনে যখন কংগ্রেসের
প্রথম অধিবেশনের আয়োজন হইতেছিল,
সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন
ভারতসভার তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় একটা
জাতীয় সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন এবং কংগ্রেস-
ের অধিবেশনের সমকালেই কলিকাতার
আলবার্ট হলে জাতীয়-সমিতির বা National
Conferenceএর অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ
কংগ্রেসের সংবাদ রাখতেন কি না, জানি না।
কিন্তু এই কনফারেন্সে দেশের নানাস্থান হইতে
যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁরা
যে কংগ্রেসের কথা কিছুই শুনে নাই,
ইহা জানি। ইহারা সকলেই এই National
Conferenceকে ভারতের 'রাষ্ট্রীয়' একতর
এবং ভবিষ্যৎ প্রজাশক্তির আধার
বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। আর কংগ্রেস
যদি সহসা এই স্থানটা পূর্ণ করিতে অগ্রসর
না হইত, তাহা হইলে আজ সুরেন্দ্রনাথের

এই National Conference আয়াদিগের
রাষ্ট্রীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম শক্তি-কেন্দ্র
হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের
প্রতিষ্ঠাতা ভারত-গবর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত
প্রধান সেক্রেটারী এল্যান ও হিউম।
ইহার পৃষ্ঠপোষক কলিকাতার প্রবীণতম
ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
বোম্বাইয়ের প্রধানতম কোম্পিলী ফিরোজসা
মেহেতা, মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ উকীল সুব্রহ্মণ্য
আয়ার। কংগ্রেস এই রূপে প্রথম হইতেই
অসাধারণ পদ-বল ও ধনবলের উপরেই
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুরেন্দ্রনাথের কর্ম-চেষ্টার
অন্তব্যাল তখন এ ছুঁয়ের কিছুই ছিল
না। সুতরাং কংগ্রেস যে সুরেন্দ্রনাথের
প্রতিষ্ঠিত National Conferenceকে সহজেই
আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল, ইহা কিছুই
আশ্চর্য্য নহে। আর ইহাতে প্রকৃত
পক্ষে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষতি
হইয়াছে, না লাভ হইয়াছে বলা কঠিন
নহে। কংগ্রেস যতটা রাতারাতি বাড়িয়া
উঠিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের কনফারেন্সেব পক্ষে
তাটা সম্ভব হইত না।— অতীতকে
সুরেন্দ্রনাথের এই কর্ম-চেষ্টা যদি কংগ্রেসের
দ্বারা এতরূপে বাহত না হইত, তাহা হইলে
দেশে আজ যে প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় জীবন
ও লোকমত গড়িয়া উঠিত, কংগ্রেস তাহা
যে কেবল গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহা
নহে, কিন্তু সাক্ষ্য ভাবে তাহার ব্যাঘাতই
জন্মাইয়াছে। কংগ্রেস দেশের অনেক
কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ
ভারতের জেলায় জেলায় লোকমত সঞ্চারিত
জন্ত যে সকল রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলেন ও করিতেছিলেন সে গুলির শক্তিহরণ করিয়া কংগ্রেস দেশের প্রকৃত রাষ্ট্রীয় জীবনকে যে দুর্বল করিয়াছে ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কংগ্রেসের প্রধান কীৰ্ত্তি তুটী --- এক লাট ক্রেসের ১৮৯১ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট, আর অন্য লাট মলের আধুনিক কাউন্সিলসংস্কার। কিন্তু দেশের জেলায় জেলায় যে সকল রাষ্ট্রীয় সভা গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাকে নষ্ট করিয়া দেশের কংগ্রেস দেশের যে ক্ষতি করিয়াছে এ সকলের কিছুতেই সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই ও হইবে না। ফলতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে স্বরেজনাথের অনন্তপ্রতিযোগী অধিনায়কত্ব লাভের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন হইতে স্বরেজনাথ কিয়ৎ পরিমাণে কংগ্রেসের অর্থশালী নেতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া, আপনি প্রথমে যে পথে চলিয়া দেশের প্রজাশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, সে পথ অনেকটা পরিত্যাগ করিয়া, বহুল পরিমাণে আপনার কর্মজীবনের সম্পূর্ণ সফলতার ও ব্যাঘাত উৎপাদন করেন।

কিন্তু ইহাতে যে দেশের কোনো সাংখ্যাতিক ক্ষতি হইয়াছে, এমনও বলিতে পারি' না। স্বরেজনাথের প্রথম জীবনের কর্মক্ষেত্রে সময়োপযোগী হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্বদেশের প্রাচীন সভ্যতার ও সাধনার কিম্বা তাঁহার স্বদেশী লোকপ্রকৃতির অনুযায়ী হয় নাই। সমাজসংস্কারে কেশবচন্দ্র যেমন প্রথম জীবনে বহুল পরিমাণে বিদেশীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়া সমাজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিরোধই জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু

কোথায় যে সেই বিরোধের সঙ্গতি ও মীমাংসা হইবে, তাহার নিগূঢ় সন্ধান ও সঙ্কেত দিতে পারেন নাই; স্বরেজনাথও সেইরূপ ইংরেজ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া শাসনসংস্কার করিতে যাইয়া, শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরোধই জাগাইয়া তুলেন, কিন্তু কোন্ পথে যাইয়া শাসিতেরা যে প্রকৃত পক্ষে আয়-চারিতার্থে লাভ করিতে সমর্থ হইবে, আর কোন্ স্বত্র ধরিয়াই বা এ দেশের শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে বিরোধ জাগিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে, এ পর্য্যন্ত স্বরেজনাথ সে সন্ধান এবং সঙ্কেত প্রাপ্ত হন নাই। স্বরেজনাথ ইংরেজের নিকট হইতেই রাষ্ট্রনীতির যাবতীয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আর ইংলণ্ডের ইতিহাসে যে পথে স্বৈচ্ছাচারী রাজশক্তিকে সংবত করিয়া ক্রমে প্রজাশক্তি স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্তমান প্রজাতন্ত্রশাসন-প্রণালীকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই পথই স্বরেজনাথের সুপরিচিত। স্বরেজনাথের অলোকসামান্য মেধা আছে, কিন্তু চিন্তার মৌলিকতা নাই। যেটী যেখন আছে তা হইয়াছে, তিনি তাহাকে সেইরূপ ভাবেই ধরিতে পারেন, কিন্তু যে মানসিক শক্তিচারি দিকের বিষয় ও বস্তুর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কোনো নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারে, সেই শক্তি স্বরেজনাথের নাই। সুতরাং স্বদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের সংস্কার ও বিকাশ সাধনে বর্তী হইয়া স্বরেজনাথ ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির চিরাত্তর পথ ধরিয়াই চলিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের সভ্যতা, সাধনা ও প্রকৃতির অনুযায়ী নূতন পথের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ইংরেজের ভাষা যে তাঁর স্বদেশের লোকের

বুঝিতে পারে না, ইংরেজের ভাব যে তাগা ধরিতে পারে না, ইংরেজের পথ যে তাদের একেবারেই অপরচিত, ইংরেজের প্রকৃতি যে তাহাদের প্রকৃতি হইতে একান্তই ভিন্ন; এসকল কথা সুরেন্দ্রনাথ এখনও ভাল করিয়া বুঝেন কি না সন্দেহ। আর স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, স্বদেশের লোকপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের চিন্তার এবং আদর্শের কোন জীবন্ত যোগ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবনব্যাপী রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যম কেবলমাত্র একটা অসম্বন্ধ, অনির্দিষ্ট, প্রবল রাষ্ট্রীয় অভাববোধকেই জাগাইয়াছে; কিন্তু এখনোও দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনো অঙ্গকেই গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। এইরূপ অভাববোধ হইতে উন্মাদিনী বিপ্লবশক্তির জন্ম হইতে পারে, কিন্তু কখনই দূরদর্শিনী রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।

কলতঃ সুরেন্দ্রনাথ যে পথ ধরিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান কোনো সম্প্রদায়েরই প্রাণগত যোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এদেশের হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিরই ধর্মভাব অত্যন্ত প্রবল। ধর্মই তারা বোধে, ধর্মের নামেই তারা মাত্রে, ধর্মের সঙ্গে যার যোগ নাই, এমন কোনো কিছু তাহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই এদেশের জনগণের বিশেষত্ব। অথচ সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় কর্মনায়কগণ সকলেই স্বজাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে জনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়াও কখনই এই সর্বজনবিদিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া

চলেন নাই। তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং রাষ্ট্রনীতি আজি পর্যন্ত মোক্ষসম্পর্ক-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের সর্বপ্রকারের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও আলোচনা দেশের মুষ্টিমেয় নব্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের উপরেই বাহা কিছু আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত জন-মণ্ডলীর চিত্তকে স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয় নাই। কিন্তু যাহারা ক্রমে ক্রমে নূতন পথ ধরিয়া, নূতন মন্ত্র সাধন করিয়া, দেশের জন-মণ্ডলীর চিত্তে এক নবশক্তির সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বাদেশিক উদ্দীপনার জন্ত সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার নিকট চিরঞ্জলী রহিয়াছেন। আজ দেশে যে নূতন আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে ও জনগণের চিত্তে যে নূতন শক্তির সঞ্চার হইতেছে তাহা কোনো কোনো দিকে সুরেন্দ্রনাথের আদর্শের এবং কর্মচেষ্টার বিরোধী হইলেও যে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা-দীক্ষার শ্রেষ্ঠতম ফল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সুরেন্দ্রনাথের অশেষপ্রকারের ক্রটি দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি যে কাজটা করিয়াছেন তাহা না করিলে আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবন যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, কখনই সে ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত না। তিনি এই জাতীয় জীবনের গঠনে যে কাজটা করিয়াছেন, সে কাজ অপর কেহ করেন নাই, এবং করিতে পারিতেনও না। আর এইজন্যই আধুনিক ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের স্থিতি এমন অক্ষয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

জীবনচন্দ্র পাল।

বাঙলা-লেখার রীতি

বর্তমান বাঙলা ভাষার দিকে লক্ষ্য করিলে সহজেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বহু লেখাতেই অনেকস্থলে শব্দসমূহের পরস্পর সম্বন্ধরক্ষা নাই, বা থাকিলেও যথোচিত চিহ্নদ্বারা তাহা সূচিত হয় না। বলিবার সময় ভাষায় যে ক্রটি লক্ষিত হয় না, লিখিবার সময় তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

অনেকে লিখিয়া থাকেন ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চা’, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ‘প্রাকৃতিক’ পদের সহিত ‘বিজ্ঞান’ পদের, এবং ইহার সহিত ‘চর্চা’ পদের সম্বন্ধ; অতএব সংযুক্ত করিয়া লিখিতে হইবে ‘প্রাকৃতিকবিজ্ঞানচর্চা।’

লিখিত হইয়া থাকে ‘অত্মরূপ ফললাভাশা’, এখানে ‘অত্মরূপ’ পদের ‘ফললাভাশা’ পদের সহিত সম্বন্ধ নহে, ‘ফল’ পদের সহিত সম্বন্ধ। অতএব লেখা উচিত ‘অত্মরূপ-ফললাভাশা’ অথবা ‘অত্মরূপফললাভাশা’।

সমস্ত পদ অতিদীর্ঘ হইয়া উঠিলে পদগুলিকে হাইফেন ও কমা যোগে পৃথক পৃথক করিয়া লিখিলে পাঠের কোন অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন, ‘প্রবাদ-কাহিনী-ও জনশ্রুতি-সমূহ।’ এখানে ‘সমূহ’ পদের ‘প্রবাদ’, ‘কাহিনী’ ও ‘জনশ্রুতি’ এই তিনটি পদেরই সম্বন্ধ, এবং তাহা পূর্বোক্তরূপে স্পষ্টভাবে সূচিত হয়।

লেখা হয় ‘ধাতু ও প্রস্তরময়ী মূর্তি।’ এখানে ‘ধাতু’ ও ‘প্রস্তর’ উভয়েরই সহিত সম্বন্ধ-প্রত্যয়ের সম্বন্ধ। অতএব তাহার

সূচনার জন্ত হাইফেন দিয়া লিখিতে হইবে ‘ধাতু-ও প্রস্তর-ময়ী মূর্তি।’ এইরূপ ‘ধাতু-ও প্রস্তর-মূর্তি।’ ‘ধাতু ও প্রস্তরমূর্তি নহে’; ‘স্থাপত্য-ও ভাস্কর্য্য-বিদ্যা’, ‘স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যবিদ্যা’ নহে; ‘ঋক্-ও সাম-বেদ’, ‘ঋক্ ও সামবেদ নহে’; ‘জাতি-ও ধর্ম্ম-নির্কির্শেষে’, ‘জাতি ও ধর্ম্মনির্কির্শেষে’ নহে; ‘যুক্তি-ও তর্ক-বলে’, ‘যুক্তি ও তর্কবলে’ নহে। ‘সং-, চিৎ-ও আনন্দ-স্বরূপ’, ‘সং, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ’ নহে; ‘হিন্দু-, বৌদ্ধ-ও জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী’, ‘হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মাবলম্বী’ নহে; ‘নিন্দা- বা প্রশংসা-মাত্র’, ‘নিন্দা বা প্রশংসামাত্র’ নহে; ইত্যাদি।

আবার ‘ঐ সমস্ত যুক্তিতর্কপ্রদর্শন’ না লিখিয়া ‘ঐ সমস্ত যুক্তিতর্ক-প্রদর্শন’ লেখা সঙ্গত, ইহাতে ‘সমস্ত’ পদের সহিত ‘যুক্তিতর্ক’ পদের সম্বন্ধ সূচিত করিতে পারা যায়।

‘তিনি যে শিক্ষার পক্ষপাতী তাহা কল্যাণকর নহে’ এই ব্যাক্যটিকে অসন্দিগ্ধ-করিবার জন্ত বক্তার বিবক্ষা-অনুসারে দুই প্রকারে লিখিতে পারা যায়—‘তিনি যে, শিক্ষার পক্ষপাতী ইত্যাদি;’ অথবা তিনি যে-শিক্ষার পক্ষপাতী ইত্যাদি; এইরূপ ‘তখন যে-কোন ব্যক্তি’, অথবা ‘তখন যে, কোন ব্যক্তি’; ‘কল্যা যে-কেহ আসিবে’, অথবা ‘কল্যা যে, কেহ আসিবে’; ইত্যাদি।

‘এই পুস্তকখানি তাঁহার জনৈক শিষ্য প্রণীত’ অথবা ‘এই.....শিষ্যপ্রণীত লেখা।’

টিক নহে, লেখা উচিত ‘এই...শিষ্য প্রণীত’, ইত্যাদি বাক্যগুকে হাইফেন দিয়া যোগ তাহা হইলেই ‘শিষ্য’ পদের স্থায় ‘জটনৈক’ পদেরও ‘প্রণীত’ পদের সহিত সম্বন্ধ সূচিত হইতে পারে।

‘সত্য সত্যি’, ‘প্রধান প্রধান’ ইত্যাদি পদগুলিকে সংযুক্ত করিয়া অথবা স্থানবিশেষে হাইফেন দিয়া লেখা উচিত। যথা, ‘সত্যসত্যি’, ‘প্রধানপ্রধান’, অথবা সত্য-সত্যি, প্রধান-প্রধান; ‘এক-এক’, ‘আর-আর’, ‘অন্ত-অন্ত’; ইত্যাদি। ‘মুসলমান অধিকার প্রবর্তনের পর’ না লিখিয়া ‘মুসলমান-অধিকার-প্রবর্তনের পর’ লেখা সম্ভব। ‘দ্বারবর্তী অভিমুখে’ না লিখিয়া ‘দ্বারবর্তী-অভিমুখে’ লেখা উচিত। ‘যে যে রাজ্যে রেশম, পশম, কার্পাসাদিজাত বস্ত্র স্থলে ‘যে যে রাজ্যে ‘রেশম-পশম-কার্পাসাদি-জাত’ অথবা ‘যে যে রাজ্যে রেশম, পশম- ও কার্পাসাদিজাত’ লেখা সম্ভব। ‘এই কর্ম বহুল আয়াসসাধ্য’ না লিখিয়া ‘এই কর্ম বহুল-আয়াস-সাধ্য’ লেখা উচিত। এইরূপ ‘উচ্ছৃঙ্খলতা- ও যথেষ্টাচারপ্রভৃতি-নিবারণ’, ‘উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেষ্টাচার প্রভৃতি নিবারণ নহে’; ‘শারীরিকসুখলাভই পুরুষার্থ’, ‘শারীরিক সুখলাভই পুরুষার্থ’ নহে।

‘যা তা’, ‘যে সে’, ‘কোন না কোন’

ইত্যাদি বাক্যগুকে হাইফেন দিয়া যোগ করিয়া, লিখিলেই ভাল হয়; যথা, ‘যা-তা’ ‘যে-সে’, ‘কোন-না-কোন’।

ইহা ছাড়া মুদ্রিত পুস্তকসমূহে মুদ্রণসম্বন্ধে সামান্য-সামান্য এত ক্রটি পরি-লক্ষিত হয় যে, সাধারণ পাঠকও একটু অন্তর্ধান করিলে বুঝিতে পারেন। কিন্তু কোনো সমালোচকও ইহার সংশোধনের দিকে সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না। যে সকল সম্পাদক নিজ নিজ মাসিকপত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে কুঠা বোদ করেন না, ছংখের বিষয়, তাঁহারাও এ সম্বন্ধে কোনোরূপ মনোযোগ করেন নাই।

‘গুরুত্ব প্রভৃতি’ সূচনার জন্ত ইংরাজীতে ইটালিক অক্ষর ব্যবহৃত হয়। দেবনাগর তদনুসরণে স্বতন্ত্র অক্ষর করিয়া লইয়াছে। বাংলা এ বিষয়ে এখনো পশ্চাৎপদ। আমি এ অভাব অমুদ্রব করিয়া সেই-সেই শব্দের অক্ষরগুলিকে ফাঁক-ফাঁক করিয়া লিখিবার প্রস্তাব করি। যেমন বৈ দা স্তি ক। রোমান অক্ষরে মুদ্রিত বহু পালিগ্রন্থে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে এই নিয়ম অনুসরণ করিতে দেখা যায়।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ

মন্দির

দূর হ'তে শ্রীমন্দির করি দরশন
প্রেম পুলকিত হিয়া
স্মৃতি অশ্রু উথলিয়া
জন্ম জন্মান্তর যেন হইল স্মরণ ।
এই সে শ্রীক্ষেত্রধাম
আশৈশব যার নাম
শুনিয়াছি, সেই যার অপূর্ণ কাহিনী
অঙ্কিত মন্দির অঙ্গে
বরণে বিচিত্র ভঙ্গে
কঠিন প্রস্তরে চারু মুরতি মোহিনী !
ঘুণা লজ্জা কুলমান
নাহি হেথা ব্যবধান
ভগবৎপ্রেমার্ণবে সব একাকার,
পতিতপাবন হরি
জগন্নাথ রূপ ধরি
অপূর্ণ শরীরী প্রভু, হৃদয় তাহার
অধম জীবের তরে
সদা উথলিয়া পড়ে
বাহুহীন আলিঙ্গনে বাঁদিছে সবাধ,

শোকান্তের শোক দূর
পতিতের মুক্তি পূর
এ মহা নির্বাণ তীর্থে কামনা বিলয় ।
জাতিভেদ হেথা নাই
চণ্ডাল ব্রাহ্মণে তাই
মহাপ্রসাদের অন্ন অমৃত সমান,
একত্র বসিয়া খায়
ভক্তি পুলক কার
বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা সর্ব সমজ্ঞান !
দীনবন্ধু নাম তব করিয়া শ্রবণ
শোক তাপে পরিশ্রান্ত
গৃহহীন পথভ্রান্ত
নির্বাণ তীর্থের ঘাত্রী তোমার সদন
আসিয়াছি, শুনিলাম,
ইহ লোকে মোক্ষধাম
তীর্থ এই, শোকবহি করিতে নির্বাণ
পারো তুমি প্রেমদানে,
সর্বদুঃখ পরিত্রাণে
লোকান্তরে মুক্তি চির করিতে বিধান

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী ।

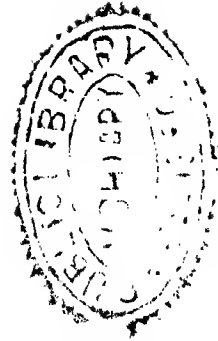
১ম হইতে ৬ষ্ঠ ফর্ম। শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মেটকাফ প্রেসে, এবং ৭ম ও ৮ম
ফর্ম। ২০নং পাটুয়াটোলা লেন বিজয়া প্রেসে, আর, সি, চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ।



বঙ্গদর্শন



প্রেমিক রবি



প্রেমের যে দর্শন-শাস্ত্র নাই, এ কথা অনুমোদনীয় নহে। কিন্তু ইহার দর্শন কাব্যের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। অবেষণ করিয়া লইতে হয়, টানিয়া বাহির করিতে হয়। প্রথম যুগের কবিগণ প্রেমের কোন বিশদ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন নাই। মধ্য যুগের কবিবর্গ মনুষ্যবর্গের মধ্যেই প্রেম-সঞ্চারের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ক্রমে প্রাণিবর্গ এমন কি উদ্ভিদ-বর্গের সহিত প্রেম-সংস্থাপন আরম্ভ হইলে পর, প্রেমের সম্মান সমধিকরূপে বদ্ধিত হইয়াছিল। এখন সমগ্র বিশ্বই প্রেমের ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য কবিগণ nature বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন; আমরা তাহাকে ‘প্রকৃতি’ বলিয়া থাকি। ঈশ্বর কে? প্রকৃতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? প্রকৃতির মধ্যে তাঁহার তত্ত্ব এবং আভাস কি পাওয়া যায়?—এ সকল কথা পূর্বে দার্শনিকগণেরই খাদ্য ছিল, ক্রমে ইহা কবিগণের খাদ্য হইতে লাগিল। সৌন্দর্যের মধ্যে, ছন্দের মধ্যে, গানের মধ্যে, এমন কি রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির মধ্যেও এই নিগূঢ় তত্ত্ব আন্দোলিত হইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ কি? প্রেম কি সেই সম্বন্ধ? এটা কি চিরন্তন সম্বন্ধ? ইহার

কত প্রকার ভাব, এবং ভাবের রূপান্তর দেখিতে পাই? ইহার উদ্দেশ্য কি এবং সার্থকতা কি? এই দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি সং কি অসং?

প্রকৃতি ও ঈশ্বরের কথা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির কবিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোন্ থানে, তাহা জানিবার কৌতূহল সকলেরই উদ্দীপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

‘প্রকৃতি’ একটা কিস্ত-কিমাকার পদার্থ। দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞান, কাব্য, ধর্মশাস্ত্র সকলেরই নিকট ‘প্রকৃতি’র একটা না একটা অর্থ আছে। কিন্তু ‘পুরুষ’ শব্দটি ‘কিস্ত’ না হউক, ‘কিমাকার’ কথা, কারণ অগ্রাগ্র দেশে এক কথা ব্যাকরণ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষীয় ধর্মশাস্ত্রেই ইহার ব্যবহার প্রথম ও শেষ। আমাদের শাস্ত্রে ‘পুরুষ’র পরিবর্তে আত্মা বলিলেও চলিবে না, ‘ঈশ্বর’ বলিলেও চলিবে না।

দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রাদি দোহন করিয়া ‘মানবতত্ত্ব’ নামক একখানি গ্রন্থে কোন খাতনামা পরিব্রাজক ‘প্রকৃতি’ শব্দের অর্থের একটা তালিকা দিয়াছেন। নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

(১) মায়ী ও প্রকৃতি একই,—মায়ী
তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ—স্বৈতাস্বতরোপনিষৎ।

(২) শুণ্ডজয়ের সাম্যাবস্থার নাম
প্রকৃতি। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। মায়ী
ও অবিদ্যা। শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি (পরা
প্রকৃতি—গীতা) ‘মায়ী’ এবং মলিনসত্ত্ব
প্রকৃতি (মন, ইন্দ্রিয়াদি—অপরা প্রকৃতি—
গীতা) অবিদ্যা। মায়ী বাহার অধীনা, এবং
যিনি মায়ীতে অধিষ্ঠিত, সেই পরমপুরুষ ঈশ্বর।

(পঞ্চদশী)

(৩) আত্মা ও প্রকৃতির সম্বন্ধ, যেমন
স্পন্দন ও পবন।

(কুর্মপুরাণ)

(৪) প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে বিশ্ব-
জগৎ। মহাদাদি সপ্ততত্ত্ব বিষ্ণুর একদেশ-
বত্ত্বী, এই জন্ত ‘অর্দ্ধগর্ভা’ নামধেয়া।

(ঋগ্বেদ-সংহিতা ২।২।১৬৪)

(৫) কিন্তু ‘অর্দ্ধগর্ভা’ প্রকৃতিতে অধি-
ষ্ঠিত হইয়াও যিনি মুক্ত, তিনিই সত্য, পূর্ণ
অমৃতময় পুরুষ।

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

(৬) প্র+কৃ+জিন্ প্রত্যয় করিয়া
প্রকৃতি। প্রকৃষ্ট প্রকারে কৰ্ম্মসম্পাদনের
ভাব।

(নিকৃত)

(৭) প্র+কৃ+জিচ্ প্রত্যয়, অর্থাৎ
যাহা প্রকৃষ্ট প্রকারে কার্য্য সম্পাদন করে।

(তত্ত্বকৌমুদী)

(৮) প্রকৃতি, শক্তি, অজ্ঞা, প্রদান,
অব্যক্ত, মায়ী, অবিদ্যা সকলেই ‘প্রকৃতি’র
পর্যায়। (বাচস্পতি মিশ্র—বৈদিক অর্থ)

(৯) প্রকৃতি উপাদান-কারণ, পঞ্চমী।

(পাণিনি—১।৪।৩০)

(১০) পরমেশ্বরের অদৃষ্টরূপা সহকারি-
শক্তি মায়ীই প্রকৃতি, অবিদ্যা প্রভৃতি।

(উদয়নাচার্যের ন্যায়-কুসুমার্জলি)

(১১) বিষয় এবং তদগ্রহণকারী ইন্দ্রিয়-
বর্গের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নাই, ক্রান্তদর্শী
কবিগণ তাহা বুঝিতে পারেন।

(ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৩।১৭।১)

(১২) শিবাই এক অদ্বিতীয় ‘শক্তি’,
শক্তিমান্ হইতে শক্তির ভেদ নাই।

(কুর্মপুরাণ)

(১৩) প্রকৃতি সর্বব্যাপী। জগৎ
প্রকৃতি হইতেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায়
তাহাতেই লীন হয়। (পাতঞ্জল মহাভাষা)

(১৪) ‘সর্বোপাদানম্’। (সাংখ্য)

এই শব্দার্থের মধ্যে প্রেমের স্থান কোথায়,
তাহা প্রেমিকগণই বুঝিতে পারিবেন।
শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন, ‘প্রকৃতি’
‘পুরুষ’ ও ‘কাল’ আমারই ত্রিমূর্তি।’ বিজ্ঞান
ভিক্ষু কণাদকে অবলম্বন করিয়া পরমাণুর
মধ্যে প্রকৃতিকে দেখিতেছেন। পাশ্চাত্য
বিজ্ঞান ইহার পরিপোষক। কিন্তু মোট
কথা প্রকৃতি অজ্ঞেয়। এহেন অজ্ঞেয় এবং
অর্থহীন পদার্থের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন
করা কিরূপ গুরুতর এবং ভয়ঙ্কর ব্যাপার,
তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু কবিগণ তাহা
করিতে ছাড়েন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাহার
সেরা।

তিনটি অবস্থার কথা শুনা যায়। জাগ্রত,
সুষুপ্তি এবং স্বপ্ন। প্রেম কোন্ অবস্থা,
তাহা বলা সহজ নহে; কেবল কবি জানেন।
অতএব আমাদের মত সাধারণ লোকের
মাথায় ‘প্রকৃতি’, এবং ‘প্রকৃতি’র প্রেম

কিংবা তদ্বিষয়িণী কবিতা কিংবা সংহিতা-দর্শনাদির অর্থ প্রবেশ করা কিরূপ কষ্টসাধ্য, তাহা বলিতে হইবে কি ?

কিন্তু 'বিশ্বপ্রকৃতি', 'পরমাত্মা', 'জীবাত্মা' প্রভৃতি কথার এত বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সর্বপ্রথমে প্রতীচা জগতে ইহা প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের জন্মের শতাব্দিক বৎসর পরে গ্রীস দেশে প্লেটোর জন্ম হয়। ভারত-বর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র তখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। প্লেটোর পূর্বে গ্রীসদেশীয় দার্শনিকগণ প্রকৃতির সহিত জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোন বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যত্নবান হয়েন নাই। প্লেটোর মতে Psyche (জীবাত্মা) বিশ্বাত্মা (world soul) এবং বিশ্বপ্রকৃতির (Nature) মিলনের ফল। উভয়ের বাত-প্রতিঘাতে জীবাত্মার উর্দ্ধে (মুক্ত ও আনন্দ-ময় অবস্থা) এবং রসাতলে (বদ্ধ এবং নিরা-নন্দময় অবস্থা) ক্রমান্বয়ে গতি হয়। কামনা-বজ্রিত হইয়া সৌন্দর্য্যের উপভোগ ধর্ম্ম-জীবনের (spiritual life) উপযোগী। ইহাই উপাসনার মূল। লক্ষ্য পরমাত্মা।

প্লেটো কিছুই নূতন কহেন নাই উপ-নিষদোক্ত বুদ্ধস্থিত দুইটি পক্ষীর কথা দর্শনের ভাষে প্রকটিত করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু ইহা দ্রষ্টব্য যে, সত্য ও প্রেম এবং তজ্জনিত আনন্দের আভাস প্রতীচা দর্শনশাস্ত্রে আমরা প্লেটোর নিকট প্রথমে প্রাপ্ত হই। প্লেটোর প্রেম দার্শনিক প্রেম, তাঁহার republic টিক সাধারণতন্ত্র নহে। প্রেমের রাজ্য এবং যক্ষদশী দার্শনিক কর্ম্মবীরগণ সেই রাজ্যের

নেতা। এমন কি, সঙ্গীত, চিত্র ও কাব্যেও জ্ঞান ও ভক্তি ছাড়া অত্র কিছুই লেশ থাকিবে না। ভারতবর্ষেরও তাহাই আদর্শ ছিল।

তাহার পর সহস্রাব্দিক বৎসরের মধ্যে আমরা কোন দেশে প্রকৃতি-পুরুষের সম্বন্ধ-জনিত পরম আনন্দের কথা দর্শনশাস্ত্রে কিংবা কাব্যে দেখিতে পাই না। এই তমিস্রা-পূর্ণ মহাযুগ নূতন জাতি-সংগঠনে কাটিয়া গিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৭০০ বৎসর কালে গ্রীস দার্শনিক এপিকুরস্ আনন্দের চরম উপভোগ সম্বন্ধে একখানি অপূর্ব সংহিতার সৃষ্টি করিয়া দর্শনশাস্ত্রের উর্দ্ধগতি নিবৃত্তি করিয়া দিয়া-ছিলেন। সেই উপভোগের ইতিহাস মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী রাজত্ববর্গের মধ্যে সমধিক ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। কামিনী কাঞ্চন-লাভ এবং ইঞ্জিয়ার উপভোগই তখন Psyche এর আদর্শস্থল। রণ যদিরা, প্রেম-মদিরা, এবং 'মিরাজী', কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের তামসিক প্রতিবিম্ব। তদানীন্তন সাহিত্য, কাব্য এবং ইতিহাস তাহাতেই পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষে তন্ত্রের এবং ভাগবত ধর্ম্মের বাতি-চারও সেই পথের দৃশ্য।

এই বীভৎস দৃশ্যের মধ্যে পরাপ্রকৃতি (Holy Spirit) লুপ্ত এবং গুপ্ত হইয়া প্রতীচা জগতে যে অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার ফলে স্পিনোজা, কাণ্ট, ফিল্ডে এবং সেলিং। যীতযুগ্ট সেই ধর্ম্মের প্রবর্তক। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, সে ধর্ম্মের প্রথম উন্মেষের কালে প্রকৃতি প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরালে স্থিত। ঈশ্বর এবং মানব, পাপ এবং পুণ্য, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম

সকলেই পৌকষেয়। প্রকৃতি জড়মাত্র। পুরাতন তত্ত্ব রোমান কাণলিক ও য়েণ্ডইটগণের মধ্যে পরিচ্ছিন্নভাবে রহিয়া গেল। নূতন প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম কস্মজগত লইয়া ব্যস্ত হইল। সেটা নৈতিক জগৎ (moral world)। বিজ্ঞান জড়-প্রকৃতি লইয়া ব্যস্ত হইল। কস্মক্ষেত্রই সকলের রঙ্গস্থল। ডেকার্টে, হিউম্ প্রভৃতি ত্রায়দর্শনের দিকে অগসর হইলেন। আমি কে? আমার ভাব কি? জড়-প্রকৃতি মিথ্যা কি সত্য? ভাববাদিগণ ও জড়বাদিগণের মধ্যে মহা সংগ্রাম বাধিল। কস্মক্ষেত্রই প্রেমের ক্ষেত্র, কস্মবীরই প্রেমের বীর, মানবসমাজই তাহার উৎকর্ষস্থল। ইউরোপের Feudalism এবং রাজস্থানের Feudalism একই ঠাঁটে সংগঠিত। কিন্তু রাজস্থান ও কালিদাস, রামানুজ ও কবীর, পরাপ্রকৃতি বিশ্বত হন নাই। Round Table এবং সেক্সপীয়র, Neoplatonists এবং নব্যযুগের দর্শন, প্রকৃতি হইতে বহুদূরে। বিজ্ঞান তাহার অন্তঃসন্ধানে তৎপর হইল। ফিল্ডে এবং গেলিং দর্শনশাস্ত্রে তাহার পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। Transcendentalism এর এই প্রথম সূত্রপাত।

স্পিনোজা দেখাইয়াছিলেন, ঈশ্বরই প্রকৃতির কস্মের নেতা এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার ক্ষেত্র। কেবল মানবসমাজই যে তাঁহার রঙ্গস্থল এবং ধর্মস্থল, তাহা নহে। অতএব প্রাকৃতিক নিয়মাবলী পালন করা আমাদেরই স্বভাব। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও ধর্মের পার্থক্য কি? এই সহাদন্দসঙ্কুল বিশ্বের মধ্যে ধর্মের সত্য এবং অস্বপ্ন পথ কোথায়? ফিল্ডে

বলিলেন, 'প্রকৃতির' অবগুপ্তন তুলিয়া দেখ—

"Quite clear the veil is
raised from thee and lo !
'Tis Self : let die, then,
this destructible :
And henceforth God will
live in all thy strife.
Consider what survives
this strife below ;
Then will the veil,
as veil be visible.
And all revealed thou'lt
see celestial life."

—Fichte's Sonnets.

গেলিং তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য, পুরুষ এবং প্রকৃতির সম্পূর্ণভাবে একতা-স্থাপনই transcendental philosophyর উদ্দেশ্য। একটি conscious subjective, অল্পটি conscious objective. চৈতন্যময় এবং চৈতন্যময়ী। বস্তুতঃ উভয়ই এক, ব্যবহারিক ভাবে পৃথক্। কিন্তু এই পার্থক্য সমীকরণ হইলে আর থাকে না। ভাব দ্বারা সেই সমীকরণ হয়। জীবাত্মার মধ্যে সেই ভাব প্রতিবিম্বিত হয়। মানবসমাজে তাহা উৎকর্ষ লাভ করে। জীবাত্মা উভয় পক্ষের উকীল। প্রকৃতির তরফে কহে 'আমি ও তুমি এক', পুরুষের তরফেও কহে 'আমি ও তুমি এক'। এই কথা Schwegler কহিয়াছেন—"God, whom Fichte conceived only as an object of moral

belief, has become for Schelling a direct object of æsthetic institution."

জ্ঞানমার্গে, এবং অদ্বৈতবাদে আমরা এই æsthetic institution দেখিতে পাই না। এই সুন্দর মুখশ্রী, বাহু, কেশ, দন্ত, সকলিই আমার। 'আমার' ? এ গুলিকে 'আমি' বল না কেন ? বলিবার যো নাই। আমি স্বতন্ত্র। ঐ যন্ত্রণায় এগুলিকে এড়াইয়া মুক্ত হইতে চাই, কিন্তু পারি কৈ ? মায়ায় মত ইহারা সঙ্গে লাগিয়া থাকে। বেদান্ত বলেন 'উপায় নাই, কিন্তু উচারা অসৎ'। দ্বৈতবাদী কহেন "বাঃ তবে কাব্য থাকে কোথায় ?" এই মুখশ্রী অস্ত্র একটি মুখ দেখিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিয়াছি, এই বাহু দ্বারা তাহার কাণা সাধিয়াছি, এই কেশ দ্বারা সেই চরণ মুছাইয়াছি, এবং এই দন্ত দ্বারা আনন্দে হাসিয়াছি। জড় হইলে কি হয়, ইহারা সংক্লেষ মাত্র, ছবি মাত্র। সমগ্র বিশ্ব যে একেরই ছবি, তাহা জানিবার যো কি ? অদ্বৈত জ্ঞানের মধ্যে দ্বৈতভক্তির সঞ্চারণা করাই transcendental কাব্যের লক্ষ্য। হেগেল বলেন—"Nature is a Baochastic God, uncontrolled by, and unconscious of himself." কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সমুদায় নহে। ভাবের সমাবেশের মধ্যে আত্মজ্ঞান ও আত্মচৈতন্য না থাকিলে তাহা কেবল প্রতিবিম্বের মত হইয়া পড়ে, অতএব জ্ঞানী ভক্তই সম্পূর্ণ মনুষ্য। রুবির Wordsworth এর trance এর মধ্যেও আত্মজ্ঞান কখনও বিচলিত হয় নাই। আত্মহারা কবি ও আত্মজ্ঞানরহিত কবির কাব্য, স্বপ্ন-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ হইলেও নিকৃষ্ট।

তাই হেগেলের নিকট "Poetry forms the transition of art into religion. In art the idea was present for perception, in religion it is present for conception. All religions seek unity of the Divine and Human."

কেবল কতগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া বাছা বাছা কথায় একটা স্বপ্নজড়িত ভাবের সৃষ্টি করিয়া, অর্থহীন কতকগুলি অসত্যের অবতারণা করা কবিত্ব নহে। কবির বাস্তবিক অনুভূতি চাই। প্রাণের কথা এবং সত্য কথা ভিন্ন কাব্যের মহিমা থাকে না। 'এই তোমার গীণা, মুরলী ও মৃদঙ্গ, গান গাহিতে পার ত গাও।' যদি স্বর্গীয় প্রতিভা তোমার থাকে, তোমার গানে সকলেই আকৃষ্ট হইবে। 'এই তোমার প্রকৃতি, যদি ঈশ্বরকে তাহার মধ্যে দেখাইতে পার ত দেখাও, নচেৎ অস্ত্র কোন যাদুকরী চলিবে না।' হে মানবসন্তান ! হে সাধক কবি ! তোমার সম্মুখে এই মহাকর্ষবাতা পড়িয়া আছে। ঈশ্বর স্বামী, প্রকৃতি সতী। মানব তাহার সন্তান এবং ধর্ম্মপ্রচারক। কাব্য সেই ধর্ম্মের গাথা। বিখের জনন, ধারণ, পালন করুণা-প্রমুখ। এই বিরাট নারীত্ব (feminism) প্রকৃতির এক অংশে প্রতিভাত। বিশ্বের উৎকর্ষ সংহার-প্রমুখ, ক্রম-বিকাশ বিধানের অন্তর্গত, সেখানে পুরুষের স্থির অচল হৃদয় প্রতিভাত। দ্বন্দ্ব হানাহানি দেখিয়া ভয়পাইও না। করুণা এবং নৃশংসতার সামঞ্জস্য জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যস্থলে। উপাধি ভঙ্গ না করিয়া যদি অল্প আশ্রাসে সত্যের আভাস পাইয়া মানব কামনা ও কামনা-

জনিত হুঃখ হইতে নিস্তার পায়, তবে কুক-
ক্ষেত্রের দরকার কি? যদি প্রতাপ ভাঙার
এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক দিয়া আরোগ্য
করিতে পারে, তবে অস্ত্র শস্ত লইয়া সর্বাধি-
কারীকে ডাকিয়া বিড়ম্বনা কেন?

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি-
বেন যে, কাব্যজগতে transcendentalism-
এর দিকে ঘেসিলে বিলক্ষণ বিপদে পড়িতে
হয়। ঈশ্বরের স্বরূপত্ব চতুর্দিকে প্রমাণিত
করিতে হইবে। এক দিকে জড়প্রকৃতি ও
বিজ্ঞান, অত্র দিকে মায়াবাদ ও দর্শন, মধ্যে
মানবপ্রকৃতির লৌকিক এবং অলৌকিক
সংশ্লিষ্ট। এই বিচিত্র ক্ষেত্রে স্বপ্নময় হা-হাশ
এবং উন্মত্ত বাক্যলহরীর প্রলাপ ছাড়িয়া দিলে
কতদূর কার্য্যকারী হইবে, তাহা বিবেচনা করা
উচিত। সুতরাং Mathew Arnold তাঁহার
Essays on Criticism নামক গ্রন্থে trans-
cendental schoolএর উপর কশাঘাত

করিয়াছেন। সেক্সপিয়র ও স্পেন্সর, গেটে
ও হেনের সহিত তুলনায় বাইরণ, শেলি ও
কীটস বহু অংশে নিকৃষ্ট। “They do not
belong to that which is the main
current of literature of modern
epochs, they do not apply modern
ideas to life.”

কিন্তু এই modern ideas ও তদানু-
যায়িক যন্ত্রণাময় উত্তাল তরঙ্গরাশি ভারতক্ষেত্রে
আসিয়া কিরূপ দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইবে, ও
ভবিষ্যতে কিরূপ একটা অভিনব জাতীয়
সৃষ্টি করিবে, এবং সনাতন ধর্ম্মের পূর্ব্বকর্ম্ম-
প্রণালী অবলম্বন করিতে জগৎ বাধ্য হইবে
কি না, সে প্রশ্নের এখনও ভাল করিয়া
মীমাংসা হয় নাই। আমরা দেখিতে চেষ্টা
করিব, রবীন্দ্রনাথ সেই পথে কতদূর কৃতকার্য্য
এবং অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

অনুপ্রাসের অধিকার-বিচার

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়া সেদিনকার
মত তাঁতবাত তুলিয়াছি। গভীর রাত্রিতে
তন্দ্রাবশে অনুপ্রাস আমার স্বকে ভর করিয়া
বলিলেন—যদি আমার অধিকার বিচার
করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে মিছা-
মিছি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চচ্চিত-স্বর্ণণ করিয়া
আসর সরগরম করিতেছ কেন? আমি
কত স্থানে কত ভাবে বিরাজ করিতেছি,

বলিয়া বাই, লিখিয়া লও। এক রাত্রির
স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রচার করিয়া দেখ, যদি ইহা
নাটক-নভেল-পরিপ্লাবিত বঙ্গভূমিতে আদর
পায়, তবে আরও সহস্র রজনীর বৃত্তান্ত
বিবৃত্ত করিও।

১। রাশি রাশি বন্দনমানের দৃষ্টান্ত
দিয়াছি। কিন্তু অন্যান্য সমানও আমার
অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

সাধুভাষার যে সব প্রয়োগ চলিত ভাষায় অত্যন্ত প্রচলিত, কেবল সেইগুলিই উল্লেখ করিতেছি। যথা—

অকিঞ্চিৎকর, অগ্রগণ্য, অঙ্গভঙ্গী, অনন্ত, অন্নপূর্ণা, অসাধাসাধন, আদ্যাশ্রদ্ধ, ঈশ্বর, ইচ্ছা, একবাক্যে, একাকার, কত্কা কর্তা, কষ্টকল্পনা, কায়ক্ষেপে, কাশীবাস, কুরক্ষেত্র, কুবের-ভাণ্ডার, কুশাসন, কৃষ্ণকালী, গতানুগতিক, গলগণ্ড, গলগ্রহ, চর্যচক্ষুঃ, চিররোগী, ছন্দো-বদ্ধ, জড়ভরত, জরাজীর্ণ, জ্ঞানগোচর, তিল-তর্পণ, তিলোত্তমা, ত্রিপত্র, দক্ষাদোষ, দেব-দারু, দৈববাণী, ধর্মকর্ম, ধর্মধ্বজী, নরককুণ্ড, নামগান, নববিধান, নষ্টকোষ্ঠী, পক্ষপাত, পরপ্রত্যাশী, পাতালপুরী, পিশাচিসন্ধ, পুষ্পপাত্র, পূর্ণপাত্র, পূর্বপুরুষ, পৌষপার্বণ, প্রতাপতি, প্রভুভক্ত, প্রসববেদনা, প্রাতঃ-প্রণাম, প্রাণপণে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ, ফণিমনসা, ভুক্তভোগী, ভূভরত, ক্রভঙ্গী, মধ্যমান, মলমাস, মহামায়া, মানমণ্ড, মানমন্দির, মুণ্ডমালা, রাজঘোটক, রামনাম, রামরাজ্য, রীতিমত, লোকলজ্জা, লঙ্কাকাণ্ড, বকধার্মিক, বহির্কাস, বাকাবাগীশ, বাকাব্যয়, বাধকবেদনা, বাধাবাধকতা, বারবেলা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধদেব, বৃন্দাবন, বেদ-বাক্য, বেদবাস, বৈষ্ণব, বন্দনা, ব্যাপ্তবাগীশ, ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রাহ্মণভোজন, শবশিবা, শবসাধনা, শবাসনা,* শববাস্ত, শিখিপাখা (পক্ষ), ষোড়শোপচার, সংসঙ্গ, সরোবর, সর্বশরীর, সাগরসঙ্গম, সাধাসাধনা, সিংহাসন, সুখাসন, সুখশেল, সুখস্বপ্ন, সেবাদাসী, স্বর্গসুখ, স্বয়ং-সিদ্ধ, হরগৌরী, হরিহর।

চলিত ভাষায়ও সমাস আছে। যথা—

আটপিঠে, আনমনা, উপরপড়া, এক-কাটা, একরোকা, কপিকল, করিৎকর্ম্মা, কসাইকালী, কড়িকোটা, কাঁচকড়া, কাঁচকলা, কাঠফুল (কাঠের কয়লা), কাঠকবল, কাঠঠোকরা, কাঠকাটা (রোদ্র), কাঠাকাগি, কাণকাটা, কাণাকাড়ি, কারিকর (কারুকর), কালীতলা, কোলকোলা, খাই-খন্নচা, গাঙগোল, গরুচুরি, গাছগরু, গাঁটকাটা, গালগল্প, গোইগাঁ (গুণগ্রাম), গোবরগাদা, চড়কপাক বা চরকীপাক, চাণাচুর, চালচিতির, চৌপাত, চুলচেরা, চোখটাটা, চৌচির, ছবিছুট, ছেলে-খেলা, ছেলেবেলা, ছাগলছানা, জগৎঘোড়া, জলজ্যাস্ত, তালফোঁপোল, তেলকল, তেল-গোল, দিনছপুর, দরদালান, ধানভানা (কল), নকলনাবশ, নিঘিরে, নীলগোলা, নৌকাকালি, পগারপার, পদ্মপুকুর, পরশপাথর, পাছা-পেড়ে, পাড়াপড়শী, পাততাড়ী, পারং-পক্ষে, পাণিপাঁড়ে, পাতাচাপা, পাথর-চাপা, পানাপুকুর, পালিশপাতা, পাশবাগিশ, পিছপাও, পিছুপানে, পিঁজরাপোল, পিটুটান, পুকুরপাড়, পুণিপুকুর, পুতুলপুজা, ফুলদোল, ফোঁটাকাটা, ভুবনভোলান, ভোজবাজী, ভাঁয়রাভাই, মজামারা, মদমাতালে, মধুমাখা, মনমরা, মনমজান, মনমাতান, মড়িপোড়া, মহামুন্সিল, মাখনমাটী, মাছিমায়া (কেরালী), মাটিকোঠা, মাথাবাথা, [মার্কামারা], মাসমাহিনা, মেড়াপোড়া, মোমাছি, রাজরাণী (রাজারানী স্বয়ংমাসে, রাজরাণী যজ্ঞীতৎপুরুষ), লালনীল, লোকনকুতা, লোণাপানি, বছরবিউনী, বাজালাবাহাদুর, বায়ুনবাড়ী, বাজরাবোঝাই, বাজুবন্দি, বাঁশবন, বাঁশবাজা, বিয়েবাড়ী,

বিশ্ববাস্তালা, বিষবড়ি, বীরবোলি, বেগুনবীচি, বেণাবন, ব্রহ্মবুলি, সমবয়সী, সাজপূজনী, সৃষ্টিছাড়া (ছিষ্টিছাড়া উচ্চারণ), স্বত্বদাব্যপ্ত, হোড়াপোড়া ।

২। সমাস না করিয়া বিশেষ্য-বিশেষণ একত্র করিতে আমার কৃতিত্ব কম নহে । কেবল চলিত কথারই উদাহরণ দেখ ;—

অষ্ট অঙ্গ (অষ্ট অঙ্গে অভরণ=আভরণ), অর্দ্ধ অঙ্গ (পত্নী), অবাক্ কাণ্ড, আট ঘাট (বাঁধা), আঙ্গুল আবডাল, উড়ে ম্যাড়া, উপরি পাওনা, উল্টা উৎপত্তি, এঁড়ে গরু, একগলা গঙ্গাজল, এক গা গয়না, কটাস কামড়, কড়া কথা, কাঁচা কাষ, কাচা কাপড়, কাটা কাপড়, কাটা কাণ, কাটা কৈ, কাঁধ-কাটা কাপড়, কান্ধলা কাচ, কাঁচা কলা, কাণা কড়ি, [কালো কোট], কালো কোর্তা, কায়ত ধূর্ত, কুড়ে গরু, কোদালে ক, খোস খবর, গরম মুড়ি, গড়ো গোয়াল, গরুর খরু, গরি গোবর্দ্ধন, গোলগাল গড়ন, গোল লঠন, গোল আলু, গোঁয়ার গোবিন্দ, ঘরপোড়া গরু, ঘোষাল রসাল, চটাস চাপড়, চারি চক্ষুঃ, চোঁচো চুমুক, চৌদ চূপড়ি (কথা), ছেলে ভুলোন ছড়া, ছোট ছেলে, জোনাকী পোকা, টোপা পানা, ডেকো ডাঁটা, তেমাথা পথ, দক্ষিণ হুয়ার, দশ দিক্, হু'দণ্ড, হু'দিন, হু'দশ দিন, হুটা হুথান, হুখে দাঁত, হুণো দর, দেশী শাড়ী, ধনেবেচা বেণে, [নম্বরী নোট], না প'ড়ে পণ্ডিত, নাপিত ধূর্ত, পটোলচেরা চোখ, পাকা কলা, পড়া পাখী, পাঁচ পীর, পার্শ্বনাথ পাহাড়, পাতাচাপা কপাল, পাথর-চাপা কপাল, পুরাণ পাপী, পুরুষ মানুষ,

পুবে বাতাস, পেট মোটা, পৈত্রিক প্রাণ, পোষা পুত্র, ফুগাল তেল, ভায়রা ভাই, ভিজে ভাত, ভিজে জাব, মড়িপোড়া মিনসে, মরা মানুষ, মাখন মাটা, মাগুর মাছ, মাগিনো মাসী, মাদী মা, মাড়োয়ারী মহাজন, মিছে কাষ, মিছে মায়ী, মিথ্যা কথা, মিরগেল মাছ, মুখুটী কুটিল, মুচে মিগ, মুড়া মাখন, মেয়ে মানুষ, মোটা মাহিয়ানা, মোরলা মাছ, রাই রাজা, রাখাল রাজা, রাঁধুনী বামুন, রাম রাজা, রাজা রামকৃষ্ণ, রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, লম্বা নাক, লম্বা লেজ, লড়াইয়ে মেড়া, লাল কালী, লাল চেলী, লাল বাবু, বকনা বাছুর, বড় বাড়ী (পাইখানা), বড়বাবু, বড় বেগতিক, বড়াই বুড়ী, বত্রিশ বাঁধন, বাইশ বাজার, বাঁকা বাঁকা বুলি, বাঙ্গালী বাবু, বাজে কাষ, বাজে জমা, বাজে জিনিষ, বাজে বকুনি, বাঁধা বুলি, বাঁহুরে বুদ্ধি, বাবা বিশ্বনাথ, বাবা বৈদ্যনাথ, বাহাত্তরে বুড়ো, বিধাতা বিমুখ, বিটলে বামুন, বিদেশী বঁধু, বীচে বাড়ি, বুড়ো বর, বুড়ো বাঁদর, বুড়ো হাড়, বেউড় বাঁশ, বেণে বো, বোকা বামনা, বৈশাখী বাচ্ছা, শিকলিকাটা টিয়া, শিকারী কুকুর, শীতলা যষ্টী, শুক কাঠ, শুকুনী শাক, শুক বা সিক শ্রোত্রিয়, শ্রীগুরু গোপেশ্বর, শ্রীমন্ত সদাগর, ষোল শ (গোপী), ষোল কলা, সরু চিড়ে, সাত সমুদ্র, সাপের পাঁচ পা, সাফাই সাক্ষী, সৃত্তিকা যষ্টী, স্নিগ্ধ সরবৎ, স্বদেশী শিল্প ।

৩. করণ কারকে ও অধিকরণেও আমার অধিকার আছে । আমারই জন্ত অমৃতের অরুচি, আনন্দের গলগদ, আফ্লাদে আটখানা, আফ্লাদে আত্মহারা, কপালে করাঘাত, কমলে কণ্টক, কুসুমের কীট, গোড়ায় গলদ, পলকে

প্রায় বিধে বিষক্রম, মুখে মধু হৃদে হলাহল,
ভুক্তিতে মুক্তি, শুক্লিতে মুক্তা, শিয়রে শমন,
শোক সাধনা, সাধে বাদ, সাধনায় শিকি,
সোণায় সোহাগা, হরিষে বিষাদ, তিতে
বিপরীত, হেলায় হারান, বিনাশকালে
বিপরীতবুদ্ধি, বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ। আমারই
কণ্ঠে নাপিতে নরুনে নখ কাটে, কাঁচিতে
চল ছাঁটে, ও ফুরে মাথা মুড়ায়। আমার
প্রসাদে—লোকে চোখে দেখে, কাণে শোনে,
নাকে সোঁকে, মুখে গায়।

আবার দেখ, আমারই প্রসাদে উড়িয়ায়
উড়াপট, গুজরাটে গরবা, গোড়ে গাজন,
ঢাকে কাঠি, চৈত্রে চড়ক, জৈষ্ঠে জামাইঘাটা
ও যুগল, ফাল্গুনে ফাগুনকোণা ব্রত ও
ছুটকড়াই মুড়কি, রমজানে রোজা। আমারই
রূপায় শীতকালে শীত আলু, মুখে মেছেতা,
পাণে চূণ (বা পোকা) [বা পিপারমেন্ট],
পাণে পাথর, ধূলায় ধূপর, কড়ায় কড়া, কাহনে
কাণা, ধনস্থানে শনি, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি,
ভাড়ে মা ভবানী। গলায় গাঁগা, গোগ্রাসে
গেলা, ঘোড়ায় চড়া (চাপায় আমি চাপা
পড়ি; ঘরে রাখা, জলে ফেলা, জেলে যাওয়া,
নাকে কান্না, পায়ে পড়া, প্রেমে পড়া, ফাঁদে
ফেলা, মরমে মরা, সরমে মরা, বৃকে বাজা,
বৃকে বসা, আমারই যোগাযোগে ঘটে। মাঠে
মায়া যাইতে, বংশে বাতি দিতে, কুলে কালী
দিতে, বৃকে বাঁশ দিতে, গলায় গামছা দিতে,
গাতে দড়ি দিতে—হাতে দড়িতে কাবারস
নাই, হাতে সূত্রে আছে—বৃকে বসে’
দড়ি উপড়াইতে, চারি চক্ষে চাহিতে, ছাত্তর
হাঁড়িতে বাড়ি মারিতে, হাতে হাঁড়ী ভাজিতে,
হুজুরে হাজির হইতে, আমি মুর্তিমান। আমিই

রোগে রোজা ডাকার বন্দোবস্ত করিয়াছি,
ভূতের ভয়ে রামনামের ব্যবস্থা করিয়াছি,
সশরীরে স্বর্গবাসের সুবিধা দেখাইয়াছি, স্বর্গে
শচী ও সুধা রাখিয়াছি, অমরায় অপমরার
আমদানি করিয়াছি, গায়ে একগা গয়না
গড়াইয়া দিয়াছি, কেরানীর কাণে কলম,
চ্যাংরার চোখে চশমা, কুলকামিনীর কঁকে
কলসী, নাকে নখ নোলক, পরণে পাছাপেড়ে
শাড়ী পাকাপাড়, সঁপায় সিন্দূর পরাইয়াছি,
হুয়োরানীর হেঁটে কাঁটা দিয়াছি, শ্রীমন্ত
সদাগরকে কমলেকামিনী দেখাইয়াছি।
অশ্বানে বা কৈলাসে শিব, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু—
সে তো আমারই লীলা। আমিই আমহাট’
ষ্ট্রীটে আমহাউস রাখাইয়াছি, বোলপুরে
ব্রহ্মবিদ্যালয় বসাইয়াছি, এবং সিমলায় শৈলা-
বাগ স্থাপন করিয়াছি।

৪। সম্বন্ধ-স্থাপনেও আমার সম্বন্ধ আছে।
আফগানিস্থানের আমীর, খেলাতের খাঁ,
পারস্যের সা, মরভঞ্জের মহারাজ, শ্বশুরীমঠের
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু, বিশ্ব-
কর্ম্মার বেটা বিয়ারিশ-কর্ম্মা—সকলেই আমার
তাবেদার। জয়সিংহের জয়পুর, মানসিংহের
মানমন্দির, আপানের জিউজিৎসু, দিল্লীর
দরবার, দিল্লীকা লাড্ডু, [লাটের লেভি],
চৈতককা চবুতারা, গাজীপুরের গোলাপ-
জল, সুখচরের চিনি, প্রয়াগের পায়োনিয়ার,
কোটালাপাড়ার কুটশাসন, তপনদীঘির তাম-
শাসন, ইত্যাদি সর্ব্বঘটে আমি। কলের
কুলি, কলিকালের ছেলে, কালীঘাটের
কাজালী, ব্রহ্মার বর, শিবের বর, বিয়ের
বর, বরের বাপ, আদালতের আমলা,
মানহানির বা মাননাশের মামলা, ব্যারি-

ষ্টারের বাবু, হরির খুড়া, বরের ঘরের মামী ক'নের ঘরের পিসী, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, গাজীর গান, মেড়ার লড়াই, বুলবুলির লড়াই, কান্দালের কর্কট রাশ, বড়দিনের বন্ধ, বিষ্ম্যবাদের বারবেলা, শনির শেষ, চতুর্দশীর চৌদশাক, ভক্তের ভগবান, হবিষ্যের মালসা, শিবরাত্রির সলিতা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সবই আমার জন্ত। পৌরাস্থের রান্না পায়ে আমি, ত্রীচরণের ছুঁচোতেও আমি, মগের মুল্লুকে, কাতলা ফেলার দেশে, হাবড়ার হাটে, স্বর্গের মিঁড়িতে, আমার বাতায়িত আছে। আমারই জন্ত শালগ্রামের শোয়া বণ সমান, আইনের আমলে পড়ে আমারই ফেরে। চট্টার ফটফট, বুটের টক্কর, জুতার গুঁতা, ব্রাহ্মণবটুর টিকি, চোখের চাহনি, চোখের দেখা, জিভের জল, নাকের নিশ্বাস, প্রাণের টান, পেছন-কার পা, প্রস্তাবের পীড়া, সবই আমার ঘোগাযোগে।

আবার দেখ, আউড়ের আঁটি, আকন্দের আঠা, আমের আচার, আমের আঁঠী, উড়কিধানের মুড়কি, কথার কথা, কলার কাঁদি, কলের জল, কলসীর কানা, কলুর বলদ, কাঁকড়ার দাড়া, কাজীর বিচার, কাটারির কোপ, কাঁঠালের কোষ, কাপড়ের পাড়, কাষের কথা, কুলের কথা, কুলের কলক, কোকিলের কুহ, খাটের খুরো, খুসীর সওদা, খোদার খাসী, গন্ধুর গাড়ী, গাছের আগা, গাছের গোড়া, [গিণ্ডির গয়না], গোলার তলা, গোসাপের গা, ঘুমে ঘোর, ঘোড়ার ঘাস, ঘোড়ার ডিম, চটির পাটি, চুলের কলপ, চলির পুঁটুলি, জুতার ফিতা,

ছোলার ছাত্ত, [জাহাজের জেট ও জালিবাট], জোয়ারের জল, ডেকোর ডাঁটা, ঢাকার শাখা, ছুঁলোকের মিষ্টকথা, ছুঁয়ের দমন, দেনার দায়, ধোপার পাট, নপুংসকের নৃত্য, নাটুরার নাচ, পটুয়ার পট, পাগলের প্রলাপ, পাটের গাঁট, পানি-ফলের পালো, পাণের দোনা, পাপিয়ার পিউপিউ, পালাবার পথ, পিতলের পিলমুহু, পুঁঠিমাছের প্রাণ, পুঙ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, পূজার বাজার, পেটের পীড়া, পেটের পুত, প্রাণপিজরের পাখী, ফণীর মণি, ভাটার টান, ভূতের ভয়, ভেকের মকমক, মতির মালা, মনের ময়লা, মনের মাহুঘ, মনের মিল, মরার মত, মাটির মাহুঘ, মাথার মণি, মাথার মাণিক, মাথার মুকুট, মাছের মুড়ে, মিছরির ছুরি, মুক্তার মালা, রায়ানন্দের রাস, রাণী রাসমণির রূপার রথ, লাখ কথা এক কথা, বখরার বন্দোবস্ত, বনের বাঘ, বনের বানর, বাঘের বাচ্ছা, বাপুকা বেটা, বাপের বাড়ী, বামুনবাড়ীর বেড়াল, বালির বাঁধ, বিকারের ঘোর, বুকের বল (ভাত পাথরটা), বেদব্যাসের বিশ্রাম, ব্যাথার ব্যথী, শত্রুর শেষ, (শুভস্র শীঘ্রং), বাঁড়ের গোরুর বাঁড়ের শত্রু, সোণার খনি, সোণার বেগ, সোণার সামগ্রী, হাতীর হাওদা, সর্কর আমি।

৫। কর্তা বা কর্ম ও ক্রিয়া। অথবা সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া একত্র করিয়া যে সব চলিত শব্দসম্বন্ধ (phrase) আছে, *

* কতকগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণভাবে সমাসবদ্ধ হইয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—কচুকাটা করা, কাঠকাটা বোজ, চাঁদচাঁওয়া ছেলে, কাণকাটা রাজা, সাক্ষিমা

সেখানেও আমার অস্বাধ অধিকার।

(স্বর)—আলো জালো, আঙ্গুল ফুলা
(ফুলিয়া কলাগাছ), আপত্তি তোলা, এগিয়ে
এস, ওং পাত।

ক—কথা কহা, *কচুকাটা করা, কড়া নাড়া,
কড়া পড়া, কলঙ্ক কেনা, কাচ করা, কাটনা
কাটা, *কাঠ কাটা, কাঠ কাটা, কাণ কাটা,
কাণ টানা, কাপড় কাচা, কাপড় কৌচান,
কাপড় ছাড়া, কাপড় ঝাড়া, কাপড় কেনা,
কামাই করা, কামান ডাকা, কায কর্ম করা,*
কারুপি করা, কাল কাটান, কিরা করা,
কুটো কাটা, কুটনো কোটা *, কুমড়ো কোরা,
কুমারী করা, কুঞ্জী (কোঞ্জী) কাটা, কুস্তি করা।

খ—খড়ি ওড়া বা পড়া, খাতির রাখা,
খানা খাওয়া, খাপ খাওয়া, খাবি খাওয়া,
খাসী পোষা, খিল লাগা, খুঁটে খাওয়া, খেটে
খাওয়া।

গ—গরু চরান, গহনা গড়ান, গান
গাওয়া, গুণ গাওয়া, গুণ টানা, গুণ মানা।

ঘ—ঘর করা, ঘর পোড়া, বাড়ি পড়া,
ঘুড়ি উড়ান, ঘোমটা টানা, বোল ঘাঁটা,
বোল চালা।

চ—চকমকি হুঁকি, চড় মারা, চাঁদ চাওয়া,
চাপা পড়া, চাল চিত্তির করা, চাল চিবান,
চাবুক চালান, চিত্তির (চিত্ত) চটা, চিমটি
কাটা, চুল চেরা, চুল ছাটা, চুকট টানা, চুণ
চাওয়া, [চেক কাটা], চোখ চাওয়া।

করাগী, মনমরা, টোলফেলা, নাড়ীছেঁড়া, ধামধরা,
বজামারা লোক, হাততোলা খাওয়া, হাড়যোড়া (গাছ)।

* এগুলি ইংরাজী Cognitive accusativeএর
মত নহে কি?

ছ—ছাঁদা বাঁধা, ছাল ছাড়ান, ছাল ছেঁড়া,
ছিকে ছেঁড়া, ছিটে টানা, ছুঁচ-বেচা (কানার-
বাড়ী), ছেলে ছৌচান, ছেলে লেখান।

জ—জল গলা, জল তোলা, জাল ফেলা,
জাত যাওয়া।

ঝ—ঝাল ঝাড়া, ঝালা ঝাড়া, ঝাঁপাই
ঝোড়া, ঝুলি ঝাড়া।

ট—টিকি কাটা, [টিকিট কাটা], টিপনি
কাটা, টেনে আনে, টেনে খোনা, টোল
ফেলা।

ঠ—ঠেকে শেখে, ঠেলে ফেলে।

ড—ডাল গলা, ডুবে যাবে।

ঢ—ঢল বা ঢেলা ফেলা।

ত—তহবিল তহরুপ করা, তান-তোবড়া
তোলা, তোপ পড়া।

দ—দম দেওয়া, দর দেওয়া, দড়া ছেঁড়া,
দড়া ছেঁড়াছিড়ি করা, দরজা দেওয়া, দাগ
দেওয়া, দাগ লাগা, দাগা দেওয়া, দাঁত দেখা,
দাঁত দেখান, দাঁতে দড়ি দেওয়া, দাম দেওয়া,
দাড়ী উপড়ান, দুধ দেওয়া, দুয়ার দেওয়া,
দেখা দেওয়া, দেখে' শেখা, দৃষ্টি দেওয়া, দোষ
দেওয়া, দোষ দেখান, দৌড় দেওয়া।

ধ—ধরা পড়া, ধান ভানা, ধান শুকান,
ধামা ধরা, ধার করা, ধৈর্য্য ধরা।

ন—নখ কাটা, নখ নাড়া, নস্ত টানা, নস্ত
নেওয়া, নস্ত লোসা, নাম কেনা, হুদি নামা,
থাক নাড়া।

প—পগার পার হওয়া, পকাশ পেরোন,
পটোল তোলা, পটোল পোড়ান, পড়ে
পাওয়া, পাক পড়া, পাক পাড়া, পাকা কলা
পাওয়া, পাখী পড়ান, পাটিয়ে পড়া, পাট কাটা,
পাঁঠা কাটা, পাত পাড়া, পাতা পাতা, পা

পড়া, পার পাওয়া, [পাশ পাওয়া], পা
পিছলিয়া পড়া, পালাবার পথ পাওয়া, পিচুটি
পড়া, পিণ্ডি পাওয়া বা পাকান, পিণ্ডি
পড়া, পুথি পড়া, পুষ পড়া, পোকা পাড়ান,
পৌটা পড়া, পেঁচোয় পাওয়া, পেছিয়ে পড়া ।

ফ—ফল ফলা, ফাঁদে পা পড়া, ফুটকড়াই
ফোটা, ফুঁ ফুটান, ফুটি ফটা, ফুল ফোটা ।

ভ—ভয় ভাঙ্গা, ভুল ভাঙ্গা, ভূত ভাগান,
ভূর ভাঙ্গা, ভূরভূরি ভাঙ্গা, ভেরেঙা ভাঙ্গা,
ভেড়া চরান, ভেলকী লাগা, [ভোট
ভাঙ্গান, ভোট ভিক্ষা করা]

ম—মজা মারা, মটকা মারা, মন কেমন
করা, মন মজান, মন মাতান, ময়দা মাখা বা
মশটান, মাছ মারা, মাছি মারা, মাথা মুড়ান,
মাথা ব্যথা করা, মাছ বাছা, মাছুষ মারা, মুখ
দেখা, মুখ দেখান, মুখ রাখা, মুণ্ডর মারা,
মুলুক মারা, মুড়ো মারা, মেড়া পোড়ান ।

র—রা কাড়া ।

ল—লোক লাগান ।

ব—বগল বাজান, বাজনা বাজা, বাজে
বকা, বাজার জাঁকান, বাজার যাওয়া, বাটনা
বাঁটা, বাড়ী বহিয়া, বাদ সাধা, বাঁশী বাজান,
বাসা বদলান, বাসা বাঁধা, বুক বাঁধা (আশায়),
বুক ঠোকা, বেরিয়ে পড়া, বেয়াকুব বানান,
বোকা বানান, বোকা বুকান, বোকা বহা ।

শ—শরীর সারা, শক শোনা, শাক সিদ্ধন ।

স—সং সাজা, সরা সাজান, স'রে পড়া,
সবুয় সহ্য ।

হ—হাওয়া খাওয়া, হাত তোলা, হাত
পাতা, হাড় গুঁড়া করা, হাড় যোড়া, হাঁড়ী
চড়ান ।

৬। উপসর্গ উপপদ প্রভৃতি যোগেও

আমার দর্শন পাইবে । যথা, আনুল্যাবিত,
উৎখাত, উৎপাত, উদ্ভিদ, উপপদ, কন্মকার,
কারুকার (কারিকর), কুস্তকার, কোলাহল,
তদ্ধিত, দায়াদ, দোহদ, নগণ্য, নির্ণয়,
নিনিমেষ, নিমন্ত্রণ (নেমস্ত্রম), নিঘূর্ণ (নিঘ্রিণে,
পরিপক, পরিপাক, পারিপাটা, পারিপাথিক,
প্রপিতামহ, প্রতিপক্ষ, প্রতীত, মহাধ্ব,
মুষ্টিমেয়, বমজ, বলীবর্দ, বিবস্ত্র, বিবাদ,
বিবাহ, বিবিধ, বিবেচনা, ব্যতিব্যস্ত, সংশয়,
সংসার, সমস্তা, সমাস, সরস, সন্দেশ, সূহ,
সুশ্রুত, সুষমা, সৌসাদৃশ্য ।

৭। প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেও অনেক হুলে
আমি মৃতিমান হইয়া উঠি । যথা (সংস্কৃত)—
অতীত, একক, একাকী, কণিকা, কথকতা,
কনক, কপর্দক, কলিকা, কারক, কুষক,
কুৎসিত, কুলীরক, কুজ্জাটিকা, তত্ত্ব, তাকিক,
তাড়িত, নন্দন, নয়ন, নবীন, নূতন, পতিত,
মজ্জমান, মনন, মহিমা, মাননীয়, মাতামহ,
মৃতিমান, ম্রিয়মাণ, রণন, লৌকিক, বাক্য,
সরস্বতী, শ্রোতস্বতী ।

চলিত কথা—গররাজি, গরহাজির,
গুরুগরি, গোমস্তাগিরি, দিগদারি, দেনদার,
দোকানদার, দৌড়দার, পাগলপাড়া, মাত-
লামো, মালামো, মুখোমো, বিবাগী, বে-আকুব,
বে-আদব, বেকবুল, বেবন্দোবস্ত, বেবাক ।

আমারই খাতিরে নানা প্রত্যয় ও
বিভক্তি-যোগে ধাতু অভ্যস্ত হয় । যথা—গঙ্গা,
চঞ্চল, জর্জর, জাজ্জল্যমান, দোহলামান,
দেদীপ্যমান, মৌমাংসা, মুমূর্ষু, যুযুৎসু, রোক্ত-
মান, লালসা, লেলিহান, গুশ্রবা, সরীসৃপ ।

৮। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, ব্যাকরণ-
বিভীষিকা-কাণ্ডে যে ব্যাকরণ-বিরোধ ও বর্ণ-

বিভ্রাসে ব্যতিক্রম বা বাণান-বিভ্রাট বর্ণনা
করিয়া নয়মনসিংহ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত
(দুইটি স্থানই আমার এলাকায়) হলস্থল
লাগাইয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রেও আমার ২৭টন-
৫টন-পটীয়সী প্রতিভার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।
আমারই মায়ায় অলৌক-সাদৃশ্য-বশতঃ নানান
বিভ্রাট ঘটে।

(১০) নিরাকার সাকার হয়, সাকার
নিরাকার হয়। যথা ছায়া-কায়া, কলা-ছলা,
কলা-মূলা, লতা-পাতা, রাজারাগী ও রাজা-
প্রজা (বাঙ্গালার দ্বন্দ্ব সমাসে)। দয়া-ময়া
(ময়া)।

(১০) বিসর্গ-বিসর্জন ঘটে। যথা—প্রাণ—
মন, বক্ষ—রক্ষ, হেম—শ্রেয়, অয়—পয়
(পয়স্ ?)

(১০) স্বরসামা ঘটে। যথা—ধূলা (ধূল)
খেলা বা খেলাধূলা, নিশি (নিশা) দিন,
নিশি দিসি, নিশির শিশির, মুগ-মুহুরী (মুহুরী),
হনুমান-জাম্ববান (জাম্ববান), ঘোষ বোস
(বসু)।

(১০) ব্যঞ্জনসামা ঘটে। যথা—(সাধারণ
উচ্চারণ) (লক্ষ্মী) লক্ষ্মী-নারায়ণ, লাত-
লোকসান (নোফান), ছিরি (শ্রী)-ছাঁদ,
ছিটি (সৃষ্টি) ছাড়া।

(১০) অক্ষরের লোপাপত্তি ঘটে। যথা—
রাম—শাম (শ্রাম)।

বিশীষিকার বিকট বদন-ব্যাধানে নিদ্রা-
ভঙ্গ হইল।

(সমাপ্ত)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ণ কাম

তোমারে বেসেছি ভাল পেয়েছি জীবনে,
মোর প্রেমপঞ্চতপ তুষ্ট দেবতার
প্রসাদ প্রদত্ত বর তুমি যে আমার,
সর্কার্থসাধিকা সিদ্ধি ব্রত-উদ্‌গাপনে।
ভূজ্জ লেখা মন্তপুত কবচের সম
বক্ষে থাকি ভয়াভীত করেছ আমারে
নিখিল ঐশ্বর্য সার রত্ন শ্রেষ্ঠতম

হে মোর কোমলভাগি, একাবলী হারে
কণ্ঠে মোর আছ বাঁধা। কিবা, স্বকচিরা,
তুমি মোর বনমালা আমি বনমালা,
তুমি সে বৈকুণ্ঠপুরী তুমিই ইন্দ্রা
প্রেমপদসদলক্ষ্মী। একি গৃহস্থালী
প্রণয়বিভূতিলিপ্ত ভিখারীয়ে লয়ে
পাতিলে কল্যাণী মোর অন্নপূর্ণা হয়ে।

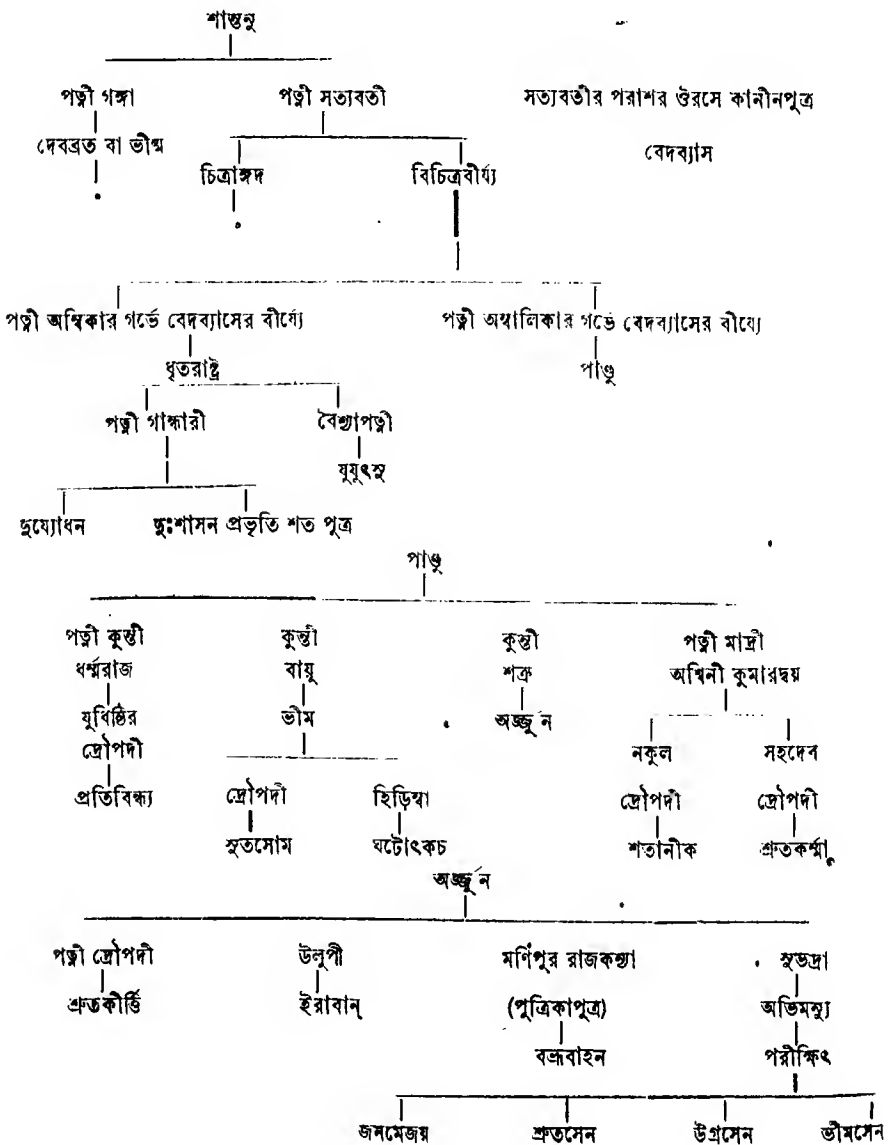
শ্রীস্বরেশ্বর শর্মা।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

সমসাময়িক অংশ ।

শাস্ত্র হইতে জনমঙ্গল পর্যা্যন্ত নৃপতিগণ এই অংশভুক্ত, কারণ ঐ কয় পুরুষ ব্যাঙ্গের সম-
কালীন বলিয়া মহাভারতে প্রসিদ্ধ। এই অংশ লইয়া পুরাণ ও মহাভারতে কোন বিসম্বাদ
নাই। একই বংশ, একই ইতিবৃত্ত পুরাণে ও মহাভারতে বর্ণিত। নিয়ে উভয় বংশাবলী
উদ্ধৃত হইল—

মহাভারতের বংশ



উপরোক্ত বংশাবলী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাণে বৃষ্টিবীরের বোধেশ্বরী নামে দ্বিতীয়া পত্নী থাকে ও তাঁহার পুত্র দেবক । এইরূপ ভীমের কালী নামে তৃতীয়া পত্নীর সর্বত্রগ নামে এক পুত্র হয় । নকুলের দ্বিতীয়া পত্নী কর্ণুমতী নিরমিত্র নামক পুত্রের জননী ও সহদেবের বিজয়া নামে দ্বিতীয়া পত্নী সুহোত্রের মাতা । মহাভারতে উঁহাদের ঐ ঐ পত্নী ও ঐ ঐ পুত্রের নাম নাই । এতদ্ভিন্ন পুরাণের ও মহাভারতের ইতিবৃত্ত সমান । সুতরাং বিসম্বাদজনিত কোন সংশয়ে কোন অবকাশ নাই । কিন্তু অনেকে বলিবেন যে,—

সমসাময়িক অংশ প্রত্যয়ের দুইটি প্রতিবন্ধক আছে ।

প্রথম প্রতিবন্ধক—অলৌকিকতা, দ্বিতীয়—প্রমাণাভাব । তাঁহারা বলিতে পারেন যে, শাস্ত্রমূর গঙ্গাকে বিবাহ ও সেই পত্নীর একে একে সন্দোজাত সাতটি পুত্রকে গঙ্গাজলে নিমজ্জন, ভীমের অজ্ঞাত বালাজীবন, সত্যবতীর মৎস্তগর্ভে জন্ম ও যোজনগন্ধাভ্রলাভ, চিত্রাঙ্গদের গন্ধর্ব্ব সহ বর্ষধরবাপী যুদ্ধ, পাণ্ডুর মৃগরূপী মুনিবধ ও মুনিশাপে ক্রীবৎপ্রাপ্তি, কুন্তী ও মাত্রীর দেবসংসর্গে গর্ভ, দ্রোণের দ্রোণ হইতে বিনা মাতৃশোণিতে জন্ম, কৃপ ও কৃপীর ঐরূপ ঋষিবীৰ্য্যে শরবনে জন্ম, যজ্ঞবেদী হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যাজ্ঞসেনীর উত্থান, শিখণ্ডীর পুংস্বপ্রাপ্তি, অগ্নির নিকট অর্জুনের গাভীবাদি লাভ, অর্জুনের পশুপতি-গ্রীণন ও দেবলোকে গমন প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে বিশ্বাসের সীমা থাকে না । সুতরাং শাস্ত্রমূ প্রভৃতির চরিত্রে কতদূর অলৌকিকতা মহাভারতে বর্ণিত ও তাহা

কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহার পর্যালোচনা আবশ্যক ।

শাস্ত্রমূচরিত অলৌকিক নহে

বাসুদেব শাস্ত্রমূর সমসাময়িক হইলেও, শাস্ত্রমূকে যে তিনি দেখেন নাই, তাহা মহাভারতেই প্রকাশ । এমন কি, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্যকেও তিনি দেখেন নাই । বিচিত্রবীৰ্য্যের মৃত্যুর পর সত্যবতী যখন ভীমকে বিবাহ করিতে অমুরোধ করিলেও ভীম নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন না এবং অত্যাচার না দেখিয়া যখন সত্যবতী অশ্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্ত বাসুকে আহ্বান করিলেন, তখনই কৌরবরক্ষমঞ্চে বাসুের আবির্ভাব । সুতরাং বেদবাসু শাস্ত্রমূ ও বিচিত্রবীৰ্য্যের চরিত্র পরের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন । শাস্ত্রমূচরিত যে গাথামূলে লিখিত, তাহা আদিপর্বে ৯৫ অধ্যায়ে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

প্রতীপঃ খলু শৈব্যামুপযমে সুনন্দাং নাম । তস্তাং পুত্রানুৎপাদয়ামাস দেবাপিঃ, শাস্ত্রমূঃ, বাহ্লীকং চেতি । দেবাপিঃ খলু বাণ এবারণ্যং বিবেশ । শাস্ত্রমূস্ত মহীপালো বভূব । অত্রানুবংশশ্রোকো ভবতি—
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং স মুখমশ্লুতে । পুনর্যুবা চ ভবতি তস্মাস্তং শাস্ত্রমূঃ বিহঃ ॥

ইতি তন্ত শাস্ত্রমূতম্ ।

অনুবাদ—প্রতীপ শিবির কন্তা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাতে দেবাপি, শাস্ত্রমূ ও বাহ্লীক নামে তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন । দেবাপি বাণ্যকালে অরণ্যে প্রবেশ করেন । শাস্ত্রমূ মহীপাল হন । এই স্থলে এই অনুবংশ-শ্রোক আছে—

“যে যে জীর্ণবাত্তিকে তিনি স্পর্শ করিতেন সেই সেই ব্যক্তি সুখী হইত ও পুনরায় যুবা হইত।” এজ্ঞ তাঁহাকে শাস্ত্রু বলিয়া লোকে জানিত। ইহা তাঁহার শাস্ত্রুত্বের কারণ।

ইহা হইতে সুপ্রকাশ যে, ব্যাসদেব গাথা-বলধনে শাস্ত্রুর চরিত্র লেখেন। শাস্ত্রু-কর-স্পর্শে যৌবনলাভ, যশ্চকর-স্পর্শে ব্যাধির উপ-শমাদির জ্ঞায়। উহা বিশ্বাস করুন, আর উপ-হাস করুন, সেই দোষ-গুণ ব্যাসদেব লইতে অনিচ্ছুক বলিয়াই বোধ হয় ঐ প্রবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শাস্ত্রুর রাজ্যপালন, সত্যবতীর সহিত পরিণয় এবং সত্যবতীর গর্ভে পুত্র-দ্বয়োৎপাদন সম্পূর্ণ মানুষিক ব্যাপার। গঙ্গার সহিত তাঁহার বিবাহ অলৌকিক বলিয়া সাধারণের প্রতীতি আছে। কিন্তু তাহাও নিপুণ ভাবে দেখিলে অলৌকিক নহে। মহাভারতে শাস্ত্রুর মর্ত্যধামে আগমন-কথা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে। একদা রাজধিগণের সহিত সুরগণ ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজর্ষি ইক্ষাকুবংশীয় মহাভিষ ছিলেন। তৎকালে গঙ্গা তথায় আসেন। মারুতহিল্লোলে তাঁহার বসন বিচলিত হইলে দেবগণ অধোবদন হইলেন। কিন্তু মহাভিষ সেই দৃশ্য সন্ধান-নয়নে দেখিলেন। পিতামহ মহাভিষের ভোগ-বাসনা বুঝিতে পারিয়া ভোগের জন্ত তাঁহাকে মর্ত্যধামে যাইতে আদেশ করিলেন। মহাভিষ তখন পৃথিবীতে কাহার, পুত্র স্বীকার করা উচিত বিচার করিয়া ধার্মিক ক্ষত্রকুলাবতংস ভূরিতেজাঃ প্রতীপকেই পিতৃত্ব বরণ করিলেন। এই সময় প্রতীপও পুত্রার্থী হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে-

ছিলেন। মহাভিষ তাঁহার পুত্র শাস্ত্রু নামে অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ত্রুর এই পূর্বজন্ম কথা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তিনি প্রতীপের পুত্র—ইহা বিশ্বাস করিতে কোন বাধা নাই। গঙ্গাও মহাভিষের প্রতি সন্মান হন এবং ঐ সময়েই বহুগণকেও ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিতে আসিতে হইবে বলিয়া বশিষ্ঠ অভিশাপ দেন। তাঁহারা আসিয়া গঙ্গাকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার পুত্ররূপে জন্মিবেন ও জন্মমাত্র তিনি গঙ্গাজলে তাঁহাদিগকে একে একে ডুবাইয়া শীঘ্র তাঁহাদিগকে ধরাধাম হইতে বিদায় দিবেন। পরে শাস্ত্রু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একদিন গঙ্গাতীরে যুগয়া নিমিত্ত পর্যটন করিতেছেন, এমন সময় একটা অনবদ্যাক্তী সুদীর্ঘা সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন। রাজা অমনি স্মরণের বিদ্ধ হইয়া তাঁহার ভজনা করিলেন। সেই ললনা বলিলেন যে, আমি ষাণ্ডা করিব, তাহাতে যদি আপনি কখন প্রতিবাদ না করেন এবং আমার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিলেই আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইব এই নিয়ম যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি আপনার পত্নী হইতে পারি। রাজা তখন রূপে মুগ্ধ। তাহাতেই স্বীকার। উভয়ের বিবাহ হইল। মহাভারতে আদিপর্বে ৯৮ অধ্যায়ে স্পষ্টই লেখা আছে যে, মানুষীরূপে আবর্ত্তা গঙ্গার সহিত শাস্ত্রুর বিবাহ হয়।

দিব্যরূপা হি মা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।

মানুষং বিগ্রহং কৃৎয়া শ্রীমন্তং বরবধিনী ॥

ভাগ্যোপনতকামস্ত ভাৰ্য্যা চোপনতাভবৎ।

শাস্ত্রনোন্ পসিংহস্ত দেবরাজসমদ্রাতোঃ ॥

অমুবাদ—সেই ত্রিপথগা গঙ্গাদেবী মানুষ

শত্রীর গ্রাণে করিয়া দিব্যরূপসম্পন্ন হইয়া শ্রীমান্ সৌভাগ্যবান্ ইন্দ্রতুলা নৃপসিংহ শাস্ত্রুর পত্নী হন।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শাস্ত্রুর বিবাহ মানুষীর সহিত হয় এবং সেই মানুষী অলৌকিকরূপশালিনী। শাস্ত্রুও তাঁহাকে গঙ্গা বলিয়া জানিতেন না। গঙ্গার অংশে জন্ম বলিয়া তিনি গঙ্গা নাম লইয়াছিলেন। শাস্ত্রু তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চিস্তানুরণনে সন্তত ব্যাপৃত রহিলেন। তিনিও সাধ্যানুসারে পতির সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রুর ঔরসে তাঁহার আটটি পুত্র হইল। জন্মবার পর একে একে সাতটিকে তিনি গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া মারেন। এইরূপ মাতার পূরনাশ ভীষণ হইলেও অসম্ভবপর নহে। সেই ভীষণ দৃশ্যে রাজা বিস্মিত, চকিত; কিন্তু কিছুই বলিতে পারেন না। অষ্টম পুত্রকেও মাতা নষ্ট করিতে যান। পিতা আর থাকিতে পারিলেন না। প্রতিবাদ করিলেন। তখন সেই মানুষী বহুগণের শাপ ও জন্ম ও গঙ্গার সহিত তাঁহাদের চুক্তির উল্লেখ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অস্তর্ধানকালে তিনি বলেন যে,—

তস্মাদ্ভজননীহেতে মানুষমুপাগতা।

জননিতা বহুনষ্টৌ জিতা লোকাস্ত্রয়াক্ষয়াঃ ॥

অনুবাদ—সেই কারণ তাঁহাদের অর্থাৎ বহুগণের জননী হইবার জন্তই আমি মানুষ বিগ্রহ ধারণ করি। অষ্ট বহুগণের জন্ম দিয়া আপনিও অক্ষয় লোক জয় করিয়াছেন।

ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ যে, গঙ্গানদীর অধিষ্ঠাত্রীৰ সন্তিত শাস্ত্রুর বিবাহ নহে, গঙ্গাদেবী মানুষী হইয়া শাস্ত্রুর পত্নী হন। অস্তর্ধানকালে তিনি

অষ্টম পুত্র দেবব্রতের যে পরিচয় দেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে,— দেবব্রত মানুষীর পুত্র, গঙ্গার প্রসাদে জাত, গঙ্গানদীর পুত্র নহে। সেই পরিচয় এই—

মৎ প্রসূতং বিজানীহি গঙ্গাদত্তমিমং সূতম্।

এই পুত্রকে গঙ্গাপ্রসাদে আমার প্রসূত বলিয়া জানিবেন।

মানুষী গঙ্গার অস্তর্ধানও অসম্ভবপর নহে।

দেবব্রতচরিত অলৌকিক নহে

দেবব্রতের জন্ম অমানুষিক নহে দেখান হইয়াছে। শৈশবে মাতৃ কর্তৃক তাঁহার পরিপোষণও অলৌকিক নহে। পরে মাতৃ কর্তৃক শাস্ত্রুর সহিত পরিচয়ও সম্ভব। তাঁহার বাল্যচরিত্র মহনীর ও অভ্যাদার, কিন্তু অলৌকিক নহে। তাঁহার সর্কশাস্ত্রবিশারদত্ব, পিতৃমুখের জন্ত আশ্চর্যবলি, আকুমার ব্রহ্মচর্যা প্রভৃতি অদ্ভুত হইলেও অমানুষিক নহে। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডবগণের কালেও তাঁহার জীবনীতে কোন অলৌকিকতা নাই।

সত্যবতী

সত্যবতীর জন্ম অলৌকিক হইলেও, কর্ম অলৌকিক নহে। পরাশরের সহিত কন্তাবহ্নায় বিবাহ ও ব্যাসের জন্ম অসম্ভব নহে। শাস্ত্রু যেক্রপ কানী, তাহাতে সত্যবতীর শ্রায় বয়ঃসী কন্তাকে বিবাহও সম্ভবপর। যদি মৎসগর্ভে তাঁহার জন্ম বিশ্বাস না হয়, তবে তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন যে—রাজরাজেশ্বর ক্ষত্রিয়কুলশিরোমণি শাস্ত্রু বৃদ্ধবয়সে রূপের মোহে কামোপহতচেতন হইয়া যখন উপযুক্ত পুত্র দেবব্রতকে বলি দিয়া

দাসরাজার পালিত কন্যাকে বিবাহ করিলেন, তখন রাজপক্ষ হইতে সেই কন্যার ক্ষত্রিয়-বৌর্য্যে অলৌকিক জন্ম প্রবাদ রটিত হইল। সেই প্রবাদ মিথ্যা হইলেই যে সত্যবতী কবির কল্পনা হইবেন তাহা বলা অযৌক্তিক।

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য

পিতার মৃত্যুকালে চিত্রাঙ্গদ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন মাত্র, কারণ রাজাপ্রাপ্তির অধ্যবহিত পরেই তাঁহাকে বর্ষত্রয়ব্যাপী যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইতে হয়। সেই যুদ্ধেই কুরুক্ষেত্রে তাঁহার অকৃত-দারাবস্থায় প্রাণান্ত হয়। ঐ বিগ্রহ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদের সহিত হয় বলিয়া অনেকে উহা বিশ্বাস করিবেন না। গন্ধর্ব্বশব্দে সাধারণঃ দেবযোনিবিশেষ বুঝায় সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্ব নামে এক জাতিও তখন কুরুজাঙ্গলের নিকট হিমালয়ের পত্যন্তপদেশে গঙ্গাতীরে বাস করিত, ইহা মহাভারতের ১৭২ অধ্যায়ে চিত্র-রথাপাখ্যানের প্রারম্ভেই বুঝতে পারা যায়। পাণ্ডবগণ জ্যৈষ্ঠদ্বীপ স্বয়ম্বর-কথা শুনিয়া যখন একচক্রা হইতে উত্তরাভিমুখে পাঞ্চালগণের রাজধানীর উদ্দেশে চলিলেন, অল্প সময় পরেই তাঁহারা সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতটে উপস্থিত। তখন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ গঙ্গায় কেলি করিতে-ছিলেন ও পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধের পূর্বে চিত্ররথ এইরূপ আত্মপরিচয় দেন। *

অঙ্গারপর্ণং গন্ধর্ব্বং বিত্ত মাং স্ববলাঙ্গয়ম্।

অহং হি মানী চেষু'শ্চ কুবেরস্ত প্রিয়ঃ সখা ॥

অঙ্গারপর্ণমিত্যেব খ্যাতং চেদং বনং মম।

অমু গঙ্গাং চরন্ কামাংশ্চিত্রং যত্র রমামাহম্ ॥

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অঙ্গারপর্ণ

নামক এক বন অমুগাঙ্গদেশে একচক্রার সন্নিবৃত্ত ছিল এবং তাহাই গন্ধর্ব্বরাজ মানী বা ঈষু বা চিত্ররথের জীড়াভূমি। একান্ত বোধ হয় যে, চিত্রাঙ্গদকে কুরুরাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী উপরোক্ত মনুষ্যজাতিবিশেষ গন্ধর্ব্বগণই আক্রমণ করেন।

চিত্রাঙ্গদের চরিত্রে যদি কোন অলৌকিকতার ছায়া থাকে বিচিত্রবীৰ্য্য-চরিত্রে কিন্তু অলৌকিকতার গন্ধও নাই। ভ্রাতার মৃত্যুকালেও তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক। ভীষ্মদেব তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বিমাতা সত্যবতীর মতে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। পরে ভ্রাতা যৌবনে আক্রান্ত হইলে, ভীষ্ম নিখিল ক্ষত্রিয় সমাজকে পরাজিত করিয়া, কাশীরাজের তিন কন্যাকে তাঁহায় দ্রুই স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া আনেন। জ্যোষ্ঠা অম্বা শাবরাজকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন প্রকাশ করিলে ভীষ্ম তাঁহাকে শাবরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্র-বীৰ্য্যের বিবাহ হইল। রাজা পত্নীগণের সহিত সম্মুখে সপ্ত বৎসর কাটাইলেন। অতিরিক্ত ভোগে যক্ষ্মা আসিয়া জুটিল এবং তিনি অপূত্রক অবস্থায় কালকবলে পতিত হইলেন। যে আশায় সত্যবতীর পিতা ভীষ্মের প্রাণ্য সিংহাসন কোশলে কাড়িয়া লন, এক্ষণে সেই আশালতা বিধির নির্ব্বন্ধে ছিন্ন হইল। সত্যবতী দেখিলেন, স্বামীর বংশ লুপ্ত হয়। তখন তিনি ভীষ্মকে রাজ্য লইতে ও বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীষ্মদেবের চরিত্র এতই উদার যে, কি সামান্য হস্তিনাপুরের সিংহাসন, সমগ্র জগতের

প্রভুস্বের জন্তও তিনি কখনই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে পারিতেন না। তিনি বিমাতাকে বিনীতভাবে জানাইলেন যে, তিনি যে কৌমার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জীবনের সহিত উদ্‌ঘাপন করিবেন, পিতৃরাজ্যও লইবেন না, বিবাহও করিবেন না। সত্যবতী চিন্তাকুলা হইয়া তখন স্বামীর বংশরক্ষার জন্ত বিচিত্র-বীৰ্য্যের ক্ষেত্রে ভীষ্মকে পুত্র উৎপাদন করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহাতে কৌমারব্রত ভঙ্গ হয় বলিয়া ভীষ্ম তাহা করিতে চাহিলেন না। তখন সত্যবতী নিরুপায় হইয়া স্বীয় কানীন পুত্র বেদব্যাসকে স্মরণ করিলেন—তাবিলেন, যে বেদব্যাসও তাঁহার সম্বন্ধে ত বিচিত্রবীৰ্য্যের ভ্রাতা বটে, ভ্রাতার দ্বারা ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন শাস্ত্রসম্মত এবং কালোচিত প্রণাম বিরোধী নহে। ব্যাসদেব কুরুবংশ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া অস্থিকা ও অঘালিকাতে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্তর বলিয়া রাজ্য পাইলেন না। পাণ্ডু রাজা হইলেন। নিজ ভূজবলে দিগ্বিজয় করিয়া সম্রাট্ হইলেন। কখনও বা হস্তিনাপুরে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, কখনও বা পরিজন-পরিবৃত হইয়া হিমালয়ে মৃগয়াসুখে তিনি মিনবাণন করিতে লাগিলেন। এপর্য্যন্ত কোন অলৌকিকতা নাই। হর্ভাগ্যবশতঃ একদিন মৃগয়ায় একটি সঙ্গমরত মৃগকে বিদ্ধ করিলেন। সেই মৃগশাবক মর্দ্যাহত হইয়া মনুষ্যস্বরে আর্তনাদ করিয়া আশ্রপরিচয় দিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ, মৃগবেশে পত্নীকে মৃগী সাজাইয়া বিহারসুখে রত ছিলেন। এই রুদ্ধে তাঁহাকে হত্যা করায় পাণ্ডুর দোষ

হইয়াছে, অতএব তিনি রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, যেমন নৃপতি তাঁহাকে রতিকালে অপূর্ণকাগাবস্থায় হত্যা করিলেন তেমনি কাগের উদ্বেগ হইলেই অপূর্ণকাম হইয়া নৃপতিকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পাণ্ডুর প্রতিশাপ

এই শাপেই বিষম গোলযোগ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মহানুভবগণ বলিবেন, ইহাও কি সম্ভব, যে মানুষ মৃগের আকার ধরিতে পারে এবং মানুষের কথায় লোকের ভোগশক্তি যায়। মানুষের মৃগবেশধারণ সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টাব্দে কাশে যখন কুকুটাদির বেশ মানুষ আজও সভ্য পতীচ্যজগতে ধরিতেছে, তখন সকাম প্রাচ্য মূনির মৃগবেশ ধরা এবং দূর হইতে রাজার তাঁহাকে মৃগ ভ্রম হওয়া সম্ভবপর বটে। শাপের শক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি কখনও অদৃষ্টে সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে তবে

ঋণীণাং পুনরাগ্যানাং বাচমর্থোহমুখাবতি

ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আর সাধারণতঃ দেখিতে গেলে জীবমাত্রেরই মনস্তাপ দিলে মনস্তাপ পাইতে হয়। মনের সহিত শরীরের একরূপ সম্বন্ধ যে, মনস্তাপে শরীর পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে, ইন্দ্রিয়বিশেষের শক্তিদ্রুপ হওয়া ত সামান্য। ঐ ব্রহ্মহত্যার কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘনবিষাদ-মেষ পাণ্ডুর হৃদয়াকাশ ষেরিয়া ফেলিল। তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া রাজ্যভরণ-উদ্যোচন পূর্ব্বক রাজপরিজনবর্গকে বিদায় দিলেন। তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নয়নে হস্তিনাপুরে চলিয়া গেলেন। কুন্তী ও মাদ্রী তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন

না। অগত্যা পাণ্ডুও, তাঁহাদিগকে লইয়া
হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া শতশৃঙ্গপর্বতে মুনিবৃতি
অবগমন করিলেন। ঘোর তপস্যায় তাপস-
গুণও তাঁহার নিকট পরাভূত। অনঙ্গ তাঁহার
নিকট পরাজিত। কিন্তু বংশলোপ-চিন্তা
তাঁহাকে জর্জরিত করিল। তখন কুন্তী
তাঁহাকে জানাইলেন যে, কতকালে হর্দ্বাসা

মুনির সেবা ও শুশ্রূষা করার ঋণ প্রসন্ন
হইয়া তাঁহাকে এমন এক মন্ত্র দিয়াছেন যে
তাঁহার প্রভাবে যে কোন দেবতাকে তিনি
আহ্বান করিবেন, সেই দেবতাই তাঁহাকে
পুত্র দিবেন। পাণ্ডু আনন্দিত হইয়া ধর্ম,
বায়ু, ও ইন্দ্রকে আহ্বান করিতে বলিলেন।
শাস্ত্রী শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নগেন্দ্রনাথ

(বিষয়বৃক্ষ)

বিষয়ক্ষেত্রে স্বর্গের চারিটি ছবি, চারিটি
রত্নপ্রভা-মণ্ডিত। আগর। রমণীররত্নের
মুণ্ডাবধারণে প্রয়াস পাইয়াছি; এখন পুরুষ-
হরের সৌন্দর্য্যাবলোকন করিয়া এ আলোচনা-
দর্শন শেষ করিব। নগেন্দ্রচিহ্ন লিখনে
আবার কবির সেই প্রথা—প্রসঙ্গক্রমে অন্তের
দ্বারা সে চিত্রের আভাস পদান করিয়াছেন।
কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নে, তাহার মাতা
জ্যোতির্ময়ীরূপে অঙ্গুলিসন্ধে দ্বারা গগনো-
পাস্তে দেখাইলেন, কুন্দ তৎসঙ্কেতামুসারে
দেখিল “নীলগগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষ-
মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত,
প্রশস্ত ললাট; সরল সবরূপ কটাক্ষ; তাঁহার
সরলবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বক্সিম গ্রীবা এবং অন্যান্য
মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতে
পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে।”
কি কোশলময় তুলিকা-সংযোগ! এক রেখা-
পাতে একটি সমগ্র চিত্রের বহিরূপ পূর্ণতা-
প্রাপ্ত! অথচ কবি যেন এ স্থলে সে চিত্রের
প্রতিফলনে চেষ্টিত নহেন।

প্রথম দর্শনেই নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর
হৃদয়ে পরস্পরের আকৃতিগত মাধুর্য্য বা
বিশেষত্ব অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু এই
আকর্ষণ প্রথমেই কাহার হৃদয়ে প্রণয়ানুরাগে
পরিণত হয় নাই। কুন্দের অপাখিব দেহ-
লাবণ্যে নগেন্দ্রের চিত্ত বিমোহিত হইয়া
থাকিলেও, কুন্দ নগেন্দ্রের হৃদয়ে দর্শনমাগ্নেই
প্রণয়প্রাতীক্বে স্থানাদিকার করিতে পারে
নাই কেন, তাহা আমরা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা
করিয়াছি। স্বর্ধ্যমুখীর পূর্ণাদিকার অন্তের
জ্ঞান স্থানাবশিষ্ট রাখিয়াছিল না। কুন্দও
তখন বালিকামাত্র, নগেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-
প্রভাব অন্তরে অনুভূতি করিয়া থাকিলেও,
সে তাহার স্বভাব-সারল্যে তাহার হৃদয়ভাবের
প্রকৃতি অবধারণ করে নাই। পরে যৌবনের
পূর্ণ সৌন্দর্য্যের নিত্য সান্নিধ্যে পূর্ণানুভূতি
পুষ্টলাভ করিয়া যেমন একের হৃদয়ে রূপে-
আদ আনিয়া উপস্থিত করিল, অত্রও সেইরূপ
যৌবনের সতেজ হৃদয়বৃত্তির পরিপোষণোন্মুখী
হইয়া পূর্ণানুরাগে সজীবতা লাভ করিল।

কাব্যে রূপোন্মাদ সচরাচর আকস্মিক ব্যাপার-রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে,—মোহের কার্য্য, চিত্তের বিহ্বলতা, দৈবঘটিত, বা মানুষের আত্মশাসনশক্তির অতীত কুন্দ-নগেন্দ্রের অমুরাগ আকস্মিক ভাবে মূলস্থাপন করিয়া থাকিলেও, তাহার পুষ্টি কতক পরিমাণে ক্রমিক, কিন্তু ক্রমিক হইয়াও তাহা উদ্ভাস্ত ভাব ধারণ করিয়াছে এবং আকস্মিক রূপোন্মাদের সহিত তাহার কোনরূপ প্রভেদ নাই। নগেন্দ্রকে কবি উন্মাদ করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন, তাঁহার রূপোন্মাদের সহিত তাঁহার নিরন্তর সংগ্রামজনিত চিত্ত-বিকলতা তাঁহার চরিত্রে মৃগপানাদি নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া ফেলিয়াছে। এ উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার আত্মদমনচেষ্টার পরাভব দ্বারা আপনার প্রতি বিরক্তির ফল, আত্মানাদর হইতে উদ্ভূত, তাঁহার চিত্তের মহত্বেরই পরিচায়ক, প্রবৃত্তির দোষবিজ্ঞাপক নহে। কাব্যে রূপোন্মাদ মিলন বা পরিণয়ে পরিণত হইয়া পাত্রদ্বয়ের চরিত্র-মহত্বে তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্টহৃদয় পাঠকগণকে আনন্দ প্রদান করে; অথবা কাব্য বিয়োগান্ত হইলে, নায়ক-নায়িকার ভাগ্য-হীনতায় ক্রন্দন করিয়া তাহাতেও পাঠক এক-রূপ আনন্দানুভব করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বিবাহিত পুরুষের হৃদয়ে স্ত্রী বর্তমানে, অন্যের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করিয়া এক সমস্তা উপস্থিত করিয়াছেন। কলুষিত চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তৎপ্রতি পাঠকের ঘৃণার উদ্বেক করিয়া দেওয়া এ স্থলে তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, প্রত্যুত এ চিত্র-সংসৃষ্ট সকলকেই তিনি পাঠকের প্রীতির, শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র করিয়া আঁকিয়াছেন, সেই প্রীতি ও শ্রদ্ধাভক্তি অক্ষুণ্ণ

রাখিয়াই তাঁহাকে এ সময়ের সমাধান করিতে হইয়াছে। নগেন্দ্রের রূপোন্মাদও তাঁহার হস্তে মিলনে পরিণতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে মিলন বিয়োগের পূর্বস্নেহজন, এবং মিলন ও বিয়োগ উভয়ই কবির মহৎ এবং বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্ববর্ণ দগ্ধ হইলে তাহার স্বরূপ অধিকতর প্রকাশ পায়, নগেন্দ্র-স্বর্ধ্যমুখীর দাম্পত্যপ্রণয় পূর্ণতর করিয়া দেখাইবার জন্যই কি কবি কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত করিয়াছেন? ফলে তাহা হইয়া থাকিলেও, তাহাই কবির মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিলে, নগেন্দ্র-স্বর্ধ্যমুখী সম্বন্ধে বিষবৃক্ষের কোন অর্থ থাকে না। কবির অভিপ্রায় ভিন্ন এবং মহত্তর এবং আধুনিক সময়ের মাজ্জিত উন্নত নৈতিক ধারণার উপযোগী। শকুন্তলার রূপদর্শনে ছন্দস্তের চিত্তবিকারস্থলে, ছন্দস্তের চরিত্রবিশুদ্ধতারক্ষার জন্য শকুন্তলার কবি গান্ধর্ব্ব বিবাহই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। বিষবৃক্ষের কবিও নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর সম্বন্ধে বিশুদ্ধতারক্ষার্থ বিধবা-বিবাহ-বিধির শরণ লইয়াছেন। কিন্তু তিনি, তাঁহার অভিমত উচ্চ নীতি তাহাতেই রক্ষিত হইল, মনে করেন নাই। তিনি লৌকিক ব্যবহারের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র, সামাজিক শিক্ষার জন্য যে কাব্য লিখিত, তাহা সামাজিক হিসাবে নায়ক-নায়িকার অপবিত্র সংযোগ দ্বারা কলুষিত হইতে দেন নাই, এই মাত্র। তিনি যে নীতি শিক্ষা দিবার জন্য এ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা লৌকিক নীতির অনেক উচ্চে সংস্থাপিত। তিনি নগেন্দ্রকে মহৎ এবং কুন্দকে পবিত্র করিয়া

কৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের প্রেমামুরাগে দোষারোপ করেন নাই; ঘটনাক্রমে অবস্থাগতিক, মানুষের যাহা হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহাদের ঘটয়াছিল; তাঁহারা মানুষ, মানুষস্বভাবের অতীত হইতে পারেন নাই; আর হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক প্রসারণ তাঁহাদিগকে না দেখাইলেও, তাঁহাদের স্বভাবসৌন্দর্য রক্ষিত হইত না। কিন্তু তিনি বলিতেছেন, “নগেন্দ্র, তোমার ন্যায় মহাপুরুষও, তোমার ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিও যদি সাধারণ মানুষের মত অবস্থাপ্রভাবে পরাভূত হইল, তবে তোমার বিশেষত্ব, তোমার শিক্ষার গৌরব রহিল কোথায়? মানুষ মাত্রেই স্বভাবতঃ দুর্বল হইলেও, শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা মানুষ সংযমী হইতে সমর্থ হয়। তোমা হইতে আশা করিয়াছিলাম, বিশেষতঃ তোমার যখন সূর্য্যমুখী ঘরে ছিল, তখন তোমার পক্ষে ইহা সম্ভবপর মনে করিয়াছিলাম যে, তুমি চিন্তাসংযমে অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিবে। তাহা তুমি পারিলে না, তাহাতেই তোমার পক্ষে বিষবৃক্ষের সৃজন হইল। তোমার অদৃষ্টে যে অসামান্য একরূপ লোকাভীতি, অতিপবিত্র, অতিবিশুদ্ধ, অতিরমণীয় ভুলভ দাম্পত্যমুখ ঘটয়াছিল, তাহা তুমি অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারিলে না। কেবল ইহাই তোমার ক্ষতি নহে, তুমি দেবতা হইবার যোগ্য হইয়াও, মানুষের নিম্নতলের হইয়া গেলে, তাহাই আমার দুঃখ।” — “আর তুমি কুন্দনন্দিনী, তুমি স্বর্গীয়, পবিত্র বিশুদ্ধ সৃষ্টি, তুমি তোমার সেই স্বর্গীয় প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া, অন্তের অমঙ্গল সত্তাবনাহলে, অন্তের সুখের বিঘ্নপরিহার জ্ঞা,

তোমার আত্মত্যাগের, আত্মনিগ্রহের প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে না, জ্যোতিষ্ময় লোকের অধিবাসী হইয়াও তোমার মানব-জন্মে তোমার মানবীত্বের প্রমাণ প্রদান করিলে।” এই অভ্যাস স্বর্গীয় তুল্যদণ্ডে মাপিলেই কেবল কুন্দ-নগেন্দ্রের অভাব বুঝিতে পারা যায়; এবং কবি তাঁহার শিক্ষা মানুষের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রদ করিবার জ্ঞা ইহাদিগকে এই অভাব দিয়া সৃজন করিয়াছেন; মানুষকে বলিতেছেন, “শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা এই অভাব পূরণ করিয়া দেবত্ব লাভের চেষ্টা কর”, অনুকরণীয়ের অনুকরণে কেবল সন্তুষ্ট না হইয়া, অনুকরণীয়কে অতিক্রম করিতে উৎসাহিত করিতেছেন, এবং অশেষ-গুণসম্পন্ন হইয়াও সর্বত্র, সর্বাবস্থায় উচ্চ নীতি সংরক্ষণে অসমর্থ হইলে যে বিঘ্নময় ফলের উৎপত্তি হয়, কুন্দ-নগেন্দ্রের জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিয়া, সে উৎসাহের ঘটনাগত সমর্থন সংযোজিত করিয়াছেন। উচ্চ নীতিরক্ষণে অসমর্থতার জ্ঞা কুন্দ-নগেন্দ্রের প্রায়শ্চিত্ত কবি কম করিয়া আঁকেন নাই। কুন্দ জীবনেও যারপরনাই মনোদুঃখ ভোগ করিয়াছিল, পরে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়াছিল। নগেন্দ্রনাথই কি কম কষ্ট পাইয়াছেন? প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামেও তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইয়াছে। তৎপরে সকল সুখের সামগ্রী, সকল আরাগের উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া অশেষ ক্লেশপরম্পরায় জীবন শেষ করিয়া, সূর্য্যমুখীর প্রতি তাঁহার অন্ত্যায়-চরণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উত্তত হইয়াছিলেন, এবং কতক পরিমাণে কষ্টভোগও করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পাপ তত অধিক

নহে, অল্প প্রায়শ্চিত্তের পরেই পুনঃ পূর্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া সুখে জীবনানতিপাত করিয়াছেন। সুখে বলি কি? যদি বলি, তবে কবির উচ্চ নীতির লাঘব করা হইবে। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়া কি নগেন্দ্রনাথকে চিরজীবন অনুতাপ করিতে হয় নাই? কুন্দনন্দিনীর রূপমোহে একবার ভ্রমে পড়িয়াছিলেন, আবার যে কুন্দের প্রতি তিনি অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার জ্ঞাত্য তাঁহার অনুতাপ না হইয়া থাকিলে, তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব থাকে কোথায়? নৈতিক বিচ্যুতির ইহাই এক অবশ্যম্ভাবী ফল, তদ্বারা যে দুঃখ-বস্ত্রণা, যে সমস্তার অবস্থা আনিয়া ফেলা হয়, তাহার এককালীন নিরাকরণ আর সম্ভবে না। পূর্ণ শরীরে যে আত্মকৃত ক্ষত, তাহা একেবারে মিলায় না। তাই, শিক্ষা দ্বারা, অভ্যাস দ্বারা, চরিত্র-ভিত্তি একরূপ দৃঢ় করা কর্তব্য যে, কখনও একরূপ সমস্তায় পড়িতে না হয়। নগেন্দ্র-চরিত্রের প্রধান শিক্ষাই এই, এবং এ অতি উচ্চ শিক্ষা।

নগেন্দ্রনাথকে কবি ভাষ্যাবৎসল করিয়া আঁকিয়াছেন। স্বর্ধ্যমুখীর জ্ঞাত্য তাঁহার আত্ম-মুশোচনা, আক্ষেপ ও দুঃখভোগ, এবং তাঁহার ভাষ্যাবিনোদন-প্রণালীর আলোচনা করিলে, তাঁহার কুন্দের আসক্তি সত্ত্বেও, তাঁহার চরিত্রের এট অংশ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। একরূপ ভাষ্যাপ্রেমস্থলেও যে রূপমোহ একরূপ অনর্থ ঘটাইতে পারে, ইহা কেবল মানুষের ভাগ্য। মানুষ যে শাপভ্রষ্ট জীব, মানুষের সুখের যে অসংখ্য বিষ, ইহা তাহাই প্রমাণ করে। অথবা মানুষের সুখদুঃখের মূলে এ সকল না থাকিলে, মানুষের যে কুহেলিকাপূর্ণ জীবন,

তাহা ওরূপ হইত না। শিক্ষা নৈতিক শক্তির প্রবর্তন করিয়া মানুষের সুখ যে পরিমাণে আপনাতর চরিত্রের উপর নির্ভর করে, সে পরিমাণে সুখের স্থায়িত্ব সংস্থাপন করিতে পারে, এবং সে অবস্থার উচ্চতা বিবেচনা করিলে তাহা বঙ্গনীয়ও বটে; কিন্তু ভাঙ্গা-গড়ার দুঃখ-দুর্দলতার মধ্যেও একরূপ রমণীয়তা আছে, তাহার ক্ষতি স্বীকার করিয়া দিতে হয়। ভাঙ্গা-গড়া, দুঃখ-দুর্দলতা কি শিক্ষার জন্তও প্রয়োজন নহে? কবি বলিতেছেন, অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা। দুঃখ নিজের কার্যফল এবং সে কার্য চরিত্রের দুর্দলতা হেতু। নৈতিক দুর্দলতা যে দুঃখ ভাঙ্গে, সে সুখ পুনর্গঠিত হইলে, দুঃখভোগ দ্বারা অন্তঃকরণের শিক্ষা জ্ঞাত্য নৈতিক বলের পুনরাধান হইয়া সেই নূতন সুখের বা পূর্ব সুখের নবগঠিত অবস্থার স্থায়িত্ব জন্মায়। অভাবজনিত দুঃখও আছে, যাহা আত্মকার্যের ফল নহে। অভাবে লোভের কারণ উপস্থিত হইলে, লোভের বস্তু পরিহারের চেষ্টা এবং চেষ্টাজনিত মানসিক অভ্যাসে চিন্তাসংঘর্ষের ক্ষমতা জন্মে। একরূপে যাহার চিন্তাসংঘর্ষের ক্ষমতা জন্মে নাই, নৈতিক বিচ্যুতি তাহার পক্ষে সম্ভবপর, আবার সে বিচ্যুতি হেতু দুঃখভোগ, দুঃখভোগ হইতে শিক্ষা, শিক্ষা হইতে নৈতিক শক্তির আধান। সর্বতোভাবে কিছুই পরিহার সম্ভবপর নহে, চক্রের আবর্তনের ত্রায় নিম্নোচ্চাবস্থাপ্রাপ্তিমাত্র, তবে একের নিয়গমন অন্তকে সঁতর্ক করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সুখের স্থায়িত্ব ঘটাইতে পারে। নগেন্দ্রের জীবনে এ সকলই দৃষ্টান্তগত হইয়াছে। তবে চিন্তাসংঘর্ষের অভাব যে

পূর্ণতাকে নষ্ট করে, তাহারও তিনি অলঙ্ঘ্য দৃষ্টান্ত। কবি তাঁহার সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহার চরিত্র-লোচনা শেষ করিলাম।—“অন্তঃকরণের পক্ষে হৃৎখণ্ডোগই প্রধান শিক্ষা।

“নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখনও হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্ত-রূপ, অতুল ঐশ্বর্য, নীরোগ শরীর, সর্ব-ব্যাপিনী বিজ্ঞা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী, এ সকল একজনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই প্রায় ঘটিয়াছিল। প্রধান পক্ষে নগেন্দ্র নিজ চরিত্র-গুণেই চিরকাল সুখী; তিনি সত্যবাদী অথচ প্রিয়বৎ; পরোপকারী অথচ ত্রায়নিষ্ঠ; দাতা অথচ দ্বিতব্যয়ী; স্নেহশীল অথচ কর্তব্য কপ্পে স্থিরসঙ্কল্প। পিতা মাতা বর্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিত্য ভক্ত এবং প্রিয়-কারী ছিলেন; ভাৰ্য্যার প্রতি নিত্য অমুরক্ত ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী; ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান; অমুগতের প্রতিপালক; শত্রুর

প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ, কার্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্তে বায়স। একরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ;—নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশ; অমুগত ভৃত্য; প্রজাগণের সম্মুখানে ভক্তি; সূর্য্য-মুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত—অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখনও এত হুঃখী হইতেন না।

হুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। বাহার বাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুক্কলোচনে দেখিবার পূর্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই, কেননা, কখনও কিছুই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সংবরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এইজন্যই তিনি চিত্তসংঘমে আবৃত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ হৃৎখণ্ডের মূল; পূর্ব্বেগামী হৃৎখণ্ড ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।”

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী।

বিলাতের কথা

(৩)

খাত্মখাত্ম

বিলাতের লোকে কি খায়, আর সে দেশে কি কি খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, অনেক এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এ দেশের সাহেবেরা বা খান, বিলাতি ইংরেজেরা তাহাই খাইয়া থাকেন। আমাদের

খাত্মখাত্মের সঙ্গে একটা ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে সেরূপ কোনও খাত্মখাত্ম বিচার নাই। সুতরাং মানুষের ভক্ষ্য বা কিছু বিলাতে পাওয়া যায়, সাহেবেরা সে সবই স্বচ্ছন্দে “সাবাড়” করিয়া থাকেন। আর

আমরা, আমাদের সংকীর্ণ সংস্কারবশতঃ যে সকল বস্তুকে মানুষের খাদ্য বলিয়া কল্পনাও করিতে পারি না, এমনও কোনও কোনও দ্রব্য ইংরেজ অতি আগ্রহ সহকারে খাইয়া থাকেন, এ কথাটাও অস্বীকার করিতে পারি না। সে কথা পরে বলিব।

মাছ-মাংস

যুরোপীয়ের প্রধান খাদ্য মাংস—এ কথাটা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের যেমন ভাত, ইংরেজ প্রভৃতি যুরোপীয় জাতির লোকের সেইরূপ মাংসই প্রধান খাদ্য। ইহাই তাহাদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। আর মাংসের মধ্যে গোমাংসই প্রধান। তবে মেঘের মাংসও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ছাগমাংসের সন্ধান সে দেশে কখনও পাই নাই। মৃগমাংস কখনও কখনও বাজারে উঠে। এ ছাড়া হাঁস, পায়রা, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পাখী এবং কেজেট, বালিহাঁস, পারটীজ্ প্রভৃতি বনচর পাখীও সর্বদাই মিলে। পাখীর মাংসের দাম বেশী। আর আমাদের পক্ষে বিলাতী পাখীর মাংস খাওয়া সময়ে সময়ে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠে।

ইহার কারণ এই যে, নিত্যন্ত পল্লীগ্রামে না গেলে, সে দেশে টাটকা পাখীর মাংস পাওয়া যায় না। পাখীগুলোকে মারিয়া, ছাল ছাড়াইয়া, নাড়ীভূঁড়ি বাহির করিয়া, প্রথমে কিছুদিন শুদামজাৎ করিয়া রাখা হয়, এরূপ শুনিরাছি। তার পর যখন এগুলি সহরে আসে, তখনও মাংসবিক্রেতার দোকানের জানালায় কত দিন যে কুলিয়া থাকে, তাও ঠিক করা সর্বদা সহজ হয় না।

শীত প্রধান দেশে কোনও বস্তুই সহজে পচিয়া উঠে না। সুতরাং এগুলো অনেকদিন এই ভাবে থাকিলেও, একেবারে অখাদ্য হইয়া যায় না। কিন্তু কেমন একটা ভেপ্‌ষো গন্ধ জন্মিয়া থাকে অনেক মসলাতেও এই গন্ধটাকে ঢাকা কঠিন হইয়া পড়ে। এইজন্য অন্ততঃ আমাদের বর্ষের রসনার বিলাতী পাখীর মাংস সহজে যোচে না।

কিন্তু কেবল পাখীর মাংস কেন, বিলাতে প্রায় কোনও মাংসই টাটকা পাওয়া যায় না। তবে পাখীর মাংসে যে গন্ধটা পাইয়াছি, অল্প মাংসে সে গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু মাংস সবই সেখানে বাসি। ইংরেজ যতই কেন আপেক্ষার স্বাধীনতার স্পর্ধা করুন না, ফলতঃ তাঁর মত এমন পরমুখাপেক্ষী লোক জগতে অতি বিরল। প্রতিদিনের আহারের জন্য ইংরেজকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যে মাংস না হইলে ইংরেজের দিন চলে না, সে মাংস জর্ম্মানী, ফরাসীস, হল্যান্ড, মার্কিন প্রভৃতি স্থান হইতে বিলাতে আমদানী হয়। বিলাতে গো-মেবাদি যে একেবারে নাই, তাহা নয়। কিন্তু স্বদেশী গরু, শূকর, মেঘ প্রভৃতি পশুর দাম সেখানে বিদেশী পশুর দাম অপেক্ষা বেশী। সুতরাং গরিব লোকের তো কথাই নাই, অনেক মধ্যবিত্ত লোকেও দিশি গো-শূকরাদির মাংস সর্বদা খাইতে পান না। দেশের অধিকাংশ লোকেই আমদানী মাংস খাইয়া জীবনধারণ করেন। আর আমদানী মাংসের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া হইতে যে মাংস যায়, তাহাই লোকে বেশী পছন্দ করেন। বিশেষজ্ঞ না হইলে সকল সময়ে বিলাতী গো-মেবাদির

মাংসের তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ার আমদানী মাংসের পার্থক্য বোঝা কঠিন হইয়া পড়ে।

বিলাতি মাছ।

বিলাতে নানা প্রকারের মাছও পাওয়া যায়। তবে এগুলির অধিকাংশই সমুদ্রে জন্মায়। মিঠা জলের মাছও আছে বটে, কিন্তু সে মাছের সঙ্গে আমাদের দেশের মিঠা জলের মাছের কোনই সাদৃশ্য নাই। আমাদের রুই কাতলা, কই মাগুর, শোল বোয়াল, এ সকল মাছের মত কোনও মাছই বিলাতে পাওয়া যায় না। বিলাতের মিঠা জলের মাছের মধ্যে শ্রামনই প্রধান। আমাদের দেশে এমন কোনও মাছ নাই, যার তুলনায় শ্রামনের কোনও জ্ঞান বাঙালী পাঠককে দিতে পারি। শ্রামনের ছোট ছোট ঝাঁস আছে, এ ঝাঁস কতকটা আমাদের কুচ্চিবাটার ঝাঁসের মত, আকারও সেইরূপ, রংও তাহারই মতন। কুচ্চিবাটা গুলো যদি আর একটু লম্বা ধরণের হইত, ও তার মাথাটা যদি কতকটা ইলিশ মাছের মাথার মতন হইত, তবে হয় ত হঠাৎ একটা মাঝারি রকমের আস্ত শ্রামন দেখিয়া কুচ্চিবাটা বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। কিন্তু আমরা যাকে কুচ্চিবাটা বলিয়া জানি, তাহা দেখিয়া শ্রামনের রূপ মনে আনিতে হইলে, অনেকটা কষ্টকল্পনা করিতে হয়। শ্রামনের বাহিরের রূপের সঙ্গে আমাদের দেশের কোনও মাছের যেমন সাদৃশ্য নাই, তার ভিতরকার রংএর সঙ্গেও সেইরূপ আমাদের কোনও মাছের মিল আছে বলিয়া জানি না। শ্রামনের ভিতরের রং লাল। ইংরেজি ভাষায় এইজন্ত এক জাতীয় লাল রংকে শ্রামন্ পিঙ্ক

(Salmon Pink) বলে। বিলাতে এই মাছের আদর বড় বেশী। তার দামও তার জন্য খুবই বেশী। এ মাছ সর্বদা মিলে না। বোধ হয় মে হইতে জুলাই কি আগষ্ট পর্য্যন্তই এ মাছটা পাওয়া যায়। ইংরেজ বড়লোকেরা এই শ্রামন্ পিঙ্ক করিয়া কাঁচা শশার সঙ্গে খাইতে বড়ই ভালবাসেন। শ্রামনের দাম অত্যন্ত মাছের চাইতে ঢের বেশী। এক পাউণ্ড বা আধ সের শ্রামনের জন্ত দেড় হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়।

বিলাতের মৎস্যসমাজে আভিজাত্য-মর্যাদার বোধ হয় শ্রামনের পরেই টার্বটের (Turbot) স্থান হইয়া থাকে। সুস্বাদুতা হিসাবে টার্বট শ্রামনের চাইতে শ্রেষ্ঠ বই নিকৃষ্ট নয়। অন্ততঃ আমাদের রুচিতে টার্বট শ্রামনের চাইতে বেশী উপাদেয় বলিয়াই লাগে। আমার মনে হয় যে, টার্বট আমাদের শিল্পিক জাতীয় মাছ। চলিতঃ কথায় এই শিল্পিককে শিলৈন বা শিলোন বলে। টার্বট শ্রামনের অপেক্ষা অনেক বড় হয়। টার্বটের দামও প্রায় শ্রামনেরই মত ; তবে শ্রামন্ সারা বছর মিলে না, টার্বট প্রায় সর্বদাই পাওয়া যায়। টার্বটের পরেই বিলাতী মাছের মধ্যে হালিবটের স্থান। টার্বটের ছায় হালিবটও খুব বড় হয়। হালিবট দেখিতে কতকটা আমাদের চিতল মাছের মত। কিন্তু চিতলের ঝাঁস আছে, হালিবটের ঝাঁস নাই। আর চিতলের মত হালিবটের এমন ঘন ছোট ছোট কাঁটাও নাই। টার্বট ও হালিবট দুই খুব তেলাল মাছ। সাধারণতঃ এ সকল নানাভাবে

কেবল সিদ্ধ করিয়াই থান। আমাদের মত কাঁচা লব্ধা ও শর্ষে দিয়া এ সকলের “তেল কোল” করিলে, অতিশয় উপাদেয় হইয়া থাকে। আমন, টাবট, হালিবট, এ সকল মহার্ঘ মাছ। গরিব লোকেরা, এমন কি মধ্যবিত্ত লোকেরাও এ মাছ প্রায়ই খাইতে পান না। বিশেষতঃ বিলাতে মাছটা প্রায়ই একটা সৌধিন খাত্তের মধ্যে পরিগণিত হয়। লাক্ষ বা ডিনারেই এ সকল ভাল মাছ ব্যবহৃত হয়। গরিব লোকেরা এ সকল আহারে মাছ ব্যবহার করেন না। তাঁরা বা’ কিছু মাছ খান, সে কেবল প্রান্তরাশের বা ব্রেকফাস্টের সময়। আর সে সময়ে কেহই এ সকল ভাল মাছ খান না। গরিব ও মধ্যবিত্ত লোকের কড্ (Cod) মাছটাই সচরাচর খাইয়া থাকেন। এই কড্ মাছ সমুদ্রে জন্মে। ইহারই বহুৎ হইতে কডলিভার অয়েল (Cod-liver Oil) প্রস্তুত হয়। কডলিভার অয়েলের গন্ধ মনে করিয়া, হঠাৎ অনেকেই কড্ মাছটাকেও একরূপ অখাদ্য বলিয়াই ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু মাছের তেলে যে গন্ধ পাওয়া যায়, টাট্কা মাছে কোথাও সে গন্ধ তো থাকে না। আমাদের এমন স্মৃতি যে ইলিশ মাছ, তার তেলের গন্ধ কি ত্রকারজনক আমরা তো জানি। কিন্তু তাই বলিয়া ইলিশ মাছ তো আর মন্দ নয়। সেইরূপ কড্ মাছের বহুতের তেলের দুর্গন্ধ দিয়া মাছ বেচারীর বিচার করিলে চলিবে কেন? ফলতঃ কড্ মাছটা বেশ মিষ্টি। টাবট বা হালিবটের মত অমন তেলাল নয় বটে; কিন্তু কতকটা আমাদের ভেটকি মাছের মত স্নগ্ধ। কড্ মাছ আকারে ভেটকির মতন

নয়, বরং কতকটা আমাদের কই মাছেরই মতন। কিন্তু তার ভিতরটা ভেটকিরই মত। ভেটকি মাছ রান্না করিলে যেমন পরতে পরতে আলাদা হইয়া যায়, কড্ মাছও সেইরূপ হয়। কডের দামও খুব বেশী নয়। এক পাউণ্ডের দাম সাড়ে চার আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কখনও কখনও আট আনা পর্য্যন্তও হয়। মধ্যবিত্ত ইংরেজেরা এই কড্ মাছটাই বেশী খাইয়া থাকেন। মাংসের যেমন কাটলেট হয়, এই কড্ মাছেরও সেইরূপ কাটলেট রান্না হইয়া থাকে। কডেরই মত আর এক জাতীয় মাছ পাওয়া যায়, তাহাকে ইংরেজেরা হেক (Hake) বলেন। এ মাছও সমুদ্রে জন্মায়। এ মাছটা কডের চাইতে নরম। এ মাছের দামও প্রায় কডেরই মতন। আমাদের আইড্ মাছের মত বিলাতে এক জাতীয় মাছ পাওয়া যায়, ইংরেজিতে তাহাকে হ্যাডক্ (Hadock) বলে। আইড্ মাছে যেমন আঁস থাকে না, হ্যাডকেও সেইরূপ আঁস নাই, তবে আইড্ মাছ যতটা বড় হয় হ্যাডক্ তত বড় হয় না। কড্, হেক, হ্যাডক্ এ সকল মাছই সাধারণ লোকে বেশী খাইয়া থাকেন। পুরী প্রভৃতি স্থানে এক প্রকারের পায়রা চাঁদা মিলে, এ দেশের ইংরেজি বুলিতে এগুলিকে পমফ্রেড্ (Pomfred) বলে। পমফ্রেড্ কথটা বিলাতে শুনি নাই। এই পায়রা চাঁদা মাছকে ইংরেজিতে আমরা বোধ হয় প্লেইস্ (Plaice) বলে। এই মাছটা ইংরেজের খুব প্রিয়। এই জাতীয় আর এক শ্রেণীর চাঁদা মাছ আছে,

ইংরেজেরা তাহাকে . সোল (Sole) বলেন। প্লেইস্টোগ্লো কাল; সোলগ্লো সাদা; দু'এর মধ্যে বেশ কম এই। নতুবা কুটাই পায়রা চাঁদা জাতীয়। এই দুই জাতীয় মাছ বড় মিষ্টি। সাহেবেরা প্রায়ই মাঝ-খানের কাঁটাটা ফেলিয়া দিয়া, এ মাছের পোনের ভাজা খাইয়া থাকেন। এইরূপ কাঁটা-ছাড়ান মাছকে ইংরেজিতে ফিলেটেড (Filletted) বলে। ফিলেটেড প্লেইস ও সোল ভাজা সকল খাবার যায়গায়ই প্রায় পাওয়া যায়। দামও বড় বেশী নয়। সচরাচর একটা প্লেইসের দাম বার আনা কি এক টাকা। সোলের দাম আর একটু বেশী। সোল সাদা আর প্লেইস কাল—তারই জন্ত দামের এই বেশ কম হয় কি না, জানি না। ইংরেজের সর্বপক্ষপাতিত্বের কথা মনে করিয়া একুপ সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব হউক বা না হউক, অসম্ভব নহে। তবে সোল প্লেইস খেতেও যে একটু বেশী ভাল, এ কথাও অস্বীকার করিতে পারি না।

আমাদের ইলিশ মাছের মত কোনও মাছ বিলাতে কখনও দেখি নাই। আমেরিকায় এক প্রকারের ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। নিউইয়র্কে সে মাছ খাইয়াছি। মার্কিনীয়েরা তাহাকে শ্যাড্ (Shad) বলেন। বিলাতে ইলিশ মাছ না মিলিলেও, স্বাদে না হউক, অন্ততঃ কাঁটার বাহুল্যে ও আকারাস্থে যে ঢকার-উঠে, তাহার গন্ধে, ইলিশ মাছকে মনে করাইয়া দেয়, এমন একটা মাছ আছে। ইংরেজিতে ইহাকে হেরিং বলে। হেরিং-গুলো দেখতে কতকটা আমাদের বাটা মাছেরই মতন, তবে বাটা মাছের চাইতে

কতকটা বড় হয়। হেরিং খাইতে বড় মিষ্টি। কিন্তু অত্যন্ত বেশী কাঁটা আছে বলিয়া ছুরি কাঁটা দিয়া এ মাছটা খাওয়া কেবল যে সহজ নয়, তাহা নহে, একেবারে নিরাপদও হয় ত নয়। তাই বলিয়া নিতান্ত গরিব লোক ছাড়া আর কেউ প্রায় এ মাছটা খান না। ইহার দামও সস্তা। সচরাচর এক আনার একটা বেশ বড় হেরিং পাওয়া যায়। কখনও আধ আনারও পাওয়া যায়। আমাদের দেশের চুন মাছের মতন কোনও মাছ বিলাতে দেখি নাই। কেবল হুয়াইট্ বেইট (White bait) নামে এক জাতীয় ছোট মাছ আছে, যাহাকে চুন পুটার শ্রেণীভুক্ত করা নিতান্ত অসম্ভব হইবে না। এ মাছটা কতকটা আমাদের মউরলা (পূর্ববঙ্গে ইহাকে মকা বলে) মাছেরই মতন। সাহেবি সমাজে এ মাছটা একটা সৌখীন খাত্তের মধ্যে পরিগণিত হয়। ভাস্কর তেলে, অর্থাৎ শুকরবসাতে,—ভাজিয়া, একটু লেবুর রস, নুন ও লঙ্কার গুঁড়ো মিশাইয়া, ব্রাউন্ ব্রেড বা চুকের রুটি দিয়া, ইংরেজেরা এ মাছটা খাইয়া থাকেন। হুয়াইট্ বেইটের নামে হুয়াইটিং-এর কথা মনে পড়িল। হুয়াইটিং (Whiting) কতকটা আমাদের বে'লে মাছের মত। আকারে ও স্বাদে উভয় দিক্ দিয়াই বে'লে মাছের সঙ্গে এর কতকটা সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু জলচরের মধ্যে ইংরেজেরা কেবল মাছটাই যে খাইয়া থাকেন, তাহা মনে করিবেন না। সমুদ্রের জীবন্ত ঝিল্লুক ইংরেজের অতি প্রিয় খাদ্য। ইংরেজিতে এগুলিকে ওয়েষ্টার (Oyster) বলে। সকল যুরোপীয়েরাই এই জীৱন্তর অত্যন্ত ভুক্ত। জীবন্ত

বিভিন্ন গুলোকে খোলা ভাঙ্গিয়া, সেই খোলার উপরেই প্লেটে সাজাইয়া দেওয়া হয়। আর কি ছোট কি বড়, সকলেই এই নড়ন্ত জীবের উপরে একটু হুন ও এক ফোঁটা লেবুর রস ফেলিয়া তাহাকে সশরীরে উদরস্থ করিয়া থাকেন। এগুলিকে চিবাঁইয়া কি গিলিয়া কি চুষিয়া খাইতে হয়,—এ সম্বন্ধে সভ্যতার রীতিটা যে কি, তাহা আমি এখনও জানি নাই। গলদা চিংড়ী এবং কাঁকড়াও বিলাতে প্রচুর পাওয়া যায়। কুচো চিংড়ীও মিলে। কুচো চিংড়ীকে ইংরেজীতে শ্রিম্পস্(Shrimps) বলে। গলদা চিংড়ী ও কাঁকড়া সমুদ্রেই ধরা হয়। আর ধরা মাত্রই, গুলিয়াছি, ফুটন্ত জলে ফেলিয়া এগুলিকে মারিয়া ফেলা হয়। তার পর এই সিদ্ধ মাছই বাজারে

বিক্রী হইয়া থাকে। কুচো চিংড়ীগুলোকে শুকাইয়া বাজারে পাঠান হয়। গলদা চিংড়ী ও কাঁকড়ার দামও খুব বেশী। দেড় টাকার কমে একটা মাঝারি রকমের চিংড়ী পাওয়া যায় না। কাঁকড়ারও দাম প্রায় চিংড়ীর মতন। স্যালাড (Salad) বলিয়া নানাবিধ কাঁচা শাক সব্জি ও তরিতরকারির যে এক অপূর্ব মিশ্রণ যুরোপীয়েরা ভক্ষণ করিয়া থাকেন, চিংড়ী মাছটা তারই সঙ্গে বেশী ব্যবহৃত হয়। ইতালীয় বা ফরাসী প্রণালীতে এই চিংড়ীর স্যালাড বা সল্লাদ প্রস্তুত হইলে তাহা অতিশয় উপাদেয় হয়;—স্বাদেশিকতার খাতিরে এ সত্য কথাটা অস্বীকার করিতে পারি না।

বিলাত ফেরত।

বঙ্গসাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ

বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতালোকে ও শিক্ষাফলে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, সকল বিষয়ই ক্রমবিবর্তনশীল এবং এই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ববিষয়ে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশমান। কিন্তু এই ক্রমবিবর্তন সমর-সাপেক্ষ। সেদিন বের্গার্সন (Bergson) সাধারণ লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের সম্বন্ধ স্থাপন কেবল পণিতশাস্ত্রানুমোদিত বাঁধা নিয়মে হয় না; যখন প্রত্যেক মনন নানা ভঙ্গিমায় কালের বাহ্য জগতের স্তরে স্তরে প্রবেশ লাভ করে, তখনই বাহিরের সহিত অন্তরের সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি সকলেরই বিশেষ

আছে; তাহার বিশেষ বিশেষ ভাবে অন্তর-বাহিরের সম্বন্ধ স্থাপন করে। নানান দেশের নানান ভাষা যেমন সেই সেই দেশ-কালোপযোগী, তেমনি নানান সুর ও নানান ভঙ্গী সাহিত্যে কালবিশেষে বিশেষভাবে উপযোগী। ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় যে সুর যে ভঙ্গী ঠিক সমরোপযোগী হইয়াছিল, এখন সমাজ ও চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, তৎসমুদায় দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্তিত হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর সামাজিক অবস্থা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেই, কলাবিজ্ঞানের সম্যক রসবোধ উপভোগ-ক্ষমতা কেমনভাবে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতেছে,

তাহা বেশ বুঝা যায়। আজকালকার ইউরোপীয় সমালোচকগণ দেখাইতেছেন, জন্মকাল যেমন হঠাৎ দৃষ্টিলাভ করিয়া সকল বস্তুই ঠিক দৃষ্টিমানের মত দেখিতে পায় না, সেইরূপ যাহারা অসত্য বা অর্ধসত্য তাহার উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদনে স্বভাবতঃই বঞ্চিত। সভ্যজগতের ইতিহাসে সাহিত্যের আদর বা অনাদর কেমন সাময়িক মনোবৃত্তিবিকাশের উপর নির্ভর করে, তাহা লেগুই (Legouis) তাঁহার ফরাসী কাব্যগ্রন্থ বিশ্লেষণে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজেরা তাঁহাদের সমসাময়িক ফরাসী কবিতা কিরূপ ভাবে বুঝিতেন, তাহা ডিকুইস্লির প্রবন্ধপাঠে জানা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ সেই ফরাসী কবিতাকে আবার অল্প চক্ষে দেখিতেছেন। ডিকুইস্লির কাছে মধ্যযুগের ফরাসী কবিতা কবিতা-নামেরই যোগ্য নহে, মাথু আর্গন্ড কিন্তু সেই কবিতাকে অল্প চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং আজকাল ইংরাজের কাছে ফরাসী কবিতার সমাদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—কেবল এই যে, মনোবৃত্তি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসবোধশক্তি-উপভোগক্ষমতাও বাড়িতেছে। আমাদের দেশে এখনও ইউরোপীয়দের মত সাহিত্য চিহ্ন সন্মত্তের যথার্থ রসবোধশক্তি বড় একটা দেখা যায় না ; তাহার প্রমাণ এই যে, বাহ্য প্রকৃত সাহিত্য-নামের উপযুক্ত, তাহাই সমালোচকগণ প্রায়ই অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। সমালোচকেরা বেশীর ভাগই, প্রকৃত সমালোচনা কি, তাহা বুঝেন না।

লেখক অন্তর-বাহিরের চিরন্তন সত্য ভাব-মৌল্য্য কিরূপে প্রকটিত করিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, সমালোচক যদি নিরপেক্ষভাবে তাহাই দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তবেই তিনি যথার্থ এই পদের উপযুক্ত ; নতুবা এটা ভাল এটা মন্দ—এই বলিলেই সমালোচনা হয় না। সাহিত্য কলাবিদ্যার একটি অঙ্গ মাত্র, কলাবিদ্যার প্রভাববিস্তার যে কারণে হয়, সাহিত্যেরও ঠিক সেই কারণেই হইয়া থাকে। পেটার (Pater) তাঁহার রচনাতে দেখাইয়াছেন, মধ্যযুগের ‘পুনর্জন্ম’র সহিত সাহিত্য ও কলাবিদ্যার আভ্যন্তরীণ যোগ না থাকিলে দুইয়ের কেহই সার্থকনাম হইত না। আজ আর সোদিন নাই যে, সমালোচক সমালোচনা করেন বলিয়াই তাঁহার মত শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। এমন এক সময় ছিল বটে, যখন অল্পপযুক্ত সমালোচকদিগের হাতে লেখকদিগকে বড়ই বিড়ম্বিত হইতে হইত। এখন গ্রাথিনিয়মের (Athenaeum) মত সমালোচককেও সাবধানে কথা বলিতে হয় ; কেননা, সমালোচককে দেখাইতে হইবে যে, তিনি উপযুক্ত পাত্র, তাঁহার কথা কহিবার যথেষ্ট অধিকার আছে।

অক্ষম সমালোচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ গত মাসের ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুবীজ-নাথ ঠাকুর রচিত ‘প্রসঙ্গ’র যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমালোচকের মতে ‘প্রসঙ্গ’ প্রকাশে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ কিছুই লাভ হয় নাই। পক্ষান্তরে আলোচ্য গ্রন্থখানি যদি কেহ

আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তাহা হইলে, তিনি গ্রন্থকারের গভীর জ্ঞান, ভাষা ও ভাবের অপূর্ণ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু সমালোচক এ ক্ষেত্রে অনধিকারচর্চা করিয়াছেন বলিয়াই ‘প্রসঙ্গ’র রসগ্রহণে তিনি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছেন।

আজকালকার অনেক মাসিক পত্রিকাতেই এইরূপ অনধিকারচর্চা দেখিতে পাওয়া যায়। ‘বঙ্গদর্শন’ের বেজাঘাত বন্ধ হইবার পর হইতেই বিপরীত সমালোচনার সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে। প্রকৃত সদৃশ্যের প্রতি অনাদর ও কটুক্তি এবং অনেক কদর্য্য গ্রন্থেরও ভূয়সী প্রশংসাই অক্ষম সমালোচক

মহাশয়গণের নিত্য অপকর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রবাসীতে ‘প্রসঙ্গ’র সমালোচকও দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

যাহা স্মরণ এবং সত্য, যাহা মানবের চিরন্তন সম্পত্তি, যাহার অধ্যয়নে আমাদের অন্তঃকরণ নিঃশূলতর আনন্দে উদ্ভূত হইয়া উঠে, এইরূপ প্রসঙ্গই আলোচ্য গ্রন্থে সরল সংযত ভাষায়, সুধীশ্রবাবুর মধুর লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বারাস্তরে সুধীশ্রবাবুর রচনাসৌন্দর্য্য সৰ্ব্বদা কয়েকটি কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমতীশচন্দ্র বাগচি,

বি, এ (ক্যাটাৰ), এল, এল, ডি (ডাব্লিন)

চরিত-চিত্র ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

ও

ব্রাহ্মসমাজ

আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সাধনা ব্রাহ্মসমাজের নিকটে অশেষপ্রকারে ঋণী। আমরা এ ঋণ অস্বীকার করিলেও, ইতিহাস কখনও তাহা ভুলিয়া থাকিবে না।

আমরা আজ যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া জানি, দেশের লোকে তাহা এপর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই; কখনও যে করিবে, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু এই ধর্মের হাওয়াটা দেশের সকল সম্প্রদায়ের উপরেই স্বরবিস্তর

পড়িয়াছে এবং ইহার সাধারণ ভাবগুলি যে অনেকেই অজ্ঞাতসারে আত্মপাৎ করিয়াছেন ও করিতেছেন, এ কথাই কি অস্বীকার করা সম্ভব? ব্রাহ্মসমাজ এ পর্য্যন্ত যে তৎ-সিদ্ধান্তের উপরে আপনার ধর্মবিবাসকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত দেশের ধর্মচিন্তায় এখনও কোনও স্থান পায় নাই; কখনও যে পাইবে, তারও কোনও সম্ভাবনা নাই। এ দেশে এবং অষ্ট

দেশে এক সময়ে বারী এই যুক্তিবাদী দিকান্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ক্রমে সে দিকান্তের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি দেখিয়া, তাহাকে বর্জন করিতেছেন। কিন্তু এই দিকান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজ যে যুক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাহার প্রভাবে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসাধন যে বহুল পরিমাণে যুক্তিপ্রতিষ্ঠ ও অর্থসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও সত্য। ব্রাহ্মসমাজ যে আদর্শ ও যে ভাবে আমাদের প্রাচীন সমাজের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন, দেশের লোকে সর্বতোভাবে তাহা অঙ্গীকার করা হুরে থাকুক, বরং প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে প্রত্যাখ্যানই করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সমাজ-সংস্কারচেষ্টার পরোক্ষ প্রভাবেই যে আজ ভারতের, বিশেষতঃ বাংলা দেশের, হিন্দুসমাজ নানা দিকে উদার ও উন্নতিমুখী হইয়া উঠিতেছে, ইহাই বা অঙ্গীকার করা যায় কি ?

আর ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বর্তমান সমাজবিবর্তনে একটা শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়াই, আপাততঃ একরূপ নিষ্ফলতা লাভ করিয়াও ফলতঃ দেশের ধর্মকর্মের উপরে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম যতই কেন বিদেশীয় ভাবাপন্ন হউক না, ইহা যে ভারতবর্ষের বিশাল হিন্দুসমাজের উপরে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই, কিন্তু তাহার বর্তমান সামাজিক বিবর্তনের ধারাটিকে আশ্রয় করিয়া ভিতর হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা মানিতেই হইবে।

সমাজ-বিবর্তনের ক্রম

এই সামাজিক বিবর্তনের গতিটা সোজা নয়, কিন্তু বাঁকা। সে বাঁকাও একটু অদ্ভুত রকমের। ইংরেজিতে ইহাকে স্পাইর্যাল (spiral) বলে। আমাদের ভাষায় ইহার কোনও প্রতিশব্দ আছে বলিয়া মনে পড়ে না। কোনও সোজা খুঁটির গায়ে গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত, খানিকটা করিয়া ব্যবধান রাখিয়া, যদি একখানা কাপড় বা একটা রজ্জু জড়াইয়া বেওয়া হয়, তবে এই কাপড়ের বা রজ্জুর গতি যেরূপ হইবে, সমাজ-বিবর্তনের গতিও সেইরূপ। এইরূপ বক্রগতিকেই ইংরেজিতে স্পাইর্যাল-গতি বলে। এ গতি একটানা কেবল উপরের দিকে চলে না। একটু উপরে উঠিয়া আবার একটু নীচে নামিয়া আইসে। কিন্তু এইরূপে নিম্নাভিমুখী হইয়াও, আগে যতটা নীচে ছিল, কদাপি ততটা নীচে আর যায় না। বরং নীচে নামিতে যাইয়াও সর্বদাই আগে যতটা উচ্চে ছিল, প্রত্যেক স্থানেই তার চাইতে উপরে থাকে। আর এরই জগৎ মোটের উপরে এই গতি সর্বদাই উর্দ্ধমুখী হইয়া পরিণামে চরম উন্নতি লাভ করে। সমাজবিবর্তনের ধারাও ঠিক এইরূপ।

সমাজ এই বক্রগতিতে চলিয়া, এক একবার নামিয়া আসিয়া আবার উপরে উঠিতে তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়া যায়। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা ইহার প্রথম অবস্থাকে ইংরেজিতে homogeneity বা নির্বিশেষ-একাকারত্বের অবস্থা বলেন। দ্বিতীয় অবস্থাকে differentiation এর বা বিশিষ্ট বহুত্বের ও পার্থক্যের অবস্থা বলেন।

তৃতীয় অবস্থাকে integration এর বা মিলনের, সামঞ্জস্যের, একত্বের অবস্থা বলিয়া থাকেন। এই কথা তিনটি জীবজগতের বিবর্তনের ইতিহাস হইতেই মূলে গৃহীত হইয়াছে। সামাজিক বিবর্তনে এই অবস্থাকল্পির অন্তরূপ নাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষা ব্যবহার করিলে, বিবর্তনের প্রথম পাদ বা প্রথম অবস্থাকে তামসিক, মধ্যমপাদ বা মধ্যের অবস্থাকে রাজসিক এবং শেষের পাদকে বা অবস্থাকে সাত্বিক বলাই সম্ভব হইবে। আমাদের পৌরাণিক কহিনীর সৃষ্টিপ্রকরণে এই বিবর্তন-ক্রমটাই ব্যক্ত হইয়াছে।

সৃষ্টির আদি অবস্থা নির্কিংশেব-একাকারত্বেরই অবস্থা। ইংরেজিতে ইহাকে স্বচ্ছন্দেই homogeneityর অবস্থা বলা যাইতে পারে। আমাদের পৌরাণিকী কহিনী নিখিল বিশ্বের বীজরূপী, অপকীকৃত-পঞ্চমহাভূতাত্মক অণুমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন-শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অণু-বস্তুর লক্ষণ নির্কিংশেব ও একাকারত্ব। কারণাক্ষিমধ্যে, এই অপকীকৃত পঞ্চমহাভূতাত্মক অণুর ভিতরে, সৃষ্টির পূর্বে, হিরণ্যগর্ভ বা মহাবিশ্ব যোগনিদ্রাভিত্ত হইয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শন এই তত্ত্বকেই অব্যক্ত বা প্রকৃতি বলিয়াছেন। এই তত্ত্বে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে। ত্রিগুণের এই সাম্যাবস্থাই বিশ্ববিবর্তনে, সৃষ্টিপ্রকরণে, homogeneityর অবস্থা। এই সাম্য ভাঙ্গিয়া মাত্রাই মহাবিশ্বের যোগনিদ্রাও ভাঙ্গিয়া যায় এবং নির্কিংশেব-একাকারত্ব হইতে ক্রমে, রজঃপ্রাধান্যহেতু, স বিশেষ ও

বহু-আকারসম্পন্ন বিশাল ও বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহাই differentiation এর বা ভেদ-প্রতিষ্ঠার অবস্থা। ভেদ-মাত্রেই বিরোধাত্মক, আর বিরোধমাত্রেই উপায়পর্যায়ভুক্ত; তাহার নিজস্ব কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাই। বিরোধ আপনাকে বিনাশ করিয়াই আপনার সার্থকতা লাভ করে। সুতরাং এই বিরোধের বা differentiation এর অবস্থা কদাপি স্থায়ী হইতে পারে না। ভেদের ভিতর দিয়া অভেদের প্রতিষ্ঠা হইলেই তবে সে ভেদ আপনার সার্থকতা লাভ করে। এইজন্য differentiation এর পরে integration হইবেই হইবে। এই integration একত্বের, অভেদের, কিম্বা অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক মহান্ একের প্রতিষ্ঠা করে; এবং এই একত্বে বা integrationএ বিবর্তন-প্রণালী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। Homogeneity, differentiation, integration—বিবর্তনক্রিয়ার এই তিন পাদের প্রথম পাদে তমোগুণের, দ্বিতীয় পাদে রজোগুণের, তৃতীয় পাদে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইয়া থাকে।

এই ত্রিপাদকে আশ্রয় করিয়াই জনসমাজ নিয়ত বিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের এই ত্রিপাদচক্র যে সমাজ-জীবনের আদি হইতে শেষ পর্যন্ত, কেবল একরূপ মাত্র ঘুরিয়া আইসে, তাহা নয়। সমাজবিবর্তনের গতি কখনও কোথাও ঠাঁয়িয়া যায় না। সমাজ নিয়তই বিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং এই ত্রিপাদচক্রও নিয়ত ঘুরিতেছে। তমঃ রজঃ স্বত্ব এই তিনগুণ, প্রত্যেক সমাজের জীবনে, একের পর অন্য, বারবার প্রবল

হইয়া, এই ত্রিপাদ চক্রের গতিবেগ রক্ষা করিতেছে। যুগে যুগে একবার করিয়া এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া এই ত্রিপাদচক্র ঘুরিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক যুগের আদিতে সমাজ ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পূর্বতন যুগের শ্রেষ্ঠতম নাস্তিকতা, কাগবশে, শাস্ত্রে ও সংস্কারে, আচারে ও অনুষ্ঠানে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে গতানুগতিকতা প্রাপ্ত হয়। সমাজের ধর্মকর্ম সকলই তখন প্রতিষ্ঠানবদ্ধ হইয়া প্রাণহীন ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। সমাজ তখন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, জড়গতিমাত্র লাভ করে। এই জড়ত্ব—তমেরই ধর্ম। এ অবস্থা তামসিক homogeneityরই অবস্থা। ক্রমে তখন জীবন সমাজমধ্যে রঞ্জোপগুণ জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই রজঃপ্রাবল্য নিবন্ধন অসাড় সমাজদেহে ভেদবিরোধের সৃষ্টি হইয়া, নূতন শক্তির সঞ্চার হয়। ইহাই রাজসিক differentiationএর অবস্থা। সর্বশেষে সবুগুণ প্রবল হইয়া এই ভেদবিরোধের উপশম ও “শান্তি হইতে আরম্ভ করে। সমাজ তখন অভিনব সামঞ্জস্যের ও সঙ্গতির সাহায্যে পূর্বতন যুগের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও অবস্থাকে ছাড়িয়া আরো উপরে উঠিয়া যায়। এইরূপে বক্রভাবে, স্পাইর্যাল (spiral) গতিতে সমাজ ক্রমে উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হয়।

আধুনিক ভারতের সামাজিক বিবর্তনে
ব্রাহ্মসমাজের স্থান

বর্তমান যুগের প্রারম্ভে, সমগ্র ভারত-সমাজ অগাধ অবসাদে নিমগ্ন ছিল। ধর্ম-প্রাণহীন, অনুষ্ঠান অর্থহীন, প্রকৃতিপুঞ্জ জ্ঞান-

হীন, সমাজ আত্মচেতনহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোরতর তামসিকতা শ্রেষ্ঠতম নাস্তিকতার ভাণ করিয়া, ভৌতিকে শম, নিকরীয়াতাকে দম, নিজালমস্তসমুত্ত নিশ্চেষ্টতাকে নির্ভর বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছিল। ভারত-সমাজের এই ঘোরতর তামসিকতাচ্ছন্ন অবস্থায় ইংরেজের শাসন, খৃষ্টীয়ানের ধর্ম, যুরোপের সাধনা এক অভিনব আদর্শের প্রেরণা লইয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নূতন শক্তি-সংঘর্ষে এই তামসিকতা অল্পে অল্পে নষ্ট হইয়া অভিনব রাজসিকতা জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই বিচিত্র যুগসন্ধিকালে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। যুরোপীয় সাধনার এই প্রবল রাজসিকতাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম ও কর্মে, সর্ববিষয়ে স্বদেশী সমাজ যে ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিবাদী ধর্মের প্রবল আঘাতে তাহাকে ভাঙিতে আরম্ভ করিয়া, আধুনিক ভারতের বিবর্তনগতিকে homogeneity বা thesisএর অবস্থা হইতে differentiation বা antithesisএর অবস্থায় লইয়া যান। আর তিন জন প্রতিভাশালী পুরুষকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ আধুনিক ভারতবর্ষের ধর্ম ও কর্মকে ঘোরতর তামসিকতা হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার মধ্যে অভিনব রাজসিকতার সঞ্চার করিয়াছেন। প্রথম—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; দ্বিতীয়—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন; তৃতীয়—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

রাজর্ষি রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

রাজা রামমোহন রায়কেই লোকে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করে সত্য;

কিন্তু তিনি যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, আর ব্রাহ্মসমাজে তাঁর পরবর্তী নেতৃবর্গ যেভাবে ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রাজা একান্ত-ভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জন করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদকে প্রামাণ্যমর্যাদাদ্রষ্ট করিয়া শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরেই ঐকান্তিকভাবে সত্যাসত্য ও ধর্ম্মার্থ-মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। রাজা ধর্ম্ম-সাধনে যে গুরুত্বও একটা বিশেষ স্থান আছে, ইহা কখনও অস্বীকার করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যেমন শাস্ত্র সেইরূপ গুরুত্বও বর্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ আত্মশক্তি ও অপ্ৰত্যক্ষ ব্রহ্মকৃপার উপরেই সাধনে যথাযোগ্য সিদ্ধি-লাভের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা কি তত্ত্বাঙ্গে, কি সাধনাসঙ্গে, ধর্ম্মের কোনও অঙ্গেই, স্বদেশের সনাতন সাধনার সঙ্গে আপনার ধর্ম্মসংস্কারের প্রাণগত যোগ নষ্ট করেন নাই। মহর্ষি একপ্রকারের স্বাদেশিকতার একান্ত অনুরাগী হইয়াও, প্রকৃতপক্ষে এই যোগ রক্ষা করেন নাই এবং করিতে চেষ্টাও করেন নাই। রাজা বেদান্তের উপরেই আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশশতাব্দীর যুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলেন। রাজা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। মহর্ষি তাঁহার আপনার আত্মপ্রত্যয়-বা-স্বাত্ম-ভূতি-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা বৈদান্তিক হইলেও তাঁর পূর্বতন কোনও বৈদান্তিক সিদ্ধান্তকেই

একান্তভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রাবলম্বনে যে সকল যুক্তি প্রমাণাদিকে আশ্রয় করিয়া, পূর্বতন ঋষি ও মনোবিগণ আপন আপন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন, রাজা রামমোহন সেই প্রাচীন ঋষি-পন্থার অনুসরণ করিয়াই, আধুনিক সময়ের উপযোগী এক সমীচীন বেদান্তসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে স্বদেশের ধর্ম্মের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়, অথচ পুরাতনের উপরেই, পুরাতনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া, পুরাতনের শিক্ষা ও সাধনাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াই—দেশ-কালের উপযোগী নূতন সিদ্ধান্তেরও প্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষিও পুরাতনকে কতকটা রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কেবল তাঁর অভিজ্ঞাত প্রকৃতির বলবতী রক্ষণশীলতার অনুরোধে। তিনি যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার সঙ্গে তাঁর এই চেষ্টার কোনই অপরিহার্য্য সম্বন্ধ ছিল না। মহর্ষির ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থে কেবল উপনিষদের উপদেশই উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এ সকল উদ্ধৃত উপদেশের প্রামাণ্যমর্যাদা প্রতি-প্রতিষ্ঠিত নহে, মহর্ষির আপনার স্বাত্মভূতি-প্রতিষ্ঠিত মাত্র। উপনিষদের যে সকল শ্রুতি মহর্ষির নিকটে সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, তিনি সেগুলিকেই বাছিয়া বাছিয়া আপনার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ করেন;—ঋষিরা কি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন বা জানিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধ তিনি করেন নাই। কোনও শ্রুতির বা উত্তরার্ক, কোনওটির বা অপরার্ক, যার যতটুকু তাঁর নিজের মনোমত পাইয়াছেন, তাহাই কাটিয়া ছাঁটিয়া আপনার ব্রাহ্মধর্ম্ম-

গ্রন্থে গাঁধীয়া দিরাছেন। অতএব মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে বিস্তর শ্রুতি উদ্ধৃত হইলেও, এ গ্রন্থ তাঁর নিজের। ইহার মতামত তাঁর, প্রাচীন ঋষিদিগের নহে। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার না করিয়া কেবল বাংলা ভাষায় এ সকল মতামত লিপিবদ্ধ করিলেও, তার যত-টুকু মর্যাদা থাকিত, উপনিষদের বুকুনী দেওয়াতে ইহা তদপেক্ষা বেশী মর্যাদা লাভ করে নাই। যুরোপীয় যুক্তিবাদিগণের অত-তম উপদেষ্টা মনকিওর ডি কনুওয়ের (Moncure D. Conway) সংকলিত শাস্ত্র-সংগ্রহের বা Sacred Anthologyর যে পরিমাণ ও যে জাতীয় শাস্ত্র প্রামাণ্য ও শাস্ত্রমর্যাদা থাকা সম্ভব, মহর্ষির সংকলিত ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের সে পরিমাণও সেই জাতীয় শাস্ত্র প্রামাণ্য এবং শাস্ত্রমর্যাদাই আছে বা থাকিতে পারে। তার বেশী নাই।

কিন্তু রাজা রামমোহন যে সমীচীন মীমাংসার সাহায্যে স্বদেশের পুরাতন সাধনার উপরেই নূতন যুগের নূতন সাধনাকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, সে মীমাংসা-প্রতিষ্ঠার অমূল্য কাল তখনও উপস্থিত হয় নাই। লোকের মন তখনও তাহা গ্রহণ করিবার জ্ঞান প্রস্তুত হয় নাই। ফলতঃ যে বিবেক জাগ্রত হইলে লোকের মনে পুরাতন ও প্রচলিতের প্রাণহীনতার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, এদেশে তখনও সে বিবেক জাগে নাই। শাস্ত্র, সন্দেহ, বিচার, সমন্বয়, সঙ্গতি—ইহাই মীমাংসার ক্রম। যতক্ষণ না শাস্ত্রে সন্দেহ জন্মে, ততক্ষণ বিচারের অবসর ও মীমাংসার প্রয়োজনই উপস্থিত হয় না। রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভা প্রাচীন ও প্রচলিতের

অসারতা ও ভ্রান্তি দেখিয়া তাহার প্রতি সন্দেহান হইয়াছিল। তাই সেই সন্দেহ হইতে বিচার, সেই বিচারের ফলে তিনি নূতন মীমাংসায় উপনীত হন। কিন্তু দেশের লোকের মনে তখনও এরূপ গভীর সন্দেহের উদয় হয় নাই; তাঁহাদের বিবেকও জাগে নাই। প্রাচীনকে লইয়াই তাঁরা তখনও সন্তুষ্ট ছিলেন। শাস্ত্র ও স্বাভিমতের মধ্যে তখনও কোনও প্রবল বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই। দেশের লোকে শাস্ত্র কি, তাহা জানিতেন না। জানিবার প্রয়োজন-বোধ পর্য্যন্ত তাঁহাদের জন্মায় নাই। সুতরাং রাজা যে মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তাহা বুঝিবার ও ধরিবার বাসনা এবং শক্তি হ'য়েরই তখন একান্ত অভাব ছিল।

রাজার সময়ে যে সন্দেহ জাগে নাই, মহর্ষির সময়ে তাহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাজার জীবদ্দশায় অষ্টাদশখৃষ্টশতাব্দীর যুরোপীয় যুক্তিবাদ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তকে অভিভূত করিতে আরম্ভ করে নাই। প্রাচীন ও প্রচলিতের প্রতি রাজার মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, তাহা মোহনদায়ী যুক্তিবাদেরই ফল, খৃষ্টীয় যুক্তিবাদের ফল নহে। করাসী বিপ্লবের চিন্তানায়কগণের সঙ্গে রাজার তখনও কোনই পরিচয় হয় নাই। পাটনার বাইয়া, পারসী ও আরবী গড়িয়া, মোহনদায়ী তত্ত্বের মোতা-জোলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদের শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়াই, রাজা সর্বপ্রথমে পৌরাসিক হিন্দুধর্মের তথাকথিত পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মহর্ষি যে এই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন,

তাহা ইংরেজি শিক্ষারই ফল। তাঁহার সময়ে যুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবেই, আমাদের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেশের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারাদি সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহের উদয় হইয়াছিল।

আর যে বিচার বা criticismকে অবলম্বন করিয়া দেশের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে এই সন্দেহের উৎপত্তি হয়, সেই বিচার বা criticismকে আশ্রয় করিয়াই মহর্ষির ধর্মমীমাংসার এবং তত্ত্ব-সিদ্ধান্তেরও প্রতিষ্ঠা হয়! এই বিচার বা criticismএর উপরেই অষ্টাদশ-ও-উনবিংশ-খৃষ্ট-শতাব্দীর যুরোপীয় যুক্তিবাদেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই যুক্তিবাদ আগমের বা আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। এই যুক্তিবাদের বিচার-পদ্ধতি প্রাকৃত বুদ্ধির আশ্রয়ে, লৌকিক জ্ঞানের বা formal logic এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই যুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে, আমাদের তদানীন্তন ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিচার বা criticismও শাস্ত্রাশ্রয় বর্জন এবং সঙ্গুকের শিক্ষা ও সাহায্যকে উপেক্ষা করিয়া, লৌকিক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণকেই অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। এই বিচার একান্তই প্রত্যক্ষবাদী। আর প্রত্যক্ষ বলিতে ইহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বুঝিয়া থাকে। এই যুক্তিবাদের বা Rationalismএর সঙ্গে জড়বাদের বা Materialismএর সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। এইজন্ত যুরোপে যখনই যেখানে যুক্তিবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তখনই সেখানে তার সঙ্গে সঙ্গে, এই জড়বাদ বা Materialismও প্রবল হইয়াছে। যুরোপীয়

যুক্তিবাদ ও জড়বাদ উভয়ই “নাশ্বদন্তীতিবাদী।” এই যুক্তিবাদের উপরে ধর্মবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, মানুষের প্রত্যক্ষ চক্ষু কর্ণাদির জ্ঞায়, অপ্রত্যক্ষ অথচ বুদ্ধিগম্য, একটা অতীন্দ্রিয় বৃত্তির অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর যুরোপীয় আন্তিক-মতাবলম্বী ধর্মসংস্কারকেরা তাহাই করিয়াছেন। তাঁরা মানুষের মধ্যে ধর্মবুদ্ধি বা religious sense বলিয়া একটা অতীন্দ্রিয় বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহারই উপরে ধর্মের প্রামাণ্যকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই ধর্মবুদ্ধি বা religious sense সভ্য অসভ্য সকল মানুষেরই মধ্যে আছে। ইহা সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক। সুতরাং কোনও বাহ্য কারণের বা অবস্থার ধোঁগাধোঁগে ইহার উৎপত্তি হয় না বলিয়া, এই ধর্মবুদ্ধিটা মত। আর ইহার একটা স্বতঃপ্রামাণ্যও আছে। এই ভাবেই যুরোপীয় যুক্তিবাদ ধর্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। মহর্ষিও ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করিতে যাইয়া কতকটা এই পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। যুরোপীয় যুক্তিবাদী আন্তিক-সম্প্রদায় যাহাকে ধর্মবুদ্ধি বা religious sense বলিয়াছেন, মহর্ষি আপনাদের ধর্মমীমাংসায় তাহাকেই আত্মপ্রত্যয় নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আত্মপ্রত্যয় বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্রোক্ত স্বানুভূতিরই নামান্তর মাত্র। বেদান্ত যাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলিয়াছেন, মহর্ষির আত্মপ্রত্যয় ঠিক সেই বস্তু নয়। অন্ততঃ তাঁহার প্রথম জীবনের ধর্মমীমাংসা যাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলিয়া ধরিয়াছিল, তাহা যে বেদান্তোক্ত আত্মপ্রত্যয়, এমন সিদ্ধান্ত

করা যায় না। আর শাস্ত্রগুরু বর্জন করিয়া গুরু যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলে এই তথাকথিত আত্মপ্রত্যয় বা স্বাত্মভূতিই সত্যের ও প্রামাণ্যের একমাত্র আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়। মহর্ষিও এই স্বাত্মভূতিকে অবলম্বন করিয়াই, ব্রাহ্মধর্মকে পুনরায় জাগাইয়া তুলেন।

এদেশে তখন একরূপভাবে লোকের স্বাত্মভূতিকে জাগাইয়া তোলা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। কেবল শাস্ত্রাবলম্বনে ধর্মসাধন করিবে না, শাস্ত্রযুক্তি মিলাইয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবে,—লোকে এই প্রাচীন ও সমীচীন উপদেশ তখন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রজ্ঞানও একরূপ গোপ পাইয়াছিল। তাহা না হইলে মহর্ষি যেভাবে চারিজন ব্রাহ্মণকে কানীতে বেদ পড়িবার জন্ত পাঠাইয়া, তাঁহাদের সাক্ষ্যে বেদের প্রামাণ্য-মর্যাদা নষ্ট করেন, তাহা আদৌ সম্ভব হইত না। ইহার কেবল ব্যাকরণের সাহায্যে বেদার্থ নির্ণয় করিতে গিয়াছিলেন, প্রাচীন মীমাংসার পথ অবলম্বন করেন নাই। রাজা এই মীমাংসার পথ ধরিয়া শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া, মহর্ষির তায় তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রাচীন ঋতিপ্রামাণ্য পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। প্রাকৃত জনে যে চক্ষে বেদকে দেখে, লোকসংগ্রহার্থে পণ্ডিতেরাও যে ভাবে বেদের অতিপ্রাকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন,—ভারতের প্রাচীন মীমাংসকগণ সেরূপ করেন নাই। রাজা এ সকল কথা জানিতেন। সুতরাং তাঁহাকে মহর্ষির ন্যায় শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জন করিতে হয় নাই। কিন্তু তখনও এ সকল প্রাচীন সিদ্ধান্তের পুনরুদ্ধারের ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় হয় নাই।

দেশের লোক তখনও এ সমীচীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী হয় নাই। সে সময়ে এ সকল সিদ্ধান্তের কথা বলিলেও, লোকে ভাল করিয়া তাহা বুঝিত না, অথচ না বুঝিয়াও তাহারই মধ্যে নিজেদের নিশ্চেষ্টতা ও তামসিকতার সমর্থন করিবার বৃত্ত্যভাস পাইয়া, সেই নির্জীব অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত। তখনকার প্রধান কর্ম ছিল, সত্য প্রতিষ্ঠা করা নয়, কিন্তু সংস্কার নাশ করা। সাধুমীমাংসা মাত্রই সমাগদর্শী। আর সমাগদর্শন নিয়াদিকারী লোকের পক্ষে কর্ম চেষ্টার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার একান্ত অন্তরায় হইয়া থাকে। যে ‘গৌ’এর ভিতর দিয়া রজোগুণ বর্ধিত হইয়া প্রবল তমোগুণকে অভিভূত করিয়া থাকে, অসময়ে সমাগদৃষ্টি লাভ করিলে সে ‘গৌ’ জন্মাইতে পারে না; সুতরাং তামসিকতাও নষ্ট হয় না। আধুনিক ভারতের নূতন সাধনার প্রয়োজনেই রাজার তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে যে সমাগদর্শনের পরিচয় পাই, মহর্ষির প্রথম জীবনের ধর্মমীমাংসায় সে সমাগদৃষ্টি ফুটিয়া উঠে নাই; উঠিলে তাঁহার দ্বারা বিধাতা যে কাজ করাইয়াছেন, তাহার গুরুতর ব্যাঘাত উৎপন্ন হইত।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র

রাজা রামমোহন প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াও, প্রকৃতপক্ষে একটা নূতন ধর্মের বা সাম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই “ব্রহ্মসভার” ভজন-সাধনকে একটা স্বতন্ত্র ধর্মরূপে গড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এই নূতন ধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও সাম্প্রদায়িক লক্ষণ যতটা পরিষ্কৃত

হয় নাই, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে তদপেক্ষা অনেক বেশী ফুটিয়া উঠে।

দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়া, কেবলমাত্র স্বাহুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই আপনার ধর্মসিদ্ধান্ত ও ধর্মসাধনের প্রতিষ্ঠা করেন বটে, কিন্তু এই স্বাহুভূতিপ্রতিষ্ঠিত ধর্মকেই তিনি উপনিষদের ঋতির আশ্রয়ে স্থাপন করিতে বাইরা, এক প্রকারের শাস্ত্র-প্রামাণ্যও প্রদান করেন। এইজন্ত তাঁর ব্রাহ্মধর্মবস্তুটা যে একান্তই অভিনব ও স্বরচিত, ইহার যে, কোনই প্রাচীন ভিত্তি বা প্রামাণ্যমর্যাদা নাই, লোকে ইহা সহজে ধরিতে পারে নাই। সে সময়ে দেশে শাস্ত্রজ্ঞান একরূপ লোপ পাইয়াছিল। সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও বেদবেদান্তাদির কোনওই ধার ধারিতেন না। সুতরাং আপনার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিসমূহ সিদ্ধান্তকে মহর্ষি যে অদ্ভুত ঋতিমর্যাদা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন, তাহার কৃত্রিমতা ও অশাস্ত্রীয়তা, দেশের লোকে একেবারেই বুঝিতে ও ধরিতে পারেন নাই। ফলতঃ প্রচলিত কর্মকাণ্ড পরিহার করিয়াই, দেবেন্দ্রনাথ সমাজচ্যুত হইয়া-ছিলেন; নতুবা তাঁর ব্রাহ্মধর্ম একান্তই অশাস্ত্রীয় ও অপ্রামাণ্য বলিয়া তাঁহার উপরে কোনওই নির্যাতন হয় নাই। বরঞ্চ তাঁর সিদ্ধান্ত ও সাধনকে উচ্চতর অধিকারের হিন্দুধর্ম বলিয়াই অনেকে মনে করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বাভিমানী যুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ব্রাহ্ম-ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁর সাধনা ও চরিত্রগুণে, তাঁর উপদিষ্ট ব্রাহ্ম-

ধর্মে এই ব্যক্তিস্বাভিমানী যুক্তিবাদের প্রভাব ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যেই একটা অতি প্রবল প্রভুস্বাভিমান বিদ্যমান ছিল। তিনি যে সমাজে, যে পরিবারে, যেক্রূপ বিভবগৌরবের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন ও যে মৌভাগ্যের অঙ্কে লালিত পালিত হ'ন, তাহাতে একরূপ প্রবল প্রভুস্বাভিমান যে তাঁর মধ্যে জন্মিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তার পর তিনি যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া, তার মুমূর্ষু দেহে নবজীবনের সঞ্চার করেন এবং এক দিকে আপনার সাধনের ও অগ্রদিকে আপনার অর্থের দ্বারা ঘেরুপে ইহাকে লোক-সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে এই ব্রাহ্মসমাজে যে তাঁর একটা একতন্ত্রপ্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও কিছুই আশ্চর্য্য নহে। আর এই কারণে মহর্ষি আদিব্রাহ্ম-সমাজে যে ধর্মের ও সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা যে একান্তই শাস্ত্রগুরুবর্জিত, এ ভাবটা বহুদিন পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই। প্রাচীন শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ আপনার সকলিত “ব্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থকেই প্রামাণ্য শাস্ত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন গুরু-আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম শিষ্যমণ্ডলী, তাঁহাকেই নূতন ধর্মের গুরুরূপে বরণ করেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রগুরুবর্জিত, গুরু স্বাহুভূতি-প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে বাহুতঃ ও লোকতঃ গুরু ও শাস্ত্র উভয়েরই প্রতিষ্ঠা হয়। আর এই জন্ত স্বদেশের ধর্মের সঙ্গে সাধন ও সংস্কারাদি বিষয়ে ইহার বিস্তর পার্থক্য দাঁড়াইলেও, ভাবগত কোনও প্রবল

বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই। কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ সর্বদা আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম-সাধনকে উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর হিন্দুধর্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। দেশের লোকেও তাহাদের এই দাবীর একান্ত প্রতিবাদ করেন নাই।

কিন্তু এইরূপে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ যে পথ ধরিয়া আপনাদের ধর্মসাধনে গুরু ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, সে পথে, এদেশে, কখনও এ বস্তু মিলে নাই। আমাদের সাধনায় শাস্ত্রগুরু-আহুগত্যের একটা নিগূঢ় সংকেত আছে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সে সংকেতটী লাভ করেন নাই। গুরু স্বয়ং গুরু-আহুগত্য স্বীকার ও শাস্ত্র আপনি পুণ্যতন শাস্ত্রে আবদ্ধ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদের গুরু ও শাস্ত্র কিম্বা গুরুপদে, দু'এর কেহই ধ্বংস-বৃত্ত ও স্বপ্রতিষ্ঠা নহেন। পূর্বতন গুরুপরম্পরা ও সনাতন শাস্ত্র-ধারার সঙ্গে ইহাদের একটা গভীর ও অঙ্গাঙ্গী যোগ সর্বদাই রক্ষিত হয়। মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজে এ যোগ থাকে নাই। আর এইরূপ স্বয়ং-রত গুরুর বা মনগড়া শাস্ত্রের মর্যাদা কদাপি কোথাও স্থানিতি লাভ করিতে পারে না। যেখানেই এরূপ গুরু-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই খানেই ক্রমে বিদ্রোহীদের উৎপত্তি হইয়া, সম্প্রদায়কে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। রোমক-খৃষ্টীয় সঙ্ঘের প্রামাণ্য একদিকে পুরাতন শাস্ত্রধারার ও অতীতকে পুরাণত গুরুপরম্পরার উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, সেখানে ধর্মমত লইয়া দলাদলির প্রকোপও

অত্যন্ত কম। প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টীয় সঙ্ঘ শাস্ত্র আছে, কিন্তু গুরুপরম্পরার ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রধারার সৃষ্টি হয় নাই; এখানে প্রত্যেকে আপনার বিচার ও বুদ্ধি, খুসি ও খেয়াল মত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অতীতকে, প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে গুরুপরম্পরারও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর এই দুই কারণে প্রোটেষ্ট্যান্ট সঙ্ঘ এই পাঁচশত বৎসরের মধ্যে অসংখ্য বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছে, আর প্রতিদিনই নূতন নূতন প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া, ইহাকে আরো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতেছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও, মূলতঃ এই একই কারণে, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই, পঞ্চাশৎ বৎসর যাইতে না যাইতে তিনটা দলের সৃষ্টি হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে পথ ধরিয়া প্রাচীন শাস্ত্রগুরু বর্জন করিয়া, আপনার ব্রাহ্মসমাজে নূতন গুরু ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, সে পথে এ বস্তু পাওয়া যায় না। তিনি আপনার বিচারবুদ্ধি বা তথাকথিত আত্ম-প্রত্যয়কে যতটা প্রামাণ্য-মর্যাদা প্রদান করিতে লাগিলেন, অপর ব্রাহ্মদিগের বিচার-বুদ্ধির প্রতি সেইরূপ মর্যাদা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। পারিলে, তাঁর নিজের গুরু-পদ-গৌরব ও তাঁর সঙ্কলিত 'ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের' শাস্ত্র প্রামাণ্য, তিনি দু'এর কিছুই দাবী করিতে পারিতেন না। কিন্তু মহর্ষি যে ব্যক্তি-ত্বাভিমাত্রী যুক্তিবাদের (Individualistic Rationalism) উপরে আপনার ব্রাহ্ম-ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তার অপরিহার্য পরিণামকে অকুতোভরে গ্রহণ করিতে

পারেন নাই বলিয়াই, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে তিনি আপনার অসঙ্গত একতন্ত্রপ্রভুত্ব রক্ষা করিতে যাইয়া আপনার শিষ্যগণের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিলেন। যে ব্যক্তিভাতিমানী সংজ্ঞান বা Conscienceকে আশ্রয় করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন ও পুরাগত শাস্ত্রগুরু বর্জন করিলেন, সেই ব্যক্তিভাতিমানী সংজ্ঞানের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্তই, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের যুবকদল, তাঁহার একতন্ত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন বিদ্রোহীদলের সৃষ্টি করেন। এ জগতে প্রত্যেক বস্তু তার অমুরূপ বস্তুকেই উৎপাদন করিয়া থাকে। স্বদেশের শাস্ত্রগুরু বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের দ্রোহিতা, আপনার কর্মবশেই, তাঁহার নিজের সমাজে, আপনার শিষ্যগণের ভিতরে, এই নূতন দ্রোহীদলের সৃষ্টি করিল। এই নূতন ব্রাহ্মসমাজ, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে, এমন পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল, যাহাতে স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ যে বিরোধ জাগাইয়াছিলেন, সেই বিরোধই আরো বেশী বিশদ ও তীব্র হইয়া উঠিল।

মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই যুরোপীয় যুক্তিবাদের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। উভয়েই প্রকৃতপক্ষে সারসংগ্রহবাদী ছিলেন। এই শ্রেণীর দার্শনিকদিগকে ইংরেজিতে Eclectic বলে। কিন্তু মহর্ষির যুক্তিবাদ যতটা সংযত ও সারসংগ্রহবাদ যে পরিমাণ স্বাদেশিক ছিল, কেশবচন্দ্রের যুক্তিবাদ ততটা সংযত ও তাঁর সারসংগ্রহবাদ বা Eclecticism সে পরিমাণ স্বাদেশিক

রহে নাই। মহর্ষি আপনার বিচারবুদ্ধিকে মতের একমাত্র ও অনন্ত প্রতিযোগী প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে স্বদেশের প্রাচীন শ্রুতি হইতে আপনার মনোমত সিদ্ধান্ত ও উপদেশাদি উদ্ধার করিয়া, তাহাকেই ব্রাহ্মধর্মের শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করেন। কেশবচন্দ্র এই পথে যাইয়াই, জগতের সমুদায় ধর্মসাহিত্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া, এই শ্লোকসংগ্রহকেই ব্রাহ্মধর্মের উদার ঐতিহাসিক ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। যুরোপীয় যুক্তিবাদের মধ্যে একটা উদার বিশ্বজনীন ভাব আছে। মহর্ষির ব্রাহ্মসিদ্ধান্তে বা ব্রহ্মসাধনে এই বিশ্বজনীনতা রক্ষিত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় ইহা খুবই ফুটিয়া উঠে। এইজন্ত যুক্তিবাদের নিক্রিতে ওজন করিলে, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মত, সিদ্ধান্ত, সাধনাদি, সকলই মহর্ষির মত, সিদ্ধান্ত ও সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়া উঠে। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষির একতন্ত্রপ্রভুত্বের প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। এইজন্য এই নূতন সমাজকে প্রথমে গণতন্ত্রতার আদর্শে গড়িয়া তুলিবার কতকটা চেষ্টাও হইয়াছিল। ইহার ফলে মহর্ষির সমাজে ব্রাহ্মসাধারণের ব্যক্তিভাতিমানী ‘সহজবুদ্ধি’র বা Intuitionএর যতটা প্রভাব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, প্রথম প্রথম তাহা তদপেক্ষা অনেক বেশি পরিষ্ফুট হইয়া উঠে। মহর্ষির উপদেশে ও সাধনে একটা হিন্দুভাব সর্বদাই জাগিয়া ছিল। এই কারণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

ব্রাহ্মগণমধ্যে একটা, বিনয়, একটা শ্রদ্ধা ও একটা সংযমের প্রভাবও সর্বদাই দৃষ্ট হইত। এই বিনয়, শ্রদ্ধা ও সংযম হিন্দুর প্রকৃতিগত বস্তু। কিন্তু প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টীয় সাধনা ব্যক্তিগত সংজ্ঞান বা Conscienceকে বাড়াইতে যাইয়া, ধর্মের এই প্রাণগত বস্তুগুলিকে অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনে এই খৃষ্টীয় ভাবের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও ব্যক্তিগত সংজ্ঞান বা Conscience এর ভাবটা নিরতিশয় প্রবল হইয়া, এই বিনয়, সংযম ও শ্রদ্ধা বস্তুকে এক প্রকার নষ্ট করিয়া ফেলে। এই ব্যক্তিত্বাভিমাত্রী সংজ্ঞানের প্রাধান্য আধুনিক যুরোপীয় যুক্তিবাদী ধর্মসকলের প্রাধান লক্ষণ। এই লক্ষণাক্রান্ত হইয়া, আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে যুক্তিবাদী ধর্মের স্বরূপটী যতটা ফুটিয়া উঠে, মহর্ষির অধীনে, তাঁর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে, ততটা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রের শিষ্যগণ জীবনের সকল বিভাগে, তত্ত্বসিদ্ধান্তে, ধর্মসাধনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, সর্বত্র, এই ব্যক্তিত্বাভিমাত্রী সংজ্ঞানের অনন্তপ্রতিযোগী প্রাধান্য প্রতিফলিত করিতে যাইয়া, আধুনিক ভারত-সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মমীমাংসায় ও ধর্মসাধনে যে রাজসিক ভাব জাগাইয়াছিলেন, তাহাকে আরো প্রবল করিয়া তুলিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আমাদের বর্তমান সামাজিক বিবর্তনে যে anti-thesis এর প্রতিষ্ঠা করেন, কেশবচন্দ্র তাহাকেই আরো বিশদ ও তীব্র করিয়া তুলিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে স্থান ছিল; তার পরে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র যে স্থান অধিকার করেন; তৎপরবর্তী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সেই স্থানই প্রাপ্ত হ'ন। ইঁহারা তিন জনেই, একের পর অল্পে, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম ও কর্মকে এবং ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া দেশের ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের চিন্তা ও ভাবকে স্বর বিস্তার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের অলৌকিক বাগ্মি প্রতিভা-গুণে তাঁহার প্রথম জীবনের উদার শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়াই, ব্রাহ্মসমাজের এ ভাব দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। আধুনিক ভারতবর্ষের জ্ঞান ও কর্মের বিকাশ সাধনে কেশবচন্দ্র যে পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথ বা শিবনাথ ইঁহাদের কেহই সে পরিমাণে সাহায্য করেন নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে যেমন মহর্ষির এবং কেশবচন্দ্রের, সেইরূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শিবনাথ শাস্ত্রী কিছুতেই মহর্ষির সাধননিষ্ঠা এবং কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভার দাবী করিতে পারেন না, সত্য। কিন্তু অন্য দিকে যে সকল বাহিরের অবস্থার ও ঘটনার গুণ্ডযোগাযোগ ব্যতীত কি মহর্ষি কি কেশবচন্দ্র ইঁহাদের কেহই ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া স্বদেশের বৃহত্তর কর্মজীবনে ও ধর্মজীবনে কখনই কোনও প্রভাব এবং প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না, শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনে সে সকল যোগাযোগও ঘটে নাই।

দেবেজনাথ প্রিন্স্‌ দ্বারকানাথের পুত্র। পিতৃবিয়োগের পরে কিছুকাল দেবেজনাথ অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যের ভিতরে পড়িয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার সংযম ও সততাগুণে কালক্রমে পৈতৃক জমিদারী ঋণমুক্ত হইলে তিনি পুনরায় কলিকাতার ধনসমাজের অগ্রণীদলভূক্ত হইয়া উঠেন এবং তখন হইতে তাঁহার অর্থেই ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হইতে আরম্ভ করে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র মুখপত্র ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন মত ও আদর্শ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হয়। বাংলা সাহিত্যের এবং আধুনিক বাঙালী সমাজের সাধনার ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী অক্ষয়কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। এই তত্ত্ববোধিনী মহর্ষির অর্থেই স্থাপিত ও পরিপুষ্ট হয়। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকগণ, ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ও কর্মচারিগণ সকলেই তখন মহর্ষির অর্থানুকূল্যে ব্রাহ্মসমাজের বেতনভোগী বা বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন। আর এই ধনবল না থাকিলে, শুদ্ধ আপনার চরিত্রের বা সাধনার বলে সে সময়ে মহর্ষি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে এতটা বাড়াইয়া তুলিতে পারিতেন না। আর ব্রাহ্মসমাজে কালক্রমে মহর্ষির যে একতন্ত্রপ্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁহার অর্থবলই ইহারও একটা প্রধান কারণ ছিল সন্দেহ নাই।

কেশবচন্দ্র মহর্ষির মত ধনী ছিলেন না বটে; কিন্তু রামকমল সেনের পৌত্র বলিয়া কলিকাতা-সমাজে তাঁহারও একটা বিশেষ

আভিজাত্যমর্যাদা ছিল। ফলতঃ সামাজিক হিসাবে, কলুটোলার সেনেরা, বৈষ্ণব হইয়াও, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। অত্ৰ দিকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে না করিতেই, কেশবচন্দ্রের দৈবীশক্তিশালিনী বাগ্মীপ্রতিভা দেশের উর্দ্ধতন ইংরাজ রাজপুরুষদিগের শুভদৃষ্টি লাভ করে। এখন যেমন, সেকালেও সেইরূপই, ইংরেজ রাজপুরুষগণ যাহাদিগকে বাড়াইয়া তুলিতেন, স্বদেশী সমাজেও আপনা হইতেই, তাঁহাদের প্রভাব বাড়িয়া যাইত। এই সকল বাহ্য ষোগাযোগ ব্যতীত কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভাও এত সহজে ও এত অল্পকাল মধ্যে দেশের শিক্ষিত সমাজে এমন অনন্ত-প্রতিবন্দী প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিত না।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কেবল যে মহর্ষির সাধননিষ্ঠা বা কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভাই নাই তাহা নহে। যে সকল বাহ্যঘটনা ও অবস্থার যোগাযোগের সাহায্যে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র আপনাদিগের কর্মজীবনকে গড়িয়া তুলেন, শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাগ্যে সেইরূপ কোনো যোগাযোগও ঘটে নাই। শিবনাথ দরিদ্রের সন্তান। একরূপ পরাণে প্রতিপালিত হইয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করেন। মহর্ষির ধন, কেশবচন্দ্রের বংশমর্যাদা—এ সকলের কিছুই তাঁর ছিল না। ‘আর এ সকল ছিল’ না বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজের বিকাশ সাধনে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র যে কাজটি করিতে পারেন নাই, শিবনাথ শাস্ত্রী তাহা করিয়াছেন।

ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজের শাসন, আধুনিক

সাধনার প্রেরণা,—এ সকলে মনিয়া আমাদের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে যে অভিনব অনধীনতা বা Independence এর ভাব জাগাইয়া তুলে, তাহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আর ব্রাহ্মসমাজের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস হই এক বস্তু। এই অভিনব অনধীনতার আদর্শ ব্রাহ্মসমাজকে যতটা অধিকার করে, দেশের অপর কোন সম্প্রদায়কে ততটা অধিকার করতে পারে নাই। অপর আংশিকভাবে এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। কেবল ব্রাহ্মসমাজই ইহাকেই সম্পূর্ণভাবে জীবনের সকল বিভাগে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছে। আর ব্রাহ্মসমাজও যে প্রথমাবধিই এই আদর্শকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিল, এমনও নহে। মহর্ষি ইহাকে যতটা অবলম্বন করেন, কেশবচন্দ্র তদপেক্ষা বেশী করিয়াছিলেন। আর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এই অনধীনতার আদর্শ যতটা ফুটিয়া উঠে, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে তদপেক্ষা অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অনধীনতা-মন্ত্রের সাধক এবং এই অনধীনতা-ধর্মের—বা ‘Religion of Freedom’ এর পুরোহিতরূপেই, ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া, এ দেশের আধুনিক ধর্মজীবনে ও কর্মজীবনে, প্রথমে মহর্ষির, তার পরে কেশবচন্দ্রের এবং সর্বশেষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর শিক্ষার ও চরিত্রের যাহা কিছু প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধানতঃ তত্ত্বমীমাংসায় ও ধর্মসাধনেই এই অনধীনতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে

কেশবচন্দ্র ইহাকে আরও একটু বিস্তৃততর ক্ষেত্রে,—পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রাণে এই অনধীনতা-প্রবৃত্তি ক্রমে যতটা বলবতী ও বহুমুখী হইয়া উঠে, কেশবচন্দ্র বেশিদিন তাহার সঙ্গে আপনাদের আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং তাহারই জন্ত দেশের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে তাঁহার পূর্ব-প্রভাব ক্রমশঃ নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। একরূপ অবস্থায়ই বস্তুতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয় এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই অনধীনতার আদর্শের সাধক ও প্রচারকরূপে নূতন সমাজের নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হ’ন।

মহর্ষির প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতাই তাঁহাকে সর্কাস্ত্রকরণে এই নূতন অনধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিতে দেয় নাই। মহর্ষির এই রক্ষণশীলতার অন্তর্গলে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, একটা সমাজানুগত্যের ভাব বিদ্যমান ছিল। আপনাদের তত্ত্বসন্ধান্তে মহর্ষি কতকটা যুরোপীয় আদর্শের যুক্তিবাদী ছিলেন, হয় ত এমনও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ সামাজিক ব্যাপারে মহর্ষি সর্বদাই স্বদেশের সমাজের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগ রাখিয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্ত মহর্ষি অনেক সময় মর্যাদা হানির ভয়েই অনেক অযৌক্তিক সমাজবিধানও মানিয়া চলিতেন। মহর্ষির এই রক্ষণশীলতা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার আভিজাত্যের আর কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার প্রকৃতিগত স্বদেশিকতার ফল ছিল।

কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতার মূলে হিন্দুর সমাজানুগত্য নহে, কিন্তু খৃষ্টীয় Non-

conformist Conscience-এর নৈতিক প্রভাবই বিজ্ঞমান ছিল। এই Non-conformist Conscience একটা অদ্ভুত বস্তু। আপনার ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের প্রতিষ্ঠায় ইহা সর্বদাই অত্যাচার হইয়া উঠে। কিন্তু অপরের ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই বস্তুই অত্যন্ত সক্ষীর্ণ ও অনুদার হইয়া পড়ে। ইহা ধর্মের ও সত্যের দোহাই দিয়া একদিকে আপনাকে অপরের আনুগত্য হইতে মুক্ত করিতে চাহে। অতীতকালে আপনার মতামতকে অপরের উপরে চাপাইয়া তাহাদের মুক্তিবিধানের জন্তই তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে হরণও করে। এই জন্ত এই Non-conformist Conscience যুগপৎ উদার ও রক্ষণশীল হয়। কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতা এই ধাতেরই ছিল। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই অষ্টাদশ-ও-উনবিংশ-খৃষ্ট শতাব্দীর যুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে ধর্ম-সংস্কারকার্যে ব্রতী হন। কিন্তু মহর্ষির ভিতরকার ভাব ও আদর্শ সর্বদাই হিন্দু ছিল। কেশবচন্দ্রের ভিতরকার ভাব, বিশেষতঃ প্রথমজীবনে, বহুল পরিমাণে পিউরিট্যান খৃষ্টীয়ান (Puritan Christian) আদর্শের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল। ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকেও তিনি এইভাবেই গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে এক সময়ে মহর্ষির হিন্দুভাবাপন্ন কিংবা কেশবচন্দ্রের পিউরিট্যানভাবাপন্ন রক্ষণশীলতা একে-বারেই ছিল না বলিলেও চলে। খৃষ্টীয় জগতে পিউরিট্যানগণ সংসারের সর্ববিধ সম্বন্ধে একটা তীব্র পবিত্রতার আদর্শের

অনুসরণ করেন। কেশবচন্দ্রও যৌবনাবধি এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। আমাদের প্রাচীন ধর্মে ও সাধনায় যাহাকে শুদ্ধতা বলে, এই খৃষ্টীয়ানী পবিত্রতা ঠিক সে বস্তু নয়। আমাদের দেহশুদ্ধি বা ভূত-শুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির কথা আধুনিক খৃষ্টীয় সাধনায় পাওয়া যায় না। কেশবচন্দ্র যে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত বাস্তব ছিলেন, তাহা ইংরেজি পিউরিটি, সংস্কৃত শুদ্ধতা নহে। এই পিউরিটি রক্ষা করিবার আত্মস্তিক আগ্রহ হইতেই কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতার উৎপত্তি হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনে ও চরিত্রে অতি কঠোর সংযমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে মহর্ষির স্বাভাবিক সমাজানুগত্য কিংবা কেশবচন্দ্রের পিউরিটি-প্রবণতা কখনই ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়ের মধ্যেই একটা অতি প্রবল প্রকৃতিগত আন্তিক্য-বুদ্ধি ছিল। আর নিজেদের প্রকৃতির এই আভ্যন্তরীণ ধর্ম-প্রবণতার বা বিশ্বাস-প্রবণতার গুণেই যুরোপীয় যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়াও ইহারা সংশয়বাদী হইয়া উঠেন নাই। ইহাদিগের অটল ঈশ্বর-বিশ্বাস আপন আপন প্রকৃতির অন্তঃস্থল হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যুক্তি-তর্কের দ্বারা স্থাপিত হয় নাই। ফলতঃ এই প্রকৃতিগত ঈশ্বর-বিশ্বাসকেই মহর্ষি আশ্রয় প্রত্যয় বলিয়াছেন। আপনার ধর্মসিদ্ধান্তে কেশবচন্দ্র এই প্রকৃতিগত 'আন্তিক্য-বুদ্ধিকেই অষ্টাদশ-ও-উনবিংশ-খৃষ্ট-শতাব্দীর খৃষ্টীয়ান দর্শনের পরিভাষায় ইনটুইশন (intuition) নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মহর্ষির আশ্র-

প্রত্যয়ই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের ধর্ম-সিদ্ধান্তের ইন্টুইসন। আর এ হ'ই মূলতঃ ও বস্তুতঃ তাঁহাদের নিষেদের প্রকৃতিগত ব্যবসায়াত্মিক। আন্তিক্য-বুদ্ধির নামান্তর মাত্র। এই প্রকৃতিগত আন্তিক্য-বুদ্ধি ছিল বলিয়াই মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র আত্ম-প্রত্যয় বা ইন্টুইসনরূপ চঞ্চল ভিত্তির উপরেও আপনাদিগের এমন অটল ধর্ম-বিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু সংশয়-প্রবণ যুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে যে সকল লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়েন, তাঁহাদের অনেকেই এই পূর্ব-জন্মার্জিত সাধনসম্পদ ছিল না। বিজয়কৃষ্ণ এবং অঘোরনাথ প্রভৃতি ছই চারিজন ধর্মপ্রাণ সাধুপুরুষ ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং উপাসকগণের মধ্যে প্রায় কাহারই প্রকৃতির ভিতরে মহর্ষির বা কেশবচন্দ্রের জ্ঞান কোনও বলবতী আন্তিক্য-বুদ্ধি ছিল না। সুতরাং ইহার অতর্ক-প্রতিষ্ঠ পরমতত্ত্বকে লৌকিক তর্কযুক্তির উপরেই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হন। ইহাদের প্রায় সকলেই কেশবচন্দ্রের বাগ্মীপ্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সকল যুক্তিবাদী ব্রাহ্মগণের মধ্যে কেহ কেহ কেশবচন্দ্রের অলোকসামাগ্র মনিষীত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকেই একমাত্র প্রত্যক্ষ গুরুরূপে বরণ করিয়া একান্তভাবে তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করেন। অতি-সংশয়বাদ সর্বত্রই এই ভাবে অনেক সময় অতি-বিশ্বাসে বাইয়া পড়ে। এই অতি-সংশয়বাদেরই ইংরেজি নাম Scepticism

এবং ইংরেজিতে যাহাকে Credulity বলে বাংলায় তাহাকেই অতি-বিশ্বাস বলা যাইতে পারে। কোনও প্রকারের অতীন্দ্রিয় ও অপ্রত্যক্ষতত্ত্ব যাহারা কোন মতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, তাঁহারা Sceptic বা অতি-সংশয়বাদী। আর এই অতি-সংশয়বাদের তাড়নাত্তেই এই সকল লোকে অনেক সময় এমন সকল বিষয়েও আগ্রহ-তিশ্য সহকারে বিশ্বাস স্থাপন করেন, যাহা কখনও কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না ও হইতে পারে না। মানবপ্রকৃতির অদ্ভুত জটিলতা নিবন্ধন অনেক সময় এইরূপে অতি-সংশয়বাদ বা Scepticism হইতেই অতি-বিশ্বাসের বা credulityর উৎপত্তি হয়। কেশবচন্দ্রের অনুচরগণের মধ্যে মূলে যাহারা অতি-সংশয়বাদী ছিলেন তাঁহাদেরই একদল কেশবচন্দ্রের দৈবী প্রতিভার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া অতি-বিশ্বাসভরে তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ রূপে বরণ করেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক আনুগত্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার মত ও উপদেশানুসারে আপনাদিগের ধর্ম-জীবন ও কর্ম-জীবনকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। আর একদল লোক এই এই অতি-বিশ্বাসকে বর্জন এবং কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষত্বের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া, আপনাদিগের স্বাভূতিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ তর্ক-যুক্তির সাহায্যে পরমতত্ত্বকে ও ধর্ম-সাধনাকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হন। এইরূপে ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পর হইতেই তাহার ভিতরে দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাব ও আদর্শ ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

প্রথমে মহর্ষি এবং তারপরে কেশবচন্দ্রও আপনাদের প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজকে যে পথে পরিচালিত করেন, তাহাতে এরূপ বিরোধ একরূপ অনিবার্য হইয়া উঠে। মহর্ষির সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজ অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর যুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই গড়িয়া উঠে। আর বস্তুতঃ সেই জন্তই কেশবচন্দ্রকে শেষজীবনে “নববিধানের” প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। কারণ এই যুক্তিবাদ বা Rationalism, প্রাকৃত বুদ্ধির প্রেরণায়, লৌকিক ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া যে পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে, তাহাকে স্বচ্ছন্দে ইংরাজিতে Deism বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে Theism বলা যায় কি না সন্দেহ। Deism আর Theism এ পার্থক্য এই যে, একেতে ঈশ্বরতত্ত্বকে বিশ্ব-শক্তি বা বিশ্ববিধানরূপে এবং অপরে শক্তিমান পরমপুরুষ বা বিশ্ববিধাতা ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। শিবনাথ বাবুর কথায়, Deism এর ঈশ্বর শক্তি, Theism এর ঈশ্বর ব্যক্তি। আর প্রকৃতপক্ষে যুরোপীয় যুক্তিবাদ ঈশ্বরকে শক্তিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করে, ব্যক্তি বা বিধাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। মহর্ষির ঈশ্বর কেবল শক্তি মাত্র ছিলেন না, সত্য। কিন্তু মহর্ষির ঈশ্বরানুভূতি প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্রহ্মতত্ত্বের উপরে গড়িয়া উঠে নাই। ইহা তাঁর ভাবাঙ্গ-সাধনেরই ফল। এই ভাবাঙ্গসাধনে মহর্ষি হাফেজ প্রভৃতি মোহম্মদীয় ভক্তগণেরই পছন্দ অবলম্বন করিয়াছিলেন, লৌকিক ভ্রাম্য-ও-যুরোপীয়-যুক্তিবাদ-প্রতিষ্ঠিত মাগুলী ব্রাহ্মধর্মের পছন্দ অনুসরণ করেন নাই। এই

গভীর ভাবাঙ্গসাধনেরশৃঙ্খলাই মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম Deism হয় নাই, কিন্তু অতি উচ্চদরের Theismরূপেই তাঁর জীবনে ও চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরও শক্তিমাত্র ছিলেন না। কারণ কেশবচন্দ্রের প্রথর সংজ্ঞানের বা conscience এর প্রেরণায় প্রথম হইতেই তাঁর ঈশ্বরতত্ত্ব একটা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষি ভাবাঙ্গসাধনের ভিতর দিয়া, মোহম্মদীয় ভক্তগণের দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে, তাঁহার নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনে, তাঁর গভীর পাপ-বোধের বা Ethical Conscientiousness এর ভিতর দিয়া, খৃষ্টীয়ান সাধকগণের দৃষ্টান্তে, ও শিক্ষার আপনাদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজে ইহারা উভয়েই যে তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার উপরে Deism এরই প্রতিষ্ঠা হয়; Theism এর প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও মহর্ষির এবং কেশবচন্দ্রের নিজেদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্ব যে Theism হইয়া উঠে, ইহাদের প্রকৃতির ও সাধনার বিশেষত্বই ইহার প্রধান ও একমাত্র কারণ।

ফলতঃ শুদ্ধ যুক্তিবাদের উপরে কোনও প্রকারের গভীর ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মসাধনকে গড়িয়া তুলে যে অসম্ভব, মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই ইহা ক্রমে অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ইহারা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই যুক্তিবাদকে ধরিয়া থাকিতে পারেন নাই। ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া সাধক অনুকূল অবস্থাদীনে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন এবং ধর্মবস্তু প্রকৃতপক্ষে

মাহুষের প্রাকৃত-বিচার বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না, কিন্তু এই সকল ঈশ্বরানুপ্রাণিত সান্দ্র মহাজনের সাক্ষ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে,—মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র উভয়েই জীবনের শেষভাগে এই মত প্রচার করেন। কিন্তু যে ঈশ্বরানুপ্রাণনের উপরে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র দুজনেই পরে আপনাদিগের উপ-দিষ্ট ব্রাহ্মধর্মের প্রামাণ্যমর্যাদা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ধর্মসিদ্ধান্তের মূলগত যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিত্বাভিমান কিছুতেই সে ঈশ্বরানুপ্রাণনের মতকে সমর্থন করে না।

কনতঃ যে আধুনিক যুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরে ব্রাহ্মসাধারণের তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে কোনও প্রকারের অনন্ত-সাধারণত্বের বা অপ্রাকৃতত্বের দাবী কখনই গ্রাহ্য হয় না। এই যুক্তিবাদ ধর্মসাধনে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে; কিন্তু সঙ্গতরূপে প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারে না। সমাজগঠনে ও রাষ্ট্রীয়জীবনে এই যুক্তিবাদ কেবল গণতন্ত্রব্যবস্থাকেই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ও ধর্মসঙ্গত বলিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে; কিন্তু সমাজ-পতি বা রাজা বা রাষ্ট্রনায়কের আধিপত্য গ্রাহ্য করে না। ফরাসীবিপ্লবের সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার আদর্শ এই যুক্তিবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কেশবচন্দ্রের ধর্মসিদ্ধান্ত প্রথমে এই যুক্তিবাদকেই আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্য; কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও তাঁর ধর্মপ্রবণ বুদ্ধি প্রথমাবধিই এই সাম্য-মৈত্রীস্বাধীনতার আদর্শকে স্বল্প-বিস্তার ভীতির চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করে। এই সাম্য-মৈত্রীস্বাধীনতার নামে যুরোপের-ইতিহাসে যে পাণবলীলার অভিনয় হইয়াছে, তাহা

স্বরূপ করিয়া, বাহাতে এই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজে একান্ত প্রতিষ্ঠালাভ না করে, কেশবচন্দ্র সর্বদাই প্রাণপণে তার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অতীত হইতে না হইতেই যুরোপীয় মনোবিগণের মধ্যেও কেহ কেহ ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করেন। ফরাসীবিপ্লব যে সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছিল, তাহাতে সমাজে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জাগাইয়া তুলে, কিন্তু এ সকলের চিরন্তন বিরোধ নিষ্পত্তির কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। ফরাসী-বিপ্লব স্বাধীনতার নামে একটা ঐকান্তিক অনধীনতার ভাবকে জাগাইয়া জনসমাজকে বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন করিতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তার সমাজের ও সেই সমাজান্তর্গত অপরাপর ব্যক্তির যে নিগূঢ় অঙ্গান্বী যোগ রহিয়াছে, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া সমাজের ঘননিবিষ্টতা সাধনের কোনও পন্থার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। আধুনিক যুগে প্রাচীনকে ভাঙাই ফরাসীবিপ্লবের বিধিনির্দিষ্ট কর্ম ছিল, এই বিপ্লব সেই কর্মই সাধন করিয়া যায়; কিন্তু নবযুগের নব আদর্শের উপযোগী করিয়া জনসমাজকে নূতন প্রেমের ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে গড়িয়া তোলা তার কাজও ছিল না, সে কাজ ফরাসী-বিপ্লব করিতেও পারে নাই। ফরাসী-বিপ্লবের নিকটে আধুনিক সভ্যতা ও সাধনা যে অশোধনীয় গুণজালে আবদ্ধ, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াও, এইজন্ত ইতালীয় মনোবী মাজিনি (১৮৩৫) ফরাসীবিপ্লবের আধ-

নায়কগণের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার সিদ্ধান্তকে যথাযোগ্যভাবে সংশোধন করিয়া লইয়া, বিস্তৃততর আন্তিক্যবুদ্ধি-প্রতিষ্ঠিত হিউম্যানি-টার (Humanity) উপরে, আপনার স্বদেশচর্যা বা Nationalismকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই উন্নত আদর্শের উপরেই ম্যাজিনী মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে যুঁ ইতালীয় সমাজের বা Young Italy Associationএর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কিছুকাল পরে ইংরেজ মনীষী কার্লাইল (Carlyle) Hero Worship নামক প্রবন্ধে এক নূতন মহাপুরুষবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া ফরাসীবিপ্লবের সাম্যবাদের মূল ভিত্তিকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করেন।

ব্রাহ্মসমাজকে এই বিপ্লবাত্মক যুক্তিবাদ ও সাম্যবাদের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেশবচন্দ্র আগ্রহাতিশয় সহকারে কার্লাইলের মহাপুরুষবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু কার্লাইলের মহাপুরুষবাদেও প্রকৃত পক্ষে ধর্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না দেখিয়া, তিনি ইহার সঙ্গে ইহুদীর সাধনার ঈশ্বরতত্ত্বের বা Theocracyর মতকে যুক্ত করিয়া দিয়া, এক নূতন প্রেরিত-মহাপুরুষবাদের প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্ত হ'ন। ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্মের কিছুকাল পরেই কেশবচন্দ্র মহাপুরুষ বা Great Men সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাতেই তিনি সর্বপ্রথমে এই নূতন সিদ্ধান্ত অভিযুক্ত করেন। এই ধানেই, প্রকৃতপক্ষে, ব্রাহ্মসমাজের কৃতবিদ্য যুক্তিবাদী যুবকদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ও তাঁর অসুগত প্রচারক-গণের বিরোধ আরম্ভ হয়।

শিবনাথের চরিত্র

এই বিরোধের সূত্রপাত অবধিই শিবনাথ কেশবচন্দ্রের প্রতিপক্ষীয় দলের মুখপাত্র ও অগ্রণী হইয়া উঠিতে আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ না করিয়া, শিক্ষার্থী অবস্থাতেই, তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কৃতবিদ্য যুবকগণ বেক্রপভাবে কেশবচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভার মুগ্ধ হইয়া আত্যাত্তিক শ্রদ্ধা-হকারে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন, শিবনাথ বেক্রপভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া-ছিলেন কি না, সন্দেহ। ফলতঃ যৌবনাবধিই শিবনাথের মধ্যে এই আত্যাত্তিক শ্রদ্ধার ভাব অত্যন্তই জ্বর ছিল। শিবনাথের পিতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইয়াও, অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার যোগ এ জগতে অত্যন্ত বিরল। বিশেষতঃ যেখানে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে সুরসিকতাও বিদ্যমান থাকে, সেখানে শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিবার অবসর মাত্রই প্রায় পায় না। যেমন তাঁর পিতৃচরিত্রে, সেইরূপ শিবনাথের নিজের প্রকৃতিতেও একদিকে প্রথর দীপ্তি ও অত্মদিকে উচ্ছ্বসিত রসিকতা এই দুইই পাওয়া যায়। স্মরণ্য প্রথম যৌবনে তাঁর বিচারশক্তি ও বিজ্ঞপ-প্রবৃত্তি বতটা ফুটিয়াছিল, শ্রদ্ধাশীলতা যে ততটা ফুটিয়া উঠে নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তাঁর সে কালের প্রবন্ধাদি ইহারই সাক্ষ্য দান করে। সোমপ্রকাশ-সম্পাদক স্বর্গীয় স্বরাকান্যথ বিজ্ঞাত্বষণ মহাশয় শিবনাথের মাতুল ছিলেন। এই সূত্রে ছাত্রাবস্থা হইতেই সোমপ্রকাশের সঙ্গে তাঁরও কতকটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে।

আর সে সময়ে শোমপ্রকাশে শিবনাথের যে সকল রচনা প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে তাঁর এই যুক্তিপ্রবণতার ও বিজ্ঞাপাসক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বন্ধিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শনে”—

“হইতাম যদি আমি যমুনার জল,
হে প্রাণবল্লভ,”

প্রকাশিত হইলে, শোমপ্রকাশে শিবনাথ তাঁহার অল্পকরণে যে বিজ্ঞপাসক্ত কবিতা লেখেন, তাহাতেই তাঁহার উজ্জ্বল কবিত্ব-প্রতিভা ও অসাধারণ বিজ্ঞপাসক্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল এবং বন্ধিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যরসিকগণও তাহা পড়িয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁর আপনার স্বরূপে শিবনাথ তত্ত্বজ্ঞানীও নহেন, ভগবদ্ভক্তও নহেন, চিন্তাশীল দার্শনিকও নহেন, যুগ্মক সাধকও নহেন, কিন্তু অসাধারণ শব্দসম্পত্তিশালী সাহিত্যিক ও সুরসিক কবি। এক সময়ে শব্দযোজন্যর কুশলতায় শিবনাথ বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কোনও কোনও দিক্ দিয়া বিচার করিলে, এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ। প্রথমে শক্তিশালী লেখক ও সুরসিক কবিরূপেই বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী সমাজে শিবনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয়। এমন কি, পরে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদ পাইয়া স্বদেশের ধর্মচিন্তায় ও কর্মজীবনে তিনি যাহা কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, আপনার স্বাভাবিকী সাহিত্যশক্তি ও কবিশ্রুতিভার সেবার একান্তভাবে আয়োজন করিলে, বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের

ও সমাজজীবনের ইতিহাসে তদপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান পাইতেন, সন্দেহ নাই। আর ব্রাহ্মসমাজেও তিনি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাগ্মিত্যশক্তি ও সাহিত্য-সম্পদের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে, কোনও প্রকারের অনন্তসাধারণ সাধন-সম্পত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

আর ইহার প্রধান কারণ এই যে, কুটবিহার বিবাহোপলক্ষে যাহারা কেশবচন্দ্রের অধিনেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আবার একটা নূতন দল গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হ'ন, তাঁহাদের অনেকে তখনও পর্যন্ত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই বিশেষভাবে আশনাদিগের নূতন ধর্মজীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণও এই দলের সঙ্গে যোগদান করেন সত্য; কিন্তু একদিকে কেশবচন্দ্রের আপনার শিকার সঙ্গে তাঁহার এই কার্যের একান্ত অসঙ্গতি এবং অন্যদিকে এই বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের অপর প্রচারকগণ কেশবচন্দ্রের পক্ষসমর্থনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, তাহার অন্তর্নিহিত ওকালতী-বুদ্ধি-মূলভ সত্যগোপনের এবং ‘অসত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এই দুই মিলিয়া বিজয়কৃষ্ণের ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মনিষ্ঠাতে গুরুতর আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই, তিনি কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করেন। আর ব্রাহ্মসমাজের ধর্মনিষ্ঠ, ভক্তিমান ও রক্ষণশীল সভ্যদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠাভাগ্য বিজয়কৃষ্ণকে আচার্য্যপদে বরণ করেন, নতুবা প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনই ইহাদিগের ধর্মজীবনের বা কর্মজীবনের অধি-

নেতৃত্বলাভ করেন নাই। ফলতঃ নূতন সমাজের কর্তৃপক্ষেরা বিজয়কৃষ্ণের ভক্তবশের সাহায্যে আপনাদিগের বিজ্ঞোহিদলের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে যতটা উৎসুক ছিলেন তাঁহার সাধু চরিত্রের এবং অলোকসামান্য আধ্যাত্মিক সম্পদের আশ্রয়ে নিজেদের ধর্ম-জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ততটা উৎসুক ছিলেন না। এই কারণেই বিজয়কৃষ্ণের সাধু চরিত্রের প্রভাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বহুমূল হইবার অবসর পায় নাই এবং তাহারই জন্ত সমাজের নেতৃবর্গ কিছুদিন পরে অত্যন্ত সরাসরিভাবে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের সমাজের সর্বপ্রকারের যোগ ছেদন করিতে পারিয়াছিলেন। আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়াই বিশেষ সাধনসম্পদের অধিকারী না হইয়াও কেবল আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ও বাগ্মিতাগুণে শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার অধিনায়কত্ব লাভ করেন।

যুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াও অনেকে ক্রমে এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়া, আপনাদিগের তত্ত্বসিদ্ধান্তে ও ধর্মসাধনে এই যুক্তিবাদকে স্বল্প-বিস্তার অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র আপনিও তাহা করেন। তাঁহার অমুগত শিষ্যমণ্ডলীও এই যুক্তিমार्গ বর্জন করিয়া এক প্রকারের ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শিবনাথ প্রথম যৌবনে যে সকল সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আজও পর্যন্ত তাহার কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়াছেন বলিয়া

বোধ হয় না। ইহার, প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যেই এমন একটা যুক্তিপ্রবণতা আছে, যাহাকে যতই ছাড়াইতে ইচ্ছা করুন না কেন, এ পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই যুক্তিপ্রবণতা মূলতঃ ইংরেজিতে যাহাকে Scepticism বা অতিসন্দেহবাদ বলে, তাহারই রূপান্তর মাত্র। আর শিবনাথ বাবুর বক্তৃতা ও উপদেশাদিতে সর্বদাই যেন এই বস্তুটা লুকাইয়া থাকে। তিনি অনেক সময় আশ্চর্য্যবিবোধী সিদ্ধান্ত সকল খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, আর তখন প্রথমে যথারীতি সে সকল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁর এই সকল বক্তৃতায় ও উপদেশে এ সকল বিবোধী সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা যতটা বিশদ ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ হয়, তিনি যে ভাবে এ সকলের খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান, তাহা সেরূপ বিশদ এবং সদযুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়া উঠে না। এই কারণে তাঁর ধর্মোপদেশে যুক্তিবাদী শ্রোতা বা পাঠকের প্রাণে ধর্মের মূল ভিত্তিগুলিকে যে পরিমাণে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেয়, সে পরিমাণে আবার কিছুতেই তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে না। আর এই সাংঘাতিক অপূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশাদিতে যে কতকটা ধর্মের প্রেরণা জাগাইয়া তুলে, ইহা তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা-শক্তি এবং মায়াময়ী কবিকল্পনারই ফল।

কিন্তু ইহাতে শিবনাথ বাবুর কোনই গৌরবের হানি হয় না। তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা কিম্বা ভক্তিপন্থা প্রদর্শন করিবার জন্ত বিধাতা-পুরুষ তাঁহার সৃষ্টি করেন নাই; করিলে

তার অন্তঃপ্রকৃতি অল্প ইঁচেই গঠিত হইত। প্রকৃত ধর্মজীবনের কতকগুলি পূর্ববৃত্ত সাধন আছে। আর মর্ষি এবং বৈশ্বচন্দ্রের প্রথম জীবনের সংস্কার-চেষ্টা কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিলে, শিবনাথ বাবুই এই সকল পূর্ববৃত্ত সাধনে ব্রাহ্মসমাজের এবং কিয়ৎ পরিমাণে দেশের সাধারণ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবকদের গুরু হইয়া, তাহাদের ধর্মজীবন ও কর্মজীবনকে ফুটাইয়া তুলিবার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সর্বপ্রকারের সংস্কার বর্জন করিয়া, চিন্তাশক্তি লাভ করিলে, সেই শুদ্ধচিত্তেই কেবল পরমতত্ত্বের সার্থক অনুশীলন সম্ভব হয়। প্রথমে সন্দেহ, পরে বিচারযুক্তি, তার পরে, সর্বশেষে, এই বিচার-যুক্তির ফলে সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে, সন্দেহের একান্ত নিরসন হইয়া, প্রকৃত শ্রদ্ধা বা আন্তিক্যবুদ্ধির সঞ্চার,— এই ভাবেই প্রকৃত ধর্মজীবনের পূর্ববৃত্ত সাধন সমাপ্ত হইয়া

থাকে। এই শ্রদ্ধাই, এতদ্ব্যতীত, ধর্মজীবনের প্রথম সোপান ও মূলভিত্তি। আর এ কালের অনেক বাঙ্গালী ও ভারতবাসী শিবনাথ বাবুর শিক্ষাদীক্ষার প্রেরণায় নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সর্ববিধ পূর্বসংস্কারবর্জিত হইয়া, সন্দেহ, বিচার, প্রভৃতির সাহায্যে ক্রমে গভীর আন্তিক্য-বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অনেকে তাঁর নায়কত্বে “না”এর পথ বাহিয়া গিয়া, পরে “হাঁ”এর রাজ্যে যাইয়া পৌছিয়াছেন আর ইহারা ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া বা তাহার বাহিরে যাইয়া, নিজ নিজ সাধনশক্তির দ্বারা যে দিকে ও যে পরিমাণে দেশের ধর্মজীবন ও কর্মজীবনকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বা তুলিতে-ছেন, তার জ্ঞাত এদেশের বর্তমান সাধনা কিয়ৎপরিমাণে শিবনাথ বাবুর নিকটে ঋণী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল।

বেহার-চিত্র *

রায় সাহেব

(বেহারের মহাজন)

১২৮৭ সালে রাজপুতানার মাড়বারে ভীষণ হুতিক দেখা দিল। গোধুম ও তুলাভাবে লোকে “বজরা” “জোয়ারি” এবং শাক-পাত খাইয়া কোনপ্রকারে প্রাণ

ধারণ করিতেছিল, কিন্তু অবশেষে ভীষণ জলকটে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল।

বণিক গুরুমুখ রায় পথে পথে সামান্য সামান্য জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া কোন প্রকারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। এই হুতিক ও জলকটে তাহার দরিদ্রের সংসার

* এই পর্ধ্যায়ের তিনটি চিত্র ইতিপূর্বে “রাজ ঘোষা”, “আলোদার” ও “হজুর” নামে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অচল হইয়া উঠিল। গুরমুখের জী এবং বৃদ্ধা জননী সপ্তাহকাল ভীষণ অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট সহ্য করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন। গুরমুখ দেখিল, দেশে থাকিলে আর প্রাণরক্ষা হয় না। তখন সে বন্ধুবান্ধবের নিকট ভিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ করিয়া, হুইথানি বস্ত্র, একটা শোটা, এক কঞ্চল এবং এক “খারিয়া” লইয়া স্বদেশের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিল। হুই মাস ভিক্ষা করিয়া, পদব্রজে চলিয়া, অবশেষে গুরমুখ একদিন সন্ধ্যাকালে, ছিন্নবস্ত্রে, নথপদে, অস্থিসার দেহে পাটনায় আসিয়া পৌঁছিল।

গুরমুখের এক দূরসম্পর্কীয় কুটুম্ব ব্যবসায় উপলক্ষে বহুদিন হইতে পাটনায় বাস করিতেছিলেন। গুরমুখ সন্ধান করিয়া তাঁহার বাসায় গিয়া উঠিল।

গুরমুখের কুটুম্ব তনমুখ রায় একজন সম্ভ্রান্ত মহাজন। গুরমুখের হুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তিনি তাহাকে আশ্রয়দান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

তনমুখের মহাজনীর সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের ব্যবসায় ছিল। প্রথম প্রথম তনমুখ গুরমুখকে বস্ত্রবিভাগেই নিযুক্ত করিলেন। স্থির হইল যে, গুরমুখ বস্ত্র লইয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া বেড়াইবে, এবং তাহা হইতে যে লাভ হইবে, তাহার চতুর্থাংশ পারিশ্রমিক পাইবে। গুরমুখ সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। গুরমুখের মুখ বড় মিষ্ট ছিল। তাহারই স্তম্ভে অন্নদিনের মধ্যেই সে সরল পল্লীবাসিগণের মধ্যে বেশ পসার জমাইয়া লইল। মধ্যাহ্নে গুরুভার বস্ত্রের মোট পৃষ্ঠে

বহিরা বর্ণাজকলেবর গুরমুখ গ্রামের অশ্বখ-তলে দেখা দিলেই, বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী দেখিতে দেখিতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিত। গুরমুখ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যতদিন না সে একহাজার টাকা সঞ্চয় করিতে পারিবে, ততদিন সে নিগের অন্ন গ্রাহ্য কোনমতেই চারি পয়সার অধিক বায় করিবে না।

সুতরাং প্রথম হইতেই স্বল্প লভ্যাংশ হইতেও গুরমুখের কিছু কিছু সঞ্চয় হইতে লাগিল। সে টাকা সে তনমুখের দোকানেই জমা রাখিয়া সুদে খাটাইতে লাগিল।

এইরূপে ধীরে ধীরে গুরমুখের ভাগ্যপথ পরিস্কৃত হইতে লাগিল।

গুরমুখের বুদ্ধিমত্তা ও কার্যদক্ষতা দেখিয়া তনমুখ কিছুকাল পরেই গুরমুখকে দোকানের কাজে নিযুক্ত করিলেন। গুরমুখের পরিশ্রমে ও দক্ষতায় দিন দিন তনমুখের দোকানের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তনমুখ পরম শ্রীত হইয়া দোকানের সমস্ত আর বায় ও হিসাবের ভার গুরমুখের উপর সমর্পণ করিলেন। গুরমুখ অবহিতচিত্তে কর্তব্যপালন করিতে লাগিল।

এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

পাঁচ বৎসর পরে সহসা একদিন বিহুটিকা রোগে তনমুখের মৃত্যু হইল। তনমুখের মৃত্যুর পর তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেরা দোকানের ভার লইতে আসিল। হিসাব নিকাশ গৃহীত হইল। গুরমুখ সমস্ত খাতা-পত্র তাহাদের উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিল।

হিসাবে দেখা গেল তনমুখের দোকানে গুরমুখের ২৫,০০০ টাকা জমা আছে! দেখিয়া পুত্রেরা কিছু বিস্মিত হইল আট

টাকা বেতন এবং এক পাই মাত্র লভ্যাংশের
অধিকারী গুরমুখ পাঁচ বৎসরের মধ্যে কিরূপে
এত টাকা জমাইল, তাহা তাহার। কিছুতেই
ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু খাতাপত্র সমস্তই
গুরমুখের হাতে, কিছুই বলিবার উপায়
ছিল না।

পুত্রদের অবিখ্যাসের ভাব দেখিয়া গুরমুখ
নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল। বলিল, “আমি এত
দিন ‘জান’ দিয়া দোকানের উন্নতি করি-
রাছি। এক্ষণে যদি আপনাদের আমার প্রতি
সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার
আর এখানে না থাকাই ভাল। আমার
টাকা আমার দিয়া দিন, আমি অত্র চলিয়া
যাই।”

তনুসুখের পুত্রগণের দোকানের কার্যে
তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং তাহার।
কাজকর্ম বুঝিয়া লইবার অভিপ্রায়ে আরও
দিনকতক গুরমুখকে দোকানে থাকিতে
বলিল।

কিন্তু “ইমান্দার” গুরমুখ তাহার
“ইমানে” আঘাত লাগায় নিতান্ত উত্তেজিত
হইয়াছিল। সে কিছুতেই আর থাকিতে
স্বীকৃত হইল না। সপ্তাহের মধ্যে সে সমস্ত
টাকা উঠাইয়া লইয়া ৬ তনুসুখ রায়ের
দোকানের পার্শ্বেই নিজের পৃথক এক দোকান
খুলিল।

২

তনুসুখের পুত্রগণের অনভিজ্ঞতার সুযোগ
পাইয়া চতুর গুরমুখ অল্পদিনের মধ্যেই ক্রমে
ক্রমে তনুসুখের সমস্ত গ্রাহক “ভাড়াইয়া”
লইল। দিন দিন যে অল্পপাতে তনুসুখের
দোকানের অবনতি হইতে লাগিল, ঠিক সেই

অল্পপাতে তাহার দোকানের উন্নতি হইতে
লাগিল। প্রথমটা গুরমুখ তনুসুখের অল্প-
করণে কেবল কাপড়ের দোকানই খুলিয়া-
ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে দেখিল
যে, সহরে বস্ত্রবিক্রয় করিয়া অধিক লাভ করা
অসম্ভব। পল্লীগ্ৰামে নির্বোধ পল্লীবাসীকে
ঠকাইয়া সময়ে সময়ে টাকায় টাকা লাভ
করাও নিতান্ত কঠিন নহে, কিন্তু সহরে টাকায়
চারি আনা লাভ করাও অসম্ভব। কারণ
সহরে দোকান অনেক এবং “গাহকি”রা
পাঁচ দোকান না দেখিয়া “সওদা” করিতে
অনিচ্ছুক। সুতরাং গুরমুখ কেবল বস্ত্র-
ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। সে
বস্ত্র-বিভাগের সঙ্গে মহাজনী বিভাগ খুলিল।
এ বিভাগেও তাহার যথেষ্ট গ্রাহক জুটিতে
লাগিল।

গুরমুখের সুদ অতি অল্প। শতকরা
মাসিক দুই টাকা মাত্র। তাহার উপর।
তাহার কথা অতি মিষ্ট। কোন সময়েই
তাহার মুখে বিরক্তি নাই, কার্যে আগ্রহ নাই
লেখক উপস্থিত নাই বলিয়া “হাতচিঠা”
লেখা হইল না, তাহাতেও গুরমুখের আপত্তি
নাই। সরল গুরমুখ কেবল সাদা কাগজে
“অনুষ্ঠের ছাপ” লইয়াই টাকা দিতে প্রস্তুত।
কেহ সন্ধ্যার সময়ে টাকা পরিশোধ করিতে
আসিলে “হাতচিঠা” খুঁজিয়া বাহির করিবার
জন্ত বিলম্ব না করিয়া, গুরমুখ হিসাব না
দেখিয়া, কেবল গ্রাহকের কথার উপর বিশ্বাস
করিয়াই, খাতায় “বেবাক্ ওয়াল” লিখিয়া
টাকা লইতে সন্মত! এরূপ উদার মহাজনের
গ্রাহক না জুটিবে কেন?

দেখিতে দেখিতে গুরমুখের দোকানের

খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এক বৎসরের মধ্যেই তনুসুখ রায়ের পুত্রগণকে দোকানে “লালবাতি আলিতে” হইল।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে গুরুমুখ “রেভিনিউ সেনে” বিষয় খরিদ করিতে লাগিল। খিড়-কিতে সে’করার দোকান বসাইল (কু-লোক বলিত, রাতে চোরদের নিকট হইতে চোরাই মাল লইয়া গালাইয়া ফেলিবার জন্য এ দোকানের প্রতিষ্ঠা!)। সুবিধা মত কিছু কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ আবাদ করিতে লাগিল। বিলাতী চিনি খরিদ করিয়া তাহাতে গুড় ও ধূলি মিশাইয়া দেশী চিনি প্রস্তুত করিবার এবং ‘দেহান্ত’ হইতে বিস্কুত স্বত কিনিয়া তাহার সঙ্গে চর্কি মিশাইয়া তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার কারখানা খুলিল।—বাণিজ্যালম্বী শতযুখে গুরুমুখের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

দশ বৎসরের মধ্যে গুরুমুখ দুই লক্ষ মূদ্রার অধিকারী হইয়া উঠিল। তাহার যশোরাশি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সুপ্রতিষ্ঠিত গুরুমুখ দেখিল যে, এক্ষণে লাভের মাত্রা আরও কিছু বাড়াইয়া দিলেও কোন অনিষ্ট ঘটবার আশঙ্কা নাই।

পরদিন প্রত্যুষে বিদেশ হইতে একজন গ্রাহক গুরুমুখের নিকট ১০,০০০ টাকা কর্জ লইতে আসিল। লেখাপড়া শেষ হইলে গুরুমুখ টাকা বাহির করিয়া আনিয়া স্তরে স্তরে গ্রাহকের সম্মুখে সাজাইয়া দিল। গ্রাহক সমস্ত টাকা পুনরায় ভাল করিয়া গণিয়া লইল।

সমস্ত কার্য শেষ হইল, গ্রাহকের মনে হইল, যখন সদরে গঙ্গাভীরে আসিয়াছে, তখন

একবার গঙ্গানানটা করিয়া যাওয়া নিতান্ত কর্তব্য। কিন্তু এত টাকা লইয়া গঙ্গানান নিরাপদ নহে। স্তত্রাং সে গুরুমুখকে বলিল, “টাকা এক্ষণে আপনার নিকটেই থাকুক, আমি গঙ্গানান করিয়া আসিয়া টাকা লইয়া যাইব।” ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া গুরুমুখ বলিল, “আমি যখন একবার টাকা বাহির করিয়া সমস্ত গণিয়া গাঁথিয়া দিয়াছি, তখন আর ও টাকা স্পর্শ করিব না। আবার কে বসিয়া বসিয়া এক ঘণ্টা ধরিয়া টাকা গণিবে? তবে যদি তোমার নিতান্তই টাকা রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এখানে লোহার সিন্ধুক আছে, এই চাবি লও, লইয়া, তোমার টাকা সিন্ধুকে রাখিয়া চাবি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। তাহা হইলে, আমার সঙ্গে টাকার আর কোন সংস্রব থাকিবে না।”

গ্রাহক সম্মত হইল। গুরুমুখ দোকানে উপস্থিত দশজনকে নেখাইয়া গ্রাহকের হস্তে চাবি দিল। গ্রাহক চাবি লইয়া সিন্ধুকের মধ্যে টাকা রাখিয়া, সকলের সাক্ষাতে চাবি লইয়া গঙ্গানানে চলিয়া গেল।

এক ঘণ্টা পরে গঙ্গানান করিয়া আসিয়া সিন্ধুক খুলিয়া সে বিষয়ে চৌৎকার করিয়া উঠিল। সিন্ধুকে এক কর্দমও নাই!

গুরুমুখ তখন গভীর মনঃসংযোগ সহকারে খাতা লিখিতেছিল। গ্রাহক গুরুমুখের নিকট আসিয়া চৌৎকার করিয়া বলিল, “আপনি কি টাকা সরাইয়াছেন?”

গুরুমুখ আকাশ হইতে পড়িল। সে লবিস্বয়ে কহিল, “তুমি নিজের হাতে টাকা রাখিয়া চাবি দিয়া চাবি লইয়া গেলে।

এখনো চাবি তোমার হাতে। আমি টাকা সরাইব কিরূপে?” উপস্থিত দশজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “আপনারা ত সব দেখিয়াছেন, এখন দেখুন একবার ব্যাপার!”

তাহারা সকলে একবাক্যে বলিল—
“বাস্তবিক আমরা ত বরাবর এইখানেই বসিয়া আছি; তুমি এ কি কথা বলিতেছ? রায়জি তোমাকেই চাবি দিলেন। তুমি নিজে টাকা রাখিয়া চাবি লইয়া গেলে। এ সকল ত ভাল কথা নয়!” গুরমুখ আবেগভরে বলিল, “দেখুন, ভাগ্যে আপনাদের সাক্ষী রাখিয়া ছিলাম। নহিলে আজ আমার কি ‘বদ-নামি’ই হইত! গুরমুখ রায় সে প্রকৃতির লোক নয়। সে কাহারও নিকট ‘এক কোড়ি’ ‘দে-ইমানি’ করিয়া লইয়াছে এমন কথা কেহ কখনো বলিতে পারিবে না। তোমার ত দশ হাজার ‘রোপেয়া’ দশ লাখ ‘রোপেয়ার’ জন্তও গুরমুখ রায় কখনো ‘ইমান’ খোয়াইবে না!” সকলেই এ কথার সমর্থন করিল। হতভাগ্য গ্রাহক অবসন্ন দেহে মাটির উপর বসিয়া পড়িল—
বেচারি চারিদিক শূন্য দেখিতেছিল! বহুক্ষণ কাতোশভাবে মাথার হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া অভাগা কপালে করাঘাত করিতে করিতে গৃহে চলিয়া গেল। অন্তর্নিহিত আনন্দের ক্ষীণরশ্মিরেখা যেন ক্ষণেকের জন্ত গুরমুখের লোভজাজক ক্ষুদ্রচক্ষু বিদ্রোহের মত খেলিয়া গেল!

৩

সকলকাম গুরমুখের উর্বর মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে অর্থাগমের নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। যাহারা সাধা কাগজে

‘আঙ্গুরার ছাপ’ মাত্র দিয়া গুরমুখের সরলতার প্রশংসা করিতে করিতে টাকা লইয়া গিয়াছিল, তাহারা সন্তোষে দেখিল যে, তাহাদের নামে গৃহীত টাকার দশগুণ টাকার জন্ত নালিশ ‘দায়ের’ হইয়াছে! যাহারা টাকা দিতে আসিয়া হাতচিঠা ফেরত না লইয়া খাতায় ‘উম্মলি’ লিখাইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সবিস্ময়ে জানিল যে, তাহাদের উপর পুনরায় পুরাতন হাতচিঠার উপর নালিশ রুজু হইয়াছে! এবং খাতায় ‘ওম্মলি’ নামগন্ধও নাই! বুদ্ধিমান গুরমুখ সর্বদা তিন ‘সেট’ খাতা রাখিতেন—এক সেট নিজের জন্ত, এক সেট গ্রাহকদের জন্ত এবং এক সেট ইনকম্‌ট্যাক্সের এসেসারের জন্ত! মূঢ় গ্রাহক-দিগের এ রহস্য বুঝিবার উপায় ছিল না।

এতদ্ভিন্ন যে সকল হতভাগ্য গ্রাহক কোন কারণে গুরমুখের দোকান ছাড়িয়া অত্যাচার ‘কারবার’ করিতে গিয়াছিল, তাহারা এক দিন সবিস্ময়ে জানিল যে, তাহাদের জমিজমা সমস্তই আদালতের সাহায্যে গুরমুখের হইয়া গিয়াছে। নালিশ, ডিক্রী, নিলাম, ‘দখল দেহানি’ সমস্তই গোপনে সম্পাদিত হইয়াছে! জানিয়া ব্যাকুল হইয়া তাহারা ছুটিয়া আসিয়া আদালতে আপত্তি জানাইল—কিন্তু তাহারা ‘সমন’ হইতে ‘দখল দেহানি’ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারে নাই—আদালত এ কথা বিশ্বাস করিণেন না।

দেখিতে দেখিতে গুরমুখের ধনভাণ্ডার অলোচ্ছ্বাসের মত ক্ষীণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু লোভের সীমা নাই। একদিন একজন পশ্চিম দেশীয় লাল সাহেব গোপনে

শুরমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। লালার সাহেবের জাল করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। লোভে তাঁহার ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় স্পর্শকরু হার জলিয়া উঠিল।

সেই দিন হইতে সুবুদ্ধি শুরমুখ রায় আর এক নতুন কারবার আরম্ভ করিলেন। অনেক বিলাসী ও হুজুরাসক্ত জমিদার ও জমিদার-পুত্র শুরমুখের নিকট টাকা লইতেন। এ কারবারে লাভ যথেষ্ট ছিল। সাধারণতঃ বিশেষ প্রয়োজনের সময়েই মোসাহেবেরা আসিয়া টাকা লইয়া যাইত। এক হাজার টাকার হাতচিঠা লইয়া আসিলে ৭৫০ টাকা দিলেই চলিত এবং সুদ শতকরা ৭৫ টাকা চাহিলেও আপত্তি হইত না। শুরমুখ সর্ব প্রথমে এই সকল মূঢ়মতি কাণ্ডজ্ঞানহীন বাবু সাহেবদের উপরেই লালার সাহেবের লিপিনৈপুণ্যের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন।

পরীক্ষা আশাভীত সফলতা লাভ করিল। অন্যরাসে জাল হাতচিঠার উপর ডিক্রী হইয়া গেল। পুলকিত শুরমুখ দেখিলেন যে, ইতি-পূর্বে তিনি অর্থোপার্জনের যতগুলি পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কোনটাই ইহার মত লাভজনক নহে। কিন্তু অবশেষে একটা হাতচিঠা লইয়া শুরমুখকে কিছু বিপদে পড়িতে হইল।

শুরমুখ একজন প্রসিদ্ধ জমিদারের নামে এক লক্ষ টাকার এক জাল হাতচিঠা প্রস্তুত করাইলেন। যথাকালে নালিশ 'দায়ের' হইল। কিন্তু এবার নির্বিবাদে মোকদ্দমার ডিক্রী হইল না। রাজা হাত-

চিঠা জাল বলিয়া অব্যবহিলেন এবং নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ীর সাহায্য গ্রহণ করিলেন।

শুরমুখও চেষ্টার ক্রটি করিলেন না। অর্থব্যয় করিয়া যথেষ্ট সাক্ষী সংগ্রহ করিলেন। দুই চারিজন সত্যনিষ্ঠ খেতাব পর্য্যন্ত সাক্ষি-শ্রেণীভুক্ত হইল। কিন্তু তাহাতেও সফল ফলিল না। দক্ষ ব্যবহারাজীবের শাপিত 'জেরায়' তত্পাকার মিথ্যাসাক্ষ্য অচিরে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বিচারক হাতচিঠা জাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

বিবাদী বাদীর উপর জালের অভিযোগ আনিবার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—শুরমুখ প্রমাদ গণিল।

অচিরে হাইকোর্টে আপীল দায়ের হইল; কিন্তু তাঁহার উকীলেরা বলিলেন যে, আপীল জিতিবার সম্ভাবনা অল্প। নিরুপায় শুরমুখ অবশেষে রাজা সাহেবের হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে ২৫,০০০ টাকা দিয়া এ যাত্রা কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইলেন। আপীল 'একতরফা' ডিক্রী হইয়া গেল।

কিন্তু আপীল জিতিয়াও শুরমুখ পূর্বপ্রতিষ্ঠা আর ফিরিয়া পাইলেন না। এই মোকদ্দম-লইয়া সহরে গুরুতর ছল ছল পড়িয়া গিয়াছিল। ভয়ে গ্রাহকেরা শুরমুখের সঙ্গে কারবার বন্ধ করিয়া দিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শুরমুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার আদেশ দিলেন। পুলিশ সাহেব গোপনে তাঁহার সবন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান লইতে লাগিলেন।

মহাজনি আর চলে না দেখিয়া, শুরমুখ জমিদারি ত্রয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু

জমিদারি খরিদ করিয়া আরও বিপদ ঘটিল।

জমিদারি থাকিলে মধ্যে মধ্যে দুই একটা দাঙ্গা হাজ্যামা একপ্রকার অবশ্যজ্ঞাবী। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উভয়েই গুরমুখের প্রতি বিরূপ থাকায়, মোকদ্দমায় গুরমুখের পক্ষ পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত হইতে লাগিল। প্রজারা ধর্মঘট করিয়া খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। তৌকুবুদ্দিন গুরমুখ বুঝিলেন, কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে আর উপায় নাই। কিছুদিন চিন্তা করিয়া গুরমুখ ক্রমে ক্রমে সাহেবদের বাসোপযোগী অনেকগুলি অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন এবং উৎকৃষ্ট গাড়ী ঘোড়া আনাইলেন। গুরমুখের সনির্বন্ধ অনুগ্রহে এবং বাটীর তুলনার ভাড়া নাম মাত্র দেখিয়া উচ্চ রাজকর্মচারিবৃন্দের অধিকাংশই দয়া করিয়া একে একে গুরমুখের বাটীতে উঠিয়া গেলেন। গাড়ী ঘোড়া তাঁহাদেরই সেবায় নিয়োজিত হইল। ক্রমশঃ তাঁহাদের বিমুখ চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে গুরমুখের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

কিন্তু বুদ্ধিমান গুরমুখ ইহাতেও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।

একজন খেতাব যুগপুরুষ বহুদিন হইতে কর্মহীন অবস্থায় সহরে কষ্ট পাইতেছিলেন। স্থানীয় খেতাবসমাজ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার বিশেষ কোন উপকার করিতে পারেন নাই। মাসিক দুইশত টাকা বেতন দিয়া গুরমুখ এই খেতাব-বহুকে নামে জমিদারির ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন।

বলা বাহুল্য, এই সকল অপব্যয়ে চিরসঞ্চয়-

শীল গুরমুখের প্রাণান্তকর কষ্ট হইতেছিল; কিন্তু উপায় ছিল না।

ম্যানেজার কেরি সাহেব স্ত্রী যুগপুরুষ। স্ত্রীর দরিদ্র হইলেও, খেতাব-মহিলা-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কিরিন্দি সব্‌ডেপুটি সাহেবের গৃহিণী হইতে জগদসাহেব ও কালেক্টর সাহেবের মহিষী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। স্ত্রীর রাজনীতিজ্ঞ গুরমুখ কেরি সাহেবের সাহায্যে প্রথমে খেতাব-মহিলা-সমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলেন।

গুরমুখের বদান্ততায় এবং কেরি সাহেবের আন্তরিক যত্নে সাহেবদের ‘ক্লাব ঘরে’ সপ্তাহে সপ্তাহে মহিলাবৃন্দের ভোজন ও নৃত্যোৎসব চলিতে লাগিল। সুরোগ বুঝিয়া, গুরমুখ কেরি সাহেবের সাহায্যে মহিলা-সমাজে কিছু কিছু উপহারও বিতরণ করিলেন। জজ, কালেক্টর ও পুলিশ সাহেবের মহিষী মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইলেন। গুরমুখের অদৃষ্টগগন হইতে দুর্ভাগ্যের ঘনমেঘ অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল।

কালেক্টর একদিন গুরমুখকে বাটীতে ডাকাইয়া তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া কহিলেন, “সহরে বৎসর বৎসর যেক্রপ কলেরা হইতেছে, তাহাতে সহরে জলের কলের আবশ্যকতা আর অস্বীকার করা যায় না। আপনাদের মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কিছুমাত্র মনোযোগ করিলেই অতি সহজেই সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।”

শুনিয়া গুরমুখের বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে জলের কলের জন্য ১০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া, গুরমুখ

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের করম্পর্শস্থ ভোগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সেই দিন হইতে বাবু গুরমুখ রায়ের প্রতি কালেক্টর সাহেবের প্রজ্ঞা সহসা অভ্যস্ত বৃদ্ধি পাইল।

হাঁসপাতালের উন্নতি, কালেক্টরের প্রতিষ্ঠা, টাউনহল নির্মাণ, বস্তি সংস্থার প্রভৃতি প্রত্যেক সংকারণ্যেই তাঁহার নিকট সাংঘ্য প্রার্থনা করিয়া তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করিতে লাগিলেন।

চাঁদার টাকা বাহির করিবার সময় সদাশয় গুরমুখ নিজের বিদীর্ঘ্যমাণ হৃদয়কে কেবল এই বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন যে, একবার কালেক্টর সাহেবের কৃপালাভ করিতে পারিলে, সমস্ত টাকা প্রজ্ঞাদের নিকট হইতে মায় স্নান আদায় করিয়া লইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।

৫

পাঁচবৎসরের অবিরাম সংকারণ্য ও বদান্ততায় গুরমুখ রায়ের কলঙ্ককালিমা সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল। কালেক্টর সাহেব বাবু গুরমুখ রায়কে রায় বাহাদুর উপাধি দিবার জন্য গবর্ণমেন্টে লিখিয়া পাঠাইলেন।

নিশ্চিত হইয়া গুরমুখ বহুদিনের উপবাসী শার্দূলের মত প্রজাবৃন্দের উপর পতিত হইলেন। একবৎসরের মধ্যে কেবল ‘নজর’ ও ‘সেলামি’তেই প্রজাদের নিকট হইতে লক্ষাধিক মুদ্রা সংগৃহীত হইল। খাজনা শতকরা ৫০ টাকা হারে বাড়িয়া গেল। বিপন্ন প্রজাবৃন্দ কালেক্টর সাহেবের নিকট আবেদন করিল। এবার কালেক্টর তাহাদের

অভিযোগ ‘ছেড়াচিঠির ঝড়িতে’ নিক্ষেপ করিলেন। বহুকালের পর ক্ষতিগ্রস্ত গুরমুখ পুনরায় চঞ্চলা কমলার কৃপালাভ করিয়া স্তম্ভ হইলেন।

কালেক্টর সাহেবের চেঁচা সফল হইল। নববর্ষে বাবু গুরমুখ রায় ‘রায় সাহেব’ উপাধিতে ভূষিত হইলেন। কমিশনার সাহেব রায় সাহেবকে “খেলাত” দিবার সময়ে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “রায় সাহেবের দেশপ্রসিদ্ধ সাধুতা, বদান্ততা, লোকহিতৈষণা, প্রজাপ্রীতি এবং রাজভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আজ গভর্ণমেন্ট নিত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহাকে এইরূপে সম্মানিত করিয়া নিজের গুণগ্রাহিতার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলেন। আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস রায়সাহেব নিজের অবলম্বিত সুপথে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনাকে সম্বরে উচ্চতর উপাধিলাভের উপযোগী করিয়া গভর্ণমেন্টের সুস্তোষ বিধান করিবেন।”

বলা বাহুল্য, রায়সাহেব কমিশনার সাহেবের বহুমূল্য উপদেশ একদিনের জন্যও বিস্মৃত হইলেন না। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত-“অর্থনীতি” অনুসারে “অপতানিকিংশেষে” প্রজাপালন ও “রাজ্যশাসন” করিতে লাগিলেন। নিরুপায় প্রজাবৃন্দ, “রায়সাহেব” তাঁহার অনন্তসাধারণ প্রজাপ্রীতির গুণে কেবে “রাজ্যসাহেব” কৃপাস্তরিত হইয়া যান, সাশ্রমেন্দ্রে কেবল তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীজগন্নাথ

হিন্দুর ধর্ম বস্তুটাই যে কি, ইহা বুঝিতে চাইলে, একবার কিছুদিন যাইয়া শ্রীক্ষেত্রে বাস করা আবশ্যিক। এখানে এই ধর্মের এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা আর কোনও হিন্দুতীর্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

হিন্দুভূমির আর সর্বত্র হিন্দুধর্মের জাতি-বর্ণের অশেষ বৈষম্য ও আচার-বিচারের কঠিন বাধাবাধিই দেখিতে পাই। কিন্তু শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে আসিয়াই এক অদ্ভুত সাম্য ও আশ্চর্য্য মুক্তভাব দেখিয়া থাকি।

হিন্দুসমাজের সর্বত্র বিধি-নিষেধের কড়াড়ি প্রতিষ্ঠা করিয়া, মনে হয় যেন, হিন্দুর সনাতন সাধনা এই পুরীধামে আপনার চিরন্তন লক্ষ্য যে একান্ত অভেদ-সাধন, তাহারই একটা চাক্ষুষ ছবি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

সচরাচর হিন্দুর বন্ধভাবটাই আমাদের চক্ষে পড়ে। হিন্দুর আচার-বিচারের বাধা-বাধি দেখিয়া মনে হয় যেন, তার মত এমন বন্ধজীব জগতে আর নাই। মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে আর কোনও ধর্মে এমন কঠিন করিয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখে নাই। কোন দিন কি খাইবে কি না খাইবে, কার সঙ্গে সে, যে বসিবে দাঁড়াইবে,—এ সকল অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও হিন্দুর কোনও স্বাধীনতা নাই। কিন্তু এ সকল বন্ধন যে হিন্দুর ধর্মের চরম লক্ষ্য নয়, কিন্তু অবাস্তব উপায় মাত্র, এ সত্যটা প্রচার করিবার জন্তই যেন শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যতীর্থের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

স্বল্পবিস্তর বিধিনিষেধের বন্ধন জগতের সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু হিন্দুধর্মে এক দিকে যেমন এই সকল বিধিনিষেধের একটা আত্যস্তিক আভিযা দেখিতে পাঠ, অন্য দিকে সেইরূপ এ সকল কিছুই যে ধর্ম-জীবনের স্থায়ী বিধান নহে, ইহাও দেখিয়া থাকি। একদিকে, ধর্মজীবনের নিম্নতর অধিকারে, এ সকল বিধিনিষেধের অত্যন্ত প্রভাব, অন্যদিকে, উচ্চতর অবস্থায়, আবার সর্ববিধ বিধিনিষেধের একান্ত অভাবও দেখিতে পাই। ইহাই হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব।

কখনও কোনও খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান সাধক তাঁহাদের ধর্মের বিধিনিষেধ সকল অতিক্রম করিতে পারেন না। এক জন খৃষ্টীয়ানের বা মুসলমানের পক্ষে যাহা অবৈধ, সকলেরই পক্ষে তাহা অবৈধ। এক অবস্থায় যাহা প্রতিপাল্য বা বর্জনীয়, সকল অবস্থাতেই তাহা প্রতিপাল্য বা বর্জনীয়। প্রবর্তাবস্থায় যাহা ধর্ম ও কর্তব্য, সিদ্ধা-বস্থাতেও তার ব্যতিক্রম সম্ভবে না।

হিন্দুর ধর্মে এমন অদ্ভুত সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে, হিন্দুর ধর্ম যে জাতীয়, খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান ধর্ম সে জাতীয় নহে। খৃষ্টীয়ান ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম বৈধী ধর্ম; যুরোপীয় পণ্ডিতেরা এ গুলিকে Legalistic Religion বলেন। হিন্দুর ধর্ম এরূপ বৈধী ধর্ম নহে। ইহার প্রধান প্রমাণ এই যে, মুক্তি বলিতে হিন্দু যে বস্তুকে বুঝেন, খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান ঠিক সে বস্তুকে বুঝেন না।

পাপ, আর পাপের অপরিহার্য পরিণাম যে নরকভোগ, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করাকেই খৃষ্টীয়ানেরা এবং মুসলমানেরা সচরাচর মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন। হিন্দুর মুক্তির আদর্শ ইহা অপেক্ষা একটু উদার। পাপ ও পুণ্য উভয়ের অতীত অবস্থাকেই হিন্দু মুক্তি কহেন। মুক্তাবস্থায় হিন্দুর যে কেবল পাপই থাকে না, তাহা নহে, পুণ্যও থাকে না। ছায়াতপের ছায় পাপ-পুণ্য যুগ্মবস্তু; একের সঙ্গে অপরে অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ; একের উপস্থিতিতে স্ফুটাকারেই হউক বা বীজাকারেই হউক, অপরের উপস্থিতি অনিবার্য। পাপ থাকিলেই পুণ্যও থাকিবে; পুণ্য থাকিলেই পাপও থাকিবে। সুখ ও দুঃখ, শীত ও গ্রীষ্ম, মান ও অপমান, স্তুতি ও নিন্দা, এ সকল যেমন নিত্যযুক্ত হইয়া আছে, পাপ এবং পুণ্যও সেইরূপ। এ সকলকে হিন্দুর শাস্ত্রে দ্বন্দ্ব কহে। আর মুক্তির অবস্থা এ সকল স্বন্দের অতীত অবস্থা। দ্বন্দ্বাতীত জীবই হিন্দুর চক্ষে একমাত্র মুক্ত জীব। আর যিনি এই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁর পক্ষে কোনও বিধিও নাই নিষেধও নাই। তাঁর জাতি-বর্ণের, আচার-বিচারের, ব্রত-নিয়মের, যাগযজ্ঞের, কোনও কিছুই অপেক্ষা আর নাই। তিনি এ সকলের অতীত, তিনি স্বাধীন, স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই যে স্বাধীনতা—এই যে স্বারাজ্যলাভ, ইহাই হিন্দুর ধর্মের ও হিন্দুর সাধনার চরম লক্ষ্য। গার্হস্থ্যজীবনের, সমাজ-জীবনের, ধর্মের ক্রিয়া কর্মের অশেষবিধ বিধিনিষেধ ও ভেদবিচার এই চরম লক্ষ্য লাভেরই সাধন ও সোপান-

রূপে হিন্দু সাধনার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সকল উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নহে। এগুলি সাময়িক বিধান, নিত্যকালের নিয়ম নহে। আর এ সকল বিধিনিষেধ যে অবাস্তব, আকস্মিক, সাময়িক উপায় মাত্র, ধর্মের সনাতন উদ্দেশ্য ও আদর্শ নয়, ইহা দেখাইবার জন্তই যেন এই পুরীতীর্থের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

এই তীর্থের দেবতাকে হিন্দু জগন্নাথ বলিয়া ডাকেন। তাঁর এই নামকরণ যে একটা অর্থহীন আকস্মিক ব্যাপার এমনও মনে হয় না। শ্রীজগন্নাথের সঙ্গে তাঁর শ্রীক্ষেত্রের রীতিনীতির ও আচার-বিচারের একটা নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পুরীর দেবতা যেমন জগন্নাথ, কাশীর দেবতা সেইরূপ বিষ্ণেশ্বর; বৃন্দাবনের দেবতা সেইরূপ শ্রীগোবিন্দজ। যিনি গোবিন্দ, তিনিই বিষ্ণেশ্বর; তিনিই আবার জগন্নাথ,—ইহা সত্য। হিন্দু আপনার ইষ্ট-দেবতাকে বহু নামে ডাকেন বলিয়া, তিনি যে এক ন'ন, কিন্তু বহু, এমন অদ্ভুত কথায় বিশ্বাস করে না। অতি প্রাচীন কালেই হিন্দু এ সকল অসংখ্য নামের অন্তরালে যে একই অখণ্ড অদ্বৈত বস্তু বিরাজ করিতেছেন, ইহা জানিয়াছিল। আপনার সাধনার অতি শৈশবেই তিনি এটা ধরিয়াছিলেন—

“একং সদিপ্রাঃ বহুধা বদন্তু”

এক সত্যকেই পণ্ডিতেরা বহু নামে ডাকিয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই বরুণ, তিনিই গরুৎ। যিনি

তিনিই শ্রীগোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই বিষ্ণেশ্বর, এ বিষয়ে হিন্দুর কখনওই কোনও দ্বিধা ছিল না ও নাই। কিন্তু স্বরূপতঃ

ইহারা সকলেই এক হইলেও, রূপতঃ ইহারা বিভিন্ন। সত্ত্বার সমতা থাকিলেও, প্রকাশের বৈষম্য আছে। একই পরমতত্ত্বের যে দিকটা বিবেক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগোবিন্দ ঠিক সে দিকটা প্রকাশ করেন নাই। আবার জগন্নাথ যে দিকটা প্রকাশ করিয়াছেন, বিবেক্ষণ বা গোবিন্দ ইহাদের কেহই তাহা প্রকাশ করেন নাই ও করেন না। বিবেক্ষণে ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাবের ঐকান্তিক প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আত্মকৃত্ত্ব পর্য্যন্ত সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের যিনি ঈশ্বর, কর্তা, নিয়ন্তা, যার মহত্ত্ব আমরা দিগকে একান্ত অভিজ্ঞত করিয়া, ভয়বিহ্বল চিত্তে আমরা দিগকে তাঁহা হইতে দূরায় স্তূপে লইয়া যায়, তিনিই বিবেক্ষণ।

ঈশাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ

ঈশস্ত বিষ্ণুস্ত পরং নিধানম্।

বেত্তাহি বেদাঞ্চ পরঞ্চ ধাম

ঈশা তত্তং বিশ্বমনস্তরূপ ॥”

বিবেক্ষণকে এই ভাবেই আমরা বন্দনা করিয়া থাকি। আর বিবেক্ষণে যেমন এই বিশ্বকর ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, সেইরূপ গোপী-জনন্যভ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগোবিন্দে অসাধারণ মাধুর্য্যের প্রকাশ। গোপীভাৱে যারা সাধন ভজন করিতে পারেন না, তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে “নাথ” বলিয়া সম্বোধন করা সাজে না। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎভাবে কেবল রাধানাথই, পরোক্ষভাবেই তাঁহাকে লোকনাথ বলিতে পারি, কিন্তু শ্রীজগন্নাথে এ ছ’য়ের কোনও ভাবই প্রকাশিত হয় নাই। জগন্নাথে বিবেক্ষণের ঐশ্বর্য্যভাব নাই; অথচ শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রজভাবের অনন্তসাধারণ মাধুর্য্য, তাহাও

নাই। এখানে একটা মাঝামাঝি—একটা মিত্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিবেক্ষণ বিবেক্ষণের—অগণ্য কোটি লোকের প্রভু ও নিয়ন্তা। কিন্তু প্রভুর সঙ্গে তাঁর অধীন জন-গণের সম্বন্ধটা সকল সময়ে একান্ত ঘনিষ্ঠ ও নিত্যন্ত ব্যক্তিগত নাও হইতে পারে। ভগবানকে প্রভুরূপে দেখিলেই যে দান্য-ভিমান জন্মে ও দাস্তারসের সঞ্চার হয়, এমনও নহে। এ সংসারে এমন অনেক প্রভু ত দেখিতে পাই, যাহাদের অগণ্য দাসদাসী আছে, কিন্তু ইহাদের কাহারো সঙ্গেই হয় ত তাঁর কোনও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নাই। আর এই যে অস্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ইহাই দাস্তারসের আশ্রয়। বিবেক্ষণের প্রভুত্বও এই জাতীয়। কিন্তু “নাথ” বাহ্যিক বলি, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তিনি আমার আপনার জন, আমিও তাঁর আপনার জন। তিনি আমার সাক্ষাৎ আশ্রয় ও অবলম্বন, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সাধারণ নহে, কিন্তু বিশেষ। আর ‘জগন্নাথে’ এই সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা ও বিশেষত্বই বুঝাইয়া থাকে। প্রভুর পরিচারকদিগের মধ্যে, কেহ বা তাঁর অন্তরঙ্গ ভৃত্য, কেহ বা তাঁহার দূরস্থ ভৃত্য, ঐমন হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। রাজ্যের সকল প্রজার সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ সমান ঘনিষ্ঠ হয় না। ভৃত্য ও পরিচারক-মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকট উচ্চ নীচ ভেদভেদ থাকিতে পারে ও সর্বদাই দেখিতেও পাওয়া যায়। রাজার রাজ্যেও প্রজাবর্গের মধ্যে এরূপ ভেদবিরোধে রাজার সম্মান বা প্রজার সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ তাঁর কোনও ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় না।

জগন্নাথের জগতে এ সকল ভেদ-বিরোধের স্থান হয় না। তিনি সকলের নাথ, তাঁর নিকটে সকলেই সমান, সকলের সঙ্গে তাঁর একই সম্বন্ধ, স্তূত্রাং কেহ আর কাহাকেও হীন বা হেয় ভাবিতে পারে না। খৃষ্টীয় সাধনা ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া, মানবসমাজে যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, হিন্দু ভগবানকে শ্রীজগন্নাথ বলিয়া, এই পুণ্যতীর্থে শ্রীক্ষেত্রে তদণেকা গভীরতর, উন্নত-তর, উদারতর, বিশালতর, সাম্য সাধনের আয়োজন করিয়াছেন।

এইজন্তই শ্রীক্ষেত্রে জাতি-বর্ণের কোনও বিচার নাই। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। আর জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলে মিলিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া একে অণ্ডের হাত ও মুখ হইতে লইয়া অবাধে গ্রহণ করিতে পারে।

জগন্নাথের ভোগের প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন যেখানে বিক্রী হয়, সে স্থানকে “আনন্দবাজার” কহে। এই “আনন্দ-বাজারে” ব্রাহ্মণেরা সকল প্রকারের কুষ্ঠা পরিহার করিয়া, সমাজে বাহাদিগকে নীচ, অস্বাজ্জাতি বলেন, তাহাদের হাত হইতেই এ সকল অন্নব্যঞ্জন কিনিয়া আহার করেন। এ বাজারে জাতিবর্ণের বিচারের গন্ধও নাই। এমন কি, এখানে উচ্ছিষ্ট-বিচার পর্যন্ত নাই। একজন যে হাঁড়ী হইতেই নিজের হাতে বাজনা দি তুলিয়া, তাহা চাকিয়া অবশিষ্ট ভাগ আবার সেই হাঁড়ীতেই ফেলিয়া যাইতেছে, অপরে, ভিন্ন ও উচ্চ বর্ণের লোক হইয়াও, আবার সেই হাঁড়ী হইতেই সেই উচ্ছিষ্ট ভক্ষ্য গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে চাকিয়া দেখিতেছেন। হিন্দুর সমাজে, হিন্দুর সাধনার, হিন্দুর চক্ষে যাহা অকথ্য অনাচার, এই “আনন্দ বাজারে”, তাহাই সদাচার বলিয়া পরিগণিত। এ কেবল জগন্নাথেরই মহিমা!

জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের এই

বাজারকে কে কবে, আনন্দবাজার বলিয়া ডাকিয়াছিল, জানি না। এ স্থানকে আনন্দ-বাজার যে কেন বলা হইয়াছে, ইহা অনুমান করা একান্ত কঠিন কথা নহে। হিন্দুসমাজে যে জাতিবর্ণের ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা যে বস্তুতঃ মানুষের পরস্পরের সঙ্গে সহজ সখ্যের সম্বন্ধের আনন্দের স্বরবিস্তার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে, ইহা অনুভব করিয়া, এখানে এ সকল ভেদাভেদ নাই বলিয়াই যেন, জগন্নাথের কোনও বিশ্বপ্রেমিক ভক্ত শ্রীক্ষেত্রের এই বাজারকে আনন্দবাজার নাম দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ বাজার সহজ মানুষের সহজ প্রেমের বাজার। এ প্রেমের সংস্পর্শলাভ যে করে নাই, তার এ পুণ্যতীর্থে যাইবার অধিকার আছে কি?

এইজন্ত বস্তুতঃ মনে হয়, শ্রীক্ষেত্রে যাইবার অধিকারী সকলে নয়। যে ব্রাহ্মণ আভিজাত্যের অভিমান এখনও প্রাণে প্রাণে পোষণ করিতেছেন, তাঁর শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যে চণ্ডাল আপনার জাতিবর্ণগত হীনতার ভারে পীড়িত ও সেই হীনতাবোধে সর্বদাই যার আত্মাভিमानে আঘাত লাগিয়া থাকে, তারও এখানে যাইবার প্রকৃত অধিকার নাই। ভগবৎ-রূপায়, ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে যার—

সর্বজীব হয়, ব্রহ্মভাবোদয়,
চৈদানন্দ জেগে উঠে

সেই জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার প্রকৃত অধিকারী। সেই শ্রীমন্দিরের এই “আনন্দ-বাজারের” প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া থাকে। আর এইজন্তই সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুসাধকেরা, জীবনের শেষ দশায়, সাধনার চরমাবস্থায়, সর্বপ্রকার ঘন্বাভীত হইয়া, জীবমুক্তিলাভ করিয়া বা লাভ করিবার প্রকালে এই পুরীধামে আসিয়া, হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকে লোকচক্ষে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। ইহাই শ্রীক্ষেত্রের বিশেষত্ব। এখানেই এই পুণ্যতীর্থের প্রকৃত মাহাত্ম্য।

বঙ্গদর্শন



দুর্গোৎসবের স্মৃতি



আমাদের বাড়িতে প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা হইত। ধনীর ঘরের পূজা নয়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীর পূজা। বড় বড় সহরের গাহেব খাওয়ান, বাই নাচান, বাজি-পুড়ান, বিলাস বৈভব-ছড়ান পূজা নয়; গ্রামের সাদা মাটা পূজা। সে পূজায় শৈশবে ও বাল্যে, এবং তার পরেও, প্রথমযৌবনে প্রতিবৎসরই যোগ দিয়া আসিয়াছি। ক্রমে সে যোগ কাটিয়া গেল। আজ আট-ত্রিশ বৎসর দুর্গার সঙ্গে ও দুর্গাপূজার সঙ্গে সকল প্রকারের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘুচিয়াছে।

এই সুদীর্ঘ অনভ্যাসেও দুর্গোৎসবের আনন্দ-স্মৃতিটুকুর এক কণাও এ প্রাণ হইতে মুছিয়া যায় নাই।

আজিও শরৎকালের প্রথম সূর্য্যাকিরণে এমন একটা নিষ্কণ্টক জড়াইয়া থাকে, ষড়-ঋতুর আর কোনও ঋতুতে সূর্য্যালোকের ভিতরে কখনও যার সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাই নাই। পূজার শব্দ-কাঁশর এবং ঢাকঢোলের রোলে প্রাণের ভিতরে সর্বদাই কি যেন একটা ভাব নাচিয়া উঠে, দুনিয়ার কোনও বাজনার কখনও যাহা জাগিয়া উঠে নাই। দুর্গোৎসবের ক'টা দিন যে বছরের আর

সকল দিনের মতন নয়, দীর্ঘজীবনসঞ্চিত যুক্তিবাদের প্রভাবেও এ ভাবটা নষ্ট করিতে পারে নাই।

আমি তো আর দুর্গার কেউ নই! দুর্গাও তো আমার আজ কেউ নন! আপদে বিপদে আর তো দুর্গা! দুর্গা! বলিয়া কাঁদি না। প্রত্যুষে আর তো দুর্গানাম স্মরণ করিয়া শয্যাভ্যাগ করি না। আমার গৃহে আর তো বোধনের ঘটস্থাপনা হয় না। পুরোহিত আগিয়া আর তো শাস্তি-স্বস্ত্যয়নে চণ্ডীপাঠ করেন না। দৈবজ্ঞ আসিয়া তো আর বছর বছর প্রতিমা রচন করেন না। তন্ত্রধারক তো আর “বন্টাস্থা পরশুধাহপি বামতোপি নিবোধতঃ” বলিয়া পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করেন না। “ছিন্দিঃ ছিন্দিঃ পট পট স্বাহা” বলিয়া তো আর ছাগাদি পশুর উৎসর্গ হয় না। “মা!” “মা!”-মুগ্ধরিত প্রাঙ্গণে আর তো বলির বাদ্য বাজিয়া উঠে না। সন্ধ্যায় তো আর আরতির সঙ্গীত ধ্বনিত হয় না। প্রত্যুষে তো আর

“জাগো মা! কুলকুণ্ডলিনী!

শতদল মাঝে শত্ৰু সহিতে

কত আর নিদ্রা যাবে জননী!”

বলিয়া কীৰ্ত্তনীয়গণ আসিয়া তো দুর্গার বন্দনা করেন না। বহু, বহু দিন এ সকল তো বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বহু, বহু দিন তো দুর্গাকে ছাড়িয়াছি। কিন্তু কি স্বদেশে কি বিদেশে, কি বন্ধনে কি মুক্তিতে, দুর্গাপূজার আনন্দস্মৃতিটুকু তো আমায় এক দিনের জন্তও ছাড়ে নাই। এ কি কেবল বাল্য-সংস্কারেরই ফল ?

আরো হাজার রকমের সংস্কারের ভিতরে তো জন্মিয়াছি ও বাড়িয়া উঠিয়াছি ; কিন্তু তার একটাও তো এমন করিয়া আমায় দখল করিয়া বসে নাই। জাতি-বর্ণের, আচার-বিচারের অসংখ্য সংস্কারকে তো অবলীলাক্রমে, ভাঙিয়া চূড়িয়া, ধুণিসাৎ করিয়া, উড়াইয়া দিয়াছি। কেবল এই বড় বড় ক'টা পূজা পার্বণের প্রভাবটাই একেবারে এড়াইতে পারিলাম না কেন ? ইহার কি কোনও নিগূঢ় অর্থ নাই ?

দুর্গাকে যখন ছাড়িলাম, পূজা যখন বন্ধ করিলাম, তখনও পূজার কটা দিন যে বছরের আর সকল দিনের চাইতে বড়, এ ভাবটা তো কিছুতেই কাটাইতে পারিলাম না। সকল দেশটা যখন এক অপূর্ব ভাবের বহ্নায় ভাসিয়া যায় তখন মাথা উঁচু করিয়া শুধু তর্ক-যুক্তির ব্রহ্মডাঙ্গায় যে বসিয়া থাকিতে পারে, পারুক ; আমি কখনও পারি নাই। আর পারি নাই যে এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেও লজ্জিত নই।

দুর্গাপূজা ছাড়িয়াও, সর্বদাই পূজার ক'টা দিন একটু বিশেষভাবে কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কখনও বা বঙ্ক-বান্ধবকে

লইয়া কেবল ষাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছি। কখনও বা ভজন-কীৰ্ত্তনাদি করিয়া শারদীয় উৎসব করিয়াছি। দেশশুদ্ধ লোক যখন এক অপূর্ব অনুপম আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠে, তখন তাদের সঙ্গে মতামতের মিল নাই বলিয়া, এই মহোৎসবের আনন্দশ্রোতের বাহিরে পড়িয়া থাকাকাটা যে একটুকুও আবশ্যক বা সুখকর, এমনটা কখনও ভাবি নাই। আর দেশের লোকের এই “ভূতপরন্তি” ছাড়াইবার জন্তও কখনও একান্ত ব্যস্ত হই নাই।

ইহার একটা কারণ হয় ত এই যে, আমি নিজে দেশপ্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ড বর্জন করিলেও এ সকল পূজা-পার্বণে যে কোনও পাপ হয়, এমনটা কখনও কল্পনা করি নাই। প্রতিমার পূজা হইতেই কেবল বিরত হইয়াছি, জীবনে কখনও ফেরাজি হই নাই। আমার পিতৃপিতামহ সকলে এমন অকপট ভক্তি ও আত্মস্তিক শ্রদ্ধা সহকারে, আজন্মকাল এমন কঠোর তপস্যা করিয়া, কেবল পাপই অর্জন করিয়া গিয়াছেন, এতটা বেয়াদবী ভাব এ দুর্কিনীত প্রাণেও কখন স্থান পায় নাই। আমি এ সকল ছাড়িলাম, আমার ভাল লাগে নাই বলিয়া। আমার শ্রদ্ধা এ সকলে আর রহিল না বলিয়াই, অপরাধ ভাবিয়া, এ সকল পূজা-পার্বণ পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু যাদের ভাল লাগে, যাদের শ্রদ্ধা চটিয়া যায় নাই, যারা এ সকলে আনন্দ, আরাম, শান্তি পাইয়া থাকেন, তাঁদের পক্ষেও এ সকল পাপকর্ম ; এ কথা কখনও ভাবি নাই। ঊনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর প্রচণ্ড

খালোকেও আমাকে এতটা সর্বজ্ঞ করিয়া তুলিতে পারে নাই।

দুর্গা-পূজা ছাড়িয়া আমি নিজে যে কোনও প্রকারের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, এমনও ভাবি না। দুর্গা আমায় যা' দিতে পারিতেন, তা' বাল্যেই দেওয়া হইয়াছে। দুর্গোৎসবে আমার যতটুকু বিকাশ ও কল্যাণ করিতে পারিত; সে টুকু শৈশবেই পাইয়াছি। দুর্গাকে যখন, ভগবৎরূপায়, আমি ছাড়াইয়া উঠিলাম, তখন দুর্গাও আমায় ছাড়িলেন। এ ছাড়াছাড়িতে দুর্গারও অবমাননা আর আমারও কোনও অকল্যাণ হয় নাই। কিন্তু দুর্গোৎসবের সঙ্গে সকল প্রকারের সম্পর্কশূন্য হইয়া আমার সম্মান-সম্মতির। যে একেবাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

শৈশবে যখন দুর্গাপূজায় যোগদান করিতাম, তখন দুর্গা যে কে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতাম, এমন কথা বলি না। আজও দুর্গা যে কে, ইহা বুঝিয়াছি, এমন স্পর্ধা করি না। দুর্গা যে আছেন, তার কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ কখনও পাই নাই। দুর্গা যে নাই, তারও কোনও অকাটা যুক্তিও কোন দিন দেখাইতে পারি নাই। হিন্দুর দেবদেবীগণ সাধক-কল্পনা-প্রসূত রূপক না সমাধিলভ্য সত্য বস্তু, জানি না। তবে দেবদেবী থাকিলেই যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নষ্ট হয়, বা দেবদেবীতে বিশ্বাস করিলেই বহু-ঈশ্বরবাদ স্বীকার করা হয়, এমন অভূত অযৌক্তিক কথা মানি না। এ সংসারে অগণ্যকেটি জীব

রহিয়াছে, কেহ বা বিবর্তনসোপানের স্মিত-তর, কেহ বা উচ্চতর স্তরে রহিয়াছে। কিন্তু এ সকল আছে বলিয়া ঈশ্বরের একত্ব তো নষ্ট হয় না। তবে মানুষের উপরে, মানুষের চাইতে স্মৃতিতর বলিয়া মানব-ইন্দ্রিয়ের অতীত, কোনও শ্রেষ্ঠতর জীব যদি থাকে, তাহা হইলেই ঈশ্বরের অনন্ত-প্রতিদন্দ্বী দাঁশিহ বা অখণ্ড একতা নষ্ট হইবে কেন?—কোনও যুক্তিতর্কের দ্বারা এ তত্ত্বের নাগাল কখনও পাই নাই। দুর্গা প্রভৃতি দেবতা যে সত্য সত্যই আছেন, ইহা জানি না। এঁরা যে বাস্তবিকই নাই এমন কথাও বলিতে পারি না। শৈশবে এঁরা আছেন, বিশ্বাস করিতাম, আর তখন আমার ধর্মজীবনের পক্ষে এ বিশ্বাসই যথেষ্ট ছিল।

“ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ” অতি শৈশবে যে এ উপদেশ পাই নাই, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা মনে করি। “ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ” ইহা ধর্মের মাঝখানের কথা, আদির কথাও নয়, শেষের কথাও নয়। ধর্ম-বিবর্তনের ইতিহাসে সর্বত্রই আদিতে ঈশ্বরতত্ত্ব সাকার, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য থাকে, বেদ বাইবেল, এ সকল প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ তার সাক্ষী। বেদের প্রাচীনতম ঈশ্বর-তত্ত্ব সাকার, নিরাকার নহে। অগ্নি, বরুণ, মরুৎ, ইন্দ্র, প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণ চাক্ষুষ বস্তু। এই প্রাকৃত অগ্নি, এই প্রত্যক্ষ আকাশ, এই বায়ু, এই বজ্রধারী মেঘ, ইহঁরাই বেদের আদিতম দেবতা। ইহঁরা কেহই “নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ” নহেন। পুরাতন বাইবেলের

জিহোভা বা এল এলোহিম (The Lord Almighty)ও ঠিক নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ নহেন। আদি মানব আদম গাছের আড়ালে লুকাইয়া ছিল বলিয়া তিনি তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়াছিলেন। তিনি এব্রাহেমের সম্মুখে আসিয়া তাহার সঙ্গে সর্দবদ্ধ হইয়াছিলেন। জেকবের সঙ্গে আঁধার ঘরে তিনি সারারাত কুস্তি করিয়াছিলেন। জগতের সকল ধর্মের আদিম বিবরণ হইতে মানুষ যে কোথাও প্রথমে নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব ধরিতে পারে নাই—সর্বত্রই যে আদিম ঈশ্বরতত্ত্ব সাকার ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ ছিল, ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। আর প্রত্যেক মানব-শিশুতে সমগ্র মানব-জাতির বিবর্তনক্রমটি পুনরাবর্তিত হয় বলিয়া, আমাদের শৈশবের ঈশ্বরতত্ত্বও কখনওই “নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ” হয় না। নিতান্ত শিশুদিগকে এ দুরূহ তত্ত্ব শিখাইবার চেষ্টা করিলে, তাহাতে কখনওই কোন সফল ফলে বলিয়াও বোধ হয় ন।

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ এ কথা তো জন্মাবধিই আমার সন্তানসন্ততির গুনিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বস্তুটি যে কি, ইহা একজনেও কখনও ধরিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহার বিপরীত প্রমাণই মাঝে মাঝে পাইয়াছি। একদিন আমার একটি অপগণ্ড বালিকা দৃক্যাকালে একান্তে বসিয়া আপনার মনে বলিতেছিল “হে জগদীশ্বর, তুমি আমায় ভাল কর! আমাকে হাতে পায়ে ধরিয়া তোমার কাছে লইয়া যাও।” শিশুরা সকল বিষয়ই

অমুকরণ করিয়া শিক্ষা করে, এ অদ্ভুত উপাসনাও এই বালিকা অমুকরণ করিয়া শিখিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে, তার “উপাসনা” শেষ হইলে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“তুই যে এই জগদীশ্বর বলে, প্রার্থনা কল্লি, জগদীশ্বর কে জানিস?” সে জোর করিয়া বলিল—“জানি বৈ কি?” “তিনি কে, কোথায় থাকেন? তা বল তো?” বাণিকা উত্তর করিল, “তাকে আমি চিনি, তিনি ভবানীপুরে থাকেন।” বালিকার উত্তর শুনিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম, কিন্তু সে কাহাকে যে নির্দেশ করিয়া এ অদ্ভুত ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিল, বুঝিলাম না। বুঝিলাম কেবল যে আমাদের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও এই শিশুর বুদ্ধি ঈশ্বরকে কিছুতেই “শুদ্ধ নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ” বলিয়া ধরিতে পারে নাই। ইহার কিছুদিন পরে, তাহাকে লইয়া ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিলাম। পথে সে জাহাজে উঠিয়া, হঠাৎ দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—“বাবা, জগদীশ্বর এই জাহাজে আছেন। সত্যি বলছি, আমি তাঁকে দেখেছি।” কথাটার মর্ম কিছুই তখন বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু দুপ্রহরের সময় আহার করিতে যাইয়া দেখি, সেখানে বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। তখন জানিলাম আমার কোমলমতি বালিকা কাহাকে আমাদের সকলের উপাশ্রয় জগদীশ্বর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। সে দিন হইতেই বুঝিলাম ছোট ছোট শিশুদিগকে নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টাটা কত উদ্ভট ও অযৌক্তিক।

আর এই জন্মই, অতি শৈশবে এই নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বর-তত্ত্ব কেহ শিক্ষা দেয় নাই বলিয়া, নিজে কে আজ পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। আর অকালে, অপকবয়সে, অধিকার লাভ করিবার পূর্বে, আমার সম্মানসম্মতির। এই শ্রেষ্ঠ তর তত্ত্বের মৌখিক উপদেশ শুনিতেছে বলিয়া বাস্তবিকই অনেক সময় তাহাদিগকে একান্ত হতভাগ্য বলিয়াও যে ভাবি না, তাহা নয়। শৈশবে কালীদুর্গার পূজায় যোগ দিতাম বলিয়া, আপনাকে এক রত্তিও ক্ষতিগ্রস্ত মনে করি না। কালী দুর্গা প্রভৃতি সত্য বা মিথ্যা, বস্তু বা কল্পনা যাই হউন না কেন, তাহাতে আমার শৈশবের ধর্মজীবনের কোনওই হানি হয় নাই; মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করি। কালীদুর্গার পূজা পরিত্যাগ করিয়াও এই সত্য কথাটা কখনওই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হই নাই।

ফলতঃ মানবজাতির ধর্ম-বিবর্তনের ইতিহাসের আদিতে কোথাও আজি পণ্যান্ত এই নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাই নাই। কেহ যে কোথাও পাইয়াছেন, এমন কথাও শুনি নাই। পণ্ডিতেরা কেহ বা প্রেত-পূজায় আর কেহ বা প্রকৃতি-পূজায়, এ দু'এর কোনও একটির মধ্যে মানবীয় ধর্মের আদি বাজ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু কেহই নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বর-তত্ত্ব ধর্মের মূল প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। মানবসমাজের ধর্মের আদিতে যাহা পাওয়া যায় না, মানব-শিশুর ধর্মজীবনের প্রথমে একেবারে তাহাকে ফুটাইয়া তুলি কখনওই সম্ভব

নহে। মানবীয় ধর্মের উৎপত্তি-স্থানে, আমরা ইতিহাসের সাপেক্ষে, কেবলমাত্র দুইটা বস্তু দেখিতে পাই—এক অতি প্রাকৃতিকের অন্তর্ভুক্তি, অপর একটা পবিত্রতার ভাব। এই অতি-প্রাকৃতিকের অন্তর্ভুক্তিকে ইংরাজিতে Sense of the Supernatural বলা হয়। আর এই পবিত্রতার ভাবকে Idea of Holiness বলা হয়। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, দেবদেবীতে বিশ্বাস, এ সকলই অতি প্রাকৃতিকের অন্তর্ভুক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ অপ্রাপীতে প্রাণধর্ম আরোপ করিয়া, অপ্রত্যক্ষ উপায়ে ইহারা যে অভূতভাবে আপনাদের শক্তি-সাধ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন, এরূপ বিশ্বাস করাই, অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাস করা বলা যায়। শৈশবে কালীদুর্গা প্রভৃতি দেবতায় আমাদের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা ঠিক এই জাতীয়। এ বিশ্বাস তর্কযুক্তির দ্বারা শোধিত বা সমর্থিত হয় নাই। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা সুসংস্কৃত হইয়া উঠে নাই। কালীদুর্গা প্রভৃতিকে প্রভুতশক্তিমানী, অতিনানুঘিক-ক্রিয়াক্ষম অথচ মাগুণেরই মতন সমধর্ম্যাপন্ন বলিয়া মনে করিতাম। রোগ হইতে তাঁরা ভাল করিতে পারেন, কি করিয়া যে করেন তাহা জানিতাম না ও বুঝিতাম না, কিন্তু ইচ্ছা করিলে ভাল করিতে পারেন, ইহা বিশ্বাস করিতাম। সুতরাং পিতা মাতা প্রভৃতি ভালবাসার জন গাঁহার, তাঁদের অনুরোধে বিস্মৃতে, করযোড়ে, কাতরকণ্ঠে, অশ্রু-পূর্ণনয়নে এই সকল দেবদেবীর প্রসাদাভিক্ষা করিতাম ও তাঁহাদের নিকটে নানা প্রকারে “মানত” করিতাম। এইরূপে এহ

সকল দেবদেবীকে আশ্রয় করিয়াই শৈশবে আমার অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের যথেষ্ট অনুশীলন হইয়াছিল। ইহা অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। কারণ সে বয়সে, নিরাকার-চৈতন্যস্বরূপ-ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করিবার শক্তি তো ছিল না। সেরূপ উপদেশ পাইলে, হয় সেই নিরাকারতত্ত্বকেই শৈশবের সহজ বুদ্ধি কোনও না কোনও রূপে একটা সাকার বস্তু করিয়া তুলিত, আর না হয়, অদৃশ্যে ভাবনা সম্ভবে না বলিয়া, সে ঈশ্বরতত্ত্বকে একেবারেই শূন্যে উড়াইয়া দিয়া পরজীবনের নাস্তিক্য-বুদ্ধির ভিত্তিটাকে গড়িয়া তুলিত। কিন্তু শৈশব-স্বভাবমূলভ সহজ কল্পনার সাহায্যে অতি প্রাকৃতে বিশ্বাসের যথাযোগ্য অনুশীলনের কোনওই সুচারু ব্যবস্থা করিতে পারিত না।

খৃষ্টিয়ান ধর্মে বা মুসলমান ধর্মে আমাদের হিন্দুধর্মের মতন দেবদেবীর স্থান নাই বলিয়া, সেখানে নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বের উপরেই শিশুদিগের ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মজীবন গড়িয়া উঠে;—হঠাৎ এমন কল্পনাও করা যায় না। কারণ, খৃষ্টিয় ঈশ্বরতত্ত্ব যতই নিরাকার হউক না কেন, যিগুখুষ্ট যে নিতান্ত “নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ” নহেন, ইহা সকলেই জানেন। আর যিগুর ছব, যিগুর মূর্তি, ধূপদোপাদি দ্বারা যিগু ও তাঁহার মাতা মেরীর আরতি—রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায় মধ্যে সর্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। স্মৃতরাং রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টিয়ানমণ্ডলীর, যিগুবাদের সঙ্গে হিন্দুর দেববাদের বড় বেশী পার্থক্য নাই।

আর প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায় মূর্তি রচনা করিয়া যিগুর পূজা করেন না বটে; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মবিদ্যালয়েই (ইংরেজিতে এগুলিকে Sunday School বলে) যিগুর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও ঘটনার বহুবিধ চিত্রপট সাজান থাকে। আর এগুলিকে আশ্রয় করিয়াই, প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টিয়ানসমাজের শিশুদিগের অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের যথেষ্ট অনুশীলন হইয়া থাকে। তা' ছাড়া খৃষ্টিয়ান ধর্মোপদেষ্টাগণ যুখে যুখে ঈশ্বর ও শয়তান সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাকে আশ্রয় করিয়াও, খৃষ্টিয়ান শিশুগণ অতি সহজেই আপনাদের শৈশব-স্বভাব-মূলভ সহজ কল্পনার সাহায্যে একপ্রকারের দেববাদ গড়িয়া তুলিতে পারে ও সর্বত্রই প্রায় গড়িয়া তুলে। মুসলমানেরা প্রায়ই কোনও মূর্তি রচনা বা ঈশ্বরের কোনও প্রকারের শারীর ধর্ম কল্পনাও করিতে চান না সত্য। কিন্তু এখানেও পীর, পয়গম্বর, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়া, শৈশবের ধর্মের একটা প্রত্যক্ষ আশ্রয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এগুলিকে অবলম্বন করিয়াই মুসলমান শিশুগণ সর্ব-ধর্ম-মূল যে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস তাহার কতকটা অনুশীলন করিয়া থাকে। অতএব একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে “নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ” ঈশ্বরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া, জগতের কোথাও মানুষের শৈশব-ধর্ম গড়িয়া উঠে না। এরূপ চেষ্টাতে কেবল বিপরীত ফলই উৎপন্ন হয়।

এই জন্তই অতি শৈশবে যে এই

নিরাকার-তত্ত্বের উপদেশ পাই নাই, কিন্তু কালী দুর্গা লক্ষ্মী স্বরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীগণের আশ্রয়েই সে কোমল বয়সের সরল ও সহজ ধর্মজীবন বাড়িয়া ও গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথাই মনে করি। ফলতঃ শৈশবের ধর্মজীবনকে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের মতন এমন সুন্দর ও সমাচিন ব্যবস্থা আর কোনও ধর্মে আছে কি না সন্দেহ। আর হিন্দুধর্মের বলযুখীনতাই ইহার প্রধান কারণ।

জগতের অপরাপর ধর্ম মানুষের প্রকৃতির এক একটা বিশেষ অঙ্গকেই বিশেষভাবে অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তার সকল দিককে একান্তভাবে জুড়িয়া বসিতে চাহিয়াছে কি না জানি না। খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি ধর্ম একদিকে মানুষের মনকে, তার মত ও বিশ্বাস, ভাব ও সিদ্ধান্তকে অধিকার করিতে চাহে; অঙ্গদিকে, তাহার বাহিরের সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধ ও সেই সকল সম্বন্ধের কর্তব্যাকর্তব্যগুলিকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা করে। মুসলমান ধর্মেও অমুরূপ প্রয়াসই দেখিতে পাই। এ সকল ধর্ম, মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তি, ভোগ ও বৈরাগ্য, আচার ও ব্যবহার অন্তর-বাহিরের সকল বিষয়কে পরিতৃপ্ত ও পরিপূর্ণ করিবার বিচিত্র চেষ্টা করে না। এ সকল ধর্ম সংসার ও পরমার্থের মধ্যে একটা আত্মস্তিক ভেদ-বিরোধের সৃষ্টি করিয়া মানুষের কতকগুলি প্রবৃত্তিকে ধর্মের বহিরে ফেলিয়া রাখে। আর অপর কতকগুলি রুচি ও প্রবৃত্তিকে ধর্মের

অধিকারে আনিয়া, তাহাদিগকে বিবিধ ভাবে বাধিয়া ছাঁদিয়া রাখিতে চাহে। খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ ধর্মে এই জ্ঞাতাওয়া-দাওয়া, নাচগান, আমোদ-প্রমোদ, এ সকলের সঙ্গে ধর্মের কোনও সাক্ষাৎ ও আত্মস্তিক যোগাযোগ নাই। এ সকল সম্বন্ধে কতকগুলি মোটা মোটি বিধি-নিষেধ আছে মাত্র; কিন্তু এ সকলের ভিতর দিয়াই যে ধর্মকে সাধন করিতে হয়, এ সকল যে ধর্মকর্মের অঙ্গ, এমন ভাবটা খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ ধর্মে নাই। হিন্দুর ধর্মে এই ভাবটা খুবই কুটিয়াছে। আর হিন্দুর দেববাদই ইহার মূল কারণ। এই সকল দেবদেবীর পূজা-অর্চনায়, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ মানুষের সম্বন্ধনার যে সকল আয়োজন করিতে হয়, সেইরূপ আয়োজন না করিলে, পূজা পূর্ণাঙ্গ হয় না। সূত্রাৎ এ সকল ক্রিয়া-কর্মে এমন একটা সহজ, শোভন, স্বাভাবিক মানুষী ভাব আছে, যাহা খৃষ্টীয়ানী বা মুসলমানী ভজন-সাধনে পাওয়া যায় না। এই মানুষী ভাবটীর জন্মই হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ড জ্ঞানবুদ্ধির ও বয়োবুদ্ধির চক্ষে যতই কেন অকিঞ্চিৎকর ও বালকত্বচক হউক না, শিশুদিগের পক্ষে অতিশয় উপযোগী হইয়া থাকে।

দুর্গা কে, জানিতাম না। তিনি কৈলাস হইতে বৎসরে একবার করিয়া পৃথিবীতে আসেন, গুনিয়াছিলাম; কিন্তু কৈলাস যে কোথায়, তাহাও জানিতাম না। কিন্তু এ সকল অজ্ঞতা বা অজানতা আমার শৈশবের দুর্গাপূজার কোনওই বাধা উৎপাদন করিত না। চক্ষুর উপরে, কাঠ খড় মাটি দিয়া দুর্গার কাঠাম নির্মিত হইত,

দেখিতাম। কিন্তু এই হাতে গড়া কাট খড়ের মূর্তিটাই যখন সুসজ্জিত হইয়া, মহাসপ্তমীর প্রত্যাষে ধূপ দীপ নৈবিদ্যাদির দ্বারা অর্চিত হইত, তখন যে তাহা অচেতন পুতলিকা মাত্র, এমন ভাবটা মনে স্থান পাইত না।

সন্ধ্যাকালে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বড় বড় ধুনচী হাতে লইয়া, আমরা বালকের দল যখন দেবী-প্রতিমাকে ধূপ-ধুমে ছাইয়া ফেলিতাম, তখন সেই দীপালোক-সমুজ্জ্বল ধূপগন্ধমোদিত, কাঁশরঘণ্টা-প্রভৃতির-আরতিক-বাচ-মুখরিত চণ্ডীমণ্ডপের মাঝখানে সেই দেবীপ্রতিমা যেন ভক্তের বন্দনায় তুষ্ট হইয়া হাসিতে-ছেন, এমনই বোধ হইত। আর মহা-নবমীর রাত্রিশেষে যখন আবার ধূপদীপ জ্বলাইয়া দিতাম, তখন সেই প্রসন্ন মুখই যেন আসন্ন বিরহ ভাবিয়া ক্রমে বিষন্ন হইয়া যাইতেছে, এমনটাই অনুভব করিতাম। বিজয়ার দিনে প্রতিমা বিসর্জন, করিয়া যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম, তখন আর চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিতে সাহস হইত না। এমনও কখনও ঘটিয়াছে যে বিজয়ার পরের দিন প্রাতঃকালে চণ্ডী-মণ্ডপের দ্বারে আসিয়া, দেবীশূন্য দেবতার ঘর দেখিয়া চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারি নাই। এ সকলই কেবল কল্পনার খেলা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্মজীবনে বিশেষ ধর্মের ভাবাঙ্গ-সাধনে, আমাদের পরিণত বয়সের জ্ঞানদৃষ্ট সাধন-ভঞ্জেই সত্যের প্রতিষ্ঠা কতটা আর কল্পনার প্রভাবই বা কতটা, কে বলিতে পারে? কল্পনাই ধর্মের প্রাণ। আর যে কল্পনাকে

আশ্রয় করিয়া এই দুর্গোৎসবের আনন্দ-টুকু জাগিয়া উঠিত, শৈশবের ধর্মজীবন গঠনে, তাহা যে কতটা সাহায্য করিয়াছে, তার পরিমাণ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না :

ফলতঃ দুর্গোৎসব আমার শিশুজীবনের সকল দিকটা এমনভাবে জড়াইয়া থাকিত, যে, বলিতে কি, পরিণত বয়সের সুসংস্কৃত ব্রহ্মোৎসবও তেমন করিয়া আমাকে কখনও আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে নাই। ব্রহ্মোৎসবে যে আনন্দ পাইয়া থাকি, তাহা মানসিক ; ভিতরকার বস্তু। অন্তরের আদর্শের প্রকাশে তার উৎপত্তি। এ আনন্দ নিরাকার ; মানসকল্পনাকে আশ্রয় করিয়া ইহার স্মৃতি হইয়া থাকে। সুমধুর সঙ্গীত, সুললিত বাক্যযোজনা, চিত্তহারিণী কবিকল্পনার সঙ্গে, এষ্ট আধটু ভক্তিরস মিশ্রিত হইয়া, এই উৎসবানন্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কলাসাহিত্যের অনুরূপলনে মানুষ যে গভীর আনন্দ উপভোগ করে, ইহা কিয়ৎ পরিমাণে সেই জাতীয়। কচিং কোনও সাধুভক্ত জনে ইহা আরও গভীরতা লাভ করে বটে, তখন স্বৈদম্পপুলকাশ প্রভৃতি ভাবের লক্ষণ তাহাদের মধ্যে ফুটিয়াও উঠে। কিন্তু সাধারণ উপাসক ও শ্রোতাগণ ব্রহ্মোৎসবের যে আনন্দ সম্ভোগ করেন, তাহা কেবল সাহিত্যরস হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য সঙ্ঘজাগরণই সর্বদা এই উৎসবের আনন্দকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন; সাধকের আধ আধ কথায় এ ফোয়ারা ছুটিয়া উঠে না। কিন্তু শৈশবে দুর্গোৎসবে যে আনন্দ পাইতাম

তাগ কেবল মানসিক বস্তু ছিল না। শরীর, মন প্রাণ, ক্ষুদ্রজীবনের সকল অঙ্গকে পূর্ণ করিয়াই তাহা ফুটিয়া উঠিত; আর সেই জন্তই বুঝি সে পুরাতন আনন্দের স্মৃতির এককণাও ভাঙ্গ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই।

আমার বালকবালিকারা আজ ব্রহ্মোৎসবের সময় ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণ-ভূমিকে কোলাহল পূর্ণ করিয়া, উপাসকগণের উপাসনার কেবল ব্যাঘাতই উৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু সে উৎসবে কোনও প্রকারেই সাক্ষাৎভাবে সামিল হইতে পারে না। একটু বড় হইলে, কেহ কেহ বা মন্দির সাজাতে যায় বটে; কিন্তু মার্কেট হইতে ফুলপাতা কিনিয়া আনিয়া মন্দির সাজান আর দেবতার পূজার জন্ত পুষ্প আহরণ করা এক কথা নহে। একে আমাদের ললিতকলার অনুশীলন হয় মাত্র! কিন্তু ভক্তি বা শ্রদ্ধার বা মাস্তিক্যভাবের অনুশীলন হয় না। সাজাবার জন্ত যে ফুল বা পাতা সংগ্রহীত হয়, তাহাকে পারে দাখিলেও প্রাণে লাগে না। সে পাতা ও ফুল ছুইতে ও ধরিতে কোনও সংঘম ও সঙ্কোচের ভাব প্রাণে জাগে না। তাহার সঙ্গে অন্তরের শ্রদ্ধা মাথিয়া থাকে না। শৈশবে যখন পূজার দিনে নিশা যোগে উঠিয়া, হাত পা ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, শুদ্ধ হইয়া, বাগানে বাগানে ফুল তুলিতে যাইতাম, তখন প্রাণের ভিতরে যে আনন্দ, যে শক্তি, যে শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিত, সে ভাবটা জীবনে আর কখনও পাইলাম না তো। আমরা বুট পায়ে দিয়া পাল্টলুন কোট পরিয়া, চেয়ার বেঞ্চে বসিয়া, দেবতার

পূজা করি। শুচি বা অশুচি, স্নাত বা অস্নাত, এ সকল বিচারের সঙ্গে আমাদের ধর্ম্যকর্মের কোনও সম্পর্ক নাই, স্মরণ্য শৈশবের সে সশক্ত, সে সনন্দ, সে সশ্রদ্ধ, সে কি জানি অপরাধ হইতেছে, ভাব, এখন আর নাই। কিন্তু সে ভাবটা একদিন ছিল বলিয়া আজো যা একটু গাধটু ধম্ম যে প্রাণে আছে, ইহা সর্বদাই অনুভব করিয়া থাকি। ফুল তুলিয়া, বেলপাতা ধুইয়া, ধূপধুনো জ্বালাইয়া শৈশবে আমিও দুর্গাপূজায় সামিল হইতাম। স্মরণ্য সে পূজা কেবল পুণোহিতের পূজা ছিল না। আমার নিদ্রেরও তার সঙ্গে যোগ ছিল। ব্রহ্মোৎসবে তো আমার সন্তানসন্ততিদের এমন কোনও যোগ থাকে না। তাদের তো কথাই না, এ উৎসবে আমরা সকলেই শ্রোতাও দ্রষ্টা মাত্র, কর্ম্মকর্তা কেবল একজন, বেদিতে বসিয়া আপনার মনোমত স্তবস্তুতি করিয়া থাকেন, সেই আচার্য্য। দুর্গোৎসবে যেমন তত্ত্বধারক মন্ত্র-উচ্চারণ করিতেন, ব্রহ্মোৎসবেও আচার্য্য সেইরূপই মন্ত্র উচ্চারণ করেন, উপাসকমণ্ডলী তাহা শুনিয়া, যথাসাধ্য তাঁর অনুরূপ ভাব আপনার প্রাণে জাগাইতে চেষ্টা করেন মাত্র। কখনও বা এ চেষ্টা সফল হয়। কখনও বা হয় না। কিন্তু দুর্গোৎসবের কেবল মন্ত্র-উচ্চারণই এক মাত্র কর্ম্ম নয়। কেহ বা ধূপদীপ জ্বালাইয়া দেয়, কেহ বা ফুল তুলিয়া আনে, কেহ বা বেলপাতা ধুইয়া দেয়, কেহ বা বলির আয়োজন করে, কেহ বা ভোগের জোঁগাড় করে

বহুমান্ত্রাপদ বা অতিশয় প্রীতিভাজন অতিথি-অভ্যাগত বাড়ীতে আগিলে, বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যেমন তাঁর সেবার আয়োজনে নিযুক্ত হয়; হিন্দুর দুর্গোৎসব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পর্বাহে, বড় বড় পূজার সময়, যজ্ঞমানের বাড়ীর ও আশ্রয়কুটুম্বদিগের সকল লোকে সেইরূপ কোনও না কোনও বিষয়ে, দেবতার অর্চনার আয়োজন করিয়া থাকেন। আর এই যে সকলে মিলিয়া পূজার ব্যবস্থা করিতে হয়, ইহাতে পূজার ফলাফলের ভাগীও সকলেই হইয়া থাকে। এই পূজার ভিতর দিয়া যতটা ধর্ম্মাহুশীলন হইতে পারে, তাহা স্বল্পবিস্তর পরিমাণে, সকলেই লাভ করিয়া থাকেন।

তার পর দুর্গোৎসবের আর একটি অতি বড় দিক্ আছে—সেটা সামাজিক লোক-লৌকিকতার দিক্! আধুনিক সভ্যতার চাপে এদিক্টা ক্রমে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু আমি যে দুর্গা-পূজার কথা সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানি, তাহাতে এদিক্টা খুবই ফুটিয়াছিল। একদিকে প্রাতঃকালে দেবতার পূজার যেমন ঘটী; অতৃদিকে অপরাহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর পর্য্যন্ত সেইরূপ লোকজনকে খাওয়ানোর ভিড়। আর সে কি খাওয়ান! পূজার আয়োজনে যেমন শ্রদ্ধা, বিনয়, ভক্তি জাগিয়া থাকিত, অতিথি-অভ্যাগতের অভ্যর্থনাতেও

তেমনি ছিল। সেখানেও গৃহস্থায়ী গণপন্থ হইয়া, আমন্ত্রিতদিগের সম্মুখে নয়পদে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এ ক্ষেত্রে জাত-বর্ণের বিচার ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির অতিথিরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, আপন আপন পংক্তিতে ভোজন করিতেন বটে; কিন্তু গৃহকর্ত্তা ও তাঁর প্রতিনিধিগণ সকলেরই নিকট সমভাবে গললগ্নীকৃতবস্ত্রে দাঁড়াইয়া সকলের সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। বরং যারা গরিব, যারা নীচ জাতের, যারা ভিন্ন ধর্ম্মের, তাঁদের নিকটে এই বিনয় সৌজন্য যেন বেশি করিয়াই ফুটিয়া উঠিত। ইহাও পূজার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। একটু বড় হইলে, পূজার আমন্ত্রিত-দিগের পরিচর্য্যার ভার আমার উপরেই অনেকটা আসিয়া পড়ে। আর এইরূপ লোকলৌকিকতার যে উন্নত উদার শিক্ষা দুর্গোৎসবের সময় পাইতাম, পরজীবনে আর কোথাও তাহা পাই নাই।

এইরূপে দুর্গাপূজা শৈশবে ও বাল্যে আমার ক্ষুদ্র জীবনের এতটা স্থান এমনভাবে অধিকার করিয়া বসিত বলিয়া, আজও পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব ও পুণ্যস্মৃতি এ প্রাণ হইতে বিন্দু পরিমাণেও মুছিয়া যায় নাই। তাই আজও পূজার বাদ্যে প্রাণের ভিতরের শত প্রাচীন তন্ত্রী ধ্বনিত হইয়া উঠে এবং দুর্গাকে মানি আর না মানি, তাঁর এই পূজার আনন্দস্রোতের বাহিরে থাকিতে বাণ্ডবিকই প্রাণে ক্লেশ পাইয়া থাকি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

নিমাই-চরিত্র

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও শৈশব

১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা, সন্ধ্যাকাল, চন্দ্র রাহগ্রস্ত। নবদ্বীপের বাবতীর নরনারী হরিধ্বনি করিতে করিতে ভাগীরথীতীরে সমাগত। এমন সময়ে জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবী এক অপূর্ণ কুমার প্রসব করিলেন। হরিধ্বনির মধ্যে এই বালকের জন্ম, হরিনাম-কীৰ্ত্তনে তাঁহার জীবন অতিবাহিত এবং হরির বিরহ-শাকে তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছিল।

মাতামহ নীলাধর চক্রবর্তী বালকের শরীরে মহারাজলক্ষণসমূহ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। গোড়ে বিপ্র রাজা হইবে এমন প্রবাদ ছিল। চক্রবর্তী ভাবিতে লাগিলেন এই বালকদ্বারাই কি সেই প্রবাদ সফল হইবে? যথাবিধি বালকের জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত হইল। জন্ম-পত্রিকাকার বলিলেন “এই বালক সাক্ষাৎ নারায়ণ। ইনি ধর্মসংস্থাপন ও ধর্মপ্রচারের দ্বারা জগতের উদ্ধারসাধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিষ্ণুদ্রোহী যবন পর্য্যন্ত এষ্ট শিশুর চরণ ভজনা করিবে।”

পুত্রের ভাগ্যফল শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী আনন্দে বিহ্বল হইলেন। যদঙ্গ, সানাই, বংশী প্রভৃতির বাদ্যের সহিত বালকের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। পুর-স্বীগণ নবকুমারকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর চঞ্চলতা পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। চারিমাস বয়সে শিশু গৃহস্থিত দ্রব্যজাত ছড়াইয়া ফেলিত এবং গৃহদ্বারে জননীর পদশব্দ শুনিবামাত্র বিছানায় যাইয়া সুশীল বালকের মত শয়ন করিয়া থাকিত। গৃহস্থিত দ্রব্যাদি কে স্থানচ্যুত করিল, তাহা লইয়া তখন জনকজননীর মধ্যে গভীর গবেষণা আরম্ভ হইত। শিশু যখন ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিত, তখন কিছুতেই তাহাকে শাস্ত করা যাইত না। অবশেষে ক্রন্দন নিবারণের এক অসাধারণ উপায় আবিষ্কৃত হইল। দেখা গেল বিষম ক্রন্দনের মধ্যেও হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলেই শিশু শান্তভাবে ধারণ করিত। তদবধি শিশু ক্রন্দন আরম্ভ করিলেই গকলে হরিধ্বনি করিতেন।

ষষ্ঠমাসে যথাবিধি নামকরণ-সংস্কার অনুষ্ঠিত হইল। মিশ্র-দম্পতীর অনেক পুত্রকন্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া পুরন্দীগণ শিশুর নিমাই নাম রাখিলেন। শিশুর জন্মের পরে দেশব্যাপী হর্ভিক্ষ প্রশমিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহার নাম রাখিলেন “বিশ্বস্তর।” সম্মুখে স্থাপিত ধাত্য, শ্রীমদ্ভাগবত, গড়ি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পুস্তক গ্রহণ করিয়া শিশু ভাবী জীবনের ইচ্ছিত দান করিয়াছিলেন।

জামু-গতি শিখিবার পর একদিন এক

সর্প দেখিতে পাইয়া শিশু তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। শিশুর স্পর্শে সর্প কুণ্ডলী করিয়া পড়িয়া রহিল—শিশু তাহার উপর শুইয়া থাকিল। দূর হইতে দেখিতে পাইয়া পিতা-মাতা দৌড়িয়া আসিলেন। সর্প পলাইয়া গেল।

ক্রমে নিমাই হাঁটিয়া বেড়াইতে শিখিলেন সুগোল-মস্তক, চাঁচর-কেশ, কমললোচন, আজ্ঞানুলম্বিত-বাহু, অরুণাধর, পরিসরবক্ষ, গৌরকান্তি শিশু যখন হেলিয়া ছলিয়া বেড়াইত, তখন তাহার কন্দর্পবিনন্দী রূপ দেখিয়া সকলে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া থাকিত এবং নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য দিয়া তাহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিত। জ্রীলোকগণ নিমাইকে দেখিলেই হরিধ্বনি করিত—নিমাই তখন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিতেন। হরিনাম শুনিয়া নিমাই ঐত সন্তুষ্ট হইতেন যে প্রাপ্য মিষ্টান্নাদি তিনি এই সমস্ত জ্রীলোকদিগকে আনিয়া দিতেন।

কিন্তু বালকের হ্রস্বপনা ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল। অনেক সময় তাহার দৌরাণ্ড্য মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিত। অন্য শিশু দেখিলেই, নিমাই তাহাকে নানা রূপে উত্যক্ত করিতেন এবং সে কাঁদিয়া না উঠা পর্য্যন্ত নিরস্ত হইতেন না। কখনও প্রতিবেশী-গৃহে অলঙ্কিতে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ ভোগ্য দ্রব্য সমস্ত খাইয়া আসিতেন, আবার যাহার গৃহে খাবার কিছু মিলিত না, তাহার হাঁড়ী কুড়ী সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, যদি কখনও ধরা পড়িতেন তখন পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতেন। কিন্তু সমস্ত অত্যাচার প্রতিবেশিগণ নীরবে সহ্য করিত।

একদিন এক তৈরিক ব্রাহ্মণ ভীর্ষ পর্য্যটন করিতে করিতে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে উপনীত হইলেন। মিশ্রের পরম সমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিয়া তাহার রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। বালগোপাল মস্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ রন্ধন সমাপনান্তে যেমন ইষ্টদেবতাকে অন্ন নিবেদন করিবার জন্ত উপবেশন করিয়াছেন, অমনি দিগধর, ধূলিধূসরিত-কলেবর বালক নিমাই কোথা হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণের পাত্র হইতে একগ্রাস অন্ন লইয়া খাইয়া ফেলিল। বালকের কাণ্ড দেখিয়া মিশ্র মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের অমুরোধে নিরস্ত হইলেন। জগন্নাথ তখন অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণকে পুনরায় রন্ধন করিতে স্বীকার করাইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারও পাক শেষ হইলেই নিমাই অলঙ্কিতে আসিয়া ব্রাহ্মণের পাত্রস্থিত অন্ন হইতে এক গ্রাস লইয়া খাইয়া ফেলিলেন। পিতামাতার ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। জগন্নাথের মনস্তাপ দেখিয়া এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসারবিরাগী বিশ্বরূপের অমুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ তৃতীয় বার পাক করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন নিমাইকে এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া সকলে রুদ্ধ গৃহের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। বালক ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। গৃভীর রাত্রিতে ব্রাহ্মণের রন্ধন সমাপ্ত না হইতেই সকলে নিদ্রাভিত্ত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন সমাপনান্তে অন্ন নিবেদন করিবার উদ্দেশে

যেমন উপবেশন করিয়াছেন, অমনি দেখিতে পাইলেন সম্মুখে 'নিমাই সমাগত। পুনরায় বালককে দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণ “হায়, হায়” করিয়া উঠিলেন, কিন্তু নিদ্রাভিভবশতঃ কেহই ব্রাহ্মণের ডাক শুনিতে পাইল না। তখন হতবুদ্ধি ব্রাহ্মণকে সন্বেদন করিয়া নিমাই বলিতে লাগিলেন “হে বিপ্র, তুমি আমায় আহ্বান করিয়াছ, তাই আমি আসিয়াছি।” দেখিতে দেখিতে সেই বালক-মূর্ত্তি অষ্টভূজ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণ দোখলেন।

এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়,
আর দুই হস্তে প্রভু মূৰ্ত্তী বাজায়।
শ্রীবৎস কৌন্তভ বক্ষে শোভে মণি হার,
সর্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার।
নব গুঞ্জা বেড়া শিপিপুচ্ছ শোভে শিরে,
চন্দ্র মুখে অরুণ অধর শোভা করে।
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন কমল
বৈজয়ন্তী মালা দোণে মকর কণ্ডল।
চরণারবিন্দে শোভে ত্রীরজ হুপুৰ,
নখমণি কিরণে তিমির গেল দূর।
অপূৰ্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেই ধানে
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষগণে ॥
গোপ গোপী গাভীগণ চতুর্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে তাই দেখে পরতোকে ॥

চিরবাস্তিত্ব আপনার ধন সম্মুখে পাইয়া
ব্রাহ্মণ আনন্দে মূৰ্ছিত হইয়া পড়িলেন।
নিমাই ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়া রক্ত গৃহে গমন
করতঃ শয়ন করিয়া থাকিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে এক একাদশী-
তিথিতে নিমাই ভয়ানক ক্রন্দন আরম্ভ
করিলেন। শত হরিধ্বনিতেও সেদিন

সে ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল না। ক্রন্দনের
কারণ জানিত না পারিয়া সকলেই উদ্ভিগ্ন
হইয়া উঠিলেন। তখন নিমাই বলিয়া
উঠিলেন “জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত
একাদশীর উপবাস করিয়া আজি বিষ্ণু-
পূজার্থ যে নৈবেদ্য আহরণ করিয়াছেন,
আমাকে তাহাই আনিয়া দেও।” বালকের
এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া জননী ক্ষুব্ধ
হইলেন। কিন্তু নিমাই কিছুতেই নিজের
আবদার ত্যাগ করি লন না। জগদীশ ও
হিরণ্য জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী ও বান্ধব
ছিলেন। বালকে অদ্ভুত খেলার
কথা তাঁহাদের কর্ণগত হইলে তাঁহারা
বিস্মিত হইলেন। সেদিন যে একাদশী
তিথি এবং তাঁহারা যে বিষ্ণু পূজার্থ নৈবেদ্য
প্রস্তুত করিয়াছেন, নিমাইর মত ক্ষুদ্র
শিশুর পক্ষে তাহা জানিতে পারা অলৌকিক
ব্যাপার বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল।
“শিশুর দেহে অধিষ্ঠিত গোপালই শিশুকে
এই সমস্ত কথা এলাইয়াছিল,” মনে করিয়া
তাঁহারা তাঁহাদের বিষ্ণুপূজার যাবতীয়
উপহার শিশুর সম্মুখে স্থাপন করিলেন।
তখন তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিয়া
নিমাই শান্তভাবে অবলম্বন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যারম্ভ ও বাল্য ক্রীড়া

ক্রমে হাতে খড়ির সময় আগত হইল।
জগন্নাথ শুভদিন দেখিয়া নিমাইর হাতে
খড়ি দিলেন। কিছুদিন পরে কর্ণবেধ ও
চূড়াকরণ-সংস্কারও অন্তর্গত হইল। নিমাইর
অসাধারণ বিদ্যাভ্যাস-পটুতা দেখিয়া

সকলে বিস্মিত হইলেন। একবার মাত্র দেখিয়াই নিমাই বর্ণমালা আয়ত্ত করিলেন, এবং দুই দিনে সমস্ত ফলা অভ্যাস করিয়া অনবরত শ্রীকৃষ্ণনামাবলী লিখিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার সহিত বালকের হ্রস্বপণা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পল্লীর যাবতীয় বালক লইয়া নিমাই এক দল গঠন করিলেন। স্বীয় দল-বহির্ভূত কোনও বালকের সহিত দেখা হইলেই, নিমাই তাহার সহিত কলহ করিতেন। সদলে গঙ্গাস্নানে যাইয়া বহুকণ যাবত জল-ক্ৰীড়া করিতেন, স্নানার্থী অত্র লোকের গায়ে জল ছিটাইয়া পড়িত, তাহারা বারণ করিলেও গ্রাহ্য করিতেন না, পরন্তু কাহাকেও ছুঁইয়া দিয়া, কাহারও গাত্রে কুল্লোল দিয়া বারবার তাহাদিগকে স্নান করিতে বাধ্য করিতেন। ধ্যানস্থ পূজকদিগের গাত্রে জল ছিটাইয়া দিয়া তাহাদিগের ধ্যানভঙ্গ করিয়া দিয়া বলিতেন “কাহার ধ্যান করিতেছ, আগিহি কলিযুগে প্রতাস্ক নারায়ণ। আমাকে দেখ।” কাহারও পূজার্থ গঠিত শিব-লিঙ্গ, কাহারও বা উত্তরীয় বসন লইয়া পলায়ন করিতেন। কখনও বা কোনও পূজকের সজ্জিত বিষ্ণুর আসনে উপবেশন করিয়া, তাহার আহৃত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন এবং ক্রুদ্ধ পূজককে সম্বোধন করিয়া বলিতেন “হুঃখিত হইও না, যাহার জন্ম নৈবেদ্য আহরণ করিয়াছিলে, সেই খাইয়াছে।” শিশুগণের কর্ণে জল দিয়া তাহাদিগকে কাঁদাইতেন, যুবকগণের স্বন্ধে আরোহণ করতঃ “মুইরে মহেশ” বসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন ;

স্ত্রীলোকগণের বসন লইয়া পুরুষের বসনের সহিত বদল করিয়া দিতেন, বালিকাগণের পরিধেয় বস্ত্র লুকাইয়া রাখিতেন, বালিকাগণ কিছু বলিলে, তাহাদের সহিত কলহ করিতেন, তাহাদের ত্রুতের ফলফুল ছড়াইয়া ফেলিতেন, কাহারও মখে কুল্লোল দিতেন, কাহারও চুলে ওকড়ার ফল ঝুড়িয়া দিতেন, কাহাকেও বা বিবাহ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেন।

নিমাইর দৌরাঙ্গ্য ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল, একদিন পল্লীস্থ অনেক জগন্নাথ মিশ্রের নিকট গমন করিয়া তাহার অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বালিকাগণও সেই সময়ে শচীদেবীর নিকট যাইয়া তাহার দৌরাঙ্গ্যের কথা বলিলেন। পুত্রবৎসনা শচী বালিকাগণকে মিষ্ট বচনে সাহসনা করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের শাস্তিবিধানের জগৎ গঙ্গার অভিযুখে ধাবিত হইলেন। বালিকাগণ জগন্নাথের ক্রোধ দেখিয়া নিমাইর জন্ম ভীত হইয়া ঘরিতে ঘাটে যাইয়া নিমাইকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিল। নিমাই পলায়ন করিলেন। জগন্নাথ ঘাটে গিয়া নিমাইকে দিখিতে পাইগেন না। নিমাইর সঙ্গিগণ তাহাকে বলিল নিমাই তখনও স্নানার্থ আসেন নাই। মিশ্র গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিতে পাইলেন—গৌরদেহে কালবিন্দুশোভিত নিমাই পুণি “হস্তে বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। নিমাই তৈল লইয়া গঙ্গার ঘাটে সঙ্গীদিগের সহিত পুনঃস্নান করিত হইলেন। পিতা-মাতা তখন তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন।

পুত্রের চপলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া জগন্নাথ চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তাহাকে শাসনে রাখিবার ক্ষমতা পিতামাতা কাহারও ছিল না। নিমাই ভয় করিতেন কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে, কিন্তু ঘটনাক্রমে বিশ্বরূপের শাসনও অচিরে অপসারিত হইল। বিশ্বরূপ সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন, বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথাতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। পুত্রের বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্ত পিতামাতা তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিলেন। বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় একদিন বিশ্বরূপ পিতামাতাকে না বলিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন, এবং শ্রীশঙ্করারাম নাম গ্রহণ করিয়া অনন্ত পথের পথিক হইলেন।

বিশ্বরূপের সংসার-ত্যাগ পিতামাতাকে শেলের মত বিকল করিল। বাঁক নিমাইও ভ্রাতার বিরহ-শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিশ্বরূপের সংসার-ত্যাগের কতিপয় দিবস পরে, একদিন নিমাই নৈবেদ্যে তাণ্ডুল চর্কণ করিয়া মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পিতামাতার শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি যে কাহিনী বর্ণনা করিলেন, তাহাতে সন্তপুত্রবিচ্ছেদবিধুর জনকজননীর মন আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িল। নিমাই বলিলেন “আমার মনে হইল বিশ্বরূপ আমাকে এক অপরিচিত স্থানে লইয়া গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।” আমি বলিলাম “আমি বালক, সন্ন্যাসের আমি কিছুই জানি না! যের

অনাথ পিতামাতা রহিয়াছেন আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে কে তাঁহাদের সেবা করিবে? আমি যদি গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিয়া পিতামাতার সেবা করি—তাহাতেই লক্ষ্মীনারায়ণ তুষ্ট হইবেন।” আমার এই কথা শুনিয়া বিশ্বরূপ পুনরায় এখানে আনিয়া রাখিয়া গেলেন।”

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নিমাইর চপলতা অনেকটা সংযত হইল। পিতামাতার সম্বোধ্য বিধানার্থ তিনি খেলা ছাড়িয়া নিরবধি তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিরতিশয় যত্নের সহিত পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাইর বুদ্ধিও স্মৃতিশক্তির প্রার্থব্য সকলের বিষয় উৎপাদন করিল। কিন্তু পুত্রের এই কৃতিত্বে পিতামাতার মনে সম্বোধের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। একদিন জগন্নাথ শচীদেবীকে কহিলেন “সর্বশাস্ত্র অধিগত করিয়া বিশ্বরূপ বুঝিয়াছিল—সংসার অনিত্য ও অসত্য” এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াই বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়াছে। বিশ্বরূপ যদি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেও সংসার ত্যাগ করিবে। অতএব তাহার পড়াশুনা করিয়া কাজ নাই সে মূর্থ হইয়া গৃহে থাকুক।” অতঃপর পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন “তোমার পড়া শুনা করিয়া কাজ নাই, তুমি যাহা চাহিবে সকলই পাইবে; পড়া ছাড়িয়া আনন্দে গৃহে অবস্থান কর।” নিমাই পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিলেন না, কিন্তু পড়া শুনা বন্ধ হওয়াতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

নিমাইর লেখাপড়া বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চাপল্য ও ঔক্ৰান্ত্য পূর্ববৎ মত অসংযত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি গৃহের বাহিরে সঙ্গিগণের সহিত ক্রীড়ায় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কখনও নিমাই কবলে গাত্র আবৃত করতঃ ঘুম সাজিয়া প্রতিবেশীর কলাবন ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিতেন, কখনও বা তাহাদিগের গৃহদ্বার রাত্রি কালে বাহির হইতে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। এই সমস্ত উৎপাতের কথা জগন্নাথের কর্ণগত হইত— কিন্তু তিনি বাঙনিপত্তি করিতেন না। অবশেষে একদিন নিমাই গৃহসমীপস্থ গর্তে স্থিত এক ডাচ্ছট্ট হাঁড়ীস্তূপের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। শচীদেবী নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন এবং এত দিনেও নিমাইর-ডাচ্ছট্টজ্ঞান হইল না বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। চতুর বালক তখন উত্তর করল “ডাচ্ছট্ট-জ্ঞান ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান হইবে কোথা হইতে? তোমরা যে আমার পড়া শুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছ। আমাকে যদি পড়িতেই না দেও তাহা হইলে আমি আর গৃহে বাইব না।” শচী নিমাইকে ধরিয়া আনিয়া স্নান করাইলেন। জগন্নাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলে প্রতিবেশিগণ সকলে মিলিয়া তাহাকে বুঝাইয়া নিমাইর পুনরায় পাঠারম্ভ করাইয়া দিলেন।

নিমাই দ্বিগুণ উৎসাহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে নিমাইর উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইল। তাহার সুন্দর সুগঠিত শরীরে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র পরম সুন্দর দেখাইত। উপনয়নান্তে নিমাই নবদ্বীপের অধ্যাপক শিরোমণি গঙ্গাদাস

পণ্ডিতের টোলে ভর্তি হইলেন। অল্পদিনেই গঙ্গাদাস তাঁহার নূতন ছাত্রের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছাত্রগণের কেহই কাঁকিতে নিমাইকে আঁটিতে পারিত না। ক্রমে নিমাই যাবতীয় ছাত্রের নায়করূপে পরিগণিত হইলেন। সুরারী ও শুভ কল্যাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, যকুন্দ, সঞ্জয় ভূতি ভক্তগণ এই টোলে নিমাইর সহধার্মী ছিলেন। প্রতিদিন সত্যর্থগণের সহিত নিমাই স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিতেন। অসংখ্য ছাত্র গঙ্গার ঘাটে সমবেত হইত। নিমাই ও তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত অগাধ টোলের ছাত্রগণের বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হইত। নিমাইর তর্ক প্রবৃত্তি এত অধিক ছিল যে, একঘাটে তর্ক শেষ হইলে, তিনি সম্ভরণ পূর্বক অগ্ৰঘাটে গমন করতঃ তত্রস্থ ছাত্রগণের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দিতেন। এই তর্ক অনেক সময় গালাগালি ও মারামারিতে পরিণত হইত।

স্নানান্তে গৃহে আসিয়া শিষ্য-পূজা ও তুলসী বক্ষে জলদান করতঃ নিমাই ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে নির্জনে বসিয়া সূত্রের টীপনী রচনা করিতেন। পুত্রের বিভ্রাটর্জয় আগ্রহ দেখিয়া মিশ্রদম্পতি আনন্দিত হইতেন এবং অনবরতঃ পুত্রের মঙ্গলের জন্ত ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। এই আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে ‘পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণ-সম্ভাবনা মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া, জগন্নাথ’ মিশ্রকে আতঙ্কে অভিভূত করিয়া ফেলিত। এক

দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, নিমাই শিখায়ুগুন করতঃ অতুত সন্ন্যাসী বেশে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে উন্নত ভাবে নৃত্য করিতেছেন, অবৈত্যাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কাস্তন করিতেছেন, নিমাই থাকিয়া থাকিয়া বিষ্ণু-গুটায় উপবেশন করতঃ সকলের মস্তকে চরণ পদান করিতেছেন এবং ব্রহ্মা ও মহাদেব “জয় শচীনন্দন” বলিয়া তাঁহার স্তবগান করিতেছেন। অতঃপর লক্ষ লক্ষ লোক সমভিষ্যাহারে নিমাই নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; কৌতুকঠনিঃসৃত হরিধ্বনি গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অবশেষে সেই বিশাল জনসংখ্যা লইয়া নিমাই নীলাচলে গমন করিলেন। স্বপ্নদর্শনে আতঙ্কিত হইয়া জগন্নাথ পত্নীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। শচী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন—বিজ্ঞানসই আত্মকাল নিমাইর ধর্ম্মে পরিগণিত হইয়াছে। বিদ্যা ছাড়িয়া নিমাই যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে—ইহা সম্ভবপর নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

পিতৃবিয়োগ ও বিজ্ঞানিক্ষা

এইরূপ কিছুদিন অতিবাহিত হইলে নিমাইর একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পুত্র ও পত্নীকে অকুল শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। পিতৃশোক নিমাই নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, পতিপ্রাণা শচী কেবল নিমাইর মুখ দেখিইয়াই স্বামিবিয়োগ সহ্য করিলেন। এখন

পিতৃহীন বালকের সেবা ভিন্ন তাঁহার অন্য কার্য্য রহিল না। পলকের জ্ঞান নিমাই তাঁহার দৃষ্টপথে বারিহর হইলে শচী আকুল হইয়া পড়িতেন। নিমাইও এখন হইতে অত্যধিক যত্নের সহিত পতিবিয়োগকাতরা জননীর সেবা করিতে লাগিলেন, এবং নানা আশার কথা শুনাইয়া তাঁহার ক্ষত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পিতৃশোকের তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিমাইর স্বাভাবিক ক্রোধ-প্রবণতা রুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বামীহীনা শচীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কিন্তু নিমাই যখন যাহা চাহিতেন, তাহা না পাইলে আর রক্ষা থাকিত না। নিমাই ক্রুদ্ধ হইলে আবার উপর কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে হারািয়া ফেলিতেন, তখন পরস্কার সমস্তই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে যাইতেন। একদিন গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় নিমাই গঙ্গাপূজার্থ জননার নিকট মালা ও চন্দন চাহিলেন। গৃহে মালা ছিল না। জননী কহিলেন “ক্ষণেক অপেক্ষা কর। মালাকরের বাটী হইতে মালা আনিয়া দিতেছি।” “এখন মালা আনিয়া তারপর আমাকে দিবে” বলিয়া ক্রুদ্ধ নিমাই গৃহে প্রবেশ করতঃ গৃহস্থিত যাবতীয় ভাণ্ড লাঠির আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। গৃহ মধ্যে তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, চাউল, কার্পাস প্রভৃতি ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ঘরে যত বস্তু ছিল, নিমাই সমস্ত গুণ্ড গুণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার ক্রোধোপশম হইল না। অবশেষে

এক ঠেঙ্গা লইয়া চালের উপর প্রহার করিতে লাগিলেন, জীর্ণ চাল ভাঙ্গিয়া পড়িল; তখন নিমাই হস্তস্থিত ঘটিদ্বারা এক গাছের উপর ও তৎপরে ভূমিতলে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভয়ার্ত শচী পুত্রের ভীষণ মূর্তি দেখিয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু ক্রোধে অন্ধ হইয়া শত অত্যাচার করিলেও নিমাই জননীর গাত্রে হস্তস্পর্শ করিতেন না। সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিমাই অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং অবশেষে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে মালা আনিয়া শচী পুত্রকে জাগরিত করিলেন এবং মালা প্রদান করতঃ নানাক্রমে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ততক্ষণে ক্রোধ শাস্ত হইয়াছে। নিমাই জননীর প্রদত্ত মালা লইয়া গঙ্গান্নানে গমন করিলেন। ভোজনের সময় শচী মিষ্ট বচনে নিমাইকৃত অপচয়ের উল্লেখ করিয়া কহিলেন, “তুমি ত এখনি পড়িতে যাইবে, কিন্তু ঘরের সম্বল যে সকলই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ, কালি খাইবার যে কিছুই নাই। “কৃষ্ণ সব মিলাইয়া দিবেন” বলিয়া পুস্তক হস্তে নিমাই গৃহত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যাকালে বধন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, তখন দুই তোলা স্বর্ণ বাহির করিয়া নিমাই কহিলেন “এই দেখ মা, কৃষ্ণ ইহা মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহাদ্বারা বাহা বাহা দরকার কিনিয়া লও।”

বিদ্যালয়ে নিমাইর প্রতিভা ক্রমশঃই ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। তৎকৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া অধ্যাপক নিতান্ত হুট হইতেন। নিমাইর প্রশ্নের উত্তর কোন

ছাত্রই দিতে পারিত না। তিনি নিজেই স্বত্বের স্থাপনা করিতেন, এবং আপনার ব্যাখ্যা আপনিই খণ্ডন করিতেন, আর কাহারও ক্ষমতা হইত না যে তাহার খণ্ডন করে। স্নান, ভোজন, পর্যটন সর্বদা নিমাই শাস্ত্র-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোণে অধ্যয়ন কালে নিমাই একখানি টিপ্পনি রচনা করেন, তাহা “বিত্তাসাগরী টীকা” নামে সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। নিমাইর প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অধ্যাপক গঙ্গাদাস স্বীয় ছাত্রদের পড়াইবার ভার তাহার উপর দিলেন। মুরারী শুণ্ড নিমাই অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঠ লইতে লজ্জা বোধ করিতেন, তজ্জগু নিমাই তাঁহাকে পরিহাস ক’রয়া বলিতেন “বৈষ্ণৱাজ, ব্যাকরণ শাস্ত্র বড় বিষয়, ইহাতে কফ-পিত্ত-অজীর্ণের বাবস্থা নাই, তুমি ইহা ছাড়িয়া লতা-পাতা লইয়া রোগীর চিকিৎসা কর গিয়া।” কিছুদিন পরে নিমাইর প্রতিভার নিকট অবনতমস্তক হইয়া মুরারী তাঁহার নিকট পাঠ-স্বীকার করিয়া ছিলেন।

ব্যাকরণের পাঠ শেষ হইলে বিখ্যাত আয়-শাস্ত্রের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে “ভট্টদীপ্তি” প্রণেতা সুবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণিও আয়-শাস্ত্র পাঠ কবিতে ছিলেন। রঘুনাথ অদ্বিতীয় প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। অতি শৈশব অবস্থাতেই তাঁহার অননুসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং পরিণত বয়সে তাঁহার বশ দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া

পড়িয়াছিল। কিন্তু অধ্যয়ন কালে নিমাইর করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল এবং নিমাইএর অমাসুখী প্রতিভার নিকট স্বকীয় টীকা তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাগর্ভে রঘুনাথের প্রতিভা মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। নিষ্কেপ করিলেন। তদবধি নিষ্কল বলিয়া নির্ণয় আছে—একদিন এক বৃক্ষতলে বসিয়া নিমাই ঞ্চায়শাস্ত্রের চর্চা পরিত্যাগ রঘুনাথ এক জটীল প্রশ্নের সমাধানে নিবিষ্ট করিলেন।

চিন্তে ব্যাপ্ত ছিলেন। বৃক্ষশাখাস্থ পক্ষিগণ তাঁহার গাত্রে মলত্যাগ করিয়াছিল, রঘুনাথ তাহা জানিতে পারেন নাই। এমন সময় নিমাই গঙ্গান্নান করিয়া সেই পথে গৃহে ফিরিতেছিলেন। পক্ষিমলাচ্ছন্নদেহ রঘুনাথকে দেখিয়া নিমাই তৎসমীপে গমন করতঃ স্বীয় আদ্রবস্ত্রের দুই চারি ফোঁটা জল তাহার পৃষ্ঠে নিষ্কেপ করিলেন। রঘুনাথের চৈতন্য হইল। তখন নিমাই তাহার চিন্তার বিষয়টীকি জানিতে চাহিলেন। রঘুনাথ প্রথমে অবজ্ঞার সহিত তাঁহার প্রশ্ন উড়াইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু অবশেষে প্রশ্নটী শুনিয়া নিমাই যখন অবলীলাক্রমে তাহার যথাযথ মীমাংসা করিয়া দিলেন, তখন তিনি বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলেন। তদবধি চিরকালই রঘুনাথ নিমাইকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।

ஞ்চায়শাস্ত্র সমাপ্ত করিয়া নিমাই ঞ্চায়ের একখানি টীপ্পনি লিখিলেন। রঘুনাথ শিরোমণিও ঠিক এই সময়েই ঞ্চায়ের টীকা রচনা করিতেছিলেন। কথিত আছে—রঘুনাথ ও নিমাই একদিন গঙ্গাপার হইতে-ছিলেন। কথোপকথনকালে নিমাই-কৃত টীকার বিষয় অবগত হইয়া রঘুনাথ বুদ্ধিতে পারিলেন, „নিমাইর টীকার পরে তাঁহার টীকার প্রচার পশুশ্রম মাত্র হইবে। রঘুনাথের কাতর মুখচ্ছবি ও হতাশ-উক্ত শুনিয়া

চতুর্থ অধ্যায়

বিবাহ, অধ্যাপনা, বায়ুরোগ, দিগ্বিজয়-
বিজয়

বল্লভাচার্য্য নামে নবদ্বীপে এক সূত্রাঙ্গণ বাস করিতেন। লক্ষ্মীনাথী তাঁহার এক লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা ছিল। একদিন স্নান-কালে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীকে দোখিয়া নিমাই মনে মনে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। ইহার কিছুকাল পরে বলমালী নামক এক ষটক শচীদেবীর নিকট গমন করতঃ লক্ষ্মীর সহিত নিমাইএর বিবাহ-সম্বন্ধ উত্থাপিত করিলেন। কিন্তু তখনও পুত্রের বিবাহ দিবার জন্ম শচী উৎসুক হয়েন নাই। ষটকের কথা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন “আমার বালক পিতৃহীন ; এখনও তাহার পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, আগে তাহার পাঠ সমাপ্ত হউক, পরে বিবাহ হইবে।” বনমালী বিষম মনে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, পথে নিমাইএর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বনমালীর নিকট জননীকর্তৃক তাহার প্রস্তাব-প্রত্যা-খ্যান-ব্যাপার অবগত হইয়া নিমাই গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং হাসিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ষটকের সহিত ভালরূপ সম্ভাষণ কর নাই কেন ?” পুত্রবৎসলা শচী নিমাইর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, এবং অবিলম্বে বনমালীকে ডাকিয়া প্রস্তাবিত

বিবাহে স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ষটক আনন্দিত মনে বস্ত্রভাচার্যের নিকট যাইয়া বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। সধব্দ স্থির হইল। শুভদিনে শুভক্ষণে শার-বিধি মতে নিমাই লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে অধ্যাপক গঙ্গাদাস স্বকীয় টোলের ছাত্রগণের অধ্যাপনার ভার নিমাইর উপর তুল্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পরে নিমাই নিজে একটী দত্ত টোল স্থাপিত করিলেন। মুকুন্দ সজ্জায় চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইর টোল স্থাপিত হইল। প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নিমাই অধ্যাপনার টোলে গমন করিতেন; মধ্যাহ্নে শিষ্য গঙ্গান্নানে যাইতেন; মধ্যাহ্ন-ভোজনাতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ পুনরায় টোলে গমন করিয়া অপরাহ্নে শিষ্ঠগণ সমভিব্যাহারে নগরভ্রমণে বহির্গত হইতেন। সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকশীত জাহ্নবীতটে কত শাস্ত্রালাপ ও শাস্ত্রব্যাখ্যান হইত; জ্ঞানদর্পিত নিমাই পণ্ডিত অর্জিত বিজ্ঞার কতই গর্ব করিতেন; প্রত্যঙ্গী পাইলেই কঁাকি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে ঠকাইয়া দিতেন। তাহার যশ দেশবিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; দলে দলে ছাত্র-বিদ্যালিক্ষার্থী তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। সহস্র ছাত্রের পাঠ-কোলাহলে তাঁহার টোল-গৃহ শব্দায়মান হইয়া উঠল।

একদিন অকস্মৎ বায়ুরোগগ্রস্ত রোগীর মত নিমাই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে এক অস্বাভাবিক শব্দ নির্গত হইতে লাগিল, এবং মূর্ত্তিকার উপর

লুপ্তি হইয়া। তিনি কখনও নিকট হস্ত করিতে লাগিলেন, কখনও বা সম্পূর্ণ উদ্ভ্রমের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার সর্বাপ স্তম্ভাকৃতি হইয়া উঠিতে লাগিল, পুত্রগতপ্রাণা শচীদেবা আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বন্ধুবান্ধবগণ নিমাইর অবস্থাকে বায়ু-বিকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু এই অবস্থাই বৈদ্যবশাস্ত্রে প্রেমভক্তির বাহ্যিক লক্ষণ স্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক বন্ধুগণের পরামর্শ অনুসারে কিছু তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি নানাবিধ ঔষধ তৈল দ্বারা নিমাইর মস্তক প্রলিপ্ত করা হইল—কিন্তু তাহাতে কোনও ফল পরিলক্ষিত হইল না। নিমাই মাঝে মাঝে হুকার করিয়া বলিতে লাগিলেন “আমি মর্দলোকের প্রভু; আমি বিশ্বধারণ করিয়া আছি—তাই আমার নাম বিশ্বস্তর; আমি সেই—অথচ কেহই আমাকে চেনে না।” নিমাই এর উক্তি শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিল “ইহার শরীরে দানবের অধিষ্ঠান হইয়াছে।” কেহ বলিল “ইহা ডাক্তারি কার্য্য।” অথ উপায়ে ব্যাধির উপশম না হওয়ায় অবশেষে এক তৈলপূর্ণ দ্রোণে নিমাইকে শোয়াইয়া রাখা হইল। এইরূপে কিছুদিন পরে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইলেন।

প্রকৃতিস্থ হইয়া নিমাই পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন এবং পুনরায় পূর্বেরই মত শিষ্ঠগণের সহিত নগরভ্রমণে বাহির হইতে লাগিলেন। নবদ্বীপের সকলেই তাঁহার অনন্তসাধারণ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। যখন নগরভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখন

সকলে যুদ্ধ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। নগরের তন্তুবায়, গন্ধপণিক ও গোপদিগের গৃহে নিমাই গমন করিলে তাহারা কৃতার্থ হইয়া যাইত, এবং মূল্যের নাম মাত্র না করিয়াই তাহাকে বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য ও দধিহৃদ্ধাদি প্রদান করিত। গোপদিগকে নিমাই মামা সম্বোধন করিতেন তাহারাও তাঁহার সহিত নানা হাশ্য পরিচাস করিত। মালাকরণগণ বিনামূল্যে তাঁহাকে মালা পরাইয়া দিত, তাহুণী তাহুল প্রদান করিত, শঙ্খপণিক দিব্য শঙ্খ উপহার দিত।

একদিন এক সর্ষজের গৃহে উপস্থিত হইয়া নিমাই স্বীয় পূর্বজন্মের ইতিহাস গণনা করিয়া বলিতে সর্ষজকে আদেশ করিলেন। গণক গণনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল—

“শঙ্খচক্র গদাপন্ন চতুর্ভুজ শ্যাম।
 ত্রিবংস কোত্তৃত বক্ষ মহা জ্যোতির্ধাম ॥
 নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দীঘরে।
 পিতামাতা দেখয়ে সম্মুখে স্থতি করে।
 সেইক্ষণে দেখে পিতা পুত্র নাহি কোলে।
 সেৱ রাত্রে থুইবেন আসিয়া গোকুলে ॥
 পুন দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
 কটিতে কিল্বিণী, নবনৌত দুই করে ॥
 পুন দেখে ত্রিভঙ্গিম যুরলৌ বদন।
 চতুর্দিকে যন্ত্র গীত গায় গোপীগণ ॥

* * * * *

তবে দেখে ধর্ম্মধূর্য্যের দুর্বাদল শ্যাম।
 বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ষজন ॥
 পুন দেখে প্রভুরে প্রলয়-জল মাঝে।
 অদ্বুত বরাহ মূর্ত্তি দণ্ডে পৃথ্বী সাজে ॥

পুন দেখে প্রভুরে নৃসিংহ অবতার।
 মহা উগ্ররূপ ভক্তবৎসল অপার ॥
 পুন দেখে প্রভুরে বামন রূপ ধরি।
 বলি যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি ॥
 পুন দেখে মৎস রূপে প্রলয়ের জলে।
 করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে ॥
 মানস চক্ষুতে এই সমস্ত অদ্বুত দৃশ্য দেখিয়া সর্ষজ হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিল “কোনও দেবতা আনাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন।” পরক্ষণেই ভাবিল “এ ব্রাহ্মণ মহামন্ত্রবৎ, আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্ম অসিয়াছে;” কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সর্ষজ নিমাইকে বলিল “আমি এখন কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। তুমি এখন যাও, ভাল রূপ গণিয়া বিকালে তোমাকে বলিব।”

দৈবজ্ঞের গৃহ হইতে নিমাই তখন শ্রীধর নামক এক দারিদ্রের কুটীরে গমন করিলেন। দরিদ্র শ্রীধর খোলা বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, কিন্তু সংসারের হুঃখ কষ্ট তাহাকে কাতর করিতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণে শ্রীধরের অচলা ভক্তি ছিল—তাঁহারই প্রেমে শ্রীধরের হৃদয় সর্ষদা পরিপূর্ণ থাকিত। নিমাই শ্রীধরের সহিত নানারূপ কৌতুক কবিতেন। আজি তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন “শ্রীধর, ‘স্মি, হরি’ ত অনুক্ষণ বলিতেছ। কিন্তু হুঃখ তোমাকে ছাড়ে কই? লক্ষ্মীকান্তের সেবা করিয়া তোমার অন্তরবস্তুর ক্লেশ ত গেল না।” বিখ্যাসী শ্রীধর উত্তর করিলেন “উপবাস ত করি না—তবে আর হুঃখ কিসের? ছোট হটক বড় হটক কাপড়ও পরিয়া থাকি।” নিমাই কহিলেন

বিষহরি ও চণ্ডীর সেবকদিগের কাণ্ডারও ত অন্নবস্ত্রের কষ্ট দেখি না। আর তোমার চালে খড়্‌ নাই।” শ্রীধর কহিলেন “রত্নময় প্রাসাদে রাজা যেরূপ কাণ্ডাতিপাত করেন, বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণও সেইরূপেই সময়াতি-বাহিত করিয়া থাকে। কাল সকলের পক্ষেই সমান। সকলেই ভগবানের ইচ্ছায় নিজকর্মফল ভোগ করে।” নিমাই তখন কহিলেন “শ্রীধর, কে বলে তুমি দরিদ্র, তুমি অপর্যাপ্ত ধনের অধিকারী, লুকাইয়া ধন ভোগ কর। একদিন আমি সব প্রকাশ করিয়া দিব।” শ্রীধর উত্তর করিলেন “পণ্ডিত, তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্ব সাজে না, তুমি ঘরে যাও।” নিমাই কহিলেন “সহজে তোমাকে ছাড়িব? আগে কি দিবে বল?” তখন—

শ্রীধর বলেন, আমি খোলা বেচি খাই।

ইহাতে কি দিব, তাহা বলহ গোসাঞি ॥

প্রভু বলেন—

যে তোমার পোতা ধন আছে।

সে থাকুক এখন, পাইব তাহা পাছে ॥

এবে কলা মূলা খোড় দেহ কর্ডি বিনে।

দিলে আমি কোন্দল না কি তোমা সনে
শ্রীধর তখন ভাবিলেন “উদ্ধৃত ব্রাহ্মণ যদি আমাকে প্রহার করে, তাহা হইলেও কিছু করিতে পারি না। ছলেই হউক বলেই হউক তবু যে ব্রাহ্মণে লইতেছে ইহা আমার ভাগ্য, ইহা ভাবিয়া নিমাইকে খোড়, কলা, মূলা, খোলা দিয়া শ্রীধর কহিলেন “লও ঠাকুর আর আমার সহিত কোন্দল করিও না।” তখন নিমাই কহিলেন “শ্রীধর আমাকে কি মনে কর?”

শ্রীধর উত্তর করিলেন “তুমি ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুর অংশ।” নিমাই কহিলেন “তুমি কিছুই জান না—আমি গোয়ালার ছেলে। তোমার গঙ্গার মহত্ত্ব আমি হইতেই।” শ্রীধর হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন “নিমাই পণ্ডিত, গঙ্গাকেও কি তুমি ভয় কর না। বয়োবৃদ্ধির সহিত কোথায় লোক স্থির গন্তীর হয়, আর তোমার চপলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।”

শ্রীধরের সহিত কৌতুক করিয়া নিমাই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকপ্রাপ্ত আকাশতলে বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে স্নিগ্ধ উপবেশন করিলেন। তখন এক অপূর্ণ মুরলীধ্বনি উথিত হইয়া আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিল। সেই ত্রিভুবনমোহন বংশীরবে শচীদেবী আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যলাভ করিয়া শচী বসিতে পারিলেন, যথায় নিমাই উপবিষ্ট তথা হইতে মুরলীরব উথিত হইতেছে; গৃহবাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পুত্র বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে উপবিষ্ট, কিন্তু বংশীনাদ আর শোনা গেল না। শচী বিস্মিত হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ইহার পরেও কত দিন নিশাভাগে নৃত্যগীতধ্বনি শুনিয়া শচী চমকিত হইয়াছেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পান নাই; কত দিন দেখিয়াছেন, হঠাৎ সমগ্র গৃহ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে, কারণ খুঁজিয়া পান নাই।

এই সময়ে কেশব কান্দিরী নামক এক দ্বিধিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে সমাগত হইলেন। তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানের পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া

নবদ্বীপের গর্ব খর্ব করিবার অভিলাষে বর্হাশ্রম সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপে হলস্থল পড়িয়া গেল। পাণ্ডিত্যে নবদ্বীপ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এ হেন নবদ্বীপের সম্মান কি দিগ্বিজয়ীর নিকট পরাভবে চিরকালের জ্ঞাত অন্তর্হিত হইবে? আশঙ্কায় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ত্রিয়মাণ হইলেন। এইবার বুঝি নবদ্বীপের যশঃস্বর্গ অস্তমিত হইল—এই চিন্তায় সকলেই বিবাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। গর্বোদ্ধত আগন্তুক পণ্ডিত ঘোষণা করিয়া দিলেন “যদি কাহারও সাহস হয়, আমার সহিত বিচারে অগ্রসর হউন। অতথা নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ পরাজয় স্বীকার করতঃ আমাকে জয়-পত্র লিখিয়া দিউন।” কেহই দিগ্বিজয়ীর আহ্বানে তাঁহার সহিত তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন না। দিগ্বিজয়ীর আগমনবার্তা নিমাইএর কর্ণগত হইল। তাহার গর্বোদ্ধত আহ্বানের কথা শুনিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে নিমাই শশিগুপ্ত গঙ্গাতীরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শিগুগুপ্ত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা হইতছে, এমন সময় দিগ্বিজয়ী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিমাইর লাবণ্যময় বদন-শ্রী দর্শন করিয়া অনিমেঘলোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিমাই সসম্মমে তাঁগকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। আসন পরিগ্রহ করিয়া দিগ্বিজয়ী অবজ্ঞাভরে কহিলেন “তোমার নাম নিমাই পণ্ডিত? তুমি ব্যাকরণ অধ্যাপনা করিয়া থাক। এই বালাশাস্ত্রে তোমার পটুতার

কথা আমি শ্রবণ করিয়াছি।” নিমাই বিনীতভাবে কহিলেন “ব্যাকরণ অধ্যাপনা করি বলিয়া অভিমান আছে বটে, কিন্তু ব্যাকরণের তাৎপর্য্য যে বুঝি, তাহা বলিতে পারি না। আপনি সর্বশাস্ত্রবেত্তা ও প্রবীণ কবি, আমি ত আপনার নিকট নবপাঠার্থী সদৃশ। আপনার কবিত্ব শুনিতে অভিলাষ হইয়াছে। অম্লগহপূর্বক যদি গঙ্গার মাথায়া কিছু বর্ণনা করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।”

তখন দিগ্বিজয়ী সগর্বে গঙ্গার মাহাত্ম্যমুচক শ্লোকাবলী রচনা ও পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। মেঘগজ্জনসদৃশ গান্ধীর্ঘ্যশালী দ্রুতোচ্চারিত একশত শ্লোক শুনিয়া, শিগুগুপ্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইল। নিমাই অশেষ সাধুবাদ করিয়া কহিলেন “আপনার পবিত্র শ্লোকের অর্থ পরিতে পারে, এমন পণ্ডিত আর কে আছে? পঠিত কবিতার অর্থ যদি আপনি নিজমুখে করেন, তাহা হইলে পরম সন্তোষলাভ করিব।” দিগ্বিজয়ী জিজ্ঞাসিলেন “কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা করিব।” তখন নিমাই পণ্ডিত শত শ্লোকের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন—
 “মহদ্বং গঙ্গায়াঃ সত্যমিদমাভ্যাসিতি নিতরাং।
 যদেষা ত্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা॥
 দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীবিব সুরনরৈরববর্ষ্যচরণা।
 ভগানীভর্তৃগুণা শিরসি বিভবত্যভুতগুণা॥
 গঙ্গার এই মহিমা নিয়ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে যে তিনি বিষ্ণুর চরণকমল হইতে সঞ্চারিত হইয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। কি সুর কি নর সকলেই দ্বিতীয় কমলার ছায়া ইহার চরণ অর্চনা করিয়া থাকেন, ইনি

ভবানীপতির শীর্ষভাগে অদ্ভুতগুণ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছেন।

নিমাই কহিলেন “আপনার পঠিত এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করুন।” দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন “ঝঞ্জাবাতের মত আমি শ্লোক আরতি করিয়াছি। কি প্রকারে তুমি তাহা কণ্ঠস্থ করিলে?” নিমাই কহিলেন “দেবতার বরে আপনি কবিশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, দেবতার বরে ক্ষণতঃ পরও হওয়া যায়।” দিগ্বিজয়ী সন্তুষ্ট হইয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন। তখন নিমাই কহিলেন “এখন শ্লোকের মধ্যে কি কি দোষ ও কি কি গুণ আছে, তাহা বলুন।” দোষের উল্লেখ শুনিয়া দিগ্বিজয়ীর অভিমান আহত হইল। তিনি অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলেন “তুমি ব্যাকরণ-ব্যবসায়ী, অলঙ্কার ও কবিত্বের তুমি কি জ্ঞান?” অতি বিনীতভাবে নিমাই উত্তর করিলেন “বুঝি না বলিয়াই আপনাকে বুঝাইয়া দিতে বলিতেছি। অলঙ্কার-শাস্ত্র না পড়িলেও, তাহার কিছু কিছু যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, এই শ্লোকে বহু দোষ ও বহু গুণ আছে।” অহঙ্কৃত্বেরে এখন দিগ্বিজয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন “বল দেখি তুমি, কি দোষ-গুণ ইহাতে আছে?” “আমার উপর রুচি হইবেন না” বলিয়া নিমাই তখন শ্লোকের দুই স্থানে অবিস্মৃতিবিধেয়াংশ, একস্থানে বিরুদ্ধমতি ও অল্প দুই স্থানে যথাক্রমে বিরুদ্ধমতি ও ভগ্নকম-দোষের উল্লেখ করিলেন এবং কোথায় কোন্ কোন্ দোষ আছে তাহা প্রদর্শন করিলেন। ব্যাকরণীয়ার

অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইলেন, তাহার প্রতিভা স্তম্ভিত হইল, যথেষ্ট আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। দিগ্বিজয়ীর পরাভবে নিমাইয়ের শিবাগম হাসিয়া উঠিলেন। তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া নিমাই দিগ্বিজয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আপনি কবিশিরোমনি; আপনার মত কবি আমি পর্যাস্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেবের কবিতাও ও দোষাভাস আছে। সুতরাং আপনি বিষম হইবেন না। আমি আপনার শিষ্যেরও সমান নছি। আমার শৈশবচাপল্যে রুচি হইবেন না।” এইরূপ মৃষ্টকপায় দিগ্বিজয়ীকে প্রবোধ দিয়া নিমাই গৃহে গমন করিলেন। রাত্রিকালে দেবী সন্ন্যস্তী স্বপ্নে দিগ্বিজয়ীকে জানাইলেন নিমাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। পরদিন প্রাতঃকালে দিগ্বিজয়ী আসিয়া নিমাইর চরণে প্রণত হইলেন।

নিমাইকর্তৃক দিগ্বিজয়ীর পরাভববৃত্তান্ত সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং নিমাইর যথঃসৌভাগ্যে নবদ্বীপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বড় বড় বিষয়ী লোক পথে নিমাইকে দেখিতে পাইলে, দোলা হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে যে বাড়িতেই ধর্মকর্ম অশুভিত হইত, তথা হইতে নিমাইর জ্ঞান উপঢৌকন প্রেরিত হইতে লাগিল। নিমাই এই সমস্ত দ্রব্য দরিদ্র ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বিলাতী বাড়ীওয়ালী

বিলাতের বাড়ীওয়ালী এক অতি অদ্ভুত বস্তু। ছনিয়ার আর কোথাও এ বস্তু মিলে কি না, জানি না। এ বস্তু আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি। কিন্তু এই সভ্যতারও সকল স্থানে ইহা পাওয়া যায় না। আমেরিকায় এ বস্তুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সেখানে বড় বড় হোটেলের প্রভাবে ছোট ছোট বোর্ডিং লোপ পাইয়াছে। আর বাসাবাড়ী আমেরিকায় এখনো ছিল কি না, তাও জানি না। বোর্ডিং এবং ছোট ছোট বাসাবাড়ী বা ইংরেজিতে বাকে apartments বলে, তাহাই বাড়ীওয়ালীদের রাজত্ব। আমেরিকায় এ রাজত্ব এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সেখানে অনেক লোক সপরিবারে হোটেলেরই সর্বদা বসবাস করে। হোটেল-বাসী কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমতঃ গৃহীন্দ্রিয়কে আর চক্কিৎ ঘন্টা ঘরকন্না লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয় না। চাকরবাকরের জঞ্জালও আর পোহাইতে হয় না। হোটেলের বন্দোবস্তমত ঘরের সকল কাজ আপনা হইতেই চলিয়া যায়। সপ্তাহান্তে বিল্টা চুকাইয়া দিলেই হয়। নিউইয়র্ক সহরের কোন কোন হোটেল, দশ পনের বছর ধরিয়া একক্রমে বাস করিতেছেন, এমন মার্কিন পরিবার দেখিয়াছি। হোটেলের থাকিলে গৃহকার্যের বিক্ষেপ হইতে রক্ষা পাইয়া গৃহস্থানী আপনার সমগ্র সময় ও শক্তি নির্বিঘ্নে অর্থোপার্জনে নিয়োগ করিতে পারেন,

গৃহিণীও রান্নাবান্নার হেঁদাম হইতে একান্ত অবসর লাভ করিয়া যথেষ্টভাবে আপনার শিক্ষায় বা সৌখিনতায় দিনকয় করিতে পারেন। আমেরিকার আধুনিক সভ্যতা ও সমাজ-জীবন এ পথেই ফুটিয়া উঠিতেছে। পারিবারিক জীবনের স্বাভাব্য ও সঙ্গীর্ণতা নষ্ট হইয়া, এক প্রকারের 'বিশ্ব-জীবন'র আকার ধারণ করিতেছে। আর হোটেলগুলোই এই অতুল 'বিশ্ব-জীবন'র আশ্রয় হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং সেখানে, বড় বড় সহরে, হোটেল-কর্তৃগণ পুরাতন বাড়ীওয়ালীর ব্যবসায়টী একেবারেই আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছেন। ফরাসীতে বা জার্মানিতে বিলাতের বাড়ীওয়ালীর মত কোনো বস্তু আছে কি না, জানি না। এ সকল দেশের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় অতি সামান্য, ভিতরকার কথা কিছুই জানি না। তবে সাহিত্যেও ইহাদের কোনো বিশেষ খবরাখবর পাই নাই।

আর বিলাতেও, লণ্ডন সহরেই 'বাড়ীওয়ালীর প্রকোপ সর্বাপেক্ষা বেশী। লণ্ডন একটা "বিশ্ব-সহর" ইংরেজিতে ইহাকে cosmopolitan city বলে। ভৌগোলিক সম্পর্কে লণ্ডন ইংলণ্ডের, সত্য ; কিন্তু জাতি-বর্ণের হিসাবে, লণ্ডন ইংরেজের নহে, সমগ্র বিশ্বের। এখানে সকল দেশের লোকের বাস। আর যেখানে নানা দিগ্দেশ হইতে নানা লোকে আসিয়া বাস করে, সেখানেই সরাই, ঘুচ্ছফেরথানা,

ছত্র, বোর্ডিং, হোটেল প্রভৃতির প্রয়োজন উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে যাকে সরাই, বা ছত্র, বা মুহাফেরখানা বলে, কিয়ৎপরিমাণে আমাদের দেবালয় সকলেও প্রবাসীকে আশ্রয় দিয়া যে অভাব পূরণ করেন, বিলাতের হোটেল, বোর্ডিং হাউস বা অ্যাপার্টমেন্টস্ (apartments) গুলো সেই কাজ করে। তবে আমাদের অতিথিসংস্কার ধর্ম; বিলাতে ইহা একটা অতি বড় ও লাভবান ব্যবসায়। সাহেবেরাও একদিন ধর্মভাবেই অতিথি সংস্কার করিতেন, তাঁহাদের ভাষা তার সাক্ষী। অতিথি কথাটার মত কথা ইংরেজিতেও আছে। তবে ইংরেজ অতিথি আমন্ত্রিত, অনাহৃত নহেন। গৃহস্থামীর সুপরিচিত, একেবারে অপরিচিত নহেন। ইংরেজ-সমাজ বিষ্ণুধর্ম্মার একটা উপদেশ খুবই শক্ত করিয়া ধরিয়াছেন— “অজ্ঞাতকুলশীলস্ত বাসো দেয়ো ন কশ্চিৎ” এটা তাঁরা খুবই জানেন। সুতরাং আশ্রয়-আলয়-হীন লোকের সেখানে আশ্রয় মিলে না। বিনা টাকায় মিলে না—টাকা দিলে হোটেল, বোর্ডিং হাউস, অ্যাপার্টমেন্টস্ এ সকলে স্বচ্ছন্দ স্থান পাওয়া যায়। আর গৃহস্থেরাও কখনো কখনো বিশেষ পরিচয় পাইলে, ভাল লোকের সুপারিশে, অভ্যাগতকে আপনার বাড়ীতে অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে অতিথি বা guest ই বলে বটে, কিন্তু খরচ-পত্র নেন বলিয়া এঁদের paying guest বলে। এই paying guest কথাটি আমাদের ভাষায় নাই, কারণ বস্তুটি এখনো আমাদের

সমাজে গজায় নাই। Paying guestদের গৃহকর্ত্তাদিগকে বাড়ীওয়ালী বলে না।

বাড়ীওয়ালীরা হয় বোর্ডিং হাউসের না হয় অ্যাপার্টমেন্টের কর্ত্তা। বয়স এবং বৈবাহিক অবস্থার হিসাবে, ইহারা তিন শ্রেণীর। বয়সভেদে যুবতী, দৌচা এবং বৃদ্ধা; বৈবাহিক অবস্থানভেদে অনুঢ়া সধবা এবং বিধবা। বয়সের ত্রিবিধ ক্রমের সঙ্গে বৈবাহিক অবস্থাত্ত্রয় মিলিয়া বিলাতের বাড়ীওয়ালীদিগকে অনেক শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছে। কেহ বা অনুঢ়া ও যুবতী, কেহ বা অনুঢ়া ও দৌচা, কাহারো মধ্যে বা পতিপুত্রহীন জীবনের গুরুপ্রাণতার সঙ্গে বার্ককোর কর্কণতা মিলিয়াছে। তেমনি সধবোর সঙ্গেও যৌবন, প্রৌঢ়, বার্কক্য মিলিত হইয়াছে। কোথাও বা বৈবাহিকের সঙ্গেও এ মিলন হইয়াছে। এইরূপে বিবিধ অবস্থার ও রূপের ও বয়সের মিলনে বিলাতী বাড়ীওয়ালীর অসংখ্য রূপের প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু রূপ অনেক হইলেও বাড়ীওয়ালীর মূল স্বরূপটি একই, বহু নহে। আর এই বহুরূপিণী বিলাতী বাড়ীওয়ালীর সেই স্বরূপটি যে ধরিতে না পারিল, লঙনের মায়াপুরীতে, পদে পদেই তার বিপদ ভার।

যুবতী ও অনুঢ়া, একরূপ বাড়ীওয়ালীর সংখ্যা ৭৬ই কম। পায় দেখা যায় না, বলিলেই হয়। যেখানে এই দুই অবস্থার সমাবেশ থাকে, সেখানে যৌবন প্রায়ই আপনার সহজ ক্রীসম্পদ হইতে নির্ম্মম-ভাবেই বঞ্চিত হইয়াছে। রূপযৌবন-

সম্পন্ন। অনুচা বাড়ীওয়ালী প্রায় দেখা যায় না। কদাচিত্ দেখা গেলেও, ভদ্রলোকে সে সকল বাড়ীতে প্রায়ই আশ্রয় গ্রহণ করেন না। এ শ্রেণীর বাড়ী লগুনে নাই, এমন নয়। কিন্তু বিলাসের লীলাভূমি, পিকিডিলির আশেপাশেই এঁরা থাকেন। এই সকল বাড়ীতে স্বল্প ভাড়ায় আতিথ্যলাভ করা যায় না। এ অঞ্চলে, একখানি বসিবার ও একটি শোবার ঘরের ভাড়া, সপ্তাহে নূনকল্পে ৫০।৬০ টাকা পড়ে। যারা স্বদেশ হইতে বিদেশে কেবল টাকা উড়াইতে যায়, তারাই কেবল এ সকল স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকে। সচরাচর যুবতী বাড়ীওয়ালীরা বিবাহিতা, স্বামীর সঙ্গেই থাকেন, স্বামীর সামান্য আয়ের সঙ্গে আপনাদের এই ব্যবসায়ের আয় মিলাইয়া নিজেদের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করেন। স্বামীর আর্থিক উন্নতিতে ও ক্রমে কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধনের অধিকারিণী হইলে, বিশেষ যখন বৎসর বৎসর পরিবারে নূতন জীবের আমদানি হইতে আরম্ভ করে, তখন এই সকল বিবাহিতা যুবতী বাড়ীওয়ালী অনেক সময় এই ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া, উপনগরীতে “ভদ্রলোকের” মত বাস করিতে আরম্ভ করেন। ভদ্রলোকের মত কথাটা নিরর্থক নয়। ইংরেজ-সমাজে এ সকল বাড়ীওয়ালী বা তাঁদের স্বামীপুত্রকে ভদ্রলোক বা gentleman বলে না। তাঁরা সজ্জন হইতে পারেন, কিন্তু সজ্জন আর জেন্টলম্যান এক কথা নয়। যাদের টাকা নাই, কিংবা বংশ-মর্যাদা নাই, তারা বিলাতী সমাজে

জেন্টলম্যান হয় না। যারা আজ ব্যবসা করিয়া খায়, তারাই যদি কাল ভাগ্যগুণে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া উঠে, অমনি ছোটলোক হইতে একটানে ভদ্রলোক হইতে পারে। আর সকলেরই ভদ্রলোক হইবার আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যারা, যারা দারিদ্র্য হইতে ক্রমে স্বচ্ছলতায় যাইতেছেন, একেবারে লক্ষপতি এখনো হন নাই, কখনও হবারও কোনো দুরাশা নাই, তাঁরাই প্রায় লগুনের উপনগরে যাইয়া ভদ্রপল্লি রচনা করেন। বাড়ীওয়ালীরাও কিছু টাকা কড় জমাইতে পারিলে, অনেক সময়েই আপনার ব্যবসা ছাড়িয়া এই সকল ভদ্রপল্লিতে যাইয়া ভদ্রলোকশ্রেণী-গণ্য হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

যৌবনসম্পন্ন বাড়ীওয়ালী প্রায়ই বিধবা হন। তবে বিধবা বলিয়া পরিচিত বলিয়াই এক সময়ে তিনি সধবা ছিলেন, এমন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। অনুচা যুবতীর পক্ষে অনেকগুলি নিত্য নবাগত অতিথি-অভ্যাগতের ভার গ্রহণ করা ভালো দেখায় না বলিয়া, যুবতী বাড়ীওয়ালীরা, আপনাদের ব্যবসার খাতিরে, বাড়ী ভাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, একেবারে সটান অনুচাবস্থা হইতে বৈধব্যে গিয়া উপস্থিত হন, মাঝখানকার সধবার গবস্থাটা না ছুঁইয়াই একলাফে ডিঙ্গাইয়া পার হইয়া থাকেন। এতে সুবিধা অনেক আছে, অসুবিধা কিছুই নাই। ইংরেজবিধবাকে হিন্দু বিধবার মত ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিতে হয় না। বিলাতী বৈধব্যে আমরণ

নিরামিষেরও ব্যবস্থা নাই, একাদশীর দিনে নিরমু উপবাসও করিতে হয় না। আহার-বিহারে সধবায় বিধবায় কোন পার্থক্য নাই। সাজসজ্জা সম্বন্ধেও, বৈধব্যের আদিকার বৎসরকালের পরে, কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ নাই। বিলাতী বৈধব্যে সমাজ-শাসননিবন্ধন, ভোগবিলাসের কোনো প্রকারের সঙ্কোচ একান্তই অনাবশ্যক। বৈধব্যের আদিতে কতকটা সংযমের ব্যবস্থা আছে সত্য; কিন্তু বিধাতাপুরুষ আপনি যেখানে এ বৈধব্যের বিধান করেন কেবল সেখানেই এ সকল সংযম অবলম্বন আবশ্যক হয়। চক্ষের উপরে যঁারা বৈধবাদশা প্রাপ্ত হন, কেবল তাহাদিগকেই সমাজের মুখ চাহিয়া এ সকল নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। যাদের পূর্ক পরিচয় নাই, যাদেরে সধবা রূপে পূর্ক দেখা যায় নাই, সে সকল অপরিচিতাদের বৈধব্য-গ্রহণে এ সকল সংযমাদি অবলম্বন অনাবশ্যক। এরূপ স্থলে একদিকে, স্বামীর ঐকান্তিক অমুপস্থিতি, আর অতৃদিকে স্ত্রীর অনামিকাতে বিবাহাদুরীয় ধারণ, এই দুটাই বৈধব্যের সন্তোষকর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। এই এক আংটির বলেই অনেক সময় অনুঢ়া বিবাহিতা বলিয়া, এবং অবিবাহিতা বিধবা বলিয়া সমাজে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাঁতে পারেন। বিধবা বাড়ীওয়ালীদের বিবাহের চিহ্নরূপ অনামিকাধৃত অঙ্গুরীয়টাই বৈধব্যের প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়। এই অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়াই তাঁরা একেবারে, “মিন্” হইতে “মিসেস্” হইয়া উঠিতে পারেন। অবশ্য ক্ষুদ্র পল্লিজীবনে এরূপ ভাবে

অনুঢ়ার পক্ষে দেখা রৈধব্যব্যাভ সন্তব হয় না। যেখানে সকলেই সকলকে জানে, সেস্থগে এরূপ অবস্থা বিপর্যয় ঘটাইতে হইলে, বছর দুবছরের জগ দেশত্যাগী হইয়া থাকা আবশ্যক হয়। কিন্তু গণ্ডন তো সহর সহে, এক বিশাল সাহারা! এ মরুভূমে কে কাকে চেনে? কে কার খবর রাখে? এক পল্লিতে যে সুপরিচিত, অত পল্লিতে সে একান্তই অপরিচিত। এক পল্লিতে যে অনুঢ়া, অপর পল্লিতে যাইয়া সে বিবাহ না করিয়াও বিবাহিতা কিম্বা বিবাহিতা না হইয়াও বিধবা সাজিয়া বসিতে পারে। এই জগুই অনেক রূপযৌবনবতী বিধবা বাড়ীওয়ালীর বৈধব্যটা সত্য না স্বরচিত, ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

বিলাতে সকল প্রকারের ব্যবসাতেই রূপ জিনিষটা বড় কাজে লাগে। যে আপনার দোকান জাঁকাইয়া তুলিতে চায়, সে বাছিয়া গুছিয়া রূপসী চাকরাণী জুটাইয়া আনে, এঁরা মোহিনী সাগ্রে সাজিয়া, গ্রাহকদিগকে আকর্ষণ করেন। এঁরা সকলেই বা অধিকাংশই যে অসচ্চরিত্র এমন মনে করা অসম্ভব। অনেক সতী লক্ষ্মী এঁদের মধ্যে থাকেন, যঁারা দরিদ্র পরিজনদের ভরণপোষণের জগ এই দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হ'ন। এ সকল লোককে দেখিলেই চেনা যায়। এঁদের নিজের রূপের জ্ঞান আছে—কোন রমণীর তাহা নাই?—কিন্তু রূপের অহঙ্কার নাই। প্রসাধনের পটুতা আছে—কোন রমণীই বা প্রসাধনে উদাসীন?—

কিন্তু বিলাতের অসংখ্যম নাই। বিধাতা তাঁদের রূপ দিয়াছেন, তাই তাঁরা সহজেই চাকুরী পান; কিন্তু নিজেরা কদাপি লোক ভুলাইবার জ্ঞাত আপনাদের মোহিনী মায়া বিস্তার করেন না। কেবল রূপের জোরে চাকুরী জুটিল এ কথা ভাবিতেও এঁদের লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু “যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ;”—দেশের এই রীতি। দোকান-পসার খুলিয়া বসিলে, ব্যবসার খাতিরে, গ্রাহক জুটাইবার জ্ঞাত যেমন ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাজ-সজ্জা সুন্দর ও সুচারু করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ রূপলাবণ্যবতী সুশিক্ষিত চাকরাণীও রাখা প্রয়োজন হইয়া থাকে। বাড়ীওয়ালীর ব্যবসাতেও এ নিয়মের অতিক্রম করিলে চলে না। বোর্ডিংটাকে জাঁকাইতে হইলে, আসবাবে ও চাকরচাকরাণীতে উভয় ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য্য সাধন আবশ্যক হয়। বাড়ীওয়ালী যেখানে আপনি রূপ-যৌবন-সম্পত্তা সেখানে তো কথাই নাই। কিন্তু ব্যবসায় মূলধনের যতটা প্রয়োজন, রূপের প্রয়োজন ত ততটা নয়। যার টাকা আছে, তার রূপও থাকিবে, এমনো ত কোন কথা নাই। বিশেষ অনেক সময় রূপ, যৌবন, ও সঞ্চিত ধন যেখানে মিলিয়া যায়, সে স্থলে রমণী প্রায়ই আপনার ইচ্ছায় না হইলে, অনুচা থাকে না। তাঁদের আর বাড়ীওয়ালী হইয়া জীবিকা উপার্জন করিতে হয় না। অনেক সময় প্রকৃত বাড়ীওয়ালী যিনি, অর্থাৎ যার টাকাতে ব্যবসা চলে, তিনি রূপসী নহেন। এ সকল ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম

তিনি নূতন অভাগতের চক্ষুর অন্তরালে থাকেন। যে বাড়ীওয়ালীর আপনার তেমন রূপ নাই, তিনি চাকরাণী নিয়োগে অসাধারণ রূপলাবণ্য খুঁজিয়া থাকেন। এ সকল চাকরাণীই প্রথমে ঘরদোর দেখাইয়া, অতিথির সঙ্গে সকল বন্দোবস্ত করে; ক্রমে ক্রমে বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়।

বিলাতের বাড়ীওয়ালীর রূপ অনেক, কিন্তু স্বরূপ এক, এ কথা বলিয়াছি। রূপতঃ কেহ অনুচা, কেহ সধবা, কেহ বিধবা। কেহ সুন্দরী, কেহ সাধারণী, কেহ একান্তই কুৎসিত। কেহ বা যুবতী, কেহ বা প্রৌঢ়া, কেহ বা বৃদ্ধা। এ সকল রূপভেদ অনেক আছে। কিন্তু স্বরূপে প্রায় সকল বাড়ীওয়ালীই এক। সে স্বরূপে বিলাতের বাড়ীওয়ালী নারী নহেন, কিন্তু রাক্ষসী; মানবী নহেন, কিন্তু শকুনী। শোষণই রাক্ষসের ধর্ম্ম; ভক্ষণই শকুনীর একমাত্র কর্ম্ম। রাক্ষসী মোহিনী মায়া জানে, বিলাতের বাড়ীওয়ালীও মায়াবিনী কম নহেন। শকুনী জীবের মাংস টানিয়া খায়, শেষে অস্থিমাত্র পড়িয়া থাকে। বাড়ীওয়ালীও, যতটা সাধ্য, আপনার আশ্রিত অতিথিদিগের অস্থিমাত্রাবশিষ্ট রাখিয়া তাঁর আর যা কিছু আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। দিবার সময় ইঁহারা মায়াবিনী, নিবার বেলা রাক্ষসী। খাটি বিলাতী বাড়ীওয়ালীর থল্লরে একবার পড়িলে, জীবের আর মুক্তির আশা থাকে না।

মানবের জন্মকথা

পশুশালায় একটা বানরের দাঁত সবল ছিল না, সে পাথরের আঘাত দিয়া সুপারি ভাঙ্গিত; পশুশালায় রক্ষকগণ আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ বানর পাথর খণ্ড দ্বারা কার্য্য করিয়া খড়ের নীচে লুকাইয়া রাখিত, উহাকে অল্প বানরকে হাত দিতেও দিত না। এই খানেই সম্পত্তির বোধ জন্মা লক্ষিত হয়; কিন্তু প্রত্যেক কুকুর যখন অস্থিখণ্ড লইয়া অপরের সহিত ঝগড়া করে, অথবা পক্ষিগণ যখন নিজ বাসা দখল করে তখন তাহারাও সম্পত্তির বোধ থাকা দেখায়।

ডিউক অব আর্গাইল বলেন যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যবশতঃ তদনুরূপ ভাবে যন্ত্র নির্মাণ করা মানুষের একটা বিশেষত্ব; সুতরাং তিনি বিবেচনা করেন যে, এই হেতু বশতঃ মানুষের সহিত পশুর অলঙ্ঘ্য প্রভেদ। এই প্রভেদ অবশ্য উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সার জে, লাবক যাহা বলেন তাহার মধ্যে অনেক সত্য নিহিত আছে। তিনি বলেন মানুষ প্রথম যখন কোন কারণে পাথরের যন্ত্র ব্যবহার করে, তখন হঠাৎ উহা ভাঙ্গিয়া গেলে উহার তীক্ষ্ণধার খণ্ডগুলি ব্যবহার করিয়াছিল। এই অবস্থার পরে ইচ্ছাপূর্বক প্রস্তর ভাঙ্গিয়া ব্যবহার করা সহজ কথা, এবং তৎপরে প্রস্তর হইতে কোন মতে যন্ত্র গঠন করাও খুব কঠিন কথা নহে।

প্রস্তর-যুগের* মানুষ কত দীর্ঘকাল পরে

* যে যুগে মানুষ পাথরের যন্ত্র ও অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত।

প্রস্তরের যন্ত্রাদি ঘষিতে ও পালিস্ করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে প্রস্তরের যন্ত্র গঠন করিতেও দীর্ঘ সময় আবশ্যক হইয়া থাকিবে। সার জে, লাবক ইহাও বলেন যে প্রস্তর ভাঙ্গিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত, এবং পালিস্ করিতেও তাপ উৎপন্ন হইত। সুতরাং “যে দুই উপায়ে অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহা এইরূপে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে।” যে সকল প্রদেশে আগ্নেয়-গিরি হইতে ধাতু-জ্ঞান নির্গত হইয়া অরণ্য মধ্য দিয়া প্রাপ্ত হইত সে সকল স্থানে অগ্নি কি পদার্থ তাহা ঐ ঘটনা হইতেই জ্ঞাত হইত। উচ্চশ্রেণীর বানরগণ সম্ভবতঃ সহজ বৃত্তির উত্তেজনায় অস্থায়ী মাচা* প্রস্তুত কবে; কিন্তু অনেক সহজ বৃত্তি বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত হয়, সুতরাং ঐ কর্ম্মও অনায়াসেই ইচ্ছাপূর্বক ও জ্ঞান-পূর্বক অমুষ্টিত কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে। ওরাও ওটাং রাত্রিকালে পাণ্ডেনাস্ পত্রে দেহাচ্ছাদন করে, ইহা জানা গিয়াছে। ব্রেস বলিয়াছেন যে তাহাদের একটা বানর রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত খড়ের মাত্র মাথার উপর দিয়াছিল। এ সকল নানাপ্রকারের আচরণ হইতে আমরা সম্ভবতঃ কতিপয় সরল শিল্প-কৌশলের প্রথম সূচনা বুঝিতে পারি। যাহা হইতে মানব জাত হইয়াছে, সেই আদিম পূর্ব-পুরুষগণ মধ্যে স্থাপত্য ও পরিচ্ছদ-রচনা কিরূপে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ ঐ সকল আচরণেই দেখা যায়।

* Platform.

সামান্য গুণানুভূতি, * সাধারণ সংস্কার, অহংজ্ঞান এবং ব্যক্তিত্ব, এই সকল উন্নত মনোবৃত্তি জন্তুগণের আছে কি না তাহা নির্ণয় করা, আমা অপেক্ষা যিনি অধিক জ্ঞানেন তাঁহারও দুঃসাধ্য। কারণ উহা দিগের মনোমধ্যে কি হইতেছে তাহা বুঝা কঠিন; এবং গ্রন্থকারগণ মধ্যে ঐ শব্দগুলির অর্থসম্বন্ধেও গুরুতর অনৈক্য। সম্প্রতি যে সকল নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সামান্য গুণানুভূতি অথবা সাধারণধর্ম পরিজ্ঞাত হইবার শক্তি জন্তুগণের নাই—ইত্যাকার মতই সর্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তার সহিত প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু যখন একটা কুরুর দূরে অথ কুরুরকে দর্শন করে, তখন নিশ্চয়ই সে এই মাত্র বুঝিতে পারে যে ঐ দূরস্থ পদার্থ কুরুর (জাতীয়); কারণ ঐ দূরস্থ কুরুরটী যদি উহার পূর্বপরিচিত সুহৃদ হয়, তবে সে নিকটে আসিলে উহার ভাব তদগোঁই পরিবর্তিত হইয়া যায়। সম্প্রতি একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে এইরূপ স্থানে জন্তুগণের মানসিক অবস্থা মানবের তায় নহে, এক কথা বলা অনর্থক বলা মাত্র। এক্ষেত্রে মানব যদি ইন্দ্রিয়গাহ বিষয়কে মানসিক সংস্কারবণতঃ অনুভব করিতে সক্ষম হয়, তবে জন্তুগণও হয়। আ ম অনেক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যখনই আমার টেরিয়ার কুরুরকে বলি, “হিঃ হিঃ ওটা কোথায়?” তখনই সে বুঝিতে

পারে, কিছু অনুসন্ধান করিতে হইবে; তৎপরে প্রায়ই সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে এবং দ্রুতগতি নিকটস্থ জঙ্গলের দিকে দৌড়াইয়া গিয়া শিকারের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ঘ্রাণ লইতে আরম্ভ করে; যখন কিছুই পায় না তখন কাঠ বিড়াল পাইবার আশায় নিকটবর্তী বৃক্ষের উপরদিকে দৃষ্ট নিষ্কোপ করে। একটা কোন জন্তু অনুসন্ধান ও শিকার কবিত্তে হইবে, এরূপ এক সাধারণ সংস্কার উহার মনে উদয় হইয়াছিল, ইহা কি ঐ সকল কর্ম দেখিয়া বুঝা যাইতেছে না?

কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, জীবন কি, মৃত্যু কি? ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করাকেই যদি অহংজ্ঞান (=অহংকার) বলা যায় তবে ইহা অবাধে স্বীকার করিতে হয় যে ইতর জন্তুগণের অহংজ্ঞান নাই। কিন্তু বুদ্ধ শিকারী কুরুরগণ অতীত কালের শিকার বিষয়ক সুখ দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা করে না, এক কথা নিশ্চিতরূপে কেমন করিয়া বলা যায়? কারণ উহাদিগের উত্তম স্মৃতিশক্তি ও কল্পনাশক্তি আছে, তাহা উহাদিগের স্বপ্ন-দর্শন হইতেই বুঝা যাইতেছে। ঐরূপ চিন্তাই ত এক প্রকারের অহংজ্ঞান। পক্ষান্তরে অতি অগভ্য নীচ অষ্টেলিয়ানের কর্মক্রান্তা জ্ঞী যে গুণবাচক শব্দই জানে না, চারি সংখ্যার অধিক বলিতে পারে না, সে অহংজ্ঞান পরিচালনা অতি কমই করে, এবং নিজের অস্তিত্বসম্বন্ধে চিন্তাও করে না বলিলেই হয়, ইহা বুক্‌নার দেখাইয়াছেন। প্রায় সকলে স্বীকার করেন যে উচ্চ শ্রেণীস্থ জন্তুগণের স্মৃতি, মনোযোগ, ভাব-

* বহু পদার্থের সাধারণ ধর্মকে সামান্য গুণবলিলাম, তাহাকে সামান্য গুণানুভূতি বলা হইল। ইহাকে জাতি-বোধও বলা যাইতে পারে।

সংযোগ, কিঞ্চিৎ কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধি আছে। এই সকল বৃত্তি বিভিন্ন জন্তুর বিভিন্ন পরিমাণ; তথাপি যদি এ সকল উন্নতিগীল হয়, তবে সরল বৃত্তি সকলের সংমিশ্রণে ও বিকাশে সামান্য গুণাত্মভূতি ও অহংকান প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত জটিল মনোবৃত্তি সকল সঞ্চারিত হওয়া বেশি অসম্ভব গণ্য হইতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ তর্ক করেন যে জীবের

উন্নতি সোপানের কোন স্তরে ঐ সকল বৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব; কিন্তু আমাদের শিশুদের মনে ঐ সকল বৃত্তি কখন উদয় হয় তাহাটী বা কে বলিতে পারে? আমরা কেবল দেখে এই দেখিতে পাই যে ক্রমে ক্রমে অলঙ্কিত ভাবে ঐ সকল বৃত্তি শিশুদের মনে বিকশিত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশধর রায়।

খোদা মালিক হায়

জানি না কি এক খেয়ালের বশে আমি প্রস্তাব করিয়া বসিলাম, এবার গ্রীষ্মাবকাশে দিল্লী বেড়াইতে যাওয়া যাক্ বন্ধুর কিশোরীমোহন অমনি মহা উৎসাহে আমার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন, উৎসাহ জিনিষটার কিশোরীর কখন অভাব দেখি নাই। বাল্যকাল হইতে দুজনে একসঙ্গে পড়িতেছি বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, কি সভা-সম্মান, কি চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান, সকল বিষয়েই কিশোরীর সমান উৎসাহ। ফুটবল, ক্রিকেট টেনিস্ খেলায় সে সকলের আগে। মোট কথা নিজের কাজ ছাড়া আর সকল বিষয়েই সে উৎসাহাশ্বিত

তখন স্থির হইয়া গেল আগামী রবিবার সন্ধ্যার এক্সপ্রেসে আমরা দিল্লী রওনা হইব। এদিকে কিশোরীর উৎসাহ যত বাড়িতে লাগিল আমার উৎসাহ সেই অনুপাতে কমিতেছিল, আমি পূর্বে স্থির করিয়াছিলাম এবার গ্রীষ্মটা বাংলার এক নিভৃত কোণে আমাদের

ক্ষুদ্র গ্রামটিতে কাটাইব। তাই যতই সেই ছায়াশীতল চিরশান্তিময় গ্রামের বাড়ীটি মনে পড়িতে লাগিল ততই কোলাহলময় রোদ্রতপ্ত হৃৎক দিল্লী শহরের উপর রাগ হইতে লাগিল। শনিবারের সন্ধ্যার পূর্বে কিশোরী কোঠা হইতে আমার মেসে আসিয়া উপস্থিত এবং তখনও আমার কিছুই গোছ গাছ হয় নাই দেখিয়া নিজেই আমার পেটের গোছাইতে বসিয়া গেল আমি চিরকাল ঢিলা স্বভাবের মানুষ—কিশোরী ঠিক তার বিপরীত। সে আধঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করিয়া ফেলিল, যাবার সময় বলিয়া গেল “আমি কাল ঠিক পাঁচটার সময় গাড়ী লইয়া আসিব আজ তুমি তোমার বন্ধু প্রফেসর যাকে একটা তার করিয়া দিও। দেখো ভুলো না, জানু তখবর না দিয়ে খণ্ডরবাড়ী গেলেও কি বিপদ হয়, এটা নেহাত কবিকল্পনা নয়।”

শেষে কিশোরীর উৎসাহের প্রবল বত্মার স্রোতে আমরা দিল্লী আসিয়া

পৌহাইলাম। টেনের কটে যখন আমার উৎসাহের লেশমাত্র অশিষ্ট ছিল না, তখনও কিশোরীর হাতে আমার নিস্তার নাই। আমি অন্তত এক সপ্তাহ কাল বিশ্রামের প্রস্তাব করিবা মাত্র কিশোরী কুতব-মিনার দেখিতে যাইবার গাড়ী ঠিক করিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া স্থিতি ও গতির সংঘাতে গতিই জয়লাভ করিল। আমরা একে একে দিল্লীর যাবতীয় দ্রষ্টব্য ও অদ্রষ্টব্য সমস্তই দেখিয়া শেষ করিলাম। তারপর আমি যখন পারী বিশ্রাম-স্থলের কল্পনায় মগ্ন, তখন কিশোরীখোহন বলিয়া বলিল “চল এখন আমরা দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াই। এতদিন আমরা যাহা দেখিলাম তাহা বিদেশী ‘টুরিষ্টে’র মত দেখা কিন্তু ইহা ত বাস্তবিক দেখা নয়। কোন শহর দেখিতে হইলে সেখানকার লোকের সঙ্গে মিশিয়া তার হাট-বাজার তার রাস্তা-গলি, তার ভাল-মন্দ, সেখানকার আনন্দ-উৎসব সবই দেখিতে হইবে।” ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বন্ধুর এতব্ধের যথার্থ স্বীকার করিয়া লইয়া শারীরিক অসুস্থতার ক্ষীণ আপত্তি করিলাম মাত্র। কিন্তু তাহা টিকিল না, বাহির হইতে হইল।

(২)

এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন প্রাতে আমরা চাঁদনীচকের রাস্তায় সুবিখ্যাত “মৌনেনরী মসজিদের” সামনে ফোয়ারার ধারে বসিয়া আছি, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড গাড়ী আসিয়া উপস্থিত।

তাগতে কয়েদী তরা, উপরে, পাশে, পিছনে ‘হাতিয়ার-বন্দ’ সিপাহী। গাড়ীটা যখন মোড়ের কাছে আসিল, তখন কোথা হইতে একটা রুকা ও একটা যুবতী দৌড়িয়া আসিয়া একজন কয়েদীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে গাড়ীর পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিল। তাহাদের কি কথা হইল শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু গাড়ীখানা যখন কুইন্স গার্ডেনের দরজায় তখন রুকা ও যুবতী নামিয়া গেল এবং কয়েদী চিৎকার করিয়া বলিল “তোমরা ভয় করো না। বাড়ী ফিরিয়া যাও, রামজী অবশ্যই দয়া করিবেন।”

কথাটা শুনিয়া আমাদের উৎসুক্য বাড়িয়া গেল। কিশোরী বলিল, “ব্যাপারটা কি জানিতে হইবে।” তারপর দু তিন দিন আমরা ঠিক সময়ে ফোয়ারার ধারে বসিয়া থাকিতাম এবং দেখিতাম রুকা যুবতীর হাত ধরিয়া মোড়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীখানি আসিলে আবার তাদের সেই কয়েদীর সঙ্গে কথা হইত। চতুর্থ দিনে কিশোরী বলিল, “আজ যেমন করিয়া হউক, ইহাদের বুভুক্ষু জানিতে হইবে।”

রুকা ও যুবতী তখন ‘পরেটাওয়ালী’র দোকানে গিয়া বসিয়াছে, কিছুক্ষণ পরে তাহার কয়েকখান মোটা রুটি লইয়া বাগানের মধ্যে গেল। তাহাদের আহালাদি হইয়া গেলে কিশোরী ধীরে ধীরে তাদের কাছে গেল—আমিও তাহার অনুগমন করিলাম। রুকার সহিত কিশোরী যখন কথা কহিতে গেল, তখন প্রথমে সে

অত্যন্ত সন্দেহের সহিত আমাদের দু'জনকে দেখিয়া লইল—কিন্তু কিশোরীর একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল সে সহজেই লোকের সহিত আত্মীয়তা করিয়া লইতে পারে। বুদ্ধাও ক্রমে এই বিদেশী, মিষ্টভাষী সুদর্শন যুবার উপর প্রসন্ন হইল। কিশোরী ক্রমে ক্রমে তাহাদের সমস্ত কাহিনী জানিয়া লইল। বুদ্ধা বলিল, —“বাবুজী সহর হইতে ক্রোশখানেক দূরে একটি ছোট গ্রামে আমাদের বাড়ী। আমরা জাতে জাঠ। যত দিন আমার স্বামী জীবিত ছিল, ততদিন আমা দর বড় সুখের সংসারই ছিল। ত্রিশ চল্লিশ বিঘের চাষ, দুজো গা ‘বয়েল’, তা’ ছাড়া গাই-মোষও ছিল। আজ তিন বছর হ’ল আমি ‘বেওয়া’ হইয়াছি—তারপর বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে এ পড়কির কপাল পুড়িল। এর ‘খণ্ডরালে’ বড় কষ্ট। খাণ্ডডী বড় বয়না দেয়, বিধবা হওয়ার পর ইহার উপর অত্যাচার বাড়িয়া গেল। তাই ভাবিলাম ছেলে “হসিয়ার” হয়েচে ঘবে খাওয়ার কষ্ট নাই, ইহাকে আমার কাছে আনিয়া রাখি কিন্তু তখন জানিতাম না যে ইহাই আমাদের কাল হইবে। আজ ছ’মাস হো’ল যমুনা আমার কাছে এসেছে তা’ এক দিনও আমাদের সুখে গেল না। যমুনা আসার পর হ’তে আমাদের গাঁয়ের ‘লম্বরদারের’ বড় ছেলে কিছু ধন ধন আমাদের বাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করিল; তা আমি ভাবিলাম— আমাদের এ দুঃখ হুর্দিনে সে আমাদের খবর লইতে আসে; তারপর এক দিন

যমুনা কাদিতে কাদিতে আমার কাছে সব কথা বলিল। আমি তাকে বুঝাইয়া শান্ত করিলাম—আর গোদন হ’তে লম্বরদারের ছেলের বাড়ী ঢোকা বন্ধ করিয়া দিলাম। শিউরতনকে কিছু বলিলাম না, কি জানি ‘যোয়ান’ মানুষ রাগের মাধ্যম কি বলে! যতদিন বড় লম্বরদার বাঁচিয়া ছিল ততদিন একরকমে গেল, তারপর সেই বড় ছেলে হটল গাঁয়ের লম্বরদার, আমাদেরও বিপদের সূত্রপাত হইল। সে পথে ঘাটে যমুনাকে দেখিয়া ঠ টা বিক্রপ করিতে আরম্ভ করিল, তার পর যমুনার নানা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। একদিন শিউরতন কোথা হ’তে সেই সব কথা জানিয়া আমাদের খুব ভৎসনা করিল এবং নূতন লম্বরদারকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তার ভগিনীকে অপমান করিলে সে সহজে ছাড়িবে না—জান দিয়াও সে ইজ্জৎ রক্ষা করিবে।

“ইহার পর যমুনার উপর প্রকাশ্য অপমান এক হইল বটে, কিন্তু আমাদের উপর অত্যাচার সুরু হইল। এখন প্রায়ই আমাদের গাই-মোষ খোঁয়াড়ে চালান বাইতে লাগিল, জমীজমা লইয়াও গোল বাধিল। আমাদের একখান ক্ষেত অগ্নে দখল করিয়া লইল, তার কোন প্রতিকার হইল না। একদিন কি এক সামান্য অপরাধে লম্বরদার শিউরতনের এক টাকা জরিমানা করিল, শিউরতন টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাকে সমস্ত দিন কাছারীতে বসাইয়া রাখিল, সন্ধ্যার সময়

খবর পাইয়া আমি টাকা দিয়া তাকে ছাড়াইয়া আনি।

“তারপর আজ পনের দিন হইল সন্ধ্যার পর যমুনা কুয়া হইতে জল লইয়া ফিরিতেছিল, পথে লম্বরদার তাকে আটকায়, সে ভয়ে চাৎকার করিয়া উঠে, শিউরতনও সেই সময় ক্ষেতের কাণ্ড করিয়া ফিরিতেছিল, সে ছুটিয়া গিয়া লম্বরদারকে বেশ ঘা কতক দিয়া যখনাকে বাড়ী লইয় আসে। লম্বরদার ছুটিয়া না পালাইলে একটা খুনখারাপি হওয়া অসম্ভব ছিল না। পরদিনই শুনিলাম রাত্রে লম্বরদারের বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে, ‘খানেন্দার’ সাহেব তদন্ত করিতে আসিয়াছেন, —দেখিতে দেখিতে চৌকীদার গাঁ ভরিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় খানেন্দার সাহেব শিউরতনকে বাঁধিয়া লইয়া গেল—সে না কি লম্বরদারের বাড়ী হইতে ক’খানা বাসন চুরি করিয়া দিল্লীতে বেচিয়া আসিয়াছে। সব কথা শুনিয়া আমি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলাম, আমাকে কাদিতে দেখিয়া যমুনা বলিল, ‘মা-জি, এমন করে’কৈদে কি কোন উপায় হবে। এরা ত দাদাকে সরাইয়া দিল, এর পর আমাদের কে রক্ষা করিবে, এ গাঁয়ে থাকতে পারব না তার চেয়ে চল দিল্লীতে যদি কোন উপায় হয়, দাদার যদি জেল হয় তবে আর গাঁয়ে ফিরব না, দিল্লীতে খেটে খুটে খাব।’ তাই হাতে, যা পয়সাকড়ি ছিল লইয়া দিল্লী আসিয়াছিলাম। কিন্তু এ সহর ‘সমুন্দর’ কোথায় আমার বাছার সন্ধান পাইব। শেষে রামজী দয়া করলেন,

পরন্তু আমরা ঐ পরেটাওয়ালীর দোকানে বসে আছি, এমন সময় দেখি একখানা গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া ফোরারার সামনে দাঁড়াইল, কত লোক ছুটিল আমরাও গেলাম, দেখি সেই গাড়ীর মধ্যে শিউরতন, বেটার হাতে পায়ে শিকল, তবু তার মুখ খানি দেখিয়া প্রাণ বাঁচিল। সে আমাকে কত ‘দিলজমি’ করিল, আমি ছুটিয়া তার কাছে যাইতেছিলাম, কিন্তু একটা সেপাই ‘সঙ্গ নের’ খোঁচা দিয়া আমাকে সরাইয়া দিল—তারপর গাড়ী মেরামত হইলে তারা আমার বাছাকে লইয়া গেল। শিউরতনের মুখ খানি দেখিব বলিয়া তার পরদিনও আসিলাম, আবার দেখা হইল, আছো দেখিলাম তার বিচার না কি এখনও হয় নি, শীঘ্র হ’বে, তবু একবার করে তাকে কাছারী নিয়ে যায়।”

অশ্রুপাত করিতে করিতে বৃদ্ধা তাহার কাহিনী শেষ করিল, যমুনার দিকে চাহিলাম, তারও হই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু মুখে একটা স্থির প্রতিজ্ঞা একটা দৃঢ়তার ভাব। জানি না সে কি ভাবিতেছিল। বৃদ্ধা বলিল—“বাবুজী, তোমরা গাঙ্গালী, ওনেছি তোমরা না কি সাহেবদের সঙ্গে খুব বাৎ চীত কর্তে পার, তা বলে কয়ে আমার শিউরতনকে খালাস করে দিতে পার না?” যমুনাও সেই সময়ে একদৃষ্টে আমাদের পানে চাহিল—অত্যাচারপাড়িতা, অত্যাগিনী বিধবার সে দৃষ্টে কি গভীর বিষাদ, কি করুণ মিনতি।

কিশোরী বলিল—“মা-জি, তুমি কাল ঠিক এই সময়ে এখানে এস—আজ যদি তোমার ছেলের বিচার মন হইয়া যায় তবে কাল আমরা এর ব্যবস্থা করব।”

(৩)

কিশোরী বাড়ী ফিরিয়াই বঙ্গবর প্রফেসর য—কে ধরিয়া বাসিল, এখানে তাঁর কোন পরিচিত উকিল আছে কি না, থাকিলে এখনি তাঁর কাছে যাইতে হইবে। বঙ্গবর একটু ‘স্বাবর’ গোছের লোক, কিন্তু কিশোরী তাঁহাকে কিছুতেই স্থির হইতে দিল না, তখনই গাড়ী ডাকাইয়া য—বাবুর বন্ধু একটি নব্য উকীলের বাড়ী গেল। সমব্যবসায়ী কাজেই কিশোরী অতি সহরেই উকীল সাহেবের সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইল এবং শিউরতনের মোকদ্দমার সমস্ত বিবরণ বলিয়া, তাঁহাকে মোকদ্দমা চালাইবার তার দিল এবং তৎসঙ্গে ফিস্ দিতেও জুলিল না। উকীল সাহেব ফিস্ লইতে আপত্তি করিলে—“কিশোরী অমানবদনে বলিল—“এ টাকা সেই বুড়ীর।”

সাক্ষ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল—পর দিন শিউরতনের বিচার। উকীল সাহেব অভিযোগের বস্তান্ত ও অজ্ঞাত কাগজাতের নকল লইয়াছেন। রাতে কিশোরী আগার উকীলের বাড়ী গেল এবং কাগজাদি দেখিয়া তাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া আসিল। তাঁদের উভয়ের মত হইল—যমুনাকে সাক্ষী মানিয়া আসল ঘটনা প্রমাণ করা। কিন্তু বুঝা কিছুতেই রাজী হইল না, বলিল—“বাবুজি, যমুনা কেমন

করিয়া অত লোকের মাঝে গিয়া এ সব কথা বলিবে! এ ছাড়া আর যদি কোন উপায় থাকে ত দেখ। আমার ত এই মত—তবে আমি বুড়ো সুড়ো মানুষ, একবার শিউরতনকেও জিজ্ঞাসা করে দেখ—সে কি বলে।” উকীল সাহেব জেগে শিউরতনের সঙ্গে দেখা করিলেন—তারও ঐ কথা, “জান কবুল সেও ভাল, কিন্তু আবরু খোয়াইতে পারিব না।”

পরদিন শিউরতনের মোকদ্দমা উঠিল, তাহার দোষ প্রমাণ করিবার সাক্ষীর অভাব হইল না, গ্রামের তিন চার জন সাক্ষী উপস্থিত হইল, পুলিশের ‘তদ্বিরে’ একজন বেগিয়া আসিয়া সাক্ষ্য দিল যে এই ব্যক্তিই তার কাছে ক’খানা থালা ও লোটা ইত্যাদি বেচিতে আসিয়াছিল—সে বেশ দক্ষতার সহিত শিউরতন ও চোরাই মাল সনাক্ত করিল, জেরায় তাহাকে কিছুতেই টলাইতে পারা গেল না। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে শিউরতন দোষী প্রমাণিত হইল—তার তিন মাস সশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা হইল।

* * * * *

কাছারী হইতে ফিরিয়া কিশোরী মাননুখে একটা আরাম কুর্চিতে শুইয়া পড়িল, আজ আর তার কোন উৎসাহ নাই, তার রকম দেখয়া আমি একটু চিন্তিত হইলাম। পাঁচটার সময় আমি বলিলাম—“দেখ, এমন করে শুয়ে থাকলে ত হবে না, বুড়ী ও যমুনা মোকদ্দমার খবরের জ্ঞে কত উৎসাহ হয়ে রয়েছে, তাদের ত একটা সংবাদ দেওয়া চাই, চল, উঠ।”

একধান গাড়ী ডাকাইয়া আমরা ভরিয়া উঠিয়াছে। কাজেই আমাকে চাঁদনীচকে “সোনেরী মলজিদের” সামনে হুমুখের কাজ করিতে হইল! সংবাদ পৌঁছিলাম। দেখি বৃদ্ধা ও অভাগিনী শুনিয়া বৃদ্ধা রাত্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে যখন বলিল—“বাবুজী, তবে আমাদেও কি উপায় হবে?” কি উত্তর দিব ভাবিতেছি—এমন সময় কে বলিয়া উঠিল—“খোদা মালিক হায়!”—চাহিয়া দেখি একজন আজ আর কথা নাই—তার চোখ জলে অন্ধ ভিখারী!

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

সারদোৎসব

নব নির্মল	গগণের তল	বিশ্বজননী	আসিছে, অবনী
শুভ্র নীরদপুঞ্জ,			রচিছে পুঞ্জার অর্ঘ্য;
যেত কাশ-কুলে	শোভে প্রান্তর,	চরণ-পরশ	লভিতে, ভূতলে
শেফালি-রাশিতে কুঞ্জ।			নামিয়া আসিছে স্বর্গ।
বহিছে সুপীর	শীতল সমীর	গগনে পবনে	নিখিল ভুবনে
আকুল কুসুম-গন্ধে,			উছলে মিলনানন্দ,—
গাহে বিহঙ্গ	মঙ্গল-গীতি	উৎসবে আজি	এস স্বরা সবে
হরষে ললিত-চ্ছন্দে।			ছাড়ি যত দ্বিধা বন্দ!
ছুটিছে তটিনী	সাগর-গামিনী	জননী! জননী!	—ওই উঠে ধ্বনি—
যুছি লয়ে ধূলি পঙ্ক,			শারদা! বিশ্বধাত্রী।
হুলায় ধরনী	শ্রামল আঁচল	এস মা, এস মা,	সুখমাকুপিণী,
—উজ্জ্বল অকলঙ্ক।			চিরমঙ্গল-দাত্রী।
গরসে জ্বল	কুমুদ কমল	এস এস অয়ি	আনন্দমরি,
ছুটিয়া উঠেছে রঙ্গে,			বিষাদ-মলিন বঙ্গে,
দিকে দিকে একি	পুলক-বিকাশ	বিজ্ঞা ঋদ্ধি	শক্তি সিদ্ধি
আজি প্রকৃতির সঙ্গে!			লয়ে পুন তব সঙ্গে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

মুদ্রা মনস্তর

বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সময় হইতেই কোম্পানী বাহাদুর মুদ্রা-বিভাগে পতিত হইয়াছিলেন। তখন কোম্পানীর মাদ্রাজের টেকশালা হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। সেই মাদ্রাজী মুদ্রা ভারতের প্রায় সর্বস্থানেই চলিত। দক্ষিণপথের ব্যয়নির্বাহের জ্ঞাত উহা প্রেরিত হইত।

বাদশাহের আমলে সিকা টাকার প্রচলন ছিল। কোম্পানী বাহাদুর যে টাকা প্রস্তুত করিতেন সিকা টাকার মূল্য তাহা অপেক্ষা শতকরা ১২০ টাকা অধিক ছিল। কোম্পানী বাহাদুর সে জ্ঞাত বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ছিলেন। তাই নবাব-দরবারে যথাবিধি উৎকোচ প্রদান করিয়াও তাঁহারা মুর্শিদাবাদে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেন। বাদশাহ শেষে তাঁহাদিগকে সে আদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুর্শীদ কুলীখাঁ বাদশাহের ফরমান অগ্রাহ্য করিলেন এবং কোম্পানী বাহাদুরকে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার প্রদানে সন্মত হইলেন না। ইতিহাসবিশ্রুত ছিয়াত্তরের মনস্তরে বাঙ্গালার যেমন ধাতু ও তণ্ডুল মহার্ঘ এবং দুপ্রাপ্য হইয়াছিল। মুদ্রার অবস্থাও তাহাই ঘটিয়াছিল!

বাঙ্গালা হইতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ইংলণ্ড প্রভৃতি নানাস্থানে চলিয়া যাইত। সেকালে বাঙ্গালার অর্ধে বোম্বাই জীবিত ছিল, মাদ্রাজের ইংরাজ-সম্প্রদায় প্রতিদিন সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছিলেন। শেষে একদিন এমন অবস্থাও আসিয়াছিল, যে দিন

কোম্পানী বাহাদুর বিলাতে জানাইয়াছিলেন বাঙ্গালার কল্পরন্ধ্রে আর অমৃত ফল নাই, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে পাঠাইতে পাঠাইতেই সমুদায় নিঃশেষে ফুরাইয়াছে! *

কোম্পানী বাহাদুর তখন কেবল বাঙ্গালার নবাব ছিলেন না, তাঁহার তখনো বাঙ্গালার ঐদেশিক বণিক। সুতরাং বাণিজ্যব্যাপদেশে তাঁহারাও প্রতিবৎসর বাঙ্গালার ৩০ লক্ষ মুদ্রা চীন দেশে লইয়া যাইতেন। † বাঙ্গালার মুদ্রা এইরূপে প্রতিদিন স্বেন মস্তকুহকে উড়িয়া যাইতে ছিল।

মুসলমানগণ যখন বাঙ্গালার কর্তা ছিলেন, তখন তাঁহারা শুধু রৌপ্যমুদ্রাই বুঝিতেন। স্বর্ণমুদ্রাও প্রস্তুত হইত বটে, কিন্তু উহা আপনার মূল্য আপনিই অনুসন্ধান করিয়া লইত—উহার কোনো নির্দিষ্ট দাম ছিল না! স্বর্ণ সেকালে শুধু ভূষণাদির জন্যই অধিক ব্যবহৃত হইত; স্বর্ণমুদ্রা তাই স্বর্ণের চিরপরিধর্তনশীল বাজার দরে বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল না।

* Letters from the President and council of Bengal to the Court of Directors, dated 25th Aug, 1770. paras 26 and 30; the 9th march, 1772, para 22; Hickey's Bengal Gazette, 29th April, 1780; Marshman's History of India, vol. I.

† The East India Company itself, in its mercantile capacity, carried a quarter of a million sterling per annum out of Bengal to China—Rural Bengal : Hunter.

দিল্লীর মোহর, সকলগুলিই ওজনে সমান হইত বটে, কিন্তু দাম স্থির ছিল না। কখনো বা একটা মোহর ১২ টাকায় বিক্রী হইত, কোণ দিন বা উহার দাম হইত ১৫ টাকা, কখনো বা ১৩।১৪ টাকাতো মোহর পাওয়া যাইত। পরস্যাও সেই রূপে বিক্রীত হইতেছিল। উহারও মূল্য নির্ধারিত ছিল না। প্রয়োজন অনুসারে এবং স্থানভেদে রোপ্য ও তাম্রমুদ্রার মূল্য নিরূপিত হইত। অনেক সময়েই রোপ্য বা তাম্র-মুদ্রা উহার আসল মূল্য অপেক্ষা কম চলিত। মুসলমান বাদশাহগণ তাই রোপ্যমুদ্রার মূল্য চিরস্থির করিবার জ্ঞা প্রয়াস পাইতেছিলেন। কাগজে পত্রে স্থির ছিল যে একটা রোপ্য মুদ্রা ওজনে এক সিকা হইবে এবং তাহার শতভাগে ৯৮ ভাগ রূপা থাকিবে। ইহাই সেকালে আদর্শ রোপ্যমুদ্রার রূপ ছিল।

টঙ্কশালা সংস্থাপন সেকালে রাজশক্তি-প্রতিষ্ঠার অতি আবশ্যক চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত। যে সফল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজগণ সর্ববিষয়ে দিল্লীসিংহাসনের শাসন অবহিত চিন্তে মানিয়া লইতেন, তাহারও স্বরাজ্য মধ্যে মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। যে রাজবংশের গৌরব-স্বৰ্ঘ্য প্রায় অন্তিমিত হইয়াছিল, সে বংশও যেমন মুদ্রা প্রস্তুত করিবার স্বাধীনতা রক্ষায় যত্নবান হইতেন, নবরাজ্য লাভ করিয়া তাহার কেবল প্রতিষ্ঠা ও শক্তির প্রথম পাদপীঠ স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহারও তেমনি সর্বাঙ্গে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে চাহিতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন মাত্র দুই একটি গিরিচূর্ণ অধিকার

করিয়াছিলেন, তখনই তাহার টঙ্কশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কোম্পানী বাহাদুর এ দেশে আসিয়া যখন বাঙ্গালার কেবল দুই চারি খানি উদ্যান ও দুই একটি গৃহ অধিকার করিয়াছিলেন, তখনই নিজের মুদ্রা প্রস্তুত করিবেন বলিয়া পরামর্শ করিতে ছিলেন।

ভারতবর্ষে তখন অনেক টঙ্কশালা ছিল। কিন্তু কোনো স্থানেই একটি নির্দিষ্ট আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মুদ্রা প্রস্তুত হইত না। তখন কোনো দুই টঙ্কশালের মুদ্রা ওজনে এবং রূপার পরিমাণে এক ছিল না; এমন কি কোনো কোনো স্থানে একই টাকশালে দুই তিন প্রকারের টাকা প্রস্তুত হইত! এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অসংখ্য মুদ্রা ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং কোনো একটি বিত্ত মুদ্রাকে অঙ্কুর করিতে কাহাকেও অধিক বেগ পাইতে হইত না।

কোম্পানী বাহাদুর এ দেশে আসিয়া যে ঋণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার জ্ঞা সূদ কিছু অধিক দিতেন। নগদ টাকা গ্রহণ করিয়া তাহার তৎপরিবর্তে এক ঋণ করিয়া কাগজ দিতে লাগিলেন। উহাই কোম্পানীর “নোট” নামে সুপরিচিত। সেই “নোট” যাহাতে খুব প্রচলিত হয় তদ্বিষয়ে তাহাদিগের যত্নের অভাব ছিল না। ইহার ফলে ভারতবর্ষের নামা স্থানে “নোট” চলিতে লাগিল। কিন্তু নোট বাঙ্গালার ভাঙ্গাইতে গেলেই অনেক সময় শতকরা ১৪ টাকা করিয়া বাটা দিতে হইত। *

তাহার কমে নোট চলিত না! কোম্পানীর দিতে চাহিতেন, তখন কর্মচারীদিগের মধ্যে
কর্মচারিগণ নোটে বেতন পাইতেন—যুদ্ধার আন্দেের রোল পড়িয়া 'বাইত। সেই শুভ
অভাব হইয়াছিল। যদি কোনো সময়ে সংবাদ পূর্ক্সাহেই সেকালের সংবাদপত্রে
কোম্পানী বাহাদুর নগদ টাকায় বেতন মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইত। (ক্রমণ)
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

শরতে মা

এসেছে শরত আজি মনোরথ ভরি' হেমঝারি নয়নের বারি
পূরিবে আমার জানি ; এনেছি মা, সযতনে ;
দিকে দিকে হা স— ভরা-ফুল-রাশি ও যুগল-পদ— জিনি কোকনদ,
ধরায় আঁচল খানি। ধুয়ে দিব—সাধ মনে !
নীল-নির্মল— নভ উজ্জ্বল (৪)
চন্দ্র-গনাথ তারা ; শূন্য জীবন, শূন্য ভুবন—
পুলকে অধীর ভাসাইয়া তীর এস, মা, পূর্ণ করি' !
বহে নদ-নদী-ধারা ! দেগী দশভুজা জননীর পূজা—
(২) হেরিব নয়ন ভরি' ।
আজি শ্রাণ চায়— আছে কে কোথায় রবে না ক আর— প্রাণে হাহাকার,
কাছে চাহি, যেবা দূরে, ঘুচে যাবে সব ব্যথা ;
স্নেহ-মুখ গুলি সাধ হয় তুলি' গত জীবনের, তাপিত মনের
দেখি আজি প্রাণ-পুরে ! আছে যত মলিনতা !
নয়নের জল কেন উজ্জ্বল (৫)
কার কথা মনে হয় !— উঠে 'মা—মা' রব— জননীর শব
বে গিয়েছে আগে, তার স্মৃতি জাগে,— মুখরিত করি দিশি ;
সে কোথা গো—এ সময় ? ধূপের সুবাস বহিছে বাতাস
(৩) স্মরন্তিত করি নিশি ।
এ সুখ-শরতে— মা আজি মরতে, অই মা আমার— করুণা আধার
হরষে ভাসিছে ধরা ; চরণে দলিয়া অরি ;—
লয়ে দুখ-রাশি— আঁধি-জলে ভাসি, বিখজজননী দানব-দলনী
কোথা মা গো, দুখহরা ! হের দশাযুধ ধরি' ।
শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ।

চরিত্র-চিত্র ।

শিবনাথ শাস্ত্রী ।

মহর্ষির সময়াবধি ব্রাহ্মসমাজ যে ব্যক্তিত্ব-ভিমানী অনধীনতার বা 'Freedom' এর আদর্শকে ধরিয়া, আমাদিগের আধুনিক আধ্যাত্মিক জীবন ও সামাজিক-জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিয়া, দেশের বর্তমান ঐতিহাসিক বিবর্তনশ্রোতের মুখে ঘাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, মহর্ষি কিংবা তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজ, কেশবচন্দ্র কিংবা তাঁর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, ইহাদের কেহই শেষ পর্য্যন্ত সেই সংকল্পের উপরে দৃঢ়ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই ; পারিলে, ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া, দেশের বর্তমান ধর্ম্মমীমাংসায় ও কর্ম্মজীবনে, শিবনাথ শাস্ত্রী কিংবা তাঁহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোনই স্থান হইত না। কিন্তু মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই, প্রথমে যে যুক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মকে বর্জন করেন, সেই যুক্তি ও বিচারের উপরে, সর্ব্ববিধ ফলাফল-ভাবনা-বিরহিত হইয়া, বিশ্বাস বা সাহস ভরে, শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই। ইহারা দুইজনই স্বদেশের ধর্ম্মের ও সমাজের সনাতন ভিত্তিকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেই, তাহার ফলে নিজেদের নূতন সমাজে ধর্ম্মের, নামে নাস্তিক্যবুদ্ধি ও স্বাধীনতার, অজুহাতে স্বেচ্ছাতন্ত্র অরাজ-কতার অভ্যুদয় দেখিয়া, একান্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়া, নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত উপায়ে স্বকৃতকর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামের প্রতি-

রোধ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। মহর্ষির ভাঙার ভিতরেও, তাঁর প্রকৃতিতে হিন্দু-আস্তিক্যবুদ্ধি ও রক্ষণশীলতার গুণে, কতকটা সংযম বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইনি যে উপায়ে আপনার কর্ম্মের মন্দফলকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, তার মধ্যেও কতকটা সংযতভাব ছিল। কেশবচন্দ্রের ভাঙার অন্তরালে হিন্দুর আস্তিক্যবুদ্ধি বা রক্ষণশীলতা ছিল না, কিন্তু খৃষ্টীয়ান কনফর্ম্মিষ্ট-স্বভাব-সুলভ উদ্ধত অহংবুদ্ধি ও উদ্যম সংস্কার চেষ্টাই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তাঁর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার অন্তরালে সেক্ষপ কোনও সংযত ও সশ্রদ্ধ ভাব আদৌ ছিল না বলিয়া, তিনি যে উপায়ে স্বকৃতকর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামের প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাও অত্যন্ত উদ্যম ও অসংযত হইয়া উঠে। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই ক্রমে বিশেষ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী করিয়া, 'আপনাদিগের উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটা বিশেষ ও অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য-মর্যাদা দান করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহর্ষির এই দাবীর অন্তরালে একটা সংযত ও সশ্রদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ও অমুগত শিষ্যগণের নিকটেই প্রসঙ্গক্রমে তিনি এই দাবীর উল্লেখ করিয়াছেন, জন-সাধারণের মধ্যে কখনও প্রকাশ্যভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। কেশবচন্দ্র, অগ্রদিকে, কেবল এদেশে নয়, সমগ্র জগতের

সমক্ষে তাঁর অনগ্রসাধারণ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী জাহির করিয়াছেন এবং মানবোত্ত-
হাসের প্রথমাবধি যুগে যুগে ঈশ্বর-প্রেরিত
মহাজনেরা এই ঈশ্বরানুপ্রাণতার সাহায্যে
যেমন যুগধর্ম প্রবর্তিত করিয়াছেন, তিনি ও
তাঁহার “প্রেরিত-মণ্ডলী” সেইরূপই বর্তমান
যুগের “নববিধানকে” প্রতিষ্ঠিত করিতে
আসিয়াছেন, নানাদিকে ও নানাভাবে, এই
এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু
প্রাচীন শাস্ত্র ও পুরাণত গুরুপরম্পরাশ্রিত
সাধনমার্গ সকলকে অশ্রান্ত নয় বলিয়া সর্ব-
প্রকারের প্রামাণ্য-মর্যাদা লুপ্ত করিয়া,
নিজেদের উপদেশ ও সিদ্ধান্তের জন্ত সেই
মর্যাদার দাবী করিলে, লোকে তাহা শুনিবে
কেন? মহাবির এবং কেশবচন্দ্রের এই অনগ্র-
সাধারণ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী ব্রাহ্মসমাজের
কোনও কোনও সভ্য স্বীকার করিলেও,
আধুনিক ভারতসমাজে এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয়
নাই; কখনও যে হইবে, তারও কোনওই
সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দেশের ধর্মজীবনে
ও কর্মজীবনে ব্রাহ্মসমাজ যে জটিল সমস্যাকে
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম আচার্যা-
গণ তার কোনও মীমাংসার পথ দেখাইতে
পারেন নাই।

তবে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তাঁর সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে এই সমস্যাকে
মীমাংসার দিকে লইয়া গিয়াছেন, মহর্ষি কিংবা
কেশবচন্দ্র যে তাহাও পারেন নাই,—জন-
সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রাচীন
অভিজ্ঞতার দিক্ দিয়া বিচার করিলে,
একথাও অস্বীকার করা অসম্ভব হইবে।
ফল যেমন পরিপূর্ণ পকতাপ্রাপ্ত হইলে,

আপনিই গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া, আবার
নূতন ফসলের সূত্রপাত করে; সেইরূপ
যে সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শের প্রেরণার
সমাজমধ্যে কোনও জটিল যুগসমস্যার
উৎপত্তি হয়, সেই সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শ
নিঃশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়া আপনারাই
নিজেদের ভিতরকার সত্য ও অসত্য, যুক্তি
ও যুক্ত্যাভাস, কল্যাণ ও অকল্যাণকে বিশদ
করিয়া তুলে এবং তখনই প্রাচীন ও
প্রচলিতের সঙ্গে নূতন ও অপ্রচলিতের
একটা উচ্চতর সামঞ্জস্যের ভূমি প্রকাশিত
হইয়া, সেই যুগ-সমস্যার প্রকৃত মীমাংসার
পথটী দেখাইয়া দেয়। এই সকল চিন্তা,
ভাব ও আদর্শ আপনারদের যথাযথ পরিণতি
লাভ করিয়া পূর্বে, কোনও কোনও দিকে
তাহাদের অসঙ্গতি বা অমঙ্গল ফল
দেখিয়া, যিনিই অকালে কোনও যুগসমস্যার
মীমাংসা করিতে যাইবেন, তাঁহার সে
মীমাংসা যে অপূর্ণ ও অযৌক্তিক, উদ্ভ্রান্ত ও
উদ্ভট হইবে, ইহা অনিবার্য। প্রশ্নটা পরি-
ষ্কাররূপে অভিযুক্ত হইলেই তো তার
সহজতর দেওয়া সম্ভব হয়। ইংরেজি শিক্ষা
ইংরেজের শাসন, যুরোপীয় সাধনার সংস্পর্শ,
এই সকলে মিলিয়া আমাদের প্রাচীন ধর্ম-
জীবনে ও সমাজজীবনে যে সকল প্রশ্ন
জাগাইয়া তুলে, মহাবির কর্মক্ষেপ্তা বা কেশব-
চন্দ্রের জীবনযাত্রা সাক্ষ্য হইবার পূর্বে, তার
সম্যক্ ও সম্পূর্ণ অভিযুক্তি হয় নাই।
সুতরাং মহর্ষি বা কেশবচন্দ্র যে এই জটিল
প্রশ্নের সহজতর দিতে পারেন নাই, ইহা
কিছুই বিচিত্র নহে। ফলতঃ কেবল ব্রাহ্ম-
সমাজের আচার্যাগণই যে ইহার সহজতর দিবার

নিষ্ফল চেষ্টা করেন, তাহাও নহে। একদিকে যেমন কেশবচন্দ্র, অত্ৰদিকে সেক্ষপ দয়ানন্দ স্বামীর আর্থ্যসমাজ, অলকট্—ব্রাভ্যাটস্কীর থিওসফী সমাজ এবং পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি-প্রমুখ তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থান-কারিগণ, ইহারা সকলেই আধুনিক যুরোপীয় যুক্তিবাদ-প্রতিষ্ঠিত “সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার” আদর্শে আমাদের নব্যশিক্ষিত সমাজে এবং তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষায় ও আচার আচরণে কিয়ৎপরিমাণে সাধারণ জনগণের ভিতরেও যে বথেক্ষাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া ফেলিতেছিল, তাহা দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং আপন আপন সিদ্ধান্ত ও শক্তি অনুসারে এই অভিনব বিপ্লবশ্রোতের প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন। আর বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস এই সমুদায় চেষ্টারই নিষ্ফলতার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

আর এই নিষ্ফলতার প্রধান কারণ এই যে, একদিকে ‘আধুনিক যুরোপীয় সাধনার এবং অত্ৰদিকে আমাদের সনাতন ধর্মের ও প্রাচীন সমাজের মূল প্রকৃতি যে কি, এ জ্ঞান ইহাদের কাহারই ভাল করিয়া পরিষ্কৃত হয় নাই। কি কেশবচন্দ্র, কি অলকট্ ব্রাভ্যাটস্কী, কি শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি,—ইহাদের কেহই দেশের লোক-প্রকৃতি, সমাজপ্রকৃতি কিংবা পুরাগত সভ্যতা ও সাধনার প্রকৃতির উপরে, অথবা আমাদের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবর্তন-প্রণালীর সঙ্গে মিলাইয়া, নিজেদের মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাঁহারা যে পথে আমাদের বর্তমান যুগসমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাকে মীমাংসা

বলা যায় কি না, সন্দেহ। মীমাংসার প্রথমে কতকগুলি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত মত, সিদ্ধান্ত বা সংস্কার বা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকে। কোনও কারণে এ সকলে সত্য বা কল্যাণকারিত্বা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের উদয় হয়। কোনও নূতন মত বা সিদ্ধান্ত, ভাব বা আদর্শকে আশ্রয় করিয়া, তারই প্রেরণায় এ সন্দেহের উৎপত্তি হয়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্ত বিচারের বা যথাযোগ্য-প্রমাণপ্রতিষ্ঠা-সমালোচনার বা criticism-এর আবশ্যক হয়। এই বিচার ক্রমে নূতন সিদ্ধান্তের সাহায্যে প্রাচীনের সঙ্গে নূতনের বিরোধ-নিষ্পত্তির পথ দেখাইয়া দেয়। এই পথে বাইয়াই পরিণামে চূড়ান্ত মীমাংসার প্রতিষ্ঠা হয়। এক্ষণে মীমাংসার জন্ত বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই সম্যক জ্ঞানলাভ অত্যাাবশ্যক। কিন্তু কি কেশবচন্দ্র, কি থিওসফী সমাজের নেতৃবর্গ, কি তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানকারিগণ, ইহাদের কেহই এ জ্ঞানলাভ করেন নাই। কেশবচন্দ্রের স্বদেশের মূল প্রকৃতির এবং বিশেষতঃ স্বজাতির ঐতিহাসিক বিবর্তনের কোনও বিশেষ জ্ঞান ছিল না। থাকিলে তিনি খৃষ্টীয়ানী সিদ্ধান্ত ও খৃষ্টীয়ান ইতিহাসের দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়া, বর্তমান যুগসমস্যার মীমাংসা করিতে যাইতেন না। হিন্দু যুগ যুগে, স্বানুভূতি ও শাস্ত্রের মধ্যে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির নিত্য বিরোধকে মিটাইয়াছেন এবং এইরূপে বেদের ক্রিয়াকাণ্ড ও দেববাদ হইতে ক্রমে উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড ও ব্রহ্মতত্ত্ব; উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে আধ্যাত্মিক

কল্পনাভূষিত পৌরাণিকী ভক্তিপন্থার ভিতর দিয়া, ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মসাধনকে অপূর্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া, পন্থাবিভাগ ও অধিকার-ভেদের সাহায্যে, আপনার ধর্মের অদ্ভুত বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বের মধ্যেই সনাতন বিশ্ব-ধর্ম ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছেন, — কেশবচন্দ্র স্বদেশের সাধনার এই অপূর্ণ ঐতিহাসিক তত্ত্বটী ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। তাঁর অনন্তসাধারণ আধ্যাত্মিক কল্পনাবলে তিনি যে ত্রিবিধ যোগ-প্রণালীর বর্ণনা করেন, * তাহাতে মানব-সমাজের ধর্মের ও সাধনার ইতিহাসের সাধারণ বিবর্তন-তত্ত্বটী অতি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে, সত্য ; কিন্তু স্বদেশের সাধনার ঐতিহাসিক বিবর্তনপ্রণালীর বিচার করিবার সময়, কেশবচন্দ্র সম্যগ্রূপে এই তত্ত্বটী প্রয়োগ করেন নাই বা অকালে দেহত্যাগ করিয়া, করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। ফলতঃ একরূপ অস্তিমদশায় আসিয়াই তিনি এই যোগ-তত্ত্বটী লাভ করেন। তাঁর “নব-বিধান” ইহার অনেক পূর্বেই আমাদের বর্তমান যুগসমস্যার একটা উদ্ভট মীমাংসা করিয়া বসিয়াছিল। আর সে মীমাংসার প্রতিষ্ঠার, কেশবচন্দ্র স্বদেশের ঐতিহাসিক বিবর্তন-পন্থাকে উপেক্ষা করিয়া, খৃষ্টীয়ানী সিদ্ধান্ত ও খৃষ্টীয়ানী অভিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করেন। তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষবাদ, ঈশ্বরানু-প্রাণতা-বাদ ও শ্রীদ্রব্যার, এ সকলই ইহদীর ও খৃষ্টীয় শাস্ত্র এবং ইতিহাস হইতে সংগৃহীত।

স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনার সঙ্গে এ সকলের কোনওই সম্পর্ক নাই। আর ইহাই কেশবচন্দ্রের মীমাংসা-চেষ্টার নিষ্ফলতার কারণ। কেশবচন্দ্রের মীমাংসার চেষ্টা যেমন খৃষ্টীয়শাস্ত্রে ও খৃষ্টীয়ান্ ইতিহাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাকে যেমন প্রচ্ছন্ন খৃষ্টীয়বাদ বলা যাইতে পারে ; * সেইরূপ দয়ানন্দের আর্ধ্যসমাজের, অল্কট্ ব্রাভ্যাটস্কীর খিও-সকীর এবং শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি নব্য হিন্দুগণের মীমাংসাও বস্তুতঃ যুরোপীয় যুক্তিবাদ ও জড়বাদের প্রভাবেই একান্ত অভিজুত হইয়া পড়ে। অল্কট্ ব্রাভ্যাটস্কীর স্তো কথাই নাই, দয়ানন্দ স্বামী বা তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও স্বদেশের ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়া আধুনিক যুগসমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই সকল মীমাংসাই প্রকৃতপক্ষে যুরোপীয় যুক্তিবাদ ও লৌকিক জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই সকল অকাল-চেষ্টিত মীমাংসার নিষ্ফলতার প্রধান কারণই এই যে, এ সকলে যে সমস্তা-ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন পর্য্যন্ত সে সমস্তাটীই নিঃশেষভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই সমস্তাটীকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াই, তার মীমাংসার পথই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

ক্ৰমশঃ ।

• Yoga : Objective, Subjective, and Universal.

• কেশবচন্দ্রের “নববিধানের” একটা হিন্দু দিক্‌ও আছে, এখানে তার কথা বলিতেছি না।

রাজা দেবীদাস ।*

(সমালোচনা)

প্রায় ছয়মাস পূর্বে সত্যরঞ্জন বাবুর পূর্ব প্রকাশিত উপন্যাস “চক্ষুদানে”র সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা বলিয়াছিলাম যে “সত্যরঞ্জন বাবুর পরিণত লেখনী বঙ্গ সাহিত্যের সৌষ্ঠব সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমরা তাঁহার সামান্য ক্রটিও উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।” কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে যে সত্যবাবু আমাদের সেই আশা পূর্ণ করিতে পারিবে, তাহা আমরা তখন অনুমান করিতে পারি নাই। সত্যবাবুর নবপ্রকাশিত উপন্যাস “দেবীদাস” অল্পদিন মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই উপন্যাস সত্যবাবুকে বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

যখন “সোণার বাঙলা” কলঙ্কের কালিমায় স্নান হয় নাই, হতাশা ও অবসাদে জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই, যখন “বাঙালীর ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান, বাটিভরা দুধ, আশাভরা স্বপ্ন, মনভরা উৎসাহ” বাঙলার সেই সময়ের জীবন্তচিত্র—“দেবীদাসে” উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। যখন ধর্মনিষ্ঠ বাঙালী ব্রাহ্মণ, পুত্রের প্রাণবদ পর্যন্ত অবহেলার উপেক্ষা করিয়া নিজের ধর্মের জন্য অটলভাবে উন্নত

মতকে দাঁড়াইতেন, যখন নিম্নশ্রেণীস্থ সামান্য ভৃত্য প্রভুপুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য নিজ পুত্রের প্রাণবলি দিতেও ইতস্ততঃ করিত না, যখন পতিব্রতায় আদর্শস্থানীয়া বাঙালী রমণী যবনীপ্রণয়মুগ্ধ বিধব্রাতী স্বামীর কল্যাণের জন্যও সকল দুঃখ, সকল বিপদ, সকল নির্যাতন অকাতরে সহ্য করিতেন, যখন জীবনকে তুচ্ছ করিয়া মানের জন্য বাঙালী বীর জলে স্থলে অসিহস্তে অনন্তশয্যায় শয়ন করিতে ভীত হইত না, যখন অনশনক্লিষ্ট প্রজার জন্য জমিদার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া, অভিভাবকের কর্তব্যপালন করিতেন, যখন বুদ্ধিকৌশলে, চতুরতায় রাজনীতির জ্ঞানে বাঙালী কর্মচারী অগতের বিষয় স্থল ছিল, যখন বাঙালীর হস্তে সুদৃঢ় শত্রুবিমর্দন “লাঠি”, মনে ক্ষুরধার বুদ্ধি, হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের পুণ্যপ্রস্রবণ, সেই সময়ের পুণ্য কাহিনীতে “দেবীদাস” পরিপূর্ণ।

“দেবীদাসে”—“দেবীদাসের” মত ধর্ম-নিষ্ঠ প্রজাপালক আদর্শ জমিদারের, “উমার” মত পতিগতপ্রাণা প্রেমপীযুষময়ী দেবীপ্রতিমার, “নারায়ণীর” মত ভগবৎ-পরায়ণা মাতৃমুগ্ধ, “তারার” মত বুদ্ধিমতী প্রেমময়ী—তেজোময়ী প্রকৃত “সহধর্ম্মিনীর”, “মাধব দত্তের” মত বিচিত্র বুদ্ধিশালী

অক্লান্তকর্মী কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীর, “ভোলানাথের” মত প্রভুগতপ্রাণ ত্যাগশীল আদর্শ ভৃত্যের, “স্বামী দয়ানন্দের” মত ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরোপকারী, কর্মনিষ্ঠ লোক শিক্ষকের, “করিম” ও “সদানন্দ গোস্বামী”র মত প্রেমবিহ্বল ভগবদ্ভক্তের সুমহান্ চিত্র দেখিতে দেখিতে বারবার অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিতে ইচ্ছা করে, হয় কি পাপে বাঙালী মহাবীর এমন অতুলস্বর্গ হইতে নীচতা, স্বার্থপরতা, ভীকৃতার এমন অন্ধ নরকে অধঃপতিত হইল! অবশ্য গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ক্রটি করেন নাই। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, যে দেশে “দেবীদাস” জন্মিয়াছিলেন, সেই দেশেই স্বদেশদ্রোহী, স্বধর্মবিদ্বেষী, আত্মসুখসর্বস্ব—“ইসমাইলখাঁ” ও জন্মিয়াছিল, যে দেশে নিঃস্বার্থপরতার প্রতিমূর্তি “ভোলা নাপিত” জন্মিয়াছিল, সেই দেশেই স্বজাতিদ্রোহী স্বার্থপর পাপাত্মা “অধিকাচরণে”ও অভাব হয় নাই। দেখিয়া “দেবীদাসের” মত কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে “যদি আজ ঐকতান বাদনের সমবেত ঝঙ্কারের জাগ্র সকল হৃদয়-তন্ত্রী একযোগে বাজিয়া উঠিত—!” কিন্তু সে যে হইবার নহে। তথাপি গ্রন্থকারের সাধনা সফল হইয়াছে। “দেবীদাস” পড়িতে পড়িতে বাঙালীর হতাশাময় অবসন্ন হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্য বাঙালীর প্রাচীনগৌরব, মহিমা, বীর্য, তেজস্বিতা ও ধর্মনিষ্ঠার অপূর্ণ চিত্র দেখিতে দেখিতে আশায় ও আনন্দে ক্ষীত

হইয়া উঠে। মনে হয়, বাঙালী চিরদিন হীন ছিল না—হীনতা তাহার অপরিবর্তনীয় নিয়তি নহে।

“দেবীদাস” সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহার সহিত ঐতিহাসিক সত্য বিজড়িত। পশ্চিম বঙ্গ স্লেচ্ছ পদানত হইবার পরেও বরেন্দ্রভূমি বহুদিন আপনায় স্বাভাব্য রক্ষা করিয়াছিল। “এক টাকিস্যার” জমিদারেরা, রাজা সীতারাম, রাজা কেদার রায়, রাজা দেবীদাস তাহার উদ্বাহরণ। পুণ্ডকের মুদ্রাঙ্কন সুলভ, ভাষা বিস্তৃত সুনিষ্ঠ আবেগময়ী, বর্ণনা মনোহর। গ্রন্থের সর্বত্র প্রবাহিত স্বদেশ প্রীতির অমৃতধারাস্পর্শে সমস্ত গ্রন্থ পবিত্রীকৃত। নানা বিচিত্র ঘটনার নিপুণ সমাবেশে গ্রন্থখানি এমন চিত্তকর্ষক যে একবার ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, পুস্তক সমাপ্ত হইবার পূর্বে ক্ষান্ত হওয়া দুর্ব্বল। পুস্তকের কোথাও কোন প্রকার ক্রটি নাই একথা বলিলে, সত্যের অপলাপ করা হয়; কিন্তু সে ক্রটি এত সামান্য যে তাহার আলোচনা করিয়া, আমরা “ক্ষমা”—বৃত্তির অপবাদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

পরিশেষে আমাদের আন্তরিক বাসনা, বাঙালীর আগতপ্রায় বাৎসরিক মহাশক্তির উদ্বোধনের, দিনে তাহার ঘরে ঘরে বাঙালী-জীবনের এই শক্তি, জ্ঞান, বীর্য ও প্রেমের পুণ্যচিত্র বিরাজিত হইয়া যেন তাহাকে আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল করে।

শ্রীসমালোচক

সমালোচনা ।

বনতুলসী—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত। মূল্য পাঁচ আনা। কতকগুলি ধর্মমূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। শুভকণ্ঠে কবির রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’ প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহার পর হইতেই বাঙলা-ভাষায় এই ধরণের কবিতা সমাদর লাভ করিয়াছে। তার পর ‘কান্ত কবি’ স্বর্গীয় রজনীকান্তের ‘অমৃত’ আমাদের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছে। বন-তুলসীর গ্রন্থকারের পূর্ব-বিরচিত শতদলের সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম—তাহাতে মধুও মিশিয়াছিল—সম্প্রতি তিনি ‘বনতুলসী’ চয়ন করিয়া ভারতীয় পূজার জগৎ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার পূজা সার্থক হউক! আমরা এই ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ পাঠে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। কবি মহাপুরুষ-গণের যে বাণী ছন্দোবদ্ধ করিয়া, নিজ ভক্ত-হৃদয়ের সুরভি মিশাইয়া এ পূজার ডালি সাজাইয়াছেন, আশা করি, তাহা মানব-হৃদয়ে দেবতার আশীর্বাদ আনয়ন করিবে

রেখাকর বর্ণমালা—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত।

যে দিন বঙ্গদর্শনে পূজাপাদ প্রবীণ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের ‘রেখাকর বর্ণমালা’ পাঠ করিলাম, সে দিন আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারি নাই। সমালোচ্য-পুস্তক খানি তাহারই পূনর্মুদ্রণ। মনে পড়ে খাল্য-কালে পুরাতন ভারতীতে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই রেখাকর বর্ণমালা পড়িয়াছিলাম। বর্তমান রেখাকর তাহারই পরিণত সংস্করণ—দ্বিজেন্দ্র

বাবুর বহুবর্ষের একাগ্র সাধনার ফল। সাধারণ পুস্তকের মত ইহার সমালোচনা চলে না। ইংরাজীতে বলে—“The taste of the pudding lies in the eating” আজকালকার দিনে খাউলা ভাষার রেখাকরের বিশেষ প্রয়োজন—যদি উপযুক্ত শিষ্যের হাতে পড়িয়া এই রেখাকর কাজে লাগিয়া যায়, তবেই দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই কঠোর সাধনা সার্থক হইবে। এই পুস্তক সম্বন্ধে সম্প্রতি ভারতীতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার ‘বাল্যকথা’ বাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। “রেখাকর, সেও এক অপূর্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কত রকম রেখাপাতের কৌশল ছড়াছড়ি, না দেখিলে তার মর্যাদা বোঝা যায় না।” বাস্তবিকই ইহা এক অপূর্ব বস্তু। কবির বহুদিনের পরিত্যক্তা কাব্যলক্ষ্মী এই কঠোর বিষয়কেও তাঁর কলা সৌন্দর্য্যে সাজাইতে ছাড়েন নাই—অভিমানিনী নিজের মান রাখিতে পারেন নাই—কবির আদরের আহ্বানের অপেক্ষা না রাখিয়া, আপনিই আসিয়াছেন। তবে আমাদের হৃৎক, কবি কি আমাদের তাঁর কেবল রেখাতেই সন্তুষ্ট রাখিতে চান? তিনি যে অসাধারণ চিত্র-কর! সে চিত্র সৌন্দর্য্য হইতে আমরা চিরদিনই কি বঞ্চিত থাকিব?

অচলায়তন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর প্রণীত। মূল্য বার আনা।

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষীয় মনুষ্যদিগের চেষ্টা হইয়াছিল—সমাজ-গঠন

মানবধর্ম শাস্ত্র সেই চেষ্টার ফল। সমাজে যতদিন প্রাণ ছিল, গতি ছিল—অর্থাৎ যত দিন আমরা অচল জীবন্ত ছিলাম, ততদিন আমাদের সমাজ বেণ ভাল ভাবেই তাহার আদর্শের পথে চলিয়াছিল। কিন্তু নিয়মের দোষই এই যে, সে মানুষকে ধর্ম করিয়া আপনাকে প্রধান কঁদে— তাহার ফলে মানুষের মনকে সে ছাঁচে ঢালিয়া কঠিন, জমাট করিয়া তোলে। ভারতবর্ষের ঋষিগণ ইহা জানিতেন—তাই তাঁহারা সমাজের মধ্যে একদলকে সর্ব সংস্কার হইতে দূরে রাখিয়া, তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, কিন্তু কালধর্ম যখন এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অধোগতি হইল—তখন তাঁহারা এই মানসিক স্বাধীনতা হারাইলেন,—তখন উপায় উদ্দেশ্যের আসন পাইল—তখন নিয়ম পালনই হইল আদর্শ এবং আচার, ব্রত, তাহাদের সহস্র শিকড় দিয়া সমাজ-মন্দির বেঠেন করিয়া ধরিল—সেই পুণ্য আশ্রম নিয়ম-প্রাচীরে বন্ধ ‘অচলায়তনে’ পরিণত হইল। কবিবর বরীজনাথ আজ সেই অচলায়তনের চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, আজ আমরা আমাদের চারিদিকে যে আচার, নিয়ম, ব্রত মন্ত্র তন্ত্রের উচ্চ প্রাচীর তুলিয়া সমস্ত জগতের সহিত সম্বন্ধ বিঘ্ন করিয়া, বাহিরের মুক্ত বায়ুর পথ রোধ করিয়া বসিয়া আছি, কবিবর তাঁহার এই অভিনব নাটকে তাহারই ফলাফল অঙ্কিত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পতন ও গুরুদেবের আগমনের সংবাদও আনিয়াছেন। ভারতবর্ষ যতদিন তাহার পাহাড় ও সমুদ্রের হৃৎকর্ষ বেঠনের মধ্যে কেবল মাত্র আপনাকে লইয়াই ছিল—তত দিন কিছু আসিয়া যায় নাই—কিন্তু যখন পাহাড়ের বাধা না মানিয়া, সমুদ্রের বক্ষেই

উপর দিয়া নব নব জাতি তাহাদের নবীন তেজ লইয়া এই প্রবীণের গৃহে প্রবেশ করিল, এখনই তাহার বিপদ। গত কয়েক শতাব্দী হইতে এই বাহিরের আঘাতেই ভারতবর্ষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। যে সত্যকে সে এত দিন নিয়মের কঠিন শ্রীঘরে আবদ্ধ করিয়া অপমান করিয়াছিল—আজ তাহার হিসাব নিকাসের দিন—অচলায়তনের প্রাচীর আর টেকে না। কবিবর তাহারই সংবাদ আনিয়াছেন।

আমাদের মনে কিন্তু এই নাটক পড়িতে পড়িতে একটা প্রশ্ন বার বার উঠিতে ছিল। আশা করি, কবি আমাদের এ প্রশ্নের ধূর্ততা মার্জনা করিবেন। জগতের মধ্যে ভারতের সভ্যতা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন—এমন কি মিসরীয় সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীনতর। গ্রীক, রোমান জাতি সকল তাহার অনেক পরে সভ্যতার আলোক লাভ করে। কিন্তু আজ কোথায় মিসর, কোথায় গ্রীক, কোথায় বা রোমান? হিন্দুজাতি যেমন অবস্থাতেই হউক, টিকিয়া আছে। যে বিজয়িনী শক্তি স্পেন হইতে সমরকন্দ পর্য্যন্ত এক শতাব্দীর মধ্যে জয় করিয়া প্রাচীন জাতি সকলকে লোপের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল—সেই ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম সভ্যতা, কহু কষ্টে কয়েক শতাব্দীর অশ্রান্ত চেষ্টায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এবং কয়েক শতাব্দী ব্যাপী একছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াও ত কই হিন্দুসমাজের উপর স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে নাই? ইহার কারণ কি আমাদের এই অচলায়তনের সূড়ূঢ় প্রাচীর নয়? ইহাকে অগ্রভাবে না দেখিয়া আশ্রয়কার চেষ্টা বলিলে কি সন্তোষ হয়?



বঙ্গদর্শন



নিমাই-চরিত্র

পঞ্চম অধ্যায়

নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজের অবস্থা,
ঈশ্বর পুরীর নবদ্বীপে আগমন।



নিমাইর যশঃপ্রভা যখন দেশদেশান্তরে
বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, তখন নবদ্বীপের
ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসমাজ মুগ্ধনয়নে তাঁহার দিকে
চাহিয়া ছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ
তখন জ্ঞানালোচনার উন্নত, সাধারণ লোক
“ধনপুত্র-রসে” মত্ত; ভক্তি তখন নবদ্বীপ
হইতে একরূপ নির্বাসিত। মুষ্টিমেয়-সংখ্যক
বৈষ্ণবমাত্র নবদ্বীপে ভক্তির আলো প্রজ্বলিত
রাখিয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানদর্পিত নবদ্বীপ
তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত।

বৈষ্ণবগণ সংখ্যায় অতি সামান্য ছিলেন।
সাধারণের নিকট তাঁহাদের মান-প্রতিপত্তি
কিছুই ছিল না। তাহাতেও তাঁহারা তত
ক্ষুণ্ণ হইতেন না, যদি স্বীয় বিশ্বাসানুরূপ
সাধনভজন করিয়া তাঁহারা সাধারণের নিকট
গজনার ভাঙ্গী না হইতেন। তাঁহারা কীৰ্ত্তন
করিতেন বলিয়া, সকলে তাঁহাদিগকে পরিহাস
করিত। কেহ বলিত, “জ্ঞানমার্গ ছাড়িয়া
আবার সাধনা কি আছে? উন্নতের মত
এ বেটারা নাচে কেন?” কেহ বলিত,

“ভাগবত ত কতই পড়িয়াছি, কিন্তু তাহাতে
ত নৃত্যগীতের ব্যবস্থা নাই?” কেহ বলিত,
“ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য হয় না?
তবে এ বেটারা নাচিয়া কাদিয়া ডাক্ ছাড়ে
কেন? এদের অত্যাচারে যে রাত্রিতে নিদ্রা
যাওয়া দায় হইল!” এই সমস্ত কথা বৈষ্ণব-
ধ্বনিগণ পথে ঘাটে বলিয়া বেড়াইত;—তিনি
বৈষ্ণবগণ মৰ্ম্মাহত হইতেন। তাঁহারা
আপনাদিগের আরাধ্য দেবতার নিকট
মনোকষ্ট জ্ঞাপন করিয়া প্রার্থনা করিতেন
। “হে ভগবান, তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া
ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছ। আজি ধর্ম্মশ্রান,
আজি তোমার নামকীৰ্ত্তন শুনিলে লোকে
বিরক্ত হয় এবং নাসিকা কুঞ্চিত করে।
আজি মিথ্যা-জ্ঞান ও বিষয়-লালসা তোমার
প্রীতিভক্তির স্থানে প্রতিষ্ঠিত। হে প্রভু,
তুমি আবার আবির্ভূত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম স্থাপন
কর।”

অবৈভূতচার্য্য নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজের
নেতা ছিলেন। সাধারণের অবজ্ঞা ও

পরিহাসের কথা সকল বৈষ্ণবেই তাঁহাকে আসিয়া বলিত। প্রতিবিধানে অক্ষয় আচার্য্য অহর্নিশ ভগবানের অবতার-গ্রহণের জন্ত প্রার্থনা করিতেন। হুই এক সময়ে আচার্য্যের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। একদিন সকল বৈষ্ণব মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করতঃ বিবেচ্যগণের তীব্র পরিহাস ও অবজ্ঞার কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। সেদিন আচার্য্যের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হুকুম করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “সব সংহার করিব। ঐ দেখ, ঐ চক্রপাণি এদিকে আসিতেছেন; এবার নবদ্বীপে কি ব্যাপার হয়, সকলে স্বেচ্ছা প্রত্যক্ষ করিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি— আমি যদি কৃষ্ণের দাস হই, যদি আমার নাম অধৈর্য হয়, তবে কৃষ্ণকে তোমাদের সকলেরই নয়নগোচর করাইব। ভাই সব, দিন কয়েক মাত্র আর অপেক্ষা কর, এই নবদ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা প্রত্যক্ষ করিবে।”

ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণবসমাজের হুঃখ দূর করিবেন—কুদ্রসমাজ কর্তৃক অবলম্বিত ধর্ম্মকে দিগ্দিগন্তে প্রচারিত করিবেন—এতি বৈষ্ণবের ইহা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। এতদ্ব্যতীত সোৎসুক-মনে ভগবানের অবতার প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। আচার্য্যের কথার তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল, ঐশ্বর্য্য বর্ধিত হইল।

নিমাইর বাহ্যিক ব্যবহারে ভক্তিশ্রবণভার লেশমাত্র লক্ষিত হইত না। নিমাইর পাণ্ডিত্যগর্ভ বৈষ্ণবদিগকে বাধিত করিত। নিমাইর সহিত বাহার দেখা হইত, তাহারই

সহিত তাঁহার তর্ক বাধিয়া যাইত। কৃষ্ণ-প্রেমবিহ্বল সংসার-বিরাগী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত আর কিছুই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু বৈষ্ণব দেখিতে পাইলেই নিমাই কঁাকি জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং তাঁহারা জবাব করিতে না পারিলে, উপহাস করিতেন। এইজন্ত বৈষ্ণবগণ দূর হইতে নিমাইকে দেখিতে পাইলেই পলায়ন করিতেন। তবু তাঁহারা সেই অনিন্দ্যশুন্দর রূপকান্তি দূর হইতে দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন। কোন্ এক অশ্রু স্রব্দদ্বারা নিমাই তাঁহাদের আশা ও স্মৃতির সহিত আবদ্ধ ছিলেন, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। নিমাইর কৃষ্ণভক্তির অভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইতেন, কেহ কেহ তাঁহার সম্মুখে বাঁহিয়াই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, “হায়, হায়! বিজ্ঞামোহে অন্ধ হইয়া বুধাই জীবন অতিবাহিত করিলে!” নির্জনে সকলে প্রার্থনা করিতেন, “হে কৃষ্ণ, জগন্নাথ-পুত্রকে তোমার প্রেমে উন্মত্ত কর; তোমার রসে সে নিরবধি নিমগ্ন হইয়া থাকুক; তাহার দলিত সঙ্গ আমাদিগকে দান কর।”

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবার কোনও লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। বৈষ্ণবসঙ্গাভার জন্ত নিমাইর বিন্দুমাত্র স্পৃহাও পরিলক্ষিত হয় নাই।

এই সময়ে নানাদেশ হইতে ছাত্রগণ পাঠের জন্ত নবদ্বীপে আগমন করিতেন। অনেক গঙ্গাবাসের জন্তও তথায় আসিতেন। চট্টগ্রামের অনেকগুলি লোক তখন নবদ্বীপে বাস করিতেন; তাঁহারা সকলেই সংসারবিরত ও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে

বৈষ্ণবগণের প্রিয় মুকুন্দদত্ত নামক একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। মুকুন্দ নবদ্বীপে এক টোলে অধ্যয়ন করিতেন। নিমাই মুকুন্দকে দেখিয়াছিলেন এবং প্রথম দর্শন অবধিই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্থাপ্ত করিয়া তুলিতেন। মুকুন্দ দূর হইতে নিমাইকে দেখিতে পাইলেই পলায়ন করিতেন। নিমাই মুকুন্দের পলায়ন লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাস্য করিতেন। একদিন মুকুন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় নিমাই অলঙ্কিতে আগিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। নিমাই বলিলেন, “প্রত্যাহ আমাকে দেখিয়াই তুমি পলায়ন কর, আজি আমার সহিত শাস্ত্রালোচনা না করিয়া কেমন যাও দেখিব।” মুকুন্দ পাণ্ডিত্যেও হীন ছিলেন না। নিরুপায় হইয়া ভাবিলেন, “নিমাই ত ব্যাকরণের পণ্ডিত, অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আজি ইহাকে এমনি ঠকাইব যে, আর কখনও তর্ক করিতে না আইসেন।” তখন দুই পণ্ডিতে ঘোর রণ বাধিয়া গেল। নিমাই অলঙ্কার-শাস্ত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া মুকুন্দকে পরাস্ত করিলেন। মুকুন্দ নিমাইর চরণধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, “এই অমামুখী প্রতিভার অধিকারী যদি কখনও কৃষ্ণভক্ত হন, তাহা হইলে তাহার সঙ্গ কখনও ছাড়িব না।”

একদিন বৈষ্ণব গদাধর পণ্ডিতকে পথে দেখিতে পাইয়া নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, “পণ্ডিত, জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন কর, মুক্তি কাহাকে বলে, বল দেখি?” গদাধর কহিলেন

“আত্মাত্মিক দুঃখনাশের নাম নিমাই তর্কের তুলীর উন্মুক্ত করিয়া গদাধরের সিদ্ধান্তকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। গদাধর মনে মনে পলাইবার সংকল্প করিতেছিলেন দেখিয়া, নিমাই তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

কিন্তু কিছুদিন পরে এক মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইর তর্কপ্রবৃত্তি স্বতঃই আত্মসঙ্কোচ লাভ করিল। এই মহাপুরুষের নাম জৈশ্বরপুরী। তিনি যখন অদ্বৈতাচার্যের গৃহে উপনীত হইলেন, তখন ভক্তচূড়ামণি আচার্য্য তাঁহার সামান্য বেশ দেখেও তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। আচার্য্য পরম সমাদরে মহাপুরুষের সৎকার করিলেন। সুকণ্ঠ মুকুন্দ তখনই কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক সুধাবর্ষা সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিলেন। জৈশ্বরপুরী ভাষা শুনিয়া মুগ্ধিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নজলে মৃত্তিকা ভাসিয়া বাইতে লাগিল।

একদিন পশ্চিমধ্যে নিমাইর সিদ্ধপুরুষোচিত কলেবর দেখিতে পাইয়া জৈশ্বরপুরী অনিমেঘ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করন্তঃ নিমাইর পরিচয় পাইয়া পুরী কহিলেন, “তুমিই সেই!” নিমাই তাঁহাকে পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন, এবং নিরন্তর যত্নের সহিত অতিথিসৎকার করিলেন। পুরী কতিপয় মাস গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিলেন। নিমাই তথায় :প্রত্যাহ তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। একদিন পুরী নিমাইকে কহিলেন, “তুমি পরম পণ্ডিত। আমি ত্রীকৃষ্ণবিষয়ক

একখানা পুস্তক রচনা করিয়াছি। তুমি তাহা শুনিয়া, তাহাতে যে যে দোষ আছে, আমাকে বল।” নিমাই কহিলেন “ভক্ত-রচিত কৃষ্ণ-চরিত্রে যে দোষ দর্শন করে, সে পার্শ্বী;

ভক্তের কবিত্ব যে-তে মতে কেন নয়,
সর্বথা কৃষ্ণের প্রীতি, তাহাতে নিশ্চয় ॥

মূর্খে বলে ‘বিষ্ণায়,’ ‘বিষ্ণবে’ বলে ধীর।

ছই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণধীর ॥

“মূর্খো বদতি বিষ্ণায়, ধীরো বদতি বিষ্ণবে।

উভয়োঙ্গ সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনাৰ্দ্দনঃ ॥”

পূরীর নির্বন্ধাতিশয্যে নিমাই তাঁহার সহিত পুস্তকের দোষগুণের আলোচনা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গদেশ গমন; পত্নী-বিয়োগ ও দ্বিতীয়বার বিবাহ

নিমাইর পৈতৃক বাসস্থান খ্রীহট্ট জেলায়। পূর্বপুরুষের বাসস্থান দেখিবার অভিলাষেই হউক, অথবা অজ্ঞ কারণবশতঃই হউক, নিমাই বঙ্গদেশভ্রমণে অভিলাষ করিলেন এবং কিয়দিন পরে জননীর অমুমতি গ্রহণ করতঃ কয়েক জন শিষ্য সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে অভিযুখে যাত্রা করিলেন। গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া নিমাই প্রথমে যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর গৃহে উপনীত হইলেন। তথা হইতে পদ্মা-তীরে উপনীত হইয়া পদ্মার তরঙ্গ-শোভা দর্শনে পরম প্রীতলাভ করিলেন। পদ্মাতীরে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া—নিমাই বঙ্গদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিলেন। বঙ্গদেশে ইতিপূর্বেই তাঁহার যশ বিতীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার কৃত টীপনি বঙ্গদেশের

অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছিল। অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থ নবদ্বীপে যাইবার আয়োজন করিতেছিল—এমন সময় তিনি স্বয়ং বঙ্গদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া, দলেদলে বিদ্যার্থীগণ তাঁহার নিকট সমাগত হইতে লাগিল। গৃহস্থগণ নানাবিধ উপায়ন সহ দলে দলে তাঁহার দর্শনার্থ উপস্থিত হইল। তাঁহার বিজ্ঞা ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। নিমাইর অধ্যাপনার এমন সুন্দর রীতি ছিল যে, ছই মাসের মধ্যেই এই সমস্ত শিষ্যের অনেকে কৃতবিদ্ব হইয়া উঠিল। অনেকে তাঁহার নিকট উপাধি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। নিমাই স্বদেশে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় তপন মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। ব্রাহ্মণ সাধা-সাধন-তত্ত্বের কোনও মীমাংসা করিতে না পারিয়া বড়ই অশান্তিতে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। একদিন স্বপ্নে নিমাই পণ্ডিতের শরণ গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়া, তিনি আসিয়া নিমাইর শরণাপন্ন হইলেন। নিমাই নামযজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে কৃষ্ণের আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন এবং বারাণসী গমন করতঃ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। তপন মিশ্র প্রেমপুলকিত শরীরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অচিরেই নিমাইও শিষ্য ও অমুগত জনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রত্যাগমনকালে শিষ্যগণ তাঁহাকে নানাবিধ ধন সামগ্রী উপহার দিয়াছিলেন।

নিমাইর অমুপস্থিতিকালে পতিবিরহ-

বিধ্বা লক্ষ্মী দেবী, এক দিন সর্পদষ্টা হইয়া
প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এ সংবাদ নিমাই
জানিতে পারেন নাই। গৃহে প্রত্যাগত হইবা-
মাত্র জননীর কাতর ক্রন্দন শুনিয়া নিমাই
বুঝিতে পারিলেন, কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।
সমস্ত অবগত হইয়া জননীকে প্রবোধ দিবার
জন্তু কহিলেন—

“কস্তকে পতিপুত্রাত্মা, মোহ এবহি কারুণম্।”
পুত্রের সাধনায় শচী দেবী শোক সংবরণ
করিতে সক্ষম হইলেন।

পুনরায় নিমাই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত
হইলেন—পুনরায় যুকন্দ সংজয়ের গৃহ তাঁহার
ছাত্রগণের অধ্যয়নে মুখরিত হইয়া উঠিল।
তথায় দলে দলে নূতন ছাত্রের সমাগম হইতে
লাগিল। নিমাই শিষ্যগণকে শাস্ত্রবিধি
পালন করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন এবং
কেহ তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন করিলে
তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতেন।
তিলক ধারণ না করিয়া যদি কেহ বিদ্যালয়ে
আসিত, তাহা হইলে তাহাকে এমন লজ্জা
দিতেন যে, আর কখনও সে সেক্রপ করিতে
সাহসী হইত না।

বালমূলভ চপলতা তখনও নিমাইকে
পরিত্যাগ করে নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে তিনি
তদেধ-প্রচলিত কখনভঙ্গী শিখিয়া আসিয়া-
ছিলেন। নবদ্বীপে পূর্ববঙ্গবাসী কাহারও
সাক্ষাৎ পাইলেই, তদেধীয় কথা বলিয়া
নিমাই তাঁহাকে উপহাস করিতেন। শ্রীহট্ট-
বাসী দেখিলে তাঁহার পরিহাসের আর সীমা
থাকিত না। ক্রুদ্ধ শ্রীহট্টবাসিগণ তখন
নিমাইর পৈতৃক বাসস্থানের উল্লেখ করিয়া
বলিতেন “তুমি কোন্ দেশী, কও তো ?

তোমার বাপ মা কার জন্ম শ্রীঅট্টে নয় ?
তোমার হৌদ পুরুষ শ্রীঅট্টবাসী।” নিমাই
তাহাদিগকে না চটাইয়া ক্ষান্ত হইতেন না।
অবশেষে যখন তাহারা গালি দিতে দিতে
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত, তখন তিনি
নিরস্ত হইতেন। এঁহেন চপল নিমাই স্ত্রী
লোকের সহিত কখনও পরিহাস করেন নাই।

এদিকে পুত্রবৎসলা শচীদেবী পুনরায়
পুত্রের বিবাহ দিবার জন্তু উৎসুক হইলেন।
নবদ্বীপে সনাতন পণ্ডিত নামক একজন
সম্ভ্রান্ত বিষয়ী ছিলেন। তাঁহার পদবী ছিল রাজ-
পণ্ডিত। তিনি সচ্চরিত্র, কুটুম্ব-পরিপোষক,
সরলস্বভাব, উদার, বিষ্ণুভক্ত ও আতিথেয়
ছিলেন। তাঁহার বংশগৌরব প্রসিদ্ধ ছিল।
বিষ্ণুপ্রিয়া নামে তাঁহার একটা কন্যা ছিলেন।
কন্যাটি পরমা সুন্দরী, বিনীতা ও মধুর-প্রকৃতি
ছিল। গঙ্গার ঘাটে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া,
শচী তাঁহার সহিত নিমাইর বিবাহ দিতে
উৎসুক হইলেন। কানীনাথ মিশ্র ঘটক হইয়া
সনাতন মিশ্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব
উত্থাপিত করিলেন। সনাতন সানন্দে স্বীকৃত
হইলেন। বুদ্ধিমন্ত খান নামে নিমাইর
হিঠৈতরী একব্যক্তি একাকীই বিবাহের সমস্ত
ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন।
শুভদিনে শুভলগ্নে পরম সমারোহের সহিত
নিমাইর দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্পন্ন হইল।
নবপরিণীতা ভার্যাসহ নিমাই গৃহে প্রত্যাগত
হইয়া জননীর চরণ বন্দনা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

গঙ্গা-গমন ও ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ

শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণ ভগবানের নিকট

প্রার্থনা করিতেন, নিমাই যেন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হন। এতদিনে তাঁহাদের প্রার্থনা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণের পর ছই বৎসর যাবৎ নিমাই নিজের টোলে অধ্যাপনা করিলেন। ছই বৎসর পূর্বে এক বিংশ বর্ষ বয়সে জননীর অমুমতি লইয়া পিতৃকার্য সম্পাদনার্থে নিমাই গয়া গমন করিলেন। এই গয়াগমনে নিমাইএর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়; জ্ঞানদর্শিত যুবক তৃণাদপি সূনীচ হইয়া ভক্তির যাজনা আরম্ভ করেন।

কতিপয় শিষ্যের সহিত নিমাই গয়া-গমনোদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিলেন। মন্দার-পর্বতে যখন তাঁহার উপনীত হইলেন, তখন নিমাইর স্নহ সবল শরীরে জ্বর প্রকাশ পাইল। সঙ্গিগণ জ্বরের প্রাবল্য দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। কিন্তু নিমাই এক বিপ্রেয় চরণোদক পান করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। ব্যাধির উপশম হইবার পর নিমাই সশিষ্য পুনরায় গয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গয়ায় প্রবিষ্ট হইয়া নিমাই প্রথমে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলেন, তৎপরে গদাধরের পাদপদ্ম দেখিবার জন্ত চক্রবেড়ের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তথায় যে দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে ভাবোচ্ছ্বাস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। নিমাই দেখিলেন, বিপ্রগণ-বেষ্টিত পাদপদ্মের উপরিভাগে ভক্তদত্ত মালা-রাশি পর্বতপ্রমাণ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তদুপরি কত গন্ধপুষ্প, ধূপদীপ, বস্ত্রালঙ্কার শোভা পাইতেছে। দিব্যপরিচ্ছদধারী বিপ্রগণ পাদপদ্ম-মহিমা কীর্তন করিয়া উচ্চরবে গান করিতেছেন—

কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিল যে চরণ

যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন।

বলিশিরে আবর্তিত হইল যে চরণ,

দেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ॥

নিমাইর ভাবস্রোত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যুগযুগান্তর হইতে, সহস্র সহস্র যোজন দূর হইতে আগত কোটি কোটি লোক যে চরণ দেখিয়া ও অর্চনা করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে তাহা দেখিতে পাইয়া নিমাই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বক্ষ ভাসাইয়া প্রবল বেগে অশ্রুধারা ছুটিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিমাইর এই ভক্তি-বিহ্বল অবস্থায়, বিধাতার ইচ্ছায় ভক্তচূড়া-মণি ঈশ্বরপুরী তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়াই নিমাই ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন। পুরী প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিমাই অশ্রুধ্বকণ্ঠে কহিলেন, “আমার দেহ-মন আজি হইতে সমস্তই আপনার পদে সমর্পণ করিলাম। আমাকে কৃষ্ণপ্রেমে অভিষিক্ত করিয়া দিন।” পুরী কহিলেন, “তোমাকে দেখিয়া কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের স্মৃতি লাভ হয়। নবদ্বীপে সেই দেখা অবধি আমি তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারি নাই।” বহুক্ষণ পুরীর সহিত প্রেমালাপের পর, নিমাই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধাদি করিতে প্রস্থান করিলেন। ফল্গুতীর্থে বালুকাপিণ্ড দান করিয়া, গিরিশুঙ্গে প্রেতগন্ধাশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর শ্রীরাম-গয়া, যুধিষ্ঠির-গয়া, ভীম-গয়া, প্রভৃতি বোড়শ গয়ার পিতৃ-দান করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে পুনরায় স্নান করত

গয়াশিরে পিণ্ডদান করিলেন এবং দিব্য মালা চন্দন দ্বারা বিষ্ণুপদচিহ্ন পূজা করিলেন।

পিতৃকার্য সম্পন্ন হইল; কিন্তু নিমাইর মন বিবম চঞ্চল হইয়া উঠিল। একদিন ক্ষেত্রপুরী তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলে, তিনি মন্ত্রদীক্ষা যাচঞা করিলেন। পুরী আগ্রহের সহিত তাঁহাকে দশাঙ্কর মন্ত্র দান করিলেন। দীক্ষা গ্রহণান্তর গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিমাই কহিলেন, “আমার দেহমন সমস্তই আপনাকে উৎসর্গ করিলাম। আমাকে কৃষ্ণপ্রেমরসে অভিষিক্ত করুন।” পুরী প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ের শরীর উভয়ের অশ্রুতে দিক্ত হইল।

দীক্ষার পর নিমাই কিছুদিন গয়াধামে অবস্থিতি করিলেন। তখন তিনি কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর, ও দিবানিশি ইষ্টদেবতার ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। বিদ্যাগোরব বিলুপ্ত হইল, চপলতা অস্তিত্ব হইল। নিমাই ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিয়া

উঠিতেন, এবং কখনও “কৃষ্ণরে, বাপরে” বলিয়া ধূলায় লুপ্তিত হইতেন। শিষ্যগণ শঙ্কিত হইয়া নানাবিধ প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া নিমাই কহিলেন, “তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর; আমি আর সংসারে ফিরিব না, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণের অন্বেষণে আমি মথুরা যাইব।” শিষ্যগণ অতি কষ্টে তখন তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। কিন্তু একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিমাই মথুরার পথে প্রস্থান করিলেন। “কৃষ্ণরে বাপরে মোর পাইমু কোথায়” বলিয়া স্কন্ধে রবে রোদন করিতে করিতে নিমাই মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে এক দৈববাণী তাঁহাকে মথুরা যাইতে নিষেধ করিল এবং নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিল। নিমাই আবাসে প্রত্যাগত হইলেন, এবং কিছুদিন পরে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মত

ব্রহ্ম-জ্ঞান

ধর্মের স্তরভেদ

সভ্যাসভ্য পৃথিবীর সর্বশ্রেণীর মানব-সমাজের প্রচলিত ধর্ম সকল তুলনা করিয়া বিচার করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, একেখরের অমূল্য লাভ করিবার পূর্বে, মানব-মণ্ডলীকে সোপানের পর সোপান এইরূপ বহু সোপান অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। যদিও নিম্নতর সোপানের

মানবসমাজে উন্নততর সোপানের লোক সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়, এমন কি, দেশ-বিশেষে সোপান সকলের পরস্পর সংমিশ্রণও দৃষ্ট হয়, তথাপি সাধারণভাবে একথা সত্য যে, ভূবিজ্ঞান স্তরের জ্ঞান মানব-জগতে ধর্ম বিকাশের মোটামুটি চারিটি সোপান বা স্তর নির্দেশ করা যায়। নিম্নতম সোপানের মানব-

সমাজ শিশুর তুল্য। শিশুগণ যেমন আপনাদিগের খেলার পুতুল প্রভৃতির মধ্যে প্রাণ করনা করিয়া, কখনও বা তাহাদিগকে সাদরে চুষন করে, কখনও বা ক্রোধভরে তাহাদিগকে প্রহারও করে, সেইরূপ ধর্মের নিম্নতম সোপানের অসভ্য মানব-মণ্ডলীও ইতরপ্রাণী, অথবা বৃক্ষ এবং কাষ্ঠ-লৌহাদিকে মানুষের জ্ঞান, অথবা ততোধিক শক্তিশালী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়া তাহাদের পূজা করে, যুদ্ধ বা বিপদ-সময়ে তাহাদের নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশায় আহ্বাদি ভোগ্যবস্তুর দ্বারা তাহাদিগের সৎকার করে, এবং সে আশায় বঞ্চিত হইলে, রোষভরে তাহাদিগকে প্রহারও করিয়া থাকে। এই স্তরের মানবগণ পরলোকগত আপনাদিগের পিতৃপুরুষাদিরও পূজা করিয়া থাকে। এই স্তরকে প্রাণবাদ (Animism) বলা যায়। সুসভ্য জাতির মধ্যেও এই স্তরের নিদর্শন দৃষ্ট হয়,—যেমন রোমীয়দিগের মেনিজ (Manes), অথবা আমাদিগের অগ্নিস্বাত, মরীচি প্রভৃতি সপ্ত পিতৃগণ। জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন লোকে জড়বস্তুর জড়ত্ব বিষয়ে নিঃসংশয় হয়, তখন তাহারা জড়পূজা হইতে বিরত হইয়া, জড়বস্তু হইতে পৃথক্ অথচ প্রত্যেক জড়বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাতা, অথবা জড়-প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা করনা করিয়া তাহাদের পূজা করিয়া থাকে। এই স্তরকে বহুদেববাদ (Polytheism) বলা যায়। আবার জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকে যখন দেখিতে পায় যে, জড়বস্তু সকল অথবা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সকল কার্য্য-কারণাদি বিবিধ অনিষ্ট স্বত্বকে পরস্পর সম্বন্ধ,

তখন তাহারা সেই অধিষ্ঠাতৃদেবগণেরও পরস্পর মিলন করনা করিয়া, একেশ্বরবাদের দিকে আরও অগ্রসর হয়; যথা,—বৈদিক বিশ্বদেব, এবং হিরণ্যগর্ভের করনা। সেই সঙ্গেই লোকে যখন যে দেবতাতে বিশেষ আসক্ত হয়, সেই দেবতাকেই দেবগণের প্রধান বা দেবরাজ বলিয়া করনা করিয়া থাকে (Henotheism)। পরিশেষে জ্ঞানের বিকাশ দ্বারা লোক যখন প্রকৃত তত্ত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়, তখন দেখিতে পায় যে, বিশ্ব-সংসার একই জ্ঞান, একই ইচ্ছা, একই শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই শেষ সোপানের নাম একেশ্বরবাদ (Monotheism)। একেশ্বরবাদের ক্রমবিকাশেই আরও একটি উন্নততর স্তরের আভাস লাভ হয়। তাহাকে সর্বাত্মবাদ, অথবা ব্রহ্মবাদ বলা যায়। প্রাচ্য দার্শনিকদিগের মধ্যে স্পিনোজা (Spinoza), হেগেল (Hegel), প্রভৃতি তাহার আভাস লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে সুফিগণ তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের বেদান্তেই সেই সর্বাত্মবাদের বিশেষ বিকাশ।

ঋগ্বেদ ধর্মস্তরের নিদর্শন

আমাদের ঋগ্বেদ ধর্ম-বিজ্ঞানের অমূল্যগন বিষয়ে জগতের বিশেষ সহায় হইয়াছে। ধর্মের ক্রম-বিকাশের পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি স্তর এবং তাহাদের পরস্পর সংমিশ্রণ ঋগ্বেদে অতি সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহা পাঠকের নিকটে প্রদর্শন করিতেছি। (১) জড়ের জীবত্ব করনার দৃষ্টান্ত :—সাদলকৃত ধনিত রেখা বা সীতার স্তব—“সর্বাণী স্তবগে তব সীতে বংদা

মহেত্বা যথা নঃ স্তুভগাসসি যথা নঃ স্তুফলা-
সসি”। ৬। ‘হে স্তুভগে সীতে, আমাদের
অভিমুখী হও। আমরা তোমার বন্দনা
করিতেছি। তুমি আমাদের ইষ্টধন এবং
সুফল প্রদান কর’। ৪। ৫৭। ৬।

জল ও নদীর স্তব :—‘অপোদেবীকৃপঃ
হুবে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ। সিদ্ধুভ্যাঃ কৰ্ত্ত্বং
হবিঃ”। ১৮। ‘দেবীকৃপ জলকে আহ্বান
করি, আমাদের গাভী সকল বাহা পান করে।
যে জল সিদ্ধুরূপে প্রবাহিত, তাহার অল্প হবিঃ
প্রদান কর্ত্তব্য’। ১-২৩-১৮। ঘূতের স্তব :—
‘বয়ং নাম প্রত্নবামা ঘূতস্তম্মিত্তজ্ঞে ধারয়ামা
নমোভিঃ”। ২। ‘আমরা ঘূতের নাম কীর্ত্তন
করিব। এ যজ্ঞে নমস্কার দ্বারা তাহাকে
ধারণ করিব’। ৪-৫৮-২ এতদ্ভিন্ন মণ্ডুক বা
ভেকের স্তব সপ্তম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তে দ্রষ্টব্য।
পিতৃপুরুষদিগের স্তবেরও দৃষ্টান্ত আমরা
ঋগ্বেদে পাইতেছি। “ইমং যম প্রস্তবমাহি
সীদাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সর বিদানঃ”। ‘হে
যম, এই যজ্ঞারম্ভে আসিয়া উপবেশন কর।
অঙ্গিরা নামক পিতৃগণকে সঙ্গে আন’। ৪।
“অঙ্গিরসো নঃ পিতরোনবথঃ অথবাণোভৃগবঃ
সোম্যাসঃ। তেবাং বয়ং স্তমতো যজ্ঞিয়ান্য-
মপি ভদ্রে সৌমনসে স্তাম।” ‘অঙ্গিরা অথর্কন
এবং ভৃগু আমাদের পিতৃগণ আসিয়াছেন।
ঐহারা সোমপানেরা অধিকারী। সেই যজ্ঞ-
ভোজ্যগণ আমাদের কল্যাণ কামনা করেন।
ঐহাদের প্রসন্নতা লাভ করিয়া, আমরাও
কল্যাণযুক্ত হই’। ১০-১৪-৪, ৬। এই সকলই
প্রাণবাদের (Animism) দৃষ্টান্ত।

(২) ঋগ্বেদে বহু দেববাদের (Poly-
theism) নিদর্শনেরও অভাব নাই। কোথাও

তেত্রিশজন দেবতার উল্লেখ (৮-৩৫-৩)
“বিশ্বদেবৈবজ্জিভিরেকাদনৈঃ” (৩×১১=৩৩),
কোথাও বা তিন হাজার তিন শত উন-
চল্লিশ জন দেবতার উল্লেখ—“ত্রীণিশতা ত্রী
সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্ধ্যান্”—
‘তিন সহস্র তিন শত ত্রিশ ও নয়জন দেবগণ
অগ্নির পূজা করিলেন’। কোথাও বা সমস্ত
দেবগণ একযোগে বিশ্বদেব নামে পূজিত
হইয়াছেন :—“আমাসর্চর্ষনীধৃতো বিশ্বে
দেবাস আগত”। ‘হে কৃষকদিগের পালক
বিশ্বদেবগণ, আগমন কর’। ১-৩৭। আবার
কোথাও বা বরুণ (৫-৮৫ সূক্ত), কোথাও
বা ইন্দ্র (২-১২-১), কোথাও বা অগ্নি
(৩-৫৫-৪) সমস্ত দেবগণের রাজা বলিয়া পূজিত
হইয়াছেন (Henotheism); পরিশেষে আমরা
দেখিতে পাই, দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই
বৈদিক ঋষির ননে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের
উদয় হইয়াছিল। “অস্তি ষিন্নু বীর্ধ্যং তন্ন
ইন্দ্র ন বিদন্তি”—‘হে ইন্দ্র তোমার সে প্রকার
শক্তি কি আছে, না নাই’ (৬-১৮-৩),
“যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহসেতি ঘোরমুতে মাহর্নৈষৌ
অন্তীতেতুং,”—‘সেই ভয়ঙ্কর (দেব) যাঁহার
সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়,
এবং কেহ বা বলে তিনি নাই, সেই ইন্দ্রে
বিশ্বাস কর’ (২-১২-৫)। “নেস্তৌ
অন্তীতি নেম উত্ব আহ কইং দদর্শকমভৌষ্ট-
বাম্,”—‘নেম (ঋষি) বলেন ইন্দ্র নাই, কে
তাহাকে দেখিয়াছে আমরা কাহার স্তব
করিব?’

(৩) আমরা ঋগ্বেদে ঈশ্বরের একত্বের
(Monotheism) অন্তর্ভুক্তিরও বিশেষ
বিকাশ দেখিতে পাই। “মহং দেবানাম্

স্বরূপমেকং” ‘দেবগণের মহাশক্তি একই’ (৩-৫৫-১)। আবার অগ্নিকেই বরুণমিত্র এবং সমস্ত দেবগণরূপে সম্বোধন করা হইতেছে। “তন্ময়ে বরুণো জায়সে যতঃ মিত্রো ভবসি যৎসমিদ্ধঃ ॥ হে বিশ্বং সংসাপ্ত্র দেবান্তঃসিদ্ধো দাপ্তবে মর্ত্যায় ॥” ৫-৩-১। ‘হে অগ্নি, তুমিই জন্মিয়া বরুণ হও, প্রজলিত হইয়া মিত্র হও; হে বলের পুত্র, তুমিই বিশ্বদেবগণ তুমিই হব্যাদায়ী লোকের নিকটে ইন্দ্র,’ আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, বৈদিক ঋষি ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনাদের অজ্ঞানতা অনুভব করিতেছেন। ঈশ্বর যে এক, জন্ম-রহিত, এবং চরিত্রের, তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন। ঋষি বলিতেছেন :—“প্রথম জায়মানকে (যিনি প্রথমে বিশ্বরূপে আবির্ভূত) কে দেখিয়াছে? যিনি স্বয়ং অস্থি-শূণ্য হইয়া অস্থিযুক্তকে ধারণ করেন। প্রাণ ও শোণিত ভূমি হইতে, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে? বিদ্বানের নিকটে কে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল? আমি অজ্ঞানী, মনদ্বারা ধারণ করিতে পারি না, এই সকল প্রশ্ন দেবগণের নিকটেও নিগূঢ়। আমি অজ্ঞানী, জানি না, তাই জানিবার জন্ত বিদ্বান্ কবি-দিগকে জিজ্ঞাসা করি—যিনি এই ছয় লোককে সৃষ্টি করিয়া আছেন, সেই জন্মরহিতের রূপ কি এক? (১-১৩৪-৪,৫,৬)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেই ঈশ্বরের একত্ব বৈদিক ঋষিদিগের নিকট বিশেষভাবে প্রকাশিত। ৮১ সূক্তে দেবতা বিশ্বকর্মা, ঋষিরও নাম বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মা নামে ঈশ্বরকে আমরাদিগের পিতা বলা হইতেছে, ঋষি বলা হইতেছে, এবং বিশ্বভূবনকে এক মহাযজ্ঞ

কল্পনা করিয়া তাহার হোতা বা হোমকর্তা বলা হইতেছে। ‘য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহুদৃষিহোতা ত্বসীদং পিতা নঃ’। সেই বিশ্বকর্মা’কে “বিশ্বতন্মস্কৃত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরত বিশ্বতস্পাৎ” বলা হইতেছে। “সেই এক দেব আবাভূমির জনয়িতা”— “আবাভূমী জনয়দেব একঃ” (৮১-১,৩)। ৮২ সূক্তেরও দেবতা এবং ঋষি বিশ্বকর্মা। তাহাতে সৃষ্টির সম্বন্ধে যে আলোচনা দৃষ্ট হয়, তাহা অতি সূক্ষ্ম। “বিশ্বকর্মার মন বৃহৎ, আত্মা বৃহৎ, তিনি ধাতা, বিধাতা, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বজ্ঞ। কেহ বলে তিনি সপ্ত-ঋষির পরবর্তী স্থানে একাকী আছেন।” এ স্থলে আমরা পরবর্তী নৈয়ামিকদিগের তটস্থ (Extramundane) ঈশ্বরবাদের কতক আভাস পাইতেছি। “বিশ্বকর্মা বিমনা আদিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সন্দৃক্”। “বজ্রা সপ্তঋষির একমাহ্”। আবার বিশ্বকর্মা সম্বন্ধে বলিতেছেন—“যিনি আমরাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা-রূপে বিশ্বভূবনের সকল স্থান অবগত আছেন, যিনি এক হইয়াও দেবগণের নামধারণ করেন, অপর সকল ভূবনের লোক তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে।” “যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যো দেবানাং নামধা এক এব তং সপ্তাশ্রং ভুবনা যন্ত্যভা।” ৩। ঋষি ছালোকের অতীত, পৃথিবীরও অতীত, অসুর দেবগণেরও অতীত, জল সকল এমন কি প্রথম গর্ভধারণ করিয়াছিল, যাহার মধ্যে সমস্ত দেবগণ আপনাদিগকে মিলিত দেখিয়াছিলেন। জল সকল সেই প্রথম গর্ভধারণ করিয়াছিল,

যাহার মধ্যে দেবগণ সকলে মিলিত, যাহা সেই জন্মরহিতের নাভিদেশে এক হইয়া অবাস্তব, তাহাতেই বিশ্বভূবনও অবস্থিত। তাহাকে তোমরা জান না, যাহা হইতে এ সকলের জন্ম। তোমাদের অস্থির অশ্রুপ্রকার হইয়াছে। লোক সকল কুশ্রুটিকাক্ষর-দৃষ্টি হইয়া নানাপ্রকার কল্পনা করে, তাহারা আহারাদি দ্বারা আপন প্রাণের তৃপ্তি অন্বেষণ করিয়া স্তবস্তুতি উচ্চারণকরতঃ বিচরণ করে। “পরো দিবাপর এনা পৃথিব্যা পরো দেবে-ভিরসুরৈর্যদন্তি। কং স্বিদার্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিধে”। ৪। “তমিদগর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিধে। অজস্র নাভাবধ্যেকমর্পিতং বস্মিদিধানি ভুবনানি তসুঃ”। ৬। ন তং বিদাধ য ইমা জজানা শুদ্রান্যাকমণ্ডবং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জগ্না চাস্মতূপ উক্থ স্বাসচরন্তি”। ৭-৮২-১০। আবার দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্ত যাহার ঋষি হিরণ্যগর্ভ, এবং দেবতা ক (কঠৈদেবার হবিষা বিধেম) নামক প্রজাপতি, তাহাতে উক্ত হইতেছে, ‘পূর্বে এক হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। তিনি জাত মাত্র ভূত সকলের একাধিপতি হইলেন। তিনিই জ্বাপৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। হবি দ্বারা কোন্ দেবতার পূজা করিব? যিনি আত্মা দান করিয়াছেন, বল দান করিয়াছেন, যাঁহার আত্মা সমস্ত দেবগণ পালন করেন, অমৃত যাহার ছায়াস্বরূপ, যত্না যাহার অধীন, কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? যিনি স্বীয় শক্তিবলে ইন্দ্রিাদি যুক্ত প্রাণি-জগতের একমাত্র রাজা, যিনি এই দ্বিপদ, চতুষ্পদ সকলের নিয়ন্তা, হবি দ্বারা কোন্

দেবতার পূজা করিব? হে প্রজাপতি, তোমা ভিন্ন অত্র কেহ এই সৃষ্ট বিশ্ব নিয়মিত করিতে পারে না”।*

আবার বলা হইতেছে—স্বপর্ণ বা পক্ষী (পরমাত্মা) একই আছেন। জ্ঞানী পণ্ডিত-গণ তাঁহার একত্ব সংস্কার বা কল্পনা দ্বারা তাঁহাকে নানারূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। “স্বপর্ণং বিপ্রাঃ কবরো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি”। (১০-১১৪-৫)। “সেই গমনশীল আকাশস্থ স্বপর্ণ বা পক্ষী অর্থাৎ সূর্য্যকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ এবং অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়। তিনি এক হইলেও পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অগ্নি, যম, মাত-রিখা প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করেন।” “ইন্দ্রঃ মিত্রঃ বরুণমগ্নিমাছরক্ষো দিব্যঃ স স্বপর্ণোগুরুয়ান্ একং সদিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিঃ যমঃ মাত্রিখানমাছঃ”। গরুড় যে বিষ্ণুর (সূর্য্যের) বাহন, এই গজের মূল এখানে দৃষ্ট হয়। পরিশেষে আমরা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের অমুবাদ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। এই সূক্তের দেবতা পরমেশ্বর বা পরমাত্মা, ঋষি প্রজাপতি। ইহাতে পাঠক দেখিবেন, বৈদিক ঋষিগণ সর্কীয়াদেবেরও সোপানে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়া ছিলেন—

* “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ পতিরেক আদীৎ। স যাহার পৃথিবী দ্যামুতেষাং কঠৈ দেবার হবিষা বিধেম। ১। য আত্মা বলদা বলা বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়াস্বতং যস্য যত্নাঃ, কঠৈ দেবার হবিষা বিধেম। ২। য প্রাণতো নিমিষতো মহিষৈক ইজ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদচতুষ্পদ কঠৈ দেবার হবিষা বিধেম। ৩। প্রজাপতে গম্যদেতা-স্তন্তো বিশ্বা জাতানি পরিভা বভূব”। ১০-১২১-১০

১। তৎকালে (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ (বা বাহ্য নাই) ও ছিল না, সৎ (বা বাহ্য আছে) ও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, বহু বিস্তৃত আকাশও ছিল না। আবরণকারী কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম গন্তীর মেঘ কি তখন ছিল?

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতত্বও ছিল না। অহোরাত্রের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ু বাতিরেকে আপনার মধ্যে আপনি জীবিত ছিলেন। তাহা ভিন্ন অণু কিছুই ছিল না।

৩। সর্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। এই সমস্তই চিহ্নার্জিত জল-ময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সর্বব্যাপী আবৃত ছিলেন। তপস্তার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্ম গ্রহণ করিল।

৪। প্রথমে মন হইতে কামের উদ্ভব। তাহা হইতেই প্রথম সৃষ্টিবীজ জন্মিল। জ্ঞানিগণ বুদ্ধিবলে হৃদয়ে আলোচনা করিয়া অসৎ হইতে সত্তের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন।

• নাসদাসীমো সদাসীতদানীং নাসীজ্জো নো
ব্যোম। পরো যৎ। কিমাবরীষঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ
কিমাসীল্লহনং গভীরং ॥ ১ ॥

ন মৃত্যুরাসীদ মৃতং ন তর্হি ন রাত্যা অহং আসীৎ
একেতঃ। আনীদবাতঃ স্বধয়া তদেকং তস্মাচ্ছাস্ত্র
পর্য কিং চনাম ॥ ২ ॥

তম আসীত্তমসা গুচমগ্রৈই একেতঃ সলিলং সর্বদা
ইদং। তুচ্ছোনাভূপিহিতং বদাসীত্তপসন্তনু মহিনা
জায়তৈকং ॥ ৩ ॥

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং
বদাসীৎ। সতো বহুমুসতি নিঃসিহনু হৃদি প্রতিষ্ঠা
কবয়ো মনীষা ॥ ৪ ॥

রেতোধা (জন্মদাতা পুরুষ) উৎপন্ন
হইল। মহিমা সকল উৎপন্ন হইল। তাহা-
দের রশ্মি উভয় পার্শ্বে অধোঃ এবং উর্দ্ধে
বিস্তৃত হইল। স্বধা (অন্ন) নিম্নদিকে এবং
প্রযতি (জীব) উর্দ্ধদিকে রহিল।

৬। কেই বা তত্ত্ব জানে? কেই বা
বলিবে? কোথা হইতে এ সকল জন্মিল?
কোথা হইতে এই বিবিধ সৃষ্টি হইল? এই
বিবিধ সৃষ্টির পরে দেবতার হইয়াছেন। বাহ্য
হইতে এ সকল হইয়াছে, কে তাহা জানে?
(পাঠক লক্ষ্য করিবেন, সৃষ্টির পরে দেবগণের
উৎপত্তি বলা হইতেছে)।

৭। এই বিবিধ সৃষ্টি বাহ্য হইতে হইল,
অথবা কেহ ইহার বিধান করিয়াছেন কি
করেন নাই, যিনি ইহার অধ্যক্ষরূপে পরম-
ধামে আছেন, হয় ত তিনিই জানেন। কি
জানি তিনিও যদি না জানেন! এ স্থলে
আমরা সাধ্য প্রকৃতি-পুরুষ-কল্পনারও আভাস
পাইতেছি।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, তিন
হাজার তিন শত উনচল্লিশ সংখ্যক দেবতা
পরিণামে ঋগ্বেদেই এক অধ্যক্ষে পরিণত
হইয়াছে। বলা হইতেছে “অজায়তৈকং”

ত্রিংশতিনো বিততো রশ্মিরেবামখঃ ষিদাসীদ্রজরি
ষিদাসিৎ। রেতোধা আসন্ন্যজি আসনস্বধা অবস্তাৎ
প্রযতি পরস্তাত ॥ ৫ ॥

কো অহা বেদ ক ইহ প্রোচৎ কুত প্রোজাতা কুত
ইদং বিসৃষ্টঃ। অবাংদেবা অগা বিসর্জনে নাথ। কো
বেদ যত আবভূব ॥ ৬ ॥

ইদং বিসৃষ্ট্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষপরমে ব্যোমসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন
বেদ ॥ ৭ ॥ (১২৯)

“সেই একই (সৃষ্টিক্রমে) জন্ম গ্রহণ করিলেন।”
 “অর্থাৎ অন্য বিসর্জনে” এই বিবিধ
 সৃষ্টির পরে দেবগণ উৎপন্ন (অর্থাৎ দেবগণ
 কল্পিতমাত্র)।

বৃহদারণ্যকে দেবগণের বিস্তার এবং সঙ্কোচ

বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাকল্য ব্রাহ্মণে
 বিদগ্ধ শাকল্য প্রশ্ন করিতেছেন, “দেবগণ
 কত সংখ্যক?” তাহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বৈশ্ব-
 দেব শাস্ত্রোক্ত বাচ্যে বলিতেছেন, “ত্রয়শ্চ
 দ্বীচশতা ত্রয়শ্চ দ্বীচ সহস্রা। (৩৩০০ +
 ৩৩০০ = ৬৬০০)। আবার বিদগ্ধ প্রশ্ন
 করিলেন, “দেবগণ কত সংখ্যক?” যাজ্ঞবল্ক্য
 বলিলেন “ত্রয়স্ত্রিংশৎ” (৩৩)। সেই প্রশ্ন
 পুনরায় করিলে পর, তিনি বলিলেন, “ষট্”
 পুনরায় করিলে পর তিনি বলিলেন “ত্রয়ঃ”
 (৩)। আবার প্রশ্ন করিলে পর বলিলেন,
 “দুই”। শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন “এক”।
 বিদগ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন সেই তেত্রিশ
 হাজার তেত্রিশ শত দেবতা কে কে? যাজ্ঞবল্ক্য
 উত্তর করিলেন এ সকল দেবগণের
 মহিমা (বা বিভূতি) মাত্র। বস্তুতঃ দেবগণ
 ত্রয়স্ত্রিংশৎ বা তেত্রিশ। আবার প্রশ্ন
 হইল, “সেই ত্রয়স্ত্রিংশৎ কে কে?” তাহার
 উত্তরে বলিলেন, “আটটি বস্তু, এগারটি রুদ্র,
 বারটি আদিত্য এই একত্রিশ এবং ইন্দ্র ও
 প্রজাপতি। (প্রশ্ন) আটটি বস্তু কে? (উত্তর)
 অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য,
 দ্যলোক, চন্দ্রমা, এবং নক্ষত্রগণ। (প্রশ্ন)
 একাদশ রুদ্র কে? (উত্তর) মনুষ্যের মধ্যে দশটি
 প্রাণ অর্থাৎ কর্মেজিয় পাঁচটি এবং জ্ঞানেজিয়
 পাঁচটি, এবং আত্মা অর্থাৎ মন তাহাদের
 একাদশ। যখন ইহারা এই শরীর হইতে

উৎক্রান্ত হয়, তখন লোককে রোদন করায়,
 এ জন্ত ইহাদের নাম রুদ্র। (প্রশ্ন) ইন্দ্র কে
 এবং প্রজাপতি কে? (উত্তর) স্তনয়িত্ব
 (মেঘগর্জনে)ই ইন্দ্র, যজ্ঞ—প্রজাপতি। স্তনয়িত্ব
 কে? অশনি বা বিদ্যুৎ। যজ্ঞ কে?
 পশুগণই যজ্ঞ অর্থাৎ পশুবৎ দ্বারাই যজ্ঞ
 সাধিত হয়। যজ্ঞের অর্থ কোন রূপ
 নাই। (প্রশ্ন) ছয় জন কে? (উত্তর)
 অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য এবং
 দ্যলোক (প্রশ্ন) তিনজন দেব কে?
 (উত্তর) লোকত্রয় অর্থাৎ পৃথিবী এবং
 অগ্নি একত্রে এক লোক, অন্তরীক্ষ এবং বায়ু
 একত্রে দ্বিতীয় লোক, এবং দ্যলোক ও
 আদিত্য একত্রে তৃতীয় লোক। (প্রশ্ন)
 দুইজন দেব কে? (উত্তর) অন্ন এবং প্রাণ
 (প্রশ্ন) একজন দেব কে? প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ-
 স্বরূপ ব্রহ্ম। সর্বাশ্রকত্বহেতু যাহাকে মহৎ বা
 ব্রহ্ম বলা হয়। ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার
 ভাষ্যে বলিতেছেন, শাকল্য ব্রাহ্মণে দেবতা-
 গণের সঙ্কোচ এবং বিস্তার-বিষয়ক সংখ্যা, এবং
 তাঁহাদের স্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে। প্রাণ
 বা ব্রহ্মরূপেই দেবগণের একত্ব। ত্রয়স্ত্রিংশৎ
 প্রভৃতি ক্রমে দেবগণ এক প্রাণের অন্তর্ভুক্ত।
 আবার সেই এক প্রাণই অনন্ত সংখ্যাতে সর্ব-
 রূপে বিস্তৃত। এইরূপে প্রাণই এক এবং
 অনন্ত, প্রাণই তেত্রিশ প্রভৃতি অবাস্তব
 সংখ্যায়ুক্ত। পৃ—৬৪৭। এইরূপে আমরা
 দেখিতেছি, বহু দেববাদের সহিত একেশ্বর-
 বাদের সামঞ্জস্য প্রদর্শনের চেষ্টা বৈদিক কাল
 হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত। ইহার
 ফলে আমাদের দেশে বহুদেববাদের সহিত
 একেশ্বরবাদের এক অপূর্ব মিশ্রণ সংঘটিত

হইয়াছে, তাহার ক্ষুদ্রপাত স্বার্থে আমরা আমাদের শত্রু সকল সর্বত্রই এই মিশ্রণেরই প্রথম দেখিতে পাই। তাহাই পরিবর্তিত অপূর্ণ দৃষ্টান্ত।
আকারে অদ্যাপি আমাদের দেশে প্রচলিত।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

বেহার-চিত্র

ভিখারী মণ্ডর

(বেহারের কৃষক)

পিতৃমাতৃহীন ভিখারী বালাকাল হইতে দেশ বিদেশে জরিপের কাজে শিকল টানিয়া টানিয়া বহুকাল পরে পূর্ণ যৌবনে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। ক্রমাগত জরিপ-বিভাগের অস্থির জীবনযাপনে উন্মত্ত হইয়া, শাস্তি ও বিশ্রামের জ্ঞান সে লালসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রহিমপুরে যেখানে তাহার পৈতৃক বাসস্থানের ভগ্ন স্তূপ পতিত ছিল, জমিদারকে কিঞ্চিৎ সেলামী দিয়া প্রথমতঃ ভিখারী সেইখানে তাহার গৃহ নির্মাণের অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিল। অল্প দিনেই ভিখারীর ক্ষুদ্র গৃহ নির্মিত হইল।

ভিখারী যে দিন অসহায় অবস্থায় কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্য না পাইয়া সজল-নেত্রে তাহার পৈতৃক বাসভবন ছাড়িয়া গিয়াছিল, সে দিন কেহ তাহাকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও কর্তব্য মনে করে নাই। কিন্তু এক্ষণে ভিখারী “বেশ ছুপয়া” উপার্জন করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, এই সংবাদ গ্রাম মধ্যে প্রচারিত হওয়ার, তাহার বন্ধুবান্ধবের অভাব রহিল না। প্রতিদিন

সন্ধ্যাক্লে হাত্রে, আলাপে, সঙ্গীতে, তাম্রকূটধূমে তাহার ক্ষুদ্র গৃহ পরিপূরিত হইতে লাগিল। কিন্তু পূর্বের কথা বাহাই হউক, এবার ভিখারীর বন্ধুবর্গকে অকৃতজ্ঞতার অপবাদ দিবার কোনই উপায় ছিল না। ভিখারীর কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অভিভাবকবর্গ তাহাকে স্বল্পমূল্য তাম্রকূটের পরিবর্তে প্রতিদিন এত প্রচুর পরিমাণে বহুমূল্য উপদেশ দান করিয়া যাইতেন যে, অভিজ্ঞ ভিখারী সময়ে সময়ে এই গুরুতার স্নেহবর্ণ পরিশোধের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইত না।

তাঁহাদেরই পরামর্শ ও প্ররোচনায় নবাগত ভিখারী অচিরেই নিকটবর্তী গ্রামের একটি পিতৃহীন সুন্দরী বাণিকার পাণিগ্রহণ করিল।

কিন্তু উপার্জনের উপায় না করিয়া, অধিক দিন পরিবার লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা যায় না। বন্ধুবর্গ পরামর্শ দিলেন, এ স্থলে তহসিলদার সাহেবকে ধরিয়া কিছু ধান সংগ্রহ করাই সুযুক্তি। বলা বাহুল্য, ভিখারীর পৈতৃক জমি খাজানা না দেওয়ার, ইতিপূর্বেই ‘সরকারে’ বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরদিন প্রত্যবে

ভিখারী গ্রামের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান হোরিল সাহ, বাউলী সিংহ এবং মুন্সী দাম্‌ড়ি লালকে সঙ্গে লইয়া জমিদারের ‘ভাণ্ডারায়’ তহসিলদার সাহেবের ‘হজুরে’ হাজির হইল।

তহসিলদার সাহেব তখন ‘বিস্তারায়’ উপর খাতাপত্র সাজাইয়া কার্যায়ত্তের অভি-প্রায়ে মনোযোগ দিয়া নিজের বস্ত্রপ্রান্তের সাহায্যে তাঁহার ভগ্নদণ্ড চশমা খানির স্বচ্ছতা-বুদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন। মুন্সী দাম্‌ড়ি-লালকে দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেয়া খবর মুন্সীজি ?” মুন্সীজি করজোড়ে বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, “হজুরকে মূল্য-কাত; আউর কেয়া ?” বলিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি মুন্সীজি ধীরে ধীরে তহসিলদার সাহেবের মসী-মলিন ‘বিস্তারায়’ একপ্রান্তে নিজের স্বরভার ‘তশরিফা’ স্থাপন করিলেন। ভিখারী অত্যন্ত মসীদেব সহিত সম্মুখে মাটির উপর বসিল।

মুন্সীজি একে একে সকলের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্ত করিয়া বাউলী সিংকে কহিলেন, “খাজ এংনা ভোরে কেয়া খবর বাবু বাউলী সিং ?” বাউলী ভিখারীকে ঠেলা দিয়া কহিল, “আরে কঁহো না তহসিলদার সাহেবকো ভিখারী।” কিন্তু ভিখারী বেচারী কি করিয়া কথাটা আরম্ভ করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

তখন হোরিল সাহ করজোড় করিয়া তহসিলদারকে কহিল, “হজুরকো খেয়াল হোগা, রহিমপুরমে এক বুড়ো রাইসৎ খা— জোরাবর মণ্ডর—।” কিস্তৎক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া তহসিলদার কহিলেন, “হাঁ হাঁ জোরাবর। বহুত জমানে কি বাত হয়ি হোরিল তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া

বলিল যে, এই ভিখারী জোরাবরেরই পুত্র। বহুকাল দেশে ছিল না। এক্ষণে ‘সার্ভেতে’ কিছু উপার্জন করিয়া দেশে আসিয়াছে। যাহাতে তাহার ‘পরবরিস্’ হয়, সে উপায় হজুরকে করিয়া দিতে হইবে। তহসিলদার সাহেব তাঁহার সুবিশুদ্ধ গুল্‌ফশ্রেণীর অন্তরাল হইতে নির্মল দস্তরাঞ্জির ঈষৎ আভা প্রকাশিত করিয়া কহিলেন, “সার্ভেমে ? ওঃ তব্ তো বহুত কামাইস হোগা ! কম বিঘা খেত লেওগে ভিখারী ?” ভিখারী বিনীতভাবে বলিল, “দশ বিঘা হইলেই কোন প্রকারে তাহার চলিয়া যাইবে।”

“দশ বিঘা ?” বলিয়া তহসিলদার সাহেব কিঞ্চিৎ চিন্তাময়ের ভাব দেখাইলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “আচ্ছা, দশ বিঘা বন্দোবস্ত কর্‌দেঙ্গে। মালগুজারি তো জানতে হোগে ?” ভিখারী অজ্ঞতাসূচক ঘাড় নাড়িল।

মুন্সী দাম্‌ড়িলালের দিকে চাহিয়া তহসিলদার বলিলেন, “আপ্‌কো তো কুল্‌হাল্‌ মানুশ হৈ। ইস্কো আচ্ছা কর্‌কে সমঝা তো দিজিয়ে মুন্সীজি, জমিনকে মালগুজারি নগদ পাঁচ রোপেয়া বিঘা আর পান্‌সের ঘিউ। সেওয়ার ইস্‌কে পাটোয়ারিকে ‘মাজন’, ‘হজ্‌তান’ ‘ফরচানা’ ‘রসিদানা’, ‘হোলি-খেলাই’, ‘দোয়াত পূজাই’, ‘হরগা পূজাই’ ‘কম্বালকে ভোলাই’, ‘চৌকিদারী’, ‘হুকুমত’, ‘মদত’, ‘বিয়াহ-দানি’, ‘ভোজনি’, ‘মজরানা’, ‘চৌঠ’, ইসব তো হইয়ে হৈ। সেওয়া ইস্‌কে জব জৈমা সরকারসে হুকুম হোয়া।” মুন্সীজি ভিখারীকে সকল কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া তহসিলদার

সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আউর সেলামি?” তহসিলদার হাস্য করিয়া বলিলেন “সো তো আপ্‌কো বাথুবি মালাম হোগা। সেলামি সম্‌জিয়ে কুছ্‌তি নহি। মালিক কো সেলামি ১০০ রোপেয়া বিধা, আউর হামারা তো জানুতেই হোঙ্গে উসিকো আধা।”

সেলামি ও খাজানার বিপুল তালিকা শুনিয়া ভিখারী শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে গোপনে হোরিলকে এ কথা জানাইল। হোরিল অপাঙ্গে একটু চতুর হাসি হাসিয়া ইসারায় তাহাকে জানাইল যে, এ জ্ঞাত তাহার কোন চিন্তা নাই, সে সমস্তই ঠিক করিয়া দিবে।

হোরিল তহসিলদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, “কোন্‌ জমিন তহসিলদার সাহেব?” হাসিয়া তহসিলদার বলিলেন, “সে জ্ঞাত চিন্তা নাই। জমি সকলের সেয়া। আসল জমি যার নাম। তোমাদের গ্রামের সেই ভাস্কু কাহারের জমি। বেটা গত বৎসর হইতে ফেরার। অনেকে সে জমির জ্ঞাত উমেদার হইয়াছিল। কিন্তু কাহাকেও দিই নাই। জেরাবর অনেক দিনের পুরাতন প্রজা ছিল বলিয়াই, তাহার পুত্রের উপর এতটা অনুগ্রহ করিতেছি।”

মুন্সী দামড়িলাল গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “হাঁ আলবৎ। জমিন্‌ তো নেহাইত্‌ উমদা!” ভিখারী আবার গোপনে হোরিলকে বলিল, “খাজানা আর কিছু কমাইয়া দিলে তাহার জমি লইতে কোনই আপত্তি নাই।” হোরিল বিনীতভাবে এ কথা তহসিলদার সাহেবকে জানাইল।

হাসিয়া তহসিলদার বলিলেন, “জমি ত আমার নিজের নহে। মালিক যে দর বাধিয়া দিয়াছেন, সে ত আর আমার কমাইবার সাধ্য নাই। তবে এক কাজ কর না কেন? “বাটাইয়া” লও না কেন? যে বৎসর যেমন ফসল হইবে, সে বৎসর তেমনি খাজানা। অর্দ্ধেক ফসল তোমার, অর্দ্ধেক জমিদারের। ইহাতে ত আর লোকসান নাই।” কথাটা ভিখারীর মন্দ লাগিল না। ভিখারী “বাটাইয়া” লইতেই সম্মত হইল।

মুন্সী দামড়িলাল কাগজপত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন; তখনি কবুলিয়ৎ লিখিত হইল এবং কবুলিয়তের উপর ভিখারীর ‘আঙ্গুঠার ছাপ’ লওয়া লইল। অপরাহ্নে কবুলিয়ৎ রেজিষ্টারি করিয়া দিয়া এবং মালিক ও তহসিলদার সাহেবের সেলামি, মুন্সী দামড়িলালের তহরির, হিষ্টরী বন্ধুবর্গের পানভোজন-ব্যয়, রেজিষ্টারী আফিসের খরচা প্রভৃতিতে বহুদিনের কষ্টসঞ্চিত ধন্বিয়াটীর ভার যথেষ্ট গণ্য করিয়া সকল-মনোরণ ভিখারী পাট্টা লইয়া হুঠিচিন্তে বাটা ফিরিয়া আসিল।

২

ভিখারীর হৃদয়ে রোম্যান্টিক কাব্যরস না থাকিলেও, সে তাহার সুন্দরী যুবতী পত্নীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার মুখ চাহিয়া ভিখারী কৃষিকার্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিল। পরিশ্রমের ফলে ভিখারীর সুদীর্ঘ গরিপুষ্টি শতশুল্ক তাহার প্রতিবেশিগণের জীর্ষার কারণ হইয়া উঠিল। সমুদ্র প্রভাত-বায়ু-তাড়িত সেই হরিৎশস্ত্র-সিদ্ধির আন্দোলিত তরঙ্গরাশি দেখিতে দেখিতে নিরঙ্কর ভিখারীর সরল হৃদয় আশায় ও আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

এক এক দিন আহারান্তে জ্যোৎস্নালোকিত অঙ্গনতলে বসিয়া গল্প করিতে করিতে সে বুধিয়াকেও এই আনন্দের অংশভাগী না করিয়া থাকিতে পারিত না। এবারকার ফসল বেচিয়া সে কিরূপ সাড়ী ও অলঙ্কারে সুন্দরী বুধিয়াকে সাজাইবে, একথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ-স্বর আনন্দে গদগদ হইয়া উঠিত। শুনিতে শুনিতে বুধিয়ারও বিশাল নয়নে প্রতিফলিত মিথু জ্যোৎস্না থাকিয়া থাকিয়া হীরকের মত জ্বলিয়া উঠিত।

এমনি করিয়া আশায় ও আনন্দে ছয় মাস কাটিয়া গেল। শস্তরাজি সুপক্ব হইল। ভিখারী সমস্ত দিন শস্ত কাটিতে এবং সমস্ত রাত্রি শস্তক্ষেত্রে মঞ্চের উপর জাগিয়া শস্ত রক্ষা করিতে লাগিল। ৭৮ দিনে সমস্ত শস্ত কাটা হইয়া গেল। বুধিয়ার সাহায্যে ভিখারী সুন্দর করিয়া ‘খলিহান’ প্রস্তুত করিয়াছিল। সুপরিচ্ছন্ন, সুশোভিত আঙ্গন-তলে স্তূপাকার শস্তরাশি কয়লায় স্বর্ণমন্দিরের ত্রায় শোভা পাইতে লাগিল।

কিন্তু জমিদারের অংশ জমিদারকে ‘বণ্টিয়া’ দিবার পূর্বে খলিহান হইতে শস্ত উঠাইয়া আনিবার উপায় ছিল না। কেহ কিছু সরাইতেছে কি না, দেখিবার জ্ঞাত জমিদারের পক্ষ হইতে চৌকিদার নিযুক্ত ছিল।

কিছু দিন পরে জমিদারের অংশ বুধিয়া লইবার জ্ঞাত খাতাপত্র, পেয়াদা, তুলাদণ্ড, আমীন, ‘কয়লা’ প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া তহসিলদার সাহেব মহাসমারোহে গ্রামে শুভাগমন করিলেন। একে একে সকল বাটাইদারের শস্ত ওজন হইতে লাগিল। তৃতীয় দিনে তহসিলদার সাহেব সপারিষদ ভিখারীর খলি-

হানে দর্শন দিলেন। ভিখারীর সমুদ্রত শস্ত-স্তূপ দেখিয়া তহসিলদার সাহেব যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ঈর্ষং হাস্য করিয়া বলিলেন, “কেয়ারে বোলানা? কেইনা উমদা জমিন।” ভিখারী করজোড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। কয়াল দেখিতে দেখিতে সমস্ত শস্ত ওজন করিয়া ফেলিল। ওজনে সমস্ত শস্ত ২০০ মণ হইল। ওজন শেষ হইলে, কয়াল জমিদারের অংশ তোল করিতে ব্যাপৃত হইল। কিন্তু এবারকার ওজনে এক এক মণে এত অধিক শস্ত উঠিতে লাগিল যে দেখিয়া প্রথমটা ভিখারী নিতান্ত বিস্মিত হইল। ব্যাপার কি বুঝিবার চেষ্টায় অনেককণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া সে দেখিল যে, পূর্বে যে মণ দিয়া শস্ত ওজন করা হইতেছিল এক্ষণে তাহা দিয়া ওজন করা হইতেছে না। অনেক-ক্ষণ নূতন লৌহ-পরিমাপকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমকোচে ভিখারী বলিল “ই কেয়া একমণ হায়, কয়াল সাহেব?” দাঁত মুখ খিচাইয়া কয়াল বলিল “তব্ কেয়া চায় মণ হায়?”

নিকটবর্তী ‘খাটিয়া’র বসিয়া তহসিলদার সাহেব খাতায় ওজন লিখিতেছিলেন। ভিখারী তাঁহার নিকট গিয়া বিনীতভাবে বলিল “ভুজুর, পহিলে জিসুসে ওজন হয়, উসিসে ওজন কিয়া যায়।” শুনিয়া তহসিলদার সাহেব উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, “কেয়ারে পাগল্ হয় কেয়া? দেখতা নেহি পাক্কা ছাপা হয় মণ হায়? ই কভি কমবেশ হো সক্তা?”

কিন্তু নির্দোষ ভিখারীর ইহাতেও সন্দেহ দূর হইল না। সুতরাং এবার ওজন করিয়া

শস্ত্র নামাইবার পূর্বেই সে তাড়াতাড়ি কাঁটার উপর হঠতে নূতন মণ ফেলিয়া পুরাতন মণ বসাইয়া দিল। পুরাতন মণ বহু উর্দ্ধ উঠিয়া গেল। ভিখারী উত্তেজিত হইয়া বলিল, “ই কেয়া জার? হাম্ ইসু মণসে তোল করুনে নেহি দেঙ্গে।” বলিয়া সে পূর্বের তুলিত শস্ত্র-রাশি আবার টানিয়া সাধারণ স্তূপে মিশাইয়া দিল। তহসিলদার সাহেব ক্রোধে অগ্নিয়া উঠিলেন, কয়াল গজ্জিতে লাগিল। তহসিলদার সাহেব যে কেবল বিপ্লব-প্রভুভক্তি-প্রণোদিত হইয়াই এই প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রভু যৎকিঞ্চিৎ পাইতেন মাত্র। “সিংহাংশ” তহসিলদার সাহেবের উদরেই বাইত, কয়াল কিছু অংশ পাইত।

সুতরাং তহসিলদার সাহেব খাতাপত্র ফেলিয়া জরাজীর্ণ চশমাখানিকে সযত্নে কোষ-রুদ্ধ করিয়া ভীষণ হুঙ্কার করিয়া কহিলেন, “কেয়া তুম্ ফসিল তউলমে নেহি দেওগে?” ভিখারী বলিল, “পূর্বের ওজনেতোল করাইতে তাহার কোনই আপত্তি নাই।” ক্রুদ্ধ তহসিলদার কয়ালকে বলিলেন, “আজ্ঞা আভি ছোড় দেও ইসকো ফসিল। পিছে দেখা যায়গা।” বলিয়া, খাতাপত্র উঠাইয়া বিদ্রোহী ভিখারীর প্রতি কয়েকবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে দলবল লইয়া অন্তর্য চলিয়া গেলেন।

প্রভূষেই জমিদার-বাড়ীর দুইজন পেয়াদা আসিয়া ভিখারীর ঘারে উপস্থিত। তাহারা জমিদার-বাড়ীর কাজের অন্ত বেষ্ট্র ধরিতে আসিয়াছিল। তহসিলদার সাহেব তাহাদের প্রথমেই ভিখারীকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

পেয়াদারা বলিল “মালিকের জরুরি হুকুম, এখনি বাইতে হইবে।” ভিখারী সবিনয়ে বলিল যে, তাহার ধানের ‘বাঁট’ এখনো হয় নাই। ধান উঠাইয়া তবে সে বাইতে পারিবে, নহিলে তাহার সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে।

পেয়াদারা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল “ও সকল ঘরের কথা আমরা শুনিতে চাহি না। মালিকের হুকুম, এখনি বাইতে হইবে। না যাও ত সাফ বলিয়া দাও, আমরা কিরিয়া যাই।”

ভিখারী তহসিলদার মহাশয়ের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াই বিশেষ শক্তিত হইয়াছিল, তাহার উপর মালিকের আদেশ লঙ্ঘন করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। ধীরে ধীরে উদ্বিগ্নচিত্তে সে পেয়াদার অহুসরণ করিল।

৩

মালিকের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ বিবাহের এখনো তিন চারি দিন বিলম্ব, আপাততঃ কেবল উদ্যোগপর্ব চলিতেছে। ভিখারী উপস্থিত হইবামাত্র হুকুম হইল, “যাও আউর তিন আদমীকে সাথ হাসনপুর; উহাসে সামিয়ানা লে আও। সামিয়ানা লানেকো রাদ খানেকো দিয়া জার গা।” গোমস্তা হাসনপুরের বাবু জগদ্ধর নারায়ণের নামে পত্র লিখিয়া দিল। ভিখারী সঙ্গীদের সহিত পত্র লইয়া সামিয়ানা আনিতে চলিল। হাসনপুর মালিকের বাটী হইতে তিন ক্রোশ দূরে গঙ্গাপারে অবস্থিত। সুতরাং সেখানে পৌছিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল। ভিখারী যখন বাবু সাহেবের দেউড়িতে পৌছিল তখন বাবু সাহেব মধ্যাহ্ন নিদ্রার সুখভোগে ব্যাপ্ত, ভৃত্য অকালে প্রভুর নিদ্রা-

ভঙ্গ করিতে সাহস করিল না। অপরাহ্নে যথাকালে নিজাভঙ্গ হইলে, বাবু সাহেব দেওয়ান-জিকে ডাকাইয়া সামিয়ানা বাহির করিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

সামিয়ানা বাহির করিতে, তাহার পরীক্ষা করিতে, খাতায় লিখিতে, সামিয়ানার উপর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে, প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

সমস্তদিন উপবাস করিয়া এক প্রহর যাত্রা বেগারেরা সামিয়ানা লইয়া প্রভুগৃহে উপস্থিত হইল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। কিন্তু কে কাহার সংবাদ লয়? সকলের কাছে দুঃখ জানাইয়া কাহারো নিকট গালি এবং কাহারো নিকট ভাঙনা লাভ করিয়া অবশেষে বহুগাথা-সাধনার পর তাহারা এক, ‘ভাণ্ডারী’র অগ্রগৃহে রাত্রি ১০টার সময় অর্ধসের করিয়া শুক ‘চুড়া’ সংগ্রহ করিল এবং তাহাই চিবাইয়া সেদিনের মত কোন প্রকারে জঠর-আলা নিবারণ করিল।

আহারান্তে গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভিখারী অবগত হইল যে, সম্মুখবর্তী বটবৃক্ষ-তলে মুক্ত মৃত্তিকার উপর তাহাদের বিশ্রামের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। অগত্যা পরিহিত বস্ত্রের একপ্রান্ত ভূমিতলে বিস্তৃত করিয়া তাহাদের কঠিন ভূমিতলে শয্যা রচনা করিতে হইল। সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তিতে অচিরেই তাহারা প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু সহসা মধ্যরাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিল। অনন্তোপায় হইয়া হতভাগাদের সমস্ত রাত্রি সিক্তবস্ত্রে সিক্ত মৃত্তিকার উপর এক প্রকার আগিয়া কাটাইতে হইল।

পরদিন প্রাত্বে—‘দরবারে’ বিদায় প্রার্থনা করিতে গিয়া সকলে আদেশ পাইল যে, ‘বরিয়াত’ আসিয়া চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাহারা কোথাও বাইতে পাইবে না। যে বাইবে তাহাকে ‘পচাশ জুতি’ ও দশ টাকা জরিমানার দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

ভিখারী বিনীতভাবে বলিল, তাহাদের যদি ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ তাহাদের বাটী হইতে কাপড় ও বিছানা লইয়া আসিতে দেওয়া হউক। কারণ, বৃষ্টিতে তাহাদের কাপড়-চোপড় সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছে।

শুনিয়া দেওয়ানজি জ্বোড়ে গর্জিয়া উঠিলেন—“ইয়ে সালে তো বড়া সওধিন দেখতে হেঁ। এক হাথুকা কাকড়ি নৌ হাথকা বীয়া”। সালেকো কাপড়া চাহিয়ে! বিছোনা চাহিয়ে! পাং চাহিয়ে! সালে ‘দেশী মুরগী, বিলায়তি বোলি’ সালেকো মুহুমে বিশ জুতি লাগাকে সালেকো দ্রুস্ত কর দেও তো গির্বর সিং।”

অতঃপর আর বিরক্তি করা চলে না। সুতরাং সিক্তবস্ত্র শূন্যজঠর ভিখারী অদৃষ্টের বিধান নীরবে শিরোধার্য্য করিয়া লওয়াই সমীচিন বিবেচনা করিল।

পরদিন ‘বরিয়াত’ আসিল। অস্ত্রাস্ত্র বেগারদের সহিত ভিখারীকেও তাঁহাদের সেবার নিযুক্ত করা হইল। বরযাত্রীরা আসিয়াই মহা ছলছল বাধাইয়া দিলেন। কেহ বলিলেন “গোড় ধোলাও”, কেহ বলিলেন “পাখা করো”, কেহ বলিলেন “তামাকু চটাও”, কেহ বলিলেন “শরবৎ বানাও”, কেহ বলিলেন “গোড় জাতো!”

চারিদিক্ হইতে যুগপৎ এত হুকুম বেচারী ভিখারীর উপর অবিরল ধারায় বর্ষিত হইতে লাগিল যে, সে যে কোনটা প্রতিপালন করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। কলে কেহ বা তাহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিলেন, কেহ ‘লাত্’ আরিলেন, কেহ তাহার শিখা ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন এবং তাহার পৃষ্ঠের উপর কেহ বা পাছকা কেহ বা খড়মের সন্যাসহার করিলেন। সমস্ত নির্ধ্যাতন বেচারাকে নীরবে সহিতে হইল।

প্রায় সপ্তাহকাল পরে সন্ধ্যায়ে প্রহার ও পরিশ্রম-জনিত বেগনা বহিয়া, অনশনক্লিষ্ট ভিখারী ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই শুনিল, পূর্বে রাজ্যে তাহার ‘ঘলিহানে’র সমস্ত ফসল লুট হইয়া গিয়াছে! প্রতি-বেশীদের নিকট সন্ধান লইয়া ভিখারী যাহা বুঝিল, তাহাতে তাহার স্পষ্টই মনে হইল যে, ইহা তহসিলদার সাহেবেরই কাজ, কিন্তু প্রবলপরাক্রান্ত তহসিলদারের বিরুদ্ধে কেহই সাহায্য দিতে সম্মত হইল না। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া ভিখারী থানায় গিয়া দারোগা সাহেবকে লুটের সংবাদ দিল। তহসিলদার সাহেব পূর্বেই থানায় উপস্থিত হইয়া এবিষয়ে বখোচিতি ‘কারোয়াই’ করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ভিখারীর মুখে লুটের সংবাদ শুনিয়াই প্রবলপ্রতাপ দারোগা গর্জন করিয়া বলিলেন, “কোন লিয়া বোল্‌নে সক্তা?” ভিখারী করজোড়ে বলিল সে ‘ওকু’র রাজ্যে ঘরেই ছিল না, সুতরাং চোরের সন্ধান সে কিরূপে দিবে?

দারোগা হতভম্ব করিয়া বলিলেন, “গালে

থানামে খেল্‌ কর্‌নে আয়া? দেওয়ান জি, সালে পর ২১১ দফা তো চালা দিজিয়ে।”

সমস্তদিন থানায় আটক থাকিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিয়া দারোগা সাহেবকে ১০ টাকা ‘পান’ খাইতে দিয়া, বেচারী বহুকষ্টে সন্ধ্যার সময় চুরির সংবাদ দেওয়ার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

পরদিন প্রভাতে তহসিলদার সাহেব পুনরায় সদলে ভিখারীর ‘ঘলিহানে’ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “কাঁহারে ফসিল তউল্‌ করাঙ।”

সকলকণ ভাবে ভিখারী বলিল, “সমস্ত ফসলই চোরে লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। ভাগ আর সে কোথায় পাইবে?” তহসিলদার বলিলেন, “আচ্ছা সো. আদালতমে দেখা জায় গা। ফেকু সিং ইয়াদ রাখ্‌না ৩০০ মণ ধান পৈদা হয়্যা থা।”

ভিখারী বলিল “সে কি? সেদিনকার ওজনে ধান মোটে ২০০ মণ হইয়াছিল।” যুগান্তরে তহসিলদার বলিলেন, “আচ্ছা আচ্ছা, আদালত মে উস্কা করুদ দিয়া জায়গা।”

৪

যথাসময়ে আদালত হইতে সমন পাইয়া ভিখারী জানিল যে, তাহার নামে ১৫০ মণ ধাত্তের মূল্য এবং ‘খেসারা’র অল্প নাগিশ হইয়াছে।

ভিখারীর ক্ষেত্রে ২০০ শত মণের অধিক ধাত্ত উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং ভাষ্য হিসাবে জমিদারের পাওনা ১০০ শত মণের অধিক হইতে পারে না। তত্তিম তাহার ধাত্ত যে তহসিলদার সাহেবেরই আদেশ অনুসারে

লুপ্ত হইয়াছিল ইতিমধ্যে ভিখারী সে বিষয়েও কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল। সুতরাং সে মোকদ্দমা লড়িয়া দেখিতে মনস্থ করিয়া নির্দিষ্ট দিনে “জবাব” দিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইল।

ভিখারী ইতিপূর্বে আর কখনো আদালত দেখে নাই। সুতরাং সেই জনসঙ্কুল, কোলাহলমুখরিত বিচারপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। লক্ষ্যহীন ভাবে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ান’ ছাড়া সে আর কোন সহপায় খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু তাহার সৌভাগ্যবশতঃ অধিকক্ষণ তাহাকে এ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল না। অতি অল্পক্ষণ পরেই সে এক পক্ষশূণ্য সম্মাত্র-মুষ্টি মুসলমানের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

মৌলভি সাহেব সমস্ত বাপার গুনিয়া ভিখারীর সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং এ মোকদ্দমা যে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে ‘ফুট্‌কি’তে উড়াইয়া দিতে পারিবেন, সে বিষয়েও তাহাকে গভীর আশ্বাস প্রদান করিলেন। অবশেষে ত্র্যাহাকে সমস্ত দিন এদিক-ওদিক কুড়াইয়া দুই তিন থানা সাদা কাগজে তাহার ‘আঙ্গুরা নিশান’ লইয়া, এবং উকীলের ‘সগুন’, নিজের ‘তহরি’র ও ‘সেহা’, মেরিস্তার ‘দাখিলা’, সাক্ষীর ‘বতাজ’ ও তলবানা ইত্যাদিতে তাহার নিকট হইতে ১০ টাকা আদায় করিয়া লইয়া মোকদ্দমার ত্র্যরিখ বলিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

ভিখারী দ্রষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

তারিখের দিন ভিখারী দুই এক জন সাক্ষী লইয়া আবার আদালতে উপস্থিত হইয়া

পূর্বপরিচিত মৌলভি সাহেবের শরণাপন্ন হইল।

বন্ধুবর তাহার নিকট হইতে আরো কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বলিলেন “তুমি এইখানে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক আমি সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছি।” ভিখারী সারাদিন বৃক্ষতলে বসিয়া রহিল। অপরাহ্নে বন্ধুবর মসীকৃতমস্ত রাজি আমূল বিকশিত করিয়া ভিখারীকে কহিলেন “যাও মোকদ্দমা ডিসমিস হো গিয়া।” বিস্মিত ভিখারী বলিল “সে কি? আমার এজাহার না লইয়াই আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন?” মৌলভি হাসিয়া বলিলেন যে ‘ওকীল সাহেব’র জেরায় তহসিলদার নিজেই সব কথা কবুল করিয়া কেলিয়াছে, তাহার এজাহারের আর প্রয়োজনই হয় নাই! গুনিয়া ভিখারী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল।

মৌলভি সাহেব আনন্দিত ভিখারীর নিকট হইতে নিজের ও উকীল সাহেবের ‘ইনাম বাবত’ আরও ১০ টাকা সংগ্রহ করিয়া যথেষ্ট প্রস্থান করিলেন। বিজয় গর্ভিত ভিখারী আনন্দে বাটা ফিরিল।

কিন্তু দুইমাস না হইতেই ভিখারী একদিন সবিষয়ে গুনিল যে তাহার জমির উপর নিগামের ঢোল ঘোররবে নিনাদিত হইতেছে এবং আদালতের পেয়াদা চীৎকার করিয়া হাঁকিতেছে—“ভিখারী মগুরকা জোত ১০ সিতধর আদালতমে নিলাম হোগা” ইত্যাদি। গুনিয়া ভিখারী দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয় পেয়াদাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। পেয়াদা বলিল তাহার নামে ডিক্রি হইয়াছে, ডিক্রির টাকা না দিলে নিলাম হইবে না?

বিস্মিত ভিখারী বলিল “কত টাকার ডিক্রি ?”
 পেয়াদা বলিল “২৩৯৮/৫” । ভিখারী বলিল
 “সে কি ? আমার যে মৌলভি বলিল
 মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গিয়াছে ।”

পেয়াদা বলিল “কোন মৌলভি ?”
 ভিখারী মৌলভি সাহেবের সবিস্তার বর্ণনা
 দিল । শুনিয়া পেয়াদা হাসিয়া বলিল “আরে
 দূর গেল ! দালাল কে পটিমে পড় গেলো ?”
 এতক্ষণে ভিখারী সমস্ত বাপারটা বুঝিতে
 পারিল । বুঝিয়া, সজলনেত্রে বলিল, “একণে,
 উপায় ?”

পেয়াদা বলিল “তুমি সত্তর আদালতে
 গিয়া ‘মানি তজবিজ্ঞ’র দরখাস্ত দাও ।
 যদি ‘মানি তজবিজ্ঞ’ নিতাস্ত মঞ্জুর না হয়,
 তাহা হইলে একমাসের মধ্যে আদালতে
 টাকা জমা করিয়া দিলে নিলাম ‘রদ্’
 হইবে ।” বলা বাহুল্য, পেয়াদা সাহেবকে
 এই আইনের উপদেশ নিতাস্ত বিনামূল্যে
 দিতে হইল না । এই উপদেশের পরিবর্তে
 ভিখারীর একটি বহুদিনের যত্ন-পালিত ‘শর’
 খাসি বিনামূল্যে পেয়াদা সাহেবের অঙ্গুগমন
 করিল । পরদিনই ভিখারী হাতে পায়ে ধরিয়া
 হোরিল সাহকে সঙ্গে লইয়া আদালতে গিয়া
 মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত দাখিল
 করিল ; কিন্তু ফল কিছুই হইল না ।
 পুনর্বিচারের দরখাস্ত শুনার দিন ভিখারী
 সন্ধ্যায় শুনিল যে, সে স্বয়ং আদালতে
 উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার ‘কবুল দাবি’
 দিয়াছে !

দরখাস্তে তাহার ‘আজ্ঞার ছাপ’ ওকালত-
 নামাতেও তাই । উকীলও আদালতের
 সম্মুখে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিলেন যে,

ওকালতনামা লইবার সময় তিনি মক্কেলের
 প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়াই
 ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছিলেন । শুনিয়া,
 বেচার ভিখারী সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া কপালে
 করাঘাত করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিল
 এবং বহু কষ্টে গ্রামের মহাজন তুলসী সাহর
 নিকটে বাড়ী বন্ধক রাখিয়া কোন প্রকারে
 মাসিক শতকরা ২ টাকা সুদে ১ ০ টাকা
 ঋণ করিয়া ডিক্রির টাকা উদ্ধার করিল ।

৫

এইরূপে তিনবৎসর কাটিয়া গেল ।
 যথাসময়ে বেগার খাটিয়া, ভূমিদারের ‘আব-
 ওয়াব’ যোগাইয়া, তহসিলদার সাহেবের
 ওজনে আপত্তি না করিয়া, পেয়াদা ও
 পাটোয়ারীদেবের ‘কোমর খোলাই’ ও ‘মাজন’
 নিয়মিতভাবে দান করিয়া, মাসে মাসে
 মহাজনের সুদ মিটাইয়া, ছিন্নবস্ত্রে অর্দ্ধাশনে
 কোন প্রকারে ভিখারী সস্ত্রীক জীবনযাত্রা
 নির্বাহ করিতে লাগিল । কিন্তু এ সুখও তাহার
 অদৃষ্টে অধিক দিন সহিল না ।

শ্রাবণ মাস । খাত্তের রোপা ফলিতেছিল ।
 গ্রামের কৃষকপত্নীগণ কলকণ্ঠে ‘রোপাণি’র
 গীত গাহিতে গাহিতে জলমগ্ন ক্ষেত্রে ধাত্ত
 রোপণ করিতেছিল । কৃষকেরা দূরে হল-
 সাহায্যে অস্ত্রান্ত ‘ক্ষেতকে’ রোপার জ্ঞ
 প্রস্তুত করিতেছিল ।

অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছিল । পশ্চিমের
 সূক্ষ্মমেঘ হইতে প্রতিকলিত মধুর আলোক
 কৃষক-রমণীদের সুস্থ ও সবল দেহে নিপতিত
 হইয়া তাহাদের সরল মৌল্যাকে উদ্ভাসিত
 করিতেছিল । এই সময়ে এক ক্ষুদ্র ঘোটকা-
 রোহী বাবু সাহেব মাঠের সংকীর্ণ পথে দেখা

দিলেন। যেখানে ‘ধান রোপা’ হইতেছিল, তাহারই সম্মুখ দিয়াই পথ। বাবু সাহেব রোপণ-নিরতা কৃষক-যুবতীগণের সম্মুখে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

বাবু সাহেব ভিখারীর মালিকের ঘোষ্ঠ পুত্র। বয়সক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। বাবু সাহেবের দৃশ্যবিত্তের কথা তাঁহার অমিদারির মধ্যে সর্বজনবিদিত। দেখিতে দেখিতে একজনের সৌন্দর্য্য যেন বাবু সাহেবকে মুগ্ধ করিল—তাঁহার কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষে বিষ্ময় ও লালসার তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিল। বাবু সাহেব ঘোড়াকে আরও নিকটে সরাইয়া আনিলেন।

ক্ষণমধ্যেই কৃষক-যুবতীদের দৃষ্টিও বাবু সাহেবের উপরে পড়িল। তাহারা দেখিল, বাবু সাহেব একদৃষ্টে বুধিয়ার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন! বাহারা দেখিল, তাহাদের অধিকাংশই যুবতী। দেখিয়া তাহারা তাড়া-তাড়ি আপনাদের বস্ত্র সংবৃত্ত করিয়া লইয়া বুধিয়ার দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে পরস্পরের ‘গা-টেপাটিপি’ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসিল। বাবু সাহেবের চরিত্রের কথা তাহাদের অবদিত ছিল না। বাহারা স্বয়ং এক সময়ে বাবু সাহেবের কৃপাকটাক লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল।

বুধিয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া, তাহার প্রতি বাবু সাহেবের ঋণদৃষ্টি নিবন্ধ দেখিয়া, তাড়া-তাড়ি মন্তক ও বক্ষ উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত্ত করিল—তাঁহার স্বাভাবিক অরুণ গাও লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

বাবু সাহেব তাহার সপ্তদশবর্ষের ‘নিটোল’ যৌবনের উপর লজ্জার অরুণাভা দেখিয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কিন্তু প্রেমালাপের পক্ষে ইহা উপযুক্ত স্থান বা অবসর নহে। সুতরাং বাবু সাহেব তাঁহার অনুগামী ভৃত্যকে অক্ষুটস্বরে কি উপদেশ দিয়া, সহসা ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

দেখিয়া অজ্ঞাত যুবতীরা হাসিয়া বুধিয়াকে বলিল “বুধিয়া গো? এইবার তোর কপাল খুলিল। আর তোকে কাদা ঘাঁটিয়া ধান রোপিতে হইবে না। এখন খাটায়্য বসিয়া ‘লালকি সাড়ী’ পরিয়া ‘হালুয়াপুরী’ খাইবি।” শুনিয়া, বুধিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যার পর ভিখারী আহায়াস্তে রামাচরণ সাহর দোকানে নিয়মিত ধূমপান করিতে গেলে, গ্রামের এক বৃদ্ধা স্ত্রীলো ধীরে ধীরে আসিয়া বুধিয়ার নিকট উপবেশন করিল। বুধিয়া তখন প্রদীপের নিকটে বসিয়া শুন্ শুন্ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে আপনার কুর্ত্তা সেলাই করিতেছিল। এ কথা সে কথার পর বৃদ্ধা বুধিয়ার আর্থিক অবস্থা এবং তাহার অতুলনীয় রূপের কথা তুলিল। উভয়ের তুলনা করিতে গিয়া সমবেদনায় বৃদ্ধার লোল চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

আহা! এই অতুল সৌন্দর্য্য, এ কি মাঠে মাঠে রোদে ও কদমে কাজ করিবার জন্ত সৃষ্ট হইয়াছিল? কীসার চুড়ি আর পিতলের নাকছাবি কি এই দেহের যোগ্য অলঙ্কার? নবীন যৌবনে বুধিয়ার কোন আশাই সফল হয় নাই। বুধিয়াও সময়ে সময়ে আপন মনে এই কথাই ভাবিত। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া

বুধিয়া অঙ্গসংগ্রাস্ত দিয়া তাহার স্নানর মুখখানি ভাল করিয়া মুছিয়া প্রদীপের আলোটা বাড়াইয়া দিল।

বৃদ্ধা তখন ক্রমে ক্রমে বাবু সাহেবের ধন, রূপ ও ঐশ্বর্যের কথা পাড়িল এবং একবার তাহার নজরে পড়িলে যে, তাহার হতাশা-পীড়িত জীবনের কোন সাধই অপূর্ণ থাকিবে না, এ কথাও তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে ক্রটি করিল না। বুধিয়া কম্পিতবক্ষে কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বুধিয়ার নিকটে কথাটা তীক্ষ্ণধার অসির উপর নিক্ষিপ্ত মধুর মত মনে হইতে-ছিল। মিষ্টতার লোভ সত্ত্বরণ করাও কঠিন, আবার শেহন করিতে গেলেও জিহ্বা কাটিয়া বাইবার আশঙ্কা!

অনেকক্ষণ ভাবিয়া বুধিয়া সলজ্জ ইঙ্গিতে জানাইল যে গৃহস্থ-বধূর পক্ষে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শুনিয়া বৃদ্ধা মুহূর্তস্য করিয়া বুধিয়ার কাণে কাণে বলিল “এ ঘটনা কি গ্রামে নূতন? রহিমপুরের যুবতীদের মধ্যে এমন কোন্ সন্দরী আছে, যে একদিন না একদিন বাবুসাহেবের অঙ্গগ্রহ লাভ করে নাই? কিন্তু এ কথা কি প্রকাশ হইয়াছে? সেজন্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই।”

কিন্তু বুধিয়ার কিছুতেই ইহাতে সাহস হইল না। বৃদ্ধা পরদিন আবার আসিল এবং বাইবার সময়ে গোপনে বুধিয়ার হাতে দশটা টাকা দিয়া গেল। বুধিয়া স্মৃতি ও কুমতির দারুণ বুদ্ধে নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিল।

তিন দিনের আলোচনার পর বৃদ্ধা স্থির বুলিল যে, ভিখারীকে কোথাও সরাইয়া দিতে

না পারিলে, বুধিয়া কিছুতেই সম্মত হইবে না। বাবু সাহেব যথাসময়ে এ সংবাদ পাইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সপ্তাহ পরে একদিন প্রভাতে উঠিয়া গ্রামের লোক সভয়ে দেখিল যে, পুলিশ আসিয়া ভিখারীর গৃহের চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। দেখিয়া, সকলেই ভয়ে ভয়ে আপন আপন গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিল।

একটু বেলা হইলে, ঘোড়ায় চড়িয়া দারোগা সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে বাবু সাহেব স্বয়ং। দারোগা আসিয়াই গ্রামের সমস্ত ‘মাতব্বর’ ব্যক্তিদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সকলে উপস্থিত হইলে, কনষ্টেবলদের হুকুম দিলেন “খানাতালাসি শুরু করো।” দুইজন কনষ্টেবল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিখারীকে গ্রেপ্তার করিল। অন্ত্রাত্ম সকলে চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে এক চাউলের হাঁড়ি হইতে একখানি সাড়ী এবং কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার বাহির হইল। বাবু সাহেব সাগ্রহে অঙ্গসর হইয়া বলিলেন, “এই বটে। এই আমার স্ত্রীর সাড়ী ও অলঙ্কার।” দারোগা সাড়ী ও অলঙ্কার ভিখারীর সম্মুখে আনিয়া বলিলেন “কেয়া রে ইয়ে সাড়ী আউর জেবর কাঁহা মিলা?” ভিখারী বিষয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; সে দারোগা সাহেবের প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিল না। দারোগা আবিষ্কৃত দ্রব্যের তালিকায় সাক্ষীদের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া ভিখারীকে চালান দিলেন। বিষয়ে দ্ব্যংগে অপমানিত ভিখারী কাঁদিয়া কেঁলিল।

বুধিয়া অন্তরালে দাঁড়াইয়া সমস্তই

দেখিতেছিল। ভিখারীকে কাদিতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। এই সাড়ী এবং অলঙ্কার বন্ধা পূর্নরাত্রি বাবু সাহেবের উপহার বলিয়া গোপনে তাহাকে দিয়া গিয়াছিল! সকল কথা দারোগাকে

বলিলে, হয় ত ভিখারী মুক্তি পাইতে পারে; কিন্তু এ কথা সে কেমন করিয়া লোকের কাছে প্রকাশ করে? মোকদ্দমার বিচারের ভার বাবু সাহেবের এক বন্ধু ‘অনাররি ম্যাজিস্ট্রেটের’ উপর পড়িল। বাবু সাহেব বন্ধুর বাড়ী গিয়া ভিখারীকে কিছু কালের জ্ঞান কারাবাসের দণ্ড দিতে অনুরোধ করিয়া আসিলেন। বন্ধুর অমুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে ‘বন্ধুর কথায় সম্মত হইলেন।

যথাসময়ে বিচার আরম্ভ হইল। বিচারক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সরলভাবে ভিখারী বলিল সে ইহারি বিন্দু বিসর্গও জানে না। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন “তবে তোমার উপর এ মিথ্যা মোকদ্দমা হইল কেন?” ভিখারী বলিল, ধর্ম্মতঃ সে তাহার কিছুই জানে না। হাকিম হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“সাধে সাধে লোকে—বিশেষতঃ বাবু সাহেবদের মত লোকে তাহার বিরুদ্ধে অকারণে মিথ্যা মোকদ্দমা আনিবে কেন?”

ভিখারীর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। অপরাধ সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়া গেল। বিচারক ভিখারীর তিন মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। রাগ দিয়া হাকিম সাহেব বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বন্ধুর কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন, তিন মাসে সাধ মিটিবে ত?”

ভিখারী কাদিতে কাদিতে কারাগৃহে চলিল। গৃহে তাহার অস্বস্তি, নিঃশ্বাস, যুবতী স্ত্রী। কে তাহাকে দেখবে? হত-ভাগ্য ভিখারী আনিত না, বুঝিয়াকে দেখিবার লোকের অভাব ছিল না।

* * * * *

সেই দিনেই গভীর রাত্রে বাবু সাহেবের প্রেরিত লাটরালগণ শিবিকা সহ আসিয়া বুঝিয়াকে তাহার উদ্যানবাটীতে লইয়া গেল। ভিখারীর জীবনের স্নেহের প্রদীপ চিরদিনের মত নিবিয়া গেল।

* * * * *

তিন মাস পরে ভিখারী বাটী ফিরিয়া দেখিল,—গৃহ নির্জন, অঙ্গন তৃণকণ্টকাকীর্ণ, বুঝিয়া নিরুদ্দিষ্ট। কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত ব্যাপার ভিখারীর কর্ণগোচর হইল। শুনিয়া, ভিখারী, অনাহারে, পরিত্যক্ত গৃহে ভয় খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল।

রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইলে, ভিখারী ধীরে ধীরে শয্যাভ্যাগ করিল। তাহার মস্তকের মধ্যে একটা দারুণ বিপ্লব চলিতেছিল। কোমরে হাত দিয়া দেখিল, কোমরে একটা দেশালাই রহিয়াছে। সহসা কি যেন উৎকট আনন্দে তাহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কিছু শুষ্ক তৃণ সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুন লাগাইয়া, সে গৃহের চালের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে বহিরাশ ছু ছু করিয়া চারিদিকে জলিয়া উঠিল। গ্রামে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। সেই কোলাহলের মধ্যে নিঃশব্দে ভিখারী রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ হইয়া গেল।

* * * * *

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত ।

চরিত-চিত্র

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ব্রাহ্মসমাজ

(শেষাংশ)

মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র শাস্ত্র-গুরু-বর্জিত ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াও, নিজের পূর্ববর্জিত সাধন-সম্পৎ-প্রভাবে, আপনাদের ধর্মতত্ত্বে বা ধর্মসাধনে শুদ্ধ-স্বাভুত্ব-ও-যুক্তিবাদ-প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সত্য স্বরূপটী ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই যুক্তিবাদের উপরে ধর্মস্থাপন অসম্ভব দেখিয়া, পরে নিজেরাই শাস্ত্র-প্রণেতার ও ঈশ্বরানুপ্রাণিত গুরুর অধিকার গ্রহণ করেন। মহর্ষির জীবদ্দশায় তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজ সকল বিষয়েই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের শোকাস্তর গমনের পরেও নববিধান-সমাজ তাঁরই বিধান মানিয়া চলিয়াছেন। এই সমাজে গুরুকরণের প্রয়োজন স্বীকৃত না হইলেও, একটা প্রবল পৌরহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে সমাজের ধর্মকে ব্যক্তিত্বাভিমাত্রী অনধীনতার আতিশয্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আর কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনের শিক্ষার গুণে এই দলের ব্রাহ্মগণ এক প্রকারের শাস্ত্রানুগত্য এবং সাধুভক্তির অনুশীলন করিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্মকে এমন একটা সংবন ও শ্রদ্ধাশীলতার দ্বারা পরিপুষ্ট

করিয়াছেন, যাহা শিবনাথ বাবুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কচিং কোনও কোনও ব্যক্তির মধ্যে দেখা গেলেও, সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে দেখা যায় না। একদিকে শিবনাথ বাবুর মধ্যে কোমল ও প্রকৃতিগত বলবতী আন্তরিক্য-বুদ্ধি নাই। অতীত নববিধান-সমাজের 'প্রেরিত-মণ্ডলী'র ও 'শ্রীদয়বারে'র মত কোনও পৌরোহিত্যের প্রতিষ্ঠাও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে হয় নাই। নববিধান-মণ্ডলীর শাস্ত্রানুগত্য ও সাধুভক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরা সর্বদাই স্বল্পবিস্তর ভীতির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। এ সমাজের কোনও কোনও আচার্য্য ও প্রচারক 'মৃত সাধুদের' চরিত্রের অনুশীলনের উপদেশ দিয়া, ধর্ম-জীবনের পক্ষে নিরাপদ নয় বলিয়া, জীবিত সাধুদের সঙ্গ করা নিবেদন করিয়াছেন,— এমনও শোনা যায়। সুতরাং শিবনাথ বাবু তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে ধর্মকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে যুক্তিবাদী ধর্মের নিজস্ব স্বরূপটী বতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, মহর্ষির জীবদ্দশায় তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজে, বা কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে আজ পর্যন্তও ততটা ফুটিয়া উঠিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মানুরাগ

কিন্তু শিবনাথ বাবুর মধ্যে কোনও আভাবিকী ও বলবতী আন্তিক্য-বুদ্ধি না থাকিলেও, সর্বদাই একপ্রকারের ধর্ম্মানুরাগ বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশে মুমুক্শু হইতেই ধর্ম্মানুরাগের উৎপত্তি হয়। শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মানুরাগ এই জাতীয় কি না, সন্দেহ। ইহাকে বিলাতী ছাঁচের ধর্ম্মানুরাগ বলিয়াই মনে হয়। ইংরাজিতে ইহাকে Religious Enthusiasm বলে। এই ধর্ম্মানুরাগ দুই দিক্ দিয়া প্রকাশিত হয়। একদিকে ইহাতে ব্যক্তিগত চরিত্রের শুদ্ধতা রক্ষার জন্ত একটা গভীর আগ্রহ থাকে, এবং এই কারণে মিথ্যাকণন, প্রবঞ্চনা, পরজবাহরণ, পরদারগ্রহণ প্রভৃতি দুর্কর্ম্ম হইতে নিশ্চুক্র থাকিবার বাসনার ও প্রয়াসের ভিতর দিয়া ইহা ফুটিয়া উঠে। অতদিকে লোকহিতৈচ্ছা এবং লোকসেবার চেষ্টাতেও ইহা প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় ধর্ম্মানুরাগের সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের বা ভগবন্তের কোনও অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নাই। শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মানুরাগ অনেকটা এই জাতীয়। তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তি, যে কি, বলা সহজ নয়। প্রকৃতিগত বলবতী আন্তিক্য-বুদ্ধি তাঁর নাই। শিক্ষার প্রভাবে গভীর তত্ত্ব-লোচনার দ্বারাও যে তিনি তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস লাভ করিয়াছেন, এমনও বলা যায় না। সদগুরুর আশ্রয় পাইয়া, গুরু-শক্তিসঞ্চারেও তাঁর ভগবৎ-ক্ষুণ্ণি হয় নাই। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের আলোচনায় লৌকিক জ্ঞান যে-কারণ-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করে, কেবল সেই ব্রহ্মের জ্ঞানই কতকটা তাঁর আছে মাত্র। আর কবি-প্রকৃতি-মূলভ ভাবাবেগ হইতে এই

লৌকিক-জ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত কারণ-ব্রহ্মতে দ্ব্যাদাক্ষিপ্যাদি মহদগুণের অধ্যাস হইয়া, শিবনাথ বাবুর ধর্ম্মে একপ্রকারের ঈশ্বর-কল্পনাও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অতদিকে স্বদেশের এবং সমগ্র মানবজাতির সুখ ও উন্নতি-কামনা-প্রসূত একটা প্রবল ধর্ম্মানুরাগও তাঁর জীবনে বেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। জগতের সর্বত্র, এই সকল উপকরণেই যুক্তিবাদী ধর্ম্ম বা Rational Religion গড়িয়া উঠে।

ফলতঃ যে ব্যক্তিস্বাভিমাত্রী অনধীনতার আদর্শে আমাদের সেকালের ইংরাজি-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকমণ্ডলীর চিত্ত একেবারে মাতিয়া উঠে, তাহারই উপরে শিবনাথ বাবুর এই ধর্ম্মানুরাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম যৌবনাবধিই, কতকটা বৈজ্ঞিক-নিয়মাবধানে, আর কতকটা ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে, শিবনাথ বাবুর ভিতরে একটা অদম্য অনধীনতার ভাব জাগিয়াছিল। ইহার সঙ্গে যুরোপীয় ঝাঁঝের একটা বলবতী মানবহিতৈষণাও মিশিয়াছিল। তাঁর প্রকৃতির ভিতরেই বাল্যাবধি এমন একটা নিঃস্বার্থতা এবং মহাপ্রাণতাও ছিল, যাহাতে এই মানবহিতৈষণাকে বাড়াইয়া তুলে। এই অনধীনতার ও মানবহিতৈষণার প্রেরণাতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন বলিয়া মনে হয়। লোকসেবাই তাঁর ধর্ম্মের মূল মন্ত্র ছিল। অনধীনতার ভাব হইতেই দেশ-প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের কর্ম্মবহুল অনুষ্ঠানাদি ও প্রাচীন শাস্ত্রগুরুর শাসনকে তিনি বর্জন করেন। মানবহিতৈষণা হইতেই স্বদেশের আভিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। যুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রেরণায়ই, স্বদেশের ও মানবসমাজের হিতকল্পে ধর্ম্মের

ও সমাজের সর্বপ্রকারের শাসন হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া, তার মনুষ্যত্ব বস্তুকে অবাধে ফুটিয়া উঠিবার সম্পূর্ণ অবসর দিবার জন্য, শিবনাথ বাবুর যে আতাত্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছে, মহাবীর কিংবা কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহা দেখা যায় নাই। তথাকথিত সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার উপরে পরিবারের ও সমাজের সর্ববিধ সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমাজের সংস্কার সাধনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রজাস্বত্বের সম্প্রসারণে, এক সময়ে শিবনাথ বাবু করাসীবিপ্লবের অধিনায়কগণের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু করাসীবিপ্লবের সাম্য-মৈত্রীস্বাধীনতার প্রভাব, ভলটেয়ার, রুশো প্রভৃতি করাসী চিন্তানায়কগণের শিক্ষাদীক্ষার ভিতর দিয়া সাক্ষাৎভাবে শিবনাথ বাবু বা তাঁর সহযোগী ব্রাহ্মগণের উপরে আসিয়া পড়ে নাই। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার যুক্তিবাদী খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের আচার্যগণের শিক্ষাদীক্ষা হইতেই আমাদের ব্রাহ্মসমাজ যুরোপীয় ‘সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতা’র উদ্দীপনা লাভ করেন। আর ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের ফ্রান্সিস নিউম্যান এবং আমেরিকার থিওডোর পার্কারের সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের সর্সাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। শিবনাথ বাবুর প্রথম যৌবনকালে পার্কারই ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী যুবকদের প্রধান শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈদ্যনিক ভিত্তির উপরে পার্কারের ধর্ম-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁর ভারতবাসী শিষ্যগণ সে তত্ত্বকে ভাল করিয়া ধরিত্তাছিলেন কি না, সন্দেহের কথা। শিবনাথ বাবু প্রভৃতি পার্কারের হৃদয়নীয় অন-ধীনতা প্রবৃত্তি এবং উদার ও বিশ্বজনীন মানব-

প্রেমের উদ্দীপনাই কতকটা লাভ করেন, কিন্তু পার্কারের তত্ত্বজ্ঞান বা ভক্তিবাদ লাভ করিত্তাছিলেন কি না, বলা সহজ নয়।

ফলতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদে বৃত্ত হইবার পূর্বে শিবনাথ বাবুর ধর্মজীবন অপেক্ষা কর্মোৎসাহই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উপাসনাদি অন্তরঙ্গ ধর্মকর্মে তাঁর যতটা উৎসাহ ও নিষ্ঠা ছিল, সমাজ-সংস্কারে তখন যে তদপেক্ষা অনেক বেশী আগ্রহ ছিল, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। এ সময়ে তিনি উপাসনা-প্রার্থনাদি ব্রাহ্মধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনকেও যে লৌকিক জ্ঞানের বিপুল তর্ক-যুক্তির কঙ্কিপাথরে কসিতেছিলেন, তাঁর সম্পাদিত ‘সমদর্শী’ই ইহার সাক্ষী। কেশবচন্দ্র ও তাঁর অমুগত প্রচারকগণ যে শিবনাথ বাবুর সে সময়ের ধর্মভাবকে বড় বিশেষ প্রকার চক্ষে দেখিতেন না, ইহাও জানা কথা। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে বৈরাগ্য-সাধন প্রবর্তিত করিবার প্রয়াসী হইলে, শিবনাথ বাবু তাঁর এ সকল মত ও আদর্শকে লোকচক্ষে কতটা হীন করিবার চেষ্টা করেন, তখনকার ‘সোম-প্রকাশে’ এবং ‘সমদর্শী’তে তার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। আর তখন পর্যন্ত ধর্মের অন্তরঙ্গ ও অতিলৌকিক দিকটা যে শিবনাথ বাবুর নিকট প্রকাশিত হয় নাই, এ সকলে ইহাই প্রমাণ করে। ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হইলে, শিবনাথ বাবু ‘বিবেক’ ‘বৈরাগ্য’দি সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু ‘এ সকল কতটা যে তাঁর’ ভিতরকার সাধনাতিক্রান্ত হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর কতটা যে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের অবস্থার

পরিবর্তনের ফল, ইহাও বলা সহজ নয়। আর এ সকল সম্বন্ধেও শিবনাথ বাবুর জীবনে ধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনের প্রয়াস অপেক্ষা, বাহিরের সমাজ-সংস্কারাদি সাধনের প্রয়াস যে সর্বদাই বলবত্তর হইয়া আছে, ইহা স্বীকার করা অসম্ভব।

ফলতঃ শিবনাথ বাবুর প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম বস্তুগুলি তাঁর ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্যের ভিতর দিয়া আজি পর্যন্ত ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। শিবনাথ বাবু কবি। রসানুভূতি কবি-প্রকৃতির সাধারণ লক্ষণ। রসগ্রাহিতা ও ভোগলিপ্সা শিবনাথ বাবুর মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই দুই বস্তুই তাঁর প্রচারক-জীবনের বন্ধনে পড়িয়া বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত ও বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে শিবনাথের চরিত্রের যে দিকটা ফুটিয়া উঠিতেছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বভার পাইয়া, তাহা ক্রমে শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করে। সত্য-সন্ধিৎসাই সে সময়ে শিবনাথ বাবুর চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। এই সত্য-সন্ধিৎসা যুক্তিবাদের সাধারণ লক্ষণ। প্রাচীন কি নূতন কোনও প্রকারের বন্ধন যুক্তিবাদ সহ্য করিতে পারে না। যুক্তিবাদ সত্যের সন্ধানে যাইয়া ভুল ভ্রান্তি যাই করুক না কেন, কখনও লোকানুবর্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। গায়ার্ডিনো ক্রপো প্রভৃতি যুরোপীয় যুক্তিবাদিগণ সত্যের সন্ধানে বা প্রচারে প্রাচীন শাস্ত্র বা প্রচলিত পৌরোহিত্য কোনও কিছুই মুখাপেক্ষা করেন নাই বলিয়াই, সেখানে যুক্তিবাদ এতটা প্রতিপত্তি

ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। শিবনাথও এক সময় সত্যের সন্ধানে যাইয়া আপনার বিচার-বুদ্ধি ও অন্তঃপ্রকৃতিরই অহংসরণ করিয়া চলিতেন, প্রাচীন সমাজের আনুগত্য পরিহার করিয়া তিনি কিছুতেই তখন নূতন সমাজের প্রচারকমণ্ডলীর বা আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। আর এইজন্য নূতন সমাজের কর্তৃপক্ষীয়দের হাতে শিবনাথকে অশেষপ্রকারের নির্যাতন এবং লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের প্রচারকগণ শিবনাথের যে সকল ছর্নাম রটনা করিয়াছিলেন, কোনও কোনও ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে আজি পর্যন্ত তাঁর স্মৃতি জাগিয়া আছে। এই নিগ্রহ-নির্যাতনে শিবনাথ বাবুর চরিত্রের শক্তি ও মৌরভ যতটা ফুটিয়াছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদে বৃত্ত হইয়া তাহা হয় নাই। বরং এই অভিনব দায়িত্বভার তাহার আপনার অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণাকে নানা দিকে চাপিয়া রাখিয়া, তাহার মূল চরিত্রের সমাগ্ন্যরূপে ফুটিয়া উঠিবার বিশেষ বাধাতাই জন্মাইয়াছে।

যোগ, ভক্তি প্রভৃতি ধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনের শক্তি ও সরঞ্জাম শিবনাথ বাবুর মধ্যে কখনই বেশী ছিল না; এখনও নাই। ফলাফল বিচার-বিরহিত সত্যসন্ধিৎসা, ছন্দস্বর্নীর অনবদীনতা-প্রবৃত্তি, অকৃত্রিম লোক-হিতৈষ্য এবং প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ,—এ সকলই শিবনাথ বাবুর প্রকৃতির নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। এই সকলের জন্মই তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদারমতি যুগবলের উপরে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়া-

ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মশিক্ষা ও ধর্মশাস্ত্র-নাথ সর্বপ্রকারের অতিপ্রাকৃতত্ব ও অতি-লৌকিকত্ব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর সম্পাদিত “সমদর্শী” যতটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর কোথাও সেরূপ চেষ্টা হয় নাই। কেশবচন্দ্র যখন ক্রমে একটা কল্পিত যোগবৈরাগ্যের ‘আদর্শের অনুসরণ করিতে বাইয়া ব্রাহ্মধর্মের সরল ও সোজা ভাব-গুলিকে স্নানবিস্তার জটিল ও কৃত্রিম করিয়া তুলিতেছেন, তাঁর নূতন শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে যখন সংসারধর্মের সহজ ভাবগুলি একটা কৃত্রিম পারলৌকিকতার উৎপাতে ভ্রিয়মাণ হইতে আরম্ভ করে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসারবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন, কেশবচন্দ্র যখন কেবল আপনিই সে আদর্শ হইতে দ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন না, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাহাকে হীন বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন শিবনাথই ব্রাহ্মসমাজের সে আদিকার অনধীনতা ধর্মের পুরোহিত ও রক্ষক হইয়া, তাহাকে প্রাণপণে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজে অবরোধ-প্রথা তুলিবার চেষ্টার রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল, ব্রাহ্মগণের মধ্যে যখন বিরোধ বাধিয়া উঠিল, তখন শিবনাথই এই উন্নতিশীলদলের অগ্রণী হইয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ-নিবারণ, বিধবা-বিবাহ-প্রচলন, জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন, এ সকল বিষয়ে শিবনাথই তখন বাংলার সমাজ-সংস্কার-প্রয়াসী যুবকদের নেতা হইয়া উঠিতেছিলেন। আর সর্বোপরি তিনিই, রাজা রামমোহন রায়ের পরে,

ব্রাহ্মধর্মেতে একটা উদার ও প্রবল স্বদেশ-প্রেমেরও সঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজ একরূপ প্রথমাবধিই যে সার্ব-জনীন অনধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল, শিবনাথ বাবু যে ভাবে ও যে পরিমাণে সেই আদর্শটিকে এক সময়ে ধরিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ কি কেশবচন্দ্র ইহাদের কেহই তাহা করেন নাই বা পারেন নাই।

শিবনাথ বাবুর স্বদেশহিতসাধ

দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসাধনে এবং কেশবচন্দ্র পারিবারিক জীবনেই যুগান্তাবে এই আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবনাথ বাবুই সর্বপ্রথমে ইহাকে রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লালায়িত হন। এই জন্য শিবনাথ বাবুর ব্রাহ্মধর্মে একটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। মহর্ষির বা ব্রহ্মানন্দের মধ্যে এ বস্তু এতটা পরিষ্কৃতভাবে কখনও প্রকাশ পায় নাই। এই জন্যই শিবনাথ বাবুর প্রথম জীবনে তাঁর ধর্মজীবন ও কর্মজীবনের মধ্যে একটা সুন্দর সঙ্গতি ও শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের অলৌকিক বাগ্মি প্রতিভার ফলে, তাঁর ধর্মজীবনে ও কর্মজীবনে, এমন কি তাঁর দৈনন্দিন চালচলনেও একটা নটবস্ত্র-সুগভ কৃত্রিমতা বিদ্যমান ছিল। এই ‘নাটুকে’ ভাবটী শিবনাথ বাবুর মধ্যে এক সময় একেবারেই ছিল না বলিয়া, গভীরতর আধ্যাত্মিক জীবনলাভ না করিয়াও, তিনি অনেক সরল ধর্মপিপাসু লোকেরও অকৃত্রিম প্রশংসা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়েই অ্যারিস্টক্রেট

(aristocrat) ছিলেন। জীবনব্যাপী ধর্ম-সাধন এবং ধর্মচর্চাও ইহাদের এই আভিজাত্য-অভিমান নষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু শিবনাথ বাবুর কোনও আভিজাত্যের দাবীও ছিল না; আর তাঁর প্রকৃতির ভিতরেই এক সময়ে একটা ঐকান্তিক নিরঙ্কশের ভাব বিজ্ঞমান ছিল বলিয়া, তিনি বাংলা সমাজে নানাদিকে বিশেষ খ্যাতিাপন্ন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেও, কখনও কোনও রূপ শ্রেষ্ঠত্বাভিमानে ক্ষীত হইয়া উঠেন নাই। আর্থোবন তাঁহাকে ডিমোক্র্যাট (Democrat) রূপেই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আর এই ডিমোক্রাসীর বা গণতন্ত্রতার আদর্শ তাঁহার ধর্মজীবনের ও কর্মজীবনের সকল বিভাগকেও অধিকার করিয়াছিল বলিয়া, যে স্বদেশপ্রীতি মহর্ষির বা ব্রাহ্মানন্দের ধর্মজীবনে প্রকাশিত হয় নাই.—শিবনাথ বাবুর মধ্যে তাহা অতি বিশদরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্র ব্রহ্মোপাসনা-কালে সমুদায় জগতের কল্যাণের জন্যই প্রার্থনা করিতেন। আর এই রীতিটা তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় সত্ত্বের (Church of England) উপাসনা পদ্ধতি হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবনাথ বাবুই সর্বপ্রথমে স্বদেশের কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিবার রীতি ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবর্তিত করেন। মহর্ষির আদি ব্রাহ্মসমাজের কথা কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতপুস্তকে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কোন সঙ্গীত কখনও দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। শিবনাথ বাবুই প্রথমে—

তব পদে লই শরণ।

আর্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারতভূমি,

অবশন্ন আছে, অচেতন হে।

একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,

হৃদিশা আঁধারু তার কর মোচন।

কোটা কোটা নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি,

অন্তর্যামি জানিছ সে সব হে ;

তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,

অমাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন।

কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,

কৃপা করি আনিলে স্বর্দিন হে ;

সেই কৃপাশুণে,

দেখি শুভক্ষণে,

সাধের ভারতে পুনঃ আন হে জীবন।—

—এই স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক গান ব্রহ্ম-সঙ্গীতভুক্ত করিয়া দেন।

কুচবিহার বিবাহের কিছুকাল পূর্বে শিবনাথ বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থী যুবককে লইয়া একটা নূতন কন্সিডল গড়িবার চেষ্টা করেন। এই দলটিকে তিনি যে আদর্শে গঠন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে শিবনাথ বাবুর অন্তরের সত্যভাব ও আদর্শ পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল। স্বদেশ-প্রীতিই এই দলগঠনের মূল প্রেরণা ছিল। এই স্বদেশপ্রীতির ভিতর দিয়াই, শিবনাথ বাবুর সে সময়ের ধর্মভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা পারিবারিক স্বাধীনতা—জীবনের সর্ববিভাগে ব্যক্তিগতাদিমানী যুক্তিবাদিধর্মের অনধীনতার আদর্শটিকে ফুটাইয়া তোলাই, শিবনাথ বাবুর এই কন্সিডল গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল। কি দেবেজনাথের আদিব্রাহ্মসমাজে, কি কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, কোথাও

এইরূপ সর্বস্বাধীনভাবে এই অনধীনতার আদর্শটিকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয় নাই। ফলতঃ শিবনাথ বাবু ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের আর কোনও লোকপ্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক বা কৰ্মনায়ক ব্রাহ্মধর্মের এই নিজস্ব আদর্শটিকে এমনভাবে ধরিয়াজ্বলিলেন বলিয়া মনে হয় না। অতএব এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, শিবনাথ বাবুর মধ্যে এক সময়ে ব্রাহ্মধর্মের মূল ভাব ও আদর্শ-গুলি যতটা পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, মহর্ষি কিম্বা কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহা করে নাই। মহর্ষি এই ধর্মের বীজমাত্র বপন করেন। কেশবচন্দ্র এই বীজকে কতকটা ফুটাইয়া তুলিয়া, আবার আপনার হাতেই তাহাকে চাপিয়া নষ্ট করেন। শিবনাথ বাবুই এক সময়ে ইহাকে পরিষ্কৃত ও পরিণক-ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে, ইহাই তাঁর জীবনের ও কর্মের বিশেষত্ব।

কিন্তু আত্যন্তিকভাবে এই আদর্শটিকে লোকচরিত্রে ও সমাজ-জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একান্তরূপে তাঁর নিজের প্রকৃতির উপরে ছাড়িয়া দিতে হয়। অনধীনতার আদর্শের চরম পরিণতি দার্শনিক রাজকতায়। যুরোপে এই ব্যক্তিভিমানী অনধীনতার বা Individualistic Freedom এর আদর্শ ক্রমে এইরূপে এই দার্শনিক অরাজকতাকে বা Philosophical Anarchismএতে যাইয়া পৌছাইয়াছে। আপনার স্বকীয় স্বভাবটী ধরিয়া চলিলে, শিবনাথ বাবুকে এবং তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেও পরিণামে এইখানেই যাইয়া উপস্থিত হইতে হইত।

আর ইহারা যে এতটা দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই, তাহাতে ইহাদের কাহারই যে একান্ত কল্যাণ হইয়াছে, এমনও বলা যায় না।

কারণ, এ জগতে মানুষ বিশ্বাসভরে, অনন্তচিত্ত হইয়া, ফলাফল-বিচার পরিহার-পূর্ব্বক, যে কোনও সিদ্ধান্ত বা পন্থাকে ধরিয়াই চলিতে আরম্ভ করুক না কেন, সেই সিদ্ধান্ত বা সেই পন্থাকে আশ্রয় করিয়াই, ক্রমে পরমতত্ত্বে ও চরম গতিতে যাইয়া পৌছাইতে পারে। যুক্তিবাদী ধর্মও এইজন্ত, আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে, পরিণামে যাইয়া পরমবস্ত লাভ করিয়া থাকে। আর সাধনের মধ্যপন্থের আকস্মিক ও মারিক ভয়াবহভীষিকার দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হইয়া, ব্রাহ্মসমাজ একান্ত নির্ভর ও নিষ্ঠা সহকারে, নিজের সিদ্ধান্তকে আঁকড়িয়া ধরিতে পারে নাই বলিয়াই, এমন ভাবে নিষ্ফলতা লাভ করিতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পূর্বে শিবনাথ বাবু যে বিশ্বস্ততা সহকারে আপনার নিজস্ব প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন, এই নূতন সমাজের নেতৃপদের গুরুতর দায়িত্ব-ভার-গ্রস্ত হইয়া, ক্রমে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আর এই জন্তই, ভয়াবহ পরধর্মের চাপে, আপনার অন্তঃপ্রকৃতিকে অবধা নিষ্প্রভিত করিবার চেষ্টা করিয়া, শিবনাথ বাবু নিজের জীবনেরও সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই, আর তাঁর সমাজকেও আত্মচরিতার্থতা লাভে সাহায্য করিতে পারেন নাই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাভারত

আদিপর্ব

জতুগৃহ-দাহ

(মহা ১।১৪৩)

১। হস্তিনাপুরবাসিগণ পাণ্ডুরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্মময় যুষ্টিধিরকে হস্তিনাপুরাজের যথার্থ অধিকারী জানিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা করিল।

২। এই সংবাদ পাইয়া মন্ত্রাময় দুর্যোধন ভীত হইয়া, অঙ্গ ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের নীতিপ্রয়োগের প্রার্থনা করিল।

(মহা ১।১৪৪)

৩। মোহময় ধৃতরাষ্ট্র তক্ষুবর্ণে শোকে নিমগ্ন হইলেন। মন্ত্রাময় দুর্যোধন উগ্র কর্ণ, কিতব শকুনি এবং ক্রুব হঃশাপনের সহিত পরামর্শ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, আপনি কৌশলক্রমে পাণ্ডবগণকে বারণাবতে নির্বাসিত করুন।

৪। ধৃতরাষ্ট্র উত্তর কহিলেন, আমি তাহাই মনে মনে আন্দোলন করিয়া থাকি।

(মহা ১।১৪৫)

৫। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে কহিলেন, তোমরা পশুপতি মহোৎসব উপলক্ষে বারণাবতে গমন কর।

(মহা ১।১৪৬)

৬। দুর্যোধন অমাত্য পুরোচনকে

সবিনয়ে বজিলেন, তুমি অশ্বতরযুক্ত রথে শীঘ্র বারণাবতে গিয়া, তথায় জতুগৃহ নির্মাণ কর এবং অতি সমাদরে পাণ্ডবগণকে তথায় বাস করাও। যখন পাণ্ডবগণ নিঃশঙ্কচিত্ত হইবে, তখন জতুগৃহের দ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে।

(মহা ১।১৪৭)

৭। কাল্ভন মাসের অষ্টম দিনে রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবতে যাত্রাকালে গিহ্ন যুষ্টিধিরকে উপদেশ দিলেন যে,—যিনি শক্রদিগের অলৌহজাত অস্ত্রের দ্বারা আহত হন, তিনি শল্লকীগৃহের দ্বারা ছইদিকে পথনিশিষ্ট বিবর দ্বারা অগ্নি হইতে নিষ্কৃতি পান। অপর, বিচরণ করিলেই পথ চিনিতে পারিবে এবং নক্ষত্র দ্বারা দিক্ নির্ণয় করিবে।

৮। পাণ্ডবগণ বারণাবতে উপনীত হইলে, দশদিন পরে পুরোচন তাহাদিগকে “শিব” নামক সেই অশিব গৃহের কথা নিবেদন করিল এবং পাণ্ডবগণ পৃথার দহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

৯। অনন্তর বিজয়ের বন্ধু একজন নিপুণ খনক পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং কহিল, আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী রাত্রিতে পুরোচন জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিবে।

১০। দুর্যোধনের পরিখা-বেষ্টিত দুর্যোধন আশ্রয় করিয়া জতুগৃহ নিশ্চিত হইয়াছে এবং পুরোচন সর্বদা ঐ গৃহের দ্বারে বসিয়া থাকিত।

১১। খনক ঐ গৃহের মধ্যে এক বৃহৎ গর্ত করিল এবং তাহার মুখ কপাট দ্বারা বন্ধ রাখিল।

(মহা ১।১৪৮)

১২। পাণ্ডবগণ জতুগৃহে একবৎসর কাল বাস করিলে পর, জতুগৃহে অগ্নি প্রদানের কাল সমুপস্থিত হইল।

যুদ্ধটির প্রারম্ভকে কহিলেন, আমরা এই আশ্রয়গারে ছয় জন মনুষ্য রাখিয়া, পুরোচনের সহিত ইহাকে দগ্ধ করিব এবং কাহাকেও না জানাইয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করিব।

(মহা ১।১৪৭)

১৩। তখন পৃথা ব্রাহ্মণ ও মহিলাগণ নিমন্ত্ৰণ করিয়া ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে নিমন্ত্ৰিত সকলেই চলিয়া গেল, কেবল এক নিষাদী পঞ্চপুত্রসহ মত্তপানে মত্ত হইয়া জতুগৃহে শয়ন রহিল।

১৪। ভীমসেন অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। পুরোচন ও পঞ্চপুত্রসহ নিষাদী অগ্নিতে দগ্ধ হইল।

পৃথার সহিত পাণ্ডবগণ স্নানমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবর দ্বারা নির্গত হইলেন এবং পলায়ন জন্ত বনে বনে চলিতে লাগিলেন।

(মহা ১।১৪৯)

১৫। এক বনে তাঁহার পৃথার সহিত মদীর জল মাগিত্তেছিলেন। এমন সময়ে

বিহুরের প্রেরিত এক বিচক্ষণ পুরুষ উপস্থিত হইয়া, পাণ্ডবগণকে যজ্ঞবিশিষ্ট পতাকা-শোভী এক স্মৃগামিনী তরুণ দেখাইয়া দিলেন এবং পাণ্ডবগণকে ও পৃথাকে কাতর দেখিয়া সকলকে নৌকায় উঠাইয়া স্বয়ং তাহাদিগের সহিত চলিলেন; এবং বাহকগণের ভূজবলে তাঁহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলে, তিনি আশীর্বাদ করিলেন।

(মহা ১।১৫৪)

১৬। পথিমধ্যে এক বটবৃক্ষমূলে আর সকলে নিদ্রিত আছেন, কেবল ভীমসেন জাগ্রত আছেন। এমন সময়ে হিড়িম্ব রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীমসেন হিড়িম্বের বধ সাধন করিলে, হিড়িম্বা রাক্ষসীসহ তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

(মহা ১।১৫৫)

১৭। ভীমসেনের গুরসে হিড়িম্বার গর্ভে—গর্ভধারণ মাত্রেই—ঘটোৎকচ জন্মগ্রহণ করিল; এবং হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচ উত্তর দিকে প্রস্থান করিল।

(মহা ১।১৫৬)

১৮। পাণ্ডবগণ তপস্বীর বেশে বনে বনে গমন করিতে লাগিলেন। একদা মহর্ষি ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাদিগকে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া গেলেন।

(মহা ১।১৬৪)

১৯। ভীমসেন বক অশ্বার সংহার পূর্বক তাহার কটিদেশ ভগ্ন করিয়া তাহার ভগ্ন দেহ এক চক্রা নগরীর দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিলেন।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহাস ।

বৈমানিক ভ্রমণবিহীন কাণ্ড বুদ্ধিতে
হইলে, মনে রাখিতে হইবে যে—

১। পনের শত বর্ষ পূর্বে যখন বর্তমান
পঞ্জিকার প্রকটন হয়, তৎকালে মহাবিশুব
ক্রান্তিপাত (Vernal equinoctial point)
মেঘ রাশির প্রথমে এবং জলবিশুব ক্রান্তি-
পাত (autumnal equinoctial point)
তুলা রাশির প্রথমে অবস্থিত ছিল; এবং
বিশুবতী রেখার (Celestial equator)
উত্তরে মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্না
এই ছয় রাশি অবস্থিত ছিল। অবশিষ্ট ছয়
রাশি বিষুবতী রেখার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

২। বিমানে যে তিনটি স্বর্গদ্বার আছে
(ঋ: বে: ১০৬৭১৪) ছয় হাজার বর্ষ পূর্বে
তাহার পূর্ব দ্বারটি (মহাবিশুব বিন্দু)
মিথুন রাশির প্রথমে ইনুবকা নক্ষত্রের পার্শ্বে
অবস্থিত ছিল। এবং পশ্চিম দ্বার—জল
বিশুবিন্দু—ধনু রাশির প্রথমে পঞ্চতারাময়
মুলা নক্ষত্রের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। তৎ-
কালে মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্না, তুলা ও
বৃশ্চিক এই ছয় রাশি বিষুবতী রেখার উত্তরে
ছিল এবং অবশিষ্ট ছয় রাশি বিষুবতীর
দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

৩। তৎকালে আকাশগঙ্গার কপিল
ধারা মিথুন রাশি ও স্বর্গের পূর্বদ্বার প্রাবিত
করিত; এবং ভাগীরথী ধারা বৃশ্চিক রাশি ও
স্বর্গের পশ্চিমদ্বার প্রাবিত করিত।

৪। তৎকালে বিমানের পশ্চিম দ্বারের
দূর দক্ষিণে আকাশগঙ্গামধ্যে যজ্ঞযুক্ত
পতাকা-শোভা তারা (নৌ স্বর্ণবহন মণ্ডল=

Argo Navis) ভাসমান ছিল। মহর্ষি
অগস্ত্য (Canopus) এই তারানোকার
কর্ণধার (মাথি) রূপে এই দিব্য নোকার
সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেছেন এবং
এই দিব্য নোকার কর্ণধার বলিয়া
ভারতের নাবিক ঋষি মাগ্ন নাম উপহার
পাইয়াছেন। (ঋ: বে: ১১৬৫১৫) যথা
এষ: ব: স্তোম: মরুত: ইয়ম্ গী: মান্দার্যাস্ত
মানস্ত কারো: ।

অন্তর্গত:

হে মরুৎগণ! তোমাদিগের এই শ্রোত ও
গীত মাগ্ন মান্দাস্ত্য বিরচিত। মান (হাল বা
নৌ-নিগড়ের ভার) যুক্ত বলিয়া মহর্ষির মাগ্ন
নাম হইয়াছে। যথা—

মানেন সন্মিত: স্ম্যাত্তস্ম্যাত্তস্ম্যাত্তস্ম্যাত্ত ইতি
উচ্যতে।—বৃহৎ সংহিতা।

সিন্ধুরাজ (সোম পবমান=the Milky
way) বস্ত্র পরিধান করিয়া এই দিব্য দীপ্তিমন্ত
নোকার উপর আরোহণ করিয়াছেন। যথা—

রাজা সিন্ধু নাম অবশিষ্ট বাস:

ঋতস্য নাবম্ আ অরুহৎ রজিষ্ঠাম।

ঋ: বে: ৯৮৯২

বিমানে হিরণ্য-নির্মিত হিরণ্য-বন্ধন নোকা
বিচরণ করিতেছে।

ঐ নোকার পথ হিরণ্ময় এবং উহার
অরিজ (দাঁড়) হিরণ্ময় আছে। যথা—
হিরণ্ময়ী নো: অচরৎ হিরণ্য বন্ধনা দিবি।
হিরণ্যয়া: পছান: আসন্ অরিত্রাণি হিরণ্যয়া।

(অ: বে: ৫১৪৪-৫)

৫। মাহিম্বতী-পতি কৃতবীর্যের বংশধর-
গণ ধনলোভে ধনাঢ্য ভৃগুবংশীর ঋষিগণকে
নির্মূল করিতে লাগিলেন। এক ভৃগুপত্নী

হিমালয়ের গিরিজুর্গে গর্ভ উরুদেশে গোপন করিয়া পনাইতেছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া দেখে, ব্রাহ্মণী আপন তেজে জলিতেছেন। শিশু মাতৃ-উরু ভেদ করিয়া বহির্গত হইলে, তাহার তেজে ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ হইল। পরে তিনি ক্ষত্রিয়গণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া অন্ধত্ব দূর করিলেন; কিন্তু তাঁহার কোথাগ্নি ত্রিভুবন উত্তাপিত করিল। তাঁহার কোথাগ্নি বঙ্গদেশে নিষ্ক্ষেপ করিলেন। সেই অগ্নির নাম বাড়ানল।

(মহা ১১৭৮—১৮১)

৬। সন্ধ্যাকালে দিমানের পশ্চিম দ্বারে বাড়বাগ্নি প্রজ্জলিত হয়। অস্তোমুখ গ্রহগণ অস্তকালে সেই অগ্নিময় বিবরে প্রবেশ করে। এবং স্নমেকবাসী তারাদর্শকের দৃষ্টিতে গ্রহগণ বহুকাল পরে আবার পূর্ব দ্বারে উদ্ভিত হয়। বেদে এই পশ্চিমদ্বারস্থিত বৈমানিক বিবর প্লাবীস ও ধর্ম্ম আদি উপাধি লাভ করিয়াছে। এই বিবর বেদভাষ্যকারগণের ‘ভূগর্ভ’। বেদ বন্দন অত্রি আদি জ্যোতিষ্কগণ এই অগ্নিময় বিবরে পতিত হইলে, অগ্নিদ্বয় তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।

৭। প্রকাণ্ড তারা বৃশ্চিকের ধড় সমগ্র বৃশ্চিকবাশি অধিকার করিয়া আছে এবং তারা বৃশ্চিকের হৃৎকৃতি ষাছ-চতুষ্টি তুলা রাশির পূর্ব ভাগ অধিকার করিয়া অবস্থিত আছে; এবং তারা বৃশ্চিকের পৃচ্ছদেশ অর্থাৎ পঞ্চ তারাময় মূলা নক্ষত্র ধনু রাশির পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া অবস্থিত আছে।

এই সূদীর্ঘ প্রকাণ্ড তারা বৃশ্চিক ইতিহে চতুর্দশ “বারণ” (হস্তী) নাম এবং “কম্বোজ অশ্ব” নাম উপহার পাইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ভোম মঙ্গল নরক বধ করিয়া এই চতুর্দশ গজ ও কম্বোজ অশ্ব দ্বারকা (the western door of heaven) নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ ৫৩০)।
বেদবাস এই চতুর্দশ গজকে নরক মঙ্গলের বাহন কল্পনা করেন নাই। নরকস্তুত ভগদত্তকে এই চতুর্দশ গজের উপরে বসান হইয়াছে।

৮। নরক মঙ্গল এই বৃশ্চিক রাশির অধিপতি এবং মূলা নক্ষত্রের অধিপতি।

মঙ্গল গ্রহের রুচি বিবিধরূপ। মঙ্গলগ্রহ কখন দীপ্তিহীন প্রায় হয়। কখন বা প্রজ্জলিত অগ্নিসদৃশ জ্যোতি ধারণ করে। দীপ্তিহীন মঙ্গল গ্রহ বিরোচন উপাধি এবং জলন্ত মঙ্গল পুংগোচন উপাধি ধারণ করে।

অঙ্গারক গ্রহ মঙ্গল (শিব) নাম ধারণ করিলেও, এই মৃত্যুদেব রাক্ষসগ্রহ মানবের অমঙ্গলময় বা অশিবময় এবং ঐ রাক্ষসের গৃহ বৃশ্চিকরাশি ও মূলা নক্ষত্র মানবের অশিবময়।

আবার মঙ্গল গ্রহ ত্রিঋণময় বলিয়া ত্রিত নাম ধারণ করেন এবং মঙ্গলগ্রহ বৃশ্চিক রাশি ত্রিত-দেব হইতে ত্রৈতন নাম উপাধি পাইয়াছেন। এই ত্রৈতন বেদে (ঋঃ বেঃ) ত্রৈতন দম্য নামে খ্যাত হইয়াছে; এবং বেদ মতে (ঋঃ বেঃ) ত্রিত দেব মদকর সোম পান করেন বলিয়া, পুরাণে ত্রৈতন দম্যরাজ মত্তপায়ী স্নেহ বলিয়া বর্ণিত আছে। এই মত্তপায়ী দম্যবনিতা পঞ্চতারাময় মূলা-নক্ষত্র পুরাণে মত্তপায়ী নিষাদী বলিয়া বর্ণিত হয় এবং নিষাদী পঞ্চ তারাস্বক পঞ্চপুত্রবতী বলিয়া বর্ণিত হয় এবং এই মত্তপায়ী দম্যর

রাজ্য পুরাণের মঙ্গভূমি। (কর্ণপর্ক ৪০।৪৪ অধ্যায় দেখ)

৯। তারা বৃশ্চিক নোখধারায় সমাপ্ত আছে। তারা বৃশ্চিকের উর্দ্ধে ও উত্তরে সোমধারা মধ্যে বাণমণ্ডলে (Sagatta, a constellation) তারা তর বিজ্ঞমান আছে। ঐ তারাশর আদি হইতে সোম-ধারা শরস্তব্য নাম উপহার পাইয়াছে। এই শরস্তব্য সুসংবৃত্ত স্বেত পর্বতে কুমার দেবের জন্ম হয় বলিয়া কুমারদেব শরজন্মা উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন; এবং এই শরস্তব্য ভগ্ন করিয়া চতুর্মানু রাণের মৃত্যুবাণ চরণ করিয়াছিলেন। এই শরস্তব্য হইতে বৃশ্চিকশিশি সোমধারা দুর্ঘোষনের অঙ্গাগার বলিয়া পরিচিন্তিত হইয়াছে।

১০। ছয় হাজার বর্ষ পূর্বে সুমর-বাসী তারাদর্শক আরও দেখিতেন যে, বিমানের অগ্নিময় পশ্চিম দ্বারে সূর্য্যাদি গ্রহগণ প্রবেশ করিলে, সূর্য্যদেব ছয় মাস পরে পূর্বদ্বারে তাঁহার একচক্র রথে পুনরাগত হইতেন। এই একচক্র রথ হইতে বিমানের পূর্বদ্বার-সন্নিহিত প্রদেশ “একচক্রা নগরী” নাম গ্রহণ করিয়াছে। মিথুন রাশির প্রথমে ইন্দ্রক নক্ষত্রের পার্শ্বে এই একচক্রা নগরী রাশিচক্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উপপত্তি

বিমানের পশ্চিম দ্বারে মূলানক্ষত্রে পুরোচন অবস্থিত আছেন। মানিয়া লইলাম যে, জতুগৃহ দ্বাহ প্রকৃত ঘটনা। জতুগৃহমধ্যে নিপুণ খনক বসিয়া গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত

গর্ত্ত খনন করিতেছেন পুরোচন দ্বারদেশে সতত উপবিষ্ট থাকিয়াও কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। এই গল্পের রচয়িতার বুদ্ধিকৌশলকে অথবা ইতিবৃত্তবাদীর বিশ্বাস-গভীরতাকে বাহ্যদ্রবী দিতে হয়; তাহা নির্ণয়ে আমরা নিতান্ত অক্ষম হইলাম।

তবে এই উপলক্ষে “শস্তুর-জামাতা-সংবাদের” মূল প্রশ্নটা আপনা হইতে আদিয়াই মনে পড়ে। “এই প্রকাণ্ড গর্ত্ত খুঁড়িতে যে মাটি উঠিল, সে মাটি কি হইল?”

দ্বিতীয় কথা এই যে, যুধিষ্ঠির মতলব বাহির করিলেন যে, “আয়ুধাগারে ছয় জন মনুষ্য রাখিয়া পুরোচনের সহিত ইহাকে দগ্ধ করিব” এবং কার্য্যতঃ তাহাই করা হইল। যুধিষ্ঠিরের মতলবে নিরীহ পক্ষ কুমার সহ নিষাদপত্নীকে দগ্ধ করা হইল। অব্যাকব্য পঠিত হয়—“যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাক্রমঃ” ইতিবৃত্ত-বাদীর কাণে শুনিতে বেশ সুমিষ্ট শুনায়। নয় কি?

ঐতিহিক রহস্তে দেবচরিত্রে পাপ স্পর্শ হয় না। এইজন্তই শূদ্রক বা বালিবধে, সীতার বনবাসে বা লক্ষ্মণবর্জ্জনে নিকলঙ্ক শ্রীরামচরিত্রে পাপস্পর্শ হয় নাই। এই-জন্তই গুরুপত্নী অহল্যার (হলচাপন-নিষেধক অমা চন্দ্র) হরণে দেবরাজ শতক্রতুর চরিত্রে পাপ স্পর্শ হয় নাই। এইজন্তই সরস্বতী হরণে বিদ্যাতার বিমল চরিত্রে কলঙ্ক লগ্ন হয় নাই। এইজন্তই তুলসী হরণে পরমদেব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে পাপ স্পর্শ ঘটে নাই; এবং পঞ্চকুমার সহ নারী হত্যায় যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে পাপস্পর্শ হয় নাই

কারণ এ সব ভোজবাজী বৈ ত নয়। সুতরাং ঐতিহাসিক রহস্তে ধর্ম্মরাজ পঞ্চকুমার হত্যা হইলে, এই মাত্র বৃত্তিতে হইবে যে, সন্ধ্যাকালীন বাড়বাগ্নিতে পঞ্চ তারকাসহ মূল নক্ষত্র দণ্ড হইয়া থাকে। সেও ছায়া বাজী। বাড়বাগ্নিতে (Zodiacal Light) দহনশীলতার লেশমাত্র নাই খালি কবিকল্পনা মাত্র।

এখন জতুগৃহদাহ আর একটু পড়িলেই ঐতিহাসিকের রচনা-চাতুর্য্য হৃদবোধ হইবে।

বিশাখা হইতে মূল পর্য্যন্ত বারণাবত নগর বিস্তৃত। নগর সমীপে পশুপতি রুদ্র দৈবত স্মৃতি নক্ষত্র বিরাজমান রহিয়াছে; এবং বারণাবতে শরশস্ত্র সোমধারা সুরা রূপে সতত বিরাজমান রহিয়াছে। এই আয়ুধাগার আশ্রয় করিয়া জতুগৃহ রচিত হইল।

নিপুণ খনক বিশ্বকর্মা বিমানের পশ্চিম দ্বারে বিবর খনন করিয়া রাখিয়াছেন।

গ্রহগণ সন্ধ্যাকালে বাড়বাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, সেই বিবরে অস্ত্র গমন করেন।

সেই বিবরে প্রবেশ করিলে, গ্রহগণ দেখেন যে, সম্মুখে মহাবি অগস্ত্য তারা নৌ সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। গ্রহগণ নৌকাযোগে আকাশগঙ্গা পার হইলেন। বৈমানিক বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রহগণ বৈমানিক পূর্ব্বদ্বারে উদ্ভিত হইলেন। সম্মুখে একচক্রা নগরী এবং তারা-বক আকাশগঙ্গায় বিহার করিতেছেন। উদয়কালে উদয় যম কাল হরণ করেন, সুতরাং একচক্রা নগরীতে পঞ্চ পাণ্ডবের কিছুদিনের জন্ত বসবাস কল্পিত হইল এবং বর্জিত ইন্দ্র-বক নক্ষত্র বক অশ্বর নামে নিহত ও পুরদ্বারে ভগ্নকটি ভাবে নিক্ষিপ্ত হইল। সত্য মিথ্যা তার্য্যচিত্র বা আকাশ দেখিলেই মালুম হইবে।

তারাদর্শক।

নারী-ধর্ম্ম

সূচনা

আজ কাল নর-নারীর অধিকার লইয়া জগতে নানা আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু যে অধিকার প্রকৃতিগত বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তর্ক করিয়া, রাগ করিয়া, আন্দোলন করিয়া, সে অধিকারের পরিবর্তন অসম্ভব। সেই জন্ত প্রকৃতিগত বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-আদর্শ অনুসারেই আমরা নারী-জীবনের কর্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব।

কর্তব্যের কথা উঠিলেই জীবনের চরম লক্ষ্যের কথা মনে করিতে হয়। কারণ, আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই জীবনের কর্তব্য নির্দ্ধারিত হয়। সেইজন্ত নারী-জীবনের কর্তব্যনির্দ্ধারণে সর্ব্বাগ্রে নারী-জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের আলোচনার প্রয়োজন।

হিন্দু-জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান ও ভগবৎপ্রাপ্তি। জন্ম-জন্মান্তরের কদভ্যাসের ফলে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা অধর্ম্মের

দিকে। সুতরাং চিত্তবৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করিবার চেষ্টার পূর্বে তাহাকে সর্বাঙ্গে অধর্মের আকর্ষণ হইতে ফিরাইয়া আনার প্রয়োজন। তাই ভগবৎপ্রাপ্তি-সাধনার প্রথম সোপান সংযমের সাধনা এবং তাহার পরে প্রীতির সাধনা, ভক্তির সাধনা, ত্যাগের সাধনা। হাই হিন্দুর বিখ্যাত আশ্রমধর্ম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

ক্ষুদ্র নিষ্করিণীর বিমলধারা যখন জীবনের প্রভাতে আপনার ক্ষুদ্র শিলাগৃহ ছাড়িয়া সংসার-পথে প্রথম বাহির হয়, তখন তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত অধিক আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন চতুর্দিকের বারিধারা শোষণ করিয়া তাহার আবিল জলোচ্ছ্বাস যৌবনের মত্ততায় গভীর গর্জনে হুঙ্কার করিয়া উঠে, তখন তাহার সেই হুঙ্কার গতিবেগকে সংযত করার জন্ত নানা কৌশলের প্রয়োজন হয়।

জীবনের অরুণালোকে যখন সকলই স্নিগ্ধ, সকলই মধুর, যখন প্রবৃত্তির ক্ষীণ কুশা-ক্ষুর কণ্টকের মত কঠিন হইয়া উঠে নাই, যখন হৃদমনীয় বাসনার ধূসর ধুলিবন্ধা জীবনকে অন্ধকার করিয়া ফেলে নাই, যখন জ্ঞানের সূর্য্য ভোগলিপ্সার ঘন কুজা-টিকায় আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই, তখন সাধনার পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে নিজের শক্তিই যথেষ্ট, অরুর উপদেশ ও আদর্শই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ত প্রচুর।

কিন্তু যখন প্রভাতের সূর্য্য মধ্য গগনে উঠিয়া অগ্নিবৃষ্টি করিতে থাকে, ধূসর বজ্রের ঐবল প্রতাণে জল স্থল কাঁপিয়া উঠে, বাসনার মেঘ-গর্জনে হৃদয়াকাশ মুহুমূহুঃ

নির্নাদিত হয়, তখন আর কেবল নিজের সাগর্ভে নির্ভর করা যায় না। পদে পদে পদস্থগনের আশঙ্কা ঘটে। তখন জীবন-পথে অবিচলিত থাকিবার জন্ত সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত বিবাহ। পরস্পরকে কর্তব্য পালনে সাহায্য করিবার জন্ত নর-নারীর এই পুণ্য মিলন। তাই কৈশোরের ব্রহ্মচর্য্যের পরে যৌবনের গার্হস্থ্য-আশ্রমের আরম্ভ।

“তথা নিত্যং যতেয়াতাং

স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতজ্রিয়ৌ

যথা নাভিচরেতাং তৌ

বিযুক্তা বিতরেতরম্।”

—মথু।

বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ সর্বদা এমনতর করবে, যাহাতে ধর্ম্মার্থকাম বিষয়ে পরস্পরের ব্যভিচার, না হয়। ভগবান্ নর-নারীর প্রকৃতি এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে একের অভাব অন্নের দ্বারা সম্যক্ পরিপূর্ণ হইতে পারে এবং পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরে সহজে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারে।

যাহারা নরনারীকে সমপ্রকৃতি ও সম-শক্তিসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া, উভয়কে প্রতি-দ্বন্দ্বিরূপে জীবনের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে চাহেন, তাহারা প্রকৃতির বিকক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, ভগবানের গুণ উদ্দেশ্য এবং সুন্দর ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে চান।

সুতরাং পুরুষজাতিতে ধর্ম্মলাভে সাহায্য করিবার জন্ত প্রস্তুত হওয়াই নারীজীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য।

“ধর্মার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা।

ধর্মার্থে ক্রিয়তে সূতঃ।

ধর্মার্থে ক্রিয়তে গেহঃ

ধর্মার্থে ক্রিয়তে ধনম্॥”

—বৃহদ্রথপুরাণ।

ধর্মের জন্তই ভাৰ্য্যা, ধর্মের জন্তই পুত্র, ধর্মের জন্তই গৃহ এবং ধর্মের জন্তই ধন।

হিন্দুশাস্ত্রকার গার্হস্থ্য-আশ্রমে রমণীর জন্ত যে সকল কর্তব্যের নির্দেশ করিয়াছেন, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, পুরুষকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্ত স্ত্রীলোকের পক্ষে তদধিক কর্তব্য পালনের আবশ্যকতা নাই।

হিন্দুশাস্ত্রমতে রমণী গার্হস্থ্য-আশ্রমের প্রাণস্বরূপ।

“যথা রথশ্চ রথিনাং গৃহিণীঞ্চ তথা গৃহম্।

সারথিস্ত যথা তেষাং গৃহস্থানাং তথা প্রিয়া॥”

—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।

রথীঃ যেমন রথ, গৃহীর তেমন গৃহ, এবং রথের যেমন সারথি, গৃহস্থের তেমন স্ত্রী।

“উৎপাদনমপত্যস্ত জাতস্ত পরিপালনম্।

প্রত্যহং লোবযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥”

সন্তানের উৎপাদন, জাত সন্তানের পরিপালন, এবং প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মূলে প্রত্যক্ষ ভাবে রমণী। রমণী কেবল সহধর্মিণী-রূপে নহেন, জননী-রূপে ও গৃহিণী-রূপে মাতৃষকে ‘মাতৃষ’ করিয়া তুলিবার জন্ত অবতীর্ণ।

“প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্থাঃ গৃহদীপ্তয়ঃ।

জিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন।”

—মহা।

সন্তান-জননী বলিয়া স্ত্রীলোক পরম-কল্যাণ-

ভাজন; তাঁহারা গৃহের দীপ্তিস্বরূপা ও পূজনীয়া; তাঁহারা গৃহের লক্ষ্মী। লক্ষ্মীতে ও রমণীতে কোন প্রভেদ নাই।

স্বামীর উপর স্ত্রীর ও সন্তানের উপর মাতার অসীম প্রভাবের কথা সর্বজন-বিদিত। গর্ভাবস্থার পর্য্যন্ত জননীর মনোভাব সন্তানের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে, একপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। হিন্দুসংসারে স্বামী পুত্র ভিন্ন আরও অনেকের স্থান আছে। তাহাদেরও সুখ স্বাস্থ্য, উন্নতি-অবনতি বহুল পরিমাণে গৃহিণীর উপর নির্ভর করে।

সুতরাং সহধর্মিণী-রূপে স্বামীর, জননী-রূপে সন্তানের, এবং গৃহিণী-রূপে সমস্ত পরিজনের কল্যাণবিধানের ভার রমণীর উপর।

অত্যাচার সঙ্গে শরীরের দৃঢ় সংগ্রাম।

“শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।”

অত্যাচার উন্নতির জন্ত শরীরের সাহায্য এবং মনের উদারতা কোন ক্রমেই অপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং সমস্ত পরিবারের দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া, ব্যাধি ও দুশ্চিন্তা হইতে তাহার দিগকে রক্ষা করিয়া, শাস্তি ও পবিত্রতার মধ্যে সকলকে “মাতৃষ” করিয়া তোলাই রমণীর কাজ। গৃহের অসহ্যকর আবর্তনারাশি দক্ষহস্তে দূর করিয়া, ‘পুঞ্জিত আয়োজনকে’ শোভায় ও সৌন্দর্য্যে মনোহর করিয়া তোলা; জীবন-সংগ্রামের বিকট ভীষণতাকে স্নেহ ও প্রীতির জ্যোৎস্নাপাতে সহনীয় করিয়া তোলা; পথভ্রান্ত হতভাগ্যের পথভ্রম দূর করিয়া, স্নেহভরে তাহাকে সুপথে পৌছাইয়া দেওয়া কল্যাণময়ী রমণীর জীবন-ব্রত। কবিবর রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে রমণীর এই

কল্যাণময়ী মূর্তি দেখিয়া শ্রদ্ধাভরে
গাহিয়াছেন ।

“সাজ হ’য়েছে রণ

অনেক যুবিকারী অনেক খুঁজিয়া

শেষ হ’ল আয়োজন ।

তুমি এস এস নারি,

আন তব হেম ঝারি,

ধূয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন—

জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন ছিন্ন—

সুন্দর কর—সার্থক কর

পুঞ্জিত আয়োজন ।

এস সুন্দরি নারি—

শিরে ল’য়ে হেম ঝারি

হাটে আর নাই কেহ

শেষ ক’রে খেলা ছেড়ে এহু মেলা

গ্রামে গড়িলাম গেহ ;

তুমি এস এস নারি

আন গো তীর্থবারি

স্নিগ্ধ হৃদিত বদন-ইন্দু—

সিঁথায় আঁকিয়া সিন্দূর-বিন্দু—

মঙ্গল কর—সার্থক কর

শূন্ত এ মোর গেহ ।

এস কল্যাণি নারি

বহিয়া তীর্থবারি

বেলা কত যায় ব’হে—

কেহ নাহি চাহে খর রকি নাহে

পরবাসী পথিকেরে ।

তুমি এস এস নারি

আন তব সুধাবারি

বাঁজাও তোমার নিকলক

শতচাঁদে গড়া শোভন শঙ্খ

বরণ করিয়া সার্থক কর

পরবাসী পথিকেরে ।

অনন্দময়ি নারি

আন তব সুধা-বারি

স্রোতে যে ভাসিল ভেলা ;

এবারের মত দিন হ’ল গত

এল বিদায়ের বেলা ।

তুমি এস এস নারি

আন গো অশ্রুবারি

তোমার সজল কাতর দৃষ্টি

পথে ক’রে দিক্ করুণা বুষ্টি

বাকুল বাহর পরশে ধস্ত

হোক বিদায়ের বেলা ।

অগ্নি বিবাদিনি নারি

আন গো অশ্রুবারি

আঁধার নিশীথ রাতি ;

গৃহ নির্জন

শূন্ত শয়ন

জলিছে পূজার বাতি ।

তুমি এস এস নারি

আন তর্পণবারি

অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ

খোল হৃদয়ের গোপন কক্ষ

এলো কেশপাশে শুভ্রবসনে

জালাও পূজার বাতি ।

এস তাপসিনি নারি,

আন তর্পণবারি ।

সুকবি নবীনচন্দ্র রমণীর কর্তব্য সম্বন্ধে আদ্য

রমণী ‘সুভদ্রা’র মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

“ততোধিক রমণীর আছে কিবা সুখ
রোগে শাস্তি হুঃখে দয়া
শোকেতে সাশ্বনাছারা
দিদি এই ধরাভলে রমণীর বুক,
ততোধিক রমণীর আছে কি বা সুখ ।
যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ
সৃজি সেইরূপ দিদি ! রোগ শোক দুখ
সৃজিলা অনন্ত প্রেমপূর্ণ নারীবুক ।
আছে আর কিবা সুখ হয় ! এইরূপে যদি
চালিয়া অমৃত মৃতে শাস্তি যন্ত্রণায়
রমণী-জীবনগঙ্গা বহিয়া না যায় !”

এই কল্যাণময় রমণীজীবনকে (১) কুমারী
(২) সহধর্মিণী (৩) জননী ও (৪) গৃহিণী এই
চারিভাগে বিভক্ত করিয়া আমরা রমণী-
জীবনের এই বিপুল কর্তব্যাবশির বিস্তারিত
আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব ।

একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজলেখক লিখিয়া-
ছেন - The condition of its women
is the truest test of a people's civi-
lization. Her status is her coun-
try's barometer. কোন জাতির জীলোকের
অবস্থা সে জাতির সভ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয় ।
দেশের জীলোকের অবস্থা দেশের বায়ুমান
বস্তুর মত ।

এ কথা সম্পূর্ণ সত্য । দেশের জীজাতি
উন্নত না হইলে, দেশের উন্নতি সম্ভব হয় না ।

কারণ, জীলোকই জননীরূপে, সহধর্মিণীরূপে,
অভিভাবিকারূপে বহুলপরিমাণে পুরুষের
চরিত্রকে গঠিত করিয়া তুলে । মহৎ-চরিত্রের
মহত্বের বীজ তাঁহার জননীর চরিত্রে নিহিত,
এ কথা সর্ববাদিসম্মত ।

যখন কুস্তীর মত পরদুঃখকাতরা, গান্ধারীর
মত ধর্ম্মপরায়ণা, সীতার মত পতিব্রতা,
সুভদ্রার মত জননী, বিদ্যালার মত তেজস্বিনী,
জনার মত স্বদেশপ্রিয়া, মৈত্রেয়ীর মত ব্রহ্ম-
বাদিনী বিদ্যমান ছিলেন, তখনই যুধিষ্ঠিরের
মত ধর্ম্মপ্রাণের, অর্জুনের মত বীরের, রাম-
চন্দ্রের মত কর্তব্যনিষ্ঠের, অভিমুখ্যার মত
সুপুরুষের, প্রবীরের মত তেজস্বীর, বশিষ্ঠ-
যাজ্ঞবল্ক্যের মত জ্ঞানীর, কর্ণের মত দাতার,
ভীষ্মের মত ভাগ্যশীলের, ধ্রুবে মত ভক্তের
উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল । *

মাতৃজাতি যেদিন হইতে কর্তব্যব্রত,
সন্তানের ও সেদিন হইতে অবনতি । আবার
যদি জাতীয় উন্নতিসাধন প্রার্থনীয় মনে হয়,
তাহা হইলে সর্বপ্রথমে রমণীজাতিকে কর্তব্য-
পরায়ণ ও সঙ্গত করিয়া তুলিতে হইবে ।
রমণীজাতির উন্নতি না হইলে, দেশের উন্নতি
কোন মতেই সম্ভব হইবে না । (ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ।

* তাই, না ভীষ্মাদির মত পুরুষ জন্মিষ্ঠেই বলিয়াই
এই সকল মহিলার উদ্ভব হইয়াছিল ?—বঃ সঃ

বিষয়বস্তু

দেবেন্দ্র দত্ত ও হৈমবতী

স্বর্গ নিরবচ্ছিন্ন সুখসৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার
আধার ; নরক নিরবচ্ছিন্ন কদর্য্যতার স্থান।
এ সংসার উভয়ের মিশ্রণ বিবৰূপে
সংসারের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার
স্বর্গীয় ভাগ আমরা দেখিলাম। তাহার
নারকীয় ভাগও শিক্ষার জন্ত, স্বর্গীয় ভাগের
সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্ত, দেখা
কর্তব্য। দেবেন্দ্র দত্ত এ ভাগের প্রধান চিত্র,
এককালে সৌন্দর্য্যবিহীন নহে, আমূল ঘুণাইও
নহে ; গুণ থাকিয়াও, ভালবাসিবার জিনিষ
থাকিয়াও, সংযমশিক্ষার অভাবে, আত্মশাসন-
শক্তির অভাবে, ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে, নরকের
সংস্কে হইয়া, মানুষ কিরূপ দয়ার পাত্র হয়,
তাহারই দৃষ্টান্ত। দেবেন্দ্রের জীবনে দুর্বিষহ
দুঃখের কারণ বিস্তারিত ছিল ; কিন্তু সে দুঃখ
নির্মার্জিত করিবার চেষ্টায়, তাহা ভুলিবার
চেষ্টায়, তিনি ভ্রমের পথে পদার্পণ করিয়া-
ছিলেন। ফলে শাস্তির অনুসন্ধানে জালা,
রোগ, ভোগ, গৌরবহীনতা, একরূপে আত্ম-
হত্যা। সুখ নিবৃত্তিমূলক, প্রবৃত্তিমূলক নহে—
দেবেন্দ্র দত্ত তাঁহার নিজ জীবনে তাহাই
প্রমাণিত করিয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খলতা কেবল
সমাজের সুখের বিষয়ক নহে, নিজের সুখেরও
বিনাশ সাধন করে। তাঁহার দ্বারা তাহাই
প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টান্ত যুবকের
পক্ষে বিশেষ শিক্ষাস্থল, অপরিহার্য্য কর্ম্মফল

দেখিয়া সতর্ক হইবার জন্ত। এ চরিত্রের
আলোচনা আমরা প্রসঙ্গক্রমে অন্তর্ভুক্ত
করিয়াছি, সুতরাং লিপিবাহুল্য নিব্রয়োজন।
দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুবুদ্ধি, সুচরিত্র, শীতল-
স্বভাব সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রের ব্যবহারে
আন্তরিক বিরক্ত হইয়াও, দেবেন্দ্রের মঙ্গলকামনা
পরিচ্যাপ্ত করেন নাই, দেবেন্দ্রকে ঘৃণিতবৎ
বর্জন করিয়া সজ্জনতার অভাব দেখান নাই।
এ চরিত্রের আলোচনা করিয়া, পাঠকেরও
মনোভাব সেইরূপই হইবে, মনে করি।
অর্থাৎ দেবেন্দ্রের কার্য্য ঘৃণিত ও বিরক্তিকর
হইলেও, পাঠক তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষা-
লাভ করিয়া, তাঁহার জীবনের পথ পরিহার
করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, সুরেন্দ্রনাথের তায়
অবিকৃত থাকিয়া, একরূপ চরিত্র যে দয়ার পাত্র,
তাহা অনুভূত করিবেন, কবির ইহাই উদ্দেশ্য
আমাদের ধারণা। কবি তাঁহার এ
চিত্র তাঁহার হৈমবতী-চিত্রের কদর্য্যতা-
প্রস্ফুটনের উপায় বা কৌশলস্বরূপে
ব্যবহার করিয়াছেন। হৈমবতীই দেবেন্দ্র
দত্তের চরিত্রচ্যুতির মূল কারণ এবং উভয়ের
এ সম্বন্ধ দেখাইবার জন্ত কবিকে
অধিক কথা বলিতে হয় নাই। চিত্রকর
সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিয়া তাহার উপর
মদী নিক্ষিপ্ত করিলে যেমন সম্ভাবিত স্নানর
চিত্রের সে বহিরঙ্গন বিনষ্ট হয়, এবং সে

মূলরেখার ধ্বংসাবশেষ ঐ মসীরাশিকে অধিক-
তর নয়নবিরক্তিকর বলিয়া প্রত্যক্ষমান করে,
সেইরূপ কবি দেবেন্দ্রকে মূলে বিধাতার সুন্দর
সৃষ্টির ভাবে পরিচিত করিয়া, তাহার জীবনে
হৈমবতী সংযোগ করিয়া ইচ্ছাপূর্বক সে
জীবনের গৌরব নষ্ট করিয়াছেন, এবং সে
উপায়ে হৈমবতীর কদর্য্যতা সহজে প্রসূরিত
হইয়াছে। কবিকে হৈমবতী-চিত্র আঁকিতে
হয় নাই, অগ্র চিত্রের সৌন্দর্য্যাবিনাশী মসী-
রাশিও তাহা আপনিই বিরক্তির সামগ্রীরূপে
পাঠকের মনশ্চক্ষুসমক্ষে মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে।

হীরাদাসী, মালতী গোয়ালিনী

সংসারে সাধারণ ইন্দিয়-লালসাকেও প্রেমাত্ম-
রাগ নাম দিয়া, মাহুষে প্রেমাত্মরাগকে
ভেঙ্গাইয়া থাকে। হীরার দেবেন্দ্র দত্তে
অমুরাগ স্বার্থময় হইলেও, ঠিক সেই শ্রেণীর
নহে। হীরা বালবিধবা, দাসীবৃত্তিচারিণী,
তাহার চরিত্র ইন্দিয়লালসা-কলুষিত হইবার
বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হীরার চিত্তসংযমে
ক্ষমতা ছিল, এবং ভদ্রপরিবারস্থা থাকিয়া,
সে দেবেন্দ্রকে অমুরাগের চক্ষে দেখিবার পূর্বে
বরাবর সতীস্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল।
দেবেন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়াও, সে কেবল ইন্দিয়-
লালসার পরিতৃপ্তির আশায় তাহাতে উপগতা
হয় নাই। হীরার হৃদয়ে রূপপ্রভাবে রূপজ
প্রণয়েরই উদ্ভব হইয়াছিল। সঙ্গীত-রসাস্বাদও
তৎসঙ্গে মিলিত হইয়া, সে আকর্ষণের সহায়তা
করিয়াছিল। সে দেবেন্দ্রকে প্রণয়িভাবে লাভ
করিত পারিলে, অমুরাগাত্মগতা দাসীর ত্রাণ
তাহার চরণ-সেবারই প্রার্থিনী ভাবে ছিল,
সাধারণ লালসাকৃষ্ট হইয়া সাময়িক মিলনের

জন্ত আকাক্ষিত হয় নাই। এইটুকুই
হীরার চরিত্রের সৌন্দর্য্য। দেবেন্দ্র দত্ত
মালতী গোয়ালিনী দ্বারা হীরাকে ডাকাইয়া
লইয়া, বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া,
কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া,
ক্রোধোদ্গীর্ণ হইয়া, গাত্রোত্থান করিয়া,
হীরা কহিল, “মগশয়! আমি দাসী
বলিয়া, এরূপ কথা বলিলেন। ইহার
উত্তর আমি দিতে পারিব না আমার
মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর
দিবেন।” ঈর্ষা-প্রণোদিত না হইলে, ইহাও
হীরাচরিত্রে প্রশংসার কথা। আমরা বিশ্বাস
করিতে অস্বীকার নহি যে, হীরা তাহার প্রভু-
সেবায় বিশ্বস্ততার চরিত্রবলেই দেবেন্দ্রের
কথার এরূপ উত্তর করিয়াছিল, যদিও পরে
ঈর্ষাবুদ্ধি-চালিত হইয়া, তাহার কুটীরস্থিত
কুন্দনন্দিনী সখকে ক্রুর ব্যবহার করিবে, সে
কথার বিবেচনা করিতে বসিয়া, মনে মনে
দেবেন্দ্র-প্রদর্শিত প্রলোভনের কথারও
আলোচনা করিয়াছিল। স্থূল কথা, হীরা দাসী
হইলেও এবং এ শ্রেণীর লোকে ঐশ্বর্য্যশালী
প্রভুর আশ্রয়ে অর্থাদি পুরস্কার লাভের
আকাঙ্ক্ষা যে করে, সেরূপ স্বার্থসাধনে তাহার
বিশেষ তৎপরতা থাকিলেও, সে তাহার কার্য্যে
চিত্তের দৃঢ়তামূলক গুণ প্রদর্শনে অসমর্থ্য ছিল
না। ঈর্ষাই তাহার চরিত্রের ক্ষতস্থল এবং
তাহাই তাহাকে নারকীয় চরিত্ররূপে প্রতি-
ফলিত করিয়াছে। ঈর্ষার বশীভূত হইয়া,
হীরা যে কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিত। এই
কলুষিত মনের বৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়াই, সে
সর্বজনশ্রদ্ধাভাজন সূর্য্যমুখীরও অনিষ্টসাধনে
প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এই নারকীয় ভাবই

তাহাকে সরলা অবলা সর্বপ্রকারে দোষ-
বিহীনা কুন্দনন্দিনীর প্রাণহত্যা করিয়াছিল।
চর্য এ চিত্রের স্থল কালিমাময় রেখা। এ
চিত্রের দিকে দৃষ্টি করিলেই, সেই কাল রেখার
চক্ষু ভরিয়া যায়। চতুরতা, স্বার্থসাধনপটুতা,
হীরা-চিত্রের একটি প্রকৃষ্ট রেখা, এবং হীরা
অতি চতুরা ছিল বলিয়াই, সে তাহার
ঈর্ষাবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনে অতদূর কৃতকার্য
হইয়াছিল।

সাধবী এবং ভদ্রপরিবারস্থ থাকিলেও,
হীরার রসের অভাব ছিল না, এবং সে
তাহার 'গঙ্গাজল' মালতী গোয়ালিনীর
সহিত গলা মিলাইয়া রসের গান গাইতে
গাইতে পথে যাইতে, অন্ততঃ রাত্রিকালে
এরূপ করিতে, কোনরূপ দ্বিধার কারণ মনে
ভাবিত না। কিন্তু মালতী গোয়ালিনীর
সহিত তাহার কেবল এই থানেই প্রকৃতি-
সাদৃশ্য ছিল, অন্ত কিছূতে মালতীর সহিত
হীরার বা তাহার সহিত মালতীর তুলনা হয়
না। মালতীকে কবি বিশেষরূপে অঙ্কিত করি-
বার চেষ্টা করেন নাই, পার্শ্ববর্তী চিত্ররূপেই
প্রদর্শিত করিয়াছেন; তথাপি যে এক রেখা
টানিয়াছেন তাহাতেই পাঠক তাহাকে
অন্যাসে চিনিতে পারিবেন। কবির কথায়
“মালতী গোয়ালিনীর মত রসিক জীলোক—

* * * *

দেবেজ বাবুর দাসী নহে—আশ্রিতাও নহে—
অথচ তাঁহার বড় অমুগত—অনেক ফরমাস
—যাহা অন্তের সঁসাধ্য, তাহা মালতী সিদ্ধ
করে।” কেবল কি রসের খাতিরেই মালতী
পাণের সেবা করিত? মহুঘাচরিত্রে বিচিত্র
কি?

আখ্যায়িকায় উক্ত অগ্রাণ্ড ব্যক্তিগণ
মধ্যে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর কথা এই সম-
লোচন প্রবন্ধে স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে।
শ্রীশচন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের সম্বন্ধে আমরা
বিশেষরূপে উল্লেখ কিছু করি নাই। শ্রীশচন্দ্রও
অতি প্রীতিকর চিত্র, সুশিক্ষিত ও সুন্দর-
স্বভাব, সদাশ্রু ও স্নেহলীল। নগেন্দ্রের ছায়
তিনিও অতি ভাষাশাস্ত্রজ্ঞ, যদিও কাব্যের
প্রধান চিত্র নয় বলিয়া, কবি তাহার সে
প্রকৃতির অঙ্কনে অধিকতর বর্ণ প্রয়োগ করেন
নাই। হরদেব ঘোষালের ছায় সুহৃদ্ লোকের
ভাগ্যে কমই মিলে,—বিদ্বান্, বুদ্ধমান্ ধীর-
প্রকৃতি; বিচারক্ষম, সংপরামর্শদাতা, শ্রদ্ধার
পাত্র; নগেন্দ্রের আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষা এবং
অকৃত্রিম বন্ধু।

হীরার আয়ী বুড়ী নূতন চিত্র নহে, পল্লী-
গ্রামে এবং সহরের রাস্তাতেও অনেক স্থলে,
অনেক সময়ে বালকবৃদ্ধের এবং বালকস্বভাব
বয়োবৃদ্ধের কোতুকোদীপক এরূপ বুড়ী
অনেকের নয়নগোচর হইয়া থাকিবে। তবে
কবির লেখনী সংযোগে হীরার আয়ী অমরত্ব
লাভ করিয়াছে, নিজীব ক্ষুণ্ণবীর্ণ বঙ্গে,
পুণিবর্ন্তনশীল বঙ্গে, অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে,
এ আমোদের অভাব হইবে না *

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী।

* অনিয়মিত ভাষে, ১৩১৭ সনের মাঘ সংখ্যা হইতে
আরম্ভ করিয়া, ১৩১৯ সনের এই সংখ্যায় আমার কৃত
বিষয় সমালোচনা শেষ হইল। ১৩১৭ সনের মাঘ-
সংখ্যায় সমগ্র কাব্যের সাধারণ সমালোচনা প্রকাশিত
হয়। তৎপর প্রকাশিত প্রবন্ধকরেকটিতে আমি বিষ-
বৃদ্ধের চরিত্রগুলির বিশেষণে প্রয়াস পাইয়াছি।
আমার সাহিত্যসেবার অভিলାষ কিয়ৎ পরিমাণেও

আবিভূতা

মোর স্বপ্নলোক হ'তে কোন পথ ধরি'
কেমনে আসিলে হেথা ওগো মায়াবিনী,
হে মোর যৌবন-স্বপ্ন-স্বর্গ-বিলাসিনী,
মনসিজা চিত্তলক্ষ্মী, হে স্বরসুন্দরী,
চক্ষে আসি দিলে দেখা ? ধ্যান-নিমীলিত
অঁধি মোর বিশ্ব'পরি ঝেলি যবনিকা,
নিভৃত অঁধার রচি' একান্তে হেরিত

শুভ্রমিথুদীপ্তি তব,—জ্যোতির্ময়ী শিখা
স্বর্গ দীপ মুখে যথা মন্দির তিমিরে ।
মর্মের মুকুর মাঝে মৌনমূর্তি খানি
ছিল ছায়া মায়া শুধু, আজি স্বশরীরে
চক্ষে বক্ষে দিলে ধরা ! সোহাগের বাণী
শুনি কাণে, ব্রাণে পাই সৌরভ দেহের,
অঙ্গের অঙ্গিনী হ'লে দেবী অন্তরের ।

শ্রী :—

সফল হইয়াছে কি না, তাহার বিচার অস্তের হাতে ।
১৩১৭ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় 'স্ব্যামুখী'চরিত সমা-
লোচিত হয়, ১৩১৮ সনের সাহিত্য পত্রিকার বৈশাখ
সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার সুপণ্ডিত, সুবিস্ত্র, ও সুদক্ষ
সম্পাদক আমার ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য
প্রকাশ করেন—

“শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্তী 'স্ব্যামুখী' প্রাংকে
সংক্ষেপে 'বিষবৃক্ষে'র সমালোচনা করিয়াছেন । ইহাতে
এমন কোন নূতন কথা দেখিলাম না, যাঁহা গিরিজা
বাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্রে' ও মাসিকের চর্কিতচর্কণে দেখি
নাই । কোন বিষয়ের রচনার শ্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, সে
সম্বন্ধে পূর্ববর্তী লেখকগণ যাঁহা লিখিয়া গিয়াছেন, নূতন
লেখকগণ তাহা পড়িয়া লইলে ভাষা ও সাহিত্য পুন-
রুজ্জ্বিত অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় ।”

এই মন্তব্য অনেক বিলম্বে আমার চোখে
পড়ে । তদবধি প্রকৃতই চর্কিত-চর্কণ দ্বারা বঙ্গীয়
পাঠকবৃন্দকে বিরক্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট
অপরোধী হইলাম কি না, ইহা বুঝিবার জন্য আমি
অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি । বিষবৃক্ষ সম্পূর্ণ
বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে, তৎকালিক

অল্প বাঙ্গলা মাসিক পত্র আখ্যাদর্শনে ইহার এক স্তম্ভীয়
সমালোচনা বাহির হয় । যত দূর মনে আছে, সে
সমালোচনায় চরিত্র বিশ্লেষণ বা কাব্যের গুঢ় সৌন্দর্য্য
প্রদর্শনের চেষ্টা হয় না । তৎপর অল্প কোন মাসিক
পত্রিকায় বিষবৃক্ষের বিশেষ সমালোচনা কিছু বাহির
হইয়াছে, একথা আমি অবগত নহি, বিশেষ অনুসন্ধানও
জানিতে পারি নাই । স্বর্গীয় গিরিজাবাবুর বই একখানি
আমার নিকট ছিল, এবং সাহিত্য পরিষদের পুস্তকা-
লয় হইতে তাহার কৃত সমালোচনার পুস্তকগুলি
আনাইয়া দেখিয়াছি । আমার একটি সাহিত্যপ্রিয় ছাত্র
দ্বারা অল্পাংশ স্থানেও গিরিজাবাবুর বই দেখাইয়াছি ।
তাঁহার পুস্তকে বিষবৃক্ষের সমালোচনা নাই । তাঁহার
'বঙ্কিমচন্দ্র' তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লেখা আছে, তাঁহার
পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমার্ধে বিষবৃক্ষ রচনায় প্রভুতি
সমালোচিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ পুস্তকাকংশ তিনি প্রকাশ
করিতে পারিবেন এক্ষণে আশা করিতে পারেন নাই ।
যাহা হোক তাহার পর গিরিজা বাবু বিষবৃক্ষের সমা-
লোচনা 'বঙ্কিমচন্দ্র' কোন খণ্ডে বাহির হইয়াছে—
সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাহা উল্লেখ
করিলে বাধিত হইব । প্রঃ লেঃ

চীনে প্রজাতন্ত্র *

মাঞ্চু জাতীয় তাং-চিং রাজবংশ রাজপাট পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং চীনদেশে রিপাবলিক গবর্নমেন্ট বা প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু চীনে যে কখন কি ঘটে তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বলিতে পারেন না।

নানা ভাগ্যবিপর্যায়ের মধ্য দিয়া চীনের রাষ্ট্রতন্ত্রের মূল নীতি সকল এমন ভাবে গঠিত হইয়া আসিয়াছে যে, চীনকে তাহা পরিত্যাগ করা কঠিন। চীনে যদিও আদিম কাল হইতে রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহা জাপানের মত নহে। জাপানে যেমন গোড়া হইতে এক রাজবংশের শাসনাধীন হইয়া সেই বংশ প্রজাবলের শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়া আসিয়াছে চীনে তাদৃশ নহে। চীনে এক রাজবংশের পতনে অপর নূতন এক রাজবংশের অভ্যুত্থান হইয়াছে।

চীনে চাউ রাজবংশ ৮০০ বৎসর, হান রাজবংশ ৪০০ বৎসর, ঠাং বংশ ৩০০ বৎসর, চুং বংশ ৩০০ বৎসর, ইউয়ান বংশ ৮০ বৎসর, মিং বংশ ৩০০ বৎসর, বর্তমান মাঞ্চু তাং বংশ ২৬৮ বৎসর রাজত্ব করার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

চীন-সম্রাটকে লোকে ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত, সুতরাং সেই পবিত্র স্বর্গ-পুত্র-সম্রাট আপন দয়া, দাক্ষিণ্য, সুবিচার, শ্রায় ও সম্ভ্রান্তের দ্বারা প্রজা শাসন করিতে বাধ্য, এবং এই কারণে তিনি উপরে পরমেশ্বর এবং নিম্নে প্রজাবর্গের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

যখন কোন সম্রাট অল্প কোনবংশীয় লোক কর্তৃক বিতাড়িত বা সিংহাসনচ্যুত হইতেন, লোকে, তখন বিশ্বাস করিত যে এই ঘটনা ঈশ্বরাদেশে হইয়াছে। কারণ পরমেশ্বর নিশ্চয়ই বর্তমান সম্রাটের কুশাসন ও পাপের শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, উপযুক্ত ধার্মিক শাসনকর্তার হস্তে এই রাজ্য-শাসনের ভার দিয়াছেন।

চীনে সর্বপ্রথম তিনজন বিজ্ঞ দার্শনিক রাজা ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে ইয়াও, চোয়েন এবং ইউ। এই প্রকার কথিত আছে যে কনফুসিয়ান এই তিন ঋষি-তুল্য দার্শনিক সম্রাটের দর্শনতত্ত্বানুসারে চীনের রাষ্ট্রনীতি গঠন করেন। চীন দেশের পরবর্তী সমস্ত রাষ্ট্রনীতিক লোক কনফুসিয়ানের নীতির আদর্শ লইয়া এ বাৎসর রাজ্য শাসন কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বর্তমান রাষ্ট্র-বিপ্লবের অল্পকাল নেতা উঃ-টিং-ফাং যন বিদেশী ভাবে যতই পরিপূত হউক না কেন তিনি যখন বালক সম্রাট পু-ই-কে সিংহাসন ত্যাগ করিবার জন্ত জেদ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনে যে সেই তিন দার্শনিক সম্রাটের আদর্শ আসিয়া উপদ্রব করিতেছিল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

* টোকিওর ইতিহাসের অধ্যাপক টিঃ আইয়েনাগো (Professor T. Iyenago) কর্তৃক লিখিত ওয়াল্ড ওয়ার্কস নামক মাসিকপত্রে লিখিত লেখকের সাক্ষাৎ এবং বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের মন্তব্য।

সম্রাট ইয়াওর রাজত্বকাল যখন শেষ হয় তখন তিনি তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত না করিয়া চোয়েন নামক এক ঋষিতুল্য ব্যক্তিকে সম্রাট মনোনীত করেন। চোয়েন প্রথম এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু যখন রাজ্যের অভিজাতবর্গ ও প্রজাসাধারণ সম্রাট ইউয়ানের পুত্রকে মনোনীত না করিয়া তাঁহাকেই সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিতে জেদ করিতে লাগিল, তখন অগত্যা তিনি এই ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া কহিলেন যে “ঈশ্বরাদেশে আমি সাম্রাজ্যের এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলাম।”

আবার সম্রাট চোয়েনের রাজত্বকাল যখন শেষ হইল তখন তিনি নিজের বংশধরকে নিযুক্ত না করিয়া বিজ্ঞ দার্শনিক ইউকে নিযুক্ত করিলেন। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কোন সম্রাটকে মনোনীত করা এবং একজন প্রেসিডেন্টকে ভোজ দ্বারা মনোনীত করার মধ্যে পার্থক্য কত অল্প। পরবর্তীকালের সম্রাটগণ যদিও বংশানুক্রমে সিংহাসনারোহণ করিয়া আসিয়াছেন, তবুও প্রজাবর্গ ও জনসাধারণ এ কথা ভুলে নাই যে সম্রাট ঈশ্বরাদেশে ত্রায় ও ধর্মের দ্বারা রাজ্যশাসন করিতে ও প্রজাপালন করিতে বাধ্য। যিনি প্রজাপীড়ক হইবেন তিনি হয় ত হত হইবেন, না হয় সিংহাসনচ্যুত হইতে বাধ্য হইবেন।

এই হিসাবে চীনে Democracy living under theocracy বা পবিত্র রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের অবস্থান মনে করা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে একজন সম্রাট নির্বাচনের পরিবর্তে একজন প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা একটা অসম্ভব ঘটনা বলিয়া বোধ হইবে না।

সম্রাটবংশের কতিপয় রাজকুমার (Prince), কর্ণ ফুসিয়ানের কতিপয় বংশধর এবং টাই পেইং বিদ্রোহদমনকারী কতিপয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যক্তি ছাড়া চীনদেশে ইংলণ্ড বা জাপানের ত্রায় বংশানুক্রমিক অভিজাত নাই। * রাজ্যশাসনকারী তথাকথিত মন্তারিনগণও Democratic, কেননা তাহাদের প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে এক হিসাবে ধরিলে চীন রাষ্ট্রনীতি আমেরিকার শাসননীতির সদৃশ ‘স্বর্গপুত্রের’ অধীনে এমন কোন পদ নাই যাহা একজন সামান্য বংশের লোক পাইতে অক্ষম। মূলকথা ক্ষমতা দ্বারা অতি নাট্যবংশীয় কোন ব্যক্তি সর্বোচ্চপদে উন্নীত হইতে পারে। এবং সময় সময় এইরূপ পদ ও মর্যাদা অনেকে পাইয়া থাকে। এই প্রকারের ডিমক্রেটিক শাসনের তত্ত্ব (Structure) কিন্তু ইংলণ্ড বা জাপানের সঙ্গে তুলনা হয় না।

শ্রীরামলাল সরকার।

* কেন ভারতবর্ষে কি অভিজাতের অভাব আছে।

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা

ছেলেবেলা অনেকবার রথ দেখিয়াছি। আর সে একটা বেশ আনন্দের ব্যাপারই ছিল। রথের দিনে স্কুলে যাইতে হইত না। বিকল বেলা বাড়ীর সম্মুখে, সদর রাস্তার দু'ধারে মেলা বসিত। সে মেলায় আর কি কি লোকেনা হইত মনে নাই। মনে আছে এই মেলার বাজারে যাইয়া ভেঁপু কিনিয়া গান্ধিতাম, আর সমবয়স্ক বালকালিকাগণ মিলিয়া এই সকল ভেঁপু বাজাইয়া গুরুজনদিগের কর্ণপৌড়া উৎপাদন করিতাম। রথের সঙ্গ কলা-বেচার সম্বন্ধটা সার্বভৌমিক। কিন্তু কলার চাইতে আর একটা ফলের কথা বেশি মনে আছে। সুসভ্য পশ্চিম বঙ্গে এ ফল পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। ইহার নাম লটকান। শ্রীহট্ট কুমিল্লা, প্রভৃতি পার্শ্বী অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্নমপুর বলিয়া এ ফলটা স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের বড়ই প্রিয়। রথের কথা মনে হইলেই ঐ ভেঁপুর কথা, আর থলো, থলো লটকানের কথা মনে পড়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আবার বালক হইয়া সে রথ-আবাদনের জন্ত রসনাটা যে একটুও লাগান্নিত হয় না, এমনও বলিতে পারি না। আর মনে পড়ে, সম্মুখের রাজপথ দিয়া যখন স্রোকে কাঁঠন করিতে করিতে এক এক করিয়া আপনাদের রথ টানিয়া লইয়া যাইত, তখন আমরাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে

হরি বোল, বোল হরি বোল,
অর্জুনের রথের স্মরণার্থী নারায়ণ
বলিয়া চাঁৎকার করিতাম। এ-ও এক আনন্দের ব্যাপার ছিল।

এইরূপ ছেলেবেলা যে রথযাত্রা দেখিতাম, তার ছবি এখনও স্মৃতিপটে জাগিয়া আছে। ফলতঃ সেরূপ রথ বড় হইয়া আর কোথাও দেখি নাই। ললিত-কণার হিসাবে শ্রীহট্ট কাছাড় প্রভৃতি বাংলার পূর্বতম অঞ্চলের রথের মতন এমন সুন্দর রথ আর কোথাও হয় না। শ্রীহটে ও কাছাড়ে বিস্তর মণিপুরী বস করে। আর মণিপুরীদের রথ একটা অপূর্ব বস্তু। অনেকেই মণিপুরের লোককে নিতান্ত অসভ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম কলাকুশলতা যদি সভ্যতার লক্ষণ হয়, তবে মণিপুরীদের মতন সুসভ্য জাতি আর একটাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। এ জাতি স্বভাব-কবি। ইহাদের ঘরবাড়ী এমন পরিষ্কার ও পরিপাটি যে দেখিলে ঠাকুরবাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের বাড়ীগুলো এক এক খানি ছবির মতন যেন সর্বদা চারিদিকের লতাপাতাকুলের বাগানের ফ্রেমের মাঝখানে ছুটিয়া থাকে। ইহাদের পূজাপার্বণে, এই সহজসিদ্ধ ললিতকলাকুশলতা, সামান্য লতাপাতাকুল দিয়া, চারিদিকে অপূর্ণ সৌন্দর্যের হাট খুলিয়া দেয়। মণিপুরীগণ বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। ইহাদের গুরুপাট

নবদীপ ও শান্তিপুর। গোস্বামীগণই ইহাদিগকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। ইহারা রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি বৈষ্ণব উৎসবগুলি অতিশয় সমারোহ সহকারে সম্পাদন করিয়া থাকে। এই মণিপুরীদিগের রথ একটী অতি অপূর্ণ বস্তু। যাহারা হিন্দুভূমির অত্যাগত স্থানের রথই কেবল দেখিয়াছেন, রথ যে এত সুন্দর হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনাতেও আসিবে না। মণিপুরী রথের চাকা ক'খানা ছাড়া আর কোথাও কাঠের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই। রথের ঠাঁটটা আদ্যোপান্ত সুন্দর, সরল, চিকিৎসিত বাঁশ দিয়া প্রস্তুত। আর এ রথের সাজসজ্জাও অদ্ভুত। ইহাতে সাতিন, কিংখাব, জড়ি-জরওয়ার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না। কিন্তু হরিত পত্রের, বিকচ পত্রের ও বিবিধ বর্ণের ও বিবিধ গন্ধের বনকুলের অপূর্ণ সমাবেশে, মণিপুরী রথ বিপুলবিভব-ছড়ান জড়ি-জরওয়ার সাজসজ্জাকেও লজ্জিত করিয়া তুলে। মণিপুরীদের এট অপূর্ণ রথ দেখিয়া, কুরুক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে না, কিন্তু ক্রীষ্ণদাবনের নিচিত্র রসলীলার স্মৃতিই প্রাণে জাগিয়া উঠে। ছেলেবেলাকার রথের স্মৃতিতে মণিপুরী রথের এই মধুর ছবিটা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া আছে।

বড় হইয়া, কলিকাতায় পড়াশুনা করিতে আসিয়া, একবার কয়জন সতীর্থের সঙ্গে মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু লোকের ছড়োছড়ি ও গ্রাম্য রসের ছড়াছড়ি দেখিয়া, প্রাণে কোনও আনন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, বরং সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই একটা

গভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। মাঝে মাঝে কলিকাতার পথে, রথের দিনে বেড়াইতে যাইয়া, রাণী রাসমণির ছোট্ট খাট রুপার রথখানি দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতে অন্তরে ভালমন্দ কোনও ভাবের প্রেরণা কখনও জাগে নাই। কিন্তু এবারে ঘটনাবশে রথ-যাত্রার দিনে পুরিধামে থাকিয়া যে রথ দেখিয়াছি এমনটী জীবনে পূর্বে আর কখনও কোথাও দেখি নাই।

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত না কি বলেন যে এই রথযাত্রাটা আদিতে হিন্দুর পর্বে ছিল না। বৌদ্ধেরাই প্রথমে ভগবান বুদ্ধদেবের দস্তাদি দেহাবশেষকে রথে চড়াইয়া, জনগণের কল্যাণার্থে চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিতেন। সিংহলে আজিও এই বৌদ্ধপর্বেটা জাগিয়া আছে। ফলতঃ জগমালা, গঙ্গাজল, এমন কি প্রচলিত প্রতিমা-পূজাদি পর্য্যন্তও, ইহাদের মতে হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াছেন। এ সকল প্রস্তুত্বের আলোচনা, আমার বিভ্রাসাধ্যের অতীত এবং বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক ও নিস্প্রয়োজন। যদি সত্যসত্যই হিন্দুরা রথযাত্রাটা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াও থাকে, তথাপি হিন্দুর সাধনা ইহাকে আপনার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও ভক্তিরসের দ্বারা গাঁড়িয়া পিটিয়া, সাজাইয়া, গুজাইয়া এতটা পরিমাণেই নিজে করিয়া লইয়াছে যে, এখন এই রথযাত্রার ভিতরে কোনও প্রাণের বৌদ্ধগন্ধ আছে বলিয়া সন্দেহ যাত্রাও উপস্থিত হয় না।

বাংলা দেশের যেখানেই রথ হউক না কেন, অধিকাংশ স্থানেই তাহা জগন্নাথের রথ। কখনও কখনও যে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে রথাক্রম করাইয়া রথ যাত্রা করা হয় না, তাহা নয়। কিন্তু এখানে জগন্নাথবিগ্রহের অভাবেই একরূপ হয়। ফলতঃ মনে হয় যে শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে না বসাইলে রথযাত্রার প্রকৃত মর্ম্মটা ব্যক্ত হয় না। শাস্ত্রের উক্তি,—রথাক্রম বামনকেই দেখিবো।

“রথেষু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যত”
কিন্তু তথাপি রথাক্রম বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ বা বামন নহেন।

কারণ এই রথ, হিন্দুর চক্ষে বিশাল বিশ্বের বিবর্তন-বিধানের প্রতিমূর্ত্তি। শ্রীজগন্নাথের রথচক্র নিখিল জগতের বিবর্তনচক্রেরই প্রতিকৃতি। শ্রীজগন্নাথের রথচক্র এই নিখিল কৰ্ম্মচক্রকেই মনে করাইয়া দেয়। এই কৰ্ম্মবাদ, হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই স্বীকার করেন, সত্য। কিন্তু নাস্তিক্য বৌদ্ধসিদ্ধান্তের কৰ্ম্মবাদ আর আস্তিক্য হিন্দুসিদ্ধান্তের কৰ্ম্মবাদ এক নহে। নাস্তিক্য বৌদ্ধসিদ্ধান্তমতে বৌদ্ধ হইতে যেমন বুদ্ধের, বুদ্ধ হইতে সেইরূপ আবার বীজের উৎপত্তি হয়; সেইরূপ অনাদি অবিচ্ছাদিত কৰ্ম্মই কৰ্ম্মের স্রষ্টি করে। এই কৰ্ম্মশৃঙ্খল স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র স্বয়ং; এই নিখিল কৰ্ম্মপ্রবাহের অতীতে থাকিয়া কোনও কৰ্ম্মাধীপ ‘এই কৰ্ম্মপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করেন না। আস্তিক্য হিন্দু-সিদ্ধান্তে, অনাদি-অবিদ্যাকৃত কৰ্ম্মপ্রবাহ স্বীকৃত হইয়াও, তাহাতে এই কৰ্ম্মাধীপেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর নিখিল স্রষ্টির

এই অনাদি-অবিচ্ছাদিত কৰ্ম্ম-প্রবাহের নিয়ন্তা যিনি, জীবের সকল কৰ্ম্মের পরিণতি যাহার ভক্তিতে ও নিরতি যাহার চরণে, হিন্দু তাহাকেই শ্রীজগন্নাথ বলিয়া জানেন।

এই জগন্নাথই, বস্তুতঃ, বিশ্বরূপ। কুরুক্ষেত্রে অর্জুন যথেষ্ট অপরূপ রূপ দেখিয়া গতযোহ ও বাতশোক হইয়াছিলেন, সেই রূপই এই জগন্নাথের স্বরূপ। সে রূপ সদৃশ-দত্ত দিব্যচক্ষু লাভ করিলে দেখা যায়, কিন্তু ভাষায় তার বর্ণনা হয় না। ভাস্কর্য্য বা চিত্রে তাহাকে প্রকাশিত করে, সাধ্য কার? বাহাকে

বায়ুর্মোহর্নির্বরূপঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতিস্বঃ প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃৎঃ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥

—বলিয়া প্রণাম করিতে হয় ;

নম পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে

নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব।

অনন্ত স্বীৰ্য্যামিতবিক্রমন্তঃ

সর্বং সমাপ্রোষি ততোহসি সর্বঃ ॥

—বলিয়া যাহার স্তুতি করিয়াও কিছুই বলা হইল না, এমনই মনে হয়; সেই বিশ্বরূপের প্রতিকরূপকে কোন্ হাতেগড়া মূর্ত্তিতে ব্যক্ত করিতে পারে? এই জন্তই শ্রীজগন্নাথের মূর্ত্তিরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বকৰ্ম্ম আপনি হার মানিয়াছেন বলিয়া হিন্দুর প্রবাদে বলে। শ্রীক্ষেত্রের ঝাড়া-নুলো দারুমূর্ত্তিটা সেই নিখিল প্রয়াসের প্রত্যক্ষ পূতচিহ্ন স্বরূপ যুগযুগান্ত বাহিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া পৌছাইয়াছে।

এই যে রথখানি প্রতিবৎসর আষাঢ়ের

শুক্রা দ্বিতীয়ার মধ্যাহ্নে শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথকে গুজাবাড়ী লইয়া যায়, আর সপ্তাহান্তে আবার তাঁহাকে সেখান হইতে শ্রীমন্দিরে ফিবাটয়া লইয়া আইসে, প্রকৃত পক্ষে শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা যে এই ক্ষুদ্র দেশটুকুকে ও এই সামান্য কালটুকুকে জুড়িয়াই আপনায় সত্যিকার গতাগতি শেষ করে, এ অদ্ভুত কর্তব্য যে করে, তার রথযাত্রা দেখা বিড়ম্বনা মাত্র। বহুবৎসর ব্যাপিয়া দেশদেশান্তরে, কোনও নায়কনায়িকার জীবনে যে সকল বিচিত্র ঘটনা ঘটে, অপৌকিক কবিতাভাষ্য সম্পন্ন নাট্যকার যেমন ক্ষুদ্রায়তন রঙ্গমঞ্চে দুই-চারি দণ্ড-কালের অভিনয়েই তাহাকে অতি সুন্দর করিয়া দেখাইয়া থাকেন; সেইরূপ এই সামান্য দারুণনির্মিত রথখানিকে এই অতি সামান্য সময়ের ভিতরে গোটাকয়েক রশ্মির রাঙ্গা ঘুরাইয়া আনিয়া, হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাধনা নিখিগ ব্রহ্মাণ্ডের পৌনঃপুনিক গতাগতিকে, প্রাকৃতজনের চক্ষুর উপরে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহাই এই রথযাত্রার নিগূঢ়

রথযাত্রার দিন কল্লারস্তের দিন। এই দিন যোগনিদ্রাভিত্ত নারায়ণ যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া, সৃষ্টলীলায় বহির্গত হন। প্রত্যেক কল্পের সূচনায় এই অদৃশ্য জগন্নাথের এই অদৃশ্য রথখানি চলিতে আরম্ভ করে। আর কল্লাস্তে, মহাপ্রলয়কালে, আবার যেখান হইতে প্রথম যাত্রা করিয়াছিল, সেইখানেই ফিরিয়া যায়। এইরূপে অসীম দেশ ও অনন্তকালকে জুড়িয়া এই জগন্নাথের রথ

কল্পে কল্পে সমগ্র সৃষ্টলীলাকে পরিভ্রমণ করিয়া আইসে। এ যাত্রার আরম্ভও জীবনে না; ইহার শেষও জীবজ্ঞানে না। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার সময় এই অদৃষ্ট অজানা বিশ্বসৃষ্টলীলাটি বিখাস চক্ষে যে দেখিতে পায়, তারই রথ দেখা সত্য ও সার্থক হয়। ইহা যে দেখিল, তার যে সকল বন্ধন দণ্ডস্বত্বের দ্বারা আপনি খসিয়া পড়ে, ইহা বিচিন্তা কি?

ঋতি এই শরীরকে রথ বলিয়াছেন; আর এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গ্রামকে এ রথের অর্থ এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের দিব্য, রূপরসাদিকে এই রথের পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই রথে রথী নিখিল জীবাণুগ্যামী শ্রীনারায়ণ। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে প্রাতদিন এই রথ যাত্রায় কটিতেছে। এ-ও এক রথযাত্রা! এই শরীর-রথে যে শ্রীনারায়ণকে আকৃষ্ট দেখে, সে ভাগ্যবান পুরুষের বন্ধন তো আর থাকে না। তিনি দেহী হইয়াও বিদেহী। প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে তিনি যে পরমপুরুষ জগতের দেহপুরে পুরস্বামীরূপে সতত বিদ্যমান থাকিয়া, প্রাণাপান-বায়ু-সংযোগে, চক্ষ্যচোষ্যলেছপেয়াদি তার চতুর্দিক অন্নকে পাক করিতেছেন, তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ করেন। এ দেহে আর তখন তাঁর আত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি থাকেনা। দেহ সম্বন্ধে আমি; আমার, এ সকল প্রত্যয় তাঁর নষ্ট হইয়া যায়।

নৈব কীৰ্ত্ত্ব্যং কৰোমীতি যুক্তো মৃত্তত
তত্ত্ববিৎ।

পাণ্ডু শৃশ্ণু স্পৃশ্ণু জিহ্বল্লল্ল গচ্ছন্ স্বপন্
স্বপন্ ॥

প্রাপন্বি বিন্ধ্যজন্ম গৃহস্থ নৃশিখিন্মিষন্নপি ।

ইন্দ্রিয়াগ্ৰীন্দ্রিয়াথৈব বঙস্ত ইতি ধারয়ন্ ॥

এই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, এইরূপে যোগযুক্ত হইয়া দেখুন, শুনুন, চলুন, ফিরুন, বকুন, ঘুমান,—যাহা কিছু করুন না কেন,— এই সকল কেবল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগেই ঘটিতেছে জানিয়া, আপনি যে কিছু করিতেছেন এমন মনে করেন না।

এই শরীরটা যেমন রথ, সেইরূপ এই বিশাল সংসারও একটা বিরাট রথ-স্বরূপ। এই সংসার-রথেও রথী সেই শ্রীনারায়ণ। এখানে তিনি মহাবিক্রুরূপে অধিষ্ঠিত। জীবের দেহ-রথে নারায়ণ ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীবের অন্তর্ধ্যামী সাক্ষীস্বরূপ হইয়া বসিয়া আছেন। এই সংসার-রথে তিনিই সমষ্টিভাবে লিখিল মানবমণ্ডলীর অন্তর্ধ্যামী, তাহাদের সমষ্টিভূত সামাজিক জীবনের নিয়ন্তা, মানবতিহাসের সাক্ষী, মানব-সমাজের বিচার, রসলীলার অভিনয়ের নটেন হইয়া আছেন। কেবল দেহ-রথে তাঁহাকে রথী বলিয়া দেখিলেই হহল না। এই লিখিল সংসার-রথেও তিনিই রথী। তিনিই ধর্মাবহ। তিনিই পাপগুদ। এই সংসার-রথে তাহাকে যে রথীরূপে দেখিল, তার সংসার আপনা হইতেই ক্ষয় হইয়া যায়।

যদা পশুঃ পশুতে রুদ্রবর্ণং কর্তারমীশঃ

তদা পুণ্যে পাপে বিধুয় নিরঞ্জনম্

শান্তমুপৈতি ॥

জীব যখন শুভ্রবর্ণ অগ্নিযন্তাকে জগতের সকল কর্মের কর্তারূপে দর্শন করে, তখন পুণ্য ও পাপ উভয়ের অতীত হইয়া সে নিরঞ্জন শান্ত-স্বরূপ পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়

যুগে যুগে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারার অনুসরণ করিয়া এই মানবসমাজ-রূপ রথখানি চলিতেছে। এই বিশাল সমাজবক্ষে যে বিশ্বরূপের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়, তার যে কোনও সমাজ-বন্ধন থাকে না, ইহাই আর বিচিত্র কি ?

এই যে অবিরাম গতিতে, প্রত্যেক জীবের নিজের জীবনে ও তাঁর সমাজ-জীবনে এবং এই লিখিল বিশ্বের অনাদ্যনন্ত বিবর্তনের মধ্যে, শ্রীজগন্নাথের রথ চলিতেছে, তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই, বৎসর বৎসর, আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে হিন্দুর এই রথযাত্রা পর্বে হইয়া থাকে। এই রথযাত্রা সেই মহাযাত্রাকে স্মরণ করাইয়াই আপনার সার্থকতা লাভ করে।

নারায়ণের চক্ষে চক্ষু রাখিয়া, সেই অসীম নিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারই মুখ দেখিতে দেখিতে, তাঁহারই রসে ভোর হইয়া, তাঁহার নাম লইতে লইতে, জীবনের কর্ম পথে যে তাঁর রথের রজ্জু ধরিয়া তাঁর রথখানি টানিতে টানিতে চলিতে পারে, তার জীবন ধন্য, সংসার সার্থক হয়। সেই জগতের সঙ্গে এতাত্ম হইয়া, জগন্নাথের রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া তাঁর বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া পৌঁছিতে পারে।

এই জন্য সত্যভাবে শ্রীজগন্নাথের রথ-যাত্রা দেখিতে হইলে, দুতারা, তেতারা বাড়ীর ছাদে সতরঞ্চ গালিচা পাতিয়া বসিলে চলে না। পথের ধারে, লোক-সংঘট্টের বাহিরে দাঁড়াইয়া দূর হইতে রথযাত্রা দেখিলেও, সত্য দেখা হয় না। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা দেখিতে হইলে,

জগতের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। বাহ্যে বাহ্যে ঠেকুক, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস মিশুক, ঘামে ঘামে মাখা-মাখি হউক ;—মানুষের বাহ্য অপেক্ষা কোমল কিছু যে আর ছুনিয়ায় নাই, মানুষের নিঃশ্বাসের মতন এমন শীতল মলয় যে আর বিশ্বে নাই, মানুষের খেদের মতন এমন মধুর রস যে আর জগতে মিলে না,—এই ঠেকাঠেকি, মেশামিশি, মাখামাখিতে এই দিব্যজ্ঞান জন্মুক, তবে বুঝিব জগন্নাথের রথযাত্রা দেখা সার্থক হইল। ঐ রথাক্রুত দারুমূর্তি তো তাঁর চিহ্নমাত্র। জগন্নাথের নিজস্ব রূপ এই বিপাল জনসংঘট্টের মধ্যেই ফুটিয়া আছে। রথযাত্রার দিনে, রথাক্রুত শ্রীমূর্তির দিকে চাহিতে চাহিতে যাদের প্রাণের

অন্তস্তল হইতে এই ভগবদ্বাদী ধ্বনিত হইতে থাকে :—

পঞ্চ যে পার্থ রূপাণি সতশোহত সহস্রশঃ
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানি চ।
এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দুটো একবার রথাক্রুত দেব-মূর্তিকে দেখিয়া আবার রথের সম্মুখস্থ লোকসংঘট্টের উপরে আসিয়া পড়ে এবং এই আকুল ভক্তমণ্ডলীর জনতা হইতে পুনরায় ত্রীজগন্নাথের দিকে ধাবিত হয়, আর এইরূপে রথে যিনি তাঁকেই পথে, পথে যারা তাঁহাদিগকেই রথে দেখিয়া যারা আত্মহারা হইয়া যায়, তাঁহাদেরই রথ দেখা সফল হয়। আর পুরিধামে বাইয়া, একবার ত্রীজগন্নাথের রথযাত্রা যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, সে কখনও এ ভাবটি উগলকি করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সাহিত্যে বস্তুতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ

চৈত্রের “বঙ্গদর্শনে” রবীন্দ্রনাথের চরিতালেখ্য লিপিয়াছিলাম। ইহাতে কোনও কোনও দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টিতে বস্তুতত্ত্বের বিশেষ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এই কথা বলি। এ জন্ত রবীন্দ্রনাথের আসন্ন ভক্তগণের কেহ কেহ বড় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন দেখিয়া আমিও দুঃখিত হইয়াছি।

কারণ রবীন্দ্রনাথকে কোনও দিকে খাট করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না। রবীন্দ্রনাথের অলোকসাগরে কবিপ্রতিভার দ্বারা বাংলার মুখ উজ্জ্বল

হইয়াছে; আধুনিক বাংলা সাহিত্য কোনও কোনও দিকে বিশ্ব-সাহিত্যের সমাজে অতি উচ্চ স্থানে যাইয়া বসিবার অধিকার পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে খাট করিলে, ভারতীয় সাধনা ও বাঙালী জাতিকে খাট করা হয়।

কিন্তু সত্যের দ্বারা কেহ কখনও খাট হয়, বা হইতে পারে, অপরে যাই বলুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনওই এমন কথা বলিবেন না। আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি সর্বদা যদি বস্তুতত্ত্ব না-ই হইয়া থাকে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথের

কোনও দোষের কথাও হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব হইতেই সাহিত্য-সৃষ্টিতে বস্তুতত্ত্বহীনতার উৎপত্তি হয়। কোনও কোনও দিকে যদি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব হইয়া থাকে, তার জ্ঞান রবীন্দ্রনাথকে কেহ কোনও মতে দায়ী করিবে না। তিনি যে স্থানে, যে কালে, যে পরিবারে জন্মিয়াছেন, যে সকল বাহিরের অবস্থা ও ব্যবহার ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন, সে সকলই তার জ্ঞান দায়ী। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়া এ সকল অবস্থা ও ব্যবহার পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। আর এ জগতে সর্বত্রই ছায়াতপের ছায় ভাল ও মন্দ, পূর্ণ ও অপূর্ণ, মিশিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বাহ্য-ঘটনাপাত্রেও এ ভালমন্দের মিশ্রণ রহিয়াছে। এ সকল ঘটনা ও অবস্থাতে কোনও কোনও দিক দিয়া তাঁর অলোকসামাগ্র্য প্রতিভাকে যেমন কতকটা সংকুচিত করিয়াছে, আবার অল্প-দিকে সে ক্ষতিপূরণ করিয়াই যেন, তাহাকে বাড়াইয়া এবং ফুটাইয়াও তুলিয়াছে। এ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষগুণেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির বস্তুতত্ত্ব-হীনতা এ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থারই ফল। ইহাতে রবীন্দ্র প্রতিভাকে যে খাট করিয়াছে বা করিতে পারে, এমন কথা বলা যায় না। বস্তুতত্ত্বহীনতা সৃষ্ট, বস্তুকেই খাট করে, সৃষ্টিশক্তিকে খাট করে না, বরং কোনও কোনও দিক দিয়া বিচার করিলে, বাড়াইয়াই দেয় বলিয়া বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির বস্তুতত্ত্বহীনতা

তাঁর অলৌকিক কবিপ্রতিভার অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক প্রভাবেরই সাক্ষ্য দেয়, তার শক্তিহীনতার প্রমাণ প্রদান করে না। বস্তুতত্ত্বহীন বলিয়া কবি-প্রতিভার কখনও যে কোনও অগৌরব হয়, এমন মনে করি নাই।

ফলতঃ বস্তুতত্ত্ব কথাটার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়াই, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ আমার অঙ্কিত রবীন্দ্র-চরিত-চিত্র পড়িয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য যে বস্তুতত্ত্ব কথাটা সংস্কৃত। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে ইহার বহুল ব্যবহার রহিয়াছে। ভগবান ভাস্কর্য্যকার শারীরিক ভায়ে যখন-তখন এ কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। আর আমাদের শাস্ত্রে বস্তুতত্ত্ববিহীনতার একটা অতি মামূলী দৃষ্টান্ত “বন্ধ্যাপুত্রবৎ।” মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধটা এমন নিগূঢ়, এমন জটিল, এত বহুমুখী যে, যে রমণী কখনও সন্তান ধারণ করেন নাই, তাঁর পক্ষে প্রকৃত মাতৃস্নেহ বস্তুটী যে কি তার জানলাভ একেবারেই অসম্ভব। কচিং কোনও বন্ধ্য অপরের সন্তানকে আপনার প্রাণের সমুদায় স্নেহ ঢালিয়া দিতে পারেন, মায়ের চাইতে বেশি সম্ভরণে ও একাগ্রতা সহকারে তার সেবা শুশ্রূষা করিতে পারেন, কিন্তু সে স্নেহ যতই উদ্বেলিত ও অনাবল, সে সেবা যতই নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত হউক না, তাহা সন্তান-বতীর আপনার সন্তানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধকে কিছুতেই অধিকার বা উপলব্ধি করিতে পারে না। বাৎসল্য হিসাবে ইহা বস্তুতত্ত্ব নয়। কিন্তু বস্তুতত্ত্ব নয় বলিয়া ইহা যে কপট স্নেহ এমন কখনওই বলা যায় না।

আপন অধিকারে, নিজের স্বরূপে, এ বস্তু অতি সত্য ও ঠাণ্ডা। বস্তুতত্ত্ব আর অকপট এক কথা নয়।

অতএব রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-বিষয়ক বা স্বাদেশিকতা-সম্বন্ধীয় অনেক কবিতা ঠিক বস্তুতত্ত্ব নয়, এ কথা ঠিকিলে রবীন্দ্রনাথ অধার্মিক হইয়া ধর্মের ভান করিয়াছেন বা স্বদেশভক্তি না থাকিলেও তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এমন কিছুই বোঝায় না।

এমন কি ঠিক বস্তুতত্ত্ব নয় বলিয়া কোনও ভাব বা রস যে একেবারে মিথ্যা হয়, এমনও নয়। রজ্জুতে সর্পদ্রম হইলে প্রাণে যে ভ্রাসের সঞ্চার হয়, তাহা বস্তুতত্ত্ব নয়। কিন্তু সর্পজ্ঞানটা মিথ্যা বলিয়া, এই ভ্রান্ত-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহাও মিথ্যা, এমন কথা কেহ বলে না। তবে সত্য সর্পদর্শনে যে ভয়ের উদ্ভেক হয়, তাহা যেরূপ স্থায়িত্ব লাভ করে, রজ্জুতে সর্পদ্রমে যে ভয় জাগিয়া উঠে তাহা সে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় না। বস্তুতত্ত্ব রস বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া থাকে, বস্তুতত্ত্বতাহীন রস বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ মানস-কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। যথাযোগ্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যখন আমাদের চিত্তে কোনও রসের সঞ্চার হয়, তখন সে রসের বিকাশের ও পরিণতির একটা স্বাভাবিক ও সার্বভৌমিক ক্রমও প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে রস বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উঠে না, কেবল মানস-কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া জাগিয়া উঠে, তাহাতে এই সকল স্বাভাবিক ও সার্বভৌমিক বিকাশক্রমটা দেখা যায় না।

এই জ্ঞত বস্তুতত্ত্বতাবিহীন রসকে ব্যভিচারী রস বলে। ব্যভিচারী রসের স্থায়িত্ব থাকে না। একটা রস ফুটিতে না ফুটিতেই তার মধ্যে অপর বিপরীত রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর এই রসভঙ্গের দ্বারা কৈন রস ব্যভিচারী ও বস্তুতত্ত্বতাহীন এবং কৈন রস অব্যভিচারী ও বস্তুতত্ত্ব, ইহা অতি সুন্দররূপে ধরিতে পারা যায়।

সাহিত্যের বিষয় দুই শ্রেণীর। এক বাহিরের অবস্থা ও বাবস্থাদি, তিতির অন্তরের অনুভূতি ও রসাদি। আর এই দুই শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টে সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে। যে কখনও সমুদ্র দেখে নাই সে অপরের রচনায় সমুদ্রের যে সকল বর্ণনা পড়িয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া, আপনার কল্পনার সাহায্যে একটা সমুদ্রের ছবি যে আঁকিয়া তুলিতে পারে না, তাহা নয়। সেই অপার নোলামুখি দেখিয়া মানুষের প্রাণে যে সকল ভাব আপনি জাগিয়া উঠে, কল্পনাবলে যে সে ব্যক্তি সে সকল ভাবকেও জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে না, এমনও নয়। কিন্তু এ সমুদ্রেও তার সমুদ্রের ছবি যে কল্পিত, সত্য নয়, অধ্যাস-প্রতিষ্ঠিত, বস্তুতত্ত্ব নয়, একথা মানিতেই হইবে। সকলে ইহার এই মায়িকতা ও বস্তুতত্ত্বহীনতা লক্ষ্য নাও বা করিতে পারে। যারা কখনও সমুদ্র দেখে নাই, তাদের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু যারা সমুদ্র স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তাহাদের নিকটে এ ছবিটা যে আসল নহে ইহা ধরা পড়িবেই পড়িবে।

সেইরূপ যে সকল আন্তরিক রসের উপাদানে কোনও কাব্যসৃষ্টি রচিত হয়, তাহার বস্তুতত্ত্বতাও কবির অপরোক্ষ রসানুভূতির অপেক্ষা রাখে। এ অনুভূতি ব্যতীত যে এরূপ কাব্যসৃষ্টি হয় না, তাহা নয়। অনেক অবিবাহিত যুবকই আপনার যৌবন-সুখ-রস-প্রাচুর্য্যনিবন্ধন, মাধুর্য্যের একটা মনগড়া ছবি অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ এরূপভাবে মাধুর্য্যরসের কল্পিত-সন্তোগ সর্ব্বত্রই পূর্ব্বরাগের একটা অতি সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু এ সন্তোগ যতই গভীর ও প্রাণোন্মাদকারী হউক না কেন, বস্তুতত্ত্ব যে নয়, ইহা অস্বীকার করা অসাধ্য। আর বাসর-ঘরে যুন্দম্পতীর প্রথম মিলনে তাহাদের পরস্পরের দেহযুগ্মকে আশ্রয় করিয়া যে অশরীরী রস উছলিত হইয়া উঠে, তার সঙ্গে পূর্ব্বরাগের এই কল্পিত সন্তোগের প্রভেদ কোথায় এবং কি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতেই কেবল তাহা ধরা পড়ে। অনভিজ্ঞের পক্ষে ইহা বোঝা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি সাহিত্যের এই দুই রাজ্যকেই অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনি বহিঃপ্রকৃতির ও স্বদেশের সমাজ-প্রকৃতির, সাহিত্যের বহিঃরঙ্গের এই উভয় প্রকৃতিরই বিবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আর মানব-অন্তরের বহুবিধ রসাদির মনোহারিণী প্রতিমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর কোনও কোনও বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অপরোক্ষ অনুভূতি আছে; কোনও কোনও বিষয়ে নাই। যেখানে তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলী

এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও অপরোক্ষ অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, সেখানে এগুলি যেমন সুন্দর সেইরূপ সত্যোপেত এবং বস্তুতত্ত্বও হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল চিত্রের বিষয় সম্বন্ধে তাঁর নিজের কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অপরোক্ষ অনুভূতি নাই, কিন্তু তিনি আপনার অলোকসামান্য কবিপ্রতিভার অবটনঘটনপটীয়সী মায়ার সাহায্যে যে-গুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেগুলি কোনও কোনও স্থলে অতিশয় প্রাণোন্মাদ-কর হইলেও, সত্যোপেত এবং বস্তুতত্ত্ব হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার আলোচনা করিতে যাইয়া, “বঙ্গদর্শনে” আমি এই কথাই বলিয়াছিলাম। এমন মোজা কথাটাও যে রবীন্দ্রনাথের আসন্ন ভক্ত-সাহিত্যিকেরা বুঝিতে পারিবেন না, ইহা কল্পনাও করি নাই।

সাহিত্যের সৃষ্টি সাহিত্যিকের অপরোক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, একেবারে শূন্যের উপরে গড়িয়া উঠে না। এই জন্ত প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির একটা অতি ঘনিষ্ঠ ও অপাঙ্গী যোগ থাকিবেই থাকিবে। সাহিত্যিকের জীবনের সত্য অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিয়া কোথাও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মর্ম্ম ও মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির আলোচনা করিতে যাইয়া, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার অভিধানের সাহায্যেই এগুলির অর্থ ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এসবের বিগত আঘাত মাসের

“প্রবাসী”তে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী আমার রবীন্দ্র-চরিত-চিত্রের সমালোচনা করিতে যাইয়া, “আমি-সাহিত্য সমালোচনার বিশুদ্ধ রীতানুসারে” এই চরিত-চিত্র লিখি নাই, এ অভিযোগ কেন করিয়াছেন, বুঝিলাম না। সাহিত্য যে জীবন ছাড়া নয়, এ কথা লেখক নিজের স্বীকার করেন। তবে “সাহিত্য-রচয়িতার জীবনের ভাল-মন্দের সহিত তাহার সাহিত্য-সৃষ্টির একান্ত সম্বন্ধ নাই” ইহাই অজিত বাবু মনে করেন। অতএব কোনও সাহিত্যিকের সাহিত্য-সৃষ্টির সমালোচনাকালে এ ভাল-মন্দকে উপেক্ষা করিয়াই চলা আবশ্যক, নতুবা সে সমালোচনা ঠিক সাহিত্য-আলোচনার বিশুদ্ধ রীতি-সম্মত হয় না।

অজিত বাবু সাহিত্য সমালোচনার যে বিধান (canon) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা এখানে অসম্ভব এবং অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক। মাসিকের ক্ষুদ্র কলেবরে এ আলোচনার স্থান এবং আমার দৈনন্দিন কর্মের ব্যস্ততার মধ্যে ইহার সময় করিয়া উঠা সম্ভব নহে। এ আলোচনার পক্ষে যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, সে পাণ্ডিত্যও যে আমার নাই, অপরে জানুন বা না জানুন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবেরা ইহা জানেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চরিত-চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি দশ-আজার ফুট-ফিতা লইয়া যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের ভাল-মন্দের মাপ করিতে যাই নাই, ইহা তো অস্বীকার করা সম্ভব নয়! আমার নিকটে ভাল-মন্দটা বাহিরের বস্তু, নয়, ভিতরের বিধান।

প্রকৃতিভেদে, অবস্থাভেদে, অধিকারভেদে ভাল-মন্দের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ও একই ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার ধরিয়া থাকে। ত্রুট্যচারীর পক্ষে রমণীমুখদর্শন কেন, জ্রীলোকের ছায়াস্পর্শ পর্যন্ত অপরাধের কথা।

যে চিত্রকর ভ্রাতার চিত্রপটে বা মর্ম্মরথণ্ডে রমণী-রূপের অশরীরী মূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহারই ভিতর দিয়া মনুজ-মণ্ডলী মধ্যে “সুন্দরের” সংবাদ প্রচার করিবেন, তাঁর পক্ষে জীবন্ত রূপসীকে সম্মুখে করিয়া, তাঁর মুখ ধ্যান করিতে করিতে, মেরুপে তন্নয় হইবার জন্ত সর্ব্বপ্রকারের সাধন অবলম্বন না করাই অধর্ম্ম। খৃষ্টীয় জগতের ধর্ম্মনীতিও এখন প্রাচীন ইহুদার দশাজার মাপকাটিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক যুরোপের ধর্ম্মনীতি বা এথিকস্‌ও (Ethics) এখন আত্মচরিতার্থতা (Self-realisation) লাভকেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বা ভালমন্দ বিচারের একমাত্র কণ্ঠি-পাথর বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। ভারতের সনাতন সাধনা “ধর্ম্ম” বলিতে চিরদিনই একরূপ এই বস্তুকে বুঝিয়া আসিয়াছে। এই জন্তই ধর্ম্মকে “সর্ব্বেষাং ভূতানাং গধু” বলা হইয়াছে। আগাদের সাধনায় প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতিকে ফুটাইয়া তুলিয়া, সেই প্রকৃতির পরম পরিণতি ও চরম চরিতার্থতা লাভকেই ধর্ম্ম বলিয়া চিরদিন প্রচার করিয়াছে। সুতরাং কবির পক্ষে আপনার কবি-প্রকৃতির পরম পরিণতি ও চরম চরিতার্থতালাভই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম। কোনও

কাব্যসৃষ্টি এই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে কিনা করিয়াছে, ইহারই দ্বারা তাহার ভালমন্দের বিচার হইবে। এই কষ্টিপাথরেই আমিও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দশ-আঙ্গার ফুট-ফিতা ফেলিয়া তাঁর “জীবনের ভাল-মন্দের” কালি কবিতে যাই নাই।

কিন্তু বাহিরের ধর্ম্মাধর্ম্মের মাপকাটি দিয়া কবির জীবনের বা কাব্য-সৃষ্টির বিচার করা অসম্ভব বলিয়া তিনি জটিল মানব-জীবনের কোন্ বিভাগের কতটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, আর তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি কোথায় কি পরিমাণে এই সকল অপরোক্ষ অনুভূতির ফল, এবং কোথায় কি পরিমাণে কেবল আপনার মানস-কল্পনারই সৃষ্টি, তারও বিচার করা কি “সাহিত্য-সমালোচনার বিগ্ৰহ-রীতি”-সম্মত নহে? অজিত বাবু শেলির যে দুইটা চরণ উদ্ধার করিয়াছেন—

In many mortal forms I rashly
sought

The shadow of that idol of my
thought.

এই idol of my thought এই মানস-প্রতিমা কি শেলির অন্তরে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, না যে সকল মর্ত্যদেহের সঙ্গে তিনি বিবিধভাবে, বিবিধ রসের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই বরাঙ্গণী-দের বরবপুকে আশ্রয় করিয়াই তাঁর চিত্তে এই মানস-প্রতিমার আবির্ভাব হইয়াছিল? যে ভাবে শেলি এই সকল মর্ত্যদেহে তাঁর অমৃত মানস-প্রতিমাকে খুঁজিয়াছিলেন,

তাহা হয় ত খৃষ্টীয় সমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম-নীতির অনুমোদিত ছিল না। সুতরাং এই নীতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে, শেলির চরিত্র নিন্দনীয় হইতেও বা পারে। কিন্তু শেলির কাব্যের আলোচনায় সমাজ-নীতির এই সিদ্ধান্তের কোনও স্থান নাই। এখানে শেলি যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন, রসের ওজনে তাহা সত্য ও সুন্দর কিনা, ইহাই বিচার করিতে হইবে। আজন্ম ব্রহ্মচারী কার্ডিনাল নিউম্যান (Cardinal Newman) যদি এই কবিতাটী লিখিতেন, আর শেলি যদি কার্ডিনাল নিউম্যানের—

“Lead kindly Light”

এই বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতটী রচনা করিতেন, তবে এ দুটিকেই কি বস্তুতন্ত্রতাবিহীন বলা যাইত না? ভগবান শঙ্করাচাৰ্য্য যদি অলৌকিক কল্পনাবলে কালিদাসের উমার রূপবর্ণনাটী লিখিতেন, আর কালিদাস যদি শঙ্করের ‘মোহমুগ্ধর’ রচনা করিতেন, তবে এ সকলকে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও অপরোক্ষ রসানুভূতির কষ্টিপাথর দিয়া বিচার করিয়া, ইহাদের সত্যাসত্য ও ভাল-মন্দ নির্ধারণ করা কি “সাহিত্য-সমালোচনার বিগ্ৰহ-রীতি”-সম্মত হইত না? দাঁতের বিয়েট্রিস্ চণ্ডীদাসের রজকিনী রামা, বিভাপতির লক্ষ্মীবাই,—না থাকিলে কি কখনও ইঁহারা আপনাদের কাব্যসৃষ্টিতে এমন অমৃত রস ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন? সে অবস্থায় তাঁহাদের এই সকল অনুপম কাব্যসৃষ্টিও, যে বক্ষ্যাপুত্রবৎ বস্তুতন্ত্রতাবিহীন হইয়া পড়িত, ইহা স্বীকার করা অসম্ভব ও মান্ত

হুইটম্যান্ খৃষ্টীয়ান্ সমাজে জন্মিয়া, তাহারই অঙ্কে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে তিনি যে অদ্ভুত রসের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে খৃষ্টীয়ানী সাধনার সঙ্গতি নাই। এই আদর্শ পুরা-মাত্রায় প্যাগান (Pagan), খৃষ্টীয়ান্ নহে। রক্তমাংসের ভিত্তর দিয়া বিধাতা যে অপকৃপ রূপ ফুটাইয়া তুলেন, প্রাচীন গ্রীশ ও রোমই কেবল তাহাতে কোনও প্রকারের অতিলৌকিক অরূপকতা বা আধ্যাত্মিকতা আরোপ না করিয়া, রক্তমাংসের বলিয়া, রক্তমাংসরূপেই, এই মানুষী সৌন্দর্যের সাধনা করিয়াছিল। ইহাই প্যাগান-রূপ-সাধনা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ওয়ান্ট হুইটম্যান এই সাধনাকেই বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সাহায্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই অদ্ভুত কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে হুইটম্যানের প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়-ভোগ-চেষ্টার সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, এই অতি মোটা কথাটা না বুঝিলে, হুইটম্যানকে কেহ বুঝিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। হুইটম্যান্ প্রথম যৌবনে ব্রহ্মচারী বা পরজীবনে ব্রাহ্ম হইলে যে তাঁর অপূর্ণ কাব্য সকল রচনা করিতে পারিতেন না, ইহা বলা নিতান্তই নিশ্চয়োজন।

বাহিরের বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্তরের অপরোক্ষ রসানুভূতির সঙ্গে কবির কাব্যসৃষ্টির সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাদী, রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যেখানেই এই

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে আপনার কবিকল্পনাকে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁর কাব্যসৃষ্টি অলৌকিক উৎকর্ষ ও সত্য লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁর “পতিতা” শীর্ষক কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই কবিতাটির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, এমন কবিতা জগতের কোনও সাহিত্যে আছে কি না, জানি না। শুনিয়াছি ব্রাউনিং-এর কোনও কোনও স্থলে না কি ইহার আভাস মাত্র পাওয়া যায়। আর রবিবাবু যে এমন অল্পপম বস্তুর সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, ইহার দুইটা কারণ। এক তিনি কলিকাতায় জন্মিয়া, আশৈশব একরূপ কলিকাতাতেই বাড়িয়া উঠিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ তিনি হিন্দু, খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান নহেন। রবিবাবুর মনগড়া তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত যাই হউক না কেন, জীবের ভিতরেই যে অক্ষয় শিবস্বরূপ বাস করিতেছেন, তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এই ধারণা, সর্বদাই জাগিয়া আছে। “পতিতা” লোকচক্ষে পতিতা, সমাজে পরিত্যক্তা, অনার্য্যসেবিতা হইলেও ভাগবতী প্রকৃতিই বিগ্রহ বলিয়া, প্রকৃত-পক্ষে সে দেবতা, তার এই দেবভাব ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত, পাতিত্য-কর্মের পাপকলুষে আচ্ছন্ন হইয়া আছে মাত্র,— শুভযোগাযোগে যে সে অন্তর্নিহিত দেবতা সেই পতিতার মধ্যেই আত্মস্বরূপের প্রকাশ করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন।—এ বিশ্বাস কেবল হিন্দুরই আছে। * হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা, হিন্দুর পুরাণ,

* “ছেড়েছি ধরম, তা বলে ধরম
ছেড়েছে কি মোরে একবারেই।

হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর তন্ত্র, এমন কি হিন্দুর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম * পর্য্যন্ত—সকলে মিলিয়া অলঙ্কিতে এই ভাবটী জাগাওয়া রাখিয়াছে। রবিবার হিন্দু না হইলে, “পতিতার” অপূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপরাশিকে এমন ভাবে, ভক্ত্যবনতপ্রাণে, কখনই কুটাইয়া তুলিতে পারিতেন না। আর “পতিতার” ভিতরকার অল্পম শ্রীসম্পদ যেমন কবির জাতীয় সাধনা ও জাতীয় প্রকৃতি হইতে স্ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ এই অপূর্ণ ছবির চারিপাশের অবস্থার ও ব্যবস্থার সমাবেশও তাঁর ভদ্রাসনের আশে-পাশের দৃশ্য হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে এবং “পতিতার” চিত্রটী এমন অলোক-সামান্য উৎকর্ষ ও সত্যতা লাভ করিয়াছে। কলিকাতা সহরে, ধনীপরিবারে ভোগ-বিলাসের মধ্যে, যে স্থানে—

নাহিক করম, লজ্জা সরম,
জানিনে জনমে সতীর প্রথা,
তা বলে নারীর নারীঘটুকু
ভুলে যাওয়া সে কি কথার কথা।*

কেবল হিন্দুপতিতার পক্ষেই এই ভাবটী অনুভব করা সম্ভব। পতিতা হইয়াও তাহার ধর্ম্মকর্ম্মকে একেবারে পরিত্যাগ করে না। গঙ্গাস্নান ও বিবিধ ব্রতপূজা তাদেরও আছে। আর এ সকল বাহ্য ক্রিয়াকলাপের ভিতর দিয়া মানুষের প্রাণের অন্তর্নিহিত দেহভাবের সঙ্গে কতটা পরিমাণে যে অতিশয় ধর্ম্মকর্ম্ম-হীন লোকেরও একটা সম্পর্ক জাগিয়া থাকে, বহিঃস্থ খীন খুঁটান সাধনা এ কথা বোঝে না।*

* বিজ্ঞপ্তিপুণিকা পুষ্পমালা পতাকা
সদ্যুৎসাহঃ যুতং বা দধিমধুরজতম্
কাকনঃ গুরুধাত্বং দৃষ্টা শ্রদ্ধা
পতিয়া বা কলমিহ গভতে মানবঃ গন্তকামঃ।
হিন্দুকে বাতাকালে এই মন্ত্র পড়িতে হয়।

* রক্ত নিলয়ে
প্রদোপের পীত আলোক জ্বালা
যেখায় ব্যাকুল বন্ধ বাতাস
ফেলে নিখাস হতাশ-ঢালা।
রতন নিকরে, কিরণ ঠিকরে,
মুকুতা বলকে অলকপাশে,
মদির-শীকণ্ড সিন্ধু আকাশ
ঘন হয়ে যেন ঘেরিয়া আসে!—

তারি অনতিদূরে অধিকাংশকাল অতিবাহিত না করিতেন, বোলপুরের প্রান্তরে “শান্তি নিকেতনের” বিজনতার মধ্যে জন্মিয়া, আজন্ম সেইখানেই যদি বাস করিতেন, তবে তাঁর পক্ষে “পতিতা” লেখা যে অসম্ভব হইত, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

কিন্তু কেবল “পতিতার” চিত্রাঙ্কনেই যে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে অপূর্ণ বস্তুতন্ত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে। স্বর্গীয় মোহিত-চন্দ্র সেন সম্পাদিত রবিবারের “ফায়াগ্রস্” ‘নারী’ শীর্ষক প্রায় সকল কবিতাতেই সত্য ও সৌন্দর্য্যের এই মধুর সমাবেশ দোঁখতে পাওয়া যায়। ‘উর্বশী’ রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। জগতের আর কোনো সাহিত্যে ‘উর্বশী’র মত কোন কিছু আছে কি না সন্দেহ। থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ ‘উর্বশী’ হিন্দুর নিজস্ব বস্তু। ভিনাসের মত রূপসী হইয়াও ‘উর্বশী’ ভিনাস নহেন। আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টিতে রাংডার হ্যাগার্ডের ‘শী’তে (She) আমাদের ‘উর্বশী’র ছায়ার ছায়া একটু স্ফুটিয়াছে মাত্র বলিয়া মনে হয়। হ্যাগার্ড

‘শী’কেই পরবর্তী-উপস্থাসে *World's Desire*—‘বিশ্ববাসনা’ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু

.....বিকশিত বিশ্ব-বাসনার

অরবিন্দ মাঝখানে.....

রবীন্দ্রনাথ যে ‘উর্কশী’কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁর সঙ্গে হ্যাগার্ডের “শী”র কোনোই তুলনা হয় না। ফলতঃ রবিবাবুর অলৌকিক কবি-প্রতিভার অসাধারণ সৃষ্টিকুশলতা ‘উর্কশী’তে যেমন ফুটিয়াছে, তাঁর আর কোনো কবিতায় তেমন ফোটে নাই। এই সৃষ্টিকুশলতা জগতের অমর-কবিসমাজেও বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। রবিবাবুর অনেক কবিতার অপূর্ণ মাধুর্য্য, কেবল তাঁর অদ্ভুত শব্দসম্পদকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠে,—এগুলির সৌন্দর্য্য একান্তই প্রত্যাশক, অশরীরী, স্বপ্নদৃষ্টির ছায় এগুলি ছায়াময়ী। এই সকল কবিতায় অতৃপ্ত বাসনার জ্বলন্ত পিপাসা মাত্রই বাড়াইয়া দেয়, কোনও বিষয়ে সত্য ও পারিপূর্ণ তৃপ্তিদান করিতে পারে না। ‘উর্কশী’র মাধুর্য্য এ জাতীয় নহে। অথচ ‘উর্কশী’ সত্য সত্যই—

“অখিল মানস-স্বর্গে অনন্ত রঞ্জিনী”

‘স্বপ্ন-সঙ্গিনী’ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু ‘বিশ্ববাসনা’র এই স্বপ্নই যে সত্য, বাস্তবজীবনের সকল সত্য অপেক্ষা কম সত্য নহে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বেশী সত্য, রবীন্দ্রনাথ আপনার সৃষ্টিকুশলতাগুণে, ‘উর্কশী’র চিত্রে এই তত্ত্বটাই বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বস্তুতঃ কাব্য কাহাকে বলে, ‘উর্কশী’তে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই

তাহা দেখাইয়াছেন। বিশিষ্টের মধ্যেই যে নির্বিশেষ বস্তু আত্মগোপন করিতে যাইয়াই, নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন; সান্ত্বের মধ্যেই যে অনন্ত আপনাকে হারাইবার চেষ্টা করিয়াই পূর্ণতর, ফুটতররূপে আপনাকে ফিরিয়া পাইতেছেন; অনিত্যের চাক্ষু্যের মধ্যেই যে নিত্যত্বের নিত্যস্বরূপটী মির হইয়া “নির্কাতনিষ্কম্পপ্রদীপমিব” জ্বলিতেছে,—রবীন্দ্রনাথ সমষ্টিগত মানব-হৃদয়ের অতৃপ্ত-অনন্ত-রূপনিয়তির চিরন্তন-বিষয় রূপিনী ‘উর্কশী’র চিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন। এখানে অচ্চ কামনা-শূন্য কাম, সর্বসম্পর্কবিহীন কামিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার ধ্যান করিতেছে। এখানে রমণী—শুদ্ধ রমণীরূপে—আপনার নিত্য ও নিজস্ব স্বরূপটীতে পুরুষের—শুদ্ধ পুরুষের—সম্মুখে উপস্থিত। এখানে পতঙ্গ অগ্নির নিজস্বরূপের সাক্ষাৎকার পাইয়া আত্মহারা। জগতের সকল কাবই কোনও না কোনও ভাবে, রমণীরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ‘উর্কশী’র চিত্রে এ রূপটী যেমন করিয়া ধরিয়াছেন, সেক্ষণীয়র কি শৈলী, বায়রণ কি ত্রাউনিং, হাফেজ কি কি সাদি,—অথবা আমাদের কালিদাস বা ভবভূতি, জয়দেব বা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস বা আর কেহ তেমন করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন বালিয়া মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের ‘উর্কশী’ শ্রেষ্ঠতম কাব্য ও গভীরতম দর্শন।

‘উর্কশী’তে যাহা কবি অপূর্ণকলা-কুশলতা-সহকারে সূত্ররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, ‘নারী’ শীর্ষক ভিন্ন ভিন্ন

কবিতাগুলিতে তাহাকেই যেন স্বাক্ষর আকারে বিশদ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে আপনার চারি পাশের নিসর্গের ও মানবসমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অতীতের আপনার অন্তরের নিগূঢ়তম অপরোক্ষ রসালুভূতি—এই বিবিধ সত্যকে প্রায় করিয়া যেমন কবি তাঁর অপূর্ণ 'উর্ধ্বা'কে সেইরূপ এই 'নারী' শীর্ষক অনেক চিত্র ও চরিত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছেন ; এবং এইজন্য তাঁর 'উর্ধ্বা' যেমন গভীর বস্তুত্ব লাভ করিয়াছে, সেইরূপ তাঁর 'তোমরা ও আমরা', 'ব্যক্ত প্রেম', 'লজ্জিতা' এই সকলগুলিই অল্পম সৌন্দর্য্য ও বস্তুত্ব লাভ করিয়াছে। ফলতঃ নারী-হৃদয়ের গভীরতা ও রমণী-চরিত্রের দুর্ভেদ্য বিচিত্র রহস্য রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া নানাদিক্ দিয়া, নানাভাবে, ও বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, আর কোনও বাঙ্গালী কবি তাহা করিতে পারেন নাই। আর রবীন্দ্রনাথ যে কালে, যে দেশে, যে পরিবারে যে সমাজে অসাধারণ রূপগুণে বিভূষিত হইয়া গিয়াছেন, এবং যে সকল বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া জীবনের সমুদায় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহাকে

আশ্রয় করিয়াই তাঁর নারীচরিত্রগুলি এমন অপূর্ণসৌন্দর্য্য ও সত্যলাভ করিয়াছে।

আবার রবিবাবু অনেক সময় সুকোমল গোলাপদলে শয়ন করিয়া, বসন্তের মৃদু মলয় নিঃশ্বাস পান ও শরতের ফুল জ্যোৎস্নায় স্নিগ্ধ হইয়া কবি-কল্পনার এই সকল মাণ্ডলী উপকরণের সাহায্যেই অনেক কবিতাও রচনা করিয়াছেন। এই সকল কাব্য সৃষ্টি যতই সুন্দর হউক না কেন, বস্তুতঃ যে হয় নাই, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এই সকল কবিতার রচনার মিত্তি বিমানচারিণী ভাবুকতাকে যতই যুক্ত করুক না কেন, উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের রসপিপাসাকে কিছুতেই যে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না—ইহাও স্বাভাবিক করিতে পারা যায় কি ? *

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

* রবীন্দ্রবাবুর চরিত-চিত্র বাহির হওয়ার পর উহার সম্বন্ধে কোনও প্রকার বাদপ্রতিবাদ "বঙ্গদর্শনে" দেওয়া অনাবশ্যক হির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটি সেইজন্য অগ্রহায়ণের "বিজয়া"র জন্মই বিশেষ ভাবে লিখিত হয়, কিন্তু এই প্রবন্ধটি লেখা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল ইহা বাদ-প্রতিবাদ নহে এবং ইহাতে অনেক নুতন কথাও আছে, সেইজন্য লেখক মহাশয়ের সম্মতি-ক্রমে "বঙ্গদর্শনে"ও ইহা প্রকাশিত হইল। বঃ সঃ

সত্যী

তুমি জান কত ক্রটি, কত অপরাধ
ভরিয়াছে এ জীবন—সব জেনে শুনে
তবু মোরে ভালবাস শুধু নিজ গুণে।
হে প্রেমবারিষি মোর অসীম অগাধ,
আমার জীবন-তট বেড়িয়া ঘেরিয়া
আমারে বেঁধেছ তুমি চির-আলিঙ্গনে।
শত উপচারে তুমি দেহমন দিয়া

নিত্য মোর কর পূজা—আমি জানি মনে
সে নৈবেদ্য মোর নয় ; আমি মাটি খড়,
শুধু ভক্ত-হৃদয়ের মানসী প্রতিমা
প্রেমমস্তকে বাঁধা হেথা—আমি মৃত জড়।
যে প্রাণ আমাতে হেরি তুমি ধ্যানরতা
তোমার সাধনা বলে হে সতি আমার,
সে প্রাণ এ মৃত প্রাণে হবে কি সঞ্চার ?

অনুতাপ

তুমি জান কত তুমি দিয়েছিলে মোরে
তুমি জান কি তাচ্ছিল্য অবহেলা ভরে
বার্ষ করিয়াছি আমি আজীবন ধরে
তোমার স্নেহের দান । কি মোহের ঘোরে
কাটালাম এত বর্ষ নিশ্চেষ্ট অসার,
ধন্যহীন, কর্মহীন, আলস্যমগ্ন
শম্বকের মত শুধু ভায়ে আপনার ।

দিয়াছিলে বজ্র দেহ—আজি থরথর
অকাল বার্কক্য ভরে, বিমল প্রতিভা
নষ্ট আরসীর মত স্নান বিশ্বহীন ।
কি না তুমি দিয়াছিলে, আজি আছে কি বা
শুধু ধ্বংস-অবশেষ, সর্বস্বাস্ত দীন
আপনার কর্মবশে । ওগো মহারাজ,
হের আজি কুপ্ত্রের ভিখারীর সাজ !
শ্রীহরেশ্বর শর্মা ।

অভিসারিকা

এতদিনে দিলে ধরা মোর বাহুপাশে,
মোর বক্ষে আশ্রয়হারা হে অগুরাগিনী
হে মোর প্রণয়বধূবিমুগ্ধা হরিলী
ত্রাস্ত ভীত যুগপদে কপিত নিখাসে
বনবনাস্তর হ'তে মোর কাছে আসি
আপনারে অবহেলে করিলে বন্দিনী ।
লজ্জা দ্বিধা শঙ্কাকুলা হে অভিসারিনী,

প্রতিকূল পবনের বাধাংশি নাশি'
কুল হ'তে স্রোতমুখে অকুলের পানে
তরীখানি লীলাভরে দিলে হাশাইয়া
অপূর্ব তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া
দূর পর পার হ'তে আসিলে এখানে
উদাসীর দীপহীন ক্ষুদ্র এ কুটারে
প্রেমের সন্ন্যাস লয়ে পশিলে সুধীরে !
শ্রীহরেশ্বর শর্মা ।

পুনঃ সংসারী

বহুদিন পরে পুন পল্লীপ্রান্ত পথে
ফিরিতেছি সেবি' স্নিগ্ধপ্রভাতসমীর,
হেনকালে সবিস্ময়ে হেরি সে কুটার,
জীর্ণ, ভগ্ন, পরিত্যক্ত, জঙ্গলে অশুধে
সযাক্ষর ধ্বংসশূন্য, নব-সংস্কারে
লভিয়াছে পুনর্জন্ম ।—কুটস্থ নবীন
ঘনপর্ণ বিরচিত, প্রাক্ষণ মাঝারে

তুলসী বেদিকা দিন্য, সুখে সমাসীন
রোমস্থ করিছে গাতী, মালক্য ভরিয়া
রাশি রাশি গন্ধ শোভাবর্ণের বিকাশ ।
আবেশে ভরিল চিত্ত, মুগ্ধ মোর হিয়া
পল্লীর আলোখ্যপটে নিজ ইতিহাস
আপন জীবনচ্ছবি হেরিল মধুর,
নূতন মন্দিরখানি নূতন বধুর ।
শ্রীহরেশ্বর শর্মা ।





বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

অষ্টম অধ্যায়

টোলভঙ্গ ও কৌতূহল

নিমাই গৃহে প্রত্যাগত হইলে সকলেই তাঁহার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। প্রাণ্ডিত্য-গর্ব-ক্ষীত যুবকের সে বিদ্যার অভিমান আর নাই। তাঁহার বিনীত ব্যবহারে বঙ্গবান্ধব সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিলেন। বহুলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল, নিমাই সকলেরই সহিত যথাযোগ্য সন্তাষণ করিলেন। আর সকলে প্রস্থান করিলে কতিপয় বিক্ষুব্ধ গয়ার রক্তান্ত সর্বিশেষ শুনিতে চাহিলেন। গয়াধামের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া নিমাই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরাম ধারা বহিতে লাগিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল ও থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তিনি কেবল “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সময়ান্তরে সর্বিশেষ বর্ণনা করিবেন বলিয়া নিমাই বঙ্গগণকে বিদায় দিলেন। শচীদেবী পুত্রের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া অমঙ্গলাশঙ্কায় গৃহদেবতা গোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন।

দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপস্থ বৈষ্ণবগণের

মধ্যে নিমাইর ভাবাবেশের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল—শুনিয়া সকলেই পরমক্ষুণ্ণ হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রার্থনা করিলেন “শ্রীকৃষ্ণ আমাদের গোত্রয়ুদ্ধি করুন।” পরদিন বৈষ্ণবগণ শুক্লাক্ষরতন্ত্রচারীর গৃহে সমবেত হইলে, নিমাই তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণব দর্শনে তাঁহার ভক্তি উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং তিনি “হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ” বলিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণের মধ্যে তখন প্রেমের বন্যা ছুটিল—সকলে নিমাইর সঙ্গে সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাইর ক্ষণে মুচ্ছা, ক্ষণে চেতনা হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন “নন্দগোপনন্দনকে আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।”

এইভাবে কিছুদিন গেলে নিমাইর অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইকে পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিতে অস্বরোধ করিলেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিমাই মুকুন্দ সঙ্করের গৃহে অধ্যাপনার্থ গমন করিলেন। কিন্তু

অধ্যাপনা করিবে কে ? অধ্যাপক নিমাই
গয়াধামেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এ যে
ভক্তিপাগল নিমাই—ইহার মুখে যে কৃষ্ণ
ভিন্ন কথা নাই, মনে যে কৃষ্ণ ভিন্ন
চিন্তা নাই। শিষ্যগণ পুঁথি খুলিয়া পাঠ
আরম্ভ করিলেন, ক্রিষ্ট পাঠ লইবার সময়
অধ্যাপকের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন
তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তাঁহার লক্ষ্য
করিলেন 'হরি'নাম উচ্চারিত হইতে
শুনিয়াই নিমাইর সংজ্ঞালোপ হইল।
সংজ্ঞা লাভ করিয়া পাঠ ব্যাখ্যা করিতে
করিতে নিমাই হারিগুণকীর্তন আরম্ভ
করিয়া দিলেন, আবার ক্ষণকাল পরেই
লজ্জিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি
কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন কি না।
দ্বিবশান্তে নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন সেদিন
তিনি কিরূপ পাঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
শিষ্যগণ উত্তর করিলেন “আজি আপনার
মুখে কৃষ্ণ নাম ভিন্ন আর কিছুই স্মরিত হয়
নাই।” পরদিন টোলে গিয়া নিমাই
পূর্বেরই মত কৃষ্ণগুণ কীর্তন করিতে আরম্ভ
করিলেন। শিষ্যগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া
পড়িল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল,
অধ্যাপনা হইল না। এক দিন “সিদ্ধবর্ণ-
সম্মায়” শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসিত হইয়া নিমাই
উত্তর করিলেন “নারায়ণ সর্ববর্ণে সিদ্ধ।”
শিষ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল “বর্ণ কিরূপে
সিদ্ধ হইল ?” নিমাই উত্তর করিলেন “কৃষ্ণ
দৃষ্টিপাত বশতঃ।” তখন
শিষ্যবলে “পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর”।
প্রভু বলে “সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ॥

কৃষ্ণের ভজন করি সম্যক আশ্রয়।

আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণ ভজন বুঝায় ॥

শিষ্যগণ ভাবিলেন, নিমাইর বাস্তুরোগ
হইয়াছে; তাহার পুস্তক বন্ধ করতঃ গঙ্গা-
দাস পণ্ডিতের নিকট যাইয়া সবিশেষ বর্ণনা
করিলেন, এবং তাঁহার উপদেশ মত
নিমাকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন।
অধ্যাপকের নির্বন্ধাতিশয়ো নিমাই ভাল
রূপ পড়াইতে প্রতীক্ষিত হইলেন।

নিমাই টোলে যাইয়া পূর্বেরই মত
গর্বের সহিত অধ্যাপনা আরম্ভ
করিলেন। শিষ্যগণ আশাবিহীন হইল এবং
নবোৎসাহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। পাঠ
দেওয়া শেষ হইলে, বিদ্যাহীন ভট্টাচার্য্য-
দিগকে লক্ষ্য করিয়া নিমাই বলিতে
লাগিলেন “যাহাদের সন্ধিজ্ঞান নাই, কলি-
যুগে তাহারাই ভট্টাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত,
যাহাদের শব্দ জ্ঞান নাই, তাহারাই তর্ক করে।
আমার খণ্ডন ও স্থাপনের অগ্রথা করিতে
পারে, নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত কে আছে ?”
এই গর্বিত বচন সম্পূর্ণ উচ্চারিত হইতে না
হইতেই নিমাই শুনিতে পাইলেন দূরে
রত্নগর্ভ আচার্য্য পাঠ করিতেছেন—

“শ্রামঃ হিরণ্যপরিধিং বনমালাবর্হী

ধাতু প্রবাল নটবেশমমুত্রতাংশে।

বিহস্তহস্তামিতরেণ ধুনানমজ্জং

কর্ণোৎপলালক-কপোল মুখাজ্জহাসং ॥”

অমনি দেখিতে পাইলেন, বনমালা
শিথিপুচ্ছ ধাতু প্রবাল শোভিত নটবেশধারী
উৎপলশোভিত শ্রবণবৃগলী কুঞ্চিতালক-
কপোল, পীতাম্বর, শ্রামসুন্দর এক হস্ত সহস্র
স্বক্কে বৃত্ত করিয়া, দ্বিতীয় হস্তে লীলাকমল

সঞ্চালন করিতেছেন ; তাঁহার বদনকমল
সুমধুর হাস্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই
ভুবনমনোহর মূর্তি মানসচক্ষুতে প্রত্যক্ষ
করিয়া নিমাই সংজাহীন অবস্থায় ভূতলে
পতিত হইলেন। শিষ্যগণ স্তব্ধ হইয়া রহিল।
ক্ষণেক পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করতঃ নিমাই
“বোল বোল” বলিয়া গড়াগড়ি যাইতে
লাগিলেন। তাঁহার নয়নজলে ভূমিতল
প্রাবিত হইল। তাঁহার সর্ব্ব রংর কঁপিতে
লাগিল। রত্নগর্ভ আচার্য্য এই দৃশ্য দূর হইতে
দেখিয়া ভাগবতের আরও শ্লোক আবৃত্তি
করিতে লাগিলেন। নিমাই ছুটিয়া গিয়া
তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন
প্রভু বোলে “বোল, বোল,” বোলে বিপ্রবর।
উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণসুখ মনোহর।
লোচনের জলে হইল পৃথিবী সিক্ত।
অশ্রু কম্প পুলক সকল সুবিদিত ॥

ক্ষণেক পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া
নিমাই শিষ্যগণকে কহিলেন “আমি কি
কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?” তখন
শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণার্থ গঙ্গা-
তীরে গমন করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া নিমাই
পুনরায় পড়াইতে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার
মুখ হইতে কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই বাহির
হইল না।

পড়ুয়া সকল বোলে “ধাতু” সংজ্ঞা কার ?
প্রভু বোলে “ত্ৰীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার।”
ধাতুসূত্র বাখানি শুনহ তাই গণ।
দেখি কার শক্তি আছে, করুক খণ্ডন ॥
যত দেখ রাজা—দিব্য দিব্য কলেবর।
কণক ভূষিত—গন্ধ চন্দনে সুন্দর ॥

‘যম লক্ষ্মী বাহার বচনে’ লোক কহে।
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়ে ॥
কোথা যায় সৰ্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কেহো ভাঙ্গাকার, কারে এড়েন পুড়িয়া ॥
সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণ শক্তি।
তাহা সনে করে স্নেহ, তা হ’লে সে ভক্তি ॥
এবে যারে সন্মার করি মাতৃজ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিয়া করি স্নান ॥
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা সুখে।
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে।
ধাতু সংজ্ঞা কৃষ্ণ শক্তি বলন্ত সত্য।
দেখি ইহা হৃদুক, আছয়ে শক্তি কায় ॥
এই মত পবিত্র পুজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি
হেন কৃষ্ণে ভাই সব কর দৃঢ় ভক্তি
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান ॥

কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বোলো “কৃষ্ণে দেহ মন।”

এইরূপ কৃষ্ণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে
করিতে দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, শিষ্য-
গণ মুগ্ধ হইয়া একমনে শুনিতে লাগিল
অবশেষে বিখকর্ত্তা প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—“আমি কিরূপে ধাতুসূত্র ব্যাখ্যা
করিয়াছি?” শিষ্যগণ উত্তর করিলেন “যাহা
বলিলেন সবই সত্য। তবে আমাদের যে
উদ্দেশ্যে পড়া তদনুরূপ অর্থ হয় নাই।” তখন
নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমাদের কি
মনে হয় আমাদের বায়ুরোগে ধরিয়াছে।”
শিষ্যগণ উত্তর করিলেন “এক হরিনাম ভিন্ন
আপনার মুখে আর কিছুই উচ্চারিত
হইতেছে না। সূত্র, ব্যক্তি, টীকা সর্ব্বত্রই

কেবল কৃষ্ণনামই আপনি ব্যাখ্যা
করিতেছেন, আমরা ত আপনার ব্যাখ্যার
কিছুই বুঝিয়া উঠিতেছি না। এই দশদিন
আমাদের পড়াশুনা কিছুই হয় না।” তখন
প্রভু বোলে ভাই সব कहিলা সুসত্য।

আমার এ সব কথা অশ্রুত অকথ্য।

কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।

সবে দেখে তাই ভাই বোলে সবাঁকায় ॥

যত শুন শ্রবণে সফল কৃষ্ণ নাম।

সকল ভুবন দেখে গোবিন্দের ধাম ॥

তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।

আজি থেকে আর পাঠ নাহিক আমার ॥

তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।

তার ঠাই পড় আমি দিলাম নির্ভয় ॥

সাক্ষনয়নে এই বলিয়া নিমাই পুঁথিতে

ডোর বাঁধিলেন। শিষ্যগণ রোদন করিতে

করিতে বলিলেন “আপনার কাছে যাহা

পড়িয়াছি তাহা আর কোথায় পাইব। আর

কাহাকেও আমরা গুরু বলিয়া স্বীকার

করিতে পারিব না।” এই বলিয়া শিষ্যগণও

পুঁথিতে ডোর দিয়া হরিধ্বনি করিয়া

উঠিলেন। নিমাই সকলকে কোলে করিয়া

রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে

সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন

“তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হউক। তোমরা

শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ কর। তোমাদের

বদন হইতে সর্বদা কৃষ্ণনাম স্মৃতি হউক।

কৃষ্ণ তোমাদের সকলের ধনপ্রাণ স্বরূপ

হউন।” নিমাই আবার कहিলেন “ভাই

সব, তোমরা আমার জন্মজন্মান্তরের বান্ধব!

আমরা সকলে এক ঠাঞি মিলিয়া

কৃষ্ণনাম করিব।” গুরুর আন্তরিক আশী-

র্বাদ শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণের নয়ন অশ্রুতে
ভরিয়া উঠিল। নিমাই পুনরায় বলিতে
লাগিলেন “আমরা এতদিনে কেবল পাঠই
করিয়াছি। এস এখন শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন
আরম্ভ করি।” শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন
“সংকীর্তন কিরূপ?” তখন স্নমধুর কণ্ঠে

“হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥”

এই পদ গাহিতে গাহিতে নিমাই হাতে

তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ

তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহারই

ভাবে অহুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই

মত নাচিতে লাগিল। ভাবাতিশয্য

বশতঃ নিমাই ধূলায় বিলুপ্ত হইয়া

পড়িলেন। তখন তাঁহার মুখ হইতে কেবল

“বোল, বোল” ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল।

কীর্তনের রোল নবরীপের জনকোলাহল

ভেদ করিয়া উথিত হইল। দলে দলে লোক

ব্যাপার কি দেখিবার জন্ম সমাগত হইল।

আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলে

বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাহারা

দেখিতে পাইল—উদ্ধতের শিরোমণি পরম

চঞ্চল দান্তিক নিমাই পণ্ডিত অতি দীন

ও কাতর ভাবে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া রোদন

করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুজলে ভূমিতল

সিক্ত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়

ভক্তি-বিকার ও অদ্বৈত-মিলন

বৈষ্ণবগণ নিমাইর তন্ত্রের প্রাণল্য
দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। গঙ্গার
খাটে অনেক বৈষ্ণবের সহিত নিমাইর

দেখা হইত—নিমাই সকলকেই ভক্তির
সহিত নমস্কার করিতেন। “কৃষ্ণের প্রতি
তোমার অচলা ভক্তি হউক” বলিয়া
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তাঁহাকে আশীর্বাদ
করিতেন। আশীর্বাদ শ্রবণ করিয়া নিমাইর
হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।
বৈষ্ণবগণ আক্ষেপ করিয়া বলিতেন
“এই নবদ্বীপে বাপ যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক ॥
কি সন্ন্যাসী কি তপস্বী কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত ॥
কেহো না বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীৰ্ত্তন।
না করুক ব্যাখ্যা আরো নিন্দে সর্বক্ষণ ॥
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বোল ধরে।
তৃণজ্ঞান কেহো আমা সন্তারে না করে ॥
সম্ভাপে পোড়য়ে বাপ সবদহ ভার।
কেথা হো না শুনি কৃষ্ণ কীৰ্ত্তন প্রচার ॥
এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সবারে।
এ পথে প্রতিষ্ঠ করি দিলেন তোমারে ॥
তোমা হইতে হইবেক পাসণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিল নিশ্চয় ॥
চিরজীবী হও তুমি বলি কৃষ্ণ নাম।
তোমা হইতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণ গ্রাম ॥”
ভক্তগণের দুর্দশার কথা শুনিয়া নিমাইর
মন বিষাদে আকুল হইয়া উঠিত। এবং
তিনি নির্জনে বসিয়া এই দুর্দশার কথা
চিন্তা করিতেন।

এক দিন গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত
হইয়া নিমাই ছ্কার করিয়া উঠিলেন।
শচী দেবী দৌড়িয়া গিয়া দেখিলেন
নিমাই একদার হাঙ্গ করিতেছেন, পরক্ষণেই
ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছেন। কখনও বা

“সব সংহার করিব” বলিয়া ছ্কার
করিতেছেন, কখনও বা “মুঁই সেই, মুঁই
সেই” বলিয়া মূচ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন।
মহা ব্যাকুল হইয়া শচী প্রতিবেশিগণকে
পুত্রের আচরণের কথা জ্ঞাপন করিয়া
কহিলেন

বিধাতায় স্বামী নিল, নিগ পুত্রগণ
অবশিষ্ট সকলে আছে একজন ॥
তাহারও কিরূপমতি বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মূচ্ছা পায় ॥
আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা !
ক্ষণে বলে ছিঙো ছিঙো পাসণ্ডীর মাথা ॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে ॥
দন্ত ক'মড়ি করে মাল সাট মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না ক্ষুরে ॥

প্রতিবেশিগণের কেহ কেহ নিমাইর
অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বায়ুব্যাধি হইয়াছে
বলিলেন, এবং তাঁহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া
রাখিতে পরামর্শ দিলেন। কেহ কেহ
শিষ্যস্বত, কেহ বা নানাবিধ পাকতৈলের
ব্যবস্থা করিলেন। স্নেহময়ী জননী কিং-
কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোবিন্দের শরণ গ্রহণ
করিলেন।

প্রতিবেশিগণের উপদেশ ও জননীর
মলিনমুখ দেখিয়া নিমাই বড়ই কাতর হইয়া
পড়িলেন। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার
গৃহে আগমন করিলে নিমাই কহিলেন
“শ্রীবাস সকলেই কহিতেছে, আমার বায়ু-
ব্যাধি হইয়াছে, তুমি কি মনে কর ?” শ্রীবাস
হাসিয়া উত্তর করিলেন “তোমার যদি বায়ু-
রোগ হইয়া থাকে, তবে ভগবান করুন

আমারও যেন এই রোগ হয়। তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিপুল রূপা দেখিতে পাইতেছি। তোমার শরীর মহাভক্তিযোগ লক্ষিত হইতেছে।” নিমাই আনন্দাপ্লুত হইয়া শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন “তুমি যদি আমার বায়ুরোগ বালিতে, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতাম।” শ্রীবাস কহিলেন “পায়ণ্ডীগণ যাহাই বলুক না কেন, আমরা সকলে মিশিয়া একত্র কীৰ্ত্তন করিব।” অতঃপর শচীদেবীকে পুত্রের প্রকৃত অবস্থা অবগত করিয়া শ্রীবাস গৃহে গমন করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে পরমভক্ত গদাধরকে সঙ্গে লইয়া নিমাই অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তখন তুলসী-বৃক্ষে জল সেচন করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে বাহু তুলিয়া হরি বলিতেছিলেন।

সাত আট বৎসর বয়সে অগ্রজ বিশ্বরূপকে ডাকিবার জন্ত নিমাই মাঝে মাঝে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিতেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্য বাগকের অলোক-সামান্য রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিবার পরে নিমাইর পরিবারের উপর দিয়াকৃত ঝঙ্কাবাত বহিয়া গিয়াছে। অদ্বৈতের সহিত নিমাইর ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইবার কোনও কারণ এতদিন হয় নাই। গয়া হইতে নিমাই প্রত্যাগত হইবার পরে তাঁহার প্রকৃতি-পরিবর্তন-সংবাদ অদ্বৈতাচার্য্য শ্রুত হইয়াছিলেন। নিমাইর কৃষ্ণোদ্ভাদ-সংবাদে বিশ্বাসে অতিভূত হইয়াছিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ

করিতে করিতে স্থান বিশেষে অর্থ ভাগরূপ বুঝিতে না পারিয়া আচার্য্য এক দিন মনোহুঃখে উপবাস করিয়াছিলেন। রাত্রি কালে স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে সেই স্থানের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বলিতেছে “আচার্য্য শীঘ্র উঠিয়া ভোজন কর। তুমি যাহার জন্ত এত দিন অপেক্ষা করিয়া আছ, যাহাকে জানিবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন। এখন দেশে দেশে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে কীৰ্ত্তন শ্রুত হইবে। শ্রীবাস পুণ্ডিতের ঘরে বৈষ্ণবগণ দেবহুর্ভব দৃশ্য দর্শন করিবে। এখন আমি চলিলাম, আবার আসিব।” নয়ন উন্মীলন করিলামাত্র নিমাইর গৌরমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন সমীপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অচিরেই সে মূর্ত্তি বাতাসে মিলাইয়া গেল। আচার্য্য বিশ্বাসবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

স্বপ্নের কথা অদ্বৈতাচার্য্য যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন নিমাইর প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তবে কি তাঁহার প্রার্থনা এত দিনে ভগবৎচরণে স্থান পাইয়াছে, তক্তের হৃদশা অবলোকন করিয়া ভক্তবৎসলের আসন কি টলিয়াছে, ধর্ম্ম জ্ঞান দেখিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনেচ্ছা কি এতদিন পরে তাঁহার মনে উদ্ভিত হইয়াছে—ইত্যাদি কত চিন্তাই তাঁহার মন আন্দোলিত করিতে লাগিল। আশা ও সংশয়ে তাঁহার মন অনবরত আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র—শৈশবেই যে তাঁহাকে দেখিয়া এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁহার মন পরিপূরিত হইয়াছিল—সেই

কি তাঁহার প্রাণেশ্বর? কিন্তু অদ্বৈত যে অতি ক্ষুদ্র—অতি হীন। অদ্বৈতের প্রার্থনায় তিনি অবতার গ্রহণ করিবেন, এত কি সম্ভবপর? কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও অদ্বৈত যে তাঁহারই কিঙ্কর—তাঁহার ধর্মসংস্থাপনার্থই ত অদ্বৈত তাঁহাকে এতদিন ধরিয়া ডাকিয়াছে। ভক্তবৎসল তিনি—ভক্তের নিঃস্বার্থ প্রার্থনা তিনি ত যুগে যুগেই সফল করিয়াছেন। তবে অদ্বৈতের প্রার্থনা কেন সফল হইবে না? এবম্বিধ চিন্তায় অদ্বৈত সময়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। কিন্তু স্বীয় মানসিক অবস্থা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। নানা জনে আসিয়া তাঁহাকে নিমাইর অদ্বৈত কাহিনী শুনাহঁত। তিনি স্বীয় ভাব গোপন করিয়া বলিতেন “নীলাম্বর চক্রবর্তীর দোহিত্র ও জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের ত ভক্তমান্ হওয়াই উচিত।”

আজ নিমাই স্বয়ং তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। আচার্য্যকে দেখিয়াই নিমাই মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আচার্য্য পাণ্ড, অর্ঘ্য প্রভৃতি লইয়া নিমাইর পূজা করিলেন এবং

নমো এক্ষণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ,

জগদ্বিত্যয় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার নয়নজলে নিমাইর চরণ সিক্ত হইয়া গেল। গদাধর সশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন “আচার্য্য বালকের প্রতি এতাদৃশ আচরণ যুক্তিস্থত নহে; অদ্বৈত ভক্তগদগদস্বরে উত্তর করিলেন “এ কেমন বালক, দিন কতক পরে জানিতে পারিবে।” নিমাই

চৈতন্যলাভ করিয়া আচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করতঃ নানাভাবে তাঁহার স্তুতি করিলেন। বহুক্ষণ আনন্দে কাটিয়া গেল। অবশেষে সর্বদা তাঁহার দর্শনলাভেচ্ছা ব্যক্ত করিয়া এবং তদর্থে তাঁহার প্রতিশ্রুতি লইয়া আচার্য্য নিমাইকে বিদায় দিলেন।

নিমাই প্রস্থান করিলে অদ্বৈতচার্য্য মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন “মতাই যদি ইনি আমার গুডু হন, তাহা হইলে আমি যেখানেই থাকি, ইনি আমাকে নিশ্চয়ই আপনার পাশে লইয়া আসিবেন।” এবং নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জ্ঞাত শান্তিপুত্র স্বকীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর নিমাই প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কীর্তন কালে তাঁহার অশ্রু, কম্প, পুলক, হৃদয়, ক্ষণে শুভ্রাকৃতি শরীর, ক্ষণে নবনীত কোমল দেহ দেখিয়া ভাগবতগণ নানা কথা বর্ণনাবলি করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন “ইনি অংশাবতার”, কেহ বলিলেন “ইহার শরীর শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল,” আবার কেহ কেহ তাহাকে শুক, প্রহ্লাদ অথবা নারদের অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ভাগবত গৃহিণীগণ বলিতে লাগিলেন “শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন।” কীর্তনকালে মুচ্ছান্তে বাহুজ্ঞান লাভ করিয়া নিমাই সকলের গলা ধরিয়া অতি করুণভাবে রোদন করিতেন। একদিন বজ্রগণ এই কাতর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নিমাই কহিলেন

“কানাইর নাটশালা নামে এক গ্রাম।

গয়া হইতে আসিতে দেখিগু সেই স্থান ॥

তমাল শ্রামল এক বালক সুন্দর ।

নবগুঞ্জা সহিত কুণ্ডল মনোহর ॥

বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তহুপরি ।

ঝলমল মণিগণ লঙ্কিতে না পারি ॥

হাথেতে মোহন বংশী পরম সুন্দর ।

চরণে হুপুর শোভে অতি মনোহর ॥

নীলসুত্ত জিনি ভুঞ্জে রত্ন অলঙ্কার ।

শ্রীবৎস কৌন্তভ বন্ধে শোভে মণিহার ॥

কি কহিব সে পীতধটির পরিধান ।

মকর কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান ॥

আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে ।

আমা আলিঙ্গিয়া পলাইল কোন্ ভিতে ॥

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিঃ নিমাই যখন বোদন

করিতেন, তখন তাঁহার আর্তি দেখিয়া

সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত । একদিন

“গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা,
কোথা কৃষ্ণ আমার শ্রামল পীতবাসা।”

গদাধর কহিলেন “কৃষ্ণ ত নিরবধি তোমার
হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন।” এই কথা
শুনিয়া নিমাই নথ দ্বারা স্বীয় হৃদয় বিদীর্ণ
করিতে উদ্রত হইলেন । গদাধর অতি
কষ্টে তাহাকে নিরুত্তর করিলেন ।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপের সকল ভক্ত
নিমাইর গৃহে আগমন করিতে লাগিলেন ।
মুকুন্দ দত্ত ভক্তিরসাল শ্লোক পাঠ করিয়া
তখন নিমাইর চিত্তবিনোদন করিতেন ।
মুকুন্দের কণ্ঠধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই
নিমাই ভাববিষ্ট হইয়া পড়িতেন । কীর্ত্তন ও
নৃত্যে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইতে
লাগিল । (ক্রমশঃ)

শ্রীতার ঞ্চন্দ্র রায় ।

নারীধর্ম্ম

কুমারী

জীবনের কর্তব্যসাধনের উপযোগী শিক্ষা-
লাভের সময় বাল্যকাল, স্মৃতির ভবিষ্যৎ-
জীবনে রমণীকে যে গুরুতর কর্তব্যভার
মস্তকে বহন করিতে হইবে, শিক্ষার দ্বারা,
সাধনার দ্বারা তাহার জ্ঞান প্রস্তুত হইবার
ইহাই উপযুক্ত সময় ।

পূর্বেই বলিয়াছি—সংসারের সমস্ত
পরিজনের ধর্ম্মোন্নতিসাধন সকলকে ধর্ম্ম-
সাধনে অবসর দিবার জ্ঞাত জীবন-সংগ্রামের
কঠোরতা দূর করিয়া সংসারে শাস্তি
সংস্থাপন এবং গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা দ্বারা

সকলের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-
সম্পাদন—ইহাই রমণী-জীবনের প্রধান
ব্রত ।

এই মহান ব্রত পালনের জ্ঞাত সর্ব্বপ্রথমে
আবশ্যক—সংযম ধৈর্য্য এবং প্রীতি ।

যাঁহাকে উন্নার্গগামী পরিজনকে দৃঢ়রূপে
আকর্ষণ করিয়া রাখিতে হইবে, তাঁহার
নিজেকে অটল রাখা সর্ব্বাঙ্গে প্রয়োজন ।
আকর্ষণকে নিজেকে চঞ্চল হইলে আকৃষ্ট
বস্তু কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেনা ।

গৃহের যিনি অধিষ্ঠাত্রী তিনি অসংযত

বা অধীর হইলে সে গৃহে শান্তি কখনই সম্ভব হয় না।

আকর্ষণের অগ্রনাম প্রীতি। প্রীতির বলেই মানুষ মানুষকে আপনার করিয়া লইতে পারে। সুতরাং সকলকে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্ত পরিপূর্ণ প্রীতির প্রয়োজন। ভালবাসার গুণেই মানুষ মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে, সুপথে চালনা করিতে পারে, সমুন্নত করিতে পারে।

কিন্তু এই উদার প্রীতি, অটল ধৈর্য্য, অবিচলিত সংঘম ধর্মসাধন বাতীত লব্ধ হইবার নহে। ধর্মই মানুষকে ত্যাগশীল করে, স্বার্থ বিসর্জন করিতে শিক্ষা দেয়, বাসনাকে সংযত করে। সুতরাং ধর্ম-শিক্ষাই নারীজীবনের সর্বপ্রথম শিক্ষা হওয়া উচিত।

ধর্মশিক্ষা

দ্রষ্টালোকের চিত্ত স্বভাবতঃই ধর্মপ্রবণ। সুতরাং অতি অল্প আয়াসেই বালিকার চিত্তে ধর্মভাব জাগরিত করা যায়।

অতি শৈশব হইতেই ধর্মের কথা, ভগবানের কথা কথাছলে বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনী, রামায়ণ ও মহাভারতের সুললিত এবং উপদেশপূর্ণ উপাখ্যান এ বিষয়ের বিশেষ উপযোগী। পূর্বে আমাদের দেশের প্রাচীন যোগমহী ও পিতামহাগণ আপনাদের হুকুমারী দৌহিত্রী ও পৌত্রীগণকে যুখে যুখে রামায়ণ ও মহাভারতের সুললিত কাহিনী শিখাইতেন। “যাত্রা” মহোৎসবে,

গানে পাঁচালীতে, কথকের কথকতায় এই শিক্ষা আরও সম্পূর্ণতা লাভ করিত। সুতরাং অতি অল্প বয়সেই বালিকারা পুণ্যশ্লোক জনকহুহিতা, সত্যশিরোমণি সাবিত্রী, ধর্ম-শীলা গান্ধারী, পতিব্রতা দময়ন্তী, মনস্বিনী দ্রৌপদী, পরহিতব্রতা কুন্তীর পুত্র চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইত এবং সেই যুগল ও সমুজ্জ্বল আদর্শের আলোকে নিজ নিজ চরিত্রকে গঠিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। বালিকাদের চিত্তে সহজে ধর্মভাবের বিকাশের জন্ত সে ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

সে কালে ধর্মলাভের আর এক সুব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। অল্প বয়সেই বালিকারা ব্রত গ্রহণ করিত এবং দেবপূজা শিখিত। ইহাতে অতি অল্প বয়স হইতেই একজন অপার্বিৎ মঙ্গলময় দেবতার সঙ্গে তাহাদের সহজে পরিচয় ঘটিত এবং শৈশবের এই পরিচয় উত্তর জীবনে তাহাদিগকে আত্মসমর্পণতা এবং ঐহিকতার হাত হইতে বহল পারিমাণে রক্ষা করিত।

আমরা নিজেরা অধার্মিক এবং অপিশাসী হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া আর আমরা আমাদের কন্যা ও ভগিনীদের এ সকল ব্রত গ্রহণে উৎসাহ দিই না। তাই আজ হিন্দুর অন্তঃপুর দিনে দিনে স্বার্থপরতা, বিলাসিতা এবং ধর্মহীনতার ক্রমমেধে ঘনাক্রম হইয়া উঠিতেছে।

এই সকল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের যথেষ্ট পরিমাণে নীতি ও ধর্ম-গ্রন্থ পাঠ করান কর্তব্য।

আমার মনে হয় বালিকারা কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাহাদের কিছু কিছু সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া তাহাদের মূল শাস্ত্র-গ্রন্থের উৎকৃষ্ট অংশ অধ্যয়ন করান উচিত। সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই এমন একটা পবিত্রতা ও গাম্ভীৰ্য্য আছে যে মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে কেবল ভাষার গুণে লিপ্তিত বিষয় অধিক-তর হৃদয়-গ্রাহী হয়। অতএব সে শক্তি কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। অ. বয়স হইতে বালিকাদের সংস্কৃত স্তোত্রাদি আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতেও মনে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়।

সংযম এবং স্ত্রীতির সাধনা ধর্মশিক্ষারই অন্তর্গত। সুতরাং ধর্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য।

সংযম-শিক্ষা।

ভগবান মনু বর্ণিয়াছেন—

“স্বশ্বেতোহপি প্রসঙ্গেভ্যঃ

স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাঃ বিশেষতঃ।

ধরোহি কুলয়োঃ শোক-

মাংহেয়ুবরক্ষিতাঃ ॥”

অতি সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ হইতেও স্ত্রীলোক-দিগকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করা কর্তব্য। তাহারা অরক্ষিত হইলে পিতৃকুল ও স্বশুর-কুল উভয় কুলের শোকের কারণ হয়।

যেহেতু—

“স্বাং প্রসংগিং চন্দ্রিক কুলমায়ানমেব চ।

স্বক ধর্মং প্রয়তেন জায়াং রক্ষন্বি রক্ষতি।”

স্ত্রীকে রক্ষা করিলে সন্তান, চরিত্র, কুল, আত্মা, ধর্ম সকলই রক্ষিত হয়।

সুতরাং বালিকার চিত্তে যাহাতে বিন্দু

মাত্র মলিনতা না আসিতে পারে সে বিষয়ে যত্ন করা কর্তব্য।

আর্য্যপাষ এই আশঙ্কাবশতঃ অতি সূক্ষ্ম বয়সে বালিকার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

স্বামী কল্যাণ, সন্তানের কল্যাণ, পরিজনের কল্যাণ—সকল নারী-চরিত্রের বিগুণতার উপর নির্ভর করে। কারণ সমস্ত পরিজনের ধর্মরক্ষার ভার রমণীর উপর।

আজকাল ক্রমশঃ বালিকাদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং এ সময়ে এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ত্রুক্ষচর্যাশ্রমে বালকদের চরিত্ররক্ষার জন্য শাস্ত্রে যে সকল বিধিব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে, অবস্থানুগারে সেই সকল ব্যবস্থা যথাসম্ভব বালিকাদেরও চরিত্রবিগুণের জন্য অবলম্বিত হওয়া কর্তব্য।

বালিকারা যাহাতে কোন কুৎসিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়, কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে যোগদান না করে, কোন প্রকার প্রালাভনের মধ্যে না যায়, সেজন্য সর্বদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

থিয়েটারে অশ্লীল হাবভাবপূর্ণ অভিনয়-দর্শন, মেলা দেখিতে যাওয়া, অলম্বয়ঙ্কা চরিত্রহীনা দাগীদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস, কুপুস্তক-পাঠ, কুচিত্র-দর্শন, অসংযত-চরিত্র ‘জামাই বাবু’দের সঙ্গে রহস্তাণাপ, ‘বাসর-বরে’র রসিকতায় যোগদান, বরকছার শয়নকক্ষে ‘আড়ি-পাতা’, অগণ্যবস্ত্রসনা প্রাচীনা রসিকা-

গণের অস্বাভাবিক রসিকতা শ্রবণ, আসন্নযৌবন বালকগণের সঙ্গে খেলায় ও আমোদ প্রমোদে যোগদান—চরিত্র-বিশুদ্ধির প্রবল অন্তরায়, সুতরাং সর্বথা পরিহার্য।

বিলাসিতা পরিহার সংযম-শিক্ষার অপরিহার্য। বিলাসিতার সঙ্গে সংযম ও ধর্ম-প্রাণতার অহি-নকুল সম্বন্ধ। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল আমাদের অন্তঃপুরে বিলাসের স্রোত যেন অবোধে প্রবাহিত হইতেছে। বেশে ভূষায়, ভাবে ভঙ্গীতে আমাদের সংযত-চরিত্রা গৃহলক্ষ্যগণ দ্রুতবেগে পাশ্চাত্য বিলাসিনীতে পরিণত হইতে চাহিতেছেন। আমাদের সুকুমারী বালিকাগণকেও শৈশব হইতে সিন্ধে, লেসে, পোষাকে, পাউডারে আমরা দিন দিন বিলাসপ্রিয় করিয়া তুলিতেছি। বিলাসিতা ও স্বাধ-পরতা নিত্যসহচর এবং চরিত্রের দুর্বলতা, পরিশ্রমবিমুখতা, ধর্মভাবের হীনতা বিলাসতার অপরিহার্য্য কুফল।

সুতরাং বালিকাদিগকে একরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য যাহাতে বিলাসের ভাব তাহাদের নুনোমণ্ডে খাদ্য প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

পরিচ্ছন্নতা অতি প্রয়োজনীয় গুণ। স্বাস্থ্যের জ্ঞান, সৌন্দর্য্যের জ্ঞান, মনের প্রকৃতির জ্ঞান, পরিচ্ছন্ন থাকা নিত্য প্রয়োজন; কিন্তু কিসে আমাকে সুন্দর দেখাইবে, কিসে আমি লোককে মুগ্ধ করিতে পারিব একরূপ চিন্তা নিত্য অবমতিকর এবং সংযম-শিক্ষার প্রবল অন্তরায়।

যে দেশের সম্রাটের কন্যা, সম্রাটের মহিষী পতি-সত্য-পালনের জ্ঞান বহুল পরিধান

করিয়া কটক-ক্ষত চরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, যে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজবংশের সর্বপ্রধানা মহিষী বনবাস-ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া স্বহস্তে সহস্র অতিথির সেবা ও সংকার-নিরত, যে দেশে এই অবনতিকর ধর্মবিবাদী বিলাসিতা কেন প্রশ্রয় লাভ করিবে? হিন্দুর চক্ষু চিরদিন ধর্মের দিকে অর্পিত, পরলোকের দিকে স্থাপিত, অতি তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী দুর্বলতা কেন তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিবে?

আমাদের দেশ—দরিদ্রের দেশ, অনাথ-আহুকের দেশ, আমাদের দেশে বিলাসিতার অবগর কোথায়?

আমাদের মঙ্গলময়ী গৃহলক্ষ্মীরা যদি আপনাদের সমস্ত অপব্যয় সংযত করিয়া, সমস্ত বাহ্য্য পরিবর্জন করিয়া স্থূল শুভ্র বস্ত্রখণ্ড মাত্র পরিধান করিয়া অন্নপূর্ণার মত অকাতরে ক্ষুধিত পিপাসিতকে অন্নপানে পরিতৃপ্ত করেন, তাহা হইলে তাহাদের সেই সরল শোভন বিরল বেশই কি তাহাদের রাজরাজেশ্বরীর অপূর্ব মহিমায় বিমগ্নিত করে না? ভিখারীর ঘরগাঁ, দরিদ্রের গৃহিণী মুক্তহস্তে জগতের দৈন্য নিবারণে নিযুক্তা, ইহাই আমাদের অন্নপূর্ণা মূর্তি! আমরা ক্ষাতীয় জীবনের এই মহান আদর্শ কেন বিস্মৃত হইব?

সুতরাং শৈশব হইতে আমাদের বালিকাদের এই চিরপুরাতন মঙ্গলমন্ত্রে দীক্ষিত করা কর্তব্য।

প্রীতির সাধনা

সাধনার দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা সকল বৃত্তিরই পরিণতি সাধিত হইতে পারে।

প্রীতি-বৃত্তিও সাধনা দ্বারা বিকশিত হয়। রমণীজীবনের কর্তব্যপালনের জন্ত ত্যাগ-শীলতা ও সংযমের যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রীতি সকল ত্যাগ, সকল সংযম, সকল সহিষ্ণুতাকে সহজ ও আনন্দময় করে। স্মরণ্য প্রীতি-বিকাশের সাধনাও বালিকায় পক্ষে একান্ত কর্তব্য। রমণীর প্রীতি বিশ্বপ্রীতিতে পরিণত হইলে তবে তাহার কর্তব্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। কবি নবীনচন্দ্র সুভদ্রার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

“না দিদি! আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।

বরিষার ধারা মত অজস্র জননী প্রেম
সর্বত্র ঢালিয়া চল যাই!

জন্মক জননী মুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগত,
শিশু কিছু নাহি জানে আর।

ক্রমে বাড়ে পরিসর, কিশোর কিশোরী দেখে
মাতাভগ্নী পূর্ণ এ সংসার।

পতি পত্নী প্রেমরঙ্গে, যৌবনে ছুটে তরঙ্গে,
আলিঙ্গিয়া ভূতল গগন।

ক্রমে সন্তানের স্নেহ দেখায় অস্ত সুখ,—
পুণ্যতীর্থ সাগর সঙ্গম!

প্রেম ধর্ম এই, দিদি। কালি কৃষ্ণার্জুন মত
হেরিতাম সকল সংসার

মাতৃস্নেহ পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
অভিমত উত্তরা আমার!”

রমণী-জন্মের এই পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনা সাপেক্ষ। বালিকা যাহাতে বাল্যকাল হইতে ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিতে শিখে, অনাথ আতুরকে দয়া করিতে শিখে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

কোন নিষ্ঠুর দৃষ্ট দেখিয়া বালিকা যেন হর্ষ প্রকাশ না করে, কলহ-বিবাদে যোগ না দেয়, রুচ বাকে কাহারও মনে কষ্ট না দেয়, প্রতিবেশীদের আপদে বিপদে তাহাদের সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করে, তাহাকে সমস্তে এরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত।

প্রাতঃস্মরণীয় অহল্যাবাই, রানী ভবাণী, মহারাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি প্রীতিময়ী, ত্যাগশীলা, পরদুঃখকাতরা মহিলাগণের জীবন-চরিত-পাঠেও বালিকার হৃদয়ে প্রীতিবৃত্তি উন্মেষিত হইতে পারে। স্মরণ্য তাহাকে যত্ন করিয়া এই সকল লোকহিত-ব্রতা আদর্শ রমণীকুলের জীবন-চরিত পাঠ করান কর্তব্য।

আত্মের সেবা, রোগীর শুশ্রূষা, প্রাচীনের পরিচর্য্যার ভারও অল্পে অল্পে বালিকার হস্তে দেওয়া উচিত। পীড়া, দুঃখ ও অসমর্থতার সঙ্গে পরিচয়ে হৃদয়ে দয়া ও প্রীতির সমধিক বিকাশ হয়। কেবল তাহাই নহে, ভবিষ্যৎ জীবনে এই সেবা-শুশ্রূষার ভার রমণীর উপরেই পড়ে। এ সম্বন্ধে পূর্ব হইতে কিছু জ্ঞান না থাকিলে, কার্য্যকালে ইচ্ছাসিদ্ধেও সেবা ও শুশ্রূষা ভাল হয় না।

এই জন্ত বালিকাদের অল্প বয়স হইতে রোগীপরিচর্য্যা এবং আত্ম-সেবায় নিযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সেবার নিয়ম, ঔষধ-সেবন, পথ্য-রন্ধন এবং শুশ্রূষার প্রণালী সম্বন্ধেও শিক্ষা দান করা উচিত।

এ সম্বন্ধে আজ কাল উপযুক্ত পুস্তকের অভাব নাই। বালিকাদের সেই সকল পুস্তক যত্নপূর্ব্বক পড়াইয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা

উপদেশগুলিকে তাহাদেঃ হৃদয়গ্রাহী করে, তাহাদের একরূপ উপদেশ দেওয়া করা হয়। দেওয়া, উচিত এবং যাহাতে তাহারা বিরক্ত না হইয়া, অধীর না হইয়া শিক্ষা—ধর্মশিক্ষা, সংযম-শিক্ষা, প্রীতি-শিক্ষা, প্রকল্প মনে প্রীতির সহিত সেবা করিতে সমবেদনা-শিক্ষা। (ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

প্রাণী ও উদ্ভিদের বিষ

উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর উপর মানুষ যে কত অত্যাচার করে তাহার সীমা নাই। গো মেঘ মহিষ, ছাগ ও শূকরাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, বোটক এবং উটু ও মনুষ্যের খাদ্য। পক্ষীদের ত কথাই নাই। তা'র পর ইন্দুর, সাপ, গো-সাপ, কাঠবিড়াল এবং কড়িং প্রভৃতি পতঙ্গজাতিও মানুষের কবল হইতে উদ্ধার পায় নাই। উদ্ভিদের উপর মানুষ এতটা অত্যাচার করিতে পারে না, সকল গাছ-পাতা বা ফলমূল স্বাহ্ নয়, কাজেই উদ্ভিদগুলির মধ্য হইতে অনেক দেখিয়া শুনিয়া মানুষ খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করে। কিন্তু আশিষ-খাদ্য-নির্ণয়ে এক প্রকার বিচার করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, সভ্য মানুষ আম-মাংস ভোজন করে না; যদি কোন প্রাণীর মাংসে কোন প্রকার অস্বাদুত্বের জিনিষ থাকে সিদ্ধ করিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ফলমূল ও অনেক শাকসব্জি অপক্যাবস্থাতেই মানুষ আহার করে, কাজেই অগ্রে স্বাহ্ তা স্থির করিয়া পরে আহাৰ্য্য বলিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। আবার অধিকাংশ উদ্ভিদেরই দেহে যে বিষাদজনক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহা সিদ্ধ করিলে নষ্ট হয়

না—কাজেই সিদ্ধ করিলে যেমন সকল প্রাণীর মাংসই খাদ্য হইয়া দাঁড়ায় উদ্ভিদ তেমনটি হয় না। নচেৎ মানুষের অত্যাচারে হয় ত, ভূমণ্ডলের গাছপালাও বিরল হইয়া আসিত।

শাস্ত্রে বলে “বজ্রার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়মুবা”। কিন্তু প্রকৃতির কার্য্য পরীক্ষা করিলে শাস্ত্রের উক্তির সহিত ষোর অসামঞ্জস্য দেখা যায়। এক কথা কখনই স্বীকার করা যায় না যে, উল্লবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের যজ্ঞের আছতির জন্যই দুর্গল ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। বাব ভালুকের তীক্ষ্ণ নখদন্ত, সজ্জার গায়ের কাঁটা, কচ্ছপ ও শলুকজাতীয় প্রাণীর কঠিন দেহাবরণ, গো মেঘ-ছাগাদির শূণ্ণ, বোলুগ ও মধুমক্ষিকার হল, এবং সাপের বিষদন্ত সকলই আত্মরক্ষার মহা অস্ত্র। কীট পতঙ্গ অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, ইহাদের ধারালো হল নাই, কিন্তু কেহ কেহ দেহ হইতে এমন দুর্গন্ধযুক্ত রস নিসৃত করে যে, তাহাতে কোন শত্রু উহাদের নিকটবর্তী হইতে ভয় পায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষার রাত্রিতে আলো জালিয়া বসিলে, এই প্রকার দুর্গন্ধ-যুক্ত বহু কীট-পতঙ্গ দেখা গিয়া থাকে।

বাঙ্ অতি নিরীহ প্রাণী, ইহাদের শিং নাই, ধারালো দাঁত না হুল নাই, কিন্তু ইহারা লম্বা লম্বা লাক দিতে পারে, তাহাই আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হয়। গেছো এবং মেপো ব্যাঙের লাক ও খুব বড় এবং সঙ্গে আবার ইহাদের দেহ হইতে এক প্রকার বিষও বাহির হয়, এই বিষের একটু পরিচয় পাইলেই কোন শত্রু ইহাদের নিকটবর্তী হয় না। কয়েক জাতীয় গিরগিটিও এই প্রকারে দেহ হইতে বিষ নির্গত করিয়া আত্মরক্ষা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রকৃতি দেবী তাঁর এই অল্পবুদ্ধি ও দুর্বল সন্তান-গুলিকে এই সকল অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া ভূতলে ছাড়িয়া দিয়াছেন, অপর বলবান্ প্রাণীদের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখুক ইহাই তাহার অভি-প্রায়। উদ্ভিদগণ ইতরপ্রাণী অপেক্ষা আরো দুর্বল ও নিঃসহায়, বাঙ্ বা হরিণের মত লম্বা লম্বা লাক দিয়া যে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবে তাহার সাধ্য ইহাদের নাই। কাজেই একস্থানে দোড়াইয়া বাহাতে আ-রক্ষা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা ইহাদের দেহে রাখিতে হইয়াছে। এই জন্তই কাহারো গায়ে কাঁটা, কাহারো পাতায় সূঁয়ো, কাহারো ফলে, ফুলে, মূলে ও পাতায় বিষ। প্রবল ইতর প্রাণীরা এই সকলের ভয়ে উদ্ভিদের অনিষ্ট করিতে পারে না, অতি বুদ্ধিমান মানুষও ইহাদের নিকট হার মানিয়া যায়। নিম, নিসিন্দা, মাখাল ফল তাহাদের দেহকে অতি বিশ্বাস রসে পূর্ণ রাখিয়া কেমন আত্মরক্ষা করে! মানুষ কোন দিন যে এগুলির দ্বারা রসনাভৃষ্টি-

কর বাঞ্জন রাখিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা আজও দেখা যাইতেছে না।

যাহা হউক, দুর্বল জীব কি প্রকারে আত্মরক্ষা করে তাহা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। আত্মরক্ষার জন্ত কোন কোন প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরে যে বিষ সংগৃহীত থাকে, এই প্রবন্ধে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

প্রথমে উদ্ভিদের বিষের কথাই আলোচনা করা যাউক। খেজুর বা কুলের কাঁটা গায়ে লাগিলে আমরা বেদনা পাই, কিন্তু সে বেদনা স্থায়ী হয় না। বিছুটি বা আলুফুলার সূঁয়ো গায়ে ঠেকিলে যে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়, তাহা মতাই বিষের জ্বালা। উদ্ভিদের বিষের ইহা একটি সুপরিচিত উদাহরণ। ছোটখাটো অম্লবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে বিছুটির সূঁয়াকে নিরেট দেখায় না। এগুলির আগাগোড়া নলের মত ফাঁপা। ভাঙ করিয়া পরীক্ষা করিলে এই শূণ্যস্থানে একপ্রকার জলবৎ স্বচ্ছ রসও দেখা যায়। এই রসই বিছুটির বিষ। নলাকার সূঁয়োগুলি প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইলে, আপনা হইতেই ভাঙিয়া যায়, এবং নলের ভিতরকার রস শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষের কার্য দেখাইতে আরম্ভ করে। বিছুটির বিষ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিতেছেন। পিপীলিকার বিষে যে ফরমিক্ এসিড্ (Formic Acid) নামক দ্রাবক মিশানো থাকে, বিছুটির রসের অধিকাংশই সেই দ্রাবকে গঠিত। তা ছাড়া সাপের বিষের মত এক প্রকার রসও অল্পমাত্রায় উহাতে মিশ্রিত

দেখা যায়। বিছুটির জ্বালা-পোড়ার কারণ এই বিষ। সুতরাং অচল উদ্ভিদকে যদি সচল সাপের সহিত তুলনা করা যায়, তাহাতে অত্যায হয় না।

আলকুশীর সূঁয়োর বিষ আরো ভয়ানক। বিষের পরিমাণ ইহাতে বিছুটির তুলনায় অধিক। মানুষ বা গোরু প্রভৃতি প্রাণীর দেহে আলকুশী লাগিলে আর নিস্তার নাই। অধিক পরিমাণে সূঁয়ো গায়ে লাগিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটেতে পারে।

ফুলের উগ্র গন্ধ নির্গত করিয়াও কতকগুলি উদ্ভিদকে আত্মরক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে। প্রকৃতি যে সকল গেষভূষায় সাজাইয়া প্রাণী ও উদ্ভিদকে পৃথিবীতে ছাড়িয়া দেন, কেবল স্বভাবের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করাই তাহার উদ্দেশ্য নয়, পত্রপুষ্পের বিচিত্র বর্ণ এবং তাহাদের বিচিত্র গঠনের মূলে এক একটা শুভ উদ্দেশ্য লুকায়িত থাকে। যে সুগন্ধ লইয়া পুষ্প জন্মগ্রহণ করে, তাহা কখনই মানুষের প্রীতি উৎপাদনের জন্ম নয়। উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণ ইহার বতন্ত্র কার্য্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। ফল প্রসব করিয়া নিজে, বংশ অক্ষুণ্ণ রাখাই উদ্ভিদ-জীবনের সার্থকতা। উদ্ভিদবিদগণ বলেন, ফুলের গন্ধ এই কার্য্যেরই সহায়তা করে। উদ্ভিদ পুষ্প-পুটে মধুভাণ্ড সজ্জিত রাখিয়া গন্ধের দ্বারা দূরের প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গকে আমন্ত্রণ করে। প্রজাপতি পুষ্পের মধুপান করিতে বসিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুলের পরাগ গর্ভকেশরে সংযুক্ত করিয়া ফলের গঠন শুরু করিয়া দেয়। কিন্তু আমরা উদ্ভিদের যে তীব্র দুর্গন্ধের কথা

বলিতেছি, তাহা পতঙ্গের আমন্ত্রণের জন্ম নহে। যোগ্যে অনিষ্টকর প্রাণী কাছে আসিতে না পারে তাহারি জন্ম এই ব্যবস্থা গিলি জাতীয় কতকগুলি ফুলের গন্ধ যে মানুষ সহ্য করিতে পারে না, এবং এই গন্ধে যে নানা প্রকার পীড়া দেখা দেয়, তাহার অনেক প্রমাণ শাওয়া গিয়াছি আমাদের চোখা ফুলের গন্ধে মাথা ধরার কথাটাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ ছাড়িয়া এখন প্রাণীর কথা আলোচনা করা যাউক। আত্ম-রক্ষার জন্ম এবং কখনো কখনো আহাৰ্য্য সংগ্রহের জন্ম যে কত প্রাণীর দেহে কত রকম বিষ আছে, তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। ইহারা সাধারণ উদ্ভিদের মত দেহকে বিষাক্ত করিয়া আত্মরক্ষা করে না, কাজেই জীবন-সংগ্রামে জয়ী করাইবার জন্য প্রকৃতি ইহাদের দেহেই নানা বিষদ্রব্য অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক প্রাণীর বিষগুলি পরীক্ষা করিলে, দেহে উহাদের দুই প্রকার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি বিষ রক্তের সহিত যুক্ত না হইলে দেহের কোন কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। সাপের বিষ, বিছুর বিষ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অপর কতকগুলি, রক্তের সহিত মিশিবার জন্য প্রতীক্ষা করে না, খাদ্যপানের সহিত উদরস্থ হইলেই ইহারা বিষের কার্য্য দেখাইতে শুরু করে। মাকড়সা প্রভৃতির বিষ বোধ হয় এই শ্রেণী-ভুক্ত। কেবল সাপ ও বিছুর বিষই যে দেহপ্রবিষ্ট হইলে অনিষ্ট করে তাহা নয়। ভেকের গাত্র হইতে যে ঘর্ম্মবৎ রস নির্গত হয়, তাগ মানুষের শরীরে প্রবেশ করাইয়া

দেখা গিয়াছে, ইহাতে অল্পক্ষণের মধ্যে
মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে। ইলু অর্থাৎ
বাইন্ জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্তের (Eel) রক্ত
যে কোন প্রাণিদেহে প্রবেশ লাভ করিলেই
বিষের লক্ষণ প্রকাশ করে। কয়েক জাতীয়
মৎস্ত এবং গিঁড়গিঁড়ের মুখের লাল ও রক্তের
সহিত যুক্ত হইলেই বিষের কথা দেখাইতে
আরম্ভ করে। শিশুর মুখের লালায় যে বিষ
আছে, ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর সাথের
দেখাইয়াছেন, এক মাস দেড় মাস বয়সের
শিশুর লাল সংগ্রহ করিয়া খরগোস ইত্যাদি
প্রাণীর শরীরে প্রবিষ্ট করিলেই, বিষের
লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে। কিন্তু এই
সকল বিষ খাওয়াইলেই কোন প্রাণীতে
অসুস্থতার চিহ্ন দেখা যায় না।

বিষদাত যুক্ত প্রাণীর দেহে কোথায়
বিষের উৎপত্তি হয় তাহার অসুসন্ধান
হইয়াছে। ইহার ফলে জানা গিয়াছে,
যাহাদের বিষ-দাত আছে, তাহাদের দাঁতের
মূলে এক একটি ক্ষুদ্র কোষ থাকে। এই
কোষই বিষভাণ্ড। সাপের বিষদন্তে যেমন
এক একটি খাঁজ কাটা থাকে, বিষদন্তযুক্ত
অপর প্রাণীর দাঁতেও ঠিক তাহাই দেখা যায়
ইচ্ছা করিলেই দন্তমূলের কোষস্থ বিষ ইহার
দাঁতের খাঁজের ভিতর দিয়া আনিয়া শত্রুকে
দংশন করিতে পারে। মাগুর বা শিপি
মৎস্তের কাঁটার বিষ আছে, ইহার হাতে
পায়ে কাঁটা ফুটিলে বেশ ব্যথা হয়। এ
শ্রেণীর অনেক মাছের কাঁটার মূলে এই
প্রকার বিষকোষ ধরা পড়িয়াছে, এবং
ইহাদের কাঁটাগুলিতে সাপের বিষদন্তের
মত খাঁজ কাটাও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঁটা হানিয়া বা নখ দিয়া আঁচড়াইয়া
প্রাণীরা যে বিষ শত্রুর দেহে প্রবেশ
করাইয়া দেয়, তাহার প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য
বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন।
খাঁচের বিষয় বিহুটি প্রভৃতি উদ্ভিদের
বিষে যে ফর্মিক (Formic Acid) দেখা
গিয়াছে, ইহাতেও তাহাই ধরা পড়িয়াছে।
সায়ুমণ্ডলাকে অসাড় করিয়া দেওয়া ফর্মিক
এসিডের একটা প্রধান কার্য। বিষের
সহিত এই জিনিষটা মিশ্রিত থাকায় ত্বক্কল
প্রাণীদিগকে শীকার করার কার্যে ইহা
খুবই সাহায্য করে। ক্ষুদ্র কাঁচপোকা যখন
রং আরম্ভলাকে শীকার করিতে যায়, তখন
কোন গতিকে আরম্ভলা গায়ে একবার হল
ফুটাইতে পারিলেই সেটি ঐ ফর্মিক
এসিড দ্বারা পক্ষাব্যতির রোগীর মত অবশ্যপ হইয়া
পড়ে। তা'র পর কাঁচপোকা উহার স্রো
ধরিয়া অনায়াসে যথেষ্ট লইয়া যাই-
পারে।

মোঁমাছি ও ভীমরূলের ঝায় বিজুর
বিষও তাহাদের পুচ্ছে থাকে। ইহাদের
সম্মুখের দুটা দাঁড়া এবং দাঁত একেবারে
নিবিষ। পুচ্ছের প্রান্তস্থিত ধারালো হল
এবং তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র বিষকোষই ইহাদের
আত্মরক্ষার মহা অস্ত্র। সূক্ষ্মগ্র হলটিকে
ইহার অতি সাবধানে কুণ্ডলী পাকাইয়া
উপরে উঠাইয়া রাখে, তা'র পর শত্রুপক্ষ
সম্মুখে আসিলেই সেই তাহার দেহে বিদ্ধ
করিয়া দেয়। "

জেলি মৎস্ত (Jelly fish) নামক এক
প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর দেহেও বিষ
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের হল, বিষ

দস্ত বা সিপি মাছের মত বিষময় কাঁটা কিছুই নাই। দেহ হইতে মাকড়সার সূত্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বিষপূর্ণ সূঁয়ো বাহির করিয়া ইহারা শত্রুকে আঁকড়াইয়া ধরে। সূঁয়ের বিষে শত্রুর দেহে বিছুটির মত যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই জন্ত জেলি-মংস্ত্রকে সামুদ্রিক বিছুটি (sea nettles) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

প্রাণীদের মধ্যে পতঙ্গ জাতির দেহে বত বিষ দেখা যায়, বোধ হয় অপর কোন জাতির মধ্যে সে প্রকার দেখা যায় না। মোমাছি, বোলতা, ভীমরুল, পিপীলিকা সকলেই বিষাক্ত এবং ইহাদের সকলেরই বিষ পুচ্ছদেশে রক্ষিত দেখা যায়। কেবল সূঁয়ো পোকা ও মশক তাহাদের বিষ পুচ্ছের মধ্যে রাখে না। সূঁয়ো পোকের বিষ তাহাদের চুলে এবং মশকের বিষ তাহাদের মুখে থাকে। মাকড়সা-জাতীয় পতঙ্গ তাহাদের পায়ের নখে রাখে। নখের মূলেই ইহাদের বিষ-স্থালী। আনাদের তেঁতুলে বিছের বিষ তাহাদের দাঁতে থাকে, দস্তমূলে যে বিষস্থালী থাকে তাহা হইতে ইচ্ছামত বিষ নির্গত করিয়া শত্রুকে দংশন করিতে পারে। পতঙ্গের সংখ্যা যেমন অধিক, ইহাদের শত্রুও তেমন অনেক। অনেক পক্ষীর পতঙ্গই প্রধান আহার। তা ছাড়া টিকুটিকি, গিরগিট, এমন কি আনাদের সঙ্গে প্রতি নিরীহ ভেকগুলি সম্মুখে পতঙ্গ পাইলে, সিংহের মত তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এই সকল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত পতঙ্গের গায়ে, মুখে, লেজ, দাঁতে, নখে, বিষ রাখিতে হইয়াছে।

বড় আশ্চর্যের বিষয় আমাদের কাঁকড়া-গুলির বড় বড় দাঁড়া আছে, কিন্তু তাহাতে বিষ নাই। চিংড়িমাছেরও সেই দশা। খুব লম্বা লম্বা দাঁড়া আছে, কিন্তু সেগুলি একবারে নির্বিষ। পক্ষীদের পায়ের নখও ঠোট খুব ধারালো, কিন্তু সেগুলিতেও বিষের চিহ্ন দেখা যায় নাই।

যে সকল প্রাণীর দেহে কোন প্রকার বিষযুক্ত অঙ্গ নাই, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলির মাংসে বিষের লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক ল্যাক্লেষ্টার সাহেব (Sir Ray Lankester) হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, অন্ততঃ শতকরা দশজন লোক ইচ্ছা করিলেও মংস্ত্র মাংস আহাৰ করিতে পারে না,—জোর করিয়া খাওয়াইলে নানা প্রকার পীড়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ইহা দেখিয়া ল্যাক্লেষ্টার সাহেব বলিতেছেন,—মংস্ত্র-মাংসাহারে এই অসুস্থতার লক্ষণ বিষেরই পরিচায়ক। বিষ খাইলেই সকলে অসুস্থ হয় না,—এমন বিষ অনেক আছে যাহা একজনের শরীরে যে ফল দেখায় অপরে তাহা দেখায় না। একই খাদ্য আহার করিয়া এবং একই জল পান করিয়া এক ব্যক্তি পীড়িত হইল এবং অপর ব্যক্তি খাদ্যস্থ বিষ হজম করিয়া সুস্থ থাকিল, এ প্রকার ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। এই সকল কথা মনে করিয়া ল্যাক্লেষ্টার সাহেব বলিতেছেন যে, নিরামিষাহারিগণ মংস্ত্র-মাংস খাইলেই অসুস্থ বোধ করেন, তাহাদের এই অসুস্থতার কারণ মংস্ত্র-মাংসের বিষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া

যায়, যাঁহারা যথেষ্ট মাংস আহার করিতে পারেন, কিন্তু মৎস্য ভক্ষণ করিতে পারেন না। চিংড়ি মৎস্য বা কাঁকড়া খাইলেই অসুস্থ হইয়া পড়েন, এ প্রকারও অনেক লোক দেখা গিয়াছে। রন্ধন করিলেও মৎস্য-মাংসে মৃদু বিষ থাকিয়া যায়, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া ল্যাক্টেটাস সাহেব নিরামিষ-হারীর রুচি-অরুচির ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, সাপ প্রভৃতির যে তীব্র বিষের বিন্দুমাত্র রক্ত স্পর্শ করিলে বৃহৎ প্রাণীরও মৃত্যু হয়, তাহা উহাদের নিজের দেহে প্রবেশলাভ করিলে কোনই অনিষ্ট করিতে পারে না। একটি সর্প আর একটিকে দংশন করিলে আহত সর্পের যে, কোন অনিষ্টই হয় না, তাহা একাধিক পরীক্ষায় সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। কয়েক জাতীয় সর্পকে রাগাইলে তাহারা নিজেদের গায়ে নিজেরাই কামড় দিতে

থাকে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নিজের বিষে ইহাদের কেহই নিজের মরে না। সম্প্রতি এই ব্যাপার লইয়া জীবতত্ত্ববিদগণ নানা গবেষণা করিয়াছেন। ইহার ফলে স্থির হইয়াছে যে, বসন্তের বা ডিপথেরিয়া প্রভৃতি রোগের বীজ অল্পমাত্রায় দেহস্থ করিলে যেমন এই সকল রোগের তাজা বিষ আর মানুষকে পীড়িত করিতে পারে না, সেইপ্রকার সর্প প্রভৃতির দেহেই বিষ-কোষ আছে বলিয়া সেই বিষে তাহাদের অনিষ্ট হয় না। হাইড্রোকোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগের শাস্তির জন্ত যেমন আমরা ক্ষিপ্ত কুকুরের মৃদু বিষের টিকা লইয়া নিশ্চিত থাকি, সাপগুলিও ঠিক সেই প্রকার যেন নিজের বিষের টিকা লইয়া নিশ্চিত হইয়া আছে। তাই পরস্পর কামড়া-কামড় করিলে বা নিজের দেহে নিজের বিষ ঢালিয়া দিলে ইহাদের কোনই অনিষ্ট হয় না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

লোকশিক্ষা ও সমাজপ্রকৃতি

লোকশিক্ষার সঙ্গে সমাজ-বিবর্তনের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। যে সকল শক্তির সংঘর্ষে বা সমবায়ের সমাজ-জীবন বিবর্তিত হইয়া থাকে, লোকচরিত্রের শক্তি তন্মধ্যে সর্ব প্রধান। আর লোকশিক্ষা এই লোকচরিত্রকে গড়িয়া তুলিয়া, সমাজ কোন্ দিকে, কতটা বেগে, বিবর্তিত হইবে, ইহা ঠিক করিয়া দেয়। এই জন্ত কোনও সমাজে কোনও অস্থির লোকশিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্বে এই নূতন

ব্যবস্থার সঙ্গে সেই সমাজের পুরাতন প্রকৃতির কতটা সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সাধন সম্ভব, ইহা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখা আবশ্যক। কেননা, এ সঙ্গতিসাধন যদি একান্তই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থাতে সাংঘাতিক সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি অনিবার্য হইয়া উঠিবে এবং সে বিপ্লবমুখে সমাজের নিজস্ব প্রকৃতি এবং সনাতন সভ্যতা ও সাধনাকে রক্ষা করা নিতান্তই কঠিন হইয়া পড়িবে। এইরূপ

বিপ্লবের আশঙ্কাতেই ইংরেজে আইনের সাহায্যে, ইংরেজের রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়া, এদেশে ইংরেজি বাবের ও বিদেশীয় ছাঁচের লোকশিক্ষা প্রবর্তিত হউক, কিছুতেই ইহা ইচ্ছা করি না।

আমাদের মধ্যে অনেকে এই সামাজিক বিপ্লবকে একরূপ অনিবার্য বলিয়া মনে করেন। আধুনিক অবস্থাদ্বারা আমরা যে কোনও প্রকারে আমাদের নিজস্ব সামাজিক জীবনটিকে তার নিজের স্বরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব, এ বিশ্বাস অনেকেরই নাই। প্রাচীন রীতি নীতিসকল চারিদিকে, চক্ষের উপরে, একেবারে ভাপিয়া চুরিয়া যাইতেছে, কেহ কিছুতেই এ ভাঙ্গাটাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না ও পারিবার কোনও সম্ভাবনাও কোথাও দেখা যায় না। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোরেই এই বিপ্লব যে অনিবার্য, অনেকে এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন। তাঁরা এ বিপ্লবের পক্ষপাতী নহেন। তাঁরা বরং যেটা যেমন ছিল সেটিকে ঠিক তেমনি রাখিতে চাহেন। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে পরিবর্তন অনিবার্য বলিয়া সমাজের মূল প্রকৃতিটিকেও বাঁচাইয়া রাখা অসাধ্য, এ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে। হিন্দুসমাজে যুগের পর যুগ, অশেষ পরিবর্তন হইয়াছে। সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শাসন-সংস্কার, ক্রিয়াকর্ম, যুগে যুগে এ সকলের বিস্তর বিপর্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু পরিবর্তন মাত্রই বিপ্লবাত্মক নহে। বরং অধিকাংশ স্থলে এই সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই সমাজের নিত্য প্রকৃতিটী

আরো উত্তরোত্তর কুটিয়াই উঠে। আমাদের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসেও তার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ একালেই যে কেবল সমাজ নূতন পথ ধরিয়া, অভিনব আদর্শের প্রেরণায়, উচ্চতর সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে, অভূতপূর্ব আকারে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা নহে। চিরদিনই একরূপ হইয়াছে, চিরদিনই একরূপ হইবে। কিন্তু এ সকল পরিবর্তনের মধ্যে তার নিজের স্বরূপটী এ পর্যন্ত হারাইয়া যায় নাই। এই স্বরূপটী হারাইয়া গেলেই সামাজিক পরিবর্তন সমাজ-বিপ্লবে পরিণত হয়। এই বিপ্লব যাহাতে না আসে, শর্তপ্রযুক্ত তারই চেষ্টা করা কর্তব্য। আর এই কর্তব্যের প্রেরণাতেই শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলের প্রস্তাবিত লোকশিক্ষা-বিধানের প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক মনে করি।

আমাদের সমাজের গঠনটী আধুনিক যুরোপীয় সমাজের গঠন হইতে অত্যন্ত পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। কোনও দিন তাহাদের সমাজের গঠনও ঠিক আমাদের সমাজের গঠনেরই মত ছিল কি না, জানি না। আজ যে তাদের সমাজ-গঠন আমাদের সমাজ-গঠন হইতে একান্তই ভিন্ন, ইহা জানি। আর আমাদের সভ্যতা, সাধনা, ধর্মকর্ম, মনুষ্যত্বলাভের যাবতীয় উপায় ও উপকরণ সকলই আমাদের এই বিশেষ সমাজ-গঠনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সমাজের এ গঠনটী যদি ভাপিয়া যায়, তবে আমাদের সভ্যতা সাধনা সকলই লোপ পাইবে। তাহা হইলে আফ্রিকার কান্ডি বা প্রশান্ত সাগরকূলের জাপানীরা যেমন সকল বিষয়ে

একরূপ যুরোপীয় বনিয়া যাইতেছে, আমরাও সেইরূপ আচার-বিচারে, ভাবে-স্বভাবে, স্বল্পবিস্তর যুরোপীয় বনিয়া যাইব, সন্দেহ নাই। ইহাতে আমাদের নিজেদের সর্বনাশ ও হুনিয়ার সমূহ ক্ষতি হইবে। এই অমঙ্গল নিবারণের জন্ত আমাদের সমাজ-গঠনটিকে বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক। আর এইটা করিতে গেলে, গোপেলে মহাশয় যে ভাবে, যে আদর্শের লোকশিক্ষা এদেশে প্রচলিত করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, সে ভাবের ও সে আদর্শের লোকশিক্ষা যাহাতে প্রচলিত না হয়, তারই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশের বর্তমান অবস্থায় কোনও প্রকারের জোরজবরদস্তির সার্বজনীন সাধারণশিক্ষা প্রচলন করিবার চেষ্টার একটা বিষয় বিপদ এই যে, এরূপ চেষ্টা করিতে গেলেই বিদেশীয় রাজ-পুরুষদিগের শরণাপন্ন হইতে হইবে। আর তাঁহাদের সাহায্যে যে লোকশিক্ষা দেশে প্রচলিত হইবে, তার তত্ত্বাবধানভার, সে শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য-নির্ণয়ের অধিকার, এ সকলি এই বিদেশীয় রাজ-পুরুষদিগের হাতেই অর্পণ করিতে হইবে। সুতরাং এরূপ লোকশিক্ষা যে বিদেশীয় আদর্শের অনুসরণ করিবে, ইহা অবশ্যস্বাবী। বিদেশীয় আদর্শ যদি দেশের জনসাধারণেরা শিক্ষিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে, দেশের লোকচরিত্র এমন একটা আকার ধরিবেই ধরিবে, যাহাতে এই লোক-চরিত্রের আশ্রয়ে আমাদের সমাজের নিজস্ব গঠন ও স্বরূপটিকে রক্ষা করা আর কিছুতেই

সম্ভব হইবে না। গোপেলে মহাশয়ের চেষ্টা যদি সফল হয়, তবে আমরা অল্পকাল মধ্যে নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার গৌরব ভুলিয়া গিয়া, কাফ্রি বা জাপানীর মত যুরোপীয়ানের অপবর্ণস্বরূপ হইয়া উঠিব। ইহা যারা অপরিহার্য বা বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাঁদের পক্ষে গোপেলে মহাশয়ের এই বিলের পোষকতা করাই স্বাভাবিক। যারা এইরূপে স্বজাতীয়ের আত্মহত্যার সম্ভাবনার প্রতি উদাসীন হইয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে প্রাথমিক এই আত্মঘাতী সংস্কারের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করাও সেইরূপই স্বাভাবিক।

যুরোপীয় সমাজগঠনের মূলে একটা প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া আছে। আমাদের সমাজগঠনের মূলে এরূপ কোনও ভাব কখনওই ছিল না। আমাদের সমাজেও ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ মগ্যাদা ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সাধনা সামাজিক জীবনের বিবিধ, সম্বন্ধের সঙ্গে প্রকৃত ও পূর্ণতম ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব জানিয়া এই জীবনের বাহিরে, ধর্মজীবনের অতি উচ্চতম সোপানে, এই অনন্তপ্রতিভুদ্বী ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যেখানে কোনও সম্বন্ধ সেখানেই একের উপরে অন্নের একটা দাওরাদাবী জন্মিয়া যায়; সেখানেই পরস্পরকে পরস্পরের অপেক্ষা রাখিয়া চলিতে হয়। আর যখন এইরূপ সম্বন্ধের সমষ্টি লইয়াই আমাদের সামাজিক জীবন গঠিত হয়, তখন এখানে কোনও প্রকারের ব্যক্তিত্বের দাবী করা যে নিতান্ত বেয়াদবী মাত্র, হিন্দু ইহা অতি প্রাচীন

কালেই বুঝিয়াছিল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিহাভিমানকে নষ্ট করিবার জগুই নত অক্ষিসন্ধি আঁটিয়াছে, তাহাকে বাড়াইয়া তুলিবার কোনও অবসরের সৃষ্টি করে নাই। অথচ মানুষের ব্যক্তিত্ব যে একটা অতি খাঁটি ও অতি উচ্চ বস্তু, হিন্দু ইহাও কখনও ভুলিয়া যায় নাই। বরঞ্চ এই ব্যক্তিত্বই যে প্রকৃত পক্ষে মানুষের মন্ত্রাঙ্ক, এ জ্ঞান তার খুবই ছিল। সুতরাং সামাজিক জীবনে এই ব্যক্তিহাভিমানকে সর্বদা সর্বপ্রযত্নে সংকুচিত ও সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া, হিন্দু অতি-সামাজিক সন্ন্যাসাশ্রমে মানুষের এই ব্যক্তিত্ব-বস্তুর অবাধ প্রসারণের ও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু যুরোপীয় সমাজ যে ব্যক্তিত্বের উপরে আপনাকে গড়িয়া তুলিতেছে, আর হিন্দু যাহাকে ব্যক্তিত্ব বলিয়া ধরিয়াছে, এই দুই বস্তু ঠিক এক নহে। সমাজ-জীবনে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেই সর্ববিধ সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে যে একে-অন্যের বশুতার ভাবটি রহিয়াছে, তাহাকে ক্ষীণ করিতেই হইবে। এইজন্য যুরোপীয় সমাজে এই বশুতার বিধানটা বড়ই দুর্বল হইয়া, সকলকে স্ব স্ব প্রধান করিয়া তুলিতেছে। ইহার ফলে বর্তমান যুরোপীয় সমাজে একটা সংগ্রামের ভাব যেন দিবানিশি জাগিয়া রহিয়াছে। এই "সামাজিক সমরসজ্জার নামই প্রতিযোগিতা বা competition. যুরোপীয় সমাজ বহুকাল হইতে এই প্রতিযোগিতার পথ ধরিয়াই চলিয়াছে। ইহার ফলে যেমন যুরোপে কতকগুলি লোকের ভিতরে

উচ্চাঙ্গের রাজসিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ আবার অধিকাংশ লোককেই এই নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রামের নিষ্পেষণে একেবারে পশুর মতন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু উচ্চাঙ্গের নাসিকতা বিকাশের পথ পরিষ্কার করিতে পারিতেছে না। ফলতঃ এই প্রতিযোগিতার তীব্রতায় যুরোপীয় সমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যে পড়িতেছে, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব।

আমাদের সমাজ এ পর্যন্ত এ পথ ধরিয়া চলে নাই। আমাদের সমাজ অতি প্রাচীন কাল হইতেই সাহচর্যের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। যুরোপের সমাজগঠনের ও সামাজিক বিবর্তনের মূলে যেমন প্রতিযোগিতা বা competition, সেইরূপ ভারতের সমাজগঠনের ও সামাজিক বিবর্তনের মূলে এই সাহচর্য বা co-operation বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সাহচর্য-প্রতিষ্ঠিত সমাজগঠনের গুণেই আমরা এত আঘাত সহিয়াও আজ পর্যন্ত নজেদের সভ্যতা ও সাধনার বিশেষত্বটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছি। আমাদের দারিদ্র্য ইংলণ্ড প্রভৃতির দারিদ্র্যের তুলনায় বেশি বই কম নহে। কিন্তু এমন নিশ্বাস হইয়াও, এ জাতিটা যে এখনও বাঁচিয়া আছে, এই সাহচর্য-প্রতিষ্ঠিত সমাজগঠনই তার মুখ্য কারণ।

আমাদের একানবর্ষপরিবার-প্রথা এই সাহচর্য-নীতির ভিত্তি ও প্রমাণ। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া দেখিলে, আমাদের এক একটা পরিবার এক একটা যৌথ-কারবারী-সম্প্রদায়েবই মতন। বিলাতি

যৌথ-কারবারের মূলধন কেবল টাকাকড়ি। আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের যৌথ-কারবারের মূলধন কেবল টাকাকড়ি নয়, কিন্তু মানুষের দেহ-মনের শক্তি। পণ্য-উৎপাদনের দিক দিয়া দেখিলে আমাদের এ পরিবারগুলিকে এক একটা ফ্যাক্টরী বলিলেও চলে। কিন্তু এ ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তা ও তত্ত্বাবধায়ক মুনাফা-লোলুপ ধন্য নহেন, কিন্তু স্নেহপ্রবণ পিতা কিম্বা ভ্রাতা। এই একান্নবর্তী পরিবারগুলি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর সভ্যতা, হিন্দুর সাধনা, হিন্দুর নিজস্ব শিল্পাদি এ সকলই বাঁচিয়া থাকিবে। আর এই একান্নবর্তী পরিবারগুলি যদি বিলাতি সভ্যতার চাপে নষ্ট হইয়া যায়, তবে আর হিন্দুর বিশেষত্বকে বাঁচাইয়া রাখা কোনও মতেই সম্ভব হইবে না। এই একান্নবর্তী পরিবারগুলি যেখানে যে পরিমাণে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সেখানে সেই পরিমাণে আমাদের সভ্যতার সব ভাল ভাল বস্তুগুলি একে একে নষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। যুগযুগান্ত ধরিয়া হিন্দু যে দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতরে বসিয়া অশেষ বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আপনার সভ্যতা ও সাধনা, ধর্ম ও কর্ম, চিন্তার ঐশ্বর্য ও চরিত্রের শক্তিকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এক একটা একান্নবর্তী পরিবারের বিচ্ছিন্নতায় ও বিলোপে, সেই দুর্ভেদ্য দুর্গের এক এক খানি খিলান যেন খসিয়া পড়িতেছে, এমনই মনে হয়।

কিন্তু যাহারা সমাজের উচ্চতর শ্রেণী বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের মধ্যে

এই একান্নবর্তী পরিবারের দৌষও বেশি দৃষ্টিয়া উঠে, এবং সেখানে এই পরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়া যতই ক্ষোভের বিষয় হউক না কেন, বর্তমান অবস্থাদীনে কতকটা যে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আর এ সকল স্থলে এই একান্নবর্তীপরি বারপ্রথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে বলিয়া দেশের যে-জাতীয় ও যতটা পরিমাণে ক্ষতি হয় না, জনসাধারণের মধ্যে যদি তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে যে তদপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক ক্ষতি হইবে, তাহারও কোনও সন্দেহ নাই। এই একান্নবর্তী পরিবার-প্রথার কল্যাণেই আমাদের দেশের কৃষকেরা বা অপত্র শ্রমজীবীগণ যুরোপের বা আমেরিকার শ্রমজীবীগণের মতন এতটা অসহায় হইয়া পড়ে নাই। যতদিন এই একান্নবর্তী পরিবারের আশ্রয়ে ইহারা বাস করিবে, ততদিন তাহারা কিছুতেই যুরোপীয়ান বা আমেরিকান শ্রমজীবীগণের মতন এমন দুর্দশাগস্ত হইবে না ইহাও স্থির নিশ্চয়। এইজন্যই সর্বপ্রযত্নে, অচ দিকে সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, আমাদেরকে এই একান্নবর্তী পরিবারগুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। গোথলে মহাশয় যে সার্বজনীন সাধারণ-শিক্ষা বিস্তারের জন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা যদি দেশে এখন প্রচলিত হয়, তবে তার ফলে আমাদের সমাজের নিম্নস্তরেও যে এই একান্নবর্তী পরিবারগুলি অতি দ্রুতগতিতে ভাঙ্গিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই। আর

সে অবস্থায়, যুরোপের সমাজ আজ যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরাও যে ক্রমে সেই স্থানে যাইয়াই উপস্থিত হইব, ইহাও স্থিরনিশ্চিত।

গোথলে মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিল পাশ হইলে দেশে যে সার্বজনীন সাধারণ-শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে, তাহাতে যুরোপীয় কাঁকের বাক্তিহাভিমানকে যে জাগাইয়া তুলিবে ইহা অবশ্যস্তাবী। এটী যদি না জাগে তবে গোথলে মহাশয় যে উদ্দেশ্যে এই বিধান প্রবর্তিত করিতে চান, তাহাই পণ্ড হইয়া যাইবে। জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের যথাসম্পত্ত স্বত্ব-স্বার্থের জ্ঞান জন্মানই তাঁর এই সংস্কার-চেষ্টার প্রধান লক্ষ্য। তারা নিজেবটী বুঝিতে পারিবে, প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে, এই নূতন শিক্ষাবিধানের সম্ভাবিত উপকারিতার প্রমাণস্বরূপ গোথলে মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকেরা এগুলিরই বিশেষ উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু “নিজেরটী” বোঝার যে আর একটা দিকও আছে, “প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা” মনে করি।*

করিবার শক্তিতে সঙ্কে সঙ্কে মানব-চরিত্রে যে আদৌ কতকগুলি বস্তু ছুটিয়া উঠে, এ সকলের প্রতি ইহারা দৃকপাতও করেন না। বেশি করিয়া যে যুবক কৃষক “নিজেরটী” বুঝিতে যাইবে, সে ই ক্রমে আপনার সবগ পেশির সক্ষম কর্ম-চেষ্টার দ্বারা জুবাজুর্ণ পিতামাতার ভরণ পোষণ করা যে জীবন-সংগ্রামে যথাযোগ্য জয়লাভের সহায় নহে, কিন্তু কতকটা অন্তরায়ই হইয়া পড়ে, এটীও বুঝিয়া উঠিবে এবং এইজন্ত সে বিবাহ করিয়াই নিজের স্বতন্ত্র ঘর বাদিবার জন্তও ক্রমে ক্রমে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। আর এইরূপ ভাবে এই সার্বজনীন সাধারণশিক্ষার কল্যাণে আমাদের যে এতদূরবর্তী পরিবারে আমাদের সমাজের ও সভ্যতার পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা, সেই একদূরবর্তী পরিবারগুলি একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবে। ইহাতে আমাদের কি যে সর্বনাশ হইবে, তাহিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আর এই বিষম বিপৎপাতের আশঙ্কাতেই শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোথলের এই সংস্কার-চেষ্টার প্রতিবোধ হওয়া দেশের এক প্রকারের জীবন-মরণের কথা বলিয়া মনে করি।*

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

* অক্ষাপদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের লোক-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর কেহ কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তখন বিপিন বাবুর বক্তব্য শেষ হয় নাই বলিয়া আমরা সে প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করি নাই। এক্ষণে বিপিন বাবুর প্রবন্ধগুলি পাঠান্তে কেহ উপযুক্ত আলোচনা বা প্রতিবাদ পাঠাইলে তাহা মাদরে গ্রহীত হইবে। বঃ মঃ।

তারার কাহিনী

অগ্নিদেবত—কৃত্তিকা-নক্ষত্র (Pleiades)

তড়িৎবর্ণ স্বন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারানিচয়ে এই তারাপুঞ্জ গঠিত। এই তারাপুঞ্জ গোম-ধারার (১) মধ্যে অবস্থিত। (২) এবং ইহা সোমধারার কেন্দ্রস্থানীয়। (৩)

অতি পুরাকালে কৃত্তিকাগণ স্বতন্ত্র তারা-মণ্ডল বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং মাহ-মণ্ডল নামে পরিচিত ছিল। ৪) মাহগণ সপ্তর্ষিগণের স্থিত পিতৃগণের পত্নী। (৫)

মহাভারতে (৩২২৯) সপ্ত কৃত্তিকা-গণের নক্ষত্রচক্রে অভি-উন্নতির ইতিহ্য দৃষ্ট হয়। (৬) বোধ হয় যে এই অভ্যুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিকাগণ বৃষরাশি-ভুক্ত হইয়াছিল। কৃত্তিকাগণ তারা-বৃষের ককুৎ গঠন করে।

কালক্রমে কৃত্তিকাগণের একটি তারা হইলে কৃত্তিকাগণ ষট্-কৃত্তিকা

(১) The Milky Way.

(২) ইন্দুভিঃ ষট্-যুজান... ঋঃ ১২৩১৫

(৩) "They are regarded by Madler as the central group of the system of the Milky Way."

(৪) আসন্নমৃত্যুঃ ন পশ্যেৎ চতুর্ধনু মাতৃমণ্ডলম্
(স্বন্দ পুরাণ)

তু। On the Globe of Eudoxos (B. C. 403) the clusterers are distinct from the Bull. In the Hippercho-Ptolemy List the Pleiades are included in the Bull.

(৫) যে মরীচি-আদয়ঃ সপ্ত স্বর্গে তে পিতরঃ
স্বতাঃ তংপত্ন্যাঃ শোকমাতরঃ। পদ্মপুরাণ।

(৬) এবং উত্তেন শক্বেন ত্রিদিবস্ কৃত্তিকাঃ গতাঃ
নক্ষত্রম্ সপ্ত শীর্ষাভস্ ভাতি তৎ ব্রহ্মদেবত। Note
ব্রহ্মা = অগ্নি ব্রহ্মা।

খ্যাতি গ্রহণ করিলেন। (৭) এই নক্ষত্র ক্ষুর ও অগ্নিশিখা-আকৃতি সজ্জিত, অমুশ্রীয়া, ক্ষমা প্রীতি, সন্নতি, অরুদ্ধতী ও লজ্জা এই সপ্তমাতার মধ্যে অরুদ্ধতী সপ্তর্ষিগণের অবস্থিত আছে।

আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে (২।১।২।৪) পাই—আদিতে কৃত্তিকাগণ ঋক্ষগণের পত্নী ছিলেন। পুরাকালে সপ্তর্ষিগণকে ঋক্ষ (ভক্ষুক) বলিত। কিন্তু কৃত্তিকাগণ স্বামোহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। সপ্তর্ষি-গ উত্তরে এবং কৃত্তিকাগণ পূর্বদিকে থাকেন। (৮)

অগ্নিদেব কৃত্তিকাগণের সখা এবং তাঁহারা অগ্নিদেবের সহবাস করেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত এই ইতিহাসী বহু বিস্তৃত ভাবে মহাভারতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার সার অংশ এই—

মহাভারত যতে (৩।২২৩-২২৯) “একদা বশিষ্ঠপ্রমুখ বিপ্রেন্দ্রগণের যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞানুষ্ঠান কালে হৃতবহ অগ্নিদেব উপ-নীত হইরাছিলেন। তিনি পাপচক্ষে মূনিপত্নীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত

(৭) গ্রীস দেশীয় ইতিহাস যতে এটলাস দেবের সখ্য কন্যা মধ্যে মিরোপি (Merope) মর্ধ্য নিমিক্স রাজকে আশ্রয়দর্শন করিয়া লজ্জায় কষ্টবৃদ্ধ হইলেন। মতান্তরে ট্রয় নগরের ধ্বংস দর্শনে সপ্তকন্যা দুঃখে মগ্ন হইলেন। Brown—146-7

(৮) এতাঃ (কৃত্তিকাঃ) ই বৈ প্রাচৈঃ দিশঃ ন চাবতে। (শঃ ব্রাঃ ২।১।২।৩) এই সময়ে মহাবিশ্ব সংক্রান্তি বিন্দু এই নক্ষত্রের সন্নিহিত ছিল

বনে আগ্নেয়ায় কুতসংকল্প হইলেন।
এজ্ঞা তিনি বনে প্রস্থান করিলেন।
দক্ষহিতা স্বাহা দেবী অগ্নিদেবে আগ্নে-
সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্নিদেবের
মন স্বাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই।
স্বাহা অগ্নিদেবের মন জালিয়া প্রতিপদ
তিথিতে একে একে ছয় মুনিপত্নীর রূপ
ধারণ করিয়া অগ্নিদেবকে মোহিত
করিলেন। এবং গরুড়ী রূপ ধারণ করিয়া
বন হইতে বহির্গত হইয়া শরস্বতীসংবৃত
শ্রেতপর্শিতে স্থিত কাঞ্চন কুণ্ডে ছয়টি গর্ভ
নিষ্ক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তপঃপ্রভাব-
শাসিনী অরুন্ধতীর দিব্যরূপ স্বাহা অগ্রকরণ
করিতে পারিলেন না।

এই ষট্ গর্ভ হইতে দ্বন্দ্ব ওরফে কুমার
দেবের জন্ম হইল। চৈত্রের পবাসী জন-
গণ বলিতে লাগিল অগ্নিদেব সপ্তর্ষি
পণের ছয় পত্নীর সহিত সমাগমে মহান্
অনর্থ ঘটনা করিয়াছেন।

সপ্তর্ষিগণ কুমারের জন্ম শ্রবণে দেবী
অরুন্ধতী বাতিরেকে (৯) আর ছয় পত্নীকে
পরিত্যাগ করিলেন।

কুমার দেব দেবসেনাপতির পদ গ্রহণ
করিলে সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নী স্ব স্ব
স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দ্রুতপদে
তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন
“হে পুত্র স্বামিগণ অকারণে রোষপরন্ত
হইয়া আমাদিগকে পুণ্যস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট
করিয়াছেন। তুমি আমাদিকে অক্ষয় স্বর্গ
দান কর।”

(৯) অক্ষমালী অরুন্ধতীর নামান্তর। অক্ষমালী
বশিষ্ঠের সংযুক্তা অধমযোনিজা। (মত্)

তখন ইন্দ্র দেব কুমারদেবকে কহিলেন
—রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ
স্পর্ধা প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠতা লাভে সমুৎসুক
হইয়া তপস্বার্থ বনে গমন করিয়াছেন।
আমি এই নক্ষত্র পরিচ্যুতি নিশ্চয়ন ব্যাকুল
হইয়াছি। আপনি ব্রহ্মার সহিত মিলিত
হইয়া নক্ষত্র-সংখ্যা পরিপূরণ করুন। ইন্দ্র
এইরূপ কহিলে কৃত্তিকাগণ স্বর্গে গমন
করিলেন। সেই অগ্নিদেবত নক্ষত্র
সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

শতপথ ব্রাহ্মণে (২।১।২৪) আমরা
আরও পাই—

“বিশেষতঃ অত্যাচ্চ নক্ষত্র এক দুই
তিন বা চারি তারাতে গঠিত। সূতরাং
ষট্ তারায়িকা কৃত্তিকা বহু তারকময়
বলিয়া উহার বহুলা নাম। (১০) বহুলা নক্ষত্র
সম্মিলিত পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের
অপর নাম বহুলা। এবং কুমার কার্ত্তিকের
দেবের নাম বহুলাসুত “বাহুলেয়।” (১১)

এই বহুলা নক্ষত্র বা বহুলা দেবী
“বেহুলার” ভাসানের নায়িকা।

উপাখ্যানটি এই—কার্ত্তিকী পূর্ণিমা
নিশিতে লখিন্দর (লক্ষ্মীন্দ্র) বেহুলা দেবীর
পাণি গ্রহণ করেন। ঐ রজনী যোগে
ধাসরঘরে সূত্র-সঞ্চার সর্প (১২) অনক্ষিত

(১০) জু। গ্রীষ্মদেশীয় নাম Pleiades = many.
হিব্র নাম Kimah = the cluster. বেবিলন নগরে
নাম Kimtu = the family. আরবদেশীয় নাম
অন ছরয় = the little ones.

(১১) বাহুলেয়ঃ তারকজিৎ। অমরকোষ।

(১২) চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া সমস্ত
পাইলেই রাহ সর্প উভয়কে গ্রাস করে। এই জন্ত
রাহর নাম দুর্ঘা-সঞ্চার সর্প।

রূপে লখিন্দরকে দংশন করে এবং লখিন্দর
জীবন ত্যাগ করে। সপোতা বেহলা
সুন্দরী লখিন্দরের শব লইয়া গঙ্গা নদীতে
(আকাশ গঙ্গা) ভেলায় চড়িয়া স্বর্গে গমন
করেন। দেব-বরে লখিন্দর পুনর্জীবিত
হয়। (১৩)

পুরাকালে তারা বৃষের ককুৎস্থিত
কৃত্তিকানক্ষত্র-(১৪)নক্ষত্র-চক্রের আদি নক্ষত্র
ছিল। সুমেরুবাসী তারাদর্শক দেখিতেন
যে তারা বৃষের ককুৎস্থিত এই নক্ষত্রে
উদিত হইয়া সূর্য্যদেব ষট্‌মাসব্যাপী
দিবার উদোধন করিতেন। ইহিহে
এই কাকুৎস্থ সূর্য্য ইক্ষাকু নাম গ্রহণে
সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ হইলেন

কৃত্তিকানক্ষত্র-সংযুক্ত পৌর্ণমাসী হইতে
কার্ত্তিক মাসের নামকরণ হইয়াছে।
পুরাকালে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা কৌমুদী
(Harvest Moon) নাম ধারণ করিতেন।
কৌমুদী তিথিতে প্রাচীন জগতে মহোৎসব
হইত। (১৫)

কারণ ঐ দিন হইতে কার্ত্তিকাদি বর্ষ
গণনা হইত। এবং ঐ দিনে নব হল চালন
আরম্ভ হইত। অত্ৰাপি বোধাই দেশের
কৃষকগণ হল স্বন্ধে লইয়া কৌমুদীনিশিতে

(১৩) তু। সাবিত্রী-নত্যাভানের উপাখ্যান “সবিতা
নত্যাধরা।” (অঃ বেঃ ৭২৪১:) = সবিতা নত্যাভান।

(১৪) কৃত্তিকাঃ প্রথমম্। তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।১।
তু। বেবিলন নগরে এই নক্ষত্রের নাম টি (Te) অর্থাৎ
ভিত্তি ছিল এবং চীনদেশে ইহার নাম “ম-আ-ও”
অর্থাৎ সূর্য্য বিমুক্ত দ্বার (“Sun-open-door”) ছিল।

(১৫) চাপক্য। বৃষল। কৌমুদী মহোৎসবস্ত কিম্
কারণম্। মুস্তারাক্স।

সকল গৃহস্থের ঘরে ঘরে “মাস্তন” (১৬)
চাহে।

বিলাতেও সেই রীতি আছে বা অন্ততঃ
ছিল।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা কৌমুদী হইতে
বর্ষ গণনা হইত বলিয়া চন্দ্র “কৃত্তিকা ভব”
নাম ধারণ করেন।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা নিশিতে পূর্বে কৌমুদী
উৎসব হইত। আবার এই নিশিতে
রাসলীলার উৎসব ইহ জগতে হইতেছে।
এবং দেবগণ ও মর্ত্ত্যগণ এই নিশিতে
রাধা ওরফে বিশাখা (১৭) নক্ষত্রে হিং
কৃষ্ণাধর্য্য এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রে স্থিত পূর্ণিমার
চন্দ্র সন্দর্শনে আধিদৈবিক রাসোৎসব
বিলোকন করেন।

তড়িৎবর্ণ বা চম্পকবর্ণ কৃত্তিকাগণ এবং
লোহিতবর্ণ রোহিত্যারা বা “হলদীবর”
তারা (Aldebaran) ধাত্রীশালার “সাত
ভাই চাম্পা” এবং “করবী বা পাকল” যথা--

“সাত ভাই চাম্পা জাগো রে

কেন বোন্ পাকল ডাকো রে ॥

(সহর)

“সাত ভাই চাম্পা জাগো রে

কেন বোন্ করবী ডাকো রে ॥

(পল্লীগাম)

সোমধারার কেন্দ্রে অবস্থিত ষট্‌কৃত্তিকা
বা ষট্‌মাতৃকাগণ দুগ্ধবতী বলিয়া প্রসিদ্ধ
মহাভারত মতে (৩২২৫) সোমধারা

(১৬) “Plough Money”.

* পল্লীগামে পৌষমাসে হল বোলা গীত হয় এবং
মাস্তন হয়।

(১৭) রাধা বিশাখা—পুণ্ডেডু (অমরকোষম্)

(দ্রুতধারা) এই মাতৃমণ্ডল হইতে বিনিমুক্ত হইয়াছিল। (১৮) এবং দেবগণ কুমার দেবকে স্তম্ভদানার্থে কৃত্তিকাগণকে নিয়োজিত করিলেন। (১৯)

(১৮) বিশাখায়াম্ যদা স্বর্ঘ্যঃ চরতি অংশম্ তৃতীয়কম্
তদা চন্দ্রম্ বিজানীয়াৎ কৃত্তিকা শিরসি স্থিতম্ ।
বিষ্ণুপুরাণ ২।৮।৭২

(১৯) ক্ষীরসম্ভবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ৎ
(রাম ২ ৩৮।২৩)

আবার মাতৃগণ শিববিবাহে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন। আমরা বেদে (তৈঃ ব্রাঃ ১।৫) পাই “দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি” অর্থাৎ দেবগণ নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত আছেন। যথা—মাতৃগণ মাতৃমণ্ডলে।

তারাদর্শক।

বেদে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব

পাশ্চাত্য মনীষিগণ গবেষণা ও পরীক্ষা-দ্বারা যে বিজ্ঞান-যুগ পৃথিবীতে প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহার প্রধান-লক্ষ্য ও কৃত-কার্য্যতা এক কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয়—সৃষ্টি-রহস্যোন্মেষদ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-চূড়ামণি বিজ্ঞানাদ্যার্থ্য হক্সলি (Huxley) এক কথায় আবার এই সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, মুখ হইতে ধূমপানের ধূম (whiff of smoke) নির্গত হয়, তাহাতেই সৃষ্টিরহস্ত নিহিত রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বাষ্পই সৃষ্টির আরম্ভ। ভূমণ্ডলের বিচিত্র গঠন-প্রণালীর মূলানুসন্ধানে এই তত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; ভূমণ্ডলস্থ অসংখ্য জগতের গঠন উপাদান বিশ্লেষণে ইহারই আভাস পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের বিভিন্ন পরিণাম পর্য্যবেক্ষণে বাষ্পময়-নীহারিকাত (Nebula) সৃষ্টির প্রথমক্রিয়া প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে।

আমাদের পূর্ব-পুরুষ আৰ্য্যমনীষিগণের উজ্জ্বল-প্রতিভাতে সেই অরণ্যাতীত বৈদিক কালেই যে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের

পূর্বোক্ত অভিনব তত্ত্ব কেবল প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহা যে বহুল রূপে প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছিল, ইহা প্রতিপাদন করাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

ঋগ্বেদ, বেদ সকলের মধ্যে প্রাচীনতম; তাহার কয়েকটি মন্ত্রে জলেতেই সৃষ্টির প্রথম বিকাশ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা যে কবিকল্পনা নহে, অবৈজ্ঞানিকের স্বপ্নদৃষ্ট প্রচ্ছন্ন সত্য নহে, পরন্তু বৈজ্ঞানিকের চিন্তা-প্রসূত, যুক্তিসমর্থিত, প্রত্যক্ষলব্ধ, সুস্পষ্ট তত্ত্ব, তাহা এ কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিলেই পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হইবে। সেই মন্ত্র কয়েকটিই সৃষ্টি-বিষয়ক। অতি সুন্দররূপে সেই গুলিতে সৃষ্টিচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে—

“আপোহ যদৃহতী বিশ্বমায়ন্

গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্ ।

ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাংসুরেকঃ

কষ্টেন্ন দেবায় হবিষা বিধেম ॥” ১০।১২।১৭

“যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশুদক্ষং

দধানা জনয়ন্তীর্যজম্ ।

যো দেবেষধিদেব এক আসীৎ

কঠৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥” ১০।১২।১৮

‘ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিধভূবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার গর্ভধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল; তাহা হইতে দেবতা-দিগের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?’

‘যখন জলগণ বলধারণ পূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তখন যিনি নিজ মহিমাধারা সেই জলের উপর সর্ব্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়া-ছিলেন, যিনি দেবতাদিগের উপর অধিতীয় দেবতা হইলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?’

“তম আসীৎ তমসা গুচমগ্রেঃ

প্রকৃতং সলিলং সর্ব্বমাইদম্।

ভূচ্ছ্যনাত্তপিহিতং যদাসীৎ

তপসস্তন্মহিনা জায়তেকং ॥” ১০।১২।১৭

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি-

মনসোরতঃ প্রথমং যদাসীৎ ॥” ১০।১২।১৮

‘সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্তার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।’

‘সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল।’

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টি-বর্ণনায় জল ও অগ্নির এত অধিক সন্নিবিষ্ট ভাব প্রকাশিত হইয়াছে যে, এই দুইটিকে

নিত্যসাপেক্ষ তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহাই সৃষ্টির মুখোপাদান স্থলে উভরকেই ধরিয়া ‘তেজোযুক্ত বাষ্প’ সৃষ্টির আদি, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা সৃষ্টির আদি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ‘Heated mass of Vapour’ (উত্তপ্ত বাষ্পরাশির) মতের সহিত সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে।

উপরি-উদ্ধৃত তৃতীয় ঋকৃটীর সহিত বাইবেল-উক্ত সৃষ্টি-বিবরণ তুলনা করিলে উভয়ের মাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—

“And darkness was on the face of the deep, and the spirit of God was moving (or brooding) on the face of the water.”—Genesis, I., 2.
“জলরাশির উপরিভাগে অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং পরমাত্মা এই অগ্নবরাশির উপরে বিচরণ করিতেছিলেন।”

এই তুলনা দ্বারা বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বই যে পূর্ব্ব মৌলিক তাহা পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি ঋকের সহিত আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য একটি অতি প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র মিলাইয়া বুঝিলে, সৃষ্টিরহস্তের সুপ্রণালীবদ্ধ দর্শন-বিজ্ঞান-সম্মত একটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উল্লিখিত মন্ত্রটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—“ওঁ আপো হি ঠা ময়োভুবন্তান উর্জে দদাতন। মহেরণায় চক্ষুসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্ত ভাজয়তেহ নঃ। উপতীৰিব মাতরঃ। ওঁ তন্মা অরক্ষমান্বো যন্ত ক্ষয়ায় জিঘৃথ। আপো জনয়থা চনঃ।”

“ওঁ ঋতঞ্চ সত্যাকাশীকাতপসোহিহজায়ত ।
ততো রাত্রীজায়ত ততঃ সমুদোহর্ষণঃ ।
সমুদোহর্ষণাদধিসদংসরোহিজায়ত । অহোরাত্রাণি
বিনধদ্বিধৃত্ত্ব মিততোবশী । সূর্য্যোচনমসৌ
ধাতা যথাপূর্ষমকরয়ঃ । দিবঞ্চ পৃথিবী-
ঞ্চান্তরীক্ষমথো ঋঃ ॥”

‘হে জগ! তোমরা অতি সুখদায়ী,
অতএব আমরাদিগের ইহকালে সুখ ও
অন্ন বিধান কর; এবং পরকালে (চিত্তশুদ্ধি
দ্বারা) আমরাদিগকে মহারমণীর পরব্রহ্মের
সহিত সংযোজিত করিয়া দিও । হে জগ!
তোমরা হিতাভিলাষিণী নাতার ত্রায়
ইহলোকে আমরাদিগকে অতি কল্যাণদায়ী
স্বায় রসের ভাগী করিও । হে জগ!
তোমরা যে রসে নিখিল জগৎ পরিতৃপ্ত
করিতেছ, আমরা তাহাতে
লাভ করি ।’

‘মহাশলয় সময়ে জগৎ একমাত্র পরব্রহ্মে
বিশ্বীন হইয়াছিল, তৎকালে কেবল রাত্রি
ছিল অর্থাৎ জগৎ অন্ধকারময় ছিল ।
পরে সৃষ্টিারম্ভ সময়ে অন্তঃকালে সৃষ্টির মূল-
স্বরূপ জনপূর্ব সমুদ্র উৎপন্ন হয়, সেই
প্রথমপয়োবিজল হইতে বিধপ্রকটনকারী
বিধাতা জন্মিলেন, তিনি দিব্যপ্রকাশক
সূর্য্য এবং রজনাপ্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া
বৎসর করনা করেন, তদবধি দিন, রাত্রি,
ঋতু, অয়ন প্রভৃতি স্বর্গলোকাদি কল্পিত হইতে
লাগিল ।’

এখানে বিধোৎপত্তি ও তৎকালীন
অবস্থা অতি সুন্দরভাবে প্রকটত হইয়াছে ।
যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই, তখন একমাত্র
পরব্রহ্মের সত্ত্বাই বিরাজিত ছিল, কিন্তু

তাহা জড়সত্ত্বা নহে, চৈতন্যময় সত্ত্বা ।
চিন্তাতেই (তপস্রাতে) আবার এই
চৈতন্যের বিকাশ (কার্য্য) হইতেছিল—
তখন অন্ধকার ব্যাপ্ত থাকিয়া রাত্রির
মত দেখাইতেছিল । সৃষ্টির ইচ্ছা হইতে
প্রথম ঋত (নিয়ম=laws) ও সত্ত্ব
(সত্য, নিত্যোপাদান Substance) উদ্ভূত
হইল । এই নিত্যোপাদানের প্রথম
পরিণামেই বায়ুময় সমুদ্র উৎপন্ন হইল ও
তৎ সঙ্গে সঙ্গে কাল প্রবর্তিত হইল । এক্ষণে
পর-ব্রহ্মের ইচ্ছাসম্বৃত শক্তি আবির্ভূত হইয়া
সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া কালের অহোরাত্র
বিভাগ এবং আকাশ, পৃথিবী, শূণ্য ও
স্বর্গাদিলোক রচিত করিলেন । এই শক্তিই
ধাতা (বিধাতা অর্থাৎ স্রষ্টা) নামে
অভিহিত হইয়াছেন । চিত্রপী পর-ব্রহ্মের
ইচ্ছা হইতে সৃষ্টি প্রসূত হয়, সৃষ্টির নিয়ম-
শৃঙ্খলা ও উপাদান এই ইচ্ছারই ফল । এই
দুইটীকে অবলম্বন করিয়া বিধাতাকর্তৃক
সৃষ্টিকার্য্য পরিণাম হয় । এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায়
পর-ব্রহ্মের নির্মিত্যের নির্ণিত ভাব সংরক্ষিত
করিয়া কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে সৃষ্টিবৈচিত্র্য-
ব্যাখ্যার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ! এইরূপে
সৃষ্টিব্যাখ্যার মূলপত্তন বেদেই হইয়াছে এবং
বাস্তবত্ব জগৎই সৃষ্টির মূলপদার্থ বলিয়া
কোঁঠিত হইয়াছে ।

পূর্বেক্ত বৈদিক মন্ত্রটীকে মার্জ্জনমন্ত্র
বলে । দৈনিক সন্ধ্যার সময় এই মন্ত্রোচ্চারণ
করতঃ মাথায় জলস্পর্শ করিয়া নিজেকে
মার্জিত (পরিতৃপ্ত) অর্থাৎ পবিত্র করিতে
হয় । দৈনিক গ্রিসন্ধ্যাতে তিনবার এই মন্ত্র
পাঠ করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিবার

যে ব্যবস্থা শাস্ত্রে করা হইয়াছে, তাহাতে মন্ত্রের মাহাত্ম্য যেমন বর্দ্ধিত হয় উপাসনার গান্ধীর্ধ্যও তেমনই জ্বায়ন্তম হয় এবং উপাসকের আত্মাও পরমাশ্রুতিমুখী হইবার প্রকৃষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

ঐতির পর স্মৃতিসংহিতার আলোচনা করিলেও পূর্বোক্ত মতেরই পোষকতা পাওয়া যায়। প্রধান স্মৃতি-সংহিতাকার-মনু বেদেরই অনুবর্তন করিয়া বলিয়াছেন “অপ এব সসর্জাদৌ তাস্ম বোজমবাস্থং ॥” প্রথমে জল (বাপ্) সৃষ্ট করিয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চালিত করিলেন অর্থাৎ প্রথমসৃষ্ট বাপ্ সমস্ত সৃষ্টির বোজ নিহিত করিলেন।

পুরাণের মধ্যেও এই তত্ত্বেরই অনুপ্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টি-ব্যাখ্যায় যে “কারণ-জলের” উল্লেখ দেখা যায়, তাহা পূর্বোক্ত বৈদিক তত্ত্বেরই সম্পূর্ণ অনুলগত, অথচ অতি স্পষ্টভাবে সৃষ্টিসম্বন্ধ জলের কারণনির্দেশক। পুরাণে “প্রায়-পয়োধির”যে উল্লেখ আছে, তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের লয়াবস্থার সহিত জলের সম্বন্ধ অতিশয় পরিকাররূপে প্রকটিত হইয়াছে—বিধ ধ্বংস

প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ সেই বাপসমুদ্রেই নিমজ্জিত হইবে। তাহা হইলে বাপ্-ব্যবস্থা হইতেই সৃষ্টির পুনঃ প্রবর্তন হইতে থাকিবে। এইরূপে যেখানে বিধের অন্ত, সেইখানেই আবাব বিধের আরম্ভ, কারণে কার্যের উপসংহারে বিধের লয়, কারণ হইতে কার্যের প্রসূতিতে বিধের উৎপত্তি। ইহাতেই সৃষ্টি-প্রবাহের অনন্ত আবর্তন চলিতেছে। আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বাপ্ হইতে যেমন সৃষ্টির আরম্ভ প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমনই তাহাতে সৃষ্টির শেষও প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের ‘নারায়ণ’ ও ‘কেশব’ নামেও এই তত্ত্বেরই ইতিহাস নিবন্ধ রহিয়াছে। ‘নারা’ ও ‘ক’ উভয় শব্দেই জল বুঝায়। ভগবান্ প্রায়পয়োধিজলে যে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছে।

অতএব বাপ্-তত্ত্বই যে ব্রহ্মাণ্ডের কার্য-কারণের সম্মিলনক্ষেত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানুমোদিত ও আর্চামনোমিগণের অন্তস্তল দর্শনের প্রকৃষ্ট-নিদর্শন।

দ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী।

অভ্যাস যোগ। *

(সমালোচনা)

ভারতবর্ষের মুক্তি কোন্ পথে এ সম্বন্ধে এখনো দেশে মতভেদ থাকিলেও, ভারত-বর্ষের প্রকৃত উন্নতি যে তাহার চিরন্তন

সাধনার পথ ধরিয়াই সম্ভব, এ সম্বন্ধে দেশের প্রকৃত হিতৈষী ও মনীষীদের মধ্যে অনেকেরই আর সন্দেহ নাই।

* শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সাক্সাল প্রণীত। মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আশা মাত্র।

সুতরাং এ সময়ে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল স্মৃতি ও দৃঢ়তার সহিত হিন্দু চিন্তে হিন্দু আদর্শ ও সাধনার একটা

উজ্জ্বল আদর্শ মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়া যে হিন্দুসাধারণের কৃতজ্ঞতা-লাভের অধিকারী হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্তমান গ্রন্থ ভূপেন্দ্রনাথের “ধর্মপ্রচার-গ্রন্থাবলীর” তৃতীয় গ্রন্থ। তিনি ইতিপূর্বে “দিনচর্যা”য় হিন্দুর দৈনিক জীবনযাপন প্রণালীর এবং “আশ্রমচতুষ্টয়ে” হিন্দুর আশ্রমধর্মের বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে তিনি হিন্দুর ঐকান্তিক সাধনার পরিচয় দিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বলেন “হিন্দুশাস্ত্রমতে বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণু ভগবানের অনন্ত শক্তিতে পরিপূর্ণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন স্থান কোথাও নাই যেখানে তাঁহার অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মানুষের মধ্যেও তাঁহার এই পূর্ণশক্তি বিরাজিত, কিন্তু মোহের প্রভাবে, অজ্ঞানের প্রভাবে, কদভ্যাসের প্রভাবে, এই বিপুল শক্তি জড়ীভূত, ক্ষীণ অগ্নিস্থলিঙ্গের তায় মূঢ়, বীজনিহিত বৃক্ষশক্তির তায় শূন্য, অস্পষ্ট, অদৃশ্য। উপযুক্ত সাধন দ্বারা যদি এই শক্তিকে বিকশিত করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে।” হিন্দু এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন বলিয়াই ঐকান্তিক সাধনা দ্বারা এমন অপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথের মতে আমাদের বর্তমান দেশব্যাপী দূরবছার সর্বপ্রধান কারণ—“অন্ধ, ভ্রান্ত, অবসাদকর অদৃষ্টবাদ।” যেদিন হইতে জড়ভাবাপন্ন ভারতবাসী কর্মের শক্তির প্রতি আস্থা হারাইয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহার দূরবছার আরম্ভ।

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা ভূপেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে, আমরা যে দৈবের উপর অন্ধ নির্ভরের ভাব দেখাই তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে। “যোগবাশিষ্ঠে”র যুমুক্ষু প্রকরণে পরম প্রাজ্ঞ বশিষ্ঠ দেব ত্রিলোকপাবন শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন “দৈবই বল’ প্রদান করে, ইহা মূঢ়ের করন।। কেননা পুরুষকার ভিন্ন সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে। * * দুর্বল ও বলবানে যুদ্ধ ঘটিলে যেক্ষণ দুর্বলের পরাজয় হয়, দৈব ও পৌরুষ এই উভয়ের মধ্যে তেমন দৈবেরই পরাজয় হইয়া থাকে।” সুতরাং বর্তমান দুর্গতি হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় কর্মের সাধনা।

কিন্তু কর্মের সাধনা করিবার পূর্বে কর্ম কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। সুতরাং গ্রন্থকার “অভ্যাসযোগ ও কর্মযোগ” নামক অধ্যায়ে বহুল শাস্ত্রবাক্য ও যুক্তি সহকারে কর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

একদিন মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ “ধর্মতত্ত্বে” তাঁহার স্বদেশবাসীকে কর্মের তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন “সকল বৃত্তির পূর্ণ পরিণতি ও সামঞ্জস্যের” সাধনাই কর্ম। ভূপেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে শাস্ত্রমতে ভগবৎশাক্তের সাধনা এবং ভগবৎ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্মই—প্রকৃত কর্ম।

কারণ “যিনি সকল শক্তির মূল, সকল জ্ঞানের আধার, সকল আনন্দের অমৃত-নিকেতন, তাঁহাকে লাভ করিলে সকল বৃত্তি আপনিই স্বাযথ বিকশিত হইয়া উঠে,

কুপ্রবৃত্তি আপনি সঙ্কুচিত হয়, সুপ্রবৃত্তি আপনি অনন্ত বিকাশলাভ করে ;—

“যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোহপি শাখাঃ ।”

কর্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অভ্যাস ও সাধনা দ্বারা কিরূপে চিত্তশুদ্ধি ও প্রকৃত উন্নতিলাভ ঘটিতে পারে, বহু সুপ্রসিদ্ধ চরিত্রবান ব্যক্তির চরিত্র হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন “অভ্যাসের দ্বারাই মানুষ আবদ্ধ, মোহমুক্ত, দুর্ব্বল—আবার অভ্যাসই তাহাকে সবল, জ্ঞানী ও বিমুক্ত করিতে সমর্থ। কদম্বাসের ফলেই আমাদের এই অধোগতি আবার সদভ্যাসই (কর্ম বা চেষ্টা) আমাদের সমুন্নত করিবে। অভ্যাস অপেক্ষা বলাবত্তর আর কিছুই নাই ! ভূমিকাতেও গ্রন্থকার বলিয়াছেন “এই তমসাজ্বর অবসাদবিজড়িত কর্মবিমুখ দেশে কর্মের শক্তির এবং অভ্যাসের ক্ষমতার কথা বজ্র কণ্ঠে শুনাইবার দিন আসিয়াছে।

কর্মের দ্বারাই কর্মকে অতিক্রম করা যায়, সদভ্যাসের দ্বারাই ভগুবানকে লাভ করা সম্ভব হয়, আলম্প্রপারায়ণ, মোহাভিভূত ভারতবাসীকে এ কথা বুঝাইতে পারিলে আর তাঁহার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।

“আমার ক্ষীণ কণ্ঠ, ক্ষুদ্র শক্তি, আমি যতটুকু পারিলাম আমার স্বদেশবাসীকে এই অভয় বাণী শুনাইবার চেষ্টা করিলাম।”

আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে প্রার্থনা করি গ্রন্থকারের সাধু ইচ্ছা সকল হউক।

গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ, সুমিষ্ট, আবেগময়ী এবং গ্রন্থপানি নানা বহুমূল্য উপদেশ ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকারের কঠিন বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

ছাপা, কাগজ ও আলোচ্য বিষয়ের তুলনায় পুস্তকের মূল্য অতি যৎসামান্য।

আশা করি, প্রত্যেক হিন্দু এই মূল্যবান গ্রন্থের এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া হিন্দুর ভগবৎ প্রীতি, জ্ঞান ও সাধনার প্রকৃত তথ্য অবগত হইবেন।

শ্রী :—

আত্মপ্রকাশ

এ বক্ষে গুঞ্জরি উঠে যত ছন্দ সুর,
কিছু মোর নয়, শুধু পরশ তোমার
মোর তন্ত্রীরাঞ্জি মাঝে ফিরি বার বার
রণিয়া রণিয়া উঠে সঙ্গীত মধুর।
উপল আঘাতে যথা ফেনিল উজ্জ্বাসে
আকুল প্রবাহ ভরা নির্যয়ের গান
কল্লোলে কাঁপিয়া উঠে, অধীর উল্লাসে।

অথবা সমীরস্পর্শে মৃদু কম্পমান
ওরুর মর্ম্মর তান পাতায় পাতায়,
অপূর্ব পুলকে যথা উঠে শিহরিয়া
মৃদল মঞ্জুলঞ্জে। বাজালে আমার
বাঁশরীর মত, দিলে বক্ষে ফুকারিয়া
যোর প্রাণবায়ু তব সুরভির্নিশ্বাস,
ছন্দে গীতে আপনানারে করিলে প্রকাশ।

শ্রীহরেশ্বর শর্মা।

মুদ্রা-মনস্তর

কোম্পানী বাহাদুর কিন্তু সময়ে সময়ে নিজের প্রবর্তিত নোটে নিজ প্রাপ্য বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইতেন। তখন চাহিতেন টাকা! * ইহাতেই নোটের উপর দেশের লোকের আস্থা ক্রমেই কমিতে লাগিল। মুদ্রার অভাবে বাঙ্গালার লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া দস্যুতা করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং কোম্পানী বাহাদুর রক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। ধনবান গৃহস্থগণ লাঠিয়াল রাখিল। এক স্থান হইতে অন্য় স্থানে টাকা পাঠাইতে হইলে কখনো কখনো সৈন্ত-সামন্ত পর্য্যন্ত আবশ্যক হইতে লাগিল। কোম্পানী বাহাদুর দেখিলেন একশত টাকা প্রেরণ করিতে শুধু রক্ষীর জন্মই পাঁচ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল! তাহার প্রমাদ গণিলেন।

দেখে যে মুদ্রা ছিল তাহা বহু পুরাতন। লোকে উহার সহিত যদৃচ্ছা খাইদ মিশাইল,—রূপা কাটিয়া লইল এবং নানাবিধ উপায়ে প্রচলিত মুদ্রার অঙ্গহানি করিয়া উহা বাজারে চালাইতে লাগিল। সুতরাং হাতে পাইলেই লোকে শুদ্ধ মুদ্রার আনুমানিক মূল্য ধরিয়া প্রচলিত মুদ্রার মূল্য বিক্রয় করিতে লাগিল। সরকারী খাজনাখানার কস্তাগণ এই সুযোগে জমীদারদিগের নিকট হইতে বেশ অধিক মাত্রায় বাটা আদায় করিয়া লইতে

লাগিলেন। যে মুদ্রার বয়স এক বৎসর মাত্র হইয়াছিল তাহার বাটা শতকরা তিন টাকা ধরা হইল—যাহার বয়স দুই বৎসর তাহার বাটা লাগিত শতকরা পাঁচ টাকা! সেই সকল মুদ্রা প্রকৃতই অশুদ্ধ কি না সে বিষয়ে কেহ অনুসন্ধান করিত না!

জমীদারগণ এই ক্ষতি বহন করিলেন না। সমস্ত টাকা গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া দরিদ্র প্রজার শিরে নিপতিত হইল! সরকারের সেরেস্তায় জমীদার যে পরিমাণ বাটা দিলেন দরিদ্র প্রজা জমীদারকে তাহার চতুর্গুণ দিতে বাধ্য হইল। তাহার রোদন করিল—হায় হায় করিল—শেষে গৃহাদি বিক্রয় করিয়া জমীদারের প্রাপ্য পরিশোধ করিল!

সিকা হইতে আরম্ভ করিয়া তখন ৩২ প্রকারের টাকা, নানা মূল্যের মোহর প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। কোম্পানীর সেরেস্তায় কোথাও বা ‘কড়ি’ চলিত, কোথাও বা চলিত না—কোন কালেক্টর স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিতেন, কেহ বা করিতেন না। কেহ বা তখন স্থির করিতেই পারিয়াছিলেন না যে কোন মুদ্রা গ্রহণ করিবেন! নিরঙ্কর বঙ্গীয় কৃষক অত কথা বুঝিল না। বাঙ্গালার বাজারে তাহার অতকাল ধরিয়া যে সকল মুদ্রা দেখিয়া আসিতেছিল, তাহার যে কোনো একটা লইয়াই তাহার অবাধে গোলাব ধাতু বা চাউল বিক্রয় করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে যখন রাজস্ব

* Letter from the Collector to the Board of Rev., April 1789.

দিবার জ্ঞাত সেই সঞ্চিত অর্থ লইয়া কোম্পানীর দ্বারে বা জমীদারের নিকট উপস্থিত হইল তখন শুনিল “এ টাকা চলিবে না!” তাহারা বন্ধে করাবাত করিতে লাগিল।

মুদ্রা সম্বন্ধে এত সতর্ক হইয়াও কোম্পানী বাহাদুর দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অর্ধাঙ্গারে অনেক অশুদ্ধ টাকা জমিয়া গিয়াছে! তাঁহারা মনে করিলেন ইহা কেবল দুই লোকের বাটা-লাভের প্রত্যাশাতেই ঘটতেছে। কোম্পানী বাহাদুর অবিলম্বে নানাবিধ বিধি-নিয়ম প্রবর্তিত করিলেন। হুংগ গেল না।

সুবর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য স্থির ছিল না। যখন যেরূপ ইচ্ছা কোম্পানী বাহাদুর তখন তাহাই সোণা-রূপার বাজার দর বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার হুংগ তাহাতেও ঘুচিল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কলিকাতা গেজেটে তখন একটা নাতিদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশিত হইল। * সে মন্তব্যের মানে এই যে সুবর্ণ মোহর প্রকৃত করিতে এখনো এত অধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহাতে দরিদ্রের সর্বনাশ ঘটতেছে। বর্দ্ধমান হইতে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য কলিকাতায় আসিয়াছে। তবুও যে মুদ্রা-বিভ্রাট বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা দেখিয়া মনে হয় এ কেবল ধনশালী অর্ধগৃহুদিগের ষড়যন্ত্র মাত্র। আর কিছু কাল এ ভাবে চলিলে দুষ্কৃতকারীদিগকে বিশেষ দণ্ডিত হইতে হইবে! কিছু দিন পর গেজেটে আবার দেখা গেল—

দেশের এই দুর্দশা নিবারণের জ্ঞাত বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। যদি কোনো উপায় নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে কুসীদজীবীদিগের চরণতলে আশ্রয় দিতে হইবে—দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য চিরদিনের জ্ঞাত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে!

কোম্পানী বাহাদুর স্থির করিলেন মুদ্রা-বিভ্রাট বিদূরিত করিতে হইলে সমুদয় পুরাতন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তৎপারবর্তে স্থির মূল্যের নূতন টাকা প্রচলিত করাই একমাত্র উপায়। তাঁহারা অবিলম্বে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে উপায়টিকে তাঁহারা নিতান্ত সহজ ও সরল মনে কল্পিয়াছিলেন তাহা একান্ত জটিল ও কঠিন। লোকে পুরাতন টাকা বহিয়া আনিয়া কোম্পানী বাহাদুরকে দিয়া প্রতি টাকার পাঁচভাগের তিনভাগ মাত্র লইয়া গৃহে কিরিতে চাহিল না! কিন্তু কোম্পানী বাহাদুর ছাড়িলেন না—ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এ দিকে যতই সময় যাইতে লাগিল ততই দেশে যাহা কিছু সামান্য মুদ্রা ছিল তাহাও নিঃশেষিত হইল। অর্পের অভাবে বাণিজ্য পক্ষেই অস্বাভাবিক সমুচিত হইয়াছিল, এখন অচল হইয়া উঠিল! প্রবীণ বণিকগণ মুদ্রার অভাবে পণ্যক্রয় করিতে পারিলেন না! তখন কেহই ধারে পণ্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল না। সকলেই বুঝিয়াছিল, একবার ধারে বিক্রয় করিলে আর মূল্য পাওয়া যাইবে না। দেবে মুদ্রা নাই—লোকে মূল্য দিবে কিসে? কোম্পানী বাহাদুর তখন স্বর্ণ-মুদ্রা প্রস্তুত করিতে

লাগিলেন। বাঙ্গালার বাজারে তখন যে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল তাহারই হিসাবে সুবর্ণ-মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারিত হইল।

কোম্পানীর স্বর্ণ ছিল না; তাঁহার কাঞ্চনের জন্ম কাঙ্গালের মুখাপেক্ষী হইলেন! বঙ্গবাসীগণ দেখিল যে, কোম্পানীর মোহর বাজারের রৌপ্যমুদ্রার হিসাবে যে মূল্যে বিক্রীত হওয়া উচিত ছিল তাহা অপেক্ষা শতকরা ১৭১০ টাকা অধিক মূল্যে চলিতেছে। বঙ্গবাসী দলে দলে সেই কাঞ্চন-সমুদ্রে বাষ্প প্রদান করিল। যাহার যে টুকু সোণা ছিল সে তাহাই লইয়া কোম্পানী বাহাদুরের টঙ্কশালার সিংহদ্বারে হত্যা দিয়া পড়িল! কেহ কেহ হয় ত দুহিতা-বনিতার অঙ্গভরণ পর্য্যন্তও গলাইতে ক্রৌড় করিয়াছিল না! কোম্পানী বাহাদুর বহুতর সুবর্ণমুদ্রা প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু দেশের হৃদশা গেল না।

আবার বিচার ও বিতর্ক উপস্থিত হইল। অনেক চিন্তার পর কোম্পানী বাহাদুর বুঝিলেন যে, তাঁহার সুবর্ণের আদর যতই বৃদ্ধি করিয়াছেন, হতাদরে রৌপ্য ততই প্রিয়মান ও মূল্যহীন হইয়াছে! তখন স্বর্ণমুদ্রায় নিজেদের অংশ প্রদান করিয়া লোকে শতকরা ১৭১০ টাকা অধিক লাভ করিতেছিল বটে, কিন্তু যাহাদিগের উহা ছিল না তাহারা রৌপ্যমুদ্রায় আপন দেয় পরিশোধ করিয়া তুল্যরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল।* সর্বদা সুবর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিতে পারে এ দেশে এমন লোকের সংখ্যা এখনো যেমন অল্প তখনো তেমনিই ছিল। কাজেই হুংখ যাহার চিরসঙ্গী তাহার হুংখ রহিয়াই গেল। কৃষকগণ দেখিল তাহাদিগের ক্ষেত্র-

পূর্ণ ধাতু আছে। জমীদার জমাও বৃদ্ধি করেন নাই, অথচ রাজস্ব দিতে গেলেই সর্বনাশ ঘটে! তাহারা ইহার কারণ বুঝিল না বটে, কিন্তু রোদন করিতে লাগিল—ক্ষুধায় মরিতে লাগিল। আগে ধাতু বিক্রয় করিয়া রাজস্ব পরিশোধ করিয়াও তাহারা কিছু সঞ্চয় করিত! সেই সঞ্চিত অর্থ তেল-লুন-লকড়ি জুটিত, খোকার মার বাউটী পৈছা হইত, খোকার পায়ে খাড়ুয়া উঠিত। কিন্তু এখন রাজস্ব দিতেই সব ফুরাইতে লাগিল—কখনো বা কুলাইলও না! মাঠের ধাতু ফুরাইল, গোশালার গরু ফুরাইল। কেবল ফুরাইল না ক্ষুধা, আর ফুরাইল না তপ্ত আঁধি জল।

কোম্পানী বাহাদুর কাঞ্চনমুদ্রা প্রসব করিয়াও বাঙ্গালার বাণিজ্যকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কলিকাতার বণিকসম্প্রদায় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, কবে বা মুদ্রার অভাবে যোগ বাতি জালিয়া নিশাযোগে পলায়ন করিতে হয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ যাহারা মূলধন ধার করিয়া ব্যবসায় চালাইত এবং পণ্য বিক্রয় হইলেই মহাজনের পুঁজি দেনা শোধ করিয়া নূতন ঋণ গ্রহণ করিত, তাহারা দলে দলে কারাগারে বাইতে লাগিল—মহাজনের দেনা শোধ দিতে পারিল না। যাহারা কোটা টাকার পণ্যে মালগুদাম পূর্ণ করিয়া কলিকাতার শ্রেষ্ঠ বণিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন মুদ্রার অভাবে তাঁহার পর্য্যন্ত দৈনন্দিন আবশ্যক দ্রব্যাদিও ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিলেন!

এই মুদ্রা-মহাস্তর যে তখন কেবল

কলিকাতাতেই নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। ছিয়াত্তরের মনস্তত্ত্বের মত উহা সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজ বণিকগণ বলিতে লাগিলেন যে যাঁহাদিগের রৌপ্যমুদ্রা আছে তাঁহারা যদি কোম্পানীর নিরূপিত মূল্যে সুবর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে উহা না দেয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করা হউক। ‘আরমেনিয়ানগণ’ কহিলেন দেশে যেখানে যতটুকু সুবর্ণ আছে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করা হউক—তাহা হইলেও ত দেশে মুদ্রা থাকিবে!

কোম্পানী বাহাদুর যে কি করিবেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পুনরায় সুবর্ণমুদ্রাই প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এবার রৌপ্যমুদ্রার তুলনায় সুবর্ণমুদ্রার মূল্য শতকরা ৫০০ টাকা হইল। যাঁহাদিগের নিকট সুবর্ণ ছিল এবারও তাঁহারা তাহা কোম্পানী বাহাদুরকে দিয়া মোহর লইল। কলিকাতার কোম্পানি মনে করিলেন, এতদিনে ঠিক হইয়াছে—ঔষধ জানা গিয়াছে। এইবার ব্যাদি সারিবে। ব্যাদি সারিল না!

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

মানবের জন্মকথা

জন্তুগণের ব্যক্তিবোধ আছে, ইহা নিশ্চিত। পূর্বকথিত কুকুরের মনে আমার কণ্ঠস্বর যখন কতকগুলি ভাবের উদয় করিয়া দিয়াছিল, তখন তাহার মনোমধ্যে ব্যক্তিত্বের বোধ অবশ্যই সঞ্চিত ছিল; কিন্তু ঐ পাঁচ বৎসর কালে * তাহার মস্তিষ্কের প্রত্যেক পরমাণুই একাধিক বার পরিবর্তিত হইয়াছে! বিবর্তনবাদিগণকে চূর্ণ করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি একজন† যে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন ঐ কুকুরও সেইরূপ তর্ক করিয়া বলিতে পারিত—“সর্বপ্রকার মানসিক অবস্থা এবং পরিবর্তনের মধ্যেও আমি যে-ছিলাম সে ই আছি। এক পরমাণু যায়, অপর

পরমাণু তাহার স্থান অধিকার করে। কিন্তু যে যায় সে যাইবার সময় তাহার স্থলভর্তী স্বীয় ভাব সকল দিয়া যায়, এই মহ অহং-জ্ঞানের বিপরীত, অহংবোধের অপরিজ্ঞাত, স্মৃতির মিথ্যা; কিন্তু এ মত বিবর্তনবাদের পক্ষে অপরিহার্য্য স্মৃতির বিবর্তনবাদ মিথ্যা।”

ভাষা। এই বৃত্তি সঙ্গীতরূপেই মানবের এবং ইতর জন্তুগণের মধ্যে এক প্রধান প্রভেদ বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু আর্কবিসপ হোএট্‌লি একজন অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি; তিনি বলেন “কেবল যে মানুষই মনের ভাব ভাষা দ্বারা বাক্য করিতে পারে অথবা অন্তের মনের ভাব ভাষা দ্বারা অন্যান্যকে বুঝিতে সমর্থ হয়, তাহা নহে।”

প্যারাগোয়ে দেশের সিবাস একারি নামক বানরগণ উন্মোচিত হইলে ছয় প্রকার শব্দ

* ডারউইন পাঁচ বৎসর কাল ঐ কুকুরের সহিত দেখা করেন নাই।

† ডাক্তার জে. ক্যাক্সন।

উচ্চারণ করে, তাহা শুনিয়া অল্প বানরও অমুরূপ ভাবে উত্তেজিত হয়। আমরা বানরের মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী বুঝি, এবং তাহারাও আমাদেরই ঐ সকল বুঝে, ইহা রেঞ্জার এবং অগ্ন্যাগ্নে বলিয়াছেন। কুকুর গৃহপালিত হইবার পর চারি পাঁচ প্রকার বিভিন্ন স্বরে ডাকিতে শিখিয়াছে, ইহা অধিকতর উল্লেখযোগ্য। যদিও এই ডাক অভিনব তথাপি কুকুরের আরণ্য পূর্ব-পুরুষগণও বিবিধ ধ্বনি করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিত। গৃহপালিত কুকুর একাগ্র মন হইলে এক প্রকার ডাকে, যেমন শিকার কালে; ক্রোধে অল্প প্রকার ডাকে; বেউ বেউ আর এক প্রকার; হতাশের প্লুত পর ও চিংকার, যেমন অবরুদ্ধ হইলে ডাকে, উহা ভিন্নরূপ; রাত্রিকালের ডাক : আহ্লাদের ডাক, যেমন প্রভুর সহিত বেড়াইতে যাইবার সময় ডাকে; এবং কোন জানালা কিম্বা দ্বার খুলিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে কুকুরগণ আদেশ অথবা অনুময়সূচক স্বরে স্পষ্টরূপে ডাকে, সে অল্প প্রকার। হোকাঁ কণ্ঠস্বরের বিশেষ অন্তর্দীপন করিয়াছেন; তিনি বলেন গৃহপালিত পক্ষী ন্যূনকালে দ্বাদশ প্রকার বিভিন্ন ধ্বনি করে।

যাহা হউক স্পষ্টভাবে উচ্চারিত (বর্ণাত্মক) ভাষা নিয়ত ব্যবহার করা মানবের বিশেষত্ব; অঙ্গভঙ্গী ও মুখমণ্ডলের পেশী সঞ্চালনসহ অব্যক্ত ধ্বনি করতঃ অর্থ-প্রকাশ, মানুষেও করে, ইতরজন্তুতেও করে। সরল এবং স্পষ্টানুভূত ভাব সকল সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে সত্য, ও সকলের

সহিত উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিঃ সংশ্রব কম। শারীরিক ক্রেশ, ভয়, আশ্চর্য্য, ক্রোধ ও তত্ত্ব ভাবমূলক কথা; এবং স্নেহময় প্রিয় পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া মাতা যে সকল নিরর্থক ধ্বনি উচ্চারণ করেন তাহা, অর্থপূর্ণ শব্দ অপেক্ষাও অধিকতর সার্থক। বর্ণাত্মক শব্দ বুদ্ধিতে পারা সম্বন্ধে মানুষে এবং ইতর জন্তুতে অলজ্ঞতা প্রভেদ নাই, কারণ সকলেই জানেন কুকুরগণ ঐরূপ অনেক শব্দ ও পদ বুদ্ধিতে পারে। উহারা এই বিষয়ে যে পরিমাণ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা দশ বার মাস বয়সের শিশুদিগের ন্যায়; কারণ ঐ শিশুগণও অনেক শব্দ ও পদ বুদ্ধিতে পারে, কিন্তু উচ্চারণ করিতে পারে না। কেবলমাত্র উচ্চারণও আমাদের অনন্ত-সাধারণ বিশেষত্ব নহে, কারণ টিয়া এবং অগ্ন্যাগ্নি [কোন কোন] পক্ষীও উচ্চারণক্ষম। নির্দিষ্ট স্বরের সহিত নির্দিষ্ট ভাব সংযুক্ত করিবার ক্ষমতাও আমাদের ঐরূপ বিশেষত্ব নহে; কারণ ইহা নিশ্চিত যে কোন কোন টিয়া পাখী যাহাদিগকে কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহারা অভ্রান্ত-রূপে শব্দের সহিত বস্তুর এবং ঘটনার সহিত ব্যক্তির সংযোগ করিতে সমর্থ হয়। মানুষে এবং ইতরজন্তুতে একমাত্র প্রভেদ এই যে, সম্পূর্ণ পৃথক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ধ্বনি ও ভাব একত্র সংযোগ করিবার শক্তি উহাদিগের অপেক্ষা মানুষের অধিক; কিন্তু ইহা তাহার মানসিক বৃত্তিসমূহের উন্নত বিকাশের উপর স্পষ্টই নির্ভর করিতেছে।

ভাষাতত্ত্বশাস্ত্রের অগতম প্রতিষ্ঠাতা হর্গটুক্ বলিয়াছেন সুরা প্রস্তুত অথবা রুটি

প্রস্তুত করার তায় ভাষাও একটা শিল্প; কিন্তু ভাষা না বলিয়া লেখা বলিলেই উদাহরণটি আরও ভাল হইত। ভাষা প্রকৃতপক্ষে সহজাত বৃত্তি নহে, কারণ প্রত্যেক ভাষাই শিক্ষা করিতে হয়। উহা প্রচলিত শব্দগুলি হইতে অনেক বিভিন্ন, কারণ মনুষ্যের কথা বলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে; তাহা শিশুদিগের অক্ষুট বাক্য উচ্চারণ হইতেই বুঝা যায়; কিন্তু কোন শিশুরই সুরা অথবা রুটি প্রস্তুত করিবার কিম্বা লিখিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই। কোন ভাষাবিৎই এখন বিবেচনা করেন না যে ভাষা মানুষে গড়িয়াছে; উহা ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে [আমাদিগের] অজ্ঞাতসারে গঠিত অথবা বিকশিত হইয়াছে। সকল প্রকার ধ্বনি অপেক্ষা পক্ষীর ধ্বনি অনেকাংশে ভাষার সহিত অধিক তুলনীয়। কারণ, একজাতীয় সমস্ত পক্ষীই ভাব প্রকাশের নিমিত্ত একই প্রকার স্বাভাবিক ধ্বনি করে; এবং যে সকল পক্ষী গান করে তাহারা স্বভাবতঃই ঐ শক্তিপরিচালনার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু উহার স্বজাতীয় প্রকৃত গান কিম্বা পরস্পরকে ডাকিবার স্বর পিতামাতার অথবা পাণ্ডকের নিকট শিক্ষা করে। “এই ধ্বনিগুলি যেমন সহজাত নহে, তদ্রূপ মানবীয় ভাষাও সহজাত নহে。” এ কথা ভেন্স ব্যাবিংটন প্রমাণ করিয়াছেন। “উহাদিগের গান করিবার প্রথম চেষ্টার সহিত মানব-শিশুর প্রথম অক্ষুট কথা কহিবার চেষ্টার তুলনা করা যায়।” অল্প-বয়স্ক পুং-পক্ষীগুলি দশ এগার মাস পর্য্যন্ত

গানের চেষ্টা করে; পাখীধরারা তাহাকে “আলাপ” করা * বলে। ঐ পক্ষীগুলির প্রথম চেষ্টা শুনিলে গানের একটু আভাসও পাওয়া যায় না, পরে উহাদিগের বংশই বয়স বাড়ি ততই বুঝা যায় যে গানের চেষ্টা করিতেছে, অবশেষে উহাদিগের স্বজাতীয় গানের সুর স্পষ্ট হইয়া উঠে। একজাতীয় পাখীর ছানাগুলি অজ্ঞাতীয় পক্ষীর গান শিক্ষা করিলে নিজের ছানাগুলিকেও ঐ নূতন সুর শিক্ষা দেয়, তাহাতেই উহা বংশানুগত হইয়া যায়; কতিপয় কেনাঙ্গী পক্ষীর এইরূপ হইয়াছিল। ব্যাবিংটন বলেন, একজাতীয় পক্ষীর গানেই যে বিভিন্ন প্রদেশে কিছু-কিছু বিভিন্নতা লক্ষিত হয় তাহা মানবীয় ভাষার প্রদেশগত পার্থক্যের সহিত ঠিক তুলনীয়। আর, বিভিন্নজাতীয় অথচ সমশ্রেণীর † পক্ষিগণের যে পার্থক্য আছে তাহা বিভিন্নবর্ণীয় ‡ মানবের ভাষা-প্রভেদের সহিত তুলনীয়। কোন একটা শিল্পকৌশল প্রাপ্ত হইবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কেবল যে মানুষেরই আছে তাহা নহে, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত উল্লিখিত উদাহরণগুলি প্রদর্শন করিলাম।

একদিকে মিঃ হেন্সে ওয়েজউড, রেভেরেন্ড ফ্যারার এবং অধ্যাপক স্কিকারের উত্তম কোতুহলোদ্দীপক গ্রন্থ

* Recording.

† আমাদিগের পরিভাষা অনুসারে “বিভিন্ন প্রকার অথচ সমজাতীয়” লেখা উচিত ছিল, কারণ মানবের বিভিন্ন Raceকে বিভিন্ন জাতীয় বলা যায় না, কিন্তু ডারউইন্ মুখে কেবল speciesশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

‡ বর্ণ = Race.

সকল, অপরদিকে অধ্যাপক ম্যাক্স মুলারের বিখ্যাত লেকচারগুলি পাঠ করিয়া পুষ্ট উচ্চারিত (বর্ণাত্মক) ভাষার মূল সম্বন্ধে আমার বিবেচনা হয় যে নানাবিধ প্রাকৃতিক ধ্বনির ও অপরাপর জন্তুগণের ধ্বনির এবং মানবের সহজাত ধ্বনির অনুকরণে ও পরিবর্তনে, ইঙ্গিত ও অশব্দজ্ঞায়িত ভাষা গঠিত হইয়াছে। * ইহাতে সন্দেহ করিতে পারি না। “দাম্পত্য নির্মাচন” আলোচনা করা কালে আমরা দেখিব যে প্রাথমিক মানব অথবা মানবের আদিম পূর্বপুরুষ সম্ভবতঃ সঙ্গীতের স্বর উৎপাদন করিতে গিয়াই প্রথমে কণ্ঠস্বর ব্যবহার করিয়াছিল; এখনও কতিপয় জিবন্ বানর যমন করিয়া থাকে, তেমনই গান করিতেই প্রথমে কণ্ঠস্বর ব্যবহৃত হয়। জীবজগতের বহু স্থলের দৃষ্টান্ত অনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে জীপুরুষের মিলন চেষ্টাতেই প্রথমে সঙ্গীত ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং তদ্বারা প্রণয়, ঈর্ষা, বিজয়-গৌরব, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বুদ্ধে আহ্বান করা প্রভৃতি নানাবিধ ভাব প্রকাশ করা হইত। সূত্রান্তঃ সঙ্গীতের স্বর অনুকরণ করিয়াই বর্ণাত্মক শব্দ হইয়াছে ও তদ্বারা বিবিধ জটিল ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, ইহাই সম্ভব বোধ হয়। অনুকরণে সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, আমাদের নিকট

* মৎপ্রণীত “ভাষা ও আদিমস এবং পরবশতা” নামক গ্রন্থে ভাষার মূল আদিমস অর্থ কালভাব, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সমস্ত জীব-রাজ্য পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বোধ হয়। অনুবাদক।

কুটুম্ব বানরগণ, আজন্মজড়ভাবাপন্ন আবোধ-গণ এবং অসভ্য মানবগণ যাহা শুনে তাহাই অনুকরণ করিবার প্রবল প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকে। মানুষ যাহা বলে বানর তাহার অনেক ভাগ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে; বহু বানর বিপদকালে ইঙ্গিতসূচক ধ্বনি করিয়া অপর বানরকে বিপদের কথা জানাইয়া দেয়; পক্ষিগণ মাটিতে বাজের আক্রমণ আশঙ্কা করিলে একরূপ এবং আকাশে ঐ আশঙ্কা করিলে অপরূপ ধ্বনি করত অপর পক্ষীদিগকে বিপদবার্তা জানাইয়া দেয়—(শুধু তাহাই নহে, আর এক তৃতীয় প্রকার ধ্বনিও উহার করিয়া থাকে, তাহা কুকুরের বুকে); এমত অবস্থায় ইহা কি সম্ভব নহে যে, কোন বুদ্ধিমান বানর-তুলা প্রাণী * শিকারী হিংস্র জন্তু হইতে বিপদ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে তাহার ধ্বনি অনুকরণ করতঃ ঐরূপ অপরাপর প্রাণিগণকে বিপদের কারণ জানাইয়া দিত? যদি ইহা সম্ভব হয়, তবে ইহাই ত ভাষাগঠনের প্রথম সূত্রপাত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কণ্ঠস্বর যতই ব্যবহৃত হইতে লাগিল ততই শব্দ-উৎপাদক যন্ত্রগুলি পুষ্ট ও পূর্ণ গঠিত হইল। এই ফল বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছিল। † এই পুষ্ট ও পূর্ণতা বাক-শক্তিকেও উত্তোরস্তর বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু মস্তিষ্কের উন্নতির সহিত ভাষার উন্নতি যেরূপ ভাবে সংঘটিত তাহাই অধিক গুরুতর কথা। ভাষার অতিশয় অনুন্নত অবস্থার

* অর্থাৎ মানবের আদি-পুরুষ।

† এক্ষণে ইহা স্বীকৃত হয় না।

পূর্বেও বর্তমান বানরগণের মনোবৃত্তি অপেক্ষা মানবের আদিম পূর্বপুরুষের মনোবৃত্তি অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত বিশ্বাস করা যায় যে নিয়ত ভাষার ব্যবহার এবং বাকুশক্তির উন্নতি বশতঃ [মানবের] মনও উন্নত হইয়াছিল ; কারণ ভাষার ব্যবহার হেতু দীর্ঘ বিচার বিতর্ক করিবার শক্তিও বাড়িয়াছিল। অন্ধ অথবা বীজগণিত ব্যবহার ব্যতীত যেমন দীর্ঘ গণনা করা যায় না, তদ্রূপ উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত শব্দের সাহায্য ভিন্ন দীর্ঘ জটিল বিষয়ের চিন্তা করাও সম্ভব নহে। ইগাও বোধ হয় যে সামান্য বিষয়ের চিন্তা করিতেও কোন প্রকার ভাষা ব্যবহার করা আবশ্যিক হয়, অথবা ব্যবহার করিলে অনেক সুবিধা হয়, কারণ মুক, বধির এবং অন্ধ বালিকারা ব্রিজ-ম্যান স্বপ্নদর্শন কালে অদ্ভুত সঞ্চালন করিত। কিন্তু কুকুরের স্বপ্নদর্শন বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, কোন প্রকার ভাষা ব্যবহার ব্যতীতও স্পষ্ট, পরস্পর সংস্পৃষ্ট দীর্ঘ ভাবপরস্পরা মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। পূর্বে দেখাইয়াছি যে ইহঁর জন্তগণ ক্রিয়ংপরিমাণে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই ভাষা ব্যবহার করে না। বর্তমান কালে আষাদিগের মস্তিষ্কের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহার সহিত বাকুশক্তির বনিষ্ট সম্বন্ধ আছে ইহা কোন কোন অদ্বৃত্ত মস্তিষ্কপীড়ায় বাকুশক্তি বিশেষ আক্রান্ত হওয়া দেখিলেই উত্তমরূপে বুঝা যায়। ঐ সকল পীড়ায় কখন বিশেষ

শব্দ শ্রবণ হয় না, অথচ অল্প শব্দ শুদ্ধরূপে ব্যবহার করা যায় ; কখন বা কোন শ্রেণীর কর্তৃপদ, অথবা তাহার আন্ত অক্ষর িংবা সংজ্ঞা শব্দ মনে পড়ে না। মনের যন্ত্র এবং শব্দ-যন্ত্র নিয়ত ব্যবহার করিলে ঐ সকল যন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়া বংশানুক্রমে পরিবর্তিত হওয়া যদি অসম্ভব হয়, তবে হস্তাক্ষর, যাহা হস্তের গঠন এবং মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহাও বংশানুকৃত হওয়া সম্ভব, কিন্তু হস্তাক্ষর ত নিশ্চয়ই বংশানুকৃত।

অনেক গ্রন্থকার বিশেষতঃ অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার সম্প্রতি দৃঢ়তার সহিত বর্ণিত হেঁ ছেন যে ভাষা ব্যবহার করিতে সাধারণ জাতিবাচক ও গুণবাচক সংস্কার থাকা আবশ্যিক। কিন্তু কোন জন্তুরই এই সংস্কার না থাকা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, এই খানেই মানুষে এবং ইতর জন্ততে অসংখ্য প্রভেদ। আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ইতর জন্তগণের ঐ সংস্কার আছে ; অনুরত এবং অক্ষুট হইলেও আছে। দশ এগার মাস বয়সের শিশুগণ মুক-বধিরগণ যত সম্ভব কতিপয় শব্দের সহিত সাধারণ ভাব সংযোগ করিয়া থাকে,* তাহা কখনই সম্ভব হইত না, যদি উহাদিগের মনে পূর্ব হইতে ঐরূপ ভাব বিদ্যমান না থাকিত। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিবিগিষ্ট জন্তগণের সম্বন্ধে এই কথাই বলা যাইতে পারে। মিঃ লেসলি স্টিফেন বলেন “কুকুর, মেঘের গথবা বিড়ালের একটা সাধারণ সংস্কার রাখে। এবং তাহার অনুরূপ শব্দও জানে ;

* অর্থাৎ অর্থ বোধ করে।

একজন দার্শনিক যেমন জানেন কুকুরও তেমনই জানে। উহা জানিবার ও বুঝিবার শক্তি থাকিলে শব্দ-বোধ যেমন উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়, বাকৃশক্তি থাকিলেও তেমনই প্রমাণিত হয়; তবে ঐ বোধের পরিমাণ ন্যূন হইতে পারে।

শ্রীশশধর রায় ।

বেদের কথা

১ .

মহু ধর্মের লক্ষণ বলিতে যাইয়া, সর্ব্বাদৌ বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্মের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহা বেদবিহিত হওয়া চাই। এখন প্রশ্ন এই, বেদ বলিতে এখানে আমরা কি বুঝিব ?

আর এ প্রশ্নের উত্তরটা আপাততঃ যত সহজ বলিয়া মনে হইতে পারে, প্রকৃতপক্ষে তত সহজও নহে। কারণ মহু এখানে সাধারণ মানব-ধর্মের লক্ষণই নির্দেশ করিয়াছেন, কোনও দেশবিশেষের বা সমাজবিশেষের বিশেষ ধর্মের কথা বলেন নাই। মহু এখানে যে ধর্মের কথা কহিয়াছেন, তাহা কেবল হিন্দুরই ধর্ম নহে, তাহা সকলেরই ধর্ম। এ ধর্ম-বস্তু সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক। হুতরাং এস্থলে বেদ বলিতেও একটা সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক বস্তুকেই বুঝিতে হইবে। না হইলে ঋষিবাক্য মিথ্যা হইয়া যায়।

ফলতঃ একটু তলাইয়া দেখিলেই মহু ধর্মের যে কয়টা লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তার সকল গুলিরই মধ্যে একটা সার্বজনীনতা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। ধর্মের প্রথম লক্ষণ যেমন তাহা বেদবিহিত

হওয়া চাই; সেইরূপ তার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, তাহা স্মৃতিসম্মত ও আবগ্ধক আর এই স্মৃতি-বস্তুও প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমিক। সকল সমাজেই স্মৃতি বলিয়া একটা বস্তু আছে। ইংরেজিতে এই স্মৃতিকে ট্র্যাডিশন (tradition) বলে। এই ট্র্যাডিশন বা স্মৃতি যেমন হিন্দুর ধর্ম, সেইরূপ ইহুদির ধর্ম, সেইরূপ খৃষ্টীয়ানের এবং মুসলমানের ধর্মও আছে। মহু, পরাশর, প্রভৃতি আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র। লৌকিক আচার-বিচার, ক্রিয়াকর্ম, পারিবারিক সংস্কারাদি, সামাজিক বিধিনিষেধ প্রভৃতি এ সকলই আমাদের এই সকল স্মৃতির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। অত্যাচ্ছন্ন সমাজে এবং অপরাপর ধর্মেও আচার-বিচার, ক্রিয়াকর্ম, পারিবারিক সংস্কার ও সামাজিক শাসন, এ সকলই স্মৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর অরণ্যভীত কাল হইতে যে সকল আচারানুষ্ঠানাদি প্রত্যেক সমাজে লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে, তাহারই নাম স্মৃতি। তাহাই ট্র্যাডিশন (tradition)। আর এই স্মৃতি বা ট্র্যাডিশনকে আশ্রয় করিয়াই, জগতের বিবিধ ধর্মের নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম সকল

জনমগুলী মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আমাদের বার মাসের হের পার্কিং ; ইহুদীর পাছোভার (Passover ; খৃষ্টীয়ানের খৃষ্টমাস (Christmas) এবং ইস্টার (Easter) ; মুসলমানের ইদ ও মহররম, এই সকলের প্রতিষ্ঠা সর্বত্রই স্মৃতির উপরে। এই সকল নিত্যনৈমিত্তিক পূজাপার্কিং, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি পারিবারিক সংস্কার, এই সকলের দ্বারাই সর্বত্র ধর্মের বহিরঙ্গগুলি রচিত হয়। এই সকল ধর্মের দেহ-স্বরূপ। এই সকল ব্রতানুষ্ঠানাদিকে বর্জন করিলে, ধর্ম-বস্ত্র ক্রিয়াহীন হইয়া, বাহ্য আশ্রয়ের অভাবে, ক্রমে স্ত্রিয়মাণ হইয়া পড়ে এবং পরিণামে তাহার ধর্মত্ব অর্থাৎ লোকস্থিতিরক্ষার শক্তিসাধ্য পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। কোনও ধর্মের তত্ত্ব যতই বিস্তৃত ও অন্তর্যুক্ত হউক না কেন, তার ঈশ্বরতত্ত্ব যতই নিগূঢ় ও নিরাকার হউক না কেন, এ সকল স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত ব্রতনियমাদি ব্যতীত তাহা কখনওই যথাযথভাবে পরিপুষ্টলাভ করিতে পারে না ; আদৌ বাচিয়া থাকিতে পারে কি না, তাহাই মন্দেহের কথা। সুতরাং সর্বত্রই যে ধর্মের একটা স্মৃতিপ্রামাণ্য আছে, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। যুগে যুগে, জগতে যে সকল নূতন ধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহারাও এইজন্ম প্রাচীন স্মৃতিকে বর্জন করিয়াও, অল্পকাল মধ্যেই নিজেদের এক একটা স্মৃতি বা ট্র্যাডিশন গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হইয়াছেন, নতুবা নিজ নিজ মণ্ডলীয় ঘননিবিষ্টতা-সাধন তাহাদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিত। আমাদের চক্ষের উপরেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও পড়িয়া

রহিয়াছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ ও আৰ্য্যসমাজ উভয়েই স্বল্পবিস্তর পরিমাণে হিন্দুধর্মের পুরাতন স্মৃতির প্রামাণ্য মর্যাদা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন। দয়ানন্দস্বামী তবুও অত্যন্ত ক্রিয়াপরিমাণে মনু-স্মৃতিকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, রাজা রামমোহনের পরবর্তী ব্রাহ্ম-আচার্যগণ তাহাও করেন নাই। কিন্তু এই অতি সামান্য কালের মধ্যেই আৰ্য্যসমাজে এবং ব্রাহ্ম-সমাজে, উভয় সম্প্রদায়েই একটা নূতন স্মৃতির বা ট্র্যাডিশনের (Tradition) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এক সময়ে দ্বারা সর্বনিম্ন শাস্ত্রগুরু বর্জন পূর্বক, গুরু স্বাক্ষরিতিকে অবলম্বন করিয়া ধর্মের প্রামাণ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন ; দ্বারা “সত্যকেই” একমাত্র শাস্ত্ররূপে বরণ করিয়াছিলেন এবং সত্য বিষয়েই “ইহা সত্য অর্থাৎ স্বাভিমত-সম্মত এবং যুক্তিযুক্ত কি না ?” এই প্রশ্ন তুলিয়াই তাহা গ্রহণযোগ্য না বর্জনীয় ইহার বিচার করিতেন ;—এখন তাঁহারা “ইহা ব্রাহ্মধর্ম বা আৰ্য্যধর্ম কি না ?” এই প্রশ্ন তুলিয়া সরাসরি ভাবে সে সকল বিষয়ের সর্বপ্রকারের দাবীদণ্ডয়ার মীমাংসা করিয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মধর্ম বা আৰ্য্যধর্ম বলিতে ইহারা নিজেদের সমাজের স্মৃতি বা ট্র্যাডিশনকেই বুঝেন ; এবং এই সকল স্মৃতি বা ট্র্যাডিশনকে অগ্রাহ্য করিয়া কেহ আর এখন ব্রাহ্ম বা আৰ্য্য থাকিতে পারেন না। এইরূপে, এই অতি সামান্য সময়ের মধ্যে, একরূপ আমাদের চক্ষুর উপরেই, ব্রাহ্মসমাজ এবং আৰ্য্যসমাজ ওভিত নতন ও সংস্কৃত ধর্মেও, নিজ নিজ

সম্প্রদায়ের স্বৃতি বা ট্র্যাডিশনই ক্রমে ক্রমে সত্তার অসুতম এবং কার্যতঃ শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য হইয়া উঠিয়াছে। আর জগতের সর্বত্রই এইরূপ করিয়া স্বৃতিপ্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব মনু-নির্দিষ্ট ধর্মের দ্বিতীয় লক্ষণও একান্তই সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক। এস্থলেও মনু কোনও ধর্ম-বিশেষের লক্ষ্য নির্দেশ করেন নাই, সাধারণ ও সার্বজনীন মানব-ধর্মের কথাই বলিয়াছেন।

তারপর “স্বগ্য চ প্রিয়মান্বনঃ”—মনু ধর্মের এই তৃতীয় লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। -ধর্মবস্তুর আত্মার প্রীতিকর হওয়া আবশ্যিক। মনু এখানে প্রেরকের কথা ব্যবহার করেন নাই। ধর্ম আত্মার প্রের-সাধক হইবে, এমন বলেন নাই। কারণ প্রেরসাধক যে ধর্মের লক্ষণ 'ইহা' বলাই প্রথমে নিম্প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ কোনও বস্তু প্রীতিকর হইল কি না, ইহা সকলেই সহজভাবে বুঝিতে পারে; শ্রেয়স্কর হইল কি না, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে, অনেকের পক্ষে সাধ্যাত্ত কি না, ইহাই সন্দেহের কথা। ধর্ম আত্মার প্রীতিকর হইবে—মনু এখানে ‘আত্মগত’ও কোনও গভীর দার্শনিক বা তত্ত্ববিদ্যাসম্মত অর্থে ব্যবহার করেন নাই। মোটামুটি সকল লোকেই যাকে “আমি” ও “আমার” বলিয়া থাকে এবং “আমি” ও “আমার” বলিয়া যাহাকে বোঝে, এখানে তাহাকেই আত্মা বলা হইয়াছে। আর ধর্মবস্তু এই আত্মারই, প্রীতিসাধন করিবে ধর্মের অনুসরণে যে যেমন লোকই হউক না কেন

তারও আত্মপ্রসাদ জন্মিবে, ইহাও ধর্মের একটা সাধারণ, সার্বভৌমিক ও সার্বজনীন লক্ষণ। ধর্মের শাসন-সংযম সকলই আছে, সকলই থাকিবে। তার অশেষবিধ বিধি-নিষেধ আছে, এ সকলও সর্বদাই থাকিবে। ধর্মপথে চলিতে গেলেই আত্মার লোভা-দিকে কোনও না কোনও দিকে, কোনও না কোনও আকারে, সংঘত করিতে হইবেই হইবে। কোনও না কোনও আকারের ত্যাগস্বীকার, ক্রেশস্বীকার ধর্মমাত্রেরই আছে। কিন্তু এই সকল ত্যাগ-ও-ক্রেশস্বীকারের ফলে সকল ধর্মেই যজ্ঞমানেরা একটা না একটা, আত্মপ্রসাদও লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই আত্মপ্রসাদও ধর্মের সাধারণ ও সার্বজনীন লক্ষণ—কোনও ধর্মে ইহা আছে, কোনও ধর্মে ইহা নাই, এমন বলা অসম্ভব। এইরূপে এক এক করিয়া মনুনির্দিষ্ট ধর্মের লক্ষণগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই, মনু এখানে যে কোনও ধর্মবিশেষের কথা কহেন নাই, যাহা সকলের ধর্ম, সকল দেশে, সকল কালে যাহা ধর্ম, অর্থাৎ যে ধর্ম সার্বভৌমিক, সার্বকালিক, সার্বজনীন, তাহারই লক্ষণ নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য বলিয়া বোধ হইবে।

আব তাহাই যদি হয়, তবে মনু ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়া যে “বেদের” কথা কহিয়াছেন, তাহাও সার্বকালিক, সার্বভৌমিক এবং সার্বজনীন হওয়া একান্তই আবশ্যিক। এই “বেদের” কোনও সঙ্কীর্ণতর অর্থ করিলে, ঋষিবাণ্যে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ আরোপ করা হয়।

ফলতঃ ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়া, মনুষ্য যে বেদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে, আমরা আজ যাহাকে বেদ বলিয়া জানি, ঠিক সেই বস্তু নয়, ইহা অস্বীকার করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

প্রথমতঃ লোকে যাহাকে সচরাচর বেদ বলিয়া জানে, সেই বেদই আপনাকে ধর্মের পরম বস্তু ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের একমাত্র সোপান বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকুচিত হইয়াছে। উপনিষদ সকল বেদান্তগত বলিয়া, বেদের মতনই প্রামাণ্য। আর এই উপনিষদই ঋগ্বেদাদিকে অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

শোনকো হ বৈ মহাশালোহস্রিরসং বিধিবদ্রূপপন্নঃ পপ্রচ্ছ ।

কশ্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞাতো সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ।

তন্মৈ স হোবাচ । বে বিদ্যো বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্

ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবেদঃ শিক্ষা

কল্পো ব্যাকরণং নিকৃষ্টং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ।

অথ পরা যম্ম তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

মহাগৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের সমীপে যথাবিধি উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

হে ভগবন্, কি জানিলে এই সমস্ত জানা যায় ?

তিনি তাহাকে বলিলেন ! ব্রহ্মবিদ্যো ইহা বলেন যে দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য ; এক পরাবিদ্যা অম্ব অপরা-বিদ্যা ।

ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্কবেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃষ্ট, ছন্দ, জ্যোতিষ (অর্থাৎ যজুস সমুদায় বেদ) অপরা বা নিকৃষ্ট বিদ্যা ; পঞ্চাশত্রে যাহা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা !

মুতরাং মোক্ষসাধনই যদি ধর্মের লক্ষণ হয়,

এবং সেই অক্ষয় পুরুষকে না জানিলে যদি

মোক্ষলাভ অসাধ্য হয়, আর শ্রুতি স্মৃতি সকলেরই এই শেষ সিদ্ধান্ত—তাহা হইলে ঋগ্বেদাদিকে ধর্মের প্রতিষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

এ কথা যে আমরাই আজ বলিতেছি তাহা নহে। যেমন শ্রুতি, সেইরূপ স্মৃতিও এই কথাই বলিয়াছেন। শর-শয্যাশায়ী মহাশূর ও মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট মনুর তায় “হৃদ্য বেদবোধিত-ধর্মে”র লক্ষণই বর্ণনা করিয়াছিলেন। আর মনুর নির্দিষ্ট ধর্মের লক্ষণে বেদকে যেমন প্রচলিত ঋগ্বেদাদির অর্থেই লোকে সচরাচর গ্রহণ করিয়া থাকেন, যুধিষ্ঠিরও তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অর্থ করিলে ধর্মের নিত্যত্ব রক্ষা করা যে অসাধ্য হইয়া উঠে, যুধিষ্ঠির ইহা স্পষ্টই লক্ষ্য করেন। তাই তিনি ভীষ্মকে পুনরায় এই প্রশ্ন করেন— (মহাভারত শান্তিপর্ব—মোক্ষধর্ম ৬০ অধ্যায়)

যে ধর্মপ্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হইতেছে, কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা কখনওই তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না; অবিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম যেরূপ, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম সেই রূপ নহে। আপদ, অসংখ্য, স্ততরাং আপদধর্মও বিবিধ প্রকার। অতএব শাস্ত্রপাঠ দ্বারা সমুদায় আপদধর্ম কিরূপে বোধগম্য হইতে পারে। শাস্ত্রে সাধুদিগের আচারকে ধর্ম ও ধর্মাত্মতান-পরতন্ত্র ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই লক্ষণ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম ও সাধু ইহার পরস্পরসাম্যক; স্ততরাং উহা দ্বারা কে সাধু ও ধর্ম কি, তাহা নিরূপণ করা যায় না। দেখুন শূদ্রগণ মুমূক্ষু হইয়া ধর্ম-ব্যক্তির নিমিত্ত বেদান্তাদি শ্রবণ করিতে তাহাদের অধর্ম হইতেছে এবং অগন্ত্যাদি মহাবিগণ যজ্ঞার্থ বিবিধ হিংসাকর কার্যের অনুষ্ঠান করিতেও তাহাদের ধর্ম সক্ষম হইতেছে।

মৃতরাঃ ধর্ম কিরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে? আর হোঁন, বেদ সমুদায়ের প্রতি যুগের হ্রাস হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন সত্য, দ্বেতা, ষাপর ও কলি এই চারিযুগে পৃথক পৃথক ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে যখন কালভেদে বৈদিক ক্রমের ভিন্নতাব হইল তখন বেদবাক্য যে যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহা কেবল লোকস্বপ্ন মাত্র। বেদ হইতে সমুদায় স্মৃতি সমুজ্জ্বল হইয়াছে, অতএব যদি বেদশাস্ত্র অপ্রমাণ হইল; তবে তৎসমুদায় স্মৃতিশাস্ত্রকে অপ্রমাণ করিতে হইবে। আবার অনেক সময় এইরূপ ঘটয়া থাকে যে, ধার্মিকেরা কোন ধর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে বলবান, দুঃখায়া উহার যে অংশ ব্যাঘাত উপাদান করে সেই অংশ সেই অবধি একেবারে উন্মূলিত হইয়া যায়।

মৃতরাঃ ধর্ম-তত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। ফলতঃ আমরা অবগত থাকি বা না থাকি এবং অল্প কর্তৃক উপস্থিত হইয়াও বুঝিতে পারি বা না পারি ধর্মতত্ত্ব যে ক্ষুরধার অপেক্ষাও যুগ্ম এবং পরিত অপেক্ষাও গুরুতর তাহার আর সন্দেহ নাই। যজ্ঞাদি ধর্ম প্রথমতঃ পদ্ধতিগতের স্থায়ী অনুষ্ঠানরূপে লক্ষিত হয়, কিন্তু যখন পণ্ডিতেরা উহাকে অনিত্য বলিয়া পর্যালোচনা করেন, তখন তাহাদের উহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ন্যূনত্বেরা, গোমন্তকের জল পানার্থ ক্ষুদ্র খাত ও ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিলে যেমন ঐ সমুদায় ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়, তদ্রূপ বেদসেবিত ধর্ম যুগে যুগে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়। অসামান্য ব্যক্তির লোকের অগ্রিহোত্রাদি কাণ্ড সমাধান, বেতন গ্রহণ দৃষ্টকারে অধ্যাপনা কাণ্ড সম্পাদন ও অন্যান্য কাণ্ড দাখনের নিমিত্ত মিথ্যা আচার অবলম্বন করিয়া থাকে। সামান্য ব্যক্তির যাঁহা ধর্ম বলিয়া কীর্তন করেন, মুঢ় ব্যক্তির তাঁহা প্রলাপ বোধ করিয়া সামান্যদের উন্নত বলিয়া অবজ্ঞা করে। হোঁন, দ্বোপাদি মহাশাস্ত্রাও যথার্থ পরিচয় পূর্বক ক্ষত্রধর্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন; অতএব সর্বজনহিতকারী আচার কুতাপি ব্যবহৃত হয় না। কোন কোন ক্রিয় ব্রাহ্মণ-আচার অবলম্বন পূর্বক ক্ষত্রধর্মচারী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করেন এবং কোনও কোনও ব্রাহ্মণে ব্রহ্মধর্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম উভয়ই

বর্তমান থাকে। অতএব সর্বপ্রকারের আচারেরই ব্যক্তিচার দৃষ্ট হইতেছে।”

আর এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া, মহামতি যুধিষ্ঠির এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—

“শ্রুতি বা স্মৃতি ধর্মের
নির্ধারক নহে।”

অতএব আমরাই যে আজি কালি বেদাদির প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া পড়িতেছি, তাহা নহে। এরূপ সন্দেহ সর্বদাই চিন্তাশীল সুধীগণের চিত্তকে চঞ্চল করিয়াছে। আমরাই যে কেবল বিদেশীয় বিজ্ঞা শিখিয়া, বিজ্ঞাতীয় সাধনার প্রভাবে, এই সকলের প্রাচীন প্রামাণ্য অস্বীকার করিতেছি তাহা নহে। পুরাকালেও এ প্রামাণ্য অস্বীকৃত হইয়াছিল এবং তাঁহারা যেমন এরূপ সন্দেহে আন্দোলিত হইয়াও, বেদাদির প্রামাণ্যের একটা সমীচন মীমাংসা করিয়াছিলেন, আমরাও একে সেধরূপে করিতে হইবে, নতুবা ধর্মকে বাঁচাইয়া রাখা অসাধ্য হইয়া উঠিবে। এই জন্যই বেদাদির সত্য অর্থ কি, তার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে আমাদের পরম দোভাগ্যের কথা এই যে, ভারতের প্রাচীনমীমাংসকগণ আপনাদের অসাধারণ প্রতিভা ও অলোকসামান্য সাধন-অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই মীমাংসার পথ অনেকটা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পবিত্র পদাক্ষের অনুসরণ করিয়া চলিলে, আমরাও ক্রমে এই সকল বিষয় যুগসমস্তার একটা সমীচন মীমাংসা যে করিতে পারিব না, এমনও মনে হয় না।

শ্রুতি বলিতে যদি আমরা ঋগ্বেদাদি গ্রন্থকে, আর স্মৃতি বলিতে যদি কেবল মনু পরাশর প্রভৃতিকেই বুঝি, তবে মহামতি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমাদিগকেও, “শ্রুতি বা স্মৃতি যে ধর্মের নির্ণায়ক নহে”—একবার্কে এই কথাই বলিতে হয়। কিন্তু মনু যে বেদ ও যে স্মৃতির উপরে বিশ্বধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে মহর্ষি বেদব্যাসের সঙ্কলিত বেদচতুষ্টয় অথবা মন্বাদি স্মৃতি নহে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠে।

প্রথমে বেদের কথা। মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ যে বেদের উপরে ধর্মবস্তুর স্থাপন করিয়াছেন—বেদ কাহাকে বলে? ঋগ্বেদাদি যে সে বেদ নহে, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই তার সাক্ষ্য দান করিতেছেন। অতএব এই বেদের যদি অণু কোনও অর্থ না থাকে, তবে নব্বাদি স্মৃতির সার্থকতা আর থাকে না। মনুর কথা সত্য হইলে, বেদের আর একটা কোনও অর্থ অবশ্যই আছে। সে অর্থটী কি?

মনু বলিতেছেন—যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম। এস্থলে মনু যে মানবধর্মেরই কথা বলিতেছেন, ইহাও সত্য। কিন্তু সংস্কৃত ধর্মশব্দের একটা ব্যাপকতর অর্থও আছে। ধর্ম বলিতে, সংস্কৃতে কেবল মানুষের ধর্মই বোঝায় না। সৃষ্টপদার্থমাত্রেরই একটা না একটা ধর্ম আছে। আর এই ধর্মের দুইটা দিক্। একটা তাহার স্থিতির দিক্, একটা তাহার গতির দিক্। স্থিতির দিক্ দিয়া ধর্ম প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব গুণমাত্র

প্রকাশিত করে। যেমন জলের ধর্ম শৈত্য, অগ্নির ধর্ম উত্তাপ ইত্যাদি। গতির দিক্ দিয়া ধর্ম পদার্থের পরিণতির বা ক্রম-বিকাশের বিধানও প্রকাশিত করে। সূত্রগণ পদার্থের গুণ এবং সেই গুণের বিকাশের ও পরিণতির বিধান, ধর্ম বলিতে আমরা এই দুই বস্তুই বুঝিয়া থাকি। এই দ্বিবিধ আকারে ধর্ম সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। আর এই উভয় ভাবে ধর্ম প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছেন—বৎ সেই প্রকৃতি হইতেই নিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছেন।

হিন্দু মাগকে ধর্ম বলিয়া জানেন, তাহা প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব প্রকৃতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কোনও বাহিরের নিষি-নিষেধাদির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। এ ধর্ম বিধিও আছে, নিষেধও আছে। কিন্তু ইহার বিধি এবং নিষেধ উভয়ই জীবের আত্ম-চরিতার্থতা লাভের জন্ত, তাহার নিজস্ব প্রকৃতির আদেশে এবং প্রয়োজনেই প্রচারিত হইয়াছে। জীবের আত্মচরিতার্থতা লাভই তার ধর্ম। আর জীব যে আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই আদর্শটী তার মধ্যে পূর্ণ-মাত্রায় ফুটিয়া উঠিলেই সে আপনার প্রকৃত চরিতার্থতা লাভ করে। হিন্দু চিরদিনই এই অর্থে ধর্ম-শব্দকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ধর্মই যদি আবার বেদ-বিহিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব আদর্শ যে তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত ও অধিব্যক্ত হয়, বেদ বলিতে তাহাকেই বুঝিতে হইবে। বেদের অণু কোনও অর্থ করিলে, ধর্মের সর্বজন-

বিদিত মর্ষের সঙ্গে, “যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম”—মন্তুর এই উক্তির সম্মতিসাধন সম্ভব হয় না।

অতএব স্রষ্টার অন্তরের যে আদর্শকে আশ্রয় করিয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে স্থিতি করিতেছে, এই নিখিল জগতের গতি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া, যাহার মধ্যে আপনার চরম পরিণতি অবেষণ করিতেছে,—তাহারই নাম বেদ।

অত্যাধিকে যাগ হইতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাগতে স্থিতি করিতেছে, এই নিখিল জগতের গতি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া, যাহার মধ্যে আপনার চরম পরিণতি লাভ হয়, তাহারই নাম বেদ।

“যতো বা ইমানি ভূতানি”—ইত্যাদি স্রষ্টি, ব্রহ্মবস্তুরই এই এই লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। “যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্মিতেছে; জন্মিয়া যাহাতে এই ভূতসকল জীবিত রহিতেছে; প্রলয়কালে যাহার প্রতি এই ভূতসকল গমন করে ও যাহাতে প্রবেশ করে”—তাহাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। তাহাই বেদ।

অতএব বেদ আর ব্রহ্ম একই বস্তু। গীতাদি শাস্ত্রও নানা স্থলে ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা বেদকে নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—“কর্ম ব্রহ্মসমুদ্ভবং।”

এখন প্রশ্ন এই—বেদকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলা হইল কেন? যেমন লোকবিশেষকে আমরা হরিদাস বা নবীনচন্দ্র ইত্যাদি নামে ডাকি, এ সকল নামে কেবল তাহা-

দিগকে নির্দেশ করে মাত্র, ইহাদের অল্প কোনও বিশেষ গুণবাস্তব অর্থ থাকে না; সেইরূপই কি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তীগণ একরূপ স্থলে বেদের নামান্তররূপেই কেবল এই ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, না এই নামের কোনও নিগূঢ় মর্ম, কোনও বিশেষ সার্থকতাও আছে?

বেদের যে কয়টা প্রতিশব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সকল গুলিরই একটা না একটা বিশেষ অর্থ আছে। বেদ-নিজেও অর্থশূন্য নাম মাত্র নহে! বিদ বাতুর অর্থ জানা। ধার্ম্যের অনুসরণ করিলে, যাহাতে সকল জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা তাহাকেই বেদ বলা যায়। বেদের ইহাই মৌলিক অর্থ। এই অর্থেই বেদের বেদ-নাম সার্থক হইয়াছে। বেদের আর এক নাম স্রষ্টি। প্রাচীন কালে শিষ্যগণ গুরুমুখে শুনিয়াই বেদশিক্ষা করিতেন, আজিকালিকার যত গ্রন্থ পড়িয়া বেদাধ্যয়ন করিতেন না, আর এই জন্যই বেদকে স্রষ্টি বলা হইত। এখনও স্রষ্টি সেই স্মৃতিকেই জাগাইয়া রাখিয়াছে। বেদের আর এক নাম আশ্রয়। আশ্রয় শব্দের ধার্ম্য—যাহা কথিত বা উপদিষ্ট হয়। আর বেদের এই আশ্রয় নামের সার্থকতাও অতি সুস্পষ্টই রহিয়াছে। বেদের আর যে কয়টা নাম আছে, সকল গুলিরই একটা না একটা বিশেষ সার্থকতা দেখিতে পাই। আর বেদকে যে ব্রহ্ম বলে, ইহারই কি কেবল কোনও সার্থকতা নাই? একরূপ কল্পনা করাও অসম্ভব।

বেদের আর এক নাম শব্দ। আর এই

খানেই, আমার মনে হয়, বেদকে কেন ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহার নিগূঢ় মর্ম্মটা ধরিতে পারা যায়।

বেদকে যে অর্থে শ্রুতি বলা হইয়াছে ঠিক সেই অর্থেই যে শব্দ বলাও হইয়াছে ; এমন মনে হয় না। যাহা শোনা যায় তাহাই শব্দ, সত্য। কিন্তু এ শব্দ ধ্বন্যাত্মক। ধ্বনি-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া এই শব্দের প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ হয়। প্রাকৃত জনে শব্দ বলিতে ইহাই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ নিত্যবস্তু নহে। অতঃপক্ষে বেদকে সর্বদা নিত্য বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের এই নিত্য-ধর্ম্ম নাই। এই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকাল পরে সেই আকাশেই আবার বিলীন হইয়া যায়। ইহার উৎপত্তি ও বিলয় আছে। বেদ অপরিবর্তনীয়, অনাদিকাল হইতে একই ভাবে, নিজ স্বরূপে স্থিতি করিতেছে। বেদ অনাদি, ইহার উৎপত্তি কখনও হয় নাই। বেদ অনন্ত, ইহার বিলয় কখনও হইবে না। ধ্বন্যাত্মক শব্দ পুরুষের কণ্ঠকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। পুরুষ ইহার কর্তা। বেদ অপৌরুষেয়। স্মৃতাং বেদের এই সকল লোক-প্রসিদ্ধ লক্ষণের সঙ্গে ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গতি নাই। প্রাকৃতজনে শব্দ বলিতে যাহা বুঝে, সেই অর্থে, বেদকে শব্দ বলা যাইতে পারে না। এখানে শব্দের আর কোনও একটা অর্থ না থাকিলে বেদের শব্দ নাম নিরর্থক হইয়া পড়ে।

কিন্তু আমরা যদিও যাহা শোনা যায়

তাহাকেই শব্দ বলিয়া জানি, তত্বদর্শী ঋষিগণ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যতীত, আর একজাতীয় শব্দের কথাও বলিয়াছেন। “সে শব্দ কানে শোনা যায় না, তাহা ধ্বন্যাত্মক নহে। সে শব্দ অতীন্দ্রিয়, কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য মাত্র। সে শব্দ “ক্ষোটাশ্রুতক।” আর এই অতীন্দ্রিয় ক্ষোটাশ্রুতক শব্দতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই বেদের আর এক নাম শব্দ হইয়াছে।

এই ক্ষোটাশ্রুতক শব্দই সৃষ্টি-মূল। ইহাই জগদ্বীজ নাম ও রূপ। বেদান্তবাদী ইহাকেই মায়া বলিয়াছেন। “কিং পুনস্তৎ কর্ম্ম যৎ প্রাগুপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়ো ভবতি ?” “সেই কর্ম্ম কি, যাহা সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছিল ?” পূর্ব্বপক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছিলেন তাহা নাম ও রূপ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে। অভিন্নও নহে—অব্যক্ত কিন্তু ব্যক্ত হইবার জন্ম চেষ্টিত—আমরা ইহাই বলি।” বৈষ্ণবেরা ইহাকেই প্রকৃতি বলিয়াছেন। এই ক্ষোটাশ্রুতক শব্দই গ্রীকদিগের লগস (Logos), ইহাই খৃষ্টিয়ানের বাইবেল-গ্রন্থোক্ত বাক্য বা Word.

In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God, বাইবেল ‘ই’ বলিয়া আমাদের শাস্ত্রোক্ত এই ক্ষোটা-শব্দতত্ত্বকেই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ক্ষোটাশব্দতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই বেদকে শব্দ ও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

এই ক্ষোটা-তত্ত্বের উপরেই বেদে

অনাদিত্য, অপৌরুষেয় প্রভৃতি ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই তরুী না বুঝিলে, যাহা বেদবিহিত তাহাই ধর্ম, ধর্মের মনু-বর্ণিত এই লক্ষণের মর্ম গ্রহণ অসম্ভব হইবে।

এই ফোটাওয়ক শব্দ কি, গুরুত্বপূর্ণ হইলে, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রসের-রূপ

বাৎসল্য ও মাতৃমুর্তি

ভালবাসার কি কোনও আকার আছে? সাকার-নিরাকার সম্বন্ধীয় বাদবিতণ্ডায় কখনও কখনও এই প্রশ্নটা তোলা হয়। আর সচরাচর ইহাতে সাকারবাদিগণকে একরূপ নির্বাক ও নিরস্তর করিয়াই তোলে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে একান্ত সাকারবাদী না হইয়াও, ভালবাসার কি কোনও আকার বা সত্য সত্যই নাই?—এ প্রশ্নটাও বোধ হয় তোলা যাইতে পারে।

তবে ভালবাগা-বস্তুটা একদ্ব্যর্থীয় নহে। ভালবাসা কতকগুলি আন্তরিক স্নেহভূতির একটা সাধারণ নাম। আমরা সম্ভানকেও ভালবাসি; জ্ঞা বা বানীকেও ভালবাসি; বন্ধুবান্ধবদিগকেও ভালবাসি। কিন্তু এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রে, ভালবাসা তিন আকারে প্রকাশিত হয়। সম্ভানের প্রতি ভালবাসাকে আমরা বাৎসল্য বলি, স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাকে মাধুর্য্য, আর বন্ধুবান্ধবের প্রতি ভালবাসাকে সখ্য বলিয়া থাকি। এই বাৎসল্য, মাধুর্য্য এবং সখ্য এক জাতীয় বস্তু হইলেও, ঠিক এক ধর্মের নহে। বাৎসল্য ও মাধুর্য্য, মাধুর্য্য ও সখ্য এবং সখ্য ও বাৎসল্য পরস্পরের প্রভেদ বিস্তর। সুতরাং ভালবাসার রূপ

বা আকার যদি কিছু থাকে, তাহা এই তিন ক্ষেত্রে তিন প্রকারেই প্রকাশিত হইবে। বাৎসল্যের রূপ যাহা, মাধুর্য্যের রূপ তাহা হাতে পারে না। আর সখ্যের রূপ এই দুই হইতেই ভিন্ন হইবে।

আর বাৎসল্যাদির কি কোনও রূপ বাস্তবিকই নাই? ভালবাসাটা অন্তরের বস্তু সত্য। কিন্তু বাহিরে যে এই আন্তরিক ভাব সর্বদাই নানাবাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে, ইহাও প্রত্যক্ষ কথা। এইরূপ অভিব্যক্তি ব্যতীত, আমরা যে একে মস্তকে ভালবাসি ইহা কিছুতেই জানিতে বা জানাইতে পারিলাম না। প্রথমতঃ আমরা ইহাকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকি। সম্ভানকে, পতি বা পত্নীকে, বন্ধুবান্ধবকে আমরা যে ভাবে সম্বোধন করি, তাহার ভিতর দিয়া আমাদের এই সকল বাৎসল্যাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাষায় অন্তরের রসাদির যে অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে রূপ বলে না। ভাষা রসের সাংকেতিক চিহ্ন মাত্র; তাহার গুণও নয়, রূপও নয়। যাহা, বাছা, অন্ধের নড়ি, যাটের ঘন, এ সকল বাৎসল্য-সূচক কথাই সন্দেহ বাৎসল্য-বস্তুর কোন অপরিহার্য্য ও অঙ্গাদী সম্বন্ধ নাই। কোনও জনক বা জননী আপনার সম্ভানকে এ ভাবে সম্বোধন নাও

করিতে পারেন, অথচ তাহাতে তাঁহাদের অন্তরের বাৎসল্যের অভাবও বোকাইবে না, আর সে রসের ক্ষুণ্ণতার কোনও বিশেষ ব্যাঘাতও জন্মিবে না। যেমন ভাষায় যনের ভাব ব্যক্ত হয়, সেইরূপ বাহিরের আচার-আচরণেও অন্তরের ভাব প্রকাশিত হয়। স্বামীপুত্রের সেবার ভিতর দিয়া সন্তানবতী স্ত্রীর মাধুর্য্য ও বাৎসল্য আপনার চরিতার্থতা অব্বেষণ করিয়া থাকে। এই সকল সেবা-যত্নের ভিতর দিয়াও তাঁহাদের অন্তরের ভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সকল সেবা-যত্নের সঙ্গেও বাৎসল্যের বা মাধুর্য্যের কোনও নিত্য ও অপরিহার্য্য অঙ্গাদ্বী সম্বন্ধ নাই। কোনও বিশেষ কারণে এই সেবা-যত্ন করা অসম্ভব বা অপ্রার্থনীয় হইতেও বা পারে। কিন্তু এই সেবা-যত্নের অভাব সর্বত্রই যে অন্তরের রসের অভাব বা এ সেবা-যত্নের অল্পতা যে সে রসের লঘুত্ব বুকাইবেই বুকাইবে, এমন বলা যায় না। সুতরাং ভাষায় রসবিশেষের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহা যেমন সে রসের রূপ নহে, সেইরূপ আমাদের আচার-আচরণে তাহার যে বহিঃপ্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকেও সে রসের রূপ বলা যায় না।

ভাষাতে বা আচার-আচরণে রসের যে প্রকাশ হয়, তাহা সর্বত্র এক নহে। আমরা যে কথায় বাৎসল্য প্রকাশ করি, ইংরেজ ঠিক সে কথা ব্যবহার করেন না। আমাদের দেশে প্রাচীনেরা পত্র ব্যবহারে অনেক সময় পুত্রকে “প্রাণহুল্যবু” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইংরেজি

ভাষায় এইরূপ সম্বোধন অতিশয়োক্তি বলিয়াই গণ্য হইবেন ইংরেজ-সমাজে ইহা শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া বিবেচিত হইবে কি না সন্দেহ। অতঃপক্ষে আমাদের দেশে পত্নীকে সঙ্গের সমক্ষে প্রথম যৌবনে ডার্লিং (Darling) বা ডিয়ার (Dear)—বাছাধন বা প্রিয়তম বলিয়া ডাকা, আর বয়োবৃদ্ধিতে ক্রমে প্রেম যখন পরিপক্বতা প্রাপ্ত হইয়া “স্নেহমারে” স্থিতি করে, তখন তাঁহাকে মা (Mother) বলিয়া সম্বোধন করা, কখনওই শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। দাম্পত্য সম্বন্ধের অন্তরালে যে মাধুর্য্য রস বিद्यমান থাকে আমরা এই সকল কথায় সে রসকে ব্যক্ত করি না। আমরা এই ক্ষেত্রে যে সকল কথা ব্যবহার করি, ইংরেজ বা জার্মান, কাক্সি বা জুলুসে কথা বা তার অনুরূপ অথ কোন কথা ব্যবহার করেন না। আর এ পার্থক্য যে সামান্য তাহাও নয়। আমাদের অন্তরের ভাব যখনই ভাষায় ব্যক্ত হয়, তখনই আমাদের নিজেদের সভ্যতার ও সাধনার, নিজেদের পারিবারিক জীবনের ও সমাজগঠনের আরো অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাব বা আদর্শ তার সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই কারণে অন্তরের ভাবটা শুদ্ধ ও অমিশ্র হইলেও, বাহিরের প্রকাশটাকে আশেপাশের অনেক বস্তু মিশিয়া থাকে। আর এরূপ মিশ্রণ হয় বলিয়াই, ভাষায় বা আচার-আচরণে একই মানবীয় রসের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভাষায় বা আচার-আচরণে রস-

বিশেষের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে সে রসের রূপ বলা যাইতে পারে না।

কারণ প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে সেই বস্তুর রূপের সম্বন্ধটা কিয়ৎ পরিমাণে নিত্য আর সর্বত্রই অঙ্গাদ্বী। একজাতীয় বস্তুর রূপ বা আকার মোটের উপরে এক। মানুষের রূপ বা আকার সকল মানুষের মধ্যেই মোটের উপরে এক। মানুষে মানুষে বর্ণে বা গঠনে, চেহারা বা চলনে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, এ সকল বিভিন্নতা মানবীয় রূপের অনতিক্রমণীয় সীমা বা সমতাকে কিছুতেই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। খর্ষাকৃতি লোমশ কে'ভ-ম্যান (Cave-man) একদিকে; কৃষ্ণকায় কুক্ষিতকেশ, স্থূল-অধঃরাষ্টসম্পন্ন কাক্রি আর এক দিকে; সুগঠিতবপু, শ্বেতবর্ণ রোমক বা গ্রীক আর একদিকে; আমেরিক ইণ্ডিয়ান একদিকে, আর চীনা-ম্যান বা জাপানী আর একদিকে; এ সকলের মধ্যে বিশ্বের আকৃতিগত বৈষম্য আছে। কিন্তু এ সকল বৈষম্য সত্ত্বেও সকলের মধ্যেই মানুষী রূপ বলিয়া যে একটা সামান্য বস্তু আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এই রূপ ইহাদের সকলকেই 'অধিকার' করিয়া আছে। এই রূপ আছে বলিয়াই ইহারা পরস্পর হইতে এতটা পৃথক হইয়াও, সকলেই মানুষ হইয়াছে। এই মানুষী রূপের সঙ্গে মানবমাত্রেরই একটা নিত্য ও অঙ্গাদ্বী সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানেই মানুষ সেখানেই এই মানুষী রূপটা ফুটিয়া আছে। ছায়া যেমন আতপের অনুগমন করে, আতপ ছাড়া যেমন কোথাও ছায়া থাকে না, থাকা

সম্ভব নহে; আর ছায়া ছাড়াও কোথাও আতপ থাকে না, থাকাও সম্ভবে না; সেইরূপ মানুষের সঙ্গে এই মানুষী রূপেরও একটা নিত্য ও অপরিহার্য্য যোগ রহিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে সেই বস্তুর রূপের সম্বন্ধ এইরূপই নিত্য, অঙ্গাদ্বী, অপরিহার্য্য। ভাষায় বা আচার-আচরণে আমরা সচরাচর অন্তরের ভাবকে বা রসকে যেক্রমে প্রকাশিত করিয়া থাকি, তাহা সর্বত্রই সমান নহে। এইজন্য রসের এই সকল অভিব্যক্তিকে তার রূপ বলা যায় না। রসের রূপ তার এমন একটা বিশেষ বহিঃ-প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হওয়া চাই, যার সঙ্গে তার একটা নিত্য, অপরিহার্য্য, অঙ্গাদ্বী সম্বন্ধ আছেই আছে। যেখানেই মানব-অন্তরে কোনও রসবিশেষ জাগিয়া উঠে, সেখানেই তার এই নিজস্ব রূপটাও প্রকাশিত হইবেই হইবে। এরূপ না হইলে, তাহাকে সে রসের রূপ বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু কোনও রস বা ভাব প্রাণে জাগা মাত্রই যে তার এই রূপটা ফুটিয়া উঠিলে, এমনও কোন কথা নাই। রূপ মাত্রেরই বস্তু-বিশেষের বহিঃপ্রকাশ। আর বস্তুর গাঢ়তার উপরে তার রূপের প্রকাশ হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা সচরাচর জড়পদার্থের তিনটী অবস্থার উল্লেখ করেন। এক—তার বায়বীয় অবস্থা—ইংরেজিতে ইহাকে gaseous বলে। দ্বিতীয়—তার তরল বা লিকুইড (liquid) অবস্থা। তৃতীয়—তার কঠিন বা সলিড (solid) অবস্থা। প্রথমাবস্থায় পদার্থের রূপ

থাকে না; চক্ষে তাহাকে দেখা যায় না। দ্বিতীয় অবস্থায় পদার্থ চক্ষুগ্রাহ্য হইলেও তরল পদার্থের যে সাধারণ আকার তাহা ছাড়া সে নিজস্ব কোনও বিশেষ আকার ধারণ করিতে পারে না। তরলাবস্থায় পদার্থের আকার চঞ্চল থাকে, স্থৈর্য্য লাভ করে না। পদার্থ-বিশেষ সর্পিলাপেক্ষা গাঢ়তম কঠিনাবস্থা লাভ করিলেই তার মধ্যে কোনও স্থির ও স্থায়ী রূপ ফুটিয়া উঠিবার অবসর প্রাপ্ত হয়।

আমাদের আন্তরিক রসেরও এইরূপ তিনটী অবস্থা আছে। জড়পদার্থের বায়বীয় বা গ্যাসাস (gaseous) অবস্থার নত, আমাদের বাৎসল্যামাধুর্য্যাদিরও একটা অতিশয় হাল্কা, বায়বীয় অবস্থা আছে। এ অবস্থায় রসের সাড়া মাত্র অন্তরে অনুভব করা যায়, কিন্তু তাহাকে ভাল করিয়া ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না। এ অবস্থায় রস নিতান্ত ছায়ার নত, অশরীরী হইয়া থাকে। বিদ্যুৎচুম্বকের ত্রায় অন্তরে ফুটিয়া উঠিয়া, আবার তখনই নিভিয়া যায়। এ অবস্থায় তার রূপের প্রকাশ হয় না। জড়পদার্থের তরলাবস্থার ত্রায় আমাদের অন্তরের এই সকল রসেরও একটা তরল অবস্থা হয়। এই অবস্থায় রসকে আন্বাদন করা যায় বটে, কিন্তু ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই অবস্থাতেই রস ব্যভিচারী ব্যবহার করিয়া থাকে। এক রস অপর বিরুদ্ধ রসের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে হারািয়া ফেলে। অপমান বা উদ্ভাদ রোগগ্রস্ত লোকের মধ্যে এইরূপ ব্যভিচারী রসের খেলা সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। হাসিতে হাসিতে ইহারা কাদিতে আরম্ভ

করে। কাদিতে কাদিতে আবার হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। ক্ষণে ভয় ক্ষণে অভয়; ক্ষণে উচ্ছ্বসিত অমুরাগ, ক্ষণে তীব্র বিরাগ; এইরূপে প্রবল ঘূর্ণিবায়ুতড়িত জলরাশির ত্রায় ইহাদের চিত্ত সুগপৎ বিবিধ বিরোধী ভাবের তাড়নায় বিকোমিত হইয়া উঠে। এই তরল অবস্থাতেও রস আপনার রূপকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। জড়পদার্থ যেমন কঠিনলাভ করিলেই বিশেষ আকার বা রূপ ধারণ করিয়া থাকে, অন্তরের রসও সেইরূপ স্থির ও গভীর হইলেই আপনার নিজস্ব রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। সূত্রাং এ সকল রসের রূপ দেখিতে হইলে, যে ক্ষেত্রে ইহারা অনন্তসাধারণ স্থৈর্য্য ও প্রগাঢ়তা লাভ করে, সেখানেই তাহাদের নিজ নিজ রূপের অন্বেষণ করিতে হয়; যেখানে সেখানে, যখন তখন, এ রূপের সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভবে না।

এই সকল রস আমাদের অন্তরেই জন্মে, অন্তরেই বাড়িয়া উঠে, অন্তরেই বাস করে, মৃত্যু। কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ রূপ আমাদের দেহেতে ফুটিয়া উঠে। বাহিরের আলোকের সঙ্গে আমাদের চক্ষের গোলকের এমন একটা সম্বন্ধ আছে যে, আলোক ফুটিলেই, গোলকে তার প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপ আমাদের অন্তরের রসের সঙ্গে একদিকে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর ও অত্ৰদিকে এই স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই, আমাদের শরীরের পেশিসমূহের একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অন্তরে কোনও রসের সঞ্চার হইবা মাওই,

স্নায়ুশুলে তার সাড়া পড়িয়া যায়। এই রস ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া গাঢ়তা লাভ করিলে, আমাদের শরীরের পেশিকে আসিয়া দখল করে, এবং যে পেশির সঙ্গে যে রসবিশেষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাদী, সেই পেশিগুলির ভিতর দিয়া, তাহাদের ক্রিয়াবিশেষকে আশ্রয় করিয়া, আপনার নিজস্ব রূপটিকে ছুটাইয়া তোলে। ভিন্ন ভিন্ন রসের তাড়নায় আমাদের স্নায়ুশুলে প্রথমে এবং ক্রমে আমাদের শরীরের বিভিন্ন পেশিসমূহের সাগায্যে বিবিধ প্রত্যয়ে যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, এবং এই সকল স্নায়বীয় ও পৈশিচিক ক্রিয়া নিবন্ধন আমাদের চক্ষে মুখে যে সকল ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহাই এই সকল রসের রূপ। এই সকলকে লক্ষ্য করিয়াই আমাদের প্রাচীন রসশাস্ত্রপ্রণেতারা রসের মূর্তির কথা বলিয়াছেন। আজি কালি যুরোপীয়েরাও শারীর-তত্ত্ব ও মনো-বিজ্ঞানের যে সকল অভিনব সত্যের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও, এই সকল রসমূর্তি প্রাণোন্মিত বলিয়া বাস্তবিকই যে একেবারেই কেবল উদ্ভাসকল্পনাসমূহ, এমন কথা বলা কতকটা অসমসাহসিকতা হইবে বলিয়াই মনে হয়।

এই সকল রস-মূর্তির প্রকাশ যে অত্যন্ত বিরল তাহাও নহে। ইহাদিগকে লক্ষ্য করাও যে একান্তই কঠিন, এমনও বলিতে পারি না। প্রায় সর্বদাই এই সকল রসমূর্তি আমাদের সংসারের দৈনন্দিন ঘটনাদির ভিতর দিয়া, আমাদের চারিদিকে ফুটিয়া উঠে। আমাদের রসানুভূতি প্রথর নহে

বলিয়া, সকল সময় আমরা এ গুলিকে দেখিয়াও দেখি না। সন্তানবতী রমণী যখন আপনার সুকুমার শিশুকে কোলে লইয়া, তাহার মুখ দেখিতে দেখিতে, সেই অসহায় সন্তানের মধ্যে আপনাকে একান্ত ভাবে ডুবাইয়া দেন, তখন তাহাকে কোন্ গৃহস্থ না দেখিয়াছে? কিন্তু তাঁর এই রূপের ভিতর দিয়াই যে বাৎসল্যরসের নিত্য মূর্তি ফুটিয়া উঠে, ইহা অল্প লোকেই জানে। এই রূপকেই জগতের শ্রেষ্ঠতম চিত্রকর ও ভাস্করগণ যুরোপের ম্যাডোনা (Madonna) বা আমাদের গণেশ-জননীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রাকৃত জনে হয় তা ভাবে যে সন্তান কোলে ধরিয়াই ম্যাডোনা ম্যাডোনা এবং গণেশজননী গণেশজননী হইয়াছেন। সন্তান কোলে করিয়া না বসিলে, তাঁহাদের মাতৃস্বের রূপটি বুঝি বা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিত না। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। সন্তানকে কোলে করিয়া যখন জননী তাহার সেই সন্তানের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যান, তখনই তাঁর মধ্যে বাৎসল্যের সমগ্র রসটি মূর্তিমন্ত হইয়া উঠে, সত্য; কিন্তু সে রসের রূপটি সন্তানের মধ্যে নহে; কিন্তু তাহার আপনার দেহেতেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্ত সন্তানের মুখ ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে বাৎসল্যে বিভোর হইয়া যে জননীর বাহুতেনা লোপ পাইয়া যায়, তাঁর ক্রোড় হইতে সে অবস্থায় যুমন্ত শিশুটিকে ধীরে ধীরে সরাইয়া নিলেও, তাঁর দেহযন্তিকে আশ্রয় করিয়া বাৎসল্যের যে রূপটি প্রকট হইয়াছিল, তাহা অমন অপ্রকট হইবে না। পুত্রশোকাতুরা জননী

যখন বিবাহের ভিত্তিতে বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া, বাৎস্যের তত্ত্ব লভ করিয়া মানসক্ষে মৃৎপুত্রকে জীবন্তভাবে আপনার ক্রোড়স্থ দর্শন করেন, তখন সন্তানের দৈহিক সান্নিধ্য বাস্তবতঃ, বাৎস্যের প্রকৃত মূর্ত্তি তাহার দেহকে আশ্রয় করিয়া স্বচ্ছন্দেই ফুটিয়া উঠিতে পারে এবং কোনও কোনও স্থলে ফুটিয়া যে থাকে, ইহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সুতরাং যুরোপের ম্যাডোনা-গুলিতে বা আমাদের গণেশজননীতে যে ভাবে মাতৃমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা ছাড়া যে এ মূর্ত্তি সত্যি পরিস্ফুটরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে না, এমন নয়। ফলতঃ সন্তানকে কোলে দিয়া, ম্যাডোনাতে এবং গণেশজননীতে মাতৃমূর্ত্তির নিজস্বরূপটিকে ফুটাইবার দিকে অন্ততঃ কোনও কোনও চিত্রকর ও ভাস্কর নিজেদের দায়িত্বভার যে অনেকটা লঘু করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাও বলিতে পারি না। সন্তান যখন কোলে আছে, তখন এ চিত্র বা ভাস্কর্য যে মায়েই তৈলচিত্র বা প্রস্তর-মূর্ত্তি, এ ধারণা আপনা হইতেই অনেকটা জন্মিয়া যায়। আর সেই জন্য এই সকল চিত্রপটে বা প্রস্তরফলকে বাৎস্যের নিজস্ব মূর্ত্তি সত্য সত্য কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে বা উঠে নাই, এ বিষয়ে অনেকেই কোনও বিশেষ অনুসন্ধান আর করেন না। মোটের উপরে ছবিখানি বা প্রতিমূর্ত্তি নয়নপ্ৰীতির হইয়াছে কি না, তাহারই দ্বারা তার ভালমন্দের বিচার করিয়া থাকে। সন্তান কোলে লইয়াও যে কোনও জননীর মধ্যে কখনও কখনও তাঁর সত্যিকার মাতৃমূর্ত্তি

ফুটিয়া নাও উঠিতে পারে; সকল সময় যে ফুটিয়া উঠে না; ইহাও পাত্যক্ষ কথা। সকল জননীই তো দিনের মধ্যে কতবার সন্তানকে কোলে করিয়া বসেন ও তাহাকে স্তন্যপান করাইয়া থাকেন। কিন্তু সর্বদাই যে এ সকল অবস্থায় তাহাদের মধ্যে বাৎস্যের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, এমন তো দেখা যায় না। আর যখন এই মূর্ত্তি কোনও জননীর মধ্যে সত্য সত্যই ফুটিয়া উঠে, তখন তাহাকে চিনিতেও বেশি বিলম্ব হয় না। সে আপনা হইতেই আপনাকে ধরা দিয়া থাকে। আর এই যে অপক্লপ মাতৃমূর্ত্তি, তাহারই মধ্যে বাৎস্যের সের রূপটি ফুটিয়া উঠে।

বাৎস্যরস পিতামাতা উভয়েরই মধ্যে সঞ্চারিত হয় সত্য; কিন্তু ইহা সন্তানের জননীকে স্বতন্ত্র পরিমাণে অধিকার করে, তাহার জনককে সে পরিমাণে অধিকার করে না। কারণ মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধটা যত ঘনিষ্ঠ, তাঁর দেহমন-প্রাণ জীবনের সকল বিভাগের ভিতর দিয়া এই সম্বন্ধ আপনাকে যে ভাবে গড়িয়া তুলে, পিতার সঙ্গে তত ঘনিষ্ঠ নয় ও হইতেই পারে না। আপনার সন্তানের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ কেবল আন্তরিক নহে, কায়িকও। প্রথমতঃ মা দশমাস দশদিন সন্তানকে আপনার গর্ভে ধারণ করিয়া এই কায়িক সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সুদীর্ঘ গর্ভবাস নিবন্ধন মায়ের স্নায়ু-মণ্ডলের সঙ্গে সন্তানের স্নায়ুগুণের একটা অতি নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হয়; নড়ীছেদের সঙ্গে সঙ্গে এ যোগ একেবারেই ছিন্ন হইয়া

যায় কি না, তাহাও বলা সংশয় নহে। আর এই জ্ঞান জননীর 'সন্তানবাংসল্যের মধ্যে অন্ততঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত যে একটা। শারীরিক দিকও জাগিয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। সুতরাং জননীর অন্তরের বাৎসল্যরস যখনই বিশেষ গাঢ়তা লাভ করে, তখনই যে তাহা তাঁর মনকে ছাড়িয়া, দেহকে পর্য্যন্ত যাইয়া সহজেই অধিকার করিয়া বসে, এবং তাঁর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে আপনার নিজস্ব মূর্ত্তীটিকে ফুটাইয়া তোলে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। জননী ঘুমন্ত শিশুকে কোলে লইয়া, তাঁর স্নকুমার মুখখানিতে আপনার চক্ষু দুটা নিবদ্ধ করিয়া যখন আপনার মাতৃ-ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া উঠেন, এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁর মুখে, চক্ষে, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, এমন কি প্রতি লোম-কূপের মধ্য দিয়া এই অপূর্ণ বাৎসল্যরস প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, ও সেই রসের আবেগে যখন তাঁর পীনপয়োদরযুগল হইতে আপনা হইতে ক্ষীরধারা ছুটিয়া সন্তানের চক্ষে মুখে যাইয়া পড়িতে আরম্ভ করে,— সন্তানবতী জননীকে এ অবস্থায় যে দেখিয়াছে, সেই বাৎসল্যরসের নিজস্ব রূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে। বাৎসল্যরসের পীড়নে জননীর স্নায়ুগুণ্ডে যে সকল বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাঁর চক্ষের, মুখের, উরসের স্নায়ুগুণ্ড

ও পেশিসমূহ যে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, এ গুলিকে লক্ষ্য করিয়া, এই ক্রিয়ার ছবিকে অন্তরে ধারণ করিয়া, যে চিত্রকর বা ভাস্কর তাহাকে চিত্রপটে বা মর্ম্মরথণ্ডে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই সত্য মাতৃমূর্ত্তি রচনায় সুদক্ষি লাভ করেন। সন্তানের মুখ ধ্যান করিতে করিতে যে জননীর চক্ষে অসীম ত্যাগের অটল সংকল্প, যুগে ভাগবতী করুণার কোমল আভা ফুটিয়া না উঠে, এই কারণে যাহার সর্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ না হয় এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীর-ভারে স্তনযুগল ঘন ফাটিয়া পড়িতেছে, এমনি অবস্থা না ঘটে,—তাঁর মধ্যে বাৎসল্যের রূপ প্রকাশিত হয় না, হইতেই পারে না। এই জ্ঞান যারা আজি কালিকার দিনে, একটা বিমানচারিণী ভাবুকতার মোহে পড়িয়া, বাৎসল্যের এই সত্য, শারীর ধর্ম্ম-গুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল একটু চাহনি বা একটা হাবভাব কি পোছের (Pose) সাহায্যে,—ক্ষীণপয়োদর ও লবুনিতর পবাহারী কৃণাদ্বিগীর্ণকে শাড়ী পরাইয়া, ছেলে কোলে দিয়া, মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁদের এ চেষ্টা যে একান্ত অসত্যকে আশ্রয় করিয়া নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে, ইহা আর বিচিত্র কি !

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ।

ধর্মক্ষেত্র

(১)

গোটা দেহ কার বিরাট দেউল,
সুবিশাল বেদী, ভূধর শির,
অর্থ্য কাহার ক্ষেত্র-কানন,
পাণ্ড, শতেক নদীর নীর ?
পূজার বাস্তব কীচক রক্তে ;
সিন্ধু লহরে, বিহগ গানে,
নিতি উৎসবে আরতি কাহার,
আকাশ ভরিয়া আলোর ঞাণে ?

কুশের বনয়ে, ধূপের ভয়ে,
শুক প্রসাদী পূজার ফুলে,
ভরা আলপনা চন্দন দাগে,
গৃহ, প্রান্তর নদীর কূলে ?

কোথায় সদাই চরণ ফেনিতে
শিহরে অঙ্গ ভক্তি-ভরে,
পবন কোথায় যন্তুশীতল,
সলিল নিযুত কলুষ ক্ষয়ে ?
সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র,
ভারত মাতার কর্মভূমি,
ধন্য জনম, যাগার জীবন-মরণ-শরণ চুমি ?

(২)

গোধন কোথায় রেখেছে বাঁচায়ে
তাপসের তপ দেবের যাগ,
নৃপের ঋদ্ধি ;—জননীকল্যা
লভিয়াছে পূজা সেবার ভাগ ?
হিংস্র কোথায় আমিষ ত্যজেছে
লভিয়া পুণ্যকুশের গ্রাস,
বেদীর মস্তে দীক্ষিত তারা
হয়েছে ঋষির দাসাশ্রুদাস,

কেশরী কেশর লুটায় লেহিছে
জগৎ-মাতার চরণতল ;
কালফণী সম পিতার অঙ্গ
বেড়িয়া ফেলেছে আঁধির জল ;
বিহগ কোথায় পরাণ দিয়াছে
কৃধির উগারি সতীর লাগি,
খগরাজ কোথা লুটিয়া পড়িয়া
বিভুর চরণে রয়েছে জাগি ?

সে যে শো আমার ধর্মক্ষেত্র,
ভারতমাতার কর্মভূমি
ধন্য জনম, যাগার জীবন-মরণ-শরণ চুমি ?

(৩)

দেবের স্বাজনে সাধের পুঙ্খ
দিয়াছে কোথায় চমর-বধু,
তুচ্ছ জীবন করিছে উচ্চ
মধুমক্ষিকা বিতরি মধু ?
বহে মৃগনাভি নাভিতে হরিণ
দিতে দেবতায় গন্ধমুখ,
দিয়াছে মুক্তা কুণ্ড বিদারি
বারণ, শুক্তি বিদারি বুক ?
পাষণ আপন বক্ষ চিরিয়া
দেছে কুকুম সিঁদুর রাগ,
তৃণ তরু দেছে আপন অস্থি,
সাধিতে কোথায় দেবের যাগ ?
কীট কোথা দিয়া আপনার হিয়া
পরায়েছে মায়ে 'লাঞ্চল,
আপন পরাণে রঞ্জিয়া দেছে
জগৎ-মায়ের চরণতল ?

সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র

ভারতমাতার কর্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

(৪)

‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ ‘রাম রাম’ বিনা

কহে না কোথায় সারিকান্তক ?

রাগায়ণ-শ্রোত দিয়াছে খুলিয়া

ক্রোধ কোথায় বিদারি বুক ?

তিত্তিরি কোথা নসি আশ্রমে

উপনিষদের বারতা কয়,

কৃতক পুত্র ময়ূর করেছে

খাষি-তনয়ের হৃদয় জয় ?

কানন পেলেকে যোগী সন্ন্যাসী

অশোক বিম্ব বটের ছায়,

জানন মলিন হোমের ধূমেতে,

করণা অরুণ নয়নে চায় ;

ধরেছে বাকল, অক্ষ-মালিকা,

ভৃঙ্গার কোথা বিটপিগুলা,

ক্ষণে ক্ষণে ঐ তম্বুরোমাঞ্চে

কুটিয়া উঠেছে কেশর ফুল ?

সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র

ভারতমাতার কর্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

৫

দারু, তুণ, হিয়া পাষাণে ঘরষি

কোথা দেছে দেবে গন্ধরস,

দেবতা দেউলে দহিয়া মরণে

লভিয়াছে ধূপ, অমর যশ ?

গোময় কোথায় করে দেছে

গুচি, লক্ষ্মীমায়ের আদিনাতল ?

অর্ঘ্যেরি লাগি কোথা ফুটে ফুল,

ভোগের লাগিয়া ধুরে গো ফল ?

আশীষ কোথায় দুর্বার দল,

মঙ্গলমাটি যুগরোচনা ?

ধাত কোথায় কমলাদেবীর

অকলঙ্করা মুক্তাকণা ?

বৈশাখদিনে অশ্বখ কোথায়

লভে গাঙ্গেয় ঝারার জল ?

দীপ আলোকিত তুলসীকুঞ্জ

মরণেতে দেয় স্নমঙ্গল ?

সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র

ভারতমাতার কর্মভূমি।
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

স্বরণের ঘাটে নিতি থেয়া দিতে

জাহ্নবী মায়ে রেখেছে কে বা ?

কোথায় নর্য কর্ম-ফলদা স-যু,

যমুনা, তমসা, রেবা ?

ঋষির আদেশে কোথায় শৈল

নমিয়া পড়িল তাহার পায় ?

ভূধর নৃপতি ধরিল আদরে

সন্ততিরূপে জগৎ-মায় ?

পুণ্য পুলক-শিহরণ সম

সান্ত্বিক রসে ভক্তদেহে,

শতক তীর্থ মঙ্গলপীঠ

জাগিয়া উঠিল কাহার গেহে ?

আমূল মর্ষ মছন করি

সিদ্ধ কাহার পরাণ পণে,

কমলা, ইন্দু, সুধা, মন্দার,

বিতরিয়া দিল দেবতা জনে ?

সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র

ভারতমাতার কর্মভূমি,
ধন্য জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

৭

নরনারী কোথা প্রভাতে দেউলে

আরতির শুভ শঙ্কতানে,

ভেগে উঠে চায় ভক্তিপ্রগত

রক্ততরুণ অরুণ পানে ;

জ্ঞানপুত গুচি, সিদ্ধ বধনে

ডেকে আনে গৃহী অনাথজনে

অর্পণ করে তর্পণ বারি স্বর্গত যত পিহরণে ?

পঞ্চ যজ্ঞ করিয়া সমাধা

অতিথি ভিখারী তুষিয়া নিতি

দিবসের শেষে, আগিষাবিহীন পুত

ভোজনের কোথায় রীতি ?

সন্ধ্যায় গত সারিয়া কৃত্য,

সুপ্তি কোথায় ক্লান্তিহরা ?

স্বপনেতে কোথায় হেরে গৃহী নিতি

ভৃঙ্গার জটা বাকল ধরা ?

সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র

ভারতমাতার কর্মভূমি,
ধন জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

৮

নিশাতম দূর আরতি আলোকে,

ভোজ্য কোথায় পূজার ভোগ,
দেউল সোপান শয্যা কোথায়,

চরণামৃত হবে গো রোগ।
বিভূনাম লেখা তিলক ভূষণ,

তীর্থের ধূলি অঙ্গরাগ,
গার্হপত্য মরণের চিতা,

দেবতার ঋণ শোধিতে যাগ ?
পূজার কুশ্মে দিন গণে নারী,

হরি বলে ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
তনয়ের নাম রাখে কোথা গৃহী

বিভূর চরণ, মাংয়ের দাস ?
জননী কোথায় অন্তর্পূর্ণ।

দুখী তাপী জনে ধরেছে বুক,
জনক কোথায় শাসনে বেড়ায়

কঙ্কাল মালা পরিয়া স্মৃতে ?
সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র,

ভারতমাতার কর্মভূমি,
ধন জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

৯

শিল্প কাহার দেউল রচনা

মূর্তিগঠনে প্রকাশ পায় ?

সঙ্গীত কোথা ভাবগদগদ

মার পদ বুক ধরিতে চায় ?

কার সাহিত্য, সতীর, সাধুর,

দেবতা জনের কবেছে সেবা ?

বড় কবি কার করুণা পাথর

প্রেমের পাগল সাধক যে বা ?

অনল, অনিল, গ্রহতারা, রবি

লভিয়াছে কোথা পূজার দান ?

প্রজাপতি কোথা করে সোমরস

সন্ধ্যা উষার স্তোত্রগান ?

কার গৃহে গৃহে শিলার খণ্ড

জাগ্রত দেব-বেদীর পরে ?

সব চরাচর লভে কার পূজা

পরংব্রজে বন্ধে ধরে ?

সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র,

ভারতমাতার কর্মভূমি,
ধন জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

১০

কর্ম কোথায় শুধু অধিকার,

ফল সে ত যায় ধাতার পায়,

মরণ মিথ্যা, অমর আত্মা

নবীন বসন পরিতে চায়।

নিজ ভাবনায় রহিলে মগন,

কোথায় নিখিল ভুবন ভুলি,

অভিশাপ থাসে উত্তত জটা,

বিহাং ছটা রোষেতে তুলি' ?

নারী ষোণাকার দেবীর মূর্তি,

মদন শমন চরণে পড়ে,

আজীবন কোথা ব্রহ্মচারিণী,

অথবা পতির চিতায় মরে ?

ইহলোক কোথা প্রবাসের মত,

ভোগ হয় যেন মলিন ক্রন্দ,

গৃহেতে অনল জ্বলিলে কোথায়

গৃহী খুঁজে তার যজ্ঞকর্মে ?

সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র

ভারতমাতার কর্মভূমি,
ধন জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

১১

ধর্মচরণে বিবাহ কোথায়

উজলিতে কুল কোথায় স্মৃত ?

বর্জন তরে অর্জন কোথা,

অভিবেক কোথা হইতে পূত ?

কর্মবলের লাগি যৌবন,

অতিথির লাগি কোথায় গেহ ?

পুনর্জন্ম জিনিতে জনম,

আত্মার লাগি কোথায় দেহ ?

যৌগের লাগিয়া স্বাস্থ্য কোথায়,

ভগের লাগিয়া, কঠোর যোগ ?

চিরনিবৃত্তি লভিবার তরে

কোথায় অচির কালের ভোগ ?

জীবন ধারণ ভুবনের লাগি,
 . পুণ্যের লাগি মনের ভাব ?
 নবীন শক্তি লভিয়া ফিরিতে
 কোথায় ইচ্ছা মরণ লাভ ?
 সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র
 ভারতমাতার কর্মভূমি ?
 ধন জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

১২

কোথা তপঃকুশ ঋষিতনয়ের
 ক্ষীণ অঙ্গুলি হেলন ভরে,
 নৃপতির শির, উদ্ধত বাজি,
 উত্তম অসি নমিয়া পড়ে ?

রাণীসহ রাজা ধেমুর সেবায়
 কোথায় কাননে ভূধরে ফেরে ?
 নৃপসুত ঘুরে পথে প্রান্তরে

কাঁদিয়া দুঃখী জগৎ হেরে ?
 শরণাগতের লাগি নরপতি
 দিতে গেল কোথা আপন প্রাণ ?
 পাপের শাস্তি লাগি দেবর্ষি

হেলায় করিল অস্থিদান !
 যুবরাজ কোথা সখা বলি ডাকি
 নিষাদে বানরে ধরিল বৃকে,
 মরণের আগে মুক্ত নরেশ

কমলার সূতা লভিল সুখে !
 সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র
 ভারতমাতার কর্মভূমি ?
 ধন জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

১৩

কোথা ভিখারীর ক্ষুদের লাগিয়া
 বাধা ভগবান কুটীর দ্বারে !
 যমুনার ফেলে পরশ-পাথর
 কোথায় তুচ্ছ জানিয়া তারে ।
 পতির নিন্দা করিয়া শ্রবণ
 'সতী' ত্যজে কোথায় ঘৃণায় প্রাণ !

বৃদ্ধ পিতারে যৌবন দিল
 অতিথিরে কোথা পুত্রদান !
 সারা জীবনের সাধনার ফল
 কোথা দেয় ব্যাধ গুরুর পায় ;
 পঞ্চ বরষে রাজার তনয়
 বনে বনে কেঁদে হরিরে চায় !
 ভ্রাতার লাগিয়া নিদ্রা ক্ষুধায়
 জিনিল মোক্ষা লাশসারণে,
 প্রজার লাগিয়া জীবনকল্যাণ
 মহিবীরে কোথা পাঠায় বনে ?

যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র
 ভারতমাতার কর্মভূমি,
 ধন জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি'।

১৪

হৃদ্ধবল স্নিগ্ধদিঠিতে
 কে করায় নিতি মোদের স্নান,
 আকাশে বাতাসে মাতাইয়া ভাসে
 কোথা নিমায়ের প্রেমের গান ।
 স্তম্ভের সহ কে দেয় কণ্ঠে,

পাপতাপক্ষয়ী হরির নাম !
 আশীষ কাহার বরের মতন—

করে গো পূর্ণ মনস্কাম !
 শত্রু জনেরে ক্ষমা কে শিখায়,
 লুটিতে মিত্র জনের পায়,
 কীর্তননাচা পথধূলি লয়ে,

কে দেয় মাথায়ে সবার গায় !
 অঞ্জলি দেয় কুসুমেরে ভরিয়া,
 শির গুলি দেয় নোয়ায়ে আর !
 বক্ষে কে দেয় বিমল শান্তি,

চক্ষে জাগায় স্বর্গদ্বার ।
 সে যে গো আমার ধর্মক্ষেত্র

ভারতমাতার কর্মভূমি
 ধন জনম, যাহার জীবন-মরণ-শরণ চরণ চুমি ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

উপাধ্যায়ের স্বাদেশিকতা

আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতটা পরিমাণে যে আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি, দেশের লোকে যেন সে কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। নতুবা এত লোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্ত কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা বাৎসরিক স্মৃতি-সভার আয়োজন পর্যন্ত হয় না কেন ?

উপাধ্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু আমাদের বড় বড় সন্ন্যাসীদের যেমন শিষ্য-সেবক থাকে, উপাধ্যায়ের সেকরূপ শিষ্য-সেবক কেহ ছিল না। সে আকাজ্ঞাও উপাধ্যায়ের ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁর সন্ন্যাস অল্প ধরনের ছিল। গীতা যাহাকে সর্বকর্ম-ন্যাস বলিয়াছেন, উপাধ্যায়ের সন্ন্যাস সে জাতীয় ছিল। আপনার বলিতে সংসারে তিনি কিছুই রাখেন নাই। আজন্ম ব্রহ্মচর্য সাধন করিয়া, তিনি এমন একটা অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁর অহং-জ্ঞানটা ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণতর সম্বন্ধ সকলকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিধে ছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের আধুনিক কর্মনায়কগণের মধ্যে উপাধ্যায়ের মতন আর কেহ এতটা পরিমাণে সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

সন্ন্যাসের অন্তরালে অনেক সময় একটা বুজুর্গী লুকাইয়া থাকে। উপাধ্যায়ের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। কিন্তু তাঁর

প্রাণটা অতি বড় হইলেও, কোনও মতেই তাঁহাকে প্রচলিত অর্থে “বুজুর্গ” বলা যাইত না। অতিলৌকিক কোনও কিছুর দাবী তিনি কখনও করেন নাই। এমন কি আপনি সংসার করেন নাই বলিয়া, সংসারী লোকের প্রতি তাঁহাকে কখনও কটাক্ষপাত করিতেও দেখি নাই।

সন্ন্যাসের সঙ্গে সচরাচর সমাজ-জীবনের একটা বিরোধ জাগিয়া উঠে। সন্ন্যাস লইয়া লোকে প্রায়ই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়। উপাধ্যায় সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারত্যাগী হন নাই। ফলতঃ তাঁর মধ্যে চিরদিনই এমন একটা প্রবল ও সজীব সমাজানুগত্যের ভাব দেখিয়াছি, যার সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর সন্ন্যাসের আদর্শের কোনও প্রকারের আন্তরিক সঙ্গতি-সাধন কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় নাই। আমাদের সন্ন্যাসীরাও কোনও কোনও বিষয়ে একান্তভাবেই লৌকিকাচারের বশতা স্বীকার করিয়া চলেন, সত্য। কিন্তু উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের সঙ্গে ইহাদের সমাজানুগত্যের একটা জাতিগত প্রভেদ ছিল বলিয়াই মনে হয়। আমাদের প্রাচীন মতের সন্ন্যাসিগণ লোকসংগ্রহার্থে, কর্মাসক্ত জনগণের বুদ্ধিতেদ বাহাতে না জন্মায়, তাঁরই জন্ত, লৌকিকাচারের অনুবর্ত্তন করিয়া চালন। উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের অন্তরালে কোনও লোকসংগ্রহের কখনওই দেখিতে পাই নাই। তাঁর অকৈতব স্বদেশ-

ভক্তির উপরেই এই অদ্বুত সমাজানুগত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আর ইহাই উপাধ্যায়ের স্বাদেশিকতার বিশেষত্ব ছিল! উপাধ্যায় তাঁর নিজের দেশকে ও সমাজকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমরা আজি পর্য্যন্ত সে চক্ষু লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের স্বদেশ-প্রেম অতি হালকা বস্তু। আমরা এ পর্য্যন্ত গোটা দেশটাকে ভাল বাসিতে শিখি নাই। আমরা দেশটাকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখি। কিয়দংশ বা তার ভাল, আর কিয়দংশ বা তার মন্দ, একরূপ ভাবে স্বদেশের দভ্যল ও সাধনার ভাল-মন্দের মধ্যে আমরা একটা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া, যেটুকু আমাদের চক্ষে বা বিচারে ভাল লাগে, তাহাকেই ভালবাসি; আর যেটুকু ভাল লাগে না, তাহাকে ঘৃণা করিয়া, তাহা হইতে নিজেদেরে যথাসাধ্য দূরে রাখিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু প্রকৃত প্রেমের ধর্ম এ নহে। ভাল-ও-মন্দ-জড়িত যে প্রেমের পাত প্রেমিকের চিত্তকে আকর্ষণ করে, প্রেমিক তাহাকে গোটাভাবেই দেখে এবং গোটাভাবেই তাহাকে প্রীতি করে। যার এ প্রেম নাই, সে এ ভালমন্দ-মিশ্রিত বস্তুর বা ব্যক্তির ভালকেও ভাল করিয়া বোঝে না; মন্দকেও ভাল করিয়া ধরে না। প্রেমকে লোকে অন্ধ বলে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেমের মতন এমন চক্ষুস্থান আর কিছুই নাই। প্রেম অপরের চাইতে কম দেখে না; বেশী দেখে। আর বেশী দেখে বলিয়াই প্রেমপাত্রের মন্দের মধ্যেও যে ভালটুকু লুকাইয়া আছে, সে

তাহাকেও দেখে, শুধু মন্দটুকুকে দেখিয়াই তাহা হইতে ফিরিয়া আইসে না।

উপাধ্যায় ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের পুরাগত সভ্যতা ও সাধনাকে এইরূপ প্রেমের চক্ষে দেখিতেন বলিয়াই তাঁর নিকটে স্বদেশ-বস্তু যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আমাদের মধ্যে অতি অল্পলোকের নিকটেই সেরূপ করিয়াছে। অনেক সময় এ বিষয়ে উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে চক্ষে স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে দেখিতেন, আমি সে চক্ষে ঠিক দেখিতাম না। অথচ উপাধ্যায় যে নিরতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন, বা যেটা যেমন আছে, সেটা ঠিক তেমনি থাকুক, ইহা যে তিনি চাহিতেন, এমন কথাও বলিতে পারি না। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। যে সমাজ যুগে যুগে বিবর্তিত হয় না, তাহা মৃত, জড়; তার ভূত-গৌরব বাহাই থাকুক না কেন, ভবিষ্যৎ-আশা যে কিছুই নাই, আমরা যেমন ইহা বুঝি, উপাধ্যায়ও ঠিক সেইরূপই বুঝিতেন। তাহাকে প্রকৃত অর্থে কিছুতেই “রি-অ্যাক্শ-নারী” (Re-actionary) বলা সম্ভব হইত না। অথচ, অন্তর্পক্ষে তিনি যে প্রচলিত অর্থে সংস্কারক বা Reformer ছিলেন, তাহাও নহে।

কারণ তিনি স্বদেশকে যে ভাবে, যতটা ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, কোনও সংস্কারকের পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভব বলিয়াই বোধ হয় না। সংস্কারকের অন্তঃপ্রকৃতিটা যে কি, তাহা নিজের জীবনে, আর যৌবন-কালের চারিপাশের যত্নবান্ধব-

দিগের জীবনে সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সংস্কারক সমাজের দোষভাগের প্রতি যতটা সজাগ থাকেন, তার গুণভাগের প্রতি ততটা সজাগ থাকিতেই পারেন না; থাকিলে তাঁর সংস্কার-বাসনার বেগটা কমিয়া যায়। আর যে প্রতিনিয়ত কেবল কোনও ব্যক্তির বা সমাজের হীনতারই আলোচনা করে, এবং এইরূপ আলোচনা করা কর্তব্য কর্ম বলিয়াই ভাবিয়া থাকে তার পক্ষে সে ব্যক্তির বা সে সমাজের প্রতি সত্য ভালবাসা লাভ করা কখনওই সম্ভব হইতে পারে না। ভাগবাসা সুন্দরের সাফাৎ-কারেই জন্মে, সুন্দরকেই চায়, সুন্দরের সন্ধানই ফিরে। কুৎসিতের ধ্যানে বা দর্শনে বা চিস্তনে, ভালবাসা জন্মিতেই পারে না, বাড়িয়া ওঠা বা বাঁচিয়া থাকা তো বহু দূরের কথা। অথচ সমাজসংস্কারক প্রায়ই মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজ-দেহের ক্ষতস্থানগুলির চাণ্ডীদিকেই সর্বদা ভন ভন করিয়া বেড়ান; এরূপ না করিলে তাঁর ব্যবসায় টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই কারণে এই জাতীয় সমাজ-সংস্কারক অনেক সময়ই আত্ম-সম্ভাবিত, ও মদাযিত হইয়া উঠেন। আর এ অবস্থায় ইহাদের পক্ষে স্বদেশকে বা স্বদেশের সমাজকে সত্যভাবে বা গভীররূপে ভালবাসা যে অসম্ভব হইয়া উঠে, ইহা আর বিচিত্র কি? উপাধ্যায় প্রথম যৌবনে কিয়ৎপরিমাণে এ জাতীয় সমাজসংস্কারক যে ছিলেন না, এমন বলা কঠিন। কিন্তু ক্রমে তিনি সে ভাবটাকে ছাড়াইয়া উঠেন। বাংলা দেশে তিনি যে অভিনব দেশভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন,

তাহা তাঁর পরিণত বয়সের দীর্ঘসাধনলব্ধ বস্তু; যৌবনের পরকায় প্রীতির মোহের মরীচিকা মাত্র নহে। তাঁরই জন্ম এ বস্তু এতটা সাক্ষা ও সজীব হইয়াছিল।

উপাধ্যায় স্বদেশের ভালটুকুকে, স্বদেশী সমাজের শ্রেয়টুকুকে, স্বাদেশিক রীতিনীতির শোভনতটুকুকেই ভাল করিয়া ধরিয়া-ছিলেন। ইহাতেই তাঁর উদার কোমল প্রাণ মজিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি অমন করিয়া স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে, স্বদেশী সভ্যতা ও স্বদেশী সাধনাকে এতটা পারমাণে প্রেম দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর চক্ষে আমাদের ভাল, আমাদের মন্দকে ছাপাইয়া উঠিত। আমাদের শৌন্দর্য্য, আমাদের ষড়য্যাতাকে চাকিয়া ফেলিত। আমাদের অশক্ত শক্তি প্রকাশ্য দুর্বলতার মায়িকতা মাত্র প্রমাণ করিত। তিনি আমাদের সিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া সাধ্যের ধ্যান করিতেন। আমরা কি করিতেছি বা করিয়াছি তার বিচার না করিয়া আমরা কি করিতে পারি তারই সন্ধান করিতেন। আর এই জন্মই আমাদের ক্রটি দুর্বলতা প্রভৃতি কিছুতেই তাঁর প্রেমকে ব্যাহত করিতে পারিত না। এ বিষয়ে তিনি ভারতের সম্ভ-সমাজ-সুলভ প্রথর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের সাধুসন্তেরা মানুষ কি জ্ঞাছে তাহা তত দেখেন না, সে লভ্য বস্তুটা যে কি, ইহা জানেন বলিয়া, তাহার বর্তমান-দুর্গতি বা পাপকলুষ দর্শনে বিন্দু পরিমাণেও বিচলিত হন না। এ হৃদনের কর্মভোগ হৃদিয়ে ফুরাইয়া যাইবে। পথের

ধূলামাটি চিরদিন গায়ে লাগিয়া থাকিবে না। একদিন না একদিন এগুলি আপনা হইতেই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এ বিশ্বাস তাঁদের আছে বলিয়া কাহারও প্রতি তাঁহাদের সেরে বা আস্থার বা শ্রদ্ধার কোনও অন্নতা হয় না। উপাধ্যায়ও সেইরূপ এই ভারতবর্ষ আজি কি ভাবে পড়িয়া আছে, তাহার প্রতি দুকৃপাত করিতেন না। ভারতবর্ষ সত্য বস্তুটী কি, ইহাই জানিয়াছিলেন ও ধরিয়াছিলেন বলিয়া তার বর্তমান দুর্গতিতে বা হীনতায় বিন্দু পরিমাণেও তাঁর চিত্র চঞ্চল হইয়া উঠিত না। এ মোহ যে ছুদিনের, এ মায়া যে ক্ষণস্থায়ী, এ দুর্দশা যে শারদ প্রভাতের মেঘাভরণের জায় আপনা হইতে কালক্রমে কাটিয়া যাইবেই যাইবে;—এ বিশ্বাস উপাধ্যায়ের মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। আর উপাধ্যায়ের মধ্যে যে রক্ষণশীলতা দেখা যাইত, তাহা এই অটল বিশ্বাসেরই ফল। স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, স্বদেশের সমাজ-প্রকৃতির ও লোকপ্রকৃতির উপরে উপাধ্যায়ের যেরূপ আস্থা ছিল, এমন আস্থা আমাদের মধ্যে আর কাহারও ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

আর এই খানেই আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ পূর্বযুগের স্বাদেশিকতার আদর্শ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে যে প্যাটি ট্রয়টিক্ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তার মধ্যে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধা ও স্বদেশের শক্তিসাধ্যের উপরে এই অবিচলিত আস্থা

কখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এ বস্তু আমাদের সে কালের সমাজ-সংস্কারকদিগের মধ্যেও ছিল না, রাষ্ট্রসংস্কারক দলেও পাওয়া যাইত না। আর এই জন্তই প্রথম যুগের সমাজসংস্কার-প্রয়াস ও রাষ্ট্রীয়-কর্মক্ষেত্র, উভয়ই একান্ত বহিস্মুখীন ও বিদেশাভিমুখীন ছিল। সুতরাং সে সময়ে আমরা আমাদের সমাজ-জীবন, ধর্মসাধন, কর্মক্ষেত্র, রাষ্ট্রীয়-আকাজ্জ ও আদর্শ,—স্বাদেশিকতার সকল উপকরণ-গুলিকেই বিদেশীয় সৎতা ও সাধনার দাড়িপাল্লায় তুলিয়া তোল করিতে যাইতাম।

আর পরের মাপে যে ব্যক্তি সর্বদা একরূপে ভাবে আপনাকে ওজন করিতে যাইবে, তার আত্মজ্ঞানের ক্ষুধা কদাপি সন্তোষে না। এই কারণে আমাদের প্রথমযুগের সমাজসংস্কার ও রাষ্ট্রসংস্কার সকলপ্রকারের স্বাদেশিক কর্মক্ষেত্রই আমাদের মধ্যে একটা গুরুতর আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া দেয়। এবং এই সাংঘাতিক আত্মবিস্মৃতি হইতে একটা পরমুখাপেক্ষিতার অভ্যাস জন্মিয়া গিয়া, আমাদের সর্ববিধ শক্তিসাধনের আকাজ্জা ও আশ্ফালনকেই আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা-বৃদ্ধির একটা প্রবল ও নূতন কারণ করিয়া তুলে।

প্রচলিত সমাজসংস্কার চেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের এই বিষয় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, উপাধ্যায় এই উভয়বিধ কর্মক্ষেত্রেরই তীব্র প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সর্ববিধে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া, দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে আত্মস্থ ও পরিপুষ্ট

হইবার পথে অন্তরায় স্থাপন করিতেছিল। আবেদন-নিবেদনেই দেশের নবজাগ্রত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছিল, জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়াও এই সকল রাষ্ট্রীয় কর্মচেষ্টা, সে শক্তিকে সংহত ও কার্যক্ষম করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। বরং প্রজা-সাধারণের নিজেরহাতে আত্মচেষ্টাতে কোনও স্বাদেশিক কর্মসাধনের ইচ্ছা ও প্রয়াসেই নষ্ট করিয়াই ফেলিতেছিল। এই জ্ঞত উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে আত্মনির্ভর ও আত্মচেষ্টার আদর্শটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। নিজের কোটে থাকিয়া, গবর্ণমেন্টের দিকে একান্ত-ভাবে মুখ ফিরাইয়া, শাস্ত ও সমাহিত ভাবে আমরা জনশক্তির সংগঠিতে সর্ববিধ স্বাদেশিক কার্য সাধন করিব,— উপাধ্যায় সর্বদা এই কথাই বলিতেন। গবর্ণমেন্টের সঙ্গে বিরোধ বাধানই প্রথমাবধি যে তাঁর রাষ্ট্রীয় কর্মচেষ্টার লক্ষ্য ছিল, এমন কথা বলা যায় না। ক্রমে, ঘটনাচক্রে, এরূপ একটা বিরোধের সূত্রপাত হয় সত্য; কিন্তু এই বিরোধকে উপাধ্যায় নিজে ইচ্ছা করিয়া জাগাইয়া-ছিলেন, এমন কথা ও বলা যায় না। ফলতঃ দেশের তদানীন্তন অবস্থাদ্বীনে গবর্ণমেন্টের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া স্বাদেশিক কর্ম করা নীতিসম্মত, না হইলেও, চিরদিনই যে জনমণ্ডলীর পক্ষে এরূপ স্বাভাব্য অবলম্বন করা আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় বা সম্ভব, উপাধ্যায় এমনটা কখনও ভাবিতেন বলিয়া বোধ হয় না। সে সময়ে দেশ বোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে একটা রাজসিক প্রেরণা প্রদান করা আবশ্যক হয়। এই জ্ঞত উপাধ্যায় জীবনের শেষ দশায় এই স্বাভাব্য-নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজসিকতা ভারতের সভ্যতা ও সাধনার চিহ্নস্তন বা

উর্দ্ধতন লক্ষ্য যে নয়, উপাধ্যায় ইহা যেমন জানিতেন, এমন আর কেহ জানিতেন বলিয়াই বোধ হয় না। তবে যে সাত্বিকতা চিরদিনই আমাদের সভ্যতা ও সাধনার চরম লক্ষ্য হইয়া আছে; সেই সাত্বিকতাকে জাগাইতে হইলেই, সে অবস্থায়, প্রথমে দেশবাসী তামসিকতাকে রাজসিকতার দ্বারা অভিভূত করা আবশ্যক— উপাধ্যায় এ সত্যটাকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রেই এই রাজসিকতাকে জাগাইয়া তোলা সহজ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। তাহাতে ভবিষ্যতের সাত্বিকতার পথও উন্মুক্ত হইবে, অথচ সমাজে কোনও প্রকারের সাংঘাতিক অরাজকতার প্রতিষ্ঠারও কোন বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। এই জ্ঞত উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে এই অভিনব স্বাভাব্যনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। দেশের লোকের আত্মচেষ্টান্যকে জাগাইয়া তোলা, তাহাদিগের চক্ষুকে আপনার উপরে নিবদ্ধ করা, নিজের হাতে দেশের কাজ দশে মিলিয়া করিলে যে শিক্ষা, যে সংঘম, যে শক্তি লাভ হয়, ইহাতে আপনাদের উপরে যে আস্থা জন্মে, ও এই আস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে যে উৎসাহ, অন্তরে যে আশা, পেশিতে যে বল সঞ্চারিত হয়, এই সকলের জ্ঞত উপাধ্যায় এই নীতি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, নতুবা গবর্ণমেন্টের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া বিরোধ বাধানই যে তাঁর অভিপ্রায় ছিল, এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারি না। কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাদেশিকতার সত্য আদর্শটিকে ধরিতে হইলে, বিশেষভাবে তাঁর সমাজ-নীতির আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ এখানেই তাঁর স্বাদেশিকতার নিজস্ব স্বরূপটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সময়ান্তরে সে কথা বলিবার বাসনা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত



বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

দশম অধ্যায়

পাষাণী-বিদেষ ও আশ্রয়প্রকাশ



এই “প্রকাশে” একদল লোক বড়ই
বিরক্ত হইয়া উঠিল। গভীর রাত্রিতে
কীর্তনের শব্দে তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত
হইত। তাহারা পথে ঘাটে মাঠে সর্বত্র
নানা কথা বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া
বেড়াইতে লাগিল।

কেহো বলে এ গুলার কি হইল বাই।

কেহো বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই ॥

কেহো বলে গোসাই কৃষি ঘন ডাকে।

এ গুলার সর্বনাশ হইব এই পাকে ॥

কেহো বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।

পরম উদ্ধত সম সবার ব্যভার ॥

কেহো বলে কিসের কীর্তন কে বা জানে।

এত প্যু কেরে এই শ্রীবাস বামনে ॥

মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই।

হরি বলি ডাক ছাড়ে যেন মহা চাই ॥

মনে মনে ডাকিলে কি পুণ্য নাহি হয়।

রাত্রি করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময়

কেহ কেহ প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল

“যখন-রাজা নদীয়ায় কীর্তনের কথা শুনিয়া

শ্রীবাস পণ্ডিতকে সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া
যাইবার জন্য দুইখানা নৌকা বোঝাই
লোক পাঠাইয়াছেন।” কিন্তু নিন্দা ভয়
প্রদর্শন কিছুতেই কোনও ফল হইল না।
ভক্তগণ ভক্তবৎসলের নাম করিয়া নিশ্চিন্ত
হইয়া রহিলেন। নিমাই পূর্বেরই মত
নিঃশঙ্ক চিত্তে নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।
বৈষ্ণবদেধিগণ বলাবলি করিতে লাগিল “এরা
যে রাজাকেও ভয় করে না। রাজার লোক
আসিতেছে শুনিয়াও রাজপুত্রের মত নির্ভয়ে
বেড়াইয়া বেড়াইতেছে।” অতি বুদ্ধিমান
একজন কহিলেন “এই নির্ভয়তার ভাণ
পলাইবার ফিকির বই আর কিছুই নহে।”
শ্রীবাস-গৃহে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভক্তগণ
কীর্তন করিতেন। অনেকে রুদ্ধ দেধিবার
জন্য আসিয়া রুদ্ধ দ্বার দেখিয়া ফিরিয়া
যাইতে বাধ্য হইত। ইহাতেও অনেকে
বৈষ্ণবগণের উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া
উঠিল, এবং বৈষ্ণবদিগকে অপদস্থ করিবার
জন্য তাহারা নানারূপ উপায় খুঁজিতে

লাগিল। একদিন চাপাল গোপাল নামক এক দুঃস্থ ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে শ্রীবাসের দ্বারসম্মুখস্থ স্থান উত্তমরূপে লেপিয়া তথায় হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন, মণ্ডভাণ্ড প্রভৃতি ভবানীপূজার দ্রব্যজাত রাখিয়া আসিল। শ্রীবাস প্রাতঃকালে সমস্ত দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং স্থানীয় সম্রাট লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া পাষাণগণের কাণ্ড দেখাইলেন। ইহার তিনদিন পরে গোপালের শরীরে কুঠলক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইল। স্বর্ণাণ্ড অস্থির হইয়া গোপাল গোরের শরণ গ্রহণ করিলেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ কীর্তন শুনিতে আসিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। ব্রাহ্মণ মর্মান্তিক হুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে গঙ্গার ঘাটে গোরকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন “তুমি আমাকে নিদারুণ মনঃকষ্ট দিয়াছ, আমি অভিসম্পাত করিতেছি—তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হইবে।” ব্রাহ্মণের শাপে গোরের মনে অপার আনন্দের উদয় হইল, তিনি খলখল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তটশালিনী ভাগীরথীর তীরে দলে দলে গাভীগণ বিচরণ করিতেছিল। নিমাই ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন। গাভীদল দেখিয়া তাঁহার বৃন্দাবন ভ্রম হইল এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া “মুঞি সেই, মুঞি সেই” বলিতে বলিতে তিনি দৌড়াইয়া শ্রীবাসের গৃহে উপনীত হইলেন। শ্রীবাস গৃহমধ্যে নৃসিংহদেবের আরাধনায় নিরত ছিলেন। দ্বারে পদাঘাত করিয়া নিমাই কহিলেন “শ্রীবাসিয়া, যাহাকে পূজা কচ্ছিস্

দেখিয়া যা সে সশরীরে উপস্থিত।” শ্রীবাসের ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন, নিমাই চতুর্ভুজ হইয়া বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং শঙ্খ-চক্র-পদাপন্ন ধারণ করিয়া মত্ত সিংহের মত গর্জন করিতেছেন। শ্রীবাস স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। নিমাই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “শ্রীবাস, এতদিনেও তুমি আমার প্রকাশ বুঝিলে না! কোথায় তোমার চীৎকারে ও নাড়ার হুঙ্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসিলাম; তুমি কি না নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ? আর নাড়া আমাকে ছাড়িয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেল। সাধুর উদ্ধার ও ছুষ্ঠের বিমাণের জন্য আমি আসিয়াছি। আর চিন্তা নাই শ্রীবাস, এখন আমার স্তব পাঠ কর।” প্রেমপুলকিত শ্রীবাস তখন পড়িলেন

“নৌমীড়া তেহভবপুষে তড়িদম্বরায়।

গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছলসম্মুখায় ॥

বহুশ্রেয়ে কবলবেত্র বিষণ্ণ বেণু।

লক্ষশ্রিয়ে যুগপদে পতপাঙ্গজায় ॥

নিমাই প্রীত হইয়া কহিলেন “শ্রীবাস, জীপুত্র সকলকে আনিয়া আমার রূপ দর্শন কর ও পূজা কর এবং অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।” তখন সম্মুখ শ্রীবাস বিষ্ণুপূজার্থ আহত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ‘দ্বারা নিমাইর পূজা করিলেন। নিমাই, শ্রীবাস ও তাহার পরিবারস্থ সকলের মস্তকে চরণাঙ্গণ করিয়া কহিলেন “শ্রীবাস, তোমাকে ধরিতে যবন-রাজা নৌকা পাঠাইয়াছে, শুনিয়া কি ভয় পাইয়াছ? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

কে তোমাকে ধরিবে, শ্রীবাস ? যদি সত্যই নৌকা আইসে সৰ্ব্বাগ্রে আমি গিয়া তাহাতে আরোহণ করিব এবং আমিই সৰ্ব্বাগ্রে গিয়া রাজার সন্মুখে উপস্থিত হইব। আমাকে দেখিয়া কি রাজা সিংহাসনে বসিয়া থাকিতে পারিবে ? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বলিব 'হে রাজা, তোমার কাজীদিগকে বল, তোমার শাস্ত্র পাঠ করিয়া তোমার হস্তী, অশ্ব ও পশুপক্ষীদিগকে কঁাদাক।' কাজীর সাধ্য নাই যে পশুপক্ষী কঁাদায়। তাহারা যখন হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া থাকিবে, তখন আমি রাজাকে বলিব এই কাজীদিগের কথায় তুমি সংকীৰ্ত্তন নিষেধ করিয়াছ? আমার শক্তি দর্শন কর।' তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া আমি যাবতীয় পশু পক্ষী কঁাদাইব, রাজাকে কঁাদাইব, তাহার পারিষদদিগকে কঁাদাইব। আমার কথায় কি তোমার প্রত্যয় হইতেছে না, শ্রীবাস ? প্রমাণ চাও ? তবে এখনই দেখ।' এই বলিয়া শ্রীবাসের লাভসুতা নারায়ণী নারী বালিকাকে সন্ধান করিয়া নিমাই কহিলেন "নারায়ণী, কৃষ্ণ বলিয়া কঁাদ ত।" চারি বৎসরবয়স্ক নারায়ণী তখন "হা কৃষ্ণ" বলিয়া কঁাদিয়া উঠিল। তাহার অঙ্গ বহিয়া নয়ন জল ভূমিতল প্লাবিত করিল। নিমাই আবার কহিলেন "কেমন, শ্রীবাস, এখন বিশ্বাস হইয়াছে, আর ত ভয় নাই।" শ্রীবাস বিগত-ভয় হইয়া নিমাইর শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তদবধি শ্রীবাসের গৃহ গোঁরের নিত্য বিহার-স্থল হইল।

একদিন বরাহাবতারের স্তোত্র পাঠ শুনিতে শুনিতে নিমাই বরাহভাবে আবিষ্ট

হইলেন, এবং বরাহের মত গৰ্জন করিতে করিতে মুরারী গুপ্তের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিমাই মুরারীকে মনে মনে বড় ভাল বাসিতেন। মুরারী তাঁহাকে স্বগৃহে প্রাপ্ত হইয়া সসন্ত্রমে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। নিমাই বিষ্ণুগৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং এক জলপূর্ণ ভাঙ সন্মুখে দৌঁধিতে পাইয়া বরাহের মত দণ্ড দ্বারা তাহা উত্তোলন করিলেন। দেখিতে দেখিতে নিমাইর মানুষ্যমূর্তি অন্তর্হিত হইল এবং তাহার স্থলে চতুৰ্দশ বজ্রবরাহ-মূর্তি আবির্ভূত হইয়া ভীষণ গৰ্জন করিতে লাগিল। মুরারী ভীত হইয়া শ্রবণ করিতে করিতে বলিলেন "হে বরাহরূপী নারায়ণ, বেদেও যখন তোমার তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত নহে, তখন ক্ষুদ্র আমি তোমাকে কি বুঝিব ? তুমি আপনিই আপনাকে জান এবং তুমি যাহাকে কৃপা কর সেই কথঞ্চিৎ তোমাকে জানিতে পারে।" বরাহমূর্তি তখন বেদ নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদ মোরে করে এই মত বিভ্রম ॥
কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সৰ্ব্বাঙ্গে হইল কুঠ তবু নাহি জানে ॥
সৰ্ব্ব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অঙ্গভব আদি গায় যাহার চরিত্র ॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ॥

ভক্তিবিশ্বল মুরারী রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভক্তগণ একে একে

নিমাইর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। পাশ্চাত্য বিদূরিত হইল। হাটে হাটে সর্বত্র কৃষ্ণনাম ধ্বনিত হইতে লাগিল।

একাদশ অধ্যায়

নিত্যানন্দ ও পুণ্ডরীক মিলন, অদৈত
কর্জুক নিমাইর পরীক্ষা

রাঢ় প্রদেশে একচাকা গ্রামে হাঁড়াই পণ্ডিত নামক একজন পরদুঃখকাতর সংসারবিরাগী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নিত্যানন্দ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিত্যানন্দের জননীর নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ শৈশব অতিক্রম করিবার পূর্বেই নিমাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমাই যে মুহূর্ত্তে ভূমিষ্ঠ হন, তখন নিত্যানন্দ এক ভীষণ হুঙ্কার করিয়া গ্রামবাসিগণকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। বাল্যকালে পল্লীস্থ বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণলীলার ও রামলীলার অভিনয় করিতেন। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক সন্ন্যাসী তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। হাঁড়াই পণ্ডিত পরম সমাদরে অতিথিগণ্য করেন। গমনকালে সন্ন্যাসী হাঁড়াই পণ্ডিতকে কহিলেন “আমার সঙ্গে ভাল ব্রাহ্মণ না থাকায়, তীর্থপর্যটনে আমাকে বহু ক্লেশ পাইতে হয়। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমার সঙ্গে দেও, আমি তাহাকে পরম যত্নে রক্ষা করিব।” পুত্রবৎসল পিতা ব্রাহ্মণের নির্ভর প্রার্থনার মর্জ্যাহত হইলেন, জননীও পুত্রবিচ্ছেদাশঙ্কায় আকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অতিথির

প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে অক্ষম হইয়া ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণদম্পতি সন্ন্যাসীর হস্তে নিত্যানন্দকে সমর্পণ করিলেন।

নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সহিত বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন এবং একাকী দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে পথে একদিন কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মাধবেন্দ্র পুরীর দর্শন লাভ করিলেন। মাধবেন্দ্রকে দেখিয়াই নিত্যানন্দ মুচ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। মাধবেন্দ্রও নিত্যানন্দের দর্শনে সংজ্ঞাহীন হইলেন। এই অপরূপ বৃশ্চ অবলোকন করিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি মাধবেন্দ্রের শিষ্যগণ রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত অবস্থানের পর নিত্যানন্দ তাহার নিকট বিদ্যায় গ্রহণ করিয়া সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, বিজয়ানগর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করতঃ নীলাচলে গমন করিলেন। দূর হইতে জগন্নাথের ধ্বজা দেখিতে পাইয়া নিত্যানন্দের মুচ্ছা হইল। মুচ্ছা অপগত হইলে জগন্নাথ দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করিলেন। অনন্তর তথা হইতে গঙ্গাসাগর দেখিয়া মথুরায় গমন করিলেন।

নিত্যানন্দ কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া মথুরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে নবদ্বীপে গৌরের আবির্ভাব সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি অচিরেই মথুরা ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এবং নন্দন আচার্য্য নামক এক পরম ভাগবতের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নন্দনাচার্য্যের গৃহে নিত্যানন্দের আগমনের কয়েক দিন পূর্বে নিমাই ভক্তগণের সহিত একত্র উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন “বন্ধুগণ হুই তিন দিনের মধ্যেই আমরা এক মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিব।” নিত্যানন্দের আগমনের দিন कहিলেন “গতরাত্রিতে আমি এক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। দেখিলাম আমার দ্বারদেশে এক তালধ্বজ রথ; তৎপশ্চাতে এক বিশালকায় পুরুষ, তাঁহার স্বন্ধে এক বিপুল স্তম্ভ, বাম হস্তে বেতবাঁধা এক কাণা কুণ্ড, তাঁহার পরিধান নীলবসন, মস্তকে নীলবস্ত্রের আবরণ, বামকর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল, তাঁহার গতি চঞ্চল; দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ‘এই বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের?’ আমি সেই ভীষণ মুর্তিদর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি कहিলেন ‘আমি তোমার ভাই, কাল আমাদের পরিচয় হইবে।’ এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইর ভাবান্তর লক্ষিত হইল। তিনি হলধর ভাবে আবিষ্ট হইয়া “মদ আন, মদ আন” বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন। তখন

‘আর্য্যা তর্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।

হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সংকর্ষণ ॥

প্রকৃতিস্থ হইয়া নিমাই সকলকে कहিলেন “নিশ্চয়ই কেমনও মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন। হরিদাস ও শ্রীবাস তোমরা গিয়া দেখিয়া আইস। হরিদাস ও শ্রীবাস সমস্ত নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া কাহারও

উদ্দেশ না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন নিমাই ভক্তগণ সহ বহির্গত হইলেন এবং একেবারে নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া তথায় নিত্যানন্দের তেজঃপুঞ্জ মুর্তি দর্শন করিলেন। নিমাই ও নিত্যানন্দ পরস্পরের দিকে অনিমেঘ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তখন শ্রীবাস ভাগবত হইতে আঁরুতি করিলেন

“বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং।

বিভ্রদ্বাসঃ কণককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং॥

রক্তান্ বেণোরধরসুখয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-

বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ॥”

ময়ূরপুচ্ছরচিত চূড়া, কর্ণধয়ে কর্ণিকার

কুসুম, কণককপিশবস্ত্র ও বৈজয়ন্তীমালা

ধারণ করিয়া, নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ অধরসুখা

দ্বারা বেণুবন্ধসমূহ পরিপূর্ণ করিতে

করিতে গোপগণ কর্তৃক স্তুষ্যমান হইয়া

স্বকীয় চরণচিহ্নশোভিত বৃন্দারণ্যে প্রবিষ্ট

হইলেন। শ্লোক শুনিয়া নিত্যানন্দের

মূর্ছা হইল। নিমাই “পড়, পড়” বলিয়া

শ্রীবাসকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

মূর্ছান্তে নিমাই সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন

এবং তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ ভয়সস্তম্ভভাবে

“রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ” বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ

গ্রহণ করিলেন। নিত্যানন্দের ভাবোন্মাদ

লক্ষ্য করিয়া গৌরের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া

অশ্রুধারা ছুটিল। কিন্তু নিত্যানন্দের ভাবা-

বেশ সহজে অপগত হইবার নয়।

গড়া গড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে,

কলেবর পূর্ণ হইল নয়নের জলে ॥

বিশ্বস্তর মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।

অন্তরে আনন্দ ক্রমে ক্রমে মহা হাস ॥

ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে গড়ি ক্ষণে বাহতাল
 ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল ॥
 অবশেষে সেই উন্মাদবপু নিমাই স্বীয় জোড়ে
 ধারণ করিলে, নিতাই নিশ্চেষ্ট হইয়া তথায়
 বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে
 নিতাই বাহুজ্ঞান লাভ করিলে নিমাই
 কহিলেন “এই কম্প, এই অশ্রু ও এই গর্জ্জন
 কখনও ঈশ্বরশক্তি ভিন্ন সম্ভাবিত হয় না।
 শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি সদয় হইয়া তোমাকে
 মিলাইয়া দিয়াছেন। এখন কোন্ দেশ
 হইতে তোমার আগমন হইয়াছে, ব্যক্ত
 করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।”
 নিত্যানন্দ কহিলেন “আমি তীর্থ ভ্রমণ
 করিতেছিলাম; কৃষ্ণের পদরেণুপূত বহুস্থান
 দর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও কৃষ্ণকে
 দেখিতে পাই নাই। অবশেষে এক মহাত্মার
 নিকট যখন জিজ্ঞাসা করিলাম ‘এত তীর্থ
 পর্যটন করিয়াও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম
 না, তিনি কোথায় গিয়াছেন?’ তখন তিনি
 বলিলেন ‘কৃষ্ণ গৌরদেশে গমন
 করিয়াছেন।’ নদীয়ায় সংকীর্ণনের কথা
 শুনিয়া অনেকে আমাকে বলিল ‘নদীয়ায়
 নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।’ কত
 পাতকী এখানে আসিয়া ত্রাণ লাভ
 করিতেছে। আমিও পরিত্রাণলাভের আশায়
 এখানে আসিয়াছি।

কিছুক্ষণ এইরূপে প্রেমানন্দে অভিবাহিত
 হইলে নিমাই কহিলেন “শ্রীপাদ গৌসাই,
 আগামী কল্য ব্যাসপূজার দিন। আপনার
 ব্যাসপূজা কোথায় সম্পন্ন হইবে?” নিত্যানন্দ
 তখন সমীপস্থ শ্রীবাসের হস্ত ধারণ করিয়া
 কহিলেন “এই ব্রাহ্মণের ঘরে আমার ব্যাস-

পূজা হইবে।” অনন্তর সকলে শ্রীবাসের
 গৃহে গমন করতঃ গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্যাস-
 পূজার অধিবাসের উল্লাস কীর্ত্তন আরম্ভ
 করিলেন। ভক্তগণপরিবেষ্টিত নিমাই ও
 নিতাই নৃত্য করিতে করিতে কখনও হৃদ্ধার
 কখনও রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়ের
 শরীর শ্বেদ, কম্প ও পুলকের লীলাহানে
 পরিণত হইল। কখনও পরস্পরের আলিঙ্গনে
 বদ্ধ হইয়া উভয়ে রোদন করিলেন, কখনও
 বা পরস্পরের চরণ ধারণের চেষ্টা করিলেন,
 কখনও বা ভূতলে বিলুপ্তি হইলেন। বাহু-
 জ্ঞান বিলুপ্ত হইল, বসন খসিয়া পড়িল।
 অচিরেই শাত্রোখান করিয়া উভয়ে পুনরায়
 বিপুল উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন

অনন্তর নিমাই অকস্মাৎ লম্ফ দিয়া
 ষষ্ঠার উপর উপবিষ্ট হইয়া “মদ আন, মদ
 আন” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং
 নিত্যানন্দকে কহিলেন, “শীঘ্র আমাকে হল-
 মুষল প্রদান কর।” নিতাই নিমাইর হস্তের
 উপর স্বীয় হস্ত পাতিয়া দিলেন। কেহ কেহ
 তখন নিমাইর হস্তে হল-মুষল প্রত্যক্ষ
 করিয়াছিলেন। অতঃপর নিমাই “বারুণী,
 বারুণী” বলিয়া হৃদ্ধার করিয়া উঠিলেন।
 নিমাইর উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সকলে
 কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল
 পরে সকলে গরামর্শ করিয়া একঘটি
 গঙ্গাজল লইয়া গেলে, নিমাই তাহা পান
 করতঃ “নাড়া, নাড়া” বলিয়া হৃদ্ধার করিয়া
 উঠিলেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন
 “কাহাকে ডাকিতেছ, প্রভু, আমরা ত
 কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” তখন
 নিমাই কহিলেন “আর কাহাকে ডাকিব ?

বাহার আস্থানে আশ্রম বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সেই নাড়া অদ্বৈত আচার্য্য আমাকে ছাড়িয়া গিয়া এখন হরিদাসের সহিত নিশ্চিত মনে কাল কাটাইতেছে।

সংকীৰ্ত্তন আরম্ভে মোহর অবতারণ।

ঘরে ঘরে করি কীৰ্ত্তন পায়ার ॥

বিদ্যাধন কুলমদ তপস্যার মদে।

মোর ভক্ত স্থানে যার অপরাধ আছে ॥

সে অধম সভারে না দিমু প্রেমযোগ।

নাগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ ॥”

নিমাই ক্ষণকাল পবেই প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?” কিন্তু নিত্যানন্দের আবেশ-ভঙ্গ হইল না। তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু কোথায় চলিয়া গেল, বসন কোথায় বিক্ষিপ্ত হইল, কিছুই ঠিকানা রহিল না। নিমাই তাঁহাকে ধরিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন, এবং তাঁহাকে শ্রীবাস-গৃহে রাখিয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

রাত্রিকালে নিতাই স্বীয় দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রাতঃকালে এই সংবাদ পাইয়া নিমাই শ্রীবাস-গৃহে আসিয়া দেখিলেন, নিতাই ‘অনবরত হাস্য করিতেছেন। অনন্তর ভক্তগণগহ নিতাইকে লইয়া নিমাই গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন, এবং স্বহস্তে নিতাইর স্নানদণ্ড গঙ্গায় বিসর্জন করিলেন। গঙ্গা দেখিয়া নিতাইর আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি কখনও বালকের মত নানাভায়ে সন্তরণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা কুন্তীর দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন সেই প্রোঢ়-শিশুকে ব্যাস-পূজার কথা স্মরণ করাইয়া

দিয়া নিমাই তাহার সহিত শ্রীবাস-গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। শ্রীবাস-গৃহে স্নানপূর সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ হইল। সেই সংকীৰ্ত্তনানন্দের মধ্যে নিতাই ব্যাসপূজার সুগন্ধি মালা নিমাইর গলদেশে অর্পণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নিমাইর মানুস্বর্ষি অন্তর্হিত হইল। ভক্তগণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হস্ত-মুখলধারী ষড়-ভূজ মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়-বাস্তভাবে “রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ” বলিয়া উঠিলেন। নিতাই মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অতঃপর নিমাই সেই অমানুষরূপ সংবরণ করতঃ নিতাইর অঙ্কে হস্তাৰ্পণ করিয়া তাহার চৈতন্য বিধান করিলেন। তখন চতুর্দিকে কৃষ্ণধ্বনি সমুদ্রিত হইল। ভক্তগণের বিহ্বল নৃত্যে দিবা অবসান হইল। নিমাই প্রদোষে স্ব-গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

নিতাই শ্রীবাস-গৃহেই রহিয়া গেলেন। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবী নিতাইকে দেখিয়া অবধিই তাঁহাকে অপত্যবৎ স্নেহ করিতেছিলেন। নিতাই মালিনী দেবীকে মাতৃ সঙ্ঘোষন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সহিত শিশুর মতই আচরণ আরম্ভ করিলেন। মালিনী দেবী খাওয়াইয়া না দিলে তাঁহার খাওয়া হইত না; খাইবার সময় অন্ন ছড়াইয়া ফেলা তাঁহার নিত্য অভ্যাসের মধ্যে ছিল। পল্লীস্থ বালকবৃন্দ তাঁহার খেলার সাথী হইল। তাহাদের সহিত গঙ্গায় যাইয়া তিনি তাহাদেরই মত সন্তরণ করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত হস্তপরিহাসে তিনি অনেক সময় কাটাইতেন। তাঁহার বালকবৎ উৎপাত অনেক সময় মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিত—কিন্তু

কেহই তাঁহার উপর বিরক্ত হইতেন না। শ্রীবাসকেই নিতাইর অত্যাচার অধিক পরিমাণে সহ করিতে হইত—কিন্তু কণ কালের জন্তও তাঁহার মনে তজ্জ্ঞা বিন্দুমাত্রও বিরক্তির সঞ্চার হয় নাই। এক দিন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত নিমাই কহিলেন “শ্রীবাস, এই অবধূতের জাতি-কুলের ঠিকানা নাই, যদি জাতি রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সত্বর ইহাকে বিদায় করিয়া দেও।” শ্রীবাস বিনীত ভাবে কহিলেন “প্রভু, আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও! তবে শোন। নিত্যানন্দ যদি মদিরা ও যবনী গ্রহণও করেন, যদি তিনি আমার জাতি, প্রাণ, ধন সমস্তই নষ্ট করেন, তবুও তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি শিথিল হইবে না।” নিমাই প্রীত হইয়া কহিলেন “শ্রীবাস, তোমার এই অচলা ভক্তির জন্ত আমি এই বর দিতেছি যে, তোমার গৃহে দারিদ্র্য কখনও প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না।”

ইহার কিছুদিন পরে শচীদেবী এক অপূর্ণ স্বপ্ন দর্শন করিলেন; নিমাই ও নিতাই পাঁচবৎসরের শিশু হইয়া মারামারি করিতে করিতে দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন, এং মন্দির হইতে কৃষ্ণ ও বলরামের বিগ্রহ বাহির করিয়া আনিলেন। নিমাইর হাতে বলরাম ও নিতাইর হাতে কৃষ্ণ। তখন বিগ্রহদ্বয় নিমাই ও নিতাইকে সোধোদন করিয়া কহিলেন “এই সমস্ত দধি, দুগ্ধ, ঘর-বাড়ী আমাদের, তোরা দুই ডাকহিত করে?” নিতাই বলিলেন “এখন আর গোয়ালার অধিকার নাই, এখন ব্রাহ্মণের

অধিকার আরম্ভ হইয়াছে; দধি দুগ্ধ লুটিয়া খাইবার কাল আর নাই। এখন যদি অবস্থা বুঝিয়া চলিতে না পার, যদি এই সমস্ত উপহারে তোমাদের পুরাতন স্বপ্ন ত্যাগ না কর, তাহা হইলে মার খাইবে।” এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম গর্জন করিয়া উঠিলেন এবং কৃষ্ণের দোহাই দিয়া নিমাই ও নিতাইকে প্রহার করিতে উত্তত হইলেন। নিতাই কহিলেন “কৃষ্ণের দোহাই আর দিতে হইবে না। এখন আর কৃষ্ণের ভয় কে করে? বিশ্বস্তর গৌরচন্দ্র আমার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা।” তখন চারিজন মধ্যে মারামারি ও নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। সকলে পরস্পরের হাত ও মুখ হইতে কাড়িয়া খাইতে লাগিলেন। তখন নিতাই শচীকে ডাকিয়া কহিলেন “মা, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে খাইতে দাও।” অমনি শচীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রাতঃকালে শচী নিমাইকে ডাকিয়া তাহার নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে, নিমাই হাসিয়া কহিলেন “মা আমাদের গৃহদেবতা বড়ই প্রত্যক্ষ। আমি অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি, নৈবেদ্যের অর্ধেক অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমার সন্দেহ হইয়াছিল তোমার বৌ বুঝি নৈবেদ্য চুরি করিয়া খায়। কিন্তু তোমার স্বপ্নের কথা শুনিয়া আমার সে সন্দেহ দূর হইল। অন্তরাল হইতে স্বামীর পরিহাস শুনিয়া বিস্ময়প্রিয়া দেবী হাসিতে লাগিলেন। অনন্তর নিমাই মাতার আদেশক্রমে নিতাইকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ কালে নিতাইকে সাবধান করিয়া নিমাই কহিলেন “নিতাই তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলাম; কিন্তু কোনও

রূপ চঞ্চলতা করিতে পাইবে না।” নিতাই মহা গভীর হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন এবং কহিলেন “আমি কি তোমার মত পাগল?” যথাসময়ে নিতাই ও নিমাই ভোজনে উপবেশন করিলেন। শচীদেবী পরিবেশন কালে একবার রান্নাঘর হইতে ফিরিয়া

আসিয়া দেখিলেন—পাঁচ বৎসর বয়স্ক ছুই শিশু ভোজন করিতেছে; তন্মধ্যে একজন গুরুবর্ণ, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ, উভয়েই চতুর্ভুজ, উভয়েই দিগম্বর, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ শিশুর অঙ্গে স্বীয় পুত্রবধু বিরাজমান। এই অপরূপ দৃশ্যে শচী মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ) শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

ভারতের ভবিষ্যৎ ও লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন-নীতি

দিল্লীর বোম্বা-বিভাগ কে ঘটাইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও সম্মান পাওয়া যায় নাই, কখনও পাওয়া যাইবে কি না ভগবান জানেন। নানা লোকে নানা কল্পনা-জল্পনা করিতেছে বটে, কিন্তু এই ব্যাপারের অন্তরালে এদেশের বা অত্মদেশের কোনও বিপ্লবপন্থীদের ষড়যন্ত্র আছে কি না, বলা অসম্ভব, কিন্তু যে বা যাহারাই এই আততায়ীর কর্ম করিয়া থাকুক না কেন, তাহার বা তাহাদের নীতির বা কর্মের সঙ্গে দেশের লোকের কোনও শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের যে তিল পরিমাণ সহানুভূতিও নাই, আর এ কথাটা অস্বীকার করা চলিবে না।

পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন প্রথম এদেশে এই বিদেশী উপদ্রবের আমদানী হয়, তখনও অনেকে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতি করিয়া, সে অহিতাচারের প্রতি আপনাদের ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু সে সকল প্রতিবাদের মধ্যে আজিকার এই গভীর আন্তরিকতা দৃষ্ট হয় নাই।

বলা বাহুল্য যে, চিন্তাশীল, সম্যকদর্শী

নীতিজ্ঞেরা কোথাও এ সকল ষড়যন্ত্রের সমর্থন করেন না। কিন্তু সকল দেশেই প্রকৃত নীতিজ্ঞের বা Statesmanএর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। প্রকৃত নীতিজ্ঞ হইতে গেলে একদিকে সর্বদা আত্মস্থ হইয়া থাকিতে হয়। অত্মদিকে লোক-চরিত্রের গভীর জ্ঞান থাকাও আবশ্যিক। আত্মস্থ থাকিয়া, ভালমন্দ সকল অবস্থাতে জন-সমাজের নিত্য লক্ষ্যটিকে যিনি ধরিয়া থাকিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত নীতিজ্ঞ বা Statesman। এইরূপ নীতিজ্ঞ কর্মনায়কই আগন্তুক লাভালাভ বা আকস্মিক সুবিধা-অসুবিধাকে উপেক্ষা করিয়া জনসমাজকে আপনার সনাতন লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিতে পারেন।

কিন্তু আধুনিক সভ্য জগতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনার মধ্যে এমন একটা ক্ষুদ্রতা ও সম্প্রদায়গত রেষারেষি জাগিয়া থাকে যে, এই সকল আন্দোলন-শ্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, অনেকের পক্ষেই যথাযোগ্যভাবে আত্মস্থ হইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষত

যেখানে শাসক-শাসিতের পরস্পরের স্বত্ব ও অধিকারের প্রতিদ্বন্দিতার উপরে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হয়, আর শাসিত সম্প্রদায়ের শক্তি অসংহত ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে এবং শাসকসম্প্রদায়ের শক্তি সুসমৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়া শাসিতদিগকে সর্বদা তটস্থ করিয়া রাখে, সেখানে এই শক্তি-সংঘর্ষে দুর্বলতর পক্ষের অধিনায়ক-গণের অভিমানে পদে পদে নিদারুণ আঘাত লাগা একরূপ অনিবার্য হইয়াই উঠে। সে অবস্থায় ইহাদের পক্ষে আত্মপূর্ণ থাকি বা দূরদর্শিনী নীতির অনুসরণ করিয়া চলা সর্বদা সম্ভব হয় না। যুরোপের আধুনিক গণতন্ত্রতার আদর্শ সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে, বহুবিধ প্রতিদ্বন্দী শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া, একটা নিত্য বিরোধ ও বিক্ষিপের সৃষ্টি করিতেছে। এই কারণে সকল দেশেই প্রকৃত নীতিজ্ঞতা বা Statesmanshipও স্বল্পবিস্তর কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। আর প্রকৃত নীতিজ্ঞতার অভাবে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শটা স্বল্পাধিক হীন হইয়া পড়িতেছে। আধুনিক সভ্যজগতের সর্বত্রই যে লোকে কোনও না কোনও আকারের বৈপ্লবিক ভাবের তাড়নায় ক্রমশঃ একটা প্রলয়ঙ্করী অরাজকতার দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, নীতিজ্ঞতার অপচয়ই ইহার প্রধান কারণ। কেননা, দূরদর্শী ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ নীতিজ্ঞ বা Statesmanই কেবল রাষ্ট্রীয় জীবনেও যে অধর্মের দ্বারা ধর্মের, আততায়িতার দ্বারা স্বাধীনতার, অত্যাচার

দ্বারা ত্রায়ের প্রতিষ্ঠা হয় না ও কখনওই হইতে পারে না, ইহা জানেন ও বুঝেন। বিদ্রোহবিক্ষিপ্ত, আত্মবিস্মৃত, নান্দদন্তী-বাদী, আন্তফলপিপু মাযুলী রাজনীতিকের বা Politicianএর পক্ষে এ জ্ঞানলাভ সহজ নহে। এই জন্যই বাংলায় বোমার আমদানীতে দেশের প্রকৃত নীতিজ্ঞেরা ভীত এবং ক্ষুব্ধ হইলেও, দেশের সকল লোকেই যে প্রথমে ইহার গুরুতর অপকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, এমন বলা যায় কি না, সন্দেহ।

সে সময়ে দেশে একটা নিদারুণ অশান্তি জাগিয়া ছিল। নানা কারণে বিদেশীয় শাসকসম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশের শাসিতসম্প্রদায়ের একটা বিষম বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। সেই বিরোধের বিক্ষিপ-বিক্ষোভের মধ্যে যখন সহসা একটা বোমার বড়যন্ত্রের সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন ব্যাপারটা যে কি ভয়ানক ও গুরুতর সকল লোকে ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। স্বদেশ-সেবার নামে, এই জাতীয় আততায়িতা যদি দেশের উদার-মতি কিন্তু অপরিপক্ববুদ্ধি যুবকগণের মধ্যে সাধুকর্ম বলিয়া প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়া যায়, তাহাতে যে কেবল রাজার উদ্বেগ বাড়িবে তাহা নহে, কিন্তু প্রজারও সর্বনাশ হইবে,—আমাদের অভিনব স্বদেশ-পূজা যদি এই তন্ত্র অবলম্বন করে, তাহাতে আমাদের পুরাতন সভ্যতা ও সনাতন সাধনা, আমাদের বিশেষ সমাজগঠন ও নিজস্ব লোক-প্রকৃতি, যাহাকে লইয়া আমাদের জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা

তাহাতে যে এ সমুদায়ই একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে,—এ সকল কথা সকল লোকে ভাবিতে বা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এমন কি কেহ কেহ সেই বোমা-ষড়যন্ত্রের মধ্যে কেবল গুটিকতক গুচ্ছ-চরিত্র, স্বদেশ-প্রাণ যুবকের অসাধারণ আত্মোৎসর্গের সংকল্পই দেখিল। আর এই সকল যুবকেরা গুরুতর অপরাধে অভি-যুক্ত হইয়াও যখন অকুতোভয়ে আপনাদের অপরাধ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল, স্বজন-বর্গের সর্ববিধ অহরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করিয়া, কোনও প্রকারে মিথ্যা-প্রবঞ্চনার আশ্রয়ে আপনাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে রাজী হইল না; প্রাণদণ্ডের বিতীষিকা মাথায় লইয়া দীর্ঘকাল কারাবাসেও যখন ইহাদের স্থৈর্য্যের বা সংযমের, প্রশান্ততার বা প্রসন্নতার একটুও লাঘব হইল না; তখন কোনও কোনও অসম্যকদর্শী লোকে হয় ত এই সকল যুবকগণের ব্যক্তিগত চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, তাহারা যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহার গুরুত্বের যথাযোগ্য পরিমাণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িল। আর এই সকল কারণেই পাঁচবৎসর পূর্ব্বেকার বোমার উৎপাতের বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহাতে যেন আঙ্গিকায় গভীর আন্তরিকতা দেখা যায় নাই।

আজ এ সকলই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বহুদিন পরে একজন সম্যকদর্শী নীতিজ্ঞ বা Statesman ভারত-শাসনভার গ্রহণ করিয়া, দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির সঙ্গে

নবোখিত প্রজাশক্তির একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সাধনের পথ ধরিয়া চলিতেছেন। সকলে না হউক, দেশের লোকনায়কগণের অনেকেই স্বল্পবিস্তর একথাটা বুঝিয়াছেন ও বুঝিতেছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন-নীতি কোন্‌ হৃদয়, লক্ষ্যের সন্ধানে চলিয়াছে, অনেকেই হয় ত এখনও তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যনীতি যে লর্ড রিপণের স্বায়ত্তশাসন-নীতি অপেক্ষা কত গভীর ও কত উদার—এই নীতির যথাযোগ্য অনুসরণের উপরে ইংলণ্ডের, ভারতের ও সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের, এমন কি, সমগ্র সভ্যজগতের, ভবিষ্যৎ শান্তি ও উন্নতি কতটা পরিমাণে যে নির্ভর করিতেছে—লর্ড হার্ডিঞ্জ যে এই নীতির মধ্যে ভারতের স্বাধীন-আত্মজ্ঞার সঙ্গে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য-সম্পদ-রক্ষার একটা চিরন্তন সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের সূত্রপাত করিয়াছেন,—এ সকল কথা অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হার্ডিঞ্জ-নীতির নিগূঢ় মর্ম্ম যাহারা বুঝিতে বা ধরিতে পারেন নাই, তাহারাও এই নীতিপ্রভাবে নিগত আটদশ বৎসরের দুঃস্বপ্নটা যে ক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ইহা সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করিতেছেন। লর্ড মিণ্টোর আত্মব্যাতিনী নীতি যে পরিত্যক্ত হইয়াছে,—প্রকৃতিপুঞ্জের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে উত্তম রাজদণ্ড দেখাইয়া শান্ত সমাহিত করা অসাধ্য, ইতিহাসের এই সার্বজনীন অভিজ্ঞতাকে লক্ষ্য করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ যে প্রজাতাড়ন চেষ্টা পরিহারপূর্ব্বক প্রজারঞ্জন

চেঁটে করিতেছেন,—শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোথাও একটা স্থায়ী বিরোধ জাগাইয়া রাখা নীতিসঙ্গত নহে বলিয়া তিনি যে সম্রাটকে মধ্যস্থ করিয়া, বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থাটা উলটাইয়া দিয়া 'রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপনের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন,—এ সকল কথা সাধারণ লোকেও মোটামুটি বুঝিয়াছে। আর এটি বুঝিয়াছে বলিয়াই সকল সম্প্রদায়ের লোকে লাট হার্ডিঞ্জকে অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জন্তই তাঁহার উপরে এই আততায়িতার আক্রমণে দেশের সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোকে এক বাক্যে এমন আন্তরিকতা সহকারে এ সময়ে এতটা সমবেদনা কেবল প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে; সত্য সত্যই অন্তরে অন্তরে অনুভবও করিতেছে।

কিন্তু লাট হার্ডিঞ্জের সঙ্গে সমবেদনা কিম্বা এই আততায়ী কক্ষের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না। কেবল শাসনে বা প্রতিবাদে এ সকল সামাজিক ব্যাধির আরোগ্য হয় না। আততায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যদি কখনও ধরা পড়ে, এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, তাহা হইলেই যে এ উৎপাত একেবারে থামিয়া যাইবে এমন কল্পনা করাও যায় না। এই উপদ্রব কে ঘটাইল জানি না, কখন জানিব কি না বলিতে পারি না, কিন্তু যেই ঘটক না কেন, সে যে স্বদেশের ও স্বাদেশিকতার বিষয় শত্রু একথা ভাল করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। যারা আজ লাট হার্ডিঞ্জের প্রতি স্বল্পবিস্তর শ্রদ্ধাবশতঃ এই আততায়ী কক্ষের প্রতিবাদ করিয়াছেন,

তাঁরাও সকলে যে এই কাজটা সত্য স্বাদেশিকতার কত বড় শত্রুতা সাধন করিয়াছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অপরে এই আততায়ী কক্ষের ফলে বুঝি বা দেশে পুনরায় লাট মিণ্টোর কঠোর শাসন-নীতি প্রবর্তিত হয়, এই ভয়ে ইহার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারাও এই দুকক্ষের প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কি না সন্দেহ। আর যতদিন দেশের জনসাধারণে এটি ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়াছেন, ততদিন কোন না কোন সম্প্রদায়ের অন্তরে কোনও না কোন আকারে বিদেশীয় বিপ্লব-পন্থাদিগের এই সকল আত্মরিক কক্ষের প্রতি স্বল্পবিস্তর সহানুভূতি থাকা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

এই সকল বিপ্লবপন্থীর কক্ষচেঁটার সঙ্গে আমাদের সত্য স্বাদেশিকতার কোনও প্রকারের সঙ্গতি-সাধন যে একেবারে অসম্ভব, চিরদিন ইহা জানিতাম ও বুঝিতাম। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমাবধি যখনই এই সকল ভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তখনই প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদও করিয়াছি। কিন্তু লাট মিণ্টোর শাসনকালে যথাযোগ্য ভাবে এই বিষয় রোগের প্রতীকার করিবার উপযুক্ত অবসর আমরা পাই নাই। রাজপুরুষেরা তখন আমাদের প্রকাশ্য প্রতিবাদই চাহিতেন, ইহা প্রতীকারের ভার আমাদের উপরে অর্পণ করিতে সাহস পান নাই। রোগের প্রতীকার করিতে হইলে প্রথমে তাহার নিদান-নির্ণয় আবশ্যক।

আর এই নিদান নির্ণয় করিতে গেলেই লাট মিণ্টোর কঠোর ও 'অদূরদর্শী' শাসন-নীতিরও যথাযোগ্য সমালোচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িত। মিণ্টোর শাসনকালে এরূপ সমালোচনা সম্ভব ছিল না, সুতরাং দেশের লোকনায়কগণের পক্ষে সত্যভাবে ও সম্যকরূপে এই রোগের প্রতীকার-চেষ্টারও অবসর ছিল না। বিধাতার কৃপায় লাট হার্ডিঞ্জের শাসনাধীনে এ অবসর আমরা পাইয়াছি। মিণ্টো-শাসনের নূতন আইন-কানুন রদ হইয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু সে সকল বিধি-ব্যবস্থার বিভীষিকা দেশে আর জাগিয়া নাই। শাসন-যন্ত্রের পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু বর্তমান বড়লাটের ব্যক্তিগত চরিত্র ও সম্যকদর্শী নীতিজ্ঞতার গুণে শাসনের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। বর্তমান অপবাত-বেদনা-পীড়িত হইয়াও লাট হার্ডিঞ্জ যুহুর্ন্তের জ্ঞান ও নীতি-ব্রষ্ট হয়েন নাই। ভারতশাসনে তিনি যে নীতি প্রবর্তিত করিয়াছেন, এই সকল আত্মঘাতী আততায়িতার দ্বারা কেশাগ্র পরিমাণেও যে তাহার পরিবর্তন হইবে না, -রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি এই আশ্বাস প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং এ সময়ে সর্বতোভাবেই স্বদেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষি-গণের পক্ষে লাট হার্ডিঞ্জের সমোচিত শাসন-নীতির সমর্থন করা কর্তব্য।

আমাদের স্বাদেশিকতার সঙ্গে লাট হার্ডিঞ্জের শাসন-নীতির সম্পূর্ণ সঙ্গতি না থাকিলে' কখনই এমন কথা বলিতাম না। লাট কার্জন এবং তাঁহার পরে লাট মিণ্টো যে নীতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন,

তাঁহার সঙ্গে এই স্বাদেশিকতার সঙ্গতি থাকা দূরের কথা, বরং একটা প্রবল বিরোধই জাগিয়া ছিল। এ বিরোধ না থাকিলে, এই কয় বৎসর দেশে যে অশান্তি জাগিয়া ছিল তাহাও জাগিত না। লাট কার্জন সর্বতোভাবে ব্রিটিশের স্বার্থকে ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ও রাষ্ট্রীয় কৰ্মক্ষেত্রে ভারত-বাসীর স্বাদেশিকতার আদর্শের প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতের সাম্রাজ্য-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যনীতিকে তিনি কিছুতেই মিলাইতে মিশাইতে পারেন নাই। সুতরাং লাট কার্জনের শাসনকালে ভারতের স্বাদেশিকতা কিয়ৎপরিমাণে গভর্ণমেণ্টের দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে আরম্ভ করে। লাট মিণ্টোও কার্যতঃ লাট কার্জনের শাসননীতিরই অনুসরণ করেন, সুতরাং তাঁহার শাসনকালেও স্বাদেশিক লোকনায়কগণ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সাহচর্য্য করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। লাট মিণ্টো উক্ত শাসনদণ্ড দেখাইয়া, আমাদের প্রাণগত স্বাদেশিকতাকে বর্জন করিয়া, তাঁহার গভর্ণমেণ্টের একান্ত আহুগত্য গ্রহণ করিবার জ্ঞান আমাদেরকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আর those who are not with us, are against us অর্থাৎ যাহারা আমাদের পক্ষে নয় তাহারা আমাদের বিপক্ষে, এই বলিয়া, শুদ্ধ এই সন্দেহের উপরে নির্ভর করিয়া, অপরাধী-নিরপরাধী-নির্কিশেবে দেশের সকল স্বাদেশিকতাকেই ব্রিটিশ-শাসনের স্বল্পবিস্তর শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। এরূপ অদূরদর্শিতার দ্বারা যাহারা বাস্তবিক শত্রু

নহে, তাহাদিগকেও যে শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে পারা যায়, লাট মির্টো এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকেরা এ মোটা কথাটাও, মনে হয়, বুঝি বা লক্ষ্য করেন নাই।

লাট হার্ডিঞ্জ ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। গুনিয়াছিঁ তিনি না কি একবার বলিয়াছিলেন .যে Nagging is not administration ; অর্থাৎ খোঁচান আর শাসন করা এক কথা নহে। এই জ্ঞাত্তি তিনি কারণে অকারণে অথবা সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া দেশের কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে খোঁচাইতে চান নাই। অতদিকে আমাদের স্বাদেশিকতার মূল লক্ষ্যটিকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয়। বিগত বৎসর বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার প্রস্তাব করিয়া তিনি যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তাহাই ইহার সাক্ষী। এই মন্তব্যে তিনি মুক্ত কণ্ঠে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের বা provincial autonomyর আদর্শটিকে ব্রিটিশ-শাসননীতির অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। লাট হার্ডিঞ্জের মত সুবিজ্ঞ ও সম্যকদর্শী নীতিজ্ঞ ব্যক্তি প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বা provincial autonomy প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বা National autonomyকে যে চিরদিন টেকাইয়া রাখা অসাধ্য, এমন সোজা কথাটাও যে বোঝেন না ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। Provincial autonomy বা প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের পশ্চাতে national autonomy বা স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্য যে আসিবেই আসিবে ইহা অবশ্যসম্ভাবী ও অনিবার্য। সুতরাং লাট হার্ডিঞ্জ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের আদর্শটিকে

প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিয়া, কার্যতঃ স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের আদর্শও গ্রহণ করিয়াছেন। আর এই জ্ঞত্বই ভারতের স্বাদেশিকতার সঙ্গে হার্ডিঞ্জ-নীতির প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই।

কোন আদর্শের দর্শন লাভ করিলেই অমনি যে তাহা চরিত্রে বা জীবনে, অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে একেবারে গড়িয়া উঠে, তাহা নহে। কি ব্যক্তিগত জীবনের, কি সামাজিক জীবনের,—সকল উন্নয়ন ও উন্নত আদর্শ-গুলিকেই গুরুদত্ত মন্ত্রের তায়, বহুকাল ধরিয়া ধ্যান ও ধারণা করিতে হয়। দীর্ঘকালব্যাপী শাসন-সংঘর্মের অনুসরণ করিয়া, জীবনের বা সমাজের ক্ষেত্রকে সেই আদর্শের সম্যক প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া তুলিতে হয়। সুতরাং মন্ত্রলাভ আর সিদ্ধিলাভ যেমন এক কথা নহে, সেইরূপ কোন আদর্শকে লাভ করা ও তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা এক কথা নহে। অতএব আমরা স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ লাভ করিয়াছি বলিয়া, এখনই যে সে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, এমন কল্পনাও করা যায় না। এ বিষয়ে এত অধীর হইলে চলিবে না। অর্থেই সকল ক্ষেত্রেই সাধনার বাদী। যেমন ধর্ম-জীবনে সেইরূপ রাষ্ট্রীয়জীবনেও দীর্ঘকাল-ব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনা করিতে করিতে প্রবর্তাবস্থার অনেক ভুল-ভ্রান্তি অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই সংশোধিত হইয়া যায়। এইরূপেই শিষ্ট আপনার পূর্ক সংস্কার-বশতঃ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে গুরুদত্ত মন্ত্রের যে কদর্ঘ করিয়া লয়, সাধনের

অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাও সংশোধিত হইয়া, অন্তরগত মোক্ষের আদর্শ ক্রমে ক্রমে পরিষ্কৃত ও সুসংকল্প হইয়া উঠে। অতএব আমরা নবজাগরণের প্রথম উল্লাসে স্বাদেশিকতার যে ছবি আমাদের অন্তরে অঙ্কিত করিয়াছিলাম, চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে তাহার যথাযোগ্য সঙ্গতি সাধন করিতে যাইয়া যে সে ছবির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাবেশের কিছু কিছু পরিবর্তন হইতে পারে না বা হইবে না ইহাও অসম্ভব। আর এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে লর্ড হার্ডিঞ্জ আপনার মন্তব্যে যে আদর্শের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই স্বাদেশিকতার সত্য আদর্শ নহে, এমন কথাও বলিতে পারি না।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংরেজ। ব্রিটিশের স্বার্থের প্রতি অন্ধ হইয়া চলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষার জগুই তাঁহার উপরে ভারতের শাসনভার অর্পিণ হইয়াছে। ব্রিটেনের অনিষ্ট করিয়া ভারতের ঈষ্ট-সাধনের জগু চেষ্টা করিলে, লর্ড হার্ডিঞ্জকে বিশ্বাসঘাতকের কৰ্ম করিতে হয়। সুতরাং ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশের সকল সম্পর্ক চুকিয়া ঘাউক এমন নীতির অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ও অসঙ্গত। তাঁর শাসননীতির লক্ষ্যও ইহা নহে। অতএব তিনি জানেন যে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক বজায় রাখিতে হইলে, দেশের এবং জগতের বর্তমান অবস্থাবীনে, কার্জনের বা মিস্টের নীতির অনুসরণ করিলে চলিবে না। সমগ্র জগত যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের সন্ধানে ছুটয়াছে,

ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জকে সে পথ হইতে সরাইয়া রাখা বা প্রতিনিবৃত্ত করা সম্ভব নহে। সুতরাং ভারতের নবজাগৃত স্বাধীন-আকাজ্জা কি করিয়া নিশ্চল করিতে হইবে, ব্রিটিশ শাসনের বর্তমান সমস্তাও ইহা নহে। কিরূপে এই আকাজ্জার যথাযোগ্য পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াও, ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় সম্পর্কটা বজায় রাখিতে পারা যায়, ভারত-শাসন সম্বন্ধে ব্রিটিশ নীতিজ্ঞদিগের সম্মুখে এই সমস্তাই আজ উপস্থিত হইয়াছে। যে পথে এই সমস্তার মীমাংসা সম্ভব, লর্ড হার্ডিঞ্জ সেই পথ ধরিয়াই চলিয়াছেন। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই তাঁহার এই সমীচীন শাসননীতির সমর্থন ও অনুবর্তন করা কর্তব্য।

আর ভারতের সত্য স্বাদেশিকতার পক্ষেও এই একই বিধান। জগতের সভ্যতাভিমानी জাতি সকল আপনাদিগের দেশে যে সকল অধিকার ও অবসর ভোগ করিয়া থাকে, ভারতবর্ষের লোকেরা নিজেদের দেশে সেই সকল অধিকার ও অবসর লাভ করিয়া সর্বতোভাবে আপনাদের সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের সার্থকতা সাধন করুক, ভারতের স্বাদেশিকতা ইহাই চায়। স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের অণু কোন অর্থ আছে বলিয়া জানি না। জগতের আর সকল জাতির সঙ্গে সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া না থাকিলে, যে আমাদের জাতীয় জীবনের এই সার্থকতা-সাধন অসম্ভব, এমনও বলা যায় না। আর ব্রিটিশের সঙ্গেও আমাদের এমন একটা সম্বন্ধ তো কল্পনা করিতে

পারা যায়, যে স্বধ্বংসের দ্বারা আমাদের স্বাধৈশিকতার সার্থকতা সম্পাদনে কোনোই ব্যাঘাত উৎপন্ন হইবে না। ক্যানেন্ডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও ব্রিটিশের সঙ্গে বিবিধ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ। কিন্তু এ সম্বন্ধে তো তাহাদের স্বাধৈশিক স্বাতন্ত্র্যকে বিন্দু পরিমাণও সঙ্কুচিত করে নাই। ক্যানেন্ডা প্রভৃতির সঙ্গে ব্রিটিশের যে সম্বন্ধ আজ আছে; আমাদের সঙ্গে কখনই সে সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে না, জানি। এ সম্বন্ধ স্বল্পবিশ্বের রক্তের সম্বন্ধ। ইংরেজের উপর ভারতের সে সম্বন্ধের দাবী নাই, এবং কখনও হইবে না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতি যে পথ ধরিয়া চলিতেছে তাহাতে অল্পকাল মধ্যেই ক্যানেন্ডা প্রভৃতির সঙ্গেও ইংলণ্ডের একটা নূতন সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে হইবে, নতুবা কেবল বর্তমান রক্তের সম্বন্ধের উপরে এত বড় সাম্রাজ্যটাকে ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। এই নূতন সম্বন্ধ Federation-এর আকার ধারণ করিবে। আর এই Federation-এর আদর্শে ভারতের স্বাধৈশিক স্বাতন্ত্র্যের

সঙ্গে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য-সম্পদের একটা সম্বতিসাধন সম্ভব। লর্ড হার্ডিজ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাঁহার শাসন-নীতি এই Federation-এর পথ লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছে। এই জন্তই তিনি ভারতে ব্রিটিশ প্রভুশক্তির প্রতিনিধি হইয়াও আমাদের স্বাধৈশিক স্বাতন্ত্র্যের আদর্শটিকে আপনাদের শাসননীতির মধ্যে বরণ করিয়া তুলিয়া লইয়াছেন।

আর এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই, তাঁহার উপরে যাহারা আততায়ীর মত এই আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বদেশের ও স্বাধৈশিকতার ঘোরতর শত্রু বলিয়া মনে করি। বিধাতার ক্রুপায় লর্ড হার্ডিজ স্বপ্ন পাইয়াছেন। তিনি সম্রাট আরোগ্য লাভ করিয়া ভারতের, বিলাতের, এবং লগন্তের কল্যাণ করে আপনাদের অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করুন, ভগবৎ-চরণে এই প্রার্থনা করি। তাঁহার উপরে অব্যবহিত ভবিষ্যতে ভারতের শান্তি এবং আমাদের স্বাধৈশিক স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের যথাযোগ্য ক্ষুণ্ণি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

জয়দেব ও বিদ্যাপতি

-(১)-

জয়দেব বাঙ্গালী, কিন্তু বাঙ্গালী কবি নহেন; বিদ্যাপতি মিথিলা-নিবাসী হইয়াও কিন্তু এখন বাঙ্গালী কবির মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় বিদ্যাপতির যত আদর মিথিলায় তত আছে কি না জানি না, অন্ততঃ

ইহা নিশ্চিত যে বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির যে পরিমাণে চর্চা হইয়াছে ও হইতেছে, সেই পরিমাণে চর্চা তাঁহার জন্মভূমিতে হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, জয়দেব যে দেশের কবি, সে দেশে কবিত্বের আদর চিরপ্রথিত, সে

দেশের জন-বায়ু যেন কবিত্তময় ; অতএব
যাহার যথার্থ কবিত্ব আছে বঙ্গদেশ তাহাকে
সমাদর করিতে যেন বাধ্য। জয়দেব বাঙ্গালী
হইয়াও বাঙ্গালী কবি নহেন, তথাপি বঙ্গ-
ভারতী তাঁহার কাছে যে কত ঋণী তাহা
এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। জয়দেব
বাঙ্গালার শেষ সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া-
ছেন, যেন সংস্কৃত ভাষা মৃত ভাষা হইবার
পূর্বে অপূর্ণ উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দিক্
উদ্ভাসিত করিয়া নিভিয়া গিয়াছে। মধুর
কোমল-কান্ত পদাবলী যথার্থই যদি দেখিতে
চাও, তবে গীতগোবিন্দ পাঠ কর, তাহা
দেখিতে পাইবে।

কিন্তু যাই মিষ্ট হউক, গীতগোবিন্দ যদি
সংস্কৃত কাব্য মাত্রই হইত, তাহা হইলে আমরা
তাহার এত পক্ষপাতী হইতাম না। গীত-
গোবিন্দ শেষ সংস্কৃত কাব্য, কিন্তু আদি
বাঙ্গালা কাব্য। একটা বিশাল বৃক্ষের পতন
হইলেও, অনেক সময় তাহার শিকড় হইতে
ছোট গাছগুলি যেমন আপনি গজাইয়া উঠে,
তেমনি বিশাল সংস্কৃত কাব্য-তরুর পতনে,
বাঙ্গালা কাব্যবৃক্ষের চারা যেন আপনি
গজাইয়া উঠিয়াছিল। গীতগোবিন্দের
গীতগুলি হইতে সংস্কৃত বিভক্তিগুলি খনাইয়া
লইলে, তাহার বাঙ্গালা কবিতার মত
শোনায়।

“চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং

শীলয় নীল নিচোলম্।”

বাঙ্গালা কবিতার উর্দ্ধতন পিতামহও নয়, ঠিক
এক পুরুষ-উপরেই। অনেক স্থলে গীত-
গোবিন্দের পদ অবিকল বাঙ্গালা বলিয়াই
লওয়া যায়—

(১) চন্দনচর্চিত নীল কলেবর পীতবসন
বনমালী।

(২) মধুকর নিঃসর করষিত কোকিল
কুজিত কুঞ্জ কুটীরে।

(৩) ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন কোমল
মলয় সমীরে।

এগুলি খাঁটি বাঙ্গালা কাব্যও বেশ চলিয়া
যাইতে পারে। অনেক স্থলে ক্রিয়াপদের
একটু আধটু ব্যতিক্রম করিলেই জয়দেবের
গান বাঙ্গালা গানে পরিণত হয়। যথা—
ধীর সমীরে যমুনা তীরে

বসতি বনে বনমালী।

জয়দেবের গীতগোবিন্দে একটা স্তোত্র
আছে, যাহার সাতটি চরণে ও ভারতচন্দ্রের
বাঙ্গালা স্তোত্রগুলিতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।
ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

জয় রাম রাঘব, কৃষ্ণ কেশব

কংস দানব ধাতন।

অথবা জয় জয় হর রঙ্গিয়া,
কর বিকশিত নিশিত পরশু

অভয় কর কুরঙ্গিয়া।

ইহার সহিত গীতগোবিন্দের ২নং গীতের
প্রথম সাতটি চরণ মিলাইয়া দেখুন, কিছু
প্রভেদ নাই। বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে যদি
ইহার স্থান পায়, তাহা হইলে যে না জানে,
সে কখনই বুঝিতে পারিবে না যে, এই স্তোত্র-
গুলি সংস্কৃত গীতগোবিন্দে আছে। গীত-
গোবিন্দের ভাষা বাঙ্গালা কাব্যের ভাষার
সূচনা করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার
কারণ নাই। বাঙ্গালা ভাষার বীজ বপন
করিয়া গীতগোবিন্দে সংস্কৃত কাব্যের শয়ন,
এবং কয়েক শতাব্দী পরে গীতগোবিন্দের

ভাব, ভাষা ও ছন্দ লইয়া মৈথিল কবি
 বিদ্যাপতির ও বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের
 জাগরণ। গীতগোবিন্দের মত মধুর না
 হইলেও, ভাষা ও ছন্দ বিদ্যাপতির পদাবলীতে
 কম সমৃদ্ধ নহে, নিতান্ত কম মধুরও নয়।
 কিন্তু বিদ্যাপতির ছন্দ যে গীতগোবিন্দের
 ছন্দের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে এ বিষয়ে
 মতভেদ হইবে না।

রতিসুখসারে গতমভিসারে

মদন মনোহর বেশম্ ।

ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বন-

মনুসর তং হৃদয়েশম্ ।

ধীর সমীরে যমুনা তীরে

বসন্ত বনে বনমালা ॥

নামসমেতঃ কৃতসঙ্কেতঃ বাদয়তে মূহ বেণুম্

বহু মনুতে তনু তে তনু সঙ্গত পবন চলিত

গণি রেণুম্ ।

এই গীতের ছন্দই বিদ্যাপতির হস্তে

কবরী ভয়ে চামর গিরি পন্দরে

মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে

হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল

গতিভয়ে গজ বনবাসে ।

এবং

অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল

ত্রিভুবন বিজয়ী মালা ।

সুন্দর বদন চারু অরু লোচন

কাজরে রঞ্জিত ভেলা ।

ইত্যাদি ছন্দে পরিণত হইয়াছে ।

শুন বিনিহিতমপি হারমুদারম্ ।

মা মনু তে ক্লেশতরুরিব ভারম্ ॥

রাধিকা বিরহে তব কেশব ।

সরসমসৃগমপি মলয়জ পঙ্কজ ।

পশুতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥

জয়দেবের এই মধুর ছন্দই রূপান্তরিত হইয়া
 বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদাবলীতে
 প্রকাশিত হইয়াছে—যথা

(১) শুন শুন যুগধিনি মনু উপদেশ ।

হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ ॥

(২) এ ধনি কমলিনী শুন হিতবাণী ।

প্রেম করবি অব সুপুরুষ জানি ॥

সুজনক প্রেম হেম সমতুল ।

দহিতে কণক দ্বিগুণ হয় মূল ॥

(৩) শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ ।

আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥

পছি গছি বৈঠবি শয়নক সীম ।

হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম ॥

(৪) অণ্ডল ঋতুপতি রাজ বসন্ত ।

ধাওল অলিকুল মাধবী পশ্চ ॥

(৫) এ কে ধনী কমলিনী সহজহি ছোট ।

করে ধরইতে করে করুণা কোটী ॥

এইরূপ জয়দেবের আরও অনেক
 ছন্দ, অন্ততঃ ছন্দের ধ্বনি, বিদ্যাপতির
 পদাবলীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।
 কথিত আছে যে, জয়দেবের কবিতার
 অনুকরণ করিয়া, কবিশেখর বিদ্যাপতি
 “নবজয়দেব” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।
 নবজয়দেব ভণিতাযুক্ত পদাবলী বিদ্যাপতির
 রচিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। *

জয়দেবের গীতগুলি যেমন শুধু সুর ও
 তালের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ছন্দাঙ্ককও
 বটে, যতি ও মাত্রার উপরও অনেক
 পরিমাণে নির্ভর করে, বিদ্যাপতির পদাবলীও
 ঠিক সেইরূপ। ইহারা গীত হইলেও কেবল
 গান নহে, কবিতাও বটে। বিরাম, যতি,

* পরিষদ সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী।

প্রভৃতি ইহাদের স্মরণলিতেই প্রায় অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান আছে। তাই জয়দেবের গীতাবলী ও বিদ্যাপতির পদাবলী এতদূরত্বেরই পাঠকালে যতি-পতনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পড়িলে ইহাদের মিষ্টত্বের কোনও ক্ষতি হয় না।

বিদ্যাপতিতে ছন্দের বৈচিত্র্য বোধ হয় জয়দেব অপেক্ষাও বেশী আছে, কিন্তু কতকগুলি ছন্দ, যেমন দেশী বরাড়ী প্রভৃতি, দুই কবিরই পদে পাওয়া যায়, এবং ছন্দের গতি ও মৃদুতা জয়দেবের গীত হইতেই যে বিদ্যাপতিতে আসিয়াছিল সে বিষয়ে কোনও ভুল নাই।

বিদ্যাপতি বাঙ্গালী কবি নহেন, এ কথায় আর এখন কাহারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু বিদ্যাপতি 'যে দেশেরই কবি হউন, তাঁহার প্রভাব যে বঙ্গবাসীর উপর অশেষ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই বহুশতাব্দী ধরিয়া বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর আদি কবি বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছিলেন; এবং বঙ্গদেশের বৈষ্ণবকবিকুল তাঁহাকে ও চণ্ডীদাসকে তাঁহাদের পথপ্রদর্শক বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন,' এবং তাঁহাদের নমস্কার পূর্বক তন্নির্দেশিত পথে চলিয়াছিলেন। বৈষ্ণবকবিরাই বঙ্গদেশকে কবিত্বসুধা পান করাইয়া অমর করাইয়াছেন, এবং ভগ্নীরথের মত বঙ্গদেশে কৃষ্ণপাদোদ্ভবা পীযুষবাহিনী গীতি-ভাগীরথীকে তাঁহারাই প্রথম প্রবাহিত করিয়াছেন। অতএব এই অমৃতধারার জন্ত বঙ্গদেশ চিরকাল বিদ্যাপতির কাছে ঋণী থাকিতে বাধ্য। শুধু এই জন্তই নয়, বঙ্গদেশ বিদ্যাপতির

কাছে অল্প কারণেও ঋণী। বিদ্যাপতির পদ ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যের বড় প্রিয় পদার্থ ছিল; তাঁহার পার্শ্বদগণও বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে মধুর হৃদ্যসাধন পিপাসা মিটাইতে পারিয়াছিলেন এবং সেই রসের পরিপোষক শিক্ষাও দিতে পারিয়াছিলেন। অতএব বিদ্যাপতির কাছে বঙ্গদেশ পবিত্র বৈষ্ণবধর্মের পরিপুষ্টির জন্তও অনেক পরিমাণে ঋণী, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

বৈষ্ণব কবির মধ্যে বিদ্যাপতির অমুকর্ভাই বেশী, তাহার একটা কারণও আছে, তাহা এ স্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার বক্তব্য এই যে, আজ যদি আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, বাঙ্গালী কবি নহেন, তাই বলিয়া যে আমরা তাঁহার ঋণপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পড়িয়াছি তাহা নহে। সে ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না, কারণ বঙ্গদেশ বিদ্যাপতির কাছে কবিত্ব-ঋণে এত ঋণী যে সেই ঋণ পরিশোধ করাই অসাধ্য।

সে হেন বিদ্যাপতি জয়দেবের কাছে শুধু ছন্দের জন্ত ঋণী নহেন, ভাবের জন্তও বিশেষ ভাবে ঋণী। জয়দেব বঙ্গদেশে মধুর রসের প্রবর্তক, অতএব বৈষ্ণব কবি মাত্রই তাঁহার কাছে ঋণগ্রস্ত। এ সম্বন্ধে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কেহই বাদ যান না। জয়দেবের কবিত্ব যে কেবল কথার বাধুনির বা ছন্দের পারিপাট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা হয় তো অনেকে বিশ্বাস করিতেই চাহিবেন না। কিন্তু তাঁহার কাছে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ভাবের জন্ত ঋণী, তিনি কবিত্ব-শক্তির দাবী

করিতে পারেন কি না তাহা সজ্জনেরাই বিবেচনা করিবেন। দিনকাল বদলাইয়াছে তাই আজকাল জয়দেবের কবিত্ব প্রমাণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা এক হিসাবে সুলক্ষণ বটে, কারণ ইহা দ্বারা মানুষের মনের গতি বুঝিতে পারা যাইতেছে। লোকে এখন যে ভালবাসার রাজ্য হইতে বাস্তবটাকে একেবারে বর্জন করিবার পক্ষপাতী হইয়াছে, তাহাতে এক কালে যে সুফল ফলিবে, সে বিষয়ে আশা করা অসম্ভব হইবে না। কিন্তু আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই যে বাস্তবকে একেবারে তাড়াইয়া দিতে পারা যাইবে তাহা সম্ভব নয় এবং বাস্তব-বর্জিত আদর্শ কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহাও দুরাশা মাত্র। আজকালকার অনেক সমালোচক এই কথাটা বিস্মৃত হইয়া একটা কোঁকের মাথায় সমালোচনা করিতে বসেন এবং সমালোচ্য কবির মদ্যটা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন, ইহাই পরিতাপের বিষয়। সুস্বদর্শী সমালোচক জয়দেবে যে প্রভূত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইবেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর এক কথা, জয়দেব কিম্বা অন্যান্য বৈষ্ণব কবির কেবল বাহ্য দৃষ্টিতে নির্ভর করিয়া সমালোচনা করা যে ঠিক নহে তাহা নিরপেক্ষ সমালোচক মাঝেই বুঝিবেন। এ কথা গ্রিসার্ন প্রভৃতি সারগ্রাহী বিদেশী লোকেরাও বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় জয়দেবের স্বদেশী অনেক সমালোচক তাহা বুঝিতে চাহেন না। যাহা হউক, এই দল যদি জয়দেবের গূঢ় অর্থোকার করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে আমাদের বিশেষ

আপত্তি থাকিত না, কিন্তু তাঁহারা যে একটা খুয়া ধরিয়া জয়দেবের কবিত্ব-শক্তির অপলাপ করিতে প্রবৃত্ত হ'ন, ইহাতেই আমাদের আপত্তি।

জয়দেবের কবিতা বহির্মুখী, অন্তর্মুখী নহে, ইহাও জয়দেব সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি। তাহার প্রেম দেহনিবন্ধ হৃদয়ের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখে না, এ কথাও অনেককে বলিতে শুনিয়াছি। আমরা আজকাল দেহ বেচারার উপর বেজায় নারাজ হইয়া পড়িয়াছি, ভালবাসার রাজ্যে বস্তুতঃ তাহার যতই দাবী থাকুক, কাব্যজগতে সে দাবীদাওয়া তাহার করা চলে না, ইহাই আজকালকার নজীর। আমরা এই মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী না হইলেও এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত নহি যে, ভালবাসায় যে অন্তর্মুখী বৃত্তি তাহাই কাব্য-জগতে শোভা পাইবার যোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু কোনও অস্বাভাবিক ভাবই কাব্যে শোভা পায় না, এই জ্ঞান দেহ-বর্জিত ভালবাসা যাহা জগতে অস্তিত্বহীন তাহাও কাব্যে চিরস্থায়িত্বের দাবী করিতে পারে না। ভালবাসার সুখদুঃখ কেন হয়? যাহাকে ভালবাসি তাহাকে যদি পাইলাম, তাহার সহিত কথা কহিলাম, তাহার আসঙ্গলিপা চরিতার্থ করিতে পারিলাম, তাহা হইলে ভালবাসার সুখ, আর তাহা না হইলেই ভালবাসার দুঃখ। ভালবাসার নৈরাশ্রের চিত্র জগতের সকল মহাকবিই আঁকিয়াছেন। সেই সকল চিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আসঙ্গলিপার অচরিতার্থতাই ইহার মূল অবস্থিত এবং ইহার জন্মই নিরাশ-প্রণয়ের

যন্ত্রণা। ভালবাসার মূলে যাহাই থাকুক, অর্থাৎ ক্লপই থাকুক, বা গুণই থাকুক, যদি তীব্র লালসা মনে উদ্ভিত না হয়, তাহা হইলে সে ভালবাসা কখনই স্থায়ী হয় না। রোমিও রোজালিনকে ভালবাসিত, কিন্তু তাহার সে ভালবাসা একটা ক্ষণবিকংসী ভাব মাত্র, তাহাতে লালসার তীব্রতা আদৌ ছিল না; তাই যখন সে রোজালিনের জ্ঞাত কবিতা আওড়াইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই জুলিয়েটকে দেখিয়া পাগল হইয়াছিল। তাহার এই ভালবাসায় তীব্র লালসা মিশিয়া ছিল, তাই তাহার জুলিয়েট-প্ৰীতিই যথার্থ ভালবাসায় দাঁড়াইয়াছিল। যদি রোমিও এবং জুলিয়েটের হৃদয়ে অসীম আকাঙ্ক্ষা ও আসঙ্গলিপ্সা না জাগিত, তাহা হইলে তাহার কবিতা গড়িয়া বেশ পরস্পরকে ভুলিয়া থাকিতে পারিত, প্রণয়ের সর্বনাশী বেগের মুখে আত্মনাশ করিয়া কাব্য-জগতে প্রণয়ীর আদর্শ হইয়া থাকিতে পারিত না। ভালবাসার রাজ্যে লালসার স্থান নিতান্ত অবহেলনীয় নহে, এ কথা মনুষ্যহৃদয়জ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তবে লালসাই ভালবাসা নহে; ইহাও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। লালসার সহিত হৃদয় সংযুক্ত না হইলে তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-বিকারে পরিণত হয়। ইন্দ্রিয়বিকার যে ভালবাসা নহে এবং ভালবাসা যে কেবল ইন্দ্রিয়-চপলতা নহে, তাহাও সকলেই জানেন। লালসার দ্বারা যে বাসনার উদয় হয়, তাহাই হৃদয়ে ভালবাসার পুষ্টি সাধন করিতে পারে ও করিয়া থাকে। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে জগতে ভালবাসার আদ্যভ্যাগ

বলিয়া কিছু থাকিত না। শুধু লালসা সম্ভোগ চায়, কিন্তু প্রণয়ে যে লালসা আসে, তাহা প্রণয়পাত্রকে আপনার করিতে চায়, এবং সেই প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ ও পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমে আপনার বলিয়া কিছু রাখিতে চাহে না, সর্বদা প্রণয়পাত্রকে সমর্পণ করিতে চায়। প্রিয়তমের সঙ্গকামনা যে ভালবাসায় নাই, সে ভালবাসা যে কিছুই নয় এবং তাহা যে ক্ষণভঙ্গুর, তাহা জগতের সকল মহাকবিই শিক্ষা দিয়াছেন। উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। যেখানে ভালবাসার কথা আছে, সেইখানেই মহাকবিরা এই কথা বলিয়াছেন। আসঙ্গলিপ্সাকে খাট করিবার ইচ্ছা যে ভাবপ্রসূতই হউক না কেন, ভালবাসার উচ্চতম প্রতিমূর্তির ভিতরেও ইহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কবিকে না ভিজ্ঞাসা করিয়া যদি আমরা বৈজ্ঞানিকের কাছে যাই, তাহা হইলে আমরা উত্তর পাইব যে যৌন সম্মিলন প্রেমের উৎপাদক। এই আকর্ষণই ক্রমশঃ নানা প্রকারে বিগুণ হইয়া জগতে ভালবাসার পবিত্র আদর্শে উপনীত হইতে পারিয়াছে। প্রথম পরিণীতা জুলিয়েট বলিয়াছেন :—

Oh I have bought the mansion
of a love
But not possessed it; and
though I am told,
Not yet enjoyed : so tedious is
the day
As is the night before some
festival
To an impatient child that hath
new robes,
And may not wear them.

সেই সম্ভোগলোলুপা জুলিয়েটই অকাতরে রোমিওর জন্ত মরিতে পারিয়াছিল। রোমিওও মরিবার পূর্বে জুলিয়েটের মৃতকল্প দেখে শেষ চুশন ও শেষ আলিঙ্গন না দিয়া থাকিতে পারে নাই। এই আসঙ্গ-লিপ্সা যুগ্মকালেও লোককে ছাড়িতে চাহে না। সম্ভোগ একীকরণের প্রধান সহায়, যদি সে সম্ভোগ মাত্র ইন্দ্রিয়-চপলতার দ্বারা সাধিত না হইয়া প্রণয়ের দ্বারা সাধিত হয়। যে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ক্লমিক উত্তেজনা প্রসূত, তাহা নীচ ও ঘৃণ্য, কিন্তু যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া প্রণয়ীযুগল পরস্পরের আলিঙ্গনের জন্ত লালায়িত হয়, তাহাকে কাব্যজগত হইতে বিসর্জন দিবার জো নাই। তা যদি দেওয়া যায়, তাহা হইলে ডেস্‌ডিমোনা, শকুন্তলা এমন কি সীতা-সাবিত্রীকে পর্য্যন্ত কাব্য-জগত হইতে বিদায় লইতে হয়। তাই বলিয়াছিলাম যে, ভালবাসাকে আজকাল-কার সমালোচকেরা যতই ছাঁকিতে চেষ্টা করুন, ইহা হইতে আসঙ্গলিপ্সারূপ কীটগুকে একেবারে বাদ দেওয়া চলিবেই না। সাধে কি বৈজ্ঞানিক ভালবাসাকে একটা contagious disease (ছোঁয়াচে রোগ) ঠিক করিয়া প্রণয়-কীটগুর (Love bascilli) সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তা সমালোচক মহাশয়েরা যতই হাওয়ায় হাত পা নাড়িবার পরামর্শ দিতে থাকুন, দার্শনিক “মদনমুখ চ পেটিকা” লিখিতে থাকুন, যদি ভালবাসার অন্তিম জগতে ক্ষুদ্র থাকে, তাহা হইলে সাক্ষাৎ মহাদেবকে অপরাধী মদনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, এবং সে পক্ষে স্বয়ং দেবতারাই প্রার্থী হইবেন।

স্বীকার করিতে বাধ্য নই যে, জয়দেবে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ ও দৈহিক সম্ভোগের কথা বেশী মাত্রায় আছে। আছে বলিয়াই যে জয়দেব ভালবাসা বুঝিতেন না, তাহা নয়। ভিতরকার কথা ছাড়িয়া দিলেও, অর্থাৎ জয়দেবকে আদি বৈষ্ণব কবি ভাবিয়া বিচার না করিলেও, ইহা মানিতে হইবে যে, জয়দেব একজন প্রেমিক কবি ও উচ্চ অঙ্গের প্রেমের কবি। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ নিরবচ্ছিন্ন কামের গান নহে, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। আজ এমন দিনকাল পড়িয়াছে যে, এ কথাটা বলিতেও একটু ভয় হইতেছে, কারণ জয়দেবে যে কিছু ভাল আছে, এ কথা বিশ্বাস করান নিতান্ত সহজ কাজ নহে। অনেকের ধারণা যে ইন্দ্রিয়-লোলুপতাই জয়দেবের কবিতার সর্বস্ব এবং শুধু এই জন্তই আমরা জয়দেবকে তথা অত্যান্ত বৈষ্ণব কবিকে আদর করি। বাঙ্গালী চরিত্রের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে, সে বিষয়ে মতবৈধ থাকিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বাঙ্গালী এতই উচ্ছন্ন গিয়াছে যে, কবির কাব্যে কেবল এই কুৎসিত অংশটুকু ধরিয়াই কবিকে আমরা আদর করি, এ কথা আমি তো স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অথচ জয়দেবের আদর বঙ্গদেশে যথেষ্টই আছে তাহা দেখিতে পাই, এবং ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বিলাতেও আজকাল তাঁহার প্রতিপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা যেন মনুষ্যত্ববর্জিত হইয়াছি, কিন্তু সেখানে তো মানুষ আছে, তাহারা কি দেখিয়া জয়দেবকে আদর করিতে আরম্ভ

করিয়াছে ? অতএব খুঁজিলে যে জয়দেবে কিছু ভাল জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে, এ কথা নিতান্ত প্রলাপবাক্য নহে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ আমার ভাল লাগে, ইহাতে যদি কোনও অপরাধ হয় তাহা হইলে আশা করি পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, কারণ জয়দেবকে আদর করার অপরাধ শুধু আমার একা নয়, ভারতবর্ষে এ অপরাধ অনেকে এখনও করিয়া থাকেন। এবং এই অনেকের ভিতর গুণগ্রাহী ব্যক্তিরও অভাব নাই। ভারতবর্ষ জয়দেবকে ভালবাসে অনেক কারণে ; ভারত সুরপ্রিয়, জয়দেবে ভরা সুর ; সংস্কৃত কোনও কাব্যেই এমন সুরের স্বাক্ষর শুনিতে পাওয়া যায় না। জয়দেবের ভাষাও তেমনি মধুর, তেমনি স্বাক্ষরময়ী, তেমনি আনন্দের আধার ; যিনি ভাষারসজ্ঞ তিনি জয়দেবের ভাষা দেখিয়া তেমনি আনন্দিত হইবেন যেমন একজন শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তি তাজমহলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনন্দিত হন। এই ভাষার আভাস লইয়া বহুশতাব্দী পরে বঙ্গের ভারতচন্দ্র “ভাষার তাজমহল” খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার উপর জয়দেবের অদ্ভুত প্রভুত্ব ; কি অসাধারণ নিপুণতার সহিত তিনি ভাবের সহিত কথার সঙ্গতি সাধন করিয়াছেন, তাহা এক মুখে প্রশংসার অতীত। জয়দেব বলিয়াছেন যদি কোমলকান্ত মধুর পদাবলী শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে জয়দেব সরস্বতীকে শ্রবণ কর। আমরা বলি শুধু মধুর কোমলকান্ত পদাবলী নহে, জয়দেব সরস্বতী গম্ভীর

রসাত্মক বাক্যাবলী শ্রবণেরও যথেষ্ট কৃতী। ইহার নিদর্শনস্বরূপ “মেবৈমে দুঃখমধরম্” ইত্যাদি গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ও দশাবতার-স্তোত্র প্রভৃতি শ্রবণ করুন। জয়দেব কবি ভাষার বিশ্বকর্মা।

ছন্দের জ্ঞানও জয়দেবের কাছে ভারতবাসীমাত্রেই স্বামী। ছন্দ এবং সুর এমন সরল ও তরল ভাবে, এমন অনায়াস-ভঙ্গির সহিত অপর কোনও কবি মিশাইতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। জয়দেবের কোমল পদাবলী সুরের সহিত, তালের সহিত গান করিবার উদ্দেশ্যে বিরচিত বটে, কিন্তু তাহা না করিয়া যদি শুধু আবৃত্তি করিয়া যাও, তাহা হইলেও তাহাদের মিষ্টত্বের কোনও হানি হইবে না, তাহারা সমানভাবেই উপভোগ্য থাকিবে। গীতগোবিন্দের যেখানেই খোল, সেইখানেই এ কণার অদ্ভুত প্রমাণ মিলিবে।

বাঙ্গালীর কাছে গীতগোবিন্দের আদরের একটা প্রধান কারণের কথা পূর্বেই বলিয়াছি ; গীতগোবিন্দ সমগ্র ভারতবাসীর অধিগম্য শেষ কাব্য এবং বাঙ্গালীর প্রথম কাব্য। গীতগোবিন্দের ছন্দ লইয়া বাঙ্গালার সমস্ত কাব্য পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালী জয়দেবকে আদর করিবে না এ কেমন কথা ?

কিন্তু ইহাই জয়দেবের সর্বস্বধন নহে, আমরা সেই কথা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিব, এবং আশা আছে একেবারে অকৃত-কার্য্য হইব না। কিন্তু সে চেষ্টার পূর্বে আমাদের নিবেদন এই যে, পাঠকগণ তাহাদের

পূর্বগঠিত সংস্কার, জয়দেব সম্বন্ধে তাঁহাদের আমাদিগের বক্তব্যের প্রতি মনঃসংযোগ অকারণ-সজ্ঞাত ভ্রান্ত ধারণা বর্জনপূর্বক করিয়া যেন আমাদিগকে কৃতার্থ করেন।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

চীনে প্রজাতন্ত্র

চীন জাতি যে এত দীর্ঘকাল এমন অটুটভাবে স্থায়ী রহিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ তাহাদের জাতীয় স্বায়ত্ব-শাসনের ক্ষমতা। চীন জাতির প্রতি পরিবার মধ্যে রাষ্ট্রনীতির বীজ নিহিত রহিয়াছে। এষ্ট প্রত্যেক পারিবারিক শাসননীতির দ্বারাই সমস্ত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনীতি গঠিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পরিবার যেমন স্রবণাতীত কাল হইতে এক নিয়মে শাসিত হইয়া আসিতেছে, সেই মত বহু পরিবারের সমষ্টি একখানি গ্রামও সেই গ্রামের একজন মোড়ল দ্বারা শাসিত হইয়া পাকে।

কতকগুলি গ্রাম ও সহরের দ্বারা এক জেলা গঠিত। প্রত্যেক জেলায় এক একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। এই সকল ম্যাজিষ্ট্রেট একাধারে শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা, এবং ইহার নানা বিষয়ে বর্তমান মিউনিসিপাল প্রেসিডেন্টের কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রত্যেক জেলার শাসনকার্য্য ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মনোনীত মোড়ল বা পঞ্চায়ত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কয়েকটা জেলার দ্বারা একটা ডিভিসন এবং অনেকগুলি ডিভিসন দ্বারা একটা প্রদেশ গঠিত। এক এক ডিভিসনের উপর এক এক কমিশনার এবং এক এক প্রদেশের উপর এক এক গভর্নর নিযুক্ত।

আবার কয়েকজন গভর্নরের উপর একজন গভর্নর জেনেরাল নিযুক্ত। কিন্তু প্রতি গ্রাম, প্রতি ডিষ্ট্রিক্ট, প্রতি ডিভিসন, প্রতি প্রদেশ স্বায়ত্ব-শাসন-প্রণালী দ্বারা শাসিত। এই প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৯০০ খৃঃ বৎসার যুদ্ধের সময় হ'ও'ন-সি-য়াই ৩০ চাং-টি টুংর শাসনপ্রণালী দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছিল। এবং সেই স্বায়ত্ব-শাসনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বর্তমান প্রজাতন্ত্রের অনেক গভর্নর, ও গভর্নর জেনেরালগণ দেখাইতেছেন।

এই সকল প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের সমষ্টির উপর পেকিনের রাজকীয় গভর্নমেন্ট। এই রাজকীয় গভর্নমেন্টের মূলমন্ত্রই এই যে, “প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে শাসিত হউক।” প্রত্যেক প্রদেশ হইতে নিয়মিত রাজস্ব আদায় এবং প্রত্যেক প্রদেশে শান্তি স্থাপিত থাকিলে পেকিন গভর্নমেন্ট সন্তুষ্ট থাকিতেন।

তবে চীনের প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের প্রধান দোষ এই যে, ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে গভর্নর জেনেরাল পর্য্যন্ত সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। প্রজাগণের এই অনোনয়ন-কার্য্যে কোন হাত নাই। কিন্তু সম্রাট স্বৈচ্ছাচারভাবে মাণ্ডারিনগণকে নিযুক্ত

করিলেও তাঁহাকে সময় সময় প্রজাগণের অসংখ্য উৎপাদনকারী মাভারিনগণকে জনসাধারণের অভিপ্রায়ানুসারে বরখাস্ত করিতে বাধ্য হইতে হয়।

চীন জাতির স্বায়ত্ত-শাসনের আর একটা আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত তাহাদের গুপ্তসমিতি সকলের গঠনপ্রণালী। সমস্ত চীনদেশে যত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ সমিতি আছে তাহাদের সভ্য-সংখ্যা ন্যূনকল্পে ৬০ লক্ষ হইবে। বর্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান যন্ত্রই এই গুপ্তসমিতি সকল।

গত তিন চারি বৎসর মধ্যে এই সকল সমিতির অত্যন্ত সভ্য ডাঃ সুন-ইমেট-সেন ইহার সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে এবং নানা দেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সকল গুপ্ত-সমিতির দ্বারা এত সহর এই প্রকাণ্ড দুর্গহ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে যে পশ্চিম জগতের একেবারে তাকু লাগিয়া গিয়াছে। এই সকল গুপ্তসমিতির লোকে মাঝু সম্রাটের সিংহাসনের নিম্নে যেন ডিনামাইট পুতিয়া রাখিয়াছিল, কেবল একটু অগ্নিসংযোগ সাপেক্ষ ছিল।

চীন জাতির আর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা— তাহাদের সামাজিক Guild বা ব্যবসায়িক সমিতি। পরস্পরের সাহায্যের জন্ত প্রত্যেক সহরে এই সকল সমিতি আছে। কোন সভ্য ব্যবসায়ে কতিপয় হইলে, দেউলিয়া হইয়া পড়িলে বা অন্য কোন কারণে বিপদগ্রস্ত হইলে অপর মেম্বরগণ তাহাকে সাহায্য করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দেয়। এই গিল্ড (Guild) সমিতির জন্তই ইহাদের

ব্যবসায়ের এত সমৃদ্ধি ও ইহার এত কার্য্য-তৎপর। বর্তমান ডাকবিভাগ ও ব্যাঙ্কের সৃষ্টির বহু পূর্ব হইতেই চীনাদের ব্যাঙ্ক ও হুণ্ডির কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

এই প্রকার বাণিজ্য, ব্যবসায় ও স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালীতে য়াহারা 'অত্যন্ত, তাহারা কেন আমেরিকার প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতে পারিবে না?

২

চীন-শাসননীতির ইহাই উজ্জ্বল অংশ। রাষ্ট্রবিপ্লবকারী সর্দারগণের সম্মুখে অধুনা কি বিষম সমস্যা উপস্থিত, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

এখন প্রশ্ন এই যে রাজকীয় শাসন-প্রণালীর নীতি ও ভাব এককালে লোকের অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়া একদমে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে কি না?

সহস্র সহস্র শতাব্দী হইতে চীন রাজতন্ত্র-প্রণালী দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে। একথা সত্য যে, এদেশের শাসন-প্রণালী প্রজাতন্ত্রের নিয়মানুসারে কতকটা হইলেই প্রজাগণ রাজাকে পবিত্রভাবে দেখিত। এখন তাহারা সেই রাজার পরিবর্তে একজন প্রেসিডেন্টকে সেই ভাবে কখনই ধারণা করিতে পারিবে না। চীন সম্রাট পবিত্র, স্বর্গজাত এবং স্বর্গীয় দেবতার প্রতিনিধি রূপে রাজ্য শাসন করিতেন।

তিনি জনসাধারণের পিতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু-পুরোহিত রূপে অবস্থিত ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সম্রাট একাধারে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির কেন্দ্রস্থল ছিলেন।

পেকিনের দক্ষিণ পূর্ব কোণে এক মনোহর নিকুঞ্জবন সদৃশ একটি উদ্যান আছে। তাহার মধ্যে খেত-প্রস্তর-নির্মিত স্বর্গ-মন্দির (Temple of Heaven) স্থাপিত। চতুর্পার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণী তাহার বেটেনী এবং উপরস্থ নীলাকাশ তাহার চক্ৰাতপ। এই খেতমর্শ্বর-প্রস্তর-নির্মিত মুক্ত বেদীর মধ্যস্থলে একখণ্ড খেত-মর্শ্বর-প্রস্তর-ফলক স্থাপিত। সেই প্রস্তর-ফলকে বিশ্ব-কেদ্র রূপে মনে করা হইয়া থাকে। ইহাতে কোন মূর্তি স্থাপিত নাই। এই ছাদ ও বেটেনীশূত্র বেদিতে আসীন হইয়া সম্রাট শূত্রস্থ নয়নাগোচর দেবতাকে আরাধনা করিতেন। এবং অবনতজাহ্নু হইয়া প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনা এবং রাজ্যের স্থখ-শান্তির কামনা করিতেন। এই ভাবে সম্রাট ও প্রজাবর্গের মধ্যে পিতা পুত্র সম্বন্ধ। এই ভাবে চীন-সাম্রাজ্যের অস্থি-মজ্জা গঠিত। এই ভাবের উপর কনফুসিয়ানের রাজ-নৈতিক ও দার্শনিক মত স্থাপিত।

কনফুসিয়ানের পাঁচটা উচ্চ আদর্শঃ— রাজায় ও প্রজায়, পিতা ও পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে, জ্যেষ্ঠে ও কনিষ্ঠে এবং বন্ধু ও বন্ধুতে যে সম্বন্ধ ও ভাব, রাজতন্ত্রশাসনপ্রণালী সেই সকল সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে নৈতিক বলের দ্বারা চীন সমাজ শাসিত এবং যাহার দ্বারা রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে তাহা রাজ-ভক্তি, দয়া-ধর্ম, অতীতের প্রতি সম্মান, বয়সের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বন্ধু-বান্ধবের উপর বিশ্বস্ততা।

এই সকল সামাজিক ও দার্শনিক নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিতে

গেলে পাশ্চাত্য দেশের সহিত তুলনায় ইহার কোন কোন নীতিতে এত পার্থক্য বোধ হয় যে, তাহা উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরুর পার্থক্যের সদৃশ। একথা সত্য যে চীনে প্রাচীন অনেকগুলি নীতি বর্তমান কালানুযায়ী অপ্রযোজ্য, এবং কনফুসিয়ানের কোন কোন মত এখন পরিত্যজ্য।

প্রজাতন্ত্র বা ডিমক্রেটিক ভাবের মূলমন্ত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্ব। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্ব চীনদেশে রাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ অন্তর্নিহিত। চীনদেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্ব এক একটি পরিবার মধ্যেই নিহিত। মৃত ও জীবিত ব্যক্তির সমষ্টি এক পরিবার মধ্যে গণ্য। পূর্বপুরুষের পূজা দ্বারা এই সামাজিক নীতি গঠিত।

এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দায়িত্বের ভাব এক দিনেই জন্মে না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, চীন-সমাজ প্রজাতন্ত্র নহে। চীনের রাষ্ট্রনীতি রাজতন্ত্র এবং ইহাই এই জাতির পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

যাহা বহুশতাব্দী যাবৎ চলিয়া আসিতেছে তাহাকে হঠাৎ ফেলিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে বিদেশী নীতি অবলম্বন কি সুবিধাজনক? কোন জাতির পক্ষে 'কি ইহা মঙ্গলজনক?

চীনের বর্তমান রাষ্ট্রবিপ্লব ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মত নহে, সেখানে রাজশক্তিকে ধ্বংস করিয়া সেই ধ্বংসাবশেষ-ভিত্তির উপর প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। চীনের

রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান কারণ মাঞ্চুরাজবংশের প্রতি বিদ্বেষ, প্রজাতন্ত্রের পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া, সেই মাঞ্চুবংশের নির্বাসন।

চীনেরা মাঞ্চু ভাড়াইয়া আপন জাতীয় রাজবংশ কি রাজপাটে বসাইতে চাহে না? রাজার পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট বসান চীন জাতির ধারণা ও সংস্কারের অতীত। ইউন-সি-আই যে প্রথম অবধারণ করিয়াছিলেন যে চীনের ৩-৪ অংশ লোক রাজতন্ত্রের গন্ধপাতী, সে কথা মিথ্যা নয়। সম্রাট চলিয়া গিয়াছেন, সাম্রাজ্যের একতাবন্ধন কি দৃঢ় থাকিবে?

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, তুর্কিস্তান, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি চীন সাম্রাজ্যের একতা সত্ত্বে আবদ্ধ থাকিবে কি না? না, তাহার মাত্র আঠারটি প্রদেশ লইয়াই চীন সম্ভষ্ট থাকিবে? সেই আঠারটি প্রদেশেরও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে। ক্যান্টন হয় ত সুন-ইয়েট-সেনকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করিবে তাহাতে কি উত্তর চীনের লোকে রাজি হইবে?

চীনের দ্বিতীয় সমস্যা এই যে চীন প্রজাতন্ত্র-শাসনের উপযোগী হইয়াছে কি না?

মন্টেকিউর (Monteque) ধারণা এই যে কোন বৃহদায়তনের দেশের গন্ধে রিপা-বলিক বা প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী অসম্ভব। তবে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে রেল টেলিগ্রাফ ও ষ্টিমারাদি দ্বারা একদেশ হইতে অল্প প্রদেশের দূরত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু

চীনের কথা স্বতন্ত্র। চীনে এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে বা এক সহর হইতে অপর সহরে যাতায়াতের এক বিষম অসুবিধা রহিয়াছে। সমস্ত চীনদেশে মাত্র ২৭০০ মাইল রেলপথ—ক্ষুদ্র জাপানের অর্ধেক। হাংকোং হইতে ছিছোয়ানের রাজধানী চেংটো পৌছিতে ৪০ দিন লাগে। চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হইবার প্রার্থীকে সমস্ত প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া লোক সকলকে বুঝাইয়া দিতে এবং তদ্বারা ভোট সংগ্রহ করিতে তিন বৎসরের প্রয়োজন। এই অসুবিধা ভিন্নও ভাষার অসুবিধা এক গুরুতর সমস্যা। প্রত্যেক প্রদেশে এক এক স্বতন্ত্র ভাষা। এমন কি এক প্রদেশেও নানা প্রকার উপভাষা ব্যবহৃত হয়।

ক্যান্টনি পেকিনের ভাষা বোঝে না। তাহারা একে অস্ত্রের সঙ্গে কথা বলিতে হইলে হয় ত মাগারিন্ ভাষায় কথা বলে, না হয় অল্প কোন বিদেশী ভাষা ব্যবহার করে। ইহা ভিন্ন এক প্রদেশের লোকের সঙ্গে অল্প প্রদেশের লোকের তাদৃশ গহাঙ্কুতি নাই। চীন প্রদেশের লোকে ক্যান্টনিকে মাঞ্চু অপেক্ষাও বিদেশী মনে করে। এক প্রদেশের লোকের ভাষা ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে অল্প প্রদেশের লোকের ভাষা ও আচার-ব্যবহারের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। এক প্রদেশের সম্বন্ধে যাহা সত্য, অল্প প্রদেশের সম্বন্ধে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এ অবস্থায় এই বিপ্লবকারীদের সম্মুখে কি সমস্যা উপস্থিত তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

শ্রীরামলাল সরকার।

বেদের কথা

(২)

বিদেশীয়ের তো কথাই নাই, আমাদের মধ্যেও অনেকেই, বেদকে কেন যে অপৌরুষেয় ও নিত্য বলা হইয়াছে, ইহার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রাকৃতজনে স্বর্ধর্মে আস্থাবান হইয়া অনেক সময়ে ইহার একটা অতি প্রাকৃত অর্থ করিয়া বসেন। কোনও অলৌকিক উপায়ে পরমেশ্বর মনুষ্য-সমাজে তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মানুশাসন প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সাধারণ লোকে এমনও কল্পনা করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরাও যে সর্ব্বথাই এরূপ কল্পনার পোষকতা করেন না, এমনও বলা যায় না। মানবীয় যুক্তিতে এই অর্থে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। আর বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে প্রাকৃতজনের এই কদম্ব গ্রহণ করিয়াই, আজিকালি অনেকে বেদের অধিকারকে অগ্রাহ করিয়া থাকেন।

প্রাকৃতপক্ষে হিন্দুর মীমাংসা-শাস্ত্রে বেদ-প্রামাণ্যের এরূপ কোন অতি প্রাকৃত অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বেদেরও উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টি একটা ঘটনা-বিশেষ অথবা আর এক দিক দিয়া দেখিলে ইহাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা-প্রবাহ বলিতে পারা যায়। এই সৃষ্টি হয় সার্থক, না হয় নিরর্থক। ইহা যদি নিরর্থক হয়, অর্থাৎ এই মধ্যে কোন প্রকারের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ

কিছা উপায়-উদ্দেশ্যের সংযোগ না থাকে, তাহা হইলে ইহা কোন প্রকারেই জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। সে অবস্থায় কোনও জ্ঞানের উপরে যে সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত, এরূপ অনুমান করাও অনাবশ্যক হয়। সুতরাং এরূপ সৃষ্টির সঙ্গে সর্ব্বজ্ঞান-মূল যে বেদ তাহার প্রতিষ্ঠা করারও আর কোনই প্রয়োজন থাকে না। অতঃপক্ষে সৃষ্টি যদি একটা সার্থক ব্যাপার হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি বলিতে আমরা যে ঘটনা বা ঘটনা-প্রবাহ বুঝি, তাহার যদি কোনও অর্থ থাকে, কার্য্য-কারণসম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা, কিছা উপায়-উদ্দেশ্যের সংযোগ যদি এই সৃষ্টিব্যাপারের একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ হয়, তাহা হইলে এই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বজ্ঞানমূল বেদের প্রতিষ্ঠাও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। এই অর্থেই বেদকে জগতের যাবতীয় জ্ঞানের আধার বলা হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন এই, এই সৃষ্টি-ব্যাপার নিত্য না অনিত্য। স্রষ্টা কোন বিশেষ কালে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন, এরূপ সিদ্ধান্ত বা কল্পনা করিলে এই সৃষ্টিকে কোন মতেই নিত্য বলা যাইতে পারে না। আর সে অবস্থায় স্রষ্টাও পরিবর্তনশীল হইয়া পড়েন, তাঁর নিত্যত্বও আর রক্ষা করা যায় না। "কর্ম্মের পূর্বে কর্ম্মীর" যে অবস্থা থাকে, কর্ম্মকালে বা কর্ম্মের পরে সে অবস্থা আর থাকে না, থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং কালবিশেষে সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ

যদি মনে করিতে হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার যে অবস্থা ছিল, এই সৃষ্ট-কার্যনিবন্ধন সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল, এই সিদ্ধান্ত পরিহার করা অসম্ভব হয়। সুতরাং স্রষ্টার নিত্যত্ব-ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য সৃষ্টিকে বিশেষ কালে সংঘটিত ঘটন-বিশেষরূপে ব্যাখ্যা না করিয়া অনাদিকৃত কর্মপ্রবাহ বলিয়া ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিতেও নিত্যত্ব ধর্ম আরোপ করিতে হয়।

হিন্দু কল্প-সৃষ্টি বলিয়া এক প্রকারের সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছেন। কল্পারম্ভে এই সৃষ্টির সূচনা এবং কল্পান্তে ইহার বিনাশ হয়। কিন্তু বেদ যে সৃষ্টির সহচর এবং সেই জন্যই নিত্য, তাহা এই কল্প-সৃষ্টি নহে। কল্পারম্ভে বেদের নূতন সৃষ্টি হয় না, কিন্তু সেই নিত্য বেদেরই পুনঃ প্রকাশ হয় মাত্র। আর কল্পান্তে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বেদের বিনাশ হয় না। কেবল যে প্রয়োজনে সৃষ্টির ক্রিয়াতে বেদের বহিঃ-প্রকাশ হইয়াছিল, সেই প্রয়োজন আর রহিল না বলিয়া, বেদ তাহার নিত্য আশ্রয় সর্বজ্ঞানাধার পরম চৈতন্যপুরুষের চিদাকাশেই বিরাজ করে।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এই তত্ত্বটি হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে বিশদ করিতে পারা যায়। কোন চিত্রকর বা ভাস্কর চিত্রপটে বা মর্ম্মর-ফলকে প্রতিমূর্ত্তিকে অঙ্কিত বা খোদিত করিবার পূর্বে আপনার মানস-পটে ধ্যানযোগে সেই মূর্ত্তির একটা প্রতিকৃতি ফুটাইয়া তুলিয়া থাকে। সেই মানসী মূর্ত্তিটাই তাঁর রচিত চিত্রে বা

ভাস্কর্য্যে একটু হইয়া উঠে। শিল্পীর অন্তরে এই চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের শিল্প ভিন্ন অংশের বা অঙ্গের যেরূপ সমাহার ও সমাবেশ হয়, ঠিক তাহারই আদেশে বাহিরের পটে বা প্রস্তরে সেই মূর্ত্তিটা ফুটিয়া উঠে। শিল্পীর মানসী মূর্ত্তির সঙ্গে তাঁহার চিত্রিত বা খোদিত প্রতিমূর্ত্তির সম্বন্ধ নিত্য। একটাকে ছাড়িয়া আর একটীর সৃষ্টি অসম্ভব। অথচ শিল্পী শিল্প-রচনায় নিযুক্ত হইবার পূর্বেই বা সমকালেই ধ্যান-যোগে আপনার মানসী মূর্ত্তিটিকে সম্পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর সেই পূর্ণ আদর্শই অল্পে অল্পে তাঁহার চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়। শিল্পীর অন্তরে সেই মূর্ত্তিটা পূর্ণভাবেই ফুটিয়া থাকে। কিন্তু চিত্রে বা প্রস্তরে তাহা উত্তরোত্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ না, চিত্রটা নিঃশেষভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, ততক্ষণ সেই মানসী মূর্ত্তিটা চিত্রপটের বা প্রস্তর-ফলকের ক্রমশঃ প্রকাশিত মূর্ত্তি অপেক্ষা বড় হইয়া রহে, এবং প্রতিপদে সেই মানসী মূর্ত্তির নিকটে লইয়া গিয়াই এই বাহিরের চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের সত্যাসত্যের ও পূর্ণতা-অপূর্ণতার বিচার করিতে হয়। বাহিরের চিত্র বা ভাস্কর্য্যকে বুঝিতে গেলে, শিল্পীর অন্তরের সেই মানসী মূর্ত্তিকে ধরিয়া চলিতে হইবে। বাহিরের চিত্র বা ভাস্কর্য্য শেষ হইবার পূর্বে কিম্বা শেষ হইবামাত্রই যদি শিল্পী তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহাতেও তাঁহার মানসী মূর্ত্তির কোন ক্ষয় বা অপচয় হইবে না। যখন ইচ্ছা তখনই তিনি পুনরায় এই মানসী মূর্ত্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া আবার

নূতন করিয়া চিত্রপটে বা প্রস্তর-ফলকে তাহাকে প্রকট করিতে পারেন। বাহিরের চিত্রের বা ভাস্কর্যের লোপে সে মানসী মূর্তির লোপ হয় নাই।

অষ্টকে যদি এই চিত্রকরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর তাঁর এই সৃষ্টি-ব্যাপারকে যদি এই চিত্রাক্ষনের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে হিন্দু মীমাংসকেরা বেদ বলিতে যাহা বৃত্তিতেন, সে বস্তুটী যে কি, এবং সেই বেদের সঙ্গে সৃষ্টি-ব্যাপারের সম্বন্ধ কেন যে নিত্য ইহা কিয়ৎপরিমাণে বোধগম্য হইতে পারে। অনাদি কাল হইতে অষ্টার অন্তরে এই সৃষ্টি-লীলার যে নিত্য আদর্শটী জাগিয়া রহিয়াছে, সেই নিখিল চৈতন্তের মধ্যে, দ্রব্যগুণাদির যে নিত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, সেই আনন্দোদ্ভাসিত

চিত্রপটে যে সকল রসমূর্তি নিত্য ফুটিয়া লীলাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাতেই দেশকালের ক্ষুদ্রায়তন-রঙ্গমঞ্চে এই সৃষ্টি-লীলা পটে পটে ফুটাইয়া তুলিতেছে। এখানকার কার্য্যাকারণ-সম্বন্ধের অর্থ, সেই জ্ঞানের মধ্যে যে সকল অর্থ প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে এখানকার উপাধ-উদ্দেশ্যের সংযোগের সার্থকতা সেই খানে, যেখানে সকল সাধনা চিরসিদ্ধি লাভ করিয়া রহিয়াছে, সেই চৈতন্তরাজ্যকে উপেক্ষা করিলে, দৃশ্যমান বিশ্বের সার্থকতা আর থাকে না। আর সেই চিদ্রাজ্যের নিখিল সম্বন্ধসমূহই সত্যাকার বেদ। এই বেদ যে নিত্য, এই বেদ যে কালবিশেষে পুরুষবিশেষ কর্তৃক রচিত হয় নাই, তাহাও কি আবার বলিতে হয়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিলাতের পুলিশ

লণ্ডনের পাহারাওয়াল

লণ্ডন সহরের পাহারাওয়াল সত্য গ্রাহী কি না জানি না। কিন্তু পারিসের জগতের একটা অপূর্ণ সৃষ্টি। ফরাসীসে বা আমেরিকায়, ইতালী কি জার্মানীতে, পাশ্চাত্য জগতেও এ বস্তুটী আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরের পুলিশের বড় একটা সুনাম নাই। অনেক সময় উচ্চ-নীচ অনেক পুলিশকর্মচারী রীতিমত সহরের চোর, জুয়ারী এবং বারান্দা-দিগের সঙ্গে নিজেদের একটা উপরি আয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, এমনও শুনা যায়। ফরাসীসের পুলিশ এতটা পরিমাণে উৎকোচ-

গ্রাহী কি না জানি না। কিন্তু পারিসের পাহারাওয়াল যে কার্য্যদক্ষতায় লণ্ডনের পাহারাওয়াল অপেক্ষা অনেক নিরুপেক্ষ, ফরাসীস-পর্গটকেরাও একবাক্যে এই কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রজা-পীড়নশীল রুশসাম্রাজ্যে পুলিশের ঐশ্বর্য্য যত বেশী, যুরোপের আর কোথায়ও তত নহে। রুশের পুলিশ অনেক সময় নিজেরা বড়বস্ত্র করিয়া, নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপের আয়োজন করিয়া থাকে, এ কথা কিছুকাল হইতে হুনিয়ার রাষ্ট্র হইয়া

পড়িয়াছে। যতদিন দেশে বিপ্লবের বহিঃ প্রযুক্তি হইবে, 'ততদিন রুশসাম্রাজ্যে পুলিশের প্রভাবও অপ্রতিহত থাকিবে। পুলিশবিভাগের কর্মচারিগণ এ কথা বিলক্ষণ জানেন ও বোঝেন, সুতরাং তাঁরা অনেক সময় গোপনে গোপনে নিজেদের চর পাঠাইয়া, বিপ্লবপন্থীদিগকে বিপথগামী করিয়া থাকেন। আজ্জেফ্ নামে পুলিশের একজন গুপ্তচর এইরূপে রুশিয়ার বিপ্লবপন্থীদিগের সহিত মিলিয়া অনেকগুলি নরহত্যার আয়োজন করিয়াছিল, এখন সভ্য জগতের সকলেই এ কথা জানেন। আর আজ্জেফের ইতিহাস হইতেই রুশিয়ার পুলিশের প্রকৃতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। জর্ম্মানির পুলিশের কথা বিশেষ কিছুই জানি না, কিন্তু রুশের পুলিশের মত এতটা দুর্দান্ত ও চুরাচারী না হইলেও, ইংরেজের পুলিশের সঙ্গে, কি কার্যক্ষমতায় কি সজ্জিত্রে কোন বিষয়েই জর্ম্মানির পুলিশের যে তুলনাই হয় না, নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যাইতে পারে। পুলিশের ক্রান্তি ও সাধুতা জগতের সর্বত্রই দুইটা বস্তুর উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। প্রথম, দেশের শাসন-যন্ত্র স্বল্প-বিস্তর পরিমাণে প্রকৃতিপুঞ্জের কর্তৃত্বাধীন হওয়া আবশ্যিক; দ্বিতীয় দেশের লোক-প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রবল আইন-আলুগতা সর্বদা জাগিয়া থাকা চাই। ফলতঃ এই দুইটা ভিন্ন বস্তু নহে। একই বস্তুর দুইটা দিক-মাত্র। শাসন-যন্ত্রের উপরে যেখানে প্রকৃতি-পুঞ্জের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে দেশের আইন-কানুন প্রজা-মতের অনুবর্তিতা করিয়া চলে। আর সে অবস্থায় প্রজাসাধারণে

সহজেই দেশের আইন-কানুনের অঙ্গত হইয়া রহে। শাসনের বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রজাসাধারণের মতামতের কোনও প্রকারের তীব্র বা স্থায়ী বিরোধ এ ক্ষেত্রে জন্মিতেই পারে না। সুতরাং প্রজামণ্ডলীর প্রাণে শাসনের বিধি-ব্যবস্থাকে পরাস্ত বা উপেক্ষা করিবার ইচ্ছাও জন্মে না। ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থা মোটের উপরে ইংরেজ প্রজাসাধারণের কর্তৃত্বাধীন হইয়া আছে। এইজন্য বিলাতের পুলিশ ক্ষুদ্রতম প্রজারও স্বত্ব-স্বার্থের উপরে অযথা হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পায় না। কোথায়ও কোনও পুলিশ কর্মচারী ভুলক্রমে বা হঠকারিতাবশতঃ কাহারও উপরে অযথা অত্যাচার করিলে, দেশময় ছলছল পড়িয়া যায় এবং সেই অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্ত, হোম সেক্রেটারী হইতে আরম্ভ করিয়া, দেশের সমগ্র শাসক সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। একবার লণ্ডন সহরে একজন পাহারাওয়ালার মিস্ ক্যান্স নামে একজন গৃহস্থ মহিলাকে বারজনা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে, এবং তাঁহাকে রাজপথ হইতে ধরিয়া লইয়া যায়। মিস্ ক্যান্সের ধনবল বা পদবল কিছুই ছিল না; বেচারী খাটিয়া আপনাদেহ সামান্য জীবিকা উপার্জন করিতেন। তথাপি এই ঘটনা লইয়া ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর মধ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল। সেই আন্দোলনের কথা আমরা এ দেশেও পড়িয়াছিলাম এবং পড়িয়া বিন্মিত ও হইয়াছিলাম।

ইংরেজের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সত্য হইয়াছে, এ কথা মনে করি না। ইংরেজ-

সমাজের এক শ্রেণীর লোকের প্রাণে অপর শ্রেণীর লোকের প্রতি যে একটা গভীর স্নেহ বা সহানুভূতি আছে, এমনও দেখি নাই। ধনিগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি-যোগিতায় নিধনদিগকে নির্ধম ভাবে নিষ্পেষিত করিতে যে বিন্দু পরিমাণেও কুণ্ঠিত হন, এমন কথা বলিতে পারি না। ইংরেজ-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও ব্যক্তির মধ্যে যে কোনো প্রকারের একপ্রাণতা আছে, এমনটা কোথায়ও প্রত্যক্ষ করি নাই। বরঞ্চ প্রতিযোগিতাপ্রধান বিলাতী সমাজের প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা একটা স্বার্থপর স্বাতন্ত্র্যের ভাব জাগিয়া আছে, ইহাই অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইংরেজ-প্রকৃতির মধ্যেই নিজেদের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষার জন্ত একটা ব্যাকুলতাও সর্বদা জাগিয়া রহিয়াছে। এবং এই ব্যাকুলতা হইতেই যখনই যেখানে শাসক-সম্প্রদায় ক্ষুদ্রতম প্রজার ত্যাগ অধিষ্ঠারের উপরে অথবা হস্তক্ষেপ করেন, তখন দেশের লোক আর সকল ভুলিয়া গিয়া সেই গরীবের স্বত্ব রক্ষার জন্ত বন্ধপরিকর হইয়া দাঁড়ায়। এমনটা ইউরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। আর ইংরেজ-চরিত্রের এই বিশেষত্ব নিবন্ধনই বিলাতের পুলিশ এমন অপূর্ব বস্তু হইয়া আছে।

বিলাতের পুলিশকর্মচারিগণ জানেন যে, তাঁরা প্রজাসাধারণের ভৃত্য; তাহাদের প্রভু নহেন। প্রজার স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্তই তাঁহারা রাজকর্মে রত হইয়াছেন, সে স্বত্ব সঙ্কোচ বা হরণ করিবার জন্ত নহে। আর এই জন্ত একদিকে যেমন

ইহারা দুষ্টজনকে দমন করিবার জন্ত প্রাণপণ যত্ন করেন, সেইরূপ অত্মদিকে সর্ববিধ বিষয়ে সমাজের শিষ্টজনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও চেষ্টা করিয়া থাকেন। আর বিলাতী পুলিশের এই সাধারণ লক্ষ্যগুলি লঙনের পাহারাওয়ালার মধ্যে মুর্তিমস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একদিকে যেমন বিলাতের পুলিশ প্রকৃতি-পুঞ্জের স্বত্ব-স্বার্থকে কখনই উল্লঙ্ঘন করিয়া চলে না, সেইরূপ অত্মদিকে দেশের জনসাধারণেও পুলিশের বিধিসম্মত আদেশকে কখনই খামাকা অমান্য করিয়া চলে না। পুলিশ যদি দেশের লোকের স্বত্ব-স্বার্থকে সম্মান না করিত, আর দেশের লোক যদি পুলিশের ত্যাগ আদেশকে মানিয়া চলিতে অত্যন্ত না হইত; তাহা হইলে বিলাতের পুলিশ-শাসন এবং পুলিশ-চরিত্রও কিছুতেই এতটা অনন্তসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিত না। লঙনের পাহারাওয়ালার টিক বুঝিতে হইলে এতগুলি কথা মনে রাখা আবশ্যিক।

লঙনের পাহারাওয়ালার মধ্যে প্রায়শঃই কতকগুলি বিরোধী গুণের অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি সামান্য লোক হইলেও ইহাদিগের চরিত্রে কতকগুলি মহৎ গুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহারা-বজ্রাপেক্ষা কঠোর এবং কুসুমদল অপেক্ষাও কোমল। ইহারা যখন দুর্বৃত্ত লোকদিগের দমনে প্রবৃত্ত হয়; তখন ইহাদিগের মধ্যে এই বজ্রের কঠোরতা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার

যখন লোকসংঘটনের মধ্যে পথহারা অসহায় শিশুদিগের হাত ধরিয়া লণ্ডনের পাহারাওয়ালারা তাহাদিগের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবককে খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন তাহার মধ্যে কুসুমের কোমলতা ফুটিয়া উঠে। পুলিশ প্রহরীর ভিতরে কোন প্রকারের সৌজন্য থাকিতে পারে, ইহা এ দেশের কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু লণ্ডনের পাহারাওয়ালার সৌজন্তের সূচ্যাত্তি সভ্য জগতময় ছাইয়া গিয়াছে। লণ্ডন সহর না সাহারা অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। জগতের আর কোথাও এরূপ জনাকীর্ণ বিজ্ঞতা আছে বলিয়া জানি না। আর এই সহরে যদি এই পাহারাওয়ালারাগুলি না থাকিত, তাহা হইলে বিদেশীয়দিগের পক্ষে যথা ইচ্ছা চলা ফেরা করা একেবারেই সম্ভব হইত না। লণ্ডন সহরে দীর্ঘকাল বাস করিয়াও আমি তার দাকুনির্ণয় করিতে এখনও সমর্থ হই নাই। আমাদের কলিকাতার মত আট দশটা সহর লণ্ডনের ভিতর পুরিয়া দিলেও তাহার সকল স্থান অধিকার করা যাইবে কি না সন্দেহ। এক পল্লীর লোকের নিকটে অপর পল্লীর পথ-ঘাট অনেক সময় একান্তই অপরিচিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় কোন অপরিচিত পল্লীতে যাইতে হইলে, বিচক্ষণ পথ-প্রদর্শকের আবশ্যক হইত। আর হয় না এই জন্ত যে সহরের ঘাটিতে ঘাটিতে লণ্ডনের এই পাহারাওয়ালারাগুলি দাঁড়াইয়া, করা মাত্রই অশেষ সৌজন্য সহকারে অনভিজ্ঞ পথিককে আপন আপন গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। কোন

পথিককে নিতান্ত অসহায় দেখিলে, আর তাহার গন্তব্য স্থান অতি দূরে যদি না হয়, তাহা হইলে কখন কখন পাহারাওয়ালারা নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে সে স্থানে রাখিয়া আসে, এমনটাও দেখিয়াছি।

লণ্ডন সহরে পথে ঘাটে যেমন লোকের জনতা, সেইরূপ গাড়ীরও ভিড়। এ জন্য পদব্রজে যারা যাতায়াত করে, তাহাদের পক্ষে বড় বড় রাজপথগুলি পারাপার হওয়া, একেবারেই নিরাপদ নহে। কিন্তু লণ্ডনের পাহারাওয়ালারা এই বিপদজনক পথকেও, পথিক জনের পক্ষে সর্বদা নিরাপদ করিয়া রাখে। যখনই কোন ভীকু পথিক গাড়ীর ভিড় দেখিয়া রাজপথে অগ্রসর হইতে সাহস পায় না, তখনই নিকটস্থ পাহারাওয়ালারা পথের মাঝখানে বাইয়া আপনার হাতখানি তুলিয়া ধরে; আর অমনি দ্রুতগামী শকটশ্রেণী যে যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেইখানেই থামিয়া যায়, এবং পথিকেরা নিরীক্সে রাজপথের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপে যে সকল লোক রাত্তা পাড়ি দিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা এখান হইতে ওধারে চলিয়া গেলে, পাহারাওয়ালারাও হাতখানি নামাইয়া সরিয়া যায়, এবং গাড়ী, ট্যাক্সী, বাস প্রভৃতি আবার রাজপথ জুড়িয়া যাতায়াত আরম্ভ করে। লণ্ডনের পাহারাওয়ালারা যখন পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকে, তখন তাহাকে মানুষ বলিব না প্রস্তর-মুর্তি বলিব বুঝিয়া উঠি নাই। মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভিতর

কি খেলিতেছে তাহা বোঝা অসম্ভব। হুনিয়ায় তাহার কোন ভাবনা, কোন ভয়, কোন আশা, কোন নিরাশা, কোন প্রেম, কোন অপ্রেম, চিত্তবিক্ষেপের কোথাও কোন কারণ আছে কি না সন্দেহ হয়। লগুনের পাগারাওয়ালারা যে যোগী পুরুষ এমন কথা বলিব না, কিন্তু যোগস্থ হইয়া আপনার কর্তব্য কৰ্ম কি করিয়া সাধন করিতে হয়, এই নিগূঢ় সঙ্কেতটী বুঝি বা সে সম্পূর্ণরূপেই আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া শুনিয়া অনেক সময় এমনটাই মনে আসে। কর্তব্যানুরোধে সে কঠোর হইতে পারে, কিন্তু সে কঠোরতার মধ্যে কখনই কোন প্রকারের ঔদ্ধত্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের আইন যেমন নিরপেক্ষ ও নিৰ্ম্মম, কিন্তু নির্দয়ও নহে, উদ্ধতও নহে, লগুনের

পুলিশও সেইরূপ আইনের পুতুল বলিলেও চলে, কলেই যেন তারা চলে, কলেই যেন তারা ফিরে, আর ঠিক কলেরই মত আপনাদের যথাযথ কর্তব্য সাধন করিয়া যায়

অথচ এই সকল লোকেরই ঘর আছে, সংসার আছে, স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে আছে, ঋণ আছে, দায়-আদায় আছে, সকলই আছে। আর এ সকলের সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্যজীবনমূলভ চিত্তবিক্ষেপের সমুদায় কারণই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেখানেও যে তাহার এইরূপ কলের মত চলে ফেরে এমন নহে। সে যোগ-সিদ্ধি ইহাদের অনেক দূরে; কিন্তু তাই বলিয়া আপনার কর্মজীবনে ইহারা যে যোগ-শক্তি অর্জন করে, তার মূল্য অল্প নহে।

বিলাত-ফেরত।

গোহ *

ভোরিস্ ভোরিন্ তার সুসজ্জিত ক্ষুদ্র কক্ষটিতে বসিয়াছিল—তার কুসুম-পেলব সুন্দর মুখে আজ একটা স্পষ্ট রিম্রোহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে আকাশে মেঘ, কনকনে শীতের হাওয়া, আর কুয়াসার ঘন অন্ধকার—কিন্তু তার কক্ষটিতে বাহিরের প্রকৃতির কোন দোরাখ্যা প্রবেশ করিতে পারে নাই—তাহা আরামের বহুমুখ্য উপাদানে ভরা! কিন্তু এ সোণার পিঞ্জিরায় ভোরিসের মনে সুখ কোথায়?

ভোরিস্ অনেকক্ষণ ধরিয়া পড়িবার

ভাণ করিল—শেষে বিরক্ত হইয়া চাকর ডাকিবার ঘণ্টাটা ধরিয়া টান দিল। কলের পুতুলের মত আরদালি আসিয়া হাজির—“ভোরিস্ জিজ্ঞাসা করিল—“মার্ ফিলিপ এখনও ফেরেন নি বোধ হয়।”

“আজ্ঞা, না,—তিনি বাহির হইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন সম্ভবত তাঁর রাতে আসিতে দেবী হ'বে—আপনি যেন তাঁর জন্ত অপেক্ষা না করেন।”

“আচ্ছা! আমার চা আনতে বল—আর মনে রেখো আমি আজ কারো সঙ্গে দেখা করবো না—এক মিঃ থার্লো ছাড়া।”

* ইংরাজী হইতে অনূদিত।

লেডি ভোরিস্ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলিয়া ভৃত্যকে বিদায় দিল।

তারপর সে বসিয়া বসিয়া নিজের কথা ভাবিতে লাগিল—তার অভিজাতবংশীয় পিতার দারিদ্র্য—ঠাশবে জ্ঞানোন্মেষের পূর্বে লক্ষপতি সার ফিলিপ ভারননের সহিত বিবাহ—একে একে সব কথা মনে আসিতে লাগিল। মনে পড়িল, তাহার রাল্ফ থালোর সহিত বাল্য-প্রণয়, তার প্রেমহীন বিবাহ—তারপর তার স্বামীর ব্যবহার। সে ত আপনার পূর্বকথা মনে হইতে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া স্বামীকে ভাল বাসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু কৈ তার স্বামী ত একদিনও তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেন নাই। সার ফিলিপ গভীর প্রকৃতির লোক, বালিকা জীকে ছেলেমানুষী আদর করিয়া ভালবাসা দেখান তাঁহার আসিত না। তা' ছাড়া, তিনি মনে করিতেন যে ভোরিস্ অর্থলোভী দরিদ্র পিতার আগ্রহেই তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছে। এমনি করিয়া স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধ্যে একটা হুলজ্বল বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল।

বহির্দ্বারের ঘণ্টাধ্বনিতে লেডি ভোরিসের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল—সে সোজা হইয়া বসিল। তার বুঝিতে বাকী রহিল না—এ অভ্যাগত কে! ভাবিতে তার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল এবং তার অশান্ত হৃদয় সহস্র চেষ্টাতেও দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল।

ভোরিস্ দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করিল, বলিল—“আ: মি: থালোঁ,—বাঁচলুম। আমি ত একা একা প্রায় পাগল

হইবার মত হইয়াছি!—যে বিস্তী দিন। এদিকে এসে আগুনের কাছে দাঁড়াও। চা খাবে ত! সব প্রস্তুত।” তারপর চাকরকে চা আনিবার জন্য আদেশ করিল।

রাল্ফ, ভোরিসের হাত দু'টি ধরিয়া বলিল—“আমি কিন্তু তোমাকে একা পাইবার জন্যই পাগল হইতেছিলাম। ভোরিস্, তুমি আজ্জিকাল আমার উপর কেন এত নির্দয় হইয়াছ? কাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিলে না কেন?”

ভোরিস্, রাল্ফের স্পর্শে কাঁপিয়া উঠিল, বড় কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিল—“এ আবার কি কথা! আমি কি কাল বাড়ী ছিলাম—কাল জেডি ক্লোনেলের বাড়ী যে আমার তাস খেলার নিমন্ত্রণ ছিল। সে কথা যাক—তুমি অমন পাগলামী করো না—গভীর হইলে তোমাকে বড় বিস্তী দেখায়!—চা এসেছে—এস চা খাও—মেজাজটা ঠিক হবো।” বলিয়া ভোরিস্ চা প্রস্তুত করিতে মন দিল—কিন্তু তার সংযম-সঙ্কেত যে হাত দু'টি কাঁপিতেছিল, সেটুকু রাল্ফের দৃষ্টি এড়াইল না। রাল্ফের পিপাসিত দৃষ্টি নির্নিমেষে ভোরিসের সৌন্দর্য-সুখা পান করিতেছিল—সে হঠাৎ দৃষ্টিসঙ্গী করিল—“ভোরিস্, সার ফিলিপ কোথায়?”

“ভগবান জানেন কোথায়। তিনি কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়ান—তা' আমি ত তাঁর অভিভাবক নই যে সব খবর রাখব।”

রাল্ফ ধীরে ধীরে বলিল,—“হাঁ, আমি তা' জানি।”

ভোরিস্ স্থির দৃষ্টিতে রাল্ফের দিকে চাহিয়া বলিল,—“অর্থাৎ—?”

“অর্থাৎ আবার কি? আমি কোন অর্থ ভাবিয়া তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—অন্তত আমি এমন কোনো কথা বলিতে চাহি নাই—যা তোমার ভাব্যের মত।”

“কিন্তু, তুমি শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হবে না যে আমি আমার স্বামীর কথা ভাবিয়া থাকি।”

রাল্ফ একটু রুষ্টস্বরে বলিল—“তা বলিয়া তুমি বোধ হয় আশা কর না যে, আমি কোনও স্বামীর সঙ্কে যে কোন ভিত্তিহীন কুৎসা রটিবে তাই গিয়া তার জীর কাছে বলব।”

ভোরিস্ আর সামলাইতে পারিল না, বলিল,—“বিস্ত্র এমন করিয়া ইসারায় বলার চেয়ে স্পষ্ট কথা ভাল। রাল্ফ, আমি মনে করিতাম তুমি আমার বন্ধু—হিতৈষী।”

“ভোরিস্, তুমি জান যে আমি তোমার হিতৈষী বন্ধু চেয়ে বেশী। আমাদের প্রথম মিলনের কথা কি আমি ভুলিতে পারি।”

ভোরিস্ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—“তার সঙ্গে আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের কি সম্বন্ধ? আমার স্বামীর সঙ্কে তুমি যা শুনেছ তাই বল।”

রাল্ফ যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—“নিশ্চয় বলতে হবে?”

“হাঁ।”

রাল্ফ থালা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—“তবে শুন, ভোরিস্—সবলেই বলিতেছে আজকাল সার ফিলিপ, মিসেস্ হারির সহিত একটু বেশী মিশিতেছে—তার বাড়ী যাতায়াত কিছু

বাড়িয়া গিয়াছে। তোমাদের বিবাহের পূর্বে না কি সার ফিলিপের সহিত ইহার বড় ভাব ছিল। তুমি অবশ্য মিসেস্ হারিকে জান না—সে ত তোমাদের সমাজের নয়। মিসেস্ হারি—সুন্দরী, বুদ্ধিমতী—সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে। ভোরিস্, আমার অবশ্য এ সব শোনা কথা, বিশ্বাস করিবার প্ররুতি হয় করিও—আমি ইহার সত্যমিথ্যা কিছুই জানি না। তবে এটুকু আমার নিজে দেখা যে মিসেস্ হারির চালচলন এখন বড় মাহুষের মত। গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী এ সব সে কোথায় পাইল—তার স্বামী ত দরিদ্র ছিল বলিলেই হয়। লোকে বলে বাল্যসঙ্গিনী দরিদ্র প্রতিবেশীকতার প্রতি সার ফিলিপের দয়া।”

রাল্ফ চুপ করিল, ভোরিস্ও কোন কথা বলিল না। ঘরের মধ্যে গভীর নিস্তরতা, কেবলমাত্র ঘড়ীর টিকটিক শব্দ শুনা যাইতেছিল—সে নীরবতা ক্রমশ উত্তরের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ ভোরিস্ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“না, না, আমি এ সব বিশ্বাস করিতে চাহি না, বিশ্বাস করিব না—এ সব, সব মিথ্যা।”

“হাঁ, এ সব কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা,—লোকে কত না বলে, সবই কি বিশ্বাস করিতে হইবে!”

ভোরিস্ এ কথার উত্তর করিল না। সহস্র স্মৃতি তার হৃদয় মগ্ধ করিতেছিল, অবিশ্বাস তার সহস্র বিষাক্ত ফণায় তার ক্ষুদ্র হৃদয়কে জর্জরিত করিতেছিল। কুন্দ-দন্তের নিগীড়নে ভোরিসের কুসুম-পেলব অধর রক্তিম হইয়া উঠিল—সে দুই হাত

বক্ষে চাপিয়া পাণ্ডুরের মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল—“তবে কি হইবে?—আমি—আমি কি করিব?”—তার সে স্বরে কি নিরাশা, কি কাতরতা, তার অশ্রুশেলশহীন চক্ষে কি মৰ্ম্মান্তিক বেদনা! রাল্ফ ভোরিসের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তার কর্ণমূলে মুখ আনিয়া বলিল—“কি করবে?—কেন, সে অবিখ্যাসীর উচিত শান্তি দিয়া তুমি আমার কাছে এস! প্রিয়তমে, আমাদের আবালা প্রণয়ের মধ্যে সার ফিলিপ কে? চল, আমার সঙ্গে, চল।”

রাল্ফের কথায় ভোরিস্ ভীত, চকিত হইল, বলিল,—“না, না, না, ও কথা বলো না—আমি তা পারব না।”

“না, তোমাকে আসিতেই হইবে! প্রিয়তমে, আমার কথা শুন। তোমার অবিখ্যাসী স্বামীর মত আমি লক্ষপতি নই—কিন্তু আমাদের দু'জনের চনিবার মত আমার যথেষ্ট আছে—আর আছে আমাদের দু'জনের আজীবনের ভালবাসা! প্রিয়তমে, চল আমরা কোন এক দূর দেশে গিয়া নিভৃত সুখে শান্তিতে প্রেমে জীবন কাটাইয়া দিই। জগদীশ্বর সাক্ষী,—আমি তোমাকে চিরদিন হৃদয়ে স্থান দিব—তোমাকে সুখে রাখিব! চল, ভোরিস্—আমরা আজই—এই রাত্রেই পলাই

ভোরিস্ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল—সহস্র ভাবনায় তাহাকে পীড়িত করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে—সে ভয়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“ধাম, ধাম,—আমাকে ভাবিবার সময় দাও। তুমি যা' বলছ তার মানে কি তা কি ভাবিয়াছ—তোমার জন্ম

আমাকে স্বামী, গৃহ, সম্মান, ধর্ম্ম সব ছাড়িতে হইবে!”

“আমার আজীবনের ভালবাসায় কি তার পূরণ হইবে না! না, ভোরিস্, ও সব ভাবিও না। চল আমরা পলাই, আজই রাত্রে ন'টার গাড়ীতে আমরা ফ্রান্সে রওনা হইতে পারি। তুমি ন'টার দশ মিনিট আগে, স্টেশনে পৌঁছিও—সেখানে টিকিট লইয়া আমি প্রস্তুত থাকিব। আর বিধার সময় নাই, একবার এ প্রেমহীন গৃহ ছাড়িতে পারিলে—আমরা চিরজীবন সুখে কাটাইব।”

ধীরে ধীরে ভোরিস্ বলিল—“রাল্ফ তুমি ত কখনও আমাকে অযত্ন করিবে না?”

“এ কি কথা ভোরিস্! তোমাকে অযত্ন!—আর না, আর বিধা নয়। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করিতে চলিলাম—দেখো—এসো।—কেমন?”

স্থির কণ্ঠে ভোরিস্ বলিল,—“হাঁ, আসিব।”

* * * * *

সে রাত্রে ন'টা বাজিবার দশমিনিট পূর্বে লেডি ভোরিস্ ভারনন্ট স্টেশনের একপ্রান্তে পদচারণা করিতেছিল—তাহার প্রতি পদক্ষেপে তার হৃদয়ে অস্থিরতা, উদ্বেগ, এবং মনে যে তুমুল ঝড় বহিতেছিল—তাহা প্রকাশিত। কৈ রাল্ফ ত আসে নাই—তার ত অনেক পূর্বেই পৌঁছিবার কথা! সেও কি তবে অবিখ্যাসী। ভাবিতে ভোরিসের মন ক্রোধে, ঘৃণায়, রাগে ভরিয়া উঠিতেছিল। রাল্ফ কি জানে না যে রাল্ফের ভালবাসার জন্ম সে কতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে বসিয়াছে!—স্বামী, গৃহ, ধর্ম্ম—

এক কথায় স্ত্রীলোকের সর্ব্বত্র সে রাল্ফের জন্ত অতল জলে ডুবাইগে বসিয়াছে—আর সে কি না—না, না, সে নিশ্চয় আসিবে। কিন্তু আর ত পাঁচ মিনিট বই সময় নাই! তবে? আর চার মিনিট,—তিন মিনিট—কৈ সে? ওই যে তার রাল্ফ। অভিমানে ভোরিস্ বলিল—“রাল্ফ, তুমি জান, আমি প্রায় দশ মিনিট তোমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছি—আর একটু হইলে আমরা ট্রেন গাইতাম না।”

রাল্ফ তাহার দিকে সম্মুখে চাহিয়া রহিল—তার সুন্দর মুখে কি যেন একটা হৃৎকের ছায়া পড়িয়াছে! তাকে বড় স্নান দেখাইতেছে—অন্তত ভোরিস্ তাই ভাবিতেছিল। রাল্ফ বলিল—“প্রিয়তমে, গৃহে ফিরিয়া যাও।”

মুহূর্ত্তে ভোরিসের সমস্ত দেহে যেন আগুন ছুটিয়া গেল—সে শুনিতে ভুল করে নাই শু—রাল্ফ কি তাহাকে এমনতর অপমান করিতে পারে। শুষ্ককণ্ঠে ভোরিস্ গুধাইল—“রাল্ফ, তুমি এ কি বলিতেছ?”

রাল্ফ বলিতে লাগিল—“ভোরিস্, আমার সঙ্গে আসিও না! তোমার স্বামীর কাছে, তোমার গৃহে ফিরিয়া যাও! তোমার স্বামী তোমাকেই মাত্র ভালবাসে—আর কাহাকেও না! আমি তোমাকে পাইবার জন্ত মিথ্যা বলিয়াছিলাম—আমাকে ক্ষমা করে গৃহে ফিরিয়া যাও।”—রাল্ফের কণ্ঠস্বর যেন এ পৃথিবীর নয়, সে যেন কোন দূর হইতে কথা কহিতেছে

হঠাৎ ট্রেনের বাশীর শব্দে ভোরিসের চমক ভাঙ্গিল—সে দেখিল ফ্রান্স ষাইবার

ট্রেন ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল। ভোরিস্ পাশের একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বড় ক্ষোভে কাঁদিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া দেখে, রাল্ফ ত তার পাশে নাই, সে নিষ্ঠুর তাহাকে একটা সাত্ত্বনার কথা না বলিয়া, বিদায় না লইয়া চলিয়া গেছে!

নিকটে একজন রেলের কর্মচারী এক দৃষ্টে তার দিকে চাহিয়া ছিল—ভোরিস্ সাহস করিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিল—“এই খানে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, কোথায় গেলেন বলিতে পার।”

সে অশ্রু হইয়া তার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—“ভদ্রলোক?” “হাঁ, যিনি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন?” “কই না, আমি ত এই পনের মিনিট ধরিয়া আপনাকে লক্ষ্য করিতেছি—কই কোন ভদ্রলোককে ত আপনার সঙ্গে কথা কহিতে দেখি নাই।” ভোরিসের আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না—সে ধীরে ধীরে ষ্টেশন ত্যাগ করিল।

* * * * *

সে রাত্রে ভোরিস্ অন্ধকারে অন্ধের অলক্ষ্যে নিজের ঘরে আসিয়া গুইয়া পড়িল। সার ফিলিপ তখনও গৃহে ফেরেন নাই। গুইয়া গুইয়া ভোরিস্ আপনার কথা ভাবিতে লাগিল—কৈ রাল্ফের উপর তাহার রাগ হইতেছে না? যে তাহাকে উপেক্ষা করিল, তাহাকে বড় লোভ দেখাইয়া ত্যাগ করিল—তার উপর রাগ হওয়া দুর্ব্বের কথা বরং মনে হইতেছে যেন সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া রক্ষা করিতেছে।

সার ফিলিপের গদশব্দে ভোরিস্ উঠিয়া বসিল। তার স্বামী বলিলেন,—“এ কি ভোরিস্ তুমি এখনও ঘুমাও নাই!—তা' ভাল হইয়াছে।”

“কেন, কোন বিশেষ খবর আছে না কি?”—বলিতে ভোরিসের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

“হাঁ,—রাল্ফ থালোঁ সম্বন্ধে! তোমার সঙ্গে না কি তার ছেলে বেলা হাতে বড় ভাব—তাই খবরের কাগজে পড়ার আগে তোমাকে বলা সম্ভব মনে করিলাম। বেচারী আজ ফ্রান্সে বেড়াইতে যাইতেছিল—শৈশনে যাওয়ার পথে মোটর গাড়ী উল্টাইয়া—”

“না, না—বলো না! বাঁচিয়া আছে ত?”

“বাঁচিয়া নাই, ভোরিস্—বেচারার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হইয়াছে।”

হৃজনে অনেকক্ষণ কেহ কাহারো সঙ্গে কথা কহিল না। শেষে ভোরিস্ বলিল—“ক'টার সময় এই ঘটনা হয়।”

“ন'টা বাজিতে প্রায় কুড়ি মিনিটের সময়! , কি ভীষণ ব্যাপার! ভাবিতেও কষ্ট হয়।”

ভোরিস্ কাঁপিতেছিল—তার মুখে রক্তের ঘেন লেশমাত্র নাই—সে হঠাৎ তার স্বামীর বুক পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—বলিল,—“হে আমার দেবতা, আমার স্বামী, আমার প্রিয়তম, আমাকে ধরিয়া রাখ, ধরিয়া রাখ, আমাকে পথভ্রষ্ট হইতে দিও না। আমি, তোমারই।”

শ্রীম্ভবোধচন্দ্র মজুমদার।

রসের রূপ

দাণ্ড-মুর্তি।

রূপ কথাটা লইয়া, দেখিলাম আমার কোনও কোনও নবশিক্ষিত বন্ধু একটু গোলে পড়িয়াছেন। রূপ আর আকার কি এক? এই প্রশ্নটাই কেহ কেহ তুলিতেছেন। এক নয় কি? আকার কাকে বলি? আকার আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে বিশেষভাবে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা ধরিতে পারি, ও ধরিয়া থাকি? মূলতঃ চক্ষুই কি আমাদের আকার-জ্ঞানের মুখ্য ইন্দ্রিয় নহে? অন্ধেরা বস্তুর উপরে হাত বুলাইয়া, তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদির জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে বটে,

আর কেবল দৈর্ঘ্যপ্রস্থাদি যদি আকারের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে, তাহাকে ঠিক রূপের এক পর্যায়ভুক্ত করা নাও বা যাইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতেও, চক্ষু দিয়াই যে মুখ্যতঃ আমরা বস্তুর আকারের জ্ঞান পাইয়া থাকি, ইহা অস্বীকার করা যায় না। স্পর্শ দ্বারাও এ জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু চক্ষুর দ্বারাও হয়, এই কথাই বলিতে হয়; কিন্তু আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞান ঐতোষাদিকেই স্পর্শের বিশেষ বিষয় বলিয়াছেন; রূপ বলিতে যাহা আমরা বুঝি, তাহা বিশেষভাবে চক্ষুরই বিষয়। এইজন্য চক্ষুর অন্তর্নিহিত দৃষ্টি-শক্তিকে আমাদের মনোবিজ্ঞান রূপতত্ত্বাত্মক

বলিয়াছেন। আর রসের রূপ কথাটা এই জগুই আমি ব্যবহার করিয়াছি যে, রস জীবদেহে, সেই দেহের স্নায়ুগুণকে অবলম্বন করিয়া, তাহার স্বকীয়ভাবে পেশি-সমূহের ভিতর দিয়া, যে বাহ্যগুণগুলি ফুটাইয়া তুলে, তাহা মুখ্যতঃ আমরা চক্ষু দ্বারাই দেখি। হাত দিয়া ধরিতে বা ছুইতে, নাসিকা দ্বারা আত্মাণ করিতে, রসনা দ্বারা আনন্দান করিতে পারি না। এইটুকু বিচার করিয়া দেখিলে, এ ক্ষেত্রে রূপ শব্দের প্রয়োগ দুষ্টীয় বলিয়া হয় ত বোধ হইবে না।

আর একটা কথা। অরূপ আর নিরাকার একই কথা নয় কি? পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আমরা নিরাকার শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা একটা বিশেষ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ স্থলে আমরা নিরাকার আর অতীন্দ্রিয় একই অর্থে ব্যবহার করি। ব্রহ্মবস্ত্র নিরাকার, অর্থ এই যে তাহা কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে মনকেও ইন্দ্রিয় বলা হয়, এ কথাটাও এ স্থলে ভুলিলে চলিবে না। সুতরাং নিরাকার বস্তু কেবল যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, তাহাও নয়, সে বস্তু মন দিয়াও ধরিতে পারা যায় না। এই জগুই শ্রুতি বলিয়াছেন—“যতো বাচ নিবর্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ”—ইত্যাদি।

আর নিরাকারের সত্য অর্থ যদি এই হয়, তবে রস-বস্তুকে নিরাকার বলা যায় কি? কারণ রস-বস্তু যে জাতীয়ই হউক না, তাহা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হউক আর নাই

হউক, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সঙ্গে একরূপ অঙ্গাদৌ সম্বন্ধে আবদ্ধ এ কথাটা অস্বীকার করা অসাধ্য। আমরা যাহাকে রস বলি, ইংরেজিতে তাহাকে ইমোশনস্ (Emotions) বলিয়া থাকে। এই রস আমাদের বিষয়-জ্ঞানের একটা মুখ্য অঙ্গ। ফলতঃ রস ব্যতীত জ্ঞান আপনি কিছুতেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। বস্তুসংস্পর্শকার জ্ঞানের পূর্ববৃত্ত ব্যাপার বা ঘটনা বা কর্ম্ম। এই জগু জ্ঞান মাত্রেই বস্তুতত্ত্ব, বস্তুর অধীন। ইহা যেমন সার্বজনীন সত্য; সেইরূপ এই জ্ঞানও যে নিয়তই জ্ঞাতার অন্তরে কোনও না কোনও রসের সঞ্চার করে, ইহাও সার্বজনীন সত্য। যেখানে বোধ মাত্র জন্মে, কিন্তু রসের সঞ্চার হয় না, সেখানে এই বোধটাকে অত্যন্ত ক্ষীণ, আছে কি না এমন মনে করিতে হইবে। বোধ যেখানেই পরিফুট, সেখানেই তারই সঙ্গে সঙ্গে রসের সঞ্চারও অনিবার্য্য। আর রস যেখানে ফুটে, সেখানে অবশুস্তাবীরূপে কর্ম্মচেষ্ঠাও প্রকাশিত হইবেই হইবে। আর বোধ, রস, চেষ্ঠা এই ত্রিপাদে জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই তিনের সঙ্গতি ও সীমঞ্জন্ত যেখানে হয়—অর্থাৎ বোধ যেখানে তার যথাবিহিত রসের সঞ্চার করে, এই রস যেখানে তার যথাযোগ্য চেষ্ঠাকে জাগাইয়া তুলে,—আর ইহারা তিনে মিলিয়া যেখানে পরস্পরে পরস্পরের যথার্থ সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করে, সেখানেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কথাটা ভাবিয়া দেখিলেও রসের সঙ্গে দেহীর পক্ষে একদিকে ইন্দ্রিয়-বোধের ও অত্মদিকে কর্ম্মচেষ্ঠার সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাদৌ, ইহা বুঝিতে বড়

গোল হইবার আশঙ্কা আর থাকে না। আর তখন রসের রূপ যে নিতান্ত নিরাকার হইতেই পারে না, এ সিদ্ধান্তটাকেও ঠেলিয়া ফেলা সম্ভব হয় কি না সন্দেহ।

আমার পূর্ব প্রবন্ধের মুখবন্ধে ভালবাসার আকার বা রূপ সম্বন্ধে যে কথাটা তুলিয়াছিলাম, তাহাকে আর একটু বিশদ করিবার জন্ত, এখানে এতগুলি কথা বলা হইল। এমন সোজা কথাটা যে কেহ গোলমালে ভাবে বুঝিবেন, বা বুঝিতে পারেন, ইহা তখন ভাবি নাই, নতুবা সেইখানেই ভালবাসা প্রভৃতি রসের সম্বন্ধে রূপ-কথাটা ব্যবহার করা যে অসঙ্গত নয়, ইহার আলোচনা করিতাম।

আমি যদিও রসের রূপ কথাটা ব্যবহার করিয়াছি, আমাদের দেশের রসশাস্ত্রে এতদপেক্ষা একটা বেশি গুরুতর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁরা খোলাখুলি ভাবে রসের মূর্তির কথাই বলিয়াছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিণীর মূর্তির কথাও উল্লেখ আছে। রস-শাস্ত্রে রস-মূর্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আর সর্বশ্রেষ্ঠ রস-শাস্ত্র যে ভক্তিশাস্ত্র, তাহাতে ভক্তির উপজীব্য ভগবানকে “নিখিলরসামৃতমূর্তি” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ মূর্তি সাকার, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। নিরাকার অর্থাৎ সর্ববিশেষণশূন্যও নহে। কিন্তু ইহা চিন্মূর্তি। মহাপ্রভু কাশিধামে প্রকাশানন্দ স্বামীর লঙ্গে বিচারে বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম শব্দ মুখ্য অর্থে কহে ভগবান

চিৎস্বৰূপ পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ সমান।

তাহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।

চিহ্নভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার ॥

ভগবানের “নিখিলরসামৃতমূর্তি” চিদমূর্তি, জড়মূর্তি নহে। সুতরাং রসের রূপের কথা তুলিলেই যে সে রূপকে সর্বথা জড়ধর্ম্মাপন্ন বলিয়া নির্দেশ করা হয়, এমন কথা ভাবিয়া লইবার কোনও হেতু নাই।

অন্ত পক্ষে, এই রূপ যে, অন্ততঃ আমাদের চক্ষে ও জ্ঞানে, সর্বপ্রকার জড়সম্পর্কশূন্য, এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের জ্ঞান বিষয়তন্ত্র; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোনও রস যতক্ষণ না আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, বিশেষতঃ আমাদের চক্ষুগোচর হয়, ততক্ষণ তাহার যে রূপ আছে, ইহা আমরা জানিতে বা বুঝিতে পারি না। সুতরাং রসের রূপ বলিতে আমরা রসবিশেষের আবির্ভাবে জীবদেহে যে সকল বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হয়, কেবল সেই বস্তুকেই জানি ও সেই বস্তুকেই বুঝিয়া থাকি। বাৎসল্যভাব যখন জননীকে অভিভূত করিয়া, তাঁহার স্নায়ু-মণ্ডলকে অধিকার করে ও সেই স্নায়ুমণ্ডলের সাহায্যে তাঁহার শরীরের শোণিত-প্রবাহ ও পেশিসমূহকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার দেহযষ্টিতে একটা বিশেষ ছবি ফুটাইয়া তুলে, সেই ছবিটাকেই বাৎসল্যের সত্যকার রূপ বলি। এ রূপ নিত্য অর্থাৎ যেখানে বাৎসল্য একটা বিশেষ ক্ষুর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, সেখানেই এই ছবিটা ফুটিয়া উঠে। এই রূপ সার্বজনীন অর্থাৎ সভ্য-অসভ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, বিজ্ঞ-অজ্ঞ সকল জননীতেই ফুটিয়া উঠে। এই রূপ সার্বভৌমিক—সকল দেশেই ইহার প্রকাশ হইয়া থাকে।

আর রসের এ সকল প্রকাশ জীব-দেহেতেই হয় বলিয়া, তাহার রূপ বা মূর্তি আছে বলা কিছুতেই অসঙ্গত হয় না।

পূর্বপ্রবন্ধে আমি বাৎসল্য-রসের রূপ বা মাতৃমূর্তির কথাই বিশেষভাবে ও বিস্তৃত-রূপে বলিয়াছি। আগ্র সর্বপ্রথমেই বাৎসল্যের ও মাতৃমূর্তির আলোচনা করিয়াছি এই জন্য যে এই মূর্তিটা অনেকেই, ভাগ্যগুণে, স্বচক্ষে নিজের ঘরে বা প্রতিবেশীদের ঘরে কখনও না কখনও দেখিয়া থাকিবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কিন্তু যেমন বাৎসল্যের, সেইরূপ অত্যাচ্ছন্ন রসেরও এক একটা নিজ নিজ মূর্তি আছে। যেভাবে বাৎসল্যের মূর্তি জননীর দেহ-যটিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ফুটিয়া উঠে, সেই ভাবে যখন যে রস কোনও ব্যক্তির অন্তরে জাগিয়া তাঁহার মনপ্রাণকে অধিকার ও অভিভূত করে, সেই রসের আপনার বিশেষ মূর্তিটা সেই ব্যক্তির দেহে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়। কোনও রসের মূর্তিই নিতান্ত বিদেহী নহে।

এইরূপে যেমন বাৎসল্যের সেইরূপ মাদুর্য্যেরও একটা নিজস্ব মূর্তি আছে। দাস্ত্র এবং সখ্যেরও আছে। এ সকলের মধ্যে দাস্ত্ররসের মূর্তিটাই সর্বাধিক সরল। কারণ দাস্যরসও তত জটিল নহে। প্রভুতে একান্ত আত্মসমর্পণ ও প্রভুর সেবাতে চরম কৃতার্থতা লাভ করাই দাস্যরসের ধর্ম। প্রভুর প্রতি সন্ত্রম, তাঁহার সেবাতে নিষ্ঠা, ও সর্বতোভাবে তাঁহার আত্মগত্যা সাধনই দাস্যরস তৃপ্তিলাভ করে। সুতরাং এখানে

সন্ত্রম ও আত্মগত্যের ভাবটাই প্রধান। এই সন্ত্রম ও আত্মগত্যেরও একটা রূপ আছে। এই রূপও আমাদের মুখের ভাবে, চক্ষুর চাহনিতে, চলাফেরার, বসাদাঁড়ানির ধরণেতে ধরা পড়িয়া যায়। যাহাকে অতিশয় সন্ত্রম করি, তাঁহার দিকে চাহিতে গেলে, চক্ষু আপনা হইতেই আনত হইয়া আইসে। শরীরের সমস্ত পেশিগুলি শিথিল হয় না, কিন্তু কেমন যেন একটা নম্রতাব্যবহার করে। আর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা প্রগাঢ় অকিঞ্চনতা ফুটিয়া বাহির হয়। এই রূপের মধ্যে ভয়ের চিহ্ন নাই, কিন্তু বশুতা আছে; লোভের চিহ্ন নাই, অথচ সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে; হীনতা-বোধ নাই, কিন্তু অপূর্ণ দীনতা আছে; স্পর্ধা নাই, কিন্তু বিলক্ষণ আদার আছে। সখ্য, বাৎসল্য, মাদুর্য্য যতটা জটিল, দাস্যরস ততটা জটিল নয় বলিয়া ইহা যে একান্ত একটা সরল বস্তু, ইহার মধ্যেও যে অদ্ভুত, অপূর্ণ বিচিত্রতা নাই, এমন মনে করা সঙ্গত নহে। দাস্যরসেও অশেষ প্রকারের তরঙ্গরঙ্গলীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই রস যখন জীবের অন্তরে জাগিয়া তাহার অন্তর্বাহ সমুদায় রুত্তি ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে অধিকার করে,—প্রভুই যখন দাসের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উপজীব্য হইয়া বসেন,—তখন এই রস দাসের আত্মমূল্যকে অধিকার ও তাঁহার পেশিসমূহে শক্তি সঞ্চার করিয়া, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া, আপনার নিজস্ব রূপটিকে ফুটাইয়া তুলে। দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর আমরা দাস্যমূর্তিটা দেখিতে পাই না। কারণ

আমাদের সমাজেই দাস্যরস একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর রঙ্গমঞ্চে সুনিপুণ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মধ্যে, কখনও কখনও এ রূপটী দেখিতেও পাওয়া গিয়া থাকে।

সখ্যমূর্তি

সখ্যরসটী দাস্যরস অপেক্ষা অধিক জটিল। “পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে বৈসে।” বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের রসিক সৃজন-দিগের বিচারে দাস্যরস সখ্যরসের নিচে। সুতরাং দাস্যের গুণ সখ্যেতে থাকিবেই, কিন্তু সখ্যে যে একটা খোলাখুলি গলাগলি ভাব, যে একটা সাম্য-সম্বন্ধ থাকে, দাস্যে তাহা সম্ভবে না। দাস্যরস যখন বিশেষ গভীরতা লাভ করে, তখন দাস্যের দেহের স্নায়ুগুলকে যাইয়া অধিকার করে, এবং তাহারই জন্ত তাহার মুখে চক্ষে ও অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, চালচলনে সকল বিষয়েই একটা বিশেষ ছবি ফুটিয়া উঠে। সখ্যেতেও তাহা হয়। আর সখ্যের রূপ বা ছবিটী ঠিক দাস্যের মতন হয় না। সখ্যও সখ্যর মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া তদগতপ্রাণ হইতে পারেন। সখ্যও সখ্যর সেবা করিতে পারেন, সখ্যেতেও সন্মম এবং আত্মগত্য সকলই আছে, কিন্তু ক্ষেত্রগুণে এ সকল বস্তু এখানে যে আকারে ফুটে তাহা দাস্যেতে এগুলি যেভাবে ফুটে, তাহা অপেক্ষা কতকটা ভিন্ন। প্রভু সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কোনও আকারে উদাসীনতা প্রকাশ পাইলে দাস্যরস নষ্ট হইয়া যায়। প্রভুর উপস্থিতির বা প্রভুর সেবা বিষয়ে দাস্যের কোনও ভাবের, কি বাহিরের কি ভিতরের,

বিন্দু পরিমাণ অনবধানতা বা উদাসিন্য থাকিতে বা জন্মিতে পারে না। জন্মিলে তাহাতে রসভঙ্গ হইয়া, অপরাধ হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অনবধানতা সখ্যরসের কোনও সাংঘাতিক ব্যাঘাত উৎপন্ন নাও করিতে পারে। ‘সখ্যর উপস্থিতিতে সখ্য উঠিয়া দাঁড়ান বা বসিয়া থাকুন, তাহাকে প্রত্যাশমন করিয়া আনুন বা না আনুন, তাঁর পায়ের নীচে বসুন কিম্বা ঘাড়ের উপরে চড়ুন, এ সকলে তাঁর প্রাণগত সখ্যরসের কোনও ইতরবিশেষ হয় না, হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং দাস প্রভুর নিকট দাঁড়াইলে তাঁর অন্তরগত রসের পীড়নে, চক্ষে মুখে, দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে, এ সকলে যে মূর্তিটা প্রকাশিত হইবে, সখ্য যখন সখ্যর কাছে যাইয়া দাঁড়ান, তখন কোনও মতেই সে মূর্তিটা ফুটিবে না। সখ্যরস দাস্যরস অপেক্ষা সমধিক জটিল বলিয়া, এ রসে যতটা বৈচিত্র্য ফুটিবার অবসর আছে, দাস্যরসে ততটা নাই। সখ্যের রসবৈচিত্র্য ও রসলীলা দেখিতে হইলে, কিশোর-কিশোরীদিগের মধ্যেই তাহার অন্বেষণ করিতে হয়। আর বড় বেশি অন্বেষণ করারও প্রয়োজন হয় না; ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে এ রসের শত শত প্রাণবিমোহন ছবি দিনের ভিতরে কতবারই না চক্ষে পড়ে। ইংরেজিতে যে বস্তুকে School boy বা School girl love বলে, তাহাতে এই অপূর্ণ সখ্যরসেরই বিচিত্র মূর্তি সকল ফুটিয়া উঠে। সে বয়সে এই রসই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই অনন্ত-প্রতিধ্বনিতা নিবন্ধন, কিশোর বয়সের এই

প্রেমতেই এই সখ্যের নিত্যকার ও সত্যকার রূপটি অতি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটা অতি অদ্ভুত কথা এই যে, বয়ঃসন্ধিকালে—শৈশব আর যৌবন যোথানে গঙ্গায়মূনার মত মিলিয়া যাইতে আরম্ভ করে—তখনকার সখ্যেতে এমন সকল বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, যাহা বস্তুতঃ সচরাচর কেবল মাধুর্য্যেতেই দেখা গিয়া থাকে। এই বয়ঃসন্ধিকালের বালকে বালকে ও বালিকায় বালিকায় যে অপূর্ব স্নেহের, প্রেমের, সাম্যের, স্পর্ধার, ঔদ্ধত্যের, আদারের, মানের, কখনও অম্মুরাগের কখনও বিরাগের, ক্ষণে কলহ ক্ষণে মিলন, ক্ষণে ক্রোধ ক্ষণে ক্ষমা,—এ সকল ভাব যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সখ্যের বিচিত্র স্বরূপ। আর এই সকল বিচিত্র ভাবের তাড়নায় ক্ষণে ক্ষণে এই সকল প্রণয়িগণের মধ্যে যে

রস উচ্ছলিত হইয়া তাহাদের চক্ষে মুখে, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, সর্ব শরীরে ছাইয়া পড়ে, ও তাহার দরুণে ইহাদের দেহকে আশ্রয় করিয়া যে জীবন্ত ছবি সকল ফুটিয়া উঠে, তাহাই সখ্যের রূপ। ক্রম-লীলার অভিনয়ে, গোষ্ঠের পালায় এ রসের স্ফূর্তি ও মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, স্কুন্মার বালক-গণকে নইয়াই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা করা প্রয়োজন হয়। কারণ তাহাদের স্কোমল ও কামসম্পর্কশূন্য দেহেতেই কেবল সত্য সখ্যের বিশুদ্ধ রূপটি ফুটিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। যাহারা অনাচারে ও অত্যাচারে ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হইয়া বীর্ধ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের দেহে এ রসের মূর্তীকে ধারণ করিবার শক্তি থাকে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মানবের জন্মকথা

যে সকল যন্ত্র শব্দ উচ্চারণে এক্ষণে ব্যবহৃত হইতেছে, প্রথম হইতে ঐ সকল যন্ত্র পুষ্ট ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল কেন, অথ যন্ত্র কেন পুষ্ট হইল না, তাহা বুঝা কঠিন নহে। পিপীলিকাগণ শুঁড় দ্বারা পরস্পরের সহিত অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভাব বিনিময় করিতে পারে; হিউবার পিপীলিকার ভাষা সন্দেহে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় লিখিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমরাও প্রথম হইতে চেষ্টা করিলে অঙ্গুলিকেই বাক্যস্ত্রে পরিণত করিতে পারিতাম; কারণ যাহার অঙ্গুলি-চালনা অভ্যাস আছে, তিনি, প্রকাশ্য সভায়

কোন বক্তা দ্রুতবেগে বক্তৃতা করিলেও বধির ব্যক্তির নিকট অঙ্গুলি চালনা দ্বারা ইহা জ্ঞাপন করিতে পারেন। কিন্তু হস্তকে এই কার্য্যে ব্যবহার করিলে অল্প কার্য্য সম্বন্ধে যে ক্ষতি হইত তাহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইত। আমাদিগের বাক্যযন্ত্র যেরূপ ভাবে গঠিত, উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণেরও তদ্রূপই, এবং উভয়েই উহা ভাব-বিনিময়ের নিমিত্ত ব্যবহার করি ও করে; স্তম্ভরা ভাব বিনিময়ের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে ঐ বাক্যযন্ত্রও অধিকতর পুষ্টতা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই কার্য্য নিকটবর্তী

উপযুক্ত যন্ত্রাদির অর্থাৎ জিহ্বা এবং ওষ্ঠাধরের সহায়তায় সিদ্ধ হইয়াছিল। নিশ্চয়ই উচ্চশ্রেণীর বানরগণের বুদ্ধিবৃত্তি প্রচুর পরিমাণে উন্নতি লাভ না করা হেতুতেই উহারা বাক্য উচ্চারণ নিমিত্ত বাক্যযন্ত্র ব্যবহার করে না। উহারা বাক্য উচ্চারণ করে না, কিন্তু দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে বাক্য উচ্চারণে সমর্থ হইত এরূপ বাক্যযন্ত্র উহাদিগের আছে ; অনেক পক্ষীরও গান করিবার উপযুক্ত যন্ত্র আছে, কিন্তু কখনও গান করে না। ঐ বানরগণের ও পক্ষিগণের অবস্থা তুল্য। বুলবুলের ও কাকের বাক্যযন্ত্র সমভাবে গঠিত ; কিন্তু বুলবুল বিচিত্র গান করিবার নিমিত্ত উহা ব্যবহার করে, অথচ কাক কেবল কা কা করিয়া থাকে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, মানুষের যে পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইয়াছে, বানরের তাহা হইল না কেন, তবে কেবল সাধারণ ভাবে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ ভাবে উত্তর পাইবার আশা করাও সম্ভব নহে, কারণ প্রত্যেক জন্তু কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তৎ সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অজ্ঞ।

বিভিন্ন জাতীয় জীবের উৎপত্তি এবং বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি একই প্রকার; উভয়ই ক্রমে ক্রমে পৃষ্ঠ হওয়ার প্রমাণও একই প্রকার। ইহা আশ্চর্যের কথা। কিন্তু জীবের অপেক্ষা ভাষার গঠন আমরা বেশি দূর পর্যন্ত মূল অনুসন্ধান করিতে পারি, কারণ অনেক শব্দ নানাবিধ ধ্বনির অল্পকরণে বিকৃতি লাভ হইল তাহা আমরা বুঝিতে সমর্থ হই। পৃথক পৃথক ভাষা ঐ

ভাষা হইতে উৎপন্ন হওয়া হেতু অনেক স্থলে বিষয়কর একতা দেখা যায়, এবং উহাদিগের গঠন এক প্রকারে হওয়ায় গঠন-সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। কতিপয় অক্ষর অথবা ধ্বনি পরিবর্তিত হইলে অন্যান্য অক্ষর এবং ধ্বনি যে ভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা [জীবতত্ত্বের] সহ-পরিবর্তনের ন্যায়। ভাষা ও জীব—উভয় ক্ষেত্রেই অধিকাদৃষ্ট দৃষ্ট হয় এবং দীর্ঘকাল নিয়ত ব্যবহারে পরিণাম ফল ইত্যাদিও তুল্য। উভয় ক্ষেত্রেই লুপ্তাবশিষ্ট অঙ্গ বিद्यমান থাকে, ইহা আরও উল্লেখযোগ্য। “Am” শব্দের m অক্ষরের অর্থ “I” স্মরণ্য “I am” পদে অনাবশ্যক লুপ্তাবশেষ বিদ্যমান আছে। শব্দের বর্ণবিজ্ঞাসে অনেক সময় প্রাচীন কালীয় উচ্চারণের লুপ্তাবশিষ্ট অক্ষর রহিয়া যায়। জীবের ন্যায় ভাষা সকলেরও শ্রেণী বিভাগ করা যায় ; এবং উৎপত্তি অনুসারে অথবা অঙ্গ লক্ষণ অনুসারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রধান ভাষা অথবা ভাষার কোন বিশেষ গঠন* প্রধান হইলে বহুবিভাগী হইয়া পড়ে এবং অত্যাগ ভাষাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে, সার চাল’স লায়েল বলেন জাতির ন্যায় ভাষাও একবার বিনষ্ট হইলে পুনরায় জাত হয় না। এক ভাষার দুই জন্মস্থান থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা মিশ্রিত হইয়া ভাষার সঙ্কর উৎপন্ন করে। প্রত্যেক ভাষার পরিবর্তনশীলতা আছে ; নূতন শব্দ সর্বদাই উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু স্বাভাবিক শক্তির সীমা আছে, স্মরণ্য এক একটা শব্দও সমগ্র ভাষাটির ন্যায়, বিনষ্ট হইয়া

* Dialects.

থাকে। ম্যাক্সমুলার ভাই বলিয়াছেন, “প্রত্যেক ভাষাতেই শব্দসমূহের মধ্যে এবং ব্যাকরণসম্মত রূপ সকলের মধ্যে প্রতি-নিয়ত জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে; যাহারা হ্রস্ব, সরল, উত্তম তাহারাই জয়ী হইতেছে। তাহাদিগের অন্তর্নিহিত উপযোগিতাবশতঃই জয়ী হইতেছে।” এই সকল গুরুতর কারণে কতিপয় শব্দ অপরাপর শব্দের স্থান অধিকার করে। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটী কারণ আছে, নূতনত্ব এবং রুচি; কারণ মানব-মন সকল বিষয়েই অল্প পরিবর্তন খুব ভাল বাসে। জীবন-সংগ্রামে কতিপয় শব্দ টিকিয়া যায় অথবা রক্ষিত হয়, ইহাই প্রাকৃতিক নির্বাচন।

অনেক অসভ্য জাতির ভাষা-গঠন অতি সূক্ষ্মাল এবং জটিল, ইহা হইতে অনেকে বিবেচনা করেন যে ঐ সকল ভাষা ঈশ্বরদত্ত অথবা উহাদিগের নিষ্ঠাভাগ্য সভ্য ও খুব কৌশলী ছিলেন। এফ, ডন্, শ্বেগেল লিখিয়াছেন, “অতি নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিহীন জাতিগণের ভাষা মধ্যেও আমরা অনেক সময় উত্তম ব্যাকরণসম্মত গঠন-কৌশল দেখিতে পাই; বাক্স, ল্যাপোনিয়ান এবং আরও কতিপয় অ্যামেরিকান ভাষা সম্বন্ধে এই কথা বিশেষরূপে সত্য। কিন্তু ভাষাকে শিল্প বলা নিশ্চয়ই ভ্রম, কারণ শিল্প শব্দে মনুষ্য কর্তৃক যত্নপূর্বক বিধি-মত গঠিত বুঝায়। ভাষা-তত্ত্ববিদগণ এক্ষণে স্বীকার করেন যে বিভক্তি ও প্রত্যয়গুলি পূর্বে পৃথক পৃথক শব্দ ছিল, তৎপর অল্প শব্দে যুক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ সকল শব্দ পূর্বে বস্তু ও ব্যক্তির সম্বন্ধবাচক থাকায় আদিকাল হইতেই প্রায় সমস্ত জাতি উহা দিগকে ব্যবহার করিয়াছে। ইহা আশ্চর্যের

বিষয় নহে। নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে ভাষার পূর্ণতা সম্বন্ধে কত সহজে ভ্রমে পতিত হইতে পারি; একটী জীবের কখন কখন দেড়লক্ষ খোসা থাকে, উহার অতি উৎকৃষ্ট ভাবে ব্যাসার্দ্ধ রেখার আয় সমজিত; কিন্তু কোন জীবতত্ত্ববিৎ এই শ্রেণীর জীবকে সমগ্র-পার্শ্বিক জীব অপেক্ষা অধিক উন্নত বোধ করেন না, যদিও ইহা-দিগের তত অধিক অংশ নাই, এবং যাহা আছে তাহাও অসম, কেবল দেহের দুই পার্শ্ব অংশগুলি তুল্য। দৈহিক যন্ত্র সকল পৃথক পৃথক হওয়া এবং নির্দিষ্ট অংশে নির্দিষ্ট কৰ্ম নিষ্পন্ন হওয়াকেই জীবতত্ত্ব-বিদগণ উন্নতির (পূর্ণতার) লক্ষণ বিবেচনা করেন; ইহাই সঙ্গত। ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই। যে সকল ভাষা সূক্ষ্মালাহীন, সংক্ষিপ্ত, মিশ্র অথবা সঙ্কর; যাহারা সূক্ষ্ম শব্দ, অথবা প্রয়োজনীয় গঠন-পদ্ধতি বিজ্ঞেতৃ কিস্তি বিজিত জাতির অথবা নবাগতগণের ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে, সেই সকল ভাষাকে [ঐ হেতুতে] সূক্ষ্মালায়ুক্ত জটিল ভাষা হইতে অধিক উন্নত বিবেচনা করা সঙ্গত নহে।

এই সকল অসম্পূর্ণ এবং অল্পসংখ্যক বৃত্তান্ত হইতেই আমি বিবেচনা করিতে পারি যে, অনেক অসভ্য জাতির ভাষা-গঠন সূক্ষ্মাল এবং জটিল হওয়াতেই ঈশ্বর কর্তৃক পৃথক সৃষ্ট বলিয়া-প্রমাণিত হয় না এবং স্পষ্ট উচ্চারিত বর্ণাঙ্ক ভাষা কেবল মানুষেরই আছে, এ হেতুতেও নিম্নতর জীব হইতে মানবের উৎপত্তি হওয়া বিশ্বাস করিবার অলঙ্ঘনীয় বাধা হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশধর রায়।

উপাধ্যায়ের সমাজ-নীতি

উপাধ্যায় ব্রহ্মবাক্য মহাশয় স্বদেশ-বস্তুকে কতটা যে ভাল বাসিতেন, তাঁর ঐকান্তিক সমাজানুগত্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দু সাধনা পরিহার করিয়া, সাধনাস্তর গ্রহণ করিয়াও তিনি এই সমাজানুগত্য বর্জন করেন নাই। বরং এই বিদেশীয় ধর্মসাধনকেই, আপনাব জীবনে, সম্পূর্ণরূপে, নিজের দেশের সমাজ-বিধানের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার জ্ঞান প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ উপাধ্যায় মহাশয়ের এই সমাজানুগত্যের অন্তরালে কেবল একটা অর্থহীন ও অযৌক্তিক রক্ষণশীলতাই দেখিতেন। প্রথম বয়সে উপাধ্যায় না কি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই জ্ঞান তাঁর পরিণত বয়সের এই সমাজানুগত্যকে কেহ কেহ, বিশেষতঃ তাঁর পূর্বকার ধর্মবন্ধুগণ, পুরাতন কুসংস্কারের দিকে পুনরাবর্তন বা রি-অ্যাক্শন (re-action) বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু উপাধ্যায়কে এ জাতীয় রক্ষণশীল বা এই শ্রেণীর পুনরাবর্তনকারী বা রি-অ্যাক্শনারী (re-actionary) বলা যাইতে পারে কি না সন্দেহ।

উপাধ্যায়ের মধ্যে একটা প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব ছিল, এ কথাটা সকলে জানেন না ও বোঝেন না। “সন্ধ্যা”-পত্রিকার সম্পাদক বলিয়াই বাঙ্গালী সমাজে উপাধ্যায় বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর

“সন্ধ্যাতে” প্রায়ই সমাজের, বিশেষ নব্যশিক্ষা-ভিমानी সম্প্রদায়ের, কোনও কোনও শ্রেষ্ঠজন সম্বন্ধে এরূপ কঠোর, তীব্র, কখনও কখনও বা গভীর বিদ্রোপাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, যে এগুলি পড়িয়া অপরিসীত লোকে কোনও প্রকারেই সম্পাদককে এক জন শ্রদ্ধাশীল লোক বলিয়া কল্পনা করিতে পারিত না। কিন্তু উপাধ্যায়কে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, তাঁরা তাঁহার কথাবার্তায় কখনও প্রকৃত শ্রদ্ধাশীলতার অভাব দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। পল্লীর স্বাহ্যরক্ষার জ্ঞান, পল্লীবাসীর কাহাকেও না কাহাকেও তার আবর্জনাশি পরিষ্কৃত করা অত্যাশঙ্ক্য হয়। এ অত্যাশঙ্ক্যীয় কর্ম যে করিতে যাইবে, তার হাতে ও গায়ে কিছু না কিছু ময়লাও লাগিবেই লাগিবে। কিন্তু দেশের হিতের জ্ঞান এ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া সে ব্যক্তি যে স্বভাবতঃই আবর্জনা ভাল বাসে, এমন কথা যেমন বলা সম্ভব হয় না, সেইরূপ সময়বিশেষে সমাজের নৈতিক বা রাষ্ট্রীয় আবর্জনা পরিষ্কার করা প্রয়োজন হইলে, সমাজের শ্রেষ্ঠজনকেও সর্বসমক্ষে অপদস্থ করা আবশ্যক হইতে পারে। আর সে অবস্থায়, সে অপ্রীতিকর কর্ম যদি কেহ করে, তাহাতে তাহাকে বহুবিস্তর হীনতাও স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সে নির্দিকার-চিত্ত দেশ-সেবককে হীনচরিত্রের লোক বলিয়া মনে করা কখনই সম্ভব হয় না। উপাধ্যায় সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। “সন্ধ্যা”পত্রিকার

সমাজের কোনও কোনও শ্রেষ্ঠজনকে যখন তখন তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইত বলিয়া, সম্পাদকের প্রকৃতিতে যে একটা স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাশীলতা ছিল না, একেবারে সরাসরিভাবে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ফলতঃ উপাধ্যায় “সন্ধ্যা” পরিচালনা করিতে যাইয়া, আপনার অন্তরকে কতটা পরিমাণে যে নিপীড়িত করিতেন, বহুদিন কাছে থাকিয়া, এক সঙ্গে কাজ করিয়া, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ সকল আক্রমণ যে সর্বদা তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহাও নহে। তবে অপর লেখকদিগের প্রবন্ধাদির উপরে তিনি প্রায়ই হস্তক্ষেপ করিতেন না। আর সমাজের “মেকি” নেতৃত্ব ও স্বদেশ-সেবার প্রভাব নষ্ট না হইলে, সত্য ও সজীব স্বদেশিকতা কখনওই ফুটিয়া উঠিবে না, ইহাও তিনি মনে করিতেন। এই জন্ত আর কোনও কিছু বিচার না করিয়া উপাধ্যায় এ সকল পেন্থা পত্রস্থ করিয়া দিতেন। নতুবা, সত্য সত্যই যে লোকনিন্দায় তাঁর আনন্দ হইত, তাহা নয়। আর এ সকলে তাঁর প্রাণগত শ্রদ্ধাশীলতার অভাবও সূচিত হইত না।

প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা হইতে, সর্বদাই এক প্রকারের রক্ষণশীলতাও জন্মিয়া থাকে। এই জাতীয় রক্ষণশীলতা উপাধ্যায়ের মধ্যে বেশই ছিল। তারই জন্ত উপাধ্যায়ের হাত প্রাচীনের ও প্রতিষ্ঠিতের উপরে আঘাত করিতে সর্বদাই সঙ্কুচিত হইত। এই জন্তই উপাধ্যায় প্রথম বয়সে আপনার কৌলিক ধর্মে আস্থাহীন হইয়াও, একেবারে উৎকট

ধর্মসংস্কারক বা সমাজ-সংস্কারক হইয়া উঠেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দিয়া, কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। কেশবচন্দ্রের নিজের চরিত্রে একটা রক্ষণশীলতা এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে একটা শ্রদ্ধাশীলতা সর্বদাই বিद्यমান ছিল। এ বস্তু ব্রাহ্মসমাজের অপর শাখায় ততটা পাওয়া যায় নাই। উপাধ্যায়ের প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা শাস্ত্রগুরুবর্জিত ব্রাহ্ম ধর্মেতেও বেশি দিন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। এই শ্রদ্ধাশীলতার প্রেরণাতেই, আমার মনে হয়, উপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া প্রথমে প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টীয় মণ্ডলীর ও শেষে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সমাজের আশ্রয় লইয়াছিলেন। আর এই ধানেই, তাঁর প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা ও রক্ষণশীলতার প্রভাবে উপাধ্যায়ের শেষ বয়সের সমাজ-নীতির মূল ভিত্তিটা গড়িয়া, উঠিতে আরম্ভ করে।

সর্বদাই ব্যক্তিহাভিম্যানী অনধীনতার আদর্শের সঙ্গে সমাজানুগত্যের একটা নিত্য বিরোধ জাগিয়া রহে। যেখানেই এই অনধীনতার ভাবটা প্রবল হইয়া উঠে, সেই খানেই সমাজানুগত্যটা ধর্মবিগর্হিত বলিয়া, পরিত্যক্ত হয়। প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ে এই ব্যক্তিহাভিম্যানী অনধীনতার ভাব খুবই প্রবল। এই জন্ত ইহাদের মধ্যে সমাজানুগত্যও ক্রমশই কমিয়া গিয়াছে, এখন নাই বলিলেও চলে। অতীতকে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সমাজ, শাস্ত্র ও গুরু উভয়ের প্রাধান্য-মর্যাদা সমভাবে রক্ষিত

হইয়া, ধর্মসাধনে ও সমাজ-জীবনে, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিভাষিমাত্রী অনধীনতার ভাবকে অনেকটা সংযত করিয়া রাখিয়াছে। এই জ্ঞান এখানে সমাজানুগত্য যে ধর্মের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এ ভাবটা এ পর্য্যন্ত একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই কারণেই, বোমক-সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উপাধ্যায়ের সমাজ-ানুগত্যের ভাবটাও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

অতএব এই সমাজানুগত্যটা ভাল হউক মন্দ হউক; যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক আর যাহা কিছুই হউক না কেন, ইহার অন্তরালে যে একটা বিরাট ধর্মতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল, এ কথাটা অস্বীকার করা যায় না। একটা খেলার চাপে উপাধ্যায় প্রাচীন সমাজশাসন পরিত্যাগ করেন নাই; খেলার চাপে তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হন নাই। এই জ্ঞান তাঁহাকে পুনরাবর্তন-কারী বা রি-অ্যাক্সনারীও বলা যায় না।

ফলতঃ আমাদের সমাজের যাহা যেরূপ আছে, তাহা সেইরূপই থাকিবে বা থাকা বাঞ্ছনীয়, উপাধ্যায়কে কোনও দিন এমন কথা বলিতে শুনি নাই। “বন্দে মাতরম্” পত্র প্রতিষ্ঠার সময়ে এই সম্বন্ধে উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। নূতন কাগজ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করিবে, ইহাই আমাদের উভয়ের বিচার্য বিষয় ছিল। বন্দে মাতরম্ সর্ব বিষয়ে উদার সংস্কারের সমর্থন করিবে, আমি এই কথা বলি। উপাধ্যায় এ বিষয়ে

একটু আপত্তি করেন। তাঁর মূল কথাটা আজিও আমার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। তিনি বলেন—“সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে আমি নই। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সমাজ-সংস্কার বলিতেই বিদেশীয় সভ্যতা-সাধনার প্রভাবে, কতকগুলি বৈদেশিক আদর্শের, স্বল্পবিস্তর অনুবর্তনই বুঝাইয়া থাকে। এই জাতীয় সমাজ-সংস্কারে আমাদের সমাজের বিশেষত্বটুকু ক্রমে লোপ পাইতেছে, আমরা ফিরিঙ্গীর একটা নকলের নকলের মতন হইয়া উঠিতেছি। এটা আমি চাই না। ইহাতে সমাজের স্বাদেশিকতা নষ্ট হইয়া, সমাজের ও লোক-চরিত্রের সাংঘাতিক বিপর্যয় উপস্থিত হইবে। এই বিদেশীয় শক্তির প্রত্যাবর্তন প্রথমে আটকাইতে হইবে। স্বদেশের সমাজকে ও স্বদেশের জনগণকে সর্বদা আত্মস্থ করিতে হইবে। তারা আগে জাগুক। নিজেরা নিজেদের চিনিয়া লউক। তারপর, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রকৃতি ও প্রয়োজনানুরূপ নিজেদের সমাজকে গড়িয়া পিটিয়া শুধরাইয়া লইবে।”

এই কথাগুলিতেই উপাধ্যায়ের সমাজ-নীতির যেমন, তেমনি তাঁর স্বাদেশিকতারও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ উপাধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মানব-সমাজকে এক একটা স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট জীবের মতন মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয়। Social organism বা সমাজ-জীব আধুনিক বিদেশীয় সমাজ-বিজ্ঞানের এই পরিচিত পিঠাখাটা তাঁর মুখে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর কথা-

বার্তায় তিনি যে এই আধুনিক সমাজ-তত্ত্বটিকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন ইহা খুবই বুঝিয়াছিলাম। আর প্রত্যেক সমাজকে এইরূপ বিশিষ্ট জীবধর্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই সকল সমাজেরই ভাল ও মন্দের মধ্যে যে একটা অতি নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, এ কথাও তিনি বলিতেন। এইজন্যই বিলাতী সমাজের মন্দটিকে ছাড়িয়া শুদ্ধ ভালটিকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে যেরূপ নিতান্ত অসাধ্য, সেইরূপ আমাদের নিজেদের সমাজের ভালটুকুকে নিখুঁত ভাবে রক্ষা করিয়া, কেবল তার মন্দটুকুকে একান্ত ভাবে পরিহার করাও একান্ত অসম্ভব। জীবদেহে যখন প্রাণশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে, তখনই কেবল তাহার অন্তরস্থ রোগের বীজাণু সকল প্রবল হইয়া অশেষ উৎপাত ও অমঙ্গল ঘটাইতে আরম্ভ করে, প্রাণীর সুস্থ সবল অবস্থায়, তারা নির্জীব ও অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া পড়িয়া থাকে, এ যেমন সত্য; সমাজের ভাল-মন্দ সম্বন্ধেও ইহা সেইরূপই সত্য। সমাজ মধ্যে যখন প্রাণশক্তি সতেজ ও সবল থাকে তখন সমাজের রীতি-নীতি এবং শাসন-সংস্কারের ভালটুকুই প্রবল হইয়া রহে ও তাহার মন্দটুকু হতবল ও হীনহেজ হইয়া অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া যায়। কিন্তু সমাজের প্রাণশক্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলেই এ সকল অন্তর্নিহিত উৎপাত ও অমঙ্গলের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, সমাজকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতে থাকে। সুতরাং সমাজের প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তোলা, সেখানে

বল সঞ্চার করা, এ সকলই সমাজসংস্কার সাধনের প্রথম ও মুখ্য কর্ম্ম। এটা করিতে পারিলে, সমাজ একবার সজীব ও আত্মস্থ হইয়া উঠিলে, সামাজিক ব্যাধি সকলের বীজাণুগুলি আপনি মরিয়া যাইবে বা মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া থাকিবো। উপাধ্যায় এই কারণেই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব-প্রযত্নে, স্বদেশী সমাজের প্রাণমধ্যে এই শক্তি সঞ্চার করিবার জগুই ব্যগ্র ছিলেন; বাহির হইতে উদ্বেজক ঔষধ দিয়া, সমাজ-দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় উপদ্রব সকলকে প্রশমিত করিবার জগু হাতুড়ে চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। এ কথাটা না বুঝিলে, উপাধ্যায় কেন যে শেষ জীবনে সমাজ-সংস্কারের কথা তেমন বেশী বলিতেন না, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা সহজ বা সম্ভব হইবে না।

উপাধ্যায়ের ভূয়োদর্শন এই ভাবটিকে বিশেষভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। বিলাত যাইবার পূর্বে, করাচীতে যখন রোমক খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের অনুশীলন করিতেছিলেন, তখন, উপাধ্যায় যতটুকু পরিমাণে সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ততটুকুও ছিলেন কি না, সন্দেহ। আমরা সমাজ-সংস্কার করিতে যাইয়া কোন্ পথে চলিতেছি, এই পথ ধরিয়া চলিলে পরিণামে কোন্ স্থানে যাইয়া পৌঁছাইতে হইবে,—বিলাতে যাইয়া। ইরেজ-সমাজের গতিবিধি ও রীতিনীতি, যত ও আদর্শ এবং ভাবস্বভাব সুস্পষ্টভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, উপাধ্যায় তাহা বেশ করিয়া ধরিতে পারিয়া-ছিলেন। আর ঐ পথ যে আমাদের পক্ষে

ভয়াবহ পরধর্মের পথ,—উপাধ্যায় ইহাও বিশ্বাস করিতেন। এই কারণেই বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কতকটা পরিমাণে স্বদেশের সামাজিক জীবনের ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। কামোপভোগপ্রবণ যৌবন-কালে যঁারা বিলাত যান, তাঁদের কথা যাহাই হউক না কেন, বেশী বয়সে, বিশেষতঃ প্রকৃত ধর্মজীবনের কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, যঁাহারা বিলাতী সমাজের ভাব-স্বভাব ও মতিগতি পরীক্ষা করিবার প্রত্যক্ষ অবসর প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের অনেকেই, বোধ হয়, স্বদেশের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের সমধিক পক্ষপাতী হইয়া বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। অন্ততঃ উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে এরূপই ঘটিয়াছিল। এই জ্ঞানই উপাধ্যায় মহাশয় শেষ জীবনে সমাজ-সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে এতটা শক্তিত হইতেন।

এরূপ শঙ্কা যে একান্তই অস্বাভাবিক বা নিতান্তই অযৌক্তিক, এমনই কি বলিতে পারা যায়? ইংরেজি শিখিয়া, যুরোপীয় ঝাঁকের ব্যক্তিত্বাভিম্বানী অনধীনতার ও গণতন্ত্রতার আদর্শ মুগ্ধ হইয়া, আমরা এক সময়ে সমাজ-সংস্কারব্যাপারটা যত সহজ মনে করিয়াছিলাম, বাস্তবিক যে তাহা তত সহজ নহে, এ জ্ঞান অনেকেরই অল্পে অল্পে জন্মিতেছে। বিশেষতঃ যুরোপীয় সমাজ-চিত্রের ধ্যানে এই জ্ঞান বাড়িয়া উঠে বৈ হ্রাস হয় না। এক এক করিয়া, আমাদের বর্তমান সমাজ-সংস্কারের মুখ্য প্রয়াসগুলিকে ধীরভাবে তাকাইয়া দেখিলেই, ইহা বুঝিতে

পারা যায়। উপাধ্যায় এটা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই, এতটা সরাসরিভাবে সমাজসংস্কারের চেষ্টায় আপনিও প্রবৃত্ত হন নাই, অপরকেও এ কার্যে প্রোৎসাহিত করিতেন না।

প্রচলিত সংস্কার-প্রয়াসিগণ আমাদের জাতিভেদ-প্রথাটা ভাঙ্গিয়া দিবার জ্ঞানিত বাগ্ন হইয়াছেন। এ বাগ্নতা সাভাবিক। বর্তমানে এই জাতিভেদ-প্রথা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সমাজের স্থবিরতা যে অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা অস্বীকার করাও যায় না। আর পূর্ব পূর্ব যুগেও মহাজনেরা সময়ে সময়ে, এই বংশগত জাতিভেদপ্রথার সংস্কার সাধন যেরূপ করেন নাট, তাহাও নহে। জাতিভেদের কঠোর শাসন সত্ত্বেও বহু কালাবধি হিন্দুসমাজে যে বীজ-মিশ্রণ ঘটয়া আসিয়াছে, ইহাও বোধ হয় প্রমাণ করা কঠিন নহে। এইরূপ বীজ-মিশ্রণে কেবল বিবিধ বর্ণসঙ্করেরই উৎপত্তি হয় না, যঁারা সমাজে সঙ্করবর্ণ বলিয়া পরিচিত নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও যে এরূপ বীজমিশ্রণ ঘটয়াছে, ইহারও প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা অসাধ্য নহে। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় মার্গের সাধক ও সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবেই এই জাতিভেদ-প্রথাকে স্বল্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বর্তমানেও যে এ প্রথার সংস্কার প্রয়োজন নর, অথবা সংস্কার হইবে না, এমন কথা কে বলিবে? উপাধ্যায় কখনও এমন কথা বলেন নাই, তিনি জীবনের কোনও বিভাগে এরূপ

স্ববিরতা ও বন্ধভাবের পক্ষপাতী ছিলেন না, একথা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায়। কিন্তু তথাপি যে ভাবে আমাদের বর্তমান সমাজ-সংস্কারকেরা জাতিভেদ-প্রথাকে ভাঙিতেছেন বা ভাঙিতে চাহিতেছেন, উপাধায় তাহার সমর্থন করেন নাই। আর করেন নাই এই জন্য যে আমরা এই পথে আমাদের প্রাচীন জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, বিদেশের আমদানী আর এক প্রকারের ঘৃণ্যতর ও সহস্রগুণে অধিক অমঙ্গলকর জাতিভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে বসিয়াছি। বিদেশীয় সমাজে ইহাকে জাতিভেদ বলে না বটে। তাঁহারা ইহাকে শ্রেণীভেদ বলেন। কিন্তু যে নামেই নির্দিষ্ট হউক না কেন, বস্তু দুটা এক না হইলেও যে নিতান্তই স-জাতীয় ইহা কি অস্বীকার করা যায়? আর এখানে প্রশ্ন এই যে সামাজিক স্ববিরতা-পোষক যে বংশগত জাতিভেদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহার যতই দোষ থাকুক না কেন, ইহার বদলে আমরা, সংস্কারের নামে, সমাজের বিপ্লবসাধক, পদগত বা ধনগত যে বিলাতী শ্রেণীভেদকে জাতসারেই হউক আর অজাতসারেই হউক, আমাদের সমাজে বরণ করিয়া লইতেছি, তাহার দোষ তদপেক্ষা বেশি কি না? এই বিষয়ে উপাধায় এই প্রশ্নটাই তুলিতেন। আর এই প্রশ্নের সোজা উত্তর কেবল একটা—বিলাতী শ্রেণীভেদের দোষ আমাদের জাতিভেদের দোষ অপেক্ষা আকারে তিন হইলেও, ওজনে কম নহে। আমাদের

জাতিভেদ মানুষের মনুষ্যত্ব-বস্তুকে হয় ত কোনও কোনও স্থলে চাপিয়া রাখে, বিলাতী শ্রেণীভেদ তাহাকে পিষিয়া মারে। স্মৃতরাং যেরূপ করিয়াই হউক, এই পুরাগত জাতিভেদকে ভাঙ্গিয়া দিলেই যে আমাদের সমাজ উন্নতির পথে ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে, উপাধায় এমনটা বিশ্বাস করিতেন না।

জাতিভেদের সংস্কার সম্বন্ধে যে কথা, অত্যাঁচ সমাজসংস্কার সম্বন্ধেও সেই কথা। যেটাকে ভাঙ্গিয়া যেটাকে গড়িতে যাইতেছি, তাহা কি বেশি ভাল? যেমন প্রচলিত জাতিভেদ, সেইরূপ বর্তমানে যে আকারে বালাবিবাহ-প্রথা দেশে প্রবর্তিত আছে, তাহাও সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের ঠিক সহায় বৈ নয়,—এ কথা উপাধায় জানিতেন এবং মানিতেন। এ কুপ্রথা এক সময়ে আমাদের সমাজেও ছিল না। কোন্ যুগে, কি কারণে, কোন্ বিশেষ অবস্থাবীনে ইহা প্রচলিত হয়, স্থির করা বহু-বিস্তৃত-ও-মূল্য গবেষণা-সাপেক্ষ। কিন্তু যখন এবং যে কারণেই ইহা প্রথমে প্রবর্তিত হউক, না কেন, হিন্দুসমাজে যখন প্রাণশক্তি প্রবল ছিল, তখন সমাজ আপন হইতেই ইহার আনুসঙ্গিক অমঙ্গল ফলগুলি, একান্ত ভাবে না হউক, অন্ততঃ বহুল পরিমাণে নিবারণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিল। সমাজের সে প্রাণশক্তির হীনতা নিবন্ধন ক্রমে এ সকলও ব্যর্থ বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্মৃতরাং আজ বালাবিবাহ-প্রথা যতটা অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, কিছুকাল পূর্বেও তও অনিষ্টকর ছিল না। এ সকলই সত্য।

সকলে না হউক, অতি নিষ্ঠাবান অথচ চিন্তাশীল হিন্দু যাহারা, তাঁহারাও এ সকল স্বীকার করেন। কিন্তু এই প্রথাকে জোর করিয়া বন্ধ করিলে, আর তাহার বদলে বিলাতী ছাঁচের যৌবন-বিবাহ ও যুনির্কীচন-প্রথা প্রবর্তিত হইলে, আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, তাহাতে আমাদের সমাজের বেশি অমঙ্গল আশঙ্কা হইবে কি না, এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাঁহারা সহসা এ সংস্কার-কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন না।

এইরূপে আমাদের সমাজবিধানে যে সকল মন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে জোর করিয়া উপড়াইয়া দিলে, তার ভাল যাহা জাছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যাইবে কি না, এই ভয়েই উপাধ্যায় মহাশয় সমাজ-সংস্কার বিষয়ে এতটা শঙ্কিত হইয়া চলিতেন। নতুবা আমাদের সমাজে বর্তমান অনিষ্টের প্রথা সম্বন্ধে তিনি যে অন্ধ ছিলেন, কিম্বা এ সকলের পরিবর্তন ও সংশোধন ইচ্ছা করিতেন না,—এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না।

অন্য প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, উপাধ্যায়ের সমাজসুগত্য ও সমাজনীতি

সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারি। উপাধ্যায় স্বদেশী সমাজকে, লোকে দেবতার মন্দিরকে যে চক্ষে দেখে, সেই চক্ষে দেখিতেন। ভক্ত লোকেও প্রয়োজন হইলে আপনার দেবতার মন্দির ভাঙ্গিয়া থাকেন, কিন্তু ভাঙ্গিবার জন্ত তাহা ভাঙ্গেন না, অথ দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্তও ত্যাহাকে নষ্ট করেন না। আপনার দেবতার দেবার মৌখ্যার্থেই ভাঙ্গিয়া থাকেন এবং ভাঙ্গিবার সময়, শাস্ত সমাহিত, গুদ্র বুদ্ধ হইয়া, ভক্তির সঙ্গেই ভাঙ্গেন। একপভাবে যদি কেহ হিন্দুসমাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, উপাধ্যায় তাহার সে চেষ্টাকে মাথায় করিয়া লইতেন, ইহা জানি। আর প্রচলিত সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার মধ্যে এই সংঘম, এই শঙ্কা ও এই ভক্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পান নাই বলিয়াই তিনি ইহার সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি স্বদেশ-বস্তুকে কেবল ভালবাসিতেন যে তাহা নয়, আন্তরিক ভক্তিও করিতেন। তাঁর সমাজানুগত্যের মধ্যে ও সমাজনীতির মূলে এই অপূর্ব স্বদেশভক্তিটা সর্বদা জাগিয়া থাকিয়া, তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

পাণ্ডবগণের জন্ম।

সেই সেই দেবতাগণের দৈবসঙ্গমে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রী ঐ ব্যাপার দেখিয়া কুন্তী যাহাতে তাঁহাকে ঐ মন্ত্র দেন তজ্জন্ত

পাণ্ডকে অনুরোধ করিলেন। কুন্তী সপত্নীকে দেবতাবিশেষের ধ্যান করিতে বলিলেন। মাদ্রী অগ্নিনীকুমারদ্বয়কে ধ্যান করিলেন। কুন্তী মন্ত্র দ্বারা তাঁহাদের আহ্বান করায় তাঁহারা মাদ্রীকে যমজ পুত্র দেন। পাণ্ডব-

গণের এই জন্ম অমানুষিক ব্যাপার বটে, কিন্তু তাঁহাদের বহু পরেও যাহারা স্বীয় গুণে মনুষ্যজাতির উপাস্য হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ অমানুষ-জন্মের উল্লেখ হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্ত, আধুনিক মনুষ্য জগতের উপাস্য 'পরমহংস সিদ্ধ যিশুর জন্মগুণান্তও এইরূপ অলৌকিক। তাঁহার মাতাও জন্মজন্মার্জিত পুণ্যফলে বিনা পুরুষসংযোগে কুমারী দশায় পরম ভাগবত যিত্তকে গর্ভে ধারণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন। হে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-পুস্তকগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন যে যদি প্রভু যিশুর দৈবজন্ম বিশ্বাস করিতে পারেন, যুধিষ্টিরাতির এই দৈবজন্ম কেন অবিশ্বাস করিবেন

যাহারা যিশুর অলৌকিক জন্ম বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও ঐ জন্মবশতঃ যিশুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করেন না। ঐরূপ দৈবজন্ম অতিরঞ্জিত বলিতে হয় বলুন, কিন্তু তা বলিয়া যে যুধিষ্টিরাতির অস্তিত্ব ছিল না ইহা বলা যায় না। যে সমস্ত কুতর্কিক যিশুর অস্তিত্বেও সন্দিহান, তাঁহাদের নিকট যদি আমরা প্রমাণ দিতে পারি যে যুধিষ্টিরাতি যথার্থই ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও বিশ্বাস করা উচিত।

কৃপ, কৃপী, দ্রোণ, ধার্ত্তরাষ্ট্র, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মও অলৌকিক। অনেকে বলিতে পারেন যে যদি কেবল পাণ্ডবদের জন্ম অলৌকিক হইত, তাহা হইলে তাহা না হয় অতিরঞ্জিত বলিয়া ঐ অংশ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ইতিবৃত্ত বিশ্বাস করিতাম,

কিন্তু মহাভারতের অধিকাংশ চরিত্রেরই যখন জন্ম অলৌকিক তখন ভারতীয় ইতিবৃত্তকে কবির করুণা ভিন্ন আর কি বলিব? তাঁহারা বলিতে পারেন যে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে একশত পুত্র হওয়া এবং গান্ধারীর একটা মাংসপিণ্ড প্রসব করা ও সেই মাংসপিণ্ডকে ব্যাসের বিভাগ করা এবং তাহা বিহঙ্গডিঘের ছায়া ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠা ঠাকুরমার গল্প। সেইরূপ শরবনে পতিত বীৰ্য্য হইতে রূপ ও কৃপীর জন্ম, দ্রোণে পতিত ভরদ্বাজের বীৰ্য্য হইতে দ্রোণের জন্ম এবং যজ্ঞবেদি হইতে যজ্ঞ ও উপযাজের আছতিবলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যাজ্ঞসেনীর জন্মও উপকথা মাত্র। সত্য বটে, জগতে সাধারণতঃ যে নিয়মে মনুষ্য আসে, সেই নিয়ম অনুসারে বলিতে গেলে ঐরূপ জন্ম সম্ভব নহে; কিন্তু পরমায়ার শক্তি বিশ্বতোমুখী। ভক্ত কবি যে গাইয়াছেন “অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব; প্রহ্লাদে রাখিতে স্তুভেতে উদ্ভব” তাহা মিথ্যা নহে। প্রকৃতির শক্তির সীমা নাই। দেখুন কিছুদিন পূর্বে মনুষ্য উড়িতে পারে বলিলে কতই উপহাস করিতেন; রাবণের পুষ্পকরথ শুনিয়া কতই হাসিতেন, রাবণ অগ্নিকে ও বায়ুকে বাঁধিয়া ছিলেন ইহা পাঠ করিয়া উপকথা মনে করিতেন। কিন্তু এফণে উড়বার যন্ত্র আবিষ্কৃত দেখিয়া, বৈদ্যাতিক আলোক ও বৈদ্যাতিক তালবৃত্ত দেখিয়া বায়ুক্রির কথা সম্ভবপর মনে করিতেছেন। বিজ্ঞানের বলে যত অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার হইতেছে ততই অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। আধুনিক

বৈজ্ঞানিক প্রথা •ও প্রাগৈন ঋষিদের প্রথার পার্থক্য এই যে, বৈজ্ঞানিক প্রথা এক জড়শক্তির দ্বারা অপর জড়শক্তির জয়। ঋষিগণের প্রথা ছিল যে প্রকৃতির কারণীভূত চিহ্নিত্তি দ্বারা প্রকৃতিকে জয়। তাহাও যে কতক সম্ভব ইহা হরিদাস সাধু, ত্রৈলোক্যস্বামী, ভাস্করানন্দস্বামী, বামা ক্রোপা বাবা প্রভৃতি আধুনিক সাধুগণ দেখাইয়াছেন। স্মৃতরাং কি ব্যাসের, কি ভরদ্বাজের, কি যাজ্ঞ উপবাজের তপোবলে যে ঐরূপ অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা অসম্ভব নহে। আর তপোবল বিশ্বাস না করিলেও মহাভারতের মূল অংশ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

মহাভারতের মূল ইতিবৃত্ত

কুরুপাণ্ডবগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত মহাভারতের বঙ্গীয় সংস্করণের ৬১ অধ্যায়ে দেওয়া আছে। ১ম অধ্যায়েও ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ মুখে মূল ঘটনা সন্নিবেশিত। মূল ইতিবৃত্ত এই যে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ত বালিয়া রাজ্য পান নাই। পাণ্ডু রাজ্য হইয়া দিগ্বিজয় করতঃ সম্রাট হন। পরে 'নির্বেদনপ্রযুক্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া তিনি কুন্তী ও মাদ্রী এই দুই পত্নী সমভিব্যাহারে বাণপ্রস্থান অবলম্বন করেন ও হিমালয়ের উত্তরে শতশৃঙ্গ পর্বতে মুনিগণের সহিত বাস করেন। তথায় তপস্তার ফলে দেববরে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এবং মাদ্রীগর্ভে নকুল ও সহদেব পাণ্ডুর এই পঞ্চ পুত্র হয়। তাহাদের বাল্যাবস্থায় পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে মাদ্রী সংমৃত্য হন। কুন্তী ও পঞ্চ

পাণ্ডবকে ঋষিগণ হস্তিনাপুরে দিয়া যান। ধৃতরাষ্ট্র ও ভীম তাহাদিগকে পাণ্ডুপুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি বহু পুত্র হয়। কুরু-বালকদের শিক্ষার ভার কুপের উপর পড়ে। অল্পদিন কুপাচার্য্যের নিকট শিক্ষা পাইবার পরই কুপের ভগ্নীপতি দ্রোণ উহাদের আচার্য্যরূপে ব্রতী হন। দ্রোণের নিকট উহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। শিক্ষাওণে অর্জুন আচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য হন। কুরুবালকদের সাহায্যে দ্রোণ দ্রুপদকে জয় করিয়া, দ্রুপদ যে তাঁহাকে পূর্বে অপমান করিয়াছিলেন তাহার প্রতিশোধ লন; কিন্তু ওদার্য্যবশতঃ তাঁহার রাজ্য তাঁহাকেই দেন। দ্রুপদ বৈরনির্য্যাতন আশায় দ্রোণবাচী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞফলে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্র ধৃষ্টহাস্য দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিলে, তাঁহাকে হস্তা জ্ঞানিয়াও, গুরু দ্রোণ তাঁহাকে শিষ্যে গ্রহণ করেন। কন্যা কৃষ্ণবর্ণা থাকায় কৃষ্ণা ও যজ্ঞফলে হওয়ায় যাজ্ঞসেনী নাম পান। এদিকে পাণ্ডবগণের শৌর্য্যবীৰ্য্য দর্শনে দুর্যোধনের দীর্ঘাবহি প্রজ্জ্বলিত হইল। তাহাদের বধ-সাধন জন্য দুর্যোধন বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অসহুদেহ সফল হইল না। ধার্মিক ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। তখন কূটবুদ্ধি দুর্যোধন নিরীহ পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার অভিপায়ে বারণাবতে পাঠাইলেন। বিদুরের সাহায্যে পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু বাহিরে প্রচার

হইল যে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব দক্ষ হইয়াছে। পথে ঘোর নিশীথে বনে হিড়িম্বকে ভীম নিপাতিত করিয়া হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। হিড়িম্বার সহিত বিবাহ কবির কল্পনা বলিতে হয় বলুন, তাঁহার গর্ভে ঘটোৎকচের উৎপত্তি অমাহুষিক নহে।, পরে পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ-বেশে একচক্রানগরে আসিয়া ব্রাহ্মণ-গৃহে অতিথি হইয়া বক রাক্ষসকে বধ করতঃ ঐ প্রদেশ নিরুপদ্রব করিয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইলেন। অর্জুন ব্রাহ্মণ-বেশে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চভ্রাতার বিবাহে দ্রুপদ প্রথম সম্মত হইলেও পরে ব্যাসদেবের কথায় তাহা স্বীকার করিলেন। তখন পাণ্ডবগণের প্রকাশ হইল। বিদুরের মন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে প্রত্যাশ্রয়ন করতঃ তাঁহাদিগকে খাণ্ডবপ্রস্থ ও দুর্যোধনকে হস্তিনাপুরের সিংহাসন-দ্বিতে প্রজ্ঞাব করিলে ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির তাহাতেই সম্মত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থের অরণ্য কাটিয়া রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ পত্তন করিলেন। ক্রমে পাণ্ডবগণের শৌর্য্যবীর্য্যে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রধান হইয়া উঠিল। ভীমার্জুন নকুল সহদেব দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নিখিল আর্য্য-অনার্য্য রাজবর্গকে পরাজিত করিয়া অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে সম্রাটপদভাক্ করাইল। রাজস্বয় যজ্ঞের অধিষ্ঠান হইল। পাণ্ডব-গণের ঐশ্বর্য্য ও গৌরবে পাপী দুর্যোধনের ঈর্ষা আবার জ্বলিল। তখনশকুনি কর্ণ প্রভৃতি কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় কুচক্রী দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দূতে আহ্বান করতঃ তাঁহার রাজ্যধনজন প্রভৃতি কাড়িয়া লইলেন। যুধিষ্ঠির আত্মহারা

হইয়া শেষে আপনাকে ৩০ চারি ভ্রাতাকে এমন কি পত্নী দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণ করিয়া খেলিলেন ও হারিলেন। দ্রৌপদীর উপর দুঃশাসন অনার্য্য ব্যবহার করিলেন। তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়বালার উজ্জিতে ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞানোদয় হইল। তিনি নিজ কুপুত্রকে তিরস্কার করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাদি ফিরাইয়া দিলেন। গৃহ-বিবাদ যেন মিটিয়া গেল। কিন্তু বিধির নির্বন্ধে আবার সব ঘুরিয়া গেল। আবার দ্যুতক্রীড়া হইল। পণ রহিল—যে পক্ষ পরাজিত হইবেন সেই পক্ষ রাজ্যচ্যুত হইয়া দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন এবং অজ্ঞাতবাসকালে জ্ঞাত হইলে পুনরায় ঐরূপ দ্বাদশবর্ষ বনে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ব্যবস্থা হইল। যুধিষ্ঠির হারিলেন। ভারতের দুর্দিন আসিল। এই গৃহবিবাদে যে অনল জ্বলিল, তাহাতে নিখিল ভারতের ক্ষত্রিয়-শক্তি পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল। বিদুর ইহা বুঝিয়াছিলেন তাই তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু দৈবের বিচিত্রগতি; ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির স্বীয় সত্য পালন করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষের পর স্বরাজ্য ফিরিয়া চাহিলেন। পাপী দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি দিতে চাহিলেন না। উভয় পক্ষ যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিলেন। ভারতের যাবতীয় ক্ষত্রিয়জাতির এমন কি আর্য্যসমাজের আশ্রিত অথচ সেই সমাজ বহির্ভূত দরদ পল্লব চীন হুন প্রভৃতি জাতিও যুদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলেন। কুরুরাজ্যের জন্ত যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল তাহার ফলে ভারত হীনবীর্য্য হইয়া

পড়িল। এই ভীষণ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি কৌরব-সেনাপতি পদে বৃত্ত হইলেন ও একে একে প্রাণ দিলেন। উভয় পক্ষের লোক-সংক্ষেপে তদানীন্তন স্তম্ভ জগৎ নিস্তেজ হইল। দুর্ঘোষনও প্রাণ হারাইলেন।

দুর্ঘোষনের মৃত্যু ঘটিলে জয়োল্লাসে বীরগণ অসাবধান হইয়া শিবিরে শয়ন করিলেন, সেই সুযোগে অশ্বখামা, কুপ ও দ্রোণ নিশীথে তক্ষকের আয় প্রবেশ করিয়া স্তম্ভ বীরগণকে হত্যা করিলেন। দ্রোণদীর পঞ্চপুত্রও হত হইল। সৌভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি ও কৃষ্ণ অপর স্থানে শয়ন করায় রক্ষা পাইলেন। পর দিন অশ্বখামা ভীমার্জুন হস্তে পরাজিত হইলেন, কিন্তু গুরুপুত্র বলিয়াই প্রাণে রক্ষা পাইলেন। যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিগণের ঔর্ধ্বদেহিক কার্যাদি করাইলেন, অন্ধ জ্যেষ্ঠাতা ও জ্যেষ্ঠাতাপত্নীর এবং কুরুনারীগণের দশা দেখিয়া আত্মীয়-বধ হেতু তিনি কাতর হইয়া পড়েন। কৃষ্ণের ও ব্যাসের বাক্যে তাঁহার ঐ মোহময় নির্বেদ অপগত হইলে, তিনি শুভদিনে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বিহুর সঞ্জয় প্রভৃতি

মন্ত্রিত্ব পাইলেন। ভীমাদির উপর কার্যের ভার পড়িল। প্রাণপণে তাঁহারা প্রজা-স্বরঞ্জে ব্যাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজের শাসন গুণে ধরায় আবার ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল। এইরূপে অনেক বৎসর কাটিবার পর যদুবংশ সুরাধিবীর প্রভাবে আত্মকলহে ধ্বংস হইল। শ্রীকৃষ্ণও ভৃঙ্গুর হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যুধিষ্ঠির সেই সংবাদে ব্যথিত হইয়া অভিমত্কার পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতঃ পঞ্চভ্রাতা ও দ্রোণদীর সহিত মহাপ্রস্থান করিলেন।

মহাভারতের এই মূল বৃত্তান্তে অবিখ্যাস করিবার কোন হেতু নাই। ইহার প্রতি বিশ্বাস ভারতে চিরদিন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। পাণ্ডবগণের চরিত্র মহনীয় এবং তাঁহাদের অবদান, অদ্বিত। শৌর্য্য, বীর্য্য ও ধর্ম্মে পঞ্চ-পাণ্ডব ভারতবাসীর উপাশ্রয়। তাঁহাদের জন্ম বিবরণে ও কর্ম্মে যে অলৌকিকতা, তাহার কারণ বৃত্তিতে হইলে, মনে রাখিতে হইবে যে মহাভারত-কাহিনী তাঁহাদেরই বংশধর অবিচলিত প্রতাপ নরপতি জন্মেজয়ের নিকট কীর্ষিত হইয়াছিল এবং সে কাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ভক্তিপ্রাণ ভারতে মহাপুরুষদিগের চরিত্র কীর্তন।

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

করক *

ছোট গল্পের, প্রধান একটা লক্ষণ এই যে, তাহা একদিকে যেমন সরস ও কুতূহলো-

শ্রীযুক্ত স্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ছোট গল্পের বহি।
মূল্য ৯০ কলিকাতায় প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

সম্মুখে কোনও প্রকারের অবসাদ পশ্চাতে রাখিয়া যাইবে না। বাসন্তী বনহলীর বরণ-কিরণ-সৌরভ-সম্ভার লোকে যেমন সহজে সম্মোগ করে, দেখে আর মুগ্ধ হয়, আর সন্ধ্যাসমাগমে নগরের ধূলিকোলাহল-পূর্ণ জনতার মধ্যে ফিরিয়া আসিলে, কেবল সেই সম্মোগের স্নিগ্ধ স্মৃতিটুকু মনে প্রাণে জাগিয়া থাকে, সাহিত্যে ছোট গল্পও সেইরূপ হইলেই সর্বোচ্চ উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। গড়া সাঙ্গ হইলে একখানি পরিষ্কার ছবি, একটা সংযত রস, একটা ভাবের হাওয়া, নীরবে, ধীরে, মাদকতা ও চাঞ্চল্য-শূন্য হইয়া মনের মধ্যে জাগিয়া থাকিবে।

বর্তমানে বঙ্গসাহিত্যে ছোট বড় অনেকেই ছোট গল্প লিখিতেছেন, এই সকল গল্প-সহরীর একটা "সবিস্তার সমালোচনা করিতে পারিলে, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের এই বিভাগেও বাঙ্গালী কতকটা কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। আর আমার মনে হয় যে, আজি কালি বিলাতে সচরাচর উচ্চাঙ্গের পত্রিকাদিতেও যে সকল ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়া থাকে, তার তুলনায় আমাদের ছোট গল্পগুলি সর্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া গৃহীত হইবে।

কিছুদিন হইতে ইংরেজি সাহিত্যে এক জাতীয় বর্ষের রস অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া বোধ হয়। অসভ্য লোকেরা রসের নিত্যন্ত বাহ্যপ্রকাশকেই সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মোগ করিয়া থাকে। দৃশ্যে বর্ণের আতিশয্য, কথ্যে আক্ষালনের প্রাবল্য, এগুলিতেই বর্ষেরসাধনা-সুলভ

রসের বিশেষ প্রকাশ হইয়া থাকে। আর আজি কালি বিলাতের কি রঙ্গমঞ্চে কি সাহিত্যক্ষেত্রে এই colour and actionটা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যে সংযম উচ্চাঙ্গের রস-সম্মোগের প্রধান অঙ্গ, যে সমাহিত ভাবের ভিতর দিয়াই গভীরতম রসের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সেখানে আজি কালি চারিদিকেই তাহার একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই জন্ত গল্পের রাজ্যে অসংযত কল্পনার আশ্রয়ে Penny Dreadfulএরই প্রসার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। মাসিকে, সাপ্তাহিকে, এমন কি দৈনিক সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত, এ জাতীয় গল্পের ছড়াছড়িতে ইংরেজের রুচিবিকার জন্মিতেছে। ফলতঃ হার্পার প্রভৃতি মার্কিনী মাসিকপত্রে যে সকল ছোট বড় উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে, সাহিত্যকলার দিক দিয়া বিচার করিলে, বিলাতের মাসিকপত্রে তেমনটা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আর বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যেও যে এ বিষয়ে এতটা হীনতা দেখা যাইতেছে, ইহার অনেক কারণ আছে সত্য, কিন্তু তার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ বোধ হয় এই যে যাবতীয় সাহিত্য-চেষ্টার মধ্যে ছোট গল্প লেখা সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ।

আর এটা এমন কঠিন কাজ এই জন্য যে এখানে বহুবিধ অবাস্তব বিষয়ের সাহায্যে লেখক কিছুতেই আপনাদের অন্তরের কবিকল্পনার নিজস্ব দীনতাকে ঢাকিয়া রাখিবার অবসর পান না। ইহার তুলনায় একটা বড় গল্প লেখা অনেকটা সহজ।

কারণ সে ক্ষেত্রে বর্ণনা-বাহুল্যে নানাবিধ আত্মসজ্জিক চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া, গল্পের প্রাণভূত যে লোক-চরিত্র, তাহা কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না উঠিয়াছে, সে মূল প্রশ্নটা কিয়ৎ পরিমাণে চাপিয়া রাখিতেও বা পারা যায়। বিশেষতঃ লেখকের যেখানে অনন্তসাধারণ শব্দসম্পদ থাকে, যেখানে তিনি কবিতার ভাষার সাহায্যে আপনার বর্ণনাদিতে বিবিধ ব্যাভিচারী রস ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, সেখানে গল্প হিসাবে কোনও গ্রন্থ অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও, শুদ্ধ আঁশনার রচনা-নিপুণতাগুণে, তাহা লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়া সাধারণ সাহিত্যে একটা অল্পবিস্তর স্থায়ী স্থানলাভ করিতেও পারে। কিন্তু ছোট গল্পে ইহার কোনওই সম্ভাবনা নাই। চিত্রকলায় যাহাকে pastel drawing or chalk drawing বলে, সাহিত্যকলায় ছোটগল্প অনেকটা তারই সমশ্রেণীর। পেট্রোলাস্কনে লোকবিশেষের প্রতিকৃতিকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গোটাকতক জ্বল রেখার সাহায্যে, পরিষ্কার রূপে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ছোটগল্পেও ঠিক সেইরূপ। এখানে গুটিকতক ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া, অতি অল্প পরিসরের মধ্যে, দুচারিটা লোকের ভিতরকার প্রাণটাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, নতুবা সার্থকতা লাভ হয় না। এই জাতীয় ছোটগল্প রচনায় বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে, আমার মনে হয়, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে পরিমাণে কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন, আর কেহ তাহা করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

সুধীবাবুর গল্পের একটা প্রধান গুণ এই

যে, এগুলি প্রায়ই অতিশয় ছোট। “করকের” প্রথম গল্পটা স্বল্পায়তন পৃষ্ঠার চৌদ্দটা পৃষ্ঠা মাত্র পূর্ণ করিয়াছে। পড়িতে বোধ হয় ১০।১২ মিনিট সময় লাগে। অথচ এই সামান্য চিত্রপটে, দুই তিনটা ঘটনার সাহায্যে, তিনি (১) দরিদ্র ভদ্র বিধবা স্ত্রীবোধের মা (২) জমিদার-পত্নী ‘হাবলা’র মা, (৩) স্ত্রীবোধ (৪) হাবলা—এই চারিটা চরিত্রকে কেমন উজ্জ্বলরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এঁরা সকলেই যেন আমাদের পরিচিত, কতবার যেন ইঁহাদের দেখিয়াছি, কতদিন যেন ইঁহাদের চরিত্রের আলোচনা করিয়াছি। ভদ্রগৃহস্থের বিধবাটী কিরূপে সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া আপনার একমাত্র পুত্রটিকে প্রতিপালন করিতেছেন, জমিদার-গৃহিণীর ইদানীন্তনলব্ধ ধনের মত্ততায় কত প্রাচীন আভিজাত্য-মর্যাদা পদদলিত হইতেছে, আর এঁদের পুত্র দুটা এইরূপ বৈষয়িক অবস্থার বৈষম্য সহ্যও, কেমন সরলভাবে, কতটা ঔদার্য্য সহকারে, পরস্পরকে কত না ভালবাসে,—এ সকল যেন আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হইয়া আছে—সুধীবাবুর ‘মিতে’ পড়িতে পড়িতে তাহাই মনে হয়। এখানে কিছুই অলৌকিক, কিছুই বিস্ময়কর, কোনও কিছুই প্রতিদিনের জীবনের অভিজ্ঞতার বাহিরের কথা নাই। অথচ আত্মোপাস্ত কেমন চিত্তাকর্ষক!

যেমন তাঁর “মিতে” সেইরূপ “কাসিমের মুরগী”ও অতি ছোট, অতি সরল, অতি সরল, অথচ অতিশয় কলাকুশলতাপূর্ণ একটা

চিত্র। এখানেও একটা বালক ও তার মাতা, কটা এক বৃদ্ধ, ও গোটা দুই তিন মুরগী, এই মাত্রই গল্পটির সরঞ্জাম। আর ইহার সাজ-সজ্জারও কোনও আতিশয্য বা বাহুল্য নাই। কিন্তু ছবিটা যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একান্তই নিখুঁত। দুখানি কাটি নাড়িয়া বাজিকর যেমন কত কি না দেখায়, সুধীবাবুও সেইরূপ দুচারিটা সামান্য বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনাকে নাড়িয়া চাড়িয়া এই অদ্ভুত সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ ইহাতে ঐন্দ্রজালিক কিছুই নাই। তাঁর প্রত্যেক ঘটনাটী, প্রত্যেক মানুষগুলো, নিরেট সত্য। সর্বদাই এ সকল ঘটনা ঘটতেছে। সর্বত্রই এ লোকগুলো চলা ফেরা করিতেছে। আর এই স্বাভাবিকতার দরুণই সুধীবাবুর এই গল্পগুলি এমন অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

তার পর “ঠাকুর দেখা”। এই গল্পটিতে সুধীবাবু আপনার কবিপ্রতিভার আর একটা দিক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। “মিতে” ও “কাসিমের মুরগী” এই দুইটা গল্পের রসেতে জটিলতা বড় নাই। দুইটির মধ্যেই সখ্যরস ফুটিয়াছে। কারণ বালক কাসিমের মুরগী ক’টা তার খেলারই সঙ্গী ছিল। কিন্তু “ঠাকুর দেখা” শীর্ষক গল্পে, সুধীবাবু গভীরতর ও জটিলতর স্ত্রী-চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন। এ গল্পের অবলম্বন ও আশ্রয় সখ্য নহে কিন্তু মাধুর্য্য। “ভগবতী” ধনগর্ব্বিতা, মুখরা, অপ্রিয়ভাবিণী, সকলই সত্য। এইজন্ত সরলচিত্ত, উদারহৃদয়, ধর্ম্মপ্রাণ “মহেন্দ্র” বড় হৃৎখে তাঁহাকে ভাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু “ভগবতীর”

শত দোষ সবেও, সে নারী, পতিপ্রেম-পিয়াসিনী। কি করিয়া সে প্রেম পাইতে হয়, বেচারী তাই জানিত না। অবোধ বালকে যেমন সুমিষ্ট কমলালেবু সযত্নে মুহুশ্বে ছাড়াইয়া খাইতে জানে না বলিয়া, সবটাই মুখে পুরিয়া দাঁত দিয়া চিবাইয়া, খোসার তিক্তরসে বিরক্ত হইয়া, তাহা “থু থু” করিয়া ছুড়িয়া ফেলে, অথচ সে নেবুর প্রতি যে তার লোভ ছিল না বা নাই, এমন নহে; হতভাগিনী “ভগবতী”ও তাহাই করিয়াছিল। তার অপ্রিয়ভাবণ, কলহ-মুখরতা, সকলই পতিপক্ষে ফলতঃ ও মূলতঃ মাধুর্য্যেরই বিকার ছিল। মহেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না। তাই মানিনীর মানও ভাঙ্গাইতে পারিলেন না। কিন্তু সে দুর্জয় মান, কেমন করিয়া, একদিন বালির বাঁধের মতন ভাঙ্গিয়া গেল, সুধীবাবু স্ননিপুণ তুলিকায় সে করুণছবিটা অঙ্কিত করিয়া,—ভগবতীর পূর্বজীবনের কর্কশতা ও যে প্রকৃতপক্ষে কেবল তাঁর প্রাণগত প্রেমেরই বিকৃতি মাত্র ছিল, ইহা চাক্ষুষ করিয়া তুলিয়াছেন। “মিতে” বা “কাসিমের মুরগী” পড়িয়া গভীরতর ও জটিলতর রসাক্ষনেও যে গ্রন্থকাবের এমন অসাধারণ নিপুণতা আছে, ইহা বোঝা যায় না। “ঠাকুর দেখা”তেই ইহার প্রমাণপরিচয় পাওয়া যায়।

“করঙ্কের” প্রায় প্রত্যেক চিত্রই “এইরূপ বিবিধ রস ফুটাইয়া পাঠকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। বাংলার সকল ছোট গল্পের বই যে আমি পড়িয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু যতটা পড়িয়াছি, তাহাতে সুধীবাবু বাংলাসাহিত্যে ছোট গল্পের লেখকশ্রেণীর মধ্যে অতিশয় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব বলিয়া মনে করি না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।



নিমাই-চরিত্র

নিত্যানন্দ সর্বদাই বালাভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। স্নেহাঙ্গনা মাগিনী দেবী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। নিতাই ক্রমে তাঁহার গুণগান করিতে আরম্ভ করিলেন। মাগিনী দেবী অসহায় শিশুর মত সদা সর্বদা তাঁহার সেবা করিতেন। নিতাই বালকের মত সকলের সহিত কলহ করিয়া বেড়াইতেন। তজ্জন্ম এক দিন নিমাই তাঁহাকে কহিলেন “নিতাই, এ বয়সে সকলের সহিত কলহ করা কি ভাল?” শুনিয়া নিত্যানন্দ “বিষ্ণু, বিষ্ণু” করিয়া উঠিলেন এবং নিমাইকে বলিলেন “আমি কি পাগল? আমি কি চঞ্চল? করিয়াছি বল দেখি?” নিমাই কহিলেন—“কেন অন্তরটি ত তোমার নিত্যকার্যের মধ্যে।” নিতাই উত্তর করিলেন “আমার দোষ ধরিয়া আমাকে ভাত দিবে না, ভাহার ছাড়া খুঁজিতেছ বুঝি” এই বলিয়া খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং উলঙ্গ হইয়া মত্তকে বস্ত্র বন্ধন করতঃ জোড়ে জোড়ে লম্ফ দিতে লাগিলেন। তখন গৌর তাঁহাকে ধরিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন।

একদিন শ্রীবাসের গৃহ হইতে একটা পিতলের বাটা কাকে লইয়া যায়। বাটাটা গৃহদেবতার স্মৃতিপাত্র ছিল। ঠাকুরের পাত্র কাকে নিয়াছে, এই কথা শ্রীবাস

জানিতে পারিলে ক্রুদ্ধ হইবেন মনে করিয়া মালিনীদেবী কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় নিতাই আসিয়া সমস্ত অবগত হইয়া কাককে বাটা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। তখন কাক বাটা আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

একদিন বিষ্ণুপ্রয়ার সঙ্গে গৌর নিজগৃহে আলাপের ত আছেন এমন সময় দিগম্বর বেশে নিত্যানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন “উলঙ্গ হইয়াছ কেন?” নিত্যানন্দ কেবল “হয় হয়” বলিতে লাগিলেন। গৌর বলিলেন “কাপড় পর।” নিতাই বলিলেন “আমি আজি চলিয়া যাইব।” গৌর বলিলেন “এ কি করিতেছ?” নিতাই উত্তর করিলেন “আর খাইতে পারি না।”

গৌর—জিজ্ঞাসা কর এক, জবাব দেও আর, এর মানে কি?

নিতাই—শবার খাবো।

গৌর তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “নিতাই সাবধান, শেষ আমাকে ছুঁতে পারিবে না।”

তখন নিতাই বলিলেন “এখানে ত খাট নাই।”

গৌর পুনরায় মিনতি করিয়া বলিলেন “নিতাই দয়া করিয়া কাপড় পর।”

নিতাই—আমি ভোজন করিব।

অপারগ হইয়া গৌর নিতাইকে ধরিয়া
কাপড় পরাইয়া দিলেন।

শচীদেবী সকলই দেখিয়াছিলেন, তিনি
তখন নিতাইকে লইয়া ভোজন করাইতে
বসিলেন। নিতাই কিছু খাইলেন—কিছু
ছড়াইয়া ফেলিলেন। শচী তাহাতে তিরস্কার
করায় নিতাই বলিলেন “ফেগিবানা, এক
টাই দিলেন কেন?”

শচী—আর ত ঘরে কিছুই নাই—আর
এখন কি খাবে?

তখন নিতাই বলিলেন “তুমি ঘরে গিয়া
দেখ—নিশ্চয়ই সন্দেশ আছে।” শচীদেবী
গৃহ মধ্যে গিয়া দেখিলেন “চারিটা সন্দেশ
রহিয়াছে।” বিস্মিত হইয়া সেই সন্দেশ
আনিয়া শচীদেবী নিতাইকে প্রদান
করিলেন, নিতাই আনন্দে তাহা ভক্ষণ
করিলেন।

নিতাইকে গৌর এমনি শ্রদ্ধা করিতেন
যে এক দিন নিতাইএর নিকট হইতে
তাহার একখানা কোপিন লইয়া শত
ধণ্ড করতঃ ভক্তগণ মধ্যে বিতরণ করিলেন
এবং ভক্তির সহিত তাহার পূজা করিতে
এবং নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিতে,
সকলকে উপদেশ দিলেন।

শ্রীবাসের গৃহে সংকীর্তন চলিতে লাগিল।
প্রত্যহ যাবতীয় ভক্ত সমাগত হইতেন
এবং গৌর ও নিত্যানন্দকে বেটন করিয়া
উন্মত্তভাবে কীর্তন করিতেন। একদিন
সংকীর্তন কালে, নিমাই হঠাৎ ভাবাবিষ্ট
হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীবাস-ভ্রাতা রামাঞ্জন
পশ্চিমতক ডাকিয়া কহিলেন “রামাঞ্জন,

তুমি শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতকে বল ‘যাহার
জন্ত বিস্তর আরাধনা করিয়াছিলে, যাহার
জন্ত কতন’ ক্রন্দন করিয়াছিলে, যাহার জন্ত
কত দিন উপবাস করিয়াছিলে, তিনি
প্রকাশিত হইয়াছেন। তোমারই জন্ত তিনি
ভক্তিয়োগ বিতরণ উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ
হইয়াছেন—তুমি শীঘ্র আসিয়া তাহাকে
দেখিয়া যাও।’ নিত্যানন্দের আগমনবার্তাও
তাহাকে জানাইবে এবং আমার পূজো-
পকরকণ সহ তাহাকে সন্মুখ আসিতে
অনুরোধ করিবে।” রামাঞ্জন কাল বিলম্ব
না করিয়া, শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে গমন
করতঃ সমস্ত তাহাকে নিবেদন করিলেন।
শুনিয়া আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া
পড়িলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে রামাঞ্জনের
উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন
“কোণায় গোশাঞ্জন আইলা মাহুষ ভিতরে।
কোন্ শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতরে ॥”

কিন্তু পরক্ষণেই আবার রামাঞ্জনকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বল বল রামাঞ্জন,
কেন তুমি আচম্বিতে আমার গৃহে আগমন
করিলে?” তখন রোদন করিতে করিতে
রামাঞ্জন বলিলেন “আমি আর কি বলিব?
তুমি ত সকলই জান?”

যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।

যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন ॥

যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।

সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ ॥

ভক্তিয়োগ বিলাইতে তাঁর আগমন।

তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্তন ॥”

তখন আচার্য্য উর্দ্ধবাহ হইয়া কাঁদিতে
লাগিলেন; উদ্বেলিত আনন্দবেগ ধারণে

অসমর্থ হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া “প্রভুকে আমিই আনিয়াছি” বলিয়া হুকার করিয়া উঠিলেন এবং “আমারই জ্ঞান আমার প্রাণনাথ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিয়াছেন” বলিয়া ভূতলে লুপ্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আচার্য্য বলিলেন—“রামাঞ্জন, যদি তিনি আমারই প্রভু হন, তাহা হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য তিনি আমাকে নিশ্চয়ই দেখাইবেন। তাহা যদি দেখিতে পাই, আমার মস্তকে যদি চরণ তুলিয়া দেন, তবে জানিব তিনিই আমার প্রাণনাথ।” এই বলিয়া পূজার সমস্ত উপকরণ লইয়া সপত্নীক রামাঞ্জনের সচিত্র নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে কি ভাবিয়া রামাঞ্জনকে বলিলেন “আমি নন্দন আচার্য্যের গৃহে গিয়া লুকাইয়া থাকিব; তুমি গিয়া প্রভুকে বলিবে অদ্বৈত আসিল না।” এই বলিয়া অদ্বৈত নন্দন আচার্য্যের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীবাসগৃহে গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সহ বসিয়া আছেন। অকস্মাৎ হুকার করিয়া বিষ্ণুখটায় উঠিয়া বসিলেন এবং “নাড়া আসিতেছে, নাড়া আসিতেছে, নাড়া আমার ঠাকুরভাব দেখিতে চাহিতেছে” বলিতে লাগিলেন। তখন নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন—গদাধর তাম্বুল কর্পূর প্রদান করিলেন, ভক্তগণ যুক্ত করে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামাঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামাঞ্জন কোনও কথা বলিবার পূর্বেই গৌরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন “আমাকে পরীক্ষা করিবার জ্ঞান

নাড়া তোমাকে পাঠাইয়াছে। নন্দন আচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া থাকিয়া আমার পরীক্ষার জ্ঞান তোমাকে পাঠাইয়াছে। তুমি এখন ফিরিয়া গিয়া তাহাকে লইয়া আইস। রামাঞ্জন তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতকে আনিতে ছুটিলেন। অদ্বৈত সমস্ত ভনিয়া আনন্দিত চিত্তে শ্রীবাসগৃহে আগমন করিলেন, এবং দূর হইতে স্তবপাঠ করিতে করিতে সপত্নীক গৌরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বাক্যগোধ হইল—দেখিলেন জ্যোতির্ময়দহ বিশ্বস্তর বিধরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, দেবগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন, অনন্ত তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়া আছেন। তখন স্তম্ভিত আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া গৌর জিজ্ঞাসিলেন “কি দেখিতেছ আচার্য্য! তোমারই কাতর গোদনে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।” তখন অদ্বৈত নানাভাবে গৌরের স্তব করিয়া সম্রাট তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। ভক্ত-বৎসল গৌরও অদ্বৈতের মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়া তাহাকে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। তখন সেই ভক্তগণ মধ্যে প্রেমের বহা প্রবাহিত হইল। সংকীৰ্ত্তনে মত্ত হইয়া সকলেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যান্তে আপনার মালা অদ্বৈতের গলায় অর্পণ করিয়া গৌর কহিলেন “আচার্য্য, তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর।” তখন নিষ্কামযোগী ভক্ত-রাজ অদ্বৈতাচার্য্য কহিলেন “আর কি বর চাহিব? যাহা চাহিয়াছি সকলই পাইয়াছি।”

তোমার সাক্ষাতে করি আপনে নাচিহুঁ ।
চিন্তের অভীষ্ট যত সকলি পাইহুঁ ॥
কি চাহিমু প্রভু কি বা শেষ আছে আর ।
সাক্ষাতে দেখিহুঁ প্রভু তোর অবতার ॥
কি চাহিমু কি বা নাহি জানহ আপনে ।
কি বা নাহি দেণ তুমি কি বা দরশনে ॥

কণকাল পরে পুনরায়—

অদ্বৈত বোলেন যদি ভক্তি বিলাইবা ।
জী শূদ্র আদি যত মুখেরে সে দিবা ॥
বিদ্যাধন কুল আদি তপস্কার মদে ।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যেচে মনে বাধে ॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরণ পুড়িয়া ।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা ॥”

একদিন সংকীর্ণনাস্তে উপবিষ্ট হইয়া
গৌর “পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি” বলিয়া
অবিরাম রোদন করিতে লাগিলেন ।
পুণ্ডরীক শ্রীকৃষ্ণের নাম । ভক্তগণ প্রথমে
ভাবিলেন বৃষ্ণি বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই গৌর
রোদন করিতেছেন, কিন্তু বিদ্যানিধি উপাধি
শুনিয়া তাঁহারা সংশয়াপন্ন হইয়া, গৌর
প্রকৃতিস্থ হইলে ক্রিষ্ণাসা করিলেন কাণ্ডার
জন্ত তিনি রোদন করিতেছিলেন । তখন
গৌর বলিলেন “পুণ্ডরীক চট্টগ্রামে ব্রাহ্মণ-
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তিনি বাহ্যিক
বিষয়ীর আচার পালন করেন—কিন্তু অন্তরে
তাহার মত ভক্ত হৃদয় । তাহার অদর্শনে
আমি বড় কষ্ট ভোগ করিতেছি ।”

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে পুণ্ডরীক
বিদ্যানিধি বহুসংখ্যক দাস দাসী সমভি-
বাহারে নবদ্বীপে সমাগত হইলেন ।
যুকুন্দ দত্তের নিবাস চট্টগ্রামে । তিনি
বিদ্যানিধিকে জানিতেন । একদিন প্রিয়-

বন্ধু গদাধরের সহিত যুকুন্দ বিদ্যানিধির
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত গমন করিলেন ।
গদাধর দেখিলেন বিদ্যানিধি রাজপুত্রের
ন্যায় মহামূল্য চন্দ্রাতপ তলে বিচিত্র আস্তরণ
শোভিত খট্টার উপর উপবিষ্ট আছেন ।
দুইজন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছ-নির্মিত পাখাদ্বারা
তাঁহাকে বাজন করিতেছে । বিদ্যানিধির
ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্য দেখিয়া গদাধরের
মনে অবজ্ঞার উদয় হইল । তখন যুকুন্দ স্বীয়
স্বাভাবিক সুরূপে ভাগবত হইতে আরম্ভ
করিলেন ।

“অহো বকী যং স্তনকালকূটং

জিঘাংসয়াহপায়য়দপ্যাসাধ্বী ।

লেভে গতিং ধাক্র্যচিতিং ততোহন্তং

কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেন ॥”

অসাধ্বী রাক্ষসী পুতনা যাহার বধেচ্ছায়
কালকূটসম্পৃক্ত স্তন তাহাকে পান
করাইয়াও তাহার নিকটে তাহার ধাত্রীর
উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছিল তদপেক্ষা
দয়ালু আর কে আছে—যাহার শরণ লইব ?

এই শ্লোক পঠিত হইবামাত্র বিদ্যানিধির
নয়নে বজ্রা ছুটিল । তিনি প্রেমে পুলকিত
হইয়া “বোল বোল” বলিয়া নৃত্য করিতে
লাগিলেন । তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিনষ্ট হইল
এবং তিনি উন্নতের মত “কৃষ্ণের বাপের”
বলিয়া করুণ কণ্ঠে অবিরাম রোদন করিতে
লাগিলেন । এই দৃশ্য দেখিয়া গদাধর
বিস্মিত হইলেন—এবং দৈদৃশ ভক্তের প্রতি
অবজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া নিন্দাস্ত অমৃতপু
হইয়া স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত
তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিবার
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন । বিদ্যানিধি

পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ; দীক্ষার দিন স্থির করিয়া গদাধর মুকুন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন ।

সেইদিন রাত্রিকালে বিদ্যানিধি গৌর-চন্দ্রকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে অলক্ষিত বেশে শ্রীবাসগৃহে প্রবেষ্ট হইলেন, কিন্তু গৌরের দর্শন লাভ করিয়াই হতভিম হইয়া পড়িলেন । ক্ষণেক বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া “কৃষ্ণরে বাপরে” বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন । ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার কাতর ক্রন্দনে

সকলেই কাদিতে লাগিলেন । তখন বিশ্বস্তর অগম্য হইয়া বিদ্যানিধিকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং “বাপ পুণ্ডরীক আজি তোমাকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম” বলিয়া হৃদয়ের আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন । গৌরের নয়ন জলে বিদ্যানিধির দেহ সিক্ত হইল । গৌর বলিলেন “প্রেমভক্তি বিতরণ করিতে ইহার জন্ম । আজি হইতে ইহার নাম হইল পুণ্ডরীক প্রেমনিধি ।”

যথাকালে গদাধর প্রেমনিধির নিকট যত্নদীক্ষা গ্রহণ করিলেন ।

শ্রীতারকচন্দ্র রায় ।

জয়দেব ও বিদ্যাপতি

২

জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির বিষয়” বহু বিস্তৃত, কিন্তু জয়দেবে লালসার বৈরাগ্য উদ্ভাস গতি, ধৈর্য উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, বিদ্যাপতিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না । জয়দেবে পূর্বরাগ ও প্রথম মিলনের চিত্র নাই, আভাসে তাহাদের উপযোগী ভাবাবলীর নির্দেশ করা আছে মাত্র । জয়দেবে প্রবাসচিত্রও নাই, অতএব শতবর্ষব্যাপী প্রিয়বিরহ হেতু শ্রীরাধার দারুণ বাথার চিত্রও নাই । তাঁহার কাব্যের বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ; বসন্ত-সমাগমে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণিকের উদ্ভাস্তি বশতঃ তৎপ্রণয়বিধুরা শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া অল্প যুবতীরূপে সহিত আমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; সেই চিত্র শ্রীরাধা আপন চক্ষে দেখিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত খেদে কাতর হইয়া-

ছেন । শ্রীকৃষ্ণ ও ক্ষণিক মোহের অবসানে শ্রীরাধার জন্ম উদ্ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন । পরে সখীর সাহায্যে উভয়ের মিলন, মান-ভঞ্জন ও বিহার । সংক্ষেপতঃ এই কয়টি কথা লইয়া গীতগোবিন্দ বিরচিত । এই কাব্যের ভিতর নান তিনটি চরিত্র,—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও সখী । তাহার মধ্যেও আবার সখী নিজের কথা কহে না, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার কথাই কহে, অতএব বিস্তৃত ভাবে দুইটি হৃদয়ের কথাই গীতগোবিন্দে লিপিবদ্ধ । ইহাতে শাসনাদি নাই, সখীতে সখীতে সম্ভাষণ বা জল্পনা নাই, সুবাগ্মিতার সহায়তা গ্রহণ নাই, ছণ-কপটতা নাই, লুকোচুরি নাই, হেঁয়ালী-প্রবন্ধ নাই, আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ নাই ; আছে কেবল দুইটি হৃদয়ের প্রবল, সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার অনিবার্য

শ্রোত। গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই যে
ভালবাসার মুখে সকলই ভাসিয়া যাইতেছে।
বিদ্যাপতির পদাবলীতেও এই ভাব শেষ
কালে আসিয়াছে, কিন্তু সে বড় শেষে।
প্রথমে তাঁহার কাব্যে অনেক হাবভাব,
অনেক ছলচাতুরি, আত্মগোপন, সংসার ও
প্রেমের দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়।
কিন্তু গীতগোবিন্দ সে সকলের ধার ধারে
না।

গীতগোবিন্দের শ্রীরাধার চরিত্র লইয়া
বিচার আরম্ভ করা যাউক। প্রথমেই কবি
দেখাইয়াছেন যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণিক
বিরহেই কত কাতর; সেই স্বল্পক্ষণস্থায়ী
বিরহের ব্যথাও তিনি সহ্য করিতে না
পারিয়া বসন্তকুহুমসুকুমার দেহকে
প্রপীড়িত করিয়া বনে বনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ
করিয়া বেড়াইতেছেন, প্রবল চিন্তায় তাঁহার
মর্ম্ম ব্যাকুল হইয়াছে, আকাজক্ষায় হৃদয়
উদ্বিগ্ন হইয়াছে। জয়দেব কবি বসন্তের
কোকিলের পঞ্চম তানের মত সুমধুর সুরে
বসন্তের গান ধরিয়াছেন, সে গান শ্রীরাধার
বিরহব্যাপাররূপ অনলে ঘৃতসংস্পর্শের কাজ
করিয়াছে, আমাদের কাণের ভিতর দিয়া
প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে একটা মধুর আবেশের
সৃষ্টি করিয়াছে। ললিতলবঙ্গলতার
কোমল আশ্লেষে আজ মলয়সমীরণ উৎফুল্ল
হইয়া বেড়াইতেছে, গেই কোমলস্পর্শে
নিজেও কোমল হইয়াছে। আজ নিলজ্জা
পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া, গাছগুলোও ফুলের
হাসি হাসিয়া লইতেছে, এমন সরস
সময়ে—এমন দ্রুত সময়ে কি না

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে,

নৃত্যতি যুবতীজনেন সমং সখি।

বিরহিজনস্য দ্রুস্তে।

ফুরদতি মুক্তলতা-পরিরন্তণ-

পুলকিতমুকুলিত-চূতে।

বৃন্দাবন-বিপিনে পরিসর-পরিগত-

যমুনা-জল পূতে ॥

একে প্রকৃতির দৌরাভ্যা, তাহার উপর
প্রিয়বিরহ। তোমার হৃদয়ে দুঃখ আছে
বলিয়া বাতাস ফুলের রেণু ছড়ানও বন্ধ
করে না, এবং কেতকীর গন্ধ মাখিয়া
তোমায় গায়ে আঙন ছড়ানও বন্ধ করে না;
“ইহ হি দহতি চেতঃ” বলিয়া মধুকরনিকর
চূর্ণ করিয়া বসিয়া থাকে না, কোকিলও কুহু
কুহু রবে কিছু সকল মুখরিত করিতে ছাড়ে
না। কবি বসন্তের শোভা তিল তিল
করিয়া সখীর মুখ দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।
শুধু তাহাই নহে “চন্দনচর্চিত নীলকলেবর
পীতবদন বনমালী” যুবতীজনের সহিত
কিরূপ ভাবে ক্রোড়া করিয়াছেন, তাহারাই
বা কত হাবভাব প্রকাশ করিয়া তাহাকে
ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে, সখী তাহাও
রাধার কাছে পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে বর্ণনা
করিয়াছে, শ্রীরাধা সখীর সহিত দাঁড়াইয়া
দাঁড়াইয়া সেই সকল লীলা দেখিয়াছেন।
গীতগোবিন্দকে যে ভাবেই দেখা যাউক, এই
বর্ণনাগুলির যথেষ্ট সার্থকতা আছে। জয়-
দেবের সহজ কবিত্ব এই সকল বর্ণনায়
উছলিয়া উঠিয়াছে। এক একটা শ্লোকে
এক একটা নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।
ইহাদের বর্ণনায় কবির উদ্দেশ্য সেই স্বময়ো-
পযুক্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর যথাযথ
সংস্থাপন একটা environment এর সৃষ্টি।

সেই জ্ঞানই জয়দেব, শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে ইন্দ্রিয়া-
কর্ষণের সকল উপচার,—মন ভুলাইবার
সকল প্রকার উপায়—স্তরে স্তরে সাক্ষাইয়া-
ছেন, এবং সেই সকল অবস্থা ও দৃশ্য সখী
সহচারিণী শ্রীরাধাকে দেখাইয়াছেন। এই
মধুর উল্লাসময় বসন্ত কালে কোথায় প্রিয়-
বধু তাঁহার সহিত প্রেমরসে নিমগ্ন থাকিবেন,
তা না করিয়া কি না তিনি শত সুন্দরী
পরিবৃত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া—

মুগ্ধ বধুনিকরে

* * * বিলসতি কেলিপরে।

শুধু তাহাই নহে, রাধাকে সখী দেখাইতেছেন
যে শ্রীকৃষ্ণ

শ্লিষ্যতি কামপি চুষতি কামপি কামপি
রময়তি রামাম্।

পশ্চতি স শ্মিত চাক্র-পরামপরামমুগচ্ছতি
বামাম্ ॥

বৈষ্ণব যাহারা তাঁহারা জানেন যে 'এইরূপ
ঘটনা সংস্থাপনের কি উদ্দেশ্য, কিন্তু সে কথা
পরে বলিতেছি। যাহারা শুধু কাব্য
হিসাবেই গীতগোবিন্দকে দর্শন করিবেন
তাঁহারাও বুঝিবেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার
ভালবাসা। কুটাইবার জ্ঞানই কবি ছই
জনকেই এই পরীক্ষানলে ফেলিয়াছেন।

প্রথমে দেখা যাউক, এই বিসদৃশ দৃশ্য
দেখিয়া শ্রীরাধার মনে কি ভাবের উদয়
হইল। কবি বলিয়াছেন যে এই দৃশ্য দেখিয়া
শ্রীরাধার মনে ঈর্ষার উদয় হইল—হওয়াই
সম্ভব; কারণ যাহারা তাঁহার প্রাণাধিককে
তাঁহার কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে,
তাহাদের প্রতি ঈর্ষা না হওয়া বড়ই
অস্বাভাবিক, বিশেষতঃ যাহার মনে ভালবাসা

আছে, তাহার পক্ষে এমন হওয়া অসম্ভব
বলিয়াই মনে হয়। অতএব রাধা আর
সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না, অন্যত্র
চলিয়া গেলেন, ইহাও স্বাভাবিক। তাঁহার
আর একটি ভাব উপস্থিত হইল তাহাও
স্বাভাবিক। “শ্রীকৃষ্ণ আমাকেই সকলের
অপেক্ষা ভালবাসেন” তাঁহার এই গর্ব
টুটিয়া গেল, এবং সেই বোধের সহিত হৃদয়ও
ভাঙ্গিয়া গেল; তাই তিনি আত্ম অতি
দীনা, বুকি মাথা তুলিয়া কথা কহিবারও
তাঁহার শক্তি ও প্রবৃত্তি নাই। বৈষ্ণবশাস্ত্রে
এই গর্বহানির বিশেষ উপযোগিতা বর্ণিত
হইয়াছে। সেই বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি
নির্দেশ করিয়া কবি “সামান্য প্রণয়ে হরৌ”
এই বিশেষণ ব্যবহার করিয়া হরির অপক্ষ-
পাতিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব মাত্রেই
বুঝেন যে ভগবান্ সকলকেই ভালবাসেন,
শুধু একজনকেই ভালবাসেন না, এবং
ভগবৎ সম্বন্ধেও গর্ব অনেক সময় স্বাভাবিক
হইলেও ভাল নহে, তাই শ্রীরাধিকা, যিনি
ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির প্রতিমূর্তি,
তাঁহাকেও এই গর্ব পরিত্যাগের শিক্ষা
দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল। ভগবানের
ভাবে নিতোর হওয়া চাই,—দীনহীন হইয়া,
দেমাকের উপর নহে। এই ফলেই আবার
ভক্তের পরীক্ষা এবং প্রণয়েরও পরীক্ষা, তাই
সখীর প্রয়োজন। বৈষ্ণব নিদানে সখীর
স্থান বড় উচ্চ, ফলে সখী ব্যতিরেকে রাণা-
কৃষ্ণনৌলারস পুষ্ট হয় না। নিঃস্বার্থ ভক্তি এই
সখীদের, ইহারা নিজেদের জ্ঞান কিছু চাহে না,
নিজেদের বিষয় ভাবে না, ভক্তকে ভগদহুগ্ধী
করিয়া, ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করিয়াই

পরিতৃপ্ত হয়, নিজের সুখ চাহে না, রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধিয়াই ক্তার্থ হয়। ইহাই জয়দেবের সখীচরিত্রের মূল স্তত্র এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে জয়দেবই প্রথম সখী-চরিত্রের স্রষ্টা; এ চরিত্র তিনি কোনও পুরাণে পান নাই। সখীর চরিত্র অবলম্বনে রাধার চরিত্র তিনিই প্রথম কুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা এখন রাধাচরিত্রের স্বাস্থ্যসংগ কবিব।

আমরা দেখিয়াছি যে প্রণয়গর্ভিতা রাধিকা আজ “দীনা” তাই তিনি মধুকর-কণ্ঠিত কোনও একটা কুঞ্জবনে বসিয়া—বসিয়া বলিলে ঠিক হয় না—যেন মাটির সহিত মিশিয়া “লীনা” হইয়া সখীকে মনের কথা নিবেদন করিতেছেন। কি সে মনের কথা? অনুযোগ নাই, অভিযোগ নাই, কেবল সেই রূপের স্মৃতি সেই মর্ষচ্ছেদী দৃষ্ণের মধ্যে তাঁহার প্রাণনাথকে কি উজ্জ্বল দেখাইতেছিল তাহারই বর্ণনা, আর এততেও, এত দেখিয়াও তাঁহার মন সেই বিশ্বাসবাতী প্রণয়ীকে স্বরণ করিতেছে কেন, ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ। এই কি হৃদয়হীনার পরিচয়? আমাদের আদর্শ ও মনের ভাব এখন এত বদলাইয়াছে যে “ভ্রমর” বোধ হয় এখন ঘরে ঘরে, অথচ ভ্রমর কেবল লোকমুখে শুনিয়া, চোখে কিছু না দেখিয়াই স্বামী পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু রাধা নিজের চ’খে প্রণয়ীর বিশ্বাসবাতকতা দেখিয়াও তাঁহারই চিন্তায় ব্যাকুল। সখী বলিতেছে, “তবে তাকে ভাব কেন?” তাহার উত্তরে শ্রীরাধার মুখে কি উদার, কি গভীর

প্রণয়পূর্ণ বাক্যই না, কবি জয়দেব বসাইয়াছেন—

গণয়তি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরীতোষং দোষং বিমুক্তি দূরতঃ।
যুবতিষু বলভৃক্ষে বিহারিণি মাং বিনা,
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি কেরামি
কিম্

বৈষ্ণব কৃত অনুবাদ,—

শুন সখি মোর মন বিপর্যায় হৈল।
কৃষ্ণ গুণগ্রাম মন জপিতে লাগিল ॥
সখী কহে শুন রাধা আমার বচন।
তোমা ছাড়ি অণু সহ করয়ে রমণ ॥
তবে কেন তুয়া মন তাহারে স্মরণে।
বৃদ্ধিতে না পারি কথা কহ দেখি মোরে।
রাধা কহে শুন সখি আমার আকৃতি
কৃষ্ণ বিনা মোর মন না চলয়ে কতি।
ভ্রমেতে না করে ক্রোধ কৃষ্ণ গুণ বিনে
কৃষ্ণ পরিতোষ সদা করিছে ধ্যানে ॥
দোষ দূরে ত্যাগ কৈল চাহি দেখিবারে।
আপন মরম সখি কহিল তোমাংরে ॥
যুবতীর মধ্যে কৃষ্ণ করিছে বিহার।
আমা বিনা নানা সুখ বাড়িল অপার ॥
পুনরপি মনোন্মত্ত করিছে কামনা।
কি করিব কহ সখি বাক্যের যোজনা ॥
প্রতিকূল সমালোচককে প্রশ্ন করি—এই কি
হৃদয় না থাকার প্রমাণ? এই কি ইন্দ্রিয়
লোলুপার কথা? এই একাগ্রতা, এই ক্ষমা,
এই তিতিক্ষা এই একনিষ্ঠতা কি কেবল
ইন্দ্রিয়লুপ্তাস্বাদনের ফল, না ইহাকে ভাল
বাসা—ভালবাসা তো একটা ক্ষণ, হালকা
কথা—প্রগাঢ় প্রেম বলা যাইতে পারে?
ইন্দ্রিয়সুখছিদ্রাধেয়ী ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি

ক্লেশময়ী, অবসাদময়ী, কণিক প্রীতি ভিন্ন তাহার সাধ্য নাই যে হৃদয়ে কোনও স্থায়ী ভাবের সৃষ্টি করে। যে শুধু ইন্দ্রিয় সুখ খোঁজে, তাহার কাছে কি প্রিয়বিরহে জগৎ সুখশূন্য হয়, চাঁদের জ্যোৎস্না স্নান হইয়া যায়, ফুলের হাসি শুখাইয়া যায়? তার কাছে কি এমন সরসবসন্তুশোভিতা মৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি? কিছুই ভাল লাগে না? যার ভালবাসা অত্যন্ত প্রবল, অত্যন্ত পরিপক্ব না হইয়াছে সে কি এমনি করিয়া আত্মাভিমান বর্জন করিতে পারে? সে কি এমনি করিয়া অদোষদর্শী, নিত্যবুদ্ধহৃদয় হইতে পারে? তাহা যদি হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে কবি জয়দেবের শ্রীরাধিকা ইন্দ্রিয়চপলা নায়িকা মাত্র নহেন, তাঁহার দেহের সহিত তাঁহার মন, প্রাণ ও প্রণয় মহাযজ্ঞের আচ্ছতি হইয়া তাঁহার হৃদয়-দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। আর এইরূপ হইয়াছে বলিয়াই শ্রীরাধার অণু কোনও চিন্তা নাই, অণু কোনও বিষয়ের স্মৃতি নাই, তাঁহার প্রবল প্রণয়ের স্রোত সহস্র বাধাকে অতিক্রম করিয়া প্রিয়তমরূপ মহাসাগরের দিকেই ধাবিত হইয়াছে। এমন অবস্থাতেও যাহার মনে প্রথম সমাগম-লজ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রিয়তমের সকল রহস্য, সকল বিলাস, সকল আদর হৃদয়ে অনন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, সে যদি প্রণয়িনী না হয়—তবে প্রণয়িনী কাহাকে বলা যাইতে পারে তাহা নতো বুঝিতে পারি না। এত দূর যদি তাঁহার স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ইহাও মানিতে হইবে যে, জয়দেবের গীত-গোবিন্দে ভাল জিনিষ আছে।

কি অদ্ভুত সহিষ্ণুতা এই জয়দেবের শ্রীরাধার! তাঁহার মনের কি অপূর্ণ একাগ্রতা; তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন যে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ অত্যাশঙ্ক, তিনি নিজে বুঝিয়া আসিয়াছেন যে তাঁহার ভালবাসা বিফল, আশাহীন, তথাপি তাঁহার মুখে এক কথা—

“গোবিন্দং ব্রহ্মহৃদয়ীং তং পশ্যামি

দৃশ্যামি চ ॥”

বিদ্যাপতির শ্রীরাধাও প্রেমিকা, কিন্তু বলিতে কি তিনিও বোধ হয় জয়দেবের রাধার মত এত অনন্তচিন্তাপ্রবরণ নহেন, বুঝি তাঁহাতেও এত আত্মাভিমানবর্জন দেখিতে পাই নাই। যখন বিদ্যাপতির রাধিকা দেখিলেন যে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নয়—তখন তিনি বড় রাগ করিলেন এবং ক্রোধের সহিত মিলন সাধনে যাহারা সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের উপর বড় অনুরোধ ও ক্রোধের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে ছাড়িলেন না।

বোললি বোলে উত্তম পত্র রাখ ।

নীচ সবজ জন কী নহি ভাধ ॥

হনে জে উত্তম দুল গুণমতি নারি ।

এত বা নিত্য মনে হলব বিচারি ॥

“উত্তম লোক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, নীচসদৃশ (নীচ কুলোদ্ভব) ব্যক্তি কি না বলে? আমি উত্তম কুলের গুণবতী নারী, ইহা নিজের মনে বিচার করিও।”—পরিশদ সম্পাদিত বিদ্যাপতি ও তাঁহার টীকা।

ইহাও কিন্তু অস্বাভাবিক নয়, কারণ বিদ্যাপতির রাধিকার তখনও শ্রীকৃষ্ণ ও নিজের মাঝখানে একটা বিরাট ব্যবধান

ছিল—সংসার। কিন্তু জয়দেবের রাধিকা
নিজের ও শ্রীকৃষ্ণের মাঝখানে কোনও
ব্যবধান রাখেন নাই, তাহার পক্ষে “তুমি
আর আমি মাঝে কেহ নাই।” তাই
তিনি সখীকে কাতর ভাবে নিবেদন
করিতেছেন—সখি ! আমি যে তাহার দোষ
দেখিতে পাই না, তাহার উপর রাগ
করিতে জানি না, সব অবস্থাতেই তাহার
উপর সম্বল আছে, এই দেখ সহস্র যুবতীর
অটল ব্যবধান ভেদ করিয়াও আমার নয়ন
তাহাকে দেখিতেছে, আমাকে দেখিয়া সেই
সখ্য তাহার যে বিশ্বয়বিষ্কারিত বদনে
হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি
দেখিতে পাঠিতেছি ও হৃদয় আনন্দময় হইয়া
উঠিতেছে; তার বিরহ যে আমার
অসহনীয়। তাই বলি

সপি হে কেশিধনমুদারম্।

রময় ময়া সহ মদনমনোরথ ভাবিতয়া।

সবিকারম্।

তারপর জয়দেবের গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণের
জাগরণের কথা বর্ণিত আছে, কিন্তু আমরা
শ্রীরাধার বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিয়া পরে সে
কথা বলিব। যাহার হৃদয়ে অত আকাঙ্ক্ষা,
অত লালসা তাহার বিরহ-যাতনা কত
নিদারুণ তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি
যখনই শ্রীরাধার মনে উদয় হইয়াছে যে
বুঝি তিনি শ্রীকৃষ্ণকে হারাইলেন, তখনই
তাঁহার সুখশান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে—মনের
বান্ধন ছিঁড়িয়াছে—দেহের আদর বুচিয়াছে
—ফলে তাঁহার জীবনের সাধই যেন মিটিয়া
গিয়াছে। এই নৈরাশ্যময় হৃদয় বহিয়া
তাঁহার যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা কবি

জয়দেব নিপুণ তুলিকার সাহায্যে বর্ণনা
করিয়াছেন,—নিজের কথায় নয়, সখীর
কথায়। সখী ভিন্ন রাধার মনের কথা
দেহের ব্যথা কেহও বুঝিতে পারে
না, তাই সখী সেই অবস্থা বর্ণনা
করিয়াছে—কি সুন্দর বর্ণনা, কি সুন্দর
দৃষ্টি ! নিরহিংসী রাধিকার বর্ণনায়—কবির
কল্পনা উল্লসিত হইয়া শত সুন্দর ভাবের সৃষ্টি
করিয়াছে—সেই সুন্দর ভাবাবলী লইয়াই
পরে বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরা
তাঁহাদের পাগলিনী শ্রীরাধার চিত্র
আঁকিয়াছেন। জয়দেব বিরহবর্ণনে নিজের
কৃতিত্ব প্রচুর পরিমাণে দেখাইতে
পারিয়াছেন, এবং বিপুল উৎসাহের সহিত
এই অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল
নিপুণ ভাবচিত্রের কথা ধরিলেও এই বর্ণনা
গুলি উপাদেয়—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমহুবিন্দতি

খেদমধীরম্।

ব্যাল-নিলয়-মিলনেন গরলমিব কলয়তি

মলয়সমীরম্।

সা বিরহে তব দীনা।

মাধব মনসিঙ্গ-বিশিখ-ভয়াদিব ভাবনয়া

হুয়ি লীনা।

অবিরল-নিপতিত-মদন-শরাদিব

ভবদবনায় বিশালম্।

স্ব-হৃদয়-মর্ষণি বর্ষ করোতি সজল

নলিনীদল-জ্বালম্।

কুসুম-বিশিখ-শর-তল্লমনর-বিলাসকলা-

কমনীয়ম্।

ব্রতমিব তব পরিরম্ভ-সুখায় করোতি

কুসুম-শরণীয়ম্।

বহতি চ বলিত-বিলোচন-অনধর-মানন-
কমলমুদারম্ ।

বিধুমিব বিকট-বিধুস্বন-দন্তদলন-গলিতামৃত-
ধারম্ ॥

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গ-মদেন ভবন্তমঙ্গল-
ভূতম্ ।

প্রথমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং
নবচূতম্ ॥

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে
পতিতাহম্ ।

অগ্নি বিমুখে যসি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে
তনুদাহম্ ॥

ধান-লয়েন পুরঃ পারকল্য ভবন্তমতীব
দূর্যাপম্ ।

বিলপতি হসতি বিষদতি রোদতি চঞ্চলি
মুক্ততি তাপম্ ॥

ইহার ভাষা এত সরল যে ইহার অইবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই পদাবলীর এক একটা শ্লোকে এক একটা নুতন ও কমনীয় ভাব ও চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায় ও বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীরাধাকে মহাভাবময়ী বলিয়া উল্লেখ করা হয়—তাঁহার সম্বন্ধে কোনও ভাব অসম্ভব-বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যে চলে না তাহা ভক্তির অবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রমাণ করিয়াছেন। তাই আদি বৈষ্ণব কবি জয়দেব তাঁহার সম্বন্ধে বহুবিধ ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন—

স্তনবিনিহিতমপিহারমুদারম্

সা মনুতে কুশতমুরিব ভারম্ । :

রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥

হে কেশব তোমার বিরহে রাধার আর কোনও অলঙ্কার ভাল লাগিতেছে না, বুকের

হারও সে তার মনে করিয়া খুলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কুশতমুর বুকি সে হারটী বহন করিবারও ক্ষমতা নাই। এই ভাব ভাবিত হইয়াই বিদ্যাপতির রাধিকা বর্ণিয়াছেন

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হাররে ।

* পিয়াশদি তেজল কি কাজ শিপারে
যায়ন সলিলে সব ডাররে ॥

বলা বাহুল্য এই অল্প পারসরের মধ্যে জয়দেব যে ভাবাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাই রূপান্তরিত ও বিস্তৃত হইয়া বিদ্যাপতির বিরহ-বর্ণনার অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে।

সরসমসৃগমপি মলয়জ-পঙ্কম্ ।

পশ্চাতি বিমমিব বপুধি শশঙ্কম্ ॥

* * *

তাজ্জতি ন পাণিতুলেন কপোলম্ ।

বাল-শশিনমিব সায়মলোলম্ ॥

হরি-রিতি হরি-রিতি জপতি সকামম্ ।

বিরহ-বিহিত-মরণেব নিকামম্ ॥

বিরহবিহিত মরণা শ্রীরাধার সেই নির্ভুর প্রিয়তমের নাম জপ কত উচ্চ ভাবের বাঞ্জক তাহা প্রতিকূল সমালোচক একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এততেও কি তাঁহার গীতগোবিন্দে মানের প্রভাব দেখিতে পান না? শ্রীরাধার কৃষ্ণচিন্তার এত একাগ্রতা যে, সেই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া তিনি সম্পূর্ণ মাত্রায় শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া যান—নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবে ভাবিতে থাকেন—

মুহুরবলোকিত-মণ্ডন লীলা

মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ।

ইহাই বিদ্যাপতির পদাবলীতে অল্প আকারে
শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ বর্ণনে প্রকটিত
হইয়াছে

অমুরূপ মাধব মাধব সোঙরিতে

সুধামুখি ভেল মাধাই ।

কি অপূর্ব সেই দিব্যোন্মাদ ! এমন অবস্থায়
উল্লীত হইবার জ্ঞান নেন কত একনিষ্ঠতা,
চিন্তার কত প্রগাঢ়তা, কত অন্তর্লীনতার
প্রয়োজন তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়
নহে কি ?

শ্লিষ্যতি চুধতি জলধর-কল্পম্ ।

হরিরূপগত ইতি তিমিরমনল্পম্ ॥

এই শ্লোকের ভাব আধ্যাত্মিকতায় উল্লীত
হইয়াছে, শ্রীরাধার জগন্ময় শ্রীকৃষ্ণকুঁঠি
হইতেছে। ভক্তি-সাহিত্যে বোধ হয়
শ্রীজয়দেব প্রথমে বিরহের চিন্তাকে এমনি
করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই ভাবে ক্রমে বৈষ্ণব ভক্তগণ ভাবুক
হইয়াছিলেন—বঙ্গের প্রথম ও প্রধান বৈষ্ণব
কবি এই ভাব লইয়া তাঁহার শ্রীরাধার চিত্র
আঁকিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছি যে
শ্রীজয়দেবের কাছে বৈষ্ণব কবি মাত্রেই
মহাংশে আবদ্ধ।

বিদ্যাপতির তো কথাই নাই। বিদ্যাপতি
শ্রীজয়দেব কবির ভাবে পূর্ণমাত্রায়
অনুপ্রাণিত। তাঁহার পূর্বস্মরণই বল,
মিলনই বল, মানই বল, বিরহই বল, সন্তোগই
বল—সর্বত্রই মহাকবি জয়দেবের প্রভাব
স্পষ্ট। কোথাও তিনি ভাবের, কোথাও বা
বর্ণনার, কোথাও বা ভাবার, কোথাও বা
ছন্দের ঋণ গ্রহণ করিয়া নিজ হৃদয়গ্রাহী

পদাবলী রচনা করিয়া নব জয়দেব উপাধি
অর্জন করিয়াছেন।

তবে জয়দেবের শ্রীরাধার ও বিদ্যাপতির
শ্রীরাধার চরিত্রগত কিছু পার্থক্য আছে।
এ পার্থক্য যদিও চরিত্রের প্রকৃতিগত নহে,
তথাপি অনুভবনীয় বটে। আমরা দেখিতে
পাই যে দুইজনেই প্রেমিকা—দুইজনেই
লালসাময়ী, দুইজনেই কৃষ্ণগতপ্রাণা; কিন্তু
বিদ্যাপতির রাধিকা সরলা বালিকা,
ক্রীড়াময়ী, চঞ্চলা, তরলা লজ্জালুপিতা।
জয়দেবের রাধিকার চঞ্চলতা বা তরলতা
নাই, তিনি গভীর লালসাময়ী, অপার
প্রেমময়ী, অনন্তচিন্তারহিতা; তাঁহাকে
আমরা যখন প্রথম দেখিতে পাই তখনই
তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী, তাঁহার কৃষ্ণসঙ্গ
ভিন্ন সুখ নাই, কৃষ্ণসঙ্গ ভিন্ন জীবনের
কোনও সার্থকতা নাই, তাঁহার নৃকোচুরি
নাই, ভাবগোপনের চেষ্টা নাই, তাঁহার
জগৎ নাই, বিধ নাই, আছে এক শ্রীকৃষ্ণ-
সঙ্গাকাজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণসংসাদন-পিপাসা;
ফলে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ত্রিঙ্গতে তাঁহার আর
কিছুই নাই। তাঁহার বিরহ, তাঁহার মান,
তাঁহার সন্তোগ, তাঁহার প্রগল্ভতা, তাঁহার
সাদর-আবদার সকলই সেই পীতাম্বরকে
অবলম্বন করিয়া। তাঁহার প্রেমের এই
প্রগাঢ়তাই শ্রীজয়দেব কবির বৈষ্ণবকুলকে
প্রধান দান ও সেই জন্মই বৈষ্ণব কাঁবকুল
তাঁহাকে মাথায় ধরিয়া রাখিয়াছেন ও
রাখিবেন তিনি রাধাকৃষ্ণের মিলনের
কবি—রাধাকৃষ্ণের সন্তোগের কবি—তিনি
মনের কবি—তিনি দেহের কবি, কারণ
বৈষ্ণব জানে যে সর্বোচ্চের দ্বারা কৃষ্ণসেবাই

পরম পুরুষার্থ, তাই শ্রী শ্রী মহাপ্রভু
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি
কৃষ্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

লইয়া নিজের অপরূপ ভক্তির পুষ্ট সাধন
করিয়াছেন। আমরা নাসিকা কুঞ্চিত
করিতে পারি, কিন্তু ঘাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্রের
মর্ম্মগ্রাহী তাঁহারা এই সন্তোগাদি ব্যাপারে
নাসা কুঞ্চিত করিবেন না তাহা নিশ্চয়।

আসলে কিন্তু শ্রীজয়দেব নীচ ইন্দ্রিয়-
বৃত্তির চিত্রকর নহেন, তাহা আমরা
দেখাইয়াছি, আমরা দেখাইবার চেষ্টা
করিয়াছি যে জয়দেবের শ্রীরাধার হৃদয়

আছে, প্রণয়ের গভীরতা আছে, আকাঙ্ক্ষার
আধ্যাত্মিকতা আছে, শালসার তীব্রতা
আছে। বিদ্যাপতির রাধারও হৃদয়
প্রেমাপ্লুত, তবে তাঁহার রাধিকা যেন একটা
পার্কিত্যটিনী, আরন্তে ক্ষীণ, কখনও ক্ষীণতা
কখনও স্তরোপসহ হইয়া চঞ্চলা ও মুখরা।
বীচিবিকৃদ্ধা, কখনও আবার হরকায়, কিন্তু
তাঁহারও গতি সেই সমুদ্রের পানে, এবং
সমুদ্রের ভিতর সম্পূর্ণরূপে আশ্রয়সংগ
করিবার পূর্বে সেও জয়দেবের শ্রীরাধার
মত একটানা বিশালকায় নদীতে পরিণত
হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

জন্মজন্মান্তরে

জন্ম হ'তে জন্মান্তরে মোরা হুগনায়
সমকর্ম্মফলভোগী, সহযাত্রী দৌহে
চলেছি অনন্ত পথে সুখে দুঃখে মোহে
পুণ্য পাপে অবিচ্ছিন্ন। অনন্ত যাত্রায়
ঘূর্ণ্যমান কোটি জন্মমৃত্যু আবর্তনে
দুটি পাশ্ব পাশাপাশি। কত শত লোকে
সহস্রযোনিতে মোরা জন্মে মরণে
ভ্রমণ করেছি দৌহে। অরুণ আলোকে
এক বস্তুে দুটি কলি বিচিত্র কুস্মে
হরষে উঠেছি ফুটি। জানি না কেমনে
কোন শুভলগ্নে মোরা কোন পুণ্যভূমে
উপনীত হ'ব ধীরে ; মন্দের চরণে
বহিতে হ'বে না আর জীবনের ভার
প্রেমের নির্ঝগ মোক্ষে হব একাকার।

বীণাবাদিনী

এ বক্ষ বীণার মাঝে স্নেহতন্ত্রীগুলি
রূপ রস শব্দ গন্ধ পরশ আঘাতে
কম্পিত বাক্ত হৃদয়। নিশিতে প্রভাতে
চারিদিক হ'তে যেন সহস্র অঙ্গুলি
নিয়ত জাগায়ে তোলে মিশ্র কোলাহল,
অর্থহীন ধ্বনি শুধু ছন্দ সুর নাই।
বিরামবিশ্রামহারা আঘাত চঞ্চল
বীণাটিরে আপনার ক্রোড়ে দিলে তাঁই
টানি' নিলে বক্ষোপরি, হে বীণাবাদিনি,
নিপুণ করুণ করে বাধি নিলে সুর।
হে আমার মূর্ত্তিমতী নিখিল-রাগিণী,
জনতার শব্দজাল করি দিলে দূর
অঙ্গুলি ইঙ্গিতে ওব ; মোহন বাক্সারে
বাক্সালে তোমার গান মোর তারে তারে।

ভরেন্দ্র শর্মা।

লোকশিক্ষা

সর্ব সাধারণের জন্য শিক্ষার যে প্রস্তাব
হইয়াছে ত্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাহার
বিরোধী। সকলে যাহা চায়, কেন
বিপিনবাবু তাহার বিরোধী হইলেন, সে
সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট বাণী আমরা পৌষ
মাসের 'বঙ্গদর্শনে' প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি
সর্বসাধারণের শিক্ষার বিরোধী নহেন।
তবে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে,
তিনি সেই প্রণালীর বিরোধী। তাঁহার
কথাটা এই,—আমাদের সমাজ শাসনের
উপর প্রতিষ্ঠিত, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যক্তিত্বের
উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায়
আমাদের এই বিশেষভাবটা নষ্ট হইয়া
যাইবে এবং আমরাও আমাদের বিশেষত্ব-
ভ্রষ্ট হইয়া কাফ্রি বা ণ্ডাপানীদের মত
কিছুতকিমাকার জীব হইয়া দাঁড়াইব।
ব্যক্তিত্ব ছাড়া মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য নহে,
বিপিনবাবু তাহা জানেন বলিয়াই খোলাসা
রাখিবার জন্য বলিয়াছেন, হিন্দুশাসনও
ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন
এই যে, সমাজে শাসন আর সন্ন্যাসে ব্যক্তিত্ব।
যতদিন মানুষ সমাজে থাকিবে ততদিন
তাহার জন্য কেবলই শাসন, সন্ন্যাস গ্রহণ
করিয়া সে ব্যক্তিত্ব ভোগ করিবে। হিন্দুর
এই সমাধান যে হিন্দু পরে পরিত্যাগ
করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহার বিষময় ফলে
যে সমাজজীবন মৃতপ্রায় হইয়াছে, মানুষ
সামাজিক জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে
পঞ্চাশোর্দ্ধে তাহা লইয়া জঙ্গলে চলিয়া
গেলে মানব-সমাজের সমুদ্র ক্ষতি অর্থাৎ

সামাজিক জীব মানুষের জীবনের সর্ব
প্রধান সমস্তার মীমাংসা যে অতি সামাজিক
হইতে পারে না, বিপিনবাবু এই কথাটা
তাগাইয়া দেখেন নাই বলিয়াই ইহা লইয়া
এত হাদ্যামা করিয়াছেন। মানুষের
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে যতই বিবাদ
থাকুক না কেন, উভয়কে একত্র থাকিতেই
হইবে। মানবসমাজ জীবদেহেরই জায়
Organism, শাসন ও ব্যক্তিত্ব অঙ্গাঙ্গী-
ভাবে জড়িত। উভয়কে পৃথক করা যায়
না। শাসনবিহীন ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিভূই
নয়; আবার যেখানে ব্যক্তিত্ব নাই সেখানে
শাসন অর্থহীন। উভয়কে মিলিত করা শক্ত
বলিয়া এক অবস্থায় শাসন ও এক অবস্থায়
ব্যক্তিত্বের ব্যবস্থা গুলিলেই ইলিয়ট সাহে-
বের 'একবেলা ডাল আর একবেলা ভাতের
কথা মনে পড়ে। চিরজীবন ব্যক্তিত্বগোপী
শাসনের মধ্যে থাকিয়া ব্যক্তিত্ব কখনও লাভ
হইতে পারে না। পাখীকে সর্বদা খাঁচার
মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া একদিন হঠাৎ তাহাকে
ছাড়িয়া দিলে, সে উড়িতে পারে না, আবার
খাঁচার মধ্যে আসে। তাই "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং
ব্রহ্মণঃ" ব্যবস্থা থাকিলেই শতবর্ষেও কেহ
ঘরের বাহির হয় না। আর 'সন্ন্যাসী
নাগধারী দলের মধ্যে জটাধারী বিভূতি-
মণ্ডিত দশ বছরের বালকের অসম্ভাব নাই।
জীবন্ত দেহকে ধড় ও মণ্ডক এই দুই ভাগে
বিভক্ত করিলে কি হয়? এইরূপে বিভক্ত
হইয়া আমাদের সমাজ ও সন্ন্যাস দুইই
অকর্মণ্য হইয়াছে।

বিপিন বাবুর মূল আপত্তি এই যে, শিক্ষার ব্যবস্থা যখন আমাদের হাতে থাকিবে না, তখন সে শিক্ষাদ্বারা আমরা জাতীয় চরিত্র ধ্বংস করিতে চাই না। এখন প্রশ্ন এই, আমরা কি কখনও একটা জাতীয় শিক্ষার উদ্ভাবন করিয়া আমাদের জাতীয় বিশেষত্বের রক্ষণ আশা করিতে পারি? এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, যে এই বিশেষত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সন্দেহে আমি বিপিনবাবুর সঙ্গে এক মত নহি। কেননা, এখন আমাদের পক্ষে একান্ত ব্যক্তিবহীন সামাজিক চরিত্র রক্ষা করার চেষ্টায় আমরা আমাদের জাতীয় জীবনকে বিনাশের দিকে লইয়া যাইব। আমরা এখন আর ভিতর হইতে গড়িয়া উঠিতেছি না। বাহিরের চাপ আমাদের গায়ে গড়িতেছে। এই চাপের সঙ্গে মিলাইয়া যতটা জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারি, তাহাই আমাদের কর্তব্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয় আমাদের নিরপেক্ষ হইয়াই গড়িয়া উঠিতেছে, সে গুলির উপর যেমন এক দিচ্চে হাত নাই, ততদিকে দেগুলির হস্ত এড়াইবারও শক্তি নাই। তখন রাগ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিলে মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনা হয় না কি? আর, যে বিশেষত্ব বজায় রাখিবার জন্য এই প্রয়াস, তাহা আমাদের কল্যাণের পথে লইয়া যায় নাই। তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছে। সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলনের দ্বারাই এই পরিবর্তন সাধিত হইবে। এখন সে শিক্ষা আমরা চাহিয়া লইলে ইহার উপর আমাদের

কিছু হাত থাকিলেও থাকিতে পারে এবং টানাটানি করিয়া এই পরিবর্তিত ও পরিশোধিত বিশেষত্বের একটু স্থানও করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পরে সে সুযোগও থাকিবে না। জগতে সর্বত্র ধীরে ধীরে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত হইতেছে। জগতের সঙ্গে যে আমাদের যোগ তাহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সুতরাং জগতের সঙ্গে যোগ কাটিবার আমাদের শক্তি নাই। জগতে যাহা হইতেছে তাহা আমাদেরও হইবে। সেদিন তো এ স্রোত থামাইতে পারিব না। সুতরাং স্রোতে ভাগিয়া যাইবার পূর্বে ঘর সামলাইয়া লইলে ভাল হয় না কি? আমরা নিজেরা রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে যে নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিব তাহার সম্ভাবনা নাই, এবং ব্যক্তিবহীন শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনও নাই। যাহা Practical politics-এর বাহিরে তাহা লইয়া আন্দোলন নিফল এবং বিড়ালের সঙ্গে বাদ করিয়া নিরানন্দ ভ্রমের তায় হাস্ত্যকর।

বিপিনবাবু যে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে একে বারে নিরঙ্কুশ, ব্যক্তিপ্রধান ও শাসন-বিহীন মনে করিতেছেন, সেটা ঠিক নহে। তিনি কি দেখিতেছেন না যে এই প্রতিযোগিতার মধ্য হইতেই কেমন সুন্দর সহযোগিতা কুটিয়া বাতির হইতেছে? আর আমাদের ব্যক্তিবহীন সহযোগিতা বিরাট অমনোযোগিতায় পরিণত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগণই শাসনাধীন হইতে পারে। শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা আগে চাই। তাহা না

হইলে যে শাসনের প্রতিষ্ঠা, তাহা জড় পরমাণুর উপরে প্রতিষ্ঠিত শাসন। তাই আমাদের দেশের যত Co-operation no-operation এর জন্ম দিয়া সমগ্র জাতীয় জীবন তমোপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বিপিন বাবু কি দেখিতে পাইতেছেন না, কেন হিন্দুর এত সাধের একান্তবর্তী পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে? উহা ব্যক্তির সমষ্টি না হইয়া ইট পাটখেলের সমষ্টি ছিল বলিয়া এত সহজে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এ বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় ব্যক্তিহকে জাগাইয়া তোলা। ব্যক্তিগণ যখন শাসন স্বীকার করিয়া একত্রিত হয়, তখনই বাস্তবিক ব্যক্তিত্ব ও শাসনের সমস্তা মিটিয়া যায়। ইহার পূর্বে যে মিল, তাহা গৌজা মিল। আমরা গৌজা মিল দিয়াছিলাম বলিয়া আজ আমাদের জাতীয় জীবনের খাতায় শূন্য দেখিতেছি। আমরা যদি সত্যই মনে করি যে, ব্যক্তিত্ব একটা অতি খাঁটি ও উচ্চ বস্তু, তবে তাহার প্রতি সন্মাসের ব্যবস্থা না করিয়া আমাদের সমাজ ও পরিবারে তাহার জন্ম একটু স্থান করিয়া দেওয়া চাই, তাহা হইলে এই খাঁটি বস্তুর সংস্পর্শে আমাদেরও সমাজ এবং পরিবার খাঁটি হইয়া উঠিবে। তমোগুণ পরিহার করিয়া রজোগুণের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। নতুবা এই ব্যক্তিত্ববিহীন শাসন চিরদিনই তমোগুণের আকর হইয়া আমাদের উপর রাজত্ব করিবে। আমাদের সমাজপ্রকৃতির পরিবর্তন এই দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সমাজের উপরের দিক্ যে শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহা হইতে সর্বসাধারণকে বঞ্চিত রাখিলে অল্প নানারকমের জটিলতা আসিয়া সমাজ-দেহকে আক্রমণ করিবে। সমাজ দেহকে একরূপভাবে দ্বিখণ্ডিত হইতে দেওয়া ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। এইটাই পরিণামে একটা গুরুতর সমস্তা পরিণত হইবে। তাহার সমাধানের জন্ম তখন হয় তো আজ যে শিক্ষা পায়ে ঠেলিতেছি, সর্বসাধারণের জন্ম তাহাই বরণ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিত্বের সাধনা অবশ্য গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতেছি, সমাজে তাহার উপেক্ষা করিবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ চেষ্টা কখনও ফলবতী হইতে পারে না। যাহারা মানব-মন ও মানব-সমাজকে এখন Organism বলিয়া ধরিতে না পারিয়া অন্ধকারে ঘুরিতেছেন এরূপ বিফল প্রয়াস তাহাদের পক্ষেই সম্ভব। যাহারা মনে করেন, শাসন যখন উদ্ভূত বজ্রের আয় ব্যক্তিত্বকে নিয়মিত করিতেছে সেই কঠোর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহে আসিয়া আমরা মেধ-শাবকের আয় শুইয়া থাকিব এবং আমাদের সমাজপ্রকৃতি অক্ষুণ্ণই থাকিবে, তাহারা যে মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রান্তদৃষ্ট পোষণ করেন সে কথা আমরা বলিতে বাধ্য।

এক্ষেত্রে বিপিন বাবু একটা ideal-এর পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন, কাণ্ডেই তিনি যখন যে দিক্‌টা দেখেন, অপর পক্ষের সে সম্বন্ধে কি বলিবার আছে, তখন

সেদিকটা তিনি আদৌ দৃষ্টিপথে রাখেন না। ইহাতে একটা দিক বেশ স্পষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। তবে বিপদ্ এই যে, তিনি যদি ঘটনাক্রমে দুই দিকেরই কথা বলিতে বাধ্য হন, তবে এই দুই দিকই সমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করে। আমার মনে হয় পৌষের 'বঙ্গদর্শনে' এইরূপ বিপদ্ ঘটিয়া গিয়াছে। সার্বজনীন শিক্ষার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া তিনি যে ব্যক্তিব্যবহার প্রসার অত্যন্ত হানিজনক মনে করিয়াছেন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবাক্যের প্রশংসা করিতে যাইয়া সেই ব্যক্তিব্যবহার প্রতিষ্ঠাকেই জাতীয় তামসিকতা দূরীকরণের একমাত্র অস্ত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মানুষ যে ক্ষেত্রেই কার্য্য করুক না কেন, মনট তাহার সামাজিক আবেষ্টন বিপিনবাবু যদি রাষ্ট্রকে হিন্দুর সন্ন্যাসের আশ্রয় মানবের সামাজিক জীবনের বাহিরে স্থাপন করিয়া থাকেন, তবে তিনি একটা মারাত্মক ভ্রম করিয়াছেন। অথচ মানবজীবনকে এমন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে মানব-প্রকৃতিতে একেবারেই বুঝা হইবে না। রাষ্ট্র ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তিব্যবহারকে জাগাইয়া তোলাই জাতীয় জীবনের পক্ষে অবশ্য করণীয় কাজ হয়, তবে সমাজক্ষেত্রেও গত্যন্তর নাই। বাহ্যিক সিংহ, ঘরে মেঘ—এ অভিনয় বেশী দিন চলে না। ফলে, অন্নদিনের অভিনয়ের পর আবার মুখিকই হইতে হয়। ব্যক্তিব্যবহার জাগাইবার চেষ্টায় যদি ব্রহ্মবাক্যের প্রশংসা নিহিত থাকে, তবে সে প্রশংসা সমাজ-

সংস্কারক ও শিক্ষা-সংস্কারক সকলেরই প্রাপ্য। বিপিনবাবু যে এ সকলের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তাহার লেখার পশ্চাতে Philosophyর অসম্ভাব এবং অতিরিক্ত ওকালতি-প্রিয়তা।

বিপিনবাবু আর একটু কথার উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি বলেন সংস্কারকেরা সমগ্র প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে পারে না। তাহা হইলে না কি তাহাদের ব্যবসাই মাটি। এই উপলক্ষে তিনি স্বীয় জীবনের যৌবনকালের অভিজ্ঞতার ইন্ডিকা হাটের নাকশানে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। বিপিনবাবু তো সন্তানের পিতা—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি তিনি যখন পুত্রের দোষ দেখিয়া তাহার সংশোধনের জন্ত, মৌখিক নহে, কিন্তু কার্য্যতঃ চেষ্টা করিয়াছেন, তখন কি কখনও মনেও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে তিনি পুত্রকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসেন না? না চেষ্টার তীব্রতাটা ভাল বাসার তীব্রতারই পরিচায়ক বলিয়া মনে হইয়াছে। যেখানে সে চেষ্টা দেখি না সেখানে ভালবাসাটা ভালবাসার বিকার বলিয়াই মনে করি। যে পিতা পুত্রের দোষ দেখিয়াও দেখেন না, ভাবেন আমার পুত্রের অনেক গুণ আছে দোষটা মায়া, উহা চলিয়া যাইবে তাহার জন্ত সন্ন্যাসের হস্তে বেত্র রহিয়াছে। চীনদেশে না কি পুলিশেরও ঐ রকম একটাকি ব্যা হা আছে। ইহা ভাল বাসা হইতে পারে, কিন্তু উহা তামসিক ভাল বাসা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

কামরূপের সামাজিক প্রথা*

কামরূপের সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে ণ্ডটকয়েক বিষয় সংক্ষেপে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। পুজারূপে সামাজিক যথার্থ তথ্য অবগত হওয়া সহজ নহে; বিশেষতঃ এমন একটা বিষয় কেবল একটা মাত্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকটিত করাও সম্ভবপর নহে।

কামরূপের হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা, কেওট, কোচ, কামার, কুমার, নমশূদ্র, নদীয়ান, বৃত্তিয়ান, প্রভৃতি নানা বর্ণের লোক লইয়া গঠিত। জলাচরণীয় ও জল-অনাচরণীয় এই দুই প্রধান শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত। সকলেরই জাতিগত ব্যবসায় আছে এবং সকল শ্রেণীর লোকেরাই হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বিবাহ-বিভাজন-নীতির অনুসরণ করিয়া সমাজ রক্ষা করিতেছেন। মহাপুরুষীয় ও দামোদরীয় বৈষ্ণবধর্মই এখানকার অধিকাংশ লোকের সামাজিক ধর্ম। শাক্তসম্প্রদায় লোকের সংখ্যা স্বল্পতর।

মনিষী ৮পীতাম্বর সিদ্ধান্তবান্ধিশ কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন স্মৃতিমতে সমুদায় ক্রিয়া-কাণ্ড নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কেবল পর্বতীয়া গোবামী ভূগণের শাক্ত শিষ্যদিগের মধ্যে কতিপয় লোকে কোন কোন স্থলে রঘুনন্দন আর্তিশিরোমণি মহাশয়ের নব্যস্মৃতি মত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এখানকার ব্রাহ্মণসম্প্রদায় শাস্ত্রোক্ত দশকর্মের যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

এদেশে মিতাক্ষরীয় ব্যবহারই প্রাধান্য ছিল। বর্তমানে ব্রিটিশ শাসনাধীনে শাসন-সৌকর্য্যার্থে বিচারালয়ে দায়ভাগের ব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করিলেও সামাজিক বিবয়ের মীমাংসায় মিতাক্ষরা মতেই হইয়া থাকে।

অন্যান্য জাতি—যথা কাছাড়ি, গাবো, প্রভৃতি পার্বত্য জাতি—কোন এক নির্দিষ্ট কাল অথবা ভোজনাদি হইতে বিরত থাকিলে এবং নির্দিষ্ট বিধির অনুসরণ করিলে গুরু তাহাদিগকে শরণ বা দ্বীক্ষা দিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লইতে পারেন। ইহারা শরণীয়া নামে অভিহিত।

এখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুদিগের বিবাহেই শাক্তানুযায়ী নান্দিমুখ শাক্ত, হোমাদি ক্রিয়া, কতাসম্প্রদান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদের প্রথম গর্ভধারণের অষ্টম মাসেতে গর্ভাধান, পুংসন ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার-কার্য্য হইয়া থাকে। বাদ্য-ভাণ্ডাদি এবং আয়তের গীত বা এয়োদের সংগীত আবশ্যকীয় মঙ্গলিক ক্রিয়ারূপে পরিগণিত হয়। স্ত্রী-আচারাদিও যথাবিহিত-রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

নিম্নতরের লোকদের মধ্যে কোন কোন স্থলে কেবল স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হইয়াই যে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না এমতও নহে। কিন্তু এধরূপ বিবাহকে সমাজ শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন না।

কতাসম্প্রদায় হইবার পূর্বেই পাত্রস্থ করা সকলেই প্ৰচলিত মনে করেন। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এবং উচ্চশ্রেণীর কলিতা প্রভৃতিরা ইহা

তাঁহাদের অবস্থা কর্তব্য বলিয়াই মনে করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ জাতির কন্যা সম্প্রদানের পূর্বে ঋহুমতী হইলে পতিতা বলিয়া গণ্য হয়, অথ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তাহা হয় না।

ব্রাহ্মণের জাতির মধ্যে বিলোম ক্রমে কন্যাসম্প্রদানের প্রথা প্রচলিত আছে।

কন্যার কেশার্চন-বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীগৃহে প্রেরিত হয় না। বিবাহে শুভদৃষ্টিকালীন দম্পতীর পরস্পর দর্শনের পর কেশার্চন (দ্বিতীয় বিবাহ) না হওয়া পর্যন্ত পরস্পরের দর্শন বা আলাপাদি নিষিদ্ধ।

• এ অঞ্চলে কিছু পূর্বে কন্যাপণের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য ছিল, অনেকে কন্যাপণের দায়ে একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইতেন, কেহ বা অর্থের অনাটনে তিরজীবন অবিবাহিত রহিয়া যাইতেন। ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে ইহার অত্যন্ত প্রভাব ছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এই প্রথা নিবারণকল্পে সভার অনুষ্ঠান করেন। ১৫ বৎসর হইল সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব স্বদেশবৎসল পরমোৎসাহী শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কু শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দ্র বক্রয়া, এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র শর্মা দট্টন এবং পণ্ডিতা-এগণ্য সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ বুদ্ধব বক্রয়া স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতির উদ্যোগে উক্ত কুপ্রথা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে।

স্থানে স্থানে সভাসমিতি হইয়া বিবাহের ব্যয়ের হার নির্দ্ধারিত হইতেছে। কেহ গোপনে পণ গ্রহণ করিতেছে কি না তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইতেছে। টোলের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও তাহাদের ছাত্রবর্গ এ সম্বন্ধে

অগ্রণী হইয়া কার্য্য করিতেছেন। শিক্ষিত লোকেরা ইহাতে যোগ দিয়াছেন, কাজেই এই কুপ্রথা যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না ইহা নিশ্চিত। পূর্বে যে স্থলে ১০০০ ব্যয় হইত এখন সে স্থলে ১৫০। ২০০ মধ্যে কার্য্য সম্বলিত হইতেছে।

বরপণ এদেশে একেবারেই নাই। আসামের কুত্রাপি ইহা দৃষ্ট হয় না।

বিধবাবিবাহ এদেশে প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু সমাজের চক্ষে ইহা তেমন শ্রদ্ধার জিনিষ নহে। ব্রাহ্মণের ভিতর বিধবা-বিবাহ নাই। যদি কেহ এরূপ কার্য্য করেন তবে তিনি পতিত হন। কায়স্থেরা পতিত হন না বটে, কিন্তু তাঁহারা কায়স্থ-সমাজে স্থান পান না। কলিতা জাতি বিধবা বিবাহ করিয়া জাতিচ্যুত না হইলেও সমাজে হীনচার ক্রুপে পরিগণিত হন। তদ্বিত্তর জাতির মধ্যে যদিও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু তেমন শ্রদ্ধার সহিত যে উক্ত বিবাহে লিপ্ত হন তেমন মনে হয় না। কায়স্থজাতীয় বিধবার বিবাহ কায়স্থের জাতির সহিত হইয়া থাকে। স্বজাতির মধ্যে হয় না। পুনর্বিবাহিত বিধবার পক্ষে সধবাদের মত কোন সামাজিক কারণে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ এবং তাঁহাদের পক্ষে সধবার চিহ্ন সিদ্ধুর ব্যবহার ও সিঁধি কাটা অবিহিত।

কেশার্চন-বিবাহের পর যিনি বিধবা হন—তাঁহার বিবাহ যেমন হয় বলিয়া সমাজ মনে করেন, কেশার্চনবিবাহের পূর্বে যিনি বিধবা হন তাঁহার বিবাহকে তেমন হেয় মনে করেন না। বিশেষ এই

শ্রেণীর বিধবা বিবাহিতা সধবার আয় সিন্দুর ব্যবহার করিতে ও সিঁধি কাটিতে পানেন, তাহাতে কোন বাধা নাই।

এই শ্রেণীর বিধবার কেশার্চনক্রিয়া বা বিবাহ দ্বিতীয় পতির সহিত সম্পন্ন করিতেই হয়। এই কার্যটি যথাবিহিত শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

স্বর্ণায় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ বিধবাবিবাহ বঙ্গদেশে প্রচলনের জন্য অক্লান্ত শ্রম করিয়াছিলেন তাহা আসামে অরণ্যভীত কাল হইতেই ব্রাহ্মণের জাতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কিন্তু অল্পপ্রকার বিধবাদের বিবাহে শাস্ত্রীয় কোনরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান হয় না, কেবল স্ত্রী-আচারেই উহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

এখানকার ভদ্রমহিলারা সাধারণতঃ অবগুপ্তিতা হইয়া আত্মীয় পুরুষদের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং সতত অতি সন্তুর্পণে লজ্জাশীলতা এবং সূরুচি-রক্ষণে যত্নবতী থাকেন। স্থানান্তরে কার্যোপোলক্ষে যাইতে হইলে যানাদিতে গমন করেন।

দরিদ্র-অবস্থা বা নিম্নস্তরের লোকেরাও সূরুচিসঙ্গতভাবে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া অবগুপ্তনবতী হইয়া আত্মীয়দের সঙ্গে গমন করিয়া থাকেন।

উপর আসামে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দাস বা দাসী বড় ঝাপি বা বৃহৎ ছত্র ধারণ করিয়াও গমন করেন। সেই বৃহৎ ছত্রটি যে কোন অবস্থায় আবশ্যক হইলেই ভদ্র মহিলাকে পথিকের বা অল্প লোকের দৃষ্টি বহির্ভূত করিবার জন্য আবরণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

স্ত্রীলোকের বেশভূষা যে অতি সূরুচি-সঙ্গত তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইহারা মেথলা এবং তত্পার এক খণ্ড বস্ত্র দ্বাধাকে বিহা বা আস্তরণ বলা যায় সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে স্থানান্তরে যাইতে হইলে অতিরিক্ত এক খানি উপরেণী বা খনিয়া ব্যবহার করেন।

হস্ত, কণ্ঠ ও কর্ণে অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকেন, সাড়ি ব্যবহার এ অঞ্চলে প্রচলিত রহিয়াছে। বিবাহকালে, সাড়ি পরিধান করাইয়া কণ্ঠকে পাত্রে স্থাপন করাইয়া থাকে। মৃত্যু স্ত্রীলোককে চিতারোহণের পূর্বে সাড়ি পরাইয়া দিতে হইবে মেথলাপরিহিতা অবস্থায় দাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।

পতিশোকাতুরা বিধবা অশোচকাল সাড়ি পরিধান করিবেন ইহাই এ অঞ্চলের বিধি। বিবাহাদি সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াতে প্রায় সাড়ি পরিধান করিয়া থাকেন।

আসামে সর্বত্র এ নিয়মটী প্রচলিত নাই, তাই অনেকে মনে করেন যে সাড়ি পরাটা এদেশ বাঙ্গালীদিগের নিকট প্রথম শিক্ষা করিয়াছে। কামরূপের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে দেখা যায় যে ২০০ বৎসরাধিক কাল একখানি পটুবস্ত্রের সাড়ি অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। শাওড়ী যে বস্ত্র পরিধান করিয়া পাত্রস্থা হইয়াছিলেন পুত্রবধূ আবার সেখানি পরিয়া বিবাহিতা হইলেন, এইরূপে বংশাণুক্রমে এই বস্ত্র ২০০ বৎসরাধিক কাল ব্যবহৃত হইতেছে।

বিধবাদের সধবাদের যত অলঙ্কার পরিধান করায় দোষ না হইলেও উহারা কণ্ঠে ও কর্ণের উপর কোনরূপ অলঙ্কার পরিধান করেন না ও সীমন্তে সিন্দূর ব্যবহার করেন না এবং বিধবারা কেশচ্ছেদন বা মস্তকও মুণ্ডন করেন না। তবে গয়া প্রভৃতি তীর্থাদি গমন করিয়া তীর্থের নিয়মানুযায়ী মস্তক মুণ্ডন করেন, সে স্বতন্ত্র কথা।

এখন এদেশের উৎসবাদির বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

এখানকার দোমাহি বা বিহুই জাতীয় উৎসব। কাতি বিহু অর্থাৎ আশ্বিনের সংক্রান্তি, মাঘ্য বিহু অর্থাৎ পৌষের সংক্রান্তি এবং বহাগ বিহু অর্থাৎ চৈত্রের সংক্রান্তি এই তিন কাতির বিহু কঙ্গালী, মাঘের বিহু ভোগালী এবং বহাগ বিহু রঙ্গালী বলিয়া কথিত হয়। কাতি বিহুতে কোনরূপ ভোজনাদির আড়ম্বর নাই বলিয়া কঙ্গালী, মাঘ বিহুতে লড্ডুক, পিঠক প্রভৃতি চব্য চুষ্য নানাবিধ ভোজনের ব্যবস্থা আছে কাজেই ভোগালী। এবং বহাগ বিহুতে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদেয়, রঙ্গ-তামাসার অনুষ্ঠান হয় বলিয়া উহার নাম রঙ্গালী। •

কার্তিক বিহুতে এদেশবাসীরা ধাতুক্ষেত্র এবং গৃহাদিতে দেবোদ্দেশে প্রদীপ ও নৈবেদ্যাদি দিয়া থাকেন। গৃহে গৃহে নামকীর্তন হইয়া থাকে এবং সমস্ত কার্তিক মাসে আকাশ-প্রদীপ দিয়া থাকেন। এই মাস পবিত্র মনে করিয়া নানাবিধ ধর্ম-কার্যের অনুষ্ঠান করেন। অনেকে সমস্ত মাস নিরামিষ ভোজন করেন।

মাঘ বিহু দিবস অর্থাৎ পৌষের সংক্রান্তি দিনের পূর্বরাএ বাসক ও যুবকগণ মাঠে গৃহ নির্মাণ করে ও সকলে একত্র হইয়া দলভাও বা লভাও খায় অর্থাৎ আমোদ-আহ্লাদ ও ভোজনাদি করে। পরে প্রাতে ঐ ঘরে অগ্নিদান করিয়া প্রাতঃস্নান পূর্বক অগ্নি সেবন করে। পরে সকল গৃহস্থই নিজ নিজ গৃহে নামকীর্তনাদি করিয়া গুরুগৃহে উপহারাদি লইয়া গমন করেন। মধ্যাহ্নে গ্রামস্থ নামঘরে সকলে গমনেত হইয়া সাড়ম্বর নামকীর্তন ও ত্রিমস্তাগবত শ্রবণ করেন। রাত্রিতে দেবোদ্দেশে ভোগ দান করিয়া থাকেন; গুরুজনাদিকে প্রণাম এই দিবসের অবশ্য প্রতিপাদ্য কর্তব্য। পরে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী গৃহে গমন করিয়া লাড়ু, পিঠে, কোমন চাউল ইত্যাদি ভক্ষণ করেন। এবং সম্ভবমত অল্পকে ভোজন করান। ডিমখেলা, মলকীড়া, দৌড়াদৌড়, লাকান প্রভৃতির যথেষ্ট আয়োজন হয় এবং আবাদগুরু সকলেই প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন। এই কারণেই এই বিহুকে ভোগালী বলা হয়। সকলে নিজ নিজ কার্য হইতে সেই দিন ও পরের দিন অর্থাৎ ১লা মাঘ বিহুত থাকিয়া বিশ্রাম ও আমোদ সম্ভোগ করেন। এই দিবসও নামসংকীর্তন, গুরুজনকে প্রণাম, লাড়ু পিঠক ভক্ষণাদি অপেক্ষাকৃত অল্প সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। যদিও এইদিনকে তাহার বড় দোমাহি বা বড় বিহু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই মাসকেও পবিত্র মনে করিয়া সকলে নানাবিধ ধর্মোচরণ করিয়া থাকেন। বিশেষ দেবালয়

ও চতুষ্পাণীগুলিতে সমস্ত মাসব্যাপী গীতা পাঠ হয়, গৃহস্থেরাও সকলে অন্ততঃ নিজ নিজ গৃহে একদিন গীতা পাঠ করাইয়া থাকেন।

বহাগ বিহু—লড্ডুক পিঠকাদির ব্যাঘ্র মাঘবিহুর মতই। ছুখী ধনী সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে নববস্ত্র পরিধান করেন ও আত্মীয় স্বজনকে দান করিয়া থাকেন। আপনারা হয়ত মনে করিতেছেন যে বাজার হইতে বস্ত্র ক্রয় করিয়া দান করেন, কিন্তু তাহা নহে। জীলোকেরা নিজ হস্তে বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন। এখানকার ব্রাহ্মণ হইতে অধস্তন সকল জাতির লোকের জীলোকেরা বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন। বস্ত্রবয়ন জীলোকের বিশেষ গুণ। বস্ত্রবয়নের কৃতিত্বের উপর কত্তার সংপাত লাভের বিশেষরূপে নির্ভর করে। এখানে বস্ত্রবয়ন দ্বারা জাতি চ্যুতির ভয় নাই। সেদিন মাত্র বঙ্গদেশ এই বিষয়টি বৃষ্টিতে পারিয়াছেন, কিন্তু এইদেশে আবহমানকাল এই সুন্দর প্রথাটি প্রচলিত রহিয়াছে। সে কথা যাক, যাহা বলিতে ছিলাম কামরূপে প্রায় প্রসিদ্ধ গ্রাম সকলে এই বিহুতে বাহবিয়া ক্রিয়া উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে, সেই মেলাতে দেশীয় তামাসা ও মল্লক্রিয়াদিও হইয়া থাকে। বাহবিয়ার বিবরণ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। গ্রামের লোক বাশ যোড়া দিয়া যত উচ্চ করিতে পারেন করিয়া তাহার সমস্ত গ্রামের লোককে আহ্বান করেন, যেন ঐটী স্বয়ম্বরা কত্তা টাকেও কে নিতে পারেন অর্থাৎ যে গ্রামের বাশ তাহা হইতে অধিকতর

উচ্চ হইবে সেই বাশ স্বয়ম্বরা লাভে সক্ষম হইবে এবং ঐ গ্রামের লোকেরা জয়ী হইবে। বাশের উচ্চতা অকটাবলোনী মল্লমেণ্টের প্রায় তুল্যই হইয়া থাকে।

এই উৎসব ‘উথেলৌ’ নামে প্রসিদ্ধ। প্রায় সমস্ত মাস বিশেষ সাতবিহু অর্থাৎ বৈশাখের ৬ দিন পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চলিতে থাকে। প্রায় সকল কত্তারা এই বিহুতে পিত্রালয়ে আগমন করিয়া থাকেন।

বিহুর দিন গৃহপালিত পশু সকলকে তৈগমর্দন করাইয়া স্নান করান হয়। লাউ বেগুনের মালা গাঁথিয়া গলায় পরান হয়। কোমল বৃক্ষ পত্র লইয়া মৃদু মৃদু আঘাত করা হয়। এবং নিয়মিতরূপে বচন বলা হয়

দীবা লাউর দীঘল পাত

গরু বাচর জাত জাত।

লাউ খাবি না বাকাল খাবি

প্রতি বচরেবারি যাবি।

পুস্তান, পাখা পরিবর্তন করিয়া নববস্ত্রের জায় নূতন পাখার ব্যবহার হয়। প্রথমে দেবতা, গো, অগ্নি পরে গুরুজনকে বাজ্ঞন করিয়া নূতন বর্ষের জন্ত গৃহস্থ বাজ্ঞনী ব্যবহার করেন। কুটুবাদি গৃহে ঐদিন উপহার দ্রব্য বা নববস্ত্রদান লইয়া সকলে পরস্পর যাতায়াত করেন।

উপর আসামে ভাখনি উৎসব নাই। কেবল নিয়ন্ত্রণীয়া-লোকেরা পুরুষ স্ত্রী এই উৎসব উপলক্ষে একত্রিত হইয়া সমস্ত বৈশাখ মাস নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। কামরূপে কিন্তু ঐরূপ নৃত্যগীতাদির প্রচার নাই। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি দিবস

হইতে অষ্টম দিবস পর্য্যন্ত চতুপাশীর ছাত্রবর্গ প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থবরে শিক্ষা করেন। সকলেই শ্রদ্ধার সহিত কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়া থাকেন। ঐরূপে শিক্ষালব্ধ দ্রব্য চতুপাশীর অধ্যাপকের প্রাপ্য। এই ব্যাপারের দ্বারা প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের চিত্র নয়নপথে পতিত হয়।

প্রবন্ধের উপসংহারে এই বক্তব্য, এদেশবাসীরা বিজ্ঞান আখ্য রীতিনীতির ঐকান্তিক

অনুসরণ করেন। আখ্যাত্যতার মনো-মুগ্ধকর উজ্জ্বল জ্যোতিতে এদেশ উদ্ভাসিত। হিন্দু শাস্ত্র ও ব্যবস্থা আলম্বনে জাতিগত যে সকল গুণ পরিলক্ষিত হইতে পারে, সমুদায় এই দেশে বিদ্যমান।

পরিশেষে এই প্রবন্ধের উপকরণ-সংগ্রহে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দেব।

নারদ

মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি আমাদের জাতীয় মহাকাব্য ও অত্যাশ্চর্য্য প্রাচীন কথা বা কাহিনীতে মহর্ষি নারদ একটা বিশেষ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছেন মহর্ষি নারদ কল্পিত হউন আর সত্যই হউন, দেবতা সমাজে তিনি যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবতাগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন এবং স্বর্গলোক হইতে মর্ত্যলোকে সংবাদ প্রেরণের আবশ্যক হইলেই মহর্ষি নারদের ডাক পড়িত। প্রত্যেক কাহিনীতেই নারদ সংশ্লিষ্ট আছেন। মহাকাব্য লেখকগণ নারদের এই আবতারণা দ্বারা মানুষকে একটি পরম শিক্ষা দান করিয়াছেন। নবীন অরুণালোকের মধ্যে মধুর বীণাধ্বনিতে সমস্ত আশাশ প্লাবিত করিতে করিতে, মহর্ষি নারদের আগমন। অধিকাংশ প্রাচীন কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। নানদের মূর্ত্তিকে কোনোও প্রাচীন লেখক বা কবি

রাত্রির অন্ধকারে উপস্থিত করেন নাই,—দিবাগোকে অরুণালোকের আলোকের সহিত তাঁহার স্মৃতি জড়িত। মহাকবিদের বর্ণনা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে জটাজুটমণ্ডিত স্নিগ্ধ প্রশান্ত স্বামির বীণাধ্বনির মাধুর্য্য প্রতিদিনের অরুণালোকের মতই মধুর তাহার পর আরও একটি আশ্চর্য্য এই যে নারদের গতি সপত্র অব্যাহত, তাঁহাকে কেহ কখনে বাধা দিতে পারে নাই। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র হইতে মর্ত্তের নৃপতিগণ পর্য্যন্ত সকলেরই ভবনদ্বার তাঁহার কাছে উন্মুক্ত। এমন সর্ব্বলোকবিহারী বিশ্বজন-বন্ধু ঋষি আর দ্বিতীয়টি নাই। অথচ এই ঋষিটি কখনো কি দেব, কি মানব, কাকারো অন্য় সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বর্গের দেবেন্দ্র হউন অথবা মর্ত্তের রাজেন্দ্র হউন কাহার বিরুদ্ধে কোনো অন্য় দেখিলে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতেন না। স্বর্গ বলিতে আমরা একটি পাপশূন্য, শুভলোকের কল্পনা করি,

কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে এমন অনেক বর্ণনা দেখা যায় যে, স্বর্গের দেবতা পৃথগুও অপরাধে মর্ত্যলোকে নামিয়াছেন। নারদ যেন স্বর্গমন্ত্যের পাপতিমিরবিনাশকারী একটি উজ্জ্বল নির্মল খর পুণ্য-শিখা।

সেই জন্মই বলিতেছিলাম নবীন অরুণা-লোকের মধ্যে তাঁহার অভ্যাদয় অতি মনো-রম। জমাট অন্ধকার যেমন প্রভাতের কিরণ-ঘাতে বিনষ্ট হইয়া যায়, নারদের চরিত্রেও তেমনি একটি পুণ্যপ্রভা দখিতে পাই, যাহার সম্মুখে বহুদিন-সঞ্চিত পাপ এবং অজায় যুহুর্ন্তমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। তাঁহার রোষ কষায়িত তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে স্বর্গাধিপতির সিংহাসনও কম্পিত হয় অথচ সকল দেবতা এবং সকল মানবের সহিত তাঁহার একটি পরমসৌন্দর্য্যবন্ধন আছে।

অভিমানী দক্ষ শিব-রহিত যজ্ঞ করিবার বাসনা করিয়া মহাদেব ব্যতীত অত্যাচ্য সকলকেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত করেন। শিবদেবী দক্ষের স্পর্শ চূর্ণ করিবার জন্ম যথাকালে তাঁহার সমীপে নারদ উপস্থিত হইলেন। তিনি দক্ষের পক্ষ হইয়া মহাদেব ব্যতীত ত্রিভুবনের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। শিবকে যিনি অপমানিত করেন অর্থাৎ মঙ্গল ব্যতীত যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেন বা কোনো কার্য করেন, তাঁহাকে কি শাস্তি ভোগ করিতে হয় এই দক্ষকে দণ্ড দিয়া, নারদ তাহা বিখঞ্জনের সমক্ষে প্রমাণ করিয়া দিলেন।

প্রাচীন কাহিনীর অধিকাংশ কলহ এবং গুণ্ডগোলে নারদের নাম পাই; কেন না তিনি কলহ করিয়া অশিবকে, মনোমালিন্য

ও পাপকে দূর করিয়া দেন। পাপের মলিনতার বিনাশ অতি সহজ হয় না; বহু সংগ্রামে এবং বহু জয়-পরাজয়ের পর পাপের বিনাশ হইয়া থাকে অন্ধকারকে ভেদ করিয়া যেমন আলোকের প্রকাশ, পাপকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াই তেমনি পুণ্যের উজ্জ্বল মূর্তির প্রকাশ। ইহার মধ্যে কত ঘাৎ কত প্রতিঘাৎ, কত কষ্ট ও কত দুঃখ তাহার ইয়ত্তা নাই। পাপের বিনাশ-সাধনকারী বিধাতার উদ্যত হস্ত যখন প্রসারিত হয়, তখন তাহা আমাদের নিকট চক্রচ্ছিন্ন-গৌরী-দেহধারী রুদ্রদেবের তাণ্ডব নৃত্যের জায়গাই বোধ হয়।

আমাদের মনের সমস্ত পাপ, দৈন্ত্য ঈশ্বর জানিতেছেন; অবশেষে কোনো একসময় বিখত্রস্কাণ্ডের নারদ ঋষিটি যখন আমাদের সমস্ত খবর বিধাতার কাছে হাজির কবিবেন তখন দেখিব সব উল্টা; কাল যেমন সুখ-লালসে নিদ্রিত হইয়াছিলাম, আজ দেখি আমার অবস্থা অতরূপ। আমি দারিদ্র অথচ দুঃখের এই প্রকাশ আমার নিকট সহস্রগুণ তিক্ত ঠেকিলেও সত্যি তাহা আমার নিকট মঙ্গল, শিব। মঙ্গল দুঃখের ছদ্মবেশ ধরিয়া উপস্থিত হয় মাত্র। দুঃখের দিন সেই জন্মই ঈশ্বরের দান,—শিক্ষা বলিয়া অতি অল্প লোকেই গ্রহণ করিতে পারে। মহাকাব্যের মধ্যে যেমন একটি নারদ ঋষি পাপমলিনতা দূর করিবার জন্ম একদিন বিমল প্রভাতে পুণ্য জ্যোতিরূপে উপস্থিত হন। মানবের জীবন-কাব্যের মধ্যেও তেমনি এক শুভ যুহুর্ন্তে ঈশ্বরের মঙ্গলবাণী মানুষের সমস্ত পাপ,

মলিনতা দূর করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকে। পাপীর পাপ সেই নারদের মঙ্গল বাণীরূপে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়— তাহার পর বিধাতার রুদ্ধমূর্ত্তি জাগ্রত হয়। তখন পাপীর সমস্তই লণ্ডভণ্ড, সমস্তই উটপান্টা হইয়া যায়।

যে জীবন অনবরত অর্থ সঞ্চয়ে একত্রত হইয়াছিল—বিধাতা তাহার উপর এমন আঘাত করেন, বাহাতে সে অর্থ ছাড়িয়া দেয়—কিন্তু সে বড় যন্ত্রণা, বড় দুঃখ পাইয়া প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদের গ্রন্থের নানা স্থানে, নানা কাহিনীতে নারদের অবতারণা করিয়া মানুষকে এই শিক্ষা দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, “অত্যাচার, পাপ, কলঙ্ক কখনো অপেক্ষাশীত থাকে না, যে মুচ যত গোপনে যত পাপই করুক না তাহা বিশ্বজনের সমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। সেই জন্যই অপাপবদ্ধ পুণ্যাত্মা ঋষিগণ কাহিনীর মধ্যে ভক্তি-নম্র চিত্তে নারদের অবতারণা করিয়াছেন। এবং সেই কাহিনী নারদের জয় দিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম বিধাতা জানিতে পারিতেছেন এবং

তাহার যথোপযুক্ত বিধানও করিতেছেন। নারদ সম্পূর্ণ যুক্ত, সম্পূর্ণ নির্মল। আমাদের প্রত্যেক জীবন এমন হউক যেন বিধাতার কাছে নারদ আমাদের নামে আর কিছু নালিস করিতে না পারেন এবং নারদের সহিত আমাদের যেন সৌভাত্র স্থাপিত হয়। নিত্য প্রভাতকালে পূর্নাকাশ-ভালে বীণাহস্তে শুভবোধদায়ী ঋষিটি প্রত্যাহই ঐষ্টিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অল্পমণি কিরণ-বীণার মধুর স্বাক্ষরে জগতের প্রত্যেক কার্য্য অতি সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইতেছে

হে নারদ! তোমার বীণার পবিত্র স্বাক্ষরে আমাদের অন্তর হইতে সমস্ত পাপ মুছিয়া ফেল। প্রত্যেক সন্ধ্যাতে তোমার উদয় আমার চক্ষের সম্মুখে যেন স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠে এবং সমস্ত দিবস যেন তোমার সঙ্গীত চিত্তকে নয় করিতে থাকে। প্রাচীনকালে ঋষিগণ তোমার যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কল্পনা নহে—অত্যাুক্তি নহে। আজি তুমি তোমার শুভ বোধধারণ করিয়া বীণার তারে স্বাক্ষর দাও। তুমি আমাদের পবিত্র, শান্ত, সংযত নির্মল কর।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

মূল ইতিবৃত্ত সত্য

মূল ইতিবৃত্ত' যে সত্য তাহা প্রমাণ করা হুঃসাধ্য নহে। ঐ ইতিবৃত্তের প্রমাণ প্রধানতঃ দুই প্রকার। প্রথম আভ্যন্তরীণ,

দ্বিতীয় বাহ্য। বাহ্য প্রমাণ আবার প্রবাদ, ভগ্নাবশেষ ও লেখ্য ভেদে তিন প্রকার।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অর্থে মহাভারতের

ঐতিহাসিকতা সন্মুখে মহাভারতের কি মত।
মহাভারতের মতে কুরুপাণ্ডবের ইতিবৃত্ত সত্য
পুরাবৃত্ত। আদিপর্কের প্রারম্ভেই নৈমিষা-
রণ্যবাসী মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,
ভারতশ্রেণীত্বাস্ত্র পুণ্যং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।

* * * *

জনমেজয়স্ত যাহ রাজো বৈশম্পায়ন উক্তবান্।

* * * *

সংহিতাং শ্রৌতুমিচ্ছামঃ পুণ্যং পাপভয়া-

পহাম্ ॥

পুণ্য ভারত-ইতিহাস যাহা বৈশম্পায়ন
জনমেজয় রাজাকে বলেন সেই পাপনাশিনী
সংহিতা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।

ইহার উত্তরে সৌতি বলিলেন—

আচক্ষুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপত্যাচক্ষতে পরে।

আখ্যাস্তস্তি তথৈবাত্ম ইতিহাসমিমং ভুবি ॥

কোন কোন কবি এই ইতিহাস পূর্বে
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপার কেহ ইহা এখনও
ব্যাখ্যা করেন। ভবিষ্যতেও অত্বে ইহা
পৃথিবীতে প্রচার করিবেন।

আদিপর্কের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকেও
মহাভারতকে ইতিহাসরূপে নির্দেশ করা
হইয়াছে—

ইতিহাসঃ প্রধানার্থঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বাগমেষ্ণয়ম্।

এই ইতিহাস গভীরার্থক ও সমস্ত আগমের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আদিপর্কের ৬০ অধ্যায়ের শেষে ব্যাস-
দেব বৈশম্পায়নকে আদেশ করিতেছেন—
কুরুগাং পাণ্ডবানাঞ্চ যথা ভেদোহভবৎ পুরা।
তদস্মৈ সর্কমাচক্ষ যমন্তঃ স্রুতবানপি ॥

আমার নিকট তুমি কুরুগণের ও পাণ্ডব-
গণের ভেদ সন্মুখে যাহা শুনিয়াছ তাহা ইহার
নিকট সমস্ত বল।

তাহার পর লেখা হইয়াছে—

গুরোবর্চনমাজ্জায় স তু বিপ্রর্ষভস্তদা।

আচক্ষুঃ ততঃ সর্কমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥

গুরুর আদেশ পাইয়া সেই বিপ্রর্ষি তখন
সেই প্রাচীন ইতিহাস আমূল বলিলেন।

৬১ অধ্যায়ে প্রাপ্তান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ
দিয়া বৈশম্পায়ন বর্ণিতেছেন—

এবমেতৎ পুরাবৃত্তং তেষামক্লিষ্টকর্মণাম্।

ভেদো রাজ্যবিনাশায় জয়শ্চ জয়তাং বর ॥

হে জেতৃগণের প্রধান, সেই অক্লিষ্ট-
কর্ম্ম পাণ্ডবগণের পুরাবৃত্ত এইরূপ।
রাজ্যের জ্ঞাতা তাঁহাদের কলহ হয় এবং
এইরূপে তাঁহারা জয়লাভ করেন।

মহাভারতের মতে যে মহাভারত ইতিহাস,
তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি নিদর্শন দেওয়া যাইতে
পারে। এক্ষণে বিবেচ্য যে ব্যাসদেব স্বীয়
মাতার কৃত্যাদশায় বিবাহও গোপন করেন নাই,
যিনি উর্দ্ধবাহু হইয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন
যে—ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও কাম পাওয়া যায়,
অতএব হে জীব! কোন অবস্থায় ধর্ম্ম ত্যাগ
করিও না—যিনি সত্যের মাংসাত্ম্য জলদগম্ভীর-
নাদে গাহিয়াছেন, সেই মহর্ষি কি কল্পিত
চরিত্র লিখিয়া 'সেই উপন্যাসকে ইতিহাস
কলিবেন? বেদব্যাস মিথ্যাবাদী ইহা
যাহারা বিশ্বাস করিতে পারেন
তাঁহাদের বিশ্বাসকে ধ্বংস। তিনি
কেবল স্বীয় কৃত্তিকে ইতিহাস বলিয়াই
নিরস্ত হন নাই; ঐ ইতিবৃত্তে তাঁহার
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও দেখাইয়াছেন। তিনিই
ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্মদাতা, তিনিই পাণ্ডব-
গণের বিবাহ দ্রৌপদীর সহিত দেন, তিনিই
রাজস্বয় যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত, তিনিই

সঞ্জয়কে প্রজ্ঞাচক্ষু. দেন, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি এই সমস্ত কথা কাল্পনিক হয় তবে তাঁহার ছায় মিথ্যাবাদী আর জগতে কেহ থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে অসংখ্য উপন্যাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কোন উপন্যাসকার ঐ উপন্যাসের ঘটনাবলিতে আপনাকে আজ পর্যন্ত ইরূপ ভাবে উপস্থাপিত করেন নাই।

হোমার, ভার্জিল প্রভৃতি কোন দেশের কোন কবি কাল্পনিক বৃত্ত দিতে গিয়া কখনও ঐ বৃত্তের সহিত আপনাদিগকে মিশান নাই। ব্যাসদেব যে মিথ্যাগল্পে মিথ্যা আপনাকে জড়াইবেন এ বিশ্বাস কি তবে যুক্তিযুক্ত? বিশেষ যদি ব্যাসদেব এতট মিথ্যাবাদী হইতেন তাহা হইলে তিনি তত্ত্বদর্শী, জ্ঞানী, সত্যবাদী ঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন না, তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থকার-গণও কখনই কুরুপাণ্ডবগণকে সত্যচরিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

প্রথম বাহ্য প্রমাণ—প্রবাদ

যদি আবহমান কাল কোন প্রবাদ কোন দেশে প্রবর্তিত থাকে তাহা হইলে তাহার মূলে সত্য আছে বিশ্বাস করা উচিত। যুধিষ্টিরাদি যে আমাদের ছায় রক্ত-মাংসের শরীরে পৃথিবীতে লীলা করিয়াছেন তাহা আবহমান কাল ভারতের লোকে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। যদি আবার পুরাণ, ব্যাকরণ, বৈদ্যশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, কাব্য, অলঙ্কার, এমন কি নিখিল সংস্কৃত সাহিত্য সেই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়, যদি দেখেন যে যুধিষ্টিরাদির বংশ বলিয়া মধ্যকালের নৃপতিগণ নিজ নিজ

পরিচয় দিয়াছেন, যদি যুধিষ্টিরের শক কোন কোন দেশে প্রচলিত থাকা দেখা যায়, যদি নবাবিস্কৃত তাম্রশাসনে তাঁহাদের ভূঁর ভূঁরি উল্লেখ থাকে, এবং সর্বশেষে যদি সেই যুধিষ্টিরের ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র জনমেজয়ের দানপত্র দেখিতে পাই তাহা হইলে মনে অনুমাত্রও সংশয় থাকা যুক্তিযুক্ত নহে।

দ্বিতীয় বাহ্য প্রমাণ—ভগ্নাবশেষ

এখনও যুধিষ্টিরের দুর্গ, যজ্ঞস্থল, নীলছত্রী প্রভৃতি ভগ্নাবশেষ তাঁহাদের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। বংশপরম্পরাক্রমে সেইগুলি যুধিষ্টিরাদির বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই দুর্গাদি যে মুসলমান সম্রাটগণের রচিত নহে তদ্বিশেষে সন্দেহ নাই। পৃথ্বী-রাজের পূর্বেও তাহাদের অস্তিত্ব ছিল। তাহাদের রচনা প্রাচীন দেখিলে বোধ হয় যে উহা প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পও নহে। সুতরাং বুদ্ধদেবের অপেক্ষা তাহারা প্রাচীন।

প্রসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব কয়েক বৎসর পূর্বে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া দিল্লীর নিকট কোন কোন স্থান খনন করতঃ কতকগুলি অদ্ভুত প্রাচীন কারুকাৰ্য্যখচিত চৌবাচ্চা বাহির করেন। ঐগুলি দেখিলেই বোধ হয় যে উহার মহাদীর্ঘ বা বৌদ্ধ শিল্প নহে, প্রত্যুত প্রাচীন হিন্দু শিল্প। এই সমস্ত দেখিয়া এখন আমাদের রাজপুরুষেরাও যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ যজ্ঞহলাদির সত্তা কথঞ্চিৎ বিশ্বাস করিতেছেন।

তৃতীয় বাহ্য প্রমাণ—লেখ্য

যুধিষ্টিরাদি যে কল্পিত জীব নহে,

তাহার যথেষ্ট সমসাময়িক ও পরবর্তী লিখিত প্রমাণ আছে। সেই সব লেখ্যের দোষ এই যে তাহার। স্বদেশী, বিদেশী নহে। যুক্তিরাদি অনুান চারি সহস্র বর্ষ পূর্বে ভারতরঙ্গে অভিনয় করেন। তখন ইউরোপ ও আমেরিকা বনময়। ইউরোপবাসি-গণ তখন অসভ্য, নগ্ন, বস্ত্রমাংসভোজী, বর্ণ-মালায় নামগন্ধও জ্ঞানেন না। তাহার অন্ততঃ একহাজার বর্ষ পরে ফিনিসিয়গণের নিকট ইউরোপীয় সভ্যতার জননী গ্রীস বর্ণ-মালা পাইয়া জ্ঞানচর্চা আরম্ভ করেন। গ্রীসের পরে রোমের অভ্যুদয়। ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, জার্মানি প্রভৃতি রোম ভাঙ্গিয়া ১০০০।১৫০০ বৎসর পূর্বে হইয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসও ১৫০০ বৎসর মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। আদিম রুটনের ইতিবৃত্ত ২০০০ হাজার বৎসর পূর্বে পাওয়া যায় না, সুতরাং পাণ্ডব-গণের সময়ে ইউরোপীয় কোন দেশের সহিত ভারতের কোনরূপ সম্বন্ধ হওয়ার সম্ভব ছিল না ও হয় নাই। ঐ সব দেশের সাহিত্য হইতে কুরুগণের ইতিবৃত্তের পরিপোষক প্রমাণ আশা করা বাতুলতা মাত্র। এজন্ত বিদেশী প্রমাণ ভিন্ন যদি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিশ্বাস করিতে না চান তাহা হইলে আমাদের প্রয়াস অরণ্যে রোদন মাত্র। এ স্থলে মনে রাখা উচিত যে কোন জাতিই স্বীয় প্রাচীন ইতিহাসের পরিপোষক প্রমাণ অপর জাতির ইতিহাস হইতে দিতে পারেন না। গ্রীকদের প্রাচীন ইতিহাস গ্রীক পুস্তকাদি হইতে বিশ্বাস করিতে হয়। রোমের ইতিহাস রোমীয় পুস্তকেই পাওয়া

যায়। সেইরূপ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ভারতের প্রাচীন গ্রন্থেই প্রাপ্য

কুরুপাণ্ডবের তিহাসের জলন্ত লেখ্য প্রমাণ—

১। পুরাণ

সকল পুরাণেই কুরুপাণ্ডবগণের ইতি-হাসের কোন না কোন অংশ আছে। কোন পুরাণের বক্তা ভীষ্মদেব, কোন পুরাণে আবার বায়ুদেবাজ্জুনের নরনারায়ণও প্রতিপন্ন।

বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, ভাগবত ও মৎস্য এই পঞ্চপুরাণেই চন্দ্রবংশের পরিচয় আছে, এবং পাণ্ডবগণের মূল ইতিবৃত্ত মহা-ভারতে যেরূপ দেওয়া আছে সেইরূপই দেওয়া হইয়াছে। পুরাণে দেবাসুর-সংগ্রাম, স্বর্গনরকাদি-বর্ণনা প্রভৃতি নানা অলৌকিক ঘটনা আছে সত্য, কিন্তু তৎসঙ্গে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ বর্ণিত। ঐ বংশাবলী অবিখ্যাস করিবার কোন সম্ভব কারণ নাই। ইংরাজি প্রত্নতত্ত্ববিদগণও এক্ষণে চন্দ্রবংশের শেষাংশ বিশ্বাস করিতেছেন। তাঁহাদেরও মতে ভারতের ইতিহাস এক্ষণে চন্দ্রবংশের তিনশত শতাব্দী পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পুরাণের উল্লিখিত জরাসন্ধবংশ বিশ্বাস না হইলেও তৎপরবর্তী পঞ্চ প্রদ্যোত, দশ স্তম্ভ, নব নন্দ, প্রভৃতি যে সত্য জীব ইহা তাত্ত্বশাসন ও মুদ্রাদি আবিষ্কৃত হওয়া বিশ্বাস করিতেছেন। পুরাণের পরবর্তী বংশাবলী এইরূপে প্রামাণিক হওয়ায় পূর্ববর্তী বংশাবলী যে বিশ্বাসযোগ্য তাহা প্রমাণিক হইতেছে। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে জরাসন্ধবংশ বিশ্বাস করিবার সম্ভব কারণ আছে। যদি পুরাণের বংশাবলী দ্বর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ আধুনিক পণ্ডিত

মণ্ডলীকে প্রবঞ্চনা করিবার বাসনায় বিষ্ণু হুংসাহস মনে হয়। অতএব পুরাণের প্রমাণে মনোমত দিয়া থাকিতেন তাহা হইলে ইহাতে যুধিষ্ঠির অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকাৰ্য্য। সেই বংশাবলীর শেষ দুই-তৃতীয়াংশ সত্য হইত না। ঐ বংশাবলীর কতদূর এক্ষণে সত্য সপ্রমাণিত হইয়াছে তাহা পরে এই প্রবন্ধে প্রকাশ পাইবে। যখন আবার বিবেচনা করা যায় যে কোন্ রাজা কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাও পুরাণে পুঙ্খানুপুঙ্খ শতাব্দী পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরাদির ঐতিহাসিকতা লিখিত তখন সেই বর্ণনা অবিশ্বাস করা স্বীকৃত।

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বেহার-চিত্র

দেওয়ানজি

(বেহারের লাল কৰ্মচারী)

জীবনের প্রত্যক্ষেই মুন্সী ছেদিপ্রসাদের চরিত্রে বিষয়বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণ অঙ্গুর দেখা গিয়াছিল। অত্যাণ্ড অল্পবুদ্ধি বালকেরা যখন “লেফ্‌ ডু গুরুজির” বৃক্ষতলস্থ পাঠশালাে বসিয়া সমস্বরে “ও নামাসি ধং গুরুজি পতং” আবৃত্তি করিত, বালক ছেদি তখন পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া নদীতীরস্থ আশ্রয়-কুঞ্জে বড়লোকের নষ্টস্বভাব ছেগেদের সঙ্গে ‘জুয়া’ খেলিয়া দুই পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করিত এবং বাবু গণেশলালের নির্জনে উদ্ভাস হইতে প্রতিদিনের ব্যবহার্য তরকারি সংগ্রহ করিত। স্নানের সময় গুরুজিরে বস্ত্র সাহায্যে নদী হইতে মৎস্য সংগ্রহ ব্যাপারেও ছেদির অঙ্গুরাগের অভাব ছিল না।

সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া কৈশোরেই ছেদি তাম্রকূট হইতে গঞ্জিকার সোপানে

আরোহণ করিয়াছিল। মাঠের খৰ্জুর বৃক্ষ হইতে গোপনে আহরিত ‘লাড়ি’র রসাবাদও তাহার অবিদিত ছিল না।

সুকুমার কৈশোরেই পোত্রের এই সর্পতোমুখী প্রতিভা দেখিয়া বৃদ্ধ দামড়িলাল সর্বদাই পুলকিত চিত্তে ভবিষ্যৎ বাণী করিতেন যে এ ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে ‘দেওয়ানজি’ না হইয়া ছাড়িবে না।

বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথরবুদ্ধি ছেদি আরও দুই একটা ওলভ বিজ্ঞা সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইল। তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান—হিসাবে গোঁজামিল দেওয়ার বিজ্ঞা এবং একজনের লেখা দেখিয়া অবিকল সেইরূপ লিখিবার কৌশল।

ছেদির পিতার একটি ক্ষুদ্র মসলার দোকান ছিল। এই দোকানই, ছেদিকে

এই দুই বিঘালাভে সাহায্য করিয়াছিল। ছেদির পিতা ভুখনলাল মধ্যে মধ্যে দোকানের জ্ঞাত জিনিষ কিনিতে যাইতেন। সেই সময়ে দোকানের ভার ছেদির উপর পড়িত। ছেদি এই সুযোগে দোকান হইতে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া গ্রাহকদের নামে খরচ লিখিয়া রাখিত এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহাদের স্বাক্ষর নকল করিবার চেষ্টা করিত।

পাঠশালা ছাড়িয়া ছেদি কিছুদিন তাহার মাতুলের নিকটে বিষয়কাণ্ড সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে আসিল। ছেদির মাতুল মুন্সী রামশরণ নাল জমিদারের 'পাটোয়ারি' ছিলেন। দলিল দস্তাবেজ লিখিতে সে অঞ্চলে না কি তাঁহার সমকক্ষ হইয়া ছিল না। ছেদি মাতুলের নিকট থাকিয়া অল্পদিনের মধ্যেই "এই ছল ভ 'দলিল মুসাবিদা' বিঘার প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করিল। বলা বাহুল্য এই উমেদারি অবস্থাতেও ছেদির অর্জনস্পৃহা একান্ত সুবৃদ্ধ থাকে নাই।

পঞ্চাশত্রে ছেদি একাঙ্গ উন্নতির গন্ধপাতী ছিল না। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাদকসেবন এবং ইন্দ্রিয়পরতার ব্যাপারেও সে সমভাবে উন্নতিসাধন করিতেছিল।

বিংশতি বর্ষ বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ছেদি কৰ্ম্মসংগ্রহের জ্ঞাত ব্যক্তি হইয়া উঠিল। বহুদিন নানাস্থানে ঘোরাঘুরি করিয়া অবশেষে মাতুলের সাহায্যে সে এক জমিদারের বহুদূরবর্তী 'মাহালে' পাঁচ টাকা বেতনের এক পাটোয়ারির পদ লাভ করিল। এই পাঁচ টাকা

সম্বন্ধেও সন্ত রহিল যে প্রজাদের দুরন্ত করিয়া দিতে না পারিলে ছেদি পূর্ণ বেতন লাভের অধিকারী হইবে না। সে অঞ্চলে গবর্ণমেন্টের জরিপ আরম্ভ হইবার কথা হইতেছিল। জরিপে একবার খাজনার হার নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে সে হার আর সহরে বর্দ্ধিত করা দুঃসাধ্য। সুতরাং পূৰ্বে হইতে খাজনা বাড়াইয়া লইতে না পারিলে জমিদারের সমুহ ক্ষতি। তাই মালিক রামপ্রতাপ সিং বহুদিন হইতে একজন উপযুক্ত কৰ্ম্মচারীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে দুইবার পাটোয়ারি পরিবর্তিত হইয়াছিল। কেহই জমিদারের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় নাই। ছেদি আশ্রিয়া 'কড়ার' করিল যে তিন বৎসরে মধ্যে যদি সে খাজনা বাড়াইয়া দিতে না পারে তাহা হইলে সে বিনা আপত্তিতে 'বরখাস্ত' হইবে এবং যতদিন না সে কার্য সিদ্ধ করিতে পারিবে ততদিন সে পাঁচ টাকার স্থলে তিন টাকা মাত্র বেতন গ্রহণ করিবে।

সন্তুষ্ট হইয়া জমিদার ছেদিকেই উপযুক্ত কৰ্ম্মচারীরূপে মনোনীত করিলেন।

"

২

কার্যভার গ্রহণ করিয়াই সূচকুর ছেদি প্রজাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে যত্নবান হইল। প্রথম সাক্ষাতেই সে প্রজাদের নিকট জমিদারের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিল এবং জমিদার যে একগুপ্ত অত্যাচারী এ কথা পূৰ্বে ঘৃণাকরে জানিতে পারিলে সে যে কদাচ এই কৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হইত না এ কথা তাহাদের বিশদরূপে

বুঝাইয়া দিল। ছেদির অকপট আত্মীয়তায় সরলচিত্ত প্রজাবৃন্দ বিমুগ্ধ হইল।

বৎসরান্তে খাজনা আদায় করিয়া ছেদি কাহাকেও রসিদ দিল না। সকলকে বুঝাইয়া দিল যে ছাপা রসিদ আনিতে লোক গিয়াছে, আসিলেই সকলকে রসিদ পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

পর বৎসরও ছেদি খাজনা লইয়া রসিদ দিল না। প্রজাদের বলিল যে রসিদ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু রসিদে জমিদারের স্বাক্ষর ছিল না। সেইজন্য সে সমস্ত রসিদ জমিদারের নিকট ফেরত দিয়াছে। জুয়াচোর জমিদার তাহাদের সরল পাইয়া ঠকাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু মুন্সী ছেদিপ্রসাদকে যিনি ঠকাইবেন তাহাকে 'গঙ্গাজি'তে মুখ ধুইয়া আসিতে হইবে।

পাটোয়ারির চতুরতা এবং প্রজাপ্রীতি দেখিয়া প্রজাবৃন্দ অধিকতর বিমুগ্ধ হইল।

তৃতীয় বৎসরে ছেদি প্রজাদের ডাকাইয়া গোপনে বলিল যে পাষাণ জমিদার তাহাদের খাজনা সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগ করিবার চেষ্টায় আছে, এই সময় হইতে তাহাদের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্তব্য, নহিলে ইহার পর বড় বিপদে পড়িতে হইবে। 'প্রজারা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে এজন্য কি উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। ছেদি বলিল তাহাদের যাহার নিকটে যত পুরাতন রসিদ আছে, সমস্ত যদি তাহারা তাহার কাছে আনিয়া দেয় তাহা হইলে সে অবশ্যই একটা সহপায় বাহির করিতে পারে। প্রজারা তাহাই

করিল। ছেদিপ্রসাদ রসিদগুলি লইয়া গিন্দুকে তুলিয়া রাখিল। প্রজাদের বলিল, এ সম্বন্ধে একবার সদরে গিয়া উকীলদের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যিক। এই সুযোগে ছেদি প্রজাদের তৃতীয় বৎসরের খাজনারও রসিদ দিল না। চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভে ছেদি জমিদারের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে অশ্রাব্য 'গালি' দিতে দিতে প্রজাবৃন্দকে জানাইল যে পাষাণ জমিদার শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে অধিক খাজনা দাবি করিয়াছে। প্রথমবারই পাষাণের এই প্রকার ছুরতিসন্ধি ছিল, কিন্তু ছেদি তাহাকে বহু কষ্টে এতদিন নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিল! মক্ৰোধে ছেদি প্রজাদের আদেশ করিল তাহারা যেন কোন মতেই এই অত্যাচারী জমিদারের অগ্রায় আদেশ পালনে সম্মত না হয়।

কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রবাক্ত প্রজাবর্গ সভয়ে জানিল যে তাহাদের নামে তিন বৎসরের বাকি খাজনার নাগিশ হইয়াছে এবং ছেদিপ্রসাদের গিন্দুক হইতে প্রজাদের সমস্ত পুরাতন রসিদ জমিদারের গুপ্তচর কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। প্রজারা আসিয়া ছেদির কাছে কাঁদিয়া পড়িল। শুনিয়া ছেদিপ্রসাদ ক্রোধে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না "উঃ এতদূর অত্যাচার, একুপ ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা!" বলিতে বলিতে ছেদি নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। বিনা রসিদে খাজনা দেওয়ার কথা আদ্যন্তে গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না—পুরাতন রসিদের অভাবে খাজনার হার সম্বন্ধে প্রশ্নও

বিলুপ্ত হইয়াছিল। কাজেই বাধ্য হইয়া প্রজাদের নূতন করিয়া জমিদারের নামে বর্দ্ধিত হারে কবুলিয়ত লিখিয়া দিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া লইতে হইল।

যেদিন সমস্ত কবুলিয়ত রেজিষ্টারি হইয়া গেল সেইদিনই ব্যথিত হৃদয়ে ছেদি-প্রসাদ উদ্যত রোষে সর্বসমক্ষে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে যদি আর এক মাসের অধিক এ কর্মে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সকলে যেন তাহার জন্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ করে!

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছেদি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল। একমাসের মধ্যেই সে নিজের কর্মদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ তহশীলদারের পদে উন্নীত হইয়া মহেশপুর ত্যাগ করিয়া গেল।

৩

তহশীলদার নিযুক্ত হইয়া দৌলতপুরে আসিয়া ছেদি দেখিল যে নূতন করিয়া জমির বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে উত্তমরূপে অর্থ-সংগ্রহের সুযোগ নাই। সুতরাং ছেদি প্রজাদের নিকট 'নোটিস' পাঠাইল যে তাহাদের অধিকৃত সমস্ত জমির পুরায় জরিপ করাইতে হইবে; কেননা তাহারা কবুলিয়ত-লিখিত জমি অপেক্ষা অনেক অধিক জমি বিনা খাজনায় অন্মায় পূর্ণক দখল করিতেছে।

দৌলতপুরের প্রজারা অধিকাংশই 'বাতন'। ছেদির অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহারা মন্ত্রণা করিয়া লোকমুখে ছেদিকে জানাইল যে এখানে কোন প্রকার 'লালাগিরি' খাটিবে না, তাহাদের জমিতে

যে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করিবে তাহাকে মন্তকটী স্থানান্তরে রাখিয়া আসিতে হইবে।

ছেদি বুঝিল মহেশপুরের কৌশল এখানে খাটিবে না। এখানকার জ্ঞাত রীতিমত প্রস্তুত হইতে হইবে। সুতরাং সৰ্ব্বাঙ্গে সে জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া প্রজাদের অন্মায় অত্যাচারের কথা সবিস্তরে তাহাকে বুঝাইয়া বলিল। রাজস্ব-বৃদ্ধির আশায় লুক্র জমিদার হুকুম দিলেন যে এজ্ঞাত যত টাকার প্রয়োজন হইবে সমস্ত 'সরকার' হইতে প্রদত্ত হইবে। কোন প্রকারে কার্যাসিদ্ধি হওয়া চাই। জমিদারের কথায় আশ্বস্ত হইয়া ছেদি প্রথমেই দারোগা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। দারোগা-জয়ের অব্যর্থ মন্ত্র সুচতুর ছেদি প্রসাদের অবিদিত ছিল না। অল্প দিনের মধ্যেই দারোগা সাহেব ছেদির একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন।

দারোগাকে হস্তগত করিয়া ছেদি এক দল লাঠিয়াল সংগ্রহ করিল এইরূপে সর্বপ্রকারে স্বরক্ষিত হইয়া ছেদি সমুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।

বিদ্রোহীদের অগ্রণী ছিল দুর্দ্ধর্ষ 'বাতন' বাবু রামলোচন সিং। ছেদি সর্বপ্রথমে রামলোচনের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে পরদিন প্রভাত হইতে তাহার জমির 'পয়মাইস সুরু' হইবে।

শুনিয়া রামলোচন সিংহের মত গর্জিয়া উঠিল, তাহার মাথার উপর মাথা আছে সেই যেন রামলোচন সিংহের জমি দখল করিতে আসে। গোপনে সংবাদ লইয়া ছেদি জানিল যে রামলোচন রাজির মধ্যে

বিস্তর লোকজন সংগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে ছেদির সাহসে কুলাইল না। ছেদি 'গোপনে লাঠিয়ালদের হুকুম দিল যে, রাত্রির অন্ধকারে এক শত মহিষ লইয়া তাহার। যেন রামলোচনের ক্ষেত্রস্থিত পরিপুষ্ট ধাতুশ্রেণী সমস্ত 'চরাইয়া' দেয়। কিন্তু এ সংবাদ কেমন করিয়া রামলোচনের কাণে পৌছিল।

ফলে নিশাচর লাঠিয়াল সম্প্রদায় লণ্ডাঘাতে জর্জরিত দেহে বৃদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং তাহাদের ক্ষুধাতুর মহিষযুগল নিকটবর্তী 'পাউণ্ডে' প্রেরিত হইল।

নিষ্ফল ক্রোধে গর্জিতে গর্জিতে ছেদি রামলোচনের সর্বনাশের জ্ঞান মনে মনে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিল।

তিন মাস ধরিয়া নানা কাগজপদ দলিল-দস্তাবেজ লইয়া ছেদি যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল, দারোগা সাহেবের সঙ্গেও মধ্যে মধ্যে গোপনে গভীর মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। তিন মাস পরে একদিন প্রত্যুষে সহসা দারোগাসাহেব সদলে দৌলতপুর, আক্রমণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রামলোচন ও তাহার ছয়জন প্রধান সাগাণ্যকারী গ্রেপ্তার হইল। অভিযোগ গুরুতর—ডাকাতি, জীলোকের প্রতি অত্যাচার, গৃহদাহ। অভিযোগের মর্ম শুনিয়া রামলোচন ও তাহার সহচরগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা 'ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না।

সুচরিত্র ছেদিপ্রসাদ মহেশপুর পরিত্যাগ কালে এক নিম্নশ্রেণীর যুবতীকে সংগ্রহ

করিয়া আনিয়াছিলেন। গ্রামের এক নির্জন প্রান্তে তাহার জ্ঞান এক ক্ষুদ্র গৃহে নিশ্চিত হইয়াছিল। অভিযোগকারী সেই যুবতী এবং তাহার এক দাসী।

যুবতী অবলীলাক্রমে আদালতে সকলকে সনাক্ত করিল এবং দাসী তাহার প্রত্যেক কথার সমর্থন করিল। প্রমাণ-প্রয়োগের কিছুমাত্র অভাব রহিল না। সর্বাপেক্ষা অকটা প্রমাণ হইল রামলোচনের স্বহস্ত-লিখিত এক পত্র।

রামলোচন তাহার সঙ্গী গঙ্গাধর সিংকে এই পত্র লিখিয়াছিল। পত্রে অভিযোগের প্রায় সকল কথাই ইঙ্গিতে লিখিত ছিল এবং সঙ্গীদের নামেরও সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। পত্র অর্দ্ধদক্ষ অবস্থায় যুবতীর ভগ্নীভূত গৃহে পাওয়া গিয়াছিল। রামলোচনের লিখিত নানা দলিলের লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দেখা গেল যে পত্রের লেখা অবিকল দলিলের লেখার অনুরূপ। সাদৃশ্য দেখিয়া স্বয়ং রামলোচনই বিস্মিত হইয়া গেল। একপ প্রভূত প্রমাণের পর নিরুত্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়?

দায়বীর বিচারে রামলোচন এবং তাহার সঙ্গীদের প্রত্যেকের ৫ হইতে ৭ বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইল। ইহার পর কাহার সাধ্য প্রবল-প্রতাপ ছেদিপ্রসাদকে বাধা দেয়? ছেদি যাহা বলিল প্রজারা তাহাতেই স্বীকৃত হইল। জমিদারের খাজনা অর্ধেকের অধিক বাড়িয়া গেল এবং প্রভুভক্ত ছেদি শুদ্ধ সেলামিতেই প্রায় পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন করিল। নিতান্ত দ্রুত হইয়া

জমিদার ছেদিকে সদরের নায়েবের পদে নিযুক্ত করিলেন।

৪

সদরে আসিয়া ছেদি দেখিল যে দেওয়ানজিকে স্থানচ্যুত করিতে না পারিলে তাহার পক্ষে পূর্ণ প্রতিপত্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। দেওয়ানজি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিশ্বাসী এবং প্রভুভক্ত, সুতরাং সহসা তাহার অনিষ্ট করা দুরূহ। সুতরাং অতি সন্তর্পণে ছেদিকে এ পথে অগ্রসর হইতে হইল। ছেদির কীর্তিকাহিনী ইতিপূর্বেই দেওয়ানজির কর্ণগোচর হইয়াছিল। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে দেওয়ানজি পূর্ব হইতেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ছেদি এ কথা বুঝিতে পারিয়া প্রথম হইতেই দেওয়ানজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব দেখাইতে লাগিল এবং প্রত্যেক বিষয়ে তাহার পরামর্শ লইয়া চলিতে লাগিল।

ছেদির কপটতা বুঝিতে না পারিয়া দেওয়ানজি ক্রমে ক্রমে ছেদি সম্বন্ধে অনেকটা আশঙ্ক হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছেদি প্রভুর চরিত্রটাও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। অল্পদিনেই সে বুঝিল যে প্রভুর চরিত্রে দুর্বলতার অভাব নাই। মনুষ্যচরিত্রে যে পথ ধরিয়া সয়তান প্রবেশ করিতে থাকে বাবু রামপ্রতাপের চরিত্রে তাহার অধিকাংশই উন্মুক্ত। দুরাকাজ্ঞা, লোভ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, মাদক দ্রব্যের প্রতি অমুরাগ—সকলগুলিই রামপ্রতাপের চরিত্রে অল্লাধিক প্রবল মূর্তি ধারণ করিয়াছিল, অথচ বুদ্ধির তাদৃশ তীক্ষ্ণতা ছিল না।

সুযোগ বুঝিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি নায়েব প্রথমেই প্রভুবশীকরণে প্রবৃত্ত হইল।

ছেদি উৎকৃষ্ট সুরা প্রস্তুত করিবার কৌশল অবগত ছিল। সে গোপনে সুরা প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে উপহার দিতে লাগিল। তাহার প্রযত্নে রামপ্রতাপের বিলাসভবন দেখিতে দেখিতে নব নব নর্তকী ও বিলাসিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অতি অল্পদিনের মধ্যে রামপ্রতাপ নরকের পথে বহুদূর অগ্রসর হইলেন।

তখন 'কোকেন' মাদক দ্রব্যের মধ্যে অধিকার বিস্তার করিতেছিল। ছেদি প্রভুকে ইহাতেও দীক্ষিত করিল।

ক্রমে ক্রমে রামপ্রতাপের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইতে লাগিল। ছেদি তাহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা করাইয়া লইতে লাগিল।

বুদ্ধ দেওয়ানজি প্রভুকে অনেক বুঝাইলেন, ছেদি সম্বন্ধে তাহাকে সতর্ক হইতে বলিলেন, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন রামপ্রতাপ সে কথা কাণে তুলিলেন না। অবসর বুঝিয়া ছেদি দেওয়ানজির সর্বনাশ করিবার সুযোগ অবেষণ করিতে লাগিল।

'হোলি'র উৎসব মহাসমারোহে আরম্ভ হইয়াছে। রামপ্রতাপের বিলাসকুঞ্জে বিলাসের স্রোত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে—সুরা, ভাঙ, গজিকা, কোকেন, চণ্ডুর অবাধ প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। নানাদেশ হইতে সমাগত শ্রদ্ধারীকুল লালসার অগ্নিকুণ্ডে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাইতেছে।* রামপ্রতাপ ধীরে ধীরে পশুত্বের নিম্নতম "সোপানে অবতীর্ণ হইতেছেন। এমন সময় সজল-চক্ষু ছেদি আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ছেদিকে দেখিয়া শিথিলবেশ রামপ্রতাপ বাহু প্রণারণ করিয়া সুরাজড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ‘আও মেরা, ভাই জান!’ ছেদি তাঁহার উদ্যত বাহুপাশ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিল যে, সে তাঁহার চরণে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। উদ্বেজিত রামপ্রতাপ বলিলেন “কৈও?” সুযোগ পাইয়া নানা অলঙ্কার সংযোগ করিয়া ছেদি প্রভুকে বুঝাইয়া দিল যে দেওয়ানজি তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে আর তাহার ‘সরকারে’র বাটীতে কাজ করা অসম্ভব। এরূপ ভাবে অপমানিত হইয়া কার্য্য করা ‘অপেক্ষা’ ভিক্ষা করিয়া প্রাণধারণ করাও শ্রেয়ঃ। বলিতে বলিতে ছেদি উদ্বেগিত অভিমানে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

বিকৃতচিত্ত রামপ্রতাপ হুঙ্কার করিয়া বলিলেন “বোলাও শালে দেওয়ানকে।”

ক্ষণকাল পরেই দেওয়ানজি আদিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ানজিকে দেখিয়া রামপ্রতাপ চীৎকার করিয়া ছেদিকে বলিলেন “লাগাও শালা দেওয়ানকে। বিশ জুতি হামারা সামনে”—প্রভুর অবস্থা দেখিয়া দেওয়ানজি স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ছেদি প্রভুর কাণে কাণে বলিয়া দিল—“দেখিতেছেন উহার বেয়াদবি, আপনাকেও গ্রাহ্য করিতেছে না!” ক্রোধে রামপ্রতাপ বিকট চীৎকার করিয়া দেওয়ানজিকে, অযথা গালি দিয়া পেরাদুকে হুকুম দিলেন “উস্কে কাণ পাকড়কে নিকাল দেও।”

দেওয়ানজি দেখিলেন এ সংসারে আর

ভদ্রহতা নাই। স্তব্ধাং অপমানিত বৃদ্ধ ছেদির প্রতি একবার তীক্ষ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিদীর্ঘমান হৃদয়ে প্রভুগৃহের নিকট নীরবে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া গেলেন। সেই নর্ত্তকীকণ্ঠযুগ্মরিত, সুরাসিক্ত, অহিফেন ও গঞ্জিকাধূমাক্তকার নরকে, ছেদিপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ দেওয়ানজির পক্ষে উন্নীত হইলেন।”

৫

বহুকণ্ঠে চিরপ্রার্থিত উন্নতি লাভ করিয়া এইবার ছেদিপ্রসাদ প্রাণ ভরিয়া ভোগসুখে মনোনিবেশ করিলেন। রামপ্রতাপকে বুঝাইয়া দিলেন যে একটু ‘ধুমধাম’ না করিলে গভর্ণমেন্টের নিকট সম্মানলাভ করা অসম্ভব।

রামপ্রতাপ ও দেওয়ানজি উভয়ের অল্প নূতন করিয়া বিশাল অট্টালিকা নির্মিত হইল। সুদৃশ্য বৃক্ষলতায়, চিত্রে মর্ম্মরে, মূল্যবান গৃহসজ্জায় অট্টালিকাঘর সুশোভিত হইল—হস্তী, অশ্ব, মোটর ও কিটনের অভাব রহিল না। নৃত্যগীত, আমোদ-প্রমোদ, উৎসব, প্রীতিভোজ গৃহের নিত্য সহচর হইল। চারিদিক হইতে কলাকুশলা, সুন্দরীকুল সমাহৃত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে খেতাপসমাজের ষোড়শোপচারে পূজা চলিতে লাগিল। তাঁহাদের যুগ্ম-ব্যাপারে, প্রীতিভোজে, নৃত্যোৎসবে রক্তকণিকা রুষ্টি-ধারার ঞায় অজস্রধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। দেওয়ানজির ঐর্ষ্যা ও সমৃদ্ধি দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাঁহার রাজোচিত বেশভূষা তাঁহার যান-বাহন, তাঁহার অকাতর আতিথেয়তা,

তঁাহার মুক্তহস্তে অর্থরূপ—যে দেখিল সেই
বিস্মিত হইল। রামপ্রতাপ কর্মচারীর কার্য-
কুশলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

কিন্তু এরূপ অপব্যয়ে রাজার ঐশ্বর্য্যও
লুপ্ত হইয়া যায়, রামপ্রতাপের মত ক্ষুদ্র
জমিদারের ত কথাই নাই। সুতরাং ঋণের
শত্রুপাত হইল। রামপ্রতাপ চক্ষু বুজিয়া
সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া দিতে
লাগিলেন এবং দেওয়ানজি যথেষ্ট হারের
সুদে যথেষ্ট ঋণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।
দেখিতে দেখিতে ঋণভার দিনে দিনে
বন্ধার মত স্কীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? টাকা
বড় না ‘ইজ্জত’ বড়? সুতরাং এ
অবস্থাতেও ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া
রামপ্রতাপের দুই কন্ঠার বিবাহ হইল।
অবশ্য ব্যয়ভার সমস্তই ছেদিপ্রসাদের
উপর। নিশ্চিতচিত্ত রামপ্রতাপ কেবল
বিলাসের অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া
সুরারঞ্জিত নেত্রে যুবতীর বিধাধরে বর্গের
সুখমা দর্শন করিতে লাগিলেন।

৬

কিন্তু ক্রমশঃ ঋণের মাত্রা জমিদারীর
মূল্য ছাড়াইয়া উঠিল। ছেদিপ্রসাদ ঋণ-
গ্রহণের সময়ে সুদের দিকে আদৌ দৃকপাত
করেন নাই। যে যাহা চাহিয়াছিল
তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং
ঋণের পরিমাণ অতি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি
পাইতেছিল। এত দিনে মহাজনেরা অধীর
হইয়া নালিশ করিতে উত্তত হইল।

ব্যাপার দেখিয়া রামপ্রতাপের বন্ধু-
বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ব্যাকুল হইয়া রাম-

প্রতাপকে ধরিয়া বসিল যে এখনো সাবধান
না হইলে সর্বনাশ হইবে।

বিহ্বলচিত্ত রামপ্রতাপ বলিলেন, “এ
বিষয়ে যা বলিতে হয় আমার দেওয়ানজিকে
বল। আমার টাকা পরসার হিসাব
করিবার অবসর নাই।”

বন্ধুবান্ধবদিগের এই অত্যাঘ উপদ্রবের
কথা অবগত হইয়া দেওয়ানজি দৌরি হইতে
দুইজন নূতন নর্তকী আনাইয়া দিলেন।
রামপ্রতাপের অবসর আরও কমিয়া গেল!

হতাশ হইয়া হিতৈষী বৃন্দ কালেক্টর
সাহেবকে ধরিয়া বসিল যে তিনি সাহায্য
না করিলে বহু কালের একটা পুরাতন বংশ
বিলুপ্ত হয়।

কালেক্টর সাহেব সন্দেহ ব্যক্তি। সকল
ব্যাপার শুনিয়া তিনি রামপ্রতাপের সম্পত্তি
‘কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের’ তত্ত্বাবধানে দিবার
জর্ত্তা চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন।

শুনিয়া দেওয়ানজি উদ্বিগ্ন হইয়া
উঠিলেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের চেষ্টাই
সফল হইল। দেওয়ানজি মালিককে দিয়া
আপত্তি করাইয়া, ডাক্তার সাহেবের প্রশংসা-
পত্র সংগ্রহ করিয়া ‘রেভিনিউ বোর্ডে’
‘কারোয়াই’ করিয়াও কোন মতে ‘কোর্ট
অব্ ওয়ার্ডসের’ ভীষণ কবল হইতে
প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না।

তিন মাসের মধ্যেই কালেক্টর সাহেবের
নিকট হইতে আদেশ আসিল যে এক
মাসের মধ্যে ‘কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস’ কর্তৃক
নিযুক্ত ম্যানেজারকে সমস্ত হিসাব ও
সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতে হইবে।

বিপন্ন দেওয়ানজি বহু কালের পর ধূলি-

ধূসরিত পুরাতন, খাতাপত্র টানিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু বুঝা চেষ্টা। বহুকাল হিসাব লেখাই হয়, নাই। প্রজ্ঞাদের নিকট কতই বা বাকি আছে, আর কতই বা আদায় হইয়াছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেওয়ানজি উত্তরীয় বস্ত্রে ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন।

* * * *

হিসাব দিবার আর দুই দিনমাত্র বাকি। সমস্ত কাগজপত্র আফিস-দরে সুগচ্ছিত। দেওয়ানজির মুখমণ্ডল চিন্তাশেষীন।

সন্ধ্যাকালে আফিস হইতে বাড়ী যাইবার সময় দেওয়ানজি আফিসের চৌকিদারকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন যে, সে যেন খুব সাবধানে পাহারা দেয়। আফিসে বিস্তর মূল্যবান কাগজপত্র রহিল। চৌকিদার মস্তক অবনত করিয়া সেলাম করিল।

চৌকিদার চারি দিক দেখিয়া রাত্রি দশটার সময়, অভ্যাসমত আপাদ-মস্তক বস্ত্রাধৃত করিয়া খাটির উপর শয়ন করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

গভীর রাত্রে বিকট শব্দে চৌকিদারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। •সৈ জাগিয়া উঠে চাহিয়া দেখিল হতাশনের লোলরসনা দিগন্ত প্রদীপ্ত করিয়া আফিস-গৃহের বংশনির্মিত চালে ভীষণ প্রতাপে নৃত্য করিতেছে। ছুটিয়া গিয়া সে দেওয়ানজিকে এই ভীষণ সংবাদ আপন করিল।

নিদ্রাজড়িতচক্ষু দেওয়ানজি 'সংবাদ পাইয়া' শিথিলবস্ত্রে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া

চৌকিদারকে তৎক্ষণাৎ পুলিশে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন। তাহার পর যখন দেখিলেন অগ্নিশিখা গৃহের চারিদিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, তখন শিথিল-বস্ত্রে উন্নতের মত দহমান গৃহের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পুলিশ আসিয়া দেখিল দেওয়ানজি অর্দ্ধবিবস্ত্রবেশে আফিস-গৃহের চারিপাশে উন্নতের ত্রায় চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "হায় হায় আমার সন্নাশ হইল। ওই ঘরে আমার চিরজীবনের সম্বল ১০ হাজার টাকার খুচরা নোট ছিল। আগুন নিভাও, আগুন নিভাও। এক এক কলসী জ্বল, এক এক মোহর। বাঁচাও ভাই, বাঁচাও।"

দারোগাকে সম্মুখে দেখিয়া দেওয়ানজি উন্নতের মত ভীষণ অগ্নিতরঙ্গ মধ্যে কাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দারোগা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। চীৎকার করিয়া দেওয়ানজি বলিতে লাগিলেন "হায় হায় হানারা সব গিয়া, আর হাম্‌কো তি জানে দিজিয়ে।"

অগ্নি যখন নির্ঝাপিত হইল, তখন সমস্ত ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। হিসাবের একখানি ছিন্ন কাগজ পর্যাস্ত অবশিষ্ট নাই।

তৃতীয় দিনে শোকার্ত দেওয়ানজি ললাটে করাবাত করিতে করিতে ম্যানেজার সাহেবকে শূণ্য থলি এবং কয়েক লক্ষ টাকার ঋণভার সমর্পণ করিয়া আনতমুখে আপনার জন্মভূমিতে ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

রামাবতী

(১)

বাক্সালার পালবংশীয় রাজাদিগের খেব রাজধানীর নাম 'রামাবতী'। ইতিহাস-বিমুখ বাক্সালাদেশের অধিবাসিগণ তাহার নাম পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার বড় দরগায় [সেক্ষ শুভোদয়া নামক] একখানি হস্তলিখিত পুথি বহুদিবস হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতে-ছিল। তাহার প্রতি যখন পণ্ডিতসমাজের প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হয়, তখন তাহার এক স্থলে 'রামাবতী'র নাম দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। রামাবতী যে একদিন বাক্সালাদেশের রাজধানী ছিল, সে কথা তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তাহার পর ক্রমে ক্রমে 'রামাবতী'র অনেক পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বুকানন হামিল্টন্ বরেন্দ্রভূমির নানাস্থানের পরিদর্শনকার্য শেষ করিয়া এক 'রিপোর্ট' লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহা বিলাতে এবং এদেশেও মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থে একটী জনশ্রুতি উল্লিখিত হইয়া-ছিল। তাহার মর্ম্ম এই যে,—“প্রায় এ দ্বাদশ বৎসর পূর্বে, বরেন্দ্রভূমিতে এক কৈবর্ত রাজার অভ্যুদয় হইয়াছিল;—তাহার কীর্তিকালাপের কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়;—ভীম নামক এক রাজার নামও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়।” একশত বৎসরের মধ্যে সে জনশ্রুতি

আগও তুর্ল হইয়া পড়িয়াছে। এখনও ভীমরাজার নাম শুনিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এখনকার জনশ্রুতি তাঁহাকে আর সহস্রবৎসর-পূর্বকালবর্তী নরপতি বলিয়া বর্ণনা করে না—তাঁহাকে [মধ্যম পাণ্ডব] ভীম বলিয়াই প্রচারিত করে! বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে [রাজসাহীর অন্তর্গত গোদাগাড়ী অঞ্চলে] এবং উত্তর-পূর্ব প্রান্তে [বগুড়ার অন্তর্গত 'মহাস্থানে'র নিকটে] স্থানে স্থানে যে সকল পুরাতন যন্ত্রাচারের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এখন [রাজসাহী অঞ্চলে] 'ভীমের ডাইঙ্গ', এবং [বগুড়া অঞ্চলে] 'ভীমের জঙ্গল' বলিয়া পরিচিত। তাহার সহিত যে 'রামাবতী'র কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা কল্পনা করিবারও উপায় ছিল না। এই সকল উচ্চভূমির রহস্যভেদের জন্ত কোন কোন রাজপুরুষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা ইহাকে জলপ্লাবন-নিবারণের 'বঁধ' মনে করিয়াও, সম্পূর্ণরূপে সংশয়শূন্য হইতে পারেন নাই। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বারাণসীধামের নিকট-বর্তী কমৌলিগ্রামে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত ও সুপণ্ডিত ডাক্তার ভিনিস্ কর্তৃক প্রকাশিত হইলে * জানিতে পারা গিয়া-ছিল,—বিগ্রহপালদেবের রামপাল নামক এক পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। তাহার কথা তাম্রশাসনে এইরূপে উল্লিখিত আছে,—

“তত্ত্বোজ্জ্বলপৌরুষশ্চ নৃপতে:

শ্রীরামপালোহভবৎ

পুত্রঃ পালকুলাক্ষি-শীতকিরণঃ

সাম্রাজ্য-বিখ্যাতিভাক্।

তেনে যেন জগজ্জয়ে জনকভূ-লাভাৎ

মুখাবৎ যশঃ

ক্ষৌণী-নায়ক-ভীমরাবণ-বধাৎ

যুদ্ধার্ণবোন্নজ্ঞানাৎ

ইহাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল,—
রামপাল অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের মতই
(যথাবৎ) যশঃ বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন।
কারণ, উভয়েই ‘যুদ্ধার্ণব’ উল্লঙ্ঘন করিয়া-
ছিলেন; উভয়েই ‘জনকভূ’ লাভ করিয়া-
ছিলেন; উভয়েই ‘ভীমরাবণ’ বধ করিয়া-
ছিলেন। অধ্যাপক ভিনিস্ এই শ্লোকের
[রামপাল-পঙ্কের] বাখ্যায় লিখিয়াছিলেন,
—রামপাল [জনকভূ-মিথিলা জয় করিয়া,
ভীম নামক মিথিলারাজকে নিহত করিয়া-
ছিলেন;—কিন্তু ভীম নামক কোনও রাজা
কখন মিথিলার রাজা থাকা জানিতে পারা
যায় নাই বলিয়া, অধ্যাপক ভিনিস্ আত্ম-
সিদ্ধান্তে সংশয় প্রকাশ করিয়া, নিরস্ত
হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তৎকালে এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য
হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে অন্তরায়ের অভাব
ছিল না। ‘জনকভূ’-শব্দের এক পঙ্কের
অর্থ (সীতাদেবী) সুগম হইলেও, অল্প
পঙ্কের অর্থ সুগম ছিল না। কারণ, পাল-
রাজগণ যে ষাণ্মালী ছিলেন, সে কথা তখন
অনেকেই জানিতেন না; যাহারা বা
জানিতেন, তাহারাও মানিতেন না। সুতরাং
জনকভূ-শব্দের ‘জন্মভূমি’-অর্থ গ্রহণ না

করিয়া, অধ্যাপক ভিনিস্ মিথিলা-অর্থ
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তারানাথ বরেন্দ্রভূমিকে পাল-নরপাল-
গণের জন্মভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়া
গিয়াছেন,—হামিল্টনও সহস্রবৎসর-পূর্ব-
কালবর্তী ভীম-রাজার নামোল্লেখ করিয়া
গিয়াছেন। তৎপ্রতি দৃষ্ট্য করিলে, এই
শ্লোকেই বুঝিতে পারা যাইত,—ভীমরাজকে
নিহত করিয়া, বরেন্দ্রভূমির উদ্ধার সাধন
করিয়াছিলেন বলিয়া, রামপালদেবও শ্রীরাম-
চন্দ্রের ত্যায় [যথাবৎ] যশঃ বিস্তীর্ণ করিয়া-
ছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেও,
সকল কথা বুঝিতে পারা যাইত না।
বিগ্রহপালদেবের রাজ্যে ভীম কেমন করিয়া
অধিকার লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন, তাহার বহুশ্বেদ করা সম্ভব
হইত না।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ছয় সাত বৎসর পরে,
দিনাজপুরের অন্তর্গত মনহলি গ্রামে
‘আবিষ্কৃত রামপালদেবের পুত্রের [মদন-
পালদেবের] তাম্রশাসনখানি বন্ধুবর
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
মহাশয়ের হস্তগত হয়, এবং তাহারই
অধ্যবসায়ে তাহার পাঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-
পরিষৎ-পত্রিকায় এবং বঙ্গীয় এসিয়াটিক
সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
তাহারও একটি শ্লোকাংশে দেখিতে পাওয়া
যায়,—

“এতস্তাপি সহোদরো নরপতিঃ

দ্বিবাশ্রজ্ঞানিভর

ক্ষোভাহুতবিধৃত-বাসবধৃতিঃ

শ্রীরামপালোহভবৎ ॥”

এই তাম্রশাসনেই জানিতে পারা যায়,—বিগ্রহপালদেবের পুত্র মহীপাল রাজা হইবার পর, তাঁহার কনিষ্ঠ শূরপাল রাজা হন; এবং তাঁহার পর, তাঁহার সহোদর [এতস্থাপি সহোদরো] রামপালও রাজা হইয়াছিলেন। [৩৭কালে] শ্লোকটির পাঠোদ্ধারে -কিছু গোলযোগ থাকিলেও, মোটের উপর জানিতে পারা গিয়াছিল,—রামপাল রাজার সঙ্গে স্বর্গাধিপতি 'বাসবে'র কোন না কোন বিষয়ে তুলনা করা হইয়াছে। রাজকবি কোন বিষয়ে কিরূপ তুলনার অবতারণা করিয়া, ইঙ্গিতে কোন ঐতিহাসিক তথ্যের আভাস দিয়া গিয়াছেন, লিপি-পাঠ মুদ্রিত করিবার সময়ে, তাহার রহস্য ভেদের ক্ষমতা যথাযোগ্য চেষ্টা প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসের 'এসিয়াটিক সোসাইটির প্রসিডিং' প্রকাশিত হইলে জানিতে পারা গিয়াছিল,—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ মহোদয় নেপাল হইতে সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত 'রামচরিতম্' নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ আনয়ন করিয়াছেন; তাহাতে [বিগ্রহপালদেবের স্বর্গারোহণের পর] কৈবর্ত-বিপ্লবে বরেন্দ্রী ভীম রাজার হস্তগত হইবার, ও [রামপাল-দেব কর্তৃক ভীম নিহত হইবার পর] বরেন্দ্রী রামপালদেবের হস্তগত হইবার বিবরণ উল্লিখিত আছে। আরও জানিতে পারা গিয়াছিল যে,—এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার অবসানে, রামপালদেব কর্তৃক 'রামাবতী' নিশ্চিত হইয়াছিল।

এই বিবরণের সাহায্যে মদনপালদেবের

এবং বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনোক্ত রামপাল-দেবের কীর্ত্তিবিজ্ঞাপক কবি-প্রশস্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্ঘাটিত করিবার সুবিধা ঘটিলেও, তাহা প্রচারিত না হইয়া, যাহা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে 'রামচরিতম্' কাব্যখানি সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এখন সকলেই জানিতে পারিয়াছেন,—'কৈবর্ত-বিপ্লব'—'ভীমরাজার উত্থান ও পতন'—তাহার অবসানে 'রামাবতী' নগর নির্মাণ,—বাসালীর ইতিহাসের উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির 'গোড়রাজমালা' গ্রন্থেও তাহা সাদরে উল্লিখিত হইয়াছে।

তথাপি এখনও অনেক কথা তর্কসম্মূল হইয়া রহিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে,—'রামচরিতম্' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই, তাহার সকল কথা সর্ব্বাংশে বোধগম্য হইতে পারে নাই। 'রামচরিতম্' শ্লষ্টকাব্য বলিয়া, এক অর্থে শ্রীরামচন্দ্রের 'সীতা-উদ্ধার' এবং অল্প অর্থে রামপালদেবের 'বরেন্দ্রী-উদ্ধার' বিবৃত করিতে গিয়া, [শ্লেষের অনুরোধে] সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার কাব্যখানি দুর্বোধ করিয়া দিয়াছেন। কিয়দংশের টীকা প্রাপ্ত হইলেও, [অনুবাদের অভাবে] সটীক শ্লোকগুলিও সকলের বোধগম্য হইতে পারে নাই। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় [ইংরাজি ভাষায় লিখিত] ভূমিকায় কাব্যোক্ত বিষয়ের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদানের ক্ষমতা করিয়াছেন, তাহাতে সকল কথা যথাযোগ্যভাবে আলোচিত

হইতে পারে নাই। এমন কি, 'রামাবতী' কোথায় নির্মিত হইয়াছিল, তাহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাবেই আলোচিত হইয়াছে ; এবং পূর্ববঙ্গের রামপাল নামক স্থান 'রামাবতী' বলিয়া [পার্শ্ব ঢিকায়] ইঙ্গিত মাত্রেই সূচিত হইয়াছে।

এখন আর 'রামাবতী'র কথা কল্পনার সাহায্যে আলোচিত হইতে পারে না। এখন এই গ্রন্থোক্ত শ্লোকাবলীর সাহায্যেই অল্প-সন্ধান-কার্য পরিচালিত করিতে হইবে ;— 'রামচরিতম্' কাব্যের সকল কথা যথাযোগ্য ভাবে বুঝিবার জন্য, [প্রয়োজন হইলে,] নানাস্থান পরিদর্শনের ক্রেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিতে হইবে। গৃহে বসিয়া 'সর্বজ্ঞ' সাজিবার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, তথ্য-সন্ধানের আশায় যেখানে যাওয়া উচিত মনে হইবে, সেখানেই গমন করিবার জন্য স্বদেশবাসীকে উৎসাহ দান করিতে হইবে ; কখন কখন বিকলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলে, পরাজয়কেও ভবিষ্যতের বিজয়লাভের সোপান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক তথ্যসন্ধান শালা এইরূপেই ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীর অভ্যাস হইয়া উঠিবে।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় বহুদর্শী সুপণ্ডিত যে উপাদেয় গ্রন্থের আবিষ্কার সাধন করিয়াও, চতুর্দশ বঙ্গবঙ্গের প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের পূর্বে তাহা সুধী-সমাজে প্রকাশিত করিতে অগ্রসর হন নাই, সে কাব্য যে বিলক্ষণ দুর্লভ, তাহাতে সংশয় নাই। বাঙ্গালীর ইতিহাসের মধ্যেই যে [এক সময়ের]

সমগ্র প্রাচ্যভারতের ইতিহাসের মূলস্থত্রের সন্ধান-লাভের আশা আছে, এই দুর্লভ কাব্যের আলোচনায় তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তখন এই কাব্য বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় সমাদর লাভ করিবে। যিনি একরূপ শ্রুতির আবিষ্কার-সাধন করিয়াছেন, তাঁহার জীবন সন্ধ্যা এই সংকাব্যের আগ্ন-প্রসাদেই চরিতার্থতা লাভ করিবে ; এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের এই গ্রন্থাবিস্ফোরকের কথা একদিন না একদিন স্বর্ণাক্ষরে লিপিত হইবার যোগ্য বলিয়াই স্বীকৃত হইবে।

পাল-রাজবংশের শাসনসময়ে তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য বহুসংখ্যক 'সামন্তচক্রে' বিভক্ত ছিল। ধর্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে 'মহামামন্তাধিপতি'র উল্লেখ থাকায়, তাহার আভাস মাত্রই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল ;— 'রামচরিতম্' কাব্যে বিস্তৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অমর-কোষে [২৮৮] দেখিতে পাওয়া যায়,—

“রাজা তু প্রণতশেষ-সামন্তঃ স্তাদধীশ্বরঃ।”
যিনি 'অধীশ্বর' [চক্রবর্তী বা সার্বভৌম]
তাঁহার 'স্ব-দেশের' অব্যবহিত ভূমির
রাজপণ 'সামন্ত' পদবাচ্য ; তাঁহার সার্ব-
ভৌমের আশ্রয়ে আপন আপন রাজমণ্ডলে
শাসন-ক্ষমতা পরিচালিত করিতেন। ভাষ্য
দীক্ষিতের ঢিকায় ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া
যায়। যথা,—

“সমস্তায়াঃ স্বদেশাব্যবহিত-ভূমে রিমে

রাজানঃ।”

সমস্ত 'রাজমণ্ডলে' বা 'সামন্ত-চক্রে' ভ্রমণশীল

‘চক্রবর্তী’র সর্বত্র অব্যাহত গতি থাকিলেও, বাহা তাঁহার ‘বদেশ’ তাহাতেই তাঁহার সাক্ষাৎশাসন প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয়। সামন্তগণের রাজধানী ‘সামন্তচক্রে’,—চক্রবর্তীর রাজধানী তাঁহার ‘বদেশে’—প্রতিষ্ঠিত থাকিবার কথা। বরেন্দ্রী ব্যতীত অত্র কোনও স্থান পালবংশীয় নরপালগণের ‘বদেশ’ বলিয়া পরিচিত থাকিবার ‘প্রমাণ’ আবিষ্কৃত হয় নাই। পঞ্চাশত্রে, ‘রামচরিতম্’ কাব্যে বরেন্দ্রী তাঁহাদিগের ‘জনকভূমি’ বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার ‘অব্যবহিত্য ভূমি’ রাত্রা, বঙ্গ [পূর্ববঙ্গ] ইত্যাদি স্থান ‘সামন্তচক্রে’র অন্তর্গত ছিল।

কৈবর্ত-বিপ্লবে পালবংশীয় নরপালগণের জনকভূমি [বরেন্দ্রী] কিয়ৎকালের জ্ঞাত হস্তচ্যুত হইবার পর, সামন্তগণের সহায়তায় রামপালদেব বহু ক্রেশে তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া, ‘রামাবতী’ নির্মাণ করিয়াছিলেন,—ইহাই ‘রামচরিতম্’ কাব্যের আখ্যানবস্তু। বাসব [ইন্দ্র] যেমন স্বর্গবিচ্যুত হইয়াও, ধৈর্য্যাবলম্বনে দীর্ঘকালের অধ্যবসয়ে পুনরায় স্বর্গরাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন, রামপালদেবও সেইরূপ ধৈর্য্যের [ধৃতির] পারচয় প্রদান করায়, বাসবের সহিত তাঁহার তুলনা দিবার অবসর লাভ করিয়া, রাজকবি [মদনপালদেবের তাত্ত্বশাসনে] রামপালদেবকে ‘বাসব-ধৃতিঃ’ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যিনি এইরূপে বহুকালে, বহুক্রেশে জনকভূমির উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সেই “বদেশ” পরিত্যাগ করিয়া, বঙ্গের [পূর্ববঙ্গের] সামন্তচক্রে অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে রাজধানী

নির্মাণে ব্যাপৃত হইবেন। কেন, তাহাতে সহজেই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। ‘রামচরিতম্’ কাব্যেও এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাতেই সংশয় অধিক বদ্ধমূল হইয়া পড়ে; এবং মহানহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকার পার্শ্বটিকায় রামপালকে ‘রামাবতী’ বলিয়া দৃষ্টিত করিয়াছেন কেন, তাহা বোধগম্য হয় না। মনে হয়,—ইহা হয় ত মুদ্রাক্ষরের ক্রটি মাত্র। যে ভাবে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ক্রটি ঘটবার সম্ভাবনার অভাব ছিল না। এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইলেও, এই গ্রন্থের মুদ্রাকর্ম্যে এত অধিক ক্রটি ঘটয়া গিয়াছে যে, শিক্ষার্থীগণের পুনঃ পুনঃ পথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ভূমিকার [৮ পৃষ্ঠায়] একস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে,—গুরবমিশ্রের শিলালিপি ‘রঙ্গপুর’ জেলায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, তাহা চিরকাল দিনাজপুর জেলার মধ্যেই স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। ভূমিকার আর এক স্থানে [৯ পৃষ্ঠায়] মুদ্রিত হইয়াছে,—দ্বিতীয় বিগ্রহপালের অব্যবহিত পরবর্তী রাজার নাম মহীপাল, “তিনি গোপালের একতম পুত্র।” বলা বাহুল্য, মহীপাল দ্বিতীয় বিগ্রহপালেরই পুত্র ছিলেন। ভূমিকার আরও এক স্থানে [১৩ পৃষ্ঠায়] মুদ্রিত হইয়াছে,—নরপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যসম্বৎসরে গয়াধামে যে মন্দির নির্মিত হয়, তাহার ফলকলিপি ‘বৈতল-বজ্র-পাণি’ কর্তৃক রচিত, এবং তাহা শীঘ্রই

[বাবু আর, ডি, বানার্জি কর্তৃক] প্রকাশিত হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় 'বৈদ্য বজ্রপানি'র নাম কল্পে পাইয়াছিলেন, ইহাতে তাহার আভাস থাকিতে পারে। বলা বাহুল্য, এই লিপির এক প্রতিকৃতি বহু পূর্বে কনিংহাম কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং 'রামচরিতম্' মুদ্রিত হইবার পূর্বেই, ত্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের যত্নে এই লিপির পাঠ ও মর্ম্ম এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল;—ফলকলিপি 'বাজ্রদৈব্য সহদেব' কর্তৃক রচিত;—তাহা স্বধীসমাজে সুপরিচিত। 'বৈদ্য-বজ্রপানি' নূতন আবিষ্কার, হয়ত মুদ্রাকরপ্রমাদ, অথবা পূর্বপঠিত পাঠের পুনশ্চ পাঠোদ্ধার চেষ্টার অভিনব নিদর্শন! এইরূপ ক্রটিতে কেবল যে ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'ভূমিকা' মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা নয়;—মুদ্রণস্থের মুদ্রাক্ষণেও স্থানে স্থানে [ইহার প্রভাবে]

তাৎপর্য্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়াছে;—তাই এক স্থলে প্রকৃত তাৎপর্য্যের বিপরীত অর্থও স্থিতি হইয়াছে।

'রামাবতী' কোথায় ছিল, তাহার তথ্যাসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, 'রামচরিতম্' অবলম্বন করিয়াই তথ্যাসন্ধান কুরিতে হইবে। এই সকল মুদ্রণ-ক্রটির জন্ত তাহার উপর সকল স্থলে নিঃসংশয়ে নির্ভর করিবার উপায় না থাকায়, প্রথমে মুদ্রিত পুস্তক-খানির সংশোধন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য। যাহারা তাহার চেষ্টা না করিয়া পাণ-নরপালগণের শেষ শাসনসময়ের ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহাদের উদ্দেশ্য এবং অধ্যবসায় প্রশংসনীয় হইলেও, তাহার সকল ফল প্রশংসনীয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার নৈত্রের।

চরিতচিত্র।

শ্রীযুক্ত তাঁর তারকনাথ পালিত।

বাংলা দেশের বাহিরে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের নাম এতাবৎকাল যে খুব সুপরিচিত ছিল তাহা নহে। আপনার দীর্ঘ জীবনের সমুদায় সঞ্চিত সম্পত্তি ঙ্গড়বিজ্ঞান-শিক্ষার সুর্য্যবহার জন্ত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দান করিয়া, পালিত মহাশয় আজ একটা ভারতবাসী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দেশবিদেশের সংবাদপত্র সকল

তাঁর গুণগানে মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রাজপুরুষেরা তাঁর এই অনন্তসাধারণ বদান্ততার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে "নাইট" শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে এক হাইকোর্টের জজেরা ব্যতীত অপর কেহ এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। বেড়াইএ পারশী ধনকুবেরদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদের বদান্ততার

জ্ঞাত এইরূপ ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বাংলায় পালিত মহাশয়ই সর্বপ্রথমে এই প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

বহুদিন হইতেই বাংলার লোকে পালিত মহাশয়ের নাম শুনিয়া আসিয়াছে। অল্প বয়সে বিলাত যাওয়া তিনি বারিষ্টার হইয়া আসেন। সেখানে বিলাত যাওয়া এতটা লজ্জা ছিল না। আর বাঙালী বারিষ্টারের সংখ্যাও দেশে অতি অল্প ছিল। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় পালিত মহাশয়ের পূর্বেই বারিষ্টার হইয়া আসেন। বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ পালিত মহাশয়ের সমকালীয় লোক। কিন্তু মনোমোহন ঘোষ বা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপন আপন ব্যবসায় যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, পালিত মহাশয় তাহা করেন নাই। অথচ পালিত মহাশয়ের শক্তিসাধ্য যে ইহাঁদের অপেক্ষা বড় বেশি হইন ছিল, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। বরং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় পালিত মহাশয় ইহাঁদের অপেক্ষা কতকটা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই নেনে হয়। কিন্তু এ জগতে সর্বত্রই একটা অদ্ভুত ক্ষতিপূরণের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে। বিধাতা যাহাকে একদিকে কিছু বেশি দান করেন, অত্ৰদিকে সে আতিশয্যের “পাষণ্ড ভাঙ্গিবার” জ্ঞাই বা বুঝি, তাহাকে কিছু খাট করিয়াও রাখেন। একটু তলাইয়া দেখিলে অনেক বুঝিতে পারা যায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যার থাকে, ধীরতা তার তেমন থাকে না। সহজে যে জটিল বিষয় ধরিতে বা বুঝিতে পারে, গভীর বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়। মনোনিবেশ করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস তার

প্রায়ই দেখা যায় না। ঘোষ ও শ্রমশীলতা কচিং এক সঙ্গে বসবাস করে। পালিত মহাশয়ের তীক্ষ্ণ মেধাই বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে তার ব্যবসায়ের অন্ত্রসাধারণ কৃতিত্বভারের অগ্ররায় হইয়াছিল। আর এই জ্ঞাই তিনি অধিকাংশ সময় ফৌজদারী মামলাতেই নিযুক্ত হইতেন। ফৌজদারী মামলায় এক সময়ে বাঙালী বারিষ্টারদিগের মধ্যে শ্রীবৃদ্ধ তারকনাথ পালিত মহাশয়ের মতন এমন সুদক্ষ লোক আর কেহ ছিলেন না, বলিলেও হয়। মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রতিপত্তি কতকটা বেশি ছিল সত্য, কিন্তু ঘোষ মহাশয় কেবল আপনার বাবহার-কুশলতাগুণে এই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন কি না, কি বলা যায় না। ঘোষ মহাশয়ের যে কর্মকুশলতা, যে লোকরঞ্জন-শক্তি, যে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য ছিল, সে সকলগুণ সে মাত্রায় পালিত মহাশয়ের থাকিলে, তিনি কোনও অংশে যে ঘোষ মহাশয় অপেক্ষা অল্প খ্যাতি্যাপন হইতেন, এমন মনে হয় না। কিন্তু বিধাতার রাজ্যে এ সকল ‘যদি’র স্থান নাই। তার নিরপেক্ষ বিচারে আমাদের প্রত্যেককে আমাদের উপযোগী শক্তিসাধ্য দান করিয়া থাকে। একদিকে কাহাকে একটু কিছু বেশি দিলে আর একদিকে একটু কাটিয়া ছাটিয়া সমান করিয়া দেয়। ঘোষ মহাশয়ের যাহা ছিল পালিত মহাশয়ের তাহা ছিল নন, আর পালিত মহাশয়ের যাহা আছে, ঘোষ মহাশয় তাহা থান নাই, এইরূপে গড়ে মানুষ একটা বিচিত্র ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীবৃদ্ধ তারকনাথ পালিতের অনেক

শক্তিসাধা আছে—যে সকল শক্তিসাধা থাকিলে লোকে ব্যবহারজীবীর ব্যবসায়ে কুতিত্ত্বলাভ করে, পালিত মহাশয়ের তাহা বিলক্ষণ ছিল। আর যে সুযোগ পাইলে এ সকল শক্তিসাধা সফলতা লাভ করিয়া থাকে, পালিত মহাশয়ের ভাগ্যে সে সুযোগও যে জুটে নাই, এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহাতে এ সকল শক্তি এবং সুযোগ সত্ত্বেও তিনি আপনার ব্যবসায়ে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। লোকে সচরাচর ব্যবহার-ব্যবসায়কে স্বাধীন ব্যবসায় বলিয়া থাকে বটে; কিন্তু এখানেও যে স্বাধীনতার খুব আদর থাকে বা প্রতিষ্ঠা সম্ভব এমন বলা যায় না। উকিল-বারিষ্টারকেও আদালতের মুখ চাহিয়া এবং হাকিমের মর্জি বুঝিয়া চলিতে হয়। না পারিলে ব্যবসায় চলা ভার হইয়া উঠে। আর অননুসাধারণ আইনজ্ঞতা বা কর্মকুশলতাগুণে ব্যবসায় চালাইতে পারিলেও সকল সময়ে সমব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করা সম্ভব হয় না। পালিত মহাশয়, চিবুদিনট অতিশয় স্বাধীনচেতা লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। লোকের মুখ চাহিয়া চলবার কৌশলটা তিনি কখনও শিক্ষা করেন নাই। যে নম্রতা থাকিলে এ শিক্ষা সহজ হয়, পালিত মহাশয়ের প্রকৃতিতে তাহা ছিল না এবং নাই। খাতির কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন না। চক্ষুলাজ্জা-বস্ত্রীও তাঁর আছে বলিয়া মনে হয় না। আর এ সকল যে উকীল-বারিষ্টারের নাই, তাঁর পক্ষে

আপনার ব্যবসায়ে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করা খাদ্যো সম্ভবে না। পালিত মহাশয়ের প্রকৃতি একটু ক্রঙ্ক। মনে হয় যেন সহজেই তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। সত্যং ক্রমাৎ প্রিয়ং ক্রমাৎ, মা ক্রমাৎ সত্য-মপ্রিয়ং—মহাত্মারতের এই শ্রমোচীন নীতি অনুসরণ করিয়া চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মোলায়েম করিয়া কথা বলার অভ্যাসটা তিনি কখনও লাভ করেন নাই। আর এই জগুই এত শক্তি সাধ্যও থাকিতো তিনি আপনার ব্যবসায়ে যথামোগ্য উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

আর ঠিক এই কারণেই দেশের তথা-কথিত জনহিতকর কর্মেও পালিত মহাশয় এ পর্য্যন্ত নেতৃ-পদ প্রাপ্ত হন নাই। এ আকাঙ্ক্ষাও যে তাঁর কখনও ছিল, একপাও মনে হয় না। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শেষ ভাগে, আর মনোমোহন ঘোষ মহাশয় আগোবনই দেশহিতকর অমুষ্ঠানে লিপ্ত ছিলেন। মনোমোহন ঘোষ বাল্যাবধিই লোকমতগঠন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিলেন। বিলাত যাঁইবার পূর্বে, যখন তিনি অজাতশত্রু যুবক মাত্র, তখনই “ইণ্ডিয়ান মিরর” (Indian Mirror) পত্রের সম্পাদকীয় ভার বহন করিয়াছিলেন। “ইণ্ডিয়ান মিরর” তখন সাপ্তাহিক ছিল; তার বহুকাল পরে দৈনিক আকারে পরিণত হয়। কিন্তু সে কালে একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র পরিচালনাও সামান্য ব্যাপার ছিল না। বিশেষতঃ “ইণ্ডিয়ান মিরর” তখন নবোদিত ব্রাহ্ম-

সমাজের মুখপত্র ছিল। কেশবচন্দ্র বক্তৃতামঞ্চে যে সুর জাগাইতেছিলেন, ইণ্ডিয়ান নিরারের স্তম্ভে সেই সুরই ভাঁজিতে হইত। ইহাতেই একদিকে মনোমোহনের শক্তিসাধ্যের ও অন্যদিকে লোক-হিতব্রতে তাঁর কি বে' গভীর অনুরাগ ছিল তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। মনোমোহন এইরূপে প্রথম যৌবনাবধিই লোকনায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চাভিলাষ আমরণ পর্যন্ত তাঁহার অন্তরে জাগরুক ছিল। কিন্তু পালিত মহাশয়ের মধ্যে এ বস্তুটা কখনও দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ, যে সকল সরঞ্জাম থাকিলে লোকে জননায়কের পদ লাভ করিতে পারে, পালিত মহাশয়ের সে সকল সরঞ্জামও কখনও ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যেমন ব্যাংকার-ব্যবসায়ে হাকিমের মুখ চাহিয়া কথা বলিতে হয়, সেইরূপ জননেতৃত্বলাভ করিতে হইলে অনেক সময় জনগণের মন যোগাইয়া চলা আবশ্যক হয়। যাহারা অনন্তসাধারণ বাগ্মীতাশক্তি বা সাহিত্যপ্রতিভার গুণে প্রথমে অগঠিত লোকমতকে প্রবুদ্ধ ও গঠিত করিয়া সেই সংহত জনশক্তির অগ্রগীরূপে লোকনায়কের পদলাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপভাবে লোকমতানুবর্তিতা না করিয়াও সেইপদ রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের এ শক্তি নাই, তাঁহাদের পক্ষে লোকমণ্ডলীর মুখাপেক্ষী হইয়া না চলিত পারিলে, আধুনিক দেশহিতকর অমুষ্ঠানাদিতে অগ্রণীদলভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। আমাদের দেশে

এ পর্য্যন্ত যাহারা লোকনেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন, একদিকে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ও অতীতকালে কিয়ৎপরিমাণে ত্রিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর প্রায় সকলকেই স্বল্পবিস্তর লোকের মন যোগাইয়া চলিতে হইয়াছে। আর সুরেন্দ্রনাথও এক সময়ে যতটা স্বাধীন ছিলেন, পরে সে স্বাধীনতা ততটা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু যেসকল গুণ থাকিলে লোকে এরূপ ভাবে, পদ ও প্রতিপত্তির লোভেও আপনাকে চাপিয়া রাখিতে পারে, ত্রিযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়ের প্রকৃতিতে সে গুণ নাই। যে স্বাধীনচিত্ততার জন্য তিনি আপনার ব্যবসায়ের চূড়ায় উঠিতে পারেন নাই, সেই স্বাধীনচিত্ততার জন্তই তিনি আমাদের আধুনিক সমাজসংস্কারের বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীর দলে নেতৃত্বলাভ করিতে পারেন নাই। এরূপকোনও আকর্ষণও তাঁর মধ্যে কখনও জাগিয়াছে কি না সন্দেহ। অথচ পালিত মহাশয় নিজের পরিবারে আর দশজন বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালী হিন্দুর মতন আধুনিক সমাজ সংস্কারের আদর্শের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছেন। কিন্তু কখনও এ সকল লইয়া একটা ছুজুগ করেন নাই। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনাতেও তিনি এইরূপেই যোগ দিয়া আসিয়াছেন। প্রয়োজন মত কংগ্রেসের সাহায্যার্থে ষা সাধা অর্থদান করিয়াছেন। তাঁর সমশ্রেণীর আর দশজনে যেমন এ সকল ব্যপারে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, পালিত মহাশয়ও সেরূপ করিয়াছেন। কিন্তু কখনও এ সকল দানের

জ্ঞ জ্ঞ কংগ্রেসের রক্তমঞ্চে আরোহণ করি-
বার কোন লিপ্সা তাঁর মধ্যে দেখিতে
পাওয়া যায় নাই।

ফলতঃ এরূপ নেতৃস্থানভের যোগ্যতাও
তাঁর নাই; কিন্তু পালিত মহাশয়ের
সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশংসার কথা এই যে,
তিনি আপনার ঠিক ওজনটী জানেন।
তিনি কি করিতে পারেন ও কি করিতে
পারেন না, ইহা যেমন পরিষ্কাররূপে জানেন,
তাঁর সমশ্রেণীর লোকেরা অনেকেই তাহা
জানেন না। এই জ্ঞই যাঁর যে কার্যের
কোনও শক্তি ও সরঞ্জাম নাই, সেও আপনার
পদের বা ধনের জোরে সে কার্য কেবল
হাত দেয় যে তাহা নহে, একেবারে
নেতৃত্ব পদে যাইয়া চড়িয়া বসিতে চাহে।
বাংলা ভাষায় ইহাকেই বোধ হয় হাম্বা
বলে। এই বস্তু হইতেই ইংরাজের
হাম্বাগিজমের (Humbugismএর) উৎপত্তি
হয়। যার প্রকৃতির ভিতরে এই বাংলা
হাম্বাটী নাই, তার পক্ষে ইংরেজি হাম্বাগিজম
করিবারও কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় না।
যার যে শক্তি নাই, সে সেই কাজ করিতে
গেলেই হাম্বাগ (Humbug) হইয়া
উঠে। যার প্রকৃতিগত আন্তিক্যবুদ্ধি নাই
সে যদি ধার্মিকের আসনে যাইয়া বসিবার
জ্ঞ লালায়িত হয়; যাঁর বাকশক্তি নাই
সে যদি করতালি লাভের লোভে বক্তৃতান্ধে
যাইয়া দাঁড়াইতে চাহে; যাঁর বিনয় স্বভাব-
সিদ্ধ নয় সে যদি বিনয়ীর যশলিপ্সায় এই
মহৎ গুণের অভিনয় করিতে ব্যস্ত হয়; যার
বুদ্ধি ও বিত্তা নাই, আছে কেবল ধনের
উত্তাপ, সে যদি লোকমত পরিচালনার জ্ঞ
জননেতৃত্ব দাবী করিতে আরম্ভ করে,—
তাহা হইলে তার পক্ষে এই হাম্বার জ্ঞ
হাম্বাগ না, সাজা অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া
দাঁড়ায়। পালিত মহাশয়ের মধ্যে এ রূপ
কোন হাম্বা নাই বলিয়া, তিনি এই
হুজুগের যুগেও এ পর্যন্ত হাম্বাগ হইয়া
উঠেন নাই।

তাঁর রূক্ষ স্বভাবের জ্ঞ পালিত মহাশয়
নিজের বাবসায়ে যেমন অনন্তসাধারণ
কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ
মানাদের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্মজীবনেও
কোনও প্রকারে নেতৃত্বমর্যাদা প্রাপ্ত হন
নাই। আর এই জ্ঞ তাঁর মেধার বা
চরিত্রের প্রভাবও আমাদেব শিক্ত
সম্প্রদায়ের মনোবাজ্যেও কোনও প্রকারের
অধিপত্য লাভ কর নাই। ফলতঃ
ইংরাজিতে যাহাকে public man বলে,
ঐন্দ্রজ্যোত্সব তারকনাথ পালিত সে জাতীয় জীব
নহেন। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে
লোকনেতৃত্ব লাভ করিবার কোনও
উপকরণও নাই। অতদিকে ব্যক্তিগত
জীবনে, আপনার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে,
আশৈশবই তিনি অশেষ প্রভুত্ব ভোগ করিয়া
আসিয়াছেন অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্য তাঁর
চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ বলিয়া
বহুকালাবধিই জানা গিয়াছে। আর
আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদিগের উপরে
তাঁর একটা মোহিনী শক্তিরও পরিচয়
অনেক পাওয়া গিয়াছে। ইহারা পালিত
মহাশয়ের সকল প্রকারের ক্রটি দুর্বলতা
উপেক্ষা করিয়া, চিরদিন তাঁর মুখাপেক্ষী
হইয়া চলিয়াছেন। একবার যে তাঁর বক্তৃতালাভ
করিয়াছে চিরদিন পালিত মহাশয়, প্রাণপণে
তাহার প্রতি সুহৃদ্বন্ধনোচিত সর্ববধ কর্তব্য
পালন করিয়া আসিয়াছেন। অত্যাধিক তাঁর
শক্ততা যে একবার করিয়াছে, বা তাঁর বন্ধ-
বান্ধবদিগের কোনোও প্রকারের অনিষ্টের
চেষ্ঠাতে যে একবার লিপ্ত হইয়াছে, ঐন্দ্রজ্যোত্সব
তারকনাথ পালিত জীবনে কখনও তাহাকে
ক্ষমা করিতে পারেন নাই। এই কারণে
তাঁর বন্ধুর সংখ্যা অল্প, শত্রুর সংখ্যা অনেক
বেশি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁর শত্রু বা
অসম্পর্কিত লোকের প্রতি পালিত মহাশয়
কখনও উদার ও কোমল ব্যবহার করিতে
পারেন নাই বলিয়া তাঁর প্রাণটা যে খুব
কঠোর এমনও মনে করা সম্ভব হইবে
না। কারণ এই কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গেই

তার কোমলচিত্ততারও অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একদিকে যেমন পালিত মহাশয়কে নিরতিশয় কঠোর-প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়, অতৃদিকে সময়ে সময়ে তাঁর সেইরূপ অসাধারণ কোমলতারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আপনার বন্ধুবান্ধবদিগের সন্মুখেই যে তিনি নিরতিশয় কোমলচিত্ততার প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা নহে; কখনও কখনও 'নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত লোকদিগের প্রতি গভীর ও উচ্ছ্বসিত সহানুভূতিতে তাঁর বক্ষে দরবিগলি ধারা প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়াছে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিনে আমরা সচক্ষে ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। সেদিন একটী যুবকের করুণ প্রার্থনা শুনিয়া পালিত মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, অথচ আনাদের মধ্যে আর কাহারও চক্ষেই সে জন্ত কিছু পরিমাণও অশ্রুপাত হয় নাই। পালিত মহাশয়ের আপাতঃ কঠোরতা ও রুক্ষ স্বভাবের সঙ্গে এই ভাবোচ্ছ্বাসের যতটা অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, ফলতঃ ততটা অসঙ্গতি এ দু'এর মধ্যে একেবারেই নাই। দুই-ই ভাবুকতার লক্ষণ। যারা অতি সহজে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তারা যে বস্তুতঃই অতিশয় নির্ম্মল প্রকৃতির লোক, তাহা নহে। প্রকৃত নির্ম্মম লোকেরা লোকের সর্বনাশ করিতে পারে, কিন্তু হঠাৎ কাহারো উপরে চটিয়া যায় না। যাদের প্রাণ নিরতিশয় কোমল তাঁরাই একদিকে সহজে ক্রোধের বশবর্তী হন, আর অতৃদিকে স্নেহমত্ততার আবেগেও আত্মহারা হইয়া যান। এ বস্তুটী অনেক লোকচিত্রিত মহাপুরুষের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে ইহা দেখিয়াছি। বিদ্যাসাগর যেমন সহজে চটিয়া যাইতেন, সেইরূপ অতি সহজেই আবার গলিয়াও যাইতেন। ফলতঃ কোনও কোনও বিষয়ে পালিত মহাশয় বিদ্যাসাগর চরিত্রকে অরণ করাইয়া থাকেন।

অন্য দুজন্যর এক নিকৃতিতে ভৌল কর; চলে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেহত পালিত মহাশয়ের মধ্যে সব দেখা যায় নাই; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানুষ্য ভাবগুলি অনেক সময় পালিত মহাশয়ের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় স্বাধীনচেতা মহাপুরুষ ছিলেন; পালিত মহাশয়ের স্বাধীনচিন্ততাও লোকপ্রসিদ্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও মুখ চাখিয়া কখনও কথা কহিতে পারিতেন না; পালিত মহাশয়ও তাহা পাবেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমলাচিন্ততাও কিয়ৎ পরিমাণে পালিত মহাশয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে ব্রাহ্মণ্যপ্রকৃতিশূলভ যে নিতান্ত নির্লোভ ভাব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এতটা বড় করিয়াছিল, ক্ষাত্রপ্রকৃতি ইংরেজের রজত-প্রধান সজ্জতার আদর্শে অভিভূত, ব্যবহার-জীবী পালিত মহাশয়ের মধ্যে সে নির্লোভ ও সে ত্যাগের প্রমাণ কেহ কখনও অবশ্যেণ কমিতে যায়ও নাই, কেহ কখনও পায়ও নাই, আর শেষ জীবনে পালিত মহাশয় যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী ত্যাগের সম-জাতীয় বস্তু নহে। এ ত্যাগেও বিলাত গন্ধ আছে, বিদ্যাসাগরের ত্যাগে সাত্বিকতা-প্রধান ব্রাহ্মণ্য-আভাও দেখা যাইত। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও, বাংলার আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে উভয়েই অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আর পালিত মহাশয় জীবনের সন্ধ্যাকালে এইরূপ ভাবে আপনার যথাসম্ভব স্বদেশী যুবকগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য দান করিয়া, প্রথমজীবনে সঞ্চিত সমুদায় কুশল একান্ত ভাবে ক্ষালন করিয়া, বাংলার আধুনিক সমাজের ইতিহাসে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একামনে নহে, কিন্তু একই মন্দিরে, অক্ষয়-কীর্ত্তি অর্জন করিয়াছেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

৩ জগদীশনাথ রায়

ন্যূনাধিক ৮৬ বৎসর পূর্বে, আষাঢ় মাসে—রথযাত্রার দিন, নদীয়া জেলার অন্তর্গত, সুবিখ্যাত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে, ৩ জগদীশনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। কাঁচড়াপাড়া এককালে সমৃদ্ধিশালী পল্লীগ্রাম ছিল, অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং প্রতিভাশালী চিকিৎসক বৈদ্য এখানে বাস করিতেন। ভক্ততিলক মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের রূপার পাত্র শিবানন্দ সেন, তাঁহার অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুত্র কবিকর্ণপুর, নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, কবি এবং “প্রভাকর” সংবাদপত্রের জন্মদাতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবি হরিমোহন সেন, ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি উপাধিদারী মেজর গোপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী অনেক মহাত্মা এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাঁচড়াপাড়া পূর্বে নরহট্ট বলিয়া প্রচারিত ছিল, এই নরহট্টে সেন শিবানন্দের ভবনে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অনেকবার আগমন করিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত কবির রামপ্রসাদ সেন ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাঁচড়াপাড়ায় বাস করিয়া ছিলেন, ১৩ জগদীশনাথ রায়ের পিতামহ— ৩ গোপালচন্দ্র রায় এবং রামপ্রসাদ সাফাৎ মাসিত পিত্তিত ভাই ছিলেন, সেই জন্ত রামপ্রসাদ গোপালচন্দ্রের ভবনে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন, তৎপরে হালিসহরে বিবাহ করিয়া সেই খানেই

বাস করেন। জগদীশনাথ রায়ের পূর্ব-পুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে বাঙ্গালার প্রথমে খীরভূমে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের এই উপনিবাসের নাম মোড়েখর গ্রাম এবং উহা মোরাখ্য নদীতীরে স্থিত; এই মোড়েখর গ্রাম মহারাজ বল্লাল সেন ইহার পূর্বপুরুষদিগকে জায়গির স্বরূপ প্রদান করেন, তাত্ক্ষণিক এই জায়গির-দানের কথা অঙ্কিত আছে। বৈদ্যসমাজে এই পরিবার বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং ইহাদের পরিচয় দিতে হইলে মোড়েখরগ্রামী পণ্ডের সম্ভ্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। জগদীশনাথ রায়ের ণ্যশ, বল্লাল সেনের দৌহিত্রবংশীয়; পরিবার বৃদ্ধি হওয়াতে, মোড়েখরী গ্রামী, মোদাল্যা গোত্রীয়, এই পণ্ডের সম্ভ্রান্ত রায়বংশীয়েরা কতক কতক বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সবাই গ্রামে এবং তৎপরে মরশতা-কুলে শম্মনগরগ্রামে আসিয়া বাস করেন; শম্মনগরে ইহাদের গড়খাই কাটা বসতবাটী, দেবালায় প্রভৃতি ছিল। বিখ্যাত বর্গির হাঙ্গামার সময় মহারাজীয়েরা দুইবার পুরী লুণ্ঠন করে, সেই জন্ত গোপাল সেন রাক্ষ-পুৰোহিতগণকে বাটী ও দেবালায় দান করিয়া গঙ্গা পার হইয়া নরহট্ট গ্রামে পলাইয়া আসেন এবং সেই খানে শিবানন্দ সেনের পরিবার মধ্যে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ৩ গুরুপ্রসাদ রায় জগদীশনাথ রায়ের পিতা। গুরুপ্রসাদ

রায় সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পার্শি, আরবি এবং ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে আরব্য ভাষা শিক্ষা দিতেন এবং “শব্দরত্নাকর” বলিয়া এক সুবহু সংস্কৃত অভিধান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন; উইলসন সাহেব, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা এবং রাজা রাধাকান্ত দেব এই অভিধানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। গুরুপ্রসাদ রায় সঙ্গীত বিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন, ইঁহার পিতা গোকুলচন্দ্র রায় ওয়ারেন্ হেস্টিংস সাহেবের অধীনে মুর্শিদাবাদ সহরে কাজ করিতেন। সাহেব যখন মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া আসেন, গোকুলচন্দ্রও তাঁহার সঙ্গে পলাইয়া আসেন এবং পলায়ন করার দরুন তিনি সর্বস্বান্ত হইলেন। ইনি বড় ধার্মিক ছিলেন এবং এই ধর্মজীবন তাঁহার পুত্র এবং প্রপৌত্র বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। আধুনিক কাঁচড়াপাড়ায় ভূতপূর্ব ইংলওয়ের এবং ভারত-সম্রাটের পিতৃব্য ডিউক অব এডিনবরা এবং লর্ড সাহেব লর্ড মেয়ো শিকার করিতে যান।

জগদীশনাথ রায়ের এক পূর্বপুরুষ যুক্তাগম বা নব্বৈখর আলিবর্দি খাঁর দেওয়ান ছিলেন। নবাব ইঁহার কার্য-কুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া, ইহাকে “রায় রৈএ” উপাধি প্রদান করেন, সেই পর্য্যন্ত এই পরিবার “রায়” বলিয়া পরিচিত। পূর্বে ইঁহাদের মুসলমান দত্ত ‘মরকার’ উপাধি ছিল। জগদীশনাথ রায়ের পিতামহ গোকুল চন্দ্র রায়, যে সময় নরহাটে (আধুনিক কাঁচড়াপাড়া) বাস করেন, সেই সময় কলিকাতাতেও তাঁহার আবাস-বাটী ছিল।

এই গোকুলচন্দ্র রায়ের স্ত্রী পতির মৃত্যুতে শব্দ লইয়া সহমরণে যান, ইনি যেমন ধার্মিক। তেমন তেজস্বিনী ছিলেন। ইঁহার স্বহস্ত-রোপিত একট আত্মবৃক্ষ অদ্যাপিও কাঁচড়াপাড়ার রায় ভবনে বিরাজ করিতেছে।

জগদীশনাথ রায়ের পিতার সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণতা এবং ইংরাজি লেখাতেও বেশ সুশণ ছিল। তখনকার যত গবর্ণর জেনারেল ছিলেন, তাঁহাদের অভিনন্দন-লিপি ইঁহারই হস্ত লিখিত। ইনি সুবিখ্যাত ধনকুবের নিমাইচরণ মল্লিকের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করিয়া দিতেন। গুরু-প্রসাদ রায় ‘নজ বাটীতে বহু ভদ্রসন্তান-’ দিগকে অনুদানের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাদান করিতেন। ইঁহাদের পুরাতন বাটীটি কলু-টোলা স্ট্রীটে পড়িয়া যাওয়ার গেবে ইঁহার। হোগলকুড়িয়ায় আসিয়া বাস করেন। সুপরি-চিত ডেপুটি মেজিস্ট্রেট ৬ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের বাটীটি পূর্বে ইঁহাদের ছিল এবং এখান হইতেই জগদীশনাথ রায় লেখা পড়া করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে কাঁচড়াপাড়ায় জগদীশনাথ রায়ের হাতে গড়ি হয়, অতি অল্পদিন গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িয়া জগদীশ কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং তথা হইতে জুনিয়ার সিনিয়র উভয় স্কলারশিপ পান ইনি সাত বৎসর উপার্জপরিমাণিক ৪০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তখন বৃত্তি রিটেন করা বলিয়া একটা ব্যবস্থা ছিল, সেই নিয়ম অনুসারে জগদীশনাথ রায় সাত বৎসর ধরিয়া স্কলারশিপ রিটেন করেন। রিটেন করার অর্থটা কি তাহা বুঝাইয়া দেওয়া

আবশ্যক। ধরুন পরীক্ষায় একটা বৃত্তি পাইলাম, সে বৃত্তিটি এক বৎসরকাল রইল। বৎসরের পর নূতন ছাত্রদিগের সঙ্গে পরীক্ষা দিলাম এবং উচিত স্থান গ্রহণ করিয়া বৃত্তিটি রক্ষা করিলাম, এই প্রকার সাত বৎসর ধরিয়া নূতন নূতন ছাত্রদের সঙ্গে সাতবার পরীক্ষা দিয়া জগদীশনাথ তাঁহার ৪০ টাকার বৃত্তিটি রক্ষা করেন; ইহাতেই তাঁহার মেধা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি কলেজে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বরাবর শীর্ষস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, কখন দ্বিতীয় হন নাই। তখন লাইব্রেরী-মেডেল বলিয়া একটি স্বর্ণপদক প্রত্যেক বৎসর প্রদত্ত হইত, হিন্দু কলেজ লাইব্রেরীতে যত পুস্তক আছে, এমন কি স্কাইলস, সফোক্রেস, এবং তরজমা করা পুস্তকগুলিও পাঠ করিতে হইত, কোন পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল না,—যে কোন পুস্তক, হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, সেই পুস্তকরাশি পাঠ সমাপনান্তে যিনিয়া স্বাক্ষরের পরীক্ষা দিতেন, যিনি সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করিতে পারিতেন, তিনিই স্বর্ণপদকখানি পাইতেন। জগদীশনাথ রায় যখন উপর্য্যপরি দুইবার মেডেল পাইলেন, তখন ক্যাম্ব্রিজ অব্ এডুকেশন হইতে ছকুম হইল যৈ ইনি পুনরায় পরীক্ষা দিলে সর্বোচ্চ হইলেও পদক পাইবেন না, যিনি দ্বিতীয় হইবেন তিনিই পদকখানি পাইবেন; ইহার মতন কৃতী উচ্চদের ছাত্র তখনকার কালে ছিল না বলিলে অত্যাক্তি হয় না।

জগদীশনাথের লেখা পড়া শেষ হইলে হিন্দুকলেজে ছয় মাসের জ্ঞান একটি অধ্যাপকের আবশ্যক হয়, কর্তৃপক্ষীয়েরা

ইহাকেই মনোনীত করেন, এবং ইনি অতিশয় দক্ষতার সহিত সে কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা কাব্যক্ষেত্রে গণ্য মান্য হন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি—মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ಷিত্রাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, সুপরিচিত উচ্চাঙ্গদ্বয় মুরলীধর সেন এবং রমানাথ লাহা প্রভৃতি, (সমধ্যায়ী-দিগের ভিতর যে কয়েকজনের নাম মনে আছে)—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারি-চরণ সরকার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি।

জগদীশনাথ রায় সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন, ইনি সুরকণ্ঠ ছিলেন এবং সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। ইংরাজি বাংলা সমস্ত ক্রীড়া, বোটকাবোহণ, অশ্ব-বিদ্যা প্রভৃতি সকল কার্য্যেই ইনি দক্ষ ছিলেন। কথিত আছে, সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জ্ঞান হিন্দুকলেজে একটি পিয়ানো কেনা হয়, অধ্যাপক ছাত্রদের স্বর কীরূপ জানিবার জ্ঞান বাজনার সহিত সুর মিলাইতে বলেন, কেহই কিছু পারিলেন না। কিন্তু জগদীশনাথ রায়ের কণ্ঠের স্বর বাদ্য-যন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়া গেল এবং সর্ব শেষ 'কি' পর্য্যন্ত তাঁহার স্বর উঠিল। অধ্যাপক বৃদ্ধকণ্ঠে সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন “ইনি একজন উৎকৃষ্ট গায়ক হইবেন।” কলেজ ছাড়িবার সময় সমস্ত অধ্যাপকেরা ইহাকে উচ্চ নাট্যকিকেট

দেন, তন্মধ্যে কাউন্সেল অব্ এডুকেশনের
হাইজন নেতার সার্টিফিকেট হইতে কয়ছত্র
তুলিয়া দিলাম-

“His educational attainments are
of such a high and superior order,
that we feel no hesitation in stat-
ing that since the foundation
of the Hindu College up till now,
we have never seen a student who
could be compared with him”

এই সার্টিফিকেটটি লিখিয়াছিলেন বিখ্যাত
ডাক্তার মটেরেট এবং সার সিসিল্ বিডন।
এই বিডন সাহেব পরে বাঙ্গালার
লেফটেনেন্ট গবর্নর হন। সুপ্রসিদ্ধ বিটন
(Hon'ble Drinkwater Bethune)
সাহেব ইঁহার সঙ্গে বন্ধুর ভ্রায় আচরণ
করিতেন এবং লর্ড এলেনব্রো, কাপ্তেন
রিচার্ডসন, ক্রিষ্ট প্রভৃতি অনেক মহাত্মা
ইঁহাকে রাশি রাশি পুস্তক প্রদান করিয়া
গিয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় সকলেই ইঁহার সঙ্গে
বন্ধুর ভ্রায় ব্যবহার করিতেন।

কাপ্তেন ডি, এন, রিচার্ডসন ইঁহাকে
বড় ভাল বাসিতেন, বলিতেন “সেক্সপিয়র
পাঠে তোমার ভ্রায় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞান
দেশীয়দিগের মধ্যে বিরল।” কলেজের আর
একজন অধ্যাপক লিওনার্ড ক্রিষ্ট সাহেবের
সঙ্গে রিচার্ডসনের মনের বড় মিল ছিল না,
বাঙ্গালী ছাত্রেরা রিচার্ডসনের বিদ্যার
প্রশংসা করিলে ক্রিষ্ট সাহেব বলিতেন
“what a ship is in Calcutta is
but a boat in London.” জগদীশনাথ
রায়ের নিকট অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী

সেক্সপিয়র অধ্যয়ন করিতে আসিতেন,
তন্মধ্যে “রিস্ এবং রায়তের” সম্পাদক শত্ৰু
মুখোপাধ্যায় এবং মিষ্টার এস, পি, সিংহের
আত্মীয় সুযোগ্য ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট প্রতাপ-
নারায়ণ সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য।
পূর্বে সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষার সহুত্তর
ছাপা হইত, জগদীশনাথ রায়ের অনেক-
গুলি প্রবন্ধ এবং প্রশ্নোত্তর এই ভাবে ছাপা
আছে।

পাঠ করিবার সময় ইনি এত নিবিষ্ট-
চিত্ত হইতেন যে অপর কোন দিকেই
তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না, ইঁহার পিতা গুরু-
প্রসাদ রায় মহাশয়ের হঠাৎ বৃকে বেদনা
ধরিয়া মৃত্যু হয়; যখন ব্যথা ধরিয়াছে, তখন
ইঁহার অগ্রজ রমানাথ রায় মহাশয়, বাটীর
চারিদিকে “জগদীশ, জগদীশ” বলিয়া উঠে:-
স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কোন উত্তর না
পাইয়া জগদীশনাথের শয়নকক্ষ ঘরের
দ্বারে নলপূর্বক আঘাত করিতে লাগিলেন,
তখন ভিতর হইতে ইনি বলিয়া উঠিলেন
“দাদা, কি হইয়াছে, কেন আমায় ডাকিতে-
ছেন?” পিতার পীড়ার কথা শুনিয়া দ্রুত-
বেগে তাঁহার নিকট গিয়া, হাত দেখিয়া
বলিলেন “বাবার নাড়ি নাই, যদি তীরস্থ
করিবার মানস থাকে, তবে এই দণ্ডে
করুন।” বৃদ্ধকে তীরস্থ করা হইল এবং
তিনি গজ্ঞানে গগলাত করিলেন। ইঁহাদের
বংশে পরে সকলেই এই প্রকার দেহত্যাগ
করিয়াছেন, ভুগিয়া অপরকে কষ্ট দিয়া কেহ
মহাপণের পথিক হন নাই।

কলেজ ছাড়িবার কিছুদিন পরে হাওড়ায়
নিমকুআফিসের সেরাস্তাদারী থালি হয়, এই

কর্মটির বেতন ছিল মাসিক ১০০ টাকা। ১০৬৩ বৎসর পূর্বে একশত টাকা বেতনের চাকুরি একটা কম জিনিষ ছিল না। পাইবার জন্ত অনেকেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জগদীশনাথ রায়ও কর্মার্থী হইয়া বিডন সাহেবের সুপারিস-পত্র লইয়া নিমক সুপারিটেণ্টে পিকক্ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। পিকক্ সাহেব তাহার অনুরোধ শুনিয়া বলিলেন “আমি বড় দুঃখিত হইলাম যে বিডন সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। কথা কি, আমি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি যে হিন্দু কলেজের সর্বোচ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে এই কর্মটি দিই এবং ওজ্জ্বল কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসনকে পত্র লিখিয়াছি, পত্রের উত্তর আসিলেই যে ছাত্রের নাম আসিবে তাহাকে পদস্থ করিব।” এই কথা শুনিয়া জগদীশনাথ ধীরে ধীরে সাহেবের ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, খাফিক দূর আসিয়াছেন আবার একজন চাপরাসী আসিয়া বলিল “মহাশয় আপনাকে সাহেব ডাকিতেছেন।” ফিরিয়া গেলে তিনি বলিলেন “আমি বড় দুঃখিত হইতেছি যে ‘কর্মটি’ তোমায় দিতে পারিলাম না। এই দেখ রিচার্ডসন সাহেব জগদীশনাথ রায়কে দিতে বলিতেছেন।” জগদীশনাথ রায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন “বিডন সাহেব ঐহাকে দিতে বলিতেছেন, তাহার নামটি কি?” তখন উহাতে জগদীশনাথ রায় লেখা আছে ‘দেখিয়া সাহেব বড়ই আশ্চর্য হইলেন এবং কর্মটি উহাকেই দিলেন।

প্রথম যেদিন জগদীশনাথ রায় কর্মে

বসিলেন, সেইদিন আফিসে লোকারণ্য, সকলেই দেখিতে আসিয়াছেন কলেজের ছোকরাটি কিরূপ, যে এত বড় কর্ম করিবে এবং যে কর্মে হাবড়ার বাঙ্গালবাবু রানরতন বন্দু প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখনকার সময়ে মাসিক একশত টাকার ‘পক্ষ বড় উচ্চ পদ বলিয়া’ লোকের ধারণা ছিল। পাথুরিয়াঘাটার অম্বুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি বাঙ্গালার হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন, তিনি জগদীশনাথ রায়ের সেরেস্তাদারীর সময়, হাবড়া ফৌজদারী আদালতের নাজির ছিলেন, বেতন মাসিক দশটাকা মাত্র ছিল। কিছুদিন এখানে সেরেস্তাদারী করিয়া, জগদীশনাথ রেভিনিউ বোর্ডের সেরেস্তাদার হন, সেখান হইতে খুলনা জেলায় এক সাহেব নিমক-সুপারিটেণ্টকে কার্য শিক্ষা দিতে যান। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে, যে সাহেবকে তিনি শিক্ষা দিতে যান, তিনি একজন বুঝাপুঙ্খ, কোন এক লন্ডের দ্বিতীয় কিসা তৃতীয়ায়ুধ, সাহেবের মাসিক ৪০০ টাকা বেতন ছিল, কিন্তু ঐ টাকাটা তাহার স্লাম্পেন সরাপেই ব্যয় হইত, অল্প খরচের জন্য তাঁর পিতা মাসে মাসে প্রচুর অর্থ পাঠাইতেন। সে বৎসর খুলনা জেলার নিমক মহলের কার্য। এত ভাল হইয়াছিল যে, রেভিনিউ বোর্ড ঐ জেলাকে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছিলেন এবং মন্তব্যের মধ্যে, ‘বিলাতের বড় ঘরের ছেলেরা অল্পদিনের মধ্যে কার্যকুশলতা প্রাপ্ত হইয়া দক্ষতার কি সুচারু দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে সক্ষম, ইত্যাদি, ভাবে সাহেবের গুণানুবাদ ও ধন্যবাদ করিয়া, গবর্ণমেন্টকে লিখেন

এবং গবর্ণমেন্টও বোর্ডের সঙ্গে একমত করিয়া জলেখরে বদলি করেন। হইয়া যুবা সাহেবটিকে স্পেসিয়াল ধন্তবাদ প্রদান করেন। সাহেব ধন্তবাদ-পত্র পাইয়া হাসিয়া আকুল, তিনি জগদীশনাথ রায়ের নিকট দৌড়িয়া গিয়া বলিগেন “দেখ, দেখ, কি মজার কথা, আমি আজও কাকে ছাড়ি, কাকে পরওনা বলে তাহা জানি না, আমি মাত্র দস্তবত করিয়াছি, আর তুমি সমস্ত কার্য্য করিয়াছ। তোমায় ধন্তবাদ না দিয়া আমাকে ধন্তবাদ দিয়াছে। কি মজার কথা, আমি লিখিব, এই ধন্তবাদ পাইবার আমি উপযুক্ত নহি, যদি কাহার ধন্তবাদে দাবী থাকে সে তোমার এবং তোমাকে আমি গবর্ণমেন্ট হইতে ধন্তবাদ প্রদান করাইবা” যে কথা সেই কাজ। গবর্ণমেন্ট তখন জগদীশনাথ রায়কে ধন্তবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। উচ্চ, উদার এই ইংরাজ আপনি সুখ্যাতি না লইয়া, যথার্থ পাত্রকে ধন্তবাদ দেওয়াইয়া সত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন।

খুলনার কার্য্য শেষ হইলে অতি অল্প দিনের জন্ত জগদীশনাথ রায় বোর্ডে পুনরায় ফিরিয়া আসেন। বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের একটি আজ্ঞা (রেজোলিউশান্) লিপিবদ্ধ ছিল যে, নিমক-মহলে উচ্চপদে কোন দেশীয় লোক বসিতে পাইবেন না, জগদীশনাথ রায়ের কার্য্য-ক্ষমতায় এবং সত্যায় গবর্ণমেন্ট এত তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, উল্লিখিত নিয়মটি রদ করিয়া, তাঁহাকে নিমক-বিভাগের উচ্চপদ (আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট) প্রদান

করিয়া জলেখরে বদলি করেন। জলেখর হইতে ইহার পুনরায় পদোন্নতি হওয়াতে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইয়া মেদিনীপুরে বদলি হইলেন, মেদিনীপুর হইতে তমলুকে আসেন এবং এখানে প্রায় আঠার বৎসর কাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তখনকার সময়ে একটি নূতন প্রথা প্রচলিত ছিল, পোষ্টাল বিভাগের তখন উন্নতি হয় নাই, সুতরাং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা পোষ্ট মাষ্টারের কার্য্য করিতেন, তাঁর কেরাণি থাকিত, কিন্তু পোষ্ট মাষ্টার রাজকর্ম্মচারী। জগদীশনাথ রায় এই জন্ত জলেখর, তমলুক ইত্যাদি স্থানে একস্ অফিসিও পোষ্টমাষ্টার ছিলেন; নিমক-বিভাগের হাকিমদের মেজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল, নিমকসংক্রান্ত মকদ্দমার ইঁহাঁরাই বিচার করিতেন এবং জরিমানা, মেয়াদাদি দিতেন। এইজন্ত নিমক কাছারীতে জেল ছিল, তাহাতে কয়েদীরা থাঁকিত এবং বরকন্দাজেরা নিয়মিতরূপে পাহারা দিত। জগদীশনাথ রায় ৩রা নভেম্বর ১৮৪৮ সালে প্রথম কার্য্যে ব্রতী হইলেন, ১৮৫৩ ইংরাজী সালে জলেখরে যান, বৎসরেক পরেই মেদিনীপুরে আসেন এবং মেদিনীপুর হইতে তমলুকে আসিয়া ১৮৬৩ ইংরাজী অব পর্য্যন্ত সেখানে থাকেন। ইং ১৮৬৪ সনে ইনি কলিকাতার হাটখোলার ‘নিমক সুপারিন্টেন্ডেন্ট’ হইয়া বদলি হইলেন; হাটখোলার অফিস খুব জাঁকালো ছিল, ৩০০ এর উপর ‘টিপনবাস’ ছিল, প্রায় ৪০০ কয়াল ছিল। ইহা ব্যতীত সেরেসাদার, পেশকার, মহাফেজ, অনেক ইংরাজ-সেরেসাদার কেরাণি, দারোগা,

বরকন্দাজ প্রভৃতি ছিল, প্রায় বৎসরাধিক এই কর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জগদীশনাথ রায়, গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিলেন যে হাটখোলার সন্ট-সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং তাঁহার অফিস রাখা নিতান্ত অনাবশ্যক, ক্ষতি ব্যতীত উপকার খুব কম নিমক-সুপারিন্টেন্ডেন্টের কার্য্য সুচারুরূপে কন্ট্রোল কালেক্টরের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে, রিপোর্ট যথাস্থানে পৌঁছিলে সাহেব মহলে একটা গোল পড়িয়া গেল, অনেক সাহেবের চোখ এ পদ থাকে। বাধা হইয়া গবর্ণমেন্ট একটি কমিসান নিযুক্ত করিলেন, তাঁহার সভ্য হইলেন- বোর্ডের সিনিয়ার মেম্বর সক সাহেব, পুলিশের ডেপুটী কমিসনার মেজার রেভলি, নিমক-বিভাগের কর্মচারী ওয়েন সাহেব এবং জগদীশনাথ রায়, অনাবাবল এডলি ইডেন সভাপতি মনোনীত হইলেন। জগদীশনাথ আপনার মত সমর্থন করিতে লাগিলেন এবং ওয়েন সাহেব পদ রাখিবার পক্ষে দৃঢ়মান হইলেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর জগদীশনাথের কথা গ্রাহ্য হইল এবং হাটখোলার অফিস উঠি গেল। ইতিপূর্বে নিমকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণকে বেঙ্গল-পুলিসে ভর্তি করা হইত, সুতরাং জগদীশনাথও বেঙ্গল পুলিশে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে পেন্সিয়াল অসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট করিয়া আশিপুরে কর্ম দেওয়া হইল। যখন হাটখোলার অফিস উঠিয়া যাইতে স্থির হইল এবং জগদীশনাথ কি কর্ম করিবেন তাহার আলোচনা হইতেছে, তখন প্রকাশ হইল, ইহাকে মালদহ জিলায় ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেট করা হইয়াছে। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, ঈশ্বর বোম্বাল, ঈশ্বর মিত্র প্রভৃতি অনেক বন্ধুগণ সমবেত হইয়া বলিলেন “তুমি ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট হইও না, নিমকবিভাগে দেশীয়গণের প্রবেশের উপায় ছিল না, তুমি প্রবেশ করিয়া দ্বার উন্মোচন করিয়াছ, তোমার পর স্বয়ংকান্ত বলিয়া একজন ভদ্রলোক নিমক মহলে উচ্চকর্ম পান, এখন তুমি পুলিশে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইয়া যদি এ বিভাগে বাঙ্গালীর প্রবেশ-পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, তাহা হইলে একটা মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং তুমি বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হও।” জগদীশনাথ রায় বন্ধুবর্গের পরামর্শ মত ডিপুটী মেজিষ্ট্রেট গ্রহণ করিলেন না, পুলিশেই প্রবেশ করিলেন এবং ভারতবর্ষের সমগ্র দেশীয়দের মধ্যে প্রথম ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইয়া দেশীয়গণের একটা উপকার করিয়া দিলেন : ৫০ বৎসর পূর্বে এ পদটি বড় মান্যের ছিল, মিলিটারী অফিসারেরাই এই কর্ম পাইতেন, অতঃ সাহেব যারা হইতেন তাঁরা সকলেই বড় ধরের ছেলে। কর্মটি পাইতে জগদীশনাথ রায়কে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। যখন তিনি দেখিলেন ডিপার্টমেন্টের সাহেবেরা একজোট হইয়াছেন এবং উহাকে এ পদ হইতে বঞ্চিত রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তখন তিনি সার উইলিয়াম গ্রে লেফটেনেন্ট গবর্ণরের কাছে এক আবেদন করিলেন। আবেদনের মন্তব্য ছিল—কেন তিনি এই পদ পাইবেন না, বিদ্যা বুদ্ধি কার্য্যদক্ষতায় তিনি উচ্চ ছিলেন, তবে কিঞ্চিৎ তাঁকে এ পদ দেওয়া হইতেছে

না এবং কেন তাঁহার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃকারীরা তাঁহার উপরে উঠিয়া যাইতেছে। এচ্, এল্ ডাম্পিয়ার তখন প্রধান সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি ইঁহার পক্ষ হইয়া জোর করিয়া লিখিলেন, ছোটলাটও ইঁহার পক্ষ হইয়া লিখিলেন, লাট সাহেব লর্ড লব্লেস বলিলেন ইঁহার মতন বিদ্বান সূদক্ষ কর্তৃকারীকে এ পদ দেওয়া উচিত। কাগজ-পত্র বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট গেল তিনি জগদীশনাথ রায়কে এ কর্ম দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, জগদীশনাথ এপ্রিল ১৮৬৮ সালে এ কর্ম পাইলেন, সেই বৎসরের বাঙ্গলার শাসন-বিভাগের রিপোর্টে ছোটলাট গ্রে সাহেব লিখিয়াছেন যে “এই প্রথম আমরা একজন দেশীয়কে এই কর্ম পদ প্রদান করিলাম।” গেজেট হইবার পূর্বে এই পদ প্রাপ্তির কথা হিন্দু পেট্রিয়াট সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল, নিজের সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, সাহেবেরা তখনও এ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। বরং এলিফ বন্দিয়া একজন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বলিয়াছিলেন “প্যাট্রিয়াটের কথা

আমরা বিশ্বাস করি না, জগদীশনাথ রায় কখনই এ পদ পাইবেন না। যখন আমরা তাঁহাকে বলিলাম-মাসিক হাজার টাকা পর্য্যন্ত তোমার বেতন হইবে তুমি বরাবরেই এই আলিপুরে থাকিবে, তখন তিনি আমাদের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। জগদীশনাথ রায় বলিয়াছিলেন, আমি ৫০০ টাকায় চিরদিন ভারতবর্ষের এক প্রান্তে, পড়িয়া থাকিব। তবুও আমার এই পদ পাওয়া চাই! এখনি তিনি নিজের ভুল বুঝিবেন। Distinguished officers object on political grounds to a native being placed in charge of a District.” ফলে জগদীশনাথ রায় যখন এ কর্ম পাইলেন, তখন দেশীয়েরা বড়ই উল্লাসিত হইলেন এবং বাঙ্গালা ইংরাজি সকল সংবাদপত্রে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল। এই নূতন পদ পাইয়া প্রথমেই তাঁহাকে বন্দিয়াখালিতে যাইতে হয়, নোয়াখালি তখন ডাকাতের আবাস-ভূমি ছিল।

(ক্রমশ)

শ্রী :—

বেদের কথা

বেদকে আমাদের শাস্ত্রে কেবল সকল জ্ঞানের মূল বলিয়াই নির্দেশ করা হয় নাই; যাবতীয় সৃষ্টিও এই বেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এমন কথাও বলা হইয়াছে। উভয় কথারই সার্থকতা স্মৃতিবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর যাহা সকল জ্ঞানের মূল, তাহা ত সকল সৃষ্টির মূলে থাকিবেই

থাকিবে। কারণ এই সৃষ্টিব্যাপার লইয়াই ত আমাদের সকল জ্ঞান। এই জড় ও এই জীব, এই দেশ এবং এই কাল—এ সকলই ত আমাদের জ্ঞানের বিষয়। এ সকলকে আশ্রয় ও অবলম্বন করিয়াই ত আমরা আমাদের যাবতীয় জ্ঞানলাভ করিতেছি। জ্ঞানের এ সকল বিষয় যদি

না থাকিত, তাহা হইলে কি বিষয়জ্ঞান, কি আত্মজ্ঞান, কোনও জ্ঞানই সম্ভব হইত না। অতএব এই বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানক্রিয়ার এবং জ্ঞান-বস্তুর সম্বন্ধ এমনই ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাদৌ যে যহা জ্ঞানের মূল, তাহা অবিচলিতরূপেই স্থিতি ও মূল হইবেই হইবে।

প্রচলিত কথার বল, যাহা নাই ভাঙে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ড। আপাততঃ এনিতে কথাটা কেমন কেমন ঠেকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত কি না রহিয়াছে, যাহার কোনও কিছু আমার ভেদে, অর্থাৎ আমার মনের ভিতরে নাই। এ দিক্ দিয়া কথাটা দৃষ্ট হই মিশ্র। কিন্তু অল্প দিক্ দিয়া দেখিলে, এই কথাটা একান্ত সত্য বলিয়াই প্রতীত হইবে। কারণ, বিশ্বে এমন অনেক বস্তু আছে ও থাকিতে পারে, যাহা আমার ভিতরে নাই—কিন্তু আমার ভিতরে যাহা নাই, তার কোনও জ্ঞানলাভ আমার পক্ষে তো আদৌ সম্ভব না। এ কথাটাই কি অস্বীকার করিতে পারি? যিনি মা হন নাই, তাঁর অস্ত্রের মাতঃস্বহ বস্ত্র নাই। তাঁর ভাঙে সহানের প্রতি নারী যে অটুতবৎ মর্দগত বাৎসল্য এ বস্তু নাই। সুতরাং অল্প রমণীর মধ্যে ইহা থাকিলেও, বন্ধার পক্ষে এ বস্তুর জ্ঞানলাভ আদৌ সম্ভবে না। সুতরাং তাঁর ভাঙে এ বস্তু নাই বলিয়া, ব্রহ্মাণ্ডে এ বস্তুর থাকা না থাকা তাঁর পক্ষে উভয়ই সমান। এইরূপ অন্ধের ভিতরে বর্ণবোধশক্তি নাই বলিয়া, এই বিশ্বের বর্ণবর্ণাকরণমেলা থাকা না থাকা তাঁর পক্ষে সমান। যে ব্যক্তির কাণে, অর্থাৎ মনে, কোনও প্রকারের স্রবোধ

নাই, তার পক্ষে সঙ্গীতও নাই। যাহা নাই ভাঙে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে এই প্রচলিত কথাটার এই অর্থ। ইহা আমাদের জ্ঞানের একটা সাধারণ ও সার্বজনীন ধর্মকে নির্দেশ করিতেছে। আমাদের জ্ঞান কেবল ভিতরে নয়, কেবল বাহিরেও নয়। জ্ঞানের ছাঁচ-গুলো আমাদের ননে থাকে, এগুলি ভিতরের বস্তু। জ্ঞেয় বিষয়গুলি এই বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলি বাহিরের বস্তু। এই ছাঁচ-গুলোই আমাদের ভাণ্ড। এই জ্ঞেয় বিষয়-রাজাই ব্রহ্মাণ্ড। বাহিরের বিষয়গুলির গুণাগুণ আমাদের ভিতরের ছাঁচে পড়িয়া, তবে আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। নতুবা তারা নিজেরা মোক্ষাসুখি অসম্মা আমাদের জ্ঞানে কুটিয়া উঠিতে পারে না। আমাদের জ্ঞান-শক্তির ও জ্ঞান ক্রিয়ার সঙ্গে বাহিরের বিষয়রাজ্যের ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই নিত্যসংঘনিষ্ঠ, নিত্যসংঘ অঙ্গাদৌ, একান্ত অচ্ছেদ্য ও নিত্যযোগ রহিয়াছে বলিয়াই, আমাদের চৈতন্যের মূলে যে বস্তু জাগিয়া আছে, সেই বস্তুই আবার বাহিরের এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে বলিয়াই আমাদের যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে। আর এই জগতই জ্ঞানের মূলে যাহা তাহাই আবার স্থিতি ও মূলে রহিয়াছে, নতুবা জ্ঞান সম্ভব হইত না। অতএব বেদ যদি সকল জ্ঞানের মূল ও সকল জ্ঞানের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা হয়, তবে তাহাকে সেই কারণেই যাবতীয় স্থিতির মূল ও বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেরও আশ্রয় হইতেই হয়। যাহা বিশ্বের মূলে নয়, যাহা স্থিতির আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা নহে, তাহা

কোনও মতেই আমাদের জ্ঞানের মূল ও জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

ভিতরের ও বাহিরের, ভাঙের ও ব্রহ্মাণ্ডের, বিষয়ী ও বিষয়ের, এই দুই'এর মধ্যে যে সঙ্গাপন সঙ্কল্প রহিয়াছে, তাহার উপরেই জড়বিজ্ঞান, ক্রৌঞ্চবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞানই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জড়গাদা কখনও কখনও মনে করেন যেটে যে, তাঁর বিজ্ঞানটা কেবল ব্রহ্মাণ্ড লইয়া, ভাঙের সঙ্গে তার বড় একটা সঙ্কল্প নাই, কিন্তু ইহা তাঁর করুনামাত্র। কারণ যে সকল কার্য্যাকারণাদি সঙ্কল্পের উপরে যাবতীয় জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, সে সকল সঙ্কল্প জড়ের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে নাই, আমাদের মনেতেই আছে। কার্য্য-কারণ সঙ্কল্পটা দুইটি বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত। একটা ঘটনা পূর্বে, ঘটলে, আর তার অব্যবহিত পরে আর একটা ঘটনা এই পূর্ববর্তী ঘটনার ক্রিয়াফলরূপে যদি প্রকাশিত হয়, তবেই ইহার একটিকে কারণ ও অপরটিকে আমরা কার্য্য বলি। সুতরাং এই যে কার্য্যাকারণ সঙ্কল্প ইহার মধ্যে একটা পৌনোপ্যর্থ্য যোগ রহিয়াছে। অর্থাৎ কালকে আশ্রয় করিয়া এই সঙ্কল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। কাল বলিতে আমরা ঘটনাপারস্পর্য্য বুঝিয়া থাকি। এই ঘটনা-প্রবাহ যতক্ষণ না থাকে, ততক্ষণ কালের জ্ঞান আমাদের হয় না। গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রাবস্থায়, এই জ্ঞান, আমাদের কালের জ্ঞান একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়। অত্যা পক্ষে যখন অনেক ঘটনা একটার পর আর একটা দ্রুতবেগে ঘটতে থাকে, আর এ সকল ঘটনাপারস্পর্য্য

আমাদের মনের উপরে গভীর দাগ রাখিয়া চলিয়া যায়, তখন অতি সামান্য কালকেও আমাদের অশেষ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। অন্যদিকে, গভীর ধ্যানে, যখন মন একাগ্র-ভাবে কোনও একটা বিষয়েতে নিবদ্ধ থাকে, তখন অতি দীর্ঘকালও অতি সামান্য কাল বলিয়া বোধ হয়। অতএব ঘটনা-প্রবাহ আমাদের মনের উপরে যে সকল দাগ রাখিয়া চলিয়া যায়, তাহারই উপরে কালের প্রতিষ্ঠা হয়। কাল আমাদের মনের ধর্ম্ম; জড়ের ধর্ম্ম নহে। যে কালের উপরে জড়ের কার্য্যাকারণসঙ্কল্পের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহারও অস্তিত্ব জড়ে নহে, মনে; ব্রহ্মাণ্ডে নহে, ভাঙে। জড় কারণও বুঝে না কার্য্যও জানে না। আমরাই তার কাছে দাড়াইয়া তার ক্রিয়ার পারস্পর্য্য লক্ষ্য করিয়া, আমাদের মনের ভিতরকার ছাঁচে ঐ বাহিরের ক্রিয়াগুলিকে ফেলিয়া ও ঢালাই করিয়া, তবে জড়বিজ্ঞানের বিবিধ বিধানসকলের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি।

ফলতঃ জড় ও মন ইগারা যদি একান্ত ভাবে পরস্পর হইতে সত্ত্ব হইয়া থাকিত, তাহা হইলে, জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভব হইত। জড়বিজ্ঞান জড়বস্তু নহে, মানসিক সিদ্ধান্ত মাত্র। জড়ের ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাহাদের মধ্যে পূর্ব ও পর, কারণ ও কার্য্য, সম ও বিষম ইত্যাদি সঙ্কল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া, মন নিজ-ধর্ম্মানুযায়ী জড়বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিতেছে। আর ঠিক আমাদের মনের ধর্ম্মানুযায়ী যদি জড়ের বিকাশ ও বিবর্তন না হইত, তাহা হইলে, আমরা কোনও মতেই

কখনও জড়ের কোনও জ্ঞানলাভও করিতে পারিতাম না। এবং জড়বিজ্ঞান বলিয়া কোনও প্রকারের প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইতাম না। বাহিরে, জড়জগতে একটা বিধান আছে—ইংরাজিতে ইহাকে Natural order বলে। আর ঠিক এই জড়জগতের বিধানের বা Natural order-এর অনুরূপ আর একটা বিধান আমাদের অন্তরেও আছে, ইহাকে ইংরাজিতে Mental order বলে। এই বাহ্যের জড়জগতের বিধানের সঙ্গে, ভিতরের মনোজগতের বিধানের একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আছে বলয়াই, আমরা জড়বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের যে সম্বন্ধ, মনোগত ভাবের সঙ্গে বাহিরের সেই ভাবপ্রকাশক বস্তুর যে সম্বন্ধ, চিত্রকের বা ভাস্করের অন্তরে যে ছবি জাগিয়া উঠে, তাঁহারা চিত্রপটে বা মন্দিরকলকে যে 'চিত্র' বা 'মূর্তি' পঙ্খিত বা খোদাই করিয়া থাকেন, তাহার সঙ্গে ঐ অন্তরগত ছবির যে সম্বন্ধ; আমাদের মনোরাগ্যের সঙ্গে বাহিরের জড়বাজ্যের কতকটা সেই সম্বন্ধ। কতকটা বলিতেছি এই জ্ঞান যে চিত্রকর বা ভাস্কর নিজের অন্তরের আয়ত্ত ছবিটী বাহিরে নিজেরাই ফুটাইয়া তুলেন; এই সকল চিত্রের বা ভাস্কর্যের স্রষ্টা তাহার নিজেই। অমরা এই জড়জগতের স্রষ্টা বা কর্তা নই। কেবল জ্ঞাতা মাত্র। আর আমরা এই জগৎকে জানিতে, বুঝিতে, তাহার বিবিধ সম্বন্ধাবলী ও কার্য্যাকাৰ্য্যকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহা হইতে সার্বজনীন সত্যের ও

সম্বন্ধের, নিয়মের ও গতির জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি এইজ্ঞান যে, যে হাঁচে এই জড়জগৎ বা Natural order গঠিত হইয়াছে, সেই হাঁচা আমাদের মনের মধ্যেও আছে। অর্থাৎ স্রষ্টার হাতের কাজগুলি বাহিরের জড়ে, আর তাঁর মনের ভাব ও আদর্শগুলি আমাদের ভিতরে তিনি প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের জ্ঞানের যেমন দুইটা দিক,—একটা বাহিরে আর একটা ভিতরে পরম জ্ঞানেরও সেইরূপ—এক দিক তার বিষয়ের দিক, প্রকাশের দিক, বিবর্তনের দিক, সৃষ্টির দিক, ওটাই দিক; অর্থাৎ তার ভিতরের দিক, আদর্শের দিক, নিত্য ও তুরায় দিক। আমাদের নিজের ক্ষুদ্র ও পরিমিত, দেশকালের অদীন বিষয়জ্ঞান যেমন আমাদের অন্তরের মানসিক হাঁচের বা mental order-এর উপরে নির্ভর করিতেছে, বিশাল বিশ্বের এই অসম অনন্ত জ্ঞানপ্রবাহও সেইরূপ বিপণতিত্ব অন্তরের নিত্য জ্ঞানের যে হাঁচ তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই নিত্য জ্ঞানের নিত্য হাঁচের অনুরূপেই বিশ্ববিবর্তনের ক্রমশঃ প্রকাণ্ড জ্ঞানজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতেছে। আর সেই হাঁচই আমাদের অন্তরে পরিণামী নিত্যরূপে বিরাজ করিতেছে বলিয়া, আমরা এই বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যকে উত্তরোত্তর অধিকার করিতে পারিতেছি। আর এই যে হাঁচটী, (১) যাগ নিত্য ভাবে তুরীয় চৈতন্যে অনাদিকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, (২) যাহা পরিণামী নিত্যরূপে জীবচৈতন্যে নিহিত রহিয়াছে, আর (৩) যাহা জড়ও

জীবের স্থিতি ও গতির আশ্রয় হইয়া বিশ্ববিবর্তনে নিরত প্রকট হইতেছে,— তাহারই নাম বেদ। ইহদ্বারা ইহাকেই Sophia বলিতেন। গ্রীকেরা ইহাকেই Logos বলিতেন। খৃষ্টীয়ানেরা ইহাকেই Christ বলেন। বৈষ্ণবেরা ইহাকেই প্রকৃতি বলেন। বৈদান্তিকেরা ইহাকেই জগদ্বাক্তি মায়ী বলিয়া থাকেন। এই বেদই আমাদের সমুদায় জ্ঞানাবজ্ঞানের একমাত্র ও নিত্য আশ্রয়। জড়ের ধর্ম ও জীবের ধর্ম, ব্যস্তির ব্যক্তিগত ধর্ম ও সমস্তির

সামাজিক ধর্ম, সাধনধর্ম ও গৌকিক ধর্ম, বিবর্তনের স্থিতির দিক ও গতির দিক, এ সকলই এই বেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং এই বেদকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া মধু ধর্মকে দেদুল্লভ বলিয়াছেন। এই বেদই শব্দ—যে শব্দকে আশ্রয় করিয়া বিশাল সৃষ্টির প্রকাশ হইতেছে, ইহা সেই ফোট শব্দ। এই ফোট শব্দত্বের উপরেই যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে।

ঐ. বিপিনচন্দ্র পাল।

বিলাতের টিক্‌টিকী

(১)

টিক্‌টিকী কথাটার ব্যুৎপত্তি কি, জানি না। কেন যে পুলিশের গোয়েন্দাকে বাংলা ভাষাতে টিক্‌টিকী বলে, টিক বুঝি না। কিন্তু ইংরেজের চণ্ডি কথায় ইহাদিগকে টিক্‌ বা টেক্‌ (tec) বলা হয়, ইহা জানি। এই টিক্‌ বা টেক্‌ ইংরেজি ডিটেক্‌টভেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। এই টিক্‌ হইতেই কি আমাদের টিক্‌টিকীর উৎপত্তি হইয়াছে?

দেখি টিক্‌টিকীর কথা আগরা আজ কালি অনেকেই জানি। ইহাদের শিক্ষা দীক্ষা, চালচলন কিছুই আমাদের আজ অবদিত নহে। ইহারা যে কি করিতে পারে, আর কি না করিতে পারে, দেবতারাও তাহা জানেন না, মর্ত্যদের তাঁ কথাই নাই। এরা যে ভাবে গোয়েন্দার কার্য করে, তাহাও আমরা স্বল্পবিস্তর বিলক্ষণই জানি।

কিন্তু বিলাতের পুলিশের সঙ্গে যেমন আমাদের পুলিশের তুলনা হয় না, বিলাতের টিক্‌টিকীর সঙ্গেও তুলনায় আমাদের দেশের টিক্‌টিকীরও কোনও বিষয়েই তুলনা হয় না। বিলাতের সাধারণ পুলিশ প্রহরীর মতন, টিক্‌টিকীও আমাদের ভদ্রসন্তান পুলিশ কর্মচারী অপেক্ষা অশেষদূরে ভদ্রলোক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এজন্য আমাদের পুলিশ কর্মচারীদিগকে দায়া করা যায় না। এরা যে শাসননীতির অধীন থাকিয়া কাজ করে, এক দিকে সেই নীতি, ও অত্রদিকে যে সমাজের ভিতরে বাজ করে সেই সমাজের সাধারণ মোক-প্রকৃতি, এই দুই ইহাদের কর্মাকর্মের 'ও ভাল-মন্দ'র জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এদেশে আসিয়া কাজ করিতে হইলে, বিলাতের

পুলিশের কর্মচারীগণও ঠিক এদেরই মতন হইয়া যাইবে। ইহা জল ও মাটিই সাহায্য।

দেশে থাকিতেই আমার ভাগ্যে স্বদেশী টিক্‌টিকার পরিচয়লাভ ঘটয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতেই পুলিশের প্রভুগণ আমায় গতিবিধি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এখন পর্য্যন্ত তাহাদের শুভবৃষ্টি এ গরিবের উপর হইতে সর্বদা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু একবার একজন লোক ছাড়া আর কেহ কখনও আমার সঙ্গে কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্তি করে নাই। প্রথম যে ব্যক্তি আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে নিযুক্ত হয়, সে অতিশয় ভাল মানুষ ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত সে যে আমার পেছনে লাগিয়াছে, ইহা আমি অমুখ্যই করিতে পারি নাই। একজন মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী আমাকে তার কথা না বলিলে হয় ত আরো বহুকাল তাহার পরিচয় আমি পাইতাম না। তখন আমি রসারোডের উপরে হাজরা পুকুরের পূর্বে, একটী বাড়িতে বাস করিতাম। আর এই বাড়ি দ্বিবারাত্র হাজরা পুকুরের বাগানের ভিতরে বসিয়া আমার বাড়ি পাহারা দিত। আমি যান পাড়িরে যাইতাম, সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইত, প্রথম দিনে যখন আমি ইহা লক্ষ্য করিলাম, সে দি-ই সে থরা দিয়া ফেলিল। আমি ট্রামে উঠিয়াছি, দেখি সেও নৌড়িয়া আসিয়া ট্রাম ধরিল। আমি অমন ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলাম, সেও অমন নামিয়া গেল। আমি তখন তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“তুমি কি আমার উপরে

মোতায়েন হইয়াছ?” বেচারীর স্বপথানি শুকাইয়া গেল—বস্তুতঃ বলিল—“বাবু সাহেব, কি করব, পেটের দায়ে এও কাজে হইতেছে। তবে আমি হইতে আপনার কোনও আনন্ড হইবে না। আপনার সকল সভাও আমায় উপস্থিত থাকি। আপনি যা বলেন, তাহা শুনিয়া থাকি। আপনি, তো আমাদেবহ ভোনের জন্য এত কষ্ট ভোগিতেছেন, তা জানিও বুঝি কপের রাজ্যে যেমন অকুর ছিল, আমাকেও সেইরূপ মনে করিবেন। আমি হইতে আপনার কোনও অমঙ্গল হইবে না।” কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম—“ও তোমার কর্তব্য তুমি করিবে, তাতে আর দোষ কি? তবে আমার পিছনে কে চলে ফেরে, ইহা আমি জানিতে চাই মাত্র। এখন আর আমার কোনও আপত্তি নাই।”

বিলাতেও ঠিক এইরূপই ঘটয়াছিল। আমার পশ্চাতে যে টিক্‌টিকী লাগিয়াছে বহুদিন পর্য্যন্ত আমি ইহা জানিতে পরি নাই সেখানেও যে আমাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইবে, ইহা কল্পনাও করি নাই। সুতরাং প্রথম পাঁচ ছয় সপ্তাহ কে সঙ্গে যান। না যার কেহ সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকে কিনা, এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করি নাই।

একদিন লণ্ডন সহরের উত্তরাংশে এক স্থানে ডাক্তার রথারফোর্ডের একটা বক্তৃতা হয়। রথারফোর্ড তখন প্যারিসে টেটের সভা ছিলেন। সুরতে (Surat) যখন কংগ্রেসের টেটক, হয়, সে সময়ে ইনি এদেশে আসিয়া ছিলেন এবং কংগ্রেসেও উপস্থিত ছিলেন।

আমি তখন বকুনায়ে বন্দী। আমার সঙ্গে তাই দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু বিবাত গেলে অগ্নিনির মতোই বেগ অলাগে আগ্রাস্তা হইয়া যায়। এদিন তিন তারতর্ষ সম্বন্ধেই বক্তৃতা করিবেন, একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। অনেক বিবাত বাসা ভারত-বাসী এজ্ঞা এই সভাতে যাইয়া উপস্থিত হন। আমরা সঙ্গে আমার একটা পার্শ্ব বন্ধু এবং তাঁর সহধর্মিণীও এই বক্তৃতা শুনে যান। এই দিনই, এই বক্তৃতা হতে ফিরিবার কালে, আমার পিছনে যে টিকিট লাগিয়াছে, সে কথা আমি প্রথম জানিতে পাই।

আমরা “বাসে” (Bus) চড়িয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। বাসের ভিতরে আমার পার্শ্ব বন্ধুটী, তাঁর গৃহিণী, এবং আমি, আমরা এই তিন জন এদেশীয় লোক ছিলাম। অপরায় ভারতাসুরা অনেকে বাসের উপরে তলায় খোলা হাওয়াতে যাইয়া বসিয়াছিলেন। “বাসের” কন্ডাক্টার আমাদের টিকিট দিয়া উপরের যাঁদের ভাড়া আদায় করিতে গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমায় বলিল—“স্মারু আপনার কোনও বন্ধুলোক কি উপরে আছেন?” আমি উত্তর দিবার পূর্বেই আমার পার্শ্ব বন্ধুটী বলিলেন—“আমাদের অনেক বন্ধুই তো উপরে আছেন।” কন্ডাক্টার বলিল—“না, আমি আপনাদের দেশবাসীদের কথা বলছি না। কোনও ইংরেজিক আপনাদের সঙ্গে আছে?” আমরা বলিলাম “না”, তখন সে বলিল “তাহা হইলে একজন লোক আপনাদের পেছু লইয়াছে।”

“তুমি কি করিয়া জানিলে?” “সে ব্যক্তি প্রথমে আপনারা কোথাকার টিকিট কিনিয়াছেন ইহা জিজ্ঞাসা করে। তখন আমি বলিলাম ‘আপনারা মার্কেল আর্চের টিকিট কিনিয়াছেন—যেহ হয় তার টিকিটও আপনারাই কিনিয়া থাকিবেন। তখন সে ব্যক্তি বলিল—‘না তাঁরা আমার টিকিট কেন নাই—তুমি আমাকেও মার্কেল আর্চের একখানা টিকিট দাও।’ এতেই আমার সন্দেহ হয় এ ব্যক্তি আপনাদের ফলো (follow) কচ্ছে।” আমরা তখন ব্যাপারখানা কি বুঝিলাম। আমার বন্ধুটী ‘বাসে’র কন্ডাক্টারের হাতে একটা ছয়-আনি রূপার ছয় পেনী) দিয়া বলিলেন—“আমরা যখন নেবে যাব, তখন তুমি ইশারা করিয়া সেই লোকটিকে আমায় দেখাইয়া দিও।” সে যথাসময়ে তাহাই করিল। তখন বাস হইতে নামিয়া আমার বন্ধুটী এই ব্যক্তির পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন। সে একটা গাড়ীর ছায়ায় লুকাইয়া আমরা কোন্ পথে যাই, দেখিবার চেষ্টা করিল, আমার বন্ধুটীও সেইখানে যাইয়া তার কাছে দাড়াইয়া তার চেহারাটী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সে সরিয়া গেল, তিনিও সরিয়া গেলেন। এইরূপে দুই জনে খানিকটা বেশ দীর্ঘাখেলা হইল। ইতি মধ্যে আমার বন্ধুর গৃহিণীও তাহাকে বেগ করিয়া চিনিয়া লইলেন। খানিকক্ষণ পরে আমার বন্ধুটী আমাদিগকে অগ্রণর হইতে বলিয়া এহ গরিব টিকিটকী বেচারীর পেছুনে নিজে টিকিটকীর কৰ্ম করিতে লাগিলেন। সে দেখিল আর আমাদের পেছু লওয়া সম্ভবপর

নহে; তখন আর এক পথ ধরিয়া চলিয়া গেল। আমার বন্ধুগণও তখন দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে আমাদের সঙ্গে আসিয়া জুটলেন। বিশালা টিক্‌টিকার সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়।

ইহার কিছুদিন পরে আমার এই বন্ধুর গৃহিণী। তাঁহার এক স্বজাতীয় বন্ধু, আমার পুত্র, আমার সেক্রেটারী—একটী আইরিশ মহিলা, এবং আমি, আমরা এই পাঁচজনে মিলিয়া লন্ডনের একটু বাহিরে ইলফোডনামক উপনগরে একটা সন্ধ্যা যাই। পথে লন্ডন ব্যাঙ্কের নিকটে আমার পার্শ্ব বন্ধুগণও আমাদের সঙ্গে আসিয়া জোটেন। আমরা লিভারপুলস্ট্রীট রেল স্টেশনে গাড়ী চাপিয়া তবে ইলফোর্ডে যাইব, একরূপ বন্দোবস্ত ছিল। ব্যাঙ্কের পাশ দিয়া স্টেশনে যাইতেছি, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পথে গ্যাস জ্বলিতেছে, সময় প্রায় ৭।০ টা। আমার বন্ধুর গৃহিণী একবার কি কারণে পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দেখলেন একটা লোক আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে। তিনি বলিলেন—মিঃ—আপনার শরীররক্ষক ঐ আস্ছেন। আমরা সকলেই তখন তাহাকে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেলাম। আমাদের ভাব বুঝিতে পারিয়া গরিব মেচারী একেবারে লন্ডন ব্যাঙ্কে ঢুকিয়া পড়িল। রাত্রি সাড়ে সাতটায় ব্যাঙ্কে ঢুকিতে যাওয়াই ত্বার মূর্ত্তা হইয়াছিল। সুতরাং তাহাকে না দেখিয়াই আমাদের সম্ভেদ দূর হইয়া গেল—সে যে আমারই পিছনে চলিয়াছে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইল। ত্রমে আমরা স্টেশনে

ঢুকিয়া পড়িলাম। আমার বন্ধুগণ টিক্‌টিক লইতে গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন লোকটা দূরে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁর কেমন হুটামি করিতে ইচ্ছা গেল; তাই টিক্‌টিক বিক্রতাকে বলিলেন—“দ্যাখ, ঐ ব্যক্তি আমার জ্বর পেছনে লাগিয়া ছ—আমরা কোথায় যাক্, তাহাকে বলিও না।” তখন সে ব্যক্তি একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল “সে কি কথা মশায়? এক্ষণি একে আমি পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছি।” যেই বলা মনি পুলিশ ডাকা। পুলিশের পাহারাওয়ালা এই কথা শুনিবা মাএই সে ব্যক্তিকে যাইয়া পাকড়াও করিল। তখন দুজনে টিক্‌টিক ঘরে ঢুকিয়া গেল এবং পাহারাওয়ালা তার কাগজ পত্র দেখিয়া, অল্প দরজা দিয়া সরিয়া পড়িল। আমরা তখন প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইয়া ট্রেনের প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার টিক্‌টিকা তখন আমার কাছে আসিয়া সমস্তমে টুপি খুঁকিয়া বলিল—“মিঃ—আমার কোনও অপরাধ নাই—মিসেস অনর্থক ভড়াধিয়া গিয়া এই গোলটা বাধাইলেন।” মিসেস—ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন—“তুমি বুঝ তাই ভাবছো? আমি তোমায় চিনেছিলাম। তোমাকে অপ্রস্তুত করার জন্যই এ ফাঁদ পাতা হয়েছিল।” তখন লোকটা আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—“মিঃ—এ কাজটা যে আমার মনোমত তা ভাববেন না। সময় সময় মানজের উপরে ঘৃণা হয়। কিন্তু কি করি জাপুত্র আছে, তাদের রুটর ব্যবস্থা করিবার জন্য এমন কাজও করিতে হচ্ছে।” খানিক পরে, আমরা

তখন ইলফোর্ডে নামিয়াছি, আমার কাছে আমাদের পক্ষে অতিশয় দণ্ডনীয় ব্যাপার। আসিয়া বেচাবি আবার বলিল—“মিঃ—আজকের এ ব্যাপারটা যদি খবরের কণ্ঠে বাহির হয় বা দণ্ডীদের কানে উঠে, গরিবের অন্ন হারা যাবে। কারণ আমাদের আপনাদের কাছে আমরা বা কোনও প্রকারে আপনাকে উদ্ধৃত কর। এমুন কি আমরা যে আপনার পিছনে পিছনে ঘুরি, ইহা ঘৃণাকর এবং আপনাকে ক্রোধে দেওয়া অসৌজন্য প্রকাশ করে নাই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিশ্বের প্রেম

ভালবাসে পাখী, প্রভাত-আলোকে
নির্ভিত সে শুনায় গান ;

ভালবাসে শুরু, ছায়া দানে মোর
জুড়ায় তাপিত প্রাণ !

ভালবাসে উষা, প্রাতি নিশি-শেষে
মোর গৃহে দেয় দেখা ;—

নিমীল নয়ন; চুমিয়া সোহাগে
মুছে স্বপনের লেখা !

ভালবাসে মেঘ নীল অঞ্চলে
দেয় খররবি ঢাকি ;

করে সে বীজন মলয়-পবন
কুসুম-সুরভি মাখি'।

অস্ত-অচলে কনক তপন—
করুণ গিদায়-ছবি—

মোর পানে চাহি' ডুবিতে না চায়,
ভালবাসে মোরে রবি।

ভালবাসে নিশি, দিবা-অবসানে
মোর কাছে আসে ধীরে ;

ছড়ায় জড়ায় কুণ্ডল রাশি
আমারে রাখে গো বিরে।

প্রিয় মতন বঁধে মোরে তার
নিবিড় মেঘের পাশে ;

নিভৃত তেমনি মিশে যাই যেন
দোহে দোহাকার খাসে !

বিশ্বের প্রেম শতধারে আসি
পশিছে আমার প্রাণে ;

আলোকে, আধারে, বরণে, গন্ধে
কত রসে, কত গানে।

মনের পাত্র ভরি লইয়াছে
আশাদ সে সবার ;

ধন্ত আমি সে, কৃতার্থ আমি,
নমি সবে বার বার।

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।





বঙ্গদর্শন

— ১৯১৯ —

(চট্টগ্রামে, সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে)

সভাপতির অভিভাষণ

এস মা সঙ্গীত-সাহিত্য মাতা, ভাবভাষা-জননী ভারতি ! ভারতের এই প্রান্তপ্রদেশে আবার ভারতি ! তোমার আরতি করিব। এই সঙ্ঘসর আমার নিভৃত নিলয়ের নিস্তরু কক্ষে আমি নিতাই তোমাকে ডাকিয়াছি ;—কিন্তু আজি আর এক ভাবে তোমায় ডাকিব। এখানে মা ! আমার কর্ণস্বর যতই ভগ্ন হউক, এই সহস্র সাহিত্য-সেবকের প্রাণের বঙ্করে আমার কর্ণশ কণ্ঠের কঠোরতা বিলুপ্ত হইবে ; আমার ক্ষুদ্র তাল সেই বঙ্কার অতি বিপুল করিয়া তুলিতেছে। তোমার সহস্র সেবকগণের শক্তির সহিত মিলিত হইয়া আমার ক্ষীণ শক্তি মহতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দাও মা ! তোমার অভয় চরণের স্খিতল ছায়া,—আমরা সেই ছায়াতলে গমবেতু হইয়া, প্রাণের সমস্বরে ধ্বজ পঞ্চমে তোমার আরতি গান করি। এস ভাই ! সকলে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ভুলিয়া, আমরা ভারতে ভারতী দেবীর বন্দনা করি। বল ভাই ! সকলে মিলিয়া বল, — মা ! আমরা যেন তোমার মন্দিরে আসিয়া হেমাঙ্ঘ্রি রেধারেষি চিরদিনের জন্ত ভুলিয়া যাই। যেন বৌদ্ধ ব্রাহ্ম,

হিন্দু-মুসলমান সকলে প্রাণের সহিত বলিতে পারি,—

“তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মন,
তুমি হি প্রাণাঃ শরীরে ;
বাহতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।”

চট্টগ্রামের অভ্যর্থনা-সমিতি আমার মত অকৃতী অধমকে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচন করিয়া, এই সমগ্র বিদ্বৎসম্মত সেই নির্বাচন অনুমোদন করিয়া এবং অধমকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আমার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ কথা আপনারা একটী বিনয়ের মামুলি কথা বলিয়া অগ্রাহ করিতে পারেন, কিন্তু এই কার্যে যে আপনারা আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, সে কথা অগ্রাহ করিবার উপায় নাই। রাজা মহা-রাজাকে, প্রফুল্ল-জগদীশের মত জগদ্বিখ্যাত স্মৃধী মনীষীকে সভাপতি সকলেই করে ও করিতে পারে। কিন্তু আমার মত অকৃতী সাহিত্য সেবীকে কদমতলার কোণ হইতে টানিয়া আনিয়া যে এই মঞ্চের সর্বোচ্চ স্থানে

অধিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, এই কার্যের মহত্ত্ব তন্নহত্ত্ব মহত্ত্ব—যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে, ততদিন ঘোষিত হইবে।

আমার একটি শিষ্যের মত, সাহিত্য-সেবারত ভদ্দলোক আমাকে সোঁদন চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, “অভিভাষণ” কাহাকে বলে ? আমি বলিলাম, “তা’ও ভাল জানি না ; গত বৎসরের পূর্বে অতবড় কঠিন কথা আমি কখনও ব্যবহার করি নাই।” আবার প্রশ্ন হইল,—“যেখানে অভিভাষণ হয়, সেখানকার কথা কি বলিতে হয় ?” আমি বলিলাম,—“মহারাজ তাই করিয়াছিলেন, আমাদিগকে মহাকবি কালিদাসের কুটুখ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আমি ত সে সব কিছু পারিব না ; চট্টগ্রামের কথা আমি ত কিছু জানি না। বৈবাহিকের “বিশ্বকোষ” উদ্ঘাটন করিয়া কতকটা বিদ্যা জাহির করা যায়, কিন্তু তাহাও পারিব না।” “তবে আপনি বলিবেন কি ?” আমি উত্তর করিলাম,—“আমি বলিব সাহিত্য সম্বন্ধে, ভাষা সম্বন্ধে, আর আমার চিরদিনের কথা বাঙ্গালার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।” এবার শিষ্য গুরু সাজিলেন, বলিলেন,—“ও শেষ কথাটা বলিয়া আর কোন ফল নাই।” আমিও গভীরভাবে আমার গুরুত্ব রক্ষা করিয়া গীতা আওড়াইয়া বলিলাম,—

“কন্ধ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।”
আমার গুরু গাভীর্ঘো শিষ্য তুষীভূত হইলেন।

বাস্তবিক আমি চট্টগ্রামের প্রায় কিছুই জানি না। জানিতাম সেই একজনকে—চট্টগ্রামের একমেবাদ্বিতীয়ং সেই নবীনচন্দ্র সেনকে। জানিতাম কেন বলি, তাহার সহিত বিশেষ বন্ধুত্বই ছিল। কিন্তু সে নবীন ত আর নাই।

শোককাহিনী আর বাড়াইব না। আমার বড় পান্সে চোখ, অশ্রুবর্ষিণী লেখনী এখনই সভা নষ্ট করিবে। বরং এমন করিয়া বলি, যিনি হাসিতে হয় হাসুন, আর যিনি কাঁদিতে হয়, কাঁদিতে থাকুন।—আজি আমার এই কৃষ্ণ-মূর্তির বাম গার্শ্বে সেই নবনীত-নির্মিত কান্তি, হাত্তোজ্জ্বলমুখ, সূর্যমুখশ্রী, সুবিস্তৃত-কেশকলাপ, জলভরা প্রাণভরা বিশাল-চক্ষু যদি বসাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আপনারা সেই অপূর্ব যুগলমূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইতেন। কিন্তু সে নিতানবনীতশ্রী আর ত দেখিতে পাইব না।

আর প্রধানকার শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেবের কৃপায় আমরা জানিয়াছি যে, অনেকগুলি মুসলমান কবি বাঙ্গালার রাধাকৃষ্ণলীলা প্রভৃতি অতি গুহ্য বিষয়ে, অতি সুন্দর পদাবলি লিখিয়া ভক্তিসাধনা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। করিম সাহেবই সর্ব প্রথমে কৈনি আলিওয়ালের পরিচয় আমাদের নিকট দেন এমন নহে, তিনি আরও বিস্তর ছোটবড় হিন্দু মুসলমান কবির পরিচয় আমাদিগের কাছে দিয়াছেন ; তাহার মধ্যে মুসলমান শৈয়দ মর্তুজা আলি, এস্তিম নাছির, সৈয়দ সোলতান, নূরমহম্মদ, সৈয়দ আমাইদ্দিন, উজ্জীর আলি পণ্ডিত এবং হিন্দু কবি নটবল্লভ, দ্বিজ রঘুনাথ, ভবানন্দ, বাসুদেব প্রভৃতির পদাবলিও তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন। করিম সাহেব এই জন্ত সমগ্র সাহিত্য-সেবীর কাছে ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য। চট্টগ্রামের সাহিত্য-সেবার আর যাহা কিছু পরিচয় পাইয়াছি, তাহা পরিশিষ্টে বলিব।

এইখানে দাঁড়াইয়া যদি বলি, সৌন্দর্য্যময়ের

জগৎ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, বোধ হয় তাহা হইলে কেহই আমার প্রতিবাদ করিবেন না। এই মধুমােসে মধুর সন্মিলন, মধুর মলয়া-নিল সাগর-বক্ষ বাহিয়া প্রাণ শীতল করিতেছে, নানাবিধ বিহঙ্গের কলকাকলি রবে স্বভাবের কুঞ্জভবন সকল মুখরিত হইতেছে। ফুল ফুটিয়াছে, সৌরভ ছুটিয়াছে; আশ্রয়শাখা মুঞ্জরিত, মধুমক্ষিকা সকল ‘ম’ ‘ম’ শব্দে অনবরত মধ্যম পঞ্চম সুরে ঝঙ্কার দিতেছে। শাখিবর লতার বহুদারা বাহুল্যতা বেঠেনে স্তব্ধপ্রায় হইয়া,
 “প্রিয়তমা নিদ্রা যায়, পাছে বিয় হয় তায়,
 নাহি নড়ে, কথা নাহি কয়।”

চারিদিকে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি দেখিবার জিনিষ, উপভোগের সামগ্রী। কিন্তু সকলে দেখিতে পায় না, উপভোগ করিতে পারে না। উপভোগ করিতে না পারিলে মনুষ্য ক’মিয়া যায়, মনুষ্য বর্ষের থাকিয়া যায় বা ক্রমে হইয়া পড়ে। সকলরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতাই প্রকৃত মনুষ্যের নিন্দাধর্ম।

এই সৌন্দর্য্য আকাশে পাঁতালে, ভূতলে পর্কত-শিখরে—সকল দিকে, সকল সময়ে অজস্র ছড়ান আছে। রথাস্থগজপদাতি-সেবিত নৃপতি যেমন হীরামরকতমণিক্য-মণ্ডিত প্রাসাদে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, দীনদরিদ্র পর্ণকুটারবাসী কৃষকও সেইরূপ তাহার শস্য-শ্রামল ক্ষেত্রে নয়ন ভরিয়া সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। তবে উপভোগের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা হয় ত সম্রাটেরও কখন কখন থাকে না, তিনি হৃদ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত হইয়াও মর্ষদাহনে দগ্ধ হন, আবার দীনহীন দরিদ্র তাহার পর্ণ-শয্যায় শায়িত হইয়া সৌন্দর্য্যময়ের আনন্দ-রূপে বিভোর হইয়া থাকে।

ভগবান্ বৈচিত্র্য্য-প্রিয়; জগৎ বৈচিত্র্য্যময়। ভগবান্ শৃঙ্খলা-প্রিয়, জগৎ শৃঙ্খলাময়। বৈচিত্র্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যে শৃঙ্খলা,—বহুর মধ্যে এক ভাব, তাহাই জগতের মূল; বৈচিত্র্য্যের মধ্যে যে শৃঙ্খলা তাহাই সৌন্দর্য্যের মূল। এই সৌন্দর্য্য যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি পরিতৃপ্ত হন, প্রফুল্ল হন; তাঁহার মনে মঙ্গল-ময়ের মঙ্গলভাব আপনা আপনি উদ্ভিত হয়। অল্পবিস্তর সকলেরই হয়,—হয় ত ভারতবাসীর এবং যুদীয়াবাসীর অধিক পরিমাণে হয়। সেই জন্যই অশ্রু জাতি বিশ্বস্তির অতলে বিলুপ্ত হইলেও, ভারতবাসী ও যুদী আজিও জীবন্ত রহিয়াছে, শত নির্যাতনেও তাহারা জীবন্ত।

সুকুমার সাহিত্য-সেবায় এই সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা জন্মায়, বৃদ্ধি পায় এবং হয়।

রস-রচনার নাম সাহিত্য। সৌন্দর্য্যের নাড়া চাড়া করিলে রস বাহির হয়। “ধার্মিক লোক সংসারের শ্রেষ্ঠ জীব” বলিলে স্বরূপ উক্তি হয়, সত্য কথা বলা হয়, কিন্তু “ধার্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার” বলিলে সেই একই কথা সুন্দর করিয়া বলা হয়, তাহাতে রস জন্মায়। প্রথমটি কেবলমাত্র ভাষা, দ্বিতীয়টি সাহিত্যের টুকরা নমুনা।

বহুকালের শিক্ষার এবং অভ্যাসের গুণে, জলবায়ুর প্রকৃতিবশে আমরা একরূপ কোমল-স্বভাব হইয়াছি; আমাদের মাতৃভাষা এত সহজে সুন্দর হয় যে, আমরা মনে করিলেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতে পারি। “ভালবাসি”, একটি অতি সাধারণ কথা। ‘আমি তোমাকে ভালবাসি’ কি না—ভাল বলিয়া জানি ও বিশ্বাস করি। কথাটি বৈদিক

নয়, সংস্কৃত নয়, বিদেশী নয়—খাঁটি বাঙ্গলা কথা। কিন্তু ঐ কথাটির ভিতর কেমন সুন্দর ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে! “ভালবাসি তাই আসি” চিরিয়া দেখাইতে গেলে মানে হয়, তোমাকে ভাল বলিয়া বিশ্বাস করি, তাই তোমার কাছে আসি। কিন্তু চিরিলে তা সাহিত্য থাকে না। “ভালবাসি তাই আসি” এই ক্ষুদ্র আয়তনেই রসবিন্দু অতি সুন্দর পরিপুষ্ট হয়। আর একটি যৌগিক শব্দ ‘দেখন-হাসি’—পরস্পর দেখা হইলেই মুখে হাসি আপনা আপনি আসে; হৃদয়ে রস উথলিয়া উঠে, মুখে তাহার মূহু তরঙ্গ খেলিতে থাকে। এমন বহুতর কথা দেখান যাইতে পারে। এইরূপে ছোট ছোট কথার বিচার করিয়া, জয়দেব-চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্র-দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত কবিকুলের রচনার ভঙ্গী দেখিয়া আমরা বলিতে পারি যে, সাহিত্যে আমাদেরিগকে বিরিয়া রাখিয়াছে। অতি শৈশবের সেই ঘুমপাড়ানি গান—“বাটাভরে পান দিব, গালভরে খেও”। আর অন্তিমের সেই হরিসকর্তন—সমস্তই সাহিত্য-মাখা। এই জাতির পক্ষে সাহিত্য-সম্মিলনই সুন্দর ব্যবস্থা। যদি কোন পথে আমাদের প্রকৃত সম্মিলন হয়, উন্নতি হয়, বিকাশ হয়, তবে এই সুকুমার সাহিত্যের পথেই হইবে।

সাহিত্য ছাড়া আমাদের আর কি আছে বলুন? আমাদের প্রকৃত পুরাতন সনাতন সমাজ, অসাড়, অনড়, নির্ধাত, নিকম্প বিরাট দেহে বিশাল বক্ষে ভর করিয়া জমি লইয়া পড়িয়া আছে; আর সেই দেহের উপর তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে,—নাচিতেছেন নীতি-সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক! সংস্কার

লইয়া সম্মিলন হয় না! ভাঙ্গার পর গড়া হইলে সংস্কার হয়। কিন্তু :হুর্ভাগ্যবশে আমরা ভাঙ্গিতে মজবুত, গঠনে অপটু। সুতরাং সংস্কারক-সম্মিলন আমাদের মধ্যে হইতেই পারে না। রাজনীতির আলোচনা দিল্লী প্রভৃতি পীঠস্থান ছাড়া, নির্বাচিত পুরো-হিতগণ মধ্য ব্যতীত সাধারণের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। তাহার পর বিজ্ঞান। আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানরত্ন আছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনের সময় এখনও হয় নাই। আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের একচালার পর-চালা হইয়া বিজ্ঞান গত বৎসর হইতে কথঞ্চিৎ-রূপে জীবন রক্ষা করিতেছে। সুতরাং এক সাহিত্য-সম্মিলনই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

আর আমাদের প্রকৃতি, প্রবৃত্তিও সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট। বহুকাল হইতে আমরা কীর্তন-কবি, যাত্রা-কথকতা, পাঁচালি লইয়া সৌন্দর্যের নাজিহাড়া করিয়া বাঙ্গালি-জীবন সার্থক করিয়া আসিতেছি।

সৌন্দর্য্য হইতে রস; রস-রচনায় সাহিত্য ভাবকে দ্বিবিধ উপায়ে রস উপভোগ করেন, আর উপভোগ করান—এক সৃষ্টি করিয়া, আর এক দৃষ্টি করিয়া বা দেখাইয়া দিয়া। সৃষ্টির ক্ষমতা অল্প লোকেরই থাকে, দৃষ্টি সাধনা করিলে অনেকেরই হইতে পারে। এই সৃষ্টি-দৃষ্টির সমন্বয়ে সকলরূপ সাহিত্য জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালি সংস্কৃত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, আখ্যান হইতে অসংখ্য নরনারীর অবতারণা করিয়াছেন। রচনার ভঙ্গিতে, বিচিত্র রঙ্গিতে সেই সকল আমাদের একেবারে নিজস্ব হইয়াছে। যেনকি যে কবি-কল্পনা-সমৃদ্ধতা, তাহা

আমরা ভুলিয়া গিয়াছি,—নিজগৃহে, প্রতিবেশি-গৃহে যেমন আর দশজন ‘মা’ দেখিতে পাই, মেনকা তাহাদেরই মত একজন—মেয়ে মেয়ে করিয়া পাগল। কার্তিকের মুখে নবনীত দিতে গিয়া ভুলিয়া উহা উমাকেই খাওয়াইয়া ফেলেন; তিন দিন পরে ভাঙ্গড় জামাতা মেয়েকে লইয়া যাইবেন, প্রথম দিনেই তাহা মনে পড়িয়াছে, বলিতেছেন,—

“আমার কিসের ঘরকন্না।

বৎসর অন্তর আসেন গোৱী তিন দিন বৈ রন্না ॥”
ভাগবতের যশোদা গোপী হইয়াও রাজমহিষী। আর আমরা যশোদাকে এমনই নিজস্ব করিয়াছি যে, তাঁহাকে ঘাঘরা-পরা দেখিলে নানিকা কুক্ষিত করি। সেইরূপ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সাবিত্রী সমস্তই আমরা আমাদের মত করিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি, যাহাকে আমরা ভাল বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাকে নিজস্ব করিতেই প্রাণ চায়। রামপ্রসাদ জগজ্জননী জগদম্বাকে আমাদের—এমনই নিজস্ব করিয়া দিয়াছেন যে, উহার ভিতর যেন একটা রূপক বা আরোপ আছে, তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারি না। ভারতচন্দ্রের “অন্নদা-মঙ্গল” সুন্দর গ্রন্থ; “র কুদ্ৰু অথচ অতি সুন্দর। তবে ভারতচন্দ্র অতি কুক্ষণে অন্নদামঙ্গলের মধ্যে “বিষ্ঠাসুন্দর” গছাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বর্দ্ধমানকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত তিনি রাজাদেশে ঐরূপ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পিত্রাজ্যাগ্রাসকারী বর্দ্ধমান-রাজের উপর তাঁহারও আক্রোশ ছিল। থাকিতে পারে; বিচিত্র কি? যাহাই হউক চোর-কবির বিষ্ঠা চুরি করিয়া তিনি বিষ্ঠাসুন্দর

লেখাতে বর্দ্ধমানরাজ অপদস্থ হউন আর নাই হউন, ক্ষমতা থাকিতেও তিনি স্বয়ং অপদস্থ হইয়াছেন। “বিষ্ঠার মত বিহ্বলী কন্না আমাদের হউক”—কোন বাঙ্গালিই প্রাণ ধরিয়া এমন কামনা করেন না। আর আমাদের সাহিত্য-সম্রাট, আখার মণি, চুড়ার ময়ূর-পাখা বঙ্কিমচন্দ্র তেমনই কুক্ষণে ইহারাজি হইতে নায়ক-নায়িকার অবতারণা করিয়াছিলেন। আমাদের নবীনচন্দ্র, তোমাদের নবীনচন্দ্র তাহা সুন্দররূপে ধরাইয়া দিয়াছেন। সে কথাও এখানে বলা আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন,—

“বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমবাবু অমর। তাঁহার উপাঙ্গাঙ্গুলিতে অতি উচ্চ শিল্প ও শিক্ষা আছে। কিন্তু আদর্শচরিত্র নাই। রামায়ণ-মহাভারতের কলাণে ভারতের গৃহে গৃহে যে আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ মাতা, আদর্শ কন্না, এমন কি আদর্শ ভৃত্য পর্যন্ত আছে, তাহা জগতে নাই। বঙ্কিমবাবু এ সকল আদর্শ তাঁহার সাধারণ প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়াছেন,—গড়িতে পারেন নাই। * * * *
বঙ্কিমবাবুর উপাঙ্গাঙ্গুলি যুরোপীয় উপাঙ্গাঙ্গ হিসাবে উৎকৃষ্ট উপাঙ্গ। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।”

এরূপ ভাবে না বলিলেও, বাঙ্গালির যশোদা, মেনকা, জগদম্বার উল্লেখ করিয়া আমি বঙ্কিমবাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে মার্চিষ্ট্র অঙ্গিত করিতে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। সকলেই জানেন, সে অনুরোধ রক্ষা হয় নাই। এখনও অনেক কৃত্তি-লেখককে সেইরূপ অনুরোধ করিয়া থাকি,

তাহাতেও বিশেষ ফল হয় না। আমাদের জুদিশাই এই, আমরা দূরে পশ্চিমদিকে নিয়তই নয়ন নিক্ষেপ করিয়া আছি, কখন আপনাদের দিকে, আপনাদের ঘরর দিকে, আপনাদের গৃহস্থালির দিকে, আপনাদের কাব্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না। ঐ সমালোচক নবীন-চন্দ্র ও কবি নবীচন্দ্রের মধ্যে তুলনা করিয়াই দেখুন না। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা কালে কেমন আমাদের আদর্শের কথা তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যের স্মৃতি, স্মলোচনা, শৈলজা—এ সকল কি? তাঁহারই কথায় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট কি? সেই যে কুরুক্ষেত্র সমরের অবসর সময়ে রাজিকালে হিন্দু-রমণী দীপ লইয়া হতাহতের অন্নসন্ধান করিতেছেন—সেটি কি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের এক-রূপ সংস্করণ নয়? . .

অতিথি ভারতে চিরদিনই পূজ্য। সেই অতিথি অঙ্গনে উপস্থিত; কুলবধু তাঁহাকে অর্থা দিবার জন্ত করক পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্বামী পথশ্রান্ত হইয়া আসিলেন। সেই মহাব্রত অতিথ্য পড়িয়া রহিল, অতিথি স্বাগত-সেবা না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কুলবধু করক অধোত রাখিয়া দিয়া পতিসেবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন।—এই না হৈল আমাদের সধবা কুলবধুর আদর্শ। যদি স্বামিসেবা বিস্মৃত হইয়া কুলবধু পরপুরুষের হতাহতের সেবায় ব্যাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই আদর্শ থাকে কি? কখনই থাকে না। প্রাচীন উচ্চ আদর্শ আমাদের সাহিত্যে রাখিতেই হইবে। পুরাণ-ইতিহাসের আদর্শ যদি সমাজে না থাকে, সমাজের আদর্শ যদি সাহিত্যে প্রতিকলিত না

হয়, তবে বিকৃত সাহিত্যের দোষে সমাজও বিকৃত হইবে। আমাদের গৃহস্থালির মধ্যে যে শাস্তি, যে প্রীতি, দয়া-মায়া, আতিথ্য, দেবভক্তি, গুরুভজনে ভক্তি আছে, তাহা ক্রমে লুপ্ত হইবে,—আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া সর্বস্বান্ত হইব। .

এখন ভাষার কথা। বঙ্গাক্ষরে লিখিত বা মুদ্রিত হইলেই বঙ্গভাষা হয় না; বঙ্গীয় শব্দ বিস্তৃত হইলেও বঙ্গভাষা হয় না। ভাষা-শরীরের অভ্যন্তরে একটি প্রাণপদার্থ আছে, সেইটি বাঙ্গালির মত হইলে তবে বাঙ্গালির উপযোগী ভাষা হয়।

ভাষা বুঝিতে হইলে প্রাণ-পদার্থ বুঝিতে হয়। ভাষা প্রাণের জিনিষ। প্রাণের ব্যাকুলতায় শিশুদিগের ভাষা ফুটিতে থাকে। কথিত হইয়াছে যে, নঞ-বাচক শব্দ সভ্য অসভ্য অনেক ভাষাতেই তুল্য রূপ; 'ন' দিয়া আরম্ভ। ন, না, নেহি, no, not, nil ইত্যাদি। কেন এমন-কইল? সকল দেশেই দেখা যায়, ছেলেরা দুধ খাইতে বড় নারাজ,—তা মাতৃস্তন হইতেই কি আর পত্রপুট বা কোনরূপ মূল্যবান পাত্র হইতেই বা কি। মা ছেলেকে ফোলে ফেলিয়া বলপূর্বক দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর ছেলে দাঁত টিপিয়া, মাথা নাড়িয়া প্রাণের ব্যাকুলতায় কোনরূপ নিষেধবাচক বা অসম্মতি-সূচক শব্দ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে,—দাঁত টিপিয়া থাকিলে আর কি শব্দ বাহির হইতে পারে—ছেলেটি বলিতেছে, “ন ন নে নৈ নি নি” ইত্যাদি। এই সার্বদৈশিক ব্যাপার হইতে 'ন' হইয়াছে নিষেধবাচক বা অসম্মতিসূচক। এই ভাষাপুরাণের মধ্যে কতটুকু ইতিহাস

আছে, তাহা বলিতে পারি আর নাই পারি,—
প্রাণের ব্যাকুলতায় যে ভাষার উৎপত্তি সে
কথা নিশ্চয়। পশুপক্ষীর কি প্রাণের ব্যাকুলতা
নাই? আছে বৈ কি। তবে তাহাদের মধ্যে
আমাদের মত ভাষা নাই কেন? ইহার উত্তরে
আবার একটি বিচিত্র রহস্যময় কথা বলিতে
হইতেছে।

মানুষের প্রাণ তিনটি। দার্শনিক মতে
পঞ্চ প্রাণের কথা আছে, সে বায়ুগত প্রাণ;
তাহার কথা এখন ধরিব না। প্রাণ তিনটি;
সেই জন্ত শাস্ত্রে প্রাণ নিত্য বহুবচনান্ত পদ,—
ঐ হি প্রাণাঃ শরীরে। তিনটি প্রাণ কোথা
হইতে আসিল? একটি পিতৃস্থানে ঔরসে
পাইয়াছি, একটি মাতৃস্থানে জঠরে পাইয়াছি,
আর একটি আমার নিজস্ব—কর্মান্বয়ে
পাইয়াছি। সংস্কৃত বচন তুলিয়া প্রবন্ধ দুর্যোধ্য
করিব না; কিন্তু অনেকে আমার কথা
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। মনের ভিতর শ্রেয়
ও প্রেয়স মধ্যে বিবাক্রম অতি প্রাচীন শাস্ত্রে
আছে; উপনিষদে আছে। স্মৃতি-কুমতির
কলহ অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থকারও লিপিবদ্ধ
করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেয় প্রেয় ব স্মৃতি-
কুমতি-কলহে একটি তৃতীয় প্রাণ মধ্যস্থরূপে
প্রকাশিত হন,—এ কথা স্পষ্ট করিয়া কেহ
না লিখিলও, আমি বলি আপনাদের মধ্যে
কেহ না কেহ অবশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।
ফল কথা প্রাণ তিনটি, ব্যষ্টিভাবে দেখা যাউক
আর নাই যাউক, সমষ্টিভাবে অনেক সময়েই
অমুভূত হইয়া থাকে। পিতামাতার চেহার',
ধরণধারণ, আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-মেজাজ—
এই সকল যে সজ্ঞানে পায়, তাহা অনেকেই
জানেন ও মানেন। আমরা পৃথক পৃথক প্রাণও

পিতা মাতার নিকট হইতে পাইয়া থাকি।
আমরা কে? আমি কে? সেই কল্পকল্পভোগী
পুরুষ। তবেই তিনটা জড়াইয়া একটা হইল।
এই প্রাণ বা মহাপ্রাণ আছে বস্তুতই আমরা
প্রাণের আবেগ প্রকাশ করিতে পারি—
তাহারই নাম ভাষা। যে ভাষায় প্রাণ নাই, সে
ভাষাই নহে।

এক সময়ে ভারতবর্ষে ঋষিমুনিদের,
ব্রাহ্মণদের প্রাণ ছিল। সেই প্রাণের ক্ষুধিত্তে
তাঁহারা দেবভাষায় মন্ত্রশক্তিবলে প্রাণের
দেবতার সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এক
সময়ে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ ছিল। সূর্য্যচন্দ্রবংশীয়েরা
সেই প্রাণের বলে পুরাণ ইতিহাসে অধিনায়কত্ব
করিয়াছেন। এক সময়ে বৈশ্যের বা বণিকের
বা বণিকের প্রাণ ছিল। তাঁহারা সমুদ্রপথে
পোতারোহণে একদিকে ফিনিসিয়া ও বিনিসু,
অন্যদিকে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলি, বর্নীয়, চীন,
জাপান—এমন কি কাহারও কাহারও মতে,
সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত ভারতের বণিজ্য
বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তে হি নো দিবসাঃ
গতাঃ। সে দিন আর নাই। সেই প্রাণীদিগের
প্রাণবন্ত্য আর নাই। যদি থাকেন ত লোক-
চক্ষুর প্রায় অগোচরে, সমাজের নিভৃত
নিলয়ে লুকাইয়া আছেন। ভারতের প্রাণ
বাঙ্গালার ক্ষীণ প্রাণ এখন কেবল শাস্ত্রোৎ-
পাদক কৃষকের হস্তে। এইজন্ত ইংরেজেরা
বলেন, ভারতবাসী প্রধানতঃ কৃষিজীবী।
ঠিক কথা। বিজ্ঞা সাহেবদের কাছে;
ক্ষত্রিয়গোঁড়ার কাছে; কলকারখানা, রেল-
গাড়ী, ষ্টিমার—সকলই সাহেবদের কাছে।
ভারতবাসীর কোন দিকে যদি কিছু উৎপন্ন
করিবার ক্ষমতা থাকে ত সে কেবল চাষে।

চাষেই আমাদের প্রাণ বাচে, চাষেই আমাদের প্রাণ আছে।

সে প্রাণে আড়ম্বর নাই, জয়ডঙ্কা নাই, সভা নাই, বক্তৃতা নাই, সম্মিলন নাই, আফালন নাই—এ সকল কিছুই নাই, তবু প্রাণ আছে, উৎপন্ন করিবার শক্তি আছে; তোমার আমান্ন কাহারও তাহা নাই। স্নেচ্ছষি জন্ম ব্রাইটের মহদ্বাক্য স্মরণ করুন,—
“A nation lives in the cottage”
কুটীরবাসীকে লইয়াই দেশ বা জাতি।

ঐ কথা ইংলণ্ডের মনীষী-মুখে। যে ইংলণ্ড প্রতাপে অধিতীয়, শৌর্য্যেবীৰ্য্যে অসামান্য, সেনা-সম্ভার গণতরীসাকল্যে জগতে দুর্দ্বর্ষ—সেই ইংলণ্ডের জন ব্রাইট বলিতেছেন,—কুটীরবাসী লইয়াই দেশ। আর, আমাদের উপরিস্তরে কিছু নাই বলিলেও চলে, অথচ আমরা নিম্নস্তরের গোরব বুঝি না; যেখানে সমাজের প্রাণ সেধানকার গোরব বুঝি না। নিম্নস্তরকে অবহেলা করিলে দেশের প্রাণে অবহেলা করা হয়। নিম্নস্তরের ভাষায় অবহেলা, অবজ্ঞা, উপহাস ঘণা করিলে আমরা নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইব।

অবহেলা করিতে সংস্কৃত পারেন, ল্যাটিন পারেন, হীক্স পারেন, গ্রীক পারেন, আরবি—হয় ত পুরাতন পারসীও পারেন; কিন্তু ইংরাজি পারেন না, ফরাসি পারেন না, জার্মান পারেন না—মৃত ভাষায় পারেন, জীবন্ত ভাষায় পারেন না। আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষাকে জীবন্ত প্রাণবন্ত করিতে বা রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের নিম্নস্তরের ভাষাকে অবহেলা করিলে চলিবে না। ভাষাতে যাহা ঘরের মত রাশি রাশি কঙ্কাল, পেটে-মসলা-পুয়া

পশুপক্ষী রাখিলে চলিবে না; চিড়িয়াখানার মত জীবন্ত পশুপক্ষী বন্দী করিয়া রাখিলেও চলিবে না, সেখানেও প্রাণ কম। ভাষাকে একটি বড় দেশী মেলার মত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে জনতা চাই, ক্রেতাবিক্রেতার চলাচল চাই, জনতার মধ্যে উচ্চ রোল চাই, হর্ষের উল্লাস চাই, বিষাদের বার্তা চাই, সুখ-দুঃখজড়িত উচ্চ নীচ মানবসত্ত্বের সংঘর্ষণ চাই—অর্থাৎ চলন্ত প্রাণ চাই।

কুলীন-মৌলিক, অপ্রাকৃত-প্রাকৃত, সম্ভ্রান্ত ইত্যর,—সমাজের নানা স্তরে এইরূপ বিভেদ করিয়া আমরা বিঃ গণ্ডগোল করিয়া থাকি। মাতৃ-ভাষার মহিমাময়ী শাখাশ্রেণীতে আবার সেইরূপ কুলীন-মৌলিক বিভেদ বলবৎ করিয়া আর গণ্ডগোল না করিলেই ভাল হয়।

পূর্বে দেশ-প্রচলিত ভাষার তিনটি অঙ্গ ছিল; (১) তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃতসম, (২) তদ্ভব অর্থাৎ সংস্কৃতোদ্ভব, এবং (৩) দেশজ। এখন আমাদের অদৃষ্টবশে হইয়াছে, চারিটি;—আর একটি বিদেশজ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কুলীন-মৌলিক কোন বিভেদ থাকিতেই পারে না। ঐ বিদেশী ডাক্তার আসিয়া, জুতাগুদ্র তোমার ছেলের বিছানার পাশে বসিয়া, ঘড়ি খুলিয়া নান্দীর স্পন্দন গণনা করিতেছেন, উঁহাকে কতদিন আর বিদেশী বলিয়া ঘণার চক্ষে দেখিবে বল? উনি তোমার সম্মানের প্রাণ-দাতা, তোমার মহোপকারী বন্ধু। তাঁহাকে তোমার সংসারের একজন না ভাবিয়া কিরূপে থাকিবে? তবে তাঁহাকে ঠাকুরবরে প্রবেশ করিতে দিবে না—প্রাণ গেলেও দিবে না,—সে স্বতন্ত্র কথা।

এরূপ বলাতে কেহ মনে করিবেন না

যে, আমি অশ্লীল বা অশ্রাব্য ভাষাকে শাধু পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। অশ্লীল, অশ্রাব্য সংস্কৃতেও আছে। তা যেখানেই থাকুক, সে সকল ত্যাজ্য। আমি বলিতেছি, “পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল”—আমাদের ত্যাজ্য নহে,—আবার “পক্ষিসর্ষ রবকারী, রাত্রি প্রভাতা”—আমাদের গ্রহণীয় নহে। বরং যদি উভয়ের মধ্যে বাছনি করিতে হয়, তাহা হইলে শেষেরটি ফেলিয়া প্রথমটিই আমাদের লইতে হইবে।—ইহাতে প্রাণের কথা বুঝান হইল না, মোটামুটি আমি কি চাই, না চাই তাহাই বুঝান হইল।

গতবৎসর সম্মিলনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপতানিকির্শেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন”—এইরূপ বলিলে যদি লক্ষ লোক বুঝিতে পারে, কিন্তু “রাম অযোধ্যায় রাজা হইয়া বাপে যেমন সন্তানদের পালন করেন, সেইরূপ করিয়া প্রজা পালন করিতে লাগিলেন”—এইরূপ বলিলে যদি কোটি লোকে বুঝিতে পারে, তবে এই হই-এর কোনটি ভাল? সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলাম, যদি লোকশিক্ষা কথাটা একটা ভণ্ডামি না হয়, তাহা হইলে আমাদের শ্রেয়োক্ত ভাষা গ্রহণ করিতেই হইবে। অর্থাৎ আমি বলিয়াছিলাম যে, ভাষা যত অধিক লোকের বোধগম্য হয়, তত ভাল। এবার বলিতেছি যে, প্রাণের আবেগে ভাষার সৃষ্টি এবং উন্নতি; নিম্নস্তরের লোকের এখনও যৎকিঞ্চিৎ প্রাণ আছে,—তাহাদের ভাষা অশাধু বা অকুলীন বলিয়া অযত্নে না করিয়া সংস্কৃতসম বা

সংস্কৃতোদ্ভব ভাষার সহিত ভূয়োপরিমাণে দেশজ মিশাইয়া লইতে পারিলে ভাষার প্রাণ থাকিবে বা হইবে।

আমার সম্মুখে একখানি উত্তম পুস্তক রহিয়াছে। অনেক পরিশ্রম ও একনিষ্ঠার ফল এই “ঢাকা ইতিহাস” ইহঁতে ভূমিকার প্রথম ছত্র লইলেই আমার কথা একটু পরিষ্কার হইবে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—“জাতীয় জীবন সংশোধনের প্রধান উপায় দেশেরই ইতিহাস।” প্রথমতঃ জাতীয় কথাটা নেহাত বিজাতীয়! তাহার পর “জাতীয় জীবন” আরও অবোধ। সেইজন্য আমি বলি, ‘দেশে প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইলে প্রথমে দেশের পরিচয় জানা প্রয়োজন।’ তাহা ত বটেই। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের পরিচয় পাইয়া, তাহার পর দেশের সাধারণ লোকের ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। তাহার পর সেই ভাষা আপনাদের ভাষার সহিত মিলাইতে পারিলে, তবে দেশে প্রাণ বাড়িবে, সজীবতা বাড়িবে। আমাদের পূর্ববর্তী যুগের মনীষিগণ যে প্রকারে বিদেশী ভাষার আমদানি করিয়া দেশের প্রাণবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেরূপ ভাবে বিদেশী তাঁর উগ্র ভাব সকল বাঙ্গলা ভাষায় আমদানি করিলে সফল হইবে না, বরং বিপরীত ফল হইবে।

অল্পবয়সী যুবতী জননী যেমন রুগ্ন সন্তানকে অতি সন্তর্পণে কোলে শোয়াইয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলান, অতি ধীরে ধীরে বাতাস করিয়া তাহার শুষ্কতা করেন, একটু একটু করিয়া বলকারক পথ দিয়া তাহার শরীরে বলাধানের চেষ্টা করেন, তেমনি করিয়া আমাদের এই মাতৃসেবা

করিতে হইবে। হঠকারী সেবককে রোগ-শয্যা হইতে হৃদয়ে রাখিতে হইবে। যাহারা খুঁখট 'বুট' বিহার করিয়া রোগের বিষয়ে সদয় জিজ্ঞাসা (kind enquiry) করিতে আদেশ, দূর হইতে তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে হইবে। 'বলহীনে' বল সংযোগ বড় বিষম বিভ্রম। প্রথমতঃ চিকিৎসককে রোগীর ধাতু বুঝিতে হইবে। দেখুন, ধাতু না বুঝিয়া পথ্যপ্রয়োগে কিরূপ অনর্থ হইতেছে। যেখানে সেখানে একটি কথা দেখিতে পাই 'সুবর্ণ সুযোগ'—'এ সুবর্ণ সুযোগ আমরা ছাড়িব কেন?' মনে করুন কোন একটি দেশে, কোন একটি প্রবল রাজসিক জাতির মধ্যে সুবর্ণ সঞ্চয়ই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কাজেই তাহাদের ভাষাতেও সুবর্ণ সর্বদা উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হইবে। Golden time, Golden opportunity, Golden deeds ইত্যাদি। এখন তাই দেখা দেখি ভূমি যদি তোমার মাতৃভাষার বলাধান করিতে গিয়া বলিতে থাক যে, সুবর্ণ সময়, সুবর্ণ সুযোগ, সুবর্ণ কার্য, তাহা হইলে বাস্তবিক কি ভাষার বলাধান হইল? না ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজের মূলমন্ত্রে মহাবিপ্লব বাধিল? আমরা শাস্ত্রের উপদেশে সাধুলোকের দৃষ্টান্তে, সমাজের ছন্দে বন্দে শিথিয়াছি যে, সুবর্ণ আমাদের জীবনের লক্ষ্য নহে, ধর্ম আমাদের লক্ষ্য, মঙ্গল আমাদের লক্ষ্য, শুভ আমাদের লক্ষ্য, সেইজন্য আমরা বলি, "এই শুভ সুযোগে আমাদের এই কার্য করিতে হইবে।" সেই সমাজ যখন বলে, হীরক জুবিলি, রজত জুবিলি, আমরা সেই সময় বলিব, শুভ জুবিলি, জুবিলি মঙ্গল ইত্যাদি।

• বিপিনচন্দ্র ধরাইয়া' দিয়াছেন, পিতা পুত্রকে লেখেন, "প্রাণতুলোয়ু"। সেইরূপ পিতাকে আমরা লিখি, "পরম পূজনীয়"। ইহার পরিবর্তে "প্রিয় পিতা" বলিলে কি ভাষায় কিছু লাভ হইতে পারে? না "প্রিয় প্রিয়" বলিয়া পিতার সঙ্গে তুল্য-মূল্য হইবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়? সেটা কি ভাল?

প্রাচীন সমাজে, সেই সমাজের ভাব-ভঙ্গির সহিত, চাল-চলনের সহিত ভাষা এরূপ ভাবে জড়াইয়া থাকে যে, বিদেশী ভাষা তাহার সহিত বলপূর্বক যোগ করিতে গেলে সমাজের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়। যাহারা সমাজ ভাঙ্গিতে বন্ধপরিষেক, তাঁহারা ভাষার উপর বল প্রয়োগ করুন, তাঁহাদিগের কার্যে আমাদের কোন কিছু বলিবার অধিকার নাই বলিলেও চলে, কিন্তু যাহারা এই পুরাতন সমাজের অগ্রে স্থিতি, পরে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি কামনা করেন, তাঁহারা ভাষার উপর দৌরাশ্রয় করিলে আমাদের কপালে করাঘাত করিতে ইচ্ছা করে।

পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ভাষা একটি জীবন্ত প্রবাহ। তাহার গতি আছে, বেগ আছে। তাহাতে আবর্ত আছে, প্রপাত আছে; আর প্রবাহের ধারে ধারে চড়া আছে, শস্ত-শ্রামলা ভূমি আছে, কর্কশ কঠিন পর্বতমালা আছে। ইহার জলরাশি কমে বাড়ে বটে, কিন্তু নিয়তই প্রবহমান; চলিতেছে—কখন কুলুকুলুরবে, কখন বা গভীর গর্জনে। এই প্রবাহে অল্প ক্ষুদ্র প্রবাহ সকল পতিত হয় বটে, কঠিং বিবর্ণ করে বটে, কিন্তু প্রায়ই কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া মিলিয়া যায়। এই প্রবাহের গতি না বুঝিয়া

প্রবাহের সংস্কার করিতে যাওয়া একরূপ বাতুলতা মাত্র।

সামাজিক কোন ব্যাপারই গড়াপেটা জিনিষ নহে। সকল ব্যাপারই ক্রমে ক্রমে গজাইয়া উঠে। অসার সংস্কারকেরা মনে করেন, কোন ধর্ম, রীতিনীতি বা ভাষা যখন কোন শক্তিশালী পুরুষের সৃষ্ট বা নির্মিত, তখন আর একজন বা দশজন তাঁহার মত শক্তিশালী লোকে কেন তাহার সংশোধন বা পরিবর্তন অথবা উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবেন না? এই ভুল ধারণা হইতেই মহা অনর্থপাত হইতেছে। একদিকে কিছু শক্তি থাকিলেই, অনেক লোকে মনে করেন, আমি অনেক বিষয়ে শক্তিশালী। এক কোপে বৃহৎ ছাগছেদের সামর্থ্য আছে বলিয়াই আমি সম্ভরণে গঙ্গাপার হইতে পারি। ভাষার উপর এই যে নির্ভুর অত্যাচার, ইহাও এইরূপ নির্ভুক্‌ত্বের ফল। ভাষাও একটি জীবন্ত জিনিষ; কুস্তকাঁরের প্রতিমার মত বা গোরীপুরের কলের মত গড়াপেটা পদার্থ নহে। ইহার প্রবাহ বৃদ্ধিতে হইবে, গতি বৃদ্ধিতে হইবে। স্রোতে স্রোত মিলাইয়া খাল কাটিয়া জল আনিতে পার ভালই, কিন্তু প্রবাহ একটানা গন্তব্য পথে যাইবেই; কোন খানেই দক্ষিণ-বাহিনীকে উত্তর-বাহিনী করিতে পার না। পৃথক্ বঙ্গলিপি যদি বুদ্ধদেবের পূর্বেও ছিল এমন বোধ হয়, তাহা হইলে পৃথক্ ভাষা তখন ছিল না, মনে করিতে হইবে কি? না, এমন মর্মে করিতে হইবে যে, সে সময়ে অবশ্য একটি পৃথক্ বঙ্গভাষা ছিল। তা যদি থাকে, আমরা ত স্বেচ্ছা বৎসর পূর্বের বঙ্গভাষার নমুনা

পাইয়াছি। প্রবাহ বৃদ্ধিবার মত আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষায় একটি পরিষ্কার সুন্দর সহজ ঠাট অনেক দিন হইয়াছে। তবে পদ্য বলিয়া যদি বৃদ্ধিতে না পার, আমরা একটু গদ্যের নমুনা দিই,

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্র

“প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র রায় পরম কল্যাণাম্পদেষু।

“আমার বয়ঃক্রম যে হইয়াছে, তাহাতে এখন সদর মঙ্গলমূলক কোন বিষয়ে মামলত যে আমি করি তাহার সময় নহে। পার-লৌকিক যে যে ব্যাপার তাহাই আমার কর্তব্য এ কারণ আপনি স্বচ্ছন্দরূপে * * * * *
* তোমাকে সমস্ত লিখিয়া দিলাম শ্রীশ্রী৬ দেবসেবা প্রভৃতি ও জগীদারী লওয়া জমাখরচ আখরাজাত ও নফা লোকসান সমস্ত তোমারই, তোমার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের সহিত এলাকা নাই, প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দেবের পোষা অধিক এ কারণ আমার মোশাহেরা সরকারে যে পাওনা আছে তাহার মধ্যে সালিয়ানা পনের হাজার তাঁহার ও প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত মহেশ দেবের দশ হাজার ও প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেবের দশ হাজার ও ভৈরবচন্দ্র দেবের পোষাপুত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দেবের আড়াই হাজার ও হরচন্দ্র দেবের পোষাপুত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত যজ্ঞচন্দ্র দেবের আড়াই, হাজার একুনে এই চল্লিশ হাজার টাকা। এতাদিগের খরচের নিমিত্ত মোবরার

করিয়া দিলাম। এই নিয়ম যে করিলাম ইহার উল্জন তাঁহার। এবং তুমি কেহ কখন করিবে না। যদি কেহ কখন এ নিয়মেব অশ্রমত আচরণে উদ্যত হও, তবে লোকত ধর্মত এবং হাকিমানে সে নামঞ্জুর। ইতি সন ১১৮৭ শন এগার শত সাতাশী শন তারিখ ৯ই জৈষ্ঠস্য।”

লক্ষ্য করিবেন যে, এই দানপত্রের ভাষা, দুই একটি পাসাঁ কথা ছাড়া, সমস্তই খাটি বাঙ্গলা; অর্থাৎ এখন যেরূপ আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া আমরা বাঙ্গলার বিশেষত্ব বুঝিতে পারি সে সমস্তই উহাতে আছে। এক কথা ভাল করিয়া দেখাইতে গেলে অনর্থক গুরুমহাশয়গিরি করা হইবে; তাহা করিব না। এটি হইল একশত বত্রিশ বৎসর পূর্বের লেখা। যে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ভারতচন্দ্র, ব্রিটিভোগী রামপ্রসাদ, তাঁহার দানপত্র যে বিশিষ্ট লোকদিগের দ্বারা লেখান হইয়াছিল, সে কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু আমি ভালমন্দের বিচার করিতেছি না, কেবল ভাষার ভঙ্গি যে পূর্ব হইতে একই ভাবে রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতেছি। ইহার কিছু পরের আর একটি লেখা দেখাইব।

পরেরটি রেবরেণ্ডের সাহেবের লেখা। তিনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে একখানি গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন; পরে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, এখন হইতে ঠিক একশত বৎসর পূর্বে, ছাপান “ইতিহাস-মালা”। তখন ইতিহাস বলিলে গল্প কাহিনীও বুঝাইত। একটি কাহিনী এইরূপ;—

“এক কৃষক লালল চসিতে গিয়া কোন খালে গোটা চব্বিশেক মংস্ত ধরিয়া গৃহে আসিয়া আপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া আপন পুনর্বার চসিতে গেল। তাহার গৃহিণী সে মংস্ত কয়টি পাক করিয়া মনে বিবেচনা

করিল যে মংস্ত পাক করিলান কিন্তু কি প্রকার হইয়াছে চাখিয়া দেখি ইহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ঝোল লইয়া খাইয়া দেখিল যে ঝোল সুরস হইয়াছে। পরে পুনর্বার মনে ভাবিল মংস্ত কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিয়া দেখি, ইহা ভাবিয়া একটি মংসা খাইল। পুনর্বার চিন্তা করিল ওটি কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিতে হয়, ভাবিয়া সেটিও খাইল। এইরূপে খাইতে খাইতে একটি মার অবশিষ্ট রহিল। পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটা আইলে তাহার গৃহিণী সেই মংস্তটি আর অন্ন তাহাকে দিল। কৃষক কহিল যে এ কি? চব্বিশটি মংস্ত আনিয়াছি আর কি হইল? তখন তাহার স্ত্রী মংস্তের হিসাব দিল,—

মাছু আনিলা ছয় গণ্ডা

চিলে নিল দুই গণ্ডা

বাকী রইল ঝোল।

তাহা খুতে আটটা জলে পলাইল ॥

তবে থাকিল আট।

দুইটায় কিনিলাম দুই আট কাট ॥

তবে থাকিল ছয়।

প্রতিবাসীকে চারিটা দিতে হয় ॥

তবে থাকিল চুই।

তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই ॥

তবে থাকিল এক।

অই পাত পানে চাখিয়া দেখ ॥

এখন হইস যদি মানুষের পো।

তবে কাঁটাখানা খাইয়া মাছখান খো ॥

আমি বেই মেয়ে।

তুঁই হিসাব দিলাম কয়ে ॥

এইরূপে মংস্তের হিসাবে কৃষকের প্রত্যয় জন্মাইল।’

হিসাবের পত্ৰটি' কেঁর সাহেবের বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল, ঐটিকে উপলক্ষ্য করিয়া কুব্জ-গৃহিণীর রহস্যময়ী কাহিনী লেখা হইয়াছে। এ লেখার সহিতও এখনকার লেখার কোন বিশেষ পার্থক্য নাই

কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই কি আর কেঁর সাহেবের সময়েই কি, বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতজ্ঞে দেখিয়া শুনিয়া দিতেন। দানপত্রের প্রথমই আছে 'বয়ঃক্রম', এই বিসর্গেই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য; 'কেঁরির রচনায় বার বার আছে 'কুব্জ-গৃহিণী'। তিনি ঝোল রাঁধিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের কথাতেই 'সুরস' হইয়াছিল। এ সকল অবাস্তব কথা। আসল কথা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, আমাদের ভাষার ঠাট, কায়াদা, ভঙ্গি, রীতি বহুদিন হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে। পদ্য বহুদিন হইতে, গদ্য অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের সময় হইতে। এই ঠাট একটা বাধি ঠাট। আমাদের সমাজে যদি কিছু বাধন থাকে, তাহা হইলে ভাষায়ও আছে। যাঁহারা বলিবেন, বাধন কোনদিকে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন কথা নাই। যাঁহারা মনে করেন, সমাজের ঠাট বজায় রাখিয়া সমাজের উন্নতি আবশ্যক, তাঁহাদিগকে আমরা বলি, ভাষাতেও সেইরূপ ঠাট বজায় রাখিয়া উন্নতি আবশ্যক। তবে আমাদের ভাষার ঠাট কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইলে একটু দৃষ্টি আবশ্যক, আর যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম আবশ্যক। মাতৃভাষায় ভক্তি থাকিলে এবং ভাষাবেগমারিশ ময়দা নয়, ছেলেখেলায় সামগ্রী নয়,—এ জ্ঞান

থাকিলেই, সে দৃষ্টি সহজেই আসে এবং সে পরিশ্রম করিতে সকলের ইচ্ছা হয়।

এ যে ভাষার প্রবাহ ইহাতে মধ্যে মধ্যে বজ্রা আসে, ঢল নামে। এই বজ্রা হইলে বা ঢল নামিলে ভাষার পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু ভাষার ভাবভঙ্গির বৈলক্ষণ্য হয় না। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় একটা বজ্রা হয়। তাহার পর কেঁরির প্রভৃতি নিশানির সাহেবদের সময় আর একটা। তাহার পর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বাঙ্গলা গদ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ণ রঙ্গ দেখাইতে থাকেন। বাঙ্গলার গদ্য একটা শিক্ষার উপায় এবং উপভোগের সামগ্রী হয়। সাহিত্যের প্রসার তখন আর কবিতায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই—গদ্যকেও আত্মসাৎ করিয়াছিল; ঈশ্বর গুপ্তের সহিত ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের নাম সমানে বিঘোষিত হইয়াছিল।

এই সমস্ত লিখিত ভাষার কথা। এই ভাষার সঙ্গে সঙ্গে চিরকালই কথিত ভাষা ছিল, থাকিবেই। কিন্তু মূঢ়াঙ্গয় ও মিশনরির দেশীয় লোকের কথোপকথন প্রভৃতি যখন গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতেন, তখন সেই ভাষা ব্যবহার করিলেও, কোন গ্রন্থকার সেই ভাষা আপনায় ভাষা বলিয়া ব্যবহার করিতে সাহস করিতেন না, অথবা যুগাবোধ করিতেন। এই সময়ে দুইজন কায়স্থপুরুষসিংহ ভট্টর মহাসে বঙ্গভাষার রঙ্গমঞ্চেও দেখা দিয়া ভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরও বঙ্গভাষায় মহাভারতের অনুবাদের উদ্যোগকর্ত্তী এবং "হুতোমপ্যাচার নক্সা"-লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা সম্বন্ধে বন্ধিম-
বাবু বলিয়াছেন,—

“যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য
এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত
প্রথমে তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার
করিলেন। ‘এবং তিনিই প্রথমে ইংরাজি
ও সংস্কৃতের ভাষার পূর্বগামী লেখকদিগের
উচ্ছিষ্টাবশেষ অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের
অনন্ত ভাষার হইতে আপনার বরণীয় উপা-
দান সংগ্রহ করিলেন। এবং ‘আলালের
ঘরের ঢুলাল’ নামক গ্রন্থ এই উভয় উদ্দেশ্য
সিদ্ধ হইল। ‘আলালের ঘরের ঢুলাল’ বঙ্গ-
ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে।

* * * আলালের ঘরের ঢুলাল
দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে,
অন্য কোন বাঙ্গলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয়
নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

“উহাতেই প্রথম এই বাঙ্গলা দেশে
প্রচারিত হইল যে, বাঙ্গলা সর্বজনমধ্যে কথিত
এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়,
সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্বজন-হৃদয়-
গ্রাহিতা সংস্কৃতভাষায়িনী ভাষার পক্ষে দুলভ,
এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। আর তাঁহার
দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি এই যে, তিনিই প্রথমে
দেখাইয়াছিলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপা-
দান আমাদের ঘরেই আছে; তাহার জন্য
ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয়
না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন
জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত
সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর হয় না।
তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের
দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায়, তবে বাঙ্গলা

দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।
প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি
‘আলালের ঘরের ঢুলাল’ প্যারীচাঁদ মিত্রের
এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি। অতএব বাঙ্গলা
সাহিত্যে প্যারীচাঁদের স্থান অতি উচ্চ।”

বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গলায় সুন্দর গদ্য হয়,
প্যারীচাঁদ হইতে ইহা শিখিয়াছিলাম। তাঁহার
সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম করিতেই
হইবে। বন্ধিমবাবু মিত্রজার গ্রন্থ দেখাইয়া
“রত্নোদ্ধার” করিতেছিলেন, তখন তাঁহার
কালীপ্রসন্নের কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই,
—আমাদিগকে এখন বলিতে হইবে। আমরা
যখন নিতান্ত বালক, তখন “হুতোম পাঁচার
নক্সা” প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার
ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গিতে একেবারে মোহিত
হইয়াছিলাম। তখন হইতে বুঝিয়াছি,
আমাদের সহজ মাতৃভাষায় বাজি খেলান যায়,
তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা
ছোঁটান যায়। আমাদের মাতৃভাষা সর্বদা
রঙ্গময়ী।

তাহার পরের যুগের প্রবর্তক, প্রতিষ্ঠাতা,
পরিচালক—স্বর্গাট বন্ধিমচন্দ্র। তিনি কালী-
প্রসন্নের, প্যারীচাঁদের গ্রাম্যতা-দোষ-পরিহার
পূর্বক ভাষাকে একটু বিশুদ্ধ করিয়া তাহার
প্রবাহ বৃদ্ধি করিলেন। সেই পথে যে বাঙ্গলা
ভাষা এখনও চলিতেছে এবং সেই পথ যে
বাঙ্গলার সমগ্র সাহিত্য-সেবীর অন্তিমোদিত,
তাহার জলন্ত প্রমাণ—এই সভায় সমবেত
সাহিত্য-সেবিগণ কর্তৃক আমার মত অকৃতি
লেখককে সভাপতিত্বে নিয়োগ।

প্যারীচাঁদের গ্রন্থ-সমালোচনা অবসরে
বন্ধিমবাবু যাহা বলিয়াছেন, সেই কথাগুলি

ব্যতীত আমি আর 'একটি কথা আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছি;—সে কথাটি এই যে, ভাষায় তেজ, আবেগ, বল, জীবন, প্রাণ আনিতে বা রাখিতে হইলে লিখিত ভাষায় কথিত ভাষায় অধিকতর সংস্রব রাখিতে হইবে। সকল বিষয়েই আমরা প্রাণহারহিতে বসিয়াছি, যদি ভাষায় বা সাহিত্যে একটু প্রাণ রাখিতে পারি বা আনিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা ক্রমে সকল বিষয়েই প্রাণ পাইতে পারি। প্রাণের একটা দৃষ্টান্ত দিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থানে আমরা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছি। তিনি সংস্কৃতানু-
বাদিনী ভাষায় অদ্বিতীয় শায়েন শাহা সম্রাট—
তখনও যেমন এখনও তেমনই। সেই বিদ্যা-
সাগর মহাশয় যখন দেশাচারের উপর খজ্জাহস্ত
হইয়া ভৎসনা করিতেছেন, তখন তাঁহার
ভাষার ভঙ্গি শুধু,—“ধৃত রে দেশাচার!
তুই শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্ম্মের
মর্ম্মভেদ করিয়াছিস্ ইত্যাদি।” দেখুন,
এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও ইতর লোকের
মত 'তুই মুই' করিতে হইয়াছে। পূর্বেই
বলিয়াছি, নিম্নস্তরের প্রাণের ভাষা না লইলে
প্রাণের আবেগ প্রকাশ করা যায় না।

প্রাণ নিম্নস্তরে; নিম্নস্তরের ভাষা আমা-
দিগকে লুইতেই হইবে। লিখিত ভাষা যত
কথিত ভাষার সহিত কাছাকাছি থাকিবে।
তত লিখিত ভাষায় জীবন পাওয়া যাইবে।
লিখিত ভাষা কথিত ভাষাকে যত দূরে ফেলিয়া
রাখিবে, ততই আপনি জীবন হারাইবে,
সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীকের মত হইবে, নানা গুণ
থাকিলেও জীবন্তত্বৎ পড়িয়া থাকিবে।
এখনও যে সংস্কৃত ভাষায় একটু একটু প্রাণ

ধুক্ ধুক্ করে, সে কেবল দেবীরাধনা কোথাও
কোথাও একটু আধটু জীবিত আছে বলিয়া।

ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে, তাহা
সাধারণের বোধগম্য করা আবশ্যিক; আর
ভাষাকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাতে রস
সংযোগ করা আবশ্যিক। 'রসময়ী ভাষাই
সাহিত্যের আধার।

এই সময় বঙ্কিমবাবুর কথা আর এক-
বার বলিব। এবার বন্ধুভাবে, শিষ্য ভাবে
নহে, বিরোধ ভাবে বলিব। আমরা জানি
বিরোধে সাজুয়া শাস্ত লাভ করা যায়।
বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, 'সৃষ্টকৌশল কবির
প্রধান গুণ, কবির আর একটি বিশেষ গুণ
—রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাণ্ডকে বলে,
আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস
শব্দটি ব্যবহার করিয়া আমরা সে পথে
কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আল-
ঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি এ কালে
পরিখার্য্য; ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে—

* * * এবম্বিধ পারিভাষিক
শব্দ লইয়া সমালোচনার কাণ্ড সম্পন্ন
হয় না। আমরা বাহা বলিতে চাহি, তাহা
অল্প কথায় বুঝাইতেছি। আলঙ্কারিকদিগকে
প্রণাম করি।” আমরা তাঁহার উপদেশ
গ্রহণ করিতে পারিলাম না; তাঁহাকে
প্রণাম করি।

'রস' শব্দ, বঙ্কিমবাবুর ব্যঙ্গভাবে প্রণম্য
অভাগা আলঙ্কারিকদিগের সৃষ্ট শব্দ নহে।
অলঙ্কারশাস্ত্র সৃষ্ট হইবার বহু বহু পূর্বে
ঋষিরা এই রসে টল্‌টলায়মান ছিলেন;

“বেদ ল'য়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিল।'
ভারতচন্দ্রের এই ষিষ্ট শ্লোকার্কে তাঁহারই

পরিচয় আছে। “রসো বৈ সঃ” ইহা ঋষিদেরই উক্তি। আলঙ্কারিকগণ রনের লক্ষণা করিতে পারেন নাই,—বলিয়াছেন, রস ব্রহ্মানন্দের মত অপূৰ্ণ পদার্থ। সেই রসানুবোধ-ক্ষমতা আমাদের কমিয়াছে বটে, আর ইংরাজিতে প্রতিশব্দ নাই বলিয়াই কিস-কস পরিহার করিতে হইবে? বাঙ্গলার রসশেখর দেখকের পক্ষে রস পরিহাসের কল্পনা একটা অদ্ভুত রসের কথা বটে।

আকাশের কি বুঝি, আকাশের কি লক্ষণা করিতে পারি; কিছুই পারি না। কিন্তু আকাশ সকলেই বুঝে। রস সেই আকাশের মত সর্বব্যাপী, সর্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছে। ঐ যে নবোঢ়া কিশোরী প্রথম সমাগম অবসরে প্রকুল যুবক স্বামীর শয্যাপার্শ্বে খট্টাঙ্গ-দণ্ডধরিয়া ক্ষৌম বসনে বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া, ব্রীড়াবিকুঞ্চিত অঙ্গে নাক্ষম ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর ঐ যে তরুণ যুবক পূৰ্ণ হইতে পুষ্পবাসিত শয্যাগ শয়ান আছে, মৃদু মৃদু দক্ষিণ, পদ কম্পন করিতেছে, আর মুচকি মুচকি হাসিয়া তরুণীর লজ্জাতরঙ্গ লক্ষ্য করিতেছে ভাল, ইহারাই কি রস বুঝিয়াছে, আর আমরা এই প্রৌঢ় বয়সে কি তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না? ঐ যে প্রবাস-গামী পতি পার্শ্বে প্রণয়িনী কি বলিতে গিয়া বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারিল না, সরমে মরমের কথা তাহার বলা হইল না, সেই প্রণয়ী প্রণয়িনীই কি রস বুঝিয়াছিল, আর আমরা কেহ কিছুই বুঝি না? ঐ যে অর্ক যুবতী, অর্ক কিশোরী, অর্ক অবগুণ্ঠন-বতী বদ্ব্যভাস্তর হইতে একটি স্তম্ভে স্নগোল মাতৃস্তন বিকশিত করিয়া দুরহিত কথঞ্চিং

চলচ্ছাক্তিবিশিষ্ট শিশু সন্তানকে সাগ্রহ আহ্বান করিতেছে, আর সন্তান উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে, টলিতে টলিতে দৌড়াইতেছে,—ঐ বঙ্গজননী আর ঐ বঙ্গ শিশুই কি রস বুঝিয়াছে, আমরা কেহ বুঝি না? আর ঐ যে,

“বধূর বাণী বাজে বুঝি ঐ বিপিনে, নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, সূখা বরষিল শ্রবণে,”
ঐ বংশীধর বন্ধু আর অবশ-অঙ্গিনী গোপীগণই কি রস বুঝিয়াছিলেন, আমরা কেহ বুঝি না? তা কেন? “যন বিজন কানন বা তরুশৃঙ্গ মরুদেশ, প্রথর রশ্মিপ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময় বা ঘোরা দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরী, তরুণযৌবন বা পরিপক্ব প্রবৌগকাল, সর্বস্থানে, সর্বকালে, সর্বাবস্থায় পুরাতন পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার করিয়া ভক্তিমানের চিত্ত রসসঞ্চারে ভক্তিভরে পরিপ্লুত হয়।”

রসময়ের রস সর্বত্র ছড়ান আছে; ছড়ানই বা কেন বলি, ওতপ্রোত আছে; তবে এই রস উপভোগ করিবার ক্ষমতা সকলের সমান নহে। সকল বিষয়ই অনুশীলন-নাপেক্ষ। রসেরও অনুশীলন করিতে হইবে। যে ভাষায় ‘জননীর আদর, পত্নীর সোহাগ, ছেলেদের আকার, বন্ধুর প্রিয়’ সন্তানগণ পাইয়াছি, সেই মাতৃভাষায় সাহিধ্য সেবা করাই রসানুশীলনের সরস উপায়। রস-রচনার অনুশীলনে হৃদয় কোমল হইবে, প্রাণ শীতল হইবে, মন সরল হইবে; দয়া মায়ী, শ্রদ্ধাভাজি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; কপটতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা কমিয়া যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনুষ্যত্ব বাড়িয়া যাইবে। আমরা কোমলপ্রাণ জীব, নাই বা পারিলাম

মারামারি করিতে, নাই এা পারিলাম উল্লম্ফন প্রলম্ফন করিতে, পূরের জন্ত প্রাণ খুলিয়া কাদিতে ত পারি, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি হইবে, জগৎ শতযুগে বলিবে বাঙ্গালি পূরের ব্যথা বুঝিতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেবা-ধর্মে পরম গরিষ্ঠ।

সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গ-সাহিত্য-সেবার সুযোগ বঙ্গ সমাজে দান করিয়া আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। গত বৎসর আমি সাহিত্য-পরিষদকে অধিকতর কর্মঠ করিবার অভিপ্রায়ে আমার অভিভাষণে অনেক কথা বলিয়াছিলাম।

যে যাহারে ভালবাসে,

সে তাহারে সদা দোবে।—

এই রীতি সকল দেখেই আছে। এ বৎসর সে সকল আঙ্গার কিছু করিব না।

এ বৎসর সাহিত্য-পরিষদের অতি দুর্ভাগ্য-সর। যে রাম-স্বভাব রামেন্দ্রসুন্দর শত কর্ম থাকিতেও এই সম্মিলনের স্থাপন গঠন কার্যে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতির প্রধান সহায় ছিলেন, আপনার শত শত গুরুতর কার্য থাকিলেও যিনি কোন দিন পরিষৎ-সেবায় বিরাম দেন নাই, সেই রামেন্দ্রসুন্দর এখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মন প্রাণ বহির্গোঁ শরীর ত আর বহে না পরিষদের সম্পাদকতার অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার দেহ একবারে রুগ্ন ভগ্ন হইয়াছে। সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ, অথচ সাহিত্য সেবায় অক্লান্ত কর্মবীর এখন গুরুতর স্থাবর স্থায় অবস্থান করিতেছেন। সেইরূপ সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার প্রধান সহায় শ্রীমান বোমকেশ মুস্তফীও অনিয়ত পরিশ্রমে জীর্ণ, শীর্ণ, রোগ-

গ্রস্ত হইয়াছেন। তাহাতেই বলিতেছিলাম, এ বৎসর সাহিত্য-পরিষদের অতি দুর্ভাগ্য-সর। এ বৎসর আমরা আকাজকা-আকারের কথা তুলিব না। ভগবানের নিকট, সাহিত্য-মাতা সরস্বতীর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, রামেন্দ্রসুন্দর, বোমকেশ পুনরায় সবল ও সুস্থ হউন, এবং আবার পূর্বমত যত্ন, পরিশ্রম সেবায় সাহিত্য-পরিষদকে গরিম্বসী করুন।

এইবার সমস্ত বঙ্গের স্বাস্থ্য-ভঙ্গের কথা এই বিপুল সাহিত্য-সম্মেলন-সমক্ষে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিব।

আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই, পল্লীগাম লইয়াই পৃথিবী। সচর, নগর,—বাবসায়-বাগিছার স্থান, সরকারী কর্মচারীদের কার্যস্থান। প্রধানত পল্লী লইয়াই প্রদেশ। কিন্তু পল্লীগামের উপর কাহারও দৃষ্টি নাই। যিনি একটু ‘মাথাতোলা’ হইলেন, তিনিই সহরে গিয়া মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। বলেন, দেশের উন্নতি করিতে হইবে। দেশ কি কেবল কলিকাতা আর ঢাকা?

পল্লীর উন্নতি দূরে থাকুক, এমন কি পল্লীর স্থিতির জন্য কাহারও কোন উদ্যোগ নাই। পল্লীগাম সকল জঙ্গলে পূর্ণ হইতেছে, কত বিশিষ্ট গাওগ্রাম হইতে গোক বাছুর বাবে লইয়া নাইতেছে, অরে ওলাউঠার দেশ উজাড় হইয়া বাইতেছে; জলকষ্টে, জল আনিবার কষ্টে, আর দুই তিন ক্রোশ দূর হইতে জল আনিবার সময় সুযোগ সুবিধা হওয়ায়, বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়, কুলবধু কুলের বাহির হইয়া যাইতেছে। এতকল কথা আমরা প্রায়ই ভাবি না। কিন্তু

এখন দিনকতক আমাদের ঘরের কথা আমাদেরকে ভাবিতে হইবে, নহিলে আর যে চলে না।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম—এই পাঁচটির পাঁচটিতেই আমরা সাধারণ ভারত-বাসী, বিশেষত বঙ্গবাসী নানারূপে বিড়ম্বিত। আমরা শুষ্ক মাটিতে বাস করিতে পাই না; স্নান, পান ও রন্ধনের জন্ত পরিষ্কার জল পাই না; পল্লীগ্রাম সকল জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে কাজেই প্রচুর সূর্যালোক পাই না; মাটি-পচায়, গাছ-পচায়, জল-পচায়, পাট-পচায় বায়ু অনেক স্থানে বিষম দূষিত হইয়াছে,—বিষাক্ত বায়ু আমরা সেবন করিতে পাই না; রোগক্লিষ্ট শোকগ্রস্ত, অন্নভাবে শীর্ণ, অকালে জীর্ণ কোটি কোটি নরনারীর আর্ত রবে আকাশ পর্যন্ত দূষিত হইয়াছে, শূন্যপ্রাণে শূন্যপানে চাহিয়াও আমরা সাহায্য পাই নী। দুর্দশায় আমাদের স্বস্তি, শান্তি অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। কি করিব আমরা নির্দোষিত সদস্তপূর্ণ মন্ত্রণা-সভা লইয়া? কি করিব কমিটি, বোর্ড, কাউন্সিল লইয়া? কি করিব উচ্চ নীচ, সুলভ দুর্ভিক্ষ শিক্ষা লইয়া? কি করিব বিচারক ও শাসকের পার্থক্য লইয়া? কি করিব সভাগৃহমধ্যে রাজকর্মচারীদিগকে অবাধ প্রৱেশ কুরিবার ক্ষমতা লইয়া? তবে, শত ধন্ববাদ দিই মহারাজ রণজিৎ সিংহকে আর রায় সীতানাথ রায়কে; তবু দুই জন লোক, বড় লোক হইয়াও আমাদের স্বাস্থ্যবিভ্রাটের কথা বড়লাটের সভায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, মন্দের ভাল বলিতে হইবে। আমরা নিতান্ত বিপন্ন, দীনহীন হইয়া পড়িতেছি,—আমরা যে বাস্তব মাটি পাই না, তৃষ্ণার জল পাই না, শীতে রৌদ্র পাই না, গ্রীষ্মে

বিষাক্ত বায়ু পাই না। আমরা বিষম দেশবাসী জরে হয় জড়সড় হইয়া কাল কাটাই, নয় উজাড় হইয়া যাই। আমরা যে প্রচুর আহারের অভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি; দেহের বল কমিতেছে, হৃদয়ের সাহস কমিতেছে, প্রাণের ক্ষতি নাই বলিলেই চলে।

রাস্তা, বাঁধ, জঙ্গল, সড়ক—সমগ্র ভারতে নিতাই বাড়িতেছে,—গোলোক-ধাধার মত রাস্তার জটিলতায় পথ হারাইয়া ফেলিতে হয়; রাস্তার জাল দিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে,—তাহাতে স্থলপথ স্রবীর হইয়াছে বটে, কিন্তু জলনিকাশের পথ প্রচুর না থাকায় বৃষ্টির জল, বস্তার জল নিকাশ পায় না, মাটিতে ক্রমাগত জল বসিতে থাকে। কাজেই ভূমি হইয়াছে ম্যানেরিয়ার বিহারক্ষেত্র। ঝালকেরা শিশু-শরীরপালন পাঠ করিয়া শুষ্ক ভূমিতে বাস করিতে শিক্ষা পাইতেছে, কিন্তু ভূমিতে জল বসিলে ভূমি শুষ্ক থাকে কিরূপে; কাজেই বাস্তব ভূমি সকল বিক্রীত হইয়াছে।

আবার নদীগর্ভ সকল ক্রমেই ভরিয়া উঠিতেছে। এক যশোহরের রায় যতুনাথ মজুমদার ব্যতীত কেহই সে দিকে মনোযোগী নহেন। বাঙ্গলার অনেক স্থলের নদী সকল কাটাইয়া না দিলে রীতিমত জল নিকাশ হইবে না; দিলে জল নিকাশের ব্যবস্থা হইবে, স্থানের ও পানের জল সঙ্কুলান হইবে এবং বাণিজ্য ও যাতায়াত সুগম হইবে। ভাগীরথী কাটাইবার কথা বাঙ্গলার লাট সভায় উপস্থাপিত করিয়া মহারাজ রণজিৎ আমাদের পুনর্বার ধন্ববাদাই হইয়াছেন।

পূর্বে ধনী ও মধ্যবিত্তের ধর্মপ্রাণতা

ছিল। পুরাতন, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও নব পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা প্রায়ই হইত। এখন সে ধর্মপ্রাণতা নাই। কিন্তু প্রাণ রক্ষা চাই। ভাল জলের সংস্থান না করিলে নদীবিহীন পল্লীগ্রাম টিকিতেই পারে না।

তাহার পর দেশে জঙ্গল বাড়িতেছে। কতক আমাদের উদাসীনতায়, কতক আমাদের অালস্বে, আর কতক আমাদের রসনার উপাসনায়। বাগাত জমিতে গাছপালা চিরকালই আছে ও থাকিবে, নতুবা বাগাত হইবে কি প্রকারে? কিন্তু বাস্তব-উদাস্ত —আমরা রসনা-পরায়ণ হইয়া আর্মের কলমে, লিচুর কলমে ভরিয়া ফেলিতেছি। যাহার আছে সে বাগাত জমিতে বাগান কর, কিন্তু বাস্তব-উদাস্ত জঙ্গল করিও না; মাঠান জমিও বাগাতে পরিবর্তন করিও না। জঙ্গলে ভূমি শুষ্ক হইতে পারে না। তাহাতে বাস্তব বিলক্ষণ ক্ষতি হয় এবং ক্ষেত্রে বাগান করিলে শতদম্ভার কমিয়া যায়। “উত্তর, কলা, দক্ষিণখোলা”—গৃহস্থ লোকের বাসের দক্ষিণে খানিকটা খোলা জমি রাখা নিতান্ত আবশ্যিক। দক্ষিণে খোলা জমি থাকিলে বাঙ্গলায় রোদ্র, বাতাস ছুইই পাওয়া যায়। আগাছা একটু বড় হইলেই পূর্বে লোকে আলানির জন্ত কাটিয়া ফেলিত; এখন অনেক স্থলে পাথুরে কয়লা আলানি হওয়ায় আগাছার তত টান নাই। বড় বড় আগাছায় গ্রাম নগরের উপকণ্ঠ একেবারে ভরিয়া উঠিতেছে। অালস্বে এবং উদাসীনতায় আমরা সেগুলি কাটাইবার ব্যবস্থা করি না। কিন্তু না করিলে আর ত চলে না। আপনার অবস্থা, আপনার গ্রামের অবস্থা, আপনার জেলার

অবস্থা ধীরে সুস্থে বিবেচনা করিয়া দেখ, দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে আমাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইতেছে। যাহাতে আপন গ্রামে, আপন ভিটার আমরা সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারি, তাহার চেষ্টা সকলকে করিতে হইবে,—জঙ্গল কাটাইতে হইবে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে, নদী সকল যাহাতে বহতা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

শরীর বহিলে তবে কর্মসাধন হয়, লোক-যাত্রা সাধন হয়। শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কিছুই হয় না, কোন কিছু ভাল লাগে না। শিক্ষা বল, বিদ্যা বল, গুণপনা বল, ধন বল, যশ বল, শরীর বহিলেই সব। যাহাতে আমরা সেই শরীর সুস্থ রাখিয়া বসবাস করিতে পারি, তাহার জন্ত অগ্রে আমা-দিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টাকে আত্মস্তর নীতি বলিতে হয়, বল; প্রজানীতি বলিতে হয়, বল; স্বাস্থ্যনীতি বলিতে হয়, বল; এই জন্ত রাজপুরুষগণের কাছে যে ক্রন্দন, আবেদন, নিবেদন—তাহাকে রাজ-নীতি বলিতে হয়, বল,—যে নামে বলিতে হয়, বল—কিন্তু এই চেষ্টা এখন কিছু দিন করা চাই। সর্বরূপ আন্দোলনে বিশ্রাম দিয়া এই পরম মঙ্গলকর কার্যে লাগিয়া যাও; আর উদাসীনতায়, অালস্বে, নিবুদ্ধিতায় আসল 'খোয়াইয়া নকলের জন্ত লালায়িত হইও না।

কতবার বলিয়াছি, আবার বলি, সমস্ত বাজে কথা আর কাজের কথা ফেলিয়া রাখিয়া এখন দিন কতক বাঙ্গালিকে বাঙ্গালির স্বাস্থ্যের কথা ভাবিতে হইবে। যাহার যতটুকু সাধ্য, স্বাস্থ্যগতির জন্ত তাহাকে তটুকু চেষ্টা

করিতে হইবে। যে মহাপুরুষ,—তিনি সন্ন্যাসী হউন, গৃহী হউন, হিন্দু হউন, মুসলমান হউন,—বাঙ্গালি জনসাধারণের মন এ বিষয়ে লাগাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই বাঙ্গালির পরম বন্ধু। আর যিনি এখন অগ্র বিষয়ে বাঙ্গালিকে মন লাগাইতে উপদেশ দিবেন, তিনি বাঙ্গালির পরম শত্রু। আমরা অস্বাস্থ্য-তরঙ্গে নিমজ্জমান হইতেছি, ‘হাঁবুড়বু’ খাইতেছি,—অগ্রে আমাদের উদ্ধার সাধন কর, তাহার পর আমাদিগকে অগ্র উপদেশ দিও।

বিগত বর্ষে এমনই দিনে, এমনই শ্রীগৌরোৎসব পূণ্যজন্মদিনে, এমনই ভারতবাসী বসন্তোৎসব—ফল্গুৎসবের দিনে, আমি পঞ্চম সাহিত্য-সম্মিলনের অর্থানা-সমিতির সভাপতি রূপে বিশেষভাবে আমার হৃগলি জেলার এবং সামান্যভাবে সমগ্র বঙ্গদেশের হৃদয়শার কথা অতি কাতর কণ্ঠে, অতি আত্মস্বরে সমগ্র সাহিত্যসেবিগণ-সমক্ষে ‘অশ্রুপূর্ণ’ লোচনে নিবেদন করিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম, সাহিত্য-সেবিগণ! আমি দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি না হইলে, সাহিত্যের উন্নতি হইবে না। সুতরাং যাহারা সাহিত্যোন্নতির অভিলাষী তাঁহারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত একটু চেষ্টা করুন। বলিয়াছিলাম, অগ্র কাহারও কাছে আমি কখন এমন করিয়া আবেদন নিবেদন করি নাই। আপনাদিগকেই আমি বন্ধ বলিয়া, আত্মীয় বলিয়া, মুকুব্বী বলিয়া জানি ও মানি। আমি আপনাদের দরবারে যেকোনো হই হাজির হইয়াছি—আপনারাই আমার জজ, আপনারাই আমার জুরি, আপনারা আমার অশ্রু-পাতে দৃষ্টিপাত করুন, আমার ক্রন্দনে কর্ণ-

পাত করুন, স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে মন দিন। আমার সেই অভিভাষণের ভূম্যে প্রচার হইয়াছিল, অনেক প্রশংসা হইয়াছিল, যৎকিঞ্চিৎ নিন্দাও হইয়াছিল, কিন্তু এমন কথা একজনও বলেন নাই বা লেখেন নাই যে, সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে দেশের স্বাস্থ্যের জন্ত এতটা কাঁদাকাঁটি করা ভাল হয় নাই। ইহাতেই আমার স্পর্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। একে ত আমি অতি প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছি বলিয়া আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, তাহাতে আপনাদের প্রশংসা পাইয়া আমার আশার, আমার স্পর্ধা, অত্যন্ত বাড়িয়াছে; আর বাড়িয়াছে আপনাদের কৃত কার্য্যে, আপনাদের অর্থাৎ চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের অর্থানা-সমিতির সভ্যগণের অহুষ্ঠিত কার্য্যে। আপনারা আমার মত নিগুণ, নিজিয়, নিষ্কৃতি লোককে সভাপতিত্বে বরণ করিবার পূর্বে অবশ্যই আমার পূর্ব অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, যে, দেশের হৃদয়শার দিকে সকলের মন আকৃষ্ট করিবার জন্ত ‘আমার একটা অসাধারণ বোঁক, অসাধারণ টান, অসাধারণ আবেগ আছে; এটা জানিয়া গুনিয়াও যখন আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন সেই বোঁক, সেই টান, সেই আবেগ যে নিতান্ত উপহাসের ব্যাপার বা অবহেলার সামগ্রী, তাহা কখন আপনারা মনে করেন নাই। তাহা যখন করেন নাই, তখন আমি সঙ্কুচিত হইব কেন? অসঙ্কোচ ত বটেই; অধিকন্তু এমন আশা করায় অসঙ্গত হইবে না যে, আপনারা আমার ক্রন্দনে এই-বার প্রকৃতই কর্ণপাত করিবেন।

আবার নিরাশার কথা বলি! এই সম্বন্ধে-

সর ধরিয়া বাঙ্গলার অনেকগুলি মাসিকপত্র পর্যালোচনা করিলাম,—কৈ ঐ কথার গুরুত্বের উপলব্ধি ত কোথাও দেখি নাই। সাপ্তাহিক পত্রেই বা কৈ? ‘সুলভে’ কিছু কিছু থাকিত, তা সুলভ ত আর নাই। “অমৃত-বাজার”, “বঙ্গবাসী” প্রভৃতি দুই একখানি পল্লীসম্পর্কিত পত্রে কিছু কিছু থাকে,—তাহাতেও বড় আশা হয় না। “অমৃতবাজার” বলেন, কলিকাতার লোকে অরকষ্ট বা জলকষ্ট কিছুই বুঝে না, সেইজন্ত কিছুই লেখে না। বাঙ্গলা কবন্ধ হইলেও কলিকাতা আমাদের মাথা,—মাথায় না লাগিলে কাহারও মাথাব্যথা হইবে কেন? ভাল, কলিকাতায় বড় গোক-দের সাহায্য যদি না পাওয়া যায়, সহরে কংগ্রেস যদি এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন, শাসক-সম্প্রদায়ও যদি পূর্বের মত গয়ংগচ্ছ করেন, তবে আমরা এই সামান্য মধ্যশ্রেণীর সম্প্রদায়, এই সমগ্র সাহিত্য-সেবীর দল, এই মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রগুলির সম্পাদকগণ, এই কবি-লেখকের দল, এই ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়—আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারি না কি? নাই বা হইলাম রামমুন্ডির মত জোয়ান, সুরেন্দ্র বাবুর মত বক্তা, ডাক্তার বোমের মত আইনজ্ঞ ও ইংরাজি-সাহিত্যরত, ঠাকুর কুমারের মত ধন-শালী,—নাই বা হইলাম আমরা এ সব কিছু; আমরা এই সামান্য বলবন্ত বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া প্রতি জনে জনে ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়া কিছুই কি করিতে পারিব না? যদি শ্রীভগবানের সহায়ে আমরা এই প্রাণের কথা আপনাদের দশজনেরও প্রাণে লাগাইতে পারি, তাহা হইলেই আশা করিব বাঙ্গলার যুগান্তর

উপস্থিত হইবে, স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প—সকল বিষয়েরই উন্নতি হইবে।

জঙ্গলে, বাধে, রেলের পথে যখন দেশের জল বন্ধ হয় নাই, যখন দেশের ছোট বড় সকল লোকে পল্লীগ্রাম গ্রাম্যতার বলিয়া জানিত, নদী-গুলি যখন ভরাট হইয়া উঠে নাই,—তখন দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহা মনে করিতে গেলেও চক্ষে জল আসে। তখন দেশে অন্ন ছিল,—দুর্ভোগ বেলা দুই মুঠা মোটাভাত সকলেই খাইতে পাইত; দেশে বিস্তর তক্ত-বাগ ও জোলা ছিল,—মোটা কাপড় সকলেই পরিতে পাইত। আর ছিল—যাত্রা-গান, কবি, পাঁচালি, কথকতা : কুন্তিবাসী কাশীদাসী পাঠ হইত; চণ্ডীর গান, পীরের গান গীত হইত, আর হইত পূজা, অর্চনা, আরাধনা, আজান; মেলা-মহোৎসব নিতাই হইত; বারম্বারিতে হিন্দু মুসলমানের সমান উৎসাহ; সর্বত্রই হাসিখুসি, গল্পগুজব, গান-বাজনা। পূর্বাঞ্চলে নদীর উপর সারিগান ও ভাটিয়াল গান পদ্মার মত ভীষণ নদীর প্রবাহ ছাইয়া রাখিত। এখন দেশ অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে ঐ সকল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে : সে উদ্যোগ নাই, সে উৎসাহ নাই; সে প্রাণ নাই, সে ক্ষুধা নাই; সে প্রফুল্লতা নাই, সে রস নাই—সে সব কিছুই নাই। আছে কেবল জ্ঞানের মায়ী, বিজ্ঞানের ছায়া, সভার আড়ম্বর, আর বক্তৃতার বিড়ম্বনা; আছেন—উকীল মোক্তার, কৌন্সিল ও ডাক্তার। আর আছে বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরাজের সংবাদপত্র এবং ইংরাজের নকলে দেশের ইতিহাস। অতি বিনীতভাবে কাতরে জিজ্ঞাসা করি, ঐ সকল খোয়াইয়া,

এই সকল ছায়া লইয়া কি বাঁচিয়া থাকি যায় ? আপনানাই বলুন, এই জগৎপীর্ণ দেহে এই বিষম চিন্তার দুর্ভহ ভার আর কতকাল বহন করিব ?

আপনারা অপূর্ণ বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবক। সাহিত্য-সেবার উপকরণস্বরূপ হৃদয়ে প্রফুল্লতা আবার আনিতেই হইবে। বাঙ্গলার স্বাভিজ্ঞান্নতি করিতেই হইবে ; আপনারা এই বিষয়ে বাঙ্গালিকর হউন, আমি আপনাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিয়া ভগবতী ভারতীর এই পীঠ মধ্যে, তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা করিয়া আপনাদের জয়গান করি। প্রসাদ ভারতি ! ভারত-সন্তানে।

পরিশিষ্ট

আপনারা জানেন, আমি মাসিক পত্রে ও সংবাদ-পত্রে নিয়মিত সাহিত্য-সেবা করিতাম। সাংসারিক বিবটন ঘটায়, সংসারের সেবার অধিক সময় দেওয়া প্রয়োজন হওয়ায় সাহিত্যের নিয়মিত সেবা আমার দ্বারা আর হয় না। তবে অভ্যাস দোষে চোরের যেমন তুষ্ণীনাড়া রোগ ছিল, আমারও সেইরূপ সাহিত্য-তুষ্ণীনাড়া চাড়া করা রোগের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাহিত্য-সেবা দুই প্রকারে হয়, এক পঠনে আর এক লিখনে। পঠন জীবনের চির সহচর, সে ত আছেই, লিখনও এক এক সময় বিশেষ বন্ধুত্ব করিয়া থাকেন। এইরূপে ‘পূর্ণিমা’র নিয়মিত লেখক হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সৌভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে ‘পূর্ণিমা’ মাসিকপত্র লীলা স্তবরণ করিয়াছে ; আমিও মনে করিয়াছিলাম, আমি খালাস পাইলাম। কিন্তু পূর্ণিমায় এক

বৎসর সমালোচনা করিয়াছিলাম বলিয়া গ্রন্থ-কারগণ আমাকে পাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পুস্তক উপহার দেন, আবার নিগ্রহ করিয়া সমালোচনার দাবী করেন। নিগ্রহ কেন বলিতেছি, বলি। লেখাপড়া কিছু না শিখিয়া অনেকের লিখিবার বাসনা হয়। অনেক লেখা বৃষ্টিতে পারা যায় না,—সমালোচনা একটা নিগ্রহ হইয়া উঠে। তাহার পর অভ্যাস দোষে গ্রন্থের দোষগুলি চোখের সম্মুখে পড়ে, সেই দোষ দেখা একটা রোগে পরিণত হয় ; যৌবনে একথাটা ঠিক বৃষ্টিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি ; ছাড়িতে চাই, কিন্তু উপরোধ অনুরোধ এড়াইতে পারি না।

তাঁহার পর অধিকতর বিড়ম্বনা গত বৎসর হইতে। আমার ঘরের কাছে সাহিত্য-সম্মিলন করিতে সারদাবাবু সঙ্কল্প করিলেন ; আমি রোগশয্যায় শায়িত, শয্যাপার্শ্বে সারদাবাবু আসিয়া আমাকে, ‘অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইতে অনুরোধ করিলেন,—আমি তাঁহাকে ‘না’ বলিতে পারিলাম না, স্বীকার করিলাম। সেই সম্মিলনের দিন হইতে রাশি রাশি পুস্তক পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা আসিতে লাগিল। আমি সামান্য লোক,—আমার সাহিত্যের সেরেস্তা নাই, ভাণ্ডার নাই ; যে গ্রন্থগুলি আছে, তাহারই স্মৃশ্রুলায় স্থান সংকুলান করিতে পারি না। স্মৃতরাং অল্প পুস্তকগর্মে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছি। কতক হারাইয়াছে ; কতক বিশৃঙ্খলায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে, যেগুলি সম্মুখে পাইয়াছি, আপনারা অনুমতি করিলে, আপনাদের সম্মুখে সেগুলির একটু আধটু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতে পারি।

এটা যদি দস্তুর হয়, দস্তুর দুঃস্থ হইল; আর যদি দস্তুর না হয়, গোস্বামি মাফ করিবেন।

প্রথমেই জ্বালোকের লেখা পুস্তকের কথা বলিতে হইতেছে। তিনজন সম্ভ্রান্ত মহিলার লিখিত চারিখানি পুস্তক পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে একটি ব্রাহ্মণকথা, একটি বৈদ্যকথা, আর একটি কায়স্থকথা। ব্রাহ্মণকথা অনুরূপা দেবীর “পোষাপুত্র” নামে একখানি গল্পের বই। বৈদ্যকথার “সৃষ্টি রহস্য” নামে একখানি অতি গভীর দর্শনের পুস্তক, আর কায়স্থকথার একমাত্র পুত্রের অকাল বিয়োগে “মর্মান্তভেদী” ক্রন্দন; এই সকল গ্রন্থের কোন সমালোচনা সম্ভব নহে।

দুইখানি এতদঞ্চলের মুসলমান লিখিত গ্রন্থ। একখানি “কারবাল” বা মহরমের যুদ্ধের বিবরণ। নোয়াখালি মাইজুদী হইতে শ্রীআবদুলবারি প্রণীত; আর একখানি ভোলায় মোজাম্মেল হক প্রণীত “জাতীয় মঙ্গল,” দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৮ সালে মুদ্রিত; দুইখানিই কবিতাময়; কবিতাগুলি সরল ও ভাবপ্রবণ।

চট্টগ্রাম পটিয়ার শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত ১৩১৮ সালে প্রকাশিত “সর্দচিত্র সপ্তকাণ্ড রাজস্থান” নামক বৃহৎ অবয়বে ৪০০ পৃষ্ঠায় পদ্যময় পুস্তক। পদ্যের ভাষা অতি প্রাঞ্জল, পরিচয় স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

“হিন্দুর আদিম কীর্তি গায় রামায়ণ,
মধ্যকীর্তি করে মহাভারত বর্ণন,
শেষ কীর্তি রাজস্থান এ লঘু ভারত।
যেমতি বিচিত্র তাহা পবিত্র মহৎ।”
সম্প্রতি চট্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ

সরকারের চারিখানি পুস্তক পাইয়াছি। এই গুলি এই সম্মিলনের প্রথম ফল। আর নবীনচন্দ্রের “আমার জীবন” চতুর্থ ভাগ পাওয়া গিয়াছে। “বঙ্গদর্শনে” কয় খণ্ডেরই আলোচনা করিয়াছি, এই চতুর্থ খণ্ডেরও করিব।

ইতিহাস চারিখানি ও জীভূতী একখানি পাইয়াছি। ইতিহাস, প্রকৃত ইতিহাস বাঙ্গালার দুর্লভ পদার্থ। প্রথমেই “গৌর রাজমালার” নাম করিতে হয়, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ব্যাপ্ত; স্বয়ং ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার সম্পাদক। তাঁহার সম্পাদকতায় শ্রীযুক্ত রমাশ্রমাদ চন্দ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বড়ই আনন্দের বিষয়। কিন্তু “বিষ্ণুপ্রিয়া” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় এই রাজমালার বিস্তর ভ্রম বা অনবধানতা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে যেন বোধ হয় যতটা শ্রম বা যত্ন করিলে এই অপূর্ণ গ্রন্থ আরও নির্দোষ হইতে পারিত ততটা যত্ন করা হয় নাই। বিনোদবিহারী রায় স্বয়ং প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানী। সম্প্রতি গভর্ণমেন্ট তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তকের ৫৬ খণ্ড ক্রয় করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। “ঢাকার ইতিহাস” প্রথম খণ্ড; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। এই গ্রন্থে অগাধ পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণে ইহাকে উৎসাহ দিলে, আমরা আনন্দিত হইব। ‘বারভূঞা’ বা ষোড়শ শতাব্দে বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। অতি উত্তম গ্রন্থ। শ্রীমান্ কুমুদনাথ মল্লিকের ‘নদীয়াকাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিদাস

পালিতের ‘গম্ভীরা’ সর্বজন-সমাদৃত হইয়াছে। ৮শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ‘রাজ-তপাস্বনী’ নামে মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর লেখা।

এই বৎসর বিজয়গুপ্তের “মঃসামঙ্গল” গ্রন্থের সচিব তৃতীয় প্রচার (বা সংস্করণ) পাইয়াছি। বিজয়গুপ্তের ভণিতা ঝাঁড়া আর পাঁচ জন কবির ভণিতা মঙ্গল মধ্যে আছে সুতরাং এখানি খাঁটি বিজয় গুপ্তের গ্রন্থ না বলিলেও চলে। কালা হরিদন্ত যে বিজয় গুপ্তের অঞ্চলে প্রথম ননসামঙ্গল রচনা করেন, তাহা এই গ্রন্থে লিখিত আছে। কাব্যে দেখা যায়, রজক-কুমারী নেতা বিষ-হরির সখী মঙ্গলাদাত্রী এবং গুরুর মত; তিনি এই পদ কিরূপে পাইলেন, গ্রন্থসম্পাদক তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। সুতরাং মনে করিতে হইবে অথ ‘গ্রন্থের আভাস ইহাতে আছে। সে কোন্ গ্রন্থ? সম্পাদক এই সকল প্রশ্নের কোন মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই।

আর একখানি প্রাচীন পুস্তক আমরা পাইয়াছি, দ্বিজ কমললোচন প্রণীত “চণ্ডিকা-বিজয়”; শ্রীপঞ্চানন সরকার সম্পাদিত ও রঙ্গপুর-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। সন ১২৮ নালের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বনে এই গ্রন্থ মুদ্রিত। সম্পাদন-কার্য্য সুন্দর হইয়াছে।

এইবার কয়েকখানি বৈষ্ণবগ্রন্থের গ্রন্থ-কারদিগের কথা বলিব। প্রথমেই প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোষ্ঠামী মহাশয়ের কথা বলি। গোড়ীয় বৈষ্ণবদাম্বিনী এই বৎসর প্রচার-কাধ্যে অধিকতর উৎসাহশীল হইয়াছেন;

প্রভুপাদই সম্পাদক। তাঁহার সম্পাদনে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের “প্রার্থনা”, পৌষ মাসে ঠাকুর মহাশয়ের “শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিসুন্দিকা”, আর মাঘ মাসে শ্রীপ্রেমানন্দ দাস বিরচিত “শ্রীমনঃ-শিক্ষা” প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন নির্বাচন তেমনই সম্পাদন হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিগুলি একেবারে হীরার টুকরা।

তাহার পর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যা ভূষণ মহাশয়ের গ্রন্থাবলির কথা বলিতে হয় সকল গ্রন্থ আমি পাই নাই; দুই খানি পাইয়াছি, “শ্রীরায় রামানন্দ” ও “গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ”। গ্রন্থ দুইখানি অতুল্য; গৃঢ় ভজনগানের অতি হৃদয়তত্ত্ব সকল পুস্তক-দ্বয়ে নিহিত আছে। আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি মাত্র, একটু একটু বুঝি ‘নামে কচি, জীবৈ দয়া,’ আমরা এই সকল হৃদয় কথার সমালোচনা করিতে পারি না।

আরও একখানি “বৈষ্ণব ধর্ম্মের সুক্ষ্ম জ্ঞ” শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রচারিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী-প্রণীত উপহার পাইয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি, হৃদয়তত্ত্ব বুঝি না, মোটা বুদ্ধিতে মোটা কথা বলিতেই ইচ্ছা হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রচারিণী সভার সহিত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের কোন সংস্রব নাই, অথচ মুসলমান নোলবী এই সভায় বক্তৃতা করেন,—এটা কিরূপ হৃদয়তত্ত্ব আমাদের বোধগম্য হয় না। ইহা কি সঙ্গীর্ণ ওদার্য্য, না স্বেচ্ছাচার?

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ, কৰ্ত্তৃক “শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ” (সচিব) সংস্কৃত

মূল, পুজারি গোস্বামীর টীকা, পদ্যানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রকাশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর। ইহাতে ১১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা আছে, সেও এক অপূর্ব পদার্থ। সম্পাদক-অনুবাদকের শ্রম সার্থক হইয়াছে। বন্ধিমবাবু প্রভৃতি সমালোচকের জয়দেবকে আক্রমণ বার্থ করা হইয়াছে।

শ্রীব্রজানন্দ স্বামিপ্রণীত “রাস লীলা” অতি সুন্দর অগ্ৰচ নিপুণ ব্যাখ্যান গ্রন্থ। আমাদের শ্রীমান্ কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত “শ্রীগৌরাসঙ্গ” গ্রন্থ এইখানে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান্ প্রকৃতই ভক্ত,—শ্রীক্ষেত্রে গিয়া ‘‘শ্রীচৈতন্য দেবের কাঁথাখানি, পুঁথিখানি ও কমণ্ডলুটি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমানের জয় হউক।

দুই তিনজন খ্যাতনামা গ্রন্থকার তাঁহাদের সমগ্র গ্রন্থাবলি এই বর্ষে আমাকে উপহার দিয়াছেন; তাঁহাদের অনুগ্রহে আমি গৌরবারিত। গতবৎসর সম্মিলনের সময়ে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ আমাকে এক রাশি পুস্তক উপহার দেন। ১৬ খানি নাটক, কিন্তু অদৃষ্টবৈশুণ্যে তাহার মধ্যে “প্রতাপাদিত্য” নাই। এক দিন আমি আলিপুরের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস মেলায় তাঁহার প্রতাপাদিত্যের অভিনয় দেখিয়াছিলাম, মোহিত হইয়াছিলাম। নাটকগুলির নাম আর উল্লেখ করিলাম না। ক্ষীরোদবাবুর “নারায়ণী” উপন্যাস সকলেরই পাঠ করা কর্তব্য। “বিরাম-কুঞ্জে” কয়েকটি ছোট গল্প আছে, সেগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক। “দুর্গা” চণ্ডীর গল্পকথা। বড় সুন্দর। আমার নয় বৎসরের দৌহিত্রীকে পড়াইয়াছি,—সমস্ত

বুঝে নাই, কিন্তু সে একেবারে মোহিত হইয়াছে।

কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন অনেক দিন হইতে শ্রবণে বলিয়া বাঙ্গলায় সুপরিচিত। তাঁহার কবিতার রস উপভোগ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই বৎসর তিনি আমাদের ভাষণে তাঁহার সমস্ত কবিতা বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন এবং আমাদের উপহার দিয়াছেন। কতকগুলির নাম “গোলাপগুচ্ছ,” “অশোকগুচ্ছ” ইত্যাদি; কতকগুলি মঙ্গল গ্রন্থ “অপূর্ব শিশু মঙ্গল,” “হরি মঙ্গল” ইত্যাদি। আরও তিনখানি অপূর্ব গ্রন্থ আছে, “অপূর্ব বীরাঙ্গনা,” “অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা” ও “অপূর্ব নৈবেদ্য,” মধুসূদনের “বীরাঙ্গনা,” “ব্রজাঙ্গনা” আর রবি কবির “নৈবেদ্য” উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ; তবে দেবেন্দ্রনাথের এগুলিও অপূর্ব বটে। শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন মজুমদার “দেবেন্দ্র-মঙ্গল” লিখিয়াছেন; বলিতেছেন—

“সার্থক সাধনা তব, হে কবিপ্রবীণ,

তপ-পূজা পুরোহিত তুমি মহাব্রতী!

চপল করিল মোরে তব স্বর্ণবীণ,

তাই দেব করিলাম তোমার আরতি।”

বাস্তবিক কবি দেবেন্দ্রনাথ আরতি করারই উপযুক্ত।

শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের অনেকের সাহিত্য গুরু স্বর্গগত অক্ষয়কুমার দত্তের পোস্ত। ইনি আটখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আমি সকলগুলি এখনও পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। “বেণু ও বাণার” ‘আরম্ভে’ কবি কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন,

“বাতাসে যে ব্যথা যেতে ছিল ভেসে ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে।

লুকান যা ছিল অগাধ অচল দেশে,
তারে ভাষা দিতে বেগু সে ফুকারি বাজে।”

Lyric কাব্যের অতি সুন্দর পরিচয় নয় ?

“হোমশিখার” প্রথমেই “সবিতা”

কবিতার ঐক্য নানী পংক্তি আছে,

“ধেয়াই বরণ্য সবিতায়,

রমণীয় দীপ্তি দেবতায়,

আমাদের বুদ্ধি বিধাতায়।”

হোম-শিখার সুন্দর নান্দী। তাহার পর

“তার্থ-সলিল” ও “তার্থ-রেণু” কবি-
প্রদত্ত পরিচয়—

“বিশ্ববাসীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভাতলে,
ভরেছি আমার সোণার কলস নানা তীর্থের
জলে।”

“ফুলের ফসলের” আগম-বাণী আরও
মনোহর, পয়গম্বর মহম্মদের কথা।

“জোটে যদি একটি পয়সা,

খাড়া কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি,

হুটি যদি জোটে, তবে অর্ধেক,

ফুল কিনিও হে অমুরাগী।

বাজারে বিকার ফল-তণ্ডুল,

সে শুধু মিটার দেহের ক্ষুধা,

হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল,

হৃনিয়ার মাঝে সেই ত সুখ।”

“চাঁনের ধূপ” গদ্য গ্রন্থ। চাঁনের
উপনিষৎ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

“কুহু ও কেকাতে” আমরা কুহুই পাইলাম,
কেকা পাইলাম না! “দৃষ্টিহারী,”

“নিধিধ্যান” প্রভৃতি চারিখানি নাটক
আছে। “দৃষ্টিহারী” পড়িয়া দিশেহারা

হইয়াছি, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।
বিদেশের বিশেষ কথা বুঝিতে পারি না।

“ব্রহ্মবাদী স্বাধি ও ব্রহ্মবিদ্যা”—

শ্রীতারাকিশোর শর্ম্ম-চৌধুরী প্রণীত। গত
বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে

অধিকাংশ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান নাই বলিয়া এবং
ব্রাহ্মনামধারী কতকগুলি ভক্তসন্তান নিতান্ত

অনাচারী হওয়াতে ব্রহ্মবাদ সাধারণ লোকের
কাছে অনাদরীয় হইয়াছে; প্রকৃত ব্রহ্মবাদ

যে কি, তাহা গুনিতেও লোকের স্পৃহা নাই।
এমন দিনে এই গ্রন্থের নামকরণ যে সমরোপ-

যোগী হইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারি না।
নতুবা এই গ্রন্থের মত গ্রন্থ বহুদিন দেখি নাই।

এই গ্রন্থ প্রকাশে বাঙ্গলা ভাষা শাস্ত্র-সমন্বিতা
হইয়াছেন, আর চৌধুরী মহাশয় সকলের
পূজনীয় হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারকে গত বৎসর
সাহিত্য-সেবীদিগের নিকটে আমি পরিচিত

করিয়া দিই। এখন তিনি সাহিত্য-সংসারে
সুপরিচিত। এ বৎসর তাঁহার “শিক্ষা-

সমালোচনা”, “ঐতিহাসিক প্রবন্ধ”
ও “সাধনা” প্রকাশিত হইয়াছে। সকল

গুলিতেই গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।
এই সঙ্গে বিবিধ প্রবন্ধমূলক শ্রীযুক্ত বিপিন-

বিহারী ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত “অনুসন্ধান”
নামক পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের “প্রকৃতির
পরিচয়” ও “বিজ্ঞানার্চা” জগদীশচন্দ্রের

আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। এইরূপ গ্রন্থ
বাঙ্গলায় যত প্রকাশিত হইবে, ততই ভাল।

“ভারতের শিক্ষিত মহিলা”—শ্রীহরি
দেব শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন কালের

এবং এখনকার দিনের বিখ্যাত ভারত-মহিলার চরিত্রের পরিচয় আছে। শিক্ষিত বঙ্গমহিলার এখানি সুপাঠ্য পুস্তক, পড়িলে জ্ঞানের সঙ্গে আনন্দ পাইবেন।

“সনাতন ধর্ম ও জ্ঞান-সমিতি”

শ্রীহরিচরণ রায় এম. এ. প্রণীত। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ঐতিহাসিকগণ একটি পৃথক সম্প্রদায় গঠন করিতে গিয়া এবং মহাযাজুরী ‘বলবৎ-সখী’কে সম্প্রদায়-কর্ত্তী করিয়া বিষম ভ্রম করিয়াছেন, নতুবা তাঁহাদের মত বেশ ভাল। তবে উহার মধ্যে যে creed বা বিশেষ বিশ্বাসের পদার্থগুলি আছে, তাহা তাগ করিলেই ভাল হয়।

“সামাজিক সমস্যা”, প্রথম খণ্ড; শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রণীত। ‘সমস্যার শেষ কথা’ হইতেছে,—“অনেক প্রাচীন নিয়ম-পদ্ধতিগুলিতে মরিচা ধরিয়াছে, তাই অবলম্বিত পন্থাগুলি ঠিক কার্যক্ষম হইতেছে না। বরং স্থলবিশেষে উপহাসের কারণ হইতেছে। দশ দিক দেখিয়া গুনিয়া কাজ করা কর্তব্য।”

শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত অনেকগুলি সুলিখিত প্রয়োজনীয় পুস্তক সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। এই ম্যালেরিয়া-প্রবণদেশে, চিকিৎসা পদ্ধতির বিপর্যয় সময়ে, এগুলি বিশেষ উপকারী এবং উপযোগী।
(১) ‘পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য-রক্ষা’ ষষ্ঠ সংস্করণ।
(২) ‘স্বাস্থ্য লভের উপায়’ সন্তান যদি লাভ হইল তাহার পর (৩) ‘শিশুপালন ও চিকিৎসা’। শিশুদের ব্যাপার হইল তাহার পর (৪) ‘স্ত্রীশিক্ষা’, শেষ (৫) ‘মাতার প্রতি উপদেশ’, গ্রন্থকার বলিতেছেন “আর্য্য

মহর্ষিরা বিজ্ঞানের যে উচ্চ লিখিবে আরোহণ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই এইটি দেখাইবার জন্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থ হইতে প্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ও প্লোকের নিয়ে পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

‘রাজা দেবীদাস’, শ্রীসত্যরঞ্জন রায় এম. এ. প্রণীত একখানি উপন্যাস। গ্রন্থকারের ভাষার উপর অধিকার জন্মিয়াছে। আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য উৎসুক রহিলাম। ‘মৃত্যু মিলন’ শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস। হেমেন্দ্র বাবু সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, তথাপি বলিতে পারি না যে, তাঁহার ‘মৃত্যু-মিলন’ সফল হইয়াছে। শ্রীর সামান্য ভ্রান্তিতে হিন্দুপতির চিরজীবন বিচ্ছিন্ন সংস্থান—যেন কেমন কেমন লাগে, একটু বিলাতী বিলাতী বোধ হয়।

আমার সাহিত্য পরিচয় নিতান্ত নীরস হইতেছে। এইবার একবার শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ‘পঞ্চকমালা’ হইতে ‘কৌতুক’-পঞ্চকের চারি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিই।

“প্রণাম করো খোপা নেড়ে,

(আমি বাবো বোকা মেরে)

দেহের বর্ণ স্বর্ণ ভূষায় উজল করে গাটি।

বৃথ্ব আমি,—নারীর ফুল

দীপ্তি বাড়ায় সাড়ীর মূল্য

প্রীতির তব্ধে গীতার অর্থ একেবারে মাটি।”

এই সময়ে শ্রীযুক্ত রসময় লাহার “পুষ্পঞ্জলি” “স্মারাম” ও “ছাই-ভাস্কর” উল্লেখ করি। ছাইভাস্করের পরিবাস

কবিতাদি বেশ সুন্দর। বাঙ্গলার পরিহাস-রস শুকাইয়া যাইতেছে, রসময় রস রক্ষা করিলে আমরা চরিতার্থ হইব, তাঁহার নাম সার্থক হইবে।

“কালিদাসের সীতা”—শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী প্রণীত। ব্যাখ্যাভাবে বর্ণনা উত্তম।

“সদালালী” শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় সংকলিত। বহু মহাপুরুষের চরিত্র-চিত্র ও উক্তি-কথা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বালক বালিকার চরিত্র-গঠনে সহায় হইবে।

কবিতা-গ্রন্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের “এমা”—পত্নীবিয়োগে শাস্তি অশ্বেষণ অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। পড়িতে পড়িতে মন পরিষ্কার হয়, ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মায়। শীঘ্রই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে,—ইহা কবির কম গৌরবের কথা নহে। আরও অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতা পুস্তক পাইয়াছি। সে গুলির আর খুঁটাইয়া পরিচয় দিবার “অবসর নাই। তবে” শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বারা ফুল” ভাল লাগিয়াছে, আর বালক পাঠ্য “ভগীরথ” অতি সুন্দর চিত্র এবং কৃষ্টি-বাসের বিবরণ-সম্বলিত অতি উত্তম পুস্তক, আর দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত বালিকা-পাঠ্য “ঠানাদিদির থলি” বা বাঙ্গলার ব্রত-কথা অতি সুন্দর ও প্রয়োজনীয় পুস্তক,—ইহার চিত্রগুলিও বেশ,—এ কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ এম, এ মহাশয় গত বর্ষে আমাদের সম্মিলনে উপস্থিত হন এবং অধমের গৃহে পদার্পণ করেন। তিনি “প্রবন্ধাটক” ও “হেডম্-রাজ্যের দণ্ডবিধি” নামে দুইখানি গ্রন্থ আমাকে উপহার দেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থ খানিতে শিখিবার বিষয় আছে। প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সবী শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের “শীশু মহল,” ঐতিহাসিক উপন্যাস অনেক দিন আমার কাছে রহিয়াছে। হইয়াছে কি জানেন? কোন হিন্দু বাঙ্গালির লেখা মুসলমানি চরিত্র দেখিলে, আমার একরূপ আতঙ্ক হয়। আয়েষা জগৎ সিংহকে ভাল বাসিল—বিধব্রী বলিয়া মনে একটু ‘কিস্ত’ হইল না? এই সকল পড়িয়া আমার আতঙ্ক হয়। শীশু মহলের সমালোচনা করিতে তাই পারি নাই।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাসের “আলেখ্য” “সোণোবিবি” ও “বোঁ”। “বোঁ” অতি উত্তম গ্রন্থ; নবীন কুলবধু মাত্রেই পড়া উচিত। শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ প্রণীত “কাদম্বিনী” (১৩১৮) ও “শরতের পূর্ণচন্দ্র” (১৩১৯), পরে পরে ভাল হইতেছে; অঙ্কুর ঘটনা-সমাবেশ কমাইলে ক্রমে আরও ভাল হইবে।

বহুতর গ্রন্থের নানাবিধ রস চাকিয়া আমাদের মুখ মারিয়া গিয়াছে। আসুন, সর্বশেষে “ফকিরের সুরসাল “নবানের” নব রস আশ্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করি।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

নিমাই-চরিত্র

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রহ্ম হরিদাস

অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে আর একজন চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া তাহাকে মহাপুরুষ আসিয়া গোরের সহিত মিলিত গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। গৃহতাড়িত হইলেন। তাঁহার নাম হরিদাস। হরিদাসের হরিদাস বেনাপোল নামক স্থানের গভীর জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত অরণ্যের মধ্যে কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় আছে। কেহ বলেন, তিনি বুঢ়ন গ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই নির্জনে এক যবনের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ গৃহে তিনি অধিকাংশ সময়ই ভজনে অতি কেহ বলেন, তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান, তাঁহার বাহিত করিতেন। রাজি দিনে তিন লক্ষ পিতৃদত্ত নাম ব্রহ্ম, তাঁহার জন্মের ছয় মাস হরিনাম জপ করিতেন। নিকটস্থ গ্রাম পরে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে নিরাশ্রয় বাসিগণ তাঁহার নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করেন এবং তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এক সন্তানবৎসল মুসলমান তাঁহাকে স্বগৃহে কিন্তু এই অবাচিত সম্মান হরিদাসের তপো- লইয়া পুত্রনিবিশেষে প্রতিপালন করেন। বিয়ের কারণ হইল। তত্রত্য জমিদার হরিদাস যবনসন্তানই হউন অথবা ব্রাহ্মণ- রামচন্দ্র খাঁ পরম অত্যাচারী ও বৈষ্ণব- বংশোদ্ভবই হউন, তিনি যে শৈশবে যবন-গৃহে বিদেযী ছিলেন। ভক্ত হরিদাসের প্রতি সাধারণের ভক্তি লক্ষ্য করিয়া রামচন্দ্র ঈর্ষ্যা- প্রতিপালিত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কোনও প্রিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে অপ- সন্দেহ নাই। যবনগৃহে প্রতিপালিত হইয়াও মানিত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। হরিদাস পরম হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া উঠেন। একদিন ছুঁত এক পরম রূপবতী বারানসীকে হিন্দুধর্মের তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার সাধুর তপোভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ প্রতিপালক (অথবা পিতা) প্রথমতঃ প্রেরণ করিল। কুলটা নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া হরিদাসের কুটীরে গমন করতঃ প্রেমপূর্ণস্বরে

তাঁহার প্রণয় ভিক্ষা করিল। হরিদাস শাস্ত্রস্বরে কহিলেন “এখনও আমার তিন লক্ষ নাম জপ সম্পূর্ণ হয় নাই; নাম সংখ্যা পূর্ণ হইলেই তোমার সহিত আলাপ করিব। ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর।” রমণী বসিয়া রহিল, কিন্তু হরিদাসের নামসংখ্যা পূর্ণ হইতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

রমণী প্রস্থান করিল। কিন্তু পুনরায় পর রজনীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিদাস কহিলেন “গত রজনীতে তুমি আমার জন্ত অপেক্ষা করিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছ। তজ্জন্ত আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না, আজি আমার কীর্তন শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। আজি তোমার অভিলাষ নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।” তখন সেই পতিতা রমণী গত রজনীর মত দ্বারদেশে উপবেশন করিয়া হরিদাস কীর্তন শুনিতে লাগিল। কীর্তন শুনিতে শুনিতে হই একবার তাহার মুখেও হরিদাস স্মৃতি হইয়া উঠিল। হরিদাসের নাম কীর্তনে নিশা অতিবাহিত হইয়া গেল। রমণী বিফল-মনোরথ হইয়া সেদিনও প্রস্থান করিল। তৃতীয় রাত্রিতেও বথাসময়ে রমণী আসিয়া হরিদাসের কুটীরদ্বারে সমাগত হইল এবং দ্বারে বসিয়া ভক্তকণ্ঠোচ্ছারিত হরিদাস শুনিতে লাগিল। নাম শুনিতে শুনিতে পতিতার মন পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাহার কণ্ঠে হরিদাস বারংবার ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অমৃতপ্ত হৃদয়ে কাদিতে কাদিতে সে সাধুর চরণতলে পতিত হইয়া রামচন্দ্র খাঁর হৃৎস্ততার কাহিনী বিবৃত করিল, এবং স্বকীয়, পাণের জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পরিত্রাণের উপায়

জিজ্ঞাসা করিল। হরিদাস কহিলেন “আমি সমস্তই অবগত আছি; কিন্তু রামচন্দ্র খাঁ নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ ‘যে পাপ করিয়াছে তজ্জন্ত তাহার উপর আমার ক্রোধ হয় না। আমি তোমারই জন্ত এ তিন দিন এখানে অপেক্ষা করিতেছি। তুমি বথাসময় ব্রাহ্মণদিগকে দান করতঃ আমারই এই কুটীরে বসিয়া একমনে হরিদাস জপ এবং তুলসীর সেবা কর, অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে দয়া করিবেন।” রমণী তাহাই করিল। সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে একবস্ত্রা হইয়া সেই কুটীরে বাস করতঃ সে প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিদাস জপ করিতে লাগিল। তাহার ইন্দ্রিয় দমিত হইল, প্রেম প্রকাশিত হইল। দেশবিদেশে পরম বৈষ্ণবী বলিয়া তাহার খ্যাতি প্রচারিত হইল।

সেই অরুণ্য হইতে হরিদাস চাঁদপুরে চলিয়া গেলেন এবং ‘তথায় বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বলরাম সপ্তগ্রামের ধর্ম্মীজ জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন হরিদাসের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সেই গ্রামে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। হিরণ্যের পুত্র বালক রঘুনাথ এই স্থানে, হরিদাসের দর্শন লাভ করিয়া পরম ভক্তিমান হইয়া উঠেন। একদিন বলরামের সহিত জমিদারের ‘সভায় গমন করিয়া হরিদাস নামমাহাত্ম্য বর্ণন করিতে করিতে কহিলেন “নামের ফল—কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমাংগপত্তি, পাপক্ষয় ও মোক্ষ নহে। মুক্তি নামাভাসেই হইয়া থাকে।” সভায় গোপাল চক্রবর্তী

নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি হরিদাসের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন “আপনারা এই ভাবুকের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিবেন না। কোটীজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তিলাভ হয়, এই ব্যক্তি বলিতেছে, নামাভাসে সেই মুক্তি হয়, এও কি কথন সম্ভব?” হরিদাস কহিলেন “শাস্ত্রেই ত আছে নামাভাস নাহি মুক্তি হয়। ভক্তি-স্বথের নিকট মুক্তি অতি তুচ্ছ বলিয়াই ভক্তগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না।’ গোপাল তখন বলিয়া উঠিল, নামাভাসে যদি মুক্তি হয়, তবে আমার নাক কাটিব।” হরিদাসও দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন “যদি না হয় তবে আমার নাক কাটিব।” সভাসদ সকলে গোপাল চক্রবর্তীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। গোপাল জমিদারের আরিন্দাগিরি করিত। সে তৎক্ষণাৎ কন্ঠ-চ্যুত হইল। কিন্তু হরিদাস কহিলেন “আমার এ ব্যক্তির উপর বিন্দুমাত্রও ক্রোধ নাই; তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নামের ‘মহিমা বুঝিতে পারে না।’ ইহার কিছুকাল পরে গোপাল কৃষ্টব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল।

কিছুকাল চাঁদপুরে অবস্থান করিয়া হরিদাস কুনিয়া গ্রামে গমন করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই স্থানীয় সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তথাকার মুসলমান কাজী তাঁহাকে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিতে লাগিল এবং অবশেষে বাদশাহের নিকট তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে, তিনি মুসলমানধর্ম-ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বাদশাহ লোক পাঠাইয়া হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে

হরিদাস বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস বন্দিশালায় প্রেরিত হইলেন। তথায় অনেক বড় বড় লোক আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা সাধু দেখিয়া প্রণাম করিলে, হরিদাস কহিলেন “যেদ্রুপ আছ তেমনি থাক।” বন্দিগণ আশীর্বাদচ্ছলে এই অভিসম্পাত শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তখন হরিদাস কহিলেন “আমি আশীর্বাদই করিয়াছি। এই বন্দিশালায়—হিংসা নাই, প্রজার পাড়ন নাই, এখানে আছে কেবল বিপন্নের শরণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-ভিক্ষা। আমি আশীর্বাদ করিয়াছি এই বন্দি-অবস্থায় তোমরা যেদ্রুপ একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ—বন্ধনমুক্ত হইয়াও তোমরা তদ্রুপই একাগ্র ভাবে হরি-গুণ ভজনা কর।”

পর দিন হরিদাস বাদশাহ-দরবারে নীত হইল—বাদশাহ প্রথমতঃ তাঁহাকে সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং অতি মিষ্ট বচনে তাঁহাকে হিন্দুনানী ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরিদাস বাদশাহের বচন শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন “অহো বিস্ময়া।” অনন্তর হিন্দু ও মুসলমানের যে একই ঈশ্বর, এবং সেই ঈশ্বরের প্রেরণাতে যে তিনি হরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন, বাদশাহকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। বাদশাহ হরিদাসের কথা শুনিয়া প্রথমে কতকটা শান্ত হইলেন বটে—কিন্তু ধর্ম্মান্ধ কাজীর প্ররোচনায় অবশেষে হরিদাসকে কহিলেন, ইসলামানুসারিত আচরণ অবলম্বন না করিলে তিনি তাহার শাস্তি বিধান করিবেন; হরিদাস নিষ্ঠুর

ভাবে উত্তর করিলেন “ঈশ্বর বাহা করাইতে-
ছেন, আমি তাহাই করিতেছি।

খণ্ড খণ্ড হয় দেহ, যদি যায় প্রাণ,

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম।”

বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন
“এই দুর্বৃত্তকে “বাইশ বাজারে বেড়াঘাত
করিয়া বধ কর।” যদি নিদারুণ বেড়াঘাতেও
প্রাণান্ত না হয়, তাহা হইলে বুঝিব এ বাহা
বলিয়াছে, তাহা সত্য।” রাজাজ্ঞা প্রতি-
পালিত হইল। পাইকগণ হরিদাসকে ধরিয়া
বাজারে বাজারে প্রকাশ্য ভাবে নিদারুণ প্রহার
করিতে লাগিল। জনসাধারণ সাধুর অগ-
মানে ক্ষুব্ধ হইয়া বাদশাহ ও উজীরকে অভি-
সম্পাত করিতে লাগিল। কিন্তু হরিদাস
নির্ভীক; তিনি তখন স্বীয় আরাধ্য দেবতার
ধ্যানে বাহজ্ঞানহীন, ঘাতকগণের আঘাত
তাঁহার শরীরে লাগিল না। যে সকল হতভাগ্য
তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিল, কেবল তাহাদের
জন্তই তাঁহার প্রাণ মাঝে মাঝে ব্যাকুল
হইয়া উঠিতেছিল, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের
নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “হে কৃষ্ণ, এই
হুভাগ্য রাজভৃত্যাদিগকে দয়া কর, আমার
উপর যে দ্রোহাচরণ করিতেছে, তজ্জন্ত যেন
ইহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে না হয়।”
পাইকগণ যখন দেখিল, তাহাদের প্রহারে
হরিদাসের কিছুই হইল না, তখন হরিদাসকে
কহিল “হরিদাস, তোমার প্রাণ নাশ করিতে
আমাদিগের উপর আদেশ হইয়াছে, কিন্তু
এত প্রহারেও যখন তোমার প্রাণ বহির্গত
হইল না তখন কাজীর হাতে আর আমাদের
নিস্তার নাই।” দয়ালু হরিদাস কহিলেন
“আমি জীবিত থাকিলে যদি তোমাদের অনিষ্ট

হয়, তবে আমার জীবিত থাকিয়া কাজ নাই।”
এই বলিয়া যোগী হরিদাস ধানাবিষ্ট হইলেন।
পাইকগণ তাঁহার নিশ্চেষ্ট দেহ লইয়া বাদশাহ-
সমীপে উপস্থাপিত করিল। বাদশাহ সেই দেহ
কবরস্থ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।
কিন্তু ছুট কাঙ্গালিগণ প্রতিবাদী হইয়া বলিয়া
উঠিল “পাণ্ডিত মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচরণ
অবলম্বন করিয়াছিল; উহার দেহ কবরস্থ
করা সম্ভব নহে। নদীতে লইয়া উহাকে
ফেলিয়া দেও।” হরিদাস গঙ্গাবক্ষে নিক্ষিপ্ত
হইলেন। ভাগীরথীর তরঙ্গচঞ্চল বক্ষে
ভাসিতে ভাসিতে হরিদাসের জ্ঞান ভঙ্গ
হইল। তখন তিনি সন্তরণপূর্বক তীরে
উঠিয়া বাদশাহ-দরবারে গমন করিলেন।
বাদশাহ স্তম্ভিত হইলেন। সভাসদগণ নির্ভীক
হইয়া ঈর্ষাপ্রতিবৎ অবস্থিতি করিতে
লাগিলেন। হরিদাসের অসাধারণত্ব প্রমাণিত
হইল। বাদশাহ সভাসদগণ সহ দণ্ডায়মান
হইয়া হরিদাসের স্তব করিতে লাগিলেন এবং
তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন।

বাদশাহ-দরবার পরিত্যাগ পূর্বক হরিদাস
ফুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন। ফুলিয়ায়
ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দেখিয়া “আনন্দে হরিধ্বনি
করিয়া উঠিলেন। প্রেমবিহ্বল হরিদাস
প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে কহিলেন, ‘ভক্ত-
গণ আমার জন্ত দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই,
জীবনে ঈশ্বরানন্দ অনেক গুনিয়াছি, তাই
ঈশ্বর রাজদরবারে আমার শাস্তি সংঘটন
করিয়া দিয়াছেন। পাপের তুলনায় শাস্তি
আমার সামান্যই হইয়াছে।’

গঙ্গাতীরে এক গোফা নির্মাণ করিয়া
হরিদাস তথায় সাধন-ভজনে নিমগ্ন রহিলেন।

সেই গোফার নিয়দেঁশে এক বিষধর সর্প বাস করিত। অনেকে সেই গোফায় হরিদাসের দর্শন লাভার্থ গমন করিয়া সেই বিষধরের গাত্রনিঃসৃত তীব্র জ্বালা অনুভব করিত। কিন্তু কারণ অনুমান করিতে পারিত না। অবশেষে কয়েক জন বৈষ্ণব গোফা পর্যবেক্ষণ করতঃ প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া হরিদাসকে সেই গোফা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। হরিদাস অনুরোধ শুনিয়া কহিলেন “অনেক দিন যাবত আমি এই গুহায় বাস করিতেছি, কিন্তু কোনও দিন কোন জ্বালা অনুভব করি নাই। তবে তোমরা যখন এখানে আসিতে পারিতেছ না, তখন এ গুহা ত্যাগ করাই কর্তব্য। দেখি যদি মহানাগ এই গুহায় নিশ্চিতই থাকেন, তাহা হইলে আগামী কলাই তিনি ইহা ত্যাগ করিয়া যাইবেন। যদি না যান তখন অস্ত্র বাইব।” সেই দিন সন্ধ্যাকালে সকলে দেখিতে পাইল, এক ভীষণ সর্প গর্ত হইতে উঠিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেল।

“ডঙ্ক” নামক এক শ্রেণীর নর্তক সর্বাঙ্গে অস্ত্রভূষণ ধারণ করিয়া নৃত্যগীত করিত, এবং জনসাধারণ তাহাদিগকে ভয় ও ভক্তি করিত। ফুলিয়া গ্রামে এক গৃহস্থের বাটতে একদিন ডঙ্কের নৃত্য ও কালীয়দহে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সঙ্গীত হইতেছিল। হরিদাস নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া হরিদাস মুগ্ধিত হইয়া পড়েন, এবং মুচ্ছাভঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। নৃত্যপর ডঙ্ক ভাবাবিষ্ট হরিদাসকে দেখিয়া সমস্ত্রমে সভার একধারে পাড়াইয়াছিল। সেই সভায় এক নিকোঁধ

ব্রাহ্মণ ছিল। সে হরিদাসের প্রতি সকলের ভক্তি লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল “হরিনাম করিয়া নৃত্য করিলেই ত সকলে ভক্তি করে। আমিও যদি হরিদাসের মত বিহ্বল ভাব দেখাইতে, পারি, আমাকেও সকলে ভক্তি করিবে।” এই ভাবিয়া সে ভাবাবেশের ভাণ করিয়া হুলুস্থিত হইল। কিন্তু এবার ডঙ্ক স্বীয় নৃত্যের প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করিয়া কষ্ট হইয়া উঠিল এবং সেই নিকোঁধ ব্রাহ্মণকে ধরিয়া নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারে জর্জরিত ব্রাহ্মণ “বাপ বাপ” বলিয়া পলায়ন করিল। তখন সকলে ব্রাহ্মণকে প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ডঙ্ক কহিলেন “ও লোকটা ভাবাবেশের ভাণ করিয়াছিল, তাই তাহাকে প্রহার করলাম। উহার এত বড় স্পন্দা যে হরিদাসের সমান হইতে চায়। কৃষ্ণ বাঁহার পদে নিরবধি ভক্তিডোরে আবদ্ধ, তিলাদ্ধের জন্ত বাঁহার মস্ত আশ্রয় করিয়া লোক কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়, মূর্থ ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রাপ্য সম্মানে লোভ করে।

জাতিকুল নিরর্থক সব বুঝাইতে।

জন্মিলেন নৌচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥

অধম কুলেতে যদি বিকৃতভক্ত হয়।

তথাপি সেই সে পূজ্য সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।

কুলে তার কি করিবে, নরকেতে নজে ॥

এ সকল বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।

জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে ॥”

হরিদাস উচ্চকীর্তন করিতেন। কীর্তন-দেবিগণ তাঁহাকে নানারূপ পরিহাস করিত। এক হুমুখ ব্রাহ্মণ এক দিন তাঁহাকে কহিল “হরিদাস, মনে মনে কি হরিনাম জপ করা

যায় না? তবে চোঁচাইয়া সকলকে উত্যক্ত কর কেন?” হরিদাস বিনীত ভাবে কহিলেন “আপনাদের কাছেই ত আমি হরিনামের মহাশ্রয় শিখিয়াছি। আপনাদের নিকটই শুনিয়াছি—শাস্ত্রে বর্ণে উচ্চরবে হরিনাম করিলে শত গুণ পুণ্য হয়, উচ্চ করিয়া হরিনাম করিলে পশুপক্ষীকীটপতংগ হরিনাম শুনিতে পাইয়া কৃতার্থ হয়। ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধা হইয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল “কলিকালে হরিদাস হইয়াছেন দর্শন-কর্ত্তা।”

ফুলিয়া হইতে হরিদাস শান্তিপুরে গমন করিলেন। অদ্বৈতাশ্রমে হরিদাস উপস্থিত হইবামাত্র আচার্য্য তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করতঃ সাধনভজনার্থ গঙ্গাতীরে তাঁহার জন্ত এক গোফা নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। সেই নির্জন গোফায় এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে হরিদাস নামকীর্তনে নিরত আছেন, এমন সময় এক পরম রূপবতী রমণী তথায় উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে তাঁহার প্রণয় যাচুঞ করিল। হরিদাস অবিচলিত ভাবে কহিলেন “আমার সংখ্যামত নামকীর্তন সমাপ্ত না হইলে, আমি কোনও কাৰ্য্য করি না। তুমি দ্বারে উপবিষ্ট হইয়া নাম গান শ্রবণ কর। কীর্তনান্তে তুমি যাহা বল তাহা করিব।” বেণাপোলের কুটীরে পূৰ্ব্বোক্ত রমণীর স্রায় নবাগত রমণীও ক্রমান্বয়ে তিন রাত্রি আগমন করিল; প্রতি রাত্রিই হরিদাসের কীর্তনে অতিবাহিত হইল। তৃতীয় রাত্রিতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া রমণী কহিল “বৃথা আশ্বাসে তুমি তিন দিন আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছ, রাত্রিদিনেও তোমার

নাম শ্রবণ হয় না।” হরিদাস বিনীত ভাবে কহিলেন “তোমার কষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু আমিই বা নিয়মভঙ্গ করি কি রূপে?” রমণী তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, “ঠাকুর! আমি মায়া, তোমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। ব্রহ্মাদি সকলকেই আমি মোহিত করিয়াছি, তুমিই কেবল আমাকে অতিক্রম করিলে। মহাভাগবত তোমার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে। তুমি আমাকে কৃষ্ণ উপদেশ কর।” হরিদাস তাহাকে যথোচিত উপদেশ দান করিলেন।

হরিদাস যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত কৃষ্ণকথলাপে অতিবাহিত করিয়া ছিলেন, তখন গৌরচন্দ্র অল্পে অল্পে নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌরকর্তৃক আন্তর হইয়া আচার্য্য নবদ্বীপে গমন করতঃ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। হরিদাসও আঁচিরে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাত প্রহরিয়া ভাব

একদিন সমাগত ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া গৌরচন্দ্র কহিলেন “আমরা দিবাভাগেই হরিনাম করিতেছি, কিন্তু রাত্রিশুলি বৃথা অতিবাহিত হইতেছে; আজি হইতে রাত্রিতেও কীর্তন করা যাউক।” ভক্তগণও তাহাই চাহিতেছিলেন, তাঁহারা সানন্দে গৌরের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। প্রতি নিশায় ক্রীয়াসংগ্ৰহে কীর্তন হইতে লাগিল। কোনও কোনও রাত্রিতে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের

অদ্বৈত, শ্রীবাস, বিগ্গানিধি, মুরারী, হিরণ্য, হরিদাস, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান্, নারায়ণ, কানীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গুরুড়, গোবিন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর, সদাশিব, বক্তেশ্বর, শ্রীগর্ভ, গুরুদ্বার, ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয় প্রভৃতি কত ভক্তই কীর্তনে যোগদান করিতেন। ভক্তকণ্ঠাখিত হরিশ্বনি নৈশ আকাশে সমুথিত হইত; পাষাণগণ তাহা শুনিয়া জলিয়া পুড়িয়া মরিত। তাহারা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল “বৈষ্ণবগণ মধুমতী সিদ্ধিলাভ করিয়া মন্ত্রবলে পঞ্চকণ্ঠা আনয়ন করতঃ নিশাকালে তাহাদের সহিত আমোদপ্রমোদ করে।” বিদ্রোষ্টাগণের নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া ভক্তগণ এককীর্তনে রত রহিলেন।

কীর্তন আরম্ভ হইলেই গৌর ভাব্যবশে মত্ত হইয়া পড়িতেন, তাঁহার চরণ শিথিল হইয়া পড়িত, এবং সময় সময় এমন ভাবে ভূপতিত হইতেন যে, তাহা দেখিয়া শচীদেবী আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। পুত্রবৎসলা জননী কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেন—

কৃপা কর কৃষ্ণ মোরে এই দেষ্ট বর।

যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বস্তর ॥

মুঞি যেন তাহা নাহি জানে সে সময়।

হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয় ॥

যত দিন যাইতে লাগিল, কীর্তনের প্রগঢ়তাও ততই বদ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে বিবিধ কীর্তন-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। শ্রীবাস, মুকুন্দ, গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি অনেকে অনেক সম্প্রদায় গঠন করিলেন। কীর্তন কালে যে উদ্গাদনার সৃষ্টি হইত, তাহা বর্ণনা

তীত। দলেদলে লোক তাহা দেখিবার জন্ত ছুটিয়া আসিত, কিন্তু গৃহের দ্বার রুদ্ধ থাকায় প্রবেশ করিতে পারিত না। পাষাণীগণও কীর্তন শুনিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রবেশ করিতে না পাইয়া বিষম রুষ্ট হইয়া উঠিত। এখন তাহারা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল “দেশে চুর্ভিক্ষ ছিল না, বেটারা কীর্তন আরম্ভ করিয়া দেশে চুর্ভিক্ষ আনিয়াছে। এত ভাল ছেলে নিমাই পণ্ডিত, এই সমস্ত বদমায়েসের দলে নিশিয়া মাটা হইয়া গেল। কোথা হইতে এক জাতি-নাশা অবধূত আসিল, শ্রীবাস দ্বিকাক্তি না করিয়া তাহাকে অগৃহস্থান দান করিল। বেটারদের স্পর্ধা বড় বাড়িয়াছে, আমরা দেয়ানে নালিশ করিয়া ইহাদের জারিজুরি সব ভাঙ্গিয়া দিব।” কিন্তু নিন্দা ও ভয় প্রদর্শনে কোনও ফল হইল না। কীর্তন যেন চালাতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল।

গভীর নিশায় এক দিন কীর্তন হইতেছে, ভক্তগণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। খোল করতাল ও কীর্তনের রব নবদ্বীপের নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মুক্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এমন সময় ভক্তমণ্ডলী ভেদ করিয়া গৌরচন্দ্র বিষ্ণুখটার দিকে ধাবিত হইলেন। খোল করতাল নীরব হইল, ভক্তগণ বিশ্বরাস্তিমিত লোচনে চাহিয়া দেখিলেন, গৌর বিষ্ণুখটায় আরোহণ করিয়া শালগ্রামশিলা অঙ্গে ধারণ করতঃ উপবিষ্ট হইলেন। মড় মড় শব্দে খট্টা কম্পিত হইয়া উঠিল। ত্রস্তব্যস্ত ভাবে নিত্যানন্দ যাইয়া খট্টা স্পর্শ করিলে শব্দ নিবৃত্ত হইল। সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া গৌর বলিতে লাগিলেন—

“কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ
আমি সেই ভগবান দেবকীনন্দন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটা মাঝে আমি নাথ ।
যত গাও সেই আমি, তোরা মোর দাস ॥
তোমা সভা লাগিয়া আমার অবতার ।
তোরা যেই দেহ সেই আহাৰ আমার ॥”

তখন প্রভুকে ভোজন করাইবার জুহু
ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন । রাশি রাশি
ভোজ্য দ্রব্য আনীত হইয়া তাঁহার সম্মুখে
স্থাপিত হইল । গৌর সমস্তই ভোজন করিয়া
বলিলেন “আর কি আছে, আনো ।” ভক্তগণ
ছুটিলেন এবং অচিরেই প্রচুর দ্রব্য সকল
আনিয়া প্রভুসমীপে স্থাপন করিলেন ; কিন্তু
নিমিষেই তাহা উদরস্থ করিয়া গৌর আবার
বলিলেন “আরো আন ।” আর আনিবে কি ?
ভক্তগণ ভীত হইয়া স্তব পাঠ করিতে
লাগিলেন “হে বিশ্বম্ভর, তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বীয়
উদরে ধারণ করিয়া আছ, আমাদের ক্ষুদ্র
উপহার দ্বারা কিরূপে তোমার তৃপ্তি সাধন
করিব ?” গৌর কহিলেন “ভক্তের উপহার
ক্ষুদ্র নহে ; তোমাদের যাহা আছে লইয়া
আইস, তাহাই আমার পরম প্রিয় ।” ভক্তগণ
কপূর ও তাধুল আনিয়া দিলেন এবং ভক্তি-
বিগলিত কণ্ঠে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ।

ইহার কতিপয় দিবস পরে প্রাতেকালে
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের সহিত শ্রীবাস পণ্ডিতের
গৃহে উপস্থিত হইলেন । একে একে যাবতীয়
ভক্ত আসিয়া সমাগত হইলেন । গৌর
ভাবাবিষ্ট হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে
লাগিলেন । তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে
পারিয়া ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন আরম্ভ
করিলেন । কীর্তন-কালে গৌর প্রায়ঃ

দ্বাস্ত্রভাবে আবিষ্ট হইতেন, কখনও কখনও
ঈশ্বর ভাবে বিভোর হইয়া বিষ্ণুখটায়
উপবেশন করিলেও, অচিরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া
যেন অজ্ঞানাবস্থায় না জানিয়া তথায় উপবেশন
করিয়াছেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন ।
কিন্তু আজি নাচিতে নাচিতে তিনি বিষ্ণু-
খটায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং সাত
প্রহর যাবত তথায় বসিয়া রহিলেন । ভক্তগণ
বৃত্ত করে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ।
গৌর আদেশ করিলেন আমার অভিষেক-
সঙ্গীত গান কর । ভক্তগণ ‘সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ’ মন্ত্রে
গঙ্গাজল দ্বারা তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন
করিলেন এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া
গৌরের দেহ চন্দনচর্চিত করিলেন । নিত্যানন্দ
তাঁহার মস্তকোপরি এক সুন্দর ছত্র ধারণ
করিলেন, অত্র এক ভক্ত চামর বাজন করিতে
লাগিলেন । অনন্তর পাণ্ড অর্ঘ্য আচমনীয় দ্বারা
যথাবিধি পূজা শেষ করিয়া ভক্তগণ স্তবপাঠ
করিতে লাগিলেন । ভক্তদত্ত নানাবিধ
সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া, গৌর শ্রীবাসকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “শ্রীবাস, মনে পড়ে
একদিন দেবানন্দের টোলে প্রেমরসময় ভাগবত
শুনিতো শুনিতো বিহ্বল হইয়া তুমি ভূমিতে
পড়িয়া কাঁদিয়াছিলে । দেবানন্দের মৃৎ ছা-
গণ ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত
হইয়া তোমাকে টানিতে টানিতে বাহির দুয়ারে
লইয়া গিয়াছিল, দেবানন্দ দেখিয়াও শিষ্যগণকে
নিবারণ করেন নাই । তুমি মনে বড় দুঃখ
পাইয়া আবার নির্জনে ভাগবত শুনিতো
চাহিয়াছিলে । তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি
বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া তোমার সদয়ে আবি-
ভূত হইয়াছিলাম এবং প্রেমযোগ দিয়া

তোমাকে আবার কাঁদাইয়াছিলাম। সে কথা কি মনে আছে শ্রীবাস ?” পূর্বকথা স্মরণ হওয়ায় শ্রীবাস কাঁদিয়া ভুলুঠিত হইলেন।

কোনও ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া গৌর বলিলেন “অমুক রাত্রিতে বিশ্রুপে আসিয়া আমি তোমাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলাম ; সে কথা মনে হয় কি ?” প্রভুর দয়ার প্রমাণ পাইয়া ভক্ত আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন।

গঙ্গাদাসকে ডাকিয়া গৌর কহিলেন “গঙ্গাদাস, রাজার ভয়ে সপরিবারে যে দিন তুমি পলায়ন করিয়াছিলে, সে দিনের কথা মনে আছে কি ? খেয়াঘাটে নৌকা না দেখিতে পাইয়া তুমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলে। তখন আমিই খেয়ারীকূপে নৌকা লইয়া আসিয়া তোমাকে পার করিয়াছিলাম। গঙ্গাদাস উদ্বেলিত ভাবাবেগে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর গৌর কহিলেন “শ্রীমৎ একজন গিয়া শ্রীধরকে আমার নিকট লইয়া আইস।” খোলা বেচিয়া শ্রীধর জীবিকা নির্বাহ করিতেন। খোলা বেচা হইতে যে আয় হইত তাহার অর্দ্ধেক মিত্য গঙ্গাপূজায় ব্যয়িত হইত, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক দ্বারা শ্রীধর কোনও রূপে ছুটি অন্ন সংস্থান করিতেন। সকলে তাঁহাকে খোলাবেচা শ্রীধর বলিয়া ডাকিত। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শ্রীধর কৃষ্ণনাম জপ করিতেন। আজি নিজগৃহে শ্রীধর হরিনামে নিবিষ্ট ছিলেন। অরিতপদে কয়েকজন ভৃত্য তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রভুর আদেশ তাঁহাকে শোনাইল। শ্রীধর আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার পদযুগল অচল

হইয়া পড়িল। ভৃত্যগণ ধরাধরি করিয়া তাহাকে গৌরের সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল। শ্রীধরকে দেখিতে পাইয়া গৌর পরম মেহে তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন “শ্রীধর আমাকে ভাবিয়া তুমি বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়াছ ; এজন্মেও প্রচুর খোলা মুলা খোড় তুমি আমাকে দিয়াছ।

আজি আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর। তখন

মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।

তমালগ্রামল দেখে সেই বিশ্বস্তর ॥

হাতে বংশী মোহন দক্ষিণে বলরাম।

মহা জ্যোতিষ্ময় সব দেখে বিজ্ঞমান ॥

দেখিয়া শ্রীধর মাচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীধর সংজ্ঞা লাভ করিলে গৌর কহিলেন

“শ্রীধর তোমার ডাকে আমি চিরদিন মুগ্ধ ;

তুমি আমার স্তব কর, শুনি।” বিজ্ঞানেশ

ধীন শ্রীধর তখন স্তুতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্লোক

রচনা করিয়া প্রভুর বন্দনা পাঠ করিলেন।

অনন্তর গৌর কহিলেন “শ্রীধর, তোমাকে

আমার আদেশ কিছুই নাই, তোমাকে আমি

অষ্টসিদ্ধি দিব ; তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা

কর।” শ্রীধর কহিলেন “প্রভু আর আমাকে

ভাঁড়াইও না, আর ভাঁড়াইতে পারিবে না।”

গৌর কহিলেন “না শ্রীধর, তোমাকে বর

মাগিতেই হইবে।” তখন শ্রীধর বলিলেন

‘যদি একান্তই বর দিবে তবে প্রভু বর দেও

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত

সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥

যে ব্রাহ্মণ মোর সাথে করিল কোনল।

মোর প্রভু হউক তার চরণযুগল”।

বলিতে, বলিতে শ্রীধরের প্রেম উদ্বেলিত

হইয়া উঠিল—উদ্ধ্বাচ হইয়া তিনি কেবল

রোদন করিতে লাগিলেন। গৌর হাসিতে হাসিতে কহিলেন “শ্রীধর তোমাকে আমি এক বিপুল সাম্রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিতে চাই।” শ্রীধর কহিলেন “আমি কিছুই চাই না প্রভু, আমি কিছুই চাই না, আমি চাই কেবল ক্রোমার নাম করিতে। তাহারই অধিকার কেবল তুমি আমাকে দেও।” গৌর কহিলেন “প্রাণাধিক শ্রীধর, আমার প্রিয় ভৃত্য শ্রীধর, অষ্টসিন্ধি, বিপুল সাম্রাজ্য, কত কি আমি দিতে চাহিলাম। তুমি কিছুই চাও না, তুমি কেবল চাও আমাকে। নিকাম ভক্ত, আমি আজি তোমাকে বেদ-শাস্ত্রে ভক্তি-যোগ প্রদান করিলাম।”

কলাম্বা বেচা যাহার উপজীবিকা, ধনহীন। বিদ্যালেশহীন সেই শ্রীধর যাহা পাইল, কোটীধর কোটি জন্মেও তাহা প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীধরকে বর দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে সন্মোদন করতঃ গৌর কহিলেন; “আচার্য্য বর প্রার্থনা কর।” আচার্য্য বলিলেন “যাহা চাহিয়াছিলাম সকলই পাইয়াছি, আর কিছুই প্রয়োজন নাই।” তখন গৌর মুরারিকে কহিলেন, “মুরারি, তোমার অভিলষিত রূপ দর্শন কর।” মুরারি দেখিলেন, দুর্কাদলশ্রাম রামচন্দ্র বীরাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার একদিকে লক্ষ্মণ, অন্নদিকে সীতা দণ্ডায়মান; বানরগণ যুক্তকরে স্তব পাঠ করিতেছে। দেখিয়া মুরারি মুচ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন তাঁহাকে

ডাকি বোলে বিশ্বস্তর, ‘আরেকের বানরা।
পাসরিলি—তোরে পোড়াইল সীতা-চোরা ॥
তুই তার পুরী পুড়ি করিলি বংশক্ষয় ॥
সেই প্রভু আমি তোরে দিল পরিচয় ॥

উঠ উঠ মুরারি, আমার তুমি প্রাণ।

আমি সেই রাঘবেন্দ্র তুমি হনুমান ॥”

মুরারি চৈতন্যলাভ করিলে বিশ্বস্তর কহিলেন, “তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।” মুরারি বলিলেন, “বর দাও প্রভু যেন তোমার শ্রুণ কীর্তন করিতে করিতে আমার জীবন অতিবাহিত হয়। জন্মে জন্মে যেন আমি তোমার দাস হইতে পারি। তোমার দাসদিগের মধ্যে প্রতি জন্মে আমি যেন জন্মগ্রহণ করি। “তথাস্তু” বলিয়া গৌর বর দান করিলেন।

অনন্তর হরিদাসকে সন্মোদন করিয়া গৌর কহিলেন, “হরিদাস আমার প্রাণ হইতেও তুমি আমার প্রিয়তর। তোমার যে জাতি আমারও তাই। পাপিষ্ঠ যবনগণ তোমায় বড় হুংখ দিয়াছিল। নগরে নগরে তোমায় মারিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল। অত্যাচারকারিগণের শাস্তি বিধান করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু কি করিব, দেখিলাম যাহারা তোমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতেছে, মনে মনে তুমি তাহাদেরই মঙ্গল কামনা করিতেছ। হর্ষস্তগণ তোমাকে যে প্রহার করিয়াছিল, তাহা আমারই পৃষ্ঠে পড়িয়াছিল; এই দেখ এখনও তাহার দাগ রহিয়াছে। তোমার হুংখ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হইয়াছি। তোমাকে আমি অক্ষয় ভক্তি-ভাণ্ডার দান করিলাম।” প্রভুর স্নুধামাখা বচনাবলী শুনিয়া হরিদাস মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অতঃপর অদ্বৈতাচার্য্যকে সন্মোদন করিয়া গৌর কহিলেন, “আচার্য্য, একদিন নিশাভাগে তোমাকে ভোজন করাইয়াছিলাম মনে পড়ে? তুমি গীতার শ্লোকবিশেষে ভক্তিযোগ না

পাইয়া উপবাস করিয়া বুঝাইয়াছিলে, স্বপ্নে আমি তোমাকে ঐ শ্লোকের ভক্তিসূচক অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। কতদিন কত শ্লোকের অর্থ আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছি তাহা কি তোমার মনে আছে?” অনন্তর সেই সমস্ত শ্লোক একে একে অঙ্গুরিত্তি করিয়া অদ্বৈতকে স্তম্ভিত করতঃ গৌর কহিলেন, “আচার্য্য্য সকল পাঠই তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবল এক পাঠ বলি নাই; এখন তাহা শোন। গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকের যথার্থ পাঠ এই :

সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তং সর্ব্বতোহঙ্গিশিরোমুখম্।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥”

আচার্য্য্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন গৌর যাবতীয় ভক্তগণকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। অদ্বৈত কহিলেন, “প্রভু আমি কেবল এই চাহি যে তুমি মূর্খ নীচ ও দরিদ্রগণকে কৃপা কর।” কহ কহিলেন, “আমার পিতা তোমার নিকট আসিতে দিতে চাহেন না; তাঁহার স্মৃতি বিধান কর।” যিনি বাহা চাহিলেন ভক্ত-বৃন্দসল গৌর তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিলেন।

কতজনকে ডাকিয়া গৌর কত গিষ্ঠ কথা কহিলেন, কতজনকে বর দিলেন, কিন্তু মুকুন্দ দত্তের নাম একবারও উচ্চারণ করিলেন না। মুকুন্দ প্রকোষ্ঠান্তরে মনোহুংখে কাল কাটাইতেছিলেন। গৌরের আদেশ ব্যতীত আসিষ্টে পারেন না, অথচ আসিবার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। তাহার হুংখে ব্যথিত হইয়া শ্রীবাস গৌরকে কহিলেন, ‘প্রভু, তোমার প্রিয় ভক্ত মুকুন্দ

তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে যে তাহাকে ডাকিতেছ না? মুকুন্দ যে তোমার পরম ভক্ত; সে যদি অপরাধ করিয়া থাকে, নিজ হস্তে তাহার দণ্ডবিধান কর, কিন্তু তাহাকে দূরে ফেলিয়া রাখিও না।’ শ্রীবাসের কথায় কোপ প্রকাশ করিয়া গৌর কহিলেন, “ও হতভাগ্যের জন্ত কেহ আমাকে অনুরোধ করিতে পারিবে না, ও কখনো দাতে ভূণ লয়, কখনো জাতি মারে। একরূপ করিয়া কেহ কি কখন আমাকে পাইয়াছে?” শ্রীবাস বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মুকুন্দের অপরাধ কি প্রকাশ করিয়া বল।” গৌর কহিলেন, “ও যখন যেখানে যায় সেইমত কথা বলে। যখন অদ্বৈতের সঙ্গে যোগ-বাশিষ্ট পাঠ করে, তখন দাতে ভূণ লইয়া ভক্তিরে নাচিতে থাকে। আবার অল্প সম্প্রদায়ের লোকের সহিত নিশিমা ভক্তিকে তুচ্ছ করে। ভক্তি হইতে বড় কিছু আছে এ কথা বে বলে সে আমাকে নিদারুণ পীড়া দেয়। ভক্তি হানে কৃতাপরাধ মুকুন্দ আমাকে দেখিতে পাইবে না।” মুকুন্দ অন্তরাল হইতে নমস্তুই শুনিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, “গুরু উপরোধে পূর্ব্বে ভক্তির শ্রেষ্ঠ মানি নাই, সর্ব্বাস্তগামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়াছেন; তাই আমার এই শাস্তি হইল। কিন্তু তাঁহার দর্শনই যদি না পাইলাম, তাহা হইলে এই অপরাধী শরীর রাখিয়া কি লাভ? আমি এ শরীর ত্যাগ করিব।” মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া শ্রীবাসকে কহিলেন, “ঠাকুর, একবার প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, এ জন্মে ত তাঁহার দর্শন লাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না, কখনও

যটিবে কি ?” বলিতে বলিতে মুকুন্দের নয়ন দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার প্রার্থনা শ্রীবাস গোরের নিকট নিবেদন করিল, তিনি কহিলেন, “কোটাঁজন্ম পরে মুকুন্দ নিশ্চয় আমার দশন লাভ করিতে পারিবে।” “কোটাঁজন্ম পরে হউক একদিন ত পাইব” ভাবিয়া মুকুন্দ আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং “পাইব পাইব” বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দূর হইতে তাহার নৃত্য দেখিয়া গোর হাসিয়া উঠিলেন এবং স্নেহভরে নিকটে আসিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, “মুকুন্দ, তুমি অপরাধমুক্ত হইয়াছ, প্রসাদ গ্রহণ কর।” অপ্রার্থিত অনুগ্রহ পাইয়া মুকুন্দ মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন

প্রভু বলে “উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।

তিলান্ধেকো অপরাধ নাহিক তোমার

সঙ্গদোষ তোমার সকল-হইল ক্ষয়।

তোমার স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥

কেটাঁজন্মে পাইবা যখন বলিলাম আমি।

হিলান্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥

‘অবার্থ আমার বাকা’ তুমি সে জানিলা।

তুমি অামা সর্বকালে হৃদয়ে বাঁধিলা ॥’

মুকুন্দ আপনাকে ধিকার দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন গোর স্বীয় গলদেশ হইতে মালা খুলিয়া ভক্তগণ মণ্ডো বিতরণ করিলেন এবং চর্কিত তাম্বুল সকলকে প্রদান করিয়া রুতার্থ করিলেন। ভোজনের অবশিষ্ট বাহা ছিল শ্রীবাসের ভাতৃস্নতা নারায়ণীকে গোর তাহা দান করিলেন। তদবধি বৈষ্ণব-সমাজে ‘গৌরাস্নের অবশেষ পাত্র’ বলিয়া নারায়ণী বিখ্যাত হইয়াছেন। এই নারায়ণীর গর্ভে চৈতন্য ভাগবত প্রণেতা পরমভক্ত বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

রামাবতী।

রামপাল নামক পাল-নরপালের সহিত পূর্ববঙ্গের রামপাল নামক সুপরিচিত স্থানের নাম-সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ইহারই উপর নির্ভর করিয়া, রামপাল নামক স্থানকে ‘রামাবতী’ বলিয়া নির্দেশ করিতে হইলে, প্রমাণ নিতান্ত দুর্বল বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

যাহার নাম ‘রামাবতী’ ছিল, তাহা কোন্ প্রক্রিয়ায় ‘রামপাল’ হইয়া গিয়াছে, তাহার

আবিষ্কার-সাধন সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। এই স্থানের নামকরণের একটি জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক তথ্যগুসন্ধানে তাহার কথা অনালোচিত থাকিতে দেখিয়া, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিজ্ঞানাগর মহাশয় তাহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জনশ্রুতি একটি প্রবাদবাক্যে পর্যাবসিত হইয়াছে।

“বল্লাল কাটায় দীঘি, নাম রামপাল।”

ইহার তাৎপর্য এই যে,—বল্লাল যে দীঘি কাটাইয়াছিলেন, তাহা (তাঁহার ভাগ্যবী রামপালের নামে) রামপাল দীঘি বলিয়া কথিত হইয়াছিল;—তাহা হইতেই স্থানের নামও রামপাল হইয়াছে।

এই জনশ্রুতির মূল্য যাহাই হউক, ইহাকে একেবারে বিশ্বৃত হইবার উপায় নাই, ইহাতে সংশয় দূর হয় না; আরও বন্ধমূল হইয়া পড়ে। শ্রীবিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থান এক সময়ে শ্রীপোণ্ডবর্দ্ধন ভূক্তির অন্তর্গত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা যে কখনও বরেন্দ্রীর একাংশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত একরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; বরং বরেন্দ্রীর সুপরিচিত ভৌগোলিক সীমান বিপরীত প্রমাণই বর্তমান আছে। কারণ, তাহার পূর্বসীমা করতোয়া।

‘রামাবতী’ নির্মাণের সমকালবর্তী কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রী-মণ্ডলেই ‘রামাবতী’ নির্মিত হইবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রামপালদেবের পুত্র মদনপাল দেবের শাসন-সময়ে সন্ধ্যাকর কাব্যরচনা করিয়াছিলেন; গ্রন্থ মধ্যে তাহার পরিচয় উল্লিখিত আছে। মদনপাল দেবের (মনহলি গ্রামে আবিস্কৃত) তাত্র শাসনে তাঁহার অষ্টম রাজ্য-সংবৎসরে “রামাবতী-নগর-পরিমার” তদীয় “জয়স্বাক্ষর সমাবাসিত” থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং সন্ধ্যাকর নন্দীর সমসাময়িক উক্তি কবিকল্পনা মাত্র ধূলিয়া অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। এই সকল কারণে, শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভূমিকায় বরেন্দ্রী-মণ্ডলেই “রামাবতী” নির্মিত হইবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এই

কথাটি এমনভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে, সংশয় আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—“বরেন্দ্রী-দেশে গঙ্গা-করতোয়ার সঙ্গমস্থলে, (?) রামপাল “রামাবতী” নামক একটি নগর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।” *

ইহার একাংশের সহিত অপরাংশের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। গঙ্গা-করতোয়ার “সঙ্গমস্থান” কোথায়? করতোয়ার সহিত কখন কোনও স্থানে গঙ্গার মিলন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে, সে ভৌগোলিক বিবরণ কোথায় পাইব? শাস্ত্রী মহাশয় তাহার সন্ধান প্রদান করেন নাই। গঙ্গার সহিত করতোয়ার মিলন-স্থান চাই; তাহা বরেন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত থাকা চাই;—তাহাই পূর্ববঙ্গের রামপাল হওয়া চাই। এতগুলি বিষয় সংস্থাপিত না হইলে, পার্শ্বটীকার ইঙ্গিত মনাহীন হইয়া পড়ে। ইহার কোন কথাই প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং, যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না।

আরও একটি সংশয়ের কথা আছে। ‘রামাবতী’ যে আদৌ “গঙ্গা-করতোয়ার সঙ্গমস্থানে সংস্থাপিত হইয়াছিল,” এ কথা কোথায় পাওয়া গিয়াছে? ‘রামচরিতম্’ কাব্যের কোন্ পরিচ্ছদের কোন্ শ্লোকে ইহার উল্লেখ বা আভাস পাওয়া যাইতে পারে, শাস্ত্রী মহাশয় তাহার একটু ইঙ্গিত করিলেও, বুঝিবার চেষ্টা করা যাইত। তিনি তদ্বিষয়ে নীরব।

‘রামচরিতম্’ কাব্যের কোন স্থানে একরূপ উল্লেখ বা আভাস আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া

* Ramapala founded a city named Ramavati at the confluence of the Ganges and the Karatoya in the Barendra country.—Introduction, p. 14.

যায় না। তৃতীয় পরিচ্ছেদের দশম শ্লোকে একবার মাত্র “গঙ্গা-করতোয়া” একত্র উল্লিখিত আছে; কিন্তু তাহাকে ‘গঙ্গা-করতোয়ার’ সঙ্গম স্চক বলিয়া কিরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাহাকে একবার রাম পক্ষে আর একবার রামপাল পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। একদিক্ টানিতে গেলে, আর একদিক্ ছিড়িয়া যায়।

একে সন্ধ্যাকরের কাব্য (প্রত্যক্ষর শ্লেষ-নিবদ্ধ বলিয়া) বিলক্ষণ দুর্লভ; তাহাতে তৃতীয় পরিচ্ছেদের টীকা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যে একখানি মাত্র হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা, ‘শ্রীশীলচন্দ্র’ নামক লেখক কর্তৃক লিখিত। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—“শীলচন্দ্র নাম দেখিয়া মনে হয় লিপিকারক বোধ,—তাহার সংস্কৃত ভাষায় অধিষ্কার ছিল না,—তরুণ অনেক শব্দ ও শ্লোক পরিত্যক্ত এবং বিকৃত হইয়াছে।” শীলচন্দ্র যে বুদ্ধ ছিল, কেবল তাহার নাম হইতে তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করা চলে না। কিন্তু “শ্রীশ্রী নমঃ সদা” বলিয়া (বুদ্ধদেবের নমস্কারের পদ) নকল আরম্ভ করিয়া, শীলচন্দ্র তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাহার উল্লেখ করিতে পারিতেন। সে বাহা হউক, সত্য সত্যই সকল কার্যে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। একরূপ ত্রুটি (অন্যাদিক মাত্রায়) হস্তলিখিত সকল পুঁথিতেই সংঘটিত হইতে পারে; কোনও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি নকল করিলেও, একরূপ ত্রুটি ঘটিয়া থাকে। প্রথমে অধ্যয়ন না করিয়া, “মথাদৃষ্ট” প্রণালীতে গ্রন্থ নকল

করা হইত; পরে, অধ্যয়ন কালে, লিপিপ্রমাদ সংশোধিত হইত। শীলচন্দ্রের নকল অধীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহাতেই লিপিপ্রমাদ সংশোধিত হয় নাই। যে লিপি-কর একরূপ দুর্লভ শ্লিষ্ট কাব্য নকল করিয়াছিল, তাহার সংস্কৃত ভাষায় কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি ছিল না বলিয়া, অনুমান করিতে সাহস হয় না। এইরূপ অনুমান কিন্তু ‘রামচরিতম্’ কাব্যের পক্ষে এবং তাহার নকলকারক শীলচন্দ্রের পক্ষে কোন কোন স্থলে বড় বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছে। শীলচন্দ্রকে মূর্খ বলিয়া ধরিয়া লইয়া, শাস্ত্রী মহাশয় তাহার নকল খানির সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ কার্য সর্বাপেক্ষা দুর্লভ,—ইহার জন্মই গ্রন্থমুদ্রাঙ্কণে বিলম্ব ঘটয়া গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় অনেক স্থলেই সুবিবেচনার সহিত পরিত্যক্ত অক্ষর সংযুক্ত করিয়া, এবং বর্ণাণ্ডাদি সংশোধিত করিয়া, পাঠকের উপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু পাঠ্যসংযোগের চেষ্টা সকল স্থলে সর্বতোভাবে সফল হইতে পারে না বলিয়া, তুই এক স্থলে শীলচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। যে শ্লোকে “গঙ্গা-করতোয়া” একত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও নকলকারকের ভ্রমপ্রমাদ ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় তাহা যেরূপে সংশোধন করিয়া গইয়াছেন, তাহার উপরে নির্ভর করিয়াই ভূমিকা লিখিয়াছেন। স্মরণ্য এখানেও সংশয়ের অভাব নাই।

সকল সংশয়ের উপর প্রধান সংশয় ঐতিহাসিক সংশয়। সম্ভ্রুতি যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্বাভিকৃত প্রমাণাবলীর আলোচনা করিলে

বুঝিতে পারা যায়,—বরেন্দ্রীর উদ্ধার সাধন করিবার অব্যবহিত পরেই, রামপাল দেবের পক্ষে মহা পূর্ববঙ্গে উপনীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। (ঢাকা জেলার দেবলাবো গ্রামে আবিষ্কৃত) ভোজবর্ণ দেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, (কৈবর্তরাজ) দিব্যের সমকালবর্তী জাত বর্ষদেব কামরূপ অধিকার করিয়া (পূর্বাঞ্চলে) ‘সার্ক-ভোমশ্রী’ বিস্তৃত করিয়াছিলেন;—ক্রীবিক্রমপুর এই রাজবংশের রাজধানী ছিল।

এই নবাবিস্কৃত তাম্রশাসনের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক হইলেও, ইহার ঐতিহাসিক, বিবরণগুলির উদ্ধার-সাধনের জন্ত যথাযোগ্য আয়োজন না করিয়া, অনেকেই আশ্রয় প্রাপ্ত স্থাপনের অশোভন চেষ্টায়, বঙ্গমাহাত্ম্যে বিবিধ বিতণ্ডার স্বত্বপাত করিয়াছেন। এই ‘তাম্র-শাসনে (কৈবর্ত-বিপ্লবের সমকালবর্তী) পূর্বাঞ্চলের যেরূপ স্বাভাবিকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ‘রামচরিতম্’ কাব্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য আছে;—তাম্রশাসনের সাহায্যে “রামচরিতম্” কাব্যের) টীকাহীন অংশের) একটি শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণেরও সূচ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

‘রামচরিতম্’ কাব্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, এক অর্থে ‘রাবণবধ’, অত্র অর্থে ‘কৈবর্তরাজ-বধ’ বিস্তৃত করিয়া, সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম “রামপ্রত্যাগমনম্।” উভয় পক্ষে প্রযোজ্য বিবরণগুলি তাহাতে যথাক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। রামপাল পক্ষে ‘রামাবতী’ নিম্নাণের পর এবং নগরপ্রবেশের পূর্বে, কবি কতকগুলি ঐতিহাসিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে

পাওয়া যায়,—বরেন্দ্রীর উদ্ধার সাধন করিয়াই রামপাল নিরস্ত হইতে পারেন নাই; কৈবর্ত-বিপ্লবে পালসাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল (বরেন্দ্রী-মণ্ডল) হস্তচ্যুত হইবার পর, (পাল-সাম্রাজ্যের পশ্চিম-দক্ষিণ অংশের, সামন্তচক্র অমুকুল থাকিলেও), অগ্ন্যস্ত্র স্থানে অনেকই স্বাভাবিক অবস্থান করিয়াছিলেন, তজ্জন্তু রামপালকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল;—তাঁহাকে ‘কামরূপ’ জয় করিতে হইয়াছিল। নবাবিস্কৃত তাম্রশাসনের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়,—রামপাল বঙ্গপতির কবল হইতেই কামরূপের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। “রামচরিতম্” কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৪৪ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়,—পূর্বাঞ্চলের অধিপতি (দানাদি উপঢৌকন প্রদানে) রামপাল দেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন; এবং এইরূপেই পূর্বাঞ্চলের অধিপতি (আমুগতা স্বীকারে) স্বাভাবিক রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্লোকটি এই,—

“বপরিত্রাণ-নমিস্তং পত্যা বঃ প্রান্দিশীয়েন।
বরবারণ-দানেন চ নিজস্তন্দন-দানেন
বর্ষণারধে॥”

শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় রচিত ভূমিকায় [১৫ পৃষ্ঠায়] ইহার উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—“একজন পূর্বাঞ্চলের অধিপতি তাঁহাকে (রামপালকে) বৃহৎ হস্তী, রথসমূহ (?) এবং বর্ষ প্রদান করিয়া, রামপালের রক্ষণাধীনে থাকিবার জন্ত, তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছিলেন।”*

* An eastern potentate propitiated him with large elephants, chariots and armour for extending his protection to him.—Introduction, p. 1:

এই শ্লোকোক্ত ‘পূর্বাঞ্চলের অধিপতি কে, এ পর্যাণ্ত, তাহার মীমাংসা করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু শ্লোকটি যে ভাবে রচিত, তাহাতে উভয় পক্ষে প্রয়োজ্য বলিয়া, (পূর্বাঞ্চলের নরপতির নাম উল্লিখিত না হইয়া) “বর্ষণা”—শব্দ গৃহীত হইয়াছে, কি না, শাক্তী মহাশয় তাহার আলোচনা না করিয়া, বীর-কঙ্ক (বর্ষা) বলিয়াই তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সন্ধাকর নন্দী স্থানান্তরে বীরগণের “নামাঙ্কন” না করিয়া, নামাংশ বা উপাধিমাাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে টীকা থাকায়, নামগুলি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানে টীকা না থাকায়, সে সুবিধা ঘটে নাই। তথাপি রচনা-ভঙ্গীতে বোধ হয়,—কবি যেন “প্রাগিদীন্যেন পত্যা” এই দুইটি শব্দকে “বর্ষণা”-শব্দের বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত করিয়া গিয়াছেন। শ্লেষানুরোধে “বর্ষণা”-শব্দটি দুই পক্ষে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। রামপক্ষে বর্ষা-অর্থ বীর-কঙ্ক তাহা সঙ্গম। রামপাল-পক্ষেও সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইলে, এই শব্দটিকে স্পষ্ট না বলিয়া, “উভয়পক্ষে তুল্যার্থ-বোধক” বলিতে হয়।

জিগীষানুরোধে সেরূপ তর্ক উপস্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু সত্যাবিস্কারানুরোধে, সে তর্ক পরিত্যাগ করাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভোজবর্ষদেবের (বেলাবো গ্রামে আবিষ্কৃত) তাম্রশাসনের সাহায্যে সমকালবর্তী পূর্বাঞ্চলের অধিপতির বর্ষান-উপাধির পরিচয় প্রাপ্ত হইবার পর, ‘রামচরিতম্’-কাব্যোক্ত “বর্ষণা” শব্দের সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। কবি “বর-

বামণেন চ নিজস্যান্দমদানেন” বলিয়া একটি মাত্র চ কারের প্রয়োগে, হয় ত প্রদত্ত দ্রব্যের মধ্যে বীরকঙ্কের (বর্ষের) উল্লেখ করেন নাই। *সার্কভৌমত্বের নিদর্শন (বরবারণ ও নিজশ্রুন্দন) অর্পণ করিয়াই, পূর্বাঞ্চলের অধিপতি “স্ব-পরিভ্রাণ” লাভের জন্ত, রামপালের আরাধনা করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি এইরূপে “পরিভ্রাণ” লাভ করিয়া, (সার্কভৌমত্ব পরিহারপূর্বক) স্বামি-ধর্মের আশ্রয়ে আসিয়া, নিজ-রাজমণ্ডলে রামপাল দেবের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সুতরাং রামপালের পক্ষে পূর্ববঙ্গ (পূর্ববং) “স্বদেশের অব্যবহিত ভূমি” হইয়াছিল;—পূর্বাঞ্চল তাহার “স্বদেশ” পদবাচ্য হইতে পারে নাই;—সুতরাং সেই সামন্তচক্রের মধ্যে রামপালের রাজধানী নির্মাণের প্রয়োজন বা সম্ভবনা ছিল না। পূর্বাঞ্চলের অধিপতি এইরূপ ব্যবহার না করিলে, “পরিভ্রাণ” লাভ করিতে পারিতেন না, রাজ্যচ্যুত হইতেন। কিন্তু “স্বপরিভ্রাণনিমিত্তং” যে ভাবে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে, তাহাতে সেরূপ তাৎপর্য বিকশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ‘ভূমিকায়’ ভাবানুবাদমাাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এমনও বোধ হইতে পারে যে,—পূর্বাঞ্চলের অধিপতি যেন কোনও শত্রু-ভয়ে ভীত হইয়া, রামপালদেবের আশ্রয়ে আশ্রয়ক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্লোকে সেরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যাহারা সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ, অথবা যৎসামান্য অভিজ্ঞতা থাকিলেও, স্বয়ং স্বাধীন ভাবে সংস্কৃত ভাষায় ‘রচিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ, তাহারাও স্বভাবতই স্বদেশের

ইতিহাস জানিবার জন্ত কোতুহলী। সুতরাং 'রামচরিতম্' কাবোর একটি বিস্তৃত অণুবাদ মুদ্রিত করা কর্তব্য ছিল। তাহার অভাবে অনেকের পক্ষেই ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভূমিকাটি একমাত্র অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। তাহার উপর সকল স্থলে নিঃসংশয়ে নির্ভর করিবার উপায় থাকিলে, তাহার সাহায্যেই তথ্যানুসন্ধান পরিচালিত হইতে পারিত। কিন্তু ভূমিকার সহিত গ্রন্থোক্ত বিষয়ের নানা-স্থলে এইরূপ নানা অসামঞ্জস্য দেখিয়া, 'রামচরিতম্' কাবোর বথার্থযোগ্য আলোচনার প্রয়োজন বিজ্ঞাপিত করিলাম। নিরপেক্ষ

ভাবে, সত্যনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, এই কাবোর আয়োচনা প্রচলিত হইলে, অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবার আশা আছে। সেই আশায় প্রথমেই "রামাবতীর" কথা অবতারণা করা হইয়াছে। রামাবতীর অবস্থান-ভূমি নির্ণয় করিবার জন্ত শ্রমসাধ্য যোগ্য চেষ্টা করা যে অবশ্য কর্তব্য, তাহা বিবেচনায় সংশয় নাই। সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে "রামচরিতম্" কাবোর ঐতিহাসিক মূল্য-কত অধিক, তাহা দিন দিন অধিক প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমা মৈত্রেয়।

বিলাতের টিকটিকী।

মানুষের প্রকৃতি মোটের উপরে সর্বত্রই সমান। আরাম, আয়েস, সকলেই চাহে। সহজে, বিনা পরিশ্রমে যে কার্য্যটা হইবে, তার জন্ত আবার কষ্ট স্বীকার করিতে কোথাও লোক বড় রাজী হয় না। আর এইরূপে আপনার কষ্টের লাঘব করিতে যদি একটু আধটু মিথ্যা প্রবন্ধনার আশ্রয় লইতে হয়, তাহাতেও কোথাও বেশী লোকে পশ্চাৎপদ হয় না। আমাদের দেশের পুলিশের লোকের মিথ্যা-প্রবণতার কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। আর কখনও কখনও এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এমনও মনে করিয়া থাকি যে বুঝি বা আমাদের পুলিশের লোকেই ছুনিষ্ঠার সকল লোকের অধম ফল কথা কিন্তু তাহা নয়। সুযোগ পাইলেই লোকে সর্বত্রই এরূপ মিথ্যাচরণ করিয়া থাকে। আমাদের

দেশের শাসনবাবস্থার বিশেষত্ব এই যে, এখানে পুলিশের লোক যতটা পরিমাণে এ সকল প্রলোভনে পড়ে, বিলাতের পুলিশ কর্মচারীরা ততটা পরিমাণে প্রলুব্ধ হয় না। লোকে মিথ্যা বলে আদারক্ষার জন্ত; যেখানে মিথ্যা না বলিলে আপনার স্বত্ব-সুবিধা রক্ষা করা কঠিন সেখানে লোক সহজেই মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে। যেখানে মিথ্যা বলা নিষ্প্রয়োজন কিম্বা নিরাপদ নহে, সেখানে লোক সত্য বলিতেই চেষ্টা করে। বিলাতে পুলিশকর্মচারীদের উপরে এমন কড়া শাসন আছে, সাধারণ প্রজাবর্গ আপনার স্বত্বস্বার্থ রক্ষার জন্ত সত্য এমন সজাগ থাকে, রাজকীয় বিধিব্যবস্থা এবং ধর্ম্মাদিকরণ সকল জনমণ্ডলীকে সর্ব প্রকারের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে

রক্ষা করিবার জন্ত এতটাই সমুৎসুক যে, সেখানে পুলিশের লোকের পক্ষে মিথ্যা আচরণ করিবার প্রলোভন নাই বলিলেও চলে। কোনও সূত্রে, কোথাও কোনও নিরপরাধী ব্যক্তির দণ্ড হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে দেশের লোক একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে; সকলেই আপনাপন স্বত্বস্বার্থ রক্ষার জন্তই পরস্পরকে রাজপুরুষদিগের অযথা শাসন হইতে বাঁচাইবার জন্ত এত ব্যগ্র হইয়া থাকে যে, সেখানে পুলিশের কর্মচারীদিগকে সতত অতি সন্তর্পণে যথাসম্ভব সত্যের ও ধর্মের পথ ধরিয়া চলিতেই হয়, না চলিলে তাহাদের চাকরী লইয়া টানাটানি পড়ে।

রাজ্যে শাস্তি রক্ষার জন্ত বিলাতের গবর্ণমেন্টকেও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। বিশেষ, লণ্ডন সহরে না কি ছুঁনিয়ার যত বিপ্লবপন্থী লোক আসিয়া প্রায় আশ্রয় লইয়া থাকে; যারা স্বদেশের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন-প্রয়াসী হইয়া শাসন সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়া পড়ে, তারা অনেক সময়ই ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। রুশের, জার্মানীর অস্থিরতার বিপ্লবপন্থীগণের অনেকে লণ্ডনে বাস করেন। লণ্ডনের পলিশকে এ সকল লোকের উপরে সর্বদা চক্ষু রাখিতে হয়। এ ছাড়া ইংরাজের নিজের রাজ্যেও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারী লোকের অভাব নাই। এ পর্য্যন্ত আইরিশেরা তো সর্বদাই ইংরেজগবর্ণমেন্টের স্বল্প বিস্তর বিরোধী হইয়া আছে। ইহাদেরও অনেকে আরলও না থাকিয়া লণ্ডন, ম্যান্‌চেষ্টার প্রভৃতি স্থানে বাস করে। এ সকলের উপরেও চক্ষু

না রাখিলে চলে না। তার পর, ক্রমে ভারতবাসী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীও বিলাতে যাইয়া আশ্রয় লইতেছেন। এই শ্রেণীর সকল লোকের উপরেই বিলাতের পুলিশের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং বিলাতের টিক্‌টিকীরা সে কেবল আমাদের উপরেই মোতায়েন হইত, তাহা নহে। বহু কালাবধিই ইহাদিগকে রাজনৈতিক লোকের উপরে গোয়েন্দাগিরি করিতে হইতেছে। আর এই দীর্ঘ অভ্যাস নিবন্ধন এ কার্যে ইহার অদ্ভুত পটুতা লাভও করিয়াছে। কাহাকেও বিরক্ত করে না; কাহারও উপরে অত্যাচার উৎপীড়ন করে না; কাহাকেও অসম্মান দেখায় না; কেবল দূর হইতে কে কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে, কোনও বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছে কি না, কোনও অরাজক দল পাকাইয়া তুলিতেছে কি না, ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকে। নানা দেশে, নানা মত্রে, নানা প্রকৃতির লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ইহাদের এমন একটা কর্মকুশলতা জন্মিয়াছে, যাহা বোধ হয় আর কোনও দেশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অধিকাংশ স্থলেই বিলাতের পুলিশকে না কি বিদেশীয় বিপ্লবপন্থীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়, এজন্ত বিলাতী বিলাতের টিক্‌টিকীদের মধ্যে এমন একটা নিষ্কাম ভাব জন্মিয়া গিয়াছে, যাহা অপর দেশের টিক্‌টিকীদের আছে কি না বিশেষ সন্দেহের কথা। সর্বোপরি ইংরেজ জাতটাই মোটের উপরে স্বাধীনতা বস্তুকে বড় ভালবাসে। যেখানে আপনাদের জাতীয় স্বত্বস্বার্থের

সঙ্গে কোন বিরোধ নাই, সেখানে এ জাম্বুটা সর্বদাই রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির বিরোধ বাধিলে, প্রজামতেরই আনুকূল্য করিয়া থাকে। কাজে না পারিলেও কথায় বার্তায়, মুনোভাবে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যাহারা দণ্ডায়মান হয়, তাহাদের সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি অনুভব করিয়া থাকে। এমন কি, ভারতে যাঁহারা প্রজাস্বত্ব সম্প্রসারণের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন আর এই চেষ্টা করিতে যাইয়া, ভারতের ইংরেজ গবর্ণ-মেন্টের হাতে স্বল্পবিস্তর নির্যাতিত হইতেছেন, তাঁহাদের প্রতিও মোটের উপরে বিলাতের লোকের একটা সামান্য সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীদিগকে বিলাতের লোকে অনেকটা সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। বিলাতের পুলিশের লোকেও যে তাহা করে, ইহা সর্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা পশ্চাতে য়ে সকল টিকটিকী মোতামেন হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আমার সঙ্গে নিরতিশয় সম্বন্ধ ব্যবহার করিতেন। চেনাশোনা হইলে সর্বদা দেখিবামাত্রই টুপি খুলিয়া সেলাম করিতেন। আর চেনাশোনা হইতে বড় বেশি বিলম্বও হইত না। দুজন লোক প্রান্তে নয়টা হইতে রাত্রি দুপ্রহর পর্যন্ত আমার বাড়ীর আশে পাশে দাঁড়াইয়া থাকিবে, বড় হউক, বৃষ্টি হউক, বরফ পড়ুক, রৌদ্র দহুক, সর্বদাই তারা দাঁড়াইয়া আছে; কখনও তামাক খাইতেছে, কখনও পথের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছে, কখনও বা পকেট হইতে সংবাদপত্র খুলিয়া পড়িতেছে, কখনও বা বইই হয়ত পড়িতেছে কিন্তু নজরটা সর্বদাই আমার দরজার দিকে রহিয়াছে—এ ভাবে যারা

গোয়েন্দাগিরি করে, তাদের চিনিয়া লইতে তো আর বড় দেরি হয় না। প্রথম কয় সপ্তাহ এ দিকে নাকি তেমন লক্ষ্য করি নাই, স্তবরাং তখন এদের চিনিতে পারি নাই, কিন্তু যে দিন হইতে বুঝিলাম যে আমার পিছনে লোক আছে, সে দিন হইতে ইহারা সর্বদাই ধরা দিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে কি করিয়া এক ব্যক্তিকে ধরিয়াছিলাম, পূর্ব-বন্ধু তার উল্লেখ করিয়াছি। ইহার কিছুদিন পরে তাঁর সঙ্গীকেও ধরিয়া ফেলি।

এই দিনও আমার পাশি বন্ধুটির গৃহিণী এবং আমার পুত্র ও আর একটা পাশি ভদ্র-লোক আমার সঙ্গে ছিলেন। এ দিনও আমরা সকলে মিলায়া একটা সভাতে বাইতেছিলাম। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, একবার পথে চলিতে চলিতে পশ্চাতের দিকে ফিরায়া কেহ সঙ্গ লইয়াছে কি না দেখিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে আমরা “টিউব” ষ্টেশনে বাইয়া উপস্থিত হইলাম। লণ্ডন সহরে মাটির নীচে দিয়া সড়কের ভিতরে, যে সকল রেলগাড়ী তাড়িত যোগে যাত্রী-সম্ভার লইয়া মুহূর্তে মুহূর্তে যাতায়াত করে, তাহাকেই টিউব কুল। রেলের যেমন ষ্টেশন আছে, এই টিউবেরও সেইরূপ ষ্টেশন আছে। ষ্টেশন-গুলো রাস্তার উপরে। এখানে টিকিট কিনিয়া তাড়িত-চালিত লিফটে (lift) করিয়া নীচে নামিয়া গাড়ীতে উঠিতে হয়। টিউবেরও প্লাটফর্ম আছে। এ প্লাটফর্ম গুলো সাত আট তালু প্রমাণ ভূমির নীচে। আমরা ক্রমে সেখানে বাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন একটা লোককে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল যে বুঝি বা সেই এবার আমার উপরে মোতামেন

হইয়াছে। মিনিটে মিনিটে টিষ্টবের গাড়ী সকল আসা যাওয়া করে। একখানি ট্রেন আসিতেছে দেখিয়া আমার সঙ্গাদিগকে বলিলাম যে তাঁরা এই ট্রেনে উঠিবার ভাণ মাত্র যেন করেন, কিন্তু একেবারে যেন উঠতে চড়িয়া বসেন না। ট্রেন আসা মাত্র সে ব্যক্তি তাহাতেও উঠিয়া পড়িল। আমরা উঠিব উঠিব করিয়া আর উঠিলাম না। ট্রেনখানা ছাড়িয়া দিল। তখন সে ব্যক্তি ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্লাটফর্মে একখানা বেঞ্চে যাইয়া বসিয়া পকেট হইতে একখানা খবরের কাগজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তখন প্লাটফর্মে আমরা ক'জন ছাড়া আর একজন যাত্রীও ছিল না। আমি আস্তে আস্তে এ ব্যক্তির কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“তুমি কি আমার পিছু লাগিয়াছ?” “Are you following me?” সে গলা ভারি করিয়া বলিল—“না।” আমি বলিলাম—“তাই যদি, তবে তুমি গাড়ীতে চড়িয়া, আমি উঠিলাম না দেখিয়া নাবিয়া পড়িলে কেন?”—সে ব্যক্তি ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন আমি বলিলাম—“দ্যাখ, আমার পিছনে লোক থাকুক তাতে আমার কোনও আপত্তি নাই; কিন্তু কে আছে, এইটা মাত্র আমি জানিতে চাই।” একটু পরে বলিলাম—“তুমি আমাকে চেন?” “হাঁ আপনাকে চিনি বই কি আপনি মিঃ—।” “এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এখন তোমার কর্তব্য তুমি কর, আমার কর্তব্য আমি করিব। দুজনে একটা বোঝাপোড়া হইল, ভালই।” এ সময়ে আবার আর একখানি ট্রেন আসিয়া পড়িল। আমরা সকলে তাহাতে উঠিয়া বসিলাম।

‘প্রথম প্রথম একটু বিরক্তি বোধ হইল; কিন্তু ক্রমে আমোদ লাগিল। আমার বাড়ীতে আমার পুত্র ছাড়া আর তিনচারিটা বাঙ্গালী ও মাহারাটি যুবক এক সময় আমার সঙ্গে ছিল। এই ইংরেজ টিকটিকীদের লইয়া তাহারা মাঝে মাঝে বড় তামাসা করিত। একদিন দুজন লোক আমার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় দাঁড়াইয়া বাড়ী পাহারা দিতে ছিল। ছেলেরা দুখানা বড় বই লইয়া, একটা কাল টেবিলক্ৰথ দিয়া ঢাকিয়া জানালা খুলিয়া গিয়া তাহাদের দিকে বই দুখানিকে নির্দেশ করিয়া যেই দাঁড়াইল, আর অমনি গরিব বেচারীরা উদ্ভ্রাণে সেখান হইতে সরিয়া গেল। তারা ভাবিল এই বইগুলো বুঝি ফটোগ্রাফের ক্যামেরা, আর ছেলেরা বুঝি তাদের ছবি তুলিয়া, কাগজ পত্রে একটা হাঙ্গামা করিবার আয়োজন করিতেছে। এদের কেহ কেহ আমার ছেলেদের পিছনে পিছনেও যাইত। শ্রাব কাৰ্জন ‘ওয়াইলীর হত্যার পরে’ অনেক দিন পর্যন্ত ছেলেদের তাহাদের উপরে দৃষ্টি খুবই বেশী ছিল, আমার উপর ততটা ছিল না। আর ছেলেরাও ভুলুমি করিয়া বেচারীদের হাঙ্গামা করিয়া মারিত। তিনজনে তিন পথে খামকা খামকা ঘুরিতে যাইত। এ গলি ও গলি করিয়া গরিবদের ঘুরাইয়া আমিত ইহারা সাপাদিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যখন সন্ধ্যার প্রকালে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িত, তখন ছেলেরা তিন চার মাইল বেড়াইবার জন্ত বাহির হইত। সেই অবসন্ন দেহে এতটা ঘুরিতে তারা পারিবে কেন? তাই ছেলেদের গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিত। “মিঃ-

বাসে (Bus'এ) চড়িয়া চলুন না—খামাকা হাঁটিয়া যাবেন কেন?"—"আমাদের আজ পয়সা নাই—বাসে (Bus'এ) যাব না।" "আচ্ছা আপনারা বাসেই চলুন, আমি আর হাঁটিতে পারি না,—পয়সা আমি দিচ্ছি।" এই বলিয়া গরিব বেচারীর স্বন্ধে চড়িয়া ছেলেরা ৭৮ মাইল বাসে বেড়াইয়া আসিত।

ফলতঃ আমাদের অশ্রু লগুনের পুলিশের কত পয়সা যে খরচ হইয়াছে, বলিতে পারি না। দু'তিন জন, কখনও চারিজন কর্মচারী দিনরাত আমার বাড়ী পাহারা দিত। মাঝে কদিন আমার বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার পরপারে একটা বাড়ী পর্য্যন্ত ভাড়া করিয়াছিল। সেখানে বসিয়া এঁরা আমার বাড়ীতে কে আসে কে থাকে, এ সকল লক্ষ্য করিত। আমাদের কেহ যখন বাহিরে যাইতাম, তখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একজন যাইত। কেবল তাহাই নহে। মাঝে মাঝে আমরা ছুটুমী করিয়াও ইহাদের পয়সা খরচ করাইতাম। এক দিন আমি সন্ধ্যার পরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। আমার সেক্রেটারীও তখন বাড়ী যাইতে ছিলেন। খানিক পরে তিনি বলিলেন "মিঃ—আপনার শরীররক্ষক (Body Guard) বুঝি এ আসছে?" আমি পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম বাস্তবিকই একটা লোক আমার অনুসরণ করিতেছে। তখন সামনে দিয়া এক খানা মটরকার যাইতেছিল। আমার সেক্রেটারীকে টিউবে চড়িয়া বাড়ী যাইতে থালায়া আমি নিজে এ চলন্ত বাসে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম এবার আমার রক্ষককে ফাঁকি দিয়াছি। কিন্তু বাদখানা মাইল খানেক নোড়িয়া যখন একটা টিউব ষ্টেশনের

সামনে যাইয়া দাঁড়াইল, দেখি সে ব্যক্তি তাহাতে উঠিয়া এবং টুপি খুলিয়া আমায় সেলাম করিয়া উপরে যাইয়া বসিল। আমি ভো দেখিয়া অবাক। খানিক পরে আমি বাস্ হইতে নামিয়া পড়িলাম। সেও নামিয়া পড়িল। আমি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি আমার সঙ্গে নিলে কেনন করিয়া বল তো? আর এত দূরে আসিয়া বাসই বা ধরিলে কেনন করিয়া?" সে হাসিয়া বলিল,—“ট্যাকসিতে করিয়া” আমি বলিলাম—“এত খরচ কল্লে!” “না কল্লে চলে কৈ? আমি যদি সঙ্গে না থাকি, আর অশ্রু কেহ আপনাকে কোথাও দেখিয়া রিপোর্ট করে, তবে আমার চাকরিটা যাবে যে। সুতরাং বেরূপ করিয়াই হউক, আমার আপনার সঙ্গে থাকিতেই হয়।”

কিন্তু সকলেই যে সর্বদা আমার সঙ্গে থাকিয়া আপনার কর্তব্য পালন করিত তাহাও নহে। কখনও কখনও কেহ কেহ সঙ্গে না থাকিয়াও আমার কাছে আসিয়া, আপনার দৈনন্দিন রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া যাইত। কর্মতার যেখানে এতটা শ্রমসাধ্য সেখানে মাঝে মাঝে কর্মচারীর পক্ষে একটু আধটু প্রবলতার আশ্রয় লওয়াও স্বাভাবিক। একদিন আমাকে একটা বক্তৃতা উপলক্ষে লগুনের বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। সে দিন রবিবার। আমার বিকালে উল্ইচ্ নামক উপনগরীতে যাইয়া বক্তৃতা পরিবার কথা। আমি একটু শীঘ্র শীঘ্র মধ্যাহ্নাহার শেষ করিয়া উল্ইচ্ যাত্রা করিলাম। বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই দেখি আমার শরীর-রক্ষক সেখানে দাঁড়াইয়া। আমার দেখিয়া

সে টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল এবং ভদ্র লোকটির মতন মস্তুরগতিতে আমার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে আরম্ভ করিল। টিউবের ষ্টেশনে যাইয়া যখন লিফটে (Lift) চড়িলাম, তখন সেও সেই লিফটেই উঠিল আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—“আজ যে অনেক দূর যেতে হবে।” “কত দূর, মিঃ—?” “উল্ইচ্।” “বাবা, আমার যে এখনও খাওয়া দাওয়া হয় নাই।” “আমি খাইয়াই আসিরাছি।” “উল্ইচে কি আজ কোনও সভা আছে না কি?” “আছে বৈ কি।” “কোথায়, মিঃ—?” “কারমেল্ চ্যাপেলে।” ইতিমধ্যে লিফট্ নামিয়া আসিয়া যথাস্থানে থামিয়া গেল। হুজনেই তখন ট্রেনের দিকে যাইতে লাগিলাম। আমার রক্ষক তখন বলিল “মিঃ—, আপনার অনুমতি যদি পাই তবে আজকের দিনটা আমি আমার ছেলে পিলেদের সঙ্গে যাইয়া কাটাই—আমি আর আপনার সঙ্গে যাব না।” “আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।” “আপনি কখন ফিরিয়া আসিবেন?” “জানি না তো! উল্ইচ্ হতে আমি সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিব—কিন্তু আজ রবিবার, তোমাদের সভ্যতার রবিবারে সন্ধ্যার পর মদের দোকানে মদ মিলে কিন্তু ভদ্র লোকের বাড়ীতে তো খাওয়া মিলে না, কাজেই আমায় বাহিরে খাইয়া আসিতে হইবে। নয়টা সাড়ে নয়টার আগে যে ফিরিতে পারিব, এমন মনে হয় না।” “আজ

কি বিষয় বক্তৃতা করিবেন?” আমি বিষয়টী বলিয়া দিলাম। সেও সেটা আপনার পকেট বইএ নোট করিয়া লইল এবং আর একবার আমার অনুমতি লইয়া, সেলাম করিয়া ফিরিয়া চলিল। সেদিন আমার সঙ্গে আর কেউ ছিল না। রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আমি কাপড় চোপড় ছাড়িবার আয়োজন করিতেছি—তখন প্রায় সাড়ে দশটা—এমন সময় পরিচারিকা আসিয়া বলিল—“একটা ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।” “এই রাত্রে ভদ্রলোক কে? ইনি কি আমার স্বদেশী?” “না একজন ইংরেজ ভদ্রলোক।” “আচ্ছা, নিয়ে এস।” তখন দেখি ঐ আর কেউ নয়—আমার শরীররক্ষক। এত রাত্রে আমায় বিরক্ত করিতে আসিয়াছে বলিয়া অতিশয় দীনতা সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আমি বক্তৃত্যে কি কি বলিয়াছি, সেখানে কত লোক ছিল, ভারতবাসী লোক কেহ ছিল কি না,—এসকল কথা নোট করিয়া লইয়া গেল। আমি বুঝিলাম—আজকের রিপোর্ট খানি আমাকেই লিখিয়া দিতে হইল। এও মন্দ নহে। বিলাতের টিক্‌টিকীই একরূপ করে। এদেশের টিক্‌টিকী হইলে আপনার মনগড়া একটা ভয়ঙ্কর বক্তৃতা সাজাইয়া রিপোর্ট করিত না কি?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

জয়দেব ও বিজাপতি

৩

আমরা জয়দেব ও বিজাপতির কৃষ্ণগত-প্রাণা শ্রীরাধাকে দেখিয়াছি, এইবার এতদ্ভয়ের শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে ইচ্ছা করি। যাহা দেখিয়াছি তাহা হইতে যদি আমরা এই টুকু বুঝিয়া থাকি যে, শ্রীরাধার ভালবাসা তোমার আমার সম্পূর্ণ বোধায়ত্ত না হইলেও ইহা এক অপার্থিব বস্তু, তাহা হইলেই ইহার যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। যিনি বৈষ্ণব তিনি জানেন যে শ্রীরাধা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা নাই; শ্রীরাধা সংযুক্ত হইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ, আর তাহা না হইলেই তিনি কৃষ্ণ মাত্র; এই ফ্লাদিনী শক্তির সংযোগ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের লীলাময়ী প্রকৃতির বিকাশ, নচেৎ সকলই আনন্দহীন। ফ্লাদিনী শক্তি না থাকিলে বাঁশী ব্যজিত না, জীবের ভক্তিও চরিতার্থ হইত না। এই আনন্দময়ী বৃত্তির পরিপোষক যত বস্তু আছে তাহাদের মধ্যে রসাস্বাদ-লোলুপা সখীই প্রধান। ইহার না থাকিলে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস পরিপুষ্ট হয় না। তাই বৈষ্ণব কবি সর্বত্রই সখী-চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে—ভগবানে সর্বস্বার্থপণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবদাস্বাদন ইহাই ফ্লাদিনীর আকাঙ্ক্ষা, তাই আমরা আদি বৈষ্ণব কবিদ্বয়ে দৈহিক আকাঙ্ক্ষার এত প্রাবল্য দেখিতে পাই। আমরা পূর্বেও সখীর কার্য অনেক দেখিয়াছি, অতঃপরও দেখিতে পাইব। শ্রীরাধার চরিত্র-বিশ্লেষণ যেমন সখীর সাহায্য ব্যতীত হয় না,

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রও সেইরূপ সখীর সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যক্ত হয় না। ইচ্ছাদিগকে যাহারা দূতী বলিতে চাহেন, তাঁহারা তাই বলুন, কিন্তু স্বল্প দৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন যে এই সখীর চরিত্রে যে কোমলতা, প্রাণে যে নিঃস্বার্থতা, হৃদয়ে যে কবিত্ব আমাদের আলোচ্য মহাকবিদ্বয় কর্তৃক অর্পিত হইয়াছে, তাহা সামান্য দূতীর ত কথাই নাই, অনেক নায়িকারও নাই। এ কথা আপনা হইতেই প্রমাণ হইয়া বাইবে এরূপ আশা করা যায়।

এখন আমরা জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র দেখিয়া প্রেমতত্ত্ব বুঝিবার প্রয়াস করিব। শ্রীকৃষ্ণ যে বৈষ্ণবের কাছে ভগবান্ স্বয়ং সে কথা এখন আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। আমরা দেখিয়াছি যে সরস বসন্তে শ্রীকৃষ্ণ শত যুবতী পরিবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ক্ষণিক ভ্রান্তিময় মুহূর্তের জন্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ভুলিয়া শত সুন্দরীর মন রাখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কবি শ্রীকৃষ্ণের চারিধারে একটা যেন অভেদ্য ইন্দ্রিয়াকর্ষণের তুর্গ নির্মাণ করিয়াছেন। একে বসন্ত ঋতু,—তাহাতে স্বভাবতঃ যুবকের হৃদয় মদমত্ত হইয়া উঠে, প্রাণের উপর দিয়া একটা চঞ্চলতার শ্রোত বহিয়া যায়, তাহার উপর আজ সেই বৃন্দারবিপিন যেন সুন্দরী যুবতীরূপের মুখশৃঙ্গলে বিশোভিত হইয়া প্রলোভনের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর আবার এই সুন্দরীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার জন্ত যেন একটা রেযারষি

চলিতেছে,—যত প্রকার মন ভুলাইবার হাব-
ভাব ও কৌশল দ্বারা রমণী যুবজনের
হৃদয়াকর্ষণ অথবা ইন্দ্রিয়াকর্ষণ করিতে পারে,
সবগুলিই এই যুবতীবৃন্দ আজ শ্রীকৃষ্ণের
উপর প্রয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে—
পীনপয়োধর ভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্ ।
গোপবধূরুগায়তি কাচিদ্ধৃষ্ট পঞ্চমরঙ্গম্ ॥
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচন খেলন-জনিত-
মনোজম্ ।

ধায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদন-বদন-সরোজম্ ॥
কাপি কপোলতলে নিলিতালপিভুং কিমপি
শ্রুতিমূলে ।

চারু চূষ্য নিতম্ববতী দয়িতং প্লবকৈরনুকূলে ।
কেলিকলা-কুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনা-জল-
কূলে ।

মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জগতং বিচক্ৰ্য করেণ দ্রুকূলে ॥

কবি গুঞ্জে গুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে উপ-
ভোগের উপাদান স্তম্ভীভূত করিয়াছেন। শুধু
তাহাই নহে, কবি দেখাইতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ
এই আকর্ষণে যেন সত্যি আকৃষ্ট—

করতলতাল-তরল বলয়া বলি কলিত কলস্বন-
বংশে ।

রাস রসে সহন্যতাপরাহরিণা যুতিঃ প্রশংসে ॥
শ্লিষ্যতি কামপি চুষ্যতি কামপি কামপি রময়তি
রামাম্ ।

পশুতি সশ্লিত-চারু-তরামপরামমুগ্ধছতি বামাম্

গীতগোবিন্দে এমন আভাস আছে যে
শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রীরাধার উপর আড়ি করিয়া
এই আশুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। আমাদের
আধুনিক সাহিত্যে গোবিন্দলাল যাহা করিয়া-
ছিল, এ যেন অনেকটা সেই রকম ঘটনা।
যে ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় এমন করে সে সেই

বহিতে দগ্ধ হয়, তাহার আর নিস্তার থাকে
না। গোবিন্দলাল এই অনলে পুড়িয়া
মরিয়াছিল, প্যারিস এই অনলে আগ্নাহতি
প্রদান করিয়াছিল। যাহার কেবল ইন্দ্রিয়-
আকাজ্জা সে এত ইন্দ্রিয়োপভোগের উপচারের
মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিস্তৃত হইতে ও আত্মোৎসর্গ
করিতে বাধ্য। বুদ্ধি, মুহূর্তের জ্ঞান এই
সম্ভাবনা অনন্ত-বিশ্বাসময়ী শ্রীরাধার মনেও
উদিত হইয়াছিল। সেই মুহূর্তে তিনি
ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিফল,
তাঁহার মুরারি এই অচ্ছেদ্য বন্ধন, এই অতি
তীব্র প্রলোভন এই সুন্দরীবৃন্দের আকর্ষণ
ও আলিঙ্গন পাশ ছেদ করিয়া বাহির হইতে
পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার এ সন্দেহ শুধু
যে ক্ষণস্থায়ী তাহা নহে, ইহার সঙ্গে বিশ্বাসের

নেশাটা অতিমাত্রায় জড়িত ছিল

মায়ুরীক্ষা বিলক্ষিত-সুধাস্মিত-মুগ্ধাননং কাননে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি

হস্যামি চ ॥

অত তো আনন্দের তরঙ্গ, অত আমোদের
ছড়াছড়ি, অত সুন্দরীর ছড়াছড়ি, প্রলোভনের
বাড়াবাড়ি, তবু আমাকে দেখিয়া বিশ্বাসে ও
আনন্দে যাহার মুখকমল হর্ষাপ্লুত হইয়া শ্লিত-
প্লুথ বর্ষণ করে, তাহাকে কে আমার কাছ
হইতে দূরে রাখিতে পারিবে? শ্রীরাধার
হৃদয়ে অমন লাঞ্ছনার পরও এই সুন্দর গর্কময়
ভাব তখনও বিরাজিত ছিল। কেন? তিনি
জানিতেন যে তাঁহার প্রাণাধিক তাঁহাকে
প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। আর এই জ্ঞানই
তাঁহার কাছে তাঁহার বঁধুর কিছুই দুষ্য বা
নিন্দিত ছিল না; বরং সেই রমণীসমাজে
তাঁহার রূপ কেমন উছলিয়া উঠিতেছিল

তাঁহার চক্ষে সেইটাই উজ্জলরূপে ভাসিতেছিল। তাঁহার হৃদয়েশ্বর যে “বহু বল্লভ” ইহাতে তাঁহার নিজের গর্ব একটু খর্ব হইলেও, তাঁহার প্রণয়-গর্ব আরও যেন বাড়াইয়া দিয়াছিল। শ্রীরাধার হৃদয়-দর্পণে শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা এইরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়াই অত অপमानেও তিনি ভ্রমরের মত অথবা অত কোনও বিলাসী নায়িকার মত শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যান নাই বরং ইহার পরেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্ত আরও বাগ্ন হইয়াছিলেন। প্রেমের লক্ষণ এমনি করিয়াই অভিযুক্ত হয়। আর প্রেমের সহিত অত কোনও ভাবের মেশামিশি না থাকাতেই এই দুইটী হৃদয়ের যথার্থ কোনও বিচ্ছেদ হয় না। মাঝে মাঝে মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়িলেও নিশীথিনী জানে যে সে মেঘ কাটিয়া যাইবে, তা অল্প দিনেই হোক, অথবা দীর্ঘ বিরহের পর হোক, চাঁদ আবার হাসিবে, অমৃত ধারা আবার ঝরিবে। তাই সে সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। চাঁদকে গাল দিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যায় না। এই যে অনাস্থা-সম্বন্ধিনী ও প্রিয়ানুগামিনী হৃদয়-কৃতি ইহাই ভারতবর্ষের রমণীর প্রেম, এবং ইহা দ্বারাই সকল অবস্থাতে বিষের পরিবর্তে অমৃতের ঙ্গুড়ব হয়।

এমন ধারা ভালবাসার একটা অমোঘ আকর্ষণ আছে, বাহ্য বোধ হয় ইচ্ছা করিলেই কাটাওয়া উঠা যায় না। বিশেষতঃ বাহ্য হৃদয়ে এই আকর্ষণী শক্তির কাছে পরাজয় মানিবার ইচ্ছা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া আছে, তাহার তো কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ঠিক

তাহাই হইয়াছিল। কৃতিবাস লিখিয়াছেন যে রামকে নাগপাশে বদ্ধ অবস্থায় কেহ গরুড়কে স্মরণ করিবার কথা বলে, আর গরুড়কে স্মরণ করিতেই সে উপস্থিত হয়, ও তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্র পাশযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠেন। এ ক্ষেত্রেও শ্রীরাধার উপর চকিত দৃষ্টিপাত শ্রীরাধার ঠিক সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিল। শ্রীরাধার প্রিয় বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ আদৃষ্টি মিথ্যা কহে নাই; তিনি যে দবতীপরিবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বয়চকিত প্রক্লাননে সুস্থিত রেখা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই কৃষ্ণের হৃদয় উদ্ভাটিত হইয়াছে; এবং তাহাই নাগপাশ-বদ্ধ রামচন্দ্রের সম্বন্ধে গরুড়ের মত কার্য্য করিয়াছিল। রূপকথায় সোণার কাঠি আর রূপার কাঠির গল্প শুনিতে পাওয়া যায়; সোণার কাঠিতে জ্ঞান ফিরাইয়া দেয়, আর রূপার কাঠিতে অজ্ঞান করে, মুগ্ধ করে। ব্রজযুবতীগণের আকর্ষণরূপ রূপার কাঠি স্পর্শে যে মুগ্ধ হরি বৃন্দাবন বিপিনে রাধাকে ভুলিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, রাধা দর্শন রূপ সোণার কাঠি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রবুদ্ধ করিয়া দিল। কোথায় রহিল দবতীবৃন্দ, কোথায় রহিল আমোদ-আহ্লাদ, প্রাণ তখনি প্রিয়তমার দিকে ছুটিয়া চলিল, নেশা কাটিয়া গেল, ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিয়া গেল।

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বন্ধ-শৃঙ্খলাম্।

রাধাধাধায় হৃদয়ে ততাজ ব্রজসুন্দরীং ॥

এই পরিণতি প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই জয়দেব কবি শ্রীকৃষ্ণের চতুঃপার্শ্বে ইন্দ্রিয়ের ভোগোপযোগী উপচার, রাশি সম্বিজত করিয়াছেন, ও করিয়া দেখাইয়াছেন যে যেখানে যথার্থ ভালবাসা আছে, যেখানে প্রণয়িনীকে

“সংসার-বাসনা-বন্ধ-শৃঙ্খল” বলিয়া জান আছে, সেখানে হৃদয়ের যে আকর্ষণ তাহা শত প্রকার বিপ্রকর্ষণ দ্বারা পরাভূত হয় না। মেঘনিমুক্ত শশধরের তায় ইহার পুনঃ প্রকাশ যেন উজ্জলতর ও সুন্দরতর বলিয়া মনে হয়। জয়দেব এই দৃষ্ট দ্বারা যে প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন বিদ্যাপতি মাথুর ও প্রবাস দ্বারা তাহাই করিয়াছেন। মাঝে মাঝে শ্রীরাধার মানের হেতুভূত শ্রীকৃষ্ণের আসক্তি তাঁহার পদাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে এমন আকর্ষণীশক্তি অর্পিত হয় নাই। বৈষ্ণব কবিতায় “প্রবাস” বিদ্যাপতির মৌলিকত্ব, এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়াই তিনি শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করিয়াছেন। তিনি সেইখানে দেখাইয়াছেন যে শ্রীরাধার টান শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রু শত আকর্ষণের প্রতি সহজে তাচ্ছিল্য আনিতে পারে। এমন আকর্ষণ আছে বলিয়াই এক জনের অভাবে সমস্ত শূন্যময় হইয়া যায়, এক নিমেষে অশ্রু সকল প্রলোভন হৃদয় হইতে দূরে অতি দূরে সরিয়া যায়।

মামিয়া চলিতা বিলোক্য বৃতং বধু নিচয়েন।

সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতি ভয়েন ॥

হরিহরি হৃদারতয়া গত স্য কুপিতেব।

কিং করিয়াতি কিং বদিয়াতি সা চিরং বিরহেণ

কিং ধনেন কিং জনেন কিং ময় জীবীতেন

গৃহেন ॥

কিন্তু তিনিও জানিতেন যে শ্রীরাধা যতই রাগ করুন, যতই অভিমান করুন, তাঁহার হৃদয় তাঁহাতেই সংলগ্ন আছে। তাই আজ তাঁহার এত চিন্তা, এত ব্যথা, তাই তাঁহার প্রধান চিন্তা কেন তাহাকে অপরাধ-ভীত

হইয়া, যাইতে নিবারণ করি নাই; সে কি করিবে সে কি বলিবে, সে এই দীর্ঘ বিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিবে। যেমন ক্ষণ-কালের জন্ত হৃদয় রাধা-চিন্তা বিরহিত হইয়াছিল, তেমনি এখন সেই চিন্তার প্রথরতা হৃদয় অবশ্য ও অনন্তকর্ম্ম। মন আর কিছু করিতে চাহে না, শুধু তাহারই কথা ভাবিতে চাহে, কৃতাপরাধের শাস্তিস্বরূপ ক্ষণিক ভ্রান্তির প্রতিশোধস্বরূপ মন সে চিন্তা ছাড়িতেও পারে না। অথচ ভয়ে ভয়ে তাহার কাছে গিয়া অপরাধ ক্ষমা করাইতেও সাহস করে না। এই সম্বন্ধতা, এই আকুল চিন্তা এই সর্বগ্রাসী আকাজক্ষা বল দেখি পবিত্র-প্রণয়বাদী, যথার্থ প্রেম হইতে আসে, না ইন্দ্রিয়লোলুপতা হইতে আসে? যাহার ভালবাসা, হৃদয়ের সমস্ত অধিকার না করিয়াছে, তার কি এমন অবস্থা হয়? অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে আমরা এখনও শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার মনুষ্যত্ব স্বীকার করিয়াই বিচার করিতেছি। মানুষ কতদূর ভালবাসিতে পারে, ভালবাসিলে কতদূর তন্ময় হইতে পারে, ভালবাসা থাকিলে নিজেকে কতদূর খর্ব্ব করিতে পারে, তাহা আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-চরিত্র হইতেই প্রথম শিখিতে পাইয়াছি। আমরা এই ক্ষণিক বিরহে শ্রীরাধার অবস্থার পরিচয় পাইয়াছি, এখন শ্রীকৃষ্ণের অবস্থার সন্ধান করিব। ইহাও আমাদের সখীর কাছ হইতে শুনিতে হইবে, কারণ সখীর মত মঞ্চগ্রাহিনী না হইলে সে অবস্থা কি তন্ন তন্ন করিয়া আর কেহ বুঝিতে না বলিতে পারে? যেমন শ্রীকৃষ্ণের কাছে সখী শ্রীরাধার দশা বর্ণনা করিয়াছে,

তেমনি শ্রীরাধার কাছেও সখী শ্রীকৃষ্ণের
অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছে—

সখি সৌদতি তব বিরহে বনমালী ॥

দহতি শিশির ময়ুখে মরণমম্বুরোতি ।

পততি মদন বিশিখে বিলপতি বিকলরোতি ।

ধ্বনতি মধুপ-সমূহে শ্রবণমপিদধাতি ।

মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুদমুপযাতি ॥

বসতি বিপিন-বিতানে তাক্ততি ললিত ধাম ।

লুঠতি ধরণি-শয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥

সখী ব্যাধার বাথী, তাই সে রাধাকে উপ-
দেশ দিয়াছে—

ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন মনুসর তং
হৃদয়েশম্

ঐ শোন এই ধীর সমীরে, যমুনাতীরে,
তোমার সর্কস্ব, তোমার প্রাণকান্ত, তোমার
অভীষ্ট ধন বনমালী,—

নাম-সমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মূহং বেণুম্ ।
বহু মনুতে নমু তে তনু-সঙ্গত পবন চলিতমপি
রেণুম্ ॥

সে যে তোমার বাঁশী বাজাইয়া “রাধা
নামের সাধা বাঁশী”তে রাধা রাধা বলিয়া
ডাকিতেছে, তুমি যাও “ন কুরু নিতম্বিনি গমন-
বিলম্বনম্”—সে যে তোমার অঙ্গস্পর্শে পবিত্র
চালিত ধূলিকণাকেও অমূল্য রত্ন ভাবিয়া গায়ে
মাখিতেছে, তুমি আর বিলম্ব করিও না ।
সে-যে—

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবহ-
পযানম্ ।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশুতি তব
পস্থানম্ ॥

তোমার কুঞ্জবনে সে যে আজি উৎকণ্ঠায়
আকুল হইয়া তোমার পথপানে চাহিয়া বসিয়া

আছে, পাখী নড়িলে, গাছের পাতা খসিলে
তুমি আসিয়াছ ভাবিয়া সে যে ব্যস্ত হইয়া
তোমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত শয়ন বিরচন
করিতেছে, এমন যে তোমার প্রাণনাথ তাহার
কাছে যাইতে বিলম্ব করিতেছ কেন ?

এই সখী-প্ররোচনার ভিতর কত মধুর
‘ভাবই না উথলিয়া উঠিয়াছে’;—এই ভাবগুলি
লইয়া বঙ্গভাষার কত কবিই নিজের কবিতা
পুষ্ঠ করিয়াছেন, ও বঙ্গসাহিত্যকে সম্পদশালী
করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই । জ্ঞানদাসাদির
“রসোদগার” শীর্ষক কবিতাগুলি যে জয়দেবের
পদ হইতে ভাবসংগ্রহ করিয়াছিল সে বিষয়ে
কোনও সন্দেহ নাই । আমরা আজকাল
অঙ্গসঙ্গের নামে শিহরিতে শিথিয়াছি বটে,
কিন্তু অঙ্গসঙ্গ-কামনা কতদূর আধ্যাত্মিকতায়
উন্নীত হইতে পারে—তাহা কবি জয়দেব
প্রথম দেখাইয়াছেন, যাহার কাছে প্রিয়তমার
অঙ্গসংস্পৃষ্ট ধূলিকণাও বহুমানের যোগ্য বলিয়া
বিবেচিত হয়, যে গল্পমাত্র শব্দেই প্রিয় সমাগম
হইল ভাবিয়া উৎকণ্ঠায় আকুল হয় তাহার
হৃদয়ে ভাবের কত গভীরতা তাহার
উৎকণ্ঠায় কত মধুরতা, কত প্রাবল্য, কত
আকাজ্জিক প্রকাশ তাহা একটু ভাবিয়া
দেখিবার বিষয় নয় কি ?

তাহার পর এই সখীসম্বাদে যাহা কিছু
‘আছে তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে
সখীর বিশ্বাস যে শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের
সহিত বিহারই তাঁহার চরম সাধনা ;
আতাত্তিক স্নেহকৃতি বিপাক । তাই এই
ব্যাপারের যাহা কিছু বিয় সখী তাহা দূর
করিয়া ‘ফেলিয়া দিতে বলিতেছে—‘মঞ্জীরে
কাজ কি, সে যে শুধু বিহারের রিপূস্বরূপ ;

নীল নিচোলে তোমার গৌরাঙ্গের আভা
ঢাকিয়া ফেল; তোমার দেহ বল তোমার
বসন ভূষণই বল দবই তো তাহারই স্নেহের
জন্ত, তবে আর বিলম্ব কেন? সে যে
অভিমানী, নিশিথিনীও যে শেষ হইতে চলিল,
তাহার কামনাপূর্ণ করিতে আর বিলম্ব কেন?
হরিরভিমানী রঞ্জনীরদানীমিয়মপি যাতি

বিরামম্।

কুরু মম বচনং সত্ত্ব-রচনং পুরম্

মধুরিপুকামম্ ॥

তাহার 'অবস্থা কি এখনও বুঝিতে
পারিতেছ না?

বিকিরতি মুহুঃ স্বাসানা শাঃ পুরো মুহুরীক্ষতে
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জগুহবহু তামাতি।

রচয়তি মুহুঃ শব্যাং পর্যাকুলং মুহুরীক্ষতে
মদন-কদনক্রান্তঃ কাস্তে প্রিয়স্তব বর্ততে ॥

সাধে কি বিভাপতি বলিয়াছেন—

ধর্মি ধরণীর মণি জনম ধনি তোর—

সবজন কান্ন কাহ্ন করি বুঝায়

সে তুয়ভাবে বিভোর ॥

চাতক চাহি তিয়াসাল অশ্রুদ

চকোর চাহি রাহ চান্দা।

তরু লতিকা অবলম্বন কারী

মরু মনে লাগল ধান্দা ॥

দুঃখের যখন এমন উৎকর্ষা তখন মিলন
অবশ্যজ্ঞাবী, কিন্তু সেই মিলনের পথেও অনেক
বিঘ্ন আছে, কতক সময়-সাপেক্ষতা আছে।
সেই যে একটু খানি বিলম্ব, তাহাও বুঝি এই
প্রণয়িযুগলের সহে না—সেই যে শ্রীকৃষ্ণ
আদিবার একটু বিলম্ব তাহাতেই শ্রীরাধা
ভাবিয়াই আকুল,—

মম মরণমেব বরমতি-বিতথ-কেতনা।

কিমিহ বিবাহামি বিবাহানলমচেতনা ॥

কেন যে শ্রীকৃষ্ণ আদিতেছেন না ইহার
কত হেতুই কল্পনা করিতেছেন, কত রকম
গড়িতেছেন' ভাবিতেছেন, কখনও মনে
করিতেছেন যে তাঁহা অপেক্ষা গুণবতী কেহ
বুঝি তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে, কখনও মনে
মনে সেই দৃশ্য স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন,
কখনও ভাবিতেছেন যে তাঁহারই মত
বুঝি শ্রীকৃষ্ণের তদ্বিরহবেদনাজনিত দুর্বলতা
আসিয়াছে তাই তিনি এক পাও চলিতে
পারিতেছেন না। জয়দেবের শ্রীরাধা
পাগলিনী; আমরা আর এক মহাকবি সৃষ্ট
পাগলিনী রাধার পরিচয় পাই, সেই পাগলিনী
আর জয়দেব-সৃষ্ট পাগলিনী একই উপাদানে
গঠিত। বিভাপতির রাধিকা রসিকা চঞ্চলা
ও কবিত্বময়ী, কিন্তু তিনিও কৃষ্ণানুশীলন
করিতে 'করিতে এক কালে এমনই
দিব্যোন্মাদগ্রস্তা হইয়াছিলেন। যে 'কালো'
ভালবাসে তাহাকে বুঝি এমন হইতেই হয়।

এই পাগলামির চিহ্ন দেখ "মানে"।
অদ্ভুত রমণীহৃদয়-রহস্য, "দেবাঃ ন জানন্তি
কুতো মনুষ্যাঃ?" যাহার জন্ত এত ভাবনা,
এত কান্দাকাঁটা এত জীবনে ধিক্কার, যাহাকে
পাইবার জন্ত এত সাধ্যসাধনা, এত অহুনয়
বিনয়, সে যেই আসিয়া উপস্থিত অমনি মানিনী
মুখ বাঁকাইয়া বসিলেন! সাধে কি সখী
তাহাকে "বিপত্নীতকারিণী" খেতাব দিয়াছে!
কিন্তু যার-বড় ভালবাসা তারই বোধ হয় মানও
বড় বেশী; একটু রঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য নয়,
একটু শান্তি দিবার প্রয়োচনায় নয়, সে মান
যেন প্রাণের ভিতর হইতে আপনা আপনি
উছলিয়া আসে, এ দারুণ অভিমান কেন আসে,

কোথা হইতে আসে তাহা বোঝা ভার, কিন্তু
তাহা যে আসে তাহাতে তো সন্দেহ নাই।
এক মুহূর্ত্ত পূর্বে কৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হওয়ার
জন্ত যে রাধিকা বলিয়াছিলেন—

বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাধ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে।
কিস্তে কৃষান্ত ভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গে
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥
তিনিই বিনীত শ্রীকৃষ্ণকে—
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ
কেতব বাদম্।

বলিয়া স্বচ্ছন্দে বিদায় করিয়া দিলেন।
অস্থয়া বড় বিষম ভাব—“ন মানিনী শং
মহতেশ্চ সঙ্গমম্” এ সূত্রে একটা সাধারণ
সত্য প্রকাশ করিয়াছে। মান জিনিষটাই
একটা পাগলামি বটে, কিন্তু যে যত অধিক
পাগল মানের সময় তাম্রি মুখ থুলে বেশী।
জয়দেবের রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বেশ ছ’ কথা
গুছাইয়া শুনাইয়াছেন, আবার বঙ্গের পাগল
কবির পাগলিনীও ঠিক এমনি ধারা শ্লেষের
বাণ ছাড়িয়াছেন। কেবল বিদ্যাপতির সরলা
রাধিকা গালি দিয়া মনের জ্বালা জুড়াইয়াছেন।
যতদিন এই পোড়া “আমি”টা একেবারে
পুড়িয়া ছার হইয়া না যায় ততদিন
কি আর অভিমান ছাড়া যায়? তা
মানও করিব, আর তারপর সে চলিয়া গেলে
আবার, কঁাদিতেও বসিব। তাহা নূন হইলে
পাগলামীর চূড়ান্ত হয় কৈ? মানের রস বড়
পরিপক্ক, তাই বৈষ্ণব আলঙ্কারিক বলিয়া-
ছেন যে এ রসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বড় প্রীতি
বোধ হয়।

প্রেমের আশ্চর্য্য গতি মান স্বাভাবিক।

জনমে কখন স্বল্প কখনও অধিক ॥

সেই দুইমত হেতু নিহেতু উপজে।

কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে পরম সুখ ভুঞ্জে ॥ *

কেন? মানের ভিতর দিয়া, প্রণয় ফুটিয়া
বাহির হয় বলিয়া এবং এই মানের অবলম্বনে
নিজের অভিমান বর্জন করা যায় বলিয়া ইহা
প্রণয়ীর গক্ষে বড় উপাদেয় রস, আর
“নাযক শিরোমণি” ইহাকে অবলম্বন করিয়াই
“নাযিক শিরোমণির” মান বাড়াইতে চাহেন
বলিয়া তিনি মান এত ভালবাসেন।

থাকুক সে কথা, এখন আমরা যাহা
বলিতেছিলাম তাহাই বলি। রাধিকা তো
কৃষ্ণের সকল অনুরোধ, দীনতা, বিনয় উপেক্ষা
করিয়া মানে বসিলেন, বেশ ছ’ কথা শুনাইয়াও
দিগেন। যদি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে ভালবাসা
না থাকিত তাহা হইলে শ্রীরাধাকে ত্যাগ
করিবার এমন সুন্দর সুযোগ আর হইত না।
যদি তিনি কেবল ইন্দ্রিয়-পরায়ণই হইতেন
তাহা হইলে তাঁহার শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া
অন্য যুবতীশত, যাহারা তাঁহাকে একান্ত
প্রার্থনা করিয়াছে তাহাদের কাছে ফিরিয়া
যাইয়া নিজের সুখ খুঁজিয়া লইবার কোনও
বাধা ছিল না, বরঞ্চ এ তো তাঁহার মনোমত
সুযোগে পরিণত হইত। আমি আসিলাম
‘তুমি আমায় ফিরাইয়া দিবে, আমি আর কি
করিতে পারি? এতো তাঁহার সুন্দর
কৈফিয়ৎ।’ কিন্তু কৈ তিনি ভো সে অছিলার
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাধাকে ত্যাগ করিলেন
না, বরং তাঁহার মানাপগমের ক্রোধ-শাস্তির
অপেক্ষা করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের
প্রতীক্ষায় রহিলেন। ইহার মধ্যে সখী

রাধিকাকে কত বুঝাইল, কত অহুযোগ করিল,
 “তোর যে সবই উলটা” বলিয়া কত তিরস্কার
 করিল, করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিল।
 কিন্তু সখীরও তো একটু রঙ্গ দেখিবার ইচ্ছা
 হয়, সে তাই আর কোনও কথা না কহিয়া
 চুপ করিয়া থাকিল। এদিকে শ্রীরাধার মান
 প্রাণের আকুলতার মুখে ভাসিয়া গিয়াছে,
 অথচ বাহ্যকে এইমাত্র তিরস্কার করিয়া বিদায়
 করিয়াছেন তাহাকে কি করিয়া ফিরাইবেন
 এই চিন্তাতে হৃদয় এখন মগ্ন হইয়াছে। সখী
 বুঝিতেছে অথচ কোনও কথা কহিতেছে না,
 বোধ হয় মনে মনে সে একটু হাসিয়া লইতেছে
 এবং মনে মনে বলিতেছে—

বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে।

এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে ?

শ্রীরাধার বড় বিপদ, এ বিপদে সখী ভিন্ন গতি
 নাই, অথচ সখীকে কিছু খুলিয়াও বলিতে
 পারিতেছেন না, মনের বাসনা দীর্ঘ নিশ্বাসে
 ও সখীর প্রতি বার বার সলজ্জ চাহনিতে
 প্রকাশ পাইতেছে। একটা হৃদয় যেন বিনা
 কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, ছবিটা বড় মনোরম
 মনে হয়, যেন এমনি অবস্থায় শ্রীরাধিকাকে
 আর একটুকু দেখিতে পাইলে আমাদের
 নয়ন সার্থক হইত। ঠিক এমনি ছবিটা আমরা
 বিদ্যাপতিতে দেখিতে পাই না, সেখানে সখীও
 রাধিকাকে হৃকথা শুনাইয়াছে, রাধাও সখীকে
 অহুরোধ করিয়াছেন। এমনি ধারা নির্বাক
 নিবেদন, এমনি কথা না কহিয়া মনের ভাব
 ব্যক্ত করিবার ছবি বিদ্যাপতির ‘মানে’ নাই,
 আছে ভাবী বিরহে, তাও বড় সুন্দর, কিন্তু
 এই ছবিটাতে যে মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে,
 তাহা অধিক জটিল। জয়দেব চিত্রাঙ্কণে যে

বেশ সিদ্ধহস্ত তাহা এই চিত্র হইতে বুঝা
 যাইতেছে।

সখী রাধিকার কাছে কোনও কথা বলুক
 আর না বলুক, সে যে শ্রীরাধার এই অবস্থার
 কথা শ্রীকৃষ্ণকে কোনও উপায়ে জানাইয়া-
 ছিল সে বিষয়ে ভুল নাই, কারণ আমরা
 দেখিতে পাই যে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার
 কাছে আসিয়া তাঁহার মানের অবশিষ্টাংশ
 ভাঙ্গিবার জগ্গ অনেক কথা বলিতে লাগিলেন।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দত্তকচিৎকৌমুদী

হরতিদরতিমিরমতিঘোরম্।

শূর দধরসৌধবে তব বদনচন্দ্রমা

রোচয়তি লোচন-চকোরম্॥

অপরাধভীত শ্রীকৃষ্ণের মুখ হৃদয় পূর্বে
 একেবারেই খোলে নাই, কিন্তু এখন শ্রীরাধার
 কোপাপনয়নসংবাদে তাঁহার কবিত্বের ফোয়ারা
 খুলিয়া গিয়াছে, এখন কতক সাহসও
 বাড়িয়াছে এবং মনের কথা প্রকাশ করিয়া
 বলিবার অবসরও মিলিয়াছে; মুখও খুলিয়াছে;
 অপরাধী রাণীর দরবারে হাজির হইয়া
 “আজি” করিয়াছেন, আমি দোষী তাহাতে
 “সত্যমেবাদিসি যদি হৃদতি ময়ি কোপিনী”
 তাহা হইলে আমায় সাজা দাও আমাকে
 লইয়া তোমার বাহা অভিরুচি হয় তাই কর
 “যেন বা ভবতি স্মৃথ জাতম্।” তুমি-যে
 আমার সব—

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং

ত্বমসি মম ভবজলাধি-রত্নম্।

আমার ভুল কি তুমি ক্ষমা করিবে না ? তুমি
 ত জান তুমি যাহাতে সুখে থাক আমি
 সেই কামনা লইয়াই জীবিত আছি।

ভবতু ভবতীহ-ময়ী সততমমুরোধিনী ।

তত্র মম হৃদয়মতি-যত্নম্ ॥

তোমাকে লইয়াই আমার কাম, আমার ভোগ আমার বাসনা, আমার লালসা এ সকলেরই চরম আশ্রয় তোমার ঐ দেহখানি। তোমার মনটাই আমার সর্ব আকাজ্জকার কেন্দ্রস্থল। হে মানিনি, তোমার বৃথা সন্দেহ দূর কর, তুমি থাকিতে কি এ হৃদয়ে আর কাহারও স্থান হইতে পারে? তাই বলি “মুঞ্চময়ী মানমনিদানম্” এস আমার হৃদয়ে, তোমার নয়ন রাগে আমার কাল দেহ রঞ্জিত হোক, তোমার হৃদয়ের হার চঞ্চল দোলনে হৃদয়ে শোভা সম্পাদন করুক, তোমার মেথলা কোমল নিক্ষেপে লালসার মদনের আজ্ঞার প্রচার করুক, প্রিয়ে আমি অপরাধী আমি একান্ত বাসনা সত্ত্বেও তোমার আর কোনও অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহস করি না শুধু আমার হৃদয়ের ভূষণ তোমার পা দুখানি ছুঁইতে সাহস করি, এস সেই দুইটাবে অলক্তক রাঙা রঞ্জিত করি। আমি বাসনা বিষজর্জরিত, তোমার স্পর্শই তাহার একমাত্র ঔষধ। অতএব আমার শিরোরত্ন স্বরূপ সেই পা দুখানি—

আশ্চর্য্যের বিষয় নহে জয়দেব এই চরণটী শেষ করিতে গিয়া চকিত ও ত্রস্ত ভাবে উহা অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার সেই দ্বিধান্দোলিত ও চকিত হৃদয়ের স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। কি করিয়া তিনি তাঁহার চিরারাধা-দেবতা জগৎপতি কৃষ্ণকে এত দীনতা স্বীকার করাইবেন ইহা ভাবিয়া যে তিনি আকুল হইয়াছিলেন, অকুল পাথারে পড়িয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। ভক্তমালে ঐ চরণ পূরণের

যে বিবরণ আছে তাহা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, এ কথা সত্য যে সেই মানীর মানী অথচ ভক্তের কাছে তৃণাদপি সূনীচ, ভক্তের মান বাচাইবার জন্ত যিনি চিরদিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তিনিই ভক্ত কবির হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া নাগিকার শিরোমণি, রাধাঠাকুরাণীর মান ব্যুড়াইবার জন্ত কবির লেখনী হইতে “দেহি পদপল্লবমুদারম্” এই অসমসাহসিক এই অশেষ আশাপ্রদ বাক্য বাহির করিয়া ছিলেন।

আমরা যে ভাবেই কৃষ্ণচরিত্র বিচার করি না কেন জয়দেবের কাছে যে “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” সে বিষয়ের প্রমাণ গীতগোবিন্দের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব বৈষ্ণবসাহিত্যে ভগবানের দীনতা যে কতদূর প্রসূত হইতে পারে তাহার এই প্রথম ও প্রধান নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিতে যে জয়দেবকে অসমসাহসিকতার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও মতভেদ হইতে পারে না। ভক্তমালের বিবরণ একেবারে অসম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না, কিন্তু কাহাকেও বিশ্বাস করিতেও বলি না, কারণ তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। যেক্ষেপেই এই বাক্য লিখিত হউক, আমরা ইহা হইতে ভক্তিরসের এক অভাবনীয় নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি, এবং মহাকবি ও মহাপ্রেমিক জয়দেব সেই ভাব বঙ্গদেশে প্রথম প্রবাহিত করিয়াছেন, তাই ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে জয়দেবের এত সম্মান, জয়দেবের আসন এত উচ্চে। ক্রমে এই ভাব সহজ হইয়া আসিয়াছিল, এমন কি বিদ্যাপতিতেই যেন অতটা সঙ্গম-বোধ আর দেখিতে পাওয়া যায়

না, পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা তো সন্ত্রমে ভাবটা একেবারেই ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই অপূর্ব উপায়ে জয়দেব শ্রীকৃষ্ণাধিকার মানভঞ্জন করিয়াছেন। মনের মান “মানে,” তাই বৈষ্ণব কবির কাছে মানের এত আদর! বৈষ্ণব ইহা মানিতেই হইবে যে কোনও “বহুবল্লভ” নাগকের পক্ষে একই নাগিকার কাছে এত হীনতা স্বীকার করিবার একমাত্র প্রয়োজন প্রাণের অনিবার্ধ্য ও প্রবল আকর্ষণ; এমন আকর্ষণ যে তাহার কাছে নিজের মান-মর্যাদা, গুণ-গরিমা সকলই ভাসিয়া যায়। আপাততঃ আমাদের এই টুকুতেই প্রয়োজন।

তাহার পর এত আকাঙ্ক্ষার এত সাধা-সাধির, এত যত্নে “মানভঞ্নের” যাহা অবশুস্তাবী পরিণতি; এবং যে ভালবাসা কেবল ভাবমাত্রে পরিণত হয় নাই তাহার যাহা স্তম্ভময় ফল কবি জয়দেব তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তখনকার কবিরা এ সব বর্ণনায় দোষ দেখিতেন না, এখনকার কবিরা দেখেন, তাই তাঁহাদের অনেক সময় আভাসে সূত্রাকারে এই সত্য প্রকাশ করিতে হয়। ঐহাদের ভাল লাগে না তাঁহারা স্বচ্ছন্দে এইগুলি বাদ দিয়া যাইতে পারেন, গ্রন্থ উপভোগের কোনও বাধা হইবে না। তবে না বুদ্ধি, মর্মগ্রহণ না করিয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট না হইয়া, কেবল অশ্লীলতার ধূয়ার খাতিরে, মহাকবি জয়দেব বা বিদ্যাপতিকের গালাগলি না করিলেই সাহিত্যের পক্ষে ও নিজেদের পক্ষেও ভাল হয়। যে সকল কথা আমরা অশ্লীল বলিয়া পরিত্যাগ করি সেই গুলিই বৈষ্ণব অনুবাদক ভক্তির পরিপোষক বলিয়া আদরের

সহিত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা হইতেই তাহাদের গূঢ়রহস্য অনেক পরিমাণে জানা যায়। গীতগোবিন্দের শেষে সম্ভোগান্তে থিরবেশা, শ্রুতকুস্তলা শ্রীরাধা দেহসজ্জার জগ্ন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছেন। সমগ্র গীতগোবিন্দে যে একটা কৃষ্ণলালসার ভরা স্বর বাজিয়া উঠিয়াছে, ইহা সেই স্বরের স্তম্ভুর সমাপ্তি। “তোমার দেহ তুমি সাজাইয়া লও, আমি তোমার জন্য সব ছাড়িয়াছি” শেষ যে ছিল লজ্জাটুকু তাহাও তোমার স্নেহের জগ্ন ধুইয়া ফেলিয়াছি, তোমার জগ্নই এই দেহ, তোমার জগ্নই এই ইন্দ্রিয়গুলি, তুমি ইহাদের সাজাইবে তবে তাহারা সাজিবে, তুমি ইহাদের যেমন রাখিবে তেমনি থাকিবে, কিন্তু হে আমার হৃদয়সর্বস্ব, আমি কেমন করিয়া অনলঙ্কৃত দেহে, ভূষণবিহীন ইন্দ্রিয় লইয়া তোমার সেবায় নিয়োজিত হইব? তাই আমার দেহে বল দাও, অঙ্গে অঙ্গে ভূষণ দাও আমার স্নাকুল কবরী সংযত করিয়া দাও, তোমার নৈবেদ্য তুমিই গুছাইয়া লও, যদি এ দেহে তোমার আবার প্রয়োজন থাকে, তবে ইহাকে নিজে সাজাইয়া লও, তোমার মনোমত করিয়া লও, তোমার প্রেমের ভূমিকে শক্তিশালিনী করিয়া লও; শ্রীরাধার ইহাই স্নেহ, ইহাই আবদার, ইহাই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ঐহারা ভক্তির রহস্য অবগত হইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ভক্তের ইহাই কামনা, ইহাতেই তাহার স্নেহ। তাই কবি জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রথমেই জোর বরিয়া বলিয়াছেন—

“যদি হরি স্মরণে কুতুংসনঃ—

শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।”

এবং এই জন্তই বৈষ্ণব অনুবাদক লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণ ভজন তত্ত্ব সকলি লিখিলা—

বৈষ্ণবের ধ্যানবস্তু তত্ত্ব বিচারিলা ।

* * *

নিত্যলীলা-সহ গ্রন্থ বিচারি কহিলা ।

রঙ্গসার গ্রন্থ যাতে সব কৃষ্ণলীলা ॥

* * *

শ্রীকৃষ্ণে একান্ত আস্থা তনু মন যার—

সেই জয়দেব পাদপদ্মে নমস্কার ॥

জয়দেবের কাব্যের যেখানে সমাপ্তি, বিদ্যাপতির কাব্যের সেই খানেই আরম্ভ। বিদ্যাপতির কাব্যের প্রাণ বিরহে, সেই বিরহ তিনি সম্পূর্ণ সম্ভোগের পরে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জয়দেব গুরু, বিদ্যাপতি শিষ্য শুধু বিদ্যাপতি কেন সকল বৈষ্ণব কবিই জয়দেবের শিষ্য, কারণ জয়দেব মধুর রসের আদি কবি। এক হিসাবে কিন্তু বিদ্যাপতি গুরুর অপেক্ষা অধিক কৃতী; তাহার শ্রীরাধিকার চরিত্রের ক্রমবিকাশ সম্পাদনে আমরা তাহার পরিচয় পাই। একটা সরলা বালিকা ভালবাসার পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হয়, বিদ্যাপতি তাহাই স্বল্প ভাবে দেখাইয়াছেন, পক্ষান্তরে একজন ভক্ত ভগবৎ-প্রেমের পথে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রগামী হয়, বিদ্যাপতি তাহাও দেখাইয়াছেন। এইরূপ একটা সরলা বালিকা পরকীয়া হইলে, তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, এবং তাহার প্রেম ও 'কুলের' নাথে পড়িয়া যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ও বিপরীতগামী ভাবাবলী তাহাতে প্রকাশ পায়, শেষে প্রেমের জয় হইলে কেমন করিয়া সে সমস্ত তাগ করিয়া প্রিয়ানুশীলনে নিমগ্ন হয়, বিদ্যাপতি তাহা নিপুণ তুলিকার সহিত চিত্রিত

করিয়াছেন। বিদ্যাপতিতে এইজন্ত কলা-কৌশল বেশ বিকশিত। পক্ষান্তরে, ভক্তির ক্রম পরিপুষ্টি, ভক্তের হৃদয়ে সংসার ও ভগবানের এই দুইয়ের মধ্যে কাহাকে অবলম্বন কবিতে হইবে এই ভাবনার তুমুল আন্দোলন ও এই পরস্পরবিরোধী ভাব-দ্বয়ের পরস্পরের অভিনব চেষ্টায় যে সকল অবস্থা বিশেষের সংস্থান ও পারিশেষে ভগবদা-কর্ষণের জয় হয়, কবি ও রসিক ভক্ত বিদ্যাপতি উৎসাহের সহিত তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্ত বৈষ্ণব কবি হিসাবে বিদ্যাপতির স্থান কোনও বৈষ্ণব কবির নীচে নহে; এবং কাব্য-কলা ও মনুষ্যহৃদয়জ্ঞতা যদি স্থান নির্ণয়ের পরিমাপক হয় তাহা হইলে তিনি অত্যাশ্রয় সকল বৈষ্ণব কবির গুরুস্থানীয় তাহা স্বল্পদর্শী মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে না। আমরা বিদ্যাপতির কথা অনেক বার বলিয়াছি হয় তো ভবিষ্যতে আবার কিছু কিছু বলিতেও হইতে পারে, অতএব এক্ষেত্রে আর বৈষ্ণব বলিবার ইচ্ছা করি না।

বোধ হয়—আমরা এতক্ষণে দেখাইতে পারিয়াছি যে কবি জয়দেব ভাব, ভাষা ও ছন্দে বঙ্গসাহিত্যকে অশেষ প্রকারে ঋণ-জালে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস, ঘাঁহার বঙ্গকাব্যসাহিত্যকে অশেষ শোভাশালী রত্নরাজি উপহার দিয়া বহু সমৃদ্ধ করিয়াছেন—উভয়েই মধুর রসের আদি-কবি জয়দেব গোস্বামীর কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী, ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রশংসার কথা আমি—বঙ্গভারতীর একজন নগণ্য সেবক-খুঁজিয়া পাই না।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু ।

বেদের কথা ।

আজি কালিকার যুরোপীয় সাধনা বিশাল বিশ্বব্যাপারে একটা ক্রম বিকাশের ধারা লক্ষ্য করিতে মার্স্ত করিয়াছে । ব্রহ্মাণ্ডের মূলে এক শক্তি, এক পদার্থ, এক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে । সে শক্তি, সে পদার্থ, সে তত্ত্ব যে কি তাহা কেহ জানে না । নানা লোকে তার নানা নাম দিয়া থাকে । কেহ বলে তাহা জড়, কেহ বলে অজড় । কিন্তু সে বস্তু যাহাই হউক না কেন, এই বিশাল ও বিচিত্র জগৎ যে সেই একই বস্তুরই ক্রমবিকাশে রচিত হইয়াছে, এ বিষয়ে আর বেশি কোনও সন্দেহ নাই । আমরা চিরদিনই এ বস্তুকে অজড়, তত্ত্ববস্তু বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি । “স দেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবা দ্বিতীয়ম্ ।” হে সৌম্য সেই এক ও অদ্বিতীয় সং বস্তুই আদিতে ছিলেন—“নান্যদন্তীতি কিঞ্চন”—এ ছাড়া অল্প আর কোনও কিছু ছিল না । সেই বস্তুই এই অশেষ বিচিত্রতাপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে । ইহাই আমাদের শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্ব । আধুনিক বিজ্ঞানও এই তত্ত্বকেই ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে ।

আর আমরা চিরদিনই সৃষ্টির মূলীভূত এই তত্ত্ববস্তুকে চৈতন্ত বস্তু বলিয়া জানিয়াছি । এই বস্তুই ব্রহ্ম-বস্তু । এ বস্তু ‘সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ।’ এই ব্রহ্মবস্তুই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কারণ । কারণ আবার আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকারের । এককে উপাদান কারণ ও অপরকে নিমিত্ত কারণ বলে । মৃত্তিকা ঘটাদির উপাদান কারণ । কারণ মৃত্তিকার দ্বারা ঘটাদি নির্মিত হয় । আর কুস্তকার এ সকল ঘটাদির নিমিত্ত

কারণ । নিমিত্ত কারণ এখানে কুস্তকারের কেবল কুলাল বা হাত নহে, তাহার মনও । কুস্তকার আপনার মনের মধ্যে পূর্বে ঘটাদির আকৃতি প্রভৃতি ধারণা করিয়া লয় । পরে সেই ধারণার অনুরূপ করিয়া, কুলাল-সহায়ে আপনার হাত দিয়া, মৃৎপণ্ড হইতে ঘটাদির সৃষ্টি করিয়া থাকে । ব্রহ্মবস্তু জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ দুইই । তাঁর অতিরিক্ত বিশেষ কোনও কিছুই নাই । সুতরাং এই বিশ্বরচনার আয়াতিরিক্ত কোনও কিছুই সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হন নাই । আর এরূপ কোনও উপাদান যদি থাকিত, তবে তাঁহাকে সেই উপাদান নইয়া বিশ্বরচনা করিতে গিয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সে বস্তুর অধীনও হইতে হইত । মৃত্তিকা যেমন কুস্তকারের শক্তির বশীভূত হইয়া, ঘটাদিতে পরিণত হয়, কুস্তকারকেও এই সকল ঘটাদি নির্মাণ করিতে যাইয়া মৃত্তিকার প্রকৃতিগত যে সকল ধর্ম আছে, তার বশত মানিয়া চলিতে হয়, নতুবা তার পক্ষ এই মাটি দিয়া ঘটাদি নির্মাণ করা সম্ভব হয় না । সুতরাং ব্রহ্মবস্তু যদি আপনিই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ দুইই না হন, তাহা হইলে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও স্বপ্রতিষ্ঠা আর রক্ষা পাইতে পারে না । জগতের উপাদান বাই হউক না কেন, জগৎকর্তাকে সে উপাদানের বশতা মানিয়া তবে এই জগৎ রচনা করিতে হইয়াছে । সে ক্ষেত্রে জগৎকর্তার সঙ্গে জগতের উপাদানবস্তুর একটা সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হইয়া উঠে । কিন্তু দুই বস্তুতে কোনও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা

করিতে গেলে, এ সম্বন্ধের স্বরূপের তৃতীয় বস্তুরও প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা আর যোগস্থাপন একই কথা। আর দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে যোগস্থাপন করিতে হইলে, একটা সাধারণ যোগসূত্র অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। ব্রহ্ম যদি জগতের নিম্নীতা বা রচয়িতা মাত্র হয়েন, আর অল্প কেহ বা কোনও কিছু যদি জগতের উপাদান হয়, তবে এই নিম্নীতার সঙ্গে এই উপাদানের একটা সম্বন্ধ ও যোগ স্থাপন করা তো চাই, না হইলে জগৎ নিম্নীত-কার্য্য সম্ভব হয় কৈ? এই জন্তই বলিতেছিলাম যে জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ দুই যদি এক ব্রহ্ম-বস্তু না হয়েন, তবে তৃতীয় তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা না করিলে জগৎ-রচনা সম্ভব হয় না। আর সে বস্তু একদিকে বিশ্বের উপাদান বস্তুকে অল্প দিকে বিশ্বকর্ম্মাকে ধরিয়া থাকিবেন— ইহার উভয়ে সেই পরম ও চরম বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া রহিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর তখন সেই পরম ও চরম তাক্ত বস্তুকেই ব্রহ্ম বলিতে হয়। তখন তাহাই পরিশেষে বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ দুইই হইয়া দাঁড়াই।

আমাদের শাস্ত্রে এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই ব্রহ্মবস্তুকে বিশ্বের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয় কারণরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর নিমিত্ত কারণ বলিলেই, তাহার মধ্যে বীজরূপে এই নিম্নত বিবর্তিত ব্রহ্মাণ্ড অনাদিকাল হইতে রহিয়াছে ইহাও মানিতে হয়। কারণ প্রকট হইবার পূর্বে ব্রহ্মাণ্ড কোথায় ছিল, অতথা এ প্রশ্নের কোনও সহজতর পাওয়া যায় না; অসৎ হইতে সত্যের

উৎপত্তি সম্ভবে না। 'যাহা মূল নাই, ফলেতে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না। যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাই ক্রমে ব্যক্ত হইতে থাকে— ক্রমবিকাশের বা ইভলিউশনের ইহাই মূল কথা। এ বস্তু ব্যক্ত হইতে গিয়া, বিবিধ কারণ সম্বারে বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে বটে—এ সকল রূপান্তর বা variation বাহিরের কারণে সংঘটিত হইয়া থাকে এবং হইতে পারে, কিন্তু রূপান্তর বলিতেই একটা ভিতরকার স্বরূপ যে আছে, ইহাও ধরিয়া লওয়া হয় না কি? এই রূপান্তর ঘটনের মধ্যে কাণ্যাকারণ সম্বন্ধ তো বিদ্যমান থাকে। আর কার্য্য ও কারণ ইহা যে দুইটা ভিন্ন বস্তু নয়, একই বস্তুর পরিণতি মাত্র, ইহাও তো অস্বীকার করা যায় না! কারণের বিকৃতি, বিবর্তন, বা পরিণতি হইতেই কি কার্য্যের উৎপত্তি হয় না? যেখানে কারণ ও কার্য্য উভয়ের মধ্যে একটা নিত্য বস্তু কিছু না থাকে, সেখানে এ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয় না কি? আমার জ্ঞর হইয়াছিল, আমি সেই জ্ঞরের বিরাম অবস্থায় কুইনাইন্ খাইয়াছিলাম, তাহার ফলে জ্ঞর আরোগ্য হইল। এখানে আমি বা আমার শরীর বলিয়া একটা বস্তু সমভাবে কার্য্যের ও কারণের সঙ্গে জড়িত হইয়া উভয়কে ব্যাপিয়াছিল বলিয়াই 'কুইনাইন্ সেবনকে কারণ ও জ্ঞরের উপশমনকে কার্য্য বলিতে পারিলাম। আমার বন্ধু কেশবের জ্ঞর হইয়াছিল, আমি তাঁর সে জ্ঞরের বিরাম অবস্থায় দশগ্রেণ কুইনাইন্ খাইয়াছিলাম, পরের দিন আর তাঁর জ্ঞর আসিল না এমন যদি ঘটে, তাহা হইলে আমার কুইনাইন্ সেবনের সঙ্গে তাঁর জ্ঞরবিচ্ছেদের কোনও

কার্য্যাকারণ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করা যাইবে কি? আর কার্য্য ও কারণের মধ্যে সেইরূপ কোন একটা কিছু সমভাবে এখানে বিদ্যমান নাই বলিয়াই, এক্ষেত্রে এ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। অতএব ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যাকারণ সংন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে উভয়ের মধ্যে এমন একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, যাহা সৃষ্টির পূর্বেও ব্রহ্মেতে ছিল, সৃষ্টির পরেও ব্রহ্মেতে একদিকে ও ব্রহ্মাণ্ডেতে অপরদিকে নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বস্তুই দেশকালের চিত্রপটে ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকট হইতেছে। এই বস্তুর প্রতিষ্ঠা না করিলে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও যোগ-স্থাপন সম্ভবে না।

যদি প্রাচীনকাল হইতেই বিশ্বদমস্তার ভেদ করিতে যাইয়া, বিভিন্ন দেশের ঋষি ও মনীষিগণ এই অপরিখার্য্য সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন। এই বস্তুকেই আমাদের বৈদান্তিকেরা মায়া, বৈষ্ণবেরা প্রকৃতি শাক্তেরা শক্তি ইহুদীরা সোফিয়া, গ্রীকেরা, হেগস, খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্ট নাম দিয়াছেন। এই বস্তুই জগদ্বীজ। এই বস্তু পরিপূর্ণ আকারে ব্রহ্মচৈতন্যে—তাহা হইতে ভিন্ন হইয়াও নহে, অভিন্ন হইয়াও নহে—অনাদিকাল হইতে বাস করিতেছে। চিত্রকরের অন্তরে প্রথমে যেরূপ একটা ছবি জাগিয়া উঠে ও তাঁর দ্বায়ে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আর তিনি এই মানসচিত্র-

কেই পরে ধীরে ধীরে চিত্রফলকে ফুটাইয়া তুলিয়ালোকচক্ষুর গোচর করিয়া থাকেন, সেই রূপ এই বিশ্বের একটা পরিপূর্ণ প্রতিকৃতি বিশ্ব-পতিও বিশকর্তার চিদাকাশে অনাদিকাল হইতে ফুটিয়া রহিয়াছে, এই প্রতিকৃতিরই অনুরূপিত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড। সেই তুরীয় চৈতন্যে মিতারিত আদর্শই এই বিশ্বের বিবর্তনে তিলে তিলে প্রকট হইয়া উঠিতেছে; সেইখানেই এই সকল অনিত্য বস্তুর নিত্য সার্থকতা। সেইখানেই এই সদসদাশ্বক জগতের নিত্য সত্যের প্রতিষ্ঠা। সেই অভিধানেই বিশ্বের সকল শব্দের সত্য অর্থ লিখিত রহিয়াছে। সত্যের কষ্টিপাথর এখানে; ধর্ম্মের উৎপত্তি এখানে; সৌন্দর্য্যের ওজন এখানে। অমৃতত্বের পরীক্ষা এখানে। আর ব্রহ্মচৈতন্যবৃত্ত এই যে বিশ্বছবি তাহাই নত্যবেদ। তাহাই ফোটাশব্দ শব্দ—যাহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। এই ফোটাশব্দ বেদ ধারণ করিয়া আছেন বলিয়াই ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি হইয়াছেন। এখানেই, এই তত্ত্বের মধ্যেই তাঁর শাস্ত্রানিযোজনের অর্থ ও প্রামাণ্য অব্বেষণ করিতে হইবে। নতুবা তিনি যে মানবের মত আপনার মুখ দিয়া ধ্বংসাত্মক শব্দযোজনী করিয়া ধ্বংসাত্মক-শব্দ সম্বলিত ঋগ্বেদাদির সাক্ষাৎ প্রচার করিয়া শাস্ত্রযোনি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা কবিকল্পনা হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বকথা নহে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।



